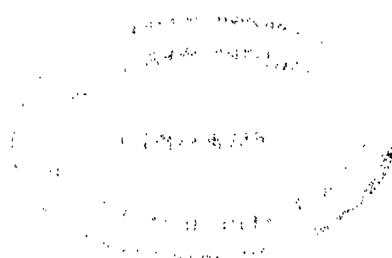
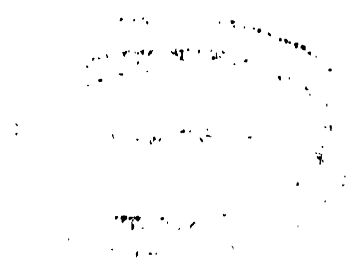






মাঘ * ১৪১০ * ১ম সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৬তম বর্ষ

উদ্বোধন কার্যালয় বাগবাজার



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

পোঃ কামারপুকুর, হুগলি-৭১২ ৬১২

ফোন ঃ (০৩২১১) ২৪৪২২১

একটি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমনে এই স্থান সবসময়ই জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। কেউ আসেন তীর্থপর্যটনে, কেউ আসেন আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হতে, আবার কেউ এর শান্ত সমাহিত মহিমা উপভোগ করেন। ছবির মতো সৌন্দর্যে ভরা এর আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সবসময়ই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে আকর্ষণ করে চলেছে।

হাওড়ায় অবস্থিত মূল কেন্দ্র 'বেলুড় মঠ'-এর একটি শাখাকেন্দ্র কামারপুকুর মঠ ও মিশন। যদিও এই কেন্দ্র স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক ভিটার অবিকল সংরক্ষণ এবং ভক্ত ও সাধুদের সাধন-ভজনের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, তবু এই কাজ ব্যতীত এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকাজকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সেবাব্রতের অঙ্গ হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন মেটাতে এই কেন্দ্র সূচনাকাল থেকেই তৎপর। এইসব সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোন নিজস্ব ভবন না থাকায় এযাবৎ মঠেরই কোন অংশে এগুলিকে স্থান করে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। ফলে ব্যাহত হয়েছে সুষ্ঠু পরিচালন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ এবং সাধু ও ভক্তদের জন্য নির্মিত রন্ধনশালা ও ভোজনগৃহ অত্যন্ত প্রাচীন হওয়ায় জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর আশু পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এই কাজ এখন নিষ্পন্ন করতে না পারলে যেকোন দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এছাড়া একটি পূজাবেদি ও তৎসংলগ্ন দর্শনমঞ্চ একান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় এখন আমরা প্রার্থনাগৃহটিকেই ব্যবহার করি। কিন্তু দিনে দিনে শিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সেজন্য অতি সত্বর একটি স্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণ করা আবশ্যক।

এই কাজগুলি অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাদের যে-অর্থের প্রয়োজন তা নিম্নরূপ—

১।	শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পাকশালা নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
২।	সাধু ও ভক্তদের ভোজনশালার সম্প্রসারণ বাবদ	২০ লক্ষ টাকা
৩।	দেবীপূজা ও অন্যান্য উৎসবের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
৪।	রন্ধনশালার ও অন্যান্য কর্মীদের আবাসন নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অতীতের মতো বর্তমানেও এই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তেরা উদারভাবে এগিয়ে আসবেন এবং অকৃপণভাবে সাহায্য করে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কাজগুলি যাতে সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করবেন। সব দান চেকে বা ড্রাফ্টে ওপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কামারপুকুর শাখা অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মহেশপুর শাখায় **রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর** নামে পাঠাবেন। **সব দানই ১৯৬১-র আয়কর আইনের ৮০জি অনুযায়ী করমুক্ত।** প্রতিটি দানের যথাযথ স্বীকৃতি থাকবে।

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
সম্পাদক

Vibrations of light are everywhere, even in the darkest corners; but it is only in the lamp that it becomes visible to man. Similarly God, though everywhere, we can only conceive Him as a big man.

Swami Vivekananda



A WELL WISHER

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৬।।

১০৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা ● মাঘ ১৪১০ ● জানুয়ারি ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী সত্যব্রতানন্দ — সম্পাদক: স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ: সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ: ৮০ টাকা; সডাক: ১০০ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য: ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন' ঃ **১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) ডাকখরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড,** ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে Service Charge বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com





আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বাঃ গিরো
যদ্‌যদ্ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥ (শিবমানসপূজা, ৪)

হে শম্ভু, হে মহাদেব! তুমি আমার আত্মা, পার্বতী আমার বুদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার ভৃত্য, শরীর তোমার মন্দির। তোমারই পূজার জন্য আমার বিষয়ভোগচেষ্টা। তোমাতে সমাহিত হওয়াই আমার নিদ্রা। আমার পাদসঞ্চালন তোমায় বিধিপূর্বক প্রদক্ষিণ করা, আমার বাক্যসমূহ তোমারই স্তব, আমি যা-ই করি তা তোমারই আরাধনা।

*

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্॥

(বেদসারশিবস্তোত্র, ১০-১১)

হে শম্ভু, হে মহেশ, হে করুণাময়, হে শূলপাণি, হে গৌরীপতি, হে পশুপতি, হে জীববন্ধননাশি, হে কাশীপতি! একমাত্র তুমিই করুণাবশত এই জগতের ধ্বংস, পালন ও সৃজন করিতেছ। তুমিই মহেশ্বর। তোমার থেকেই, হে স্মরারি, জগৎ হয়ে থাকে। হে মৃড় (আনন্দময়)! তোমাতেই জগৎ অবস্থান করে। হে ঈশ, হে চরাচর বিশ্বরূপী, লিঙ্গরূপী! তোমাতেই এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়।



স্বামীজীর শিববন্দনা

"দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকল্হারকান্তম্।
পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥"
('শিবস্তোত্র'—স্বামী বিবেকানন্দ)

—সমূহ পাপরাশি যাঁহার তেজে ভস্মীভূত হয়, দক্ষসুতা সতীর প্রাণবল্লভ, কলিমলহর, কহ্লারকুসুমবৎ[১] কান্তি, সদা পরহিতচিকীর্ষায় যিনি প্রাণোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, শরণাগতকে রক্ষাকারী সেই নীলকণ্ঠের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জানাই।

স্বামীজীর আয়তনেত্র দীপ্ত মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া এই স্তোত্রাংশটি পাঠ করিলে মনে হয়—শিব নহে, যেন স্বামীজীকেই আমরা প্রণাম করিতেছি, নমস্কার জানাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের শিববন্দনা প্রসঙ্গে একটি গীতের প্রথম পঙ্‌ক্তি মনে পড়েঃ "আপনি করিলে আপনার পূজা, আপনার স্তুতিগান।" যখন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরের নহবতে থাকিতেন, তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা ঐ ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তাঁহারই একখানি ছবি সেখানে পূজিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিল্বপত্রাদি সহযোগে আপন পটে পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "এ অতি উচ্চ যোগাবস্থার ছবি।" তাই সাধক-কবি স্বামী প্রেমেশানন্দ পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন ঃ "আপনি করিলে আপনার পূজা, আপনার স্তুতিগান/ ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ।" উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, একা ঈশ্বর অদ্বিতীয় সত্তান্বিত থাকিয়াও সহসা ইচ্ছা করিলেন—"একোঽহম্ বহুস্যাম প্রজায়েয়েতি"—আমি এক, বহু হইতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ তিনিই একরূপে পূজা করিবেন, অন্যরূপে পূজা গ্রহণ করিবেন। তাই মনে হয়, স্বামীজীর শিববন্দনাও এরূপ আত্মপূজা বা আত্মকথনের নামান্তর। যখন ভুবনেশ্বরী দেবীর আর্তিতে বীরেশ্বর শিব তুষ্ট হইয়া পুত্রসন্তানের মুখদর্শন হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, তখনি অতিজাগতিক চেতনার স্তরে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, জগতের তাপিত মানুষের দুঃখে কাতর হইয়া "পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতম্" স্বয়ং শিবের আবির্ভাব হইবে। বরানগরের মঠে একরাত্রে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখেন, নিদ্রিত স্বামীজীর শরীরের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিশূলধারী শিবের অনেকগুলি মূর্তি ঘুরিতেছে। তাহাদের দিব্যজ্যোতিতে অন্ধকার দূর হইয়া সমগ্র ঘরটি পবিত্র আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনে পড়িল কাশীতে বীরেশ্বর শিবের আকৃতিও অনুরূপ। মূল শিবলিঙ্গের উপর অজস্র ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ খোদাই করা রহিয়াছে। স্বামী শিবানন্দ মিথ্যা বা মনগড়া কথা বলিবার পাত্র নহেন। এবং স্বামীজীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে গদগদ স্বরে তাঁহাকে স্তুতি করিবার কারণে এইরূপ বলিয়া শ্রোতার মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন—তাহাও মনে হয় না। অর্থাৎ 'স্বামীজী স্বয়ং শিব'—এই কথা বলিলে তাহা ভক্তের আবেগমথিত স্তুতিবাক্য না কি সত্য ঘটনা, সেকথার বিচার কালের গর্ভে লুক্কায়িত আছে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে নরেন্দ্রনাথকে কখনো শিববন্দনা করিতে দেখা যায় না। এবং নিজেও শিবপ্রসঙ্গে তিনি সাধারণত চুপ করিয়া থাকিতেন। শিববন্দনা করিতে গিয়া স্ব-স্বরূপের কথা মনে পড়িলে তাহাতেই মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা লয় হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কাই কি ইহার কারণ? স্বামীজী কিন্তু যথেষ্ট ভালই জানিতেন যে, শিব-শক্ত্যাত্মক এই জগতে শিবের (পুরুষের) প্রকাশ প্রতিনিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, নিরবচ্ছিন্নভাবেই। মোহান্ধ মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহে না। তিনি নিজে শিব ও শক্তির অনুভব প্রতিক্ষণে করিতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তাই অল্পসংখ্যক হইলেও পরবর্তী কালে কয়েকটি শিবসঙ্গীত এবং শিবস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। এবং সেই অল্পসংখ্যক গান ও স্তোত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার গভীর মন্দ্র শিবানুভূতি প্রকাশলাভ করিয়াছে বলিয়াই উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা লাভবান হইয়াছি।

যে-দুটি শিবসঙ্গীত স্বামী বিবেকানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি ধ্রুপদাঙ্গে রচিত। তাঁহার নিজেরই সুরারোপিত, দরবারি কানাড়া রাগাশ্রয়ী এবং সুরফাঁকতালে নিবদ্ধ। অন্যটি কর্ণাটী রাগে বাঁধা। এই গানটিও স্বামীজীর সুরারোপিত, জলদ একতালে নিবদ্ধ। দ্বিতীয় গানটি আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হইলেও সুগভীর দার্শনিক ভাবব্যঞ্জনাময়। স্বামীজী যখন কথ্যভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাহার ভাষা, গতি ও অভিব্যক্তি সাধারণ কথাসাহিত্যিকগণের বিস্ময়ের কারণ হইত। আবার যখন গভীর দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করিতেন, তখন তাহার ভাষা জলদগম্ভীর হইয়া উঠিত। কিন্তু 'তাথৈয়া'[২]

১ পদ্মের একটি বিশেষ প্রকার।

২ 'তাথৈয়া' শব্দের উচ্চারণ স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণত আমরা বলিয়া থাকি—তাথোইয়া। স্বামীজী বলিলেন, ইহার উচ্চারণ হইবে—তা থেই য়া, হিন্দীভাষীদের ন্যায়।



তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটিতে স্বামীজী এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

গানটি আকারে ক্ষুদ্র। "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা/ বম্ বব বাজে গাল/ ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল/ গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূলরাজে/ ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্কভাল॥"—এই কয়টি সহজ কথার মধ্য দিয়া সমগ্র সৃষ্টিরহস্যটি যেন উন্মোচিত হইয়াছে। চক্ষু মুদিয়া ভাবিলে মনে হয় যেন নৃত্যরত মহাদেবের চিত্রটি ভাসিয়া উঠিয়াছে। গানটি বরানগর মঠে শিবরাত্রির দিন গীত হইয়াছিল। এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিক্রম বেদান্তে যেভাবে বর্ণিত আছে, স্বামীজী তাঁহার 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। 'রাজযোগ' গ্রন্থে বলিয়াছেন, আদিতে দুটি বস্তু ছিল—আকাশ ও প্রাণ। সেই আকাশে প্রাণ স্পন্দিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে সত্ত্বাদি তিন গুণ ও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হইল। শিবনৃত্য বস্তুত সেই প্রাণস্পন্দনের দ্যোতক। কেহ কেহ শিবনৃত্যের সহিত প্রলয়কে সম্পর্কিত করিয়া থাকেন। কেবল প্রলয় নহে, শিবের নটরাজ মূর্তির মধ্যে সৃষ্টির সহিত স্থিতিও সমভাবে সূচিত হইয়াছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড (universe) একটি নির্দিষ্ট ছন্দে হেলিয়া-দুলিয়া যেন প্রতিনিয়ত বিশ্বেশ্বরের আরতি করিয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতেও আজ ইহা প্রমাণিত সত্য। সেই মহাজাগতিক ছন্দেরই অনুবর্তন হইয়া থাকে প্রাণির জীবনছন্দে। তাই এই সৃষ্টি ছন্দোময়। প্রতিক্ষণে একদিকে যেমন সৃষ্টি হইতেছে, অপরদিকে তেমনি প্রলয় হইতেছে। ব্যক্তিজীবনে আমাদের সুষুপ্তিকালে বাহ্যজগৎ বিলীন হইয়া যায়। মানবজগতের প্রেক্ষিতে উহা ব্যষ্টি-প্রলয়। তেমনি সমষ্টি-প্রলয় হইয়া থাকে যখন সমষ্টি-জীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নিদ্রাগত হন। ইহাকে 'ব্রহ্মার রাত্রি' বলা হয়। এইরূপে ব্রহ্মা একশত বৎসর জীবিত থাকেন। সেই একশত বৎসর পরে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হইলে পর মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। এইরূপে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রলয় হইয়াছে এবং হইবে। ব্রহ্মা প্রত্যেক সৃষ্টিচক্রের অধিকর্তা। এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মার মস্তক লইয়া নির্মিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাকালরূপী শিব নৃত্য করিতেছেন। তাই স্বামীজী লিখিলেন ঃ "ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপালমাল।" এই ব্রহ্মা-কপালমাল তাই কালপ্রবাহের দ্যোতক। সে-কারণেই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে জগত প্রবাহাকারে নিত্য।

চরাচর বিশ্বের স্থিতির কী কারণ? স্থিতির কারণ জল। স্বামীজী গাহিলেন ঃ 'গরজে গঙ্গা জটামাঝে'। স্রোতস্বিনী গঙ্গা স্থিতির প্রতীক। অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থিতিই গঙ্গারূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অনন্ত কর্মরাশির প্রতীক শিবের ঐ জটিল জটারাশি। একটি 'কর্ম' পরবর্তী 'কর্ম'-এর জন্ম দিতেছে। এইরূপে স্থিতিলাভ করিয়া বারিপ্রবাহের ন্যায় চলিয়াছে অনন্ত সৃষ্টিলীলা। প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী সেতু এই অপার ত্রিগুণাত্মক কর্মরাশি স্থিত্যাত্মক। শিবহস্তে ধৃত রহিয়াছে মহাজাগতিক ত্রিশূল-দণ্ড। তাহার ত্রি-শলাকা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্যোতক। মধ্যবর্তী শলাকা সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া জ্ঞানালোক বিকিরণকারী। অক্লান্ত, অভ্রান্ত এই জ্ঞানাগ্নি উদ্গত হইতেছে বলিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ "উগরে অনল ত্রিশূলরাজে।" সেই ত্রিশূলরাজের তিনটি শলাকাকে 'ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না'—এই তিন নাড়ির সহিত উপমিত করা যায়। মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ি হইতে ব্রহ্মানুভূতি নামক অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে বলিয়াই 'ত্রিশূলরাজ' শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। মহাবিদ্যুতাধার কুণ্ডলিনী হইতে ঐ তিন নাড়ির মধ্য দিয়া মহাশক্তি অনলরূপে নির্গত হইতেছে। এই অনলরাশি মহাদেবের কৃপাসাপেক্ষে মানবের যাবতীয় কর্মরাশিকে নিমেষে ভস্মীভূত করিতে পারে। 'ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ'—চন্দ্রমৌলি শঙ্করের মাথার মণি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অর্থাৎ সেই জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। এই বর্ণনায়ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথাই বিধৃত রহিয়াছে। এবং অনন্ত জটাজালের প্রতিপাদ্য অনন্ত কর্মফল পর্যায়ক্রমে অবিদ্যা-কাম-কর্মের সৃষ্টি করিয়া এই জগৎকার্য অক্লান্তভাবে চালাইতেছে। যে-শক্তি ইহার পশ্চাতে ক্রিয়মাণা, উহাই শিবশক্তি বা আদ্যাশক্তি। এইসব লইয়া যে ছন্দোভূত সৃজন-পালন-নিধন লীলা সকলের অলক্ষ্যে চলিতেছে, তাহাই নটরাজের মহাকালনৃত্য।

অপরটি ভাবগম্ভীর এক সঙ্গীত। দরবারি কানাড়া রাগে স্বামীজী স্বয়ং সুরারোপ করিয়াছিলেন। "হর হর হর ভূতনাথ, পশুপতি/ যোগীশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি/ ঊর্ধ্বজ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোম কেশভাল/ সপ্তভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥" ধ্রুপদাঙ্গে রচিত সুর ফাঁকতালে বাঁধা এই গানে স্বামীজী যেন নিজ হৃদয়ের শিবভক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। গানের বন্দিশে শিবের প্রলয়নৃত্যের একটি অনবদ্য সর্বপ্লাবী অথচ অনুচ্ছল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং লক্ষণীয় যে, এখানেও একটি মহাজাগতিক ছন্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'সপ্তভুবন ধরত তাল'—নৃত্যের ছন্দে, জীবনের প্রবাহের ছন্দে।

আরো দুটি গান স্বামীজী আবেগমথিত কণ্ঠে গাহিতেন। একটি আনন্দকিশোর রচিত 'তুয়া চরণকমল পর মন ভ্রমর' এবং অপরটি দেবী সহায় রচিত 'অব শিব পার করো মেরে নেইয়া'। দুটি গানই ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ, যদিও কালোয়াতি করিবার যথেষ্ট সুযোগ উহাতে রহিয়াছে। প্রথমটি আশাবরি ও ত্রিতালে বাঁধা, দ্বিতীয়টিও ত্রিতালে বাঁধা, কিন্তু বিলাবল রাগাশ্রয়ী।

শিবলিঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া স্বামীজী বিশেষ কিছু



বলিতে চাহিতেন না। স্বামীজীর একান্ত মুহূর্তে নিবেদিতা কখনো কখনো এই বিষয়ক কিছু কথা স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। এবং ভাগ্যবতী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিবসাধনার চরমোৎকর্ষ লাভের সময়ে অমরনাথে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। স্বামীজীর নিজস্ব পত্রাবলী ও নিবেদিতার রচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ পুণ্য সময়ে ক্ষীরভবানীর দর্শন স্বামীজীর জীবনে অমরনাথ দর্শনের প্রভাবকে প্রবলতর নহে, প্রবলতম করিয়া দিয়াছিল। ঐ সময়েই তাঁহার স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে?

অনন্ত তুষারাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া একদা স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেনঃ "ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব। আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী।" ইহারই ভাষান্তর আমরা পাইয়াছি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেঃ "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

স্বামীজীর অনুভবে শিবের অস্তিত্ব ছিল প্রাণে প্রাণে, জীবের গূঢ়তম সত্তায়। তাই তাঁহার মহামন্ত্র ছিল—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। শ্রীলঙ্কার জাফনায় বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলিলেনঃ "যখন তোমরা শুধু তাঁহাকে শিবলিঙ্গে নহে সর্বত্র দেখিবে তখনি তোমাদের শিবভক্তি এবং তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে।" তৎকালীন সমাজে এসকল কথা সম্পূর্ণ অভিনব ও নূতন ছিল বলিয়া ঘরে-বাহিরে স্বামীজীকে বিপুল সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাকে যথার্থই 'নীলকণ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর মন্দিরে স্বামীজী বলিলেনঃ "যদি দেহ-মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন।... দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।" তখন ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ তাঁহাদেরই সন্ধান করিতেছে।

অর্থাৎ স্বামীজীর 'শিবসাধনা'র দুটি প্রধান অভিব্যক্তির প্রথমটি ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক শিবানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং দ্বিতীয়টি ছিল তাঁহার সেই অনুভূত অধ্যাত্মতত্ত্বে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষকে টানিয়া তুলিবার আকুল প্রয়াস। এই অকৃত্রিম প্রয়াসই তাঁহাকে একটি ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সন্ধান দিয়াছিল, যাহা তিনি সমাজে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মাধ্যমে।

অজ্ঞেয়বাদী কিংবা নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথ দত্তের মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে সহজেই অনুমিত হয় তাঁহার গভীরমন্দ্র 'শিবসাধনা'র পশ্চাতে কোন্ ব্যক্তি কলকাঠি নাড়িয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন তারাপদ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেনঃ "ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মানতো না, কাল মেনেছে।... মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, মার গান শিখিয়ে দাও। 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটি গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে।" ক্রমশ কালীতত্ত্বে নিমজ্জিত নরেন্দ্রের হৃদয়ে শিবের 'স্বে-মহিম্নি' রূপটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শিবভাবনার অনবদ্য প্রকাশ ঘটিয়াছিল পরবর্তী কালে, যখন তিনি রচনা করিলেন বিখ্যাত শিবস্তোত্রটি—"নিখিলভুবন জন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহা" ইত্যাদি। স্বামীজী কালীতত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাঁহার 'কালী দি মাদার' কবিতায় [কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত 'মৃত্যুরূপা মাতা' দ্রষ্টব্য] যেখানে মহাকালীর করাল ভয়ঙ্করী রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিবস্তোত্রে ঐ ভয়াল প্রতিবেদন নাই। হয়তো কালীমূর্তিতে শবরূপী শিব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াই। কিন্তু সমগ্র স্তোত্রে উপনিষদের মহান পুরুষের বর্ণনার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

তাই বোধহয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, ঐ 'শিবস্তোত্র' যেন বিবেকানন্দরূপী শিবেরই আত্মস্তুতি। দেবাদিদেবের যেসকল গুণের উল্লেখ এই স্তোত্রে রহিয়াছে, তাহা বহুলাংশেই স্বামীজীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। অসীম বৈরাগ্য-সম্পৃক্ত-হৃদয় সপ্তঋষির এক ঋষি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে এই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন, তখন তাঁহার অন্তরে কী বিপুল আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? স্বামীজীর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল—"গলিততিমিরমাল শুভ্রতেজঃপ্রকাশ/ ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ/ যমিজনহৃদিগম্যো নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ/ প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ॥"—অজ্ঞানবারিধির পারে শুভ্রতেজে যাঁহার প্রকাশ, যাঁহার অট্টহাসিতে জ্ঞাননির্ঝর পরিদৃষ্ট হয়, অখণ্ড যে-সত্তা সংযমীর হৃদি-গম্য, সেই মানস সরোবরে বিচরণশীল রাজহংসকে (পরমপুরুষ) প্রণাম করি।

ইহাও যেন স্বামীজীর জন্ম-কর্মের বাঙ্ময়রূপ। তাঁহার পূত স্পর্শে কিংবা আলিঙ্গনে অতি দুর্ধর্ষ পাপীরও সকল অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানলাভ হইত, ইহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই স্বামীজী যখন লিখিলেনঃ "অশিথিল-পরিরম্ভ প্রেমরূপস্য যস্য/ হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রংবিভুত্বম্॥" [অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ যাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনে বিশ্বচরাচর স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হয়], তখন শিবের স্তুতি করিতে গিয়া মনে হয় যেন তিনি আত্মকথনই করিয়াছেন। সেই নীলকণ্ঠরূপী স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সমবেত প্রণতি জানাই—"নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥" ❑



স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে* লিখিত



৯২১ ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রিট
লস এঞ্জেলেস
২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তাহলে তুমি জেগে আছ, আর ঘুমাতে পারছ না! বেশ! জেগে থাক, পুরোপুরি জেগে থাক। আমি যে এখানে এসেছি তাতে ভালই হয়েছে। কারণ, প্রথমত আমি রোগমুক্ত হয়েছি। এই যে হাঁটতে পারছি এবং প্রতিদিন রাত্রে গুরুভোজনের পর তিন মাইল হাঁটছি—এব্যাপারে তুমি কী মনে কর? উত্তম নয় কি?

আমি দ্রুত উপার্জন করছি—এখন দৈনিক ২৫ ডলার করে। শীঘ্রই আমি আরো বেশি কাজ করব এবং দৈনিক ৫০ ডলার করে উপার্জন করব। সান ফ্রান্সিস্কোতে আমি আরো ভাল করার আশা রাখি—সেখানে দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমি যাব। ভাল কথা, তার চেয়েও ভাল কথা এই যে, সব টাকাই আমি নিজের কাছে রাখছি এবং তা আর অপচয় করছি না। আর তারপর হিমালয়ের বুকে একটি ছোট্ট জায়গা কিনব—একটা গোটা পাহাড়—মনে কর, প্রায় ছয় হাজার ফুট উঁচু। সেখান থেকে দেখা যাবে চিরতুষারের অপরূপ দৃশ্য। সেখানে অবশ্যই একটি ছোট্ট জলাশয় থাকবে। চিরহরিৎ দারুবৃক্ষ—হিমালয়ের চিরহরিৎ দারুবৃক্ষের অরণ্যানী—এবং থাকবে ফুল, সর্বত্র ফুলের সম্ভার। সেখানে আমার একটি ক্ষুদ্র কুটির থাকবে, মাঝখানে থাকবে আমার সবজিবাগান, যেখানে আমি নিজে কাজ করব এবং—এবং—এবং আমার বইগুলি এবং কালেভদ্রে একবার মাত্র মানুষের মুখ দেখব। আর আমার চোখের ওপর হয়তো দুনিয়া রসাতলে যাবে, আমি ভ্রূক্ষেপও করব না। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সব কাজ চুকিয়ে দেব, আর অবসর নেব। অহো! সারাজীবন ধরে আমি কতই না অস্থিরভাবে ঘুরে মরেছি! আজন্ম যাযাবর! [কি হবে] আমি জানি না, তবে এই আমার এখনকার স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ অনাগত। অদ্ভুত! সবসময়ে আমার নিজের সকল সুখস্বপ্নের নিষ্ফল পরিণতি অবশ্যম্ভাবী মনে হয়, কিন্তু অন্যের কল্যাণের ক্ষেত্রে সাধারণত তারা ফলপ্রসূ হয়।

আমি আনন্দিত যে, তুমি মিসেস বুলের আতিথ্যে সুখে ও শান্তিতে কাটাচ্ছ। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা। এমনই মহীয়সী, যাঁকে দেখা তীর্থদর্শনের সমতুল।

এখানে কোন তুষার নেই; ঠিক উত্তরভারতের শীতকালের মতো। কোন কোন দিন তার চেয়ে বেশি গরম, সকালে ও সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা, মধ্যদিনে সূর্যতাপে উষ্ণ। আমাদের চারদিকে গোলাপ গাছ, সর্বত্র উদ্যানের মেলা, আর আছে চমৎকার তালবৃক্ষরাজি। কিন্তু আমি ভালবাসি তরঙ্গায়িত তুষার, যা পায়ের তলায় 'মচমচ' শব্দে ভাঙবে, শুভ্র—শুভ্র—শুভ্র—চতুর্দিকে শুভ্রতা!

আমার কিডনি বা হার্টে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল বদহজমের দরুন এবং এখন সেটা প্রায় সেরেই গেছে। মাত্র আর এক মাস, তারপরেই আমি সিংহের মতো বলবান ও অশ্বতরের মতো কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠব। বেচারা ইংরেজদের ওপর ব্যুয়েররা আক্রমণ শানাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি গৃহে শোকের ছায়া, তথাপি যুদ্ধ চলছেই। মানুষের এমনি মূঢ়তা। মানুষের সভ্য হতে আরো কত কাল লাগবে কে জানে! যুদ্ধ কি কোনকালে বন্ধ হবে? মা-ই জানেন। নতুন বছরে নিশ্চয়ই এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক কিছু ঘটুক—এই প্রার্থনা জানাই। নতুন বছর ও আগামী অনেকগুলি বছরের জন্য তোমাকে পাঠাচ্ছি সার্বিক আনন্দ, সর্বাঙ্গীণ ভালবাসা ও সর্বপ্রকার সফলতা।

তাহলে মিসেস বুলের কাছে এসে তুমি ভাল করেছ বলেই মনে করছ। আমি তাতে খুশি। আমি চেয়েছিলাম, তুমি মিসেস বুলকে পুরোপুরি জান। যতদিন পার সেখানে থেকে যাও। আমি নিশ্চিত যে, এতে তোমার কল্যাণ হবে। মনে উৎসাহ রাখবে এবং প্রফুল্ল থাকবে, কারণ আগামী বছরটি নিশ্চয়ই তোমার জন্য অনেক আনন্দ ও শত আশিস বহন করে নিয়ে আসবে।

তোমাদের সত্যবদ্ধ
বিবেকানন্দ

---

* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

চতুর্থ অধ্যায়ঃ কর্মরহস্য

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥১০॥

শ্লোকার্থঃ *[শ্রীভগবান জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন] আসক্তিরহিত, ভয়বর্জিত, ক্রোধশূন্য, মদ্গতচিত্ত এবং আমারই শরণাগত [অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থিত] বহু ব্যক্তি এই জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পরা শুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব [মোক্ষ] প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

ব্যাখ্যাঃ এই সংসারের কোন বস্তুতে যাহার প্রয়োজনবোধ নাই, তাহার ক্রোধের সম্ভাবনা নাই। ক্রোধ হয় কখন? যে-জিনিস পাইতে ইচ্ছা করি তাহা না পাইলেই ক্রোধ হয়। ভয় হয় কখন? যখন মনে হয় আমার প্রয়োজনীয় বস্তু বুঝিবা হাতছাড়া হইল অথবা বিনষ্ট হইল।

এই 'প্রয়োজনীয়' বস্তু হাতছাড়া হইয়া গেলে সেই ব্যক্তি কী লইয়া থাকিবে? যথার্থ বিচারবান ব্যক্তি তখন 'আমাকে লইয়া' অর্থাৎ ঈশ্বরকে লইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের এই উক্তি নূতন কিছু নহে। কারণ পূর্বেও অনেকে আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বর লইয়া থাকিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥১১॥

শ্লোকার্থঃ *যিনি যেপ্রকারে [মোক্ষ বা জ্ঞান লাভের জন্য কিংবা সকামভাবে আর্তি নিবারণের জন্য অথবা সগুণ বা নির্গুণভাবে] আমার ভজনা করেন, আমি [সর্বকর্মফলপ্রদাতা পরমেশ্বররূপে] তাঁহাকে সেই ফল প্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদেরও আমি বঞ্চিত করি না, কারণ মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং আমিই ইন্দ্রাদি সর্বদেবরূপধারী।*

ব্যাখ্যাঃ শ্রীভগবান বলিলেন, যে যেভাবেই আমাকে ডাকে, আমি তাহাকে সেইরূপ এবং সেই পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রমুখ দেবতাদিগের উপাসনায় যাহার যেমন কামনা, তাহাই লাভ হইবে। কিন্তু যদি কেহ পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া সামান্য এক পাথরের মধ্যেও উপাসনা করে, তাহা হইলে উহা হইতেই সে আমাকে (ঈশ্বরকে) তত্ত্বত জানিতে পারিবে। অবশ্য আমার তত্ত্ব না জানিয়া কেবল ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিলেও তাহা কিছুটা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হইবে নিশ্চয়ই।

[**মন্তব্যঃ** বস্তুত, এই শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের মর্মবাণী। বৈদিক যুগে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"ও একই কথা। শান্তি ও সমন্বয়ের এই মহাবাণীর ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া পুনরায় উহাকে উজ্জ্বলতর ও যুগোপযোগী করিয়া তুলিলেন।—**সম্পাদক**]

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২॥

শ্লোকার্থঃ *তবে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফল কামনা করিয়া অনেকে ইহলোকে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, মুক্তির জন্য সাক্ষাৎভাবে আমার শরণাগত হয় না। কারণ, মনুষ্যলোকে কাম্য-কর্মের ফল শীঘ্র অনুভূত হয়।*

ব্যাখ্যাঃ আমরা অনন্তকাল ধরিয়া বাসনা-প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছি। তাই কোন বাসনার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের মন সহজেই একাগ্র হইয়া পড়ে। কারণ, বাসনার দিকেই স্বাভাবিক ঝোঁক। পিতা পুত্রের অসুখে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করে, যাহাতে সে আরোগ্য লাভ করে। অনেক সময়েই দেখা যায়, পিতার অন্তরের এই ব্যাকুলতাজনিত তীব্র ইচ্ছায় পুত্রের রোগমুক্তি ঘটে। তাহা যেভাবেই হউক, ঝাড়-ফুঁক, স্বস্ত্যয়ন, faith-healing অথবা নামী চিকিৎসকের পরামর্শে। ইহা ছাড়া টাকা, যশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কর্ম করিলেও সহজেই উহার ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন সহজে ধাবিত হয় না। কারণ, অনন্তকাল ধরিয়া আমরা নিজেদের মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল মনকে একাগ্র করিয়া ব্রহ্মবস্তুর বিষয়ে নিদিধ্যাসন করিলে সত্য প্রতিভাত হয়। ইহার জন্য জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইতে পারে, আবার ইহজন্মেও সত্যলাভ হইতে পারে। কিন্তু সকাম কর্মের ফল এই জন্মেই লাভ হয়।

[**মন্তব্য ঃ** শ্রুতি-নির্দিষ্ট কর্মই শ্রৌতকর্ম এবং স্মৃতি-নির্দিষ্ট কর্ম স্মার্তকর্ম। বস্তুত, কর্মফললাভের অধিকার পশু, মনুষ্য ও দেবগণের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যকুলেরই আছে। সুতরাং মনুষ্যলোকেই সকাম কর্ম কিংবা নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে, অন্যত্র নহে।—**সম্পাদক**]

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥১৩॥

শ্লোকার্থ ঃ *সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এবং কর্মের চরিত্রানুসারে আমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। জাগতিক বা মায়িক ব্যবহারে আমি এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টির কর্তা বলিয়া কথিত হইলেও বস্তুত আমাকে অকর্তা ও অব্যয় (অধিকারী) বলিয়া জানিবে।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ—যে-গুণের প্রতি যাহার প্রবণতা, তদনুসারে আমি (ভগবান) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মবিভাগ করি। পরে তাহা বংশপরম্পরায় পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। অতীত কর্মফলে উপজাত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন জীবই ব্রাহ্মণ সংস্কারসম্পন্ন বংশে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তেমনি রজঃ ও তমোগুণের সংস্কারসম্পন্ন বংশের ক্ষেত্রেও সেই সেই গুণসম্পন্ন জীবই জন্মগ্রহণ করে। তবে একথাও ঠিক যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও চারপ্রকার স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে দেখা যায়, কেহ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ, কেহ পশুবধ, কেহ পূজার উপচার সংগ্রহ, আবার কেহ সমিধ আহরণ ও যজ্ঞবেদি নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত। একজন শিখ বলিয়াছিল, যখন আমরা পবিত্র 'গ্রন্থসাহিব' পাঠ করি তখন আমরা ব্রাহ্মণ, যখন লড়াই করি তখন ক্ষত্রিয়, যখন চাকুরিজীবী তখন বৈশ্য এবং যখন গৃহস্থালির কাজ করি তখন শূদ্র।

ভগবান এইরূপ চার বর্ণ সৃষ্টি করিলেও উহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকায় তিনি ইহার জন্য responsible (দায়বদ্ধ) নহেন। তিনি plan (পরিকল্পনা) করিয়া দিয়াছেন, এখন গাড়ি আপন গতিতে ধাক্কাধাক্কি খাইতে খাইতে নানা বিষয় আস্বাদন করিতেছে। তাহাতে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঈশ্বর এইরকম creation (সৃষ্টি) -এর plan (পরিকল্পনা) করিলেন কেন? উত্তর হইবে—এইসব তো created (সৃষ্ট) হয় নাই। তুমি খামোকা স্বপ্নের মতো এই জগৎটাকে real (বাস্তব) ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছ কেন? ইহা তো মোটেই সৃষ্ট হয় নাই! আর যদি ইহাকে real বলিয়া বোধ হয়—জগতে যদি ধাক্কাই খাইতে হয়, তবে ইহাকে real ভাব এবং কিভাবে এই ধাক্কা সামলানো যায় তাহার চেষ্টা কর। বৃথা ভগবানে দোষারোপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমারই ক্ষতি।

নিষ্কাম কর্মের রহস্য এই যে, তাহাতে কর্ম সুন্দর হয়, স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। ধ্যানে বসিলে মন নানা চিন্তায় বিরক্ত করে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে মন নানাপ্রকার সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যাইয়াও যতই কম agitated (উত্তেজিত) হইবে, ততই মন শ্রীরামকৃষ্ণা-ভিমুখী হইবে।

অব্যয়ম্ = Unchangeable—আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আমি যেরূপ ছিলাম, সেইরূপই থাকি।

[ক্রমশ] ॥ পনেরো ॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২৯

পাশাপাশি ঃ (১) অখণ্ডানন্দ, (৪) অঘ, (৫) তমো, (৬) দাস, (৭) চিরমগন, (১১) ক্ষীরভবানী, (১২) পানি, (১৫) কাম, (১৭) কুক, (১৮) জন রাইট।

ওপর-নিচ ঃ (১) অদ্বৈত, (২) নবীন, (৩) কলম্বাস, (৪) অনল, (৭) চিনি, (৮) মন, (৯) লাভ, (১০) ধনী, (১২) পাকড়াশী, (১৩) ডরাক, (১৪) নন্দন, (১৬) মর্কট।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, অভিবৃতা দাস, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব নন্দী, শিখা দত্ত, অলক পালচৌধুরী, নীলিমা চৌধুরী, সরোজ দাস, পার্বতী দাস, রঞ্জন বসাক, সলিল চ্যাটার্জি, বিজয়া দাস, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক অধিকারী, মীনাক্ষী ব্যানার্জি, অণিমা সর্বাধিকারী, রমা ঘোষ, নন্দদুলাল ঘোষ, সুনীতি পাল, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, গদাধর রানা, চণ্ডীদাস রায়, রুণা রায়চৌধুরী, মালতী মুখার্জি, নির্মলচন্দ্র জানা, মানবেন্দ্র শীল, কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঝরনা সেন

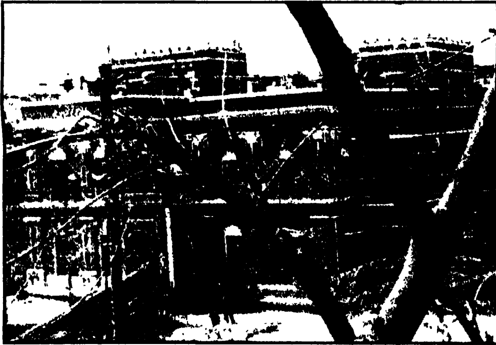
হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ত্রয়োদশ পর্যায়ে হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি।—**সম্পাদক**

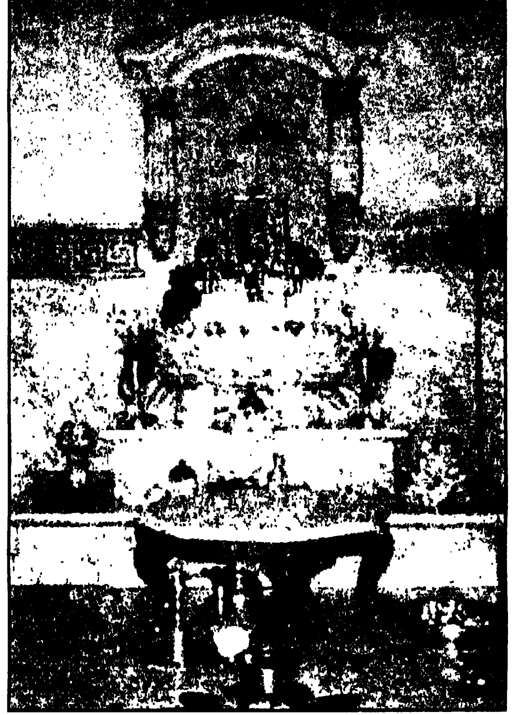
শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহি-শিষ্য নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধনের বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীশ্রীমা পানিবসন্তে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্যলাভের পর তাঁকে গাড়িতে করে নানা স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই তিনি রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাপ-মা ও যোগীন-মা।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবগোপাল ঘোষের কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে একদা শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। পরবর্তী কালে নবগোপাল ঘোষ কলকাতার বাড়ি ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় বিশেষ আকর্ষণবশত হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুর



শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়ি

গ্রামে বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে এসে স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর উদ্দেশে বিখ্যাত প্রণামমন্ত্র "ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য..." মুখে মুখে রচনা করে ঠাকুরকে প্রণতি জানান। সেদিন ছিল ১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমা (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানে আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়মিত পূজা হয় এবং মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ উৎসব হয়।



নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পট

এই বাড়িতে এসে জানা যায়, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে (বৈশাখ ১৩১৬) নবগোপালবাবুর দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করলেও পরবর্তী কালে নবগোপালবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা পরম ভক্তিমতী নিস্তারিণী দেবীর আগ্রহে তাঁরই প্রেরিত গাড়িতে করে শ্রীশ্রীমা আরো কয়েকবার এখানে শুভাগমন করেছিলেন, কিন্তু রাত্রিবাস করেননি। নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে তাঁর একটি আত্মিক সম্পর্ক ঠাকুরের জীবদ্দশা থেকেই বিদ্যমান ছিল। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি যখন বৃন্দাবনে যান, তখন রাধারমণ দর্শন করতে গিয়ে তিনি ভাবচক্ষে নিস্তারিণী দেবীকে

দেখতে পান। এসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "রাধারমণের মন্দিরে যাইয়া তিনি [শ্রীশ্রীমা] দেখিয়াছিলেন—যেন ভক্তবর শ্রীযুক্ত নবগোপালবাবুর স্ত্রী বিগ্রহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেছেন; গৃহে ফিরিয়া তাই বলিয়াছিলেন, 'যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এইরকম দেখলুম'।"[২] সুতরাং নবগোপালবাবুর এই ভক্তিমতী স্ত্রীর আহ্বানে পরেও তাঁর এই বাড়িতে আসা স্বাভাবিক, যদিও সেসব তথ্য মুদ্রিত আকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

এই ঘোষ বংশ বরাবরই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। নবগোপালবাবুর বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা হতো। তিনি নিজে যখন নামকীর্তন করতেন, তখন তাঁর প্রথম পুত্র সুরেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে খোল বাজাতেন এবং এই বালকের খোল বাজানো শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশংসাও করেছিলেন। নবগোপালবাবুর দ্বিতীয় পুত্র নীরদবরণ ঘোষ খুব উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন, যিনি বেলুড় মঠে যোগদান করে স্বামী অম্বিকানন্দ (নীরদ মহারাজ) নামে অভিহিত হন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তৃতীয় পুত্র শ্যামসুন্দর ঘোষও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, যিনি বেলুড় মঠে মহারাজের সমাধিমন্দির নির্মাণের জন্য সেকালে ৪০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুষমা ঘোষ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। চতুর্থ পুত্র রামকৃষ্ণ ঘোষও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী আরতি ঘোষ স্বামী শিবানন্দের মন্ত্রশিষ্যা। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৯৫ বছর। বাড়ির প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবধারায় নিষ্ণাত।

এই বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের মাথার পাগড়ি রক্ষিত আছে, যেটি তিনি এই ভক্ত পরিবারকে ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠার দিন উপহার দিয়েছিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন ঐ পাগড়ি ভক্তদের কাছে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া এই বাড়ির ঠাকুরঘরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পূতাস্থির কিয়দংশ রক্ষিত আছে। বাড়ির একতলার হলঘরে স্বামীজীর ব্যবহৃত পিয়ানো ও অর্গান-দুটিও সযত্নে রক্ষিত।

বাড়ির প্রবেশপথের বামদিকের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের ওপর লেখা আছেঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ৺নবগোপাল ঘোষের এই ভবনে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে, বাঙলা ১৩০৫ সনে মাঘী পূর্ণিমার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ [পট] প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেন এবং এখানেই তিনি প্রণামমন্ত্র রচনা করেন।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদগণের (স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ) আগমন ও মাঝে মাঝে রাত্রিবাসের দরুন এই বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক তীর্থস্বরূপ। ❑

পথনির্দেশঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য নবগোপাল ঘোষের বাড়ির ঠিকানাঃ ৮১ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-৭১১১০৫। হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুরগামী যেকোন বাস বা মিনিবাসে ফজিরবাজার বা লঞ্চঘাটে নেমে রিক্সায় রামকৃষ্ণপুর লেনে অবস্থিত এই বাড়িতে আসা যায়।

১ দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ১৮৪
২ ঐ, পৃঃ ১১৩

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচীঃ ফাল্গুন ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীরামকৃষ্ণদেব**
ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া
৯ ফাল্গুন, রবিবার
(২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)
শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব
১৬ ফাল্গুন, রবিবার
(২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
দোল পূর্ণিমা
২২ ফাল্গুন, শনিবার
(৬ মার্চ ২০০৪)
স্বামী যোগানন্দ
ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী
২৬ ফাল্গুন, বুধবার
(১০ মার্চ ২০০৪)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীশ্রীশিবরাত্রি**
মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী
৫ ফাল্গুন, বুধবার
(১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ৩, ১৮ ফাল্গুন
সোমবার, মঙ্গলবার
(১৬ ফেব্রুয়ারি, ২ মার্চ ২০০৪)

"আমি অশরীরী বাণী"

স্বামী গণনাথানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের এক অবিস্মরণীয় উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার অনুভূতিলব্ধ এই সত্যটি স্বামীজী অত্যাশ্চর্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে পত্রে তিনি লিখছেনঃ "I am a voice without a form."[১] — "আমি এক অশরীরী বাণী।" পত্রে দুবার তিনি এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে, এই 'আমি'টি কার, কার বাণী, কার এই 'voice'? এই রহস্যের সমাধান ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখছেনঃ "ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে (নরেন্দ্রনাথকে) দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া), 'দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি—কিছুই তফাৎ বুঝতে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কলকেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐকথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারী হীনবুদ্ধি—তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।'"[২] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয়ে বলা যায়, নরেন্দ্র বা বিবেকানন্দের 'আমি' প্রকারান্তে ঠাকুরেরই আমি। এমন মনে করাটা ভাবালুতা বা অযুক্তিকর হয় না। কারণ, একথা অবতীর্ণ ভগবানেরই শ্রীমুখের কথা।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুরের তিরোধানের দুদিন আগে সব দিয়ে 'ফকির' হওয়ার দৃশ্যটি অভূতপূর্ব এবং মর্মস্পর্শী। জগতের কল্যাণের জন্য ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ আধাররূপে তৈরি করে স্বীয় শক্তি ও ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে 'ফকির' হয়ে গেলেন। ঠাকুর জানতেন, নরেন্দ্রনাথ আধিকারিক পুরুষ এবং উচ্চ আধার ও ঐশী 'শক্তি' ধারণে সক্ষম। নিঃস্ব ঠাকুর অনুস্যূত হলেন নরেন্দ্রনাথে, তাঁকে তাই নিজের 'আত্মা' বলে ঘোষণা করলেন। নরেন্দ্রনাথের আলাদা অস্তিত্ব আর রইল না। ঠাকুর কেন এটি করলেন? করেছেন প্রেমের দায়ে। ঈশ-হৃদয়ের অনন্ত প্রেম ও করুণা মানুষের জন্য। "প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।" নিজেকে দেওয়ার জন্যই তো আসা। এটি ভগবানের প্রতিশ্রুতি—'সম্ভবামি যুগে যুগে'। তাই তিনি নিজেকে দিলেন তিলে তিলে—'প্রাণার্পণ জগত-তারণ'। এটি হলো ঠাকুরের কৃপার সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন লোককল্যাণে এবং জীবের দুঃখমোচনে নিয়োজিত। ভগবানের জন্য যত না কেঁদেছেন, মানুষের জন্য তার চেয়ে কম কাঁদেননি। স্বামীজীর মধ্যে ঠাকুরের এই আত্মপ্রকাশটি নব নব ভাবে, কর্মে ও জ্ঞানে মহিমামণ্ডিত। কবির ভাষায় বলা যায়ঃ "তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" স্বামীজীর বাণী তাই এত উদ্দীপনাময়, তেজঃপূর্ণ, প্রাণবন্ত এবং সঞ্জীবনী শক্তিদায়ী।

কে এই স্বামীজী? কি তাঁর স্বরূপ? কেন তাঁর আগমন এই ধরায়? এই বিষয়ে ঠাকুরের এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন হয়েছিল—"একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে;... দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতির্ঘন তনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন।... সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। (উক্ত দেবশিশু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁহার শ্রীমুখ হইতে লীলাপ্রসঙ্গকার এটি শুনিয়াছিলেন) ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল।... প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন।... দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।'... ঋষির প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। ... নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!"[৩]

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অধীর আগ্রহে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম যেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলেন, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, দেবালয়ে নরঋষি ও দেবশিশুর প্রথম মিলনদৃশ্যটি অভিনব ও অলৌকিক, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অভিনন্দন, অভিমান ও আনন্দাশ্রু—এই উপচারে ঠাকুর করজোড়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। বলেছিলেনঃ "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি,

'নররূপী নারায়ণ'। জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।"[৪] নরেন্দ্র স্তম্ভিত ও নির্বাক।

বহু প্রতীক্ষিত মানুষটিকে পেয়ে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন। অমৃতের পূর্ণপাত্রটি তিনি তাঁর নরেনের কাছেই রেখে যাবেন সবার মধ্যে বিতরণের জন্য। কারণ, সবাই অমৃতের অধিকারী, সবাই অমৃতের সন্তান। সেকথা বিশ্বসভায় ঘোষণা করবেন নরেন্দ্রনাথ।

স্বামীজী কিন্তু প্রথমদিনেই ঠাকুরকে চিনতে পারেননি, বুঝতে পারেননি যে, তিনি অবতীর্ণ ভগবান। তাঁকে অনেক সাধন করে এটি বুঝতে হয়েছিল। শেষে যখন বুঝলেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ-অবতার, তখন নিজের সর্বস্ব তাঁর চরণে অর্পণ করে তিনি স্তব করলেন বিভিন্ন মন্ত্রে—তুমি 'নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়'। প্রণামমন্ত্রে বললেন —'অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ'। স্বামীজী emotional হয়ে কিছু বলেননি বা কিছু করেননি। তিনি তাঁর সদাজাগ্রত বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক মনীষার আলোকে দেখেশুনে বহুভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই ঠাকুরকে নিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন তাঁর ভাব ও আদর্শ। স্বামীজীর সমগ্র জীবন ও বাণীতে তাই শ্রীরামকৃষ্ণেরই আত্মপ্রকাশ। স্বামীজীর গুরুপদে আত্মসমর্পণের ভাবটি 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ "দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে,/ তব গতি নাহি জানি,/ মম গতি তাহাও নাহি জানি।" স্বামীজী চিরদিনের জন্য প্রভুর দাস, প্রভুর গোলাম হয়ে গেলেন— "ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা।"

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে কত যত্নে নরেন্দ্রনাথকে গড়ে তুলেছিলেন, সেকথা স্বামীজীর জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমাধির আসন থেকে নামিয়ে এনে 'জীব শিব' মন্ত্রে দীক্ষিত করে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করলেন। "জীব-শিব ইব না পরঃ"—তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। স্বামীজীর জীবপ্রেম সেই 'ফকির'-এরই প্রেম। তাঁর দেওয়া চাপরাশ—'নরেন শিক্ষে দিবে' শুধু কথার কথা নয়, এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। স্বামীজীর উত্তরজীবনে দেখতে পাই এরই ফলশ্রুতি। দেশে-বিদেশে তিনিই প্রথম জনজাগরণের সূচনা করলেন। ঘোষণা করলেন ঃ "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,/ জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" মানুষকে ভালবাসা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা—এই প্রেমের আগুন ঠাকুর ধরিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে, ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়। জগৎজুড়ে তাই স্বামীজীর আহ্বান ঃ "হে অমৃতের সন্তানগণ ওঠো জাগো।" "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে স্বামীজী যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং জগতের ধর্মেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। দিনটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। সেদিন ভারত-বিবেকানন্দ হলেন বিশ্ব-বিবেকানন্দ। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এত বড় আলোড়ন, এত উন্মাদনা সৃষ্টি করতে আর কোন ধর্মপ্রবক্তা পারেননি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা প্রথমোক্ত ঐ পত্রটিতে স্বামীজী লিখছেন ঃ "প্রভুর ইচ্ছায় এখনো নাম-যশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই, বোধহয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি করে; আর শত শত পাদরী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্', আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য! যে-শহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়েছে—'Cyclonic Hindu'। তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form." এক পরাধীন দেশের মানুষ আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকায় ঐরকম অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করার পর নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দিচ্ছেন—এ শুধু স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাব ও আদর্শ তিনি স্বয়ং প্রচার করছেন, আর সকলে যন্ত্রমাত্র। তাঁর এই হৃদয়-নিহিত অনুভূতি অপরূপ রূপলাভ করেছে তাঁর 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে। সেখানে তিনি লিখছেন ঃ "প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।/ কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।/ বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

স্বামীজীর জীবনসঙ্গীতে ঠাকুর রয়েছেন নানা রাগে অনুরাগে ও বিভিন্ন ভাবে বিভাসিত। যন্ত্রী যেমন নানা রাগে, নানা ছন্দে সরব হয়ে উঠে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, তেমনি অশরীরী ঠাকুর অনুরণিত হয়েছিলেন স্বামীজীর কণ্ঠে বাণী-রূপে। তামাক খাবার ছলে বলেছিলেন ঃ "এটাও আমি, ওটাও আমি।" ❑

তথ্যসূচী

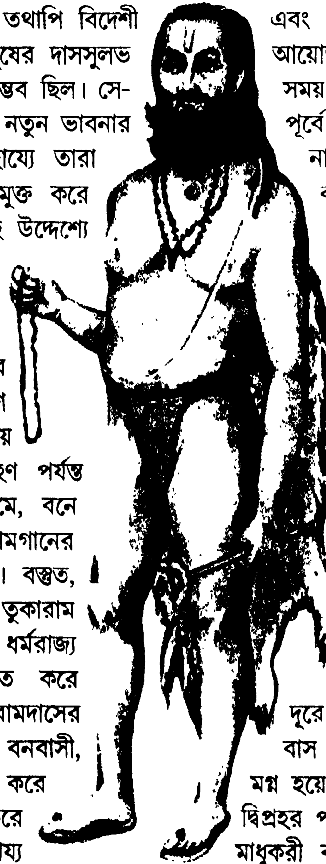
১ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, 11th Edn. p. 283
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৮ম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ২১শ সং, পৃঃ ১২৪
৩ ঐ, ৪র্থ অধ্যায়, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৪
৪ ঐ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৩৬

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

পরাধীন জাতিকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সমর্থ রামদাস

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে যুগে যুগে যেসকল সন্ত, সন্ন্যাসী ও ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সমর্থ রামদাস অন্যতম। তাঁর জীবন এবং কর্মের তুলনা হয় না। যদিও অন্যান্য সন্তদের মতো তাঁরও প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে ভক্তিপথে পরিচালিত করা, তথাপি বিদেশী বিধর্মী শাসকদের প্রতি এদেশের মানুষের দাসসুলভ আনুগত্যকে সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে-কারণে তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে এক নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে চাইছিলেন, যার সাহায্যে তারা নিজের দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার আলো দেখাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'দাসবোধ'।



সমর্থ রামদাস মাত্র বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইসময় থেকে প্রায় তিয়াত্তর বছর বয়সে মহাসমাধি গ্রহণ পর্যন্ত অবিরাম সমগ্র মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে, বনে পর্বতে ভ্রমণ করে সুললিত কণ্ঠে রামগানের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। বস্তুত, সমর্থ রামদাস এবং জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, তুকারাম প্রমুখ সন্তরা ছত্রপতি শিবাজীর ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সমর্থ রামদাসের অবদান ছিল সর্বাধিক। তিনি গ্রামবাসী, বনবাসী, গিরিজনদের মধ্যে ভক্তিরসের সঞ্চার করে তাদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। বস্তুত, সন্তমণ্ডলীর সাহায্য ব্যতীত শিবাজীর পক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ হতো না।

তদানীন্তন নিজাম রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলার জাম্ব নামক শস্যশ্যামল গ্রামে সূর্যাজী নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্নী রানুবাঈ বাস করতেন। রামভক্ত সূর্যাজী কয়েকটি গ্রামের কুলকর্ণী বা সরকারি গোমস্তা ছিলেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর ও ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের জন্ম হয়। এই নারায়ণই পরবর্তী কালে সমর্থ রামদাস নামে খ্যাত হন। তিনি চৈত্র শুক্লা নবমী অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন।

গঙ্গাধরের বয়স যখন দশ বছর এবং নারায়ণের সাত, তখন তাঁদের পিতা সূর্যাজী ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাধর একজন ভক্ত কবি-রূপে মহারাষ্ট্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নারায়ণের বয়স যখন মাত্র এগার বছর, তখন থেকেই বিশ্বের কল্যাণচিন্তা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। এই দেখে জননী রানুবাঈ উদ্বিগ্না হয়ে উঠলেন এবং বারো বছর বয়স্ক নারায়ণের বিবাহের আয়োজন করলেন। কথিত আছে, বিবাহের সময় পুরোহিত ব্রাহ্মণ যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণের পূর্বে 'দ্বিজ সাবধান!' বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বিবাহের অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলেন। পুরোহিতের কথা শুনে তাঁর বিবেকই যেন বলে উঠল ঃ নারায়ণ, সাবধান হও! সংসারের মায়াজালে জড়িও না। তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর জীবনের ইষ্টদেবতা বলে গ্রহণ করে জগতের কল্যাণের জন্য সংসারত্যাগ করে চলে গেলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক খোঁজ করলেন, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।

নারায়ণ জাম্ব গ্রামের দক্ষিণে গোদাবরী নদী পার হয়ে নদীতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। পঞ্চবটী থেকে দেড় ক্রোশ দূরে টাকেরলী নামে ছোট একটি গ্রামে নির্জনে বাস করে তিনি বারো বছর কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইলেন। গোদাবরী তীরে প্রত্যূষ থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতেন এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে গৃহস্থের ঘরে ঘরে

অন্নভিক্ষা করতেন। সেই অন্ন দেবতাকে উৎসর্গ করে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণের বয়স যখন চব্বিশ, তখন তিনি পঞ্চবটী ত্যাগ করে সারা ভারত পর্যটন করতে আরম্ভ করলেন। প্রায় বারো বছর পর তীর্থভ্রমণ শেষে যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি 'সমর্থ রামদাস' নামে বিখ্যাত। তাঁর অপূর্ব ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সকলে তখন মুগ্ধ। এত জ্ঞান তিনি কার অধীনে অর্জন করেছিলেন, কে তাঁর গুরু ছিলেন তা জানা যায়নি। এবিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি ঃ "সহায় আমার হনুমন্ত। আরাধ্য দেবতা রঘুনাথ। সদ্‌গুরু শ্রীরাম সমর্থ। তাই নাম মোর রামদাস। শ্রীরামের নামে অখণ্ড বিশ্বাস।"

সমর্থ রামদাস বারো বছর যাবৎ যেসব তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরে বদরীনারায়ণ, দক্ষিণে সিংহল ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্বে শ্রীজগন্নাথধাম এবং পশ্চিমে দ্বারকা। এইগুলির মধ্যবর্তী সমস্ত ভূখণ্ড-সহ তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। এইভাবে সারা ভারত ঘুরে তিনি দেশের অবস্থা, হিন্দু জনসাধারণের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তাঁর ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন। সংসার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই ছিল তাঁর দেশভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। এত দীর্ঘকাল ভারত-পরিক্রমা সম্ভবত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের পরে সন্ত-মহাত্মাদের মধ্যে একমাত্র সমর্থ রামদাসই করেছিলেন। পরবর্তী কালে এব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের নাম করা যায়।

কথিত আছে, হিমালয় পর্যটনকালে একদিন সমর্থ রামদাসের মনে হলো—এই দেহ ধারণ করে লাভ কী? এই ভেবে তিনি যখন এক কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত, তখন নাকি স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বাধা দেন এবং বলেন ঃ "আমার আদেশ, তোমার হাতেই জগতের উদ্ধার হবে। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে স্বধর্মস্থাপনে ব্রতী হও।" ইষ্টদেবতার আদেশ পেয়ে সমর্থ রামদাস স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন। পথে রাম-কীর্তন করতে করতে একদিন গোদাবরীর তীরে 'পৈঠন' নামক গ্রামে এক পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পারলেন। তাঁর মুখে জননীর দুরবস্থার কথা শুনে রামদাস মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর গ্রাম জাম্বের উদ্দেশে রওনা হলেন। জননীর গৃহদ্বারে পৌঁছে তিনি 'জয় রঘুবীর সমর্থ' উচ্চারণ করে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। বৃদ্ধা জননী জয়ধ্বনি ও শ্লোক শুনলেন, কিন্তু পুত্রের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন না। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে বললেন ঃ "দেখ তো বউমা, কোন গোঁসাই এসেছেন, ভিক্ষা দিয়ে এস।" এই কথা শুনে সমর্থ বললেন ঃ "এ-গোঁসাই শুধু ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যাবে না আঈ।" একথা শোনা মাত্র জননী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন ঃ "কে বাবা, নারায়ণ এসেছিস?" মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে ও তাঁর অশ্রুবিগলিত চোখ দেখে সমর্থ মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলে উঠলেন ঃ "হ্যাঁ মা, তোমার ছেলে নারায়ণ এসেছি।" দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে মাতা-পুত্রের এই মিলনদৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কথিত আছে, সমর্থের স্পর্শলাভ করে অন্ধ জননী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন।

মায়ের কাছে কিছুদিন থাকার পর সমর্থ রামদাস আবার বেরিয়ে পড়লেন দেশের মানুষকে জাগ্রত করার কাজে। সেইসময়ে মুসলমান শাসকদের জঘন্য অত্যাচারে দেশের সমস্ত মানুষ গভীর হতাশায় ডুবে গিয়েছিল। বিদেশী শাসকরা দেশকে পরাধীন করে রেখেছিল। চারিদিকে চলছিল তাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার, অনাচার। হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য দিকে দিকে শুরু হয়েছিল তাদের পাশবিক তাণ্ডব। গ্রামের পর গ্রামে চলছে লুঠতরাজ। ঘর-বাড়ি, খেত-খামার পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হচ্ছে। যারা শাসকদের বশ্যতা স্বীকার করছে না, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। শিশু, নারী ও বৃদ্ধেরা পর্যন্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং দেশের শত্রুদের সমূলে উচ্ছেদ করার মতো এক বলিষ্ঠ মানুষের তখন প্রয়োজন। দেশের চরম হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল, এই ঘোর সঙ্কট থেকে আমাদের ত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। সমর্থ রামদাস সারা ভারত পরিক্রমা করে এই ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন। দেশ ও ধর্মের চরম শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। এই অবস্থা থেকে দেশকে কেমন করে উদ্ধার করা যাবে? লোক-সংগঠনই বা কেমন করে করা যাবে? ভিক্ষার জন্য তাঁকে লোকালয়ে যেতে হতো, কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি একাকী বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, নির্জন নদীতীরে ঘুরে বেড়াতেন এবং গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

অবশেষে তিনি উপায় খুঁজে পেলেন। মনে মনে স্থির করলেন, ত্রেতাযুগে রাবণের কারাগারে অবরুদ্ধ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে যিনি বন্ধনমুক্ত করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা আজ দেশের সকলকে শোনালে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার হবে, দেশ ও ধর্ম

রক্ষা পাবে। শুরু হলো রাম-কথা ও রামনবমীর উৎসব। সকল শ্রেণির মানুষ দলে দলে রাম-কথা শ্রবণ করতে এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এল। এইভাবে সংগঠন-কার্যের সূত্রপাত হলো। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সমর্থ রামদাস কৃষ্ণা নদীর গর্ভে শ্রীরামের একটি মূর্তি আবিষ্কার করলেন। পরের বছর চাফল গ্রামে মন্দির নির্মাণ করে মহা সমারোহে সেই রামমূর্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র—গ্রামে, নগরে, তীর্থক্ষেত্রে বহু মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বয়ং রামদাসের জীবনকালেই সহস্রাধিক মঠের স্থাপনা হলো। এইভাবে মঠস্থাপন এবং মঠগুলির সাহায্যে লোক-সংগঠনে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। রামদাসের মুখে সর্বদাই এই সংগঠনের কথা শোনা যেত। কেউ দেখা করতে এলে কিংবা কাউকে পত্র লিখতে বসলে সর্বপ্রথম কথাই ছিল—"সমুদায় করাবা"—লোক-সংগঠন করবে, এবিষয়ে কখনো আলস্য করো না। আলস্য করলে তোমার পরমার্থের প্রয়াসে বিঘ্ন ঘটবে। এই কাজের জন্য সমর্থ রামদাস তাঁর মোহন্ত শিষ্যদের পরামর্শ দিয়েছিলেনঃ "নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাঁরা সহৃদয় ও বুদ্ধিমান, তাঁদের কাছে ডেকে এনে তাঁদের সংসার-সমাচার সবিস্তারে শুনবে। নিজ দুঃখের কথা অপরকে বলতে পারলে দুঃখের ভার লাঘব হয়। তখন দরদীর সাথে মৈত্রীবন্ধন সহজেই স্থাপিত হয়। তারপর তাঁদের দেবতার কথা, ধর্মের কথা শোনাবে, সাধনার পথ তাঁদের দেখাবে। এরপর তাঁদের আমার কাছে নিয়ে আসবে। বাকি কাজ আমিই করে দেব।" সমর্থ রামদাস সাধারণ মানুষের মনের সব হতাশা, হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অবক্ষয়কে যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর সুমধুর অথচ তেজোদ্দীপ্ত গান অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে দিকে দিকে ভেসে যেতে লাগল, আর সকল শ্রেণির মানুষকে এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ফলে সব অবসাদ যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। মনের মধ্যে নতুন বল, বীর্য, দেব-ভক্তি, সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এমন সাড়া জাগিয়ে তুললেন যে, হেরে যাওয়া, ভেঙে পড়া মনগুলো যেন তরতাজা হয়ে উঠতে লাগল। হতাশার সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলে যুবশক্তি নব উদ্যমে জেগে উঠল। শাসকদের অত্যাচারে যাদের ঘর-সংসার ভেঙে গিয়েছিল, আবার তাদের নিজ নিজ সংসারধর্মে উৎসাহ দিয়ে তাদের জীবনকে সহনীয়, বরণীয় করে তোলার জন্য তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করলেন।

সমর্থ রামদাস সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় ও ছন্দোবদ্ধ সুললিত সুরে গান করে বললেনঃ

—তোমার জীবনকে সবদিক থেকে শতগুণ সমৃদ্ধ করে তোল।

—মূর্খতা ও আলস্য ত্যাগ কর।

—নিজের ভাগ্য ও দৈবকে দোষ দিয়ে কাঁদতে বসো না।

—কাজ কর, চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর।

—প্রচেষ্টাই তোমার পরমেশ্বর।

—বুদ্ধির সঙ্গে, হিসেব করে নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে যাও।

—যাঁরা ভক্তির পাত্র, হৃদয় দিয়ে তাঁদের ভক্তি কর।

—কখনো ধৈর্য হারিও না।

—যাকিছু ভাল, তাই গ্রহণ কর। যা খারাপ, তা ত্যাগ কর।

—ঐক্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর।

—বিবেককে ত্যাগ করো না, শিক্ষাকে ত্যাগ করো না।

—শরীর সুস্থ ও সবল রাখ।

—বৃথা আলস্যে ও নিদ্রায় আয়ুক্ষয় করো না।

—ভালদের সঙ্গলাভ কর।

—ভালভাবে সংসারধর্ম পালন কর।

—সতত উদ্যম কর। সর্বদা সাবধানে থাক।

—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করেন, তাঁকে উপলব্ধি কর।

—কঠিন অবস্থাকে ভয় করো না।

—পরের ওপর নির্ভর না করে নিজেই কষ্ট কর, পরিশ্রম কর।

—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর।

—শত্রু কে আর বন্ধু কে, তার সঠিক নির্ণয় কর।

—সংযমের সঙ্গে চল। কোন মহৎ কাজে জীবনকে সার্থক কর।

এই ধরনের শত শত সহজ সুন্দর বাণী তিনি সরল স্বচ্ছন্দ ভাষায় গানের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে, বনে পর্বতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি আরো গাইলেনঃ "ওরে আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা। জ্বালালেই জ্বলবে। কাজ করলে তবেই কাজ হয় রে। আগে নিজে কাজ করে দেখা, তারপরে সেই কাজ করতে বল। শ্রীরামের প্রতি অক্ষয় ভক্তি মনের মধ্যে রেখে শুধু কাজ করে যা। ওরে তোরা সবাই কাজ করে যা।" সমর্থ রামদাসের এই উপদেশ অনুযায়ী তাঁর শিষ্য-অনুগামীরা কাজ করতে লাগলেন, যার ফলে হাজার হাজার শিষ্য মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা সকলে মিলে রাষ্ট্রধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সমর্থ রামদাসের নির্দেশে এই বিশাল সংগঠনের কাজ চলেছিল গুপ্তভাবে। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেনঃ "তোমার কর্ম বাইরের লোক যেন জানতে না পারে। বিশাল সংগঠন করবে, কিন্তু গুপ্তভাবে।" তিনি বলেছেনঃ "অগ্রপশ্চাৎ

বিবেচনা না করে কাজ করলে তা হবে পণ্ডশ্রম। সেইজন্য সন্ধান করে চতুর ও বিচক্ষণ লোক সংগ্রহ করতে হবে। তাদের কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সাবধান! সব কথা যেন গোপন থাকে।" এইভাবে তিনি সদাচারী, রাজ্যাধিকারী প্রভৃতি অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন। এদের মধ্যে বাসুদেব, উদ্ধব, কল্যাণ, ভীম প্রমুখ ছিলেন প্রধান ধর্মাধিকারী শিষ্য এবং শিবরায়, বালাজী আবজী, প্রহ্লাদ পন্ত, নীরো সোনদেব, রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রমুখ রাজকারণী শিষ্য।

১৬৪৪ থেকে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম দশ-বারো বছর সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থাপন করতে এবং প্রধান প্রধান মঠগুলি গড়ে তুলতে কেটেছিল বলে মনে হয়। গ্রামবাসী সরলচিত্ত মানুষদের তিনি বড় ভালবাসতেন। তাঁর সঙ্গে সর্বদা ওষুধপত্র থাকত। রোগী দেখলেই তিনি ওষুধ দিতেন, সেবা-যত্ন করতেন। দুঃখী-তাপীকে মিষ্টকথায় সান্ত্বনা দিতেন। ধীরে ধীরে সকলকে সহজবোধ্য ভাষায় উপদেশ দিতেন। দলে দলে লোক আসত তাঁকে দেখতে, তাঁর মধুর গলায় কীর্তন শুনতে। মুখ্য শিষ্যদের সঙ্গে গুরু রামদাসের মধুর ব্যক্তিগত স্নেহ-সম্পর্ক ছিল। তিনি এক জায়গায় বেশিদিন থাকতেন না, ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতেন। পত্রদ্বারা শিষ্যদের উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন। তাঁর পত্র-ব্যবহার ছিল বিশাল। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি প্রায় দশ বছর শিবথরে অধিকাংশ সময় বাস করে লেখাপড়া ও কবিতা রচনায় ব্যয় করেন। শিবথরকে কেন্দ্র করে তাঁর ভ্রমণও অব্যাহত ছিল।

শিবথর রায়গড় দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে সমর্থ রামদাসের প্রায়ই গোপনে দেখাসাক্ষাৎ হতো বলে অনেকেই মনে করেন। সেইসময় তাঁদের মধ্যে স্বরাজ্য ও স্বধর্ম স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা হতো বলে বিদ্বজ্জনদের ধারণা।

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের এক পুণ্য দিনে শিবাজী এক অমূল্য পত্র পেলেন। পত্রের প্রতিটি শব্দ থেকে যেন এক পবিত্র সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল, যার মধ্যে শিবাজীর জীবনব্যাপী কার্যের নিখুঁত বর্ণনা ছিল। এই সুন্দর পত্রের মধ্যে শিবাজীর ধ্যেয় মূর্তিটি নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছিল। পত্রের সুমধুর, সুললিত শব্দগুলি যেন সহ্যাদ্রি পর্বতের সুপ্রশস্ত বক্ষ থেকে নির্মল ধারায় নেমে আসা নির্ঝরিণীর পবিত্র প্রবাহের মতো সর্বত্র আনন্দের বার্তা বহন করে এনেছিল। শিবাজী সেই অমূল্য পত্র পাঠ করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। রামদাস লিখেছিলেন ঃ

"সদাজাগ্রত নৃপবর! তীর্থক্ষেত্র ধ্বংস হয়েছে। এইসবের সংরক্ষণে তোমার হৃদয়ে নারায়ণ আবির্ভূত। প্রেরণা দেন সকল পণ্ডিত বেদজ্ঞগণ। ধর্মরক্ষক কেউ এমন নেই। শুধু তোমার কারণেই এখন ধর্মকৃত্য চলছে। ধন্য তোমার কীর্তি। বিশ্বে তা হয়েছে বিস্তৃত। কত শত দুষ্টের করেছ সংহার, ভীতি-আতঙ্কের অবসান! কত গৃহহীন পেয়েছে আশ্রয়! নিজে স্থিতপ্রজ্ঞ থেকে সকলকে করলে চিরঋণী। কেমনে করিব বর্ণনা তোমার ধর্মসংস্থাপনার কীর্তি! সুরক্ষিত রাখতে হবে সামগ্রিক রাজধর্ম। না লিখলে এই চিত্তে পেতাম না শান্তি।"

শিবাজীর মনে সন্দেহ রইল না, পত্রলেখক সমর্থগুরু রামদাস ব্যতীত অন্য কেউ নন। সমর্থ রামদাসের পত্র পাঠ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শিবাজী। তিনি রামদাসের শিষ্য দিবাকর গোস্বামীকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানালেন এবং সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি শুরু হলো। ঐবছরই আগস্ট মাসে শিবাজী অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে চাফল যাত্রা করলেন। সমর্থ রামদাস চাফলের নিকট শিঙ্গনবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর আশ্রমে একটি মঠ ও বাগান ছিল। জায়গাটি ছিল অত্যন্ত রমণীয় এবং পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। শিবাজী অত্যন্ত বিনীতভাবে সমর্থের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁর চরণবন্দনা করলেন। শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সমর্থও অত্যন্ত প্রীত হলেন। একই সুরে বাঁধা দুই হৃদয়তন্ত্রীর মধুর ধ্বনি তাঁদের আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলল। ধর্মরক্ষার যে মহৎ ব্রতে শিবাজী নিজ জীবনকে দেশমাতৃকার বেদিমূলে উৎসর্গ করেছেন, তার সাফল্যের জন্য সমর্থ তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এই পবিত্র আশ্রমে গুরুর সান্নিধ্যে ভজন-পূজন-কীর্তনের আনন্দসাগরে শিবাজী কয়েকদিন সম্পূর্ণ ডুবে রইলেন। এই কয়দিন গুরু রামদাসের অনেক অমূল্য উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য তাঁর হলো। এক পুণ্য দিবসে শিবাজী আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থ রামদাসের নিকট দীক্ষালাভ করে তাঁর শিষ্যরূপে অভিষিক্ত হলেন।

বিদায়ের পূর্বে গুরু রামদাসকে পরম ভক্তির সঙ্গে শিবাজী প্রণাম করলেন। রামদাস বললেনঃ "রাজধর্ম পালনই তোমার মুখ্য ধর্ম। ধর্মস্থাপনা, দেব-ব্রাহ্মণের সেবা, প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাদের পালন ও রক্ষা করবে। এই ব্রত সম্পাদনেই তুমি পরমার্থ লাভ করবে। তুমি মনের মধ্যে যে-সঙ্কল্প করবে, তাতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।" শিবাজীর মনে হলো, গুরুর দর্শন, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য, শিষ্যত্ব ও অমূল্য উপদেশ লাভ করে তাঁর জীবন ধন্য হলো। কৃতার্থ হৃদয়ে তিনি রায়গড়ে ফিরে এলেন।

একসময় শিবাজী তাঁর সমস্ত রাজ্য গুরু রামদাসের চরণে নিবেদন করেছিলেন। তখন গুরুদেব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো
কহিলেন গুরু রামদাস।" ('প্রতিনিধি')

১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে সমর্থ রামদাসের জননী রানুবাঈ পরলোকগমন করলেন। সমর্থ জাম্ব গ্রামে মায়ের অন্তিম শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিছুকাল চাফলে বাস করেছিলেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপগড় দুর্গে তিনি স্বহস্তে তুলজা ভবানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শিবাজী জানতে পারলেন, চিরকাল জনজাগরণের কাজে বনে-পর্বতে পর্যটনরত সমর্থ রামদাস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে জ্বরও হচ্ছে। তাঁর বৃদ্ধ বয়স ও শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি সাতারার নিকট একটি ছোট দুর্গে গুরুদেবের বসবাসের ব্যবস্থা করে তাঁকে অনুরোধ করলেন, গুরুদেব যদি সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেন, তাহলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হবেন। গুরু রামদাস তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের অনুরোধ স্বীকার করলেন এবং শিবাজী তাঁর থাকার জন্য 'পরলী' নামক দুর্গটির উপযুক্ত পুনর্নির্মাণ করিয়ে তার নাম দিলেন 'সজ্জনগড়'। গুরু রামদাস এই দুর্গে বাস করতে চলে এলেন ৮ আগস্ট ১৬৭৬। শিবাজীর নির্দেশে তাঁর কর্মচারীরা সমর্থের থাকা ও পূজা-অর্চনাদির জন্য সবরকম সুব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপর সমর্থ একদিন প্রতাপগড়ের নিকট দেবী ভবানীর মন্দির দর্শনে গেলেন। তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করলেনঃ "হে রামবরদায়িনী ভগবতী দুর্গে! ধর্মসংস্থাপনের কাজ যেন অব্যাহত থাকে; শুদ্ধ অধ্যাত্মের যেন প্রকাশ ঘটে। স্নান-সন্ধ্যাদির জন্য তীর্থোদকের প্রবাহ যেন অবরুদ্ধ না হয়। হে দেবি জননি! শিবাজী যেন আমার চোখের সামনেই বিশাল রাজ্য, যশ, বৈভব লাভ করে— এই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুরু রামদাস ও জননী জিজাবাঈয়ের আদেশে শিবাজীর যথারীতি রাজ্যাভিষেক হলো। সেইসময় সমগ্র মহারাষ্ট্রে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। গুরু রামদাস পরমানন্দে 'আনন্দবনভুবন' নামে এক অপরূপ সঙ্গীত রচনা করলেন। তার ভাবানুবাদ নিচে দেওয়া হলোঃ

"স্বপ্নে যেমন দেখেছি রাত্রে, ঘটছে ঠিক তেমনই। আনন্দবনভুবনে।
স্বধর্মের ওপরে যে-বিঘ্ন ঘনিয়েছিল, তা ছিন্নভিন্ন হলো।
আনন্দবনভুবনে।।
বাধা-বিঘ্নের প্রচণ্ড বাহিনীকে স্বয়ং ভীমই যেন গুঁড়িয়ে দিলেন
সমগ্র জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, স্বয়ং দেবতাই বুঝি উঠে দাঁড়ালেন।
স্বর্গই যেন নেমে এল মাটিতে, রামগঙ্গা মহানদী
এইসব তীর্থের তুলনা নেই। আনন্দবনভুবনে।
ত্রৈলোক্যের বাহিনী চলল, ভীষণ যুদ্ধ বাধল
বেজে উঠল রণবাদ্য, ঢাল-তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল।
মহাপ্রলয় শুরু হলো যেন, ম্লেচ্ছদৈত্যকুল ধ্বংস হলো
দেবী মহাশক্তি ভীষণ রূপ ধারণ করলেন। আনন্দবনভুবনে।।
সমস্ত পাপী নিশ্চিহ্ন হলো। হিন্দুস্থান শক্তিশালী হলো।
অভক্তদের নাশ হলো। আনন্দবনভুবনে।।...
পবিত্র বারির অভাব রইল না স্নান-সন্ধ্যা করতে
কিংবা জপ-তপ-অনুষ্ঠানের। আনন্দবনভুবনে।।
আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, সকলেই খুশি হলো,
পরস্পরের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি পেল। আনন্দবনভুবনে।
দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের হলো অবসান, শুদ্ধ অধ্যাত্মের হলো বিকাশ
রাম কর্তা রামই ভোক্তা। আনন্দবনভুবনে।।
দেবালয় দীপমালা। রঙ্গমালা বহুরকম,
পূজিত হলেন দেবদেবী। আনন্দবনভুবনে।।
সমর্থের গীত-সঙ্গীতে সুমধুর বাদ্য যুক্ত হলো,
সবার কামনা পূর্ণ হলো। আনন্দবনভুবনে।।
সকলেই সুরক্ষিত বোধ করল, সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজিত।
সমর্থ আর কী বলবে? আনন্দবনভুবনে।।"

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে রায়গড়ে ছত্রপতি শিবাজী দেহরক্ষা করলেন। এই দারুণ দুঃসংবাদে রামদাস শোকে মুহ্যমান হলেন। এরপর থেকে তিনি বাইরে যাওয়া-আসা প্রায় ছেড়েই দিলেন, কথাবার্তাও বিশেষ বলতেন না। এর প্রায় এক বছর পরেই ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে সমর্থ রামদাস পরমধামে যাত্রা করলেন। কথিত আছে, অন্তিম সময়ে 'দাসবোধ'-এর শ্লোক শ্রবণ এবং 'হর হর, রাম রাম রাম' উচ্চারণ করতে করতে ইষ্টদেবতার মূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিবাজীর মতো সমর্থও শিবাজী-পুত্র সম্ভাজীর অনাচারে দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি সম্ভাজীকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ

"মারতে মারতে মরবে, তাতে সদ্‌গতি পাবে।
ফিরে এসে ভোগ করবে মহৎ ভাগ্য।"

সমর্থ বলেছিলেন, কর্ম করতে গেলে যুক্তি ও শক্তি দুয়েরই প্রয়োজন। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ "শক্তিই প্রাণীকে সুখে রাখে। যুক্তি-শক্তি যেথা মিলে, সেথায় লক্ষ্মীর বাস।"

'দাসবোধ' ও 'মনোবোধ' ছাড়াও সমর্থ 'শ্রীমনাচেঁ শ্লোক' ও 'করুণাষ্টক' নামে দুখানি সুন্দর কবিতাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শিষ্যদের অবশ্যপালনীয় বলে রামদাস বারোটি আদেশ দিয়েছিলেন ঃ

১। সর্বদা জ্ঞান সঞ্চয় করে তৃপ্তিলাভ করবে।

২। সেই জ্ঞান অপরকে দান করবে।

৩। যেকোন কাজ প্রথমে নিজে করবে, পরে অপরকে করতে বলবে।

৪। হরিকথা, স্নান-সন্ধ্যা, দেবার্চন ইত্যাদি অবশ্যকরণীয় জানবে।

৫। আপন দেহ পরের কাজে লাগাবে।

৬। সর্বদা মৃদু ও মিষ্ট কথা বলবে।

৭। উদার মনে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করবে। মনে ক্রোধ-ঈর্যাদি আসতে দেবে না।

৮। আলস্য সর্বদা পরিহার করবে।

৯। কখনো উদ্যম ত্যাগ করবে না।

১০। অবহিত হয়ে সংসার করবে।

১১। কাউকে দুঃখ দেবে না।

১২। তোমার সমস্ত আচরণ সম্প্রদায়ের নিয়মাবর্তী হবে।

সমর্থ রামদাস চিরন্তন উদার ধর্মে দেশকে প্রবুদ্ধ করতে শিবাজী ও সম্ভাজীকে উৎসাহিত করেছিলেন। ইতিহাসে এই মহাপুরুষের স্থান অতি উচ্চে। যতদিন মানবসমাজ থাকবে, ততদিন রামদাস ও তাঁর 'দাসবোধ'কে কেউ ভুলতে পারবে না। তিনি একাধারে ছিলেন রাজগুরু, রাষ্ট্রগুরু ও ধর্মগুরু। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) রামদাস ও শিবাজী—চারুচন্দ্র দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১

(২) হে রাজা শিবাজি!—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ও ৩য় খণ্ড, ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গ্রাহকদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, **পত্রিকা সময়মতো না পেলে** পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ডাকে না পেলে বা হারিয়ে গেলে অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই **দুমাসের মধ্যে** পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

বিবেকানন্দস্তুতিঃ

স্বামী হর্ষানন্দ

রামকৃষ্ণস্য বাগ্‌ধারা
দিব্যং চ
যস্মিন প্রকাশিতে তং বৈ
বিবেকানন্দমাশ্রয়ে॥১॥

আমি সেই বিবেকানন্দের কাছে আশ্রয় নিই, যাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের (প্রজ্ঞার) কথামৃতধারা এবং দিব্যকর্মসমূহ অভিব্যক্ত হয়েছে।

তেজো যস্য যতের্বিলোক্য তরণি-
র্লজ্জাযুতো জায়তে,
রূপং যস্য মুখস্য চারু মদনো
দৃষ্ট্বা শরীরং জহৌ।
বাণীং যস্য গুরোর্নিশম্য মধুরাং
বীণা বিমোহং গতা
পাদে তস্য নতির্বিবেকসুখিনঃ
সা নস্সদা রক্ষতু॥২॥

যাঁর উজ্জ্বল প্রভায় সূর্যও অপ্রতিভ হয়, যাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যদর্শনে প্রেমের দেবতা কন্দর্প তনু ত্যাগ করে, যে মহান শিক্ষকের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে বীণাও সম্মোহিত হয়—সেই বিবেকানন্দের চরণে আমরা প্রণতি জানাই। এই প্রণিপাত যেন আমাদের রক্ষা করে।

তাপস

অপূর্বসুন্দর মৈত্র

অতীতের গাঢ়তম কুহেলিকা ভেদি ঊর্ধ্বমাঝে
সমুন্নত শির কার সর্ব উচ্চে আজিও বিরাজে?
কার বাণী যুগে যুগে মুমূর্ষু মানবচিত্তখানি
আঁধারের তীর হতে আলোকে এনেছে টানি?
শুনায়েছে মন্দ্রস্বরে জীবনের পূর্ণ জয়গান
প্রাণের আড়াল থেকে টানিয়া এনেছে মহাপ্রাণ?
পশ্চাতের দূরাকাশে কার জ্ঞান-জ্যোতিষ্কশিখায়
নিকটের নভোলোকে কটি তারা ম্লান হয়ে যায়?
থামায়ে রথের গতি কার পর্ণকুটিরের দ্বারে
রাজার ঐশ্বর্য-শির হেঁট হয়ে গেছে বারে বারে?
অস্থি কার বজ্র গড়ে, কার হাসি ভুবন মাতায়।
সে-তাপস যুগে যুগে ভারতের বনানীর ছায়
নদীর নির্জন তীরে গড়ে তার পাতার কুটির
ধরার সম্পদ রিক্ত মহাধনে ভরে ক্ষুদ্র নীড়।
আমাদেরও বক্ষমাঝে সে ত্যাগীর ক্ষীণ রক্তকণা
অন্ধকারে বন্দি থাকি হারায়েছে শক্তির সাধনা।
তবু আজও থাকি' জাগে তার চঞ্চল স্পন্দন
অন্তরেতে মন্ত্র ওঠে 'ছিন্ন কর সকল বন্ধন'।

বিবেকানন্দ

শৈলেনকুমার দত্ত

আঁকব ছড়ায় সেই মানুষে—এমনি ছিল ইচ্ছে
শব্দগুলো ফন্দি করে হাতটা টেনে দিচ্ছে!
মুখ দেখে তাঁর সূর্য হাসে, অতল দেখে সাগর
দীপ্ত তেজে অগ্নি-ঝড়ও নিচ্ছে টেনে আগড়!
উচ্চতা কি মাপবে পাহাড়? বুদ্ধি তাদের শানায়
চোখদুটো তাঁর মায়ায় আঁকা! মায়ের মুখেই মানায়!
চাইল ছুটি শব্দগুলো—এইখানে শেষ ছড়া
অক্ষরেতে সেই মানুষে যায় কি তেমন গড়া!

ত্যাগব্রতের অগ্নি

(১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর আঁটপুরে প্রজ্বলিত ধুনি স্মরণ করে)

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্" (ঈশ উপনিষদ্, ১।১৮)
—হে অগ্নি! মহার্ঘ্য বস্তুলাভের জন্য আমাদের সুপথে নিয়ে যাও।

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি, সঘন গহন অন্ধকার।
এই বিশ্বচরাচর শান্ত স্থির নিঃসীম নির্জন।
আকাশে অগণ্য গ্রহ তারারাজি অবাক বিস্ময়ে
অপলকে চেয়ে আছে নিশীথের নির্মল গগনে।
দীর্ঘদেহ সুপ্রাচীন বনস্পতি সবে বাহু মেলি
ঊর্ধ্বাকাশে, অপেক্ষিছে কার আগমন-প্রতীক্ষায়।
সেই নৈঃশব্দ্যের মাঝে ধ্যানমগ্ন কয়েকটি তাপস
সম্মুখে হোমাগ্নি জ্বালা, সে-অগ্নির লেলিহান শিখা
মেলিয়া সহস্র বাহু ধেয়ে চলে অনন্তের পানে।
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত সে-অগ্নির সু-উজ্জ্বল আভা,
সেই দীপ্তি তাহাদের নির্মল ললাটে উদ্ভাসিত।
সঙ্কল্পে সুদৃঢ় তারা, প্রত্যয়ে একান্ত অবিচল,
তপঃক্লিষ্ট ঋজু দেহ, দীপ্তিমান উজ্জ্বল ভাস্বর,
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে করেছিল মন্ত্র উচ্চারণ—
'হে অগ্নি, হে বৈশ্বানর, তোমার প্রসন্ন আশীর্বাদে
পার্থিব জীবনে যেন হয় সে মহার্ঘ্য বস্তু লাভ।
চিরকাল সেবা করে যেতে পারি আর্ত মানবের,
দধীচির মতো যেন এজীবন নিঃশেষিত হয়।'

বৃক্ষরাজি সাক্ষী ছিল, সাক্ষী ছিল গ্রহ তারকারা,
সেই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাক্ষী ছিল অনন্ত প্রকৃতি।
হিমরাত্রি সাক্ষী ছিল, সাক্ষী ছিল বিশ্বচরাচর,
হোমাগ্নি ছিল সাক্ষী তাদের কঠিন প্রতিজ্ঞার।

সেই যে পবিত্র অগ্নি জ্বেলেছিলে সেদিন
আজিও অম্লান দেখ সে-অগ্নির অনির্বাণ শিখা।

১২ জানুয়ারি

অসীম চৌধুরী

দাঁড়িয়েছিলাম মিশিগান আর বাল্‌বোর মোড়ে,
হিল্টন হোটেলের সামনে।
শীতকালের রোদ্দুর---
কুয়াশার জাল ভেদ করে তখনো পৌঁছায়নি।
বরফে ঢাকা ফুটপাত;
লেক মিশিগান যেন ঠাণ্ডায় কাঁপছে।
এটা হলো বর্তমান।

ভাবছিলাম একশো এগারো বছর আগের কথা—
যখন এখানে ছিল জন লায়নের বাড়ি।
ঠিক এই রাস্তা ধরে দেবী সরস্বতী
হাত ধরে নিয়ে যেতেন সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে,
আর্ট ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য।
ওটা হলো ইতিহাস।

আজ থেকে ঠিক একশো একচল্লিশ বছর আগে---
আর্ট ইনস্টিটিউটের তখনো জন্ম হয়নি।
মিশিগান অ্যাভিনিউয়ের ওপর ছিল না তখন
গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি।
কিন্তু সূর্য সেদিন উঠেছিল মহাজ্যোতিষ্মান---
কলকাতার তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি লেনে।
সেটা হলো মহাসন্ধিক্ষণ।

প্রার্থনা

তারাপদ দাস

তুমি দুহাত বাড়ায়ে রয়েছ দাঁড়ায়ে
আমার দুয়ার প্রান্তে;
আমি অভাজন, তব লীলা-রূপ
পারিনি কো কভু জানতে।
খেলা নিয়ে ভুলে থাকি সারাখন,
চোখের সুমুখে রঙিন স্বপন,
নিত্যানিত্যের করি নাকো খোঁজ,
দিবা কিবা নিশা-অন্তে।
মন ভরে আছে শত আবরণে,
ছিঁড়ে ফেল তব কঠোর শাসনে,
ভেঙে দাও মোহ, করো নাকো দ্বিধা
কঠিন আঘাত হানতে।
মোরা শিশু অতি, চঞ্চলমতি,
জানি না কি হবে অন্তিম গতি,
চরণে তোমার স্থান দিও প্রভু
দিন-অন্তে।

অন্য এক অনুভব

সন্তোষকুমার অধিকারী

অন্য এক অনুভব
অন্তহীন দূরের দিশায় ভেসে যাওয়া।
ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে রেখে
ছিঁড়ে মুগ্ধ ভালবাসা
মায়ার বাঁধন ভেঙে দিয়ে
চারধারে ঘিরে থাকা বাধা—
'আমি'—এ অস্তিত্ব মুছে
অলক্ষ্য শূন্যের পথে ধাওয়া।
চারপাশে
করাঙ্গুলি দিয়ে গুনে রাখা
আয়ুর বিবর্ণ দিনগুলি;
চারদিকে চোখের দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া
অস্তিত্বের নিয়ত বিধুর হাহাকার!
মুছে দিয়ে প্রত্যহের অর্বাচীন মূঢ় অহঙ্কার,
মুখোমুখি হতে পারা সীমাহীন মহাশূন্যতার।
প্রবাহিত কল্প হতে কল্পান্তরে শুধু,
প্রত্যূষে প্রত্যূষে রূপময়
জ্যোতির্দীপ্ত চলার আনন্দে।
অণু পরমাণু দিয়ে গড়ে ওঠা শরীরের কোষ
স্পন্দনমুখর; স্নায়ুপুঞ্জে জাগে আলোড়ন
জাগ্রত চোখের দৃষ্টি দেখে দীপ্ত আলোকের অবাধ প্রবাহ,
ছিঁড়ে যায় জ্ঞানের সকল সীমা,
চেতনার মুক্তি ঘটে অন্য এক মগ্ন অনুভবে!!

শ্রদ্ধা

উদয়ন ভট্টাচার্য

ধূপে আলোয় শ্রদ্ধা-বলে
জ্বালিয়েছিলাম আরো
স্বপ্নে এসে বললে তখন
এবার আমায় ছাড়।

ছুটে তখন মন্দিরে যাই
দেখি সিঁড়ির কাছে
অনাথ শিশু কাঁপছে শীতে
খোলা বারান্দাতে।

তখন বুকে পদ্ম ফোটাই
সুবাতাসের শ্বাসে
নীল আকাশের সজীব দুপুর
আঁধার হয়ে আসে।

নিজের পশম দিয়ে তাকে
এলাম যখন ফিরে
অভয়মুদ্রা বলল হেসে
আছি তোমার ঘরে।

মাঘ ১৩১০
জানুয়ারি ১৯০৪



নিশ্চেষ্ট অবস্থা

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ)

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়াছিলাম যে, ইহা একটী উত্তেজনা বাক্য, গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাসগ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে, বারবার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে—আমার রক্ষাকর্ত্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাসগ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়। এই উচ্চ শিক্ষাই ঈশ্বরলাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় সাধনা আরম্ভ হয়, এত দিনে তীর্থভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, দিবারাত্র বলে—"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি এখন কোথায়?" এই উচ্চ শিক্ষা গৃহে অতি কঠিন।...

কিন্তু যদি আমরা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর তরঙ্গে সাগরনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয়, তুঙ্গ শৃঙ্গে যিনি সন্ন্যাসীকে আহার দিয়াছেন—তিনিই আমাদের নিত্য আহার দিতেছেন; অর্থ সম্পদ সকলই তাঁহারই দান, জলবুদ্বুদের ন্যায় এখনি লয় হইবার সম্ভাবনা, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা, চতুর্দ্দিকে বিপদ্‌জাল, বিপৎকালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয়; তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ থাকে না।...

কেহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয়? পরমহংসদেব বলিতেন, হয়। আমরা দেখিয়াছি, হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ-চরিত্র বর্ণনা করা আমার কতদূর সাধ্য জানি না, কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ।... নাগ মহাশয় (আমরা সকলে তাঁহাকে নাগ মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্সটী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারি করিতে গিয়া দর্শনীর পরিবর্ত্তে রোগীর পথ্য অনেক সময়ে নিজে দিয়া আসিতেন। কোন দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে দোকানদারকে করজোড়ে বলিতেন, "কৃপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন।" দোকানদার যাহা দিল, তাই।... গৃহ আছে, স্ত্রী আছে, ইনি গৃহী। কিন্তু ইঁহার সন্ন্যাসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মচেষ্টারহিত। একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্বে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাঁহার পরিবার যাহা জিনিসপত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন, "কি করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে রক্ষা করিবে? আইস—আমরা অগ্নিদেবের স্তব করি, যাহাতে রক্ষা হয়।" সত্যই, রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনেই হউক বা যাহাতেই হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই নয়, আলস্যবশতঃ যদি কখনও নিশ্চেষ্ট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট হওয়া একটী অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়। তোমার বাসনা তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইতে পার। কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেষ্ট হইতে পারিবে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। নতুবা আমি নিশ্চেষ্ট হইয়াছি—এই ভান জীবনে বিড়ম্বনা। যাহারা অপদার্থ, কার্য্যে উদ্যমশূন্য—তাহারাই অদৃষ্টে যাহা আছে বলিয়া (প্রকৃত নিশ্চেষ্ট হয় না) কার্য্যে বিরত থাকে। নিয়ত দৈবজ্ঞের নিকট কখন সুসময় আসিবে, তাহা জানিতে ব্যগ্র হয়; বিপদে অধীর ও সম্পদে উল্লসিত, নিশ্চেষ্ট ভানে তাহাদের জীবনযাত্রা একটী বিড়ম্বনা, তাহারা তমোগুণীর আদর্শ। সংসারে এইসকল ব্যক্তি লক্ষ্মীছাড়া; কিন্তু যিনি পঞ্চম-পুরুষার্থ-সম্পন্ন, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট—তিনি মহা ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, লক্ষ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখদুঃখে অটল, সঞ্চয়বুদ্ধিরহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃসংসার জ্ঞানে [তিনি] নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শতগুণে কঠিন।... গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা বুদ্ধি দূর হইয়া যেন আপনাকে "সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়" জ্ঞানলাভ করিতে পারি। যেন তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এই বোধ সকল অবস্থায় অচল থাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে পারি।

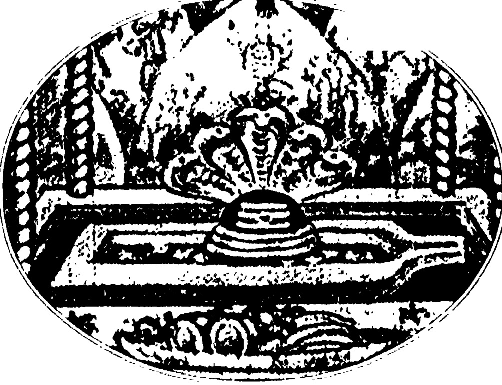
সঙ্কলনঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিক্রমা..........

শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ কার্তিক ১৪১০ সংখ্যার পর]



সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার দীর্ঘ বাসযাত্রার ক্লান্তি নিয়ে শ্রীশৈল তীর্থে পৌঁছে কিন্তু আমার মনে নতুন করে উৎসাহের জোয়ার এল। দীর্ঘদিনের তীর্থদর্শন বাসনা এবার পূর্ণ হবে। বহুবার শুনে এসেছি ঃ "কাশ্যাং তু মরণাৎ মুক্তি, স্মরণাৎ অরুণাচলে, দর্শনাদেব শ্রীশৈলে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"—কাশীতে মরলেই মুক্তি, অরুণাচল স্মরণে মুক্তি এবং শ্রীশৈল দর্শনে মুক্তি। আপাতত মুক্তির কথা ভুলে এজন্মের দীর্ঘসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে আমি পথের ক্লান্তি ভুলে ধুলোপায়েই মন্দিরদর্শনে রওনা হলাম। আমার সঙ্গী শুধু একবার এক কাপ চা খাওয়ার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে আমাদের ঝোলা-দুটি তাঁর পরিচিত একটি দোকানে রেখে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে একটু যেতেই দুধারে বহু দোকানপাট, কিন্তু তার পিছনেই পাহাড়। আরো একটু এগিয়ে হাজির হলাম একটা বিরাট চওড়া রাস্তার মুখে, সামনেই বিশাল গোপুরমাকৃতি তোরণ, তাতে বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। তোরণের নিচ দিয়ে প্রধান সড়ক, যেটি মন্দিরের দিকে গিয়েছে। এই পথ দিয়ে দেবতাদের রথযাত্রা হয়, নানা উৎসবে উৎসববিগ্রহরা শোভাযাত্রা করে রাস্তায় নামেন। এই যাত্রা ভক্তেরা যাতে ভালভাবে দর্শন করতে পারেন, সেজন্য রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার দুধারে একই মাপের সারি সারি একতলা বাড়ি, মাঝে মাঝে নানান মঠ, এর মধ্যে আচার্য শঙ্করপন্থী শৃঙ্গেরী মঠের শাখাটি খুব সুন্দর ও বিরাট মূর্তি দিয়ে সাজানো। শুনলাম, এই রাস্তা ও দুপাশের সব বাড়ি এবং প্রধান গোপুরম—সবই পূর্বে শোনা সেইসব প্রাচীন রাজাদের। এগুলি প্রধানত বিজয়নগর রাজাদের আমলে তৈরি।

বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পরে আবার একটা তোরণের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটি প্রায় দোতলার সমান উঁচু। নকশা করা কাঠের বিশাল দরজার দুপাশে পুলিশ ও মন্দিরের রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে। ভিড় সামলাবার জন্য কিছুক্ষণ বাদে বাদে লোক ছাড়ছে। এই তোরণে ঢোকার আগেই বাঁদিকে জুতো রাখার জায়গা। আমরা দরজা দিয়ে ভিতরে এসে কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে মূল মন্দির-চত্বরে হাজির হলাম। এই মন্দির ধূসরবর্ণের পাথরে তৈরি, চারটি ভাগে বিভক্ত। আমরা প্রথমে নন্দিমণ্ডপের বিশাল ধাতুময় নন্দিকে প্রণাম করে একটি মণ্ডপ পার হয়ে এলাম। শুনলাম, এর নাম 'বীর শিরো মণ্ডপ'। এখানে চারটি সারিতে চারটি করে পাথরের নকশা করা স্তম্ভের ওপর মণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে। একটি লিপিতে লেখা আছে, এটি ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে অনভেমা রেড্ডি নামে এক রাজা তৈরি করেন। এর মাঝের চারটি স্তম্ভের মাঝখানে বলিপীঠ দেখা যায়। লিপিতে আছে, সেসময় ও পরবর্তী কালেও এখানে বহু কোঙ্গবীর শৈবভক্ত এসে স্বেচ্ছায় তাঁদের মাথা ও জিভ কেটে উৎসর্গ করতেন, যাতে দেহান্তে তাঁরা শিবসারূপ্য লাভ করতে পারেন। এই মণ্ডপ পার হয়ে আমরা এলাম 'মুখমণ্ডপ' বা 'নাটমণ্ডপ'-এ। এটি বেশ বড়, এখানেও চার সারিতে চারটি করে পাথরের অলঙ্কৃত স্তম্ভের ওপর মণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে। এই মণ্ডপের তিনদিকে তিনটি দ্বার আছে। এখানকার শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই মণ্ডপটি বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর দেব ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন। এরপরেই নাটমণ্ডপ ও গর্ভমন্দিরের মাঝে সামান্য একটু অন্তরাল, তাতে কোন দরজা নেই। এর সামনে পূর্বদ্বারী গর্ভমন্দির। রুপোর ছোট্ট দরজার দুপাশে নন্দিভৃঙ্গির দারোয়ান বেশের মূর্তি। রুপোর চৌকাঠের মাথায় পূর্ণঘট ও তার ওপর একটি দেবীমূর্তি পদ্মকোরক হাতে নিয়ে

দণ্ডায়মান। দরজার বামদিকে ছোট একটি ঘরে গণপতির মূর্তি। আমরা দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ছোট গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তর ১০০ বর্গফুট মাপের। মাঝখানে রুপোর রেলিঙে ঘেরা ২৫ সেন্টিমিটার উঁচু ছোট্ট জ্যোতির্লিঙ্গ মল্লিকার্জুন। গৌরীপট্টটি একটু নতুন আকৃতির, ঠিক গোলাকার নয়। লিঙ্গকে চতুষ্কোণাকারে বেষ্টন করে উত্তরদিকে লম্বালম্বিভাবে দুটি ধারায় বেরিয়ে গিয়েছে। লিঙ্গের পিছনে রুপোর আস্তরণে পর্বতের ছবি খোদাই করা।

এখন শিবলিঙ্গের ওপরের সব পুষ্প ও বিল্বপত্রের সজ্জা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দুপুরের ভোগের আগে এখন স্নানের প্রস্তুতি হচ্ছে। আমরা সোজা গিয়ে লিঙ্গের পূর্বধারে বসে পড়লাম। আমাদের বাঁদিকে অর্থাৎ দেবতার দক্ষিণে একটি আসনে বসে পূজারী সমস্ত পরিষ্কার করছিলেন। দেবাদিদেবকে স্পর্শ করা যায় কিনা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমায় সম্মতি দিলেন। আমার সঙ্গে একটি শিশিতে গঙ্গাজল ছিল, তাই দিয়েই শিবস্নান-পঞ্চমন্ত্রে জ্যোতির্লিঙ্গকে স্নান করিয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করতেই পূজারী বললেন ঃ "শির লাগা দো।" মাথা দিয়ে স্পর্শ করার অনুমতি সর্বত্র থাকে না। এখানে অযাচিতভাবে সেই সুযোগ পেয়ে শিবলিঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম—"শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবুধাভিষঙ্গে, তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদাবসন্তম্।/ তমর্জ্জুনং মল্লিক-পূর্বমেকং, নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্।" আচার্য শঙ্কর-কৃত এই প্রণামমন্ত্র পাঠ করে সামান্য কিছুক্ষণ জপ করে উঠে এলাম।

ফিরে এলাম মন্দিরের বাইরে। দেখি, প্রধান তোরণের সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন স্থানীয় ভক্ত ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি। হায়দ্রাবাদ মঠ থেকে তাঁকে ফোন করে জানানো হয়েছে আমার এখানে আসার কথা। এখানকার সবকিছু দর্শন ও থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যও তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি সেইমতো এখানকার চেট্টিয়ার চোলট্রিতে আমাদের থাকার জন্য ঘর ঠিক করে এসেছেন। যাই হোক, প্রথমেই মন্দিরের রাস্তা পার হয়ে বাজার অঞ্চলে গিয়ে একটা পরিষ্কার হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া হলো। দক্ষিণী রান্না রসম সম্বর দিয়ে ভাত, টক দই ও পাঁপড় খেয়ে উঠে এলাম। রসমে প্রচণ্ড ঝাল, তাই দই কিছুটা খেয়ে নিলাম—সেটা আবার প্রচণ্ড টক! তেলেগু-তামিলদের এই টক-ঝাল খুব প্রিয়।

গেস্ট হাউস কাছেই, প্রায় নতুন দোতলা বাড়ি। আমাদের জন্য একটি দুই-শয্যার ঘর ঠিক করাই ছিল, বিছানাও বেশ পরিষ্কার। আমি স্নান করেই বেরিয়েছিলাম, তাই হাতে-পায়ে সামান্য জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। ব্রহ্মানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হলো, তিনি বিকাল ৩টার সময় গাড়ি নিয়ে আসবেন, তখন আবার মূল মন্দির এলাকা ও স্থানীয় অন্য সব দর্শনীয় স্থানে যাওয়া হবে।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রামের পর ঠিক ৩টায় ব্রহ্মানন্দবাবু একটা জিপগাড়ি নিয়ে হাজির হলেন। আমি তৈরি হয়েইছিলাম। আমরা তিনজনে গাড়িতে এসে পৌঁছালাম মূলমন্দিরের দ্বিতীয় তোরণের সামনে। গাড়ি বাইরে রেখে আমরা আবার মল্লিকার্জুন-মন্দিরে এসে উঠলাম। বিগ্রহকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আমরা পুরোহিতের মন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—"রত্নৈ কল্পিতং আসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চদিব্যাম্বরং।/ নানারত্ন বিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনং ॥/ জাতীচম্পক বিল্বপত্র রচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা।/ দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্ ॥" প্রাণভরে প্রণাম করে কিছুক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়ে শিবনাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলাম। এখানে পাণ্ডাদের কোন উৎপাত নেই, ভিড়ের চাপ নেই, বাইরে চলে আসার তাগাদাও নেই। তাই দর্শন-পূজাদি করে বড় পরিতৃপ্তি হলো। মনে হচ্ছিল, কত শত বছর ধরে কত সিদ্ধ সাধক ভক্ত মহাপুরুষ আচার্য এখানে এসেছেন। তাঁদের ভক্তি, প্রার্থনা এই জ্যোতির্লিঙ্গকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে! আমারও ভক্তির অর্ঘ্যটি নিবেদন করে এলাম সেই মল্লিকার্জুনের চিন্ময় শ্রীচরণ-প্রান্তে—"করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা।/ শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধং।/ বিহিতমবিহিতং বা।/ সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব।/ জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥"

বাইরে এসে মন্দিরটি ভাল করে দেখলাম। প্রায় পাঁচতলা উঁচু মন্দির দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মতো ক্রমশ সরু হয়ে ওপরদিকে উঠে গিয়েছে। ধাপে ধাপে ৯টি স্তরে বিন্যস্ত, একেবারে চূড়ায় একটি ফলক, ওপরে ত্রিশূল-সমন্বিত একটি স্বর্ণময় কলস। মূলমন্দির পূর্বদ্বারী। ব্রহ্মানন্দজী বললেন, এই মন্দির ঠিক কবে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে একটি শিলালিপি থেকে আন্দাজ করা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাদে কাকতীয় বংশের রাজা গণপতিদেবের বোন রাজকুমারী মৈলাম্বা এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। একটু দূরে মন্দিরের ডানদিকে আরেকটি প্রাচীন মন্দির আছে—বৃদ্ধ মল্লিকার্জুনের। সেটি পরে দেখব, এখন আমরা মন্দিরের উত্তরদ্বার দিয়ে পিছনদিকে এলাম দেবী ভ্রমরাম্বিকার দর্শনের জন্য।

মূল চত্বরের পিছনদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে কিছুটা খোলা জায়গা পার হয়ে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে দেবী

ভ্রমরাম্বার মন্দিরে পৌঁছালাম। ছোট নাটমন্দির, ছয়টি করে স্তম্ভ নানা কারুকার্য-খচিত গ্রানাইট পাথরের মণ্ডপের ছাদটিকে ধরে রেখেছে। তার সামনে দেবীর খুব ছোট গর্ভমন্দির। লম্বা-চওড়া ছয়-সাত ফুটের বেশি নয়। সামনে পিতলের ছোট দরজা, তাতেও নানা নকশা। দেবী পশ্চিমাস্যা। সোনার সিংহাসনে পদ্মাসীনা দেবীর ছোট ধাতব বিগ্রহ। রক্তবর্ণের পট্টবস্ত্র এবং অলঙ্কারে তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত। তার ওপর ফুলের মালার চাপে শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে। সিংহাসনের মাথায় একটি সিংহের মুখ খোদাই করা। আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। বড় বড় সবুজ পাতিলেবু দিয়ে মালা তৈরি করে মায়ের সিংহাসন সাজানো। এখানে পাণ্ডারা সবাই রক্তবস্ত্র পরিহিত। বেশিক্ষণ সামনে দাঁড়াতে দেয় না। অবশ্য মন্দিরের দরজাও খুব ছোট। এখানে মায়ের প্রতীক দেবীযন্ত্র বাইরে এনে এঁরা কুঙ্কুমাভিষেক করেন। আমরা সেই অভিষেক হচ্ছে দেখলাম।

শুনলাম, ইনি একান্নপীঠের এক দেবী। এছাড়া ইনি দেবীর অষ্টাদশ শক্তির অন্যতমা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে আছে—"যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি॥ তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্পদম্।/ ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্/ ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥" (৫২-৫৪) অরুণাসুর বধের জন্য দেবী অসংখ্য ষটপদী ভ্রমরের রূপ ধরে তাকে নিহত করেন। তখন থেকেই তাঁর একটি নাম হয় 'ভ্রামরী'। এখানেই সেই ঘটনা ঘটে। এদেশের ভাষায় মায়ের নাম 'ভ্রমরাম্বা' অর্থাৎ 'জননীভ্রমর'। আমরা পুষ্পবিল্বপত্রের অঞ্জলি দরজার বাইরে থেকেই মাকে নিবেদন করলাম। কারণ, এখানে পূজারী ছাড়া কাউকে মাকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। তবে দেবীর যন্ত্রটি বাইরে থাকলে সেটি স্পর্শ করা যায়। আমার সৌভাগ্য আজ সেটি নাটমন্দিরে এনে অভিষেক হচ্ছিল। আমি সেই অবসরে দেবীর যন্ত্রটি স্পর্শ করে একটু কুঙ্কুম তুলে নিয়ে মাথায় দিলাম। অবশ্য পুরোহিত কিঞ্চিৎ কটাক্ষে আমার দিকে তাকালেন, বিনা পয়সায় এটি স্পর্শ করলাম বলে কিনা জানি না। তবে মাকে সাধ্যমতো প্রণামী বাক্সে দিয়েছিলাম আগেই। যাই হোক, এবার মাকে প্রদক্ষিণ করার পথে শ্রীরেড্ডি গর্ভমন্দিরের ঠিক পিছনের দেওয়ালে একটি অতিক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিয়ে সেখানে কান পাততে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু কি শুনতে পাচ্ছি? সত্যিই শোনা গেল অস্পষ্ট মৃদুস্বরে গুন্‌গুন্ শব্দ, যেন দূর থেকে একদল ভ্রমর গুঞ্জন করছে! এটিই এই ভ্রামরী ভ্রমরাম্বা দেবীর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। মায়ের ভ্রমররূপের কথা মনে করিয়ে দেয় এই শব্দলহরী। আনন্দে মন ভরে গেল! প্রদক্ষিণ শেষ করে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল, পরিব্রাজক জীবনে আচার্য শঙ্কর সশিষ্য এখানে এসেছিলে এবং এখানেই কিছুদূরে এক জঙ্গলে ঝরনার ধারে তাঁর অস্থায়ী কুটির নির্মিত হয়েছিল। এখানে তখন তান্ত্রিক কাপালিকদের প্রচণ্ড প্রতাপ। তারা স্থানীয় রাজার সাহায্য নিয়ে নানারকম উৎকট সাধনা করত, নরবলিও তার মধ্যে অন্যতম। সেসময় উগ্রভৈরব নামে এক কাপালিক আচার্যকে দেখে তাঁকেই বলি হিসাবে ঠিক করল। তাঁর বয়স তখন প্রায় ১৭। অসাধারণ পণ্ডিত, দিব্যকান্তি এই যোগীকে দেখে ভৈরব ভাবল, এইরকম বৈদান্তিক সাধুকে বলি দিতে পারলে তার সাধন পূর্ণ হবে, তাদের প্রভাবও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সে একদিন আচার্য শঙ্করকে তার ইচ্ছা জানাল ঃ "আপনি তো মুক্ত সন্ন্যাসী, এই শরীরের আর আপনার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমার তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধির জন্য আপনার মতো একটি সাধুলক্ষণযুক্ত সাধক বলি প্রয়োজন। এতে আমি শিবলোকে স্থান পাব। এখন যদি আপনি কৃপা করে আপনার শরীরটি আমার পূজায় বলি হিসাবে দান করেন, তাহলে আমার সাধনা পূর্ণ হয়।"

দিব্যভাবে আবিষ্ট শঙ্করাচার্য কৃপাপরবশ হয়ে ভাবলেন, সত্যিই তো আত্মজ্ঞান লাভের পর এই শরীরের আর কি প্রয়োজন? তার চেয়ে এই শরীর দিয়ে যদি কোন সাধকের সাধনা পূর্ণ হয়, সে তো ভালই। তিনি সম্মত হলেন। তবে বলে দিলেন, একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে, তাহলে তাঁর শিষ্যেরা এটা হতে দেবে না। উগ্রভৈরব খুব খুশি হয়ে বলে গেল, সামনেই চতুর্দশীর মধ্যরাত্রে সে কিছুদূরে পাহাড়ের নিচে অপেক্ষা করবে। আচার্য যেন সেই সময় সেখানে আসেন। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আচার্য আত্মতত্ত্বে মগ্ন হয়ে উগ্রভৈরবের কাছে এলেন। এদিকে তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ ঘুমের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসলেন গিয়ে দেখলেন গুরুদেব আসনে নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন নৃসিংহ-মন্ত্রে সিদ্ধ। তিনি তাঁর আরাধ্য নৃসিংহদেবকে স্মরণ করলেন। নৃসিংহদেব তাঁর শরীরে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন সেই কাপালিকের আশ্রমে। তখন আচার্য সমাধিস্থ অবস্থায় বলিপীঠে দেহ উৎসর্গের জন্য তৈরি। আর কাপালিকরা তাদের ক্রিয়াদিতে ব্যস্ত। নৃসিংহদেবের আবেশে পদ্মপাদ হুঙ্কার দিতে দিতে সেখানে এসে প্রথমেই উগ্রভৈরবকে সংহার করলেন, ভয়ে অন্যেরা পালিয়ে গেল। আচার্য

শঙ্কর সব বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে ভাবের অবসান হলে পদ্মপাদ তাঁর গুরুদেবকে কুটিরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

আমি এখানে বসে বসে পদ্মপাদের গুরুভক্তি ও আচার্য শঙ্করের পরের কল্যাণে দেহ উৎসর্গ করার কথা ভাবতে ভাবতে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই অঞ্চলটি তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। দিনের বেলায় কিছু ভক্ত আসতে পারলেও রাত্রে এখানে তান্ত্রিক ও কাপালিকরা বিকট সাধনায় মেতে উঠত।

এইখানেই কাপালিকদের পরাভূত করে শঙ্করাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'শিবানন্দ লহরী স্তোত্র' ও 'শ্রীভ্রমরাম্বিকা অষ্টক স্তোত্র' রচনা করেন। শেষোক্ত স্তোত্রে আচার্য লিখেছেন ঃ ''ভৃঙ্গীচ্ছানটনোৎকৃষ্টঃ করিমদগ্রাহী স্ফুরন্মাধবাহ্লাদো নাদযুতো মহাসিতবপুঃ। পঞ্চেষুণাচাদৃতঃ সৎপক্ষ সুমনোবনেষু সপুমঃ সাক্ষান্মদীয়ে মনোরাজীবে ভ্রমরাধীপো বিহরতাং শ্রীশৈলবাসী বিভুঃ॥''—যিনি ভ্রমরীর ইচ্ছায় নৃত্যমত্ত, যিনি গজাসুরের দর্পহারী, নারায়ণের আনন্দপ্রদাতা, যিনি নৃত্যকালীভ্রামরীর নাদধ্বনিতে সঙ্গত, অতিশুভ্রকান্তি, কামের শত্রু, দেবতাদের রক্ষায় যিনি সদা সহায়ক, সেই সাক্ষাৎ শ্রীশৈলবাসী মহেশ্বর আজ আমার হৃদয়পদ্মে ভ্রামরী দেবী-সহ বিহার করুন।

আমার সঙ্গী জানিয়ে দিলেন, এই দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির খুবই প্রাচীন, তবে কুর্ণুলের নবাব মুনওয়ার খাঁয়ের আমলে এই মন্দির ও বিগ্রহের বিকৃতি ঘটেছিল। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী তা মেরামত করিয়ে বর্তমান রূপটি দান করেন। এটি খুব জাগ্রত শক্তিপীঠ বলে কর্ণাটক ও অন্ধ্রের মানুষের বিশ্বাস। অসমে কামাখ্যা যেমন তান্ত্রিকদের পীঠস্থান, দাক্ষিণাত্যে তেমনি তন্ত্রসাধকদের এই ভ্রমরাম্বিকাদেবীও প্রধান আরাধ্যা। এখনো গোপনে, মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে এই মন্দির ও আশপাশের অঞ্চলে নানা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় বলে শুনলাম।

মূল মন্দির-চত্বরে নেমে এসে আমরা এবার মল্লিকার্জুনের মন্দিরকে ডানহাতে রেখে কিছুটা উত্তরদিকে প্রাচীরের কোণের কাছে একটি খুব পুরনো মন্দিরে এলাম। শুনলাম, এই মন্দিরই এই চত্বরের মধ্যে প্রাচীনতম। এর নাম 'বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন'। এখানেই একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে রাজকুমারী চন্দ্রাবতী মল্লিকা ফুলের মালা দিয়ে শিবকে পূজা করতেন। প্রবাদ, এখানে তখন প্রচুর কলাগাছের বন ছিল। চন্দ্রাবতী মাটির মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ দেখতে পেয়ে সেটি খুঁড়ে বের করেন। তখন সেই লিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখার মতো এক জ্যোতি বের হতে থাকে। ভক্তিমতি রাজকুমারীর পূজিত সেই পৌরাণিক শিবলিঙ্গ আজ 'বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন' নামে খ্যাত। মূল মন্দিরের মল্লিকার্জুন লিঙ্গ তার পরে কোন একসময় আবির্ভূত। প্রথমে নতুন মন্দিরে, তারপরে এই প্রাচীন লিঙ্গের পূজা ও আরতি হয়। দেবতার শয়ন হয় এই মন্দিরেই।

এবার রেড্ডিজী আমাদের নিয়ে গেলেন মন্দির কমিটির অফিসে। সেখানে তাঁর পরিচিত একজন কর্মকর্তা আমায় বসিয়ে প্রসাদ দিলেন এবং এই মন্দির ও বিগ্রহ সম্পর্কে আরো কিছু কথা শোনালেন।

তিনি বললেন, এই মল্লিকার্জুন ও শ্রীশৈলতীর্থ বহু প্রাচীন। এর প্রমাণ বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। 'মৎস্যপুরাণ'-এ এই তীর্থের আরাধ্যা দেবীর নাম 'মাধবী'। 'অগ্নিপুরাণ'-এ আছে, শ্রীশৈল সিদ্ধক্ষেত্র; এখানে শিব পার্বতীর সঙ্গে নিত্য বিরাজ করছেন। আচার্য শঙ্করের জীবনী 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থে এখানে তাঁর অবস্থান ও উগ্রভৈরবের কথা জানা যায়। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কাশ্মীরীরা এখানে শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছেন। বসুবন্ধু তাঁর 'বাসবদত্তা' নাটকে এই পর্বত মল্লিকার্জুনের আবাসভূমি বলে স্মরণ করেছেন। 'মহাভারত'-এ পুলস্ত্য মুনি ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য বলতে গিয়ে বলেছেন, এখানে বিষভধ্বজ মল্লিকার্জুনের পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফললাভ হয়। 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাশীখণ্ডে 'শ্রীশৈলখণ্ড' বলে একটি পুরো অধ্যায় আছে। 'বায়ুপুরাণ'-এ উল্লেখ আছে, এখানে শ্রাদ্ধাদি করলে পূর্বপুরুষের মুক্তি হয়। ভবভূতির 'মালতীমাধব'-এও শ্রীশৈল পর্বতের এক কাপালিক অঘোরঘণ্টার নাম রয়েছে, যে নায়িকা মালতীকে বন্দী করেছিল বধ করার জন্য। কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁর 'রত্নাবলী' গ্রন্থে এই পর্বতের এক সিদ্ধ সাধক শ্রীকণ্ঠদাসের কথা লিখেছেন, যিনি নায়ক উদয়নকে জালন্ধর বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। এইসব লেখাগুলি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। অর্থাৎ সেইসময়েই শ্রীশৈলাধীশ নানা পুরাণ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের লেখায় এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন।

এখানকার আরো একটি বিশেষত্ব হলো, তৎকালীন সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকরা এই শ্রীশৈলপীঠ ও ভ্রমরাম্বিকা দেবীর পীঠস্থানের আশপাশে নানান জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়ে বহু বিচিত্র সাধনায় রত হতেন। এপ্রসঙ্গে সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক শৈব তান্ত্রিকদের পরিচয় জানা যায়, যারা এখানে জালন্ধর বিদ্যা (বশীকরণ), গুটিকাসিদ্ধি (জংলি গাছগাছড়া নিয়ে নানা ক্রিয়া) প্রভৃতি সাধনা করত। এদের

'ঘোরশৈব'ও বলত। হর্ষবর্ধনের 'রত্নাবলি', জৈনদের 'মহাবীর চরিত্র', 'কথারত্ন কোষ'—এইসব গ্রন্থে শ্রীশৈলমে তাদের অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি-সাধনার কথা জানা যায়। এইজন্য এই ক্ষেত্রকে 'সিদ্ধক্ষেত্র' বলা হতো। এই যোগীরা রসযোগ বা যেকোন ধাতুকে সোনায় পরিণত করার বিদ্যাও লাভ করেছিল। 'নিত্য নাথ' নামে এক প্রাচীন লেখকের 'রসরত্নাকর' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এখানকার পাহাড়ের কোন কোন গোপন গুহায় এই রসযোগের জন্য তারা রসায়নাগারও তৈরি করেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এইসব কাণ্ড হতো। প্রাচীন তেলেগু লেখক জাকান্না রচিত 'বিক্রমার্কচরিত্র' গ্রন্থে 'সিদ্ধসারস্বত মন্ত্র' বলে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাতে ঐ রসবিদ্যা বা ধাতু-পরিবর্তন বিদ্যার কথা জানা যায়।

শ্রীশৈলই তখন সমগ্র কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর তামিলনাড়ু অঞ্চলের শৈবসম্প্রদায় ও শিবশক্তি মন্দিরের প্রধান পরিচালক ও নির্দেশক হিসাবে মান্য হতো। কালমুখ ও পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধকেরা ছিল এই তীর্থের প্রধান শৈব নেতা। এরা আধিপত্য বজায় রেখেছিল পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এখানে আরেক নতুন শৈব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এরা হলো 'বীরশৈব'। আল্লমপ্রভু এবং অক্কমহাদেবী নামে দুজন সাধক ও সাধিকা এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এঁরা বর্তমানের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের আদি। এঁরা বলেন, শ্রীগোরক্ষনাথও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইনি সিদ্ধ সাধক নাগার্জুনের শিষ্য। এই লিঙ্গায়েতেরা আজও সারা দক্ষিণ ভারতে বিখ্যাত। এই তীর্থে এসেছেন রামচন্দ্র, পঞ্চপাণ্ডব, দত্তাত্রেয়, নাগার্জুন; এসেছেন চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ ও ফাহিয়েন।

এই দীর্ঘ বিবরণী শোনার সময় আমার আগ্রহ দেখে একজন কর্তা আমাকে একখানি বই উপহার দিলেন—'Sri Sailam its History and Cult'; বইটি বহু তথ্যপূর্ণ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখানে আরতি একটু দেরিতে হয়। তাই হাতে সময় থাকায় এই মন্দিরের পুরাণকথা শুনতে আগ্রহী হয়ে প্রশ্ন করলাম। পুরোহিতদের মধ্যে একজন বললেন ঃ "আমি অল্প কথাতে এই মল্লিকার্জুনের উদ্ভবকথা আপনাকে শোনাচ্ছি। আরতির আগেই শেষ করে দেব।"

তিনি মল্লিকার্জুনকে প্রণাম করে পাঁচটি কাহিনী শোনালেন। প্রথমে সত্যযুগের কাহিনী। কৈলাস পর্বতে দেবী পার্বতীর গলার মালা নিয়ে দুই ছেলে গণেশ ও কার্ত্তিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছে। গণেশ বুদ্ধি করে মাকে প্রদক্ষিণ করে সেই মালাটি লাভ করেছেন। কার্তিক ময়ূরে চেপে অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে দাদার গলায় মালা দেখে ও বিবরণ শুনে রাগ করে চলে এলেন দাক্ষিণাত্যে। দেবী পার্বতী শিবকে বললেন পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে। শিব বললেন ঃ "কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার ছেলে শীঘ্রই ফিরে আসবে।" পার্বতী তাতে শান্ত না হয়ে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্বদের পাঠালেন পুত্রের কাছে। তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তিনি গোঁ ধরে বসে থাকলেন—"আমি যাব না।" তখন শিব ও শিবানী নিজেরাই পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে চললেন। কিন্তু কার্ত্তিকের এমনি অভিমান যে, বাবা-মা আসছেন শুনে এই অঞ্চল ছেড়ে তিন যোজন দূরে আরেকটি পাহাড়ে চলে গেলেন। শিব আর পার্বতী বোধহয় এতদূর এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আর ছেলের পিছনে না ছুটে এখানেই থেকে গেলেন জ্যোতিরূপ ধারণ করে। সেইদিন থেকে শিব 'মল্লিকার্জুন' নামে এই শ্রীশৈলপর্বতে অবস্থান করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে অভিমানী পুত্র ফিরে আসবে। কার্তিক কিন্তু আর এলেন না। তিনি 'ষণ্মুগম', 'কুমারমঙ্গলম'—এইসব নাম নিয়ে তাঁর প্রিয় দক্ষিণাত্যেই থেকে গেলেন।

দ্বিতীয় কাহিনী—দ্বাপর যুগে নবল্লামালাই পাহাড়ে 'শিলাদি' নামে এক মুনি শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দৈববাণী করলেন ঃ "তুমি কি চাও?" মুনি বললেন ঃ "আমার তো অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই আমি আর পারছি না। আমাকে এমন একটি সন্তান দাও, যে তপস্যা করে তোমার দর্শন পাবে।" শিবের বরে তিনি তাই পেলেন। পুত্রও শিবভক্ত, কঠোর তপস্যা শুরু করল। শিব আবার দৈববাণীতে বললেন ঃ "আমি দর্শন দিলে কোন মানুষ সেই দিব্য তেজ সহ্য করতে পারবে না, তাই তুমি ভেবে দেখ কি করবে।" কিন্তু ভক্ত তাঁর দর্শন ছাড়া আর কিছুই চায় না। শেষে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় মহাজ্যোতির্ময় মূর্তিতে শিব তার সামনে আবির্ভূত হলেন। ভক্ত সেই জ্যোতি দর্শনকালে অন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু একটি প্রার্থনা করল ঃ "হে দেবাদিদেব, জ্যোতিস্বরূপ ভগবান! আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই, শুধু তুমি যে এখানে দয়া করে আমার কাছে এসেছিলে, এটি প্রমাণ করার জন্য যুগ যুগ ধরে জ্যোতির্লিঙ্গ হয়ে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে এখানে বিরাজ কর।" এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্ত শিবজ্যোতিতে লীন হয়ে গেলেন, আর মহাদেব ভক্তের

বাসনা পূর্ণ করার জন্য এখানে জ্যোতির্লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হলেন।

তৃতীয় কাহিনী আরো পরবর্তী কালের। এই জঙ্গলে আদিবাসী চেঞ্চু ভীলেরা তাদের আরাধ্যা দেবী পার্বতীকে তাদের কন্যা বলে মনে করত। সেই সূত্রে তারা মল্লিকার্জুনকে নিজেদের জামাই ভাবত। আদিবাসী চেঞ্চু ভাষায় 'চেঞ্চু মল্লিহা' মানে নিজের জামাই। এই 'মল্লিহা' থেকে 'মল্লিকা' এসেছে। আজও বিশেষ উৎসবের দিনে চেঞ্চু আদিবাসীদের বিশেষ সম্মানের স্থান থাকে।

চতুর্থ কাহিনী—কৃষ্ণা নদীর ওপারে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর মেয়ে চন্দ্রাবতী এখানে জঙ্গলের মধ্যে শিবলিঙ্গ খুঁজে পেয়ে প্রথম বনের মল্লিকা ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করেন। সেই থেকেই 'মল্লিকার্জুন' নাম হলো।

পঞ্চম কাহিনী—অর্জুন এখানে কিরাতবেশী শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং শেষে শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশেরই কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়ারার ইন্দ্রকিলা পাহাড়ের ওপর কনকদুর্গার মন্দিরে ঘটেছিল বলে একটা প্রচলিত মত আছে। যাইহোক, অর্জুন এই শ্রীশৈলে এসে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। যেভাবেই হোক তাঁর নামের সঙ্গে এই শিবের নাম জড়িয়ে গিয়েছে।

এই শিবমাহাত্ম্য শুনতে শুনতেই মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠল—আরতির আর দেরি নেই। পুরোহিত এই শিবকথা শুনিয়ে চলে গেলেন আরতির প্রস্তুতির জন্য। আমরাও আরতি দর্শনের জন্য গর্ভমন্দিরের সামনে দুপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো ভক্তদের সঙ্গে মিশে গেলাম।

আরতি শুরু হলো। দক্ষিণদেশীয় কাড়া, নাকড়া, নাদস্বরম, ঝাঁজ—এইসব বাজিয়ে আরতি চলতে লাগল। প্রথমে পূজারী গর্ভমন্দিরের দরজার বাঁদিকে ছোট একটি ঘরে রুপোর আবরণে ঢাকা এক গণেশকে আরতি করে তারপরে শিবকে আরতি করতে লাগলেন। ঝাড়প্রদীপ ও কর্পূরদীপ দিয়ে বেশিক্ষণ আরতি হলো। মূলমন্দিরের আরতির পরেই পূজারী ও তাঁর সহকারী সব উপচার নিয়ে বৃদ্ধ মল্লিকার্জুনের কাছে গিয়ে তাঁকে আরতি করলেন। আরতি শেষ হতে আধঘণ্টার মতো লাগল। এরপর মন্দির পরিষ্কার করতে শুরু হলে সেই অবকাশে একেবারে ফাঁকা মন্দিরে আমি আবার গেলাম মল্লিকার্জুনকে প্রণাম করতে। তারপর ঘরেরই এককোণে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জপ ও স্বামীজী রচিত শিবস্তোত্রটি পাঠ করলাম।

প্রণাম জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এখানকার মন্দিরের এক অদ্ভুত রীতির পূজা দেখলাম। পূজারীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের বাঁদিকে অর্থাৎ শিবের দক্ষিণদিকের চত্বরে এসে একটি গরু ও বাছুরকে কিছু মন্ত্রাদি সহকারে ফুল দিয়ে পূজা করলেন এবং কর্পূরারতি করে তাদের চাল ও আরো কিছু খেতে দিলেন। এইসঙ্গে বাজনাও বাজতে লাগল। এই অনুষ্ঠান দেখতে বেশ ভিড় হয়েছিল। আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ সব মন্দিরে ভোগ হলো। কিছুক্ষণ পরে আবার বাজনা বাজিয়ে প্রতীক-বিগ্রহকে নিয়ে যাওয়া হলো বৃদ্ধ মল্লিকার্জুনের মন্দিরে, যেখানে সুন্দর খাটবিছানা পাতা আছে। এবার আমাদের মন্দির থেকে বাইরে চলে আসতে হলো। দূর থেকে মল্লিকার্জুনকে প্রণাম জানিয়ে বিশাল তোরণ পার হয়ে বাইরে এলাম। দেখলাম, মন্দিরের সংলগ্ন ছোট ঘরে গণেশের গায়ের রুপোর আস্তরণ সরিয়ে নেওয়ায় কালোপাথরের উপবিষ্ট গণপতির বিগ্রহ পরিষ্কার দেখা গেল। বিঘ্নবিনাশক গণেশকে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম।

পথে নেমে ব্রহ্মানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হলো, আগামীকাল সকালে গাড়ি আসবে, তাতে স্থানীয় আর কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখেই রওনা দেব।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল মন্দিরে শ্রীশৈলসুপ্রাতম্‌ ও মঙ্গলমের গানের শব্দে। তাড়াতাড়ি স্নানাদি করে তৈরি হতেই নিচে গাড়ির শব্দ পেলাম। নেমে এসে গাড়িতে উঠে প্রথমেই এলাম মল্লিকার্জুন-মন্দিরে। এখন মন্দির ফাঁকা। প্রাণভরে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম— "শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবিধপ্রসঙ্গে শেষাদ্রি শৃঙ্গেঽপি সদাবসন্তম্‌। / তমর্জুনং মল্লিকপূর্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্র-সেতুম্‌॥"... "তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌।/ পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌, বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যম্‌ ॥"

দূর থেকে মা ভ্রমরাম্বিকাকেও প্রণাম জানালাম। কারণ, মঙ্গলারতির পর মায়ের সাজগোজের জন্য তাঁর মন্দির কিছুক্ষণ বন্ধ। তাঁকেও প্রণাম জানালাম— "সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসদ্‌স্বরূপং।/ শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্‌।/ সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা।/ ত্বাং সর্ববিশ্বজননীং মনসাস্মরামি ॥"

ব্রহ্মানন্দবাবু আমার জন্য কিছু প্রসাদী লাড্ডু সংগ্রহ করে এনেছিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে সামনে অপেক্ষারত জিপে গিয়ে উঠলাম।

পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের গাড়ি প্রথমেই এল প্রাচীন এক মন্দিরে। ছোট মন্দিরে সাক্ষী গণেশের সিন্দুরচর্চিত বিগ্রহ। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিঘ্নবিনাশক গণেশকে আমাদের শ্রীশৈলদর্শন নির্বিঘ্নে হওয়ার জন্য

প্রণাম জানিয়ে এবং এই তীর্থদর্শনের সাক্ষী থাকার অনুরোধ করে নেমে এলাম। আমাদের গাড়ি আরো কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে দাঁড়াল। এখানে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম কিছুটা সমতল জায়গায় পাহাড়ি দেওয়াল বেয়ে পাঁচ-ছয়টি স্বচ্ছ জলের ধারা নেমে আসছে। খুব পরিষ্কার ও মিষ্টি জল। এখানে অনেকে স্নানও করে দেখলাম। পাশেই এক সাধুর কুটির। এই পঞ্চধারা একসঙ্গে মিশে নিচে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। আসছে যে কোথা দিয়ে তাও দেখা যায় না। এই জায়গাতেই কোথাও আচার্য শঙ্কর সশিষ্য ছিলেন। সেখানে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে এই পাহাড় পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়ের চূড়ার কাছে পৌঁছালাম। এই স্থানটি এখানকার সবচেয়ে উঁচু, নাম 'শিখরেশ্বর'। গাড়ি থেকে নেমে কিছু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই দুচোখ জুড়িয়ে গেল। এটি মল্লিকার্জুনের মন্দির থেকে প্রায় ছয় মাইল দূর। এই চূড়াতে দুটি মন্দির আছে। একটির নাম 'শিখরেশ্বর'। প্রবাদ, এখানে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। এখান থেকে মল্লিকার্জুন-মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। এখানে পাথরের গায়ে লেখা আছে, আর লোকেরও বিশ্বাস—"শ্রীশৈলশিখরং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" এই স্থানটি সমুদ্রতল থেকে ২৮৩০ ফুট উঁচু। এখানে একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে ডমরুর মতো বেশ বড় একটি পাথর বসানো আছে। সেটিকে সর্প বেষ্টন করে আছে। তার মাথায় একটু সমতল জায়গায় একটি ছোট নন্দির মূর্তি। মজা এমনি, নন্দিকে ধরে যেদিকে খুশি ঘোরানো যায়। সে ঘোরে, কিন্তু পড়ে যায় না। তবে সবসময়ই সেটি মল্লিকার্জুন-মন্দিরের দিকে মুখ করে থাকে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব! সমস্ত শ্রীশৈলক্ষেত্রটিকে ছবির মতো দেখা যায় এখান থেকে। একপাশে কৃষ্ণা নদী ও তার ওপর নির্মীয়মাণ বাঁধ কিছুটা দেখা যায়। এখানে পাহাড়ের গায়ে একটি সুড়ঙ্গ বা গুহার মতো আছে। মাথা নিচু করে তার মধ্যে ঢোকার পরে কয়েকটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ দর্শন হলো। শোনা যায়, এই 'বীরভদ্র লিঙ্গ' নাকি পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত।

এর আশপাশে আরো অনেক মন্দির আছে। কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে, তাই আর বেশি দেরি না করে আবার শ্রীশৈলের দিকে ফিরে চললাম। কারণ, ঐদিকেই আমাদের নামবার রাস্তা।

বাসস্ট্যাণ্ডে এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য সিট রিজার্ভ করে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ব্রহ্মানন্দবাবুকে বিদায় জানিয়ে বাসে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। বিদায় শ্রীশৈলাধীশ মল্লিকার্জুন, বিদায় মা ভ্রমরাম্বিকা—"ন শিবেন বিনাশক্তির্ন শক্তিরহিতোঃ শিবঃ।/ উমাশঙ্করয়ো ঐক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" [সমাপ্ত]। ❑

নিবন্ধ........

প্রভুর কাজে গুরুভাইদের সঙ্গে বিবেকানন্দ

গোরাচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স ছিল অনধিক চব্বিশ বছর। বয়সে তরুণ হলেও বিশুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী নরেন্দ্রনাথ তখনি বুঝেছিলেন, তাঁর প্রভুর জীবনসাধনার মধ্যে আধুনিক জগতের বিভিন্ন দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান নিহিত। "ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য", "শিবজ্ঞানে জীবসেবা", "যত মত তত পথ", "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রজ্ঞালব্ধ বাণীগুলি কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্বের কথা নয়। সকল ধর্মের সারাৎসার যেমন এর মধ্যে নিহিত, তেমনি পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষকে নিয়ে শ্রেণিদ্বন্দ্ববিরহিত সৌভ্রাতৃত্বমূলক এক সুসমঞ্জস মানবসমাজ গঠনের সূত্রাবলীও এইসকল বাণীর মধ্যে বিধৃত। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিবর্তিত মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল, দেখেছিলেন মানবিক গুণ ও মূল্যবোধের চরম বিকাশ, স্পর্শ পেয়েছিলেন নিখাদ মানব-মনে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক ভাবরাশি, যা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি জানতেন, "His (Sri Ramakrishna) life is a searchlight of infinite power." (তাঁর জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো)[১] এবং "[তাঁহার] ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তিপরায়ণ করিয়া তুলিবে এবং নানা দেশ ও নানা জাতির কল্যাণসাধন করিবে।"[২]

এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গুরুর ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনে ছিল এক বৃহৎ কর্তব্য, যা তাঁর 'প্রভুর কাজ' বলে মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের নিকট লিখিত পত্রে স্বামীজী এই কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ "আমার সমাদর হউক আর নাই হউক, আমি... যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।... ভারতের নগরে নগরে... শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন, হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।"[৩]

কিন্তু যেহেতু বৃহৎ প্রকল্প খাড়া করার পূর্বে তার 'মডেল' তৈরি করতে হয়, তাই আদর্শ প্রচারের আগে নিজেদের জীবনকে মডেল-রূপে গঠন করে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগল। 'আদর্শের বাস্তবায়ন' কথাটির অর্থ কি? স্বামীজী নিজেই বলেছেন ঃ "ইহার অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রিস্টানের কর্মপ্রবণতা এবং ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া তোলা।"[৪] সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ, বরানগর মঠে দুশ্চর তপস্যা ও অধ্যয়ন এবং কয়েক বছর যাবৎ ভারত পরিভ্রমণ —এ সবই ছিল এই প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্ব।

স্বামীজী অবশ্যই জানতেন, 'প্রভুর কাজ' বলে যে-কর্তব্যভার তিনি স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন তা সাধন করতে গিয়ে কি পরিমাণ ক্লেশ সহ্য করতে হবে, কত অশ্রু ঝরাতে হবে, শিলাকণ্টকে সমাচ্ছন্ন কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু বীরসন্ন্যাসী কিছুতেই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কঠোর বাস্তব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "আমার হৃদয় [যেন] মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়—For 'we have taken up the cross, Thou hart laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death.' (কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি; হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও—যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি।)"[৫] স্বামীজী ভক্ত বলরাম বসুর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়েরও আশীর্বাদ ভিক্ষা করে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঃ "যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয় কিংবা এশরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।"[৬]

জীবনকে পণ রেখে 'প্রভুর কার্য' সম্পাদনে নরেন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্পের---এর পিছনে কর্তব্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক নিখাদ ভালবাসার আকর্ষণ। নরেন্দ্রনাথ জানতেন, গুরু তাঁকে কি চোখে দেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমের অতলান্ত সাগরে অবগাহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। গুরুর প্রতি তাঁর ভালবাসাও ছিল একান্ত ও অপ্রমেয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, আধ্যাত্মিক প্রেমের জগতে গুরু ও শিষ্য "চিরকালের মতো প্রণয়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।"[৭] নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন ঃ "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল, দেহ


স্বামী বিবেকানন্দ


স্বামী ব্রহ্মানন্দ


স্বামী প্রেমানন্দ


স্বামী যোগানন্দ


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ


স্বামী সারদানন্দ


স্বামী শিবানন্দ


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।"[৮]

গুরুনির্দেশ শিরোধার্য। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পূর্বে ভাবী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নেতার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল যেমন অপরিসীম তেমনি বেগবান। এই কালে বিদেশ থেকে গুরুভ্রাতৃবৃন্দকে লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে স্বামীজীর দয়াল, ভয়াল ও প্রেমময় মূর্তি যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে। প্রভুর কাজের ভার গ্রহণ করার জন্য যে বৈরাগ্যবান যুবকবৃন্দ ভবিষ্যতে স্বামীজীর পার্শ্বে এসে দাঁড়াবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই ছিল এঁদের আসন। এক নিগূঢ় ভালবাসা দিয়ে স্বামীজী এঁদের সকলকে বেঁধেছিলেন। এঁদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে স্বামীজীর প্রাণে লাগত।[৯] সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে প্রথম যৌবনে যখন এঁদের অনেকেই ছিলেন নিঃসহায়, তখনি স্বেচ্ছাকৃত দাসখত লিখে স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন ঃ "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।"[১০]

স্বামীজী বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ ভাবরাশি জগতে ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য অধ্যাত্ম সাধনায়, চরিত্রে, সাহসে ও আত্মবিশ্বাসে এঁদের প্রত্যেকের জীবনকে এক-একটি সচল শক্তিকেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে হবে। তাই স্বামীজীর কথাই ছিল —শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য যে, সে ঈশ্বরের নির্বাচিত যন্ত্র, সে অসাধ্য সাধন করিবে, "সে দুর্বল হইয়াও কর্মবীর মহাবীর হইবে।"[১১]

"সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী।... এখন এজন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার।... যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরিব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরি হবে—তাদের ভেতর তিনি আসবেন।"[১২]

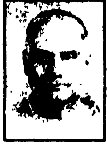
গুরুভাইদের লিখছেন ঃ "তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন,... বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনো হয় নাই।... Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে।... Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীনবুদ্ধি খরচ করতে শেখ।... প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।"[১৩]

"গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক।... তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা।... ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।"[১৪]

গুরুভ্রাতৃবৃন্দ যাতে প্রভুর কাজে তাঁদের গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য স্বামীজীর সতর্কবাণী সর্বদা এঁদের ঘিরে রাখত। স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখছেন ঃ "তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও।"[১৫] আরো লিখছেন ঃ "তোমাতে Organizing Power আছে—একথা ঠাকুর আমায় বললেন, কিন্তু এখনো ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্বাদে ফুটবে।"[১৬] ব্রহ্মানন্দজীকে লিখছেন ঃ "রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনো বুঝতে পারিসনি।"[১৭]

তাই জগৎকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এইসব জীবন প্রভুর কাজের জন্য যাতে ঠিকমতো ফুটে উঠতে পারে সেব্যাপারে স্বামীজীর উদ্বেগ, চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেগুলি এর সাক্ষ্য বহন করছে। একবার গুরুভাইদের মধ্যে কে কোথায় আছে, কি করছে, কেমন আছে এইসব খবর নিয়ে লিখলেন ঃ "তোরা এক-একটা মানুষই হ দিকি রে বাবা!"[১৮] আবার লিখলেন ঃ "বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করিতে না পার।... গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে।"[১৯]

এই চিঠিগুলিতে একদিকে যেমন স্বামীজীর অনাবিল প্রেমের প্রস্রবণ খুলে গিয়ে গুরুভাইদের হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, আনন্দে ভাসিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সময় সময় ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রক্তচক্ষুর ঝলকানি তাঁদের সকলকে সচকিত করে তুলেছে। একবার নিউ ইয়র্ক থেকে ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে লিখলেন ঃ "আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর?... যেসকল কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর প্রায়ই পাই না—কেবল আবোলতাবোল।... চিঠি হারায় কেন? ফাইল হয় না কেন? সকল কাজেই ছেলেমানুষি! আমার চিঠি হাটের মাঝে পড়া হয় বুঝি? আর যে আসে, সেই ফাইল টেনে চিঠি পড়ে বুঝি?"[২০]


স্বামী অভেদানন্দ


স্বামী অদ্ভুতানন্দ


স্বামী অদ্বৈতানন্দ


স্বামী তুরীয়ানন্দ

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, স্বামীজীর অনুমান সর্বাংশে সত্য। যে-চিঠি সাগরপার থেকে নরেনের বার্তা বহন করে এনেছে—যে-চিঠি প্রিয়তমের দূত--সেটি বারবার পড়েও তৃপ্তি হয় না। সেটি নিয়ে হয়তো কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়েছে। ফাইলে রাখা হয়েছে, আবার হয়তো ফাইল থেকে বের করে কেউ পড়তে নিয়েছে। তাই তাঁর নির্দেশমত সব কাজ হয়ে ওঠেনি। অতএব বকুনি একটু খেতে হবে বৈকি! আবার কাজের কাজটি যখন হয়েছে, তখন হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত কী না অভিনন্দন! আর কী আশ্চর্যই না তার অভিব্যক্তি! কী আনন্দ আর গর্ব! "তাকে [সারদা মহারাজ---স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে] আমার শত শত ধন্যবাদ।... আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই ইতি, আমি সারদার চেলা।"[২১] কিন্তু সারদা মহারাজের 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নামটি নিয়েই স্বামীজীর রসিকতা---"তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়।... কী জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামই করেছ!"[২২] শুধু কি গুরুভাই? নিজেকে নিয়েও স্বামীজীর কত রঙ্গ! একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ "একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; মধো, তোর পেটে এতও ছিল!!"[২৩] আরো লিখছেন ঃ "আমাকে বেটারা [আমেরিকার পাদরীরা] যমের মতো দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে,... কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন।"[২৪] "এখানকার দিগ্গজ দিগ্গজ পাদরীতে ঢের চেষ্টা-বেষ্টা করলে---এ গিরিগোবর্ধন টলাবার জো কি!"[২৫] তবে সর্বকিছু ছাপিয়ে এক নিষ্কলুষ গুরুভ্রাতৃপ্রেম স্বামীজীর পত্রগুলিতে বারবার ফুটে উঠেছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ "তোদের সব আনন্দ-দের নাম মনেও থাকে না - কোনটাকে কি বলি! সবগুলোকে এক সাঁটে আমার ভালবাসা দিবি।"[২৬] ভালবাসা দেওয়াটাই ছিল স্বামীজীর আসল কথা—নাম যাই হোক। গুরুভাইরা সকলে তাঁর মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন---একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একবার যথাসময়ে একটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়নি। অমনি সিংহের গর্জন শোনা যেতে লাগল—"একটা তাল ধরবার মানুষ নেই;... আমি এখন চললাম, সব... তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন---যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে---এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব।"[২৭] মনে হলো, ক্ষুব্ধ বীরেন্দ্র কেশরী বুঝি সব ছেড়েছুড়ে বাণপ্রস্থ নিতে চলেছেন! কিন্তু অহো আশ্চর্যম্! পরের অনুচ্ছেদে পৌঁছে দেখা গেল, সিংহ ধীরে ধীরে ফিরে এসে বলছেন ঃ "আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়প্রতিষ্ঠং' অভয় যেন তোমাদের করেন।"[২৮]

জীবনকে পণ রেখে প্রভুর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বা ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে যারা সস্তায় গৌরব কুড়োবার চেষ্টা করত, স্বামীজী তাদের অল্পে ছাড়তেন না। অনল বর্ষিত হতো সেইসব বচনবিলাসী বক্তাদের প্রতি — যারা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করত, কিন্তু নিজেদের চরিত্রে ও কর্মে তাঁর ত্যাগবৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শকে প্রতিফলিত করা থেকে দূরে সরে থাকত। স্বামীজী চাইতেন, অন্যেরা যে যাই করুক না কেন তাঁর গুরুভাইরা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সিংহবিক্রমে প্রভুর কাজ সম্পন্ন করবে। তাঁদের কারো মধ্যে ভাবের কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেলে অথবা পৌরুষের অভাব দেখলে তাকে 'ত্রাহি মধুসূদন' করিয়ে ছাড়তেন। এক গুরুভাইকে তিনি লিখলেন ঃ "'আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই নই'---ও কোন্ দিশি বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ওরকম 'দীনাহীনা' ভাবকে দূর করে দিতে হবে।... তুমি জান না তো এতকাল করলে কি? ওসব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়।"[২৯] শ্রীরামকৃষ্ণের সহচর হয়ে নবযুগের উদ্বোধন ঘটাতে যাঁরা পৃথিবীর মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, স্বামীজীর কথায়, তাঁদের ভাব হবে — "আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে?"[৩০] "যখন তোমরা বল রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরেই বল ---'আমরা কিছুই জানি না', তখনি আমি বলি---'Liar (মিথ্যাবাদী), চোর, ঝুট বিলকুল'। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে।"[৩১] অতএব সাগরপার থেকে কম্বুকণ্ঠের দাবি উত্থিত হতে লাগল ঃ "বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ...যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টা-গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের —মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে।"[৩২]

আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, দেশ ও জাতির সর্বতোমুখী অভ্যুদয়ের জন্য স্ত্রীজাতির উন্নতি ও কল্যাণসাধন অবশ্য প্রয়োজন। তাই এদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠের সাথে সাথে শ্রীশ্রীমায়ের মঠ স্থাপনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। চিঠিপত্রে দেখা যায়, তিনি বরং শ্রীশ্রীমায়ের মঠ আগে স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। লিখেছিলেন ঃ "আগে মা


স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ


স্বামী অখণ্ডানন্দ


স্বামী সুবোধানন্দ


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা।"[৩৩] 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে দেশে নারীশক্তি তথা মাতৃশক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। তবেই তো গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো মহা মনস্বিনী রমণীরা আবার জগতে জন্মাবে। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে বদ্ধপরিকর স্বামীজী গুরুভাইদের বারবার তাগাদা দিয়েছেন যাতে সর্বাগ্রে উপযুক্ত ও প্রশস্ত জমি সংগৃহীত হয়—মঠ তৈরি করার জন্য। ১৮৯৪ সালে এক ঐতিহাসিক চিঠিতে গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে স্বামীজী লিখলেন ঃ "দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে।"[৩৪] সত্যসঙ্কল্প স্বামীজী এবং তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের ঈপ্সিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে। তারও আগে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' স্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর স্বপ্নের স্ত্রীমঠের সূচনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীমা। শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানত্রয়ের কার্যাবলী আজ বহু-বিদিত ও বহু-বিস্তৃত।

বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, অশান্ত স্বামীজী গুরুভাইদের বকছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন আবার কঠিন কর্তব্যের ভার মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। স্বামীজী জানতেন, তাঁর প্রভুর কাজ গুরুভাইদের ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হওয়ার নয়। সকল মানুষের মধ্যে যে একই ঈশ্বর বিরাজিত, ব্যবহারিক জীবনে এ-সত্য তুলে ধরার সাহস ও শক্তি আর কার আছে? সেই ত্যাগ, ভালবাসা, নিঃস্বার্থপরতা, মুক্তবুদ্ধি কোথায়? কোথায় সেই নিবেদিতপ্রাণ সেবাব্রতী, যে দীন, দরিদ্র, হতভাগ্য মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে? তাই স্বামীজীর এত চিন্তা, এমন অধীর আকুলতা, এত অভিমান, এত তর্জন-গর্জন। গুরুভায়েরা ভাল করেই চিনতেন তাঁদের নেতা নরেনকে—জানতেন তাঁর প্রাণের কথা। তাই বজ্রনাদের আড়ালে যে প্রেমের বংশীধ্বনিটুকু বাজত, তা শুনতে ও বুঝতে তাঁদের ভুল হতো না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ ভাবরাশি জগতে প্রচার করা এবং দীন, দুঃখী, অসহায় মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে শিবের আরাধনা করা—এই দুই মহান ব্রত স্বামীজী নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন এবং গুরুভাইদের সাথে মিলিত হয়ে 'প্রভুর কাজ'রূপে তা সম্পন্ন করেছেন। সে-কাজের ধারা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। প্রভুর প্রেম স্বামীজীকে গ্রাস করেছিল।

বৈষ্ণবদের মধ্যে 'প্রেমের ঋণ' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। শোনা যায়, বৃন্দাবনের গোপ-গোয়ালিনীগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এতটাই ভালবেসেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই ভালবাসার সম্যক প্রতিদান দিতে পারেননি। গোপীদের কাছে ভগবান তাই প্রেমের ঋণে আবদ্ধ ছিলেন। সেই প্রেমের ঋণ শোধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগে রাধাভাবসুবলিত দেহ ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাতে হয়েছিল। ঋণ পরিশোধের এই মধুর ও অনবদ্য কাহিনীর প্রায় অনুরূপ ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রনাথের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের ঋণ শোধ করার জন্য নরেন্দ্রনাথকে বৈরাগী হয়ে জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে এবং সমাধির আনন্দলোক ছেড়ে সংসার-মরুক্ষেত্রে বটবৃক্ষের ছায়াবিস্তার করে নিজে দগ্ধ হয়েও অসহায় দীনদুঃখী, পথভ্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে হয়েছে। অখণ্ডের ঘর থেকে নরঋষি এসেছিলেন মর্ত্যের মাটিতে—নরেন্দ্ররূপে। গুরুর প্রেমের ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় এই মাটিতে তিনি দধীচির মতো আত্মদান করেছেন। আর আমরা তার ফল ভোগ করে চলেছি আজও। এমনি চলবে আরো কতকাল।❑

তথ্যসূচী

১ পত্রাবলী, ৩য় সং, পৃঃ ২৫৫
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১১শ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১০৭
৩ পত্রাবলী, পৃঃ ১০৫
৪ বাণী ও রচনা, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১০৫
৫ পত্রাবলী, পৃঃ ৭
৬ ঐ, পৃঃ ২৭
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য়ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ২১শ সং, পৃঃ ৬৭
৮ পত্রাবলী, পৃঃ ৪৩
৯ ঐ, পৃঃ ৩৭৬
১০ ঐ, পৃঃ ৪৪
১১ ঐ, পৃঃ ৫৫৯
১২ ঐ, পৃঃ ১৬৪ ১৬৫
১৩ ঐ, পৃঃ ২৫৯
১৪ ঐ, পৃঃ ২৬০
১৫ ঐ, পৃঃ ৪৫১
১৬ ঐ, পৃঃ ৪১১
১৭ ঐ, পৃঃ ২৮৮
১৮ ঐ, পৃঃ ২৬৪
১৯ ঐ, পৃঃ ২৪২
২০ ঐ, পৃঃ ৪৪৯
২১ ঐ, পৃঃ ৩৪২
২২ ঐ, পৃঃ ৪২৮-৪২৯
২৩ ঐ, পৃঃ ১৬২
২৪ ঐ, পৃঃ ১৯২
২৫ ঐ, পৃঃ ১৯০
২৬ ঐ, পৃঃ ৭৪০
২৭ ঐ, পৃঃ ৬০৮
২৮ ঐ, পৃঃ ৬০৮
২৯ ঐ, পৃঃ ২৮২-২৮৩
৩০ ঐ, পৃঃ ২৮৩
৩১ ঐ, পৃঃ ২৮৬
৩২ ঐ, পৃঃ ২৫৮
৩৩ ঐ, পৃঃ ২৫৬
৩৪ ঐ, পৃঃ ২৫৬

ঐই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বিভূতিভূষণ'

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় অজিতেন্দ্র সিংহের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বিভূতিভূষণ' রচনাটি থেকে প্রকৃতিপ্রেমিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী, কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রভাব যে কত গভীর ছিল তা জেনে খুব ভাল লাগল। এপ্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা যোগ করা যেতে পারে।

১৯৫০ সালের ২৮ অক্টোবর বিভূতিভূষণের হৃৎযন্ত্র ও কিডনি বিকল হয়ে পড়ে। এরপর 'দেবযান'-এর লেখক দেবযানের উদ্দেশে যাত্রার প্রারম্ভে মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরের জন্য যে আকুলতা প্রকাশ করেন, তা বিবৃত হয়েছে বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা 'অন্তিম দেবযান' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'বেতারজগৎ' পত্রিকায় ১৯৫০ সালে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়।

ঐ লেখাটি থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পূর্বদিন মঙ্গলবার বিভূতিভূষণ তাঁর স্ত্রী কল্যাণীদেবীকে ভেঙে পড়তে দেখে বলছেন ঃ "তুমি অত অধীর হচ্ছ কেন? তাহলে যে আমার দেবযান লেখা মিথ্যে হয়ে যাবে। তুমি কি ভেবেছ এটা শুধু গল্প? ওটা সত্য, আমি জানি ওটা সত্য। তিনি পরম পিতা, তিনি ডেকেছেন, আমার প্রয়োজন হয়েছে আমি যাচ্ছি। তোমারও প্রয়োজন আসবে, তিনি ডাকবেন, তুমিও যাবে। এ তো শুধু এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়া। এতে এত বিচলিত হওয়ার কি আছে? তিনি তো আমাদের সকলেরই পিতা।" কথাগুলির মধ্যে 'কথামৃত'-এর ভাব অনুরণিত হয়।

পরদিন বুধবার। লেখক গজেন্দ্রবাবুর ভাষায় ঃ "তিনি (বিভূতিভূষণ) পরিচিত এক স্বামীজীকে ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। বললেন, 'আর কেন স্বামীজী, নাম শোনান ঠাকুরের!' স্বামীজী বললেন, 'আমাদের ওখানকার সেই বড় ছবিখানার কথা মনে আছে? ঠাকুরের?' 'নিশ্চয়।' দুহাত তুলে প্রণাম করলেন বড়দা (বিভূতিভূষণ)।"

ঐদিন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও বিভূতিভূষণের মুখে ছিল এক অদ্ভুত স্বর্গীয় হাসি। তাঁর শয্যাপার্শ্বে ডাক্তারের স্বীকারোক্তি ঃ "বহু রোগীর মৃত্যু দেখেছিলাম। এ-হাসি কখনো কল্পনা পর্যন্ত করিনি। দেবতার হাসি!"

এভাবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও বিভূতিভূষণের ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ভাব ও মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ দেখে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়।

নিতাই নাগ
চাঁদমারীডাঙা, বাঁকুড়া-৭২২১০১

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় 'আলোচনা' বিভাগে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার লেখা যে-রচনাটি প্রকাশ করেছেন, তাতে আরো কিছু কথা যোগ করতে চাই।

বিভূতিভূষণ জন্মেছিলেন তাঁর মাতুলালয় মুরাতিপুর গ্রামে। তাঁর পৈতৃক নিবাস বনগাঁর অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে এবং তাঁদের আদিনিবাস ছিল বসিরহাটের অন্তর্গত পানিতর গ্রামে।

বিভূতিভূষণের লেখা 'জন্মদিন' গল্পের কেশববাবু বলছেন, অসহ্য হয়ে উঠেছে এসংসার। শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। অন্তত সেইসব জায়গায় আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে। রায়বাহাদুর তাঁর একষট্টিতম জন্মদিনে লেকের ধারে বেঞ্চিতে একলা বসে নিজের অন্তঃসারহীন সার্থকতার কথা ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে আজকের এই সার্থকতার ওপারে রাতুলপুরে শিক্ষকতা ও অন্যান্য মধুর স্মৃতির মাঝখানে আরো গভীরতর সার্থকতার শান্তি পেলেন। সেইরকম শান্তি আমরা মরমি বিভূতিভূষণের জীবনেও দেখতে পাই। তিনি মনে করতেন, এই প্রকৃতি, এই মানুষ—সবারই একটা প্রসন্ন মন আছে, একটা বড় প্রকৃতিতে তার আনাগোনা আছে। একটি ডায়েরিতে লিখেছিলেন ঃ "বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল।" তিনি লিখেছিলেন ঃ "জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে-সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভিতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করার আনন্দের মধ্যে।" এই অর্থে বিভূতিভূষণের জীবন সার্থক ছিল।

অজিতেন্দ্র সিংহ
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

প্রসঙ্গ 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ'

সেই আদিম যুগ থেকে মানবসমাজের ধীরে ধীরে সভ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর কাহিনীই হলো ইতিহাস। এবং ইতিহাস বিবৃত করার সময় সাল-তারিখের উল্লেখ অপরিহার্য। তাই ইতিহাসঋদ্ধ নিবন্ধকে সর্বতোপক্ষে হতে হবে self-explanatory বা self-contained। বিখ্যাত লেখক টমাস কারলাইল একজায়গায় লিখেছেন ঃ "The history of the world is but the biography of its greatmen." কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, সাধারণ

মানুষও 'history' গড়ার পিছনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, তবেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটে বা ঘটে চলেছে।

এই কথাগুলি লেখার কারণ হলো, গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় মদনমোহন সাহা 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ' নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছেন ঃ "আলোর ছিল সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী। ইতিপূর্বে 'শাহী' নামে এক শক্তিশালী রাজবংশ এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, কিন্তু রাজার নাম সঠিক জানা যায়নি।" এখানে সালের উল্লেখ নেই। লেখক অবশ্যই বলতে পারেন, ইতিহাস বই পাঠ করলেই তো এগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু, অন্য পেশায় নিযুক্ত মানুষের 'time constraint' বলে একটা ব্যাপার সবসময়ই থাকে, সেইজন্য তাঁরা চান যে, 'readymade' তথ্য পরিবেশিত হোক।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো, যা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে কেরালার কোচি শহরের উত্তরে ক্রাঙ্গানোরে এবং এইসঙ্গে ভারতে ইসলামধর্মের সর্বপ্রথম আগমন ঘটে। একজন তামিল ব্রাহ্মণ নৃপতি সেরামান পেরুমল আরবে যান এবং মদিনায় ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের সঙ্গে দেখা করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদেরই এক ভাইঝির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধও হন। পরে তিনি ভারতে ফিরে এসে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ মসজিদটি তৈরি করেন। এই কারণে এটি এখনো প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল সম্ভবত ১০৩৩ খ্রিস্টাব্দের পর।

সুহাসচন্দ্র রায়

পালপাড়া রোড, চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ' রচনাটির অনুষঙ্গে কিছু কথা যোগ করতে চাই। প্রথমত, লেখক আরব আক্রমণের সময় বৌদ্ধদের অসহযোগিতার কথা বলেছেন। কিছু বৌদ্ধ পঞ্চম বাহিনীর (Fifth columnist) কাজ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সকলেই দেশদ্রোহী ছিলেন না। অনেকে বিরোধিতা করেছেন, কেউ আবার অস্ত্রধারণ করেছেন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে। এর কারণ—মুসলমানদের নির্বিচারে গণহত্যা ও রক্তপাত পছন্দ হয়নি অহিংস বৌদ্ধদের। এছাড়া তাঁদের ধর্মে রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ। শুধু বৌদ্ধদেরই হাড়িকাঠে চাপালে চলবে না, অনেক অ-বৌদ্ধও সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল ঐসকল বিদেশী-আক্রমণকারীদের।

দ্বিতীয়ত, লেখক স্ট্যানলি লেনপুলের মত উদ্ধৃত করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন ঃ "The conquest of Sindh was the first and the last great achievement of the Arabs in India." (The Classical Age, p. 175) হিন্দু রাজাদের সাফল্যের কারণ নির্দেশিত হয়নি। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন কারণ হিসাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে আসল কারণকে চাপা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, হিন্দুদের সাফল্যের কারণ হলো—"Superior military strength and state-organisation of the Indians." (Ibid., p. 175) দাহিরের সঙ্গে তাঁর সৈন্যরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে 'চচনাম' গ্রন্থে ঃ "The infidels made a rush on the Arabs from all sides and fought so steadily and bravely that the army of Islam became irresolute and their lines were broken up in great confusion."

তৃতীয়ত, মহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যুদণ্ডের পিছনে লেখক নতুন খলিফার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেছেন। আসলে হজ্জাজের সঙ্গে ছিল তাঁর পুরনো শত্রুতা। তাই ক্ষমতা পেয়ে প্রতিশোধ নিতে হজ্জাজের জামাতাকে কোরবানি দেন তিনি।

চতুর্থত, সিন্ধুবিজয়ে আরবদের সাফল্যের পশ্চাতে কিছু কারণ আছে। পশ্চিমদিক দিয়ে ভারতে প্রবেশের চারটি দ্বার ছিল। সমুদ্রপথ ছাড়া অন্য তিনটি পথ হলো—খাইবার পাশ, বোলান পাশ ও মকরান উপকূল। সমুদ্রপথে অভিযান বারবার ব্যাহত হলে আরবরা বেছে নেয় খাইবার ও বোলান পাশকে। কিন্তু খাইবার পাশ কাবুল ও জাবুলের দ্বারা সুরক্ষিত। আর বোলানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে মোকাবিলা করতে হবে কিকানের দুঃসাহসিক জাটদের। পার্বত্য এলাকার জটিল রাস্তাঘাট আর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্রমাগত প্রতিরোধে বারবার পর্যুদস্ত হয় আরব অভিযান। বাধ্য হয়ে তারা বেছে নেয় মকরান উপকূলকে। এখান দিয়ে তাদের সিন্ধু আক্রমণে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হয়েছিল। তবে গৃহযুদ্ধ ও পারস্পরিক হানাহানিতে বিপর্যস্ত সিন্ধুর আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা আরবদের জয়ের পক্ষে অনুকূল ছিল।

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

কেশাপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।—**সম্পাদক**

প্র ব ন্ধ

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও সর্বাঙ্গীণ লোকশিক্ষা

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত



আশাপূর্ণা দেবী শ্রীমায়ের লোকশিক্ষা দান বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছেনঃ "মায়ের আশ্চর্যসুন্দর জীবনখানিই তো একটি সর্বজন-শিক্ষণীয় অনবদ্য পাঠ্য-গ্রন্থ। এগ্রন্থের ভাষা সরল, শব্দবিন্যাস অনাড়ম্বর, প্রকাশ-ভঙ্গি আকর্ষণীয়, আর বিষয়বস্তু গভীর ব্যঞ্জনাময়।"[১] বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মভাবে যে যুগোপযোগী ভাবান্দোলনের সূত্রপাত করে গিয়েছেন, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তারই বাস্তবায়নের দুই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মানুষকে আধ্যাত্মিক আলোকদান শ্রেষ্ঠ দান মনে করলেও এঁরা কেউ জাগতিক প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করেননি। স্বামীজী একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসীর মতো এই ভাবান্দোলনকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর লজ্জাশীলা ও অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমা নিজে পল্লীগ্রাম বা কলকাতায় বসে অগণিত সন্তানের প্রাণে অপূর্ব আনন্দালোক দান করেছেন তাঁর সহজ সরল কথা ও আচরণের মধ্য দিয়ে এবং দেখিয়েছেন নারীর ভাগ্যোন্নয়ন ও সমাজবিবর্তনের নতুন দিশা।

শ্রীমায়ের সমকালে যেসকল সমস্যা আমাদের সমাজকে জড়পিণ্ডবৎ ও কলুষিত করে রেখেছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল জনসাধারণের শিক্ষার অভাব এবং সেই অশিক্ষাজনিত পর্বতপ্রমাণ কুসংস্কার; বিশেষত নারীদের শিক্ষার সুযোগ তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। এর ওপর ছিল বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা ও বালবিধবাদের প্রতি সমাজের কঠোর অনুশাসন, ছিল নিম্নজাতি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলার মনোভাব, কোন ব্যক্তিবিশেষ সমাজবিধি সামান্য লঙ্ঘন করলে বা তার বিন্দুমাত্র চারিত্রিক স্খলন হলেই সমাজপতিদের প্রবল রক্তচক্ষু ইত্যাদি। সমাজের এইসকল নির্যাতনের জ্বালা নারীদেরই মূলত সহ্য করতে হতো। এইসকল সমস্যাকে শ্রীমা কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং কিভাবে সেগুলির সমাধান চেয়েছিলেন, সেকথাই আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শ্রীমায়ের বাল্যকালে প্রায় সমগ্র দেশই অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মুষ্টিমেয় কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে ঐ ভাষায় খানিক শিক্ষাচর্চা থাকলেও এবং কয়েকজন ইংরেজ শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় কলকাতার মতো কয়েকটি বড় শহরে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার কিছুটা প্রচলন হলেও বাঙলাভাষায় গ্রন্থাদি তখনো সৃষ্ট হয়নি এবং এই ভাষাশিক্ষার জন্য প্রাথমিক পুস্তকাদিও রচিত হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী' ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি রচনা করেন এবং তারপর বাংলার তদানীন্তন গভর্ণরের আনুকূল্যে গ্রামে-গ্রামান্তরে ২০টি মডেল স্কুল এবং বালিকাদের জন্যও ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২] সারা দেশের পক্ষে ঐ মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়গুলি যৎসামান্য হলেও শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

ঐকালে জয়রামবাটীর মতো ক্ষুদ্র ও প্রত্যন্ত গ্রামে সারদাদেবীর পক্ষে যে প্রথাগত শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। তবে পরবর্তী কালে তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তাঁর সহোদর ভ্রাতা প্রসন্ন ও জ্ঞাতি ভাই রামনাথের সঙ্গে কখনো কখনো তিনিও পাঠশালায় পড়তে যেতেন।[৩] সাংসারিক দারিদ্র্য ও কর্মব্যস্ততা এবং নানা সামাজিক বাধা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে বরাবর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তা শ্বশুর-গৃহের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নির্বাপিত হয়নি। কামারপুকুরে অবস্থানকালে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা কিরকম অগ্রসর হয়েছিল তা তিনি নিজেই জানিয়েছেনঃ "কামারপুকুরে লক্ষ্মী (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী) আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, 'মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে!' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারি মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আরেকখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত।" শ্রীমায়ের এই আগ্রহ পরবর্তী কালেও অটুট ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন কিছুদিন তাঁকে একা একা দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে হয়েছিল। ঐকালে সেখানে ভব মুখুজ্জেদের একটি মেয়ে মাঝে মাঝে এসে সঙ্গীহীন শ্রীমায়ের কাছে থাকত এবং রোজ তাঁকে পাঠ দিত ও নিত। তার ফলেই পাঠ করতে শেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি' গ্রন্থে আবার একটু ভিন্নপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগারো বছরের ছেলে শরৎকে বলেছিলেন লক্ষ্মীদিদি ও তাঁর 'খুড়ি'কে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দিতে এবং তা পড়ানো শেষ হলে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বুঝলেন, রামায়ণাদি ধর্মগ্রন্থ তাঁরা বেশ পড়তে পারবেন তখন আর অধিক লেখাপড়া করার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৪]

উপরি উক্ত তথ্যগুলি থেকে একথা পরিষ্কার, শ্রীমা বিদ্যাশিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাকে অনুমোদন করেছিলেন। সারদাদেবীর এই শিক্ষানুরাগ চিরদিনই অম্লান ছিল; তিনি আজীবন চেয়েছেন—এদেশের মেয়েরাও শিক্ষিতা, চিন্তাশীল, কুসংস্কারমুক্ত ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। তাঁর নানা কর্মে ও কথায় এমন প্রগতিশীল ভাবধারার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু ও মাকুকে সাধারণভাবে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং তাদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়ে শুনতেন বা তাদের সাহায্যে ভক্তদের চিঠিপত্রও লেখাতেন। তের-চোদ্দ বছর বয়সেও রাধু বিদ্যালয়ে গেলে শ্রীমায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-মা সেকালের সামাজিক চিন্তাধারা অনুযায়ী আপত্তি জানিয়েছিলেন। শুনে শ্রীমা বলেছিলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই, বরং যে-অঞ্চলে তার বিয়ে হয়েছে, সে-অঞ্চলের অশিক্ষিত মেয়েরা তার থেকে উপকৃত হবে। জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া বা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মেয়েরা শিক্ষার অভাবে পশুবৎ জীবনযাপন করছে দেখে শ্রীমা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং ব্যাকুলচিত্তে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু যোগ্য শিক্ষিকার অভাবে তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।[৫] জনৈক শিক্ষাব্রতী সন্তানকেও তিনি জয়রামবাটী অঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম শেখাবার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শ্রীমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, শিক্ষা ছাড়া নারীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা কখনোই জাগ্রত হবে না এবং তাদের পরাধীনতা ও পরনির্ভরতা ঘুচবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের যেকোন প্রচেষ্টাকেই তিনি ঐকান্তিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। স্বামীজীও চেয়েছিলেন, এদেশে নারীদের যথার্থ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রথমে সারদাদেবীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠুক। সে-কারণে তাঁরই নির্দেশে ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর যখন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার সঙ্কল্প করেন, তখন শ্রীমাকেই ঐ শিক্ষায়তনটির প্রতিষ্ঠাপূজাদি সম্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তিনি তা সানন্দচিত্তে নিষ্পন্ন করেছিলেন। পূজান্তে এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তিনি ভাবী ছাত্রীদের উদ্দেশে আশীর্বাণী প্রদান করেছিলেন ঃ "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।" নিবেদিতা শ্রীমায়ের এমন প্রাণঢালা আশীর্বাদ লাভ করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন এবং পরে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।"[৬] বিদ্যালয়টির শিক্ষাকার্য সঠিকভাবে শুরু হওয়ার পরও শ্রীমা নানাভাবে নিবেদিতা ও ছাত্রীদের উৎসাহ দান করেছেন। বিদেশিনী বলে নিবেদিতার বিদ্যালয়ে অনেক হিন্দু পিতামাতা তাদের কন্যাদের পাঠাতে চায় না বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে যথাসম্ভব নিজের কাছে টেনে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক ভক্ত নারীকেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন তাদের কন্যাদের নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পাঠানোর জন্য। শ্রীমা নিজে বহুবার এই বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন এবং মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাদি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এতে নিবেদিতা এবং অন্যান্য শিক্ষিকারা খুবই উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয়টিকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। শ্রীমা চাইতেন, মেয়েরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সূচীশিল্প, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদিও শিখুক।

গৌরীমায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ওপরও শ্রীমায়ের প্রভূত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। বলতেন, গৌরীমায়ের আশ্রমে যে সামান্যও সাহায্য করবে, তার 'কেনা বৈকুণ্ঠ'। তিনি স্বয়ং নানাভাবে গৌরীমাকে সাহায্য ও প্রেরণা দান করেছেন। আশ্রমিক পরিবেশে থেকে মেয়েরা যাতে পড়াশোনা ও অন্যান্য গৃহকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠে, সেবিষয়ে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন, এমনকি বলেছেন—মেয়েরা অবশ্যই ইংরেজি পড়বে।

বস্তুত, সারদাদেবী মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাই চাইতেন যা তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সহানুভূতিকে জাগ্রত রেখে জীবনপথে চলতে সর্বদা সাহায্য করবে। পাঠরতা মেয়েদের তিনি একবার বলেছিলেন ঃ "তোমরা যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার খবরগুলি জানা থাকা চাই। কিন্তু কারুকে কিছু বলবে না।" মেয়েদের এই যে চোখ-কান খোলা রেখে চলার উপদেশ তিনি দিয়েছেন, তা তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মনির্ভরতা অর্জন ও সার্বিক জাগরণের প্রয়োজনেই। মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা চাইলেও এবং তাদের প্রতি সমাজপতিদের অশেষ অবিচারের কথা শুনলেও অনেক আধুনিক নারীবাদীর মতো তাঁর উপদেশবাক্যে কখনো

অযথা পুরুষবিদ্বেষ বা সমাজদ্রোহের ইঙ্গিত থাকত না। ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য সমাজে শৃঙ্খলা ও সংসারে শান্তি বজায় রাখা যে একান্ত অপরিহার্য—একথা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, এই কাজে মেয়েদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি মেয়েদের অনেক সময়ই মানিয়ে চলতে বলেছেন। বলতেন: "যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মতো শ্রীমাও উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ তখনি অত্যাচার, ব্যভিচার ও অবিচার থেকে মুক্ত হতে পারবে যখন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। আপন হৃদয়ের অনুপম মাতৃভাবের প্রেরণায় তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন এবং আপামর জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করেছেন। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের মহোচ্চ আদর্শ শ্রীমা শুধু ধর্মজীবনে নয়, সমাজজীবনেও নানাভাবে রূপায়িত করেছেন।

সারদাদেবী প্রচলিত অর্থে সমাজসংস্কারক বা সমাজবিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু একজন সামান্য শিক্ষিতা গ্রাম্য নারী হয়েও জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা, বালবিধবাদের কঠোর জীবনযাপনে বাধ্য করা ইত্যাদি তদানীন্তন সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি তিনি যে উদার ও বলিষ্ঠ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই যুগান্তকারী।

জাতিভেদ প্রথাটি তৎকালীন সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল এবং কেউ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সমাজপতিদের নির্মম শাসনদণ্ড তার ওপর নেমে আসত। স্বাভাবিক কারণে গ্রামাঞ্চলেই এদের আধিপত্য ছিল বেশি, আর শ্রীমাকেও জীবনের অধিকাংশ কাল ঐ গ্রামবাংলাতেই কাটাতে হয়েছে। সেই যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ভক্তির সাহায্যেই জাতিভেদ প্রথাটি উঠে যেতে পারে, কারণ ভক্তেরা একটি স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমাও সকল ভক্ত ও আশ্রিতকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন এবং গোঁড়া গ্রামীণ সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আপন সন্তানের ন্যায় গ্রহণ করেছেন। জয়রামবাটীতে বসেই তিনি একবার এক বাগদি যুবককে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৭] আরেকবার এই গ্রামেই জগদ্ধাত্রীপূজার পর সাধু-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ নির্বিশেষে নানা জাতির ভক্তকে একই পাত্র থেকে মুড়ি ও জিলিপি প্রসাদ খেতে দিয়েছিলেন।[৮] আরেকবার কোয়ালপাড়ার এক অব্রাহ্মণ বালক ভক্তকে জগদ্ধাত্রীপূজার ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেছিলেন।[৯] শ্রীমায়ের এক পিতৃব্যের মৃত্যুর পর শবদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন শূদ্র ভক্তও ছিলেন। এব্যাপারে গোলাপ-মা অনুযোগ করলে শ্রীমা বলেছিলেন: "শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?"[১০] ভক্ত বালবিধবা ক্ষীরোদবালা রায় এবং বৈদ্য শ্যামাদাস কবিরাজ অব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাধুকে তাঁদের প্রণাম করতে বলেছেন। ক্ষীরোদবালার জাত কী ইত্যাদি সংবাদ নলিনীদিদি প্রমুখ আত্মীয়া ও সঙ্গিনীগণ মায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন: "ওসব আমি বলব না—ওরা ভক্ত, এক জাত।"[১১] ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে উঠে যাওয়ার পর জয়রামবাটীতে শ্রীমা-ই সাধারণত তাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন। তা দেখে নলিনীদিদি শিউরে উঠে বলেছিলেন: "মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।" শুনে শ্রীমা বললেন: "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?" ব্রাহ্মণ বিধবা হয়েও তিনি অব্রাহ্মণের দেওয়া বা রান্না করা অন্ন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ বিদেশিনীর সঙ্গে এক পাত্র থেকে তিনি ফল ও মিষ্টি গ্রহণ করেছেন। কায়স্থ রাজেন্দ্রলাল দে-কে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। মুসলমান মজুর আমজাদ (আর্থিক অনটনের জন্য যাকে মাঝে মাঝে চুরিডাকাতি করেও জীবিকা নির্বাহ করতে হতো) মায়ের বাড়ির দেওয়াল তৈরি করতে আসত। তার প্রতিও শ্রীমায়ের ছিল অফুরান সন্তানবাৎসল্য। নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়ে তাকে তিনি যত্ন করে খাওয়াতেন, এমনকি খাওয়ার পর ঐ স্থানটি নিজে জল দিয়ে ধুয়ে দিতেন। তাঁকে একবার এরকম করতে দেখে শুচিবায়ুগ্রস্তা নলিনীদিদি শিউরে উঠে বলেন: "ও পিসিমা, তোমার জাত গেল।" শ্রীমা সে-কথার উত্তরে শুধু বললেন: "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"[১২] আরেকবার তিনি যখন জ্বরে শয্যাগত, তখন আমজাদ এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছিল; সেসময় ঠাকুরের ভোগ দেওয়ার সময় হয়ে যাওয়াতে সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীমায়ের ঘর থেকে গঙ্গাজলপূর্ণ পঞ্চপাত্রটি নিয়ে যান এবং তা দেখেও তিনি কিছুমাত্র আপত্তি জানাননি। আরেকজন মুসলমান ভক্ত একবার কয়েকটি কলা এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য মাকে দিতে চাইলে তিনি স্বচ্ছন্দে তা নিয়েছিলেন এবং তাকে মুড়ি মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। একজন স্ত্রীভক্ত তা দেখে ঐ মুসলমানদের চৌর্যবৃত্তির কথা উল্লেখ করে আপত্তি জানালে মা তাকে বলেন: "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।"[১৩] তিনি বলতেন, দোষ মানুষের লেগেই আছে, কী করে তাদের ভাল করতে হবে সেটাই সবার চেষ্টা করা উচিত। একবার কয়েকজন ডোম শ্রীমায়ের বাড়িতে বিড়া নিয়ে এলে তিনি

একটি স্থান দেখিয়ে সেগুলি রাখতে বললেন। তারা সেই নির্দেশমতো সন্তর্পণে বিড়াগুলি রাখার পর নলিনীদিদি চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ ''ঐ ছোঁয়া গেল, ওসব ফেলে দাও।'' তারপর তাদের তিরস্কার করে বলতে লাগলেন ঃ ''তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস!'' তাদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখে শ্রীমা অভয় দিয়ে বললেন ঃ ''তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নেই।'' তিনি তাদের আবার মুড়ি খাওয়ার পয়সা দিলেন। যেকালে জাতিবিচারের বিষয়টি দেশের মানুষ খুবই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকত, সেই কালে ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা রমণী হয়েও তিনি পল্লীগ্রামে বসে অস্পৃশ্যতা বর্জন করেছেন এবং সকল জাতি ও ধর্মের মানুষকে সাদরে নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাঁকে মাশুলও দিতে হয়েছে, কারণ সমাজপতিরা তাঁর উপর রুষ্ট হয়ে তাঁকে জরিমানা করেছে; কিন্তু তাতেও তাঁকে এই উদার আচরণ থেকে নিরস্ত করা যায়নি।

সারদাদেবীর সমকালে মেয়েদের বাল্যবিবাহকে হিন্দু শাস্ত্রমতে আবশ্যিক বলে মনে করা হতো। কিন্তু শ্রীমায়ের যুক্তিনিষ্ঠ মনে এর দোষত্রুটিগুলি ধরা পড়েছিল বলে তিনি এই সামাজিক অনুশাসন নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি। আটবছর বয়স হতে না হতে গ্রামীণ মানুষেরা মেয়েদের পরগোত্র করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। তিনি এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। মাদ্রাজের দুজন কুমারী মেয়ে কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেও নিবেদিতার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে জেনে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। এক স্ত্রীভক্ত তার পাঁচটি কন্যার বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তা করছে শুনে তিনি তাকে বলেন ঃ ''বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।''[১৪] যে-যুগে এদেশের সমাজ মনে করত যে, দশ-বারো বছরের মধ্যে বিয়ে না হলে মেয়ে 'অরক্ষণীয়া' হয়ে যায়, সেই কালেই শ্রীমা এমন বিপ্লবাত্মক কথা বলেছেন। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, গৌরীমা, সুধীরাদেবী প্রমুখ নারীগণ সংসারে লিপ্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে নারীশিক্ষায় ব্রতী হয়েছেন দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁদের সেই কাজে যথাসম্ভব সহায়তা করতেন। কোন মেয়ে বিবাহে অসম্মত হলে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই ছিলেন না। তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের শাস্ত্রপাঠে, পূজার্চনায়, ব্রহ্মচর্যে ও সন্ন্যাসে অধিকার স্বীকার করতেন। সুধীরাদেবী বয়স্কা ব্রহ্মচারিণীদের জন্য নিবেদিতা স্কুলের অঙ্গ হিসাবে যে আশ্রমবিভাগ বা মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা শ্রীমায়ের আনুকূল্যলাভ করে দুরূহ সামাজিক বাধা পেরিয়ে স্থায়িত্বলাভ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা ও শ্রীমায়ের স্নেহাশ্রিতা গৌরীমা সন্ন্যাসিনীর জীবনই যাপন করতেন।

বাল্যবিবাহের আরেকটি বড় কুফল যে মেয়েদের বহু সন্তানের জননী হওয়ার বিড়ম্বনা—একথা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। এর ফলে তাদের শরীর, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, আত্মিক বিকাশ—সবকিছুই ব্যাহত হয়। তাই বিবাহিত জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মতোই জোর দিতেন এবং অসংযমী পিতামাতা সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলতেন ঃ ''একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু!''

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমাও মনে করতেন, লজ্জা ও নম্রতা নারীর ভূষণ। তিনি নিজ জীবনে তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনে তিনিই আবার অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে কঠোর হয়েছেন, অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাগবাজারে তিনি তাঁর বাড়ির বারান্দায় জপে বসেছেন, এমন সময় সামনের বস্তিতে একটি মজুর শ্রেণির লোক তার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করতে লাগল। তার ফলে কোলের শিশুটিকে নিয়ে সে উঠানে পড়ে গেল, কিন্তু তারপরেও লোকটি বউটিকে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগল। সে-দৃশ্য দেখে শ্রীমা স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর অবগুণ্ঠন খসে পড়ল, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ ''বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?'' অমনি দেখা গেল লোকটি মাথা নিচু করে বউটিকে ছেড়ে দিল এবং খানিক পরে তাকে সাধাসাধি করতে লাগল।[১৫]

শ্রীমা প্রয়োজনে যে কতদূর কঠোর হতে পারতেন তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে পাগল হরিশকে শায়েস্তা করার ঘটনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি তখন কিছুকাল কামারপুকুরে অবস্থান করছিলেন। সেসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরনো ভক্ত হরিশের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল। সে-অবস্থাতেই তিনি কামারপুকুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। একদিন শ্রীমা পাশের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন, এমন সময় তাঁকে একা পেয়ে খেপা হরিশ তাঁর পিছু ধাওয়া করতে থাকে। শ্রীমা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে প্রথমে ধানের গোলার চারদিকে ছুটতে লাগলেন, শেষে উপায়ান্তর না দেখে তিনি তার বুকে হাঁটু দিয়ে বসে তার জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলেন যে, সে 'হেঁ হেঁ' করে হাঁপাতে লাগল।[১৬]

কখনো কখনো তিনি ভক্তনারীদেরও সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার পরামর্শ দিয়েছেন। বালবিধবা ক্ষীরোদবালা একবার কালীপূজার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে বাগবাজারের বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু সেদিন খুব ভিড় থাকাতে শ্রীমা তাঁকে সুধীরাদেবীর সঙ্গে দেখা করে গৌরীমার কাছে যেতে বলেন এবং তারপর নিজগৃহে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে কিছুটা বিস্মিত হয়ে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ "গাড়ি করে যাব, না পায়ে হেঁটে যাব? সঙ্গে কেউ যাবে কী, না আমি একাই যাব?" উত্তরে শ্রীমা বললেন ঃ "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে? যাও—এস গে।"[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধবা বধূ ক্ষীরোদবালা তখন প্রৌঢ়া নন। নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের এমন আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছা আমরা তাঁর সারাজীবনে বহুবার লক্ষ্য করি। [ক্রমশ]

আকরগ্রন্থ

১ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৯৯

২ ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৫৪৮

৩ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯, পৃঃ ১৮

৪ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬-২৭

৫ ঐ, পৃঃ ৩৬২

৬ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩৫

৭ মাতৃসান্নিধ্যে —স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮১, পৃঃ ১৪৭-১৪৮

৮ ঐ, পৃঃ ৩৮

৯ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩৯৬, পৃঃ ২১৮

১০ ঐ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬০

১১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৮ম সং, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৩৫৭

১২ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৯৮৯, পৃঃ ২৮৮-২৮৯

১৩ ঐ, পৃঃ ২৮৮

১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১১

১৫ ঐ, পৃঃ ৩১

১৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১২৩-১২৪

১৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮

শব্দচেতনা 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে নির্মিত

■	১		২	■	■	৩		৪	■
৫		■	৬				■	৭	৮
	■	■	■	■	■	■	■	■	
৯	১০	■	১১			১২	■	১৩	
■		■		■	■		■		■
■		■		■	■		■		■
১৪		■	১৫				■	১৬	১৭
	■	■	■	■	■	■	■	■	
১৮	১৯	■	২০			২১	■	২২	
■	২৩			■	■	২৪			■

পাশাপাশি ঃ (১) ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, —— বেড়ি কিসে কাটি। (৩) খুব রোখ চাই, তবে —— হয়। (৫) —— থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। (৬) —— জল, আর মনটি যেন দুধ। (৭) যত লোক স্ত্রীলোকের ——। (৯) মণি মন্দির মেজে —— অক্ষ দুটি করে কুঁচি। (১১) নিতাই কোনরকমে —— করিয়ে নিতেন। (১৩) রাম বললেন, নারদ! আর কিছু —— লও। (১৪) ভাবছ কি মন একলা বসে, অনুরাগ বিনে কি চাঁদ —— মিলে। (১৫) সুরেন্দ্র অনেকটা —— বলে বোধ হয়। (১৬) আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য-জগৎ। তাই বাল্মিকী —— মন্ত্র জপ করেছিলেন। (১৮) হৃদে একদিন বললে ——র কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। (২০) যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য সেই ——। (২২) একচক্ষু কানা ভাল তো ট্যারা ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও —— হয়। (২৩) পাশ করলে কি হয়, ——টার মাদীভাব, কথা কইতে পারে না। (২৪) —— —, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না।

ওপর-নিচ ঃ (১) —— আবরণস্বরূপ। (২) যশ অপযশ কুরস সুরস সকল —— তোমারি। (৩) হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর, এই গীতার ——কথা। (৪) ——রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত। (৫) —— পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম। (৮) ঈশ্বরদর্শন হলে —— ত্যাগ করা যায়। (১০) নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার ——। (১১) —— -এর এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (১২) —— বুদ্ধি ভাল নয়। (১৩) সাদাচোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে... ——কেও যেন দেখেছিলাম। (১৪) —— -র গান শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইত। ঠাকুর তাঁহাকে মহা তপস্বিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। (১৭) —— -এর দোষ ধরতে নাই; গলা টিপলে দুধ বেরোয়! (১৯) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে বললে, —— এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। (২০) ছোট ছেলে —— কত ঐশ্বর্য তা জানে না। (২১) বাল্যকাল হইতেই —— ভূষণ ধর্মভাবাপন্ন এবং মেধাবী। (২২) —— হলে হাত ভারী হয়।

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গুণাতীত স্থপতি স্বামী সারদানন্দ

হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেন সূর্য। তাঁকে ঘিরে বিশাল এক সৌরমণ্ডল। সেই পরিমণ্ডলে বহু জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়। স্বামী সারদানন্দ তাঁদের অন্যতম। ১২৭২ বঙ্গাব্দের ৯ পৌষ, (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর) শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। শৈশবে তিনি ছিলেন শান্ত, সৌম্য, ধর্মপ্রাণ। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁর যথারীতি উপনয়ন হয়। তিনি নিয়মিত পূজা, পাঠ ও জপ-ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্ত প্রহ্লাদের বাণীই যেন তাঁর জীবনে প্রতিফলিত—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥"

(৭।৬।১)

পাঠশালায় অধ্যয়নকালে দরিদ্র সতীর্থদের দুঃখে শরৎচন্দ্র দ্রবীভূত হতেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের সমবেত চেষ্টায় সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা, আর্তের সেবা ও শরীরচর্চার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়। তিনি তাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। উক্ত সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মর্ত্যের তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর প্রথম আগমন ঘটে। সেখানে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান।

চুম্বকের আকর্ষণের মতোই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে এসে উপস্থিত হন শরৎচন্দ্র। ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের অমৃততত্ত্ব শ্রবণে তিনি পরিতৃপ্তির পয়োধারায় অভিষিক্ত হন। অতীন্দ্রিয়ের সম্রাট ঠাকুরের মধুর সঙ্গলাভের জন্য তাঁর নিকট প্রায়দিনই শরৎচন্দ্র চলে আসতেন। কোন কোন দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি অতিবাহিতও করতেন। ক্রমে তিনি সংসার-আসক্তিহীন ঠাকুরের চরণে সমর্পিত-প্রাণ হয়ে পড়েন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

(৫।১০)

গহন রাতে ঠাকুর তাঁকে জাগিয়ে পঞ্চবটী, বেলতলা কিংবা ভবতারিণীর নাটমন্দিরে জপ-ধ্যানের নিমিত্ত পাঠাতে থাকেন। এইভাবে ভগবান ভক্তটিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলেন। বিরাট বনস্পতির ছায়ায় থেকে শরৎচন্দ্র আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

ঠাকুর একদিন পার্ষদ-পরিবৃত হয়ে নানা তত্ত্বকথার সঙ্গে গণেশের চরিত্রও আলোচনা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র বললেনঃ "আমি গণেশের চরিত্র পছন্দ করি, তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।" ঠাকুর প্রত্যুত্তরে বলেনঃ "না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, তোমার আদর্শ শিব। শিবের গুণরাজি তোমাতে বিদ্যমান। নিজেকে সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধুক্ষরা বাণীতে শরৎচন্দ্রের আত্মজাগৃতি ঘটে। তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে অপূর্ব তিতিক্ষা ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি দেবাদিদেবের আদর্শ পরিস্ফুট হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ঠাকুর কল্পতরুরূপে অনেকের অভীষ্ট পূরণ করেন। এইরকমই আরেকদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে ডেকে বলেনঃ "কিরে, তুই যে কিছু চাইলি না?" তিনি নতমস্তকে বলেনঃ "কি আর চাইব? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই করে দিন।" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেনঃ "ও যে শেষকালের কথা রে!"



'মায়ের বাড়ি'তে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বাসকক্ষ

তখন শরৎচন্দ্র বলেনঃ "তা আমি জানি না, মশায়।" ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেনঃ "তা তোর হবে।" পরবর্তী কালে এই ঘটনা বিবৃত করে তিনি বলেনঃ "তিনি [ঠাকুর] যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।"

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগসূত্র ঠাকুরের মাধ্যমেই। উভয়ে ক্রমে অচ্ছিন্নবন্ধনে আবদ্ধ হন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা যুবক শরৎচন্দ্রের ক্রোড়ে উপবেশন করেন। ভক্তেরা এর কারণ জানার জন্য কৌতূহলী হলে অন্তর্যামী ভগবান স্মিত হেসে বলেন ঃ "দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।" পরবর্তী কালে সুবিশাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদকরূপে এবং শ্রীশ্রীমায়ের 'ভারী'রূপে যখন তিনি অবতীর্ণ হন, তখনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঐকথার সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধ হয়।

ঠাকুর অসুস্থতার দরুন যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর সেবাযত্নে ব্রতী হন শরৎচন্দ্র। কিন্তু চিকিৎসা, সেবাযত্ন সবই ব্যর্থ করে মহাসূর্য অস্তমিত হন। ছন্নছাড়া জীবন তখন সন্তানদের। ঠিকমতো আহার জোটে না। পরিধেয় বস্ত্রের অভাব। এই অবস্থায় স্থাপিত হয় বরানগর মঠ। সেখানে শরৎচন্দ্র অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনায় ব্রতী হন। শ্রান্ত জীবনের ক্লান্তিতে ক্ষয়ে না পড়ে চলে তীর্থ পরিব্রাজন। তারপর স্বামীজীর আহ্বানে ঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য স্বামী সারদানন্দের পাশ্চাত্যে পদসঞ্চার হয়। সেখানে স্বামীজী তাঁকে সুবক্তারূপে গড়ে তোলেন।

এরপর স্বামী সারদানন্দের স্বদেশে প্রত্যাগমন হয়। রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হলে স্বামীজী তাঁকে সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন। অনলস পরিশ্রমে সে-দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়। তখন তাঁর জীবনে দেখা যায় ঋষি অরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যের বাণী—

"Who ever is too great must lonely live
Adored, he walks in mighty solitude
Vain in his labour to create his kins
His only Comrade is the strength with in."

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকা যাত্রা করলে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশে দারুণ অসুবিধা দেখা দেয়। তখন কম্বুলিয়াটোলায় গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাড়িতে 'উদ্বোধন' প্রকাশ হচ্ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হলে উদ্বোধন কার্যালয় ৩০নং বোসপাড়া লেনে উঠে আসে। কিন্তু দুবছর পর গৃহের মালিক সে-স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন।

সারদানন্দজী মহাবিপদে পড়েন। তবু ভাবনার ভবনে প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকেন তিনি। উদ্বোধনের জন্য একটি স্থায়ী ভবনের কথা তিনি চিন্তা করতে থাকেন। সেসময় সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবী জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এলে তাঁর থাকার সমস্যা হতো। সেই দুর্দিনে মহানুভব কেদারচন্দ্র বা 'খোড়ো কেদার' গোপাল নিয়োগী লেনে এক খণ্ড জমি দান করেন। তখন আনন্দের আপ্লবে তাঁর মনের সব চিন্তা অপসৃত হয়।

স্বামী সারদানন্দ অসীম ধৈর্য ও অটল সঙ্কল্প নিয়ে গৃহনির্মাণে প্রয়াসী হন। স্বামীজীর গ্রন্থ বিক্রয়ের দরুন ২৭০০ টাকা তাঁর হাতে আসে। তাকেই মূলধন করে 'মায়ের বাড়ি'র নির্মাণ চলতে থাকে। সামান্য অর্থে কতদিন চলে? সারদানন্দজী নিজ দায়িত্বে ঋণ নেন। ধীরে ধীরে 'মায়ের বাড়ি' গড়ে ওঠে। তারপর জয়রামবাটী থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে শ্রীমা উদ্বোধনে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আসেন এবং শরৎ মহারাজ 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করতে থাকেন।

শুধু 'উদ্বোধন' ভবন নির্মাণই নয়, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। সেসময় জয়রাম-বাটীতে বহু ভক্ত যাতায়াত করতেন। তাঁদের থাকার নানা অসুবিধা হতো। সেখানেও মায়ের মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন সারদানন্দজী।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করেন। শরৎ মহারাজের সামনে তখন মহাসমস্যা। কিন্তু জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। মা মর্ত্যের মায়া ত্যাগ করে অন্তর্হিত হয়েছেন, ব্রহ্মানন্দ মহারাজও দেহ রেখেছেন। কোন কাজে উৎসাহ পান না তিনি। কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সারদানন্দজী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল 'মাতৃমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন।

"কীর্তির্যস্য স জীবতি।" 'উদ্বোধন' ভবন নির্মাণ তাঁর অমর কীর্তি । জীবনে অসীম কার্য তাঁর। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান স্থপতি। এত কর্মের দরুন তাঁর কোন গর্ব বা অহঙ্কার ছিল না। গীতার ভাষায় তিনি গুণাতীত পুরুষ—

"উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥"

(১৪।২৩) ❑

তথ্য সংগ্রহ

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
৩ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত

ভিটামিন 'এ' ও তার প্রয়োজনীয়তা

চৈতালি মুখোপাধ্যায়

ভারতের জনগণের প্রধান অপুষ্টির কারণ তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার মধ্যে প্রধানত ৫টি উপাদানের অভাব—ক্যালরি, প্রোটিন, ভিটামিন 'এ', আয়রন এবং আয়োডিন। আমরা এপর্যায়ে মূলত ভিটামিন 'এ' নিয়ে আলোচনা করব।

১৯৭০ সালে শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ'-র অপুষ্টিজনিত কারণে ভারত সরকার 'National blindness Control Programme' চালু করেন অন্যান্য 'National Health Programme'-এর পাশাপাশি। অতীব দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় যে, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতে বহু শিশু প্রতি বছর ভিটামিন 'এ'র অপুষ্টিজনিত কারণে রাতকানা এবং কেরাটো ম্যালেশিয়া (Karatomalesia) জনিত কর্ণিয়াল ওপাসিটির (Corneal opacity) কারণে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়। অথচ আমাদের দেশে প্রচুর সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের শাকসবজি ও ফল রয়েছে, যেগুলি 'ক্যারোটিন' নামক রঞ্জক পদার্থে সমৃদ্ধ। ক্যারোটিন পিগমেন্ট হলো ভিটামিন 'এ' তৈরির উপাদান (Precursor)। আবার এই ভিটামিন প্রাণিদেহে (প্রাণিজ খাদ্যে) ভিটামিন 'এ' হিসাবেই পাওয়া যায়, যা প্রাণিরা নিজেদের দেহে তৈরি করে সবুজ শাকপাতা খেয়ে।

প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে মেটে (যকৃৎ), বৃক্ক, মুড়ো, ডিম ও মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। যেমন ভেটকি, রুই, মৃগেল, ইলিশ, ছোট চারামাছ প্রভৃতির মেটে ও তেলে কড লিভার অয়েলের সমপরিমাণ ও কিছু ক্ষেত্রে বেশি ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। কিন্তু পেশির মাংসে ভিটামিন 'এ' উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে না। এছাড়া প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ চর্বি ও তেলে ভিটামিন 'এ' থাকে।

সমস্ত রকমের ফল ও শাকসবজিতে কমবেশি পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। গাজর, সিম, বাঁধাকপি, পাকা কুমড়ো, পাকা টমেটো, টাটকা পাকা ফল, টাটকা কাঁচা লঙ্কাতেও ভিটামিন 'এ' থাকে। তবে বাসি তরিতরকারিতে ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি' দুটোই নষ্ট হয়ে যায়। মোটকথা, সমস্ত রঙিন সবজি ও ফল বিশেষত কমলা ও হলুদ রঙের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। তবে এখন দুধ হোমোজেনাইজড (homogenised) করা হয় বলে এই দুধে ভিটামিন 'এ' অনেকটাই কমে যায়। মাতৃদুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে, যদি মায়ের পুষ্টি ঠিক থাকে। মা ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য খেলে তবেই মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন 'এ'-র পরিমাণ বাড়বে।

মায়েদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনবছরের কমবয়সী শিশুরা শাকসবজি হজম করতে পারে না। এই অজ্ঞতাবশত তারা শিশুদের শাকসবজি খাওয়ান না। ফলে এইসব শিশুরাই প্রধানত রাতকানা ও কেরাটোম্যালেশিয়ার শিকার হয়। অনেক ধনী বা শিক্ষিত পরিবারেও এই দৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু সেসব শিশু কিছুটা করে দুধ, মাখন বা ঘি, ফল বা ফলের রস খায়। ফলে তাদের ঘাটতি পূরণ হয়। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা শিশুকে চারমাস বয়স থেকেই সিদ্ধ শাকসবজি ও স্থানীয় মরশুমি ফল চটকে খাওয়াতে পরামর্শ দেন।

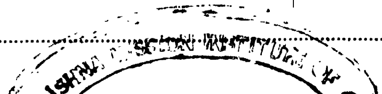
রাতকানা রোগটি কখন হয়

নয়মাস থেকে তিনবছর বয়সের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কারণ, শিশুরা মাতৃদুগ্ধ তখন প্রায় পায় না এবং বাড়িতেও শাকসবজি খাওয়ানো হয় না। তিনবছরের পরে যখন শিশুকে শাকসবজি দেওয়া হয়, তখন সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয় যদি না ইতিমধ্যে চোখের অন্য কোন সমস্যা এসে গিয়ে থাকে।

প্রতিরোধমূলক কার্যপ্রণালী

কাজ করতে হবে দুভাবে—(১) দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী (Long Term programme) এবং (২) স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচী (Short Term Programme)

● **(১) দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী ঃ** প্রথমত মাকে সচেতন হতে হবে। চারমাসের শিশু শাকসবজি হজম করতে সক্ষম—এটা খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। বাড়িতে রান্না করার আগে শাকসবজি পরিষ্কার জলে ভাল করে ধুয়ে যতটা সম্ভব কম মশলা দিয়ে রেঁধে ভাত ও রুটির সঙ্গে চটকে খাওয়াতে হবে। 'বি' ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ খাবার অর্থাৎ সবুজ, হলদে ও কমলা রঙের ফল ও সবজি যেমন পাকা পেঁপে, পাকা আম, গাজর সিদ্ধ, কমলালেবুর রস ইত্যাদি খাদ্যতালিকায় যুক্ত করতে হবে এবং মাতৃদুগ্ধ পান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাত, ডাল বা রুটির সঙ্গে চটকে খাওয়াতে হবে। গর্ভবতী মা এবং প্রসূতি মাকেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ'-যুক্ত খাদ্য খেতে হবে। শিশুকে ছয়মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো বাধ্যতামূলক—



এব্যাপারে মাকে সচেতন হতে হবে এবং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে যতদিন সম্ভব মাতৃদুগ্ধও চলবে—অন্ততপক্ষে দেড় থেকে দুবছর পর্যন্ত।

এগুলিই হচ্ছে সমস্যার স্থায়ী সমাধান। কিন্তু এগুলি সময়সাপেক্ষ, রাতারাতি সম্ভব নয়। তাই যেমন এগুলিও চালিয়ে যেতে হবে, তেমনি ভারত সরকার নির্দেশিত স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচীও এর সঙ্গে চালাতে হবে।

● **(২) স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচী** (Short Term programme) অর্থাৎ 'National Blindness Control programme'-এর অন্তর্গত ভিটামিন 'এ' 'Prophylaxis Programme'-এর সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তা হলো হামের (measles) টিকার দিন থেকে শুরু করে তিনবছর পর্যন্ত ছয়মাস অন্তর ১ ডোজ ভিটামিন 'এ' অয়েল খাওয়াতে হবে।

নয়মাসে হামের টিকার সঙ্গে অর্ধেক ডোজ (১ লাখ ইউনিট) দিতে হবে। কারণ, শিশুদের পুরো ডোজ দিলে তাদের মাথার 'Carneal Pressure' বেড়ে যায় এবং তালুটা ফুলে ওঠে। তখন মাথাব্যথা হওয়ায় তারা কাঁদে ও বমি করতে থাকে। এতে পরিবারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এরপর ছয়মাস অন্তর (পরেরটা দেড়বছরে) পোলিও ও D.T.-র সঙ্গে পুরো ডোজ (২ লাখ ইউনিট) দিতে হবে।

ভিটামিন 'এ'-র কাজ

ভিটামিন 'এ' চোখে 'Rhodopsin' তৈরি করে, যা অল্প আলোয় দেখার জন্য প্রয়োজন। রাত্রে দেখাটা পুরোপুরি নির্ভর করে ভিটামিন 'এ'-র ওপর। তাই এর অল্প অভাবেই রাত্রে দৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়। দিনের বেলায় যদিও স্বাভাবিক দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসবে, বেশি অভাবে চোখে ব্যথা হবে, মাথা ধরবে ইত্যাদি।

আমাদের চোখে যে 'ভিসুয়াল পার্পল' আছে, তাতে ভিটামিন 'এ' থাকে। চোখে আলো পড়লেই এই ভিসুয়াল পার্পল ভেঙে নার্ভে স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্ককে বলে দেয় চোখ কি দেখছে। এভাবে ভিসুয়াল পার্পল বারবার ভাঙছে ও সঙ্গে সঙ্গে পূরণও হচ্ছে, তাই আমাদের যতক্ষণ দেখার কাজ চলে, ততক্ষণ ভিটামিন 'এ'-র প্রয়োজন হয়।

জোরালো আলোতে চোখের ভিটামিন 'এ' খুব বেশি নষ্ট হয়। আবার অল্প আলোতেও এর খরচ হয় খুব বেশি।

ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত রোগ

(১) ভিটামিন 'এ'-র অভাবে চোখে বিটট্স স্পট ও 'জেরফথ্যালমিয়া' হয়, যার ফলে পরে 'কেরাটো মালেশিয়া' এবং চোখের মণিতে ঘা (Corneal ulcer) হয়। এই অবস্থায় বেশিদিন থাকলে 'কর্ণিয়াল ওপাসিটি' হয়ে চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

(২) এপিথেলিয়াল সেলের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভিটামিন 'এ'র প্রয়োজন, তাই এর অভাবে চামড়ার ক্ষতি প্রথমেই ধরা পড়ে। যেমন—চামড়ার ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতা নষ্ট হয়, চামড়া খসখসে হয়ে 'পদ্মকাঁটা'র সৃষ্টি করে (follicular karatitis)। এর জন্য চামড়ার তলার স্তরের কোষ মরে যায় ও চামড়ার ঠিক নিচেই তেলভরা থলির লোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে তেল বের হতে পারে না বলে চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়, সারা গায়ে চুলকানি হয়। এটা প্রথমে লক্ষ্য করা যায় কনুই, হাঁটু ইত্যাদি জায়গায়। এরপরও যদি ভিটামিন 'এ'র অভাব চলতে থাকে, তাহলে চামড়ায় ফুসকুড়ি, ফোড়া ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

(৩) ভিটামিন 'এ' 'anti-infective' গুণসম্পন্ন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব শিশুরা ভিটামিন 'এ'-যুক্ত খাদ্য খায় বা ঠিকমত ভিটামিন 'এ'-র ডোজ নিয়েছে, তাদের মধ্যে সংক্রামক রোগের (যেমন ডায়রিয়া, সর্দিকাশি, চুলকানি ইত্যাদির) প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

আমাদের নাক, গলা ও সাইনাসের ভিতরদিকে ঝিল্লির মতো আবরণ থাকে। খাবারে ভিটামিন 'এ' ঠিকমত থাকলে ঐ ঝিল্লিগুলি থেকে একজাতীয় তরল পদার্থ বা শ্লেষ্মা ক্রমাগত বের হতে থাকে। এতে কোষের ওপর একটি আবরণ পড়ে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে না। এভাবে সারা দিন ও রাত লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে আর ঐ শ্লেষ্মার আবরণে বাধা পেয়ে মরে যাচ্ছে। এভাবে অনেক সংক্রামক ব্যাধি থেকে দেহ রক্ষা পাচ্ছে। তাই ভিটামিন 'এ'র অভাবে মানবদেহে সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(৪) ভিটামিন 'এ'র অভাবে চুল রুক্ষ হয়, মাথায় খুসকি জমে ও চুলের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়।

(৫) ভিটামিন 'এ' শিশুর দেহবৃদ্ধির একটি উপাদান।

(৬) এছাড়া ভিটামিন 'এ' দাঁতের এনামেলের বৃদ্ধি করে, খাবারের ইচ্ছা বজায় রাখে, পরিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

প্রতিদিনের চাহিদা

পূর্ণবয়স্কদের প্রতিদিন ভিটামিন 'এ'র প্রয়োজন 4000 IU বা 750 mcg। কিন্তু শরীরে ভিটামিন 'ই'র পরিমাণ যদি যথেষ্ট না থাকে, তবে ভিটামিন 'এ' রক্তে পৌঁছেও নষ্ট হয়ে যায়। এমনিতে ভিটামিন 'এ' তেলে দ্রবীভূত হয়

(oil soluble) ও লিভারে জমা থাকে, কিন্তু শরীরে 'বি' ভিটামিন 'কোলিন'-এর পরিমাণ কম থাকলে ভিটামিন 'এ' সংরক্ষণ করা যায় না। আবার ভিটামিন 'ই' যথেষ্ট না থাকলে বা কিছু জমা থাকলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

এছাড়া ক্যারোটিন বা ভিটামিন 'এ' প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্রের পিত্তরসের সঙ্গে মেশে, কিন্তু খাদ্যে স্নেহপদার্থের পরিমাণ কম থাকলে অন্ত্রে খুব কম পরিমাণেই পিত্তরস পৌঁছায় অথবা মোটেই পৌঁছায় না এবং শতকরা ৯০ ভাগ ভিটামিন 'এ' আর ক্যারোটিন নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া যতখানি ক্যারোটিন পৌঁছায়, তার সবটাই ভিটামিন 'এ'-তে পরিণতও হয় না। ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ শাকসবজি ভাল করে ধুয়ে কেটে রান্না করে এবং ভালভাবে চিবিয়ে খেলে তবেই সেলুলোজ ভাঙে ও কোষপ্রাচীর ভেদ করে ক্যারোটিন বের হয়। সেলুলোজ দিয়ে তৈরি কোষপ্রাচীর ভাঙা বেশ শক্ত। সবজি ভাল করে সেদ্ধ হলে যত নরম হবে তত বেশি ক্যারোটিন রক্তে প্রবেশ করবে। ফলের রস খেলে সবচেয়ে বেশি ক্যারোটিন পাওয়া যায়, তবে তা খেতে হবে রস তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে; না হলে বাতাসের অক্সিজেনের প্রভাবে ভিটামিন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

Hyperoitaminasis of vit 'A' আমাদের দেশে সাধারণত হয় না, কারণ আমাদের খাদ্যতালিকা এমন যে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' আমাদের খাওয়া হয় না। খাদ্যতালিকায় ভিটামিন 'এ' কম থাকতে পারে, কিন্তু বেশি থাকে না। তবে vit 'A' tab খেলে তাতে হতে পারে। এতে একই রোগলক্ষণগুলি দেখা যায়—চোখে ঝাপসা দেখা, চুলকানি, শরীরে অস্বস্তি, চুল ওঠা ইত্যাদি; তবে vit 'A' tab খাওয়া বন্ধ করে দিলে আস্তে আস্তে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। ❑

তথ্যসূত্র

(১) Text Book of Preventive Social Medicine—Park

(২) সুখমনে সুখাহার—ডঃ রমেন মজুমদার।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

অবশেষে ঈশ্বরের অপার করুণা ও অমোঘ ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা একটি 'জাতীয় স্মারক' হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করল এবং রামকৃষ্ণ মিশন তার দেখভালের দায়িত্বগ্রহণ করলেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরই এই বাড়ি মিশন কর্তৃক অধিগ্রহণের কথা উঠেছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই প্রস্তাব কলকাতায় বেশ সাড়া ফেলেছিল এবং ক্রমে সেই ভাবনাচিন্তা একটি ঋদ্ধরূপ পরিগ্রহ করল। স্বামীজীর জ্ঞাতিরা সেই পুরনো বাড়িতে ছোট ছোট প্লট করে ভাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেরাও কেউ কেউ বসবাস করছিলেন। সুতরাং সম্পত্তি মিশনকে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় হাইকোর্টে বেশ কিছু মামলা দায়ের করা হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ মামলার রায় বেরনোর পর যাবতীয় আর্থিক চুক্তি রক্ষা করে সম্পূর্ণ জায়গা ও সেই পুরনো বাড়ি মিশনের দ্বারা অধিগৃহীত হলো। মোট ৩০ কাঠা জায়গার ওপর অবস্থিত পুরনো বাড়িটির মূল চেহারা কেমন ছিল তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল। বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর তাঁর জ্ঞাতিগণ ১৮৮৫ সালে হাইকোর্টে একটি পার্টিশন মামলা করেছিলেন। সেই দলিলে বাড়ির যে প্ল্যান ছিল তা পেলে ভাল হতো। বিকল্প হিসাবে স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থে বাড়ির যে প্ল্যান পাওয়া গেল, সেটি ঐ মূল প্ল্যানেরই অনুরূপ ধরে নিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হলো। অতঃপর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া এবং ডেভেলপমেন্ট কন্‌সালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ-এর ইঞ্জিনীয়ার, কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিশোকানন্দকে নিয়ে একটি দল মূল প্ল্যানমাফিক বর্তমান বাড়িটিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করল। প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য ইঁটকে ব্যবহার করা হবে, প্রত্যেক মূল দেওয়াল সংরক্ষিত থাকবে—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করে যেসব রান্নাঘর, শৌচালয়, বারান্দা ইত্যাদি নতুন করে লোকেরা বানিয়েছিল, সেসব ভেঙে ফেলার পর দেখা গেল মহেন্দ্রনাথ দত্তের দেওয়া প্ল্যানের সঙ্গে সবটা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

যেসব ইঁট ভেঙে গিয়েছিল, তার পরিবর্তে একই মাপের ইঁট বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মাণ করে এবং দেওয়াল ইত্যাদিকে হাইড্রোলিক যন্ত্রের সাহায্যে সোজা করে কাজ শুরু হলো। নির্মাণকাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো লার্সেন ও টুব্রো কোম্পানিকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য করেছে। এখন স্বামীজীর বাড়ির ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে সেই ঠাকুরদালান, সেই ঘর, সেই অলিন্দ, সেই চৌকাঠ, সেই কুলুঙ্গি আবার ফিরে এসেছে। যে-ঘরে স্বামীজীর আবির্ভাব হয়েছিল, সেই পুণ্য স্থানটিকে চিহ্নিত করার জন্যই শুধু একটি মন্দিরের মতো চূড়া নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া স্বামীজীর বাড়িতে নতুন কোন নির্মাণ করা হয়নি।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যে-ভাবান্দোলনের সূচনা করেছিলেন সূক্ষ্মরূপে, পরবর্তী কালে সেটাই সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। এই প্রচার ও প্রসারের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে পুণ্য গৃহে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটিই ছিল আধুনিক ভারতের নবজাগরণ মন্ত্রের উৎসস্থল। এই বাড়িকে অবলম্বন করে যে নতুন উদ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন প্রধাবিত হতে চলেছে সেটিই আমাদের বর্তমান প্রচ্ছদ-পরিকল্পনার বিষয়বস্তু।

প্রচ্ছদে স্বামীজীর বাড়ির ভিতরের চকমিলানো উঠান ও ঠাকুরদালানের অংশ দেখা যাচ্ছে।

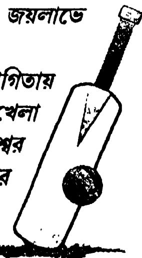
সবুজ পাতা

স্বামীজীর খেলাধূলা





স্বামীজী কি ফুটবল খেলেছিলেন? উল্লেখ নেই কোথাও। কিন্তু ফুটবল খেলেননি, তা-ও বলা যাচ্ছে না। কারণ, তাঁর দুঃসাহসিক মন্তব্য আমাদের মনে আছে—"গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হবে।" অর্থাৎ হাড়গিলে রোগা সরু দড়ির মতো কিংবা কুমড়োর মতো দুর্বল ও স্ফীত শরীর নিয়ে কোন কাজ হয় না—ত্যাগও হয় না, ভোগও হয় না। তাই গীতার অর্থ বুঝতে গেলে সমর্থ, শক্তিশালী, জয়লাভে পটু শরীর ও মন চাই।



স্বামীজী যে ক্রিকেট খেলেছিলেন তার প্রমাণ অবশ্য আছে। একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও ক্রিকেট খেলেছিলেন। তবে বিবেকানন্দের ক্রিকেট খেলা পেশাদারি ছিল না নিশ্চয়ই। তখন 'ব্যাটবল' না বলে বলা হতো 'ব্যাটম্বল'। বীরেশ্বর (বিলে)-এর এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। পাড়ার অনেক ছেলে তাঁর বাড়ির বাইরের উঠানে জড়ো হতো এবং বিকালে 'ব্যাটম্বল' খেলা চলত। এই খেলায় বীরেশ্বরই নেতার আসন দখল করত। শোনা যায় স্বামীজী নাকি কলকাতার টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলতেন।



ছবি ঃ অনুস্মিতা মণ্ডল

দ্বিতীয় শ্রেণি

এম ডি. বি. ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

মর্কট বৈরাগ্য

সে এক মানুষ, নানান জ্বালায় জ্বলছিল সংসারে
ভাবে, জ্বালা থেকে কেমন করে বা রেহাই সে পেতে পারে।
মা ষষ্ঠীর কৃপায় মিলেছে ছেলেমেয়ে মোট দশ,
তারাও মানে না বাপের শাসন, কেউ নয় তার বশ।
আজ এটা চাই, কাল ওটা নাই—নানা তাগিদের জ্বালা,
আহা, বেচারার সেইসব শুনে কান হলো ঝালাপালা।
আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সে ঠিক করে অবশেষে,
সংসার ছেড়ে যাবে কাশীধামে—বিশ্বনাথের দেশে।
করল জোগাড় গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া চাদরখানি,
পড়ল বেরিয়ে টানতে না পেরে পোড়া সংসার-ঘানি।
সবাই ভাবল, গত জন্মের বহু পুণ্যের ফলে
সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে সেই মানুষটা গেল চলে।

এরপর কেটে যায় বহুদিন, নাই কোন যোগাযোগ,
সংসারে তার পরিজনদের বেড়ে চলে দুর্ভোগ।

আরো কিছুদিন পরে
কাশীধাম থেকে সেই মানুষটি খবর পাঠাল ঘরে ঃ
'কুশলেই আছি, শুনিতে পাইবে সকলই বাড়িতে গেলে,
এখানে একটি কাজ পাইয়াছি, ভালই বেতন মেলে।'

ঠাকুর বলেন, এসব জীবের সংসারেই অনুরাগ গো,
একে কি বলে তা জান? একে বলে—মর্কট বৈরাগ্য।

ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

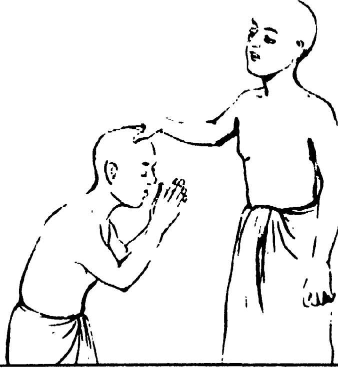


আদি শঙ্করাচার্য ২৮

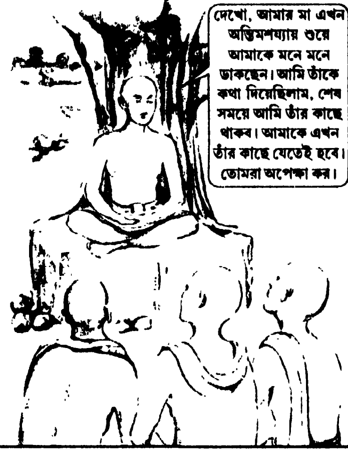
চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

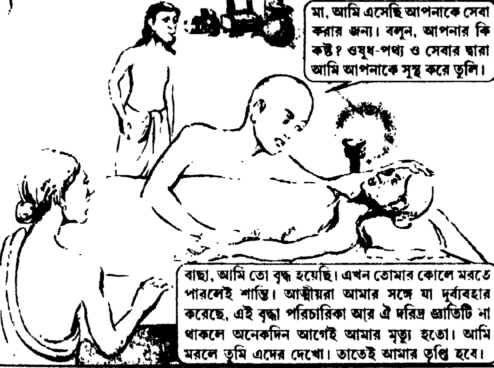
পদ্মপাদ আচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী রচনা করলেন 'বিজয়-ডিণ্ডিম'। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই পুঁথি আগুনে ভস্মীভূত হলো। গভীর দুঃখে মুহ্যমান হলেন পদ্মপাদ। আচার্যের কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন তিনি।



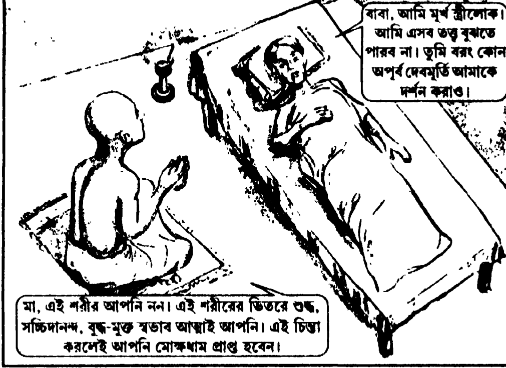
একদিন শৃঙ্গেরী মঠে শাস্ত্রব্যাখ্যার সময়ে আচার্য মুখে মাতৃস্তন্যের স্বাদ অনুভব করলেন।



আচার্য শঙ্কর কেরল রাজ্যে তাঁর জন্মস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে তাঁর মা বিশিষ্টা দেবী আনন্দে অধীর হলেন।



শঙ্কর জানেন, পরব্রহ্ম তত্ত্ব শোনালে মায়ের মুক্তি হবে। মায়ের মৃত্যুকাল আসন্ন, তাই এখনি মাকে তা শোনানো দরকার।



শঙ্কর কিছুক্ষণ মৌন থেকে জননীকে চোখ বুজে ঈশ্বরচিন্তা করতে বললেন। তিনি নিজে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

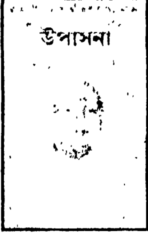
অতি বিনয়ের সঙ্গে শঙ্কর তখন শিবদূতগণকে বিদায় দিলেন।



অতঃপর বিশিষ্টা দেবী বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। শঙ্কর স্বহস্তে মায়ের শ্রাদ্ধকর্মাদি সমাপন করতে উদ্যোগী হলে তাঁর জ্ঞাতিরা এসে বাধা দিল।

কথা-সুর-ভক্তির উপাসনা

উপাসনা ● শিল্পী : রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ● পরিবেশক : জে. এম. ডি. সাউণ্ডস অডিও ক্যাসেট, ৬২২ মেকার চেম্বার নং ৫, নরিম্যান পয়েন্ট, সিক্সথ ফ্লোর, মুম্বাই-৪০০ ০২০ ● মূল্য : ৩০ টাকা



প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুললিত কণ্ঠ ও মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনার মাধ্যমে বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুদীর্ঘ কাল ধরে আকৃষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর বিচিত্র সঙ্গীতভাণ্ডারে ভক্তিগীতির একটি বিশেষ স্থান আছে। **'উপাসনা'** সেইরকমই একটি ভক্তিগীতির সঙ্কলন। এই ক্যাসেটটিতে যে-গানগুলি রামকুমারবাবু গেয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই যেন সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেছেন ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

অনুপমা দে-র কথায় শিল্পী নিজের সুরে মোট দশটি গান গেয়েছেন। প্রত্যেকটি গানেই কথার সঙ্গে সুরের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে। তবে ক্যাসেটের প্রথম পর্বের প্রথম গানটি 'জাগো জাগো তুমি মা' এবং দ্বিতীয় গানটি 'ভবের কারায় বদ্ধ আছি' যন্ত্রধ্বনি ও অত্যন্ত অনুরণনের আধিক্যে অনেকটাই শ্রুতিমাধুর্য হারিয়েছে, এমনকি গানের কথাও অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায়নি। রেকর্ডিঙের সময়, বিশেষ করে মিক্সিং করার সময় এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। ক্যাসেটটির এই পর্বেই 'তুমি যে আমার কত আপনার' গানটি বিশেষ আকুতিপূর্ণ, যা শিল্পীর রসবোধে অধিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'কে হে নটবর শ্যামলসুন্দর'—এই কীর্তনাঙ্গীয় গানটি মনকে উদ্দীপ্ত করে। গানটির সূচনায় বাঁশির ব্যবহার যথাযোগ্য হয়েছে। 'গা-রে রসনা গা'—এই গানটির আঙ্গিক একটু নতুন ধরনের।

ক্যাসেটটির দ্বিতীয় পর্বের প্রথম গানটি 'একি রঙ্গ তোর তারা' যন্ত্রধ্বনির আধিক্যে কিছুটা ম্লান হয়েছে। 'আমার শ্যামের মুরলী' ও প্রসাদী সুরে 'কি বলিব তোমারে হরি শুন' (ইনলে কার্ডে গানটির প্রথম পঙ্ক্তিটি ভুল ছাপানো হয়েছে) গানদুটি শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্যে সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। ছায়ানট রাগাশ্রিত 'তোমার প্রেমের অঞ্জন' গানটি ভাবগভীরতায় উজ্জ্বল। তবে 'কেমনে আনিতে যাব যমুনার জল'—এই গানটিতে একটি বৈঠকী মেজাজ এসেছে। এইধরনের গানে যদিও রামকুমারবাবুকে বিশেষভাবে চেনা যায়, কিন্তু এমন পরিবেশনার মধ্যে চটুলতার আধিক্য এসে পড়ে, যা ভক্তিভাবের শান্তোজ্জ্বল তপস্যাকে বিঘ্নিত করে।

তবে এই ক্যাসেটটি আনুপূর্বিক শ্রবণ করে এই কথাই বলা যেতে পারে, শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রোতাদের এমন নতুন কিছু গান উপহার দিয়েছেন, যা সঙ্গীতভাণ্ডারে এক বিশেষ সংযোজন।

যন্ত্রানুসঙ্গ পরিচালনায় দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায় যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন।❑

সঙ্গীতজগতে এক নবীন প্রয়াস

জয় সারদা ● শিল্পী : সৌম্যকান্তি ঘোষ ● পরিবেশক : জে. এম. ডি. সাউণ্ডস অডিও ক্যাসেট, ৬২২ মেকার চেম্বার নং ৫, নরিম্যান পয়েন্ট, সিক্সথ ফ্লোর, মুম্বাই-৪০০ ০২০ ● মূল্য : ৩৫ টাকা

ঈশ্বরসাধনার বহু পথ। তার মধ্যে সঙ্গীত অন্যতম। সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই ভাব ও রসে উপনীত হওয়া যায় এবং পরম রসঘন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অতি সহজেই আসা যায়। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ সঙ্গীতের মাধ্যমে তরুণ শিল্পী সৌম্যকান্তি ঘোষ সেই প্রয়াসই করেছেন।

'জয় সারদা' ক্যাসেটটির প্রথম পর্বের প্রথম গানটিতে ('সাধনায় মগন জগতের কল্যাণে') 'সা-র-দা' কথাগুলির তাৎপর্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাণী সম্বলিত অংশগুলি মনোজ্ঞ। গানটির কথা ও সুর (শচীকান্ত বেরা) যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি যথাযথ পরিবেশনা এই নবীন শিল্পীর। 'শিল্পীরা তোর মূর্তি গড়ে' বা 'পঞ্চবটীর আকাশে বাতাসে' গানদুটিতে শিল্পী নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। মন্মথনাথ মণ্ডলের কথায় শিল্পীর স্ব-সুরারোপিত গানটিও শুনতে ভাল লাগে। এই পর্বের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গানগুলি একই ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় কিছুটা একঘেয়েমি লাগে। গানগুলির বিন্যাস নিয়ে একটু ভাবা উচিত ছিল।

ক্যাসেটটির দ্বিতীয় পর্বে লোকসঙ্গীত অঙ্গের 'গুরু গো দয়াল গুরু' এবং 'আমি রামকৃষ্ণের নৌকায় উঠেছি' গানদুটিতে শিল্পী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। তবে ফণীন্দ্রনাথ হালদারের কথায় শিল্পী নিজের সুরে যে-গানটি ('বল মা শ্যামা বল') গেয়েছেন, সেটিতে তাঁর আরেকটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। স্বামী বলভদ্রানন্দ রচিত ও সুরারোপিত 'স্বামীজীর মন্ত্র মোরা ভুলব না' গানটির কথা, সুর ও উপস্থাপনা চমৎকার।

রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রানুসঙ্গ পরিচালনা যথাযথ হলেও সাউণ্ড মিক্সিং-এর ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টিপাত করা উচিত ছিল। কারণ, কয়েকটি গানে কণ্ঠধ্বনির প্রাবল্য এত বেশি শোনা গিয়েছে যে, অন্যান্য যন্ত্রধ্বনি (পারকাসন ছাড়া) খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

ক্যাসেটটির শিরোনাম ও প্রচ্ছদ চিত্রটির ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসে। 'জয় সারদা' (যদিও কোন গানের প্রথম পঙ্ক্তি অনুসারেই সাধারণত নামকরণ করা হয়, এক্ষেত্রে যা অনুপস্থিত) নামকরণ এবং প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীমায়ের চিত্রটি থাকায়, সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গানগুলি নিবেদিত হওয়ায় সকলের ধারণা হবে, এটি মাতৃকেন্দ্রিক সঙ্গীত-সঙ্কলন, কিন্তু শিল্পী এই ক্যাসেটে বিবিধপ্রকার ভক্তিমূলক গান গেয়েছেন। এক্ষেত্রে ক্যাসেটটির প্রচ্ছদচিত্র ও নামকরণ নিয়ে ভাবা যেতে পারত।

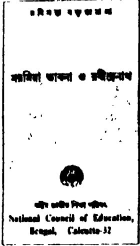
তবে শিল্পী সৌম্যকান্তি ঘোষের ঐকান্তিক ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীতাঞ্জলি এধরনের খুঁটিনাটি দোষত্রুটিগুলিকে সহজেই ঢেকে দেয়।❑

চন্দনকুমার রায়

অতীন্দ্রিয় ধ্যানধারণা

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

মরমিয়া ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ • লেখক: বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় • প্রকাশক : অরুণকুমার গুপ্ত, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা-৭০০ ০৩২ • মূল্য : ১৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬+৫৬ • প্রকাশকাল : ১৯৯৯



শুধু অন্নে মানুষ বাঁচতে পারে না। একথা 'বাইবেল'-এ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাঁচার মতো বাঁচতে হলে আমাদের অন্নময় প্রাণের উত্তরণ প্রয়োজন। সেই উত্তরণের মহত্তম প্রকাশ মরমিয়া ভাবনায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কাব্যে ড্যানিয়েল-অনূদিত সেনেকার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন: "And that unless above himself he can/ Erect himself, how poor a thing is man!" (মানুষ যদি নিজেকে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে মানুষের চরম দুরবস্থা!) এই অতিক্রমণের পরিণাম সেই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি—যার সাহায্যে, উইলিয়াম ব্লেকের ভাষায়, একটি বালুকণার মধ্যে নিখিল ধরণিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ধরনের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অর্জুন লাভ করেন, যার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "অর্জুন বললেন, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি, তাতে থোলো থোলো কালোজামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বললেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি—ও থোলো থোলো কালো ফল নয়, থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মতো।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৩।২) স্বাভাবিকভাবেই এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরম নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন, যাঁকে তিনি 'মর্মমরমি' আখ্যা দিয়েছেন।

মরমিয়া ভাবনার মূল কথাটি লেখক দেখেছেন মানুষের আলোকের জন্য আর্তির মধ্যে। তাই তিনি এর নিজস্ব নামকরণ করেছেন 'আলোকাভিসার'। বৈদিক প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' (আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও), দান্তের 'পারাদিসো'র শেষে জ্যোতির্বন্দনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'এই তো তোমার আলোকধেনু'—এ সবকিছুই তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিস্ময়কর তাঁর অধ্যয়নের পরিধি, বিশেষত সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজি সাহিত্যে। উপনিষদের মরমিয়া চিন্তার সারসঙ্কলন তিনি গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। 'দ্বা সুপর্ণা' নিয়ে পৃথক অধ্যায়ে বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে তিনি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। সুফিদের চিন্তাধারা নিয়ে অধ্যায়টিও সুলিখিত। লেখকের রচনাশৈলীর প্রসাদগুণ আমাদের মুগ্ধ করে।

গ্রন্থের প্রথম অংশের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তবে দ্বিতীয় অংশে সবটাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। 'মরমী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মিস্টিক কবির একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু গান ও কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা থেকেও উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে। 'গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও ত্যাগের আদর্শ' প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী। 'রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম' নিবন্ধটিতে পাঠকগণের উজ্জীবনের খোরাক রয়েছে। 'মরমিয়া ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ' সকলকে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা দেবে এবং মিল্টনের বিশ্ববিশ্রুত উক্তি মনে করিয়ে দেবে, যেখানে তিনি ভাল বইকে 'মহান আত্মার মহামূল্য প্রাণশোণিত' ('precious life blood of a master spirit')-রূপে বর্ণনা করেছেন।

'মরমিয়াবাদ' সম্পর্কে বাঙলায় এইধরনের গ্রন্থ বোধহয় এই প্রথম, বিশেষ করে সাহিত্যে এর প্রতিফলনের ওপর বেশি জোর দিয়ে। এই দিক থেকে বিশ্বনাথবাবু পথিকৃতের মর্যাদা পাবেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে এক শারদীয়া সংখ্যায় তিনি 'মরমিয়াবাদের মর্মবাণী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই গ্রন্থের সম্ভবত সেখানেই সূত্রপাত। এটি পাঠ করলে মনে হয় যে, গ্রন্থকার নিজে মরমিয়া পথের পথিক। সেইজন্যই তাঁর গ্রন্থের এক বিরল সূক্ষ্মতা ও গভীরতর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাবের ব্যাপ্তিতে বৃহৎ। মরমিয়া ভাবুকের মতো তিনি বিন্দুতে সিন্ধুর সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, মরমিয়া সাহিত্যভাণ্ডারে লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'Mystisism in English Poetry'। আলোচ্য গ্রন্থটি তার দ্বিতীয় ও মূল্যবান সংযোজন। ❑

ক্যাসেট প্রাপ্তি-সংবাদ

♪ *রাতুল চরণে* (শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি) • *শিল্পী : তিমির ঘোষ ও ডঃ পাপড়ি ঘোষ • পরিবেশক : ডি. এস. এম. স্টিরিও • মূল্য : ৩০ টাকা।*

♪ *ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ* (শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন) • *শিল্পী : [illegible] • পরিবেশক : নিবেদন, সত্যানুসন্ধানী ভাবানুসঙ্গ • মূল্য : ৩৫ টাকা।*

♪ *জয় হোক তব সারদে* (মাতৃবন্দনা) • *শিল্পী : আশুতোষ রায় • পরিবেশক : নিবেদন, সত্যানুসন্ধানী ভাবানুসঙ্গ • মূল্য : ৩৫ টাকা।*

♪ *শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ সংগীত* (গুরু শিষ্য পরম্পরা, পর্ব-২) • *শিল্পী : তমাল মুখার্জি, প্রতিমা মুখার্জি, পূরবী মুখার্জি • পরিবেশক : ইউ. ডি. সিরিজ • মূল্য : ৪০ টাকা।*

♪ *নিবেদিতায় নিবেদিত* (কবিতা ও গান) • *শিল্পী : পরিমল চক্রবর্তী, অপর্ণা চক্রবর্তী, নম্রতা চক্রবর্তী প্রমুখ • পরিবেশক : [illegible] সাহা, মাদার পাবলিশিং • মূল্য : ৩৫ টাকা।*

♪ *মনরে আমার থাকতে সময়* (বাঙলা ভক্তিগীতি) • *শিল্পী : উত্তর দেব • পরিবেশক : এইচ. এম. ভি., সা রে গা মা ইণ্ডিয়া লিমিটেড • মূল্য : ৩৫ টাকা।*

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা

বাংলার নিরক্ষর, নিরন্ন পল্লীজীবনকে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, সম্পদে ও উৎসাহে উজ্জীবিত ও সর্বশ্রীসম্পন্ন করে তোলার মহান ব্রত সামনে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য স্বামী গণেশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী অমিয়) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ডহারবারের কাছে সরিষা গ্রামে সূত্রপাত করেন সরিষা আশ্রমের। গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে এক পরিত্যক্ত কামারশালায় শুরু হয় আশ্রমের কাজ। প্রাথমিক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের কাপড় বোনা শেখানো এবং বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা'। অমিয় মহারাজ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সরিষা আশ্রম স্থানান্তরিত হয় তার নিজস্ব জমিতে অর্থাৎ বর্তমান অবস্থানে। ত্যাগব্রতী কর্মীরা ছাড়াও শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, পাঁচুকালী সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা হয়। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ছেলেদের সংগ্রহ করে চালু করা হয় একটি পাঠশালা; নাম দেওয়া হয় 'শিক্ষামন্দির'। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষামন্দির 'Extended M. E. School' হিসাবে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'High School' হিসাবে সরকারি অনুমোদন পায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গণেশানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করার পর আশ্রম-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্বামী নির্মোহানন্দ। এই কর্মতৎপর সন্ন্যাসীর নেতৃত্বেই আশ্রমের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তিনি N.C.C., ব্রতচারী, শারীরশিক্ষা, কৃষি, বয়ন, B.T. ইত্যাদি প্রশিক্ষণে আশ্রমের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বা অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতেন। আশ্রমের নিজস্ব স্কাউট দলও তৈরি হয়। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বামী নির্মোহানন্দ সম্পাদকরূপে সরিষা আশ্রমের সেবা করেন।



যে-সময়ে আশ্রম স্থাপিত হয়, সে-সময়ে ঐ অঞ্চলে মেয়েদের জন্য পৃথক কোন বিদ্যালয় ছিল না। উচ্চবর্ণের বালিকারা গ্রামের পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে কিছু লেখাপড়া শিখত। সরিষা মিশন এই অঞ্চলে শুধু মেয়েদের জন্য প্রবর্তন করে 'সারদামন্দির'। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। তার কত আগে স্বামীজী নারীজাগরণের কথা বলেছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গণেশানন্দজীর 'সারদামন্দির' প্রতিষ্ঠা তো স্বামীজীর সেই স্বপ্নেরই অনুবর্তী। প্রসঙ্গত, বর্তমানে 'শিক্ষামন্দির' ও 'সারদামন্দির'—প্রত্যেকটিতে ছাত্র ও ছাত্রী-সংখ্যা একহাজারের ওপর। ছাত্রাবাসে রয়েছে প্রায় ২০০ ছেলে—যাদের মধ্যে ৫০ জন 'concession' পায়; ছাত্রীনিবাসেও আছে প্রায় ২০০ মেয়ে—যাদের মধ্যে ২৩ জন 'concession' পায়।

কালে কালে সরিষা আশ্রমের কর্মপরিধি বেড়েছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রা এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আলোক সঞ্চারে ব্রতী এই আশ্রম বিভিন্ন সময়ে যেমন পেয়েছে স্বামী বেদান্তানন্দ, স্বামী আদিত্যানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ (যতীন মহারাজ), স্বামী যজ্ঞানন্দের মতো মহাপ্রাণ, আত্মবিলয়ী, কর্মসাধক সন্ন্যাসীকে; তেমনই পেয়েছে প্রচারবিমুখ, কর্মযোগী বিভিন্ন সেবাব্রতী ভক্তকেও। সন্ন্যাসীরা একসময় গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বেলেছেন সভ্যতার প্রদীপশিখা। বাগদিপাড়ায় গিয়ে শুনিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেদের স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রীতি লক্ষ্য করে শিখিয়েছেন যাত্রাদলের গান। আর এসবের মধ্য দিয়ে সবার অজান্তে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে ভদ্র, মার্জিত। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষ গড়তে। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন তার নিজস্ব অঞ্চলে নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বামীজীর সেই মহান ব্রত ধারণ ও রূপায়ণ করে চলেছে। এখানে ১৯৮২



সরিষা আশ্রমে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য সূচনা হয়েছে কমিউনিটি সেণ্টারের। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। দুটিই সুসম্পাদন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। বর্তমানে আশ্রমের জমি প্রায় ৭০ বিঘা। 'শিক্ষামন্দির' ও 'সারদামন্দির' ছাড়াও আশ্রমের পরিচালনাধীনে রয়েছে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (মোট প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী), মেয়েদের জন্য দুটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র (প্রায় ৭৫ জন শিক্ষার্থী), একটি কারিগরি বিভাগ (প্রায় ৬৫ জন শিক্ষার্থিনী), মহকুমা গ্রন্থাগার ও একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার (দুটিতে মোট প্রায় ২৩ হাজার বই), দুটি ভ্রাম্যমাণ 'Audio-visual unit', একটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়, 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান'-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে ভ্রাম্যমাণ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থা, নার্সদের জন্য স্থানীয় ট্রেনিং, মেয়েদের জন্য কমিউনিটি সেণ্টার (শতাধিক শিক্ষার্থিনী) ইত্যাদি।

উৎসব-অনুষ্ঠান

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বিহার) ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ গত ১৬-১৯ নভেম্বর ২০০৩ অবস্থান ও দীক্ষাদান করেন। গত ১৯ নভেম্বর একটি ভক্তসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। স্বামী সুমনসানন্দজী ও স্বামী অবধূতানন্দজী যথাক্রমে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের দেবীভাব ও মাতৃভাব' বিষয়ে আলোচনা করেন। পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ আশীর্বাণী প্রদান করেন।

চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠ (তামিলনাড়ু) ঃ গত ১২ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয়। মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, 'নাদস্বরণম্' ও ভক্তিগীতি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের প্রথম পর্ব শুভারম্ভ হয়। আয়োজিত জনসভায় আশ্রমের পক্ষ থেকে 'দি বেদান্ত কেশরী', 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা'র বিশেষ সংখ্যা এবং চেন্নাই সারদা বিদ্যালয় থেকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে একটি 'সিডি' প্রকাশ করা হয়। সভান্তে প্রায় ৪,০০০ সাধু-ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ দুটি সুসজ্জিত রথ শোভাযাত্রা সহকারে পথ-পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে আরতি করা হয়। তন্মধ্যে একটি ভ্রাম্যমাণ রথ প্রদর্শনী ও পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র-সহ তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরীর বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করার জন্য চার সপ্তাহের যাত্রা শুরু করে। অন্য রথটি চেন্নাই শহরের মধ্যে আশ্রমের বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেবে।

রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া ঃ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত 'প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশন (রাজস্থান) ঃ গত ২০ নভেম্বর ২০০৩ প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

দেহত্যাগ

স্বামী সুতীর্থানন্দজী (পরিতোষ মহারাজ) গত ৫ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের পবিত্র জন্মতিথিতে বিকাল ৩টায় বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শরীরত্যাগের পূর্বে তিনি আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মঠ, চণ্ডীপুরে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি মেদিনীপুর আশ্রম, কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, বাগবাজার মায়ের বাড়ি, কামারপুকুর মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটী এবং জয়রামবাটীতে সাধুকর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ ৫৩ বছরের সাধুজীবনের বেশির ভাগ সময় পূজার কাজ করেছেন। তিনি ৭ বছর বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরে পূজা করেছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন সহজ-সরল, নিরলস কর্মী ও নিষ্ঠাবান। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২ ডিসেম্বর ও ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী অমলাত্মানন্দজী ও স্বামী হররূপানন্দজী।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩ ক্রিসমাস ইভ উপলক্ষ্যে যিশুখ্রিস্টের জীবনী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব ঃ গত ১৬-১৮ ডিসেম্বর ২০০৩ মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথির দিন সকালে মঙ্গলারতি,



মায়ের ঘরে সুসজ্জিত পট

সানাইবাদন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী ও স্বামী দেবরাজানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ কালীকীর্তন পরিবেশন করেন। এছাড়া



মায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীপূর্তি উপলক্ষ্যে নির্মিত তোরণ

পরিবেশিত হয় দেবাশিস দত্তের কণ্ঠে ভক্তিগীতি, শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের শ্রুতিনাটক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি মা সারদা' এবং সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপালা 'ভক্ত কবি জয়দেব'। উৎসবের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র 'ওয়েবসাইট'-এ দেওয়া হয়। আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও সারাদিনব্যাপী উৎসবে ভোর সাড়ে ৪টা থেকে রাত্রি সাড়ে ৯টা পর্যন্ত প্রায় ১৮,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন ১৭ ডিসেম্বর 'নারীমুক্তি আন্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। 'শ্রীমা সারদাদেবী' শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন ভবিষ্যৎ নাট্যগোষ্ঠী। ১৮ ডিসেম্বর 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। সেতারবাদন পরিবেশন করেন কুশল দাস।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সারদা নারী সংগঠন, বালিভাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১১-১৪ অক্টোবর ২০০৩ চতুর্দশ বার্ষিক 'সর্বভারতীয় মহিলা শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী। প্রথমদিনের সভায় তিনি ছাড়াও প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ চিন্ময়ী নন্দী, ডাঃ তাপসী ঘোষ প্রমুখ মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সঙ্গীত, মনঃসংযোগ, চরিত্রগঠনের ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শেষদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ পথপরিক্রমা করা হয়। শিবিরে মোট ২২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাঁও (অসম)ঃ গত ১৯ অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এতে আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অসমীয়া, বাঙালি ও অন্যান্য বহু ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্যান্য বছরের মতো এবারেও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ২,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪)ঃ গত ২৪ অক্টোবর ২০০৩ কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 'বরাভয়লীলা' উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও 'কথামৃতের গান' পরিবেশিত হয়। উৎসবে বহু ভক্তের সমাগম হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শ্রীশ্রীমা এই বাড়ির যে-অংশে বাস করতেন, সেই অংশটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। মেরামতির পর তা ভক্তসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ডানকুনি (হুগলি)ঃ গত ২৮ অক্টোবর ২০০৩ ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করা হয়। স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী এই উৎসবের শুভসূচনা করেন। আয়োজিত সভায় নিবেদিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ডঃ ধৃতিশ্রী গাঙ্গুলি, মৃদুলা মুখোপাধ্যায়, জয়া বসুরায়, রেশমী বসু প্রমুখ। আবৃত্তি করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় ২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৯৫)ঃ গত ২৮ অক্টোবর ২০০৩ বাগবাজারে নিবেদিতা উদ্যানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিবেদিতার মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, স্থানীয়

পুরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়, রাইকমল দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে পথশিশুদের মধ্যে নতুন পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ সোসাইটি, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড)ঃ গত ৩০ অক্টোবর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ একটি নবনির্মিত সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তিনি এখানে চারদিন অবস্থান করে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী বহু ভক্তকে দীক্ষাদান করেন। সোসাইটির শাখাকেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি আশীর্বাণী দান করেন।

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থ সেবায়তন (বীরভূম)ঃ গত ২ নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ইত্যাদি হয়। স্বামী শিবনাথানন্দজীর পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ডিব্রুগড় (অসম)ঃ গত ২ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনাদি ছিল পূজার অঙ্গ। স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী ও স্বামী অঘোরেশানন্দজী মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, কোন্নগর (হুগলি)ঃ গত ৫-৮ নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত প্রার্থনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। প্রভাতফেরি, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিকালের ধর্মসভায় স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া)ঃ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে আদর্শ ভারত ও সেই ভারত গড়তে যুবসমাজের কি করণীয়' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, স্বামী তদ্‌বিদানন্দজী ও ব্রহ্মচারী সেবাচৈতন্য। উপস্থিত প্রায় ৭০০ যুবপ্রতিনিধিকে স্বামীজীর ছবি ও 'ভারতের নিবেদিতা' পুস্তিকা দেওয়া হয়।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম)ঃ গত ৯ নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ) প্রাক্তনী সংসদ এবং মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সহযোগিতায় স্থানীয় কামদাকিঙ্কর স্টেডিয়ামে একটি আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'বিবেকজ্যোতি' মশাল প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দ পুরী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, পরেশনাথ দত্ত প্রমুখ। মোট ২৮টি বিভাগে ৪০টি প্রাথমিক ও ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫২৬ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবক-সহ মোট প্রায় ৭০০ জন যোগদান করে।

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১৬ নভেম্বর ২০০৩ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ও সারাদিনব্যাপী যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী লোকেশানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী জাতবেদানন্দজী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে দরিদ্রদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। প্রায় ৬৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা স্মরণ সঙ্ঘ, রাণাঘাট (নদীয়া)ঃ গত ১৬ নভেম্বর ২০০৩ ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুরেশানন্দজী প্রমুখ। এছাড়া গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, নাগেরবাজার (কলকাতা-২৮)ঃ গত ২৩ নভেম্বর ২০০৩ কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বাবিংশ ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পূতানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী প্রমুখ। বিকালে প্রকাশ্য জনসভায় আলোচনা করেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে 'দিশারী' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। এই সম্মেলনে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৩ নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভা, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, অসিতবরণ সামন্ত, বনমালী সামন্ত, প্রতাপচন্দ্র মাইতি প্রমুখ যুবসমাজের ওপর স্বামীজীর অবদান বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

হুগলি জেলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ২৯-৩০ নভেম্বর ২০০৩ পরিষদের বিংশতিতম বার্ষিক সম্মেলন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ, ধ্যান, ভজন ছাড়াও পরিষদের কাজের মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আলোচনাসভায় অংশ নেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী কৌশিকানন্দজী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী ক্ষেমানন্দজী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। সম্মেলনে ৬৫টি সঙ্ঘের ১০৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গত ২৩ নভেম্বর একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৭৭ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

রামগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ৩০ নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। সকালে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী ব্রহ্মবিদানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী লক্ষ্মীকান্তানন্দজী, আলোকময় বসু, ডাঃ সুনির্মল বেরা প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩৫ জন দুঃস্থের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সেবাব্রত

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ২২ নভেম্বর ২০০৩ ফ্রেজারগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাক্তন চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ কমলকান্তি গায়েনের দুটি চোখ কলকাতা মেডিকেল কলেজে দান করা হয়। সঙ্ঘের উদ্যোগে এটি দ্বিতীয় মরণোত্তর চক্ষুদান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৯ নভেম্বর ২০০৩ স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজীর উপস্থিতিতে ৩০০ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ১০০ ধুতি, ১০০ শাড়ি এবং ১০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। ঐদিন একটি দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরে ৫ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ২০০ জনের অ্যালোপ্যাথি এবং ৬৪ জনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রত্যেক রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। বস্ত্র-বিতরণ এবং চিকিৎসা-শিবির—উভয় ক্ষেত্রেই সেবাশ্রমকে সহযোগিতা করে রামকৃষ্ণ মঠ, ময়াল-ইছাপুর

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, দুর্গাপুর-নিবাসিনী আনন্দময়ী চট্টোপাধ্যায় গত ১ জুলাই ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি নিয়মিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা পাঠ করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অর্চনা সেন গত ৩ জুলাই ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী প্রতাপ চৌধুরী গত ৩ জুলাই ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। সরলতা ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি শিলচর মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বর্ধমান-নিবাসী কমলচন্দ্র দত্ত গত ১১ জুলাই ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অনিতা বসু গত ১১ জুলাই ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী শম্ভুপ্রসাদ মিত্র গত ৩ আগস্ট ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরল এবং সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, পাটনা-নিবাসিনী প্রকৃতি চৌধুরী গত ৩ আগস্ট ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সরল প্রকৃতির।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী বীণা দাশগুপ্তা গত ৭ আগস্ট ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি কাশী সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাধুসেবা, সেবাপরায়ণতা, পরোপকারিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি আজীবন 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী বিনয় দাস গত ৮ আগস্ট ২০০৩ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি সিঁথি বেণীপাল উদ্যান রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হুগলি-নিবাসিনী প্রভাবতী চট্টোপাধ্যায় গত ৯ আগস্ট ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অনিমা রায় গত ১৪ আগস্ট ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। ❑



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী





'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

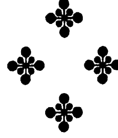
গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান),** কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস,** ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ,** ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
ফোন ঃ ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম,** ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
ফোন ঃ ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স**
১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক,** সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র,** চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,** টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক,** ৯ আর. এন. টেগোর রোড
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৬৭-১১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আঢ্য ব্রাদার্স,** ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল**
১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫
ফোন ঃ ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক,** ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
৯ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী,** স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জি
৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫
ফোন ঃ ২৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **দাসানুদাস সাহা,** ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট
কলকাতা-৫, ফোন ঃ ২৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়,** ১/২ডি সেণ্টার সিঁথি রোড
কলকাতা-৫০, ফোন ঃ ২৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা,** ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস,** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন ঃ ২২১৮-১২৮৫
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী,** প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা কেন্দ্র
১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ,** বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন,** ২৪/৬১ যশোর রোড
১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮
ফোন ঃ ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ**
প্রযত্নে শঙ্কর আইচ, ৯/এইচ, দমদম রোড, রাজাবাগান
কলকাতা-৩০, ফোন ঃ ২৫৫৭-০৫৭৬, ৯৮৩০১৩২৩৯২
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ,** প্রযত্নে বিকাশ সাহা
মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা ৭৯
ফোন ঃ ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য,** প্রযত্নে শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
ফোন ঃ ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ,** (শকুন্তলা পার্ক)
৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা ৬১
ফোন ঃ ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য,** ডলফিন স্টুডিও
৩/১ ভুপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
ফোন ঃ ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা,** ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা ৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস**
২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া
কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ২৫১২-৫৭৪৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর**
প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা
কলকাতা-৪৯, ফোন ঃ ২৫৪১-০১২২
- **রূপম চক্রবর্তী**
প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬,
ফোন ঃ ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪
- **বিবেকানন্দ পাঠমন্দির,** প্রযত্নে কানাইলাল বসু
৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর
কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪
- **অলক পাল চৌধুরী,** প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, সঙ্কটাপল্লী
ঘোলা বাজার-১১১, ফোন ঃ ২৫৯৫-২১৮৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র**
১১/৫৪ ঋষি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৫১

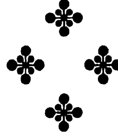
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No. 1
JANUARY
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R N 8793/57
Postal Regn No SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

ISSN 0971-4316 01

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

✡ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সংঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✡ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✡ ২০০৪ সালের জন্য 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ [illegible] অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী [illegible]

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

।। ১০৬ ।।



ফাল্গুন ১৪১০ ২য় সংখ্যা



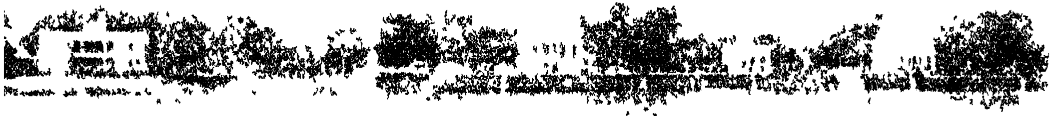


১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



"পিপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে।
বালিতে চিনিতে মিশানো - পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে
একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের
মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো,
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে,
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে - গোলটি ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ



আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ ২য় সংখ্যা • ফাল্গুন ১৪১০ • মার্চ ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক: স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ: সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ: ৮০ টাকা; সডাক: ১০০ টাকা ☐ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য: ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' ঃ ১০৬তম বর্ষ ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) ডাকখরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা,** পিনকোড, ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে Service Charge বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে।

M.O. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১





হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

হৃদয়পদ্মে শোভমান, বিকল্পরহিত, সৎ ও অসৎ-এর পার্থক্য-রহিত, অদ্বয়স্বরূপ, প্রকৃতিগত বিকারশূন্য, নিত্য, কলুষবিহীন, সদা আনন্দঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভজনা করি।



নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

উপমারহিত, অতি সূক্ষ্ম, মায়া-প্রপঞ্চশূন্য, নিঃস্পৃহ, সর্ববস্তুর মধ্যে অবস্থিত আকাশের ন্যায় সবকিছুর মধ্যে সদাব্যাপ্ত, সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের অতীত, সৎ ও চিৎ (জ্ঞান)-স্বরূপ, পূর্ণব্রহ্মরূপে বরণীয়, কলুষবিহীন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভজনা করি।



বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

জ্ঞান, ভক্তি ও পরমা শান্তি বিতরণের নিমিত্ত জগতে আবির্ভূত, জীবের দুঃখে অতি কাতর, প্রেমে বিগলিত চিত্ত, অনায়াস-সমাধিকুশল, জ্ঞানঘন কোমলমূর্তি, কলুষবিহীন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভজনা করি।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রম্—স্বামী অভেদানন্দ, ১, ২, ১৭)



কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম অনুভূতির জিনিস

সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মনে হয় তদ্রূপ অন্য কেহ করেন নাই। সেই ইতিহাস মানুষের পশুস্তর হইতে মনুষ্যত্ব লাভের ইতিহাস, জাতিগঠনের ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস, মানুষের স্বাধিকার রক্ষার ইতিহাস, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উপসংক্রমণের ইতিহাস। পৃথিবী জুড়িয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঢঙে এই বিবর্তন সঙ্ঘটিত হইলেও ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিবর্তন এই ভারতবর্ষের মাটিতেই হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস ভারতবর্ষের ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসেরই নামান্তর মাত্র। একথায় অনেকেই আপত্তি তুলিবেন। কারণ, ইউরোপীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাস স্বতন্ত্র। চিন, জাপান ইত্যাদি এশীয় দেশগুলির ধর্মেতিহাসও ভারতবর্ষীয় ধর্মেতিহাসের সদৃশ সর্বাংশে নহে। ঠিক কথা। তবে আমরা যে-ধর্মের প্রসঙ্গ তুলিয়াছি তাহা ধর্মের আনুষ্ঠানিক বা পোশাকি বাহারের দিক নহে—উহা ধর্মের ভিতরের কথা, অনুভূতির প্রসঙ্গ। স্বামীজী পরিষ্কার বলিলেন : "Religion is realization."—ধর্ম অনুভূতির জিনিস। অসাধারণ আশাবাদী ছিলেন স্বামীজী। যখন ইংরেজের পদতলে ভারতবর্ষের মানুষ নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিকে তিনি বলিলেন : "For a complete civilisation the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waiting for the marvellous spiritual inheritance of the race."—একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার পথ চাহিয়া আছে এই বিশ্ব। ভারতবর্ষের রত্নাগার হইতে কী উঠিয়া আসিবে, কী বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে জগদ্বাসী ভূষিত হইবে, সেই আশায় এই পৃথিবী অপেক্ষমাণ।

* * *

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহে একদিন—

"জীব চারপ্রকার—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

"নিত্যজীব : যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

"বদ্ধজীব : বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে। ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

"মুমুক্ষুজীব : যারা মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউবা পারে না।

"মুক্তজীব : যারা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ নয়। যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।...

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে থাকে।"

সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া আছে এক প্রশান্ত সৌম্য মহামানবীয় মূর্তির পানে। সাধারণ কথার মাধ্যমে এক অসাধারণ বিশ্লেষণ। মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, এই বদ্ধজীবের মন কি কখনো অধ্যাত্মমহিমায় আলোকিত ভারতবর্ষের রূপ দেখিবে? মনে হয় সম্ভব নহে। তাহারা ধর্মের বর্জ্য অংশের চাকচিক্য ও বিশাল আড়ম্বরে মোহিত হইয়া ভাবিবে, আহা তাই তো, ইহাই যে আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু! নানাবিধ অলৌকিকতার মোহনীয়তায় আবিষ্ট ঐসকল মনের নিকট ধর্ম হইতে 'অনুভূতি' বাদ পড়িবে। বদ্ধজীব বোধস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিবে না! আজ এই সময়ে, এই বিশ্বে ইহাই কী বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর চরিত্র?

এতৎ সত্ত্বেও, অনুভূতি চিরকাল অলঙ্ঘনীয় থাকিয়া যাইবে। কী সেই অনুভূতি? অনুভূতিবান পুরুষের বর্ণনা দিয়াছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ :

"(গোস্বামীর প্রতি)—তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ করে আসেন—এও সত্য, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন—এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার-নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

"কিরকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

"তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।...



"হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"

ইহা কেবল কথার কথা নহে। ঋষির অনন্য সত্যদর্শন সাধারণ সরল গ্রাম্য ভাষায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অসাধারণ রূপকজালের সূক্ষ্ম, ঐশ্বর্যময় সান্দ্র প্রয়োগের মধ্য দিয়া নিরলঙ্কার সত্যের অপূর্ব বর্ণনা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব শব্দচয়নের মধ্যে একদিকে রহিয়াছে চূড়ান্ত সরলতা, অপরদিকে বিস্ময়কর বর্ণাঢ্যতা। উপনিষদের ভাষাও ঠিক এইরূপ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যেমন সাধনের মাধ্যমেই ঐ ভাষা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও কি তাহাই করিয়াছেন? সেখানে বাহ্য আড়ম্বরের স্থান নাই। ঋষি বলিলেন :

"নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১৯)

—শ্রীভগবানের মহিমার ইতি করা অন্যায়। ক্ষুদ্র মানুষবুদ্ধিতে ঈশ্বরের মহিমা কতটুকুই বা বুঝা যায়?

একদা স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি বাঙ্ময়রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—"অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা হউক না কেন, তাহা অনন্তই থাকে এবং তাহার প্রত্যেক ভাগটিও অনন্তই।" ('দেববাণী', ৭ জুলাই, রবিবার)

* * *

বেদান্তধর্মে সবই আছে—অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বৈতবাদী ধর্মসকলের বাহ্য আড়ম্বর কখনো কখনো ধর্মজীবনকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলে। মহাপুরুষের মহনীয়তা তাঁহার দিব্য অনুভবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার যথার্থ ঈশ্বরানুভবই তাঁহাকে দিব্যলোকের যথার্থ পথযাত্রী করিয়া তুলে; কোনপ্রকার অলৌকিকতার মাধ্যমে তাহা কখনো সম্ভব হয় না।

সেদিন অপরাহ্ণে রাজা হেরডের মনের বিপুল উদ্বেগের কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটিল না। স্মিতহাস্যে তিনি দূত প্রেরণ করিলেন : "যাও, সেই অভূতপূর্ব নক্ষত্রকে অনুসরণ কর। খুঁজিয়া আন সেই সদ্যোজাত শিশুকে, আমি যাঁহার পাদবন্দনা করিব।" কংসের জীবনেও অনুরূপ ঘটনাই দৃষ্ট হয়। রাজার নির্দেশে যুগদর্শী মহাপুরুষের একটি ক্ষুদ্র দল চলিল গগনে আবির্ভূত অভূতপূর্ব একটি নক্ষত্রকে অনুসরণ করিয়া। ক্ষুদ্র একটি গৃহের ঠিক উর্ধ্বে থামিল সেই নক্ষত্র। প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ নয়ন ভরিয়া দেখিলেন অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত শিশু যিশুকে, মেরির অঙ্কে। তাঁহারা কি জানিতেন, এই শিশুই একদিন ঘোষণা করিবে সেই সত্যকে—যে-সত্য বেদান্ত-নির্ঘোষিত—যে-সত্য বস্তুজগৎ নহে, পরন্তু অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত? এই শিশুই সদর্পে ডাকিয়া বলিবে : "Blessed are the pure in heart, for they shall see God!" যাহাদের অন্তর গভীর পবিত্রতায় মণ্ডিত, তাহারা ধন্য; কারণ তাহারাই ঈশ্বরদর্শন করিবে। প্রাজ্ঞগণ কি বুঝিয়াছিলেন, এই শিশুর কণ্ঠেই ধ্বনিত হইবে : "Blessed are the peacemakers : for they shall be called children of God."—শান্তির বাণীবাহকগণই ধন্য, কারণ তাহারাই ইতিহাসে 'ঈশ্বরের সন্তান' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে? সেই বিজ্ঞগণ রাজা হেরডের নিকট ফিরিয়া যান নাই। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ও ইসলামিক দেশগুলির নেতৃবৃন্দ বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা যতই সাড়ম্বরে উচ্চারণ করুক না কেন, যান্ত্রিকতার যন্ত্রণায় অস্থির মানুষকে আজ 'অনুভূতি'র কথা শুনাইবার কেহ নাই। অনধিকারচর্চার দায় এড়াইতে এই শব্দগুলির অর্থ কী তাহা জানিতে চাহিলেই তাঁহারা অন্য কথা পাড়েন।

* * *

ভারতবর্ষ ধর্মের উৎসস্থল বলিয়াই স্বামীজী ঘোষণা করিলেন : "A great moral obligation rests on the sons of India to fully equip themselves for the work of enlightening the world on the problems of human existence."—ভারতবর্ষের মহান সন্তানবর্গের উপর যে বিশাল দায়ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা হইল, সারা পৃথিবীকে অস্তিত্বের সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ দেখাইতে হইবে তাহাদিগকেই। ইহার স্পষ্ট তাৎপর্য ইহাই যে, সকল ধর্মের বিবদমান মানুষ ধর্মের যে-বহিরাংশ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে, তাহা হইতে তাহাদের দৃষ্টি ধর্মের সারাংশের দিকে ফিরাইতে হইবে। এই সারাংশ আর কিছুই নহে, "Religion is realization."—যথার্থ ধর্ম 'অনুভূতি'র উপর স্থাপিত। উপনিষদ্ তাই বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন : 'অনুভূতিতেই মানুষের স্বাধিকার'—"জীবন্মুক্তিঃ সুখপ্রাপ্তি হেতবে জন্মধারিতম্"। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের অধিকার-সচেতনতাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনা। এই গণতান্ত্রিকতা আমাদের জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়, ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইহা কোনরূপ অনুভূতিতে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। আমরা সামান্যতম বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব—আজ পৃথিবীর সভ্যসমাজ সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ হইয়া গিয়াছে। দয়া, অনুকম্পা, সহানুভূতি, হৃদয়ের উষ্ণতা ভারতবর্ষে এখনো কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হইলেও বিশ্বের অপর সকল দেশে এই শব্দগুলির বাস্তব প্রয়োগ নাই বলিয়াই শুনা যাইতেছে। অবশ্য একটি অনুভূতি সকলেরই হইতেছে, যান্ত্রিক বিশ্বের যন্ত্রণাময় সেই অনুভূতি। সেই বেদনামুক্তির জন্যই কি সারা বিশ্ব ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে? ❑



অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী শিবানন্দের চারটি পত্র

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত



॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Godavari House
Ootacammand
3.10.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তোমার ওখানে থাকিবার সুবিধা হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তাঁর আশীর্বাদে তোমাদের সকল রকম কুশল হইবে, নিশ্চয় জানিবে।



ধ্যান, জপ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাও। যেরূপ বলিয়াছি। তাঁর কৃপায় মন স্থির হইবে। ধ্যান, জপের সময় গৈরিক পরিধান করিতে পার, কিন্তু তাহার পর উহা ছাড়িয়া রাখিবে।

ঠাকুরের নিত্য পূজা করিবার যদি বাসনা হইয়া থাকে, বেশ ভাল কথা। আমাদের ভক্তির পূজা, অত বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন নাই। ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও ভাবের সহিত প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই হইয়া গেল। মঠ হইতে ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি কিনিতে পাওয়া যায়। তাহাও আনাইয়া লইতে পার। ভক্তি বিশ্বাসই আসল। পূজা যদি ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে উহা কিছুই নয় জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমার ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা জানিবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramkrishna Ashram
Basavangudi
Bangalore City
25.10.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক।

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী স্বর্গত যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির পার্শ্বেই মায়ের ছবি নিশ্চয় রাখিবে। প্রাণায়াম পার ত একটা করে করে নেবে। নচেৎ ইষ্টমন্ত্র জপেই উহার কাজ হইয়া যাইবে। তোমার স্ত্রী যে মন্ত্র পাইয়াছে উহাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জপ করিতে বলিবে। তারপর আমি যখন মঠে ফিরিব তখন শুনিয়া যাহা বিধান হয় করিব। আমার ফিরিতে বোধহয় ডিসেম্বর হইবে। আমার শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। ইতি

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥৩॥
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramkrishna Ashram
Basavangudi
Bangalore City
12.11.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যশোহর জেলা মেলেরিয়ার ডিপো। তোমাদের সকলে যে এক২ বার জ্বর হইয়াই রক্ষা পাইয়াছ ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা জানিবে। মঠে গঙ্গার ধার ফাঁকা জায়গা। সেখানেই ছেলেরা সব রক্ষা পায় না, এ[ক] পালা করিয়া হইয়া গিয়াছে।

তুমি আজকাল মানসিক ভাল আছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বাবা বিশ্বাস করে পড়ে থাক। তাঁর কৃপায় দেখবে সবই আপনা আপনি হয়ে যাবে। ঠাকুর কে, আমরা কে, তুমিই বা কে সব বুঝিতে পারবে। তবে ঐদিকে জীবনের লক্ষ্য রেখে অসীম বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যের সহিত চলতে হবে।

মায়ের পূজা দক্ষিণাকালিকার ধ্যান করেই করবে। তাঁহার মধ্যে সবই আছে জানিবে। তিনি মহামায়াও বটেন এবং মায়ামোচন করেনও বটে। আমার শরীর ভালই আছে। শীঘ্র মাদ্রাজ যাইব। তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে ও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দস্য

॥ ৪ ॥
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramkrishna Ashram
Khar, Bombay
9.1.27

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার দুইখানি পত্রই পর২ পাইয়াছি। আমি বাংলোর হইতে মাদ্রাজ আসি। সেখানে এক মাস থাকিয়া বিগত ২২ ডিসেম্বর এই আশ্রমে আসিয়াছি এবং শারীরিক ভাল আছি। তোমার ১২-১১ তারিখের পত্রের উত্তর এই—সাধারণভাবে মাছ মাংস খাওয়ায় কোন দোষ নাই। (মাংস পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাটীতে কদাচিৎ হয়) ঘটে যে দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা তুমি যেরূপ লিখিয়াছ সেইভাবেই করিতে পার, কোন দোষ নাই, বরং ভাল।

তোমার স্ত্রীকে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করাইয়া লইয়া গিয়াছ খুব ভাল হইয়াছে। তাহারও উহা ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। ইহাতে তার পরম মঙ্গল হইয়াছে ও হইবে।

দক্ষিণেশ্বর ও মঠের নিকট তোমার একটা সুবিধামত কায হইলে অবশ্য ভাল হয় তার সন্দেহ নাই। চেষ্টায় থাক। তাঁর ইচ্ছায় যাহা হয়। তবে বর্ত্তমান কাযটী যে তাঁর ইচ্ছায় জুটিয়াছে তাহা তত মন্দ নয়। অবশ্য তোমার আয় কিছু বেশী হইলে খুব ভাল হয়। তাঁর ইচ্ছায় তোমার মঙ্গলই হইবে। চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে। স্ত্রীকেও জানাইবে। আমি বোধহয় এই মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই মঠে যাইতে পারি। ইতি—

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।
—সম্পাদক

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কর্মরহস্য

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥১৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *অতএব আমার অহঙ্কার নাই বলিয়া এবং কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কোন কর্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। যিনি আমাকে এইরূপে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন এবং কর্তৃত্বরহিত ও কর্মফলে স্পৃহাশূন্য বলিয়া জানেন, তিনিও কর্ম দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ কর্ম তাঁহার জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না।*

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীভগবান নিরহঙ্কারের প্রতিমূর্তি। কিছুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান, 'আমি কর্তা'—এই ভাব তাঁহার ভিতর নাই। শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন 'সর্বভূতহিতেরত' থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কর্ম করিলেন। যে তাঁহার ধ্যান করিবে, যে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবে—সেও নিরহঙ্কারী হইয়া 'সর্বভূতহিতেরত' হইবেই হইবে। সেকারণেই সামনে একটি 'model' বা আদর্শ দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় ইষ্ট,—যাহা আমি হইতে চাহি। আদর্শ অনুসরণ করিয়া আদর্শানুরূপ জীবন গঠনই জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভের উদ্দেশ্য—সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে পূজা করা নহে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥১৫॥

শ্লোকার্থ ঃ *আমি (শ্রীভগবান) অকর্তা, অভোক্তা, কর্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত জানিয়া জনকাদি পূর্বতন মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রাচীন মনীষিগণ পূর্বকালে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও (হে অর্জুন) নিষ্কামভাবে কর্ম কর, কখনো কর্মত্যাগ করিও না।*

ব্যাখ্যা ঃ নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া বাহ্যস্পর্শের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লাভ-অলাভ কিংবা জয়-পরাজয়ে সমভাবে উদাসীন থাকিতে না পারিলে জ্ঞান হয় না—অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুনিঋষিগণ জানিয়াছিলেন। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার উপদেশ করিতেছেন। ইহা যে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথামাত্র নহে, পূর্ব পূর্ব যুগের মনীষিগণ এই নিষ্কাম কর্ম জীবনে আচরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আধুনিক যুগে দেখিতে পাওয়া যায়, এটি এঁর মত, এটি ওঁর মত, ইনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি অমুকটা বলিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া লোকে চিৎকার করে, কিন্তু সত্যের দিকে নজর নাই! লোকে বলে ঃ "হেগেল এই কথা বলিয়াছেন, দান্তে এই কথা বলিয়াছেন, গান্ধীজী এই কথা বলিয়াছেন।" কিন্তু সত্য কি, সেদিকে নজর নাই! আর কেহ বলেও না—'ইহাই সত্য।"

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *কর্ম কী, অকর্মই বা কী ইত্যাদি প্রশ্নে মহাপণ্ডিতগণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন। অতএব যাহা জানিতে পারিলে সংসারজলধিরূপ (কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববোধ এবং তজ্জাত জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতিই সংসার) অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, তাহাই তোমাকে বলিব।*

ব্যাখ্যা ঃ কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কর্ম উচিত, কোন্ কর্ম উচিত নহে তাহা বুঝা যায় না। অভ্যুদয়ার্থীর (যে জাগতিক প্রতিষ্ঠা, উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে) কর্ম একরূপ, মুমুক্ষুর কর্ম অন্যরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ছোট-খাট বাসনা একবার চাখিয়া দেখিবে ও ত্যাগ করিবে। বড় বাসনা বিচার করিয়া ত্যাগ করিবে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার মূল। অর্থাৎ কোন্‌টি ছোট কর্ম, কোন্‌টি বড় কর্ম তাহা বুঝা সাধারণ মানুষ তো

দূরের কথা, মহাপণ্ডিতগণেরও সেব্যাপারে বিভ্রম উপস্থিত হয়। তাহা ছাড়া মুমুক্ষুর মধ্যেও নানা স্তরভেদ আছে। সেই সেই স্তরভেদ অনুসারে কিছু কর্ম কর্তব্য, কিছু কর্ম আছে যাহা অকর্তব্য। এই বোধে জাগ্রত থাকিয়া জীবনে চলাকেই স্বধর্মপালন বলা হয়।

মুমুক্ষু তাঁহার অন্তরে 'দারিদ্র্য-সাধনা'র অগ্নি এমনভাবে প্রজ্বলিত রাখিবেন যে, কখনো কাহারো সহিত বিবাদ উপস্থিত না হয়।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥১৭॥

শ্লোকার্থ : *যতপ্রকার কর্ম আছে তাহার অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম এবং অকর্মের তত্ত্ব—এ তিন কর্মের গূঢ়ার্থ বুঝিলে আরো অনুভব হয় যে, এই তিন তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।*

ব্যাখ্যা : যেকোন কর্ম করিবার পূর্বে তাহার উদ্দেশ্য, তাহার ফল এবং সাধনপদ্ধতি (end, means and plan-estimate) জানা কর্মীর অবশ্যকর্তব্য। প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষ কিছু না বুঝিয়া অপরের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহা যথার্থ শিক্ষার অভাবজনিত দোষ। ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। বংশ ও পরিবার কিংবা দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত সঠিক না বুঝিয়া অধিকাংশ লোকই গতানুগতিকভাবে কর্ম করিয়া থাকে। এরূপ অজ্ঞতাপ্রসূত কর্মের ফলে সমগ্র জাতির অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়। অতএব কর্তব্য নির্ণয় করিবার পূর্বে বিজ্ঞ এক ব্যক্তির নহে, বহু ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র আলোচনা করিবে এবং ঐ কর্মে নিজের রুচি ও সামর্থ্য কতখানি আছে তাহা বিবেচনা করিয়া কাজে হাত দিবে। যে-কর্ম না করিলে নিজের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে হয়—তাহাই কর্ম। সন্ন্যাসী যদি মুমুক্ষুর পাঠ্য শাস্ত্রগ্রন্থ না পড়ে, যদি সে সন্ন্যাসি-সঙ্গ বর্জিত হয়, সন্ন্যাসের সাধনপদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে অনিবার্য কারণে সে পরিশেষে অনন্ত দুঃখভোগ করিবে।

অকর্ম তাহাই, যাহা করিলে বাহ্যত বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলেও বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। যেমন তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করা, বাজে গল্প করা [অথবা অযথা টেলিভিশন দেখা] ইত্যাদি। বিকর্ম তাহাই, যাহাতে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়, নিজের ক্ষতি হয়।

অর্থাৎ যে-কর্ম কর্তার কোন কাজে লাগে না, তাহাই অকর্ম। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম সকাম কর্মের ন্যায় নিজের কাজে লাগে না যদিও, তথাপি তাহাতে পরের উপকার হয় এবং নিষ্কাম থাকিবার অভ্যাস দৃঢ় হয়। সুতরাং কর্তার পক্ষে [যাহার কর্তৃত্ববোধ আছে] নিষ্কাম কর্মকেও অকর্মই বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানী যখন কোন কাজ করেন, তাঁহার পক্ষে সব কাজই 'অকর্ম' বটে, কিন্তু অন্যেরা সেগুলিকে কর্মরূপেই দেখিতে পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন ব্যাস যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলেন, গোয়ালিনীগণ বলিল : এত জল, নদী-পারাপারের নৌকা নাই, কি হইবে? ব্যাস দুধ-মাখন-সর-ননী যাহা ছিল সবই খাইয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন : হে যমুনা, আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি, তবে তুমি দু-ভাগ হইয়া যাইবে, আমরা সেই রাস্তা দিয়া ওপারে যাইব। বাস্তবিকই তাহাই হইল। গোয়ালিনীগণ অবাক হইয়া ভাবিল, ও মা, ব্যাস এইসব খাইলেন, আর পরমুহূর্তেই বলিতেছেন : আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি!

[**মন্তব্য :** কর্তৃত্ববোধ থাকিলে নিষ্কাম কর্ম যদি অকর্মই হয়, তাহা হইলে উপায় কী? স্বামী বিবেকানন্দ ইহার উপায় বলিয়াছেন, কর্ম করিলেই কর্মফল লাভ হইবে। কিন্তু উহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিলেই সেই 'অকর্ম' 'কর্মে' পরিণত হইবে। ইহাই রহস্য।—**সম্পাদক**]

[ক্রমশ] ॥ ষোল ॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান : শব্দচেতনা ৩০

পাশাপাশি : (১) অভয়, (৩) গোলাপ, (৮) নিষ্ঠা, (৯) যোগেন, (১০) গয়া, (১৩) রাজার, (১৪) হরিশ, (১৮) ভাব, (১৯) মনন, (২০) মন, (২৩) শীতলা, (২৪) আলগা।

ওপর-নিচ : (২) ভয়, (৪) লাল, (৫) মানিক, (৬) খগেন, (৭) প্রয়াগ, (১১) প্রজার, (১২) গিরিশ, (১৫) স্বভাব, (১৬) আনন্দ, (১৭) মানত, (২১) জাত, (২২) গোল।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন সাহা, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ।

ভা ব ণ

অতুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, এককথায়, সহজ মানুষ। সহজ—যাঁর ভিতরে কোন কপটতা নেই, যাঁর ভিতরে লোকদেখানো কিছু নেই, শিশুর মতো সরলতা যাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু সেই সরলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে অসাধারণ তত্ত্বের পরিবেশন করেছেন, সেটি দেখে অবাক হতে হয়। বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশিত তাঁর যে-প্রতিভা, তা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। তিনি কথাশিল্পী, আবার মৃৎশিল্পী—মূর্তি গড়তে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, অঙ্কনবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ তিনি। তারপর সর্বশেষ কথা হলো, তিনি মানুষের মনোজগতের রাজা, নিয়ন্তা। সকলের মনকে নিয়ে তিনি যেন তার একটা অদ্ভুত গঠন দিচ্ছেন। স্বামীজী একজায়গায় বলেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতরে অসাধারণত্ব, অলৌকিকতা—miracle করবার শক্তি ছিল কিনা লোকে ভাবে। আমাদের মতো এই নবশিক্ষিত যুবকদের মনগুলোকে নিয়ে কাদার তালের মতো যেমন ইচ্ছে করেছেন। এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী আছে?" সবদিক থেকে এই মানুষটি অদ্ভুত! একেবারে আবাল্য তাঁর ভিতরে অসাধারণত্ব। বলা হয়, 'যেন তস্য প্রতিমা অস্তি'—তাঁর প্রতিমা অর্থাৎ ভগবানের অনুরূপ আর কিছু নেই।

'ভাগবত'-এর ভিতরে একটি কথা আছে, সুতপা এবং পৃশ্নি—বসুদেব এবং দেবকী হয়ে জন্মেছেন। তাঁরা সেই আদি যুগে খুব তপস্যা করেছিলেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেনঃ "কি বর চাও বল।" তাঁরা বললেনঃ "তোমার মতো একটি ছেলে চাই।" ভগবান বললেনঃ "তথাস্তু।" ভগবান বরদরাট—তিনি বরদাতাদের রাজা। তাঁর অদেয় কিছুই নেই! তিনি বললেন—'তথাস্তু', কিন্তু বিপদে পড়লেন তারপর। চারিদিকে খুঁজছেন তাঁর মতো একটি ছেলে। তারপর শেষকালে বলছেনঃ

"অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ।।"

(১০।৩।৪১)

অর্থাৎ হে সতি! এই সংসারে শীল ও উদারতা গুণে আমার সদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে আমিই তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম। তাই আমার নাম হয়েছিল পৃশ্নিগর্ভ।

তিনি জন্মেছেন শুধু একবার নয়, বারবার তিনবার। কারণ, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরকম একটি অসাধারণ মূর্তি, যিনি অতুলনীয়। তাঁর সঙ্গে আর অন্যের তুলনা হয় না। মাস্টারমশায় অনেক জায়গায় বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না, তিনি অতুলনীয়। কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ "আচ্ছা, আমাকে তোমাদের কার মতো মনে হয়, বল দেখি?" মাস্টারমশায় বললেনঃ "আপনি অতুলনীয়। আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।" আরেকবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "আচ্ছা, আমার ব ত আনা জ্ঞান হয়েছে, কত আনা ভক্তি হয়েছে?" মাস্টারমশায় বলছেনঃ "মশায়, অত আনা-টানা বুঝি না। কিন্তু জগৎ এরকম আর দেখেনি।" এই কথাটি হলো শেষকথা। তাঁর মতো মানুষ জগৎ আর দেখেনি। এটা কি গোঁড়ামির কথা হলো? তা জানি না। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলে আমরা কি দেখি? দেখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আর দ্বিতীয় নেই। কেন? না, বিভিন্ন মনোভাবের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষদের সকলকে এমন করে মোহিত করতে পারা, তাঁর মতো অসাধারণ যাদুকর ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর একটি অদ্ভুত যাদু এই যে, সকলকে আকৃষ্ট করছেন—আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ পড়ছেন না তাঁর আওতা থেকে। যিনিই আসছেন, তিনিই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আসছেন হয়তো বিরোধ করতে, এসে অভিভূত হয়ে যাচ্ছেন তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখে। সেই ব্যক্তিত্বের ভিতরে গাম্ভীর্যতা আছে। তবু, যখন কথামৃতকারের মাধ্যমে আমরা তাঁর জীবনের ঘটনার কথা শুনি, আমরা লক্ষ্য করি এমন কেউ নেই, যে তাঁর সেই আকর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। এ হেন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের চর্চা হচ্ছে। তাঁর জন্মের আজ ১৫০ বছর পরে—১৫০ বছর জগতের ইতিহাসে হয়তো খুব বড় কথা নয়, কিন্তু লক্ষণীয়—এই ১৫০ বছরের ভিতরে সমস্ত জগৎটাকে তিনি কিরকমভাবে নাড়া দিয়েছেন। জগৎটা যেন এখন তাঁর কথা শোনার জন্য উৎসুক! হয়তো দু-চারজন যারা দেখবে না, তাদের কথা আলাদা। যারা বধির তারা শুনবে না, তাদের কাছে তাঁর ডাক হয়তো পৌঁছাবে না। কিন্তু যারা একটু চোখ চেয়ে দেখবে—যারা মনের দরজা একটু খুলে ফাঁক করে দেখবে, তারা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারবে না।

ঠাকুর অনেক কথা বলেছেন। একটি হলোঃ "যারা এখানে এসেছে, তাদের শেষজন্ম।" আরেকটি কথা হলোঃ "যারা ঠিক ঠিক ভগবানকে ডেকেছে, তাদের এখানে আসতেই হবে।" 'এখানে' মানে কি দক্ষিণেশ্বরে? 'এখানে' মানে কি শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরটিতে থাকতেন, সেই ঘরটিতে? আমাদের

মনে হয়, 'এখানে' বলতে তাঁর ভাবকে আশ্রয় যে করবে। এই ভাব তাকে মুগ্ধ না করে পারে না। তিনি সরল সোজা কথায় বলেন তাঁর কথাগুলি। কথার ভিতরে যে বেশি কোন কূটিলতা জটিলতা আছে, কথার ভিতরে যে শিল্পের চেষ্টা আছে—তা নয়। সহজ শিল্পী তিনি। যা কথা বলেন তাই অদ্ভুত, তাই আকর্ষণের। কেন? না, তিনি প্রাণ থেকে কথা বলেন—যা লোকের প্রাণকে স্পর্শ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের বরাবরের বৈশিষ্ট্য এটি। আবার তাঁর ভাবকে প্রকাশ করছেন কখনো অদ্ভুত নিপুণ ভাষায়। সেদিক থেকে তিনি কথাশিল্পীও বটে।

তারপর—আসল কথা হচ্ছে ভাবের বৈচিত্র্য। কত বিচিত্র তাঁর ভাব! কত বৈচিত্র্য! তাঁর কাছে আসছে সন্ন্যাসী, তাঁর কাছে আসছে গৃহস্থ। তাঁর কাছে আসছে বিদ্বান, তাঁর কাছে আসছে মূর্খ। প্রত্যেকেই তাঁকে দেখে মোহিত। কেন? না, তারা অন্তরে হয়তো যে-আদর্শটাকে চাইছিল, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর ভিতরে দেখতে পাচ্ছে। আমাদের ভাল লাগার কথাটা যে বলি তার অর্থ হলো, যখন আমাদের মনের ভিতরে একটা সুপ্ত আদর্শ থাকে, কেউ ভাষায় বা চিত্রে সেই ভাবটাকে যখন অভিব্যক্ত করে, তখন আমাদের সেই ভাব ভাল লাগে। এইজন্যই বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু ভাল লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ কিন্তু একদেশী নয়, সর্বগ্রাহী তিনি। তিনি বলছেন: "আমি শুকনো সাধু হতে চাই না। আমি রসে-বশে থাকব।" তাঁর 'রসে-বশে' থাকা মানে তিনি নিজে যে শুধু রসে ভরপুর তা নয়, যে তাঁর কাছে গেছে সে-ই তাঁর রসের দ্বারা আপ্লুত হয়ে গেছে। এটি দেখার জিনিস। যারা তাঁর কাছে গেছে, সকলেই যে তাঁকে পূজা করতে গেছে, তা নয়। অনেক 'critic' ছিল, সমালোচক ছিল। অনেকে গেছে কৌতূহলী হয়ে—কি জানি কি একটা বস্তু! কিন্তু গিয়ে যে-বস্তুটিকে দেখেছে, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এইটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বলোকসম্মোহিনী শক্তি। সকল লোককে মোহিত করছেন। কিন্তু অন্যের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়ে দিয়ে নয়—মোহিত করছেন তাকে তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে। এই হলো বৈশিষ্ট্য।

আমরা বলি, ঠাকুর সর্বভাবময়। আবার, তিনি কারো ভাব নষ্ট করতেন না। স্বামীজীকে বলছেন: "ওরে, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। যার যা ভাব—পারলে তাকে সেই ভাবে সাহায্য করিস। তা না পারলে কারো ভাব নষ্ট করিস না। তাতে অকল্যাণ হয়।" বাস্তবিকই তাই। স্বামীজী ঠাকুরের এই শিক্ষা চিরকাল মনে রেখেছেন। তাঁর ভাষণের মধ্যে অনেক জায়গায় বলেছেন, শিক্ষা মানে তোমার ভাবকে তোমার ছাত্রের ওপরে চালিয়ে দেওয়া, প্রবেশ করিয়ে দেওয়া—তা নয়। স্বামীজী শিক্ষার সুন্দর আদর্শ বলেছেন। বলছেন, যেমন একটি চারাগাছ—তাকে সার দিতে হয়, জল দিতে হয়, বেড়া দিয়ে রাখতে হয় যাতে গরু-ছাগলে না খায়। কিন্তু গাছ আপনার শক্তিতে বাড়বে। এইভাবে আপনার শক্তিতে যে-গাছটি বড় হবে, সেটি তার বৈশিষ্ট্য হারাবে না। তার যা বৈশিষ্ট্য সেইটি নিয়েই সে এগোবে। ঠাকুর এইজন্য কাউকে বলেননি—দেখ, তুই এই ভাবটা অনুসরণ করে চলবি। বলেছেন—তোমার যে-ভাবটি ভাল লাগে সেটি তুমি নাও। তিনিও তাকে সেপথেই সাহায্য করেছেন। বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। কল্পতরুর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। তাহলে, তিনি কিরকম কল্পতরু হয়েছিলেন? তিনি তো শুধু একটি কথা বললেন: "তোমাদের চৈতন্য হোক।" এখন 'চৈতন্য' বলতে কি বুঝব? জানি না। 'চৈতন্য' মানে যদি এই হয় যে, তোমার ভিতরে যে-সত্তা, তোমার যে-আদর্শ—তা তোমার কাছে পরিস্ফুট হোক। তুমি তোমার জীবনকে সেই আদর্শপ্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রিত কর। সর্বপ্রকারে নিজেকে তাতে নিয়োজিত কর। এরকম যদি অর্থ হয়, তাহলে আমরা দেখছি এটি একটি সুষ্ঠু কথা। কারণ, যারা তাঁর কাছে সেই আশীর্বাদ পেয়েছে, তাদের একরকম অনুভূতি হয়নি। একথা লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কল্পতরু হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন, যার যেটি ভাব বা আদর্শ—সেই ভাবটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই তো বৈশিষ্ট্য। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—কারো ভাব নষ্ট করেন না। একটা ভাব চালাতে হবে বলে কারো ওপর চালিয়ে দিলেন—তা নয়। তিনি সকলের ভিতরে সেই জীবনীশক্তি সঞ্চার করেন—যে-জীবনীশক্তি প্রত্যেককে তার নিজের আদর্শে পৌঁছে দেবে। এটি হলো বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বৈশিষ্ট্যকে দেখে আমরা অবাক হই। আর এরকম ভাবের এত বৈচিত্র্য—এধরনের আদর্শ জগতে আর দ্বিতীয় একটি হয়েছে কিনা জানি না।

অবশ্য অনেক জায়গায় কিছুটা উল্লেখ আছে। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন:

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।" (৪।১১)

অর্থাৎ যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেইভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি।

তিনিও বলছেন, তিনি ভাব নষ্ট করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই যে, তিনি কারো ভাব নষ্ট করেন না।

আরেকটি কথা। তাঁর কাছে এসে কেউ থেমে থাকতে পারবে না। এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। তীব্র প্রেরণা তিনি দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প—কাঠুরিয়াকে ব্রহ্মচারী বললেন, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া অতি কষ্টে কাঠ কেটে দিন নির্বাহ করত। ব্রহ্মচারী বললেন, এগিয়ে পড়। এগিয়ে দেখল চন্দন কাঠ।

অনেক রোজগার হলো। সে একদিন ভাবল, আমাকে এগোতে বলেছে, এখানেই তো থামতে বলেননি। আরো এগিয়েছে। আরো এগিয়ে রুপোর খনি। তারপর সোনার খনি, তারপর হীরে, জহরত পেয়ে সে 'আপ্তিল' হয়ে গেল। এইভাবে প্রত্যেককেই তার নিজের ভাব দিয়ে 'আপ্তিল' করে দেওয়ার জন্য—পূর্ণ সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত জীবনকে নিয়োজিত করেছেন। আর তাঁর কাজ কেমন? না, কর্মী আমরা যাকে বলি, বাইরে দৌড়ঝাঁপ করে যে কাজ করা—তেমন কর্মী তিনি নন। তিনি বলছেন, আমি কিছু জানি না। মা যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি। সব ঠিক কথা। কিন্তু কী বিচিত্র সেই করা! যেন প্রত্যেককে তিনি তার একেবারে চরম আদর্শে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর, প্রত্যেকের ভিতরে এই যে একটা নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব তিনি গোড়া থেকে সকলের মনে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন—এটি বিশেষ করে বর্তমান যুগে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলেও তাঁর অসাধারণ অবদান। এমন করে সকলকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে বলা, আর কজন বলেছেন জানি না। তবে বলার ভিতরে কোন কপটতা নেই। কোন একটা কার্যসিদ্ধির জন্য কৌশল করে একটা কথা বলা, পরস্পরের ঝগড়া থামিয়ে দেওয়া—তা নয়। তিনি সোজা বিচার করে বলেছেন, তুমি অপরকে সমালোচনা করছ। তুমি কি তার মতে সাধনা করেছ? আমরা তার মত তো পরীক্ষা করিইনি; যে-মতে আমরা চলছি, আমাদের অমুক সম্প্রদায়—সেই নিজের সম্প্রদায়ের মতকেই আমরা জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত করেছি? তা না করে আমরা সকলকে বলছি—ওরা ভ্রান্ত, ওরা ভ্রান্ত। এটা আমাদের মূর্খতা। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কথা বলেছেন—তোমার নিজের মতে তোমার শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তা না থাকলে তুমি এগোতে পারবে না। কিন্তু অপরের সম্বন্ধে তোমার সমালোচনা করার অধিকার নেই। পার তো সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। আর তা যদি একান্ত না পার, তাহলে তুমি তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করো না। বরং তুমি বল, আমি জানি না। এই 'জানি না'টুকু বললেই ভাল, যথেষ্ট। কিন্তু তিনি আরো চেয়েছেন। নিজে করেছেন বিভিন্ন মতের সাধনা। যখন যে-সাধনা করেছেন, নিয়মিতভাবে সেই সম্প্রদায়ের সাধকেরা যেমনভাবে করেন, তেমনিভাবেই করেছেন। করে চরম তত্ত্ব, চরম অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে যে, সব একজায়গাতেই পৌঁছায়। "সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্।" যত জল, তাদের গতি শেষকালে সমুদ্রে। একথা আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১১) পেয়েছি। গীতাতেও কতকটা বলছেন। আরো অন্য জায়গায় বলছেন। কিন্তু জীবনে এরকম হাতে-নাতে করে কেউ দেখিয়েছে—একথা আমাদের অধ্যাত্ম ইতিহাসে কোথাও নেই। কোথাও একথা নেই যে, একজন তার জীবনে এতরকম সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আবার বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্নতা কত! তাঁর কাছে নানা মতের লোক আসত, নানা ভাবের ভাবুক আসত। প্রত্যেককে তার ভাব নিয়ে কথা বলতেন। সেই কথা যখন যাকে বলেছেন, সেই লোকের মনে হয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরই মতের লোক। এমনকি সমাজের যেসব সম্প্রদায়কে ঘৃণ্য বলে লোকে মনে করত, সেইসব সম্প্রদায়েরও জীবন তিনি দেখেছেন ভিতর থেকে। তাদের সাধনার ধারাটি দেখে তিনি পরে বলেছেন, নোংরা পথ হলেও সেটি একটি পথ বটে। সব দিক দিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। তবে তোমরা রাজার ছেলে, সেই আঁস্তাকুড় দিয়ে কেন যাবে? তোমরা যাবে রাজপথ দিয়ে। তোমরা রাজদেউড়ির ভিতর দিয়ে যাবে। তোমরা আঁস্তাকুড় দিয়ে যাবে না। এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন। সাবধানতাও খুব সতর্ক হয়ে করেছেন। তা না হলে আমাদের কি গতি হতো জানি না। সেই সময়ে সমাজে ধর্মের নামে নানাপ্রকারের কুরীতি প্রচলিত ছিল। সেইগুলিকে তিনি নিন্দা ঠিক সরাসরি করেননি। ওটা যে কারোর পক্ষেই অনুকূল পথ নয়—একথা বলেননি। কিন্তু ঐ নোংরা পথ দিয়ে যেও না—এই কথা বলেছেন। খুব সাবধান করে দিয়েছেন।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর ছোকরা ভক্তরা রয়েছে। একজন সেজে এসেছে ব্রহ্মচারী বেশে। তাকে দেখে নরেন্দ্রনাথ বলছেন: "ও ব্রহ্মচারী তো আমি বামাচারী।" ঠাকুর এতক্ষণ রসিকতা করছিলেন। নরেন্দ্রের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন: "দেখ, ওকথা রহস্যচ্ছলেও বলতে নেই।" আদর্শের ভিতরে কখনো গরমিল করো না। যা আছে সেটাকে নিজে ধরে রাখ। শুদ্ধ আদর্শকে ধরে রাখবে। তারপরে যা তোমার পরম উপলব্ধি—তাতে যখন পৌঁছাবে, দেখবে সকলেই সেখানে পৌঁছেছে। যেমন সব নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু একটি সামান্যীকরণ—'generalisation', তা নয়। তিনি নিজে প্রত্যেকটির অনুষ্ঠান করে এবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখেছেন—বিভিন্ন জায়গা দিয়ে গিয়ে সকলে একই তত্ত্বে পৌঁছায়। একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাটের একই জল সবাই খাচ্ছে। নাম বলছে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা হয়েছে আমাদের ভাষায়—আমাদের ভাবপ্রকাশের যে-যন্ত্র, তাতে। আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের সংস্কার, আমাদের পরিবেশ—যেখান থেকে আমরা গড়ে উঠেছি, সেসবের বিভিন্নতার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু যদি আমরা এগিয়ে যাই, কোন জায়গায় থেমে না যাই—নিজের আদর্শটি সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হয়ে অবিচলিত থেকে অন্বেষণ করে যেতে পারি; তাহলে দেখব যে, আমাদের প্রভেদ ক্রমশ কমে আসছে এবং শেষকালে দেখব, আর কোন

প্রভেদ নেই। এটি শ্রীরামকৃষ্ণের একটা অদ্ভুত অনুভূতি, যা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদরূপে তিনি দিয়ে গেছেন। এই তত্ত্বটি জগতের জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সিদ্ধ হয়েছে। শুরু থেকেই তিনি বলছেন : "সত্যি বলছি, ভগবান ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না।" আর কিছু জানার তাঁর প্রয়োজন নেই। কারণ, সকল আদর্শের যেখানে পূর্ণতা, সেখানেই তাঁর ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে অনুভব করে দেখেছেন, বিভিন্ন দিক থেকে সব ধারা এসে এই ঈশ্বরেতে সমবেত হচ্ছে। আমাদের ধৈর্য নেই, আমাদের চেষ্টা নেই শেষপর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার। পথ নিয়ে আমরা পথেই হৈচৈ করি, কোলাহল করি, আর তাতে পথেই আমাদের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে সমাজে দ্বেষভাব আরো বাড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছেন এইভাবে সকলকে নিয়ে যেতে। এটা কেবল একটি সিদ্ধান্তরূপে নেওয়া নয়, প্রত্যেককে জীবনে এটি অনুসরণ করতে বলেছেন। সমষ্টি হলো ব্যক্তিরই সমষ্টি। ব্যক্তি যদি শুদ্ধ হয়, সমষ্টির ভিতরে শুদ্ধি অবশ্যই আসবে। সমষ্টির শুদ্ধি আর কিছু নয়—ব্যক্তির শুদ্ধি। ব্যক্তিগুলি যদি শুদ্ধ হয়, আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি, তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করতে পারি, কোন একটা মতবাদ নিয়ে মত্ত হয়ে না থেকে কেবল সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে যদি এগোতে পারি—তাহলে তাঁর এই চরম অনুভূত তত্ত্বটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

ভগবান লাভ হলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবান লাভ মানে হলো—ভগবান হওয়া। আমরা যত সেই ভগবানের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাব, তত দেখব আমাদের এই 'কাঁচা আমি'টা বদলে যাচ্ছে। বদলে বদলে 'পাকা আমি' হবে এবং শেষপর্যন্ত তাতে পরিণত হবে। ঠাকুর বলছেন, কুমোরে পোকাকে চিন্তা করতে করতে আরশোলা কুমোরে পোকা হয়ে যায়। এটি একটি দৃষ্টান্ত। ঠিক সেইরকম ভগবানকে ভাবতে ভাবতে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। হয়ে যাওয়া শুধু নয়, সে ভগবান আছে। এই কথাটুকু বিশেষ করে মনে রাখার মতো যে, আমাদের ভিতরেই সেই দেবত্ব রয়েছে। তিনি সর্বঘটে বিরাজ করছেন। কেবল সেই প্রকাশের তারতম্য। যদি আমরা তাঁর স্বরূপকে খুব জোর করে ধরে চলি, শেষকালে দেখব তিনি সমস্ত কিছুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। ঠাকুর বলছেন : "দেখলুম, মা রতির মার ভেতরেও।" রতির মা বেশ্যা। সেই বেশ্যার ভিতরেও সেই জগন্মাতা রয়েছেন। তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করা। ঠাকুর এইটি করেছেন। আমাদের এই যুগে এইটি একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত যে, সকলকে আমাদের সেই দেববুদ্ধিতে দেখা—ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখা। স্বামীজী সে-আদর্শটিকে কাজে লাগালেন। ঠাকুরের কথাটিকেই তিনি বলেছেন : "গাছে, পাথরে, কাঠে ভগবানের পুজো হয়, আর মানুষে তাঁর পুজো হয় না?" অবশ্যই হয়, যখন মানুষের ভিতরে তাঁর প্রকাশ দেখা যায়। আর কেউ যদি এইরকম নিজের ভিতরে তার দিব্যভাবকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, তখন সেই মানুষই ভগবান হয় এবং সেই ভগবানের প্রতি সকলের আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক। আবার, যেখানে বিশেষ করে বিভিন্ন পথগুলি এসে সমন্বিত হয়েছে, একসঙ্গে মিলেছে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা"—শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। একথাটি একেবারে তাঁর সমস্ত জীবন-ইতিহাসের নিষ্কর্ষ।

আমরা এই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান করতে করতে এই যুগে যদি কথঞ্চিৎ তাঁর ভাবে আমাদের জীবনকে ভাবিত করতে পারি, তাহলে এই বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এবিষয়টি স্মরণ করে আমরা বারবার তাঁকে প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে থাকেন। তিনি যেন আমাদের আদর্শরূপে সর্বদা বিরাজ করেন—যাতে আমরা তাঁকে সেইভাবে প্রকাশিত দেখে সকল জীবের প্রতি সৌহার্দ্যসম্পন্ন শুধু নয়, সকলের প্রতি একাত্মতা বোধ করতে পারি। স্বামীজী এই আদর্শটিকে প্রচার করেছেন বেদান্তের ভাষা দিয়ে, পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে। অন্যদিকে, সেই কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ সরল কথায় বলেছেন। এই কথাটিই আজ আমরা চিন্তা করে তাঁকে স্মরণ করছি।* ❑

* ১৯৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর আয়োজিত ধর্মসভায় পরম পূজ্যপাদ মহারাজের সভাপতির ভাষণ। ভাষণটির সংগ্রাহক ও অনুলেখক স্বামী ঋতানন্দ।

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচী : চৈত্র ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	:	রামনবমী চৈত্র শুক্লা নবমী ১৬ চৈত্র, মঙ্গলবার (৩০ মার্চ ২০০৪)
একাদশী-তিথি	:	৩, ১৮ চৈত্র বুধবার, বৃহস্পতিবার (১৭ মার্চ, ১ এপ্রিল ২০০৪)



ফাল্গুন ১৩১০
ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

জ্ঞান।

(শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিত।)

বাঙ্গালা দেশে আমরা জ্ঞানের কথা শুনিলে ভয় পাইয়া থাকি। মুক্তি লাভ হইলে কিছুই থাকিবে না, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি, জ্ঞান শুষ্ক মার্গ, জ্ঞানের কচকচিতে কি হইবে ইত্যাদি কথা আমরা প্রায় শুনিতে পাই। এমন কি, কাহাকেও কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি, সোঽহংবাদী হইলে স্বেচ্ছাচার হইতে হয়। কেহ কেহ আবার জ্ঞানমার্গ সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় বলিয়া জ্ঞানকে সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন।

আমাদের দেশে জ্ঞানের বহুল চর্চ্চা নাই বলিয়াই যে এই সমুদয় কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে যাহার সম্বন্ধে যত অনভিজ্ঞ, সে তাহাকে তত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্, জ্ঞান বলিতে কি বুঝা যায় এবং তাহা সাধনের উপায়ই বা কি?

জ্ঞানীদের মত এই,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু আর সব অবস্তু। এই তাঁহাদের মূল মত। ইহারই উপর তাঁহাদের অন্যান্য মত প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে এই মত একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

এই কান্ত-ভীষণ প্রকৃতির লীলা, এই বিচিত্র-বৈষম্যময়-প্রকৃতিশালী নরনারীর বিচিত্র সম্মিলনস্বরূপ সমাজ-সংহতি এ কি? এসকল কোথা হইতে আসিল? ইহার আদি কোথা, অন্তই বা কোথা?

দেখিতেছি, জগতে নানা প্রকার সুখ আছে, আবার দুঃখও আছে। কেহ কেহ ক্রমাগত সুখ সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে, কেহ আবার যেন দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, আবার কেহ কেহ কতক সুখ কতক বা দুঃখ ভোগ করিতেছে। মনীষী ব্যক্তিগণ ইহার রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক সুখী দুঃখী বলিয়া কোন ভেদ নাই, কারণ, সকলেই বাসনানলে দগ্ধ। সুতরাং যাহাকে আমরা দুঃখী বলিতেছি, তাহাকে সাংসারিক ভোগসুখ অধিকতর পরিমাণে দিলেই যে সে সুখী হইবে, তাহা কখনই নহে, তাহার দুঃখ কোন মতেই ঘুচিবে না।...

জ্ঞান কাহাকেও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলে না, বরং বলে, 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম',—কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মী যখন নানারূপ কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, যখন সে আচমনের সময় কয় গণ্ডূষ জলপান করিব, উত্তরমুখো বা পূর্ব্বমুখো বসিয়া পূজা করিব, কতবার জল ছিটাইব, অমুকের হাতে খাইতে দোষ ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, এ সব কি ছেলেখেলা করিতেছি, এ সকলের অর্থ কি, তখন জ্ঞান বজ্রগম্ভীর-রবে বলেন, 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম',—তাহাই কর্ম্ম, যাহা চিত্তশুদ্ধিকর। চিত্তশুদ্ধি যাহাতে হয়, তাহাই কর। যদি পূর্ব্বমুখো বসিলে তোমার চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হয়, তাহাই কর, আবার পশ্চিমমুখে বসিলে যদি হয়, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। বস্তুতঃ 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম'। অতএব জ্ঞানের আলোকে কর্ম্মী যথার্থরূপে ও উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন, দেখা গেল।

ভক্ত—তোমার ভক্তির বস্তু কোন ঐতিহাসিক অবতার বা সাকার মূর্ত্তি অথবা সগুণ ব্রহ্ম। তার্কিক আসিয়া বুঝাইয়া দিল ইতিহাসের প্রমাণে কৃষ্ণ বা খ্রীষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না; সাকার মূর্ত্তি ভগবানের হইতেই পারে না; যাঁহাকে ঈশ্বর বল, তাঁহাতে যে দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের আরোপ কর সেই গুণগুলি বাস্তবিক পরস্পরের বিরোধী। ঈশ্বর যদি দয়াময় হন, তবে তিনি কেন সকল জীবকে সুখী করিলেন না? তিনি যদি জানিতেন, জগতে কেবল দুঃখই বিরাজ করিবে, তবে তিনি জীবকে সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? যদিই বা সৃষ্টি করিলেন তাহাকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? এ সকল প্রশ্নে ভক্তের চিত্ত যখন সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হয়, তখন জ্ঞানী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, অবতারগণের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও ভাবরূপে তাঁহারা নিত্য। সাকাররূপ সকলও এইরূপ নিত্য, ভক্তিযোগে এই সকল রূপ যোগনেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে।...

জ্ঞানী যোগীরও গুরু। যে সকল যোগী নেতি ধৌতি প্রভৃতি নাড়ীশুদ্ধিকর কার্য্যে মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলেন, নাড়ীশুদ্ধির উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তোমার সমুদয় কার্য্য বৃথা। যাঁহারা সামান্য একটী সিদ্ধি পাইয়া মাতিয়াছেন, জ্ঞানী তাঁহাদিগকে বলেন, সমুদয় সিদ্ধি তোমার ভিতরে, শুধু তোমার নয়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে রহিয়াছে। তুমি একটি সামান্য সিদ্ধি লইয়া মাতিয়াছ, ইহা ত তোমায় সাজে না। তুমি ব্রহ্ম। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া একবার যথার্থ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থিত হও দেখি।

অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মী, ভক্ত বা যোগী কাহারও বিরোধী নহেন, বরং সকলেরই সহায়ক।

জ্ঞানকে লোকে শুষ্ক তর্কের সঙ্গে এক করিয়া থাকে। জ্ঞান বাস্তবিক শুষ্ক তর্ক নহে। বাস্তবিক যতক্ষণ না তর্কবৃত্তির নিরোধ হয়, ততক্ষণ জ্ঞানের উদয়ই হয় না। সাধারণ বিষয়জ্ঞানের সহিতও ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে এ তিনের লয় হয়। উহা একরস, একতত্ত্বস্বরূপ।

এই জ্ঞান—কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যে কোন আশ্রমী, যে কোন বর্ণ, আম্লেচ্ছচণ্ডাল সাধন করিতে পারেন। কারণ, সকলেরই ভিতর এই জ্ঞানস্বরূপ রহিয়াছেন, কেবল একটা আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। সাধন-চতুষ্টয় দ্বারা এই আবরণ সরাইতে পারিলেই জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞানই আনন্দ ও ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

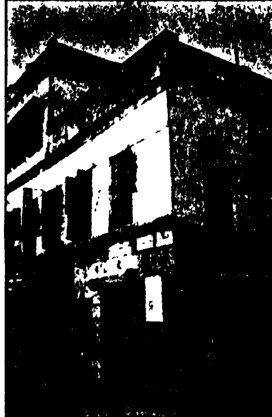
রাজাবাজারে গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার চতুর্দশ পর্যায়ে রাজাবাজারে গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ি।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের কলকাতায় প্রথম আগমন এবং রাত্রিবাসের অনুপম স্মৃতি বহন করে মধ্য কলকাতার রাজাবাজারে যে প্রাচীন বাড়িটি আজও বিদ্যমান, সেটি পণ্ডিত গিরিশ বিদ্যারত্নের 'শ্রী'-যুক্ত পরম সম্পদ এবং ভক্তগণের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের মৌন আশীর্বাদের অনুপম প্রতীক।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের সময় কার্যগতিকে শ্রীশ্রীমাকে কলকাতায় তাঁর ভ্রাতা প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৃহে এক রাত্রি থাকতে হয়। সে-বাড়িটির মালিক ছিলেন গিরিশ ভট্টাচার্য (বিদ্যারত্ন)। ঐ বাড়িতে তখন একটি ছাপাখানা ছিল এবং প্রসন্নকুমার সেই প্রেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ঐ বাড়িতে বাস করতেন বলে জানা যায়।


রাজাবাজারে গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ি
আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি : "তার পরের বার (চতুর্থবার) তো আমি, মা, লক্ষ্মী, আরো কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বরে গত অসুখের মানসিক নখ, চুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে কলকাতায় তার বাসায় (গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায়) উঠি। ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাই।"[১] অর্থাৎ মাত্র এক রাত্রি শ্রীশ্রীমা সবাইকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় সেখানে বাস করেছিলেন।

এই বাড়িতে থাকাকালীন এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শোনা যায় : "প্রথমে যখন কলকাতায় আসি, আগে জলের কল-টল তো কিছু দেখিনি, একদিন কলঘরে গেছি, দেখি কল সোঁসোঁ করে সাপের মতো গর্জাচ্ছে। আমি তো মা, ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁসোঁ করছে।' তারা হেসে বললে, 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি তো হেসে কুটিপাটি।"[২]

গিরিশ বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ কবিরত্নের দুই নাতনি বিমলা দেবী ও কমলা দেবী উত্তরাধিকার-সূত্রে এই বাড়িটি পান। বিমলা দেবীর পুত্রবধূ শিপ্রা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জানা যায় যে, পূর্বে এই অঞ্চলে বহু কাঁসারির দোকান থাকায় এটিকে তখন অনেকেই 'কাঁসারিপাড়া' বলত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি রাজাবাজার অঞ্চলে পড়ে। আরো জানা যায় যে, গিরিশ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন; সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় এই বাড়িতে বিদ্যাসাগরেরও যাতায়াত ছিল। গিরিশ বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ কবিরত্নও অধ্যাপকরূপে হিন্দু কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং পিতা-পুত্র দুজনেই অধ্যাপক হওয়ায় তৎকালে বহু জ্ঞানি-গুণী ব্যক্তির এই বাড়িতে আগমন হতো। শোনা যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই বাড়িতে আসতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদও মাঝে মাঝে এখানে এসে শাস্ত্রালোচনায় যোগ দিতেন। এখানকার প্রেস থেকে মূলত সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতো। বর্তমানে সেই প্রেস অবলুপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, বহু মনীষীর আগমনে এবং সর্বোপরি জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের এক রাত্রি বাস উপলক্ষ্যে বাড়িটি আজ তীর্থমর্যাদায় ভূষিত। ❑

পথনির্দেশ : শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানধন্য গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ির ঠিকানা : 'আনন্দম্', ২৪সি গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। মধ্য কলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত 'এম. এন. চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আই হসপিটাল'-এর বিপরীতে গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন-সংলগ্ন বড় রাস্তার ধারেই দোতলা বাড়ি।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ২২৯
২ ঐ, পৃঃ ৩১

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

নিবন্ধ

প্রার্থনার শর্তাবলী ও প্রার্থনাপূরণ

স্বামী ভজনানন্দ

'কথামৃত'-এর যেকোন পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন সাধনের উপায়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনাকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন। ঐ গ্রন্থের নির্দেশিকা খুঁজলে আমরা দেখতে পাব যে, ঠাকুর চল্লিশেরও বেশিবার প্রার্থনার সম্বন্ধে বলেছেন। যখনি কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ "মহাশয়, উপায় কি?" সাধারণত তাঁর উত্তর ছিল ঃ "উপায়—প্রার্থনা।" বারবার তিনি আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ "আন্তরিক হলে ভগবান প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।" প্রার্থনার দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার, এমনকি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬, পৃঃ ১৯৩-১৯৪) এই গ্যাস কোম্পানির কাছে আরজি করাই হলো প্রার্থনা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের আদি পর্বে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো প্রার্থনার দ্বারা। ঋগ্বেদ তো প্রার্থনায় প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন যোগ, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য সাধনমার্গ আবিষ্কৃত হলো, তখন প্রার্থনার ওপর জোর কমে গেল। বৈদিক প্রার্থনাগুলির মধ্যে একমাত্র গায়ত্রীই আজ পর্যন্ত টিকে আছে। বলা যেতে পারে, বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রার্থনার সুপ্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

এই ধারা শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের কয়েকজন সন্তান, বিশেষ করে স্বামী শিবানন্দ—যিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে বেশি পরিচিত—বহন করে চলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তাঁর উপদেশাবলীতে প্রার্থনার ওপর জোর দিয়েছেন। এমনকি স্বামী তুরীয়ানন্দ, যিনি সাধারণত জ্ঞানের উপদেশ দিতেন, তিনিও তাঁর চিঠিগুলিতে বাধা অতিক্রম করার একটি উপায়রূপে প্রার্থনার আশ্রয় নিতে বলেছেন।

প্রার্থনা কি?

প্রার্থনা শুধুমাত্র ইচ্ছাপ্রকাশ নয়। মনে যেকোন ইচ্ছা উঠুক, ভগবানকে সম্বোধন করে প্রকাশ করলেই তা প্রার্থনা হয়ে দাঁড়ায় না। প্রার্থনা হচ্ছে মানবাত্মার গভীরতম আকুতি, সুগভীর অভাববোধ—যা এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষারূপে প্রকাশিত হয়।

প্রতিদিন কত অজস্র কামনা-বাসনাই না আমাদের মনে জাগে! মানবাত্মা এইসব কামনা-বাসনার অধিকাংশই অগ্রাহ্য করে—এগুলি মনে অল্পক্ষণ থেকে তারপর মিলিয়ে যায়। কিন্তু কিছু আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় আত্মার তীব্র অভাববোধ থেকে। আত্মা এগুলি যেন 'জেনে-বুঝে' (by an act of will) বেছে নেয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দৃঢ়ীভূত এইরূপ তীব্র কোন আকাঙ্ক্ষা যখন আত্মসমর্পণের রূপ ধরে ঈশ্বরাভিমুখী হয় এবং ভগবানের কাছে সহায়তা চায়, তখনি তা প্রার্থনা হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমরা ঈশ্বরের সাহায্য চাই কেন? কারণ আমরা উপলব্ধি করি—মানবীয় চেষ্টার দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার নয়। মানবীয় চেষ্টা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ মানবাত্মার আপাত-সীমাবদ্ধতা। জীবমাত্রই দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। জীবমাত্রেই শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দেরও সীমাবদ্ধতা আছে। এইসব সীমাবদ্ধতার জন্যই আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হই না।

অপরদিকে ঈশ্বর দেশ, কাল ও নিমিত্তের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ। যেকোন জিনিস তিনি ইচ্ছামত করতেও পারেন (do), করে কাটাতেও পারেন (undo), আবার পাল্টাতেও পারেন। ("কর্তুম, অকর্তুম, অন্যথা বা কর্তুম।")

প্রার্থনা হলো অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের এই দিব্য উৎসের কাছে আপন আত্মাকে উন্মোচন করার প্রচেষ্টা। এই আভ্যন্তর উন্মোচন বাইরের দরজা খোলার মতো নয়। বরং তা ভিতর থেকে কোন ব্যক্তি যাতে খুলে দেন, সেইজন্য বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার মতো। এখানে ভিতরের দরজা হৃদয়-দুয়ার, আর ভিতরে অবস্থিত 'কোন ব্যক্তি' হলেন ঈশ্বর—অন্তর্যামী পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বাস করেন। এই ভিতরের দরজায় টোকা দেওয়া, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অন্তর্যামীকে আকুল হয়ে ডাকা—একেই বলে প্রার্থনা।

ঈশ্বরকে এইভাবে ডাকা সাধারণত তাঁর সঙ্গে মনে মনে কথা বলার রূপ নেয়। কিন্তু অনেক সময়ে তা ক্রন্দনের রূপও নিতে পারে। আর্ত মানুষ হৃদয়ের বেদনা ঈশ্বরের কাছে উজাড় করে দেয়। প্রার্থনা হলো জীবাত্মার ক্রন্দন।

এই প্রসঙ্গে আরো তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত প্রার্থনা ভক্তিমার্গেই সম্ভব। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে সম্বোধন করা হয়। একজন ব্যক্তির কাছেই কেবল আমরা মনের কথা বলতে পারি বা কাঁদতে পারি। সুতরাং প্রার্থনা সবসময়েই একজন ব্যক্তিকে—ঈশ্বর বা অবতার বা মহাপুরুষকে—সম্বোধন করে করতে হয়। যাঁরা নৈর্ব্যক্তিক পরম ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁদের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। যাঁরা ভক্তির পথে চলেন, প্রার্থনা কেবলমাত্র তাঁদেরই জন্য।

দ্বিতীয়ত, এই যে মনে মনে কথা বলা বা কাঁদা, তার পিছনে কোন না কোনভাবে সাড়া পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে। আমরা প্রার্থনা করি, কেননা আমরা আশা করি কেউ না কেউ সে-প্রার্থনা শুনবে ও সময়মতো সাড়া দেবে। প্রার্থনা আর

ধ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রভেদ হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার প্রত্যাশা থাকা আর না থাকার প্রভেদের অনুরূপ।

পরিশেষে, ওপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রার্থনার মূল ভাব হলো ঈশ্বরকে নিজের ইচ্ছাপূরণের উপায়ে পরিণত করা। ঈশ্বর মানবজীবনের কেবল উদ্দিষ্টমাত্রই নন, তিনি উপায়ও। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করি আর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিই। প্রার্থনার মাধ্যমে সাধক যখন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজের হৃদয় উন্মোচিত করে দেয়, ঈশ্বর তখন তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তখন উপায়ে—মহত্তম উপায়ে—পরিণত হন।

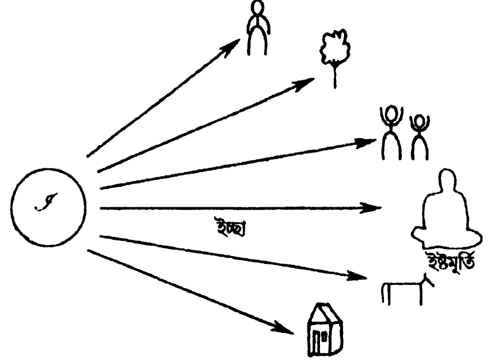
দ্বিবিধ প্রার্থনা : আধ্যাত্মিক ও জাগতিক

যেসব ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তাদের বিপুলতর অংশ প্রার্থনাকে কোন না কোন জাগতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করে। নানা ইচ্ছা ও ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দুঃখ ও যন্ত্রণার ধাক্কা খেতে খেতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। এইসব প্রয়োজন বলতে ধন ও সমৃদ্ধি লাভ হতে পারে, রোগ বা দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া হতে পারে, অথবা দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া হতে পারে।

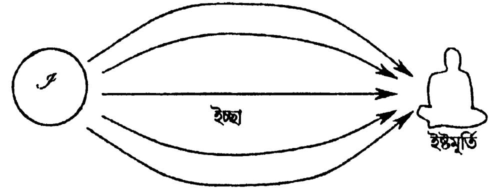
বেশির ভাগ লোকেরই জানা নেই যে, এই ধরনের জাগতিক প্রার্থনা ছাড়া আরেক ধরনের প্রার্থনা আছে—এগুলিকে 'আধ্যাত্মিক প্রার্থনা' বলা হয়, যার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানো। পবিত্রতা, ভক্তি, শক্তি, আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা প্রভৃতি লাভ করা এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে।

শুধুমাত্র উদ্দেশ্যই নয়, আরো কয়েকটি বিষয়েও আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো—আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রার্থনাক্রিয়াটিই একাগ্রতাসম্পাদনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এটি প্রকৃত ধ্যানের অভিমুখে একটি পদক্ষেপ বা তার ভূমিকাস্বরূপ। সাধারণত প্রকৃত ধ্যানাবস্থা লাভ করার আগেই মন পথ হারিয়ে ফেলে। প্রার্থনা এই পথ হারানো নিবারণ করে। পূর্ণ ধ্যানাবস্থালাভের আগেই প্রার্থনা মনকে ঈশ্বরের অভিমুখে ঘুরিয়ে দেয় বা তুলে দেয় এবং এইভাবে মনের পথভ্রষ্ট হওয়া আটকায়।

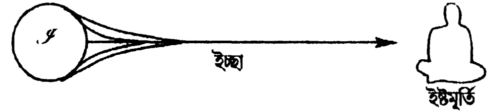
সাধারণ বিক্ষিপ্ত মনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা নানা বস্তুতে ছড়ানো থাকে। আমরা যখন প্রার্থনা করি, ইচ্ছার এই ছড়ানো শক্তিসমূহ ধ্যেয়বস্তুর অভিমুখে একত্রীভূত হতে থাকে। এইভাবে যে-একাগ্রতালাভ হয়, তা হয়তো প্রথম প্রথম তত গভীর হয় না। কিন্তু প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকলে ক্রমশ কথা বন্ধ হয়ে আসে, আর ইচ্ছার শক্তিসমূহ পূর্ণভাবে ইষ্টবস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়। তখন চেতনার ক্ষেত্রে কেবল তিনটি সত্তার অস্তিত্ব থাকে—'আমি', ইষ্টবস্তু, আর কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি; সেইটিই হলো প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা। তখন প্রার্থনা ধ্যানে বিলীন হয়ে যায়। পুরো প্রক্রিয়াটি নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে।



বিক্ষিপ্ত মন (ইচ্ছা বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে আছে)



প্রার্থনারত মন (ইচ্ছার শক্তিসমূহ ইষ্টাভিমুখী হয়েছে)



ধ্যানমগ্ন মন (ইচ্ছার শক্তিসমূহ ইষ্টে কেন্দ্রীভূত হয়েছে)

অপরদিকে জাগতিক প্রার্থনায় মনের একাগ্রতা সম্পাদন লক্ষ্য নয়। সেখানে লক্ষ্য—কোন জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা বা কোন পার্থিব কামনার পূরণ করা।

তৃতীয় পার্থক্য হলো, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা ক্রিয়া করে প্রধানত আমাদের বাসনা অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন সংস্কাররাজির ওপর—যেগুলি আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা, আবেগ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়। আমাদের প্রারব্ধের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রার্থনার বিশেষ সম্বন্ধ নেই। কর্মফল অপেক্ষা সংস্কারের ওপরই ভগবৎকৃপা সহজে কাজ করতে পারে।

অপরদিকে জাগতিক প্রার্থনা ক্রিয়া করে সোজাসুজি আমাদের প্রারব্ধের ওপর। কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করার সময় প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের প্রারব্ধ কর্মে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করি। কেবলমাত্র ঈশ্বর বা অবতারই কারো কর্মফলের গতি পাল্টাতে পারেন। কোন

সাধারণ মানুষ, এমনকি গুরুও একাজ করতে পারেন না। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অবতার 'কপালমোচন'—যিনি অপরকে তাদের প্রাক্তন কর্ম থেকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু গীতায় যেমন বলা হয়েছে, কর্মের গতি অতীব জটিল—'গহনা কর্মণো গতিঃ'। প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের সঙ্গে তার আশপাশের অনেকের কর্মের যোগ আছে। ঈশ্বর বা অবতার যদি জাগতিক সমস্যার সমাধান করে আমাদের সাহায্য করতে চান, তাহলে তাঁকে প্রথমে সমষ্টি কর্মের জট থেকে আমাদের মুক্ত করতে হয়। একাজটি বেশ কঠিন। স্বামী বিরজানন্দ তাঁর 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে যেমন বলেছেন, এই কাজ করার জন্য আমাদের তাঁকে কিছু সময় দিতে হবে। সেইজন্যই বলা হয় ঃ "ভগবান দেখেন, কিন্তু অপেক্ষা করেন।"

প্রার্থনা ও ধ্যান

আগেই বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক প্রার্থনায় যদিও আমরা পবিত্রতা, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চাইতে পারি, তবুও এক্ষেত্রে প্রার্থনাক্রিয়াটিই একাগ্রতা সম্পাদনের একটি উপায়, প্রার্থনা করাটাই একধরনের সাধনা। 'শিবানন্দ-বাণী' পুস্তকের প্রথমেই একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, তাতে এই জিনিসটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কলেজের ছাত্র এক তরুণ স্বপ্নে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছে যায় এবং কী করে ধ্যান করতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাকে বলেন যে, প্রথম প্রথম ধ্যান হওয়া শক্ত। তার চেয়ে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা ভাল। ঠাকুরের একটি বড় ছবির সামনে বসে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা করতে করতে ক্রমে প্রার্থনাই ধ্যানে পরিণত হবে।

প্রার্থনার এই ধ্যানে পরিণত হওয়ার এক গভীর অর্থ আছে। প্রার্থনা আমাদের মনকে বর্তমানে ধরে রাখতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন আমরা ধ্যান করতে বসি, তখন মনে মনে কী করি? সাধারণত কোন দেবতার মূর্তি বা মন্ত্রকে স্মৃতিপটে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। প্রার্থনা কোন কিছু স্মৃতিতে নিয়ে আসার ব্যাপার নয়, প্রার্থনা হলো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কারো সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলার মতো। যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করি; আমাদের মন তখন বর্তমানে নিবদ্ধ থাকে। ধ্যানও মনকে বর্তমান মুহূর্তে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। সাধারণত আমাদের মন অধিকাংশ সময় অতীতের কথা স্মরণ করতে অথবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতেই নিযুক্ত থাকে। এই যে মনকে অতীত বা ভবিষ্যতে ঘুরে বেড়াতে দেওয়ার অভ্যাস, তাকে ভাঙার চেষ্টাই হলো ধ্যান।

অধিকাংশ সময়েই সাধকেরা ওপরের ব্যাপারটি ভুলে যান। তাঁদের অনেকেই যা করে থাকেন তা হলো এই—তাঁরা কোন দেবদেবীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর চোখ বন্ধ করে যা দেখেছেন তা স্মরণ করার চেষ্টা করেন। এই যে অতীতের একটি ঘটনাকে পবিত্রজ্ঞানে সেইটিকে ধরে থাকা—এই ব্যাপারটি অন্য ধরনের অতীত-ঘটনা-স্মরণ থেকে স্বরূপত আলাদা নয়। এর ফলে ধ্যান বারবার করা যান্ত্রিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। স্নায়ুগুলি তাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। অতীতের দরজাটা খুলে দেওয়া হয়—সাধক দেখেন একরাশ অতীত ঘটনার স্মৃতি সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যে ভিড় জমাচ্ছে। কাজেই বহু সাধক যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই ধরনের ধ্যান অভ্যাস করেও বিশেষ উপকৃত হন না, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রকৃত ধ্যান হলো প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত ইষ্টমূর্তির মুখোমুখি হওয়া। কাউকে মুখোমুখি দেখার সময় আমরা বর্তমান মুহূর্তে থাকি। ধ্যান এইরকম হতে পারে—যদি আমাদের দৃষ্টি হৃদয়ের অজানা গভীরে পৌঁছায় এবং সেখানে আমরা জীবন্ত ইষ্টমূর্তিকে প্রত্যক্ষভাবে 'দেখতে' সক্ষম হই। এটা সম্ভব হয় তখনি, যখন আমরা চৈতন্যের আলোককে কেন্দ্রীভূত করে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষেপ করতে পারি। প্রবর্তকদের এজিনিস কঠিন বোধ হয়। সেইজন্যই তাদের প্রথমে প্রার্থনা ও পূজা অভ্যাস করতে বলা হয়। প্রার্থনা ও পূজারূপ ক্রিয়া কেবল বর্তমানকে অবলম্বন করেই অর্থবহ হতে পারে। প্রার্থনা কখনো সাধকের অজ্ঞাতসারে বর্তমানকে বিস্মৃত হয়ে অতীতে চলে যেতে পারে না। এধরনের বিস্মৃতি হওয়ামাত্র প্রার্থনা বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা হলো বর্তমান মুহূর্তটিকে ধরে রাখার সুতীব্র প্রয়াস। যখন প্রার্থনা করি, তখন তা অচেনা কোন সত্তাকে সম্বোধন করে করলেও আমরা বর্তমানেই অবস্থান করি। উপাসনার মধ্য দিয়ে সেই সত্তা আরো বাস্তব হয়ে ওঠেন এবং আমরা আরো দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমানকে অবলম্বন করে থাকতে সক্ষম হই। জীবসত্তার সঙ্গে ইষ্টসত্তার এই সাক্ষাৎকার যখন অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে থাকে ও গভীরতর মাত্রা পায়, তখন তা ধ্যানে পরিণত হয়।

গায়ত্রী—একটি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রার্থনা

ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীভগবান তখন তাঁকে বলেন ঃ "তুমি এই পার্থিব চক্ষে আমার ঐ রূপ দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। তাই দিয়ে আমার ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দেখ।" এই 'দিব্য চক্ষু' হচ্ছে স্বজ্ঞা (intuition)-এর শক্তি—যা দিয়ে আমরা ইন্দ্রিয়নিচয়কে অতিক্রম করে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে সক্ষম হই। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'দিব্য চক্ষু'-কে 'ধী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই স্বজ্ঞাশক্তি সকলের মধ্যেই প্রসুপ্ত থাকে। গায়ত্রী এই প্রসুপ্ত ধী-কে জাগাবার প্রার্থনা। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দূরত্বনির্দেশক শিলাখণ্ড (milestone) হলো এই ধী-র জাগরণ। একবার জেগে উঠলে ধী সাধককে অধ্যাত্মসাধনা এবং লোকব্যবহার—উভয় ক্ষেত্রেই পথ দেখাতে থাকে। (বৈদিক-পরবর্তী যুগে

সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে 'ধী' শব্দের স্থলে 'বুদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হয়।)

গায়ত্রী প্রার্থনার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের শক্তি নিহিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অভ্যারোহমন্ত্র আরেকটি সুপরিচিত বৈদিক প্রার্থনা : "অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

অনেক সময়েই প্রশ্ন করা হয় : এইসব প্রার্থনামন্ত্র লক্ষ লক্ষ লোক তো আবৃত্তি করছে, কিন্তু কৈ তার ফলে যে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটছে, এমন তো মনে হয় না? এই ব্যর্থতার কারণ খোঁজার জন্য আমাদের বেশি দূর যেতে হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের জন্য বা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা-সঞ্জাত প্রার্থনা যখন হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয় এবং তার সঙ্গে যখন কিছুটা চিত্তশুদ্ধি যুক্ত থাকে, তখনি তা ফলপ্রদ হয়। কেবল ধর্মীয় আচার বা প্রথা বা কর্তব্য হিসাবে গতানুগতিকভাবে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করে গেলে অন্তর্নিহিত ধী-কে জাগাবার শক্তি উৎপন্ন হবে না।

প্রার্থনার শর্তাবলী

প্রার্থনা, আধ্যাত্মিকই হোক আর জাগতিকই হোক, শুধু কতকগুলি শর্ত পূরণ করলেই তা ফলপ্রদ হয়। যেমন :

(ক) তীব্রতা : তীব্রতা বলতে বোঝায় আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, প্রার্থনা করতে হয় তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে।

(খ) আন্তরিকতা : প্রার্থনাকে উৎসারিত হতে হবে হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল থেকে। এটা হতে পারে তখনি, যখন প্রার্থনা আমাদের সদ্য অনুভূত কোন অভাবকে প্রকাশ করে। পবিত্রতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বল প্রভৃতি যেসব জিনিসের অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি, তার জন্যই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত—ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ঐজাতীয় অস্পষ্ট ও বহুদূরবর্তী কোন উদ্দিষ্টবস্তুর জন্য নয়।

(গ) সম্পূর্ণ নির্ভরতা : প্রার্থনাকে যখন একমাত্র উপায়রূপে অবলম্বন করা হয়, কেবল তখনি তা কার্যকর হয়। বাইরে থেকে আসা সমস্তরকম আশ্বাস পরিহার করে আমাদের একান্তভাবে ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। এর জন্য ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। এইরকম নির্ভরতাকেই 'শরণাগতি' বলে। এবিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন : "শরণাগত বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের কিছু করতে হবে না—আমরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? না, তা নয়। তাঁর কাছে সরল প্রাণে সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে।"

(ঘ) লেগে থাকা : সাধারণত প্রার্থনার ফল পেতে সময় লাগে—কখনো কখনো কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু সাড়া না পেলেও আমাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্পের সঙ্গে যতদিন না ফললাভ হয়, প্রার্থনা করে যেতে হবে। শুধু প্রার্থনা করলেই হবে না, আমাদের প্রতীক্ষা করতেও শিখতে হবে—প্রার্থনা কর, আর প্রতীক্ষা কর।

অপরের জন্য প্রার্থনা

ওপরে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত প্রার্থনা অর্থাৎ নিজের হিতের জন্য প্রার্থনা। যখন একাধিক ব্যক্তি প্রার্থনার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং আমরা অপরের জন্য প্রার্থনা করি, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়। দুটি শর্ত পূরণ না হলে এইধরনের প্রার্থনা থেকে ফল পাওয়া যায় না। আমরা যদি অপরের হিতের জন্য প্রার্থনা করতে চাই, তাহলে আগে আমাদের তার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যিনি বহু বছর ধরে প্রার্থনা অভ্যাস করে অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন, অন্তত এসম্বন্ধে একটা দৃঢ় প্রত্যয় যাঁর জন্মেছে, কেবল তিনিই প্রার্থনার দ্বারা অপরকে সাহায্য করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, অন্য ব্যক্তিদের জন্য করা প্রার্থনায় ফল হয় তখনি, যখন তারাও নিজেদের মন দিব্য শক্তির এক সাধারণ উৎসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। আমরা যখন কারো জন্য প্রার্থনা করি, তখন মূলত ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই তা করি। ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া তার কাছে পৌঁছাতে পারে তখনি, যখন তারও মন ঐশ্বরিক শক্তির একই উৎসের সঙ্গে সুরে বাঁধা থাকে। তার যদি ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করার মতো মন না থাকে, তাহলে তার জন্য করা প্রার্থনায় ফল নাও হতে পারে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যেমন, যখন কেউ গভীর আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করে, যেমন কোন মা তাঁর রুগ্ন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন বা কোন পত্নী পতির জন্য প্রার্থনা করেন। এইজাতীয় আন্তরিক ও ব্যাকুল প্রার্থনা সমস্ত রকম শর্তের বাইরে।

একটি জনসমষ্টি আন্তরিকভাবে কারো মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলে তার কার্যকারিতাও অনুরূপ হয়। সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে এইধরনের সমষ্টি-প্রার্থনা, যার অনুষ্ঠান কখনো কখনো 'প্রার্থনা-শৃঙ্খল'-রূপে করা হয়ে থাকে, খুবই ফলপ্রদ হয়।

প্রার্থনাপূরণ

প্রার্থনার ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আধ্যাত্মিকই হোক আর জাগতিকই হোক, উল্লিখিত শর্তগুলি মিটিয়ে প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মহান প্রবর্তক ও সন্তেরা আমাদের এব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। আর আমাদের নিজেদের জীবনেও এটা আমরা অনুভব করতে পারি।

আন্তরিক প্রার্থনা কখনো বিফলে যায় না। সুতীব্র ইচ্ছার সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প যুক্ত হলে শুধু তাথেকেই প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয়। আর যখন প্রার্থনার মাধ্যমে এই একাভিমুখী ইচ্ছার সঙ্গে ভগবৎকৃপা মিলিত হয়, তখন তা অপ্রতিরোধ্য গতিতে লক্ষ্যভেদ করে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে।

এটা শুধু আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে নয়, জাগতিক প্রার্থনার ক্ষেত্রেও সত্য। উল্লিখিত শর্তগুলি পূরণ করে জাগতিক বস্তুর জন্য প্রার্থনা করলেও তা একদিন না একদিন সফল হবেই। এবিষয়ে শত শত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

একশো বছর আগে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর একেবারে প্রথম দিকের একটি সংখ্যায় এইধরনের প্রার্থনার শক্তি কতদূর হতে পারে, তার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি ছিল ব্রিস্টল শহরের জর্জ মুলার সম্বন্ধে। ইনি ছিলেন 'অ্যাশলী ডাউন অর্ফ্যান হোমস' নামক অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা—যার শাখা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছে এবং যার ছাত্রসংখ্যা ১,২২,০০০। ৯৩ বছর বয়সে জর্জ মুলার একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন যে, যখনি তাঁর কোন কিছুর অভাববোধ হয়, তিনি সোজাসুজি প্রার্থনা শুরু করে দেন এবং সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তা করতে থাকেন। 'অর্ফ্যান হোমস'-এর প্রতিটি প্রস্তর, প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ড তাঁর প্রার্থনার ফল। ঐ প্রতিষ্ঠানের শুধু বাড়িগুলি নির্মাণ করতেই লেগেছিল ১,১৫,০০০ পাউণ্ড—তার একটি পেনির জন্যও কখনো তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাত পাতেননি। তিনি বলেন যে, বিগত ৬২ বছরের প্রতিটি বছর কারো কাছে একটি শিলিংও না চেয়ে এইভাবে চালিয়েছেন। (দ্রঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত', জুলাই ১৮৯৯, 'নানা কথা' শিরোনামে)

অনুরূপ শত শত সত্য কাহিনী আছে, যাতে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে লোকে দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি বা সাঙ্ঘাতিক অন্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটা বলে রাখা ভাল যে, যদিও জাগতিক প্রার্থনা খুবই কার্যকর, তবে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তেরা সাধারণত এই ধরনের প্রার্থনার আশ্রয় নেন না। তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ, তাই তাঁরা কেবল আধ্যাত্মিক প্রার্থনাই করে থাকেন।

আধ্যাত্মিক প্রার্থনা—নিম্ন ও উচ্চ পর্যায়

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থনা প্রধানত একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি লাভের একটি সহজ উপায়। বহু বছরের কর্মযোগের সাধনার দ্বারা যে-পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেও তা পাওয়া যেতে পারে। ব্যাকুল প্রার্থনা মনের বহির্গামী প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করে কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির উদ্দামতা কমিয়ে দেয়। অধ্যাত্ম-সাধকদের মন সাধারণত অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। সামান্যতম অশুদ্ধির আভাসেই তাঁদের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা ব্যাকুল হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁর প্রথম বয়সে কখনো কখনো আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখলে তার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করতেন ঃ "ঠাকুর, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।" কোন সন্দেহ নেই, তাঁর মন ছিল নিষ্কলঙ্ক; কিন্তু তা এত সংবেদনশীল ছিল যে, কোনরকম অশুদ্ধি আসতে পারে—এচিন্তাও তার কাছে অসহনীয় ছিল।

একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য প্রার্থনা প্রার্থনার নিম্নতর পর্যায়। মন যথেষ্ট শুদ্ধ হয়ে গেলে সাধক সাধনার পথে দ্রুত এগোতে থাকেন। ধ্যান তাঁর কাছে সহজসাধ্য হয়ে যায়, উচ্চতর ধ্যানের অভ্যাসও তিনি শুরু করতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি তখন প্রার্থনা করা পুরোপুরি ছেড়ে দেবেন।

প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত কখনো প্রার্থনার অভ্যাস ছাড়েন না। প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি করার পরও তিনি প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকেন; তবে সাধনার পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রার্থনার ধরনও বদলাতে থাকে। তিনি তখন উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনা শুরু করেন।

এই উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। নিম্ন পর্যায়ের প্রার্থনার লক্ষ্য যদি কোন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক প্রয়োজন মেটানো অথবা কোন সমস্যার সমাধান হয়, উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনা সেখানে স্বয়ং ঈশ্বরেরই জন্য। এটি হলো ঈশ্বরকে ডাকার একটি পন্থা। যখন আমরা কারো সাক্ষাৎ চাই, আমরা তাকে নাম ধরে ডাকি এবং যতক্ষণ না সে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণ ডাকতে থাকি। ঠিক সেইরকম উন্নত সাধক তাঁর অন্তরের গভীরে ঈশ্বরকে ডেকে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর উপদেশের মধ্যে এই 'ডাকা' অর্থেই 'প্রার্থনা' শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা আপন শিষ্যসন্তানদের উপদেশ দিতেন—"বাবা, তাঁকে ডাক।"

এই উচ্চতর আহ্বান ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য আত্মার কাতর ক্রন্দন—আত্মার সুতীব্র ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ লেখক শ্রীম একটি দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাত প্রায় তিনটা হইল, তিনি (মণি) উঠিলেন। উত্তরাস্য হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন। দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন'!" (বালক লাটু এইভাবে ঈশ্বরের জন্য কাঁদছিলেন।)

উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনা মনে মনে ঈশ্বরকে নাম ধরে ডাকা হতে পারে কিংবা তা 'হে ঠাকুর', 'ও মা'—এই বলে কান্নার রূপ নিতে পারে। আবার তা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে তীব্র আর্তনাদ-রূপে উৎসারিত হয়ে ভাষায় অপ্রকাশিত থেকেও অন্তর্লোকের বিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে পারে।* ❑

* মূল প্রবন্ধ ইংরেজিতে 'Prayer—Its Conditions and Fulfilment' নামে 'শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'সাধনা'য় মুদ্রিত হয়। লেখক সেটিকে অনুবাদের আগে কিছুটা পরিবর্ধিত ও অনুবাদটি পরিমার্জিত করে দিয়েছেন।

অনুবাদক—অধ্যাপক শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-আলোকে আলোকিত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ

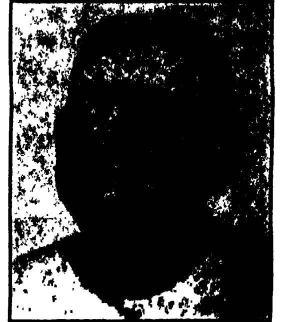
তাপসশঙ্কর দত্ত

নট ও নাট্যকারের সুষম সমন্বয় হয়েছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে। শুরুতে অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও রঙ্গমঞ্চের আশু প্রয়োজন মেটাতেই তিনি নাট্যরচনাতে মনোনিবেশ করেন। নাট্য আন্দোলনের পুরোধা গিরিশচন্দ্র সারাজীবনে প্রায় ৮০টি পৌরাণিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। আজও তাঁর ৮-১০ খানি নাটক দর্শক ও পাঠকের কাছে সমাদৃত। তাই নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ি আবেগের সঙ্গে বলেছেন ঃ "লোকে না পড়েই বলে গিরিশচন্দ্রের লেখা ভাল নয়। অথচ মাইকেলকে বাদ দিলে বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র।" গিরিশচন্দ্রকে 'গ্যারিক' উপাধিতে ভূষিত করে অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রিকা লেখে ঃ 'ইংল্যাণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় বইতে পড়েছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোন গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন, তা আমাদের ধারণা হয় না।" ভগিনী দেবমাতার ভাষায় ঃ "নাট্যকার গিরিশকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁকে বাঙলা নাট্যমঞ্চের গ্যারিক ও বাঙলা নাটকের শেক্সপীয়ার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।" তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উক্তি ঃ "আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। আপনার হাতে আমার উপন্যাসের যথেষ্ট আদর হবে, আমি বিশ্বাস করি।" আবেগময়ী ভাষায় অমৃতলাল বলেছেন ঃ "গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক। বাঙলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র। তার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেউ কোনদিন ছিল না।" শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতারূপেই নন; অভিনেতা, শিক্ষক ও পরিচালক-রূপে মিলিয়ে দেখলে তিনি ছিলেন সবার ওপরে।



গিরিশের আগে বা তাঁর সময় ছেলেরা মেয়েদের অভিনয় করত। ভদ্রবাড়ির কোন মেয়ের ছেলেদের সঙ্গে অভিনয়ে আসা কল্পনার মধ্যে ছিল না সেসময়। তাই তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করাতে শুরু করান। এসব পতিতা মেয়েরা অভিনয়কে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে পরবর্তী কালে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। সমাজের ঘৃণিত পদদলিত অবহেলিত মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে। ভয়, অনিশ্চয়তা, চাপ, অযথা নির্যাতন শিল্পী-প্রতিভা ঠিকভাবে বিকাশ করতে পারে না—একথা গিরিশ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। 'স্টার' থিয়েটার সমাপ্ত করার জন্য একসময় তিনি ১৬,০০০ টাকা দান করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনয় করতে পারে, কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। গিরিশের নাট্যাভিনয় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত। নাটকের পরিবর্তে জীবন্ত ঘটনা মনে হতো তাঁর অভিনয়। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ভগিনী দেবমাতা। উল্লিখিত ঘটনা থেকে নাট্যকার গিরিশের পরিমাপ করা যেতে পারে। দর্শকাসনে উপবিষ্ট বিদ্যাসাগর নাট্যকার গিরিশের অভিনয় উপভোগ করার সময় অভিনয়রত গিরিশকে নারী অবমাননা করতে উদ্যত দেখে উত্তেজিত হয়ে দর্শকাসন থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর চটিজুতো ছুঁড়ে মারেন। জুতো তাঁকে আঘাত করে রঙ্গমঞ্চেই পড়ে থাকে। গিরিশ জুতোটি কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর মাথায় ছুঁইয়ে দর্শকদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ "অভিনয়জীবনে এরকম সম্মান আর কখনো পাইনি, আমার অভিনয়জীবন সার্থক।" নেপোলিয়নের উক্তি ঃ "Impossibility is a word that can he found in the dictionary of a fool."—গিরিশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। 'ম্যাকবেথ'-এর ডাইনিদের কথোপকথন বাঙলাতে অনুবাদ করা অসম্ভব—জনৈক বন্ধুর এই উক্তি শুনে তিনি 'ম্যাকবেথ'-এর বাঙলা অনুবাদ করে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন। উল্লিখিত বন্ধু পরবর্তী কালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

কারো কথা যাচাই না করে গিরিশচন্দ্র নির্বিবাদে মেনে নিতেন না। ভূত আছে বলে কোথাও যেতে বারণ করলে তিনি সেখানে চলে যেতেন সত্যতা নিরূপণের জন্য। ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে প্রতি পদে পদে। নৌকাযোগে একবার বাবার সঙ্গে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ যাওয়ার পথে প্রবল প্রতিকূল স্রোতের মুখে পড়ে বিপদের সম্মুখীন হয় নৌকাটি। ভীত-সন্ত্রস্ত বালক গিরিশ বাঁচার অদম্য আগ্রহ নিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। চালকের দূরদর্শিতায় নৌকাটি সে-যাত্রা নিরাপদে তীরে আনা সম্ভব হয়। "আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? তোমার জীবনের চেয়ে আমার কাছে



পেয়েছেন—এধারণা তাঁর বদ্ধমূল হলো। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ "চৈতন্যদেব যেমন জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবও তেমনি আমার মতো পাপিষ্ঠকে উদ্ধারের জন্য মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।" গৃহী শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র গিরিশকেই তিনি গেরুয়া বসন দিয়েছিলেন। একবার গিরিশের অভিনয় দেখতে গেলে তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসে বলেন ঃ "তুমি আমার ছেলে হবে বল?" তিনি অসম্মতি জানালে তিনি পীড়াপীড়ি করতে থাকায় তিনি বলেন ঃ "আমার বাবা শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ, আমি কেন তোমার ছেলে হতে যাব?" শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তি অতি সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে—

"তুই শালা স্বেচ্ছাচারী বহু বেশ্যাগামী।
কি কারণে ছেলে তোর হতে যাব আমি॥
পরম পবিত্র-চিত বিশুদ্ধ আচার।
ক্রিয়াবান নিষ্ঠাবান জনক আমার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে উত্তেজিত গিরিশ ভীষণ রেগে তাঁকে গালাগালি দিতে থাকেন। উপস্থিত ভক্তেরা গিরিশের আচরণে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করতে থাকেন। এ পাষণ্ডের কাছে আর না যেতে তাঁকে পরামর্শ দেন। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে এপ্রসঙ্গ আবার উঠলে তিনি রামচন্দ্র দত্তকে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাম বলেন ঃ "গিরিশ কালীয় সাপ, বিষ ছাড়া তো তাঁর আর কিছু দেবার নেই—তাই সে দিয়েছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র দত্তের অপূর্ব কথোপকথন ব্যক্ত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে—

"দেখিয়াই প্রভুদেব কহিলেন তায়।
গিরিশ বড়ই গালি দিয়াছে আমায়॥
ভূমিতে লুটিয়া বন্দি প্রভুর চরণ।
দিলে গালি খেতে হবে ভক্তোত্তম কন॥
শ্রীপ্রভু বলেন যদি মারে অতঃপর।
সহিতে হইবে তাহা রামের উত্তর॥
যাহা দিয়াছেন যারে সেই দিবে তাই।
কোথায় পাইবে দিতে তার যাহা নাই॥
কালকূট একমাত্র ধন কালিয়ার।
সে দিবে ধরিয়া বিষ যাহা আছে তার॥"

রামের কথা মনঃপূত হওয়াতে তিনি তাঁকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের বাড়ি চলে যান। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে আবেগজড়িত কণ্ঠে গিরিশ বলেন ঃ "আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুর, তাহলে বুঝতাম, তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান করতে পারনি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি, তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।" গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বকলমা' দিয়েছিলেন। নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ "ঠাকুরকে 'বকলমা' দিয়ে মনে করেছিলাম, বড় বুদ্ধির কাজ করেছি। আমার আর কিছু করতে হবে না। এখন দেখছি, যাঁকে 'বকলমা' দিলাম, উঠতে বসতে, খেতে শুতে তাঁরই স্মরণ চলছে—পানটুকু পর্যন্ত নাম না করে মুখে তুলতে পারছি না।" আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে চলেন ঃ "তাঁকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁকে ভোলাই কঠিন।" 'বকলমা'র অর্থ গিরিশ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন—কোন কাজে আর 'আমি, আমার' বলার অধিকার রইল না। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী ও দুই মেয়ে মারা যাওয়ার পর তিনি লিখেছিলেন ঃ "শূন্য প্রাণ, শূন্য এ-সংসার। কিন্তু 'বকলমা' দিয়েছি, তাই বলছি—তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।" একবার শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে লিখে দিয়েছিলেন ঃ "বিশ্বাসই সব।" তাঁর কথা গিরিশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করে তিনি যা গ্রহণ করতেন, তা থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "গিরিশের বিশ্বাস পাঁচ সিকা পাঁচ আনা।" আগের দিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে গেছেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণের গলা থেকে পুঁজ-রক্ত পড়তে থাকে। যে-পাত্রে এগুলি ছিল তা পরিষ্কার করা হয়নি পরদিন পর্যন্ত। গিরিশ এলে তিনি পাত্রটি দেখিয়ে বিদ্রূপ করে বলেন ঃ "আবার বলে অবতার!" এতটুকু ইতস্তত না করে উত্তরে তিনি বলেন ঃ "এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে—তাই রামকৃষ্ণ অবতারে এই রোগ।" তাঁর 'শঙ্করাচার্য' নাটকের উৎসর্গপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মূর্তিমান বেদান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন, বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামীজীর সামনে প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থটিকে বারবার প্রণাম করেছেন 'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়' বলে। একসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের গলা দিয়ে পুঁজ-রক্ত পড়তে দেখে সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে "গিরিশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি"—বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে গিরিশের উক্তি ঃ "তিনি জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য, মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।" একবার তাঁর ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সামনেই বিষয়-আশয়ের চিন্তাতে নিজেকে মগ্ন করে দেন তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন—বিষয়চিন্তা ধুয়েমুছে তিনি নিজের অজান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তাতে ডুবে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদান পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "তাঁর শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল—ছেলেবেলা থেকে আমার প্রকৃতি এই যে, যে-কাজ কেউ করতে বারণ করবে, সেই কাজ আমি করবই করব। পরমহংসদেব একদিনের জন্য আমায় কোন কাজ করতে নিষেধ করেননি। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হয়েছে।"

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের উদ্যানে 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। 'কল্পতরু' হওয়ার আগের মুহূর্তে গিরিশকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "গিরিশ, তুমি যে সবাইকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কী দেখছ ও বুঝছ?" বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে গিরিশ বলেন ঃ "ব্যাস-বাল্মিকী যার ইয়ত্তা করতে পারে না, আমি তার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?" তাঁর সহজ-সরল বিশ্বাস প্রতি কথাতে ব্যক্ত হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে সমবেত ভক্তদের বলেন ঃ "তোমাদের আর কী বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" সমবেত প্রায় ত্রিশজন গৃহী ভক্তের সঙ্গে গিরিশও তাঁর বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন এই বিশেষ মুহূর্তে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বড় প্রখর। এই অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তাঁর উক্তিগুলি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানকালে সুগায়িকা এক পাগলী ঘন ঘন এসে তাঁকে প্রায়ই বিরক্ত করত। উৎপাতের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ভক্তদের প্রহারও পেতে হতো তাঁকে। সবাই যখন পাগলীর আচরণে ভীষণ বিরক্ত, তখন গিরিশ পাগলী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন ঃ "সে-পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যেভাবেই করুক, তার কখনো মন্দ হবে না।" গিরিশ ভৈরবরূপে মর্ত্যভূমিতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসাধনে সহায়তা করতে। এব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির উল্লেখ আছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে—

"কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া।
আইল মুরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
কেবা যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়,
কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়।
কিবা প্রয়োজন?—তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল 'কার্য' করিব তোমার।
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর,
দেখিনু ভৈরব সেই তাঁহার উপর।"

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভাবসমাধিতে তাঁকে এরূপ দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—যার উল্লেখ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এও আছে। নিজেকেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ যুগ ধরে লীলা-সহচর বলে মনে করতেন। তবে বলতেন ঃ "প্রতিবারেই আমি জগাই-মাধাইয়ের সাজে কেন আসব? হাম্ হর্ দফে জগাই-মাধাই নেহি হোঙ্গে।" শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর গিরিশ প্রায় ছাব্বিশ বছর এই মর্ত্যভূমিতে ছিলেন। তাঁর বাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্তদের আনন্দের স্থান ছিল। অর্থ, বুদ্ধি, পরামর্শ ও আরো নানাভাবে সঙ্ঘকে তিনি লালনপালন করেছেন।

১৯১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে করতে মরজগৎ ত্যাগ করেন। রোগযন্ত্রণায় কাতর গিরিশ তাঁর অন্তরঙ্গদের বলেন ঃ "তোমরা কি মনে কর, আমি আমার রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারি না? দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে শুয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই আমি নীরোগ হতে পারি। কিন্তু ঠাকুর সর্বকরুণাময়—তিনি চান আমার ভোগদশা শেষ হয়ে যাক। ভোগদশা শেষ হবার জন্যই আমি শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জর্জরিত হয়ে আছি। তাই রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন কল্পতরু—তাঁর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আমি যখনি কোনকিছু প্রার্থনা করেছি, তখনি তা পেয়েছি।" মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী গিরিশকে দেখতে আসেন কথামৃতকার শ্রীম। তাঁকে দেখে তিনি বলে ওঠেন ঃ "ভাই, আমায় ঘা-কতক জুতো মেরে যাও তো, সত্যি সত্যি ঘা-কতক জুতো মেরে যাও।" কারণ জানতে চাইলে গিরিশ বলেন ঃ "হ্যাঁ হে, জুতো খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত; তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন, তবু কিনা আমি ভাবি, মারা যাবার পর আমার কি হবে!"

জীবনে সীমাহীন শোকতাপ পেয়েছেন গিরিশ—চরম ভোগের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন জানতে, অজান্তে ও ভ্রান্তে। তাঁর ব্যর্থ জীবন সার্থক হয়েছিল অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে। তাঁর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তি ঃ "গিরিশ নিজের সঙ্কল্পে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজেকে বিলীন করে আত্মসমর্পণের শিক্ষা আমি গিরিশের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ঠাকুরের কাছে তিনি নিজেকে মনেপ্রাণে সমর্পণ করেছিলেন—এব্যাপারে তিনি ছিলেন তুলনাহীন।" দুর্গাচরণ নাগ (নাগমশায়)-এর উক্তি ঃ "গিরিশবাবুর কাছে পাঁচ মিনিট বসে থাকলেই পার্থিব দুঃখযন্ত্রণা সব ধুয়েমুছে যাবে। মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ছিল। এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির জন্য তিনি রামকৃষ্ণদেবকে অবতাররূপে জানতে পেরেছিলেন।" জীবনের শেষপ্রান্তে অসুস্থ গিরিশ কাশীধামে এসেছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সেসময় প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন ঃ "যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে হ্যাক্-থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন—তাই প্রত্যক্ষ করছি।"

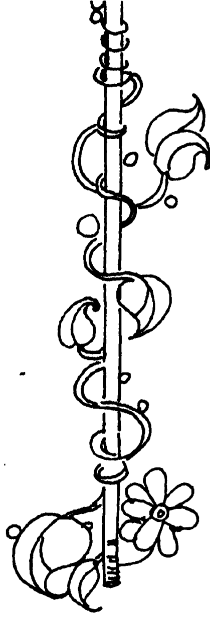
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ তাঁর মূল্যায়ন করে বলেছেন ঃ "তখনকার যুগের স্বনামধন্য লোকেরা রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু আগত গৃহী ও ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে সবার চাইতে প্রতিভাবান ছিলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ আর গৃহীদের মধ্যে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।" ❑

প্রত্যয়

স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ

প্রত্যয়ের মনোবলে
এগিয়ে চল—
পারাপারের সম্পদ নিয়ে
হাতের মুঠোয়।

নতুবা, জীবনের গোধূলিবেলায়
নিঃশ্বাসের স্মৃতিকথায়
কোন লাভ নেই,
লাভ নেই—
যমদূত অপেক্ষমাণ
শিয়রে দাঁড়ায়ে।



শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

কালীসাধন ফৌজদার

মন যখন ভরল ব্যথায়, দেহ ক্লেদ ক্লিন্ন;
(তখন) হৃদয় মাঝে স্মরণ করি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।
প্রেমচন্দন আলিম্পনে ভক্তিপুষ্পে পূজি
চরণদুটি আকুল হয়ে হৃদয়মাঝে খুঁজি।
দৃঢ়তারই অভাব যখন দেহে মনে রাজে—
তখন যেন তোমার বাণী মনের মাঝে বাজে।
(যখন) হিংসা ক্রোধ অপবাদে হৃদয় বীততৃষ্ণ
(তখন) তোমার পায়ে লুটাই আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।
এই পৃথিবীর যত বিভেদ ঘুচাও ঠাকুর তুমি—
মৈত্রীসূত্রে এক কর দেব এই বিশ্বভূমি।
বিশ্বাসেতে অটল রাখ, সরলতা দাও—
মনের যত মলিনতা শুদ্ধ করে নাও।
ক্লান্তি যখন আসবে দেহে, হৃদয় হবে দীর্ণ—
(তখন) পড়ে যেন আমার মনে তোমার চরণচিহ্ন।
বুকে যেন সাহস বেঁধে এগিয়ে যেতে পারি—
সৎ-কর্মে-কর্মপথে বিপদ বাধা ত'রি।
কভু যেন না হই ক্ষুব্ধ মিথ্যে অহঙ্কারে—
সবায় ভালবাসতে পারি পার্থিব সংসারে।
অশান্তিতে মন জর্জর, দেহ যখন খিন্ন,
(তখন) শান্তি মাগি তোমার কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ

শচীনন্দন আঢ্য

সাধনায় নাই স্তরভেদ কোন থাকিলে ভক্তি প্রেম
মিলে ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম নিকষিত চারু হেম।
তুমিই দেখালে মা-ময়ী জগৎ নব ঈশ্বরীরূপা
জ্যোতির্ময়ীর জ্যোতিতে ফোটালে বিশ্বেরে অপরূপা।

'যত মত আর তত পথ'-এ মেলে ঈশ্বর সবাকার
ভবতারিণীর মূর্তিই হলো সাকার ও নিরাকার।
কামারপুকুর হতে এসেছিলে পূজারী বামুন হয়ে
পূজিতেরই তুমি পেলে দক্ষিণা ভক্তির বিনিময়ে।

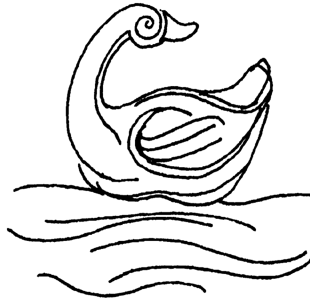
উচ্চ-নীচের প্রাকার ভাঙিয়া করে দিলে একাকার
মানুষে লভিল নূতন চেতনা নবরূপে চিন্তার।।
কেশব নরেন গিরিশ রাখাল লাটু আর বাবুরাম
সবার চিত্তে হয়ে জাগরূক করালে সবে প্রণাম।
জীবের মধ্যে লুকায়ে রয়েছে পরমাত্মার দেহ
তোমারই নরেন নির্দেশ দিল 'জীবগণ সেবা লহ'।

দেবী রাসমণি দয়ায় তোমারে পাইয়া ধন্য মোরা
ধন্য ভারত মহিমায় তব বিশ্বজগৎ জোড়া।
তাই, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মানবপ্রেমিকবর
শতেক প্রণাম চরণে তোমার জানাই নিরন্তর।

মন আর মুখ

সুদিন বিশ্বাস

প্রভু, মন আর মুখ এক করতেই
বলেছিলে বারবার,
ব্যবহারে তার প্রয়াসী হলেও
থেকে যায় ব্যথাভার!
নামেতে রুচি ও বিশ্বাস হলে
সাধন করতে হয় না
বিচারের ভাব বয়ে বেড়াবার
প্রয়োজন আর হয় না।
হে রামকৃষ্ণ, তব কথামৃত
অমোঘ সত্য জানি,
এই প্রার্থনা যেন কায়মনে
প্রয়োগে সেকথা মানি।



শ্রীরামকৃষ্ণ

অঞ্জু ভট্টাচার্য

পঙ্কিল আবর্তে যখন পথের দিশা হারাই—
অন্ধকারে ঠাহর হয় না, পথ না বেপথ,
চোরাবালির গর্তে তলিয়ে যেতে যেতে
ভেসে ওঠে তোমার মুখ—
আমি মাটি খুঁজে পাই।
আজ সুজন, স্বজন, পরিজন
কেউ কাছে নেই
অন্ধ চোখ, দুর্বল পেশি,
কোথায় যাই, কার হাত ধরি
সহসা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে তোমার মুখ
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর আমার

অপরূপ চক্রবর্তী

সবাই বলে কামারপুকুর
গদাধরের দেশ,
আমি বলি আমার বুকে
ঠাকুর আছেন বেশ।
সবাই ছোটে বেলুড় মঠে
শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে,
মন্দিরেতে ধ্যানে বসে
তাঁরই নাম জপতে।
আমি কেবল পলক ফেলে
ভিতর পানে চাই—
তাকিয়ে দেখি সেইখানেতে
নিকানো তাঁর ঠাঁই।
হাজার চোখের চেনা ছবি
আমার সাথে মেলে না
আমার ঠাকুর আমার মতো
অন্য কারোর মতো না।
তর্ক করে সে কি রে ভাই
তোদের সাথে মেলে,
স্বাদ কীভাবে যায় রে বলা
জিভ না সেটা ছুঁলে?
এই জগতের যেইখানেতে
চোখের দেখা শেষ,
সেইখানেতে শুরু আমার
রামকৃষ্ণের দেশ।



দিব্যগীতি

সোমনাথ সরকার

হৃদয়ে আমার দিব্যচেতনার হোক উন্মেষ,
হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ।
জন্ম নিইনি তোমার কালে,
বাঁধা পড়ে গেছি সংসার-জালে,
ত্রিতাপজ্বালায় আশা-হতাশায় হয়েছি শেষ,
হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ।
তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত,
তোমার কৃপাধারা অফুরন্ত,
শুধু কাশীপুর উদ্যানবাটীর দাও সে-পরিবেশ,
হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ।
কত নববর্ষ হয়ে যায় পার,
ইষ্টদেবের দেখা মেলা ভার,
কর পাকাপাকি হৃদয়ে আমার তোমার দেশ,
হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ।

কৃপাসিন্ধু অবতার

তারক চক্রবর্তী

উদার আকাশ তুমি সায়াহ্নে প্রভাতে।
স্নিগ্ধ আলো জ্যোতির্ময় অন্ধকার রাতে॥
মেঘ হয়ে জল আনো বারিধি অপার।
নক্ষত্রকিরণমালা ঢেউয়ে একাকার॥
বর্ণে গন্ধে ছেয়ে যায় হোমের অনল।
ধূম্রজাল যজ্ঞধূমে সূর্য করোজ্জ্বল॥
ভয়ে তারা আলো দেয় দুর্নিবার গতি।
আকর্ষণ ভালবাসা নীরব সংহতি॥
ব্রহ্ম হতে কীট সর্বভূতে প্রেমময়।
প্রণব ওঙ্কারে ধ্বনি—জয় শুধু জয়॥
কৃপাসিন্ধু অবতার জয় কৃষ্ণরাম
জয় জয় রামকৃষ্ণ প্রাণের আরাম॥

নামতা

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

এক এককে এক
ঠাকুর কোথায় দেখ
দুই এককে দুই
ঠাকুর আর তুই
তিন এককে তিন
ভাবিস কেন দীন?
চার এককে চার
ঠাকুর অবতার
পাঁচ এককে পাঁচ
ইন্দ্রিয় ছেড়ে বাঁচ
ছয় এককে ছয়
কীসের লজ্জা ভয়?
সাত এককে সাত
বাড়িয়ে দুটি হাত
আট এককে আট
মায়ার বাঁধন কাট
নয় এককে নয়
ডঙ্কা বাজিয়ে জয়
দশ এককে দশ
ঠাকুর পুজোয় বোস
বারো চোদ্দো ষোলো
পূর্ণ চাঁদের আলো
বিশ পঞ্চাশ শত
এক পথ মত যত।

ধর্ম কী, কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন

সেখ হাসান ইমাম

ধর্ম কী? বহু আলোচিত হলেও এ-প্রশ্ন চিরনতুন। ধর্মকে সংজ্ঞিত করা ততটাই কঠিন, যতটা কঠিন জীবনের সংজ্ঞা দেওয়া। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থাৎ যা ধারণ করে। 'যা' কী?—নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং, সর্বোপরি প্রেম। সহজ কথায় সত্য, ন্যায়, সেবা, ত্যাগ, পরার্থপরতা ও জীবপ্রেম। কাকে ধারণ করে? জীবন এবং জগৎকে। জগতের মহান ধর্মপুরুষগণ ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে—"অহিংসা পরম ধর্ম।" তীর্থঙ্কর মহাবীর বলেছেন: "যেখানে অহিংসা অথবা প্রাণিমাত্রের প্রতি দয়া বা প্রেম, সেখানেই ধর্ম; ইহাই মনে করা উচিত। হিংসায় ধর্ম হইতে পারে না। যেখানে সংযম, সদাচার ও শীল, সেখানেই ধর্ম—এইরূপ মনে করা উচিত। অসংযমে, দুরাচারে অথবা কুশীলে ধর্ম অসম্ভব।" বাইবেলের মূল শিক্ষাই হলো: মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। যিশুখ্রিস্ট বললেন: "Love thy neighbour as thyself." হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছিলেন: "ইসলাম মানে শান্তি, আত্মসমর্পণ (ঈশ্বরে), সংযম, সত্যানুরাগ ও পবিত্রতা।" অন্যত্র বলেছেন: "ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপনের পর মানুষকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য মানবপ্রেমকে ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন এইভাবে: "ধর্ম মানুষের মধ্যে যে-দেবত্ব আছে, তারই প্রকাশ। ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। 'It is being and becoming.' ধর্ম মানে (আদর্শস্বরূপ) হওয়ার চেষ্টা করা এবং হয়ে যাওয়া। ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া এবং সৎ কর্ম করা—এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।" স্বামী নিগমানন্দ বলেছেন: "তোমরা আপন ভুলিয়া প্রেম-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ কর। স্বার্থপর শয়তানকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া প্রেমময় ভগবানকে আসন দাও। ইহাই ধর্ম। নতুবা চোখ বুজিয়া জপ-তপ করিলে ভগবানের কৃপা হয় না। উহা জড়ের সান্ত্বনা মাত্র।" রবীন্দ্রনাথ ধর্মগুরু না হলেও মহান মানবপ্রেমিক, তাই এপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যও স্মর্তব্য: "যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি।" অন্যত্র বলেছেন: "ধর্ম আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই। তাহা দেশ-কাল-পাত্র ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত; তাহা বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।" মহান দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন: "The marks of genuine religion are Abhaya, or free from fear and Ahimsa or Love." অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের চিহ্নগুলি হলো—অভয় বা ভয়শূন্যতা এবং অহিংসা বা ভালবাসা। তাঁর 'Religion in a Changing World' গ্রন্থে বলেছেন: "এই বিচ্ছেদ ও ভেদ বিরোধপূর্ণ খণ্ডিত চৈতন্যের জগৎ থেকে এক স্বাধীনতা, প্রেম ও সমন্বয়ের জগতের দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করাই হলো ধর্মের উদ্দেশ্য।" অনেকেই জানেন, মহামনীষী কার্ল মার্ক্স ধর্মকে বলেছিলেন 'জনগণের আফিং'। এবিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্য হলো: "Religion is the sigh of an oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of a soulless state of affairs, it is the opium of the people."—ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন সংসারের হৃদয় এবং আত্মাহীন বস্তুর আত্মাস্বরূপ। এটি জনগণের আফিং। আফিং খেলে মানুষ যেমন স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, ধর্মচর্চার ফলও তেমনি। দারিদ্র্যসীমার নিচের শ্রমজীবী মানুষ, বিচার-বুদ্ধি যাদের কম, তাদের পদানত ও বশীভূত করার জন্যই যেন ধর্মের উদ্ভব। এ যেন লোক ঠকাবার হাতিয়ার বা উপায়মাত্র। কার্ল মার্ক্স তাঁর সমকালে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে অনাচার, শোষণ ও দুর্নীতি দেখেছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ অন্য অনেক সমাজসংস্কারকের মতোই তিনিও ধর্মের নামে যে লোক-ঠকানো ব্যবসা চলছিল, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্মের কঠোর সমালোচক হয়েও তার কিছু কিছু মহত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়: "সবকিছু সত্ত্বেও ক্রিশ্চিয়ানিটিই আমাদের শিখিয়েছে শিশুদের ভালবাসতে।" কেউ বলতে পারেন, মনীষী কার্ল মার্ক্স ছিলেন 'materialist' বা জড়বাদী আর উল্লিখিত ধর্মীয় পুরুষগণ ছিলেন 'idealist' বা ভাববাদী। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তো থাকবেই। কিন্তু 'idealist' দার্শনিকগণও তো সব বিষয়ে একমত নন। "Great men think alike." মহামানবদের চিন্তাভাবনায় কিছু সাধারণ

ক্ষেত্র (common ground) অবশ্যই পাওয়া যায়। জড়বাদী-ভাববাদী নির্বিশেষে সব যুগন্ধর পুরুষই একটি নীতিতে একমত হয়েছেন। তা হলো—মানব-কল্যাণ। এককথায় বলা যেতে পারে, পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য এক।

ধর্মের অন্য একটি অর্থের কথাও কেউ কেউ বলেন। তাঁদের মতে, ধর্ম হচ্ছে গুণ বা প্রকৃতি। অর্থাৎ যার যা স্বভাব, তাই তার ধর্ম। যেমন নিম্নগামিতা বা সমোচ্চশীলতা জলের ধর্ম। আগুনের ধর্ম তার দাহিকাশক্তি। বাতাসের ধর্ম প্রবহমানতা, সূর্যের তাপ-বিকিরণ, চন্দ্রের আলোদান। পাখি গান গেয়ে যায় আপন মনে, ফুল গন্ধ বিলায়। আরো সহজ করে বলা যায়, লঙ্কার কটুতা, লেবুর অম্লতা, উচ্ছের তিক্ততা ও মধুর মিষ্টতা তাদের স্ব-স্ব ধর্ম। এখন প্রশ্ন হবে, এই গুণ বা প্রকৃতি বিচারে মানুষের ধর্ম কি? এই বিচারে মানুষের ধর্ম চিন্তাশক্তি, বিবেক, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কেউ বলতে পারেন, মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ—ও তো তার স্বভাবজাত। কিন্তু 'conflict' বা সঙ্ঘাত নয়। মানুষের অগ্রগতি ঘটেছে তার 'live and let live' নীতির ভিত্তিতেই। দ্বন্দ্ব বা হিংসায় সে বিবেকহীন পশু, প্রেম-ভালবাসা-সহযোগিতায় সে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। হ্যারল্ড ল্যাস্কির মতেঃ "To live with other is the condition of rational existence." অর্থাৎ মানুষ হিসাবে বাঁচতে গেলে মানুষকে গ্রহণ করতে হবে সহাবস্থানের নীতি। সুতরাং ধর্মকে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্থে ধরলে এককথায় মানুষের ধর্ম হলো মানবতা।

কিছু মানুষ ভাবেন, ধর্ম মানে অলৌকিকতা। ভবিষ্যৎ বলা, বিনা ওষুধে রোগ সারানো, আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, শূন্যে ভেসে বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যেই ধর্ম। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ একজায়গায় লিখেছেনঃ "একবার এক আমেরিকান মহিলা তাঁদের ক্লাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বক্তৃতার পর চা-জলখাবার খাইয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে একটু দেখান তো কিভাবে শূন্যে উড়তে হয়।' আমি আমার অক্ষমতা জানালে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।" ঐ ভদ্রমহিলার ধারণা, ধর্ম সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয়, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যাঁরা, এটা তাঁদের ব্যাপার। অর্থাৎ ধর্ম সকলের জন্য নয়, বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। এ-ধারণা ভ্রান্ত।

একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, কোন গভীর, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে হলে বা সেবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই প্রচুর মনন ও চিন্তন প্রয়োজন। সত্যিকার মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া 'ধর্ম কী' জানতে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামীজীকে একবার এক অত্যুৎসাহী যুবক বলেছিলঃ "আমি ঈশ্বরকে দর্শন করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" স্বামীজীর উত্তরঃ "ফুটো কলসিতে চোখ রেখে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা যায় না। প্রয়োজন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের।" কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দের সহপাঠী প্রখ্যাত বিজ্ঞানীত্রয়—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অদূরে হলকর্ষণরত এক কৃষককে দেখিয়ে তাঁরা বলেছিলেনঃ "তোমার ধর্ম নিয়ে ঐ লোকটির কোন মাথাব্যথা নেই। তুমি ওকে তোমার ধর্মের গভীর তত্ত্ব বোঝাতে পারবে কি?" নির্বেদানন্দজী প্রশ্ন করেছিলেনঃ "তোমরা তো নামকরা বিজ্ঞানী, 'astrophysics'-এর 'latest theory'-টা ওকে বোঝাতে পারবে কি?" বলা বাহুল্য, তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। ধর্মের অনেক কট্টর সমালোচকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজ ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান যেমন ভাসা-ভাসা, অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এঁরা আরেকটু দায়িত্বসচেতন হলে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব।

সত্যি, ধর্ম নিয়ে মানুষের প্রশ্নের, সমালোচনার শেষ নেই! একদল মানুষ যেমন বংশপরম্পরায় বা ঐতিহ্যগতভাবে কোন না কোন ধর্মের অনুসারী, তেমনি আবার একদল মানুষ বিজ্ঞানমনস্কতার দোহাই দিয়ে ধর্মকে বাতিল করতে চান। যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রশংসার্হ, কিন্তু তা যদি কুযুক্তি বা অজ্ঞতার নামান্তর হয়, তাহলেই বিপদ। বাস্তবে কিন্তু এরকমই ঘটছে। ধর্মের নামে কোথাও কোন গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি দেখলেই এঁরা ধর্মকে দায়ী করেন। এ তো সেই কিছু মানুষের হাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখে বিজ্ঞানকে 'অভিশাপ' বলে রায় দেওয়ার মতো ব্যাপার! আসলে আমরা যতই নিজেদের বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের বড়াই করি না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞানার্জন অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। জ্ঞানচর্চার কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েও অন্য বিষয়ে নিতান্তই 'novice'—এমন মানুষের সংখ্যা মোটেই কম নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের পর আমরা সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়ে থাকি। অন্ধ বিশ্বাসীদের মতো অন্ধ অবিশ্বাসীরাও এক অর্থে মৌলবাদী। দেখা যায়, নিজেদের বক্তব্যে এঁরা যতটা অনড়, অন্যের বক্তব্যে ততটাই অসহিষ্ণু। পুঁথিগত বিদ্যার অহঙ্কারে এঁরা অন্ধ। এই প্রেক্ষিতে বলতে পারি, পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতা ছাড়া সব শিক্ষা ব্যর্থ।

সকল ধর্মের একটি সাধারণ সত্য হলো—মানব-কল্যাণ, জীবের মঙ্গলসাধন। অর্থাৎ—

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ-জীবন মন সকলই দাও।
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় বলা হয়েছে ঃ

"এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।"
(৩।১৬)

—হে পার্থ, যে-ব্যক্তি এইপ্রকারে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথাই জীবনধারণ করে। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের কথা না ভেবে যে কেবল আত্মসুখেই জীবনযাপন করে, তার জীবন বৃথা। আবার বলা হয়েছে ঃ

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" (৩।১৩)

—যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপান্ন ভোজন করে।

'ধম্মপদ'-এ বৈরিতা নাশের কথায় বলা হয়েছে ঃ

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তম্।"

—"বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়/অবৈরে যে শান্তি লভে এই ধর্মে কয়।" (অনুবাদ ঃ রবীন্দ্রনাথ)

'কোরান শরীফ'-এ উল্লেখ আছে ঃ "লিল্লাজিনা আহ্‌সানুফী হাজি হিদ্দুনিয়া হাসানাহ।"

—যারা এপৃথিবীতে কল্যাণমূলক কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ।

'হাদীস শরীফ'-এ বলা হয়েছে ঃ "ইয়ারহামু মান ফিল আরজি,/অ-ইয়ার হামুমান ফিস সামায়ি।"

—তোমরা মর্ত্যবাসীর প্রতি সদয় হও, সর্বনিয়ন্তা প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।

মানুষকে ঘৃণা করে শাস্ত্রপাঠে মগ্ন থাকলে ধার্মিক হওয়া যায় না। নজরুল তাই লিখলেন ঃ

"মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে গ্রন্থ কেতাব নাও জোর করে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।"

স্বামীজী তাই বললেন ঃ "যে-ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না—সেই ধর্ম বা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।"

সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত ধার্মিক হওয়া কঠিন, ধর্মের সমালোচক হওয়ার তুলনায়। অনেকে ধর্মকে এড়িয়ে চলেন, আধুনিকতার নামে নাস্তিক সাজেন। তখন হয়তো নানা সুবিধা পাওয়া যায়। এই প্রবণতাই উন্নাসিকতার জন্ম দেয়। এ-স্রোতে গা ভাসালে সমাজের ক্ষতি, পরিহার করলে সকলের মঙ্গল।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা অনেক কথা বলেন। তাঁদের মতে, ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী। তাঁরা আরো বলেন, যেহেতু ঈশ্বর প্রমাণযোগ্য নয়, তাই বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সত্যিই কি তাই? একথা অনেকেরই জানা যে, মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, যদিও সাধারণ ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ "বিজ্ঞানী হয়েছি শুধু এইটুকু জানতে যে, বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন স্বাধীনতা ছিল কিনা। নয়তো পথের পাশে মুচি কিংবা ভাটিখানার বেয়ারা হতাম।" তাঁর বিখ্যাত উক্তি ঃ "Science is lame without religion and religion is blind without science." বিজ্ঞানী কেপলার, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, আইজ্যাক নিউটন ঈশ্বরের ভূমিকায় আস্থাশীল ছিলেন। প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকায় স্যার আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত উক্তি ঃ "হাইপোথিসেস ননফিংগো"—কোন মনগড়া ধারণার আশ্রয় নেব না। আরো লিখেছিলেন ঃ "মহাকর্ষের কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। তাই কোন মতবাদ দেব না।" উপসংহারে বলেছেন ঃ "সূর্য, গ্রহাদি বা ধূমকেতুদের এই সুন্দর ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে কেবল এক পরম শক্তিমানের নির্দেশ ও পরামর্শে।" ১৯৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস 'গড অ্যাণ্ড দ্য নিউ ফিজিক্স' বইটি লেখেন। অসামান্য জনপ্রিয় এই বইটিতে চিরপুরাতন সেই প্রশ্নগুলি নতুন আকারে আবার দেখা দেয় ঃ এই ব্রহ্মাণ্ড কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল? কেমন করে লয় হবে? পদার্থ আসলে কী? প্রাণের স্বরূপ কী? মন কাকে বলে? ইত্যাদি। ডেভিস লিখেছেন ঃ "বিশ্বসৃষ্টির চেয়ে গূঢ়তর ও কঠিনতর সমস্যা বিজ্ঞানে আর নেই।" পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন কেউ কেউ স্বয়ম্ভু বিশ্বের কথা বলছেন, অর্থাৎ যে-বিশ্ব আবির্ভূত হয়েছে আপনা-আপনি। পল ডেভিসের আরেকটি বই 'দি মাইণ্ড অফ গড'। এর মলাটের নিচে লেখা—"Science and the search for ultimate meaning." একজায়গায় ঐ বিজ্ঞানীর মন্তব্য ঃ "প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী নই আমি। তবে এটাও মনে করি না যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উদ্দেশ্যহীন একটা দুর্ঘটনা।" বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলির 'The Bible, the Quran and science'

একটি বহুপ্রচারিত গ্রন্থ। বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ডঃ মরিস একজায়গায় লিখেছেন: "পরিশেষে এইসব প্রমাণ দলিলের ভিত্তিতে আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কুরআনে এমন একটা বক্তব্যও নেই, যাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যায়।" স্বামী পবিত্রানন্দ তাঁর 'Modern man in search of religion' (ধর্মের সন্ধানে আধুনিক মানুষ) গ্রন্থের 'Science and religion' (বিজ্ঞান ও ধর্ম) অধ্যায়ে যে মননশীল আলোচনা করেছেন, তারই কয়েক ছত্র—"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও বহিঃপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে। ধর্মও অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস তথা অন্তঃপ্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচনে উন্মুখ। উভয়ের মধ্যে কোন বৈরিতা নেই।" বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন: "ধর্মের মতবাদ বা বিধান এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই। ধর্ম এবং বিজ্ঞান—উভয়েরই কাজ হলো সত্যের সন্ধান। আর স্বয়ং ভগবানই হলেন সত্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের ভগবদ্‌জ্ঞানের প্রসার ঘটে। আর ধর্ম বিজ্ঞানকে বিপথগামী হতে বাধা দিয়ে থাকে। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, ধর্ম যেন যুদ্ধ অথবা ধর্মীয় অপরাধের তদন্ত ও শাস্তিবিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকে—যেমন ছিল অতীতের ক্যাথলিকপন্থী খ্রিস্টানদের ভাবধারার মধ্যে। আর বিজ্ঞান সম্পর্কেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসের মধ্যেই যেন বিজ্ঞানের শেষ পরিণতি না ঘটে।" (Convocation address, Centenary of Madras University, 29.1.1957) বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই মহান চিন্তাবিদের অভিমতও আমাদের জানা দরকার। 'Fragments of confession' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা অনেকখানি আয়ত্তে এনেছি, একথা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা মানুষের সাধ্যাতীত, তাও অনেক বিজ্ঞানী স্বীকার করেন।... তাছাড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধিও যদি না ঘটে, তাহলে মৃত্যুভয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।... আর এদিকে মানুষের পারস্পরিক ক্ষেত্রে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও বিজ্ঞানের করণীয় কিছু নেই।" তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত নয়, পারস্পরিক পরিপূরকতাই মানুষের মঙ্গলসাধন করতে পারে।

কেউ কেউ বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান গ্রহণযোগ্য হয়, ধর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন অবকাশ নেই। একথা কিন্তু ঠিক নয়। ধর্মও পরীক্ষিত সত্য। তা হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি দ্বাদশ বছর সাধনান্তে সর্বধর্মের পথ অবলম্বন করে এক ঈশ্বরকেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং উপলব্ধ সত্য যথার্থ কিনা তা পরীক্ষার জন্য দক্ষিণেশ্বরে প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন—যদি ঠিক ঠিক ঈশ্বর উপলব্ধি হয়ে থাকে তো সামনের পাথরটি তিনবার উঠে আবার পড়বে। তবে সে-পরীক্ষা বাইরের ল্যাবরেটরিতে হয় না। ধর্ম যেহেতু মন, আত্মা, অনুভূতি, উপলব্ধির মতো বিষয়: যাদের চোখে দেখা যায় না, হাতে ধরা যায় না—তাদের নিয়ে কাজ করে, তাই তার পরীক্ষাগারও ভিন্ন। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ বা নীতি—এই সত্য স্বীকার করেন আস্তিক, নাস্তিক সকলেই। যদিও আস্তিকের বিশ্বাসের গভীরতা নাস্তিকের থেকে বেশি। এ কি পরীক্ষিত সত্য? অবশ্যই।

এক বা একাধিক বিজ্ঞানসাধক যখন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য ঘোষণা করেন, তখন সাধারণ মানুষ তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেন। শতকরা ৯৯ জন মানুষই জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্বাস করেন নিজেদের চোখে দেখে নয়, বিজ্ঞানীদের কথা শুনে। অথচ এমন অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। যেমন—সূর্য ঘুরছে না পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়, চাঁদের আলো নেই, সূর্যের উদয়-অস্ত নেই, আকাশ মহাশূন্য ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলি পরীক্ষিত সত্য। অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললেও সাধারণ মানুষ তা মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা একসময় বলতেন, অ্যাটম বা পরমাণু পদার্থের শেষকথা। পরে তাঁরা বললেন, অ্যাটম শেষকথা নয়, তারপরেও আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করছেন, নিজেদের চোখে না দেখেও। ধর্মজগতের মহান সাধক যাঁরা—নিষ্ঠা, সাধনা ও সত্যানুসন্ধানের একাগ্রতায় তাঁরাও তো বিজ্ঞানী। তাঁরা যখন ঘোষণা করেন—'সত্যমেব জয়তে', তখন তো তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই গ্রহণীয়। যখন তাঁরা বলেন— ধর্মের জয়, তখন তো তাঁরা বলতে চান—যা সত্য, যা নীতিসম্মত, যা কল্যাণকর, তার জয়। মানুষের মনের জগতে, অনুভূতির জগতে যে-ল্যাবরেটরি আছে, সেখানে এ-তথ্য পরীক্ষিত হয়েছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। বরং একদিক থেকে এ-সত্য মহত্তর। কেননা কালে কালে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যে আমূল বা আংশিক পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্সের মন্তব্য স্মরণযোগ্য: "We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth because at any moment new faots may be discovered and compel us to abandon it." ('The New Background of Science')

কিন্তু ধর্ম বা দর্শন এমন কিছু মূল্যবোধের কথা বলে, যা চিরন্তন। শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, দয়া, মায়া, সৌহার্দ্য শাশ্বত, চিরকালীন। এসব ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জীবন হয় শুষ্ক ও মরুময়। আত্মহননের পথ বেছে নিতেও তখন সে দ্বিধা করে না। তাই ধর্মও বিজ্ঞান। ধর্মের সত্যও পরীক্ষিত সত্য।

অনেকে বলেন রাশিয়া, আমেরিকা, চিন প্রভৃতি দেশ তো ধর্ম ছাড়াই অনেক উন্নতি করেছে। একথা যেমন ঠিক, সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, ধর্মহীন সভ্যতা তাদের শান্তি দিতে পারেনি। চরম ভোগবাদ তাদের চরম হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' তার কুটিল ফণা বিস্তার করেছে। সভ্যতার বরপুত্র পশ্চিমের মানুষ সেই নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে জরজর তনু। সভ্যতা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনে পরম আশীর্বাদ, কিন্তু ধর্মহীন তথা মূল্যবোধহীন সভ্যতা ও অসংযত ভোগবাদ মানুষকে করে তুলেছে অসংযমী, হিংস্র ও স্বার্থপর। এ থেকে বাঁচতে হলে ধর্ম তথা মূল্যবোধের পথেই ফিরতে হবে। পশ্চিমে সে-প্রবণতা দেখাও দিয়েছে। একজন প্রকৃত ধার্মিক মানুষ, তা তিনি যে-ধর্মমতের অনুসারীই হোন না কেন, সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। এমনকি কেউ যদি কোন বিশেষ ধর্মমতের একনিষ্ঠ অনুসারী না হয়েও মানব-কল্যাণকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে তাঁকেও 'ধার্মিক' আখ্যা দেওয়া যায়। সকলেই জানেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ বিষয়ে তেমন সক্রিয় ছিলেন না, কিন্তু অসামান্য মানব-হিতৈষণার জন্য একজন মহামানবরূপে সম্মানিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বীকার করার স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমন আছে অস্বীকার করারও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "I am able to love my God because He gives me freedom to deny Him." আবার যেহেতু সকল ধর্মমতই কতকগুলি শাশ্বত মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছে, সেই হেতু ধর্মগুলির মধ্যে একটি ঐক্যের সুর বিদ্যমান। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণ যেহেতু আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, সেই হেতু বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরাও পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদের মধ্যে যদি বিভেদ, সঙ্ঘাত, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তাঁরা প্রকৃত অর্থে ধার্মিক হতে পারেননি। সারা বিশ্বে আজ যে মূল্যবোধের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ ধর্ম-নির্দেশিত মানবতাবাদের প্রকৃত অনুশীলন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও সর্বাঙ্গীণ লোকশিক্ষা

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]



শ্রীমায়ের জীবৎকালে শচীন সেন, দেবব্রত বসু প্রমুখ অনেক বিপ্লবী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় স্নাত ও শ্রীমায়ের স্নেহরসে আপ্লুত হয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের জন্য পুলিশ সঙ্ঘকে সন্দেহ করা ও নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করলে মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ একবার তাঁদের বহিষ্কৃত করার কথা চিন্তা করেন, কিন্তু শ্রীমা একথা জেনে তীব্র প্রতিবাদ করে বলেনঃ "ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে—তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা?" আরেকবার সিন্ধুবালা নামে দুই নারীর ওপর পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী শুনে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে সংস্রব আছে—এই সন্দেহে একজনকে ধরতে এসে নামের সামঞ্জস্যবশত পুলিশ দুজনকেই বন্দি করে অনেকটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। এঁদের মধ্যে আবার একজন ছিলেন অন্তঃসত্তা; গ্রামবাসীরা পুলিশের ভুল দেখিয়ে দিলেও বা গাড়ি করে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও পুলিশ তাতে কর্ণপাত করেনি। এই সংবাদ শুনে মা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেনঃ "এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে-দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?"[১৮] অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করাকেও শ্রীমা সমর্থন করেছেন। লজ্জাশীলা হলেও প্রকৃতিগতভাবে তিনি ভীরু ছিলেন না এবং চাইতেন যে, মেয়েরাও যেন অকারণে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়। একবার সন্ধ্যার সময় গৌরীমা জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং মজা করার জন্য মাথায় পাগড়ি বেঁধে পুরুষের বেশে বাড়ির উঠানে ঢুকে ভিখারিদের অনুকরণে বলেনঃ "মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা!" ঐ অসময়ে বাড়ির ভিতরে একজন পুরুষকে দেখে শ্রীমায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ ভয়ে ছুটে গিয়ে মাকে সব জানান। শ্রীমা তখন বাইরে এসে দৃঢ়স্বরে বলেনঃ "কেরে!" গৌরীমা পূর্বস্থানে দাঁড়িয়েই আবার বলেনঃ "দুটি ভিক্ষা পাই, মা। আমি রাত-ভিখারি।" মুখ দেখতে না পেলেও শ্রীমা কিন্তু গলা শুনেই তাঁকে চিনতে পেরে বললেনঃ "ও! গৌরদাসী! এস, এস! কখন এলে?" তখন সবাই হাসাহাসি করতে লাগল।[১৯]

শ্রীমায়ের জীবৎকালে আমাদের দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পানাহার, বেশভূষা, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি বিষয়ে ছিল ভয়ানক কুসংস্কার—যেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত মনে না করলেও সমাজের ভয়ে প্রায় সকলেই মান্য করত। ভাবতে বিস্ময় লাগে, ঐযুগে ঐরকম গ্রাম্য পরিবেশে বাস করেও শ্রীমা তাঁর চিন্তা ও আচরণে ঐসকল প্রচলিত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর মাতৃহৃদয়ের বিগলিত স্নেহ-করুণার জন্য—যার জন্য তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি সন্তানকে অভয় ও আশ্রয় দেওয়ার তাগিদে সবরকম ভয়ভাবনাকে তুচ্ছ করতে পারতেন। সেকালে হিন্দু বিধবাদের, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের বিধবাদের সাদা থানকাপড় পরিধান ও সবরকম অলঙ্কার ত্যাগ একান্ত আবশ্যিক সামাজিক বিধান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীমাও সেই বিধান মেনে সাদা কাপড় পরতে ও গায়ের অলঙ্কার খুলে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু সেসময় বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেনঃ "আমি কি মরেছি যে এয়োস্ত্রীর অলঙ্কার হাত থেকে খুলে ফেলছ?" এরূপ দর্শন ও শ্রবণের পর তাঁর আর হাতের বালা খোলা হলো না এবং সাদা থানকাপড়ও না পরে তিনি নিজের হাতে শাড়িগুলির পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিলেন এবং তারপর থেকে আজীবন তিনি সরু লালপেড়ে কাপড় পরিধান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশমতো তিনি এই আচরণ করলেও তখন সমাজের খুবই মুষ্টিমেয় মানুষ ঠাকুর ও মাকে চিনতে বুঝতে পেরেছিল। তাই সেযুগে শ্রীমায়ের ঐরূপ বেশ ছিল বৈপ্লবিক।

কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক আচরণ করলেও তিনি দেশাচারকে মোটামুটিভাবে মেনে চলতেন এবং অন্যদেরও তা পালন করতে বলতেন, কিন্তু দেশাচারের নামে মানুষকে নিষ্পেষিত করা হলে তিনি তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। বিধবাদের সেকালে নানাপ্রকার

কঠোরতা করার সমাজবিধি ছিল। তাদের ঐরূপ কঠোরতা করতে দেখে ব্যথিত হয়ে শ্রীমা অনেক ক্ষেত্রে তা শিথিল করার উপদেশ দিয়েছেন। একজন বিধবা রাত্রে প্রায় কিছুই আহার করতেন না শুনে মা তাঁকে বলেছিলেন ঃ "তুমি রাত্রে রুটি, পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও।" একাদশীর দিন নির্জলা উপবাস করা ছিল তদানীন্তন সমাজের বিধি। এই বিধি পালন করতে গিয়ে অনেক বালবিধবা ও বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে, তথাপি সমাজের ভয়ে তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের মুখে একবিন্দু জল পর্যন্ত দেয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণও সমাজের এই নিষ্ঠুর নিয়মকে মানেননি। একবার যোগীন-মা তাঁর বৃদ্ধা খুড়িমাকে নিয়ে একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। শ্রীমা তাঁকে অত্যন্ত কাতর দেখে এক গ্লাস শরবৎ খাওয়াতে চাইলেন, কিন্তু সংস্কারবশে বৃদ্ধা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে সকলে যখন ঠাকুরের ঘরে গেলেন তখন বৃদ্ধা হাঁফাতে হাঁফাতে মাটিতে ঝুঁকে পড়েছেন। ঠাকুর তা দেখে ও সবকিছু শুনে নিজেই গঙ্গাজলে শরবত তৈরি করে তাঁকে খাওয়ালেন। ঠাকুর নিজের হাতে বৃদ্ধার মুখের কাছে শরবত ধরাতে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তা পান করে বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন ঃ "বুকটা ঠাণ্ডা হলো, বাবা।"[২০] শ্রীমা বিধবাদের প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ নিয়মভাঙা সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং সেটাই হয়তো তাঁকে সারাজীবন প্রভাবিত করেছিল। একাদশী তিথিতে তিনি নিজে লুচি খেতেন এবং ভক্তদেরও অধিক কঠোরতা করতে নিষেধ করতেন। বালবিধবা ক্ষীরোদবালা একাদশীর দিন কিছুই খান না শুনে মা তাঁকে বলেছিলেন ঃ "না না, আমি বলছি তুমি সাগু খেও, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?" ক্ষীরোদবালা মাথায় তেল মাখেন না শুনে মা বলেছিলেন ঃ "তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তেলটি মেখো।"[২১] বিধবাদের জন্য সমাজ যেসব কঠিন আচারবিচার বেঁধে দিয়েছিল, তার বিরোধিতা করে তিনি তাঁর সন্তানদের বলতেন ঃ "ঐসব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না; ওতে ঠাকুরকে ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তাই করবে।" বালবিধবা শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে মা বলেছিলেন ঃ "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।" সুরবালা দেবী পতিবিয়োগের পর বাকি জীবন হবিষ্য করে কাটিয়ে দিতে চাইলে মা তাঁকে বলেছিলেন ঃ "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়; সে কাঁদে, 'আমাকে দিলে না' বলে।"[২২] নিতান্ত প্রয়োজনে সমাজবিধির বিরোধিতা করলেও তিনি সাধারণভাবে দেশাচারকে মান্য করতেন এবং আহার ও পোশাক-আশাকে অনেকটা সংযম পালন করে চলতেন এবং অন্যের মধ্যে ত্যাগ, সংযম, সেবা প্রভৃতি গুণগুলি দেখতে পেলে খুশি হয়ে প্রশংসা করতেন।

দেহকে অতিরিক্ত মাত্রায় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার প্রয়াস করতে গিয়ে অনেক মহিলা প্রায়ই শুচিবায়ুগ্রস্তা হয়ে পড়েন, কিন্তু এই বাড়াবাড়ির ফলে ধর্মজীবনের কাম্য মানসিক পবিত্রতা তো বৃদ্ধি পায়ই না, বরং মন আরো মালিন্যযুক্ত হয়—একথা ঠাকুর ও শ্রীমা তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীদিদি ছিলেন এমনি এক চূড়ান্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা মহিলা। তাঁর আচার-বিচারের আধিক্য দেখে মা একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন ঃ "বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।" তাঁকেই ঐ বাই ছাড়াবার জন্য আরেকবার নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমি তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বললুম, ব্যস্ সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব—মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।" অনেক শিক্ষার মতো এই শিক্ষাও শ্রীমা ঠাকুরের কাছেই পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বাসকালে ঠাকুর পেটের ব্যামোতে আক্রান্ত হলে শ্রীমা প্রত্যহ তাঁর জন্য সুক্তো, ঝোল ইত্যাদি রান্না করে পাঠাতেন, কিন্তু একবার পর পর তিনদিন তিনি তা পাঠাননি, তাই তাঁর খাবার এসেছে মন্দিরের প্রসাদী ভোগ থেকে। পরে ঠাকুর তাঁকে খাবার না পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলেছিলেন ঃ "মাসের মধ্যে মেয়েরা যখন তিনদিন অশুদ্ধ থাকে, তখন রীতি অনুযায়ী তারা কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।" শুনে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "কে বললে পারে না? তুমি আমাকে দেবে, তাতে দোষ হবে না। বলত, অশুচি তোমার শরীরের কোন্ জিনিসটা? চামড়া, না মাংস, না হাড়, না মজ্জা? দেখ মনই শুচি, অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।"[২৩] পরবর্তী কালে জনৈকা মহিলা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন মেয়েদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরের পূজা করা যায় কিনা, তখন মা বলেছিলেন—মন পবিত্র থাকলে সে-অবস্থায় পূজা করলে দোষ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মতো শ্রীমাও বুঝেছিলেন যে, মনুষ্যসমাজ যাবতীয় অত্যাচার, ব্যভিচার ও অবিচার থেকে মুক্ত তখনি হতে পারবে যখন সকল মানুষের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবজগৎ, সংসার এক নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত—এই উপলব্ধি এঁদের তিনজনের মধ্যেই সকল প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছে। এই প্রেরণা থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা বা পূজা করতে বলেছেন, স্বামীজী তাঁরই পথ অনুসরণ করে সকল মানুষকে 'অমৃতের সন্তান' বলে সম্বোধন করেছেন এবং দরিদ্র ও আর্তের সেবার মধ্য দিয়ে সকলের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে জাগ্রত করতেই কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। আর সারদাদেবীর মধ্যে যে স্বভাবজাত মাতৃত্ব ছিল এবং ষোড়শীপূজার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে মাতৃসত্তার

উদ্বোধন করে দিয়েছিলেন, তারই প্রেরণায় তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে আপন সন্তানের ন্যায় অনাবিল স্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন। এই সমদৃষ্টির জন্যই তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বা ইংরেজ-ভারতবাসীর মধ্যে কোন ভেদ ছিল না।

ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য—একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেও শ্রীমা সমাজ-সংসার ও তার যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, সেবিষয়ে ইতোপূর্বে এই প্রবন্ধে নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, তাদের কল্যাণের জন্য সব করতে পারতেন। দামোদরের বন্যায় একবার বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে শুনে তিনি জনৈক ভক্তকে বলেন ঃ "বাবা, জগতের হিত কর।" রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণকেও তিনি লোকহিতকর কার্যে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন যে, সেবামূলক কাজ নিয়ে থাকাই সকলের পক্ষে কল্যাণকর। স্বামী ঈশানানন্দকে তিনি একদিন বলেছিলেন ঃ "মনটাকে শুধু বসিয়ে না রেখে, আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এসব দেখেই তো এইসব কাজের পত্তন করলে।"[২৪] বারাণসীতে মিশনের সেবাশ্রমের আন্তরিক সেবাকার্য দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন ঃ "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" শুধু মৌখিক সমর্থনই নয়, তাঁর সামান্য সঞ্চয় থেকে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানকে কিছু আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেশে যখন খুব বস্ত্রাভাব, তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে চরকা ও তাঁতের কাজ চলছে দেখে মা তাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "আমাকেও একখানা চরকা এনে দাও, আমিও সুতা কাটব।"[২৫] কায়িক শ্রমের আবশ্যকতার কথা শ্রীমা ভক্তগণকে শুধু উপদেশের মাধ্যমেই বলেননি, নিজে অবিরত সেবা ও কর্ম করে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সারদাদেবীর জীবনের উৎকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হলো সকলের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা। তিনি বলেছিলেন ঃ "ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।" চোর, ডাকাত, অসৎ, পতিতা —কেউই তাঁর স্নেহ-করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। ভারতীয়দের কঠোর নির্যাতন করার কথা জেনে যে-ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি ব্যথিতচিত্তে বলেছিলেন ঃ "ওরা কবে যাবে গো"—তাদেরই সম্পর্কে অন্য একসময়ে বলেছিলেন ঃ "তারাও তো আমার ছেলে।" তিনি মানুষের দোষকে কখনো বড় করে দেখতেন না, বলতেন ঃ "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে তাকে ভাল করতে হবে তা কজন জানে?" মানুষের প্রতি তাঁর চরম বাণী ঃ "যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।" তিনি নিজে যে কারোর দোষ দেখে দূরে সরিয়ে দিতেন না, তার পরিচয় তাঁর জীবনের অনেক ঘটনায় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে রাত্রিবেলা মা নিজে ঠাকুরের খাবার নিয়ে নহবতঘর থেকে এসে তাঁকে খাইয়ে যেতেন; একদিন এমনি খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা ভক্ত তাঁকে বললেন ঃ "দিন মা, আমায় দিন" এবং মায়ের হাত থেকে থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের সামনে রেখে চলে গেলেন। কিন্তু মহিলাটির চরিত্র ভাল ছিল না বলে ঠাকুর সে-অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না, শ্রীমাকে বললেন ঃ "তুমি একি করলে? এখন আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে?" শ্রীমা তা শুনেও সেদিনের মতো খেয়ে নিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করলে তিনি অবশেষে বললেন ঃ "আর কোনদিন কারো হাতে দেবে না বল?" তখন মা হাতজোড় করে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "তা তো আমি পারব না ঠাকুর; আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।" সেকথা শুনে ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন, সারদাদেবীর বিশাল মাতৃহৃদয় সন্তানদের সকল দোষত্রুটি উপেক্ষা করে তাদের অগাধ স্নেহরসে অভিষিক্ত করেছে; তাই তিনি প্রসন্ন হয়ে শেষে আহার করেছিলেন। আরেকটি ঘটনারও এখানে উল্লেখ করা যায়। একবার একটি ডোমের মেয়ে নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একটি পুরুষকে ভালবেসে তার সঙ্গে ঘর ছাড়ে, কিন্তু কিছুদিন পর সেই উপপতি তাকে ত্যাগ করলে শ্রীমা ঐ পুরুষটিকে বলেন ঃ "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে। এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ, এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে। নরকেও স্থান পাবে না।" মায়ের কথা শুনে লোকটি মেয়েটিকে আবার তার ঘরে নিয়ে যায়। এখানেও আমরা দেখি, মা প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করার জন্য অভিযুক্ত করে মেয়েটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলতে চাননি, এবার উপপতির সঙ্গেই যাতে ভালভাবে ঘর করতে পারে তারই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও শ্রীমা চরিত্র বিচার না করে মানুষটির সেবা ও সহানুভূতির মনোভাব দেখে প্রাণ খুলে প্রশংসা করেছেন। বাগবাজারে তাঁরই গৃহের সম্মুখে একজন পুরুষকে তার উপপত্নীর কঠিন অসুখের সময় প্রাণ দিয়ে সেবা করতে দেখে তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন ঃ "কী সেবাই করেছে মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান!"[২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার জীবৎকালে রঙ্গালয় স্থানটি ছিল অপবিত্র, কারণ বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে তখন অভিনেত্রী নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাই ভদ্রঘরের কোন নারীর অভিনয় দর্শন করাও সমাজের অনুমোদিত ছিল না। এমনকি কেশব সেন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণও রঙ্গালয়ে পতিতাদের অভিনয় করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতের নিষ্কলঙ্ক মানুষ হয়েও রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঘৃণা না করে আশ্রয় দিয়েছেন; বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে (সমাজের চোখে যিনি ছিলেন মদ্যপ ও চরিত্রহীন)

তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার দিয়েছিলেন এবং নিজে রঙ্গালয়ে গিয়ে তাঁর ও তথাকথিত পতিতা অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখেছেন; নটী বিনোদিনী তাঁর চরণপ্রান্তে স্থান পেয়েছেন। শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণবিধবা হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমাও ঠাকুরের মতো রঙ্গালয়ে গিয়ে নাটকের অভিনয় দেখেছেন এবং 'রামানুজ' নাটকের চম্পার ভূমিকায় নীরদাসুন্দরীর চমৎকার অভিনয় দেখে তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে স্নেহচুম্বন করেছেন। তাছাড়া অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী তাঁর অযাচিত স্নেহ লাভ করে তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন এবং আশীর্বাদ ও প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। তাঁর কাছে পতিতাদের আসার ব্যাপার নিয়ে একবার সঙ্ঘের কোন কোন সাধু ওজর-আপত্তি জানালে মা বলেছিলেন ঃ "ওদের যদি আসতে না দাও, আমি এখানে থাকব না।" উচ্ছৃঙ্খল নট গিরিশচন্দ্রকেও তিনি নিজ স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিয়েছেন, জয়রামবাটীতে স্বহস্তে তাঁর সেবা করেছেন, তাঁর বিছানার চাদর কেচে দিয়েছেন এবং তাঁর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ঃ "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।" পাপী, তাপী, পতিত, অসৎ সকল মানুষের প্রতি শ্রীমায়ের অপার করুণার কথা বলে শেষ করা যায় না। সম্ভ্রান্ত বংশের জনৈকা মহিলা বিপথগামী হওয়ার কিছুকাল পরে আপন ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে শ্রীমায়ের কাছে শান্তিলাভের জন্য আসেন; মা তাঁকে সাদরে কাছে ডেকে বলেন ঃ "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ, এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।" আরেকবার চুরির অপরাধে মঠ থেকে স্বামীজী এক ভৃত্যকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন, সে এসে কেঁদে পড়ল মায়ের কাছে। করুণাময়ী মায়ের হৃদয় অপরাধীর অসহায়তার কথা ভেবে স্থির থাকতে পারল না, বাবুরাম মহারাজকে ডেকে তিনি বললেন ঃ "দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরিব। অভাবের তাড়নায় এরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে। সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না। একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" মায়ের আদেশ জেনে স্বামীজী দ্বিরুক্তি না করে তাকে কাজে পুনর্বহাল করলেন।

শ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন পৃথিবীর মতো সহনশীলা। সন্তানদেরও প্রতি তাঁর উপদেশ ঃ "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কতরকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে। সহ্যের সমান গুণ নেই।" মানুষকে বিশেষত নারীদের অশেষ সহনশীলা হতে উপদেশ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের ওপর পুরুষদের অতিরিক্ত আধিপত্য ও নির্যাতন লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—এরকম চলতে থাকলে মেয়েরা আর পৃথিবীর মতো সহনশীলা থাকবে না।

অতিরিক্ত বিষয়তৃষ্ণা মানুষকে গভীর দুঃখের পথে টেনে নিয়ে যায়—একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি আমাদের বলেছেন ঃ "সন্তোষের সমান ধন নেই" এবং নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, বাহ্য জগৎ থেকে প্রায় কিছুই না পেয়ে কত সন্তুষ্ট, কত পরিতৃপ্ত, কত আনন্দিত থাকা যায়। তিনি বলতেন ঃ "ঠাকুরের কাছে যদি কিছু চাইতেই হয়—নির্বাসনা চেয়ে নেবে।"

সেযুগে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার অভাবে নারীদের জীবন ছিল একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। সেকালেই তিনি গৌরীমাকে বলেছিলেন ঃ "মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা কেবল থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড় করতেই এজগতে আসেনি।"

শ্রীমা যে কী অগাধ স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং পরমার্থের পথে সকলকে এগিয়ে দিতে চেয়েছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। সন্তানদের অভয় দিয়ে তিনি বলেছেন ঃ "আমি মা, আমার ছেলেরা গায়ে ধুলোকাদা মাখলে আমাকেই ধুইয়ে মুছিয়ে কোলে নিতে হবে।" বলেছেন ঃ "আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি? সব মেয়ের ভিতরই আমি, সব মায়ের মধ্যেই আমি রয়েছি। যে যেখান থেকেই আসুক, সবাই আমার ছেলেমেয়ে।" সংশয়ী সন্তানদের প্রতি তাঁর গভীর আশ্বাস ঃ "আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা খুশি কর না কেন, যেভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত-পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, মানুষ তো তা ছুঁড়বে, তারা তাদের খেলা খেলবেই।" আরেকজনকে বলেছেন ঃ "তোমরা সাধন-ভজন আর কী করবে! আমিই তো তোমাদের জন্য করছি। তোমরা যে যা খুশি কর না কেন, শেষকালে ঠাকুরকে আসতেই হবে তোমাদের নিতে।"

আজকের এই অবক্ষয় ও ভালবাসাহীনতার যুগে শ্রীমায়ের অগাধ স্নেহ-ভালবাসার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ জীবন ও বাণী যদি আমরা যথার্থভাবে অনুধ্যান করতে পারি, তবেই আমাদের নিশ্চিত পরিত্রাণ। [সমাপ্ত] ❑

আকরগ্রন্থ

১৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২০৩-২০৪
১৯ ঐ, পৃঃ ২১৯
২০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০
২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৩৫৩
২২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬০, ৩৬৩
২৩ ঐ, পৃঃ ৭১
২৪ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১৪২
২৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬৫
২৬ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—সুস্মিতা ঘোষ, ১৯৯৯, পৃঃ ১০২-১০৩

ঐ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ ঃ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা

গত বর্ষের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) এবং এই বর্ষের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (জুন-নভেম্বর ২০০২) দুটি অংশে শ্রীদেবাঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে' প্রকাশ করে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক এবং লেখক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু যে একেবারেই অভিনব তা অবশ্য বলা যাবে না। বিবেকানন্দ-নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে এযাবৎ বহু গবেষক বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছেন। তবে এই ধারায় দেবাঞ্জনবাবুর লেখাটি যে মূল্যবান একটি সংযোজন, তাতে সন্দেহ নেই। 'মূল্যবান' বলছি এইজন্য যে, প্রাবন্ধিক এখানে সংস্কারমুক্ত নির্ভীক মন নিয়ে এমন একটি বিষয়ের ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছেন, যেখানে 'দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পান'।

দেবাঞ্জনবাবু এই সূত্রে এমন অনেক পুরনো তথ্যকে আবার নতুন করে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন, যা আমরা অভ্যাসদোষে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। নতুন তথ্যও যুক্ত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। তবে শুধু তথ্য নথিভুক্ত করাতেই নয়, দেবাঞ্জনবাবুর আসল কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি সেই তথ্যসমষ্টিকে যুক্তি দিয়ে পুনর্বিচার করে এবং পূর্বনির্ধারিত কোন বিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কসূত্রটিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলেছেন। এইজন্যই এবিষয়ে আজ পর্যন্ত আর যাকিছু আলোচনা হয়েছে, তার তুলনায় নিঃসন্দেহেই এই প্রবন্ধটির মূল্য বেশি। আর হয়তো খানিকটা সেই কারণেই তাঁর প্রবন্ধের প্রথমাংশটি 'উদ্বোধন'-এর পাতায় পাঠ করার পর আমাদের প্রত্যাশাও জেগেছিল বেশি। বলতে খারাপ লাগছে, দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটির গত অগ্রহায়ণ ১৪১০ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ সমাপ্ত হওয়ার পর অন্তত কিছু পরিমাণে হলেও আমাদের সেই প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ব্যাপারটি তাহলে একটু ভেঙেই বলা যাক।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বহু আকর্ষক তথ্যপ্রমাণ পেশ করলেও লেখকের উল্লিখিত এসমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় (৩৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মূল্যবান একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধ-শিরোনাম ছিল—'বিবেকানন্দের মহা-প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা'। জগদীশবাবু তাঁর এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-কবিতাটিকে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের প্রতিক্রিয়ায় রচিত বলে অনুমান করেছিলেন, সেটি হলো 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মরণ-মিলন'। কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। পত্রিকায় এর নাম ছিল 'মরণ'। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৩০৯ বঙ্গাব্দের এই সময়পর্বে রবীন্দ্রজায়া মৃণালিনী দেবী ছিলেন শয্যাশায়িনী। ভাদ্র মাসে কবি তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু কবির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ৭ অগ্রহায়ণ কবিপত্নীর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনতথ্যের ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে, 'স্ত্রীর মরণ-নিশ্চয় পীড়ার'র ভাবী পরিণতির দিকে তাকিয়েই 'শোকের কল্পিত হৃদয়োচ্ছ্বাস'কে কবি ভাষাদান করেছেন এই কবিতায়। জগদীশবাবু এই অনুমানের তীব্র বিরোধিতা করে তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেন ঃ "রবীন্দ্র-জীবনীকারের পক্ষে এই অসতর্ক উক্তি শুধু হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক নয়, তা মনুষ্যধর্মবিরোধীও বটে। পত্নীর অসুস্থ শয্যার পাশে বসে যে সেবারত স্বামী প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছেন, তিনি পত্নীর মৃত্যুকে কল্পনা করে 'মরণ-মিলন'-এর মতো কবিতা রচনা করবেন—এ অনুমান নিতান্তই অমানবিক।" বস্তুত, 'মরণ-মিলন' রচনার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে প্রভাতকুমারের সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এই আপত্তি তোলার সূত্র ধরেই ঐ প্রবন্ধে শুরু হয়েছিল জগদীশবাবুর নিজস্ব অনুসন্ধান।

জগদীশবাবুর সমগ্র প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয়ের বিবরণ এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সকলের অবগতির জন্য উক্ত প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করে সমগ্র প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের নির্যাসটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ঐ প্রবন্ধে জগদীশবাবু মূলত বলতে চেয়েছিলেন ঃ "মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'মরণ-মিলন'।... কবিতাটিকে এককথায় বলা যেতে পারে, শোকাভিহত চিত্তের মৃত্যু-সম্ভাষণ।... কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটি মৃত্যুর পূর্বাভাস নয়, মৃত্যু এখানে সমাগত। কবিচিত্তের মর্মমূলে বাসা-বাঁধা কোন প্রিয়জন-বিয়োগের স্মৃতি থেকেও এই কবিতার জন্ম হয়নি। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালিতে আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুস্মৃতিকে অবলম্বন করে লেখা অনেক কবিতা পেয়েছি। তাদের রূপ ও রীতি, সুর ও স্বাদ আলাদা।... মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বরবধূর মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিব-উমার মিলনের কথা সর্বপ্রথম 'মরণ-মিলন' কবিতাতেই বললেন।... রুদ্ররূপী প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায়

শোককাতর চিত্তের মৃত্যু-সম্ভাষণই কবিতাটির উপজীব্য। স্বভাবতই আমাদের জিজ্ঞাসা, কোন্ বন্ধুচিত্তের দুঃখের প্রতি কবির সমবেদনা এখানে নাট্যরূপ লাভ করেছে?... পূর্বেই বলা হয়েছে, 'মরণ-মিলন' কবিতাটি 'মরণ' শিরোনামায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মাত্র মাস-দুই পূর্বে আষাঢ় মাসে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। আমাদের প্রতিপাদ্য হলো, রবীন্দ্রনাথের 'মরণ-মিলন' কবিতাটি বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে রচিত। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্ববাসী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনেছে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, বিশ্বকবিও তেমনি বিবেকানন্দকে চিনেছেন নিবেদিতার দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মৃত্যুত্তীর্ণ দিব্যসম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ শিব-উমার প্রতীকে উপস্থাপিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্কের যে-রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার প্রতীক হলো তপস্বিনী উমা আর বীরেশ্বর শিবের দিব্যমিলন।... বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে গোধূলি-লগ্নে।... গোধূলি-লগ্নে দেহবন্ধনমুক্ত শিবের আবির্ভাব মৃত্যুরূপে। তপস্বিনী উমার সঙ্গে ঘটল তাঁর মর্ত্যবন্ধনমুক্ত দেহাতীত আত্মিক মিলন। এই হলো 'মরণ-মিলন' নামকরণের তাৎপর্য।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, উক্ত প্রবন্ধে যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়ে প্রবন্ধকার তাঁর প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কোন তুলনা নেই। একথাও সহজবোধ্য যে, জগদীশবাবুর এই অসামান্য অনুসন্ধানের সূত্র ধরে ঐ প্রবন্ধে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের অনেক অচেনা স্নিগ্ধ ভিতরমহলের দরজা খুলে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও জগদীশবাবুর দুর্ভাগ্য এইখানে যে, তথাকথিতভাবে নিষিদ্ধ একটি এলাকায় প্রবেশ করে অনধিকারচর্চার অভিযোগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ও ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। তাদের সেই বীভৎস বিষোদ্গার আজকের পাঠক অবশ্য মনে রাখেননি। সময় তার সমস্ত চিহ্ন মুছে নিয়েছে। আর জগদীশবাবুর ঐ কিংবদন্তিতুল্য সাধনার কথাও আমরা আজ বিস্মৃত হয়েছি বটে; তবে তার কারণ, বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ। এতবছর পর 'উদ্বোধন'-এর পাতায় দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটি যখন প্রকাশলাভ করল, তখন আমরা ভেবেছিলাম, এই প্রবন্ধে হয়তো জগদীশবাবু তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাস্তবে তা হয়নি।

দেবাঞ্জনবাবু তাঁর প্রবন্ধের ৮৫ ও ১০০ সংখ্যক পাদটীকায় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যাটির দুবার উল্লেখ করেছেন। বৈশাখ ১৩৭০ থেকে তিনি যদি আরেকটু পিছিয়ে এসে মাঘ ১৩৬৯ সংখ্যাটি একবার ঘেঁটে দেখতেন, তাহলেই জগদীশবাবুর প্রবন্ধটি তাঁর চোখে পড়তে পারত। অবশ্য এই দীর্ঘ একচল্লিশ বছরে জগদীশ ভট্টাচার্যের সত্যসন্ধান যে একেবারেই কোন স্বীকৃতি পায়নি, তা নয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের সদস্য, বঙ্গসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত, 'পেঙ্গুইন' থেকে প্রকাশিত 'Rabindranath Tagore : Selected Poems' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মরণ-মিলন' তথা 'Death Wedding' কবিতাটির পাদটীকায় (গ্রন্থটির সংশোধিত পুনর্মুদ্রণে) লিখেছেনঃ "There is disagreement about what have inspired it. It has been related to... the death of Swami Vivekananda early in the year."—যদিও 'স্ত্রীর মরণ-নিশ্চয় পীড়া'র সঙ্গে এই কবিতার সংযোগ সম্পর্কিত প্রভাতকুমার-কৃত অনুমানকে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণটিতে গ্রহণ করেও এই সংস্করণে রাদিচে সেই সম্ভাবনাকে নির্দ্বিধায় খারিজ করে দিয়েছেন। জগদীশবাবুর পরিশ্রমী গবেষণার প্রতি রাদিচের এই সম্মানজ্ঞাপন নিশ্চয়ই সুখকর। কিন্তু স্বদেশের মাটিতে কি কোনদিনই তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাবেন না?

১৪০৯ সালের কার্তিক সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটির প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে ছোট্ট একটি টীকায় পত্রিকা-সম্পাদক জানিয়েছিলেন, এপ্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সকলে একমত নাও হতে পারেন, তবুও পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রবন্ধটি নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত হলো। জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা 'বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা' প্রবন্ধটিকেও কি বিস্মৃতির বিজন কক্ষ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে পুনঃপ্রকাশিত করা যায় না? শুধু বর্ষীয়ান এক সমালোচককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই নয়, বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কসূত্রটিকে আরো স্বচ্ছভাবে বোঝার জন্যও জগদীশবাবুর প্রবন্ধটি বাঙালি পাঠকের গোচরে আসা জরুরি। 'উদ্বোধন'-এর একজন নগণ্য পাঠক হয়েও 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়ে দুঃসাহস প্রকাশ করার জন্য আমি বিনীত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

তপোব্রত ভাদুড়ি
বাঙলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দেবাঞ্জন সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতাঃ রাগে অনুরাগে' ধারাবাহিকটি শেষ হলো। এই ধারাবাহিকটি পড়তে পড়তে কখনো উৎফুল্ল, কখনো ব্যথিত, আবার কখনো বিস্মিত হয়েছি। গবেষক-লেখক শ্রীসেনগুপ্ত বিদগ্ধ অনুশীলনের মাধ্যমে এই আপাত রহস্যাবৃত সম্পর্কের সঠিক উন্মোচনের সফল প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। তবে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাবনা-চিন্তা কিন্তু মিলিয়ে যায় তাঁর অসাধারণ মীমাংসক শেষ অনুচ্ছেদটিতে, যেখানে তিনি বলেছেনঃ "অস্তাচলে যাওয়ার আগে দিনান্তের রবি অর্ঘ্য দিয়ে গেলেন তাঁর 'লোকমাতা'কে।"

এই অনবদ্য প্রবন্ধটি আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য লেখক ও সম্পাদক মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই।

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

ভিটামিন 'এ' ও তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে

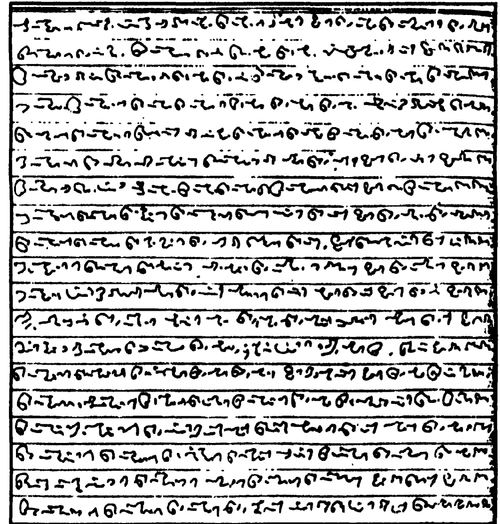
'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যার 'স্বাস্থ্য' বিভাগে 'ভিটামিন এ ও তার প্রয়োজনীয়তা' প্রবন্ধে চৈতালি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ চর্বি ও তেলে ভিটামিন 'এ' থাকে। তিনি এপ্রসঙ্গে কড লিভার অয়েলের কথা লিখেছেন, কিন্তু আমাদের দেশি হাঙরের তেল (Shark liver oil) বেশি ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ। কিন্তু এই দুই তেলেই খুব বেশি পরিমাণ ভিটামিন 'এ' থাকায় মাত্রাতিরিক্ত খেলে ক্ষতিকর। চর্বি একপ্রকার প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য। 'উদ্ভিজ্জ চর্বি' বলতে লেখিকা বোধহয় বনস্পতিকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য বনস্পতি তৈরির সময় ভিটামিন 'এ' যোগ (fortification) করা হয়। উদ্ভিজ্জ তেলে ভিটামিন 'এ' থাকে না। ব্যতিক্রম একমাত্র পাম তেল (red palm oil)—যা মালয়েশিয়া, আফ্রিকা ও ব্রাজিলে সাধারণত উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও আমদানি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম তেলে ভিটামিন 'এ' তৈরির উপাদান (provitamin A) ক্যারোটিন আলফা ও বিটা (α-Carotene, β-Carotene)-রূপে থাকে। পরিমাণ প্রতি ১০০ গ্রাম তেলে ৬,৭০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন 'এ' তৈরি হওয়ার সমান। তুলনায় কমলালেবুতে ২১, টম্যাটোতে ৫০ ও গাজরে ৪০০ মাইক্রোগ্রাম। লেখিকা আরো লিখেছেন, আমাদের দেশে প্রচুর সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের শাকসবজি এবং ফল রয়েছে, যেগুলি ক্যারোটিন নামক রঞ্জক পদার্থে সমৃদ্ধ। ক্যারোটিন পিগমেন্ট হলো ভিটামিন 'এ' তৈরির উপাদান (precursor)। কিন্তু কোন সবজি বা ফলের রঙ দেখে তা ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ কিনা সবসময়ে বলা যায় না। হলুদ গাজর ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ, আবার সবুজ শাকপাতায় প্রচুর ক্যারোটিন থাকলেও সবুজ ক্লোরোফিলের জন্য ক্যারোটিনের হলুদ রঙ চাপা পড়ে যায়। টম্যাটোর লাল রঙ 'Lycopene'-এর জন্য। 'Lycopene' একটি ক্যারোটিন হলেও ভিটামিন 'এ'র উপাদান (precursor) নয়। অন্য পুষ্টিগুণ বিতর্কিত।

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

ভারতের অতলস্পর্শী ইতিহাসের কতটুকুই বা আমরা জানি?

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় স্বামী মুখ্যানন্দের 'সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার এবং বৈদিক সভ্যতা' বিষয়ক নিবন্ধটি অত্যন্ত সুন্দর এবং গবেষকদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, রাজস্থান অঞ্চলে প্রাক্-বৈদিক এবং বৈদিক সভ্যতার অনেক চিত্র পাওয়া গেছে। এই কথার সত্যতা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলা যাক। রাজস্থানের 'নাগোর' জেলায় একটি জায়গা আছে—'কুচাওয়ান সিটি'। এখানে একটি অদ্ভুত পরিবার বাস করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। সেপ্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এঁদের পরিবারের একটি ছেলে চিমনেশ গৌড় সম্বন্ধে এখানকার কাগজেও লেখালেখি হয়েছে। ইনি সুদীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে সাধনা করে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে প্রতিদিন ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত তিনি দুর্বোধ্য ভাষায় (সকলে বলে,



সংস্কৃতের আদি রূপ) পাতার পর পাতা লিখতে থাকেন এবং মুখেও অনর্গল ঐ ভাষায় কথা বলেন। সেই ভাষার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না, এমনকি সকালের পর তিনি নিজেও কিছু বুঝতে পারেন না। এই লিপিতে তাঁর একটা আলমারি ভর্তি হয়ে গেছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা এর অর্থ উদ্ধার করতে এখনো অক্ষম। তবে এটুকু বোঝা গেছে, তাঁর কথার অধিকাংশই জ্যোতিষশাস্ত্রের দুর্লভ সব খোঁজের, যা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। আমি এই লিপির কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছি, যার সঙ্গে 'উদ্বোধন'-এ স্বামী মুখ্যানন্দজীর রচনায় প্রকাশিত লিপির কিছু মিল আছে। শ্রদ্ধেয় স্বামী মুখ্যানন্দজী এবিষয়ে আলোকপাত করলে খুশি হব।

কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়পুর, রাজস্থান-৩১২০০১

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বালোকে আজকের মানুষ

স্বামী অমৃতত্বানন্দ



শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ "মানুষ আর মান-হুঁশ। যার চৈতন্য হয়েছে সেই মান-হুঁশ, চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ।" 'মানুষ' শব্দটি এভাবে বিশ্লেষণ করে মানুষের সংজ্ঞা এর আগে কেউ দিয়েছেন বলে জানা নেই। তবে এর চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি মানুষের স্বরূপের কথা বলেছেন ঃ "মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।" 'ধাম' শব্দের অর্থ এখানে 'স্বরূপ'। এ হলো মূলকথা, শেষকথা।

শাস্ত্র এই স্বরূপতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে একটি উপায় নির্দেশ করেছেন—অধ্যারোপ ও অপবাদ। সেই মূলতত্ত্ব যে মানুষের স্বরূপ, তা বুঝতে গেলে অধ্যারোপ করে বুঝতে হবে; তাই 'আজকের মানুষে'র অবতারণা। আজকের মানুষ কিভাবে 'মানুষ', জগৎ সম্পর্কে তার আরোপ এবং অপবাদ করেই আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। মানুষের এই অধ্যারোপকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন ঃ "মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ২১১) "মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি সব দেখতে একরকম। কিন্তু কারু ভিতর নারকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।" (ঐ, পৃঃ ১০৩) 'আজকের মানুষ' সকলকে 'সমান' চোখে দেখতে চায়—সবাই সমান! গুণভেদে মানুষের ভেদ প্রত্যক্ষ করেও দিকে দিকে সমানাধিকারের অশোভন হুল্লোড়।

আজকের মানুষ বললে—নির্বিশেষে সকল মানুষকেই বোঝানো হয়। তাতে অসুবিধা হলো, বহুরকম মনোবৃত্তির মানুষকে নিয়েই আলোচনা করতে হবে। বহুধরনের মতবাদ উল্লেখ করে তাদের অপবাদ করতে হবে। তথাপি সরল করা যায়—যদি মানুষের ভাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে নিই—জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে। বেশির ভাগ মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও জড়জগৎকে অসত্য বা মিথ্যা ভাবে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—জগতের নিয়ামক ঈশ্বর আছেন, আমরাও আছি, জগৎও আছে—এসবই সত্য। আমরা সুস্থ শরীরে ও মনে জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ভোগ করতে থাকব; অসুবিধা হলে ভগবানকে স্মরণ করব, প্রার্থনা করব, এমনকি মানতও করব। এই মতের সংখ্যাই বেশি। এমনকি চোর, ডাকাত, খুনিরাও তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, পুজো দেয়। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র—অণুচৈতন্য। মানুষ এজগতে যেমন কাজ করবে, মৃত্যুর পর সেরূপ ফল পাবে। পুণ্যবলে স্বর্গ হবে, পাপে নরকভোগ। পুনর্জন্ম হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনগণ ও অপর কোন কোন মতাবলম্বী মানেন। পুণ্য-পাপাত্মক কর্মফল ক্ষয় হলে আবার জন্ম হবে। পাপের মাত্রার তারতম্যে নরকবাস, শেষে তির্যকযোনি, গাছ, পাথর পর্যন্ত হতে হয়—"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।/ স্থানুমন্যেনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥" (কঠ উপনিষদ্, ২।২।৭)

এই মানুষই কর্ম করে লোকসকল জয় করে। সাতটি উর্ধ্বলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য। সাতটি অধঃলোক। এসকল লোকলাভের উপায় কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনা। বলা হয়েছে, 'কর্মণা পিতৃলোকঃ', 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ'—কেবল কর্মফলে লোক পিতৃলোকে যায় আর উপাসনার বলে যায় দেবলোকে। মানুষেরই এইরূপ কর্ম করার সুযোগ রয়েছে এবং কর্ম উপাসনার সঙ্গে করা হলে বা কেবল উপাসনার বলেই উচ্চতম ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মানুষ যেতে পারে এবং ক্রমমুক্তিও লাভ করতে পারে। ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হলে কৈবল্য মুক্তিলাভও করতে পারে। সুতরাং দেবতা বা পশু প্রভৃতির শরীর কেবল ভোগায়তন হওয়ায় ঐসকল শরীরে কর্ম বা উপাসনা করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু জন্ম-পরম্পরায় কখন মানুষজন্ম লাভ হবে বলা দুষ্কর। শাস্ত্রে একারণেই নরজন্মকে 'দুর্লভ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "দুর্লভং ত্রয়মেতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।/ মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥" (বিবেকচূড়ামণি, ৩) তাই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মহাভারতে বলা হয়েছে—"ন মনুষ্যাৎ পরতরং হি কিঞ্চিৎ।" বাংলার মরমিয়া কবিও গেয়েছেন ঃ "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

আজকের দিনে অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা এসকল তত্ত্ব মানেন না। ধর্ম মানেন—পরলোক মানেন না। আর তাঁদের মতের প্রতিনিধি হয়েই যেন বঙ্কিমচন্দ্র কথা বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আপনি কি বলেন, মানুষের কর্তব্য কী? কী সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?" বঙ্কিমবাবু এর বিস্ময়সূচক উত্তর দিয়েছেন ঃ "পরকাল! সে আবার কী?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন ঃ "হ্যাঁ জ্ঞানের পর আর অন্যলোকে যেতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়—ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়, কোনমতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরলোকও আছে, জ্ঞান হলে ঈশ্বরদর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায়, আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না, জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয়, তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে আর সংসার করতে পারে না, তার তো আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) বঙ্কিমচন্দ্র অতদূরে যেতে রাজি ছিলেন না। আজকের মানুষও তাই, ধর্ম করবে সংসারের সুখের জন্য। তাই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানীকে 'আগাছা' ভাবলেন, বললেন ঃ "মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।" তাঁর মতে সন্ন্যাস ব্যর্থ, কারণ 'অপত্যস্নেহ' সেখানে নেই।

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়।" এখানেই আজকের মানুষের বুদ্ধির দৌড় সীমাবদ্ধ—অনেক বিচার করেও জগৎলয়কারী ব্রহ্মজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে না, বিচারের ক্ষেত্রে স্বীকার করলেও।

আজকের মানুষ পুনর্জন্ম মানে না

অনেকে আবার পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেছিলেন, সেকথার পুনরুল্লেখ করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন ঃ "যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে, ছাড়বে না, অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ-সংসারে আসতে হবে নিস্তার নাই।" কিন্তু জ্ঞানীর যে প্রয়োজন আছে মনুষ্যসমাজের জন্য, সভ্যতার জন্য তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার সংসারে লোকশিক্ষার জন্য।... সে তাঁর কাজের জন্য তিনিই রেখে দেন; যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য।"

এটাই আশ্চর্য কথা যে, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যন্ত কেমন করে এই প্রমাদ হলো যে, জ্ঞানী আগাছা, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না! এই জ্ঞানীদের ভাবরাশিই তো সনাতন ধর্মের মূল, সভ্যতার মৌলিক উপাদান—বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতিশাস্ত্রাদি সকল সনাতন ধর্মশাস্ত্রেরই তো রচয়িতা ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ।

উনবিংশ শতাব্দী হলো সংশয়ের যুগ। আধুনিক যুগের সংশয়াত্মা। পাশ্চাত্য ভাবধারায় আমাদের স্বচ্ছ বিবেক যেন ঝলসে গিয়েছিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগরও ঐকালের সৃষ্টি; ধুতি-চাদর পরা যদিও, তবু অন্তরে সাহেব। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যুগবাহিত সংশয়ে শাস্ত্র-প্রবেদিত সত্যকে তিনি মনেপ্রাণে কি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? অনেকটা অজ্ঞেয়বাদীর মতোই যেন, তবে তাঁর লোকসেবা, পরোপকার, সহানুভূতি ছিল অসাধারণ।

তিনিও আজকের মানুষের প্রতিভূ। ধর্ম মানেন, ঈশ্বর মানেন, তবু সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ একটাই—জগৎটাকে সত্য বলে ধরেছেন। তা নাহলে কেমন করে বললেন, সাংখ্য বেদান্তদর্শন যে ভুল তাতে কোন দ্বিমত নেই।

জগৎ সত্য(?)

এই জগৎকে আজকের মানুষ চরম সত্য বলে ধরেছে বলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী প্রশ্ন ঃ "আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কী?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।"—এমন উত্তরকে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক উত্তর বলে মনে নাও করি, তাহলেও বলতে বাধা নেই যে, এটাই কি আজকের মানুষের আন্তর রূপ নয়? কাঞ্চন-কাম চর্চার যে-রূপ আজকাল সাহিত্য, কাব্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে দেখা যাচ্ছে, তাতে কী বোধ হয়? এখানে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বৃহত্তর সভ্যজগতে, ধনী শিক্ষিত মহলে বিনোদনের উপকরণ-সহ যে গ্রাম্যসুখস্পৃহার চেহারা, তা কি জড়বাদী সভ্যতার রূপ নয়? একে অধিক মাত্রায় সত্য বলে দৃঢ় ধারণা করাতে প্রয়াসী বহুশত বিজ্ঞানী তথা ডারউইন, কার্ল মার্ক্স, ফ্রয়েড প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মানবগণের নাম অবশ্যই করা যাবে। তাঁদের ধারণার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উত্তর ঃ "এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। তুমি যা রাতদিন করছ তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে।... কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে রাতদিন রয়েছ, আর ঐকথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়।" একথা আজকের মানুষ অযথার্থই বলবেন—'বড় বেশি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্তর বলেই মনে হয়'। ঐ পাটোয়ারি আর কপটতাই বর্তমান সভ্যতাকে মূল্যবোধহীন করছে।

এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে অভ্রান্ত প্রজ্ঞাবচন দিয়েছেন ঃ "শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে?

পাণ্ডিত্যে কি হবে, যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে? চিল-শকুন খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর।" (ঐ, পৃঃ ১২১৩) জড়বাদী পণ্ডিতদের অবস্থা কি এরূপ নয়?

আবার ঈশ্বরভক্ত, অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মানুরাগী ব্যক্তি শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষেরও অধ্যাত্মজগতের ধারণা যে কত অগভীর, তারও প্রমাণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতেঃ "কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করছে! পাগলা। এরা 'বেহেড' হয়েছে।" ঠিক কথা আজকের জড়বাদী মানুষ তাই ভাবে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে, প্রকৃত ভক্ত গৃহীদের সম্বন্ধেও হয়তো—'বেহেড হয়েছে'! একেবারে চাঁচাছোলা গ্রাম্যভাষায় এর তীব্র নিন্দা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ "এরা বেহেড হয়েছে, আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ! কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে।" (ঐ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসার-মায়া সম্পর্কে তাঁর মৌল ধারণাকে কোন দার্শনিক পরিভাষায় বা তত্ত্বরূপে বর্ণনা না করে একেবারে মূলবস্তু ধরে বলেছেনঃ "কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না।" তবে এরই সঙ্গে এইসব সর্বজনশ্রদ্ধেয় বড় মাপের মানুষের হৃদয়বত্তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তগুলি যতই বেদান্তের আলোকে অসমীচীন ইহজাগতিক বোধ হোক—তাঁরা মানবদরদি ছিলেন, মানুষের দুঃখমোচনের আন্তরিক প্রেরণায় তাঁরা অনেক ভেবেছেন, দর্শন রচনা করে জানিয়েছেন—মানবসেবা এবং মানবকল্যাণই জীবনোদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গই কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমমুখে উত্থাপিত করতে চেয়ে কাঞ্চনের প্রসঙ্গ তুলেছেন? তিনি 'টাকা মাটি মাটি টাকা' করে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র বলে উঠলেনঃ "টাকা মাটি! মহাশয়, চারটি পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?" (ঐ)

পরোপকারে নিজেরই উপকার

উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, সত্যিকার দয়া আসে ঈশ্বরপ্রেম থেকে। মানুষ সহানুভূতি করে অপরের দুঃখময় অবস্থাকে সামান্যত অনুভব করে; সঠিক বেদনাবোধ অনুমান-প্রত্যয়ে হয় না, আত্মৈক্যবোধ থেকে তা আসে। মানুষের দয়া বা পরোপকার গভীর অনুভবসঞ্জাত অধ্যাত্মচেতনা নয় বলে সে নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রেখে উদ্বৃত্ত খরচ করে—তাও কষ্টে; অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন বিদ্যাসাগর, যদু মল্লিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমানের বিদ্বজ্জনের জীবনদর্শনে মৌল পার্থক্য হলো—শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ আর ঐহিকদের জীবনোদ্দেশ্য হলো ভালভাবে থাকা—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে। স্বার্থচেতনায় মানুষ পরোপকার করতে গিয়েও কাতর হয়। সেকথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছেনঃ "দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর? মানুষের এত নপর-চপড়, কিন্তু যখন ঘুমোয়... তখন অহং, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?"

এই বাস্তব কথাটা আজকের মানুষ মানতে চায় না যে, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। কারণ, সমগ্র জীবজগতের পশ্চাতে যে অনন্ত শক্তির খেলা চলছে তা সে ধরতে পারে না, মুখে বললেও সর্বাংশে তা ধারণা করতে পারে না। তার অনন্তপ্রসারিত দৃষ্টির অভাব।

আজকের দিনের মানুষের পরোপকার-স্পৃহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা প্রজ্ঞাশূন্য অন্ধ আবেগমাত্র; আর পরোপকার বলতে তো বোঝায় হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি, স্কুল, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ—এইসব। খাদ্য, ঔষধপত্র, বাড়িঘর, পোশাক, রাস্তাঘাট—এ হলো মৌলিক চাহিদা—'right for work' ইত্যাদি। এরই অপবাদ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেনঃ "শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছে হয় যে খুব কতকগুলো ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরিবদের অনেক উপকার হয়। আমি বললুম, হাঁ অনাসক্ত হয়ে যদি এসব কর, তো মন্দ নয়।" এসব কাজ 'মন্দ নয়'—যেন অনুরোধে পড়ে অনুমোদন করলেন। তাই স্বীকার করেছেনঃ "যারা হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করবে আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও ভাল লোক।" তারপরই বললেনঃ "আরো বললুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তুমি তাঁকে চাইবে, না কতকগুলো ডিস্পেন্সারি বা হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।"—একেবারে মোক্ষম কথা, স্পষ্ট, সহজ। তবু কি মানুষের চেতনা হয়? কেন হয় না? কারণ, "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—এ বোধ নাই।"

এই বোধ নেই কেন? না, আজকের মানুষের মনে চিটে গুড়ের পানাই উপাদেয়—"এ-সংসার অনিত্য, দু-দিনের জন্য, আর এ-সংসারের যিনি কর্তা, তিনিই সত্য, নিত্য—এ বোধ নাই।"

এরপরই শ্রীরামকৃষ্ণ আজকের মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানচেতনার কথাটি পেড়েছেন এবং নিজেই আজকের

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদ করে বলেছেন ঃ "কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স, না আগে ঈশ্বর?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেন ঃ "হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবে কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।"

বর্তমানের বিজ্ঞান-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ও সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাবের জন্য ঈশ্বরই সত্য—একথা বুঝতে দেয় না। অথচ পবিত্রহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভাব ও প্রেম, ব্যাকুলতা—তার জন্য কোন লৌকিক শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। জগতের রহস্য জানতে লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন বিশেষ নেই। উদাহরণ তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ংই, এছাড়া স্বামী অদ্ভুতানন্দজী এবং গোপালের মা প্রমুখ স্ত্রী ভক্তগণ—ঈশ্বর-প্রসাদে যাঁদের চিত্তে জগৎ-জীবন-ঈশ্বর-তত্ত্বাদির ধারণা বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। লাটু মহারাজ ও গোপালের মাকে দার্শনিকগণ প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁদের তত্ত্ববিষয়ক উত্তরে তাঁরা সন্তুষ্ট শুধু নন—অবাকও হয়েছিলেন।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন ঃ "ঐ তোমাদের এককথা! আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে পারবে।" উপমা দিয়েছেন ঃ "যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পার যোসো করে, তাহলে, যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা গাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ, কখানা বাগান—এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ি ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা যদি ঢুকতে না দেয়, তাহলে কখানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ, কখানা বাগান—এসব ঠিক খবর কেমন করে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও একথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সামনে আসে, তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্মিকীর 'মরা' মন্ত্র জপের উদাহরণ তুলে বলেছেন—'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ—তাই "আগে ঈশ্বরলাভ তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।... আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ। এক-কে জানলে সব জানা যায়। এক-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। এক-কে পুঁছে ফেললে কিছুই থাকে না। এক নিয়েই অনেক।"

বিজ্ঞান কি চরম সত্য বলতে পারে?

যে-বিজ্ঞানের গর্ব, বড়াই আজকের দিনের মানুষ করে—সেই বিজ্ঞান এখনো কোন বিষয়েই চরম কথা বলতে পারেনি। তার পরিধি প্রাকৃতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ, মনের গভীরে সে প্রবেশ করতেও পারেনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বরণ করেছেন, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, বাজিয়ে দেখে নিয়েছেন। এবং বিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর সমাধির অবস্থায় শারীরিক লক্ষণাদি স্বয়ং পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। হতভম্ব হয়েছেন ডাঃ সরকার। আজকের মানুষের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ সরকার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, কৃতবিদ্য এবং প্রবল বিজ্ঞানচেতনা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য সকলের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। বড় মাপের এই মানুষটিরও চেতনা স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূত স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবতার, গুরুবাদ, সাকার উপাসনা তিনি মানতেন না; ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখে বিরক্ত হতেন।

আজকের মানুষ শিক্ষাভিমান অধ্যাত্মপথের অন্তরায়

যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে। কারোর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে ঃ "ওসব আমি জানি।" এধরনের লোকদের বুদ্ধি কেমন? ঠাকুর বলেছেন—'সোনার বেনের বুদ্ধি' অর্থাৎ 'calculating' বুদ্ধি। শ্যাম বসুকে তাই বলেছিলেন ঃ "তুমি এ-সংসারে ঈশ্বরসাধন জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার অত শত কাজ কি? ফিলজফী লয়ে বিচার করে তোমার কী হবে?... তোমাদের ঐ এক। কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ'। কেননা, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।" (ঐ, পৃঃ ১০৮১)

মানবসত্তার তিন স্তর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবসত্তার বিচার করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। শ্যাম বসুর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন ঃ "পঞ্চভূতকে নিয়ে যে-দেহ, সেইটি স্থূলদেহ; মন-বুদ্ধি-সংস্কার আর চিত্ত—এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে-শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়—সেইটি কারণশরীর। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত মহাকরণ (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।" (ঐ, পৃঃ ১০৮২) [ক্রমশ]

শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব

বৈষ্ণব ক'ন—এ ভবসাগর
কৃষ্ণ-মন্ত্র বিনে
কোন মানুষেরই পেরিয়ে যাবার
উপায় তো দেখছি নে।
ভবসাগরের পারাপার ঘাটে
কৃষ্ণই কাণ্ডারী,
কুকুরের ল্যাজ ধরে কি দেয় গো
মহাসমুদ্র পাড়ি?

শাক্ত বলেন—মা আমাদের
রাজরাজেশ্বরী,
কাণ্ডারী হওয়া তাঁর কি মানায়?
কী বুদ্ধি, মরি মরি!
তাই রেখেছেন ঐ কৃষ্ণকে
ভবসাগরের ঘাটে,
মায়ের ভক্ত পার করে দিতে
কাণ্ডারী হয়ে খাটে।

ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়



ছবি ঃ রুমিতা সাহা
জোড়াবাগান, কলকাতা

ভোলেনি সংস্কার

সংস্কারের নাগপাশ ছেঁড়া
মোটেই সহজ নয়,
মৃত্যু হলেও তার অভ্যাস কিছুতে হয় না ক্ষয়।
সেকথা বোঝাতে ঠাকুর বলেন—শোন গো, তাহলে বলি,
মানুষ কেমন করে হয়ে পড়ে সংস্কারের বলি।
সে এক রাজার ছেলে,
সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সে কাটায় সারাদিন হেসেখেলে।
আর সব ছেলে এক খেলা ছেড়ে আরেক খেলায় মাতে,
রাজকুমারের আগ্রহ নেই তাতে।
সে বলে—ওসব ভাল লাগে নাকো
আজেবাজে খেলা ছাড়,
আমি যা বলছি, সে-খেলাই হোক, যেটা আরো মজাদার।
এই দ্যাখ, আমি উপুড় হয়েই শুলাম মেঝের 'পরে,
কাচ না কাপড় আমার পিঠেই তোরা হুস্‌হুস্ করে।
ঠাকুর বলেন—শোন গো তাহলে, ব্যাপারটা বলি খুলে,
রাজার ছেলেটি পূর্বজন্মে ছিল যে ধোপার কুলে।
তাই সে রাজার ঘরেতে এসেও ভোলেনি সংস্কার,
কাপড়কাচার খেলাটি তাই তো সবচেয়ে প্রিয় তার।



ছবি ঃ অনুস্মিতা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি
এম. ডি. বি. ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়



আদি শঙ্করাচার্য ২৯

চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

মায়ের ইচ্ছা অনুসারে আচার্য শঙ্কর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলে আত্মীয়রা সম্পত্তির লোভে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠল।



আত্মীয়রা আরো রেগে গেল। তারা ঐ দরিদ্র জ্ঞাতিকে সমাজচ্যুত করার ভয় দেখাল এবং আচার্যকে নানা কুবাক্য বলতে বলতে সে-স্থান ত্যাগ করল। আচার্য বৃদ্ধা পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে তাঁর মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

একদিন কালাডির রাজা রাজশেখর শঙ্করাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আচার্যের অসামান্য জ্ঞান ও প্রতিভায় তিনিও মুগ্ধ। আচার্যের প্রতি তাঁর আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারের কথাও তিনি শুনেছেন। তিনি সে-প্রসঙ্গটি তুললেন।

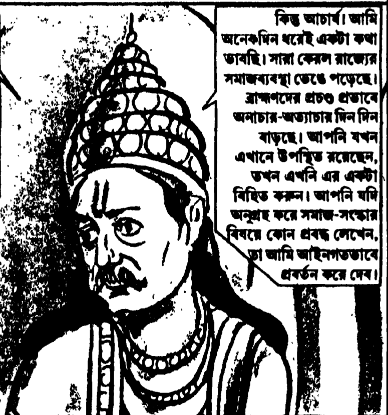




শাস্তির খবর শুনে ভয় পেয়ে গেল আচার্য শঙ্করের আত্মীয়রা। তারা রাজার কাছে ছুটে এল শাস্তি মকুবের জন্য।







আচার্য সম্মত হলেন। তিনি ৬৪টি অনুশাসন যুক্ত 'শঙ্কর-স্মৃতি' রচনা করলেন। রাজা রাজশেখর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের এক সভা ডেকে সেটি সর্বসমক্ষে বিচারের জন্য পেশ করলে ব্রাহ্মণগণ তা মানতে চাইলেন না। কিন্তু আচার্যের যুক্তির কাছে তাঁরা পরাজিত হলেন।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



আচার্য বুঝলেন; ব্রাহ্মণরা তাঁর শক্তিপরীক্ষা করতে চাইছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

ক্ষুধামান্দ্য

ক্ষুধামান্দ্যের অভিযোগ বিশেষত মহিলা এবং যারা বসে কাজকর্ম করেন বা কায়িক শ্রম করেন না, তাঁদের। যেকোন আহার্য হজম বা পরিপাক হতে ২-৫ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। পরিপাকক্রিয়া পূরণের পূর্বে কোন আহার্য বা পানীয় যেমন চা, কফি, কোকো, হরলিক্স ইত্যাদি গ্রহণও ক্ষুধামান্দ্যের কারণ।

যেকোন আহার্য পরিপাকের জন্য উদরে পাচকরসের উপস্থিতি একান্ত অনিবার্য। আহার গ্রহণকালে পাচকরস আহার্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। আবার নতুন করে পাচকরস তৈরি হতে যে-সময় প্রয়োজন এবং উদর যখন পাচকরস-হীন অবস্থায়, তখন যেকোন আহার্য বা পানীয় অপরিপক্ব অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে ক্ষুধামান্দ্য আনে। অগত্যা পেটে বায়ু, চোঁয়া ঢেঁকুর, উদরস্ফীতি, বমিভাব, পেটব্যথাও ক্ষুধামান্দ্যের একটি বড় কারণ। প্রতিকারের জন্য অলসতা ত্যাগ, নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ, বাগান করা, গৃহকর্ম, কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম সকলের পক্ষে মঙ্গলকারক। এর দ্বারা আহার্য বস্তু অতি শীঘ্র হজম হয় ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

খাদ্য পরিপাকের সময়

প্রত্যেক খাদ্যসামগ্রী হজম হতে কিছু সময় প্রয়োজন। যাঁরা এবিষয়ে সতর্ক নন, তাঁরা পেটসংক্রান্ত রোগে অসুস্থ হন। তাই তাঁদের জ্ঞাতার্থে একটি তালিকা দেওয়া হলো।

(১) ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, ঝিঙা, চালকুমড়া, লাউ, পটল, কাঁচা কলা, মুলা, মুসুর ডাল, কিসমিস এবং বেল পরিপাক হতে ৩ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন।

(২) সিম, কাঁঠাল, নারিকেল, মটর ডাল, ছোলার ডাল, অড়হর ডাল, গুড়, চিনি, সন্দেশ, যবের ছাতু, ছোলার ছাতু, পিঠা, কচুরি, লুচি, রুটি, ইলিশ ও রুই মাছ পরিপাক হতে ৩½ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন।

(৩) বিট, শালগম, ওলকপি, গাজর, বিন, কাঁঠালবিচি, আপেল, খিচুড়ি, পনির, পাঁউরুটি, ঘি, মাখন, ডিম সিদ্ধ বা ভাজা, ভেড়ার মাংস পরিপাক হতে ৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন।

(৪) বাদাম, সরিষা বাটা, সরিষার তেল, পোলাও, কাটলেট, পায়রার মাংস, তিতিরের মাংস, পাখির মাংস, কচ্ছপের মাংস, হাঁসের মাংস, মুরগির মাংস, খাসির মাংস, শূকরের মাংস, মেষের মাংস, হরিণের মাংস, পেস্তা-বাদাম পরিপাক হতে সময় লাগে ৫ ঘণ্টা।

(৫) বিভিন্ন প্রকার গুরুপাক খাদ্য একই সময়ে খাওয়া হলে পরিপাক হতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। গুরুপাক খাওয়ার পর একবেলা উপবাস শ্রেয়।

দ্বিপ্রাহরিক আহার

প্রাতরাশের ন্যূনপক্ষে ৪ ঘণ্টা পর দ্বিপ্রাহরিক আহার অর্থাৎ বেলা ১১টা থেকে ১২½টা আদর্শ সময়। গৃহকর্ত্রীরা বাড়ির সব কাজ সমাপন করে আহার সারেন ২/৩টার সময়। আবার ব্যবসায়ীরা আহার করেন ৩/৩½টাতে। বিলম্বিত আহারে অনেকে গর্ববোধ করেন। তাঁদের উদ্দেশে জানাই, পেপটিক-ডিওডিন্যাল-গ্যাস্ট্রিক আলসার, পিত্তপাথুরি, লিভার স্ফীতি ইত্যাদি রোগ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আহারের পূর্বে জল পান না করা। ভাত গরম হলে চা-চামচের দুই চামচ ঘি/মাখন (ঠাণ্ডা ভাতে কখনোই নয়) মেশান। কিন্তু আলাদা নুন না মেশানোই ভাল। কয়েকটা নিমপাতা ভাজা/নিমবেগুন/উচ্ছে বা করলা সিদ্ধ বা ভাজা মুখের রুচি এনে দেবে। উচ্ছে, করলা, কাঁচা কলা, পেঁপে, ঝিঙা, সজনে, পটল, হিঞ্চে, থানকুনি, আলুর তৈরি শুক্তো পাকস্থলীতে পাচকরস সঞ্চার ও হজমে সহায়ক হবে। সবুজ শাক, নটে শাক, কাটোয়া ডাঁটা, পালং, গিমা, কলমি, লাউ শাক, কুমড়ো শাক, বা লাউ-কুমড়ো, আলুর খোসার চচ্চড়ি দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেবে। মুগ, মুসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, বিউলির পাতলা ডাল পেশির শক্তি বৃদ্ধি করে। ছোট মাছের ঝোল মুখের সৌন্দর্য ও স্মৃতিশক্তি বাড়াবে। মাঝে মাঝে খাসির মাংস, পাখির মাংস, মুরগির মাংস, ডিমের ঝোল প্রোটিনের অভাব দূর করবে। টম্যাটো, বুল, আম, তেঁতুলের টক হাড় শক্ত করে। একটুকরো মিষ্টি ও ঘরে-পাতা দৈ (টক বা মিষ্টি নয়) সর্বোত্তম আহার।

রাত্রের আহার

রাত্রের আহারের উৎকৃষ্ট সময় ৮টা থেকে ৯টা। আহারের পর একটু হাঁটা, বই পড়া, পারিবারিক আলোচনা, ধ্যান-জপ করা প্রয়োজন। রাত্রিতে আহারের পরিমাণ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, দিনের বেলা পেট ঠুসে ও রাত্রে সিকিভাগ খাওয়া। প্রাণের ঠাকুর ডায়াটিসিয়ান না হলেও তাঁর পরামর্শ মেনে নিতে পারলে পৃথিবী থেকে তিন-চতুর্থাংশ রোগজ্বালা বিদায় নেবে। রাত্রে গুরুপাক ও মুখরোচক রসাল খাদ্যাদি কোনমতেই ঘুমের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিপাক হয় না। ফলস্বরূপ বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, কলিক বেদনা, রক্ত আমাশয়, বদহজম, অম্লপীড়া

বমি, উদরাময়, অম্ল্রে ঘা, মস্তক পীড়া, নিদ্রাহীনতা-সহ মানসিক উদ্বিগ্নতা, হিংসা ও ক্রোধ ইত্যাদি কঠিন রোগের শিকার হতে হয়।

দিনের বেলা অধিকাংশ মানুষ অফিস-কাছারি, কল-কারখানা, ডাক্তারখানা, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা, গৃহের কাজ ইত্যাদি নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন ও কায়িক শ্রমজনিত কারণে পাচনক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। সেহেতু দিনের বেলা পেটপুরে খেলেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু রাত্রে যেহেতু কায়িক শ্রম হয় না, তাই পাচনক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। তাই রাত্রে সিকিভাগ খেয়ে তৃপ্ত না হলে অর্ধ আহারের অধিক কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয়।

কোন্ কোন্ রোগে কি নিষিদ্ধ

অচির রোগ—ভেষজ গুণসম্পন্ন খাদ্য, চা, কফি, তামাক, মদ। *অনিদ্রা*—ঐ। *অন্ননালীর ঘা*—ঐ, মশলা, লঙ্কা। *অজীর্ণ*—অতি ভোজন, অসময়ে আহার। *রক্তাল্পতা*—ঐ, গুরুপাক খাদ্য এবং উপবাসের কারণে। *উচ্চ রক্তচাপ*—ঐ, উত্তেজক খাদ্য, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, মধু। *উদরাময়, বমি*—দুধ, টিনজাত দুধ, মাংস, ডিম, গুরুপাক খাদ্য। *কোষ্ঠকাঠিন্য*—মাংস, ডিম, ময়দা, লুচি, বড়াভাজা, পরটা। *নিম্ন রক্তচাপ*—উপবাস-জনিত কারণ, অতিভোজন, অলস জীবনযাপন। *সাধারণ জ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড*—বরফ, কলা, বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, মাখন, দৈ, ঠাণ্ডা পানীয়, ভাজা, মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, ছোলা, কুমড়ো, মুলো, পিঁয়াজ, পোস্ত, ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, পায়েস, টক, চা, কফি, নেশার জিনিস। *অম্ল্রে ঘা*—মাখন, ঘি, পনির, খিচুড়ি, সুজি, ময়দা, মাংস, রসাল ফল। *স্নায়বিক রোগ*—উত্তেজক খাদ্য, পোলাও, তেলেভাজা, চা, কফি, নেশার জিনিস। *অক্ষুধা*—পিঁয়াজ, রসুন, টক। *বহুমূত্র*—মাটির নিচের সবজি, রাসায়নিক খাদ্য ও পানীয়। *হৃদ্‌রোগ*—বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক, চকোলেট, ঘি, মাখন, তেল। ❑

শব্দচেতনা 

সংখ্যামূলক

১	২			■	৩		৪	৫
৬		■	■	৭	■	■	৮	
	■	■	৯		■	■	■	
	■	১০		■	১১	১২	■	
■	১৩		■	■	■	১৪	১৫	■
■	১৬		■	■	■	১৭		■
১৮	■	১৯		■	২০		■	২১
	■	■	■	২২		■	■	
২৩	২৪	■	■		■	■	২৫	
২৬				■	২৭			

সহায়ক গ্রন্থ ঃ
(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (২) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী

পাশাপাশি ঃ (১) ঠাকুর 'কথামৃত'-এ তিন বন্ধু ও বাঘের গল্প বলেছেন যে-বছর (৩) আনুমানিক যে-সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসেন (৬) বলরামবাবুর বাড়িতে ঠাকুর এই বছর রথ টানেন (৮) ঠাকুর দ্বিতীয়বার তীর্থদর্শনে যান (৯) ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত (১০) মা যে-বছর জগদ্ধাত্রীপূজায় দেশে যাননি (বাঙলা) (১১) প্রথম যেবার নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যান (১৩) 'ওঁ স্থাপকায় চ...' মন্ত্রটির রচনাকাল (১৪) ঠাকুর 'কথামৃত'-এ কর্মনাশা নদীর কথা বলেছেন যেসময় (১৬) ঠাকুর কোনরকমে অমৃতকুণ্ডে পড়ার কথা বলেছেন এই বছর (১৭) কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ (১৯) রাধাকান্তের গয়না চুরি হয় যে-বছর (২০) এই বছর ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজায় গিয়েছিলেন (২২) এই বছর ঠাকুর বেলঘরিয়ার 'তপোবন'-এ আসেন (২৩) চন্দ্রমণি দেবীর দেহত্যাগ (২৫) রাখতুরাম (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে যে-বছর প্রথম যান (২৬) ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামের স্বপ্ন দেখেন (বাঙলা) (২৭) ঠাকুর মেছুনি ও আঁশচুবড়ির গল্প বলেন এই বছর।

ওপর-নিচ ঃ (১) ঠাকুর প্রথম যেবার কলকাতা আসেন (২) যে-সালে ঠাকুর 'হাফেজ'-এর কথা বলেছেন (৪) ঠাকুরের ইসলাম সাধনা (৫) ঠাকুর প্রথম তীর্থদর্শন করেন (৭) ঠাকুর খই ও সন্ন্যাসীর তুলনা করছেন (৯) হৃদয় যত সাল পর্যন্ত ঠাকুরের সেবা করেন (১০) ঠাকুরের জন্মসাল (১২) মা যে-বছর প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন (১৩) যে-বছর মায়ের প্রথম ছবি তোলা হয় (১৫) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি স্থাপন (১৮) মথুরামোহন যতদিন ঠাকুরের সেবা করেছিলেন (২০) শিবানন্দজী মহারাজ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন (২১) 'কথামৃত'-এ ছাপা মায়ের চিঠির সাল (বাঙলা) (২২) এই সালে ঠাকুর সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন (২৪) এই বছর ঠাকুর ষোড়শীপূজা করেন (২৫) ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলরামবাবুর বাড়ি যেতে বলেছেন (বাঙলা)।

সুজিত ঘোষ

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ

লোকনাথ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড) ● সঙ্কলক : কালীজীবন দেবশর্মা ও ভক্তবৃন্দ ● প্রকাশক : সুজন চক্রবর্তী, লাইব্রেরি পাড়া, পোঃ ডানকুনি, জেলা—হুগলি ● মূল্য : ১৬০ টাকা ও ১৫০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+৪৯৪ ও ১০+৪৭৭ ● প্রকাশকাল : ২০০৩

আমাদের বিশ্বাসে বেদ, উপনিষদ্ হলো অপৌরুষেয়। বেদের কেউ কর্তা নয়। যাঁরা দেখে শুনে বেদের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করে দিলেন, তাঁরা ঋষি-মুনি। তারপর এলেন টীকা, ভাষ্য, বার্তিকের আচার্যরা। বেদকে জানতে হলে এঁদের সকলেরই সাহায্য চাই। তার সঙ্গে আছে অবতারপুরুষের মহাজীবনচর্যার আদর্শ—যা বেদের বাস্তব ভাষ্য—প্রায়োগিক স্বরূপ। কানে শুনবে, চোখে দেখবে তবে এযুগের মানুষের কিছু প্রত্যয় হয়। উপনিষদের 'পিতৃদেবো ভব' শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে পরিস্ফুট হলো, রামায়ণ-মহাভারত তাই 'পঞ্চম বেদ'।

যা শাশ্বত, সুভাষিত তা-ই সূক্ত। যা মনন করলে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তা-ই মন্ত্র। এই সমস্ত শক্তি রূপপরিগ্রহ করল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতকথা ও দিব্যজীবন একাধারে এযুগের মানুষের হাতে তুলে দিল ব্রহ্মাস্বাদ অনায়াসে। তাঁর কথাগুলির বাস্তবায়নের জন্য আর স্বতন্ত্র অবতরণের অপেক্ষা তিনি রাখলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বুঝিবা এটিও একটি মৌলিক স্বাতন্ত্র্য। ঠাকুরকে 'অবতার' বললে ঠিক বলা হয় না, তিনি অবতারী। অর্থাৎ তাঁর দেহে সর্ব অবতারের স্থিতি—অবতারগণের আশ্রয়। প্রতিবারের মতো তিনি এবারেও একা আসেননি, লীলাপার্ষদদের সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন এবং এখনো সেই লীলা অবিরাম চলেছে।

বাল্মীকি যাঁর বন্দনা গান, কালিদাস যাঁর অন্ত না পান—সেই মহিমার ছবি আঁকার মতো বড় ক্যানভাস পাওয়া দায় ঠিকই, তবু ভক্তের প্রাণ মানে কৈ? নিজ সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে দিয়েও তার মন ভরে কৈ? আর তখনি তো বিরাট পুরুষ তিনি আমাদের কাছে আমাদের মতো হয়ে ধরা দেন। ভক্তচিত্তে অনুরণিত হয়—"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে।"

প্রভুর এই যে মর্ত্যাবতরণ, এই যে আনন্দযজ্ঞ, তার সঙ্গে এবার শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় তো আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত জগতের প্রাণের তর্পণ বিধৃত রয়েছে। একালের মহাসৌভাগ্যে যে, এখনো শ্রীভগবানের দুটি করুণাধারা ভারত তথা বিশ্বকে কৃতার্থ করে বয়ে চলেছে—(১) গোমুখ থেকে মা গঙ্গার করুণাধারা, (২) শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অমৃতকথা। বিশ্ব তাঁর বাঙ্ময় বিগ্রহের স্পর্শে ধন্য হয়েছে, কারণ তিনিই যে অরূপ, স্বরূপ, বিশ্বরূপ। তাই সমস্ত বিশ্ব তাঁর মধ্যে সমাহিত, সমন্বিত। 'কোষ' শব্দের একটা অর্থ হলো ভাণ্ডার। ঠাকুর হলেন বিশ্বের ভাণ্ডার—ভাণ্ডারীও। মূর্ত বিশ্বকোষ। তাঁর কথায় চরাচরের কোন্ দিকটা প্রকাশিত হয়নি?

এই 'বিশ্বমূর্তির মূর্তিমান্' '**শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা**' করেছেন কালীজীবন দেবশর্মা ও ভক্তবৃন্দ। দুটি খণ্ডে নানা পথে প্রভুর অনুধ্যানের অনুপুঙ্খ আয়োজনে ব্রতী হয়েছেন সঙ্কলন-কর্তা। উপচারটি অভিনব এক আভিধানিক প্রয়াস। কালীজীবনবাবু স্মরণ করেছেন : "ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনে এক, একে তিন। এই 'এক' সমষ্টিনামা শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি এই পরিক্রমার কেন্দ্রবিন্দু।" সঙ্কলক প্রথম খণ্ডে ভক্ত-পরিক্রমা ও দ্বিতীয় খণ্ডে তীর্থ, বাণী ও গ্রন্থ-পরিক্রমা করেছেন। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, লীলা ও ধাম—এই চারটির যেকোন একটি আশ্রয় করতে পারলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। এই গ্রন্থে উক্ত সবকটি পথেরই সমন্বয় হয়েছে। ভক্ত-পরিক্রমার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য, এমনকি তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্য-ধন্য অন্য ভক্ত ও সমকালে পরিচিত কিছু মানুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সঙ্কলক দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ, পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলকেই সঙ্কলক শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে পাবনতা লাভের সুযোগ দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই তাঁর এবিষয়ে প্রেরণা—"আমি সবই লই।... সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।"





শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বর্ণানু-ক্রমিক পরিচিতি প্রদান বড়ই দুরূহ কর্ম। সেবাব্রতী কালীজীবনবাবু তাঁর এই সারস্বত প্রয়াসে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রেমের সাক্ষর রয়েছে বইয়ের সর্বত্র। যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টায় কোন ফাঁক ছিল না বোঝা যায়, তবু অনবধানে যেটুকু অসমৃদ্ধ থেকে গেল তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

এই সঙ্কলনের পরিচয় রয়েছে 'অভিধান', অবশ্য প্রচ্ছদে স্পষ্ট লেখা দেখি—'An Encyclopaedic Approach'। কথা হলো, 'encyclopedia' বা জ্ঞানকোষ, বিদ্যাকোষ বা অভিধান—যা 'dictionary'-রূপে আধুনিক কালে পরিচিত এবং প্রাচীন কোষগ্রন্থসমূহ কিংবা 'concordance'—সবেরই তো একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। মনে হয়, '**শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা**'কে এগুলির কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞায় সীমায়িত করা উচিত হবে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ডঃ জলধিকুমার সরকার প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মহানির্দেশিকা' একটি অসাধারণ সারস্বত সাধনা। তেমনি বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটিও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। একে আগামী দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাকোষ অবতরণের ভূমিকা বলা চলে। প্রসন্ন অভিবাদন জানাই।❑

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকাব্যে শ্রীহট্ট উপাখ্যান

অয়ন বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-বিশ্বে শ্রীহট্ট • লেখক : নৃপেন্দ্রলাল দাশ • প্রকাশক : অধ্যাপক বিজিতকুমার দে, রামকৃষ্ণ-সারদা ভাবপ্রচার পর্ষদ, সিলেট • মূল্য : ২৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৬ • প্রকাশকাল : ২০০৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলাসম্বরণের পূর্বে একদিন তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে বললেন : "নরেন, শ্রীহট্টের কেউ সাধনপ্রার্থী হয়ে এলে ফিরিয়ে দিবিনে। ভক্তির এমন উর্বর ক্ষেত্র আর পাবিনে।" (সূত্র : পত্রসাহিত্যে পরমানন্দ, ১ম খণ্ড)। আবার শ্রীহট্টে শ্রীমায়ের যাটজনের মতো কৃপাপাত্র দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। (সূত্র : পঞ্চখণ্ড রামকৃষ্ণ আশ্রম স্মারকগ্রন্থ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রের ঈশান কোণে সিলেট যতই ছোটখাট জায়গা জুড়ে থাক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-বিশ্বের অ-পার্থিব মানচিত্রে তাই সে এক সম্মানিত, সমুন্নত স্থানমাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল। সুরমা নদীর তীরে ইতিহাসের আবহমান সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদা ভারত তথা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত এবং অপরিসীম নিসর্গ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সুরম্য পার্বত্য-নগরী এই শ্রীহট্ট।

বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে শ্রীহট্টে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। একই সাথে দরগাহ্ শরীফ, মাজার, বুরুঙ্গা গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের পৈতৃক ভিটের মন্দির, গয়ার বিকল্প বিষ্ণুপদধাম, বৈষ্ণব মণিপুরী সম্প্রদায়, মাধবকুণ্ড-র চূড়ায় শিবমন্দির এবং সর্বোপরি মরমী গীতিকার ও মানবপ্রেমিক কবি দেওয়ান হাসন রাজার জন্মস্থান ও সমাধিসৌধ শ্রীহট্টকে এক সর্বধর্ম-সমন্বয়ের পীঠস্থানের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।



বিশিষ্ট মানবতাবাদী বাগ্মী, কবি এবং ঐতিহ্যসন্ধানী গবেষক অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ আলোচ্য গ্রন্থ **'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-বিশ্বে শ্রীহট্ট'** রচনাকালে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানাবিধ তথ্য এবং তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। এমনকি প্রতিটি বিষয়কে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত দুরূহ, যেহেতু তা কোথাও প্রথাগতভাবে সংরক্ষিত থাকে না। জন্মসূত্রে শ্রীহট্টের যতিবৃন্দের প্রদীপ্ত সন্ন্যাস-জীবনের পাশাপাশি তাঁদের প্রদীপের সলতে-পাকানোর কাল পূর্বাশ্রম জীবনের কথাও লেখক কঠোর শ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমে জনসমক্ষে এনেছেন। তাঁর এই বিরল প্রচেষ্টা যে বহু সত্যসন্ধানী, গবেষক এবং কৌতূহলী ভক্তমণ্ডলীর ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা কুড়াবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'অন্নদামঙ্গল', 'যোগিনীতন্ত্র', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্ট নামক জনপদের যে-প্রশস্তি এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনতার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়, লেখক তা রচনার ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। তিনি সবিশেষ আলোকপাত করেছেন শ্রীভূমির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র সম্পর্কেও। তবে ভৌগোলিক দেশকালের কাঁটাতারে আবদ্ধ নন যে-সন্ন্যাসীরা, বিরজা হোমের মাধ্যমে যাঁরা সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত হয়েছেন—তাঁদের সঙ্কীর্ণ একটি বিশেষ জনপদে আবদ্ধ করে দেখানো অন্যায় জেনেও লেখক এবিষয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল উৎসাহী পাঠক এবং ভক্তজনের জন্য এগ্রন্থের সোনার তরীতে তুলে দিয়েছেন। শ্রীহট্টের ভূমিপুত্র যেসমস্ত সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সেবাব্রতে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্বামী জগদানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ প্রমুখ অন্যতম। শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা সেবাত্মপ্রাণা প্রমুখও শ্রীহট্ট পুণ্যভূমির ভূমিকন্যা। ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য অর্থাৎ পরবর্তী কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীহট্ট আশ্রম ১৯২৬ সালে বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্রের স্বীকৃতিলাভ করে।

শ্রীহট্টে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন যে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা স্পষ্ট হয় বিশিষ্ট গবেষক ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের মূল্যায়নে : "স্মৃতি অনুগামী শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণেরা খুবই আচারনিষ্ঠ, সঙ্ঘাত এবং স্পর্শদোষ-কাতর। উৎসবাদিতে, নরনারায়ণসেবায়, প্রসাদ-গ্রহণের পঙ্‌ক্তিভোজনে, প্রথম ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব এবং সঙ্কোচবোধ পরিলক্ষিত হতো। রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলির প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আহার-বিহারে এই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভাবটি অনেকটা দূর হয়েছে বলে মনে হয়—অন্তত উৎসব দিনে এবং উৎসবের ক্ষেত্রে।" (সূত্র : শ্রীভূমি শ্রীহট্ট, পৃঃ ৩৭)

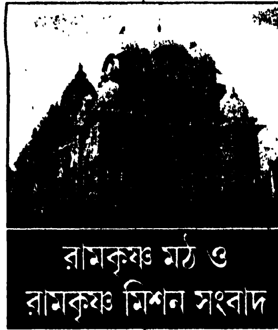
বইটিতে শ্রীভূমি শ্রীহট্টের বরেণ্য যতিবৃন্দের সচিত্র পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে স্বল্প পরিসরে ছন্দোবদ্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণমঙ্গল' এবং 'সারদা স্মরণমঙ্গল'-এর সংযোজন গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ। সিলেট রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ গ্রন্থটির ভূমিকায় এর যথার্থ প্রবেশক রচনা করেছেন—যা বইটির মূলসুরের সাথে পাঠকের মনকে একতানে বেঁধে দেয়। পরিচ্ছন্ন গৈরিক প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতি লেখকের প্রচ্ছদ-ভাবনার ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার পরিচয়বাহী। সর্বোপরি গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সিলেট রামকৃষ্ণ মিশনের নির্মাণাধীন 'প্রেমেশানন্দ হল' নির্মাণে ব্যয়িত হওয়ার অঙ্গীকার তাকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেবাধর্মী করে তুলেছে। ❑

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির
২০০২-২০০৩ সালের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বেলুড় মঠে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্রের সূচনা, বৃন্দাবন সেবাশ্রমে প্রসূতিবিভাগ ও দন্তবিভাগ, কনখল সেবাশ্রমে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, লখনৌয়ের বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকে শিশু-চিকিৎসা বিভাগ এবং জম্মু কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বাগমারিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ৭৮টি ফ্ল্যাট-যুক্ত এক আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করে হাসপাতাল-চত্বরে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠের পুনে কেন্দ্রে একটি পলিক্লিনিকের উদ্বোধন এবং কলকাতার বলরাম মন্দির ট্রাস্ট ও শিকড়া-কুলীন গ্রামের স্বামী ব্রহ্মানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।


রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বিগত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রায় ১,৭৪৫টি গ্রামের প্রায় ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছেন। জানুয়ারি ২০০১-এ গুজরাটে বিধ্বংসী ভূমিকম্প-পীড়িতদের মধ্যে যে বৃহৎ পুনর্বাসন কার্য শুরু করা হয়েছিল, তা মার্চ ২০০৩-এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত ছিল—(১) ৩৯০টি বাড়ি, ৮১টি বিদ্যালয়-গৃহ, ৫টি সমাজ-গৃহ ও অন্যান্য গৃহ নির্মাণ; (২) 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্পে ১৯০টি পরিবারকে গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম সরবরাহ এবং (৩) ৭টি পুকুর খনন ইত্যাদি। গুজরাট ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে খরচ হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্যাদির জন্য ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ১১১টি ডিস্পেনসারি ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬২ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার জন্য ৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৬৬ হাজার। বিগত বছরে শিক্ষাখাতে মোট খরচের পরিমাণ ৮০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

বেলুড় মঠঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। সারাদিনব্যাপী উৎসবে বিশেষ পূজা, হোম, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি, কীর্তন, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী। বাঙলায় স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং ইংরেজিতে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটীঃ গত ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০০৩ সাতদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'সারদা মেলা'র উদ্বোধন, একটি স্মরণিকা প্রকাশ ও ধর্মসভায় আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এছাড়া অখণ্ড জপযজ্ঞ অনুষ্ঠান, মহিলা সম্মেলন, ছাত্রী সম্মেলন, শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতী হোম, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত যোগদান করেন। মেলা-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীমঞ্চ তৈরি করা হয়। হাজার হাজার মানুষ ও বহু সাধু-ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উদ্বোধনের দিন প্রায় ২০,০০০ এবং শোভাযাত্রার দিন প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ২৪ ডিসেম্বর প্রায় ৪,০০০ গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ ও পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরীঃ গত ১৬ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ইতোপূর্বে ২৯ নভেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। পরে পূর্বোক্ত দিনগুলিতে মঙ্গলারতি, ভজন, হোম, ধর্মসভা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা, লীলাকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মহিলাদের জন্য সেলাই বিভাগের উদ্বোধন করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী তদ্‌গতানন্দজী, স্বামী দীনেশানন্দজী প্রমুখ।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম এবং হাসপাতালে রোগী-নারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৭৫ জন মহিলাকে শাড়ি এবং ১,০০০ দরিদ্র বিধবাকে প্রসাদ, কম্বল, কাপড়, সাবান ও সরষের তেল প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা হয়। বিকালের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রমণ রেটি, মহাবন (মথুরা)-এর স্বামী গুরুশরণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে ইতোপূর্বে ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক দুটি চক্ষুবিভাগ ও প্যাথলজি বিভাগের উদ্বোধন করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, বরানগর ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং ২০ ও ২১ ডিসেম্বর মঠের বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ২০ ডিসেম্বর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৬ ও ২১ ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ১০০ দুঃস্থ মানুষকে কম্বল বিতরণ করেন স্বামী সুখানন্দজী। ১৬ ও ২১ ডিসেম্বর যথাক্রমে প্রায় ২,০০০ ও ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল রামায়ণগান।

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত ঃ গত ১৬-১৯ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং মঠের বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতি। এদিন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী, স্মৃতিচারণ, বাণী এবং ৪০টি চিত্র-সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। ১৯ ডিসেম্বর মহাপুরুষ মহারাজের ১৫০তম আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। সকালে বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের এবং ১৯ ডিসেম্বর মহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও বাণী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর প্রতিদিন বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং স্বামী সুবীরানন্দজী। রাত্রে যথারীতি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, পাঠ, নাটক, ভজন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী ঋতানন্দজী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন ধর্মসভায় তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী প্রভানন্দজী। ২৪-২৬ ডিসেম্বর উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, গীতি-আলেখ্য, যাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'ত্যাগব্রত সঙ্কল্প দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী ও স্বামী শিবময়ানন্দজী। সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ, ধুনি প্রজ্বলন ও আরতি করেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজী। ২৬ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় ১৪,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এছাড়া গত ৯ নভেম্বর ও ২৩ ডিসেম্বর ৪১ জনের বিনাব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে গত ২০-২২ ডিসেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ২৪-২৫ ডিসেম্বর ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী এবং ভক্তসম্মেলনে সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। ২৪ ডিসেম্বর ভক্তসম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী রাজীবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শাস্ত্রচৈতন্য, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী পররূপানন্দজী এবং ডঃ বারিদবরণ মণ্ডল। ২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে শুরু হয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন। এদিন বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী প্রমুখ। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী এবং বিভিন্ন পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী।

নতুন কেন্দ্র স্থাপন

সম্প্রতি জমি ও বাড়ি-সহ কুচবিহারের রামকৃষ্ণ আশ্রম অধিগ্রহণ করে এখানে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ **রামকৃষ্ণ মঠ, নিউ টাউন, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬ ১০১।** ফোন ঃ (০৩৫৮২) ২৩৩৮৫৯।

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের ছাত্ররা ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম, ৪র্থ (২জন), ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম স্থান অধিকার করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল (ইউ.জি.সি-র অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা) এই কলেজকে আগামী পাঁচবছরের জন্য 'এ' গ্রেড হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছে।

ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন, নিউ দিল্লি **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর** পরিচালিত বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সম্মান (Best School Award) দিয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী (জীবন মহারাজ) গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৩ বেলা ৩টা ২০ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর গল ব্লাডারে ক্যান্সার হয়েছিল।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৩ সালে কামারপুকুর মঠে তিনি যোগদান করেন এবং বেলুড় মঠ, কাঁকুড়গাছি, কনখল, বৃন্দাবন, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও শ্যামলাতাল কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। গত তিনবছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অতি সরল, অনাড়ম্বর ও প্রাণবন্ত ছিল তাঁর জীবন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাবতিথি পালন ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। বিকালে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্যামনগরের 'অমৃতধারা' সংস্থা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক একটি শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন।

গত ৬ ও ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হররূপানন্দজী। গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী।

জাতীয় যুবদিবস পালন ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ আলোচনা, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। সকালে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের বৈদিক স্তোত্র ও সমবেত কণ্ঠে 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠের পর স্বাগত-ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তরুণ গোস্বামী ও নন্দদুলাল চক্রবর্তী। প্রশ্নোত্তর আসর পরিচালনা এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। প্রতিযোগীদের সকলকে সকালে টিফিন ও দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ) ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১৯ নভেম্বর এবং ১৩-১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবপ্রদানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী এবং স্বামী তপোব্রতানন্দজী। ভজন পরিবেশন করেন স্বামী বিশ্বেশানন্দজী ও স্বামী অমূল্যানন্দজী। স্টাডি সার্কেলের পক্ষ থেকে ৮,০০০ টাকার জীবনদায়ী ওষুধ ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে দান করা হয় এবং রোগীদের মধ্যে কম্বল ও ফল বিতরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর 'মা সারদা' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ৫-৭ ডিসেম্বর ২০০৩ দীক্ষাদানকার্য অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনে মোট ২৭৫ জনকে দীক্ষাদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দেবাত্মানন্দজী।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (হুগলি) ঃ গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন পূর্বা সেনগুপ্ত। 'শতরূপে মা সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন চন্দননগরের 'শ্রীগুরু গোষ্ঠী'।

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত এতে যোগ দেন। বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, অধ্যাপক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অশোক সাঁতরা, রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সুশান্ত দত্ত। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী।

দেউলী যুব সঙ্ঘ, ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী পুরাতনানন্দজী, স্বামী ওঁকারাত্মানন্দজী, স্বামী সুনিশ্চিতানন্দজী, সোমনাথ বাগচী, অরিন্দম দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, উপস্থিত প্রায় ৫৫০ যুবক-যুবতীর মধ্যে অর্ধেক ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর (হাওড়া) : গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত এতে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সূচনা করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী ও ডঃ রামচন্দ্র মান্না।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৪৭) : গত ১৩-১৭ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্যদান করে উৎসবের সূচনা করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। তিনি ছাড়াও বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী সমর্পণানন্দজী, স্বামী বাসবানন্দজী এবং স্বামী সৎপ্রভানন্দজী। বেহালার 'সুরপীঠ' গোষ্ঠী 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কিছু দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। স্বামী বোধসারানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা এবং দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সরোজ নাইয়া, কানাইলাল দাস এবং রাধাকৃষ্ণ নস্কর। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত বসে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ধানবাদ (বিহার) : গত ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, আলোচনা, ভক্তিগীতি, দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার, এস. তেওয়ারি এবং পুলক ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেন।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকদ্বীপ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এদিন ৩৫ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর (বীরভূম) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ২,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে প্রায় ২০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।

সাঁতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও ভক্তিগীতির আয়োজন করা হয়। প্রায় ১,৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান গেহ, চেলিয়ামা (পুরুলিয়া) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। প্রায় ৪৫০ ভক্ত এদিন প্রসাদ পান এবং ২৩ জন দরিদ্র মহিলার মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করা হয়।

দাঁইহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে পূজা, নামগান, শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এছাড়া অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর এবং সর্বসাধারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ওপর প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৪২ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন।

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ, উলুবেড়িয়া (হাওড়া) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তিগীতির আয়োজন করা হয়। ৩ জানুয়ারি ২০০৪ বৈকালিক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। সভার শেষে দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থ (পাঠচক্র), মূলাজোড় (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী কৈবল্যানন্দজী। প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পাঠ, উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি, পালাকীর্তন এবং নরনারায়ণসেবার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রায় ৭,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন, আবৃত্তি, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। প্রায় ৩০০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১২৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী কল্যাণানন্দজী।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (নদীয়া)ঃ বর্ষব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসবের প্রথম পর্যায় গত ১৬-২১ ডিসেম্বর ২০০৩ ধর্মসভা, যুবসম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, স্বামী সুরেশানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী এবং ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। এছাড়া ৩১ জন দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র, ৩৩ জন ছাত্রীর মধ্যে সোয়েটার এবং ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে পুস্তক প্রদান করা হয়।

সেবাব্রত

গাঁতী বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ৩ ডিসেম্বর ২০০৩ ইনস্টিটিউট ফর ইণ্ডিয়ান মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড-এর সহযোগিতায় একটি চিকিৎসাশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। শিবিরে প্রায় ২০০ দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির এবং লায়ন্স ক্লাব অফ হাওড়ার সহযোগিতায় ১০ম চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। এদিন ১০৯ জনকে ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং ১৪, ১৬ ও ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ হাওড়ার লায়ন্স ক্লাব হাসপাতালে তাঁদের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর)ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ ৪র্থ বর্ষ রক্তদান-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী মিলন চক্রবর্তী গত ১ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী বিজলী চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ আগস্ট ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি কলকাতার সারদা সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কর্মী এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নিউ ব্যারাকপুর-নিবাসী সুনীলকান্তি ঘোষ গত ২৬ আগস্ট ২০০৩ 'উদ্বোধন' পাঠরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বেলুড় মঠ, যোগোদ্যান এবং কাশীপুর মঠে স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর-নিবাসী বিভূতিভূষণ পণ্ডিত গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তিনি নিয়মিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা পাঠ করতেন।

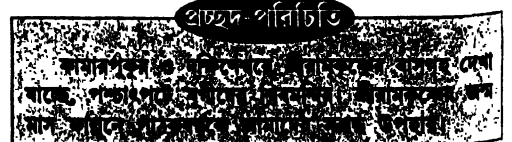
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী এষা বসু গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ছিলেন এবং তাঁদের জন্মভিটায় বাগ-আঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমৃত্যু এই আশ্রমের সম্পাদিকা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পুরুলিয়া-নিবাসী বংশীধর মাহাথা গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত বিভিন্ন প্রাইভেট আশ্রমের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং কসবা সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সুনীলেশ সেনগুপ্ত গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অকৃতদার সুনীলেশবাবু বহুকাল বেলুড় মঠ ও অন্যান্য কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবা করেছেন। বড়িশা রামকৃষ্ণ মঠ বৃদ্ধাবাসের গ্রন্থাগারে অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকরূপে তিনি দশবছর কাজ করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসী স্মৃতি চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি আমৃত্যু মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনা-নিবাসী প্রভাসকুমার দেবনাথ গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। শ্যামনগরের রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।❑





ভক্তের কর্তব্য ঃ

- ঈশ্বরের নামগুণগান
- [illegible]
- নির্জনবাস
- বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
- বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

১



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ২

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

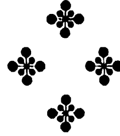
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন : ২৬৫৪-৫৮৯২
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৪২-০৯৩২
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৬০-১০৮৪
- **শুকদেব সাঁতরা**, গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬
- **পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পানিত্রাস-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল-৭১১ ৪০৪
- **সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন : ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্ট: অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন : ২৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫
  ফোন : ২৬৫৯-১১৪৪
- **দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন : ২৬২৯-০০৮৮
- **বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ বেলাড়ী, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫
- **দীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্কাশী, থানা : বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭
  ফোন : ২৬৬১-৮১১২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন**
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন
  বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন : ২৬৬৮-০০১৪
- **সম্পাদক, উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ**
  উলুবেড়িয়া

জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : (০৩২২৮) ২৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : (০৩২২৭) ২৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়্গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়্গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬২১০৫
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
  ফোন : (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম : বরুণা (ভুতা), পোঃ ভুতা, থানা : দাসপুর
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬০২৭১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬
- **ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন : (০৩২২২) ২৭০৩৪৬

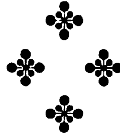
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



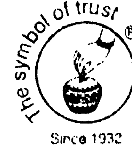
ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

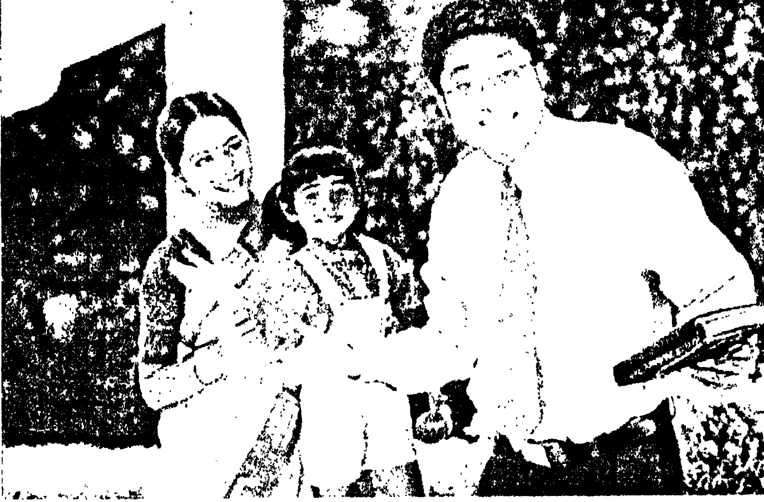


বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ



সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা।
সাথে ফ্রি জীবনবীমা
আমার জন্য ভালো।
আমার পরিবারের পক্ষেও ভালো।



এবার এলো



প্রকল্পের সময়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
ফ্রি জীবনবীমার* নিরাপত্তা

এত দারুণ সুযোগ তো
কেবল পিয়ারলেসই দিতে পারে

• পাঁচ বছরের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম • মাসে ৫০০ টাকা করে অথবা ১০০ টাকার গুণিতকে জমান • মেয়াদ পূর্তিতে ৫.৮০% কার্যকরী সুদ • মেয়াদপূর্তির আগে এক বছর পর টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ • আপনার পরিচিত, নির্ভরযোগ্য পিয়ারলেস এজেন্ট আপনার বাড়িতে আসবেন। লাইনে দাঁড়ানো নেই। দেরী হবে না • কোন ডাক্তারি পরীক্ষা লাগবে না • প্রত্যেক ডিপোজিটারের জন্য বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড-এর সুবিধা।

* Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd. এর মাধ্যমে

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, 'পিয়ারলেস ভবন', ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

এগুলির ও অন্যান্য আকর্ষক স্কীমের বিশদ বিবরণের জন্য আপনার কাছের পিয়ারলেস এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা ফোন করুন : ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : কলকাতা (০৩৩) ২২৪২ ১৫৬৪/১০০১ • নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : গুয়াহাটি (০৩৬১) ২৫২ ৩৮৭৮/২১৪৬

* শর্তসাপেক্ষে

Peerless
Smart solutions

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No. 2
FEBRUARY
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R N 8793/57
Postal Regn No SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশকালীন নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে একটানা প্রথম।

২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

✡ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✡ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✡ ২০০৪ সালের জন্য 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী [redacted] হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগু[redacted]নন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং [redacted]রাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনে[redacted]রে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে [redacted] **Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ স[redacted], ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে [redacted]বিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Of[redacted]700003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতান[redacted]

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৬



চৈত্র ১৪১০ ৩য় সংখ্যা

১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



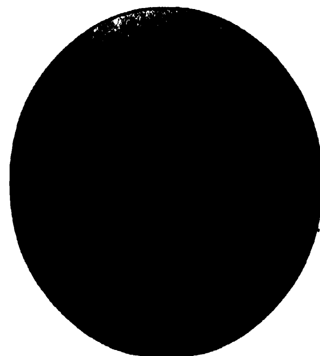
"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক. এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে।
বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে
একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের
মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো,
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে,
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ



ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ



There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

Sri Ma Sarada Devi



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● ই-মেল ঃ rmsppp@vsnl.com

(বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩)

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেট

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
SP2,	কথামৃতের গান
SP-7, SP-8, SP-10–12	(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
SP-3	শ্রীরামনাম-সংকীর্তন (স্বামী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (সংক্ষিপ্ত)
SP-6	শিবমহিমা
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
SP-17	বীরবাণী
SP-18	গীতিবন্দনা
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)
SP-23	ওঠো জাগো
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা
SP-29	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত)
SP-30	সারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)
SP-35	আগমনী
SP-36	ভজন সুধা
SP-37	সবাই মিলে গাই এসো
SP-38	যুগে যুগে হরি
SP-39	শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্

সদ্য প্রকাশিত



মা সারদার চরণ রেখা (১ম পর্ব)

জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলা

সিডিতে

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ সারদাপীঠ, বেলুড়; মিউজিক ওয়ার্ল্ড

অডিও সি. ডি. / মূল্য ১০০ টাকা

Cd/SP-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণং শরণম্)

Cd/SP-3 শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়)

Cd/SP-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা   Cd/SP-13 শ্রীসারদাবন্দনা

Cd/SP-31–34 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

Cd/SP-37 সবাই মিলে গাই এসো   Cd/SP-23 ওঠো জাগো   Cd/SP-27 বেদমন্ত্র

Cd/SP-41-44 শ্রীশ্রীচণ্ডী (সম্পূর্ণ)

ভিডিও সি. ডি.-রম / মূল্য ২০০ টাকা

Vcd/SP-1 Holy Footprints of Sri Ramakrishna   Vcd/SP-1A শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

[illegible]

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' ঃ ১০৬তম বর্ষ ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) ডাকখরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড,** ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে Service Charge বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে।

M.O. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৬।।

১০৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা • চৈত্র ১৪১০ • মার্চ ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication:	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Kolkata-700 003
Periodicity of its Publication:	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Editor's Name	Swami Sarvagananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Name & Address of Individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711 202 West Bengal

Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Gitananda	*Vice-President*	do
Swami Smarananananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	,, ,,	do
Swami Bhajanananda	,, ,,	do
Swami Srikarananda	,, ,,	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda	Trustee	do
Swami Gautamananda	,,	do
Swami Mumukshananda	,,	do
Swami Prabhananda	,,	do
Swami Tattwabodhananda	,,	do
Swami Vagishananda	,,	do
Swami Vandanananda	,,	do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 2004

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956





কিং বাহনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্॥

এই ধন, ঘোড়া, হাতি অথবা প্রাপ্ত রাজ্যেই বা কি হবে? পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু ও পশুর দ্বারা কি হবে? দেহ ও গৃহেই বা কি হবে? হে মন, ক্ষণভঙ্গুর জেনে তা শীঘ্র দূরে ত্যাগ করা উচিত। নিজ আত্মার জন্য (আত্মজ্ঞানের জন্য) গুরুর বাক্য অনুসারে পার্বতী-পতির পুনঃ পুনঃ ভজনা কর।



বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

স্বপ্রকাশ উমাপতি দেবগুরুকে বন্দনা করি, জগৎকারণকে বন্দনা করি, সর্পভূষণ ও মৃগধারণকারীকে বন্দনা করি, পশুপতিকে বন্দনা করি, সূর্য-চন্দ্র ও অগ্নিরূপ ত্রিনয়নধারীকে বন্দনা করি, মুকুন্দপ্রিয়কে বন্দনা করি, ভক্তজনের আশ্রয় ও বরদানকারীকে বন্দনা করি, মঙ্গলময় শঙ্করকে বন্দনা করি।



গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥

পশুপতির শরীর ভস্মের দ্বারা শুভ্র, হাসি শুভ্র, হাতের নরকপাল (মাথার খুলি) ও খট্বাঙ্গ শুভ্র, বাহন বৃষভ শুভ্র, কানে দুটি কুণ্ডল শুভ্র, জটা গঙ্গার ফেনার দ্বারা শুভ্র, মাথার চাঁদ শুভ্র। এইরূপে সেই সর্বশুভ্র—তিনি আমাদের সর্বদা পাপক্ষয়রূপ বিভব দান করুন।

(শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র, ১২, ১৫, ১৬)



শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

'শিক্ষা' ও 'শিক্ষানীতি' শব্দদুটি সমার্থক নহে। শিক্ষা শব্দের অর্থ শিক্ষাপদ্ধতি, মানুষের আত্মবিকাশের ধারা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকুশলতার ক্রমবিকাশ। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলিলেনঃ "Education is the manifestation of the perfection already in Man."—মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ-সাধনই শিক্ষা। উপনিষদ্‌কার বলিলেনঃ "শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ।"—শিক্ষা কাহাকে বলে, আমি ব্যাখ্যা করিব। ইহার পর নানাদিক হইতে শিক্ষার যে-ব্যাখ্যা উপনিষদ্‌কার উপস্থাপিত করিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নরূপ—"আমাদের (শিষ্য ও আচার্য) উভয়ের যশ তুল্যরূপে বিস্তারিত হউক। আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমভাবে প্রকাশিত হউক।... আচার্য পূর্ববর্ণস্বরূপ, শিষ্য পরবর্ণস্বরূপ, বিদ্যা মধ্যবর্তী এবং বেদোচ্চারণ তাঁহাদের সম্বন্ধ।... ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে আমার নিকট (আচার্যের নিকট) বিদ্যালাভার্থ আগমন করুক। তাহারা যথাশাস্ত্র (নিয়ম মানিয়া) আগমন করুক। তাহারা বিবিধরূপে (বিষয় ও সংস্কৃতি ভেদে বিবিধরূপে) আগমন করুক। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত (সংযতেন্দ্রিয়) হউক। তাহারা শমযুক্ত (সংযতচিত্ত) হউক।... শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধি জানিয়া বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সত্য বলিবে, তপস্যা করিবে, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিবে, অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিবে।... যদি কর্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানে যেসকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ... নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা কর্ম ও আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও তদ্রূপ করিবে।... ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী)

উপরি উক্ত প্রত্যেকটি শব্দের গূঢ় অর্থ রহিয়াছে। সবকিছুর বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ কম। তথাপি বর্তমান শিক্ষা ও শিক্ষানীতি বিষয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে উপর্যুক্ত কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত ভাবসম্প্রসারণ করিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে।

প্রথমত, বিদ্যাচর্চা আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে একটি আন্তরিক সেতুবন্ধন। তাহাদের মধ্যে অসূয়া (বিদ্বেষ বা হিংসাত্মক কিংবা 'ফেলো কড়ি মাখ তেল'-জাতীয় ব্যবসায়িক মনোভাব) থাকিলে চলিবে না। উভয়ের যশ (achievement) সমতুল্য হইবে। শিষ্যের সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের জন্য যেমন আচার্য প্রস্তুত থাকিবেন, তেমনি আচার্যের প্রীতি উৎপাদনের জন্য শিষ্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ে যাহারা আসিবে, তাহারা পূর্ব হইতেই নিজগৃহে ন্যূনতম নীতিশিক্ষা করিয়া আসিবে। অর্থাৎ সমাজের পরিকাঠামো এরূপই হইবে। শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হইবে, উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহারা অধ্যয়ন করিবে। শিক্ষার্থী সংযতবাক্ ও সত্যপরায়ণ হইবে।

তৃতীয়ত, "তাহারা [শিক্ষার্থীরা] বিবিধরূপে আগমন করুক।" অর্থাৎ সমাজের সকল স্তর হইতে সকল রুচির এবং অল্প বা সমধিক মেধাসম্পন্ন যেকেহ আসিবে, সে-ই শিক্ষার সুযোগ পাইবে। গুরুগৃহে তাহাদের পরিবারগত অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইবে না—সকলেই সমান ব্যবহার পাইবে। সকলেই সমান সুযোগ পাইবে এবং স্ব স্ব মেধানুসারে সাফল্যলাভ করিবে। গুরুগৃহে তাহারা স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী স্ব স্ব বিষয় নির্বাচন করিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু মূল্যবোধের উৎকর্ষসাধনের জন্য স্মৃতি-সংহিতাদি সাধারণ বিষয় সকলেই অধ্যয়ন করিবে।

চতুর্থত, অধ্যয়ন-শেষে অধ্যাপনা করিবে। অর্থাৎ নিজের অধীত বিদ্যা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে। অধ্যাপনার সহিত অধ্যয়নের বৃত্তটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। নতুবা কেবল অধ্যয়নের কোন সামাজিক উপযোগিতা নাই।

পঞ্চমত, যদি সন্দেহ ও সমস্যা বা সংশয় উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ কি করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া অথবা বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিয়া সমাধান অন্বেষণ করিবে।

আধুনিক চালচিত্র

প্রথমত, স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিবে, আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় 'অসূয়াহীনতা'র শিক্ষা দেওয়া হয় কি? ভারতবর্ষে নানা সময়ে নানা ধরনের 'শিক্ষা কমিশন' গঠিত হইয়াছে, এখনো হইতেছে। 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন'-এর পর 'কোঠারি কমিশন', 'মুদালিয়র কমিশন', পশ্চিমবঙ্গে 'হাণ্টার কমিশন', 'মিত্র কমিশন' ইত্যাদি বহু কমিশনের নামোল্লেখ করা যায়। কিন্তু শ্রদ্ধা, অসূয়াহীনতা, ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষার কথা কোথাও বিস্তৃত আকারে বলা হয় নাই। সর্বত্রই পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং নানাবিধ 'অধিকার' সৃষ্টি ও প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৫১ সালে যে আদমশুমারি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল মোট ১৬.৭৫%। এখন নাকি তাহা বাড়িয়া ৬৫% ছুঁইছুঁই। জনসংখ্যাও সমানুপাতে কিংবা আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা তেমন বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।



অর্ধশিক্ষিত মানুষ, স্কুল-ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় দেশে দুর্নীতির কালো মেঘ আজ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের আক্ষেপোক্তি স্বতই মনে পড়েঃ "Bring light to the uneducated, bring more light to the educated."—যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের জন্য আলো আনো, যাহারা শিক্ষিত তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে আলো আনো।

'শিক্ষা' আজ পণ্যে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক কিংবা পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করিবার প্রবণতা দেখা যায় না। গুরুদক্ষিণার কথা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মাসে আট ঘণ্টার জন্য যদি ৪০০ টাকা 'টিউশন ফি' হয়, এক ঘণ্টা কামাই করিলে অভিভাবক গৃহশিক্ষককে ৩৫০ টাকা দিবে—এই রেওয়াজ খুবই সাম্প্রতিক। এই শিক্ষাব্যবস্থায় অসূয়াহীনতার পরিবর্তে অসূয়াবৃদ্ধি হইবে বৈ নহে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কিংবা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের—উভয়ত এই অসূয়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার "মা বিদ্বিষাবহৈ" (আমাদের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে যেন বিদ্বেষ না থাকে—একটি প্রার্থনা)—এই পবিত্র মন্ত্রের প্রয়োগ আধুনিক সমাজে ক্রমবিলীয়মান।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ে যাহারা আসিবে তাহারা, সনাতন শিক্ষাব্যবস্থানুযায়ী, পূর্বেই স্বগৃহে কথঞ্চিৎ নীতিশিক্ষা করিয়া আসিবে। অর্থাৎ সমাজের ঈপ্সিত পরিকাঠামো এরূপই হওয়া উচিত যে, ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ গৃহেই এমন একটি উত্তম পরিবেশ লাভ করিবে যাহাতে তাহার মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনের বুনিয়াদ নির্মিত হইতে পারে। বর্তমানে ইহা কি বাস্তবসম্মত?

শ্রদ্ধাহীনতা এবং অসূয়া সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, যদি কোন শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় সদুপায়ে শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়, তাহা হইলে সে প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িবে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সকলের সম্মুখে নিজেকে সৎ, ভদ্র, সত্যপরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ভিতরে অসদুপায়ে জীবনধারণ করিবার উপায় কোন কোন অভিভাবকের নিকট বালক-বালিকারা শিখিতেছে। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার এই শিশুকুলের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, CBSE, ICSE ইত্যাদি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পিতামাতাগণ নিজদিগকে এবং নিজের পুত্র-কন্যাকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের নিকট দেখাইতেছেন। কারণ, পুত্র বা কন্যার ন্যায় পিতামাতারও যেন পরীক্ষার টেনশন হইতেছে। এবং এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। পরীক্ষাব্যবস্থার ছিদ্রবাহুল্য এবং প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি পরীক্ষার প্রতি একটি ভীতির বীজ উপ্ত করিয়াছে আধুনিক এই শিক্ষাপদ্ধতি। যদিও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে একইসঙ্গে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ঘাটনকে এই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির শুরু ভাবিলে ১৪৭ বৎসর ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের পাঁচহাজার বৎসরের ইতিহাসের তুলনায় ইহা আধুনিকই বটে। পরীক্ষা প্রসঙ্গে একদা এক মনীষী সুন্দর একটি মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ "Examination is a festival of education."—পরীক্ষা হইল শিক্ষার (বা শিক্ষাজীবনের) আনন্দোৎসব। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত একথা এখন বাতুলতা বলিয়াই মনে হইবে।

ঘটনা ইহাই। অথচ ভারতবর্ষে সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের যে অভাব আছে, একথা সত্য নহে। ভারতবর্ষ হইতে সদিচ্ছাসম্পন্ন, নীতিপরায়ণ, নিঃস্বার্থপর এবং সর্বোপরি অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ যেদিন নিশ্চিহ্ন হইবে, সেদিন সমগ্র বিশ্বে ধর্মভাবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বামীজী মনে করিতেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ২০০০ সালে ইউ. জি. সি. (ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশন)-র চেয়ারম্যান ডঃ হরি গৌতম বলিয়াছিলেনঃ "The objective of our education should be full and integrated development of the student's personality providing balance of the five essential components in this respect—physical, practical, ethical, moral and intellectual besides highest sense of idealism, patriotism and service to humanity. Our future welfare and destination will depend more on our spiritual strength than on our material wealth." (University News, Vol. 38#26, p. 9) ইহা স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হইয়াছিল যে, সরকারের শিক্ষানীতি হইল রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ভারতবর্ষের (৬-১৪ বৎসর পর্যন্ত) সমস্ত শিশুর নিকট অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা পৌঁছাইতে হইবে। এবং দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সকল শিশুকে সাক্ষর করিয়া তুলিতে সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এখনো তাহা সুদূরপরাহত। সর্বক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অনসূয়া এবং পরস্পরের জন্য গর্বিতবোধ করার উল্লেখ কোথাও নাই। যে সনাতন শিক্ষানীতিতে সোচ্চারে বলা হইয়াছিল "আচার্য দেবো ভব"—সেই আদি পুরাতন ভারতবর্ষে শিক্ষার মূল স্তম্ভ 'শ্রদ্ধা'কে কি অবজ্ঞা করা হইতেছে? ইহার পরেও কি কোন গুরুজনের "অর্বাচীনগণ বড়দের কেন শ্রদ্ধা করে না?"—এই প্রশ্ন করিবার অধিকার থাকিবে? [ক্রমশ]



অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র

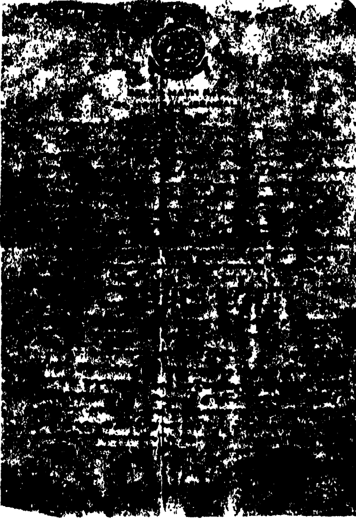
মনোরমা সরকারকে* লিখিত



॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
(১৯৩২?)



মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তোমরা মা লোকতঃ দূর দেশে আছ বটে কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে আমার কাছেই আছ। আর ঠাকুর ত মা তোমাদের হৃদয়েই রয়েছেন। অতএব মা আসবার কি দরকার আছে। মানুষের শরীর বুদ্ধি যত দিন থাকে তত দিন যাওয়া-আসা, দেখাশুনা। তার পর তাঁর কৃপায় ভক্তি বিশ্বাস এলে ওসব আর কিছুই থাকে না, তাঁকে সব সময় হৃদয়েই পাওয়া যায়। তোমরাও মা তাই পাবে।

কাগজে বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সব পড়ছি, তবে মনে হয় সবল কেউ কেউ উহা ছড়াইতে দেবে না—কারণ তাতে ইংরাজদের কাজ কারবারের খুবই ক্ষতি হবে।

আশা করি ইতিমধ্যে ছোট খুকী সুস্থ হয়ে গেছে। আমার শরীর মা ভাল নয়—খুবই খারাপ। কয়েকদিন একটু আমাশায়ের মত হয়ে শরীর আরও দুর্বল করে দিয়েছে। প্রার্থনা করি—ঠাকুর তোমাদের কুশলে রাখুন এবং খুব ভক্তি বিশ্বাস দিন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH
১।৫।৩২

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার জ্বরটা এখন বন্ধ হইয়াছে—হাঁফানী ও রক্তের চাপও অপেক্ষাকৃত কম। ৫।৭ দিন তাই ডাক্তাররা ঔষধ বন্ধ রাখিয়াছেন। মা, তুমি চিন্তিত হইও না। শরীর ভাল মন্দ সবই ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যে মা, তাঁর ইচ্ছার দাস। তিনি যেমন চালাইবেন, শরীর মন তেমনই চলিবে।

মা, স্থূলশরীরে আমাকে অনেকদিন দেখ নাই বলিয়া অস্থির হইও না। ঠাকুর ও আমরা যে মা সর্ব্বদাই তোমার অতি নিকটে রহিয়াছি। তাঁর ইচ্ছা হইলে স্থূলশরীরেও আবার তোমার সহিত দেখা হইবে।

তোমাদের ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগাদি ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ উৎসবের সংবাদ পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। প্রার্থনা করি দিন দিন তোমাদের তাঁর উপর ভালবাসা, বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিও। ইতি

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* মনোরমা সরকারের পুত্রবধূ, গড়িয়া-নিবাসিনী বাসন্তী সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



চৈত্র ১৩১০
মার্চ ১৯০৪

স্বামীজির কথা

আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে স্বামীজির সঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গুটিকতক দেওয়া গেল।

ভারতে দার্শনিক বিষয়ে বর্ত্তমানকালে কিরূপ আলোচনা হইয়া থাকে?

ভারতে অধিকাংশই দ্বৈতবাদী; অল্পই অদ্বৈতবাদী। মায়া ও জীবাত্মা সম্বন্ধেই ভারতে খুব আলোচনা হইয়া থাকে। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, শ্রমজীবীরা পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের অনেক খবর রাখে, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মতামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা শুধু বলে,—আমরা চর্চ্চে গিয়া থাকি মাত্র। ভারতে কিন্তু কোন চাষাকে যদি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কিছুই বলিতে পারিবে না, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবে। সে হয়ত লেখাপড়ার কিছু ধার ধারে না, কিন্তু সাধুদের কাছে এই সকল শিক্ষা পাইয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর তাহারা গাছতলায় বসিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে।

'নিষ্ঠাবান্' হিন্দু বলিতে এখন কি বুঝায়?

আজকাল পানাহার ও বিবাহের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানিলেই 'নিষ্ঠাবান্' হিন্দু হওয়া যায়। তার পর সে যে মতই মানুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন রীতিমত প্রণালীবদ্ধ চর্চ্চ ছিল না, সুতরাং এই এই মত মানিলেই 'নিষ্ঠাবান্' হওয়া যায়—এমন কেহ কখন বলে না। মোটামুটি আমরা বলি, বেদবিশ্বাসী হইলেই 'নিষ্ঠাবান্' হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, অনেক দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বেদ যত না মানে, তাহা অপেক্ষা পুরাণ বেশী মানে।

ষ্টোরিক-দর্শনের উপর হিন্দুদর্শন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

খুব সম্ভব যে, আলেক্জান্ড্রিয়ার লোকে হিন্দুদর্শনের ভাব অনেক গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারা এই ষ্টোরিকদের ভিতরেও হিন্দুদর্শনের ভাব অনেক প্রবেশ করিয়াছিল। পিথাগোরাস সাংখ্যদর্শনের ভাব অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে। যাহা হউক, আমাদের ধারণা, এই সাংখ্যদর্শনই বেদনিবদ্ধ দর্শনকে যুক্তিসহায়ে সামঞ্জস্য করিবার প্রথম চেষ্টা। বেদেও এই কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—'ঋষিং কপিলং প্রসূতং যস্তমগ্রে'।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুদর্শনের বিরোধ কোথায়?

কোন বিরোধ নাই। হিন্দুদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আমাদের 'পরিণামবাদ' এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আধুনিক মতের মত। তোমাদের পরিণামবাদ (Evolution Theory) আমাদের যোগ ও সাংখ্য দর্শনে রহিয়াছে। পতঞ্জলি বলেন,—'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ'। তাঁহার মতভেদ কেবল ঐ মতের ব্যাখ্যায়। তাঁহার পরিণামবাদের ব্যাখ্যা 'আধ্যাত্মিক', তিনি বলেন,—'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণ-ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—যখন কোন কৃষক নিজ ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে কেবল নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের সঙ্গে তাহার ক্ষেত্রের যে ব্যবধান আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয় মাত্র। এইরূপ সকলেই সেই অনন্তস্বরূপ, কেবল নানারূপ বাধায় উহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। কিন্তু ঐ বাধা অপসারিত হইলেই উহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশিত হয়। পশুতে নরত্ব গূঢ়ভাবে এবং নরে আবার দেবত্ব গূঢ়ভাবে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের এই সকল নূতন মতের সহিত কোন বিশেষ বিরোধ নাই। এই দেখুন না,—বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে সাংখ্যের মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মত হইতে অতি অল্পই তফাত।

সংবাদ ও মন্তব্য

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলুড় মঠ এবং তাহার শাখাস্বরূপ মান্দ্রাজ, কাশী প্রভৃতি স্থানের মঠে এবং রেঙ্গুন, কটক প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একসপ্ততিতম জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভক্তগণের সম্মিলন, ভগবন্নামকীর্ত্তন, হরিকথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় যেন আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনরূপ মহান্ আদর্শের পথে দিন দিন অগ্রসর হই। সেই মহাপুরুষের 'ব্রহ্মই সত্য বস্তু আর সব অবস্তু'—এই বাণী যেন আমাদের হৃদয়ে দিবারাত্রি জাগরূক থাকে। কাম, কাঞ্চন, মান—এসকলকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিয়া যেন আমরা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিসম্পন্ন হইতে শিক্ষা করি।

গত ৬ই ফাল্গুন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে আসনোপরি পরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা এবং জীবনী হইতে উপদেশ পাঠ করা হয়।... পরে ৯ই ফাল্গুন রবিবার দিবস পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমে ৩টী গান হইলে অযোধ্যা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্নদাসজী ২টী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে উদ্বোধন পত্রিকা হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু পড়া হয় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া হরিসংকীর্ত্তন হইলে পর উপস্থিত ব্যক্তিগুলিকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য সমাধা করা হয়।

সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে একটী 'বিবেকানন্দ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য,—যুবকগণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তার। এই সমিতি ধর্ম্মবক্তৃতা, নিয়মিত ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মপুস্তকাগার স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। অনেক গণ্যমান্য লোক এই সদুদ্দেশ্যে যোগ দিয়াছেন। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক



কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥১৮॥

শ্লোকার্থ ঃ *যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি জ্ঞানী এবং যোগযুক্ত। তিনিই সর্বকর্ম-সাধক।*

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞান হইলে সকল কর্মের (সৎ কার্য) ফলস্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। তাই বলা হইয়াছে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন—তিনিই 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ' অর্থাৎ সর্বকর্ম সাধন করিয়া কর্মবিধিকে অতিক্রম করিয়াছেন। জ্ঞানী দেখেন, দেহ, মন ও বুদ্ধি কাজ করে। জ্ঞানী তাই দ্রষ্টামাত্র। এইরূপ দৃষ্টিকে 'কর্মে অকর্ম' দেখা বলে। কেহ বিষয়বাসনা থাকিতেও কর্ম পরিত্যাগ করিলে সেই কর্মাভাব (অকর্ম) জ্ঞানপ্রাপ্তির পক্ষে বিষম বিঘ্ন হয় এবং তাহাতে সমাজব্যবস্থার ক্ষতি হয়। তাই সেই অকর্ম বিষম দুঃখফলপ্রদ। যিনি এই তত্ত্ব বোঝেন, তিনি বুদ্ধিমান।

প্রত্যেক কাজে উদ্দেশ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হইয়া থাকে, সেই কর্ম সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই সর্বদা লক্ষ্য (end) এবং পথ বা উপায় (means) সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে বলা হইতেছে। কর্মেতে অকর্ম দেখা এবং অকর্মতে কর্ম দেখা—এই উভয় প্রকার রহস্যই যিনি জানেন, তিনিই 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ'।

[মন্তব্য ঃ কৃৎস্ন = সামগ্রিক কৃৎস্নকর্ম = সর্বপ্রকার কর্ম। যিনি সর্বপ্রকার কর্মের রহস্য জানেন, তিনিই কৃৎস্নকর্মকৃৎ। অর্থাৎ তিনি জানেন যে, তিনি কর্মের কর্তা নহেন, অকর্মের কর্তাও নহেন। কিংবা বিকর্মের (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম) কর্তাও তিনি নহেন। আর একপ্রকার কর্ম আছে, তাহা নিত্যকর্ম। যাহা রোজ করিতে হয়। নৈমিত্তিক কর্ম বিশেষ উপলক্ষ্যে করিতে হয়। নিত্যকর্ম প্রতিদিন না করিলে প্রত্যবায় (পাপ সঞ্চিত) হয়। প্রত্যবায়ের কারণে নরকযন্ত্রণা ভোগ হয়। কারণ, প্রতিদিনের অবশ্যকরণীয় কাজ না করিলে আখেরে সংসার নরকে পরিণত হইবে—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে এই নিত্যকর্মেরও অকর্তা বলিয়াই জানেন।—সম্পাদক]

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥১৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *যাঁহার কর্মপ্রচেষ্টায় কোনরূপ ফলতৃষ্ণা কিংবা কর্তৃত্বাভিমান নাই, শুভাশুভ কর্মে যাঁহার কর্তৃত্ব বুদ্ধি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে—তাঁহাকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তির কৃতকর্মে কোন কামনা ও কামনা-সিদ্ধির জন্য কর্ম করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প যদি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। জ্ঞানীরা তাঁহাকেই 'পণ্ডিত' বলিয়া থাকেন।

মনের মধ্যে বাসনা থাকিলেই 'এটা করিব', 'ওটা করিব' ইত্যাদি সঙ্কল্প উঠে। সাধক প্রথমাবস্থায় নিজেকে অকর্তা জানিয়া বাসনা ত্যাগ করে এবং গুরুর আদেশমতো কাজ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যখন সিদ্ধ হইবে, তখন সে দেখিবে যে, তাহার সমস্ত কর্ম যান্ত্রিক নিয়মে দেহ, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে হইয়া যাইতেছে। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, সাক্ষী। যতদিন না দেহনাশ হয়, ততদিন প্রারব্ধবশে শরীর তাহার পূর্ব ভরবেগ (momentum) অনুসারে কাজ করিতে থাকে। সেই কর্ম জ্ঞানীকে স্পর্শমাত্রও করে না। তাঁহার বোধ রহিয়া যায়, তিনি অ-স্পৃষ্ট।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

শ্লোকার্থ ঃ *যিনি কর্মফলে আসক্তিবর্জিত হইয়া সর্বদা পরিতৃপ্ত ও নিরবলম্বন (নিরাশ্রয়ঃ) থাকেন, তিনি রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছু করেন না। কারণ, শুভ-অশুভ কর্মের কর্তৃত্ব তাঁহার দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।*

ব্যাখ্যা ঃ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর আমি নহি—এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, যিনি কারণশরীরে সর্বদা বর্তমান থাকেন, তাঁহার এই পৃথিবীর কোন বিষয়েই প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকায় তিনি নিজের আহার, বাসস্থান, বস্ত্রাদির জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত হন না। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, মথুরাদাস প্রমুখ।

সেই যোগী যদি লোকশিক্ষার্থ বা গুরুর আদেশে কোন কর্ম করেন, তিনি নিজেকে অকর্তা জানিয়া সেই কর্মকে (উহাতে বিন্দুমাত্র আসক্ত না হইয়া) অকর্ম দেখিয়া থাকেন। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ। কোন জিনিস থাকিলেই তাহার স্বধর্মে নানাবিধ ক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই ঘটিতে থাকে। দেহ থাকিলেই তাহার স্বধর্মে ক্ষুধা অনুভব হয়। যৌবনে চিত্তচাঞ্চল্য হয়।

আমরা এই শরীরকে নানা বাসনাসহায়ে আনন্দ করিবার জন্য আনিয়াছিলাম, এখন ইহা একটি মহা ঝামেলার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে!

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥২১॥

শ্লোকার্থ ঃ *যে-যোগী ফলাকা৩ ারহিত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করেন এবং সর্বপরিগ্রহ-বর্জিত (অর্থাৎ যাঁহার চাহিদা নাই, কোন কিছু গ্রহণও করেন না) এবং যাঁহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযত, তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কেবল শরীরধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মমাত্রই করেন। ইহার ফলে পাপপুণ্যরূপ এই সংসারবন্ধন তিনি প্রাপ্ত হন না।*

ব্যাখ্যা ঃ যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এই জগতের কোন বিষয়ই তিনি আশা করেন না—তাঁহার স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ই তিনি গ্রহণ করেন না—যেমন সুন্দর গান, নাচ, রূপ ইত্যাদি।

শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি স্বভাবের প্রেরণা-বশে আহারাদি যাহা কিছু করেন, তাহাতে তাঁহার কোন আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয় না। তাঁহার দেহ-মন তো ভগবানের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার দেহ-মনের ওপর কোন কর্তৃত্ব নাই।

[**মন্তব্য ঃ** প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি রূপ-রসাদি সর্ববিষয়-বর্জিত, তিনি মানুষ না যন্ত্র? হাসি, কান্না, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ লইয়াই তো মানুষের জীবন। যদি কিছুই না রহিল, তাহা হইলে যন্ত্রের জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকায় কী লাভ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধ ঋষির নিকট লাভ-ক্ষতির ব্যাপার নাই। তাঁহার সবই ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদের বিক্রয়ের কিছু বাকি আছে, যাহারা নিজে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে এখনো পারে নাই—তাহাদেরই মনে লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন উঠে। রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে যাঁহারা জগৎকে চাখিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহারা তাহাই করুন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, 'মায়া' হইল 'statement of fact' অর্থাৎ ঘটনার অনুপূর্ব বর্ণনা। শ্রীভগবান গীতায় এই অনুপূর্ব বর্ণনাই দিতেছেন, এখানে কাহাকেও জোর করিয়া কিছু করিতে বলা হইতেছে না।—**সম্পাদক**]

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥২২॥

শ্লোকার্থ ঃ *যদৃচ্ছালাভে যিনি পরিতুষ্ট (নিজের ইচ্ছাবশে নহে পরন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনধারণের যে-উপকরণ পাওয়া যাইল তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তিনিই যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট), শীত, উষ্ণ, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি দ্বারা পীড়িত হইলেও যিনি অবিষণ্ণচিত্ত, যাঁহার অন্তরে মাৎসর্য (দ্বেষ) নাই (অর্থাৎ শত্রুহীন ব্যক্তি), সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদৃষ্টি এবং হর্ষ-বিষাদবিরহিত সেই যোগী শরীররক্ষার নিমিত্ত ন্যূনতম কর্ম করিলেও ঐ কর্মের দ্বারা কদাপি বদ্ধ হন না।*

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলে জীবন পরিচালিত হয়। সেইজন্য কেহ কেহ এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করে যে, তাহার খাওয়া-পরা, মান-সম্ভ্রমের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কাহারো বা বহু চেষ্টার ফলে অন্নবস্ত্র জুটিলেও মান জুটে না, কোনরূপ সুযোগ-সুবিধাও জুটে না। এসমস্তই কর্মফল। নিজেকে বাঁচাইবার এবং উন্নতিলাভ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কর্ম সংস্কার-রূপে পরিণত হইয়া জীবকে পুনরায় নব নব কর্মে নিয়োজিত করে। জ্ঞানীর এই জগতে থাকিবার বা কোনপ্রকার উন্নতিলাভ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে না। কেবল পূর্ব কর্মফলে তাহার যেটুকু আহার-বাসস্থান জুটে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

আমরা দেহ-মন রক্ষা করাকেই আত্মরক্ষা বলিয়া মনে করি। কিন্তু জ্ঞানীর দেহ-মনের সঙ্গে সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। তাই তাঁহাকে দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াহীন বলা হইয়াছে। অন্যের উন্নতি দেখিলে অজ্ঞলোকের মাৎসর্য (jealousy) হয়; কিন্তু এই জগতের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে জ্ঞানী সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই তাঁহার কোন মাৎসর্য নাই। সুতরাং তিনিই যথার্থ নির্বৈর।

সংসারের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় নিজের বা অন্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" (গীতা, ১৪।২) সৃষ্টিতে তাঁহার আহ্লাদ নাই, প্রলয়কাণ্ড ঘটিলেও তাঁহার মনে বিকার বা ব্যথা নাই।

তিনি যদি পরোপকারের জন্য কিংবা গুরুর আদেশে কিছু করেন, তাহাতে বন্ধন হয় না। তাঁহার যেকোন কর্ম লোককল্যাণের নিমিত্তই সংঘটিত হইয়া থাকে।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥২৩॥

শ্লোকার্থ ঃ *আসক্তিশূন্য, ধর্ম-অধর্মবর্জিত, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-রহিত সেই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার ক্ষেত্রে ঐ যজ্ঞকর্মের ফলও বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বন্ধনের কারণ হয় না।*

ব্যাখ্যা ঃ যাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হইয়াছে, তিনি সর্বদাই ব্রহ্মানুভব লইয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্যজগতের কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। সুতরাং তিনি বাহ্য বিষয়ের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। এমন ব্যক্তি যদি লোকশিক্ষার্থ কিংবা গুরুর আদেশে ঈশ্বর আরাধনা-জ্ঞানে কোন কাজ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল এবং কর্মসংস্কার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

জ্ঞানীরা জানেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্য করিলে তাহা ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানেই করিয়া থাকেন।

[**মন্তব্য ঃ** স্মৃতিশাস্ত্র-মতে বলা হয়—"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম।" যেকোন কর্ম ভোগ না হইলে শেষ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। তিনি প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করিতেছেন দেখিয়া লোকে মনে করে যে, তিনি কর্মফল ভোগ করিতেছেন। উহা তাঁহার শরীরধারণের জন্য ন্যূনতম কর্মভোগ, যাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ উভয় কর্মই জ্ঞানীর ক্ষেত্রে দগ্ধ বা ভস্মীভূত হইয়াছে।] [ক্রমশ]॥সতেরো॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

হাওড়ার রামরাজাতলা

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার পঞ্চদশ পর্যায়ে হাওড়ার রামরাজাতলা।—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন দেবালয় দর্শনে যেতেন, শ্রীশ্রীমাও তেমনি অনেক দেবস্থানে বিগ্রহ দর্শনে গিয়েছেন। এমন একটি স্থান—হাওড়া জেলার 'রামরাজাতলা'।

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় : "বর্তমান উদ্বোধন লেনের ১ নম্বর বাটীতে নিজগৃহে শ্রীশ্রীমা প্রায় ছয়মাস বাস করেন। এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার পানিবসন্ত হইয়াছিল, সারিয়া যাইবার পর গাড়িতে করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। একদিন তিনি রামরাজাতলায় গিয়া ঠাকুরদর্শন করেন ও ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি হইয়া আসেন।"[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থের 'স্বামী সারদানন্দ' অধ্যায়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের রামরাজাতলায় শুভাগমনের কথা বলা হয়েছে।

হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে রামরাজাতলায় শ্রীশ্রীমা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যে-বিগ্রহ দর্শন করতে গিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে যে-তথ্য পাওয়া যায়, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পরিবেশিত হলো।

সাঁত্রাগাছির শ্রীরাম-ভক্ত জমিদার অযোধ্যানাথ চৌধুরী ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ এবং তাঁর উপাধি 'চৌধুরী' হলেও প্রকৃত পদবি ছিল 'সান্যাল'। একদা রামচন্দ্রের বিগ্রহপূজার জন্য তাঁর প্রবল বাসনা জাগলেও কোন্ মূর্তিতে তিনি রামচন্দ্রের পূজা করবেন—এবিষয়ে দ্বিধায় পড়েন। কারণ, রামচন্দ্রের অনেক মূর্তি আছে, যথা—সীতাপতি রামচন্দ্র, যুদ্ধরত ধনুর্ধারী রাবণারিরূপী রামচন্দ্র, সীতা-লক্ষ্মণসহ বনচারী রামচন্দ্র প্রভৃতি। ভক্ত অযোধ্যানাথ একদিন রাত্রে স্বপ্নে সীতারামের যুগল রাজারানী মূর্তি দর্শন করে বিহ্বল হয়ে পড়েন; কিন্তু যেহেতু সেটি প্রত্যক্ষ দর্শন নয়, সেজন্য মূর্তি-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। পরদিন প্রাতে পুষ্করিণীতে স্নানের সময় তিনি নিমজ্জমান অবস্থায় পূর্বরাত্রের স্বপ্নদৃষ্ট যুগলমূর্তি পুনরায় মানসলোকে দর্শন করে নিশ্চিন্ত হন এবং সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। অতঃপর তিনি তাঁর জ্ঞাতি এবং কুলপুরোহিত, প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্নের পৌরোহিত্যে ইষ্টদেবতার মৃন্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।



রামরাজাতলায় শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ

বলা আবশ্যক, উক্ত পণ্ডিতের বংশধরগণই আজ অবধি এই শ্রীরামচন্দ্রের পূজারী। রাজা রামের এই মূর্তি রাবণবধের পর অযোধ্যার সভারই নিদর্শন। পরবর্তী কালে তাঁর নাম অনুসারেই স্থানটির নাম হয়—'রামরাজাতলা', সংক্ষেপে 'রামতলা'। এখানকার রেলস্টেশনটির নামও 'রামরাজাতলা'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীতে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সাঁত্রাগাছির 'রামরাজা মেলা'। এত দীর্ঘস্থায়ী মেলা বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার অবধি এই মেলা চলে। মেলার বিশেষ আকর্ষণ—মন্দিরের মধ্যে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ২৩ ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি। মোট ২৬টি বিগ্রহের মধ্যে তিনি ছাড়াও তাঁর বামপাশে রয়েছেন সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও তাঁর পাশে মহাদেব। রামচন্দ্রের পাশে ব্যজনরত ভরত ও তাঁর পাশে ব্রহ্মা। দ্বিতীয় সারিতে একদিকে শত্রুঘ্ন, অপরদিকে বিভীষণ। তার তলায় নন্দীভৃঙ্গী, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, হনুমান, জাম্বুবান এবং সকলের ওপরে সরস্বতী, দুর্গা প্রমুখ। এছাড়া আলাদাভাবে বিগ্রহের সামনে রামভক্ত হনুমান, মণ্ডপের পূর্বদিকে সাবিত্রী-সত্যবান এবং বামন ভিক্ষালীলার বিগ্রহাদিও আছে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ সুবৃহৎ মূর্তি এবং অন্যান্য দেবদেবীর একযোগে এতদিন ধরে পূজা বঙ্গদেশে আর কোথাও হয় না। এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রতিবছর মূর্তিগুলি নতুনভাবে তৈরি হয় এবং পূজাশেষে গঙ্গায় নিরঞ্জন হয়। আবার পরের বছর মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজার দিন কাঠামপূজার দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তিনির্মাণের উদ্বোধন হয়। নিরঞ্জনের উৎসব এবং একযোগে সমুদয় মূর্তি-সহ গঙ্গাভিমুখে শোভাযাত্রাও বিশেষ দর্শনীয়। বর্তমানে 'সাঁত্রাগাছি রামরাজা পরিষদ' এখানকার পূজা, মেলা, নিরঞ্জন প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানই পরিচালনা করেন।

প্রায় তিন শতাধিক বছর যাবৎ রামরাজাতলার এই ঐতিহ্যময় উৎসবের সঙ্গে সীতারূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনের দিব্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। ❑

<u>পথনির্দেশ</u>ঃ মন্দিরের ঠিকানা—রামচরণ শেঠ রোড, রামরাজাতলা, হাওড়া-৪। হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের 'রামরাজাতলা' স্টেশনে নেমে বামদিকের স্টেশন রোড ধরে শঙ্কর মঠের সামনে দিয়ে পদব্রজে ৩-৪ মিনিটের রাস্তা। অথবা হাওড়া স্টেশন থেকে ৫২ নং বাস বা কলকাতার রাজাবাজার থেকে রামরাজাতলার মিনিবাসে শেষ স্টপেজ—মন্দির-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৯৩, পৃঃ ৭৬

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অভিনন্দন

যেসকল সুধী পাঠক-পাঠিকা শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিবিধ রচনাসম্ভারে সজ্জিত এই বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য ভক্তমণ্ডলীর কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিশেষ সংখ্যাটির ক্রমাগত চাহিদার কারণে পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১০% ছাড় দিয়ে মূল্য ৫০ টাকার পরিবর্তে ৪৫ টাকা ধার্য হয়েছে। সীমিত সংখ্যক পুনর্মুদ্রণের কারণে সংগ্রহকারীকে যথাশীঘ্র পত্রিকাটি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই।

বিঃ দ্রঃ—ইতোমধ্যে যাঁরা অগ্রিম বুকিং করেছিলেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, অবিলম্বে পত্রিকাটি সংগ্রহ করে নেবেন। ১৫ এপ্রিল ২০০৪-এর পরে পত্রিকাটি দেওয়া সম্ভব হবে না।

নিবন্ধ

বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৪,০০০ বছর পূর্বে আর্য জাতি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং অনুমিত হয়েছে যে, বেদশাস্ত্রের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে। এই হলো অনুমিত বৈদিক যুগ। বেদ গ্রন্থটির দুটি অংশ প্রধানত উল্লেখযোগ্য—পূর্বকাণ্ড (কর্মকাণ্ড), যার লক্ষ্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় ও তদ্দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ এবং উত্তরকাণ্ড (জ্ঞানকাণ্ড), যেখানে লক্ষ্য হলো বিশ্বের মূলতত্ত্ব (ব্রহ্ম) ও আত্মা সম্বন্ধীয় দার্শনিক জ্ঞানাহরণ ও তার দ্বারা মোক্ষলাভ। পূর্বকাণ্ডের প্রথমাংশকে বলা হয় 'মন্ত্র' বা 'সংহিতা'; আর উত্তরকাণ্ডটি 'উপনিষদ্' নামে পরিচিত।

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত বৈদিক অনুশাসনাশ্রয়ী ধর্মই ছিল প্রাচীনতম আর্যসভ্যতার আচ্ছাদন। ধর্মীয় আচারভিত্তিক বেদ-এর (পূর্বকাণ্ডের) প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকৃত দর্শনতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে। পরবর্তী কালেও ভারতবর্ষের দর্শন ধর্মীয় আচারপ্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

যাগযজ্ঞাদির যথাযথ অনুষ্ঠান মনস্কামনাপূরণের একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হতো—সেখানে দেবতাদের অনুকম্পা থাকুক বা নাই থাকুক। যাগযজ্ঞেরই কার্যকারিতা ক্রমে অন্য সমস্ত কর্মের ফলপ্রসূতার ধারণায় পরিণতিলাভ করে। অর্থাৎ ক্রমশ এই ধারণা জন্মায় যে, কর্মমাত্রই অনিবার্যভাবে তার প্রকৃতি অনুযায়ী ফলপ্রদান করে থাকে। তাহলে এই কথা বলা যায় যে, ভারতীয় কর্মবাদের মূল নিহিত ছিল বৈদিক আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নীতিতত্ত্বসাপেক্ষে ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে এই কর্মবাদের মধ্যে।

আবার যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তৎসংক্রান্ত উৎসর্গের মধ্য দিয়ে বিস্ময়কর ফললাভের সন্ধান ক্রমপরিণতি লাভ করে ধ্যান ও আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ তপস্যার মধ্যে। পুরাণে এমন অনেক তপস্বীর কথা আছে, যাঁরা তপোবনে অনেক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। বেদ-এর পূর্বকাণ্ডে বর্ণিত আছে, মহান স্রষ্টা তপস্যা ও আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে এই জগতের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

আবার, সেই যুগেই যখন বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল, তখন এমন কতিপয় সত্যদ্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেইকালে ঐ ঈশ্বর মানুষের বহিঃশক্তি হিসাবে কল্পিত ছিল মাত্র; তা মানুষের জীবনের গভীরে নিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূলে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। উপনিষদের যুগেই কেবল আত্মা ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ব্রহ্ম কল্পিত হয় বহিঃশক্তিরূপে নয়, মানুষের অন্তরতম সত্তারূপে।

আগেই বলা হয়েছে, উপনিষদের নব জ্ঞানালোকের প্রকাশ ঘটে ধীরগতিতে। এরই প্রতিফলন দেখা যায় গ্রন্থে কোথাও ব্রহ্মকে 'প্রাণ'-রূপে, আবার কোথাও অন্য কোন প্রতীকের রূপে ধ্যান করার মধ্যে। যে পরম তত্ত্বের সন্ধান শুরু হয়েছিল কতিপয় বেদজ্ঞ ঋষির জীবনে, তা উপনিষদের স্পর্শে এক নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করল। সেই আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল অন্তর্মুখী, যার চরম লক্ষ্য স্বর্গসুখের মধ্যে নয়, অনন্তকাল বেঁচে থাকার মধ্যেও নয়—তার লক্ষ্য ছিল লয়হীন কালাতীত আধ্যাত্মিক চেতনার আস্বাদন।

সুতরাং ঋষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বুদ্ধিগত আলোচনার গণ্ডি ছাড়িয়ে এক রহস্যময় (অলৌকিক) অনুভবে পর্যবসিত হয়েছিল—যা বাক্যমনের অগম্য, দেশকালগত বিশ্বের ঊর্ধ্বে (অতিবর্তী); অথচ ঐ বিশ্বেরই মূলগত চরম তত্ত্ববিষয়ক অভিজ্ঞা—যেখানে সত্তা, চেতনা ও আনন্দ পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে একত্বে (অদ্বৈতত্বে) অবস্থান করে (সচ্চিদানন্দ)।

ঐ নিরবচ্ছিন্ন শাশ্বত চেতনাই হলো পরম তত্ত্বের উপাদান—যা আমাদের প্রাণপ্রবাহ, চিন্তাশক্তি ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার হেতুস্বরূপ এবং এই কারণেই তাকে বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি সম্ভব তখনি, যখন মানুষ তার নৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। যাঁরা আপন জৈবিক ক্রিয়াকে অথবা দেহ-মনকে 'আত্মা' বলে মনে করেন, তাঁদের কাছেই মৃত্যু হলো এক বিভীষিকা; কিন্তু যাঁরা আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক করে দেখেছেন—সেইসকল তত্ত্বদর্শীর বিচারে মৃত্যু একপ্রকার ভ্রমমাত্র।

পাশ্চাত্য ভাববাদী (idealist) দার্শনিক বার্কলে ঘোষণা করেছিলেন, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবকারী ব্যক্তিমনের অনুভবের (সংবেদনের) ওপর নির্ভরশীল, বস্তুর

সত্তা হলো বস্তুর প্রত্যক্ষতা (জ্ঞাততা)—'Esse-Est-Percipi'; কিন্তু ঔপনিষদিক দর্শনতত্ত্বে ঠিক এইরকম কথা বলা হয়নি—বলা হয়নি যে, প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে আমাদের অনুভবের পরিণামমাত্র, বরং এখানে বস্তুর ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ সত্তা ঘোষিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, বিশ্বতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে তার ব্যক্তিমনের উর্ধ্বে উত্তরণ করতে হবে, এমনকি মানস-ভূমিরও (মনোময় লোকের) উর্ধ্বে আরোহণ করা আবশ্যক। বিশ্বের পরম তত্ত্ব এবং মানুষের অন্তরতম সত্তা (আত্মা) এক ও অভিন্ন হয়েও তা মানুষের সঙ্কীর্ণ সত্তা এবং মানসচেতনার রাজ্যকেও ছাপিয়ে যায়। বার্কলে অবশ্য তাঁর ভাববাদী চিন্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মগত ভাববাদকে (subjective idealism) বিসর্জন দিয়ে জানালেন—ব্যক্তিমন নয়, বিশ্বমনই (universal mind) বিশ্বের রচয়িতা। এই হলো তাঁর বস্তুগত ভাববাদ (objective idealism), যে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে ভাগবৎ-মনের ভাবসমষ্টি। তাহলে ভাববাদের গণ্ডি অতিক্রান্ত হলো না। অপরপক্ষে উপনিষদের ভগবান (ব্রহ্ম) মানসরাজ্যে সীমাবদ্ধ নন। ঔপনিষদিক উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ আধুনিক দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়বুদ্ধির রাজ্য ছাড়িয়ে যে অনির্বচনীয় জ্যোতিতে আপ্লুত হয়ে মাতৃদর্শন লাভ করেছিলেন, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ নিজের ভাষায় 'অতিমানস আলো' (supramental light) বলে বর্ণনা করেছেন—যে-আলোকে নামিয়ে এনে তিনি পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। এইরূপ রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা তিনি উপনিষদের মধ্যেই পেয়েছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলও একজন বস্তুগত ভাববাদের প্রবক্তা। তাঁর ধারণায়—বিশ্বমন (ভগবান) বুদ্ধির ভূমিকায় ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন, ব্রহ্ম হলেন স্বনির্ভর পরিপূর্ণ বুদ্ধি (absolute reason)। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দের বৈদিক ব্যাখ্যায় অতিমানস (supramental) ভূমিতেই ব্রহ্মের যথার্থ পরিচয়, তাঁর পূর্ণ প্রকাশ। তাই উপনিষদের দর্শনকে কেবল 'ভাববাদ' আখ্যা দিলে বড় ভুল হবে। ❑

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

শব্দচেতনা



পুরাণভিত্তিক

■	১			২	■	৩	■	■	৪
৫		■	■		■	৬			
	■	■	৭		৮	■	■	■	
৯	১০			■		■	১১		
■		■		■	১২	১৩		■	
১৪	■	১৫		১৬	■		■	১৭	■
১৮			■		■	১৯			২০
	■	■	■	২১	২২		■	■	
২৩			২৪	■		■	■	২৫	
	■	■		■	২৬				■

পাশাপাশি ঃ (১) ভূ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি পুরাণোক্ত উর্ধ্বলোক (৫) এই দেবতার বাহন মহিষ (৬) দশাবতারের অন্যতম (৭) শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্যদলের এক বানর (৯) কদ্রু, মনসা (১১) প্রাচীন মুনিবিশেষ (১২) সূর্যের এক নাম (১৫) সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ (১৮) নন্দনকানন (১৯) দ্যুমৎসেনের পুত্র, সাবিত্রীর পতি (২১) যমের এক নাম (২৩) মহাদেব (২৫) বাহ্লি দেশের রাজা, যিনি নারীরূপে বুধপুত্র পুরূরবার জন্ম দিয়েছিলেন (২৬) ত্রেতাযুগের অবতার।

ওপর-নিচ ঃ (১) ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর এক পুত্র (২) শিবের গাত্রবর্ণ এর মতো (৩) রামচন্দ্রের এক পুত্র (৪) লক্ষ্মীপতি (৫) সূর্যের কন্যা (৭) জনকরাজার পুরোহিত (৮) শকুন্তলার পুত্র (১০) বিষ্ণুর চরণ থেকে এঁর সৃষ্টি (১১) কাব্যে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণের নাম (১৩) ব্রহ্মার এক নাম (১৪) লক্ষ্মীদেবীর এক নাম (১৫) ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভা ইনি নির্মাণ করেছিলেন (১৬) বিষ্ণুর এক নাম (১৭) শিবপত্নী দুর্গা (২০) যক্ষের কাছে যুধিষ্ঠির এঁর প্রাণভিক্ষা করেছিলেন (২২) কৈকেয়ীর দাসী (২৪) গণদেবতাবিশেষ (২৫) যাঁর সহস্রলোচন।

প্রশান্ত গুপ্ত

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গ বে ষ ণা

প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্যে পদ্ম

সান্ত্বনা বসু

ভারতবর্ষে 'পদ্ম' একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ফুল এবং ভক্তিভাবের প্রতীকও বটে। হৃদয়পদ্মে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়। বৈদিক যুগে সর্বথা প্রশংসিত এই পদ্মকে বিষয়ী মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করলেও পদ্মের ঐতিহ্য, মহিমা এবং পবিত্রতা এতটুকু ম্লান হয় না, বরং সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যে পদ্মের স্থান চিরদিন অটুট। বিদগ্ধ লেখিকার এই সারস্বত নিবেদনে সেকথাই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।—সম্পাদক



ভারতীয় ভাস্কর্যে দেবদেবীর আসন হিসাবে এবং মন্দিরগাত্র, বৌদ্ধস্তূপ ও তোরণের অলঙ্করণের উপাদান হিসাবে পদ্মফুলের অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালের শিল্পীগণ পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন তাঁদের শিল্পকর্মে। মন্দিরগাত্রে কিংবা এককভাবে বা দেবদেবীর আসন হিসাবে পদ্মফুলের এত অধিক ব্যবহার দেখে স্বভাবতই এর কোন বিশেষ কারণ আছে কিনা সে-প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। আসন হিসাবে পদ্ম কি কোন ধ্যানধারণার প্রতীক?

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য ও মূর্তিকলা হলো ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত এবং আবহমানকাল ধরে সঞ্চিত চিন্তাধারা ও মানসচিত্রের প্রত্যক্ষ রূপ। শিল্পে পদ্মফুল চিত্রণের পিছনেও নিহিত আছে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের প্রতিচ্ছবি, যার সূচনা হয়েছিল বৈদিক যুগে।

পদ্মফুলের প্রাচীনতম নাম 'পুষ্কর', যার উল্লেখ 'ঋগ্বেদ'-এ আছে। 'অথর্ববেদ'-এও পুষ্করের উল্লেখ আছে এবং এক কবি একটি শ্লোকে এই ফুলের সুগন্ধের কথাও বলেছেন—তোমার (পৃথিবীদেবীর) সুগন্ধ যা পুষ্করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। (১২।১।২৪) এছাড়া দেবতাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ ছিল পদ্মফুলের মালা, যার জন্য বৈদিক যুগের যুগ্মদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একটি অভিধা হলো 'পুষ্করস্রজৌ' বা পুষ্করের মালা ধারণকারী। বেদে এই দুই দেবতা তাঁদের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

পুষ্করের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে অগ্নিদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত এক মন্ত্রে—হে অগ্নি, আদিতে অথর্বণ্ তোমাকে সর্ববস্তুর বাহক পুষ্করকে মন্থন করে প্রকাশ করেন। (৬।১৬।১৩) এখানে 'সর্ববস্তুর বাহক' পুষ্করের বিশেষণ। বৈদিক সাহিত্যে আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল সর্বব্যাপী উত্তাল জলরাশি—যার মধ্যে সৃষ্টির বীজ সুপ্ত ছিল। সেই কারণে এই মন্ত্রে মহাজাগতিক জলরাশিকে সর্ববস্তুর বাহক বলা হয়েছে। এই উত্তাল জলরাশি এবং তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অপ্রকাশিত সৃষ্টির বীজের প্রতীক হলো পুষ্কর—এক জলজ উদ্ভিদ। পরবর্তী কালে সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টায় ঋগ্বেদের এই বীজস্বরূপ মন্ত্র নানা শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং জন্ম নেয় সৃষ্টিরহস্য সংক্রান্ত কয়েকটি 'মিথ' বা কল্পকাহিনী।

এই কল্পকাহিনীতে 'সলিল' ও 'পুষ্করপর্ণ' দুটি শব্দই সৃষ্টির আদিতে মহাজাগতিক জলরাশির আপাতদৃষ্টিতে দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থার দ্যোতক। সলিল ইঙ্গিত বহন করছে জলরাশির উত্তাল অবস্থার এবং তার মধ্যে নিহিত স্থিরতার ইঙ্গিত রয়েছে পুষ্করপর্ণে। পুষ্করপর্ণ হলো সেই অস্থির অবস্থার মধ্যে প্রজাপতির আধারের প্রতীক। 'অপাম্ কুলায়ম্' অগ্নির অপ্রকাশিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ যখন অগ্নি জলের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, তখন তাঁর পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। 'প্রজাপতি অগ্নিকে জলের কুলায়ের ওপর চয়ন করলেন' বাক্যে প্রজাপতির সাহায্যে অগ্নি প্রকাশিত হন—একথা বলা হয়েছে। সেই অগ্নি পৃথিবীতে পরিণত হন। 'শতপথব্রাহ্মণ'-এ (৭।৪।১।৮) আছে, পৃথিবীই অগ্নি। জলজ পুষ্প পুষ্কর জলের প্রতীক, যার থেকে জন্ম অগ্নিদেবের। অগ্নির জন্মকাহিনী মনে রেখে ভাস্কর্যে অগ্নিদেবের আসন বা আধার হিসাবে শিল্পীরা পদ্মফুলকে বেছে নিয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্র থেকে ক্রমশ জন্ম নেয় সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের বৈদিক যুগের কল্পকাহিনী। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' বলছে—অগ্নি পুষ্করপর্ণের ওপর বিশ্রাম করছিলেন। প্রজাপতি তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পান। (৫।১।৪।৪) শতপথব্রাহ্মণে কাহিনীটিকে আরেকটু বিশদভাবে বলা হয়েছে—একদা অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে জলে প্রবেশ করেন। দেবতাদের অনুরোধে প্রজাপতি তাঁকে খুঁজে বের করেন। অগ্নি জল থেকে চুপিসাড়ে উঠে এসে পুষ্করপর্ণের ওপর বিশ্রাম করছিলেন। (৭।৩।২।১৪)

প্রজাপতিকে (পৌরাণিক যুগে যিনি 'ব্রহ্মা' নামে অধিক পরিচিত) সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তিনি কেন এই অভিধার অধিকারী, তার হদিশ পাওয়া যায় 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ —সেসময় চতুর্দিকে কেবল উত্তাল জলরাশি ছিল। প্রজাপতি একা পুষ্করপর্ণের ওপর আবির্ভূত হন। তাঁর মনে সৃষ্টি করার বাসনা জাগে। (১।২৩।১) প্রজাপতির পুষ্করপর্ণের ওপর স্বয়ং আবির্ভাবের কারণে প্রজাপতিকে (বা ব্রহ্মাকে) 'স্বয়ম্ভু' ও 'কমলযোনি' আখ্যাও দেওয়া হয় এবং চিত্রে ও ভাস্কর্যে ব্রহ্মাকে সর্বদাই কমলাসনের ওপর উপবিষ্ট দেখা যায়।

পুরাণে আছে, সৃষ্টি রক্ষা করতে একদা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। এই কাহিনীর উৎস বৈদিক যুগের এক কল্পকথা। কেবল পার্থক্য এই যে, সেখানে বিষ্ণুর স্থলে প্রজাপতি উদ্ধারকর্তা। শতপথব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) আছে, প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করে মহাজাগতিক জলরাশি থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে পুষ্করপর্ণের সাহায্যে স্থিরতা দেওয়া হয়—সৃষ্টির আদিতে চতুর্দিকে উত্তাল জলরাশি ছিল। তাই দেখে প্রজাপতি শ্রান্ত হন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এমন কেন হয়? তিনি দেখেন, পুষ্করপর্ণ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মনে হয়, এর নিচে নিশ্চয়ই কিছু আছে যার জন্য এটি দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি বরাহের রূপ ধরে জলে ঝাঁপ দেন এবং জলের নিচে পৃথিবীকে দেখেন। তার একটি অংশ নিয়ে তিনি ওপরে আসেন এবং সেটিকে পুষ্করপর্ণের ওপর প্রসারিত করেন। (১।৩।৫-৬)

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে, প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রজাপতির স্থান দখল করে নেন জগতের পালক বিষ্ণু। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এ আছে, পদ্মকল্প শেষ হওয়ার পর নারায়ণ বা বিষ্ণু জানতে পারেন, বন্যায় পৃথিবী জলমগ্ন। এবারও বিগত কল্পের মতো পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি বরাহরূপ ধারণ করেন—যেমন তিনি উদ্ধার করেছিলেন পূর্বের কল্পগুলিতে মৎস ও কূর্ম রূপ ধারণ করে। বরাহ অবতারের মূর্তিতে দেখা যায়, তাঁর পায়ের তলায় পদ্ম ও কাঁধের ওপর পৃথিবীদেবী। মহাজাগতিক জলরাশির মধ্যে সৃষ্টিকে অবলম্বন ও স্থিরতা প্রদান করার যে সুপ্ত শক্তি ছিল, তারই প্রতীক পদ্মের সাহায্যে শিল্পী সেকথা বোঝাতে চেয়েছেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুষ্করপর্ণকে অগ্নির যোনি ("যোনির্বা অগ্নেঃ পুষ্করপর্ণম্"—৫।২।৪।১) বলা হয়েছে, যার মূলে রয়েছে ঋগ্বেদে উল্লিখিত অগ্নির জন্মকথা। পৌরাণিক যুগে এই উক্তির জন্য গর্ভাশয় বা জরায়ুর আকার পদ্মের মতো কল্পনা করা হয় ("পদ্মবৎ গর্ভাশয়ঃ"—অগ্নিপুরাণ, ৩৭০)। দেখা যাচ্ছে, গর্ভাশয় ও পদ্মের সম্পর্ক ঋগ্বেদের সময় থেকেই চলে আসছিল, তবে পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়নি। এমনকি একটি মন্ত্রে (৫। ৭৮।৭) এর প্রতি ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'নিদানকথা'য় আছে, গর্ভধারণের দিন গৌতম বুদ্ধের জননী রানী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি শ্বেতহস্তী শুঁড়ে শ্বেতপদ্ম নিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে। পদ্ম এখানে দুটি বিষয়ের ইঙ্গিতবাহক—(১) গর্ভাশয়ের প্রতীক পদ্ম গর্ভধারণের ইঙ্গিত করেছে এবং (২) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পদ্ম শুচিতা এবং সংসারের প্রতি অনাসক্তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রানী মায়াদেবী সংসার-পাঁক থেকে মুক্ত এক মহাপুরুষকে জন্ম দেবেন—এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে পদ্ম।

সৃষ্টিরহস্য ও অধিবিদ্যার সঙ্গে পদ্ম জড়িত প্রথম থেকেই, তা আমরা জানি। এর কারণ—ঋষিমুনিদের চোখে পদ্ম ছিল এক অতিপ্রাকৃত (super natural) বস্তু। এর অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য ঋক্ ও অথর্ব বেদে পরবর্তী সময়ে এই ফুলের জন্মকথা সম্পর্কে অনেক রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত হয়। 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় এর জন্ম সম্পর্কিত কাহিনীটি এইরকম—ইন্দ্র দস্যু বৃত্রকে বধ করেন। পৃথিবী ও আকাশ বৃত্রের রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর অংশে পড়ে বিভিন্ন রং এবং আকাশের অংশে পড়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী (নক্ষত্রাণী)। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিতে পুণ্ডরীক (পদ্ম) প্রস্ফুটিত হয়। এটি শক্তির আরেক রূপ। (৪।৪।৭)

শতপথব্রাহ্মণে (৫।৪।৫।১৪) পদ্মকে 'আকাশের রূপ' ও 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর রূপ' ('দিবো রূপং নক্ষত্রাণাং রূপম্') বলা হয়েছে। এই কাহিনীগুলিতে পদ্মের আরেক প্রতিশব্দ—'পুণ্ডরীক'। 'পুষ্কর' এবং 'পুণ্ডরীক'—পদ্মের এই দুই নাম মাঝেমধ্যে স্থানবদল করেছে। যেমন 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'-এ এক স্থানে আছে—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রকাশে পুণ্ডরীকের জন্ম। সেকারণে হোতা পুষ্করের মালা ধারণ করে। (১৮।৯।৬)

'পুষ্কর' শব্দের ব্যুৎপত্তি বা শব্দপ্রকরণ নিয়ে শতপথব্রাহ্মণে একটি কল্পকাহিনী আছে। এতেও পুষ্করের জন্মরহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা লক্ষণীয়। ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করার পর মনে করেন যে, সে নিহত হয়নি। তাই ইন্দ্র জলে আশ্রয় নেন। জল তার নির্যাস ('রসম্') ওপরদিকে একত্রিত করে ইন্দ্রের জন্য একটি সুরক্ষিত আশ্রয় নির্মাণ করে। 'পুঃ' শব্দের অর্থ সুরক্ষিত আশ্রয় এবং 'কর্' শব্দের অর্থ নির্মাণ করা। সেকারণে 'পুষ্কর' ইন্দ্রের

সুরক্ষিত আশ্রয়। এই নাম দেওয়ার কারণ, দেবতারা রহস্য ভালবাসেন। (৭।৪।১।১৩)

'পুষ্কর' শব্দের আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যাস্ক প্রণীত বৈদিক অভিধান 'নিরুক্ত'-এ। এতে আছে, প্রাণিজগৎকে পোষণ করে, তাই এর নাম পুষ্কর।

পদ্ম অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক—এই মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে আরো কয়েকটি কল্পকাহিনী আছে মৈত্রায়ণী সংহিতা ও পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে। এই কাহিনীগুলিতে পদ্মকে জলাধিপতি বরুণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কাহিনীগুলির সারমর্ম হলো—বরুণের বীর্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তার এক ভাগ জলে প্রবেশ করে। যে পুষ্করের মালা ধারণ করে, সে সেই বীর্য ধারণ করে। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, ১৮।৯।১-২ এবং মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪।৩।৯; মৈত্রায়ণী সংহিতায় 'অপ্' বা জলের স্থানে সরস্বতী নদীর নাম আছে।) সরস্বতী অধুনা অবলুপ্ত এবং বেদে উল্লিখিত এক নদী। তাই অন্যত্র, যেমন পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে সরস্বতীর স্থলে 'অপ্' (জল) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সরস্বতী এবং বাক্ অভিন্ন—শতপথব্রাহ্মণে একথার বহুবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ('বাক্ বৈ সরস্বতী')। যেহেতু বৈদিক সাহিত্যে পুষ্কর জলের প্রতীক, সেহেতু শতপথব্রাহ্মণে (৬।৪।১।৭) 'বাক্ পুষ্করপর্ণম্' বলা হয়েছে। বাক্ বা ভাষা নদীর মতোই সতত প্রবহমান। অন্যথায় তার মজে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই কারণে বাক্ ও সরস্বতী নদীকে একরূপ গণ্য করা হয়। মানুষকে প্রদত্ত বাক্‌রূপ এই বিশেষ শক্তির কারণে সে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাক্-এর জন্যই বৈদিক যুগে ঋষিরা মন্ত্রোচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা তার জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন বাক্‌কে দেবীর পদে অধিষ্ঠিত করেঃ "তাম্ দেবীম্ বাচম্ হবিষা যজামহে।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৮)—সেই বাগ্দেবীকে আমরা নৈবেদ্য সহকারে আরাধনা করি। এখানে লক্ষণীয় যে, সরস্বতীর দুটি সত্তা—নদী ও বাক্ (দেবীরূপে আরাধিত) বৈদিক যুগে একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিল না। পরবর্তী যুগে এই দুটি সত্তাকে পৃথগ্‌ভাবে দেখা হয় এবং তখনি শ্বেতপদ্মের ওপর অধিষ্ঠিতা সরস্বতী বা বাগ্দেবীর মূর্তির কল্পনা করা হয়। দেবী সরস্বতীর অনুষঙ্গ হিসাবে জলের প্রতীক পদ্ম সেই বৈদিক চিন্তাধারার দ্যোতক—যখন সরস্বতী নদী ও বাক্ একই অভিপ্রায়ের দুই রূপ ছিল।

সরস্বতীর মতো লক্ষ্মীর সঙ্গেও পদ্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লক্ষ্মীর অনুষঙ্গ হিসাবে পদ্মফুল উর্বরতার প্রতীক। লক্ষ্মীর বৈদিক নাম 'শ্রী'। শতপথব্রাহ্মণের কাহিনী ও যাস্কের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, পুষ্করকে পুষ্টি এবং নির্যাসের (রসের) মূর্তরূপ মনে করা হতো। এসব কারণে শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীর অনুষঙ্গ হিসাবে পদ্মফুল উর্বরতার প্রতীক—যার ওপর সমৃদ্ধি ও সম্পদ নির্ভরশীল ছিল। ফলত চিত্রে বা ভাস্কর্যে লক্ষ্মীদেবীকে পদ্মফুলের ওপর আসীন দেখা যায়।

'শ্রীসূক্ত'-এ শ্রীদেবীর সৌন্দর্যের বর্ণনার জন্য পদ্মফুলের উপমা দেওয়া হয়েছে। যথা—'পদ্মাননা' (পদ্মের মতো মুখ যাঁর), 'পদ্মাক্ষী' (পদ্মের মতো আঁখি যাঁর), 'পদ্মবর্ণা' (পদ্মের মতো বর্ণ যাঁর) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি 'পদ্মমালিনী'—পদ্মের মালা ধারণ করেন।

বুদ্ধদেবের সময় পদ্মফুলের মালা একটি জনপ্রিয় অলঙ্কার ছিল। পালি ত্রিপিটকের 'দীঘনিকায়' গ্রন্থে আছে, রাজা মহাসুদর্শন পুষ্করিণীগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের পদ্ম লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর রাজ্যে প্রজারা সারা বছর পদ্মফুলের অলঙ্কার ধারণ করতে পারে। অন্য একটি পালি ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তরনিকায়' আছে, রাজকুমার সিদ্ধার্থের পিতা রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের পদ্মশোভিত পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পদ্মশোভিত পুষ্করিণী মানুষের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করে। পদ্মের বিভিন্ন প্রজাতির জন্য পালি ধর্মগ্রন্থগুলিতে 'উপ্পলনীয়ম্-পদুমিনীয়ম্-পুণ্ডরীকিনিয়ম্' শব্দসমষ্টি নীল, লাল ও শ্বেত পদ্মে ভরা পুষ্করিণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পালি ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই ফুলের উল্লেখ সর্বত্র আছে, তা সে উপমা হিসাবেই হোক বা সৌন্দর্যবৃদ্ধির অঙ্গ হিসাবেই হোক। ধর্মগ্রন্থগুলিতে পদ্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই মনে হয় বৌদ্ধস্তূপের তোরণে, ভিত্তি-উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে, অজন্তার ভিত্তিচিত্রে—সর্বত্র শিল্পীরা এই ফুলকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

বৈদিক ও বৌদ্ধ—দুই সাহিত্যেই নানা প্রসঙ্গে পদ্মের উল্লেখ আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গির। বৈদিক ঋষিদের কাছে পদ্মফুল ছিল স্রষ্টার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, যে-কারণে তাঁরা এই ফুলকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতীক হিসাবে বেছে নেন। কিন্তু বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে পদ্ম একটি সুন্দর পরিচিত ফুল—যার জন্ম জল ও পাঁকের মধ্যে, অথচ সে পাঁকমুক্ত। উপমা হিসাবে সেই কারণে এটি সাধারণের বোধগম্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈদিক ঋষিরাও পদ্মের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার ওপর বিভিন্ন প্রতীক আরোপ করেন। তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ফুলের সৌন্দর্যের প্রশংসা একটিমাত্র শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্লোকে আতিথেয়তা-পূর্ণ গৃহকে পুষ্করসমৃদ্ধ পুষ্করিণী এবং দেবতাদের সজ্জিত বাসগৃহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (ঋগ্বেদ, ১০।১০৭।১০)

পুষ্করিণী ও দেবতাদের মধ্যে গভীর সম্পর্কের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আরেকটি স্থলে আছে এবং সেখানে পদ্মফুলে ভরা পুষ্করিণী দৈব আশীর্বাদের প্রতীক। অথর্ববেদে (৫।১৭।১৬) কবি বলেছেন—কোন রাজার রাজত্বে কোন ব্রাহ্মণজায়া যদি ভ্রমবশত নিগৃহীত হন, তাহলে সেখানে পুষ্করিণীর অভাব দেখা দেয়।

পৌরাণিক যুগেও এই বিশ্বাস সাধারণের মনে গাঁথা ছিল। মহাভারতের বনপর্বে আছে—রাজা লোমপাদ একদা এক ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি অবিচার করেন, ফলে রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, আজও গ্রামাঞ্চলে লোকের ধারণা—খরা হলো চূড়ান্ত পাপের দৈব শাস্তি।

পাঁকের মধ্যে জন্মেও পদ্ম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পদ্মপাতায় জলবিন্দু স্থির থাকে না, গড়িয়ে পড়ে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে পদ্ম শুচিতা ও অনাসক্তির মূর্ত রূপ হিসাবে সাধারণের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এর সূচনা উপনিষদের সময় থেকে। চতুর্বেদে এবং ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকগুলিতে এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। উপনিষদে সর্বপ্রথম পদ্ম, পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর উপমা দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী ও পাপকর্মের সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে—জল যেমন পদ্মপত্রকে আশ্লিষ্ট করতে পারে না, তেমনি যে-ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, তাকে পাপকর্ম আশ্লিষ্ট করতে পারে না। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।১৪।১৩)

অনাসক্তির প্রকৃষ্ট উপমা হিসাবে পদ্মপত্রের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে অর্থাৎ উপনিষদ্গুলিতে পাওয়া গেলেও এর ব্যবহার খুবই পরিমিত ছিল। এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, সে-যুগে এটি একটি প্রচলিত উপমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে উপরি উক্ত বিশেষত্বগুলি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় উপমায় পর্যবসিত হয়। পালি ধর্মগ্রন্থগুলিতে উপমা হিসাবে এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অসংখ্যবার আছে। যথা—জলমগ্ন পদ্মকোরক এবং জলের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপমা দিয়ে সাধনার বিভিন্ন মানসিক স্তর বোঝানো হয়েছে। ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ নিজেকে জলের আশ্লেষমুক্ত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাতকমালার এক কাহিনীতেও (খদিরাঙ্গার জাতক) আছে, বোধিসত্ত্বের পায়ের তলায় একটি পদ্ম ফুটে উঠে তাঁকে অবলম্বন দেয়। মার (বৌদ্ধধর্মের শয়তান) বোধিসত্ত্বকে ভিক্ষা দিতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহের সামনে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করে। বোধিসত্ত্ব সেই অগ্নিকুণ্ড উপেক্ষা করে ভিক্ষা দিতে এগিয়ে যান। তখন একটি বিশাল পদ্ম অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়। তিনি তার ওপর পা রেখে অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে ভিক্ষাদানের মতো পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করেন। (জাতকমালায় বুদ্ধের নাম 'বোধিসত্ত্ব' অর্থাৎ যিনি প্রবুদ্ধ হয়েও মানবকল্যাণের জন্য বারবার জন্ম নেন।)

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পদ্মের উপমা এবং পদ্মসংক্রান্ত গল্পের জন্য ভাস্কর্যে পদ্মফুল সংসারের প্রতি বুদ্ধের অনাসক্তি এবং সাংসারিক আশ্লেষ থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। শিল্পীরা ভগবান বুদ্ধকে পদ্মের আসনের ওপর অধিষ্ঠিত করে সংসারের প্রতি তাঁর অনাসক্তিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিয়েছেন। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বালোকে আজকের মানুষ

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]



সবজান্তা আজকের মানুষ

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অভিযোগ করেছেনঃ "যত Religious Reformer হয়েছে—যিশু, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে, 'আমি যা বললুম, তাই ঠিক।' এ কী কথা!" ডাক্তার সরকারও অবশ্য একই দোষে দুষ্ট। এবং এই ব্যাধি আজকের দিনের মানুষেরও। সবজান্তা! সকলের দোষ ধরবে—তাতে যে নিজের দোষ প্রকট হয়, তা বুঝবে না। গিরিশবাবু ডাক্তারকে তাই বললেনঃ "মহাশয়, সে-দোষ আপনারও হচ্ছে! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে—এ-দোষ ধরাতে ঠিক সে-দোষ আপনারও হচ্ছে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১০৮৬) বস্তুত, এঁরা ঈশ্বর-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কী, তা বুঝতে চান না—সকলকে সমান মনে করেন। এঁরা বেদান্তসত্যকে ধারণা করতে পারেন না। ডাক্তার সরকার বলেছেনঃ "I connot believe that God is real and creation is unreal." ঠিক কথা, এধারণা এঁদের হয় না। বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে জগৎ শূন্যতায় পর্যবসিত বা শক্তির স্পন্দন মাত্র বলে ধারণা হলেও শক্তির আধার চৈতন্যের ধারণা করা সম্ভব হয় না—ফলে জগৎ মিথ্যা বোধ হতে চায় না বা আত্মতত্ত্বের ধারণাও দৃঢ় হয় না।

আজকের মানুষের বিষয়লালসা ক্রমবর্ধমান

বর্তমানে চারিদিকে নানা চটকদার দ্রব্যসামগ্রী, ভোগ্য উপকরণের ছড়াছড়ি এবং অধিক ভোগের জন্য অধিক রোজগারের তাগাদা। নিজের কল্পনাকেই ধর্মের সার মনে করে অনেকে উল্টোপাল্টা তর্ক জুড়ে দেন। এখনো লোকের ধারণা, আমাদের শাস্ত্রসকল কুসংস্কারে ভর্তি, আর 'ধর্ম' 'ধর্ম' করেই আমাদের অধোগতি হয়েছে! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অহঙ্কার, বিজ্ঞান সামান্য পড়ে বা না পড়েই তাকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস, বিষয়বাসনা-তাড়িত ক্লিন্ন মানসিকতায় ধর্মকে 'সেকেলে চিন্তা' বলে পাশ কাটানো এবং 'জগতের উপকার করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য' বলে বড় বড় কথার আড়াল রচনা করে স্বার্থচেতনাকে সার করা যেন আজকের মানুষের স্বভাব হয়ে পড়েছে! কলকাতার মানুষ কেমন, সেবিষয়ে 'কথামৃত' থেকে ঠাকুরের সুন্দর উক্তিগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। কলকাতার লোক—"জালে রয়েছে, কিন্তু মনে করে বেশ আছি।" "হরিকথা হলে সেখান থেকে উঠে যায়।" "তীর্থে গেলে পরিবারের পুঁটলি বইতে বইতে প্রাণ যায়।" "বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।" "আঁশচুবড়ির গন্ধ সইতে পারে, ফুলের গন্ধে ঘুম হয় না।" "কাকে ঠোকরানো আম।" "উটের মতো কাঁটা ঘাস খাবে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়বে তবুও খাবে।" "যেমন কুমিরের গায়ে অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়, তেমনি বদ্ধজীবের প্রাণে ধর্মকথা লাগাতে পারে না।" "নিম্নদৃষ্টি।" "এক সের দুধে পাঁচ সের জল।" "কলকাতার লোকদের ত্যাগের কথা বলার জো নেই।" "কলকাতার লোকদের কেবল লেকচার।" "চিল-শকুনির মতো, অনেক উপরে ওঠে নজর ভাগাড়ে।" কলকাতার লোক "হুজুকে, কথা রাখে না।" কলকাতাকে লক্ষ্য করে আধুনিক কালে সকল মানুষের উদ্দেশেই এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অথ শাস্ত্রীয় অধ্যারোপ কথা

লোকলোচনে দৃষ্ট সত্য নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। এখন শাস্ত্রকথা। কেন? না, শাস্ত্র হলো—অজ্ঞাতজ্ঞাপক; অর্থাৎ প্রত্যক্ষত যা বোঝা যায় না, অনুমান দ্বারাও যা স্পষ্ট হয় না, সেকথাই শাস্ত্রে বিধৃত থাকে। অন্যান্য প্রমাণ সবই প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক হওয়ায় সবই লৌকিক। অজ্ঞাত বিষয় 'সৃষ্টি'; সেসম্পর্কে শাস্ত্র কী বলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বদৃষ্টি সে-সিদ্ধান্তের অনুকূল না প্রতিকূল, তা বোঝার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি,

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্ত-সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কথাই বলেননি, যদিও তাঁর অনুভব বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাহলেও সেসকল অনুভব বেদান্তভিত্তিক দার্শনিক ধারাকে কখনো অস্বীকার করেনি।

বর্তমান বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মধ্যে সৃষ্টি-বিষয়ে একটা নিদারুণ বৈপরীত্য দেখতে পাওয়া যায়। তা হলো—বিজ্ঞান বলে, পরমাণুর ক্রমিক পরিবর্তনে এই জগৎ সৃষ্ট। বেদান্ত বলেন, এই জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রক্ষেপ মাত্র। অবশ্য এই দুই মতের সামঞ্জস্য কেউ কেউ করেছেনও। তাঁদের মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুরাশির ক্রমপরিবর্তন, ক্রমবিকাশের ফলেই এই জগৎ হয়েছে ইত্যাদি।

আজ 'ক্লোন' করে মানুষ তৈরির বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এগোচ্ছে, এমনকি কৃত্রিমভাবেও মানুষ তৈরির গবেষণা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তাতে অনেকে আশঙ্কা করছেন, কোথায় থাকবে তখন কর্মফল আর পুনর্জন্মবাদ? আত্মা চন্দ্রলোক থেকে প্রাক্তন কর্মাবশেষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—এসব মতবাদ ধ্বংস হবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। তাঁদের বলি, তখনো আত্মা কর্মবশে ওসকল শরীরে প্রবেশ করবে ও নিজ অভীপ্সা অনুসারে চলতে থাকবে, এতে কোন যুক্তিবাধ বা শাস্ত্রবাধ হবে না। কারণ, অনুকূল পরিবেশ পেলেই বহু বিদেহ আত্মার সংস্কার সহিত প্রবেশ সেসকল দেহমধ্যেও ঘটতে পারবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকবে—মানুষ কেবল সৃষ্টিরহস্যকে বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্মোচিত করতে পারবে। এতেও মানবমহিমাই প্রকাশিত হবে।

কিন্তু এসকল বিজ্ঞানের সাহায্যে নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব ও বদ্ধজীবের স্বরূপ বোঝা যাবে না।

শক্তির তারতম্যে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যে মানুষের ভাবধারা, ব্যবহার ও আকাঙ্ক্ষার যেরূপ বৈচিত্র্য গীতামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দার্শনিক পরিভাষায় বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বাস্তব জীবনকথায় সুন্দর ভাষাচিত্রে এঁকেছেন। বাহুল্যভয়ে সেসকলের উল্লেখ করা হলো না। মানুষেই ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ, সেকথা ঠাকুর বলেছেন: "জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে জমে; তেমনি মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি।"[১] "এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ। নরনারায়ণ।" "প্রতিমাতে আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না?" তবে "তিনি শুদ্ধভক্তের ভিতর বেশি প্রকাশ—তাই নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্য এত ব্যাকুল হই।" (ঐ, পৃঃ ৪৮৩) "বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই এক-একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনো সাধুরূপে, কখনো ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।" (ঐ, পৃঃ ৫০২)

সমাধিজ প্রজ্ঞাবলে নরেন্দ্রনাথ এই মানবমহিমাকে উপলব্ধি করে প্রাচীন ঋষির মতোই বলেছিলেন, "আমি আদি কবি, মম শক্তি বিকাশ রচনা। জড় জীব আদি যত/ আমি করি খেলা মম মায়া সনে/ একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।"

চৈতন্যের বোধে পূর্ণপ্রজ্ঞ মানুষই 'মান-হুঁশ'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আজকের মানুষের প্রতি—"তোমাদের চৈতন্য হউক।" * [সমাপ্ত] ❑

---

১ তুলনীয়—

"পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥"

(ভাগবত, ৭।১৪।৩৭)

"মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্‌খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥"

(ঐ, ৭।১৪।৯)

"ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥"

(ঐ, ৭।১৪।৪০)

* ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এ প্রদত্ত ভাষণ।

সমাধান : শব্দচেতনা ৩১

পাশাপাশি : (১) মায়ার, (৩) সাধন, (৫) দয়া, (৬) সংসার, (৭) বশ, (৯) লব, (১১) হরিনাম, (১৩) বর, (১৪) গৌর, (১৫) রসদ্দার, (১৬) মরা, (১৮) মামা, (২০) মানহুঁশ, (২২) খল, (২৩) মাস্টার, (২৪) শিমুল।

ওপর-নিচ : (১) মায়া, (২) রস, (৩) সার, (৪) নব, (৫) দয়াল, (৮) শরীর, (১০) বলিবার, (১১) হরিহর, (১২) মতুয়ার, (১৩) বলরাম, (১৪) গৌরীমা, (১৭) রাখাল, (১৯) মামা, (২০) মার, (২১) শশি, (২২) খল।

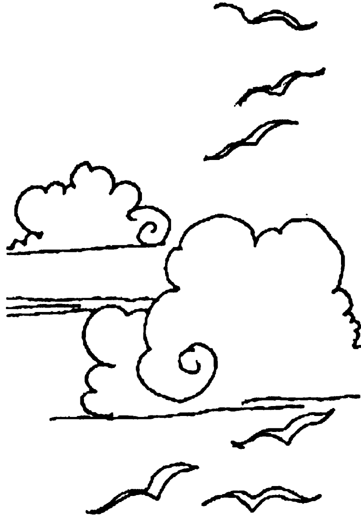
সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

স্বপনকুমার গাঙ্গুলী, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, নন্দদুলাল ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার সরকার, সরোজকুমার দাস, পার্বতী দাস, রমণীমোহন বর্মণ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন দাস, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ।

গাও তাঁরই নাম

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

লৌকিকিকতা ও অলৌকিকিকতা
অভিমান আর উপাসনা,
মানবিকতা ও ঐশ্বরিকতা,
আবেগ এবং সাধনা;
স্বপ্ন এবং বাস্তব, আর
অর্থ এবং অনর্থ,
ব্যক্তি-সমাজ, ভোগ-ত্যাগ, আর
বিশ্বাস এবং বিতর্ক—
মেলালেন তিনি, মেলালেন সব,
জগৎ দেখিল হরিষে।
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-গান গাও,
হৃদি-অমৃত বরিষে!



যখন তিনি

বিশ্বনাথ গরাই

যখন তিনি ডাকেন, জেনো
হৃদয়খানি কমলাসন—
যখন তিনি শূন্যে বিলীন
হৃদিকমল একলা ভীষণ;

মধ্যবর্তী শূন্যতা তাই
তাঁহার এবং গৃহবাসীর—
উথালপাতাল ঝাম্‌রে ওঠে
প্রেম ও বিষাদ পাশাপাশি!

দেববাণী

শুভ্রকান্তি দে

বিষণ্ণ গোধূলিতে—
যখন জগৎ ভুলে তলিয়ে যাচ্ছি আপন ব্যথার গভীরে
লক্ষ্য যখন ক্রমশ সরে যাচ্ছে বহুদূরে
তখনি—
সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিপথ বেয়ে
এগিয়ে এলে—মাগো!
মাথায় রাখলে তোমার অমৃত-স্পর্শ,
তোমার দেববাণী অনুরণিত হলো
শিরা-উপশিরার প্রান্তে প্রান্তে—
'ভয় কি বাবা, আমি তো আছি।'

ছোট্ট কটি শব্দ প্রাণে জাগাল
নতুন আশা, নতুন স্পন্দন
কক্ষচ্যুত নক্ষত্র ফিরে পেল তার কক্ষপথ।

সভ্যতার শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে
মাগো, তোমার এ-অমৃতবাণী
প্রবাহিত হবে কাল থেকে কালান্তরে।
তোমার অহৈতুকী ভালবাসায় স্নাত হয়ে
কত শত আমজাদ
পার হয়ে যাবে জীবনপথ
যুগ থেকে যুগান্তরে।



তুমি বলেছিলে

(শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে)

চণ্ডী সেনগুপ্ত

(১)
ব্রহ্ম কেমন কে জেনেছে!
জ্ঞানবিচারে লুপ্ত অহং,
সাগরে 'লুন' মাপতে গিয়ে
নুনের পুতুল—নাহং, নাহং॥

(২)
ফোঁসে দোষ নাই
রোষ নাহি রেখো মনে,
সুপ্ত রেখো না বিদ্বেষ-বিষ
অমলিন চিন্তনে॥

(৩)
কচ্ছপ ভাসে জলে—এ-ঘাটে ও-ঘাটে,
আড়াতে পেড়েছে ডিম, তাই তার মন
অনুক্ষণ,
আড়াতেই বাঁধা পড়ে রয়,
অস্থির শরীর ভাসে জোয়ার-ভাটায়।
অনুরূপ মানবশরীর,
ত্রস্ত, অস্থির;
ভেসে চলে সংসার-সলিলে—
দগ্ধ পলে পলে,
সে-সংসারী ধন্য, যার মন—
কামিনী-কাঞ্চন
ভুলে; ঠাঁই খোঁজে পরমপিতার পদতলে॥

কথামৃতে

অনিমা দত্ত

নিত্যদিন নিত্যনৈমিকতা।
অনিত্যের দ্বন্দ্ব ভয় দ্বিধার দীনতা।
তৃষ্ণাতুর ভঙ্গুর পাত্র হাতে
নিত্য চাই উত্তরণ হতাশ আগ্রহে
নানা মিথ্যা কথকতা নিরন্ধ্র কোলাহলে
নির্বেদে নিগৃহীত প্রাণ
যখন এ-গ্রহে।
তখন শ্রবণ ভরো অমৃতের গানে
প্রাণশিখা দীপময় অমৃতের পানে
একান্তে—সিংহাসনে—
হৃদয় অঞ্জলি ভরো কথার অমৃতে
সমস্ত
মৃত মুহূর্ত
বাণীর ঝঙ্কারে মূর্ত
সঞ্জীবিত হয়ে যাক তাঁর কথামৃতে।



সন্ত্রস্ত ধরণীতে পথের নিশান

রাধাকান্ত মহাপাত্র

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', নাই কোন সবুজ আশ্রয়।
চোখের পলকে, জঞ্জালের স্তূপের হলো শতাধিক তল।
তলায় তলায় নামে আগুনের লেলিহান শিখা।
ধূলিময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাঝে ঝাঁপ দিল কেউ,
বাঁচিবার আকুল প্রয়াসে। ভীতত্রস্ত নরনারী
ছোটাছুটি করে চারিধার। কোথায় মিলিবে
এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়? পম্পাই নগরীর মতো
আজ কী শেষদিন? একথা শুনায় কেউ।

শক্তিমদস্ফীত বুকে কোন্ অর্বাচীন দিল
থুতু ছিটাইয়া? ওদিকে নাটের গুরু
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কোন্ এক পর্বতগুহায়
চিবাইছে পান—দিতেছে ফতেয়া—হানো হানো
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ, বারুদের গাদায় তাই দিয়েছে আগুন
ভিখারি শিশুর দল, খাদ্যপাত্র নিয়ে ফেরে ক্ষুধার জ্বালায়।
বামিয়ানে বুদ্ধ কাঁদে কুঠারের ঘায়ে।

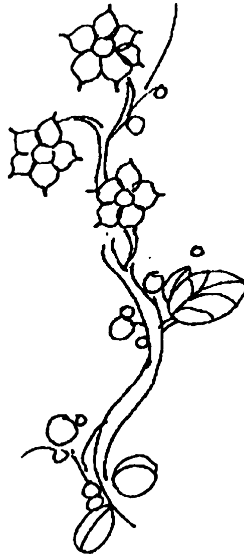
সমগ্র বিশ্বের চোখে ছুটে গেছে ঘুম।
কে দেবে সান্ত্বনা আজ পথের নিশান
পথহারা দিশাহারা মানুষের দল এখনো খুঁজিয়া
ফেরে—কোথায় আছেন এক পূজারী বামুন?
'যত মত তত পথ' তাঁর কথামৃতবাণী মানুষের অন্তিম আ

আনন্দসাগরে ভক্ত*

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দী শতাব্দী ধায় ভারতের সাধনায়
'ভক্তি' একটি ছোট্ট কথা আছে ভারা ভারা;
কি বল অর্থ তার অর্থ খুঁজে সারাৎসার—
শত শত মগ্নপ্রাণ হলো দিশাহারা।
অদ্বৈত ভক্তিবাদী আচার্য শঙ্করাদি
ভক্তিরূপে পেয়েছেন স্বরূপের 'সম'
নিজের স্বরূপখানি যথা নিজে খুঁজে আনি
বুঝেছেন ভক্তি তারই নাম অনুপম।
নারদ ভক্তপ্রাণ মুখে শুধু নামগান ঃ
'সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেম রূপ-অনুরাগ'
এই প্রেম প্রেমাস্পদে সর্ব উচ্চে রাখি সাধে
এ-প্রেমে প্রত্যাশার নাহি কোন ভাগ।
এ-প্রেমে কেবলই দায়, ফিরে কিছু নাহি চায়
হৃদয় মগন রহে সন্তোষে আপন
অহৈতুকী এই ভক্তি পরম প্রেমানুরক্তি
ঈশ্বর-প্রীতির জন্য ঈশ্বরান্বেষণ।
তারই তরে নাম চিন্তা নিত্য পূজা-পাঠ-বিচিন্তা
পবিত্র জীবনে নিত্য শুদ্ধ ভগবান
মগ্নপ্রাণে ভালবাসা হৃদে করে যাওয়া-আসা
আনন্দসাগরে মগ্ন ভক্ত মূর্তিমান।

* স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'ভক্তকথা' অবলম্বনে।



আলো দাও

সনৎ সেন

অন্ধকার ছুঁয়ে বসে আছি
পা ডুবে আছে পাঁকে
আলো দাও—প্রখর আলো
আমি ছুঁতে চাই তোমাকে।
আরো উঠতে চাই আমি
আরো প্রস্ফুটিত হতে চাই
আর ছড়াতে চাই
তোমার সুগন্ধ পৃথিবীতে।
আর সুমিষ্ট ফল বিতরণ
করতে চাই তোমার
পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর ভিতর।

শৈবতীর্থ ঊনকোটি

জয়িতা লাল

ঊনকোটি ত্রিপুরার একটি শৈব তীর্থস্থান। কৈলাশহর থেকে এটি ৯ কি.মি. এবং আগরতলা থেকে ১৭৮ কি.মি. দূরে। ত্রিপুরার উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। পূর্বে আসাম ও মিজোরাম। বাঙালি ও মণিপুরি ছাড়া ১৯ রকমের পার্বত্য উপজাতির বাস এখানে। ঊনকোটি পৌঁছাবার দুটো রাস্তা—একটা আসামের শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি বা বাসে করে অথবা শিলচর থেকে ট্রেনে ধর্মনগর এবং সেখান থেকে বাসে বা গাড়িতে কৈলাশহর। আরেকটা রাস্তা হলো আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে বাসে বা গাড়িতে কৈলাশহর। তবে এ-রাস্তায় জঙ্গিদের উৎপাত। পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া আজকাল চলাই যায় না। যদিও এটি ত্রিপুরায়, তবুও আগরতলা থেকে দূরত্ব শিলচরের তুলনায় বেশি। শিলচর থেকে কৈলাশহরের রাস্তাও অনেকটা নিরাপদ। তবে জঙ্গিদের ভয়ে এখানেও কিছু অঞ্চলে রাত্রে কেউই যাতায়াত করে না।



পাথরে খোদিত তারকাসুর বধ, মদন-ভস্ম ও কার্ত্তিক জন্মের কাহিনী

ঊনকোটিতে পাহাড়ের গায়ে যে অপূর্ব ভাস্কর্য রয়েছে, তা আনুমানিক ৭ম থেকে ৯ম শতকের মধ্যে খোদিত। ভারতবর্ষের এটিই সবচেয়ে বড় 'পাথর-খোদাই ভাস্কর্য'। 'ঊন' অর্থে 'এক কম'। সুতরাং 'ঊনকোটি' অর্থে 'কোটির চেয়ে এক কম'। এই শৈবতীর্থ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এক বিশাল মূর্তি এবং পুরো পাহাড়ে ও রাস্তায় বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের বহু গল্পগাথা আছে। এর মধ্যে তারকাসুর বধ, পঞ্চশর দিয়ে মদনের শিবের ধ্যান ভাঙানোর চেষ্টা প্রভৃতি মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত।

এই তীর্থ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। কৈলাসে হর-গৌরী আলোচনা করছিলেন, কাশীর সমতুল্য একটা তীর্থের প্রয়োজন। কারণ, গঙ্গার তীরে কাশীতে জনসমাগম প্রচুর হওয়ায় দেবতাদের অবাধে বিচরণ ও জপধ্যানে বিঘ্ন হচ্ছে। হর-গৌরীর এই আলোচনা শোনার পর এক কোটি দেবতা বেরিয়ে পড়লেন কাশীর সমতুল্য এক সুন্দর মনোরম জায়গার খোঁজে। তাঁরা আকাশপথে বিচরণ করতে করতে ঊনকোটি পর্বতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এদিকে শর্ত ছিল, সূর্যদেব উদিত হওয়ার আগেই কাশী পৌঁছাতে হবে। বিধাতার কি ইচ্ছা জানা নেই। হঠাৎ কাক ডাকতে শুরু করল। দেবতারা বুঝলেন, ভোর হতে দেরি নেই। তাই দেবতারা যে যেভাবে ছিলেন, লুকিয়ে পড়লেন। তাঁরা সকলে পাথর হয়ে গেলেন। শিব শুধু তখনো এসে পৌঁছাতে পারেননি।

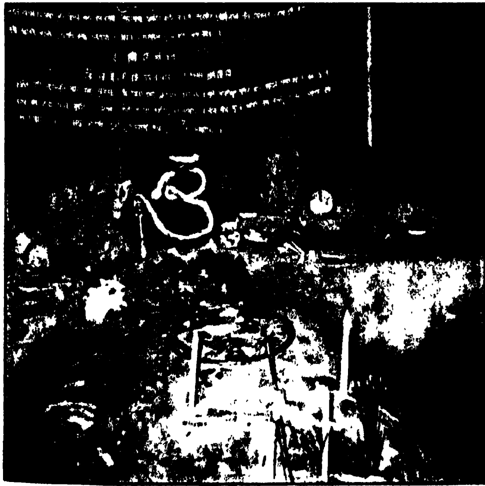
ঐতিহাসিক দিক দিয়েও ত্রিপুরা কখনো পাণ্ডববর্জিত স্থান ছিল না। এখানে চিরকাল ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরাজিত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যখন সকল দেবদেবীর পূজা লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, তখন পাল রাজত্বের সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত পাহাড়ে এইসব ভাস্কর্য তৈরি হয়। কি করে যে এত বিশাল বিশাল মূর্তি পাথরে খোদাই করা হয়েছে, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে।



বাঁশের মাচা দিয়ে উঠে কুণ্ডে স্নান : মাচায় স্নানার্থীদের দেখা যাচ্ছে

এখানে একটি বড় শিবের মূর্তি আছে। মূর্তির মাথায় এমন একটা পাথর আছে, যা দেখে মনে হয় শিবের জটা। সেই পাথরের ওপর ঝরনার জল পড়ে পাশের কুণ্ডে জমা হয়ে আবার নিচে পড়ে। ঠিক যেন শিবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। এই কুণ্ডকে 'গঙ্গাকুণ্ড' বা 'সীতাকুণ্ড' বলে। এই কুণ্ডে কেবল একজন করেই ঢুকতে পারে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, মাথা ঠেকে যাবে—কিন্তু দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে শরীর গলিয়ে দিলে কোমর পর্যন্ত জল। উনকোটিতে চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতেও মেলা বসে। অশোকাষ্টমীর বিকালে এখানে একটা উৎসব হলো। একটা বাসন্তীপূজাও দেখলাম। এলাকার মানুষ এই স্থানটিকে একটি পর্যটনকেন্দ্র করতে চান। কিন্তু এই দুর্গম পাহাড়ের ঝোপেঝাড়ে ও রাস্তায় জঙ্গিদের খুবই অত্যাচার।

পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে দুটি চরণচিহ্ন দেখা যায়। এটিকে সকলে বিষ্ণুর চরণ বলেন। এই চরণদুটির মাঝখানে সবসময় জল থাকে, যা কখনো শুকায় না। সকলে 'বিষ্ণুপাদোদকম্' বলে এই জল গ্রহণ করেন।



পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে 'বিষ্ণুপাদোদকম্'

শিলচর থেকে উনকোটি যাওয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে করিমগঞ্জ যেতে শুকতালের কাছে বরাক নদী পার হতে হলো। দুর্ভাগ্যক্রমে দুদিন আগে ব্রিজ ভেঙে গেছে। তাই পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে অন্য গাড়িতে উঠে করিমগঞ্জ, নিলামবাজার, পাতারকান্দি ও আরো অনেক মফস্‌সল শহর এবং ধর্মনগর হয়ে কৈলাশহরে পৌঁছালাম। প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় লাগল। রাস্তা বেশির ভাগই ভাল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তার দুধারেই চাবাগান। বাগানগুলি দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল সবুজ কার্পেট বিছানো। দুদিন কৈলাশহরে কাটিয়ে ফেরার সময় ট্রেনে চড়ার ইচ্ছা হলো। অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও আমরা নিরুৎসাহ হলাম না। কারণ, পাহাড় ও চাবাগানের ভিতর দিয়ে ট্রেনে যাওয়ার আনন্দটা আমরা হারাতে চাইনি। কৈলাশহর থেকে ট্রেনের রাস্তা নেই। গাড়ি করেই ধর্মনগর এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে চড়লাম।



উনকোটি উৎসব

প্রকৃতি ও পাহাড়ি জঙ্গলের শোভা দেখব বলেই ট্রেনে চড়েছি। তাই জানলার ধারে বসলাম। খানিক পরে পুরো ট্রেন জঙ্গল থেকে কেটে আনা কাঠে ভর্তি হয়ে গেল। এটা বে-আইনি কাজ সত্ত্বেও এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এভাবেই ব্যবসা চালান। পুরুষ ও মহিলারা আমাদের দিকে একটা অদ্ভুত সরলতা মিশ্রিত চাহনিতে দেখছিল। পাতারকান্দিতে প্রায় সব কাঠ নেমে গেল। এবার উঠলেন চাকুরিজীবীরা। হঠাৎ বদরপুর স্টেশন যাওয়ার পর শিলচরের যাত্রীরা সকলে এক কামরায় চলে এলেন। আমরাও তাই করলাম। জানলা-দরজা নিজেরাই বন্ধ করে দিলাম। শোনা গেল, পথে শালখিরা নামে একটি জায়গা আছে, সেখানে প্রায়ই ডাকাতি ও লুটপাট হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডের সহযোগিতাতেই এই কাজকর্ম হয়। বস্তুত, সারা রাস্তা ট্রেন বেশ ভাল গতিতে এলেও বদরপুরের পর শালখিরা আসতেই ট্রেনের গতি অনেকটা কমে গেল। মনে মনে ঠাকুর-মাকে স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা ৮.৩০ নাগাদ ঐ জায়গাটি পার হয়ে গেলাম। ট্রেন সময়ের আগেই শিলচর স্টেশনে পৌঁছাল।

উনকোটির অপূর্ব ভাস্কর্য ও তীর্থমাহাত্ম্য এবং যাওয়া-আসার সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার এক সুখকর ও আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম। ❑

অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ

মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রথমেই বলে রাখা ভাল, শিরোনামটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ধার করা। বিশ্বকবির আলোর বৃত্তে অবস্থান করেও যাঁরা নিজ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বা গীতিকার হিসাবে নিজস্ব স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ অন্যতম। কবিগুরু তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজেই সস্নেহে ওপরের অভিধায় তাঁকে ভূষিত করেছিলেন।

অতুলপ্রসাদের জীবনের ঘটনাগুলি সামান্যভাবে স্পর্শ করে আমরা তাঁর গান ও কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করব। অতুলপ্রসাদের জন্ম হয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। তাঁর পিতা রামপ্রসাদ সেন পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। অতুলপ্রসাদ মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পিতৃহীন হন। তখন থেকে তিনি তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণবাবুর সংসারে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তাঁর কাছেই অতুলপ্রসাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ এবং চারুকলা ও সঙ্গীতকলায় দীক্ষা হয়। তিনি ঢাকা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় যেকোন কারণেই হোক বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতযাত্রা করেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায় নিযুক্ত হন, কিন্তু এখানে পসার ভাল না হওয়ায় তিনি লখনৌ চলে যান। সেখানে ধীরে ধীরে তাঁর পসার জমে ওঠে এবং সাধারণের কাছে 'সেন সাহেব' ও 'মিঃ এ. পি. সেন' নামে সমধিক পরিচিত হন। এখানেই তাঁর জনসংযোগ বিশেষ এক মাত্রা পায় এবং তিনি প্রথমে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে 'যুবসমিতি' গঠন করেন, পরে যার নাম হয় 'বেঙ্গলী ক্লাব'। তখন থেকেই লখনৌ শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে এই ক্লাবের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ ক্লাব গড়ে ওঠে। এই সময় থেকেই বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মায় এবং বিশেষত তাঁরই প্রয়াসে কানপুর শহরে 'বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' সংগঠিত হয়। তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। কাশীতে যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, অতুলপ্রসাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধন করেন। সেই সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সময়েই তিনি 'উত্তরা' নামে এক সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তারই স্বীকৃতিস্বরূপ 'পরিশোধ' কাব্যগ্রন্থটি তিনি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করেন।

অতুলপ্রসাদ তখনকার বিলাতফেরত ব্যারিস্টার এবং ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত হলেও অন্তরে ছিলেন গভীর দেশপ্রেমিক। স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ও গানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি প্রায় ২০০ গান রচনা করেছেন। এগুলি তাঁর গানের সঙ্কলন 'গীতিগুঞ্জ' ও 'কাকলি' নামে স্বরলিপি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরো কিছু গান হয়তো সমকালীন পত্র-পত্রিকায়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে ছড়িয়ে থাকতে পারে। অতুলপ্রসাদের গ্রন্থগুলির প্রকাশক কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। তাঁর উইলপত্র অনুসারে এইগুলির স্বত্বাধিকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। এই সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ লোকহিতে ব্যয় করা হবে—এই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। আজও তা সেইভাবেই চলে আসছে।

অতুলপ্রসাদের গানের গঠনের মধ্যে আমরা পাই বাঙলা ছোট খেয়াল বা রাগপ্রধান, টপ্পা, ঠুংরি, বাঙলা কীর্তন, রামপ্রসাদী সুর, উত্তর ভারতের 'কাজরী' বা অন্যান্য বিবিধ লোকগীতির ছাপ।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' গ্রন্থে গানগুলির যেমন নির্দিষ্ট বিভাগ আছে, 'গীতিগুঞ্জ'-এ তেমন নির্দিষ্ট বিভাজন নেই।

তবে বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী সেগুলির কিছু দেশাত্মবোধক, কিছু প্রকৃতি পর্যায়ের, কিছু ঈশ্বর প্রসঙ্গে, কিছু মাতৃবিষয়ে, কিছু তাঁর কবিমানসীকে কেন্দ্র করে, কিছু তাঁর দাম্পত্য জীবনের নিঃসঙ্গতা অবলম্বনে রচিত।

অতুলপ্রসাদ মূলত ছিলেন এক ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি, তবে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি ছিল অব্যক্ত। সেজন্য অনেক সমালোচকের অভিমত, তিনি ভগবানকে অন্তর থেকে ডাকেননি, ডেকেছিলেন শুধুই গানে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ নিজে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। তিনি চিরকাল ছিলেন ঈশ্বরনির্ভর। গানের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক, অসুখী। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল একটি উদাসী বাউল-মন। এসবেরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গানের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁকেও মাঝে মাঝে ফরমায়েশি কবিতা লিখতে হয়েছে। এক নিকট আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে নবদম্পতির নতুন জীবনের সূত্রপাতে তিনি অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও প্রার্থনা জানান এভাবে ঃ "দুইটি হৃদয় হয়ে একাকার, স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার, বিশ্বের বুকে চলুক উদার, কখনো না হয়ে কুণ্ঠিত।" আবার এক নবজাতকের জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি অভিনব ভঙ্গিতে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা জানান ঃ "সে-জীবনে প্রভু, যেন কোথা কভু, না যায় তোমারে ছাড়িয়া।"

অতুলপ্রসাদের কবিতা বা গানে কোথাও কোথাও এক মায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কোন দেবীমূর্তি নন। তিনি সনাতনী আদিরূপা মাতৃশক্তি, যাঁর কাছে অতুলপ্রসাদ প্রার্থনা জানান ঃ "চিত্তদুয়ার খুলিবি কবে মা, চিত্তকুটীরবাসিনী।" এ যেন সাধকের আকুল প্রার্থনা, যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্বোধন হয়। আবার কখনো লিখেছেন ঃ "তোর কাছে আসব মাগো শিশুর মতো।" এই গানটি সম্পূর্ণ অনুধাবন করলে এর মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে শুনতে পাওয়া যায়।

অতুলপ্রসাদের জীবনে মাঝে মাঝে প্রকৃতির আহ্বান এসেছে। তাই তিনি লিখেছেন ঃ "ডাকে কোয়েলা বারে বারে।" আবার সেই পাখি যখন তাঁর গৃহাঙ্গনে দেখা দেয়, তখন তিনি লেখেন ঃ "মোর আঙিনায় আজি পাখি গাহিল একি গান।" কখনো বা তাঁর কবিমনে শিশুসুলভ চিরন্তন প্রশ্ন জাগে ঃ "মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, ও আকাশ, বল আমারে।" এইসব আনন্দের হাট থেকে কবির মন আর ঘরে ফিরতে চায় না। তাই তিনি বলেন ঃ "যাব না যাব না যাব না ঘরে, বাহির করেছে আজ পাগল মোরে।"

অতুলপ্রসাদের যে একটি প্রচ্ছন্ন বাউল-মন ছিল, তাকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন ঃ "পাগলা মনটারে তুই বাঁধ, কেনরে তুই হেথা সেথা পরিস প্রেমের ফাঁদ।" এ যেন অবাধ্য অবুঝ মনটাকে বশে আনতে কবির সাবধানবাণী। আবার এই মনকেই ডেকে কবি কখনো বলেন ঃ "মিছে তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।... ওরে হয়তো তাহার পাবি দেখা, গানটি হলে সমাপন।" আমাদের সমগ্র মানবজীবনকে যদি একটি সম্পূর্ণ গান বলে ভাবা যায়, তাহলে সেই গান-শেষে যখন আমাদের জীবনে তেহাই-এর মাত্রা পড়ে অর্থাৎ আমরা যখন সমে ফিরে আসি, তখন হয়তো গানের দেবতার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হবে—এটা কবির একান্ত বিশ্বাস। আবার কখনো তিনি তাঁর নিজের ভোলা মনকে ডেকে বলেন ঃ "যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হলো রে উছল রে ভোলা, তবে তুই একূল-ওকূল ভাসিয়ে নিয়ে চলরে ভোলা।" এ যেন সেই সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে অচিনদেশে যাত্রার আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথকে 'গানের রাজা' বলা হয়। তাঁকে যদি 'গ্রহপতি' ভাবা যায়, তবে সেই সৌরমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল গ্রহ হলেন অতুলপ্রসাদ। তিনি নিজের জীবনে তাঁর গানকে নিয়ে কি ভাবনা ভেবেছেন, সেবিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই তিনি তাঁর জীবনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সঙ্গীতকে ডেকে বলেন ঃ "ওগো দুঃখ-সুখের সাথী, সঙ্গী, দিনরাতি সঙ্গীত মোর, তুমি ভবমরু-প্রান্তর মাঝে শীতল শান্তির লোর।" এই উষ্ণ শুষ্ক জীবনের মরুবালুকায় কবির প্রাণ পিপাসিত, সেই তৃষিত অন্তরে কবির একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর সঙ্গীত, তাঁর কবিতা। তাঁর জীবনদেবতাকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন ঃ "তুমি গাও, তুমি গাও (গো), গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে-বাঁধা জীবন-বীণা ঝঞ্ঝারি বাজাও।" কবির নিজের জীবন-বীণা সকরুণ বেদনার তারে বাঁধা ছিল—একথা আমরা অনেকেই জানি। এই গানে তারই অকপট স্বীকৃতি। আবার কখনো সেই জীবনদেবতাকে তিনি বলেন ঃ "যখন তুমি গাওয়াও গান, তখন আমি গাই। গানটি যখন হয় সমাপন, তোমার পানে চাই। আরো কি মোর গাইতে হবে? নয়নজলে নাইতে হবে? আরো কি মোর চাইতে হবে—দিলে না যা তাই?" এ যেন কবির নিজের জীবনদেবতার কাছে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্কের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনাগণ্ডার হিসাব-নিকাশ। কবি যখন নিজের সমগ্র সঙ্গীতজীবনের পর্যালোচনা নিজেই করেন এবং ভাবতে বসেন ঃ "একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে দিলাম নয়নজলে। সহসা কে এলে গো এ তরী

বাইবে বলে।" আবার কখনো ভাবেন ঃ "কেন যে গাহিতে চাহি আমি যে সে সুর-হারা।" তাঁর সমসাময়িক কোন ভক্তকবির গানে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই ঃ "আমার গানের সুর হারিয়ে গেছে এই গাঙের কূলে।... গাহিতে বলে, চেনে না জানে না তারা। যে-সুরে আমি খুঁজে খুঁজে হলেম সারা, তাই দে না গো বলে (সুরধুনী)।" জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে অতুলপ্রসাদ আবার গেয়ে ওঠেন ঃ "কত গান তো হলো গাওয়া, আর কেন মিছে গাওয়াও? যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও?" দীর্ঘ শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের শেষে ব্যথাহত অভিমানী কবির এ এক সকরুণ আক্ষেপ।

অতুলপ্রসাদের গানগুলিতে দেখা যায়, 'তরী', 'কাণ্ডারী', 'হরি' প্রভৃতি কয়েকটি অনুষঙ্গ বারবার ফিরে ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথের গানের বেলাতেও তাই। কিন্তু সেখানে 'হরি'র ব্যবহার কিছু কম। তবে এই 'হরি' কিন্তু সাধু-ভক্ত-বৈষ্ণবদের আরাধ্য হরি নন। ইনি অতুলপ্রসাদের অন্তরদেবতা, যিনি অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে সর্বক্ষেত্রে চালনা করে চলেছেন। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই যে-গানটির কথা মনে আসে, সেটি 'গীতিগুঞ্জ' সঙ্কলনের প্রস্তাবনা-সঙ্গীত। এর সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে। সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।" আর এখানে অতুলপ্রসাদ লিখলেন ঃ "আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোমার তরী। যাতে হয় মনোমত তেমনই করে লও হে গড়ি।" মনে হয় অতুলপ্রসাদ যেন আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। কবিতাটি অতি দীর্ঘ। এটিই বোধ করি অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। কখনো তিনি আপনমনে গেয়ে চলেছেন ঃ "মনরে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়, হালের কাছে আছেন হরি... সেই তো তরীর কর্ণধার।" রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও যেন অনুরূপ উচ্চারণ ঃ "ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার।" ভাবের নৈকট্য প্রকট, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। একটি গানে অতুলপ্রসাদ সেই কাণ্ডারীকে আকুলভাবে ডেকে বলছেন ঃ "এসো হে এসো হে প্রাণে প্রাণসখা... জীবনতরী মাঝে নাহি কাণ্ডারী, প্রেমপারাবারে আমি একা।" আবার বলছেন ঃ "কোথা হে ভবের কাণ্ডারী, একা আমি জীবনতরী বইতে নারি।" সেই খোঁজ সমানে চলছে। কবি কোথাও লিখেছেন ঃ "বলো হে হরি, আর কতকাল সুদিনের লাগি রহিব জাগি।" নিজের গানের ভিতর বারবার সেই হরিকে তিনি খুঁজে চলেছেন। এই কবিই আবার ভাবছেন ঃ "বিফল সুখ-আশে জীবন কি যাবে? কবে আসিবে হরি, আর কবে বুঝাবে?" এ যেন সেই সনাতন মানবাত্মার প্রশ্ন, যা সকলেরই মনের কথা। তিনিই কখনো জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?" সেই অতি চিরপুরাতন মানবচিত্তের ক্রন্দন। আবার কখনো কবি আকুলচিত্তে প্রশ্ন করেন ঃ "তব পারে যাব কেমনে, হরি! দুস্তর জলধি, নাহি তরী। আছি বসে একা তীরে। ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে, বল বল কেমনে এ নিধি তরি?" এ-প্রশ্ন শুধু একা কবিরই নয়, আমাদের সকলেরই অন্তরের কথা। অবশেষে জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে কবি বিধাতার দিকে তাঁর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন ঃ "বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি। আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।" এইভাবে তিনি পারে যাওয়ার তরীর সন্ধান পেলেন। তাই বিধাতাকে তাঁর ভক্তিদৃপ্ত প্রেমদীপ্ত চ্যালেঞ্জ। এ যেন সাধক-কবি রামপ্রসাদের কথা মনে পড়িয়ে দেয় ঃ "আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে?" ভিন্ন প্রেক্ষিত ভিন্ন উচ্চারণ, কিন্তু ভাবে অভিন্ন।

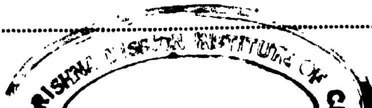
অতুলপ্রসাদ ছিলেন গভীর দেশপ্রেমিক। তাঁর বহু কবিতায় ও গানে তা পরিস্ফুট। তিনি আশা করেছেন, ভারত একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। জানি না সেদিন এখনো কতদূরে? নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যে তিনি মিলনসূত্রের সন্ধান করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তব চিত্র আজ কী প্রমাণ করে? তিনি মাতৃভাষা বাঙলাকে নিয়ে অসীম গর্ব অনুভব করেছেন। একমাত্র আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ছাড়া যথার্থই এ-গর্ব আর কী কেউ করতে পারে? তিনি তাঁর গানে যথার্থই বলেছেন ঃ "ভারত-ভানু কোথা লুকালে?" অথবা "কাণ্ডারী নাহি গো কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে।" এই হলো বর্তমানে দেশের সত্য ছবি।

অতুলপ্রসাদ তাঁর কোন কোন গানে শিক্ষক-উপদেষ্টার ভূমিকাও পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে।" বা "আপন কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না।" কখনো বলেছেন ঃ "নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি নারে মন, তুই সুখীজনের করিস পূজা, দুঃখীর অযতন (মূঢ় মন)।" আবার কোথাও সমাজ-সংস্কারের কথাও বলেছেন ঃ "হারে মূর্খ, হারে অন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব।... ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ, একজাতি তাই একশো অংশ, হিন্দুরে তুই হবি ধ্বংস, না ঘুচালে এই বালাই।" অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি-দূরীকরণ—এসবের এমনই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর লেখায় আমরা পাই। আবার তাঁর গানে কোথাও

কোথাও বিশ্বমানবতার, বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুরও শোনা যায়—"সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে। আছে তোর যাহা আপন ফুলের মতো দে সবারে।" এই গানেরই শেষ চরণে আছেঃ "একই নাওয়ে সকল ভাইয়ে যেতে হবে যে ওপারে।" এখানে যেন বিশ্বখ্যাত নিগ্রো কবি-গীতিকার পল রবসনের "We are on the same boat, brother" গানটির অনুরণন খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো তিনি বলেছেনঃ "আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্বঘরে পেতেম না ঠাঁই।" 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ভিন্ন প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" কবি আবার কখনো কখনো মিলনের গান গেয়েছেন, সবাইকে ডাক দিয়েছেনঃ "আয় আয় আমার কাছে ভাসবি কে আয়। আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙা ভেলায়।" অথবা "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে তোরা আয় কে গো ঝুলিবি কে আয়।"

অতুলপ্রসাদের আস্তিক্যবুদ্ধি খুবই প্রখর ছিল। তিনি সাকার বিগ্রহে বিশ্বাসী হয়তো ছিলেন না, তবে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খেলা যে তাঁর জীবনে অহরহ ঘটে চলেছে—এ-বিশ্বাস তাঁর প্রবল ছিল। তাই তিনি অভিমানভরে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেনঃ "ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছ অনুক্ষণ।" বস্তুত, মোহগ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে সেই 'সর্বকারণ-কারণম্'-এর অবিরাম লুকোচুরি খেলা চলছে। "আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো? আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো"—এখানে সেই ছবিই পরিস্ফুট হয়। "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়, বলছ হরি আমায় ধর"—এখানেও সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে লুকোচুরি খেলা। এপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে, যেখানে অন্ধ বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের লুকোচুরি খেলা চলছিল। অতুলপ্রসাদ কখনো তাঁর দেবতাকে বলছেনঃ "আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধর।" একই প্রতিধ্বনি অপর একটি গানেও পাইঃ "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।" কবির স্বপ্ন—জীবনদেবতা তাঁর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবি তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে কেন মোরে ডাকিলে গো এ আঁধারে।" তাঁর স্বপ্ন তখন সার্থক হয়। কবির নিঃসঙ্গ বেদনাহত জীবনে মাঝে মাঝেই যেন কার ডাক আসে! তখন তিনি গেয়ে ওঠেনঃ "সে ডাকে আমারে, বিনা সে-সখারে রহিতে মন নারে।" সেই ডাকে সাড়া দিতে তাঁর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। আবার সংসারের শত কোলাহলে কোথায় যেন তা হারিয়ে যায়। সেই সখার কাছে তাঁর যেন কিছু চাহিদা থাকে। তখন তিনি অন্তরে ভাবেনঃ "কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়। শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।" এটাই তো সারস্বত সাধনার মূল কথা। আমাদের সারাজীবনের সকল কাজের মধ্যেই তো সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজার আয়োজন। আবার কোন গূঢ় কারণে কবি তাঁর কাছে ক্ষমা চান এই বলেঃ "ক্ষমিও হে শিব, আর না কহিব।" কখনো তাঁর কাছে কবির অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনঃ "তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে।" অন্তিমে কবি তাঁর অন্তরদেবতার কাছে প্রার্থনা করেনঃ "সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি তো আমার রহিবে।" কবি এখানে তাঁর দেবতার কাছে অগ্রিম প্রতিশ্রুতি চান, যাতে মরলোকে যদি তাঁর সাক্ষাৎ নাও পাওয়া যায়, তবুও তাঁর সঙ্গে কবির সম্পর্ক যেন চিরদিন অবিচ্ছিন্ন থাকে।

যেকোন কারণেই হোক, অতুলপ্রসাদের দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের ছিল না এবং এই অসুখী জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর বহু গানে ও কবিতায়। ব্যক্তিগত জীবনে কবির একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর নিঃসঙ্গতা। "এসো গো একা ঘরে একার সাথী, সজন নয়নে বল রব কত রাতি"—এই ছিল কবির নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর দয়িতার কাছে প্রশ্ন। যদিও এ-প্রশ্ন দয়িতার কানে পৌঁছাত কিনা বা তাঁর অন্তরে কোন রেখাপাত করত কিনা তা জানা যায় না। কখনো বা বলেছেনঃ "আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে বঁধু আমার?" এ যেন বৃন্দাবনের কুঞ্জমাঝে গোপিনীদের গোবিন্দের জন্য অনন্ত আকুল প্রতীক্ষা। কবির ব্যাকুল উদাসী মন যেন নিজেকেই খুঁজে বেড়ায় আকাশে-বাতাসেঃ "আমার পরান কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে।" আবার কখনো তাঁর পরান-বঁধুয়ার অস্তিত্ব অনুভব করেনঃ "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে।" কখনো আক্ষেপ করে বলেনঃ "তাহারে ভুলিব বল কেমনে।" কোন এক বাদল নিশীথে শূন্য শয্যায় বিনিদ্র তিনি কাঁদেনঃ "আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে, বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে।" কখনো-বা বলেনঃ "এমন বাদলে তুমি কোথা, আজি পড়িছে মনে মম কত কথা।" আবার বিপ্রলব্ধা স্ত্রীর উদ্দেশে আক্ষেপ করেনঃ "আজি এ নিশি সখি সহিতে নারি, কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি।" তারপর তাঁকে অন্তরের আকুল আহ্বান জানান পুনর্মিলনের আশায়ঃ "আজি স্বরগ আবাস এসো ছাড়ি, আজি বরষা বরষে বিরহ বারি।" কখনো বিপ্রলব্ধার পশ্চাৎ অনুসরণ



করে তাঁকে নদীতীরে আবিষ্কার করে বলেন ঃ "কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা... কার লাগি বল অবেলা?" কিন্তু সবই বিফলে যায়। অবশেষে মরিয়া হয়ে কবি কলহান্তরিতা স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটান ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন ঃ "আমায় ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগায়ে থাকি।" কবি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন, যেন তাঁর দয়িতা পথভুলে তাঁর কাছে আবার ফিরে এসেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ "কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া, এসেছ কি হেথা তুমি তব পথ ভুলিয়া।" আবার স্ত্রীর এই পুনরাগমনের আনন্দে কবি সোল্লাসে গেয়ে ওঠেন ঃ "আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেকদিনের পর।" অভিমানভরে তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ "মনে পড়িল তা কি? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী, বুঝি ভিজিল আঁখি?" দাম্পত্য জীবনের সুখ-অসুখের দ্বন্দ্বে, পাওয়া না-পাওয়ার বেদনায় ক্ষতবিক্ষত কবি দোলাচলচিত্তে ভাবেন ঃ "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়।" অথবা "ওগো দুঃখী, কাঁদিছ কি সুখ লাগি, সুখের যাতনা জান না কী।" এসবই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অম্লমধুর ফসল।

এত সব ব্যথা-বেদনাসঙ্কুল জীবনের অন্ধকার জগতে একমাত্র আলো ছিল অতুলপ্রসাদের এক কবিমানসী—যেমন অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের থাকে। তারা কোথাও প্রত্যক্ষ জৈবসত্তার অধিকারিণী, আবার কোথাও নিছকই কল্পলোকের বাসিন্দা। অতুলপ্রসাদের জীবনে দ্বিতীয় রূপটিই সত্য। পথের মাঝে কোন একদিন তিনি এক 'ক্রন্দসী পথচারিণী'কে দেখতে পান। সেই 'বিষাদিনী'র অন্তরে কি ব্যথা লুকানো, তিনি তার অনুসন্ধান করেন। অন্যান্য কবি-গীতিকারদের রচনায় এই শব্দটির ব্যবহার বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি ক্রন্দনরতা অর্থে এটিকে গঠন ও প্রয়োগ করেছিলেন। যাই হোক, সেই 'বিরহিনী'কে তিনি সম্ভাষণ করে বলেন ঃ "এ পোড়া পরানতরে এত ভালবাসিলে?" আবার কখনো তাঁর মনোপথে এক 'বনহরিণী' এসে ধরা দেয়। তার 'সজল কাজল আঁখি'র কারণ তিনি খুঁজে পান না। তখন তাকে প্রশ্ন করেন ঃ "তবে কেন ধাও হেন ওগো বনহরিণী?" কবি তাঁর বিরহতাপিত জীবনে অনুভব করেন ঃ "কে যেন তাঁকে বারে বারে চায়।" তিনি তো তাকে চেনেন না, কিন্তু সে তাঁকে চেনে বিলক্ষণ। তাই প্রেমমুগ্ধ চিত্তে কবি তাঁর প্রেয়সীকে এক 'বনকুসুম'-এর মাল্যদান করেন এবং তা যেন সে ফিরিয়ে না দেয়, তার জন্য আর্তি জানান। তিনি তাঁর মনের মন্দিরে সেই 'নবীনা বালিকা'কে আবাহন করেন এবং অতিশয় নৈকট্যে সেই 'রঙ্গরানী'কে চিনতে পারেন, অন্তরে উপলব্ধি করেন এই নায়িকা "শূন্য করি লইবে মোর চিত্তখানি।" এমনই তাঁর বিচিত্র অনুভব।

জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে কবি যখন পিছন পানে তাকান, তখন তিনি নিজেকেই নির্দেশ দেন এক অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ঃ "যারা তোরে বাসল ভালো, যারা দিল প্রাণে ব্যথা, যাবার আগে বন্ধু জেনে সবার পায়ে নোয়া মাথা।" অপূর্ব! রবীন্দ্রনাথের একটি গানে হুবহু একই কথার প্রতিধ্বনি। জানি না কে কার কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তারই পরিচয়, সবারে আমি নমি। যেকেহ মোরে দিয়েছ দুখ, দিয়েছ তারই পরিচয়, সবারে আমি নমি।" ভাব ও চিন্তার কী অদ্ভুত বাঙ্ময় সমীকরণ!

অতুলপ্রসাদ দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। অন্তর-বাহিরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এই সুরের পূজারী মাত্র ৬৩ বছর বয়সে ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে সুরলোকে গমন করেন। আজ আমরা সেই সুরসাধকের উদ্দেশে আমাদের ভক্তি-বিনম্র প্রণতি নিবেদন করে ধন্য হই। ❑



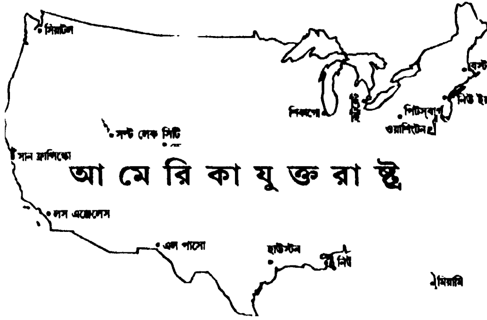
প্রচ্ছদ-পরিচিতি

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'হোমকুণ্ড' নামেই পরিচিত বরানগর মঠ। ঐ বাড়িতে কী উগ্র তপস্যাই না হয়েছিল—নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে! শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছিল এই পুণ্য তীর্থেই। দুঃখের বিষয়, সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে মাত্র দুটি প্রাচীন স্তম্ভ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সেই স্থানটি অধিগ্রহণ করে সযত্নে পরিমার্জনাদি করেছিলেন 'বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি'। সম্প্রতি তাঁরা বেলুড় মঠের হাতে সম্পূর্ণ মঠটি তুলে দিয়েছেন। প্রচ্ছদে অতি পুরাতন দুটি স্তম্ভের মূল ছবিটি দেখা যাচ্ছে। মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আশ্রমবাড়ি ও স্তম্ভদুটির সংস্কৃত রূপ। পটভূমিতে একটি স্তম্ভের অস্পষ্ট ছবি।

চলতি বছরে আমাদের প্রচ্ছদ-বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন।

আমেরিকার সমাজব্যবস্থা একটি চালচিত্র

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী



আমেরিকা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মহলে মোটামুটি ভালই ধারণা আছে। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষ আমেরিকায় গেছেন, এখনো যাচ্ছেন। নতুন কিছু বলার নেই, তবুও মনে হয়, এদেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। অবশ্য কারোরই সম্যক ধারণা থাকা খুবই কঠিন, কারণ এদেশটি এত বড় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এগিয়ে গেছে যে, সেসব বুঝতে গেলে দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন।

এটা ঠিকই যে, এদেশে আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই—ব্যক্তিগত উদ্যোগই প্রধান। এবিষয়ে আজ থেকে একশো বছর আগে স্বামীজী যে-কথাটি বলেছিলেন তা আজও সত্য। তিনি বলেছিলেন, একজন হতদরিদ্র আইরিশ এদেশে এসেছিল সমস্তরকম আত্মবিশ্বাস-শূন্য হয়ে। কিন্তু এখানে পৌঁছেই যখন সে দেখল—সকলেই নিজেদের চেষ্টায় উন্নতি করছে, তখন সেও ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। সে-ঐতিহ্য আজও বিদ্যমান। এই কারণে এখনো পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি থেকে অগণিত মানুষ এদেশে আসছে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে। চিন বহুকাল তাদের দেশের মানুষদের বাইরে যেতে দেয়নি। সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশে যাওয়ার নিয়ম শিথিল করার ফলে সেখান থেকে আজ বহু লোক এদেশে আসছে এবং বহু শহরেই তারা ছোটবড় নানা কাজে লেগে পড়েছে। যেকোন বড় শহরেই তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তেমনি বহু বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানীর আসা অব্যাহত রয়েছে, যদিও বর্তমানে আমেরিকা সরকার নানা কারণে বহিরাগত মানুষের আগমন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এশিয়া মহাদেশের ছাত্রছাত্রীরা নেই—এমনটি দেখা যায় না। এখানে কিণ্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করতে কোন ব্যক্তিগত ব্যয়ের দরকার নেই। এখানকার হাসপাতালগুলিও চিকিৎসাক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে। আগে আমাদের দেশের বিত্তশালী লোকেরা চিকিৎসার জন্য ইউরোপ, ভিয়েনায় যেতেন, এখন বেশির ভাগই আসেন আমেরিকায়। আমাদের দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আই. আই. টি. ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টগুলি প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আদলেই তৈরি হয়েছিল। আমেরিকায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির রূপায়ণে শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এসবই অনেকাংশে বাজার-অর্থনীতির অবদান।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা

এদেশে শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা আছে—সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে (পাবলিক স্কুল) সকলে বিনাপয়সায় পড়াশুনা করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলিতে (প্রাইভেট স্কুল) অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সেজন্য সাধারণ মানুষ সরকারি বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের পাঠায়। নিঃসন্দেহে এদেশের সরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক উন্নত, কিন্তু শিক্ষার মান যে খুব উন্নত তা মনে হয় না। এমনকি ব্যয়সাধ্য ব্যক্তিগত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাও যে সর্বক্ষেত্রে উন্নত, সেটিও ঠিক নয়। এদেশের শিক্ষার মান সম্পর্কে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' একটি সমীক্ষায় জানিয়েছে, ভাল স্কুলের ছাত্ররা জানে না ওয়াশিংটন ডিসি কোথায়। ৩৫% ছাত্র পারেনি মানচিত্রে আমেরিকার সীমানা অঙ্কন করতে। বাল্টিমোর শহরের ৪৫% ছাত্র বিশ্ব-মানচিত্রে আমেরিকার অবস্থান দেখাতে পারেনি। উক্ত সমীক্ষার ফল এমনই হতাশাজনক। আবার কলেজের লেখাপড়াও খুব ব্যয়সাধ্য। কম করে হলেও কলেজের ফি বছরে ১০-১২ হাজার ডলার। তাছাড়া থাকা-খাওয়ার খরচ আছে। এগুলি সবই বেসরকারি কলেজ। অথচ এরকম কলেজের প্রথম বর্ষের ৯৫% ছাত্র বিশ্ব-মানচিত্রে ভিয়েতনামের অবস্থান কোথায় দেখাতে পারেনি, যেখানে কিছুদিন আগেও ভিয়েতনামের যুদ্ধে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০টি উন্নত দেশের পরীক্ষায় আমেরিকার অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা পাটিগণিতে দশম, বীজগণিতে দ্বাদশ ও জ্যামিতিতে দশম স্থান লাভ করেছে। আরেকটি সংস্থা

'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি ইভ্যালুয়েশন অফ এডুকেটিভ অ্যাচিভমেণ্ট' মোট ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালায়, যাদের ক্লাস স্ট্যাণ্ডার্ড পঞ্চম, নবম এবং দ্বাদশ। সমীক্ষার ফলাফল এইরকম—

বিষয়	ইংল্যাণ্ড (%)	জাপান (%)	আমেরিকা (%)
পদার্থবিদ্যা	৫৮	৫৯	৩৪
রসায়নবিদ্যা	১৬	৬২	২৭
জীববিদ্যা	৭১	৪৮	৩৪

বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিম্নমানের হওয়ার ফলে যেসমস্ত সংস্থা নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মপ্রার্থীদের কাজ দিয়ে থাকেন, তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলিকে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। এজন্য আমেরিকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থাকে বছরে ৩২ বিলিয়নের বেশি ডলার ব্যয় করে নিজেদের কাজের জন্য কর্মী তৈরি করে নিতে হয়। অথচ কিণ্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কোন ব্যয় করতে হয় না। পাবলিক স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করে, কিন্তু সরকারি কোন খবরদারি থাকে না আমাদের দেশের মতো। প্রতি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ও শহরের জন্য একটি নির্বাচিত পরিচালন সংস্থা চারবছর অন্তর নির্বাচিত হয়। এই সংস্থাই বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও পরিচালনব্যবস্থা কিরকম হবে সেটি ঠিক করে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা থাকে। এখানকার বিদ্যালয়গুলির সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশের তুলনায় অভাবনীয়ভাবে বেশি। ছেলেদের বইপত্রও কিনতে হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান এমনই যে, এখানে কোন 'টিউটোরিয়াল হোম' বা 'প্রাইভেট টিউশন' প্রথা নেই। ছাত্রদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়, তাদের সেটি করে আনতে হয়। শিক্ষকদের বেতন গড়ে বার্ষিক ২৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০ ডলার। কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষক পাওয়া যায় না। কারণ, শিক্ষকতার বাইরে কাজের জন্য অনেক বেশি অর্থ পাওয়া যায়।

সরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলির জন্য এত ব্যয় করা সত্ত্বেও যে আশানুরূপ ফল হচ্ছে না, তার অনেক কারণের মধ্যে মূল কারণগুলি মনে হয় এরকম ঃ প্রথমত, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের একটা বড় অংশ বিদ্যালয়-ছুট হয়ে পড়ে। সারা আমেরিকায় এমন ছাত্রের গড় সংখ্যা হলো শতকরা ৩০। কোন কোন শহরে এটি ৫০ ভাগের মতোও আছে। এই বিদ্যালয়-ছুট হওয়ার কারণ হলো, একটা বয়সের পরে অনেক ক্ষেত্রেই এদের ওপরে অভিভাবকদের কোন প্রভাব থাকে না। তার জন্য একদিকে যেমন বাইরের জগতের সমবয়সীদের নানাধরনের প্রলোভন, তেমনি বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এবং বাড়িতে বাবা-মায়ের সান্নিধ্যের অভাব। বিদ্যালয় থেকে ৩টে নাগাদ ফিরে এসে ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে কাছে পায় না। তখন হয় তারা দরজা বন্ধ করে সারাক্ষণ টিভিতে নানা ধরনের ছবি দেখে অথবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাইরে চলে যায়; অনেক সময় বাবা-মায়েরা তাদের খোঁজও করে না। এর ফলে অনেক কিশোরী অল্পবয়সেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে। গর্ভবতী হলে বিদ্যালয়-ছুট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, আমেরিকায় প্রতি বছরে প্রায় ১০ লাখ কিশোরী গর্ভবতী হয় এবং তার মধ্যে প্রায় ৪ লাখ সন্তান প্রসব করে। এই সমস্যা সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এছাড়াও অবশ্য অল্পবয়সে বিদ্যালয়-ছুট হওয়ার পিছনে দারিদ্র্য একটা কারণ। যেহেতু এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা থাকলেও অনেক কাজ পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি প্রয়োজনে তাদের কর্মীদের নিজ খরচে তৈরি করে নেয়, সেজন্য কাজ পেতে তেমন অসুবিধা হয় না। এদেশে একদিকে যেমন পৃথিবীর উন্নততম শিক্ষাব্যবস্থা আছে —যার ফলে অসংখ্য বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ্ তৈরি হয়ে দেশে-বিদেশে তাদের প্রভাববিস্তার করতে পারছে, পাশাপাশি তেমনি শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ ছেলেমেয়ে এই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারছে না। এর জন্য যত না শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী পারিবারিক বন্ধনের অভাব।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রসঙ্গে

স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমেরিকার অগ্রগতি এককথায় অসামান্য। চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষণায় আমেরিকা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে অনেক এগিয়ে। এদেশে প্রায় ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্র আছে। এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে ছাত্রদের যে-পরিশ্রম করতে হয়, তার শতকরা ৫০ ভাগও যদি আমাদের দেশের ছাত্ররা করতে পারত, তাহলে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম। এই নিম্নমানের স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্যই আজকাল কোন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার আমাদের দেশ থেকে পাশ করে এসে এদেশে বা পাশ্চাত্যের কোন দেশেই ডাক্তারি করার সুযোগ পায় না। এখানে ডাক্তারি করতে গেলে নতুন করে লেখাপড়া করে পাশ করে তবেই ডাক্তারির সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে ছাত্রদের হাসপাতালে 'Internship' করার সময়ে একটানা ৩৬-৪৮ ঘণ্টা 'duty' করতে হয়। এইসময় যদি কোন ছাত্র ঢিলেমি দেখায়, তাহলে তার 'Registration' পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এদেশের 'Teaching' হাসপাতালগুলির ডাক্তারদের 'Clinical' কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণার কাজও করতে হয়। কোন অবস্থাতেই এরা 'Private practice' করতে পারে না এবং করেও না।

এদেশে উন্নত স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থা ও হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো 'স্বাস্থ্য বীমা' (health insurance) এবং বেশির ভাগ মানুষেরই এই ব্যবস্থা আছে। যাদের যথেষ্ট বীমা করা আছে, তাদের চিকিৎসার সমস্যা তত জটিল নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বীমা কোম্পানিগুলি, আইনব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা, ওষুধশিল্প (drug industry), চিকিৎসা-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প (Medical Instrument Complex) এবং সর্বোপরি ডাক্তারদের লোভ—সব মিলিয়ে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে। ভেষজশিল্প কিভাবে শোষণ করছে, তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে ১৯৯৯ সালের ১৮ আগস্টের 'USA Today' দৈনিক পত্রিকা থেকে।

মেয়েদের স্তন-ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য যে-ওষুধগুলি খুবই জরুরি, তার মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় আমেরিকা ও কানাডায়। একই পরিমাণ ও একই শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত ওষুধের মূল্য-তারতম্য খুবই বিস্ময়কর।

Drug	Dose Amounts	USA ($)	Canada ($)
Tamoxifen	10 mg. 60 Pilk Rx ills	156.42	12.80
Synthroid	5 mg. 100 Pilk Rx ills	22.68	8.14
Zocor	20 mg. 100 Pilk Rx. ills	366.27	191.45
Coumaden	1 mg. 100 Pilk Rx ills	56.52	30.72
Relafan	500 mg. 100 Pilk Rx. ills	115.45	63.61

পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার রোগীরা ওষুধ কেনার জন্য অনেক বেশি ব্যয় করে। এব্যাপারে অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান 'Prime Institute' একটি নমুনা তুলে ধরে দেখিয়েছে, আমেরিকার লোকেরা একই কোম্পানির তৈরি ওষুধ ও একই ডোজের জন্য কত বেশি ব্যয় করে। এতে দেখা যাচ্ছে, একই ওষুধ একই ডোজের জন্য যেখানে আমেরিকার নাগরিক দিচ্ছে ১ ডলার, জার্মানিতে দিতে হচ্ছে ৭১, সুইডেনে ৬৮, ইংল্যাণ্ডে ৬৫, কানাডা ৬৪, ফ্রান্সে ৫৭ এবং ইটালিতে ৫১ সেন্ট। গত বছর আমেরিকার ১০টি বড় ওষুধ কোম্পানি গড়ে ২.৫ বিলিয়ন লাভ করেছে, যা তার আগের বছরের চেয়ে শতকরা ২৬ ভাগ বেশি। একইভাবে যেসব কোম্পানি চিকিৎসার জন্য নানারকম যন্ত্র তৈরি করে, তারাও বেশি দামে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ফলে চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমেরিকার চিকিৎসাক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা হলো—ভুল চিকিৎসার ফলে রোগীর মৃত্যু হলে বা বড় কোন ক্ষতি হলে রোগীদের আত্মীয়রা আদালতের শরণাপন্ন হলে বিচারকগণ খুব বড় রকমের ক্ষতিপূরণের বোঝা ডাক্তারদের ওপর চাপাচ্ছেন। কখনো কখনো এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ বিলিয়নও ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে ডাক্তাররা 'Mal Practice' বীমা করেছেন। সেই বীমার প্রিমিয়াম আবার যথেষ্ট বেশি, ফলে চিকিৎসাব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে "Consumers' Court" কোথাও কোথাও রোগীর পক্ষে রায় দিচ্ছেন। তাই ডাক্তারদের সংগঠন তাদের 'ফি' প্রভৃতি বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কোন ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য নানারকম পরীক্ষা করাতে বলছেন—যার অনেকটাই দরকার না থাকলেও। এর ফলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হচ্ছে এবং তার জন্যও ব্যয় বাড়ছে। এসবের নীট ফল হলো—বীমা কোম্পানির প্রিমিয়াম বৃদ্ধি, যার ফলে অনেক নিম্নবিত্ত মানুষের বীমা করা সম্ভব হয় না। অনেকে মনে করেন, এদেশের প্রায় ৩৫-৪০ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষ বীমা করে না এবং প্রায় ৬০-৬৫ মিলিয়ন মানুষ পূর্ণাঙ্গ বীমা করাতে পারে না। যার অর্থ হলো, দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষই বীমাপ্রথার পূর্ণ সুযোগ নিতে না পারার ফলে অনেক সময়েই উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না। শুনেছি, আমেরিকার হাসপাতালের একটি দ্বিশয্যা-বিশিষ্ট ঘরের বেড-চার্জ ২০০ ডলারেরও বেশি। আমেরিকায় খুব কম হাসপাতালেই 'জেনারেল বেড' আছে।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা ভেবে, বিশেষ করে ৬৫ বছরের ওপর যাদের বয়স, তাদের জন্য 'Medicare' নামে একটি বীমাপ্রথা সরকার চালু করেন। এর ফলে বৃদ্ধদের উপকার হলেও ডাক্তাররা এখন আর মেডিকেয়ারের রোগীদের চিকিৎসা করতে চান না। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলির অন্তর্ভুক্ত রোগীদের চিকিৎসা করলে তাদের লাভ অনেক বেশি। আবার সরকার পক্ষও দেখছিলেন যে, মেডিকেয়ার কর্মসূচীর ফলে সরকারি ব্যয় চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এখন সরকারি ব্যয় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১১-১২%। এই ব্যয় যেকোন উন্নত দেশের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ইংল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে মোটেও উন্নত নয়। এবিষয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রচুর জলঘোলা হয়েছিল, এখনো হচ্ছে।

কালো মানুষের সমস্যা

আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারের কথা বললেও সেদেশে এখনো অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে। এদেশের বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষই আফ্রিকান —যারা একসময় ক্রীতদাস হয়ে এসে এদেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের

বিষয়, বর্তমান শতাব্দীর ছয়ের দশক অবধি এরা বিশেষ কোন উন্নতি করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল, সাদারা এদের সবসময় আলাদা করে রাখত। উভয়ের মধ্যে খেলা, মেলামেশা ছিল বর্জনীয়। এই অপমান থেকে কালোদের মুক্তি দেন মার্টিন লুথার কিং বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে। ষাটের দশকে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত আমেরিকা সরকার কোনরকম 'segregation'-কে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেন। তারপর থেকে কালোদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন অনেক কালো আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হওয়ার সুযোগ করে নিতে পেরেছে। কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি করা ছাড়াও তারা রাজনীতিতে ভালরকম ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও এখনো কালো আমেরিকানরা সাদাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। যেকোন শহরের দরিদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীই হলো কালো আমেরিকান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা এখনো অনেক পিছিয়ে। বিদ্যালয়-ছুটদের একটা বড় অংশই কালোরা। তবে তাদের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু কালো ছেলে যোগদান করায় হোমফ্রন্টে মেয়েরা শিক্ষায় এগিয়ে যায়। আমেরিকায় এমনিতেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের দেশে এর বিপরীত। তাই আমাদের দেশে লেখাপড়ায় সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত, যদিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। যাই হোক, আমেরিকার কালো মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার ফলে এদের বিবাহের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে। কেননা অনেক সময়ই এদের সমকক্ষ শিক্ষিত ছেলে না পাওয়ায় বিবাহ করা হয়ে উঠছে না। যদিও সাদা-কালো বিবাহ হচ্ছে, তবুও এদের মধ্যে খুব বেশি খোলামেলা মিশতে এখনো দেখা যায় না, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে। মার্টিন লুথারের আন্দোলনের ফলে কালোদের মধ্যে যে-পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল, তার গতি যেন এখন অনেকটা শ্লথ হয়ে আসছে। যদিও আইনের বাধা নেই, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোথাও একটা অভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা কালো আফ্রিকানদের 'identity crisis' বলেও ভাবা যেতে পারে। যেকোন দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এটি হতে পারে। বর্তমানে কালো আমেরিকানরা একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে আজ সেই 'identity'-রই সন্ধান করছে বলে মনে হয়।

আমেরিকানদের পারিবারিক অবস্থান ও অপরাধপ্রবণতা

মানব-সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার—এই দুটি ব্যাপারেরই বিরাট ভূমিকা আছে। একটি শিশুর জন্ম ও তার প্রতিপালনকে কেন্দ্র করে এই দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে দুটিরই অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে—বিশেষ করে তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন, সভ্যতার আদিম স্তরে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সন্তানের জন্ম দিলেও অনেক সময়ই পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে থাকত না। ধীরে ধীরে নবজাতকের কল্যাণের লক্ষ্যেই 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠল, যদিও সেটি বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। আবার এর থেকেই জন্ম হলো 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানের—যেখানে পিতামাতা ছাড়াও আরো অনেকে বসবাস করতে লাগল। জন্ম নিল যৌথ পরিবার, তা থেকে আবার অনেকগুলি পরিবারকে কেন্দ্র করে গঠিত হলো গ্রাম বা সমাজ। অর্থাৎ শিশুকে কেন্দ্র করেই রূপ নিল মানব-সভ্যতা বিকাশের তিনটি মূল প্রতিষ্ঠান—বিবাহ, পরিবার এবং গ্রাম বা গোষ্ঠী জীবন। সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন মানব-সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের যন্ত্র-সভ্যতা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এমন সব পরিবর্তন আসতে লাগল, যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে শুরু করেছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা ছাড়াই এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব নিয়মকানুনের মধ্য দিয়েই আত্মনিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা এই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর এমন আঘাত হানতে লাগল যে, এখন তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কট এদেশে যতখানি প্রত্যক্ষ করা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে বোধহয় ততটা নয়। অবশ্য এই সঙ্কট কমবেশি সমস্ত উন্নত দেশেই দেখা দিয়েছে। এমনকি আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, এমনকি ছোট ছোট পরিবারেও তথাকথিত উন্নত দেশের সঙ্কট অনুভূত হতে শুরু করেছে।

আমেরিকায় ১৯৭০ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বিবাহের হার ৩৫% কমে গিয়েছে। বর্তমানে হয়তো এই হার আরো বেড়ে গিয়েছে। এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল শিকাগো ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং আমেরিকান সরকারের আর্থিক সাহায্যে—যাকে 'National Marriage Profiles'ও বলা হয়। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক পোপেনোই বলেছেন: "That Marriage is a weakening institution. There are not too many signs of optimism. Because marriage is so central to the family and the family is so central to society, we should be

talking about and finding ways to help people, especially young people to have stronger marriage.... The major thing that's going on here is that people are delaying marriage. And societies where marriages begin to be delayed, the actual marriage rate also begins to drop. People wait too long. Then they just give up. They don't marry. Or they live together outside marriage. You have a tremendous growth in non-marital cohabitation, and that begins to signal people that may be, we don't really need marriage. The break-up rate of cohabitating partners is far, far higher than marriage partners." ('Detroit Free Press', 11 August 1999)

এই রিপোর্ট থেকে একটা বিষয় বোঝা যায় যে, একাধিক ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা বা একসঙ্গে থাকাকে এখানে 'cohabitation' বলে। আবার অন্যদিকে আদর্শ বিবাহ কি হতে পারে তার নিদর্শন যুবক-যুবতীরা সংসারে দেখতে পায় না, বরং তার উল্টোটাই দেখে। আমেরিকায় যুবসমাজের মধ্যে যে অপরাধপ্রবণতার চিত্র আমরা দেখতে পাই, তার অন্যতম প্রধান কারণ—তাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। ১৯৭৪ সালে মোট ২০,৬০০টি খুনের এক-চতুর্থাংশ পারিবারিক কলহের পরিণতিতে। প্রতি ৫ জন নিহত পুলিশের একজন পারিবারিক কলহ থামাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। বাবা-মায়ের হাতে শিশু খুনের সংখ্যা ৭০০। আবার আশ্চর্যের বিষয়, একটা বড় অংশের খুনি হলো গর্ভধারিণী মা। প্রতি বছর ৩,০০০ ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায় আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, যাদের বয়স ১৪-১৫ বছর। আমেরিকার অপরাধ-জগৎ সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই ধারণা আছে। একদিকে দরিদ্র আমেরিকান, বিশেষ করে অ্যাফ্রো-আমেরিকান ছেলেমেয়েরা যেমন আছে, অপরদিকে তেমনি আছে মধ্য ও উচ্চ বিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও। বাপ-মায়ের বিতাড়িত বহু ছেলেমেয়েই, শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, দেহ বিক্রয় করে বেঁচে থাকে। এদের অনেকে আবার মাদকদ্রব্যের প্রতিও আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এদেশে এত বেড়ে গিয়েছে যে, আজকাল পার্টিতে মদের পরিবর্তে কোকেনের গুঁড়োও ট্রেতে সাজিয়ে রাখা হয়!

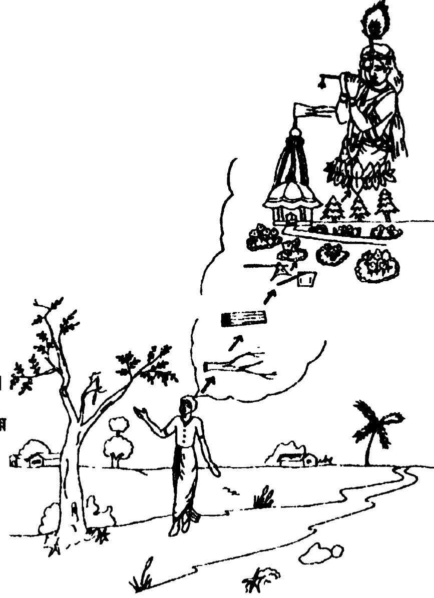
আমেরিকার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক কারণের মধ্যে একটা মূল কারণ হলো বিবাহ ও পারিবারিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়। ভারতীয় ধারণায় মূলত বিবাহ শুধু একজন পুরুষ ও মহিলার মিলন নয়—এটি দুই পরিবারের মিলনও। এই কারণে আমাদের দেশে আগে গুরুত্ব দেওয়া হতো পরিবার-দুটি কেমন, তার ওপর—শুধু ছেলেমেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নয়। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই প্রথা ক্রমেই শিথিল হচ্ছে। আমেরিকায় তো কথাই নেই! শুধু পরিবার নয়, কোন্ গ্রাম বা অঞ্চলের ছেলেমেয়ে—সেটিও একটি বিচার্য বিষয় ছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত সন্ন্যাসী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী প্রায়ই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে 'Home University'র কথা বলতেন। তখন এর গুরুত্ব কতজন বুঝেছেন তা জানি না, কিন্তু বর্তমানে সকলেই বুঝতে পারছেন। আমেরিকাতেও বর্তমানে 'Family Life Education' নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে।

স্বামীজী যখন এদেশে এসেছিলেন, তখনি তিনি পাশ্চাত্য জগতের অবস্থান দেখে বলেছিলেন—এরা একটা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে; যেকোন সময় অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। ঋষিবাক্য ব্যর্থ হওয়ার নয়—একটু গভীরভাবে ভাবলেই অনুধাবন করা যায়। আজকাল আমাদের দেশেও মূল্যবোধের শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের ভাবা প্রয়োজন, মূল্যবোধের অবক্ষয় কেন হচ্ছে? এসবের জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংঘাত প্রভৃতি দায়ী, কিন্তু পারিবারিক মূল্যবোধের অভাবও কিছু কম দায়ী নয়। স্বামীজী একারণেই বলেছিলেন, আমাদের দেশেরও পাশ্চাত্য দেশের মানুষদের কিছু দেওয়ার আছে। তা হলো বেদান্তের উচ্চ আদর্শ—শুধু ভোগ নয়, ত্যাগেরও দরকার। এই প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তকেন্দ্রগুলি এদেশে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদেশের বিদ্বজ্জন ক্রমে এবিষয়ে অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পারছেন। আজকাল আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে আমেরিকায় আসছে নানা উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাদের অনেকেই এদেশের আবহাওয়ায় পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকানদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য বলছে, তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে আরো বেশি সংযম ও আদর্শনিষ্ঠা দেখতে পেলে খুশি হবে, যদিও অপেক্ষাকৃতভাবে ভারতীয় ছাত্ররা অন্যান্য দেশ থেকে আগত ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ—একথাও অনেকে বলেন। এই কারণে ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষ করে এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমরা এদেশের বাইরের চাকচিক্য দেখে যেন মনে না করি, এখানকার সবকিছুই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। বরং স্বামীজীর কথাই এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে—এদের যেটা ভাল তা অবশ্যই গ্রহণ করব, আবার যেটি ভাল নয় সেটি বর্জন করব। তবেই আমরা আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ শিখতে পারব। ❑

বাবলা গাছ দেখে

এক ভক্ত বাবলাগাছ দেখেই ভাবাবিষ্ট,
গাছটি দেখে তাঁর মনেতে উদ্ভাসিত ইষ্ট।
রাধাকান্তের ফুলবাগিচা পড়ল মনে তাঁর যে,
ঐ বাগানের কুড়ুলখানির বাঁট তৈরির কার্যে
বাবলাডালের হয় প্রয়োজন—এই ভাবনায় ভক্ত
রাধাকান্ত-চিন্তনে হন বিভোর, অনুরক্ত।
ঠাকুর বলেন, মেঘ-নীলাকাশ কিংবা ময়ূরপুচ্ছ
দেখলে রাধার কৃষ্ণ ছাড়া সব ভাবনাই তুচ্ছ।
ঠিক তেমনই দেখলে দেউল তাঁকেই মনে পড়বে,
পবিত্র এক উদ্দীপনে মনটি তোমার ভরবে।
যাও যদি গো তীর্থে,
তাঁর ভাবনার কেন্দ্র থেকে চাইবে না মন ফিরতে।

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়



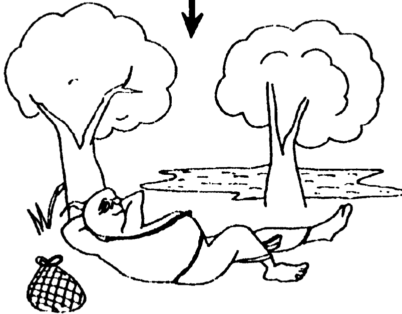
ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি
এম. ডি. বি. ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

সাড়া নাই

নিমন্ত্রণের ভোজের আসরে
শুরুতে বেদম শব্দ,
পাতে লুচি-টুচি পড়ার সাথেই
শব্দ অনেক জব্দ।
মণ্ডা-মিঠাই পড়লে তখন
শব্দটা আরো চুপ,
দই পাতে এলে তখন কেবল
আওয়াজটি সুপ্‌-সুপ্‌।
ভরপেট খাওয়া চুকে-বুকে গেলে
তখন ঘুমিয়ে যাই,
ঠিক তেমনই গো, ঈশ্বরলাভ
হলে আর সাড়া নাই।

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়





ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল
ঐ

আদি শঙ্করাচার্য ৩০



নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে দুটি সভার আয়োজন করা হলো। আচার্য শঙ্কর যোগবলে উভয় সভাতেই উপস্থিত হলেন।





উভয় সভার ফল প্রকাশ হলে সকলে চমকে গেল। আচার্য দুটি সভাতেই নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তর্কে জয়লাভ করেছেন। অতঃপর আচার্য শঙ্করের প্রণীত 'শঙ্কর-স্মৃতি' সমাজে বলবৎ করলেন রাজা রাজশেখর।

মুগ্ধ ও অভিভূত রাজা রাজশেখর আচার্য শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। কয়েকদিন পর—



রাজার নিযুক্ত লিপিকারের সামনে আচার্য শঙ্কর ঐ তিনখানি নাটক পর পর বলে গেলেন। তিনটি নাটক লেখা শেষ হলো।



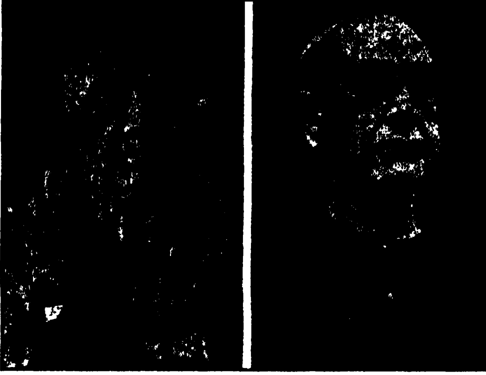


ভারতবর্ষে বেদান্ত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আচার্য শঙ্কর আবার যাত্রা করলেন। এককাল জগতে যত ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে—সবই রাজশক্তির সহায়তায়, ভয় দেখিয়ে, বাধ্য করে। কিন্তু বেদান্ত-পতাকা হাতে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী শঙ্করের এই যাত্রায় উচ্চারিত হলো বেদধ্বনি, দেবদেবীর বন্দনাগান। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নরনারীগণ তাঁর যাত্রাপথে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দেবতা-জ্ঞানে বরণ করে নিল।

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

স্মৃতির আলোয় স্বামীজীর ভ্রাতৃদ্বয়

নিশিকান্ত সরদার*



মহেন্দ্রনাথ দত্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৫২ সাল। আমার ভগিনীপতি হীরালাল বিশ্বাস একদিন আমাকে বলল: "দাদা, তুমি মহাপুরুষ দেখতে যাবে?"

আমি বললাম: "কিরকম মহাপুরুষ?"

সে বলল: "তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখেছেন। স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত।"

"হ্যাঁ যাব। কবে যাবে?"

"চল, কালই যাই।"

পরদিন দুজনে চললাম মহাপুরুষ দর্শনে। বেলা ১০টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছালাম ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি লেনে 'ভুবনেশ্বরী ভবন'-এ। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই দুপাশে দুটি ঘর। ডানদিকের ঘরে থাকেন মহেন্দ্রনাথ এবং বাঁদিকের ঘরে স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। আমরা প্রথমে ডানদিকের ঘরের দরজার কাছে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পরে জেনেছি, তিনি মহেন্দ্রবাবুর সেবক ধীরেন্দ্রনাথ বসু। তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম: "আচ্ছা, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কি দেখা হবে?" তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি। ২৪ পরগনার রাজারহাট থেকে আসছি শুনে তিনি "আচ্ছা এস" বলে ঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে দেখি যেন একজন বিরাট শিব-পুরুষ শুয়ে আছেন। ঠিক শিবের মতোই তাঁর গায়ের রং। আমরা যেতেই তিনি উঠে বসলেন, বললেন: "ওরে আয়রে, আয়।" আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে কোলে করে তাঁর নিজের বুকে চেপে ধরলেন এবং আদর করে আবার বললেন: "ওরে আয়রে, আয়।" তাঁর সে কী চেহারা! বড় বড় দুটি চোখ, মাথার ওপর একটি আব। যেন স্বয়ং শিবঠাকুর!

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কোথা থেকে এলি?"

আমাদের গ্রামের নাম শুনে বললেন: "হ্যাঁ পাড়াগাঁ। হ্যাঁরে তোদের নারকেল গাছ আছে?"

আমি বললাম: "হ্যাঁ, আছে।"

"ধানচাষ হয়?"

"হ্যাঁ, হয়।"

"তবে ঝুনো নারকেল আর মুড়ি ভেজে নিয়ে আসবি। মিষ্টি আনবি না, বুঝলি। এখানে কলকাতার অনেক ভক্ত আসে। সঙ্গে অনেক মিষ্টি আনে। তুই আনবি নারকেল-মুড়ি। আমার কলকাতার ভক্তরা খেয়ে আনন্দ পাবে। তোর মাকে মুড়ি ভেজে দিতে বলবি।"

"আচ্ছা, তাই আনব।"

তার কয়েকদিন পর আমি নারকেল-মুড়ি নিয়ে মাকেও সঙ্গে করে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই তিনি "কিরে, আয় আয়" বলেই আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরলেন।

আমার সে যে কী আনন্দ হচ্ছিল তা বলতে পারি না! তাঁর ভালবাসা মুখে বলা যায় না। তিনি যেন ভালবাসার মূর্তি! তাঁর কাছে যে-ভালবাসা পেয়েছি সেকথা স্মরণে এলে চোখে জল আসে আর বারবার তাঁর চরণে প্রণাম জানাই।

আমি তাঁকে বললাম: "বাবা, আপনি তো রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছেন।"

তিনি বললেন: "ওরে, তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন, অনেক কথা বলতেন। অনেকসময় বৈঠকখানায় কথাবার্তা শেষ হলে পরমহংসমশাই দক্ষিণদিকের ছোট উঠোনটিতে গিয়ে কীর্তন করতেন। সেইসময় দেখতাম, পরমহংসমশাই তাঁর কোঁচার কাপড়টি ফেটি করে কোমরে গাঁট দিয়ে বাঁধতেন। জামাটি গায়ে থাকত, আবার কখনো কাপড়টি তিনি কোঁচা দিয়ে রাখতেন। কখনো বা কোঁচাটি খুলে লম্বা করে চাদরের মতো কাঁধে ফেলে রাখতেন। তিনি উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটিতে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। রামদাদা প্রায়ই তাঁর ডানদিকে আর মনমোহনদাদা বাঁদিকে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতেন। রামদাদা ও মনমোহনদাদা প্রথমে কীর্তনের গান আরম্ভ করতেন। কীর্তনে খোল-করতাল বাজত না। একদিনকার কীর্তনের

* কাশীপুর-নিবাসী, বয়স ৭০

গান একটু স্মরণে আছে। গানটি হলো—'হরি বলে আমার গৌর নাচে, নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে...।' রামদাদা ও মনমোহনদাদা কীর্তনের গান আরম্ভ করলে পরমহংসমশাই মৃদুস্বরে সামান্য কীর্তন গাইতেন এবং মাঝে মাঝে করতালি দিতেন।" গানের কলি এইটুকুই আমার স্মরণে আছে, আর কিছু স্মরণে নেই।

এর কয়েকদিন পর আমি, আমার মেজ বোন অর্চিতা ও ভগিনীপতি গিয়েছি পদ্মফুল ও ধানের শিষ নিয়ে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন : "কী নিয়ে এসেছিস?"

আমি বললাম : "পদ্মফুল ও ধানের শিষ এনেছি। আপনার ঘরখানি সাজাব।"

তারপর ধানের শিষের মালা করে মাঝে মাঝে পদ্মফুল দিয়ে সারা ঘরখানি সাজালাম। সে যে কী সুন্দর হলো!

মহেন্দ্রবাবু দেখে খুব খুশি হলেন, সেবককে বললেন : "ও ধীরেন, এরা সবাই খেয়ে যাবে।"

তিনি আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরব মনে করছি, এমন সময় ভূপেন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে বললেন : "এই শোন, এখানে ঘন ঘন আসিস কেন রে?"

আমি বললাম : "এনার কাছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা শুনতে ভাল লাগে, তাই আসি।" তিনি বললেন : "দেশের কাজ করবি তো আমার সঙ্গে আয়।" এই বলে তিনি আরো বললেন : "কাল খুব সকালে আসবি। আসবি তো?"

আমি "হ্যাঁ, আসব" বলে সেদিন বিদায় নিলাম।

পরদিন খুব সকালে গিয়ে হাজির হয়েছি। আমাকে দেখে ভূপেন্দ্রবাবু বললেন : "যা, এই চিঠিটা নিয়ে গোখেল রোডে যা, সব বলা আছে।" আমি সেই চিঠি নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। গোখেল রোডে গিয়ে দেখি, বহু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং একজন ডাক্তারবাবু বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : "কোথা থেকে আসছ?" আমি ভূপেনবাবুর চিঠিটি তাঁকে দিলাম। সেটি দেখে তিনি বললেন : "তা বেশ। তুমি কাল ৯টার সময় এখানে আসবে। তোমার পরীক্ষা হবে।" পরদিন আমি ৯টার সময় সেখানে হাজির হলাম। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হলো। পরীক্ষায় পাশ করলাম। আমার খুব আনন্দ হলো। ডাক্তারবাবু বললেন : "তোমাকে হায়দরাবাদ যেতে হবে। সেখানে ট্রেনিং নিতে হবে। তোমার নেভিতে কাজ হবে।" আমি তখন "মাকে বলে আসি" বলে সেদিন বিদায় নিলাম।

আরেকদিন মহেন্দ্রবাবুর কাছে গেছি। প্রণাম করে বললাম : "আপনি পরমহংসদেবের কথা কিছু বলুন।"

তিনি বললেন : "পরমহংসদেব মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন ও 'নরেন, নরেন' বলে ডাকতেন। কোন ভক্তের বাড়ি যাওয়ার জন্য একদিন ঘোড়ার গাড়ি করে এসেছেন। 'নরেন, নরেন' বলে ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি এসে দেখি, ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছেন। আমি বললাম, 'দাদা বাইরে গেছে।' ঠাকুর বললেন, 'তাহলে তুই-ই আয়, রামের বাড়ি যাচ্ছি, তুইও যাবি।' এই বলে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তারপর আবার আমাকে বললেন, 'যা, তোর মাকে বলে আয়, রামদাদার বাড়ি যাচ্ছি। দাদা (নরেন) এলে যেন সে সেখানে যায়। সে গাইতে বাজাতে সব জানে, গেলে ভাল জমবে।' তারপর দাদা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি রামদাদার বাড়িতে হাজির হলো। আসর ভাল জমল, গান-বাজনা হলো, খুব আনন্দ হলো।"

আরেকদিনের কথা। আমি সেদিন খুব সকালে গেছি। মহেন্দ্রবাবু শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে তাঁর সেবক ধীরেন্দ্রনাথ বললেন : "তুমি বেলুড় মঠে গেছ?" আমি বললাম : "হ্যাঁ, গেছি।" তিনি বললেন : "তোমাকে আজ বেলুড় মঠে যেতে হবে।" এই বলে একটি বই আমার হাতে দিলেন। সেটি 'দেশ' পত্রিকা। তাতে রয়েছে মহেন্দ্রবাবুর লেখা একটি কবিতা—'স্বামীজীর জন্মভিটা'। বইখানি বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দ মহারাজকে দিতে হবে।

আমি যথাসময়ে বেলুড় মঠে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি থাকেন স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের পশ্চিমদিকের দোতলার ঘরে—প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালে। আমি সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে আসছি। আমি স্বামীজীর বাড়ি থেকে আসছি বলে পত্রিকাটি এবং তার সঙ্গে একটি চিঠি ছিল, সেটিও তাঁকে দিলাম। তিনি পত্রিকাটি খুলে মহেন্দ্রবাবুর কবিতাটি পড়ে বললেন : "বেশ ভাল হয়েছে।" তিনি আমাকে প্রসাদ পেয়ে যাওয়ার জন্য বললেন এবং পূজ্যপাদ ভরত মহারাজজীর (স্বামী অভয়ানন্দজী) কাছে পাঠালেন। মহারাজজীকে প্রণাম করতে তিনি বললেন : "সূয্যি মহারাজকে প্রণাম করে এস, তারপর প্রসাদ পেয়ে যাবে।" আমি সূর্য মহারাজকে (স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ) প্রণাম করে প্রসাদ পেয়ে সিমলায় ফিরে এলাম। এসে ধীরেনদার সঙ্গে দেখা করে মহেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি বসে আছেন। তাঁর কাছে আরো তিনজন বসে আছেন—প্যারিমোহন মুখার্জি, মহেন্দ্রবাবুর ভাগনে কানাইবাবু এবং গোপাল নামে মহেন্দ্রবাবুর এক ভাগনের ছেলে। আমি তাঁদের সকলকে আমার অন্তরের ভালবাসা জানিয়ে এবং মহেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করে সেদিন বিদায় নিই। ❑

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানালোকে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ

অসীম মিত্র

বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞা ছিলেন, কিন্তু কাত্যায়নী ছিলেন স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। সেহেতু তিনি তাঁর সম্পত্তি দুজনকে ভাগ করে দিতে মনস্থ করলেন। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেনঃ পার্থিব সম্পদ দ্বারা কি অমৃতত্বলাভ করা যায়? যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ করা যায় না, তা আমার প্রয়োজন নেই। আপনি অমৃতত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যা জানেন, তা আমায় বলুন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত হয়ে বললেনঃ তুমি প্রিয়া ছিলে, এখন প্রিয়তমা হলে। আমি ব্যাখ্যা করছি, তুমি মন দিয়ে শ্রবণ কর। আত্মপ্রীতির জন্য সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। কিন্তু জাগতিক বস্তু কি আত্মা থেকে পৃথক বস্তু এবং আত্মা কি তাদের অতিরিক্ত কিছু? অধিকাংশ ব্যক্তি, এমনকি অপরাবিদ্যায় অনুরক্ত পণ্ডিতও এমন মনে করেন। সুতরাং এই আত্মাকে সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ, মনন, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা জানতে হবে। আত্মা মহান, কোন ক্ষুদ্র বস্তু নয়। ক্ষুদ্র বস্তু প্রিয় হয় না, ভ্রমবশত অনেকেই আত্মাকে পৃথক বস্তু বা অতিরিক্ত অন্য কিছু মনে করে। হে মৈত্রেয়ী, শ্রবণ, মনন, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানতে হবে; সহস্রপ্রকার বস্তু আত্মার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, যারা এরকম প্রয়াস করে অর্থাৎ আত্মাকে ছেড়ে ভিন্ন বস্তুতে মনঃসংযোগ করে—আত্মা তাদের বঞ্চিত করেন, আত্মা তাদের পরিত্যাগ করেন। তাদের কাছে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। যে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, ব্রাহ্মণ জাতি তাকে পরিত্যাগ করে। যে-ব্যক্তি ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাকে ত্যাগ করে। যে-ব্যক্তি সমুদয় বস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক জ্ঞান করে, সমুদয় বস্তু তাকে ত্যাগ করে। এই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, সমুদয় বস্তু এবং এই ভূতসমূহ—সমস্তই আত্মা।

আত্মার সর্বব্যাপিত্ব দেখানো ছাড়া এই দৃষ্টান্তের আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে সর্বদাই থাকেন সত্য, কিন্তু ব্যষ্টিরূপে সসীমরূপে আত্মার যে-প্রকাশ—যাকে আমরা 'জীবাত্মা' বলি—তা অস্থায়ী। আত্মা বিজ্ঞানময় বটে, কিন্তু সেই বিজ্ঞান সাধারণ অভেদ বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ী ভেদশূন্য বিজ্ঞান; জড়বিজ্ঞানের মতো বিশেষ বিজ্ঞান নয়, বিষয়-বিষয়ী ভেদযুক্ত বিজ্ঞান নয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, (এই মহান আত্মা) এই সমস্ত ভূত থেকে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হয়ে এই সমস্তই বিনাশ হয়। মৃত্যুর পর আর কোন সংজ্ঞা থাকে না।

এই শিক্ষাতে মৈত্রেয়ী যে বিস্মিত হবেন, এটি তাঁর অবোধ্য হবে—তা বিচিত্র নয়। তাই তিনি বলছেনঃ মৃত্যুর পর কোন সংজ্ঞা থাকবে না—এটি বলে আপনি আমায় মোহগ্রস্ত করলেন। আমি এটি বুঝতে পারছি না। যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ আমি তোমায় কোন মোহজনক বাক্য বলিনি। বিজ্ঞানলাভের জন্য এটিই পর্যাপ্ত। এই আত্মা অবিনাশী উচ্ছেদবিহীন। জীবদ্দশায় আমাদের বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ভেদ থাকে; কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তা থাকে না। সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানক্রিয়ার যে বিচিত্র জগৎ প্রতীয়মান হয়, যার মূল জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ—তা তখন থাকে না। বিষয়ের সঙ্গে প্রভেদবশতই বিষয়ী জ্ঞানগোচর হন। জ্ঞেয়ের সঙ্গে ভেদই জ্ঞাতাকে জানার উপায়। যে-অবস্থায় বিষয়-জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকে—সে-অবস্থায় আত্মা কিভাবে জ্ঞানগোচর হবে? যে-স্থলে (মনে হয়) দ্বিতীয় বস্তু আছে, সে-স্থানে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে শ্রবণ, মনন, দর্শন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন জ্ঞানীর কাছে সমুদয়ই আত্মা হয়ে যায়, তখন কিভাবে কেমন করে কার দ্বারা কাকে আঘ্রাণ করবে, কার দ্বারা শ্রবণ-মননাদি করবে?

ফলত জ্ঞান ব্যাপারকে যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্লেষণ করেছেন বটে, কিন্তু এই বিশ্লেষণে তিনি জ্ঞানের উপাদানগুলিরই ভেদ দেখিয়েছেন, অভেদের দিকটা অথবা ভেদের মধ্যে যে অভেদ—ভেদাভেদ, সে-দিকটা সম্যগ্‌রূপে দেখাননি। দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান ব্যাপারে দ্রষ্টা-দৃষ্ট, শ্রোতৃ-শ্রুত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়—এরূপ দুটি বস্তু-সম্বন্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধই সাধারণ জ্ঞানের মূল ভাব, সম্বন্ধ ছেড়ে দিলে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব থাকে না। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয়, এই সম্বন্ধের একদিকে স্থায়ী বিজ্ঞাতা, অপরদিকে অস্থায়ী বিজ্ঞান মাত্র।

এই বিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের মতো বিশেষ বিজ্ঞান নয়। এর একদিকে অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা, অপরদিকে সসীম জীবাত্মা—যার কাছে পরমাত্মা নিজ স্বরূপ জ্ঞান-ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, অসীম-সসীম সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হলে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব থাকে না। জ্ঞান না থাকলে আত্মা থাকে না।

সুতরাং জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ, জ্ঞানকে অবলম্বন করেই ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মলক্ষণ অবস্থান করে। জ্ঞান, প্রেম, কর্মশক্তি প্রভৃতিতেই আত্মার মাহাত্ম্য। এসমস্ত লক্ষণবিহীন 'আত্মা' যদি অনন্ত কাল অবস্থান করে, তার কোন মূল্য নেই। যেসমস্ত লক্ষণে আত্মার মূল্যবত্তা প্রকাশিত হয়, তাকেই আমরা 'অমৃতত্ব' নামে আখ্যায়িত করতে পারি।

জ্ঞানের গোটা বিষয় অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান নয়। প্রত্যেক জ্ঞান ব্যাপারে জীবাত্মার—নিজ অন্তরাত্মা-রূপে বিশ্বাত্মাকে জানে। সর্ববিষয়াশ্রয়ো বিশ্বরূপ পরমাত্মাই বিশ্বাত্মা। সুতরাং আমাদের সামনে যাকিছু আসে তা বিশ্বাত্মার অংশ-রূপেই আসে। যখন সেই বিষয় তিরোহিত হয়, তা বিশ্বাত্মার আংশিক রূপেই তিরোহিত হয়; আবার যখন আবির্ভাব হয়, তখন আংশিক রূপেই ফিরে আসে। সুতরাং জীবাত্মার নিকট তাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব অস্থায়ী। পরমাত্মা-জ্ঞানে তারা চিরস্থায়ী, তাঁর চিন্ময়রূপে তারা পারমার্থিক। এই আংশিক রূপে বিষয় যে স্থায়ী, আমরা প্রত্যেক স্মৃতি ব্যাপারে তার পরিচয় পাই। যাকিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের পূর্বদৃষ্ট, পূর্বচিন্তিত (pre-thought)। স্মৃতির আকারে আমাদের সামনে যা আসে তা নতুন বিজ্ঞান নয়, পুরনো বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব। আর এই পুরনো বিজ্ঞান যদি বিনাশপ্রাপ্ত হতো, স্থায়ী নিত্য আত্মাতে না থাকত; তবে এটাই সেই পুরনো বিজ্ঞান—এরূপ ধারণা অসম্ভব হতো। পুরুষ অনুমেয় নয়, আমাদের সাক্ষাৎ অন্তরাত্মারূপী নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাতেই বিজ্ঞানসমূহ স্থায়িভাবে বর্তমান থাকে আর আমরা তাদের পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি এবং বলি, এইসকল পূর্বদৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়। আত্মার স্বরূপ নিয়েই তাদের আবির্ভাব। বস্তুত, যে নিত্য জ্ঞানময় আত্মা ঐসকল বিজ্ঞান নিয়ে পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই আত্মাই পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন। জ্ঞান, স্মৃতি, বিস্মৃতি তাঁরই আবির্ভাব ও তিরোভাব।

'আমরা ব্রহ্মিষ্ঠ' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ—এই ব্যাখ্যায় আসার জন্য জনকরাজার যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হওয়া। রাজর্ষী জনক একসহস্র গাভি যজ্ঞভূমিতে অবরুদ্ধ করে প্রত্যেক গাভির শৃঙ্গে দশ পদ স্বর্ণ বেঁধে রেখেছেন। যিনি সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনিই গাভিসমেত ঐসব স্বর্ণের অধিকারী হবেন। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য বেদজ্ঞ মহাপুরুষ উক্ত যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন, কিন্তু কেউই গাভিগুলি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত হলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য যখন দেখলেন, কেউ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলেন না, তখন তিনি তাঁর শিষ্যকে গাভিগুলি তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। স্বভাবতই উপস্থিত সকলে রাগান্বিত হলেন। রাজার প্রধান হোতা পুরোহিত অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেনঃ তুমিই কি ব্রহ্মিষ্ঠ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ আমি 'গোকাম' অর্থাৎ গাভি ভালবাসি। প্রকারান্তরে তিনি নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বললেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে যাজ্ঞবল্ক্য যেন বললেনঃ আপনারা আমায় পরীক্ষা করুন। অশ্বল তা করলেন। অন্য ঋষিগণ করলেন। উপস্থিত মহিলা ঋষি সম্ভবত গার্গী বাচক্নবী অর্থাৎ বচক্নুকন্যা—তিনিও পরীক্ষা করলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করব।

অতঃপর গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেনঃ কিসে সমুদয় ওতপ্রোত? নানা সসীম বস্তুর নাম করে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ ব্রহ্মলোকেই সমুদয় লোক ওতপ্রোত। গার্গী পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ এই প্রশ্ন 'অতি প্রশ্ন' অর্থাৎ অনুচিত।

এরপর গার্গী একই প্রশ্ন দুভাগে করে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষত্রিয় যুবাদের প্রাণঘাতী বাণদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করে ভাবলেন এবার যাজ্ঞবল্ক্য ঘায়েল হবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য এবং এতে ব্রাহ্মণগণ নিরস্ত হলেন। এরপর গার্গী প্রশ্ন করেছিলেন—কিসে সমুদয় ওতপ্রোতভাবে বর্তমান? সমুদয় বস্তু আকাশে বর্তমান, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর 'আকাশ'। আকাশ কোন নিরপেক্ষ বস্তু নয়, স্বতন্ত্র বস্তু নয়—বৃহত্তর বস্তুর আশ্রিত, যার থেকে আর বৃহত্তর বস্তু নেই। সেই বৃহত্তর বস্তুই স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বয়ম্ভু। গার্গীর মনে প্রশ্ন উঠলঃ আকাশ কিসে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান? যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ অক্ষরপুরুষে এবং তিনি সেই অক্ষরপুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক লক্ষণ দুই-ই বর্ণনা করলেন। রূপ-রসাদি সসীম বস্তুর দ্বারা তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করলে তাঁর স্বরূপের প্রকৃতি বর্ণনা হয় না, তাঁর অনন্তত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমুদয়কে তাঁর আশ্রিত ও অন্তর্গত বলে ধারণা করতে হবে। তাঁর অনন্তত্বের বাইরে আর কিছু থাকতে পারে না। এই লক্ষণ তাঁর জ্ঞাতৃত্ব, তাঁর জ্ঞান। জ্ঞানের বাইরে আর কিছুই থাকতে পারে না। জ্ঞানই অসীম। যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ অক্ষরপুরুষ অন্তর-রহিত, বাহির-রহিত। আকাশের খণ্ডত্ব প্রকৃতপক্ষে অনন্ত বলেই প্রতীয়মান হয়। এটাও জ্ঞানের অধীন। আকাশকে বড় বলে মনে হলেও জ্ঞানের অধীন বলে মনে করতে হবে। এই জ্ঞানকেই অনন্ত ভূমা বলে মানতে হবে। জ্ঞানরূপী অনন্ত বা ভূমা বহু সসীমের সমষ্টি নয়, কারণ অসীম কখনো সমষ্টিগত হতে পারে না। তিনি প্রত্যেক সসীমের মধ্যে অসীমরূপে বিরাজমান। তিনি মহাবিশ্বে যেমন অসীম, অণুতেও তেমনি অসীম। অসীম কেবল একই হতে পারে, দুই অসীম সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞাতা একই—এক স্বাধীন জ্ঞাতার জ্ঞানই অসংখ্য অধীন জ্ঞাতাতে 'অনুভাত' হয়ে আছে। [ক্রমশ]

শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'The Vedanta Kesari'-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৫৪) এই রচনাদুটি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।—**সম্পাদক**

॥১॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর জীবন্ত প্রতিমা

এই তো সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। বিশ্বের সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের পুরুষ এবং নারী ঐ আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সকল দেশের আধ্যাত্মিক আদর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ। তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষার অসারতা প্রমাণ করে তাঁর মতো একজন নিরক্ষর মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য একমাত্র শর্তটি হলো নিজের আত্মা তথা অন্তর্নিহিত সত্যটি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন, পুরুষ অথবা নারী এককভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না অথবা এককভাবে মানবসমাজের নিকট আদর্শরূপে গৃহীত হতে পারে না। পুরুষ এবং নারী একযোগে এক আত্মা, এক প্রার্থনা, এক সাধনা এবং এক সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে সক্ষম হলেই সমাজে আদর্শ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন: তোমাকে অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো হলে চলবে না। আমি যদি সমগ্র মানবসমাজের পিতা হই, তবে তোমাকে হতে হবে সকল মানুষের 'মা'।* এজাতীয় প্রসঙ্গের উত্তরে খুব স্বল্পসংখ্যক নারীই সম্মতি জানানোর মতো সাহসের অধিকারিণী হন। যখন সারদাদেবীর বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন অতি সাধারণ এক গ্রাম্য মেয়ে। তাঁর সীমন্তে সিঁদুর এবং অন্তরে এক আদর্শ পত্নী ও সন্তানের জননী হয়ে ওঠার নারীসুলভ স্বপ্ন। এক্ষেত্রে সাধারণ রমণীর মতো উত্তর না দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: তুমি আমাকে তোমার মতো করে গড়ে নাও; আমি যেন প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ সেই চরম সত্যের অনুভূতি লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন: তুমি রক্তমাংসে গড়া এক জাগতিক মা-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে না; তুমি হবে অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননী।

সকলেই অবগত আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদতলে উপবেশন করে শ্রীমা সারদাদেবী কীভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিষদভাবে শিক্ষালাভ করেন এবং একসময় তাঁকে কী নিদারুণ দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়। তিনি ছিলেন নারীর স্নিগ্ধতা এবং নম্রতার পূর্ণ আধার। তিনি নিজহাতে তাঁর পতিদেবতার জন্য আহার্য প্রস্তুত করতেন এবং তাঁর যাবতীয় সেবা স্বয়ং করতেন।

একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সকল গ্রন্থ পাঠ করলে অথবা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মূল্যবান কিছু ডিগ্রির অধিকারী হলেই একজন মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত বলে বিবেচিত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে প্রেম এবং সেবার ভাব জাগ্রত না হলে এই তথাকথিত শিক্ষার কোনই মূল্য নেই। জীবনে প্রেমের ভাবটি বিকশিত না হলে শুধু চালাকি এবং বুদ্ধির সাহায্যে কোনকিছুই লাভ করা যায় না।

আমরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট এই শিক্ষাই লাভ করেছি; তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এক ঘনিষ্ঠ অনুসারী—মূলত একই মানসিকতার অধিকারী। তাঁর মধ্যেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অসীম প্রেম এবং সকলকে সেবা করার অপরিসীম তৃষ্ণা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্থূলশরীরে বর্তমান ছিলেন, তখন শ্রীশ্রীমা সর্বদাই তাঁর সকল সুখদুঃখের অংশীদার হতেন। কিন্তু পতিদেবতার মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জীবনে এই সেবার ভাবটি যেন অধিকতর মাত্রায় প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। এক শক্তিময়ী কেন্দ্ররূপে তিনি তাঁর নিকট আগত বহু পুরুষ ও নারী ভক্তকে সংগঠিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপদেশামৃতের জীবন্ত ভাষ্যরূপে ধরাধামে রেখে গেলেন শ্রীশ্রীমাকে। শুধু সেই ভাব এবং অসীম সাহস সম্বল করে তিনি দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্তের মনে একটি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকে প্রেম এবং সেবার শিক্ষাগুলি গ্রহণ করা প্রত্যেক নারীর অবশ্যকর্তব্য। জীবনে চরম প্রতিকূলতা, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও প্রতিটি অশ্রুকণাকে প্রেম ও সেবারূপ মুক্তায় রূপান্তরিত করা সম্ভব—এই শিক্ষাই তাঁর জীবন থেকে প্রত্যেক নারীকে লাভ করতে হবে। সীমাহীন দুঃখের আবর্তে নিক্ষেপ করে এই মূল্যবান জীবনটিকে নষ্ট না করার শিক্ষা তাঁর জীবন থেকেই লাভ করতে হবে। দেখা যায়, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বিধবা মহিলা স্বামীর স্মৃতি রোমন্থন করে চরম দুঃখ ও বেদনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। তাঁদের নিকট শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন একটি আদর্শ শিক্ষাস্বরূপ।

নারীশক্তির সাহচর্য এবং নারীর মহত্ত্বের বিকাশ না ঘটলে পৃথিবীতে কোন পুরুষই কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হননি। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, বহু পুরুষ তাঁদের তথাকথিত অশিক্ষিত পত্নীদের সাহায্যেই জীবনে বিপুল সাফল্য লাভ করেছেন। যুবতী অথবা বৃদ্ধা, সুখী অথবা অসুখী, বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা—আজ প্রত্যেক নারীর উচিত

* প্রকৃত ঘটনাটি এরকম—ঠাকুর পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" শ্রীশ্রীমা উত্তর দিয়েছিলেন: "তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।"—**অনুবাদক**

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকে নিজেদের জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করা। তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত কোনদিন প্রাচীন হয়ে যাবে না; তাঁর জীবন কালজয়ী। কারণ, তিনি এক মহৎ আদর্শ, এক সৎ আদর্শের জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন।

এই মহান তথা অতি সাধারণ এক রমণীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁরই জীবনের আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

আজ বিশ্বের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার এবং প্রসার ঘটছে। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়াতেও দেখলাম, দলে দলে মানুষ সমবেত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' পাঠ, শ্রবণ এবং তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধানিবেদন করার জন্য। সমগ্র বিশ্বের মানুষ আজ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মহান ঋষিগণের মধ্যে জাতি অথবা দেশগত কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁরা বিশ্বজনীন, তাঁরা সর্বজনীন। আজ ভারতবর্ষের কর্তব্য সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করানো যে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর মতো ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরি।

সরোজিনী নাইডু

শ্রীশ্রীমায়ের ৮৬তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ মঠে প্রদত্ত ভাষণ, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

॥২॥

যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন

আমেরিকার এক বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কাছে আমি যখন প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে শুনি, তখন থেকেই আমি তাঁর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। তারপর আমি তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করি এবং আরো বেশি করে জানার ব্যাকুলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই শ্রীশ্রীমা কে ছিলেন এবং কীভাবেই বা আমি তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হলাম, সেকথাই এখন বিবৃত করব। আমি শুধু একথাই জানতাম যে, তাঁর জীবনটি ছিল অতীব শান্ত এবং ঘটনাবহুল। তাঁর হৃদয় ছিল এক দিব্য প্রশান্তি, আনন্দ, কোমলতা এবং সর্বজনের প্রতি গভীর প্রেম ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। স্বভাবতই শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেছেন—এমন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি।

আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষকে দর্শন করার দুর্লভ সুযোগ একদিন আমার জীবনে অকস্মাৎ এসে গেল। সেই ভারতবর্ষ পরিদর্শনকালে আমি যখন কলকাতায় এসে পৌঁছাই, তখন যে-বাসনাটি আমার মনে সর্বপ্রথম উদয় হয়, সেটি হলো শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মভূমি জয়রামবাটী দর্শন করব। সেখানে পৌঁছে আমার এমন একটি আকর্ষণীয় গ্রামের সঙ্গে পরিচয় হলো, যেটিকে তখনো কোনরকম মলিনতা স্পর্শ করতে পারেনি। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরটি দর্শন করা মাত্র তাঁর জীবনের মুখ্য সম্পদ সেই চরম প্রশান্তির কথা স্মরণ হলো। নীরবে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে সেই পবিত্র পরিমণ্ডলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সাধনায় মগ্ন হলাম। তারপর গেলাম শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের ওপর নির্মিত মন্দিরে। তাঁর সেই তৈলচিত্রের* সম্মুখে উপবেশন করে আমি যেন তাঁর দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম।

ক্রমে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা নহবতের যে-ঘরটিতে বাস করতেন, সেটিও দর্শন করি। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘর, তার চারপাশে সঙ্কীর্ণ একটি বারান্দা; আবার তারই মধ্যে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের রান্নাঘর। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, জানালাবিহীন এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে—যেখানে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার—শ্রীশ্রীমা দিনের অধিকাংশ সময় কিভাবে অতিবাহিত করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের জন্য আহার প্রস্তুত করতেন? আমি সেই দৃশ্যটির কথা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম—শ্রীশ্রীমা বেড়ার ছিদ্রে দৃষ্টি রেখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে আছেন কখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটিবার দর্শন লাভ করা যাবে।

দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলাম উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কলকাতার বাড়িতে। একটি সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি ছোট্ট চাতাল অতিক্রম করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি। সেই ঘরে তাঁরই ব্যবহৃত খাটের ওপর শাড়ি-পরিহিতা শ্রীশ্রীমায়ের একটি অপূর্বসুন্দর চিত্র। সেই চিত্রটির সম্মুখে কিছুসময় নীরবে উপবেশন করার সৌভাগ্য আমার হয় এবং সেখানেও আমি তাঁর দিব্য উপস্থিতি অনুভব করি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন দর্শনে যান। এই নগরীতে নানা পথ পরিভ্রমণকালে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য মন্দিরের দর্শনলাভ করা যায়। এইসকল স্থানে শ্রীশ্রীমা দীর্ঘকাল প্রার্থনা ও গভীর ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। সেখানে রাধারমণের মন্দিরে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা জানান: "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১৪০৮, পৃঃ ৩১৯)

আমি যখন বৃন্দাবনে যাই, আমিও 'কালাবাবুর কুঞ্জ' দর্শন করি। সেখানে একটি ঘরে শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস বাস করেন। তার ঠিক পাশেই বহমানা যমুনা নদী। মনে পড়ল, শ্রীশ্রীমা এই নদীতে স্নান করতেন এবং এই নদীর বালুকাবেলায় একাকী পদচারণ করতেন।

আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন—এমন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্বপ্নটি পূরণ হয়। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষিত এক দম্পতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। স্বামীর দীক্ষা হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। আমি তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করি।

* প্রথমে মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যেটি ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে নির্মিত হয় (বর্তমানে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দিরে সংরক্ষিত) শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে সেটির স্থলে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।—অনুবাদক

আমার অনুরোধ শুনে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন। আমি তাঁর মুখের ভাবটি লক্ষ্য করতে থাকি। শ্রীশ্রীমায়ের কথা অনুধ্যান করতে করতে তাঁর মুখমণ্ডলে এক স্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল; তাঁর চোখদুটি এক তীব্র জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বলতে শুরু করলেন: "আমার প্রথম সন্তানের জন্মের পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আমি সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সম্মত হন না। বলেন, 'সবাই যদি সন্ন্যাসী হবে, তবে আমরা কার কাছে যাব? তোমার কিসের ভয়? সর্বদা মনে রেখো, আমি আছি। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না।' তারপর তিনি আমার বুক স্পর্শ করলেন। মনে হলো সর্বশরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার দুটি পা কাঁপতে লাগল। আমি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললাম এবং নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম—শ্রীশ্রীমা আমাকে বলছেন, 'এই সংসার নিয়ে তোমার এত চিন্তা কেন? এসবই আমার ইচ্ছাস্বরূপ; এসব থাকবে।' তারপর থেকেই আমাদের সকল সমস্যা যেন একে একে দূর হয়ে যেতে থাকল। আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, এসবই শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে। আমার কিছুই করার ছিল না। আমি অনুভব করলাম এই জগতের তিনিই 'সর্বময়ী কর্ত্রী'।"

কিছুক্ষণ থেমে তিনি আরো বললেন: "একদিন আমার এক গুরুভাই শ্রীশ্রীমাকে বলেন, 'মা, আমি তোমাকে কিছুই বুঝতে পারলাম না।' উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমাকে কিছুই বুঝতে হবে না, বাবা! তুমি শুধু মন দিয়ে জপধ্যান করে যাও।' একদিন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাওয়ার পথে আমার কাপড়ে নোংরা লেগে যায়। আমি স্থির করলাম, এই নোংরা কাপড়ে আর তাঁকে স্পর্শ করব না; সেই কারণে দূর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর শ্রীচরণ আমার মাথার ওপর স্থাপন করলেন। মুখ তুলে দেখি, পরম করুণাভরে তিনি হাসছেন। আমিও পরম আনন্দে হাসতে থাকি।

"একদিন জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, 'মা, তোমার আর ঠাকুরের পূজা কীভাবে করব?' শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন, 'ঠাকুর ও আমাকে অভেদজ্ঞানে পূজা করবে। জানবে একজনের পূজা করলেই উভয়ের পূজা করা হয়।' একদিন এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎলাভের আশায় উদ্বোধনে আসেন, কিন্তু তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ-সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীমাকে বললেন যে, তাঁর এই কাজ ঠিক হয়নি। উত্তরে তিনি বললেন, 'এর জন্য তোমাদের মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। আমার যেরূপ ইচ্ছা হবে, আমি তাই করব।'

"একদিন এক পতিতা নারী উদ্বোধনে এলে তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং এসে তাঁর হাত ধরে ভিতর নিয়ে গিয়ে তাঁকে তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার অনুমতি দেন। সেই মহিলা ভীতস্বরে বলে ওঠেন, 'মা, আমি পাপী, আমি তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারি না।' কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাঁকে বাধ্য করলেন তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে। তারপর তিনি তাঁকে মন্ত্রদান করে পরম কৃপাভরে আশীর্বাদ করলেন। সন্ন্যাসিগণের আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তাকে কৃপা না করলে সে কোথায় আশ্রয় নেবে?' "

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রলোকের দীক্ষালাভের কিছুদিন পর তাঁর পত্নী লক্ষ্য করতে থাকেন যে, প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তিনি পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে পাঠ করেন। ঐ চিঠির বিষয়বস্তু জানার জন্য তাঁর অত্যন্ত কৌতূহল হয়। পরম বিস্ময়ে তিনি জানতে পারেন, চিঠিটি শ্রীশ্রীমায়ের।

সেইদিনই ঐ মহিলা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর রচয়িতা মাস্টারমশায়ের বাড়ি যান এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন মহিলাদের দীক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে কিনা। তিনিও দীক্ষাগ্রহণ করতে পারেন—একথা জেনে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মাস্টারমশায় তাঁকে বলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়ার সময় তিনি যেন তাঁর পুত্রটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান, কারণ সে তার পিতার সঙ্গে বহুবার উদ্বোধনে যাওয়ার ফলে সেখানকার পথঘাটের সঙ্গে পরিচিত। যাই হোক, উদ্বোধনে পৌঁছে ঐ ভদ্রমহিলা দেখলেন, শ্রীশ্রীমা দরজার সামনে যেন তাঁদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হাত তুলে ইশারা করে তিনি তাঁদের ডাকলেন: "এস মা।"

দীক্ষালাভের কয়েকদিন পূর্বে ভদ্রমহিলাটি স্বপ্নে দর্শন করেন যে, শ্রীশ্রীমা ভোর চারটার সময় এক নদীর তীরে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে নদীতে স্নান করে এসে ইষ্টনাম জপ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি সবিনয়ে বলেন: "আমার তো কোন ইষ্ট নেই, কিভাবে আমি তাঁর নামজপ করব?" তখন শ্রীশ্রীমা তাঁকে জপ করার জন্য একটি নাম দেন।

এর কিছুদিন পর ঐ ভদ্রমহিলা যখন উদ্বোধনে গেলেন দীক্ষালাভের জন্য, তখন শ্রীশ্রীমা তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে এসে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন: "মা, স্বপ্নে কি তুমি কখনো কোন মন্ত্রলাভ করেছ?" মহিলাটি তাঁর সেই স্বপ্নদর্শনের বর্ণনা দিলেন। শ্রীশ্রীমা বললেন: "তুমি ঐ মন্ত্রই জপ করবে।"

এই দম্পতির মুখে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হলো, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হলে আমরা তিনজন বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকলাম। আমার মনে হলো, আমি সত্যিই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বসে আছি।

অকস্মাৎ সেই মহিলা আমার প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন: "শ্রীশ্রীমা আপনার মনের কথাটিও জানেন।" শুনে শিহরিত হয়ে উঠলাম এবং মনে মনে ভাবলাম—তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই মনের খবর রাখেন।

আজ আমি স্থিরনিশ্চিত যে, শ্রীশ্রীমা আজও দিব্যশরীরে সর্বত্র অবস্থান করছেন। যিনি ব্যাকুল হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর দর্শন প্রার্থনা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁর দর্শনলাভ করবেন।

চার্লট বোস (সরলা)

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিণী, দীক্ষিতা এই আমেরিকান মহিলা পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ভারতের নানান তীর্থ দর্শন করেন।

নেতাজী-রহস্য তদন্তে ডি. এন. এ.

বরুণ রায়চৌধুরী

নেতাজী কোথায় হারিয়ে গেলেন, তাঁর শেষ পরিণতি কী হলো তা নিয়ে একাধিকবার তদন্ত হয়েছে। আবার হতে চলেছে। এবারকার অভিনবত্ব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, দেহাবশেষে জৈব প্রযুক্তির সরাসরি প্রয়োগ। 'নেতাজির চিতাভস্ম' বলে জাপানের রেনকোজি মন্দিরে যা রাখা আছে তা সত্যিই তাঁর দেহাবশেষ কিনা, সেই নিয়ে পরীক্ষা করা হবে 'ডি. এন. এ. টেস্ট'-এর মাধ্যমে। তাই তাঁর জীবিত আত্মীয়স্বজনদের দেহ থেকে ডি. এন. এ. নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।[১] আরো দুটি প্রাসঙ্গিক খবর—উত্তরপ্রদেশের প্রয়াত সাধু গুমনামী বাবাকে একদা ছদ্মবেশী নেতাজী বলে মনে করা হতো। ডি. এন. এ. টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি তা নন।[২]



পলাতক ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন ধরা পড়ার পর যে কাঁচাপাকা উস্কোখুস্কো চুলদাড়িতে ঢাকা বিধ্বস্ত প্রৌঢ়টিকে দেখা গেল, তার সঙ্গে ইরাকের রাষ্ট্রপতির চোখধাঁধানো ব্যক্তিত্ব একেবারেই মেলে না; কিন্তু ডি. এন. এ. টেস্টে ধরা পড়ল তিনিই আসল সাদ্দাম।[৩] দেখা যাচ্ছে যে, ডি. এন. এ. টেস্ট নিয়ে চারদিক বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কী? সত্যিই কি তা থেকে নেতাজী-রহস্য সমাধান হওয়া সম্ভব? এই নিবন্ধে সে-প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

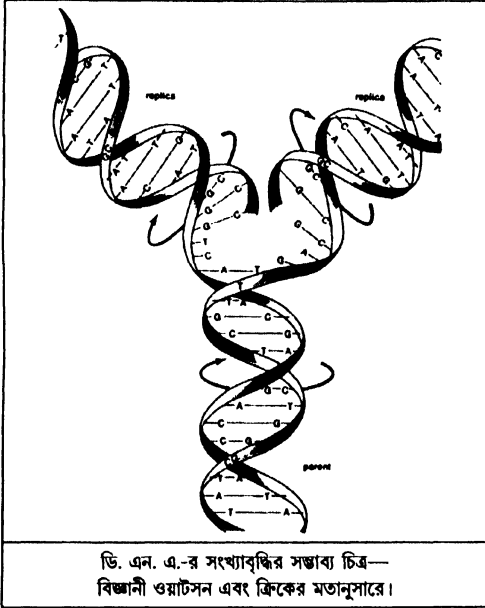
মানুষ বা অন্যান্য জন্তু ও উদ্ভিদের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে তৈরি। এক এক অঙ্গের কোষ এক একরকমের। কিন্তু সব কোষের মধ্যেই থাকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো অতি দীর্ঘ এক আণবিক শৃঙ্খল। সর্পিল আকার দুটো স্প্রিং-এর একটিকে যদি আরেকটির মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে যেরকম দেখতে হয়—সেই 'ডবল হেলিক্স' আকৃতির এই আণবিক শৃঙ্খলের নাম 'ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড', সংক্ষেপে 'ডি. এন. এ.'। তার এক একটা অংশকে 'জিন' বলা হয়। যেকোন প্রাণীর সন্তান যে সেই প্রাণীর মতো দেখতে হয়, বাবা-মায়ের সঙ্গে যে ছেলেমেয়ের চেহারার মিল থাকে—এসবের মূলে জিন। বাড়ি তৈরির ইঁটের মতো ডি. এন. এ.-র মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট আণবিক সমন্বয় থাকে, যাকে 'বেস' বলা হয়। A, C, G এবং T—এই চার রকমের বেস আছে। আসলে এই অক্ষরগুলি এক-একটা রাসায়নিকের আদ্যক্ষর। বেসের সমন্বয়বৈচিত্র্যের ওপর ডি. এন. এ. তথা জীবদেহের গঠন নির্ভর করে। তাই পৃথিবীতে এত জীববৈচিত্র্য, যেমন ইংরেজি বর্ণমালার মাত্র ২৬টি অক্ষর দিয়ে রোজ একটা করে নতুন খবরের কাগজ ছাপানো যায়।

দেহকোষের মধ্যে 'ক্রোমোজোম' নামক এক সুতোর আকৃতির বস্তুর মধ্যে ডি. এন. এ. ঠেসে ভরা থাকে। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া করে ক্রোমোজোম থাকে। পিতা ও মাতার শরীর থেকে মাত্র একটি করে কোষ এসে 'ভ্রূণ' তৈরি করে। সেই বিশেষ কোষে ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে; তার মধ্যে থাকে ডি. এন. এ.। এরপর সেই ভ্রূণ ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং তাতে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা বোধহয় কাশীরাম দাস দিয়েছেন ভীষ্মের জবানিতে (মহাভারত, শান্তিপর্ব) :

"মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্মে জনক-ঔরসে।।
পঞ্চরাত্রি গতে হয় বুদ্‌বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান।।
এইরূপে ক্রমে-ক্রমে বাড়ে অতিশয়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা যেমনে বাড়য়।।"

প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোমের সঙ্গে ঐ ডি. এন. এ. copy হয়ে যেতে থাকে। সামান্য হেরফের অবশ্য হয়; কারণ একটি পিতার থেকে এসেছে, অন্যটি মাতার থেকে। তবে সাদৃশ্য থেকেই যায়। সন্তানের পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত সর্বত্র এবং রক্তের প্রতি ফোঁটায় পিতা-মাতার ডি. এন. এ.-র সদৃশ ডি. এন. এ. উপস্থিত থাকে। রক্তের লোহিতকণিকায় অবশ্য ডি. এন. এ. থাকে না, কিন্তু শ্বেতকণিকায় থাকে। ২২ জোড়া ক্রোমোজোম নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই একরকম। তাছাড়া পুরুষের ক্ষেত্রে X এবং Y দুরকমের ক্রোমোজোম একটি করে থাকে। নারীর ক্ষেত্রে দুটিই X ক্রোমোজোম। সুতরাং

নারীসন্তান বা নারী বংশধরের দেহে জনকের চিহ্ন (ডি. এন. এ.) থাকার সম্ভাবনা বেশি। নেতাজীর ক্ষেত্রেও মেয়েদের দিকের বংশধরদের দেহের নমুনা সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেহের নমুনা বলতে রক্তের এক ফোঁটা, গোড়াসমেত চুল, চামড়া বা নখের টুকরো, হাড়, দাঁত বা যেকোন দেহাবশেষ হতে পারে। দুই ব্যক্তির দেহের নমুনা পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়, ডি. এন. এ. একরকম; তাহলে অকাট্য প্রমাণ হয় যে, একে অন্যের আত্মীয়। অতএব নেতাজীর চিতাভস্মে উপস্থিত দেহাবশেষের জিন যদি তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে মিলে যায়, তবে প্রমাণিত হবে—তিনি বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ কি একেবারেই নেই? ছাইয়ের কখনো ডি. এন. এ. টেস্ট হতে পারে না। তার মধ্যে কিছু না কিছু দেহাংশ থাকতে হবে। নেতাজীর চিতাভস্মে একটা দাঁত এবং এক-টুকরো হাড় আছে বলে শোনা যায়। ঐটুকুর যথার্থতার ওপরেই পরীক্ষার ফল নির্ভর করবে।



ডি. এন. এ.-র সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাব্য চিত্র—
বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিকের মতানুসারে।

চলতি কথায় 'ডি. এন. এ. টেস্ট' শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আসলে কথাটা হওয়া উচিত ছিল 'জেনেটিক টেস্টিং', যার মূলকথা—কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেহাংশে ডি. এন. এ.-র কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। পিতৃত্ব বা আত্মীয়তা নির্ণয় করা, যাকে বলে 'আইডেন্টিটি টেস্টিং'—এই পদ্ধতির একটিমাত্র প্রয়োগ। এছাড়া অন্য ব্যবহারও হতে পারে এবং সবগুলিতে সেই ডি. এন. এ. পরীক্ষাই করা হয়। যেমন, সন্তানের কোন বংশগত রোগ থাকবে কিনা, তা নির্ণয় করা যায়। কয়েক ধরনের ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি রোগ ডি. এন. এ. ত্রুটির জন্য হয় বলে মনে করা হচ্ছে। সেই ত্রুটিপূর্ণ জিনকে শনাক্ত করতে পারলে তার চিকিৎসাও সম্ভব। তাকে বলে 'জিন থেরাপি'। যেমন, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য সুস্থ-সবল প্রোটিন কোষ তৈরি করতে পারে—এমন ডি. এন. এ. রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। অপরাধ-বিজ্ঞানে দাগি অপরাধীর আঙুলের ছাপের মতো ডি. এন. এ. তথ্যও সংরক্ষিত রাখার প্রচলন হয়েছে। 'ক্লোনিং' আরেকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ, যাতে ডি. এন. এ.-র একটি ছোট অংশের অনেকগুলি copy করে জনক কোষের হুবহু নকল নির্মাণ করা যায়।

আত্মীয়তা নির্ণয়ের ডি. এন. এ. পরীক্ষা নানাভাবে করা যায়। 'পলিমারেজ চেন রিয়্যাকশন', সংক্ষেপে PCR নামক একটি পদ্ধতিতে কম পরিমাণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ডি. এন. এ. নিয়েও কাজ করা সম্ভব। নেতাজীর ডি. এন. এ. পরীক্ষায় সেইজাতীয় পদ্ধতিই উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়। ডি. এন. এ. শৃঙ্খলের কিছু অংশ সব মানুষের ক্ষেত্রেই একরকম। তার মাঝে মাঝে কিছু অংশ থাকে, যা এক একজনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। PCR পদ্ধতিতে সেই অংশগুলিকে চিহ্নিত করে তার অনেকগুলি copy করা হয়। 'প্রাইমার' নামক এক ডি. এন. এ. খণ্ড দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। রাসায়নিক মিশ্রণ সমেত জৈব অংশটিকে বারেবারে গরম ও ঠাণ্ডা করলে প্রাইমারের সঙ্গে ক্রমশ আণবিক শৃঙ্খল জোড়া লাগতে থাকে। এইভাবে মূল যে ডি. এন. এ.-টা পাওয়া গিয়েছিল, তার আণবিক ক্রমের আরো বিস্তারিত রূপ পাওয়া যায়। আতসকাঁচের নিচে যেমন ছোট জিনিসকে বড় করে দেখা যায়, দেহাবশেষ থেকে পাওয়া একটা ডি. এন. এ.-র অংশকে বিবর্ধিত করে অন্য একটি নির্দিষ্ট নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। কাজটা সহজ নয়। ব্যাপারটা যেন ফসিলের একটা ভাঙা টুকরো বিশ্লেষণ করে অতীতের আসল প্রাণীটা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা। নেতাজীর ডি. এন. এ. পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে ঐ দাঁত আর হাড়ের টুকরো কতটা খাঁটি, অন্য ব্যক্তির দেহাংশ মিশে গেছে কিনা—তার ওপর। ❑

তথ্যসূত্র

১ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৪ ও ২৮ নভেম্বর ২০০৩, পৃঃ ১
২ ঐ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃঃ ৪
৩ ঐ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃঃ ১

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীমদনমোহন সাহার 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ' শীর্ষক রচনার ৫৬০ পৃষ্ঠার ৩য় অনুচ্ছেদের ৯ম, ১০ম এবং ১১শ পঙ্ক্তিগুলি আমার কাছে সংশয়ের কারণ হওয়ায় এই চিঠির অবতারণা। এখানে বলা হয়েছেঃ "উল্লেখ্য যে, পারস্য সুলতান বর্বর লুটেরা নাদির শাহ দিল্লির উপকণ্ঠে একদিনে দশহাজার নব মুসলমানকে (মোঙ্গল জাতির বংশধর) নির্মমভাবে হত্যা করেন।"

কিন্তু পাঠ্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হুলাগুরের পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে মোঙ্গলরা সিন্ধুনদ অতিক্রম করে সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) মোঙ্গলদের পরাজিত করেন এবং উলুখ খাঁ নামে চিঙ্গিজ খাঁয়ের এক বংশধর তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে অনুচরবর্গ-সহ ইসলামধর্ম গ্রহণপূর্বক দিল্লিতে বসবাস করতে থাকেন এই মর্মে যে, সুলতান তাঁদের অপেক্ষাকৃত সামরিক উচ্চপদ, জায়গির বা অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবেন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন খলজি উলুখ খাঁ এবং নসরৎ খাঁয়ের অধিনায়কত্বে ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট জয় এবং লুণ্ঠন করেন। এসময় উলুখ খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ (ইসলামধর্ম গ্রহণ করায় 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত) পূর্বোক্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ দাবি করে এবং তা প্রত্যাহৃত হওয়ায় তারা সুলতানবিরোধী কার্য তথা বিদ্রোহী হলে সুলতান আলাউদ্দিনের আদেশে একদিনে প্রায় ৩০ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করা হয়। (দ্রঃ ভারতের ইতিহাস—অতুল রায়, ১ম খণ্ড, সুলতানি যুগ, পৃঃ ৫৩, ৫৬, ৬৮ ইত্যাদি) এই তথ্য প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক, সতীশচন্দ্রের 'Medieval India, Part I' সহ অন্যান্য গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এবং এটাই স্বাভাবিক।

এখানেই আমার প্রশ্ন—

(১) নাদির শাহই কি ১০ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন? নাকি এটি ছাপানোর অসাবধানতার ফল।

(২) নাদির শাহ দিল্লি প্রবেশ করে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ) লুণ্ঠন-সহ যে বহু নরনারীকে হত্যা করেছিলেন, লেখক তাদেরই কি 'নব মুসলমান' বলে উল্লেখ করেছেন?

(৩) নাদির শাহের আক্রমণকাল বা তার পরেও কি 'নব মুসলমান' বলে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ছিল? থাকলে তৎকালীন বিভিন্ন দরবারি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা কি ছিল?

(৪) মোঙ্গল শাসনের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার ঠিক ৩২তম বছরে নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠন/হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে 'নব মুসলমান' হিসাবে উল্লেখ করার যৌক্তিকতা কোথায়?

আমার অনুরোধ, যদি উপরি উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে 'উদ্বোধন'-এর কোন সংখ্যায় বিস্তারিত লেখা হয়, তাহলে আমার মতো বহু পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

মুক্তারাম ঘোড়ুই
তাজপুর, আরামবাগ, হুগলি-৭১২৪১৫

লালন ফকিরের বাউলধর্মে দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে

১৪১০ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'উদ্বোধন'-এর ৬৭১ পৃষ্ঠায় 'বাউল ধর্ম-দর্শন ও মানবপ্রেমের সাধনা' শিরোনামে শ্রীদিলীপকুমার দত্তের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে সন্দেহাতীতভাবে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে লালন ফকির সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ "শোনা যায় বাউলশ্রেষ্ঠ এই ফকির লালন শাহ হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় এক বাউল ফকিরের কাছে বাউলধর্মে দীক্ষিত হন।" এই 'শোনা কথা' সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, প্রায় চার দশক আগে এক মাসিক পত্রিকায় (সম্ভবত 'মাসিক বসুমতী', কারণ তখন আমি সেই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম) লালন ফকিরের এক সংক্ষিপ্ত জন্মবৃত্তান্তে পড়েছিলাম, লালন নেহাত কম বয়সে গ্রামের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে (তখন রেল বা মোটর-যোগে ভ্রমণের সুযোগ ছিল না, পদব্রজে বা নৌকাই একমাত্র অবলম্বন ছিল।) যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথে সেই নৌকা এক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা সাঁতার জানত, তারা কোনরকমে প্রাণে বাঁচে। কিন্তু লালন সম্ভবত সাঁতার না জানায় গভীর জলে তলিয়ে যান। সহযাত্রীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে নৌকা নিয়ে দেশে ফিরে যায়। এদিকে লালন অনেক পরে অচৈতন্য অবস্থায় স্রোতের টানে নদীর তটে এসে পড়ে থাকেন।

নিকটস্থ গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান লালনকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে নিজ বাটীতে নিয়ে যান এবং অনেক সেবাশুশ্রূষা করার ফলে লালনের সংজ্ঞা ফিরে আসে, যদিও পূর্বস্মৃতি ফিরে না পাওয়ায় সেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান লালনকে নিজের ছেলের মতো পিতৃস্নেহে লালন-পালন করতে শুরু করেন। অন্যত্র লালন-পালন হওয়াতে সম্ভবত তাঁর নাম হয় 'লালন'। এভাবে ঐ পরিবারভুক্ত হয়ে বহুদিন থাকার পর লালন বোধহয় কোন বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শে প্রভাবান্বিত হন। যে-ব্যক্তি তাঁকে লালন-পালন করেন, তিনিই হয়তো সেই বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

কুমুদবন্ধু স্বামী

ধুবড়ি, অসম-৭৮৩৩০১

জানতে চাই

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীবিনয় চক্রবর্তীর লেখা 'শিকাগো-বক্তৃতা আজো প্রাসঙ্গিক' পাঠ করে কিছু সংশয় জেগেছে। শ্রীচক্রবর্তী ধর্মমহাসভায় আমন্ত্রিত ১০ জন ভারতীয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। রচনাটির ৮৪২ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৩য় অনুচ্ছেদের এক স্থানে লেখা হয়েছে ঃ "পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের তালিকার মধ্যে নরসিংহচারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া বাকি কেউই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না।" কিন্তু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তো ছিলেন। এছাড়াও বীরচাঁদ গান্ধী, বি. বি. নাগরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও সশরীরে ছিলেন। এবিষয়ে লেখকের বক্তব্য জানতে ইচ্ছা করি।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ২য় কলমে 'মণিলাল গান্ধী' কি 'মণিলাল দ্বিবেদী' হবে? ডঃ হেনরি ব্যারোজের গ্রন্থে তাঁর নাম 'Divadi Manilal Mabhubhai (Nabhubhai)', অথচ স্বামীজী তাঁর চিঠিতে লিখছেন 'শ্রীযুক্ত মণিলাল নাডুভাই'। কোন্‌টি সঠিক? 'নাভু' না 'নাডু'? যদি অনুগ্রহ করে জানান সুখী হব।

অশোক সেন

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং-৭৩৪৪৩০

লেখকের উত্তর

পত্রপ্রেরক শ্রীঅশোক সেনকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর 'সংশয়' নিরসনের জন্য বলি—শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাঁরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বীরচাঁদ গান্ধী, নরসিংহাচারী, লক্ষ্মীনারায়ণ, বি. বি. নাগরকর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং রেভঃ মরিস স্লেটার।

৮৪২ পৃষ্ঠায় সেদিনের অনুষ্ঠানে "পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের তালিকার মধ্যে—নরসিংহাচারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া বাকি কেউই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না"—এভাবে অর্থ করলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৮৪১ পৃষ্ঠায় 'মণিলাল গান্ধী' নয়, 'মণিলাল দ্বিবেদী' হবে। 'Divadi Manilal Mabhubhai (Nabhubhai)' বলে ডঃ ব্যারোজ তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীজীও 'নভু ভাই' বলে পত্রে উল্লেখ করেছেন। 'নাভু' বা 'নাড়ু' নয়।

বিনয় চক্রবর্তী

স্যাটেলাইট টাউনশিপ, কলকাতা-৭০০০৬১

আস্তিকতার স্বরূপ কী?

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীঅসীমকুমার চৌধুরীর 'নাস্তিকতা বলে কিছু নেই' আলোচনায় নাস্তিকতার পক্ষেই যেন বেশি বক্তব্য পরিলক্ষিত হলো। এখন প্রশ্ন হলো ঃ 'আস্তিকতা' বলেই বা কী আছে?

সেই জীবনপ্রত্যুষে বাস্তববোধ ও আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন আমাদের প্রায় সকলের মনের মধ্যে জাল বোনে। দেব-দ্বিজে ভক্তি, পূজার্চনা, ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদি থাকলে মানুষ আস্তিক হয়। অন্যথায় খুব সহজেই আমরা উক্ত বিশ্বাসবর্জিত ব্যক্তিকে 'নাস্তিক' বলে ঘোষণা করি। কোন্‌টি 'বাদ' (ism), আর কোন্‌টি বাদ (rejected) তা আমাদের বোধে অনেক ক্ষেত্রে বাধ (obstacle) সাধে।

সহজ কথা হলো—যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আবার স্বামীজী বলেছেন—যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি—ঈশ্বর আছেন কিন্তু আমি নিজে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলাম না অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু যথাকালে পেলাম না; ঈশ্বরকে অস্বীকার করলাম না, কিন্তু নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করলাম—আমি নাস্তিক। কখনো কখনো অনবধানতার কারণেও ঈশ্বর উপলব্ধ না হওয়ায় কেউ নাস্তিক হতে পারেন। আবার যথেষ্ট বিশ্বজ্ঞান উপলব্ধি করার পর ধারণা জন্মায়—ঈশ্বর নেই। (কারণ আমাদের ধারণা—ঈশ্বর মন্দ কিছু ঘটাতে পারেন না।) এধরনের দৃষ্টান্ত—বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, জওহরলাল নেহরু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এঁরাও নাস্তিক।

ঈশ্বরবোধের মূল স্তম্ভ হলো, এই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে কোন শক্তিকে ভাবা। দুই, জন্মান্তরবাদ মেনে নেওয়া—যে-অর্থে মানুষ 'অদৃষ্ট' কথাটি ব্যবহার করে। প্রশ্ন হলো, না-জানা, না-দেখা বিষয়ে ঈশ্বরত্ব আরোপ কেন?

একদিন বিশ্বাস ছিল—সূর্য পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। পরে যখন জানা গেল (প্রমাণিত জ্ঞানের জন্য), তখন দৃষ্ট আলোকে অদৃষ্টের অন্ধকার দূর হলো। অপরপক্ষে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলকে পরজন্ম অবধি ঠেলে দেওয়ার মতবাদ যাঁরা প্রবর্তন করেন, তাঁরা মনে হয় তদানীন্তন পরিস্থিতির চাপে তা করতে বাধ্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে যে-যুক্তি খাড়া করেছিলেন তা কিছুটা বাধ্য হয়েই। জাতিস্মর একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, তা কখনো জন্মান্তর হতে পারে কী? দু-একটি বিশেষ (particular) ব্যাপারকে 'সাধারণ' (universal) বলে চালানো অযৌক্তিক। অলৌকিক হলেই কি ঐশ্বরিক হতে হবে?

তাছাড়াও কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ চালানো গেলে একশ্রেণির মানুষের বিশেষ সুবিধা হয়। মানুষ বঞ্চনাকেও ভাগ্যবিড়ম্বনা বলে মানিয়ে নেয় বলে বিদ্রোহ করে না। একই কর্ম করে যদি কেউ সফল হন, তাহলে ঈশ্বর বা সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হবে। অপরপক্ষে, ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব কর্মফলকে দায়ী করা হবে। মানুষকে হীনম্মন্য করে কোন্ ধর্মের মাহাত্ম্য ফলপ্রসূ হয়? স্বামীজী বললেনঃ "Face the brute." কেন বললেন? তিনি তো বলতে পারতেন—মানিয়ে নাও, ঈশ্বর দিচ্ছেন।

শুধু ঈশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্তনকে সর্বস্ব জ্ঞান করলে স্বামীজী স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন করে মানবসেবা করতে বলতেন না। মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করার কথা না বলে তিনি শুধু মঠ, মন্দির স্থাপন করে যাগযজ্ঞ করতে বলতেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধি ছিলঃ "মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ধর্ম নাই।"

সুতরাং যিনি দেব-দ্বিজে সেবা, পূজার্চনা, জপধ্যান না করে মানুষের সেবায় নিরত থাকেন—তিনি কি নাস্তিক? আর আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ দিনরাত 'মা, মা' বলে উতলা হলেও তাঁর হৃদয় ছিল মানবসম্পদ-রূপ রত্নরাজিতে ঠাসা। নাহলে তিনি "যত মত তত পথ" বলে দিকভোলাকে পথ দেখাতেন না; 'অজ্ঞান', 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' বোঝাতেন না।

আসলে কেউ কেউ ভাবেন, তাঁর আড়ালে একজন শক্তিমান আছেন—তিনি সব ঠিকঠাক করে দেবেন! দুটো নকুলদানা কিংবা একখানা বাতাসার বিনিময়ে ছেলের পাশ কিংবা মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজে দেবেন! এই কি আমাদের ঈশ্বর-ভজনা? নাকি কবিগুরুর ভাষায়ঃ "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"

আর পুরোহিত তো সবই পারেন! কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে শিরঘূর্ণন—সর্ববিধ মন্ত্র তাঁর ঝুলিতে। তাঁদের দোষ নেই। কারণ, আমরা তাঁদের ডাকি বলে তাঁরা আসেন। রুটিরুজির প্রশ্ন। জন্মান্তর, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ইত্যাদি না মানলে লোকে এসব ক্রিয়াকলাপ করবে কেন? আবার দু-চার মিনিটে তো আর ভারী বিল করা যায় না। তাই তাঁদের বিভিন্ন শতাব্দী থেকে ভাল ভাল বুলি দিয়ে 'পুঁথি' সাজাতে হয়। অবশেষে যজমানকে 'ব্রাহ্মণায় দদামি' বলিয়ে নিয়ে নিজের ঝুলি ভর্তি করে তাঁরা বাড়ি যান। কত বড় 'আস্তিক' আমরা!

আত্মা অবিনশ্বর। তাহলে মানুষ মরলে কাঁদি কেন? অসুখ হলেও ডাক্তার দেখানোর কী দরকার? একটা কাপড় ছেড়ে আরেকটা নতুন কাপড় পরা ছাড়া তো কিছু নয়। পাওনা টাকা-পয়সাই বা তাগাদা করার কী দরকার? এ-জন্মে না পাও, পরের জন্মে নিও। তার বেলা—এখন দাও, কাল দাও, সামনের মাসে দাও—তর সয় না কেন? 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' জানার পরও ভাবি, পৃথিবীটা বুঝি চ্যাপ্টা! ঋষিকে ভগবান বলে মানি, বিজ্ঞানী বলে নয় কেন?

তবে কি আমরা পাওনা আদায়ের বেলায় চার্বাকদের মতো নাস্তিক আর ধর্মভীরু শান্তিপ্রিয় সামাজিক হওয়ার সময় আস্তিক? আমার কন্যা যখন জ্যান্ত পুড়ে সতী হয়েছে, তখন তোমার মেয়ের বেলায় ছাড়ব কেন? এই কি আমাদের আস্তিকতা?

আসলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহামানবগণ তাঁদের যা দেওয়ার তা তাঁরা বাণী, রচনা, আচার-আচরণ ও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। ধূপ, দীপ জ্বালি বা নৈবেদ্য সাজাই—তাঁরা এসে আমাদের কাজটা করে দিয়ে যাবেন না। তাঁদের আদর্শকে অনুশীলনের মাধ্যমে অনুধাবন করতে হবে। যাঁরা মারণব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার করেন, তাঁরাও মানুষই। মহামানুষ, ভগবান কেন?

এই সেদিন দেখলাম, আড়াই কিলো সোনার গহনা গড়ানো হয়েছে মা-কে সাজানোর জন্য। আমরা জানি, প্রতিবছর পূজার সময় পদ্মফুল আহরণ করতে গিয়ে ৩০-৪০টি কিশোরের সর্পদংশনে অকালপ্রয়াণ ঘটে। আমরা যদি পূর্বাহ্নে মেডিকেল ক্যাম্প করে এ. ভি. এস. নিয়ে ঐ কিশোরদের প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হই, তাহলে কি ভক্তিপিপাসিনী মা একটু বেশি খুশি হতেন না? মাত্র পাঁচশ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়ে কত দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হলো, আর আমরা পাঁচহাজার বছরের প্রাচীনত্ব ও মানসিক পরাধীনতা নিয়ে জেগে ঘুমিয়ে এতদিন কাটিয়ে এলাম! এখনো 'কে আস্তিক আর কে নাস্তিক'—এই ভাবনা নিয়ে পড়ে আছি! স্বামীজীর কথায়—আমরা আর কবে 'মানুষের মতো মানুষ' হব?

নরেশ বিশ্বাস
বসিরহাট কলেজ, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪১২

[illegible] প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং [illegible] দেখে পড়ছে। অজস্র অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের [illegible] দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

—সম্পাদক

প্রশ্ন : *ভারতে অনেক সন্ন্যাসী সঙ্ঘ আছে। তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বিশেষত্ব কোথায়?*

—ব্রতীন সমাদ্দার, গ্রিন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ১০৩

উত্তর : ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতকে আশ্রয় করে অসংখ্য সন্ন্যাসী সঙ্ঘ রয়েছে। কোন সঙ্ঘে অদ্বৈত ভাবকে অবলম্বন করে আশ্রমবাসীরা সাধনা করেন এবং সেই ভাবকে সকলের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হন। এইভাবে কোন সঙ্ঘে বিশিষ্টাদ্বৈত, কোন সঙ্ঘে দ্বৈত ভাবে সাধনার প্রচলন রয়েছে; এছাড়া বিভিন্ন আশ্রমে অন্য ভাবের সাধনাও হয়ে থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাবের সাধনার মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্য—মোক্ষলাভের জন্য অগ্রসর হন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁদের পূর্ববর্তী সন্ন্যাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশে যখনি কোন দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দৈব-দুর্বিপাক দেখা দেয়, তখনি তাঁরা সেইসব জায়গায় গিয়ে মানুষের কষ্টের কিছুটা লাঘব করতে চেষ্টা করেন। মিশনের সাধুরা যখন দুঃস্থ লোকের সেবা করেন, তখন তাঁরা নিজেদের মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর একেবারেই নজর দেন না। তাঁরা প্রত্যেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে শ্রীভগবানেরই প্রতিভূরূপে দেখার চেষ্টা করেন। স্বামীজী বলেছেন : "দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে-ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, সে-ব্যক্তি অপেক্ষা যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একটিমাত্র দরিদ্রকেও শিব-বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, ১৪শ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ২৭) স্বামীজীর এই বাণীকে অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেন—এটিই তাঁদের বিশেষত্ব।

প্রশ্ন : *আমাদের কলেজ জীবনে একই সঙ্গে একাধিক বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তার মধ্যে রয়েছে পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্র—যেখানে মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়ার অবসর কম। আবার রয়েছে আমাদের সনাতন সাংস্কৃতিক জগৎ—যা আবর্তিত হয় কতকগুলি মানবিক গুণকে ঘিরে। এছাড়াও রয়েছে তথাকথিত আধুনিক পশ্চিম-ঘেঁষা সংস্কৃতির হাতছানি। আমরা যে-মুহূর্তে যে-ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকি, তখন সেটাকেই বেশি করে সত্য মনে হয়। বাকিগুলো সাময়িকভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ে। কীভাবে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারি? কোন্‌টিকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া বিধেয়?*

—অবন চৌধুরি ও অভিষেক কুণ্ডু, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫

উত্তর : তোমাদের প্রশ্নের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে উত্তর রয়ে গেছে। আমাদের সনাতন সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপরে দাঁড়িয়েই (অর্থাৎ platform হিসাবে ব্যবহার করে) আমাদের নিজেদের জীবনকে এবং জগৎকে দেখতে হবে। যদি কোন platform না থাকে, তাহলে কোন জীবনগঠন অসম্ভব। একাধিক বৃত্তের মধ্যে একটিকে মূল বৃত্ত হিসাবে যে গ্রহণ করতে পারে, সে-ই জীবনে সাফল্যলাভ করে। ভারতবর্ষের এই মূল বৃত্তটি হলো সনাতন ধর্ম অনুসারী মূল্যবোধভিত্তিক চরিত্র-গঠনের মাধ্যমে পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তি। সনাতন ধর্মে যেমন নিবৃত্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে, তেমনি প্রবৃত্তিমার্গের কথাও বলা হয়েছে। মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি আমাদের সকলের লক্ষ্য হলেও অভ্যুদয় অর্থাৎ জাগতিক উন্নতির পথ ধরেই

সংসারী মানুষকে চলতে হবে। সুতরাং তোমরাই যে কেবল একাধিক বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছ তা নয়, এই সমাজের বেশির ভাগ মানুষকেই একাধিক বৃত্তে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই বৃত্তগুলির মধ্যে মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়ার অবসর কম। তাই যদি হতো, তাহলে মূল্যবোধহীন মানুষেরাই সর্ববিষয়ে সাফল্যলাভ করত। আর্থিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সচ্ছলতা কোন মানুষের অন্তরে সত্যিকারের সুখ-শান্তিকে নির্ধারণ করে না। মূল্যবোধহীন বহু মানুষের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এবং শারীরিক আরাম প্রাপ্তির নানাবিধ সুবিধা থাকার মানে এই যে, সমষ্টিগতভাবে কোন বিশেষ project-কে sucessful করার জন্য মূল্যবোধহীন হলেও চলতে পারে। কিন্তু যেকোন পরিকল্পনা রূপায়ণের মূলে এই মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমী সংস্কৃতির মূল্যবোধ সম্বন্ধীয় অংশটুকু বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতার দিকটি আমরা সর্বদা গ্রহণ করে থাকি। তাদের মধ্যে যদি মূল্যবোধ না থাকত, তাহলে আমাদের বড় বড় project-এ পশ্চিমী দুনিয়ার সাহায্য নেওয়ার জন্য তাদের দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে হতো না। বর্তমান সমাজের মূল্যবোধহীনতাজনিত যে অবক্ষয়, তার কারণ আমরা নিজেরাই। অর্থাৎ কোনভাবেই মূল্যবোধহীনতা মানুষের সাফল্য-লাভের চাবিকাঠি হতে পারে না। অতএব সনাতন ধর্মভিত্তিক না বলে বলা উচিত বেদান্তভিত্তিক যে মূল্যবোধের কথা স্বামীজী প্রচার করেছিলেন—সেই মূল্যবোধের platform-এ দাঁড়িয়ে বাহ্যজগৎকে দেখা ও বিশ্লেষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছিলেন, তার সূচনার কোন লক্ষণ কি বর্তমান যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে?*

—দ্বৈপায়ন দাশগুপ্ত, ডোমেস্টিক এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩৫

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছে। এখন যেদিকে তাকাই, সর্বত্রই শূদ্রজাগরণ ঘটে চলেছে। নিম্নশ্রেণির মানুষ ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে—এটি ঘটনা। কেউ কেউ মনে করেন, উচ্চশ্রেণির মানুষকে টেনে নামানোই সাম্যবাদ; স্বামীজী কিন্তু মনে করতেন নিম্নশ্রেণির মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায়, আর্থিক সুযোগ-সুবিধায়, পেশাগত দক্ষতায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওপরে টেনে তুলে উচ্চশ্রেণির সমকক্ষ করে তোলাই সাম্যবাদের লক্ষ্য। শূদ্রজাগরণের মূলকথাই হলো সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদের অর্থ কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন—ভোগ-তারতম্য বর্জন। অর্থাৎ একটি কোম্পানির কর্ণধার যে-সুযোগসুবিধা পাবেন, সেই কোম্পানির একটি সাধারণ শ্রমিকও সেই সুযোগসুবিধা পাওয়ার যোগ্য। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই জানেন যে, একথা অবাস্তব। কিন্তু অধিকার-তারতম্য বর্জন সম্ভব বলে স্বামীজী নির্দেশ করেছেন। সকলের সমান অধিকারের কথা সনাতন হিন্দুশাস্ত্রেও বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অধিকার-তারতম্য সৃষ্টি করে শোষণের রাস্তা পরিষ্কার রেখেছেন। পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের অধিকার একজন ব্রাহ্মণের যেমন আছে, একজন শূদ্রেরও তেমনি আছে। সাম্যবাদের মূল তাৎপর্য এখানেই। সেই অর্থে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে পৃথিবী যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই শূদ্রজাগরণ পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

প্রশ্ন ঃ *একজন সাধারণ নাগরিক ও স্বামীজীর অনুরাগী হিসাবে আমি সমাজের জন্য কি করতে পারি? (যাবতীয় NGO-এর দ্বারা কৃত conventional কাজ ছাড়া) অন্তত আমার দায়িত্ব (elementary দায়িত্ব) কী?*

—সৌমিক সরকার, শ্রীপল্লী, বর্ধমান-৭১৩ ১০০

উত্তর ঃ ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন—"আত্মদীপো ভব"—তুমি নিজে প্রদীপশিখা হও। সাধারণ নাগরিক এবং স্বামীজীর অনুরাগী হিসাবে তোমার উচিত নিজের জীবনকে দৃষ্টান্তমূলক জীবনে পরিণত করা—যে-জীবনের দিকে তাকিয়ে অনেকে লাভবান হবে এবং তার ফলশ্রুতিতে সমষ্টিগতভাবে সমাজকল্যাণের পথে অগ্রসর হবে। কীভাবে এগোব, কতটা এগোব, এগোতে গেলে কী চাই ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর স্বামীজীর পত্রাবলী এবং তাঁর অন্যান্য রচনাতে বিস্তারিত লেখা আছে। স্বামীজী যে 'রামকৃষ্ণের ছাঁচ'-এর কথা বলে গিয়েছিলেন, সেটিকে conventional বললে NGO-রা সেই conventional কাজই করে চলেছে। অর্থাৎ এই conventional কাজটি জগতের কল্যাণেই শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ন্যূনতা কিছু নেই—বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের উদার ভাবের প্রেক্ষিতে। অর্থাৎ conventional—এই শব্দটির প্রতি অবজ্ঞা না করে বরং তার পশ্চাতে যে-আদর্শ কাজ করছে, সেটিকে সম্যক বুঝে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সেই কাজকে কীভাবে আরো উন্নততর করা যায়—সেটাই আমাদের ভাবতে হবে। ❑

গ্রন্থপরিচয়

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্য

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ • লেখক : অমরনাথ চ্যাটার্জি • প্রকাশক : এস. কে. দত্ত, অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, ৮৭৮৮ রানি ঝাঁসি রোড, পোঃ বক্স নং ২৬৭৯, করোল বাগ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০৫ • মূল্য : ৩০০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬+৩০০ • প্রকাশকাল : ২০০২

অধ্যাপক অমরনাথ চ্যাটার্জি ইতিহাসের ছাত্র। তিনি ভারতে ও বিদেশে বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে সামগ্রিক গবেষণা করেছেন। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে কীভাবে ভারতে মধ্যযুগে এক বিরাট ভাবান্দোলন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে, সেবিষয়ে গবেষকের জিজ্ঞাসু মন নিয়েই তিনশতাধিক পৃষ্ঠার 'মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ' গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে যে-বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল এবং শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন—উভয়েরই গবেষণাভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন গ্রন্থকার। একটি সুলিখিত গৌরচন্দ্রিকার পরে ছয়টি অধ্যায়ে অধ্যাপক চ্যাটার্জি তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। অধ্যায়ের শীর্ষনাম লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কীভাবে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়কে সাজিয়েছেন : 'শ্রীচৈতন্য জীবনালেখ্য', 'শ্রীচৈতন্য আন্দোলন', 'শ্রীচৈতন্য ভাবান্দোলন', 'মধ্যযুগের সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব', 'সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যাবদান' ও 'শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণব নবজাগরণ'। গ্রন্থটিতে একই সঙ্গে পাওয়া যায় ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্যের আলোচনা। গ্রন্থকার শুধু বিভিন্ন উচ্চস্তরের গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, তিনি বাংলা ও ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে অনুসন্ধান চালিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে পাঠক যা পেয়েছেন তা হলো একটি গবেষণাভিত্তিক, সুলিখিত গ্রন্থ—যেখান থেকে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি বস্তুনিরপেক্ষ সামগ্রিক আলোচনা পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক তো বটেই, এমনকি ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের গবেষকরাও এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে অভিনন্দন।

শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক ভাবনাচিন্তার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে পাওয়া গেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। এই নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীচৈতন্য যেমন তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন এক অভূতপূর্ব জীবনচর্যার আদর্শ—যার মূল কথা ছিল পাণ্ডিত্যের অভিমান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে সমাজের আপামর মানুষের মধ্যে অকৃপণভাবে প্রেমবিতরণ। তাঁর সেই প্রেম ছিল বহুমুখী এবং বহু উদ্দেশ্যসাধক। তাঁর অগণিত ভক্ত নিজেদের প্রয়োজনমতো সেই উদার প্রেমের ভাগীদার হয়েছেন, তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছেন, জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করে উদ্ধারলাভ করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বহুমুখী ভূমিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি শুধু ভক্তদের উদ্ধার করেছেন তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের ভারতকে এক নতুন ভাবান্দোলনের মাধ্যমে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, তার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজে জাতিভেদের মতো কিছু দুষ্ট ব্যাধির প্রতিবিধানের পথ দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডূকতা থেকে ভারতীয় সমাজের এক বৃহৎ অংশকে আলোকোজ্জ্বল আধুনিকতার প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধভিত্তিক জীবনচর্যার পন্থা নির্দেশ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর তিরোধান হয় ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে নবদ্বীপে, যখন তিনি 'বিশ্বম্ভর মিশ্র' নামে পরিচিত ছিলেন। পরে ২৩ বছর বয়সে গয়ায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। এরপর থেকে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও উপাস্য দেবতা বলে মনে করতে থাকেন এবং ক্রমশই কৃষ্ণভক্তির গভীরে ডুবে যান। সন্ন্যাসগ্রহণ করে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে পরিচিত হন, পরে গৃহত্যাগ করে ওড়িশার পুরীতে আসেন। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্তিরস ও কৃষ্ণপ্রেমের সাহায্যে জয় করেন নৈয়ায়িক আচার্য সার্বভৌমকে এবং ওড়িশাধিপতি প্রতাপরুদ্রকে। এরপর শুরু হয় তাঁর বিজয়যাত্রা। প্রথমে দাক্ষিণাত্য অভিযান। রায় রামানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন—"কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।" এইসময় তিনি তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় দেন এইভাবে : "আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নৃপতি নই, বৈশ্য নই, শূদ্রও নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থী নই, সন্ন্যাসীও নই; আমি শুধু নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস।" বৎসরান্তে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর ভক্তসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তিনি দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম পর্যন্ত পরিভ্রমণের পর মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। মধ্যে একবার গৌড়দেশে যান। তারপর তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্রজভূমি বৃন্দাবন এবং মথুরা, প্রয়াগ ও কাশী ভ্রমণ শেষে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে নীলাচলে ফিরে আসেন। তিনি সেখানে আঠারো বছর কৃষ্ণনামে বিভোর থাকেন।

ভারত-পরিক্রমায় তিনি বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করে এই কথাটি প্রতিষ্ঠা করেন যে, জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড় এবং ভাগবতই বেদান্তের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে প্রবল ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম নেতার ভূমিকা পালন করেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর দার্শনিক বক্তব্য 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত হয় —যাকে গ্রহণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গড়ে ওঠে। এই ধর্ম অনেকাংশেই প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্ম থেকে পৃথক ছিল। 'মধুর ভাব'কে তিনি ভক্তিবাদের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গুরুত্ব দেন। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায় আটটি শ্লোক ছাড়া আর কিছু রচনা না করলেও তাঁর মত ও পথ ধরে তাঁর নির্দেশে বৃন্দাবনের 'ছয় গোস্বামী' সুবিশাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ও অন্যান্য ভক্তরা বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

শ্রীচৈতন্য শুধু একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথিকৃৎ ছিলেন না, তিনি এক নতুন ধর্মান্দোলনের জনক ছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন গঠন করেন এবং নবদ্বীপে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। নগর-সঙ্কীর্তনের বিরুদ্ধে কাজির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তিনিই নেতৃত্ব দেন এবং কাজিকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য করেন সংগঠিত জনগণের চাপে। এই ঘটনার প্রায় পাঁচশো বছর পরে মহাত্মা গান্ধী শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করেন। একজন সুদক্ষ সংগঠক হিসাবে শ্রীচৈতন্য তাঁর পার্ষদদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের ওপর বাংলায়, রূপ ও সনাতনকে মথুরা-বৃন্দাবনে এবং কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালীকে গুজরাট ও পাঞ্জাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার দেন। সনাতনকে তিনি বৈষ্ণবদের জন্য ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্বন্ধে স্মৃতিরচনার দায়িত্ব দেন। তাঁর ভাবান্দোলনের জন্য তিনি কয়েকটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন; যেমন—কীর্তন, নগর-সঙ্কীর্তন ও মহোৎসব। অতি সহজ সরল জীবনচর্যার মাধ্যমে মানুষের মনকে ঈশ্বরীয় পথে নিয়ে যাওয়া, বিপুলসংখ্যক মানুষকে একত্রিত করা এবং জাতপাত নির্বিশেষে একত্র পঙ্ক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনে যখন হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষজন ভয়ে বা পার্থিব লোভে ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য হচ্ছিল, তখন জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের স্বধর্মে থেকেই সৎ জীবনযাপনের পথ দেখিয়েছিল। তন্ত্রসাধনার বিভৎসতা থেকেও মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি। তিনি সমাজে ধনী-নির্ধনের বিভেদ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষ করে, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ শ্রেণির সমাজে উচ্চ স্থান ও বিশেষ সুবিধাভোগের দাবিরও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। তিনি সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছিলেন এমন এক সমসমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমে 'রাজা প্রজা একসঙ্গে গড়াগড়ি যাবে'। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় বহু 'শূদ্র', এমনকি মুসলমানও স্বীয় সাধনা ও চরিত্রবলে 'গুরু'র মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যবন হরিদাসকে তিনি বরাবর বিশেষ সম্মান দিয়ে গেছেন। এইভাবে সামাজিক ঐক্যসাধনার ব্রতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোল, স্নানযাত্রা ইত্যাদি নতুন নতুন উৎসবের প্রবর্তন করে সামাজিক ঐক্যকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর নারীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চললেও তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান জানাতেন এবং তাঁদের সমস্যাগুলির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর শিষ্যরাই কয়েক হাজার 'নেড়া-নেড়ি'র উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সমাজে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন —বিশেষ করে নিম্নবর্গের বঞ্চিত মানুষদের এবং মহিলাদের। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার তিনি মানতেন না।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই গৌড় বাংলা, উৎকল, উত্তর ভারত এবং অসমে বৈষ্ণব জীবনচর্যা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সব জায়গাতেই স্থানীয় ভাষায় ধর্মপ্রচার করার ফলে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ তিনিই মসৃণ করেছিলেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলিকে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর অনুগামীদের সৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এমনকি পরবর্তী অ-বৈষ্ণব কবিদের মঙ্গলকাব্যেও বৈষ্ণবীয় ভক্তি, বিনয়, নম্রতা, প্রেম, মানবিকতা ও অহিংসার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ওড়িশা ও অসমের সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চরিত্র সেযুগের সাধারণ মানুষকে একটি উন্নততর জীবনচর্যা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অনেক বক্তব্য বিষয়ের এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অনেক মত ও পথের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্য-ভাবান্দোলনের মধ্যে।

যেকোন দিক দিয়েই বিচার করি না কেন, শ্রীচৈতন্য ছিলেন তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'অবতার' এবং অ-বৈষ্ণবদের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের বিচারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবী। এ হেন বিরাট মাপের এক সমাজনেতার ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও প্রভাবের সামগ্রিক পরিচয় সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন অধ্যাপক চ্যাটার্জি। তাঁর এই গ্রন্থ যেমন তথ্যনিষ্ঠ, তেমনি সুলিখিত। ধর্মে বিশ্বাস করুন বা না করুন, যেকোন শিক্ষিত বাঙালি এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে শ্রীচৈতন্যের মূল্যবান ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণাভিত্তিক পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে।

শেষে শুধু একটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি কয়েক জায়গায় 'উড়িষ্যা', কয়েক জায়গায় 'ওড়িষ্যা' এবং একইভাবে 'উড়িয়া' ও 'ওড়িয়া' কথা ব্যবহার করেছেন। বোধহয়, 'ওড়িশা' এবং 'ওড়িয়া' লিখলেই ভাল হতো।

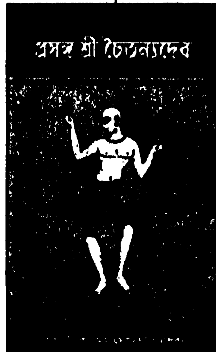
গ্রন্থটির মুদ্রণ উচ্চ মানের, সেজন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম পুরোধাপুরুষ

শুভঙ্কর ঘোষ

***প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব* • লেখিকা : ডঃ মৈত্রেয়ী চৌধুরী • প্রকাশিকা : সুরীতি চৌধুরী, 'নির্জনপ্রহর', বিজয়কৃষ্ণ পল্লী, পোঃ নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১০৩ • মূল্য : ৩৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬+৭৮ • প্রকাশকাল : ২০০২**

বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) অবদান একটি অবিতর্কিত ঐতিহাসিক সত্য। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে লিখিতভাবে শ্রীচৈতন্যচর্চার প্রাবল্য ও প্রাচুর্য মূলত বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কারের চর্চা। তাঁকে এতকাল ভক্তিমার্গের আলোয় দেখার ও দেখাবার চেষ্টা হলেও তাঁর 'human interest' বা মানব-রসে নিষিক্ত জীবনবীক্ষার দিকটিও সমূহ গুরুত্বে আলোচিত হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, নিবিড় ধর্মসাধনা যেমন সত্য, তেমনি সমান সত্য তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা, নৈতিকতা ও মানবপ্রেমের সাধনা। পঞ্চদশ শতকে আত্মপ্রকাশ করে ধীরে ধীরে ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক ছুঁয়ে বিশাল ব্যাপ্ত হয়ে ওঠার সাধনায় সার্থক এই যুগপুরুষ জাতপাতে শতধাবিদীর্ণ হিন্দুসমাজকে যেমন ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার আদর্শে গণতন্ত্রী ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত করে তোলায় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তেমনি ধর্মকে মূল অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেও মানুষের স্বাধিকার ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভাবনার পক্ষে যথোচিত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ তাঁর আশ্রয় ছিল, ফলে তাঁর ধর্মভিত্তিক সমাজবীক্ষা ও মানববীক্ষার যথার্থ মূল্যায়নে কার্ল মার্কস তাঁকে 'রিফর্মার' ও উদারনীতির পুরোধা প্রবক্তা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি।



প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁর স্বীকৃতির পাশাপাশি ঐতিহাসিক নিরিখে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা যখন বলেন : "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ", তখন তাঁর দিব্য জীবন ও দিব্য প্রেমসাধনাকে মেনে নিয়েও বলা যায়—প্রান্তিক মানুষের জাগরণের এটি হলো গণমন্ত্র এবং চৈতন্যদেব হলেন সেই গণ আন্দোলনের পথিকৃৎ। "মুচি হয়েও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"—এই উপলব্ধি সমাজতন্ত্রের উপলব্ধি। হরিনামের সঙ্ঘবদ্ধ উচ্চারণ ও নামসঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী নগর-পরিক্রমা—বর্তমান কালের শ্লোগান ও পদযাত্রার আদি সংস্করণ। দীপবর্তিকা নিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সমবেত পথচলা আজকের মশাল-মিছিলের লোকায়ত নজির। নিজ ধর্মে স্থিত থেকে অন্য মতকে স্বীকার করেও ভিন্নধর্মীদের চিত্তজয় করার 'সেক্যুলার' দৃষ্টির অধিকারী চৈতন্যদেব শুধু ধর্ম-সাহিত্য-সঙ্গীতেই নয়, লোকসংস্কৃতিতে, রূপকলায়, বৈষ্ণব রসতত্ত্বে, নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনে, শিল্প-সাধনায়, দর্শনে, ছড়া-প্রবাদ-ব্যালাড-টেরাকোটায় সুদূর প্রভাববিস্তারী নতুন মাত্রা দিয়েছেন। অপরদিকে দক্ষিণ ভারত, নীলাচল, সর্বোপরি বঙ্গীয় মানচিত্রে ও মানসচিত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক তথা দেবমহিমা স্বীকৃত সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—একাধারে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিপ্রেমের অধিকারী তিনি। বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়েছিলেন চৈতন্যদেবের 'বড় প্রাণ'-এর বাধাবন্ধহীন ব্যাপ্ত হয়ে ওঠার তাৎপর্য।

মধ্যযুগের ক্ষয়, অন্ধকার, ব্যভিচার, শ্বাসরোধী সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে চৈতন্যদেবের মুক্তিদানের সূত্রেই ষোড়শ শতক হয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলীর সুবর্ণযুগ—'চৈতন্য-রেনেসাঁস' হিসাবে চিহ্নিত চৈতন্যজীবনসাধনা, প্রেমভক্তি ও সাধনপদ্ধতির সমগ্র ফসল। তাঁর সপার্ষদ ধর্মান্দোলন বাঙালি সমাজের মাটিঘেঁষা জীবনেরই মহিমান্বিত আন্দোলন। পাঁচশো বছর পরেও তিনি যে আমাদের চৈতন্যের জগৎকে ঋদ্ধ করেন, জিজ্ঞাসু করেন, মহনীয় করে তোলেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অধ্যাপিকা ডঃ মৈত্রেয়ী চৌধুরী প্রণীত '**প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব**' এইসব কারণেই প্রাসঙ্গিক।

অধ্যাপিকা চৌধুরী ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে অত্যন্ত সংহত ও নির্যাসবদ্ধ করে দুই মলাটে সমগ্র চৈতন্যদেবকে বুঝতে চেয়েছেন, আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "ইতিহাসকে বাদ দিলে দেশ-কাল-জাতি ও ব্যক্তিত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যায় না।" এই বোধের নিরিখে তিনি দেশকালযোগে গড়ে ওঠা চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনমহিমা ও লোকায়ত কর্মকাণ্ডকে কিছুটা ভক্তির অতিরেক

সত্ত্বেও চমৎকার ভাষায় সমন্বয়ী জীবনাদর্শে প্রাণিত হয়ে চিত্রিত করেছেন। শ্রীমতী সত্যবতী গিরির 'উন্মোচন' ভূমিকাটি বাড়তি পাওনা হলেও 'প্রস্তাবনা' অংশেই মূল কথাগুলি উপস্থাপনা ও মূল গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা করার মিলিত অঙ্গবন্ধনটি অধ্যাপিকা চৌধুরী অনায়াসে আয়ত্ত করেছেন।

অধ্যাপিকা চৌধুরী ভারত-পরিক্রমায় শ্রীচৈতন্যের অখণ্ড ভারতবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ ও আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রকে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নামসঙ্কীর্তনের ঐতিহাসিক উপযোগিতা, আধ্যাত্মিক মহিমা ও মানবিক তাৎপর্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই মহাপুরুষ প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের বিস্তার, গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপিকা চৌধুরী মনে করেন: "ভক্তিমার্গের সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের স্বীকৃতির সূত্রে চৈতন্যদেবই প্রথম প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব।" তিনি বিভেদমুক্ত আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শপুষ্ট অনুধ্যানেই চৈতন্যদেবের গণসংযোগ সাধনাকে বুঝে নিতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর সমগ্র জীবনসাধনায়, "সঙ্ঘর্ষের পথে নয়, অহিংস আন্দোলনের পথে সমাজবিপ্লবী চৈতন্যদেবের আলোকাভিসার।" বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চৈতন্যপ্রভাব অপরিসীম। অধ্যাপিকা চৌধুরী দেখিয়েছেন: (১) চরিতসাহিত্য সৃষ্টি ('শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ইত্যাদি), (২) শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ব্যাখ্যা অবলম্বনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বদর্শনের সৃষ্টি, (৩) পালাকীর্তনের আসরে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন—সবই চৈতন্যপ্রভাবের ফসল। সর্বোপরি সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিবদল ঘটেছে দেবতাবাদ অপেক্ষা মানবতাবাদের অভিমুখে। দেবতাকে অস্বীকার নয়, গ্রহণ করেই মানুষের দিকে যাওয়া। সামগ্রিক অর্থেই এই ৭৭ পৃষ্ঠার দুই মলাটবদ্ধ গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন: "চৈতন্যদেবের ধর্ম থেকে বাঙালি পেয়েছে আত্মিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক কালচারাল প্রগ্রেস-এর দিঙ্নির্দেশ।"

গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র; ফলে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ঘটেনি। তবু স্বল্প পরিসরেও অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী চৌধুরীর **'প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব'** শ্রীচৈতন্যচর্চার একটি প্রাঞ্জল ও গভীর মাত্রার দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হবে।❑

উন্নততর জীবনচর্যার লক্ষ্যে এক সাধু-প্রয়াস

দিলীপকুমার মোহান্ত

***ধর্ম ও সংস্কৃতি* • লেখক: দেবানন্দ ব্রহ্মচারী • প্রকাশক: অমল সাহা, সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ • মূল্য: ৬৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১০৪ • প্রকাশকাল: ২০০১**

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন করে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থ **'ধর্ম ও সংস্কৃতি'**। গ্রন্থকারের মতে, অতিমানস স্তরে এক সূক্ষ্ম গবেষণা হলো ঈশ্বরসাধনা। **'ধর্ম ও সংস্কৃতি'** গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সাতটি ভাগে বিন্যস্ত। দুঃখের বিষয় হলো, প্রথম দুটি বিভাগেই—যথা 'উৎসবের তাৎপর্য' ও 'উপাখ্যানের আলোকে' প্রাবন্ধিকের ব্যাখ্যা অতীব লঘু, শুধুই বর্ণনামূলক। ভয় হয়, এধরনের ব্যাখ্যা সংগঠিত ও মিলিট্যান্ট ধর্মীয় ফ্যানাটিকদের উৎসাহ দিতে পারে। প্রবন্ধকার-উল্লিখিত হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা হলো: "হীনং দূষয়তি যঃ সঃ হিন্দু।" এধরনের কোন লক্ষণ হিন্দুধর্মের থাকলে তার আকরনির্দেশ করা একান্ত জরুরি। তাছাড়া "ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে হিন্দুসংস্কৃতিকেই বুঝায়"—এসব উক্তি ইতিহাসসম্মত নয়। নিজ মতের সপক্ষে কোন বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিও দেননি গ্রন্থকার। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির বারিধারায় পুষ্ট ও প্রবহমান হলো ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোত। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও এদুটি অভিন্ন নয়। গ্রন্থটিতে যেন বিভিন্ন বিষয় জোর করে একসঙ্গে জড়ো করে দেওয়া হয়েছে; ফলে নামকরণে চমক থাকলেও তা বিষয়ানুগ হয়নি। তাছাড়া ছাপার ভুলও আছে। (৮৯ পৃষ্ঠাতে 'সাকরশ্চ' না হয়ে 'সাকারশ্চ' হওয়া উচিত, 'অবসম্ভাবী' না হয়ে 'অবশ্যম্ভাবী' হওয়া উচিত।)

তবে 'গীতায় কর্ম করার উপদেশ', 'ভক্ত অচিরেই মুক্ত হন', 'সাধনজগতের তিনটি সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি লঘু চালে রচিত হলেও অপেক্ষাকৃতভাবে মূলানুসারী বলা যায়। এধরনের প্রবন্ধ সঙ্কলনে এই বিষয়গুলি আরো গভীরভাবে বিশ্লেষিত হওয়া কাম্য। তথ্যাদি বিষয়েও মূল আকরের নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। অদ্বৈতবেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বললে জগৎকে 'unreal' বা অসৎ বলা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তে পারমার্থিক সত্তা ছাড়াও ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার স্তরভেদ রয়েছে। এসব বিষয় সতর্কতার সঙ্গে মূলানুগভাবে আলোচনা করা দরকার।

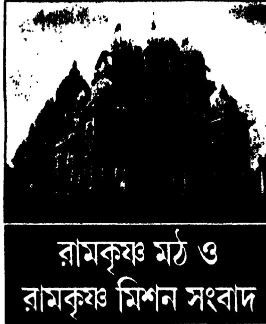
গ্রন্থটির প্রকাশক উন্নত মানের কাগজ ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটির মুদ্রণও ঝকঝকে।❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠ ঃ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনে হাজার হাজার ভক্ত মঠে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ১৯,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা ঃ গত ১৯ নভেম্বর ২০০৩ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত ১৪টি বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের পটে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১০,০০০ বালিকাকে একটি করে পুস্তক প্রদান করা হয়। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রীদের ২০৫টি সোয়েটার, ২,৫০০ খাতা ও ৬৫০টি কলম দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী ঃ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর জন্মতিথি এবং ১২-১৮ জানুয়ারি ২০০৪ যুবসপ্তাহ পালন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আলোচনা, ধর্মসভা ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দীনেশানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী, স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ। দুঃস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ১০৩টি কম্বল ও ৫০ সেট বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করা হয়।


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, শিকড়াকুলীন গ্রাম ঃ গত ২১-২৩ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, শ্রুতিনাটক, পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন যুব-উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী প্রমুখ। এদিন যোগাসন, নৃত্যনাট্য ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন এবং 'গুপ্ত বৃন্দাবনে ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয়দিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং স্বামী শান্তাত্মানন্দজী। সন্ধ্যায় 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাপালা অভিনীত হয়। তৃতীয়দিন বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, রামনামসঙ্কীর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী শান্তাত্মানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। সন্ধ্যায় যাত্রাপালা 'নবাবজননী বিষ্ণুপ্রিয়া' মঞ্চস্থ হয়। তিনদিনের ধর্মসভায় স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীতরাগানন্দজী।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

ভারতে ঃ **আগরতলা, চণ্ডীগড়, চণ্ডীপুর, দিল্লি, মাদুরাই, উটকামণ্ড, পাটনা, পুরী মঠ, রায়পুর, রাঁচি মোরাবাদি আশ্রম, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, ত্রিচুর এবং আলসুর।**

বহির্ভারতে ঃ **সাও পাওলো (ব্রাজিল)।**

উদ্‌ঘাটন

গত ৬ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে একটি নবনির্মিত সভাগৃহের উদ্বোধন করেন। এটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাজে ব্যবহৃত হবে।

গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে বেলগাঁও আশ্রমে (রাজস্থান) নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট ৩১৫ জন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং প্রায় ৫,৫০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ শারীরিক অসুস্থতাবশত আসতে না পারায় এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁর আশীর্বাণী-সম্বলিত একটি ভি. সি. ডি. পরদিন প্রদর্শিত হয়। আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মসভায় শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী ও স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটকের রাজ্যপাল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর (হুগলি) ঃ গত ২১-২৭ জানুয়ারি ২০০৪ ব্যাঙ্গালোরের ভি. এস. ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসকদের নেতৃত্বে একটি দন্ত-চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ২৮৭ জনের চিকিৎসা হয়। এছাড়া স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দাঁত পরীক্ষা করা হয়।

ছাত্রকৃতিত্ব

চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ সালের পরীক্ষায় **বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চেন্নাই বিদ্যাপীঠ)** ছাত্ররা স্নাতক স্তরে রসায়নে ১ম ও ৮ম, গণিতে ৯ম, উদ্ভিদবিদ্যায় ২য়, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এ ৪র্থ, অর্থনীতিতে ৫ম, ইতিহাসে ১ম, সংস্কৃতে ১ম, ২য় ও ৩য় এবং স্নাতকোত্তর স্তরে রসায়নে

২য়, ৩য় ও ৪র্থ, গণিতে ৫ম, উদ্ভিদবিদ্যায় ১ম, অর্থনীতিতে ৪র্থ ও ৫ম, দর্শনে ১ম ও ৪র্থ, সংস্কৃতে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম (২ জন) ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

গত বছর **দেওঘর বিদ্যাপীঠের (ঝাড়খণ্ড)** এক ছাত্র সি. বি. এস. ই পরীক্ষায় অধিকাংশ বিষয়ে শতকরা ১০০ নম্বর পেয়ে ভারত সরকার কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংরক্ষিত আসনে বসে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার সুযোগ-লাভ করে।

শিল্পমন্দিরের (রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি ছাত্র গত বছর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন' পরিচালিত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করে।

দেহত্যাগ

স্বামী মৈত্রানন্দজী (রাম মহারাজ)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ত্রিচুর হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ সালে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চেন্নাই মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, রেঙ্গুন, বারাণসী সেবাশ্রম, কালাডি, তিরুবনন্তপুরম এবং ত্রিচুর কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। গত ১৬ বছর যাবৎ তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাইরে থেকে তাঁকে কঠোর দেখালেও তাঁর ভিতরে ছিল একটি কোমল হৃদয়।

স্বামী সুগতানন্দজী (সুধেন্দু মহারাজ)ঃ গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ রাত ৯টা ৫০ মিনিটে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি পাটনা ও রাজকোট কেন্দ্রে ৫ বছর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে যুক্ত ছিলেন এবং তারপর থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৬ বছর 'রহড়া বয়েজ হোম'-এর সঙ্গে সাধুকর্মীরূপে যুক্ত ছিলেন। রহড়া কেন্দ্রেই তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন অনাড়ম্বর ও কঠোর পরিশ্রমী।

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য (মণিমারন)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ সরস্বতীপূজার দিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বেশ কয়েক বছর তিনি কঠিন হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৯৬ সালে তিনি সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ২০০১ সালে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি মালয়েশিয়া কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। নানা কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল। হাঁপানি সত্ত্বেও তিনি আশ্রমের উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ এক নিবেদিতপ্রাণ ও কঠোর পরিশ্রমী যুব সদস্যকে হারাল। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাবতিথি পালনঃ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপন করা হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনাঃ প্রতি ইংরেজি মাসের ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ও ৩য় বৃহস্পতিবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১ম ও ৩য় রবিবার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং ২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ১,২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ পাঠ, জপধ্যান, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে **'কল্পতরু দিবস'** পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতাল, সংশোধনাগার এবং অনাথাশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া (বিহার)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ ও ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও

স্বামীজীর আবির্ভাবতিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা ও লীলাগীতি পরিবেশন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর ২০০৩ একটি ভক্তসম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী প্রমুখ। গত ১৯-২২ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমে প্রায় ২০০ ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছেন।

ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, মাতৃসঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণ সেবা, বস্ত্র-বিতরণ, আলোচনাসভা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী জগদস্বানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, গোবরডাঙা (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং ১-৪ জানুয়ারি ২০০৪ বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১ ও ২ জানুয়ারি যথাক্রমে 'কালাপাহাড়' ও 'মহাতীর্থ কালীঘাট' যাত্রাপালা এবং ৩ জানুয়ারি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসবে প্রায় ১,৭০০ ভক্ত শোভাযাত্রা সহকারে পথ পরিক্রমা করে। এতে ১৫০ জন কুমারী শ্রীশ্রীমায়ের সাজে সজ্জিত হয়ে অংশগ্রহণ করে। এদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী প্রমুখ এবং প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ৬,০০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে 'যুব উৎসব' এবং দুর্গাপূজার সময় দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩০টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল।

ঝিখিরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (হাওড়া) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীভিত্তিক আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। রাত্রে 'শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র পদচিহ্ন' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন' ডি. সি. ডি. প্রদর্শিত হয়।

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ্ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের এই আশ্রমে পদার্পণ ও উপবেশনের পুণ্যক্ষেত্রটির উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। প্রায় ১৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, গোরাচাঁদ ভবন (কলকাতা-৬) ঃ গত ১৬-২২ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে একদিন বিভিন্ন জেলা শাখাতেও পাঠচক্র, আলোচনাসভা ও সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হয়। 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী—রঙিন চিত্রে' উদ্বোধন করেন সাংসদ অজিতকুমার পাঁজা। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, শ্রীবন্দনাপুরীজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী প্রমুখ।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (হুগলি) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এরপর ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি সাংস্কৃতিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে ভাষণ দেন ডঃ জয়শ্রী মুখার্জি, কৃষ্ণা ব্যানার্জি প্রমুখ। এদিন শতাধিক দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া ঃ গত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর এবং ২৩-২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য, শ্রুতিনাটক, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এদিন একটি স্মরণিকা প্রকাশ ও প্রদর্শনীর সূচনা হয়। ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী প্রমুখ। ২৮ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের নবনির্মিত রিলিফ মূর্তিতে অর্ঘ্যপ্রদান করেন।

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (দক্ষিণ ত্রিপুরা) ঃ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ পরিষদের দ্বাবিংশতিতম অর্ধবার্ষিক সম্মেলন আনন্দনগর, আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী সম্মেলনের উদ্বোধন ও পরিষদীয় সভায় পৌরোহিত্য করেন। পূর্বাহ্ণে একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দেহাতীতানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পাণ্ডু (গুয়াহাটী) ঃ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ গীতি-আলেখ্য, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম পর্যায় উদ্‌যাপিত হয়। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এবং অসমিয়া ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শভিত্তিক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী অনন্তানন্দজী ও অধ্যাপক সুভাষ দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, হাফলং (অসম)ঃ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রায় ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর (কলকাতা-১৪১)ঃ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, সঙ্গীত, গীতিগাথা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশাত্মানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। এদিন দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৫-১৭ আগস্ট ২০০৩ যোগশিক্ষা এবং ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০০৪ এক যুব-উৎসবে বিবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া)ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩ প্রভাতফেরি, পূজা, আলোচনাসভা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মাতৃসঙ্ঘ ও মাটি পরীক্ষাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এছাড়াও এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ১৫০টি পাঠচক্র, ধর্মসম্মেলন, মহিলা, মাতৃ ও ছাত্রী সম্মেলন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, স্মারক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী।

বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নিউ ব্যারাকপুর (কলকাতা-১৩১)ঃ গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী, পূজা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহিলা সম্মেলন, নাটক, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী প্রমুখ। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৪৩০টি কম্বল, ৬টি চাদর ও ২০টি মশারি বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, 'বেদ', 'গীতা', 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'পুঁথি' পাঠ, সঙ্গীত, প্রদর্শনী, ধর্মালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ। প্রায় ৭,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ১৩০ জনের চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সাঁইথিয়া (বীরভূম)ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র, 'গীতা', 'চণ্ডী', 'মায়ের কথা' ও 'সারদা-পুঁথি' পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ পরিষদের ত্রয়োদশ অর্ধবার্ষিক সম্মেলন **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, শকুন্তলা পার্কে** অনুষ্ঠিত হয়। ১৬টি সদস্য আশ্রম ও ৫টি আমন্ত্রিত আশ্রমের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। স্বামী শান্তিদানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী চেতসানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী।

জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ, চরনন্দনবাটী (নদীয়া)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ 'বেদ', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতে ৭,০০০-এরও অধিক ভক্ত যোগদান করেন ও প্রসাদ পান। বিকাল ৩টায় বাজি, বাজনা, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়ার পূর্বমুহূর্তটি স্মরণ করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও ডঃ নমিতা দত্ত।

নাগভবন (কলকাতা-৬)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পালাকীর্তন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করেন স্বামী পূতানন্দজী। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার প্রমুখ। ৩ জানুয়ারি ২০০৪ সাধুভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, দক্ষিণ হারাধনপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, ভজন, পাঠ, আলোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী, মিলনকান্তি পাল প্রমুখ। প্রায় ৮০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীমা কে. জি. স্কুল, কাজিয়ালপাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব ও স্কুলের

প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ভাষণ দেন অনিমা রায়, বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ।

মির্জাপুর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (হুগলি) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয়। প্রায় ১২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৮০০ দরিদ্রনারায়ণকে ধুতি, শাড়ি ও কম্বল এবং ৩০০ দুঃস্থ ছেলেকে জামা-প্যান্ট দেওয়া হয়। একটি পাঠাগার উদ্বোধন করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ডাঃ কালোসোনা পাধা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্র ও 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, পদাবলীকীর্তন, স্বামীজীর জীবনের ওপর চিত্রপ্রদর্শনী, নাটক, স্মরণিকা প্রকাশ, নৃত্যনাট্য, লোকসঙ্গীত, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয়। সারাদিনে প্রায় ৬৫,০০০ ভক্তের সমাগম হয় এবং দুপুরে প্রায় ২৮,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, ওসমান গণি প্রমুখ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, মার্ঘেরিটা (অসম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয়। সভায় ভাষণ দেন বেলা দেব। গত ১৪ জানুয়ারি বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন বেলা দেব ও রিঙ্কু ভট্টাচার্য।

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র (বাঁকুড়া) : গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, বৈদিক মন্ত্র, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কালীকীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব এবং পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী অমেয়ানন্দজী প্রমুখ। প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন স্বামী অমেয়ানন্দজী। ১০০ জন দুঃস্থ মানুষকে ধুতি, শাড়ি ও কম্বল প্রদান করা হয়।

সেবাব্রত

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, জয়নগর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১৩৪টি কম্বল, ৬৩টি জামা-প্যান্ট, ৮টি গেঞ্জি, ৮টি ফুলপ্যান্ট এবং কয়েকটি মশারি বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৪০০ জনকে প্রসাদ ও বিস্কুট দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন স্বামী সুনিশ্চিতানন্দজী।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, জলপাইগুড়ি-নিবাসী নিখিলরঞ্জন রায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বহরমপুর-নিবাসিনী কমলা ব্যানার্জি গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৮ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর (অসম)-নিবাসী অজিতকুমার রায় গত ৩ অক্টোবর ২০০৩ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান-নিবাসিনী লতিকা মজুমদার গত ১১ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষিকা মেরি লুই বার্কের জীবনাবসান

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের এক অসামান্য সেবিকা মেরি লুই বার্ক (ভগিনী গার্গী) গত ২০ জানুয়ারি ২০০৪ স্যান ফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্ণিয়ার মঠাবাসে নিজ কক্ষে পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

৬ খণ্ডে বিভক্ত 'Vivekananda In The West—New Discoveries' মহাগ্রন্থটি রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-বিজয় সম্পর্কিত আকরগ্রন্থ হিসাবে এটি অপরিহার্য। স্বামীজী সম্বন্ধে এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যাদি দেশ ও বিদেশের পাঠকসমাজকে প্রভূত অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৪৮ সালে বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্ণিয়ার স্বামী অশোকানন্দজীর সঙ্গে মেরি লুই বার্কের সাক্ষাৎ হয় এবং শীঘ্রই তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পূজনীয় মহারাজ তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখার জন্য উৎসাহ দেন। ঐ কাজ শেষ হলে মহারাজ তাঁর নিজের সম্বন্ধে লেখারও অনুমতি দেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলি হলো—Swami Trigunatita : His Life and Work (1997), A Heart Poured Out : A story of Swami Ashokananda (2003), A Disciple's Journal : In the Company of Swami Ashokananda (2003)।

মেরি লুই বার্ক ১৯৭৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ভারতে আসতেন এবং বেলুড় মঠের অতিথিনিবাসে থেকে তাঁর কাজকর্ম করতেন। ১৯৭৪ সালে ভারতভ্রমণকালে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় 'সিস্টার গার্গী'। ১৯৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রদত্ত 'বিবেকানন্দ পুরস্কার' তিনিই প্রথম পান। ❑

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✻

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

✻

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

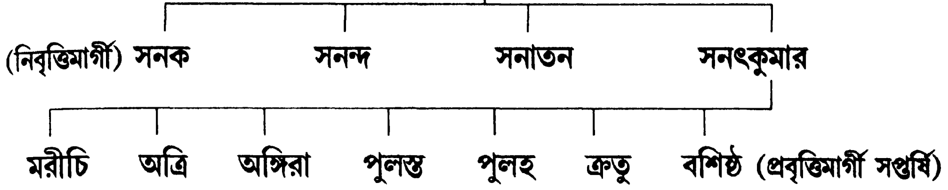


সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

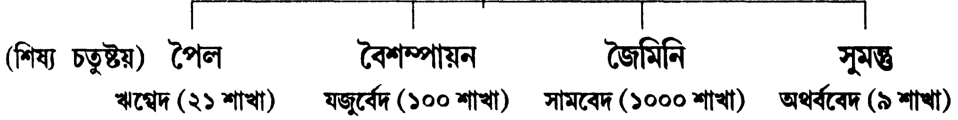
বৈদিক ঋষি-পরম্পরা

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা (আদিকর্তা)

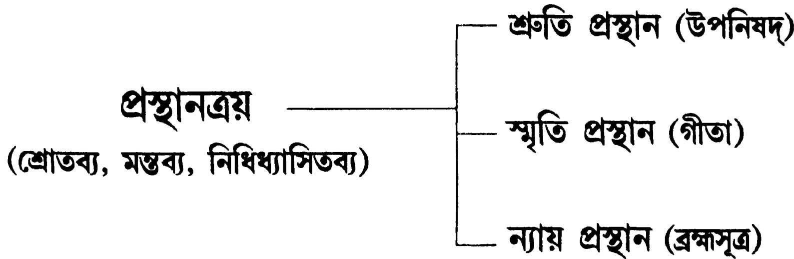


বেদ-বিভাগ কর্তা

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব)



হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ





'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ফোন : (০১১) ২৩৫৮-৭১১০/৩০২৩
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ফোন : (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

অসম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর ফোন : (০৩৮৪২) ২৬৬৭৮৯, ২৬৭৭৮৯
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ, ফোন : (০৩৮৪৩) ২৬২২৭২
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭, ফোন : (০৩৬১) ২৪৭০৯৯১
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা ফোন : (০৩৮১) ২২৩০২২২, ২৩৭৫৮৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম** পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যাণ্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী, ফোন : (০৬৭৫২) ২২২৪৭৯, ২২৮৯১৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি** খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮, ফোন : (০৬৭১) ২৩০৩৮৯২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্‌হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩, ফোন : (০৩৬০২) ২১১৮৫৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ ফোন : (০৬১২) ২৬৭০৮১৫

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি রাঁচি-৮৩৪০০৮, ফোন : (০৬৫১) ২৫৪-১৯৭০/১০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**, বিষ্টুপুর জামশেদপুর-৮৩১০০১, ফোন : (০৬৫৭) ২৪২৩৭৯৫, ২৪৩০৬৯৯
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০ ফোন : (০৫২২) ২৭৮-৭১৯১/৭১৪৩

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ** কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **পি. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

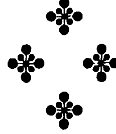
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনি আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনি, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এ/৭, রচনা সোসাইটি বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড বালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : (০২৬৩২) ২৪২৩৭৩ ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com

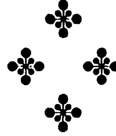
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No. 3
March
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

ISSN 0971-4316
9 770971 431004

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন

গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৫ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-**ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

২০০৪ সালের জন্য **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য** বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'**কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক **গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন** করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা **প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ** করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন'-এর সেবায় আটটি **স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে।** একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী [illegible]তানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ান[illegible]** এবং **স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে** উৎসর্গীকৃত। **'উদ্বোধন'-এর জন্য [illegible] দা[illegible] আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে [illegible] পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' —এই [illegible] ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। [illegible] M.O. কুপনে** তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। [illegible]আপন দিতে গেলে **'Udbodh[illegible] Office, K[illegible]kata-700003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট [illegible]বেন।

[illegible] সম্পাদক : স্বামী [illegible] সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নি



বৈশাখ ১৪১১ ৪র্থ সংখ্যা

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়

১০৬তম ব উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' : ১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) ডাকখরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড,** ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে Service Charge বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে।

M.O. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৬।।
১০৬তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ● বৈশাখ ১৪১১ ● এপ্রিল ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা



রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

১৪১১ বঙ্গাব্দ / ২০০৪-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১১ বৈশাখ	শনিবার	২৪ এপ্রিল	২০০৪
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২১ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৪ মে	,,
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	১৮ আষাঢ়	শুক্রবার	২ জুলাই	,,
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩১ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১৫ জুলাই	,,
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৪ ভাদ্র	সোমবার	৩০ আগস্ট	,,
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২১ ভাদ্র	সোমবার	৬ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৮ ভাদ্র	সোমবার	১৩ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২১ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	৭ অক্টোবর	,,
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৮ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	১৪ অক্টোবর	,,
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৭ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	২৩ নভেম্বর	,,
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৯ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	২৫ নভেম্বর	,,
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৫ পৌষ	সোমবার	২০ ডিসেম্বর	,,
যিশুখ্রিস্ট		৯ পৌষ	শুক্রবার	২৪ ডিসেম্বর	,,
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৯ পৌষ	সোমবার	৩ জানুয়ারি	২০০৫
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২৩ পৌষ	শুক্রবার	৭ জানুয়ারি	,,
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১ মাঘ	শনিবার	১৫ জানুয়ারি	,,
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	১০ মাঘ	সোমবার	২৪ জানুয়ারি	,,
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৮ মাঘ	মঙ্গলবার	১ ফেব্রুয়ারি	,,
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৭ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১০ ফেব্রুয়ারি	,,
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৯ মাঘ	শনিবার	১২ ফেব্রুয়ারি	,,
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	১২ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	২৪ ফেব্রুয়ারি	,,
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৮ ফাল্গুন	শনিবার	১২ মার্চ	,,
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		৬ চৈত্র	রবিবার	২০ মার্চ	,,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১১ চৈত্র	শুক্রবার	২৫ মার্চ	,,
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৫ চৈত্র	মঙ্গলবার	২৯ মার্চ	,,

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৪ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	১৮ মে	২০০৪
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২০ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতিবার	৩ জুন	,,
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	৫ আষাঢ়	শনিবার	১৯ জুন	,,
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	২৭ আশ্বিন	বুধবার	১৩ অক্টোবর	,,
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	৩ কার্তিক	বুধবার	২০ অক্টোবর	,,
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৫ কার্তিক	বৃহস্পতিবার	১১ নভেম্বর	,,
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	২০ নভেম্বর	,,
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	১০ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	২৬ নভেম্বর	,,
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১ ফাল্গুন	রবিবার	১৩ ফেব্রুয়ারি	২০০৫
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৪ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৮ মার্চ	,,

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	২, ১৮, ৩১ (এপ্রিল ১৫, মে ১, ১৪)	কার্তিক—	৭, ২২ (অক্টোবর ২৪, নভেম্বর ৮)
জ্যৈষ্ঠ—	১৬, ৩০ (মে ৩০, জুন ১৩)	অগ্রহায়ণ—	৬, ২২ (নভেম্বর ২২, ডিসেম্বর ৮)
আষাঢ়—	১৫, ২৯ (জুন ২৯, জুলাই ১৩)	পৌষ—	৭, ২৩ (ডিসেম্বর ২২, জানুয়ারি ৭)
শ্রাবণ—	১২, ২৬ (জুলাই ২৮, আগস্ট ১১)	মাঘ—	৬, ২২ (জানুয়ারি ২০, ফেব্রুয়ারি ৫)
ভাদ্র—	১০, ২৫ (আগস্ট ২৬, সেপ্টেম্বর ১০)	ফাল্গুন—	৭, ২২ (ফেব্রুয়ারি ১৯, মার্চ ৬)
আশ্বিন—	৮, ২৪ (সেপ্টেম্বর ২৪, অক্টোবর ১০)	চৈত্র—	৭, ২২ (মার্চ ২১, এপ্রিল ৫)





মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং।

মন সর্বদা ধর্মের আগে আগেই চলে, (কারণ) সব ধর্মই মন থেকে জাত। কুমনে যে কুকথা বলে অথবা কুকর্ম করে, দুঃখ নিত্যসঙ্গিরূপে দিনরাত তার কাছে কাছেই ফেরে—যেমন গাড়ির চাকা বলদের পিছনে অবিরত ঘোরে।

❀



মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।

মন সর্বদা ধর্মের আগে আগেই চলে, (কারণ) সব ধর্মই মন থেকে জাত। প্রসন্ন মনে যে সৎকথা বলে অথবা সৎকর্ম করে, সুখ নিত্যসঙ্গিরূপে দিনরাত তার কাছে কাছেই ফেরে—যেমন বিচ্ছেদহীন সাথি হয়ে ছায়া কায়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

❀

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা।

কলহে মত্ত মূর্খলোকেরা কখনো চিন্তা করে না যে, তারা নিত্য প্রতিক্ষণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যার মনে সর্বদা মৃত্যুচিন্তা থাকে, তার অন্তর থেকে দ্বন্দ্ব-কলহ সমূলে ধ্বংস হয়।

ভগবান বুদ্ধ

(ধম্মপদ, যমকবগ্‌গো, ১, ২, ৬)

শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, 'বড়দের' শব্দটি যত না অভিভাবকগণের উদ্দেশে ব্যবহৃত, তাহা অপেক্ষা ইহার লক্ষ্য ঢের বেশি যাঁহারা কেন্দ্র কিংবা রাজ্য-স্তরে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন—তাঁহাদের দিকে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে শিক্ষাক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে মন্দ হইবে না।

স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও তাহার বাস্তবায়ন

'Centre for Research in Rural and Industrial Development' কর্তৃক প্রকাশিত 'Education in India' (1781-1985) গ্রন্থের মুখবন্ধে পি. এন. হাসকর লিখিয়াছেন ঃ "ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন আছে, এই ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু সেই সংস্কারের পদ্ধতি এবং লক্ষ্য কী তাহা লইয়া বিতর্ক হইতে পারে।"

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী 'বোর্ড' নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'Central Advisory Board of Education' (CABE) এবং ঐ মাসেই সকল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করিয়া দিল্লিতে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য একটিই, অর্থাৎ সদ্যোমুক্ত জাতির পুনর্গঠনের জন্য যাহা যাহা করণীয় তাহার মধ্যে 'শিক্ষা'কে অগ্রাধিকার দান। সেই সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় ১৩,০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৯১টি মহাবিদ্যালয় ছিল। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৬.৬৭। শিক্ষাজগতে অসংখ্য বাধা, বিপুল প্রতিবন্ধকতা এবং অকল্পনীয় আঞ্চলিক অসাম্যের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়াও কয়েকটি অতিসাহসী সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত সেই সময়ে লওয়া হইয়াছিল। যেমন নারী-পুরুষের শিক্ষিতের হার সমানুপাতিক করা হইবে, মাধ্যমিক স্তর হইতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে (যাহা তখনি রূপায়িত হয় নাই), প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারণ ঘটানো হইবে, দেশের সর্বত্র সমচরিত্র পাঠক্রম প্রচলনের ব্যবস্থা করা হইবে ইত্যাদি। কিন্তু আঞ্চলিক শিক্ষানীতির সহিত কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির পার্থক্য দূরীকরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা তখন করা হয় নাই। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিরই সহগমন করিবে—এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনেক পূর্বেই লওয়া দরকার ছিল। পরবর্তী কালে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনও তৃণমূল স্তরে শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছিল।

শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য সরকার বহুসংখ্যক শিক্ষা কমিশনের জন্ম দিয়াছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আলো দেখাইবার জন্য তাঁহারাই স্বয়ং অন্ধকারে ফিরিয়াছেন। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি তাঁহাদের সদুপদেশকে রূপায়িত করিবার মতো কখনো ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যথার্থই বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২), এবং আরো পরে কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৬৮ সালে কোঠারি কমিশনের সুচিন্তিত প্রতিবেদন ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে একটি 'শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি'র বিল পাস করা হয়। ইহাই বোধহয় ভারতবর্ষের প্রথম 'জাতীয় শিক্ষানীতি'। এই নীতিতে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে বাহির হইয়া আসিবার কথা বলা হইল। কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কথা বলা হইল। শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নততর করিবার কথা বলা হইল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরো বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার কথা বলা হইল। আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে 'সমাজসেবা'কে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করা হইল। ইহার সত্তর বৎসর পূর্বে পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একই কথা বলিয়াছিলেন ঃ "স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সহিত ইংরেজি আর science পড়ানো চাই; technical education চাই যাতে industry বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪০৩)

অবশ্য স্বামীজীর পূর্বেও 'টেকনিক্যাল শিক্ষা'র ব্যাপারে কেহ কেহ ভাবনাচিন্তা করিয়াছিলেন। যেমন ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন যখন শিক্ষার সার্বজনীন সমস্যার উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেন, তখন প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে হার্টগ কমিটি (১৯২৯), সাপ্রু কমিটি (১৯৩৪) প্রভৃতিরও টেকনিক্যাল ও বৃত্তীয় শিক্ষার

প্রতি বিশেষ নজর ছিল এবং ১৯৩৬ সালে উড-অ্যাবট কমিশনের তদারকিতেই প্রথম পলিটেকনিক কলেজের পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হইল।

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে, সকল কমিশনই মাধ্যমিক স্তরকে মূলত উচ্চ শিক্ষার একটি প্রস্তুতিপর্ব বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন। এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র বলিতে ঐ মাধ্যমিক স্তরকেই চিহ্নিত করিতেছিলেন। কথাটা যেন এইরূপ যে, মাধ্যমিক স্তরের পরে মানুষের আর নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই! ১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশনই প্রথম সোচ্চারে বলিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্তর, এবং এটিকে উচ্চশিক্ষার একটি প্রস্তুতিপর্ব বলিলে ভুল হইবে। যদি কেহ ইচ্ছা করে, মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর ইচ্ছানুযায়ী নিজের পেশা বা বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারে। এবং কোঠারি কমিশন (১৯৬৪) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলিলেন, নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র কেবল মাধ্যমিক স্তরে নয়, উচ্চশিক্ষার যেকোন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেনঃ "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়াই মনে করি।" (দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, 8th Edn. p. 231) কিংবা "(আজকালকার শিক্ষাপ্রণালীতে) প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি গড়া কল বৈ তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বর্জিত হচ্ছে।" ('বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১)

সরকার 'পঞ্চায়েতিরাজ' প্রকল্প রূপায়ণ করিবার সময়ে গণশিক্ষার কথা বলিয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাহার ৭৫ বৎসর পূর্বেই গণশিক্ষার কথা বলিয়াছিলেনঃ "শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ— এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই।... পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।... যাঁদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড়লোক [মহাপুরুষ] জন্মায়।" (ঐ, পৃঃ ২৮-২৯)

মানবসম্পদের উৎকর্ষসাধন

মাদ্রাজ শহরে একটি সাক্ষাৎকারে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেনঃ "দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ, তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।" (দ্রঃ Complete Works, Vol. V, p. 222)

১৯৮৫ সালে ভারত সরকারের 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক' সৃষ্টি, যদিও অত্যন্ত বিলম্বে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ—সেব্যাপারে সন্দেহ নাই। বস্তুত, একটা নিরাকার ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার এই প্রচেষ্টা এখন অনেকটাই সফল। ইহার পশ্চাতে অবশ্য আরো একটি কারণ ছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ঐ বৎসরেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, একটি বহিরাগত বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি ক্রমশ বলবান হইতেছে এবং ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সৃষ্টি করিয়া কিংবা বিলাসব্যসন এবং ড্রাগ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য উপকরণের সাহায্যে যুবশক্তির মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করিতে প্রবলভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। মূলত ১৯৮৬ সালে গৃহীত NPE (National Policy on Education) বা জাতীয় শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকেই শিক্ষায় সার্বিক সাম্য আনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। উহার যথার্থ প্রয়োগ হইয়াছে অথবা অপপ্রয়োগ হইয়াছে, কিংবা উহা কেবল তত্ত্বাকারেই রহিয়া গিয়াছে ইত্যাদি বিচার করিবার অবসর এই প্রবন্ধে নাই, কিন্তু অদ্যাবধি যে-পরিমাণ অসাম্য, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কথা প্রত্যহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠে। ১৯৮৯ সালে আচার্য রামমূর্তির নেতৃত্বে যে পর্যবেক্ষণ কমিটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার 'বিকল্প' উপায় উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টামণ্ডলী ১৯৯২ সালে এন. জনার্দন রেড্ডির নেতৃত্বে নির্মিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কিছু নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যথা—অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, বয়স্কশিক্ষা, জেলাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন, নারীদের মধ্যে সাম্য আনয়ন, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর (backward class) বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষায়তনে দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করা, পরিবেশ-সচেতনতা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, কম্পিউটার শিক্ষা এবং গোষ্ঠী ও অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। সেই সময়ে শিল্পে দক্ষ কারিগরের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকে কর্মমুখী করিয়া তুলিবার জন্য 'ভোকেশন্যাল' কোর্স চালু হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনটি—ব্যক্তিগত উদ্যোগে কর্মসংস্থান, দক্ষ কারিগরের চাহিদা-যোগানের পার্থক্য হ্রাস এবং যাহারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে চাহে, তাহাদের সম্মুখে একাধিক পথ খুলিয়া দেওয়া। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১৫০টি ভোকেশন্যাল কোর্স চালু করা সম্ভব হইয়াছে। সারা দেশে ৩৭৩টি পলিটেকনিক কলেজ এবং গ্রামাঞ্চলে ও মফস্‌সলে

তাহাদের কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বামীজীর অভীপ্সিত Community Polytechnic ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে 'বিদ্যালয়-ছুট'দের সংখ্যা ১৯৬১ সালে ৭১% হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৯৫ সালে ৫৬% হইয়াছে। এবং তফসিলি ও উপজাতি শিক্ষার হার ১৯৬১ সালের তুলনায় এখন শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত আরো কিছু আলোচনার পূর্বে একান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির হার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলে মন্দ হইবে না। যদিও কিছু কিছু অঞ্চলে দুরবস্থা কল্পনাতীত, তথাপি পার্শ্ববর্তী দেশগুলির তুলনায় ভারত যে বহুলাংশে অগ্রসর হইয়াছে তাহা একজন পাকিস্তানি শিল্পোদ্যোগী তথা সাংবাদিকের প্রতিবেদন হইতে কিছুটা অনুমিত হইবে। বিগত ডিসেম্বর মাসে লাহোরের একটি সংবাদপত্র 'The News International'-এ তিনি (মাসুদ হাসান) দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন (ইংরেজি হইতে আক্ষরিক নহে, ভাবানুবাদ মাত্র দেওয়া হইল)—

একটি অতিপরিচিত রাস্তা দিয়া পাঁজরের হাড় ভাঙিতে ভাঙিতে গাড়ি লইয়া দীর্ঘদিন পরে যখন গন্তব্যস্থলে যাইতেছিলাম, তখন মনে পড়িতেছিল আমি যখন কিণ্ডারগার্টেনে পড়িতাম, তখনও রাস্তায় এইরূপ অতিশয় গর্ত ছিল। এইরূপ পুরু ধূলিভরা রাস্তা তখনও দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের কথা মনে হইয়াছিল। হয়তো ভারতবর্ষেও এই সকল সমস্যা সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তথ্য অন্য কথা বলিতেছে। সীমান্তের ওপারে [অর্থাৎ ভারতবর্ষে] যেভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসিতেছে তাহা বিস্ময়কর।

*বর্তমানে **IT** (Information Technolgy) বা তথ্যপ্রযুক্তির কারণে ভারতবর্ষের বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি-হার ১,০০০ কোটি ভারতীয় মুদ্রা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১৫টি মোটরগাড়ি নির্মাতা ভারতবর্ষ হইতে যন্ত্রাংশ ক্রয় করিয়া থাকে। ফলে এই খাতে ভারতের লভ্যাংশ এখন ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করিয়াছে। এবং অবিলম্বে ইহা ১½ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করিবে। আগামী পাঁচ বৎসরে আশা করা যায় উহার পরিমাণ হইবে ১৫ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মোটর সাইকেল নির্মাতা হিরো হণ্ডা—যাহা প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষ মোটর সাইকেল নির্মাণ করে—ভারতেই অবস্থিত। এবং আমেরিকান মোটরগাড়ি কোম্পানি রোভার বছরে ১ লক্ষ টাটা ইণ্ডিকা গাড়ি ক্রয় করিয়া নিজের নামে চালাইতেছে। হণ্ডা, টয়োটা এবং ভল্ভো 'ভারত ফর্জ' নামক [ভারতে অবস্থিত] পৃথিবীর বৃহত্তম গলিত ধাতুর কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ১.২০ লক্ষ টন গলিত ধাতু ক্রয় করিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ল্যামিনেটেড টিউব নির্মাতা 'এসেল প্রোপ্যাক'-এর শতকরা ২৫ ভাগের অংশীদার ভারত। ভারতের বিভিন্ন কোম্পানি পৃথিবীর মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হইতেছে। 'অস্টন মার্টিন' কোম্পানি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সস্তায় স্পোর্টস কার নির্মাণের জন্য ভারতের একটি কোম্পানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত হইতে ঐসকল গাড়ি বিদেশে রপ্তানি করা হইবে। ২০১০ সাল নাগাদ ৫ লক্ষ হিউন্দে স্যাঁতরো গাড়ি ভারত হইতে দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি হইবে। ভারতের ঔষধ নির্মাতাগণও কেহ বসিয়া নাই। এখন ভারতীয় ঔষধের বিক্রয়লব্ধ আয় ৬½ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করিয়াছে। এবং ইহার বৃদ্ধিহার প্রতি বৎসর ৮-১০%। ওষধি (**medicinal plant**) বিক্রয় করিয়া ভারতের আয় বৎসরে ৪,০০০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে সুপার কম্পিউটার নির্মাতা তিনটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। অপর দুই দেশ—আমেরিকা ও জাপান। মহাকাশে ভারত-নির্মিত **INSAT** কৃত্রিম উপগ্রহ সর্বদেশে, সর্বকালে পৃথিবীর বৃহত্তম।*

*আরো দুঃখের খবর রহিয়াছে। বিশ্বে যেসকল দেশ হীরা কর্তন ও পালিশ করিতে পারে, তন্মধ্যে ভারত প্রথম তিন দেশের অন্যতম। এবং সারা পৃথিবীর প্রতি দশটি হীরার মধ্যে নয়টি হীরাই ভারত হইয়া অন্যত্র গমন করে। ২০০২ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য শতকরা ১০৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৭০টির বেশি আন্তর্জাতিক কোম্পানি তাহাদের গবেষণা ও উন্নয়ন [**R & D** (Research and Development)] বিভাগ ভারতবর্ষে নির্মাণ করিয়াছে। এমনকি চিনকেও অনেক ক্ষেত্রে ভারত অতিক্রম করিতেছে। **GE** কোম্পানির ১,৬০০ গবেষক ভারতীয় এবং মাত্র ১০০ চিনদেশীয়। ভারতের সর্বত্র টেলিকমিউনিকেশনে ফাইবার অপটিক ব্যবহার করিয়া যোগাযোগব্যবস্থাকে ৭৫,০০০ গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একজন ভারতীয় **MBA**-র জন্য খরচ হয় ৫,০০০ ডলার, একজন আমেরিকান **MBA**-র জন্য দরকার ১,২০,০০০ ডলার। বাইপাস অপারেশনের জন্য আমেরিকায় খরচ হয় ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ টাকা। ভারতে এখন এই ব্যয় মাত্র ৪০,০০০ টাকা।*

ইহা সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সকলেই মহা উদ্যমী, মহা সৎ ব্যক্তি। সেখানেও আমলাতন্ত্র রহিয়াছে, অসংখ্য ক্ষমতালোভী রাজনীতিকের ঘৃণ্য দলবাজি রহিয়াছে, ১০০ কোটি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত অ-কুশল ও অলস, এবং অত্যন্ত সীমিত পরিকাঠামো লইয়াই সকলকে কর্ম করিতে হয়। তথাপি আমাদের সহিত তাহাদের কত পার্থক্য! [ক্রমশ]

স্বামী শিবানন্দের পাঁচটি পত্র



মনোরমা সরকারকে লিখিত

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
18.8.31

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় তোমরা কুশলে আছ এবং বর্ম্মার গোলমাল অনেক কমে গেছে জেনে খুবই প্রীত হইয়াছি।

মা তোমরা ঠাকুরকে খুব ডাক—তিনি সর্ববিধ মঙ্গল তোমাদের করিবেন। ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা সব তিনি দিবেন।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একটু ভাল। তোমরা সব কুশলে থাক। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH
৭।৫।৩২

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর এখন আবার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল মনে হইতেছে। সকলই তাঁর ইচ্ছা মা। তাঁর উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। তোমরাও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখ। মঙ্গলময় তিনি—মঙ্গলই করিবেন।

বেবী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। চিকিৎসকরা যেমন বলেন সেই মত চলা ছাড়া আর উপায় কি? প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সে সম্পূর্ণ নিরাময় হউক। তাহাকে খুব সাবধানে রাখিও।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাসার সকলকে জানাইবে। মা, ঠাকুরই একমাত্র ভরসা। তাঁকে অবলম্বন করিয়াছ; তোমাদের কোন ভয় নাই, নিশ্চিত জানিও। আর অধিক কি?

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

।৩॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
Belur Math
29.4.32

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। ঠাকুর সকল প্রার্থনাই শুনেন[।] স্ফুট ও অস্ফুট সমস্ত কথাই তিনি শুনতে পান। তবে সব পূরণ হয় না তার কারণ, কোনটাতে আমাদের মঙ্গল হইবে তাহা ত আমরা বুঝি না। যেটীতে যাহার কল্যাণ অর্থাৎ তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়—তাহা তিনি পূরণ করেন। তিনি যাই করুন, আমাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন তাঁকে করিতে হইবেই।

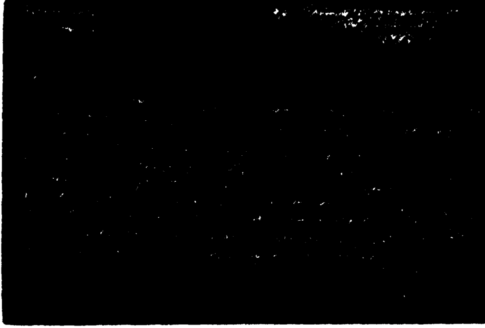
তুমি করিও কোন চিন্তা নাই। তিনি প্রেম ভক্তি বিশ্বাস দিয়াছেন আরও দিবেন। যে অবস্থায় তিনি রেখেছেন তাঁর উপর নির্ভর করে থাকলে তিনি ঐখান হইতেই তোমাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবেন।

আমার শরীর তাঁর দয়ায় কয়েকদিন অপেক্ষাকৃত একটু ভাল। আশাকরি তোমরা কুশলে আছ। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাটীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥৪॥
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
Belur Math
13.5.32



শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। আমার শরীর তাঁর দয়ায় অপেক্ষাকৃত একটু ভাল। সব উপসর্গই কম আছে।

তোমার অবস্থা সবই বুঝিতেছি। খুবই প্রার্থনা করতে হয় এবং নিজে সাবধানে থাকিতে হয়—যখনই ঐসব ভাব মনে উদয় হয় দূরে চলে যেতে হয়। আন্তরিক চেষ্টা ও প্রার্থনা এবং তাঁর দিকে মন দিতে দিতে সৎভাব সব জাগ্রত হয়। কোন চিন্তা নাই?—লেগে পড় যেমন আছ থাক—পবিত্রতা, ভক্তি বিশ্বাস তোমার বৃদ্ধি পাইবেই। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

মনোলোভা মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

॥৫॥
ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৯শে পৌষ, ১৩৩৯

মা মনোলোভা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। উমাপদ এখন ভাল আছে ত? কোন চিন্তা নাই। দাঁতের বেদনা আস্তে ২ কমে যাবে। উৎসবের পর উৎসব চলিতেছে—আর চিঠিও অনেক আসে সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় পত্রাদির উত্তর যথাসময়ে আর দেওয়া হয় না—তাহাতে তোমরা চিন্তাযুক্ত হইও না। আমার সংবাদ ত নানাপ্রকারে তোমরা পাইয়া থাক। তবে আর কি?

অধিক কি লিখিব। তুমি উমাপদ ও ছেলেপিলেরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমাদের সর্ব্বদা দেখিতেছেন। কোন ভাবনা করিও না। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। ইতি।

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পত্র ১ এবং ২ মনোরমা সরকারের পুত্রবধূ, গড়িয়া-নিবাসিনী বাসন্তী সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পত্র ৩, ৪ ও ৫ শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী সদ্যপ্রয়াত যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

* মনোলোভা দেবী উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী।



বৈশাখ ১৩১১
এপ্রিল ১৯০৪

উপনিষদের গল্প।

উপনিষদে যেসকল উপাখ্যান আছে, তাহা আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা দ্বারা অনেকের উপকারের সম্ভাবনা। উহাতে যেমন নানা উপদেশ নিহিত, তদ্রূপ উহা দ্বারা অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহার জানিতে পারা যায়। আরও ঐসকল গল্প পাঠ করিলে মূল উপনিষদ্ পাঠেও অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, এইসকল বিবেচনা করিয়া আমরা উপনিষদের প্রধান প্রধান গল্পগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

দেবগণের ব্রহ্মদর্শন

কেনোপনিষদে এই উপাখ্যান আছে। ব্রহ্ম দেবতাদের হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আমরা যেকোন উচ্চকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা যেমন বাস্তবিক ব্রহ্মশক্তিবলে হইলেও তাহা নিজেতে আরোপিত করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকি, দেবগণেরও ঠিক সেই দশা হইল। দেবগণও ব্রহ্মকে ভুলিলেন, ভুলিয়া আপনারাই অভিমান করিতে লাগিলেন, আমাদেরই কৃত এ বিজয়, আমাদেরই এ মহিমা। বাস্তবিক কি সকল জাতির জীবনেও এই ব্যাপার ঘটে না? মহাশক্তির কৃপায় তাঁরই শক্তিবলে এক জাতি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু যখন সে বিজয়লক্ষ্মী ও ধনধান্য, সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই বিজয়লক্ষ্মী কোথা হইতে আসিল, তাহা ভুলিয়া আপনিই আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া অপরকে আপনার গৌরব, আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে যায়। তখনই সেই জাতির পতনের সূচনা হয়।

দেবগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। তাই তিনি তাহাদের এই অভিমান জানিতে পারিয়া তাহাদের নিকট নিজ যোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিত অত্যদ্ভুত বিস্ময়জনকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও পূজ্য বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি কে, তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, 'জাতবেদঃ, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আপনি জানিয়া আসুন।' অগ্নি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' অগ্নি উত্তর দিলেন, 'আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।' 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি সব দগ্ধ করিতে পারি—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিতে পারি।' 'এই তৃণগাছটী দগ্ধ কর দেখি।' হায়, হায়, অগ্নে, কাহার সম্মুখে অভিমান করিতেছ? অভিমানভরে বুঝিতেছ না, যাঁহার এককণা শক্তি পাইয়া তোমার এই অগ্নিত্ব, তাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি অগ্নির সৃজন হইতে পারে। অগ্নির যত শক্তি, সব সেই তৃণদাহে নিয়োজিত হইয়া বিফল হইল, তখন তিনি মানে মানে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণকে নিবেদন করিলেন, 'জানিতে পারিলাম না, পূজনীয় স্বরূপ ইনি কে?'

তখন তাঁহারা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। বায়ুকেও সেই প্রশ্ন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিত হইল। বায়ুও অগ্নির ন্যায় নিজের বড়াই করিয়া বলিলেন, 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।' 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি ইচ্ছা করিলে জগতের সব জিনিষ একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি।' তাঁহাকেও সেই তৃণ প্রদত্ত হইল। তিনি অনেক চেষ্টায়ও তাহাকে তাহার স্থান হইতে একবিন্দুও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন হেঁটমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তিনিও আপনার অক্ষমতা জানাইলেন।

এইবার দেবদেব ইন্দ্র প্রেরিত হইলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কোথায় সেই জ্যোতির্ম্ময়? এ যে বহুশোভমানা হৈমবতী উমাদেবী আকাশে আবির্ভূতা। ইন্দ্র ভক্তিভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মা, যিনি এইমাত্র ছিলেন, বিদ্যুতের মত প্রকাশ হইয়া ক্ষণপরেই লুকাইলেন, তিনি কে?' তখন জগজ্জননী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমরা ইঁহারই শক্তিতে যুদ্ধে জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উহাকেই তোমাদের সর্ব্ববিজয়ের মূলীভূত কারণ জানিয়া অভিমানশূন্য হও।'

হায়, হায়, কবে ব্রহ্ম আমাদের ঘাড় ধরিয়া এইরূপে অভিমানশূন্য হইতে শিখাইবেন? কবে আমাদের এই এক ছটাকের 'আমি' অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিব? যখন ভাবি, তখন ত হাসি পায়। হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। তুই কে যে, তা করবি? যে করবার, সে ত কচ্ছে। তুই কেবল আপনাকে চিনে নে। হে অনন্ত আকাশের অনন্ত বাণী, নিত্য গম্ভীরস্বরে তুমি বল, 'আমি আছি', 'আমি আছি'। ভুলে যাই দেহ, ভুলে যাই মন, ভুলে যাই সংসার, ভুলে যাই কর্ম্ম। প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তোমার নাম গেয়ে বেড়াই। নাহং নাহং, তুঁহুঁ তুঁহুঁ। মুক্তি হবে কবে, 'আমি' যাবে যবে। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥২৪॥

শ্লোকার্থঃ *স্রুব (যাহা দ্বারা যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়) প্রভৃতি অর্পণপাত্র ব্রহ্ম, ঘৃত (হবি)-আদি অর্পণীয় বস্তুও ব্রহ্ম। অগ্নি ব্রহ্ম, যে-ব্যক্তির দ্বারা হোম সম্পাদিত হইতেছে তিনি ব্রহ্ম। এই আহুতিকার্য (হোম) ব্রহ্ম। এবং এই ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।*

ব্যাখ্যাঃ বেদান্তের মত যথারীতি অনুধ্যান করিলে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। বিচারের দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করা যাইলেও তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য যিনি যে-অবস্থায় আছেন—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, সন্ন্যাসী কিংবা গৃহস্থ—প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিজের সমস্ত ক্রিয়া (movement) ব্রহ্মেরই স্পন্দনমাত্র—এই অনুভবে প্রতিষ্ঠাই সাধকের লক্ষ্য। সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ, দৃঢ়ভাবে এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে সত্যসত্যই দেখা যায়, আমরা যাহা কিছু করি তাহা ব্রহ্মেরই লীলারূপ।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মবিদ্যাকে মানুষের শিক্ষার একটি প্রধান বিষয় করিয়া সর্বদা তাহার চর্চা করিতেন। এখন যেমন শিষ্য পরম্পরায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে অতি আশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কৃত হইতেছে, বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চর্চা না করিলে জড় কিংবা অধ্যাত্ম কোন বিজ্ঞানেরই উন্নতি হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা বহুকাল ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছিল। সেইজন্য এখন এই তত্ত্ব আমাদের নিকট একটু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তখন ইহা সত্যসত্যই কার্যে পরিণত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মকর্মসমাধিনা' বলিতে ভগবান বুঝাইয়াছেন—কর্মকে ব্রহ্মরূপে দেখিতে দেখিতে কর্মরূপী ব্রহ্মেতে মনকে সমাহিত করা। সেই অর্থে 'কর্ম' ব্রহ্মেরই একপ্রকার স্পন্দন।

[**মন্তব্যঃ** অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করিলে মন্দ হয় না যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কেন্দ্রেই চিরাচরিত প্রথামতো এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দুপুর ও রাত্রে আহার শুরু করা হয়।—**সম্পাদক**]

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥২৫॥

শ্লোকার্থঃ *অন্য যোগিগণ দেবদেবীর পূজা করেন যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে। আবার কেহ কেহ ব্রহ্ম-রূপ অগ্নিতে 'ব্রহ্মযজ্ঞ'-এর সাহায্যে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন অর্থাৎ সর্বকর্ম ফলের সহিত ব্রহ্ম-রূপ অগ্নিতে অর্পণ করেন।*

ব্যাখ্যাঃ ইন্দ্রাদি দেবতার নামে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা দৈবযজ্ঞ। তাহাও নিষ্কামভাবে ব্রহ্মের পূজাজ্ঞানে করিবে। জ্ঞানবিচারকেও যজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে। উপাসনা দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, গীতা প্রচারের সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যজ্ঞই ছিল ঈশ্বর আরাধনার প্রধান উপায়। কিন্তু রুচির বৈষম্যবশত সকলে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ করিতে চাহিতেন না কিংবা ভালবাসিতেন না। ব্রাহ্মণরা তাহাদিগকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই যুগে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রকার উপাসনাকেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের চেষ্টাকেই 'যজ্ঞ' আখ্যা দিয়া প্রশংসাই করিয়াছেন। যাঁহারা কর্মকাণ্ডপরায়ণ, তাঁহারা যেমন ঈশ্বরের সেবক হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান তেমনি জ্ঞানকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তিগণকেও ঈশ্বরেরই সেবক হিসাবে উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥২৬॥

শ্লোকার্থঃ *অপর কোন কোন যোগী চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি*

দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ শব্দাদি বিষয়সমূহকে (যথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সংযত করিয়া রূপ-রস ইত্যাদি যাহা কিছু বিষয় ইন্দ্রিয়াদিতে আপতিত হইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করার কথাই শ্রীভগবান বলিলেন। রামপ্রসাদের গানে আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিতেন ঃ "যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে; আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মারে..." ইত্যাদি।

[**মন্তব্য ঃ** এই শ্লোকে উল্লিখিত সংযত ব্যক্তিকে কোন কোন ব্যাখ্যাকার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহারা দৈনন্দিন ছোটখাট সকল কর্মকেই যজ্ঞ-ভাবনা করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক করিয়া তোলেন। এই 'ইন্দ্রিয়যজ্ঞ'-কারীর মন স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।]

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥২৭॥

শ্লোকার্থ ঃ *অপর কোন কোন ধ্যাননিষ্ঠ যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়া হোম করেন এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়-প্রাণকর্ম নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং প্রাণ-অপান-সমানাদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়াকে আত্মসংযমের মাধ্যমে সংযত করিয়া ধ্যেয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া মনকে সেই ধ্যেয়বস্তুতে একাগ্র করিতে হইবে। এই একাগ্রতাসাধনকেই একপ্রকার যজ্ঞ বলা হইয়াছে। বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা যে 'ঈশ্বরসেবা' প্রসঙ্গ শ্রীভগবান শুরু করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা যোগিগণসেবিত ঈশ্বরপূজা।

[**মন্তব্য ঃ** ইন্দ্রিয়কর্ম = চক্ষু-শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম। প্রাণকর্ম = প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান—এই পঞ্চপ্রাণের কর্ম। প্রাণবায়ুর কর্ম বহির্গমন, অপানবায়ুর কর্ম অধোনয়ন, ব্যানের কর্ম আকুঞ্চন-প্রসারণ, উদানের কর্ম উর্ধ্বনয়ন এবং সমান-বায়ুর কর্ম ভুক্তদ্রব্যের সম্যক্ পরিপাক করা।—**সম্পাদক**]

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২৮॥

শ্লোকার্থ ঃ *কেহ কেহ দ্রব্যাদি দানরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ বা চান্দ্রায়ণাদি তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন। কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতি বেদাভ্যাসরূপ স্বাধ্যায় করেন এবং কেহ বেদার্থ নির্ণয় করিয়া জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ দ্রব্য দিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম 'দ্রব্যযজ্ঞ', তিতিক্ষার মাধ্যমে কষ্টসহ্য করার নাম 'তপোযজ্ঞ', অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম 'যোগযজ্ঞ' এবং বেদপাঠের দ্বারা বেদ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান হয়, তাহা 'স্বাধ্যায়'। এবং বেদার্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়রূপ যজ্ঞই 'জ্ঞানযজ্ঞ'। সংযত ব্যক্তিই যতি। বহুবচনে যতয়ঃ। কেহ জিদ করিয়া কিছু করিলে, তাহাকে বলা হয় 'সংশিতব্রত'।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥২৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *কোন কোন যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করেন। কেহ বা অপানবায়ুকে প্রাণে আহুতি দিয়া থাকেন। এইভাবে প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ আসল কথা, সকল বস্তুকেই ব্রহ্মময় দেখিবার অভ্যাসের কথা শ্রীভগবান বলিয়াছেন। প্রাণায়াম ক্রিয়াকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণকে রুদ্ধ করিলে তাহা যেন হবি, অপান যেন অগ্নি—এইভাবে প্রাণকে অপানে যজ্ঞ করা হইল। [ক্রমশ]॥আঠারো॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের বীজ কাশীপুরে উপ্ত হয়ে বরানগরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। অবশেষে সেই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল বেলুড় মঠের নিজস্ব জমিতে। স্বামীজী নিজের কাঁধে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত ভস্মাস্থি বহন করে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেইজন্য আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।" প্রাথমিক অবস্থায় বেলুড় মঠ যেমন ছিল, প্রচ্ছদের নিচের অংশে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। স্বামীজীর বাড়ি এবং পুরনো মঠবাড়ির একাংশ দৃশ্যমান, এরই পাশে আজ মহাগরিমাময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির অবস্থিত—যেন দুহাত বাড়িয়ে দুঃখ-তাপ-শোকসন্তপ্ত মানুষকে নিজের বুকে টেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান করে চলেছে। সেই গতি উর্ধ্বমুখী।

শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ষোড়শ পর্যায়ে শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ি।—সম্পাদক

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বসুর বাড়িতে একদা শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল। কৃষ্ণরাম বসুর বংশেই পরম ভক্ত বলরাম বসুর জন্ম। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম বসু জীবনপ্রভাতে হুগলি জেলার আঁটপুর-তড়া হইতে ব্যবসায়-ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং জীবনমধ্যাহ্নে সরকারের পক্ষে হুগলি জেলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় বর্তমান শ্যামবাজারে ট্রামডিপো ও তৎপার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ এবং শ্রীশ্রীকালী ও শিবমন্দির স্থাপনপূর্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। জীবন-সায়াহ্নে তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া এবং ব্রাহ্মণ পরিপোষণের জন্য ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ট্রামডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্ণরাম বসুর স্ট্রিট আজও তাঁহার গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মবরণান্তে স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে পল্লীর নাম হয় শ্যামবাজার।"[১]



কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ির প্রবেশদ্বার
আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

কৃষ্ণরাম বসুর অধস্তন পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসুর জীবদ্দশায় এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমা শুভাগমন করেছিলেন। এসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "কৃষ্ণচন্দ্র বসু বলরাম বসুদের জ্ঞাতি, কিন্তু তাঁহাদিগের পৃথক বাটী, পৃথক গুরু। মাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁহাদেরও গভীর ভক্তি ছিল। এই পরিবারের মায়েদের আকাঙ্ক্ষা, মা একদিন তাঁহাদিগের গৃহে পদার্পণ করিয়া দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কিনা, ইহা লইয়া জল্পনা চলে।

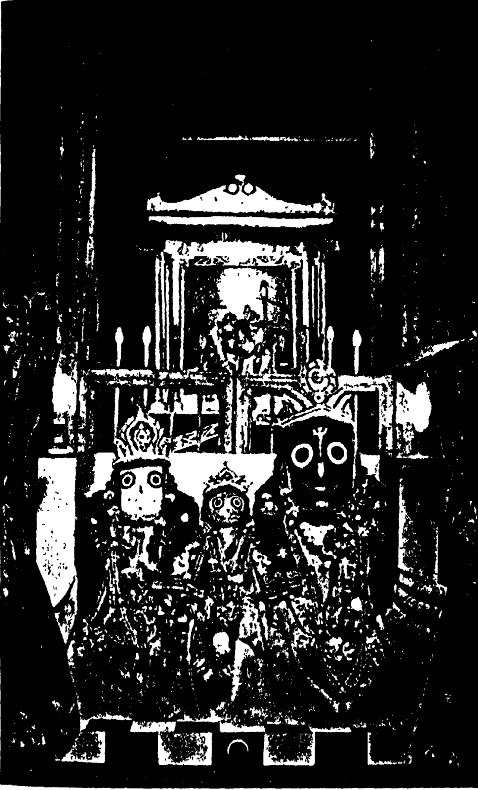


ঐতিহ্যপূর্ণ ঠাকুরদালান *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

"অবশেষে তাঁহাদিগের আবেদন একদিন মাতার শ্রুতিগোচর হইল, তাঁহাদের কুণ্ঠার কথাও শুনিলেন। আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন, 'কেন যাব না? সব্বাই আমার ছেলে, নাই বা নিলে মন্ত্র, গুরু কি আলাদা? শিবের গুরু জগন্নাথ, আবার জগন্নাথের গুরু শিব; গুরু সব এক।'

"এমন উদার মতবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। নির্দিষ্ট দিনে মহা উৎসাহে তাঁহারা পত্রপুষ্পে গৃহ সুসজ্জিত করিলেন। গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়, প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাকালে মাতাঠাকুরানী

অনেক ভক্ত-সহ গিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল তাঁহাদের গৃহ, যেন শারদীয়া পূজার মহোৎসব। গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের পূজা ও ভোগারতি হইল। নানাবিধ ভোজ্যের আয়োজন হইয়াছিল, সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পাইলেন।



ঠাকুরদালানে রাধাকৃষ্ণ এবং বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের বিগ্রহ
আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

"প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে মাতাঠাকুরানী গৃহকর্ত্রীকে বলেন, 'তোমরা আমায় এতদিন দূরে রেখেছিলে, তোমাদের এখানে এসে আজকের দিনটি বেশ আনন্দে কাটল।'

"নারীপুরুষ সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কুলগুরুর পত্নীও প্রণাম করিলেন, ইহাতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিয়া মা বলেন, 'ওমা, এ কী কাণ্ড! আপনার দণ্ডবৎ নিতে নেই, আপনি যে গুরুমাতা।'

" 'আর, আপনি যে জগন্মাতা।'—উত্তর দিলেন কুলগুরু।"[২]

কৃষ্ণচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র রাধামাধব বসুর জ্যেষ্ঠ সন্তান অনিরুদ্ধ বসু বর্তমানে দেবোত্তর এস্টেটের ট্রাস্টি এবং বিগ্রহের সেবায়েত। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, উক্ত 'গৃহকর্ত্রী' হলেন অনিরুদ্ধ বসুর পিতামহী রাধারানী বসু। তাঁর মাথায় হাত দিয়ে শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদও করেছিলেন। পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয় ১৯৪৪ সালে এবং পিতামহী রাধারানী বসুর মৃত্যু হয় ১৯৫২ সালে। উভয়ের জীবদ্দশাতেই শ্রীশ্রীমায়ের এই বাড়িতে শুভাগমন হয়েছিল। সেসময়ে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে সঠিক তারিখ জানা যায় না। জ্ঞাতি বলরাম বসুর বাড়িতে এঁদের যাতায়াত থাকায় রাধারানী বসুর আমন্ত্রণেই শ্রীশ্রীমায়ের মাত্র একদিনের জন্য এই বাড়িতে শুভাগমন ঘটে।

এই বাড়িটি ৩০০ বছরের পুরনো এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জীউ বিগ্রহ ওড়িশার কোঠারে বসু পরিবারের জমিদারিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই বাড়িতে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্তমানে তাঁর নিত্য সেবা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহেশের রথও এই বসু-পরিবারের এবং সেই রথ-উৎসব এখনো তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। বসু-পরিবারের উদ্যোগেই মাহেশের রথ-উৎসবে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেছিলেন। শ্যামবাজারের এই বাড়িতে একদা বিখ্যাত রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতির দোকান 'ট্রেডার্স ব্যুরো' ছিল, এঁদেরই মালিকানায়। সেটি বর্তমানে অবলুপ্ত। ❑

<u>পথনির্দেশ</u> : কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ির ঠিকানা—১২, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৪। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউয়ে ঢুকে সামান্য এগোলেই ডানদিকে এই বাড়ি। বাড়ির প্রবেশপথের ডানদিকের দেওয়ালে পাথরে লেখা আছে—'শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ ঠাকুর'। রাস্তা থেকেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা যায়। ঠাকুরদালানের সামনের প্রাঙ্গণে একদা দোল-উৎসব পালিত হতো।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৯ম প্রকাশ, পৃঃ ১৯২
২ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭২

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী*

স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

আমেরিকান ধর্মতত্ত্ববিদ্ হাউস্টন স্মিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The World's Religions-এ সুন্দরভাবে ভগবান বুদ্ধের জীবনের বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন। ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায়, সারা ভারত যখন তাঁর বাণীতে আলোড়িত, রথী-মহারথী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষেরা এসে তাঁর কাছে নতজানু হচ্ছে, তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছেঃ "আপনি কে? আপনি কি দেবতা?" বুদ্ধদেব উত্তর দিয়েছেনঃ "না।" "আপনি কি দেবদূত?" "না।" "আপনি কি ঋষি?" "না।" "তবে আপনি কে?" ভগবান উত্তর দিয়েছেনঃ "আমি প্রবুদ্ধ।" এই উত্তরই যেন তাঁর পরিচয়। 'বুধ্' ধাতু 'জেগে ওঠা' ও 'জানা' দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই জেগে ওঠাই তাঁর শাশ্বত পরিচিতি হয়েছিল। সারা জগৎ যখন কুসংস্কার এবং অজ্ঞানের তিমিরে মগ্ন—একজন মানুষ সেই কুহক দূরে অবহেলায় ফেলে দিয়ে তার উর্ধ্বে অবস্থান করলেন। এই জেগে ওঠার কাহিনী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের ভগবান বুদ্ধ হয়ে ওঠার



ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী পাঠ করার সময় আমাদের মনে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ যেন আমাদের হৃদয় ও মনকে ছুঁয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার সঙ্গে একটি মরমি হৃদয়ের সমন্বয় তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক। নিঃসন্দেহে তিনি একজন অসাধারণ তার্কিক ছিলেন—যেকোন প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসাকে তিনি কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে নিতেন; তারপর বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলিকে আবার দক্ষ কারিগরের মতো যুক্তিসম্মত পারম্পর্যে সাজিয়ে ফেলতেন। এই ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক পরম সংবেদনশীল মন—যা জগতের হাহাকারে সমব্যথী হতো, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হতো। তাঁর অনন্য সাধন-পরিক্রমাও ছিল মানুষের দুঃখ দূর করার উপায় অন্বেষণের কারণে।

ভগবান বুদ্ধের এই বিশাল হৃদয় প্রতিফলিত হয়েছে 'থেরাগাথা'য় বর্ণিত সুনীতের উপাখ্যানে। নীচকুলে সুনীতের জন্ম, মন্দিরের শুকনো ফুল ঝাঁট দিয়ে চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখা তার কাজ। পরিত্যক্ত মালার স্তূপের মাঝখানে সে ভাল ফুল খুঁজে বেড়াত—তা বিক্রি করে যদি গ্রাসাচ্ছাদন হয়। সুনীত একদিন ময়লার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দেখতে পায় ভগবান বুদ্ধ সেদিকে আসছেন। সুনীতের হৃদয় শ্রদ্ধা ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে সঙ্কোচবোধও করতে লাগল। কারণ সে তো নিম্নবর্ণের। কিন্তু কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জায়গাও নেই, তাই সে পাঁচিলে সেঁটে থাকার মতো হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। ভগবান বুদ্ধ সুনীতের মধ্যে অর্হৎ (নির্বাণের যোগ্য) হওয়ার লক্ষণ দেখতে পেলেন—আলোর শিখা যেমন পাত্রের মধ্যে থাকে সেইরকম। এগিয়ে এসে আহ্বান জানালেনঃ "সুনীত, তোমার এই নিকৃষ্ট জীবনযাপনের কী প্রয়োজন? তুমি কি সংসার ত্যাগ করতে পারবে?" সুনীতের হৃদয়ে আনন্দ উথলে উঠল, তার মনে হলো যেন কেউ তার হৃদয়ের ক্ষতে অমৃতসিঞ্চন করছে; সে ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করল। পরবর্তী কালে সুনীত ভিক্ষুক সঙ্ঘের একজন অগ্রগণ্য সভ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন।[১]

তদানীন্তন কালের অবস্থার নিরিখে প্রতি অবতারই নতুন ধর্মের বাণী নিয়ে আসেন। বুদ্ধাবতারেও হিন্দুধর্মের অধঃপতন রোধ করতেই ভগবানের আবির্ভাব। প্রথমত, বুদ্ধদেব কর্তৃত্ববিহীন এক ধর্মের কথা শোনালেন। সেখানে কর্তা-ক্রিয়া বলে কিছুই নেই, আছে আনন্দময় নির্বাণ। পুরোহিততন্ত্রের অবসান ঘটাতে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার থেকে ধর্মকে তিনি মুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান জানালেন সত্যকে পরীক্ষা করে দেখতে। কোন মত বা উক্তি শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া গেলেই তা ধ্রুব সত্য নয়, কোন অনুশাসন ঐতিহ্যবাহী হলেই তা সঠিক বলা যাবে না। ধর্মপথের যাত্রীকে সঠিকভাবে কোন্‌টি সত্য, তা পরখ করে দেখতে হবে। "অত্তো দীপো ভব"—নিজে নিজের আলোকবর্তিকা হও; "আত্তো সরণো ভব"—নিজ মুক্তি খোঁজ নিজের মধ্যে; "অনঞঞ সরণো ভব"—অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করো না। এই তাঁর নির্দেশ।

* আসন্ন বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবেদিত।

কিন্তু দর্শনের অতিরিক্ত কচকচি দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মকে ভারী করতে চাননি। মালুঙ্খপুত্রের সঙ্গে তাঁর আলোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কেন তিনি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বকে ধর্মচর্চার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে দেখেননি। তিনি একবার বলেছিলেন ঃ "এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হয়েছিল। তার আত্মীয়-বন্ধুরা এক সুনিপুণ চিকিৎসক ডেকে আনল। সেই আহত ব্যক্তি বলল, 'আগে আমাকে বল কার বাণে আমি আহত হয়েছি? যে বাণ মেরেছে সে-লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? তার নাম কী?' এইসকল প্রশ্নের উত্তরে কী লাভ আছে? ফল এই দাঁড়াল যে, কথা শেষ না হতেই বাণাহত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হলো। হে মালুঙ্খপুত্র, তুমি আহত হয়ে আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে-ওষুধ, তা আমি বলে দিয়েছি। আমি যা প্রকাশ করিনি, তা অপ্রকাশিত থাকুক—যা ব্যক্ত করেছি তা-ই প্রকাশিত হোক।"[২]

দার্শনিক নানান প্রশ্নে—যথা আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব নিরুত্তর থেকেছেন। এই কারণে বৈদান্তিক আত্মতত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অনাত্মবাদের হয়েছে নানা তর্কবিতর্ক। ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের ধর্মের প্রায়োগিক দিকের ওপর বেশি জোর দিতে বলেছেন—দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট না করে।

মহান লোকগুরু, যথা যিশুখ্রিস্ট ও আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভগবান বুদ্ধও তাঁর মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষায় পরিবেশন করেছেন—গল্প-উপমার সাহায্যে; সংস্কৃত ভাষার নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে কথ্য পালি ভাষায়। এটি তখন স্থানীয় ভাষা ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তা হলো মাগধী প্রাকৃত। ধর্মের উচ্চতম আদর্শ তিনি বুঝিয়েছেন ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে এবং সেই কারণেই প্রকাশিত তত্ত্বগুলি হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। সেরকম একটি উপাখ্যান—

পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি কোশল রাজ্য অধিকার করার ইচ্ছায় সেখানকার রাজা ও রানীকে বন্দি করলেন ও তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মৃত্যুর আগে কোশলরাজ পুত্র দীর্ঘায়ুকে ডেকে উপদেশ দিলেন ঃ "হিংসা কখনো প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না—মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজিত করবে।"

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে পুত্র দীর্ঘায়ু বনে গিয়ে কাতরভাবে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগল। পরে সে কাশীতে এসে ঘাতক রাজা ব্রহ্মদত্তের দরবারে ছদ্মবেশে একটি চাকরি নিল। ক্রমে রাজা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের পার্শ্বচর করে রাখলেন।

একদিন রাজা মৃগয়ায় গেছেন। অন্য অনুচরেরা দূরে রয়েছে। এমন সময়ে ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীর্ঘায়ুর মনে মা-বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা হলো। সে খাপ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করল, কিন্তু তারপরেই তার বাবার কথা মনে পড়ে যেতে তরবারি আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখল।[৩]

ভগবান বুদ্ধের বাণী সেদিন তার মনে পড়েছিল ঃ

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং।

অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।।"

—শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার শান্তি হয় না। শত্রুতাহীনতার দ্বারাই সেটি প্রশমিত হয়—এটাই সনাতন ধর্ম।[৪] ভগবান বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত উৎসর্গ করেছেন ঃ "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব... নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী, কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃতবাণী"—আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধদেবের এই সহিষ্ণুতার বাণীই আজকের অশান্ত পৃথিবীতে আনতে পারে শান্তির ঝরনাধারা।

এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে কপিলাবস্তুর ভরা সংসার—স্ত্রী গোপা, একমাত্র পুত্র রাহুল ও কপিলাবস্তুর রাজত্ব—সব ছেড়ে তিনি সাধনার পথে ব্রতী হলেন। আরেক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বোধিবৃক্ষের নিচে তিনি সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভ করে 'বুদ্ধ' পদবিতে আরূঢ় হন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি ভারতের পথে পথে ঘুরে তাঁর জীবনদায়িনী ধর্মের কথা শোনান। অসংখ্য হতাশ, মলিন প্রাণে জেগে ওঠে বাঁচার নতুন স্বপ্ন। ভগবান বুদ্ধ সৃষ্টি করেন তাঁরই অনুগামী এক বিরাট সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। পৃথিবীর ইতিহাসে 'সঙ্ঘশক্তি' কাকে বলে, মানুষ এই প্রথম জানল।

তবু তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, তাঁকে অতিলৌকিক করে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাকে করেছিলেন প্রতিহত। ভিক্ষুসঙ্ঘের এক বার্ষিক অধিবেশনে ভগবান তথাগত সমবেত স্থির-সমাহিত সন্ন্যাসিবৃন্দের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেন ঃ "শিষ্যগণ, তোমাদের কাছে জানতে চাই, কার্যে বা কথায় তোমরা আমার কোন দোষ খুঁজে পেয়েছ কি?" তাঁর প্রিয় শিষ্য শারিপুত্ত তখন বলে উঠলেন ঃ "প্রভু, আমার আপনাতে এত বিশ্বাস আছে যে, আমার মনে হয়—আপনার তুল্য মহান বা জ্ঞানী মানুষ আগেও ছিলেন না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবেন না।" বুদ্ধদেব কিন্তু শারীপুত্তকে ভর্ৎসনা করলেন ঃ "শারীপুত্ত, তুমি কি বিগত দিনের সব বুদ্ধদের জেনেছ? ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের সম্বন্ধে কিছু জান? বর্তমান বুদ্ধের অন্তরেও কি তুমি প্রবিষ্ট হতে

পেরেছ? তাহলে এত উচ্ছ্বসিত ও সাহসী শব্দগুলি তুমি ব্যবহার কর কি করে?"[৫]

জগৎ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ধারণা নিহিত আছে তাঁর প্রচারিত চার 'আর্যসত্য'তে। প্রথম আর্যসত্য ঃ মানবজীবন দুঃখময়। দ্বিতীয়ত, এই দুঃখভোগের কারণ আছে এবং তা নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত, দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে। এবং চতুর্থত, দুঃখনিরোধের উপায় আছে। সাময়িকভাবে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেলেও পরে সুযোগমত দুঃখ আবার ফিরে আসবে, তৃতীয় আর্যসত্য সংক্রান্ত ঐ আশঙ্কাকে খণ্ডন করার জন্যই চতুর্থ আর্যসত্য বলা হলো।

বুদ্ধের বিশ্বতত্ত্বের পরিকল্পনাকে আমরা চৈতন্যবাদী বলতে পারি। তবে তাঁর ধারণায় কিন্তু বিশ্বে স্থায়ী বা নিত্য পদার্থ বলতে কিছু নেই। রাজা মিলিন্দ ও বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের আলোচনায় এই ধারণা পরিষ্কার হয়। সংক্ষেপে তাঁদের কথোপকথন তুলে ধরা যাক।

"নাগসেন—একটা দীপ জ্বালিয়ে দিলে সমস্ত রাত্রি তা জ্বলতে থাকে। প্রথম প্রহরে যে-শিখা জ্বলেছে, তা কি মধ্যরাত্রের শিখার সঙ্গে সমান?

"মিলিন্দ—না।

"নাগসেন—তবে একে কি একই শিখার ভিন্ন রূপ বলবেন? তাও নয়, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জ্বলছে। আমাদের জীবনেরও এই গতি—এক যায়, এক আসে। আদি নেই, অন্ত নেই, জীবনচক্র ঘুরছে। পূর্বাপর একও নয়, আবার ভিন্নও বলা যায় না।"[৬]

বিশ্ব তাই হয়ে দাঁড়ায় কতকগুলি জ্ঞান, অনুভূতি ও চিন্তায় পরস্পর গ্রথিত মালার মতো, যা চৈতন্যের প্রবাহস্বরূপ। এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে ভগবান বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। প্রতীত্যসমুৎপাদ-এর অর্থ হলো একটির ওপর নির্ভর করে আরেকটির উৎপত্তি। একদিকে যা কারণ, তাই অপরদিকে কার্য। এই কার্য-কারণ পরম্পরার সংযোগে যেন একটি চক্র নির্মিত হয়েছে। এটিই মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘোরায়। এরই নাম 'ভবচক্র'। এই প্রতীত্যসমুৎপাদে বারোটি কারণ বা নিদানের উল্লেখ রয়েছে। একে 'দ্বাদশ নিদান' বলা হয়েছে। তবে এই প্রবাহাকারে গতি নির্ধারণে পাঁচটি নিদানের বড় ভূমিকা দেখা যায়। যথা—বিজ্ঞান (অহংবোধ), ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন), স্পর্শ (ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সংস্পর্শ), বেদনা (ইন্দ্রিয়ানুভূতি), নামরূপ (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগের ফলে বিশ্বপ্রবাহের অনুভূতি)।[৭]

বুদ্ধদেব তাঁর সমস্ত কর্ম ও চিন্তা দ্বারা সর্বজীবের কল্যাণ চেয়েছিলেন। তাই তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "চরথ ভিক্খবে, চারিকং বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়।"[১০] —ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের নিমিত্ত, বহুজনের সুখের নিমিত্ত বিচরণ কর। গত শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধের এই মহান আদর্শের কথা সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম।"

অন্তিম সময়ে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে অমানুষী করুণা দেখা যায়। চুন্দের পরিবেশিত শূকর মাংস (যা তখন উৎকৃষ্ট আহার বলে বিবেচিত হতো) ভক্ষণ করার পরে একটু অসুস্থ বোধ করলেও আরো অনেক পথ চলে তিনি মল্লদের শালবনে শেষশয্যায় শায়িত হন। সেই শেষ অবস্থাতেও তিনি সুভদ্র নামে এক ব্যক্তিকে অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণ করেন। (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়।) পাছে চুন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে, তাই তিনি বলেছেন, সারাজীবনে তিনি যত খাদ্য গ্রহণ করেছেন — তার মধ্যে দুইটি তাঁকে বিশেষ করে তৃপ্তি দিয়েছে। প্রথমটি সুজাতার আনীত পায়সান্ন, যা তাঁকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে এনে বোধিবৃক্ষের নিচে পরমজ্ঞান লাভে সাহায্য করে; আর এই দ্বিতীয়, যা তাঁর সামনে মহানির্বাণের অন্তিম দ্বারকে উন্মোচিত করছে। তারপর তিনি বলেন ঃ "সকল সৃষ্টিই অনিত্য, ভঙ্গুর। অপ্রমত্ত হয়ে তোমরা কর্তব্য সম্পাদন কর।" রাত্রির তৃতীয় যামে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করলেন।[৮] রেখে গেলেন জগতের সামনে অনির্বাণ দীপশিখার মতো এক মহনীয় আদর্শ।

"অজ্ঞানতিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূতঃ প্রদীপকঃ।
নমোঽস্তু বোধিসত্ত্বায় সম্বুদ্ধায় নমো নমঃ।।" ❑

তথ্যপঞ্জী

১ The World's Religions—Houston Smith, 1st edn., p. 91
২ বৌদ্ধধর্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, করুণা প্রকাশনী, ১ম সং, পৃঃ ৪৪
৩ ঐ, পৃঃ ৬৫
৪ ধম্মপদ—মিহির গুপ্ত অনূদিত, ১ম সং, পৃঃ ৪
৫ The World's Religions, p. 90
৬ বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ৫১
৭ ধম্মপদ, পৃঃ ৩০
৮ বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ—আশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ধর্মবীর বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১ম সং, পৃঃ ৩০

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

শাস্ত্র আলোচনা........

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানালোকে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ

অসীম মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরিশেষে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ঃ হে গার্গী, এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন; তাঁকে শ্রবণ করা যায় না, তিনি কিন্তু শ্রবণ করেন; তাঁকে মনন করা যায় না, তিনি কিন্তু মনন করেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নেই, তিনি ভিন্ন অন্য কোন শ্রোতা নেই, তিনি ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞাতা নেই। এই অক্ষরই আকাশে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রয়েছেন।

আমরা এবার 'সূত্রাত্মা' ও 'অন্তর্যামী' সম্বন্ধে আলোচনা করব। 'সূত্রাত্মা' ও 'অন্তর্যামী'-র অর্থ কী তা উদ্দালক আরুণী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। 'সূত্রাত্মা'র অর্থ—সূত্রের মতো যিনি সমুদয় বস্তুকে একত্র করে রাখেন এবং 'অন্তর্যামী'র অর্থ যিনি সমস্ত বস্তুর অন্তরে থেকে তাকে যমন বা নিয়মন অর্থাৎ পরিচালনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, বায়ু অর্থাৎ প্রাণই সূত্রাত্মা। মূলকথাটা এই ঃ দেশকালাশ্রিত সসীম বস্তুর সঙ্গে অনন্তস্বরূপ আত্মা অসীমের আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। এই অর্থে সসীম অসীমের সঙ্গে একই। অসীমকে ছেড়ে, অসীমকে না জেনে, অসীমকে না ভেবে সসীমকে জানা যায় না; সুতরাং সসীম বস্তু বলে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নেই, অসীমই একমাত্র স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ বস্তু।

কিন্তু অসীমের সঙ্গে যেমন সসীম অভেদ, তেমনি ভেদও আছে। যেমন জ্ঞানরূপী অসীম প্রত্যেককে অতিক্রম করে অন্য বস্তুতে ব্যাপ্ত। এই বস্তুকে জানার অর্থই সীমাকেও জানা। এটাই অসীমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। অর্থাৎ অসীমই সসীমের ভিতরে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। যেমন আত্মা আমাদের দেহে থেকে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করছে। এর এই অর্থ হয় ঃ অসীম ও সসীম অভিন্ন, অ-স্বতন্ত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে নানা ভৌতিক বস্তু, মন, প্রাণ, বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তুর উল্লেখ করে এই সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্যামী আত্মার—যিনি বিশ্বের আত্মা এবং জীবেরও আত্মা—ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সসীম ব্যক্তিত্বকেই 'বিজ্ঞান' বলেছেন। যেসকল বস্তুর ব্যক্তিত্ব নেই, তারা জড়বস্তু; তারা অসীমকে না জেনেই তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানরূপী জীবের ব্রহ্মজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তা অনেক স্থলেই নিদ্রিত বা অস্ফুট। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী' ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ 'যিনি' পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী থেকে পৃথক বা ভিন্ন, পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন —তিনিই আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত, বিজ্ঞান যাঁকে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান যাঁর শরীর এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থেকে যিনি বিজ্ঞানকে নিয়মিত করছেন—তিনিই আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। একমাত্র অনন্তই দর্শন-মননাদির বিষয়, তা 'নারদ-সনৎকুমার সংবাদ' ইত্যাকারে শাস্ত্রের নানা স্থানে প্রতিপাদিত হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের অমৃতত্বের ব্যাখ্যা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে প্রতিপাদিত হয়েছে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ "কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?" অর্থাৎ জীবাত্মার জ্যোতি কি? কিসের দ্বারা জীবাত্মা ইহলোক ও পরলোকে পরিচালিত হয়? এই প্রশ্নে সহজ ও স্থূল উত্তর হলো—সূর্যালোক দ্বারা, তার অভাবে চন্দ্রালোক দ্বারা, তার অভাবে অগ্নি দ্বারা, তার অভাবে বাক্ দ্বারা। সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে কোন লোকের উচ্চারিত বাক্যই আমাদের চালক। কিন্তু এসকল জ্যোতি তো স্বতন্ত্র জ্যোতি নয়। মূল জ্যোতি—আত্মার নিজস্ব জ্ঞানালোক। তাছাড়া সূর্য, তারা, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি—এসকলের জ্যোতি জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং এসকল জ্যোতিষ্মান বস্তু আত্মজ্যোতিরই অনুভাসন মাত্র। যেখানে সমুদয় বস্তুর অবান্তর আলোকের অভাব, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসুকে সেখানেই মূল আত্মালোকের উপলব্ধি করাচ্ছেন। এটাই মূল আলোক—এ যে নিজ শক্তিতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করতে পারে, সেজন্য জিজ্ঞাসুকে জাগ্রত অবস্থা থেকে তিনি স্বপ্নলোকে নিয়ে গেছেন।

যেসকল বস্তুকে লোকে আত্মার অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু মনে করে—স্বপ্নাবস্থায় সেসকল বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অথচ আত্মা নিজ শক্তিতে সেসকল বস্তু সৃষ্টি করে। স্বপ্নে রথ নেই, রথী নেই এবং পথ নেই; তখন আত্মাই পথ সৃষ্টি করেন। সেই

স্থলে মোদ এবং প্রমোদ নেই, তখন আত্মাই মোদ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। যেখানে বেশান্ত নদী ও পুষ্করিণী নেই, সেখানে এই আত্মাই বেশান্ত পুষ্করিণী বা নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্তা। স্বপ্নে সৃষ্ট বস্তুসমূহ যে মানসিক, সেবিষয়ে কেউই সন্দেহ করে না। সেগুলি যে বাহ্যবস্তুর অনুরূপ, তাও নিশ্চিত—এত অনুরূপ যে, স্বপ্নভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত সেগুলি 'বাহ্যবস্তু' বলেই মনে হয়। যা মনের 'বাইরে', যা 'জড়' তা কিরূপে মানসিক হতে পারে—এটা সাধারণ লোক অদার্শনিকভাবে দেখেন, তাই এই বাহ্যবস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বলে মনে করে। দার্শনিক জানেন, মনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর; তবে তিনি দ্বৈতবাদী হলে বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞানগোচর বস্তুর একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। যাহোক, এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ইঙ্গিত করছেন, আত্মা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলির কর্তা, তেমনি জাগ্রত অবস্থায় সকল বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা। জড়জগৎ ও আত্মজগতের কোন দ্বৈতভাব নেই। তিনি মনে করেন, জড় ও আন্তর জগৎ—উভয়প্রকার বস্তু বিনাশশীল। এইসকল বস্তু অমৃতত্ব প্রকাশ করে না। অমৃতত্ব আমরা দেখি সুষুপ্তিতে—স্বপ্নহীন নিদ্রায়। সুষুপ্তি অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন না, কোনপ্রকার কামনা করেন না—এটিই এর কামনারহিত, পাপরহিত অভয় রূপ। এটাই এর আপ্তকাম, আত্মরাম, শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভেদ ও ভেদমূলক সম্বন্ধ এবং নৈতিক ভেদ কিংবা ধর্মাধর্ম কিছুই থাকে না। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। পুণ্য কিংবা পাপ এর অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ সমুদয় শোক থেকে উত্তীর্ণ হন। জ্ঞান যেহেতু আত্মারই শক্তি, সুষুপ্তিতে এই জ্ঞান থাকে।

মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার মৌলিক একত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে জীব-ব্রহ্ম সসীম-অসীম—এই ভেদকে স্পষ্টত প্রকাশ করেননি। অভেদের মধ্যে যে অবিরুদ্ধ ভেদ থাকতে পারে—তা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। সুষুপ্তি অবস্থাকেই যাজ্ঞবল্ক্য 'ব্রহ্মলোক' বলেছেন। তিনি সর্বভেদরহিত আত্মার সম্বন্ধে বলছেন, তিনি সলিলের ন্যায় ভেদরহিত এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। এটিই ব্রহ্মলোক। ইনি ভেদযুক্ত জীবাত্মার পরম গতি, ইনিই পরম আনন্দ, পরম আস্পদ, অন্য সমুদয় ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে। তিনি এই আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের তুলনা করেছেন। ব্রহ্মানন্দ সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করলে তাকে পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করতে হবে। কিন্তু যিনি কামনাশূন্য হয়ে দেহত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। আবার দেহ থাকতেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরতি ও তিতিক্ষা-যুক্ত হয়ে এবং সমাহিত হয়ে আত্মাতেই আত্মা দর্শন করেন পাপ তাকে সন্তপ্ত করতে পারে না, তিনিই পাপকে সন্তপ্ত করেন। তিনি নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হয়ে ব্রাহ্মণ হন। এটিই ব্রহ্মলোক। জনক রাজা বললেনঃ আমি সেই ব্রহ্মিষ্ঠকে আমার বিদেহ রাজ্য দান করে এবং দাস্য কর্মের জন্য নিজেকে দান করছি।

প্রসঙ্গত, যাজ্ঞবল্ক্যের সাধনা ও জ্ঞানের গভীরতা এবং সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক মননশীলতাই তাঁর উপদেশাবলীর প্রতি ছত্রে ঝঙ্কৃত হয়েছে। উপনিষদের কোন কোন ঋষির বর্ণনা—যেমন কৌষতকীর ইন্দ্রচিত্র, ছান্দোগ্যের প্রজাপতি-ইন্দ্র সংবাদ ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায়, তাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যের মত অনুমোদন করেননি। অতি প্রাচীন কাল থেকেই দুটি পরস্পরবিরোধী মত চলে আসছে। আত্মার জাগ্রত-স্বপ্নাদি অবস্থাসমূহ, মানবজীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব—এদের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মবাদ দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। সুষুপ্তির পর প্রলয়ের ধারণা, জ্ঞানের উদয় থেকে সৃষ্টির ধারণা এবং জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা থেকে স্থিতির ধারণা হয়েছে। সুষুপ্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে মতভেদ হওয়ার দরুন ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ হয়েছে। আরুণি যাজ্ঞবল্ক্য সুষুপ্তি সূচিত মৃত্যুকে একান্ত অভেদাবস্থা বলেছেন। সুতরাং তাঁদের মতে, আদি কারণ ব্রহ্ম—যাঁর থেকে সমুদয় উৎপত্তি এবং যাঁতে সমুদয় পুনঃপ্রবেশ—তিনি অভেদ, নির্বিশেষ। নির্বিশেষ অভেদ থেকে যে-জগৎ উৎপন্ন হয় বলে বোধ হয়, তা বাস্তব জগৎ হতে পারে না; তা মায়াময় জগৎ ('ইব'-মাত্র)। এইসব মতের ঋষিবৃন্দ সুষুপ্তিতেই থেমে গেছেন, আর কোন অবস্থাতে অগ্রসর হন না। কিন্তু মূল জ্ঞানের অপরিবর্তনীয়তা আত্মার চতুর্থ অবস্থা বা তুরীয় অবস্থা। এটিই আত্মার পরমাবস্থা, পরমাত্মভাব, ব্রহ্মভাব।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এসকল অবস্থা মূল আত্মার অবস্থা নয়, শরীরী আত্মার অবস্থা। জীবাত্মা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে এমনকি এই শরীর থাকলেও তাঁর দিব্য চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মলোকের ভোগ্যসামগ্রীসমূহ দেখতে পান। ব্রহ্মলোকবাসী দেবতাগণ অথবা শুদ্ধাত্মাগণের সম্বন্ধে প্রজাপতি বলেছেনঃ এঁরা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন, সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায়, প্রজাপতি-কথিত ব্রহ্মলোক এবং যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী। তবে একথা নিশ্চিত, তাঁরা যেমনভাবে দেখেছেন ও অনুভব করেছেন—সেভাবেই তাঁরা উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা বাহ্য প্রমাণ গ্রহণ না করে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজ জ্ঞান দ্বারা ঐ তত্ত্ব গ্রহণ বা বর্জন করবেন। (সমাপ্ত) ❑

আলোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ঃ কেদারনাথের লেখনীতে

মাধব চট্টোপাধ্যায়



বাংলা সাহিত্যে কৌতুকরসের অন্যতম সার্থক শিল্পী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। কর্মসূত্রে বহুদিন তাঁকে বাংলার বাইরে থাকতে হয়েছিল। বক্সার যুদ্ধের সময় সরকারি কাজে তাঁকে চিনেও কয়েক বছর কাটাতে হয় (১৯০২-১৯০৫)। জব্বলপুরে থাকার সময় তিনি প্রবাসী বাঙালিদের নাটক ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করতেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকায় 'লাঠি ও লাঠালাঠি' নামে একটি কৌতুকরচনা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যনাটক গ্রন্থ 'রত্নাকর'। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে তিনি ৩০০ প্রাচীন কবির গান সংগ্রহ করে 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে একটি গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন। ১৯১০ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত তাঁর কৌতুক কবিতা সঙ্কলন 'কাশীর কিঞ্চিৎ' রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গ্রন্থে তিনি 'নন্দিশর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। রসরাজ এবং অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি স্বনামে লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শেষ খেয়া' (উপন্যাস), 'ভাদুড়ী মশাই' (উপন্যাস), 'আই হ্যাজ' (উপন্যাস), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (উপন্যাস), 'আমরা কি ওকে' (লিপিচিত্র), 'কবুলতি' (লিপিচিত্র), 'মা ফলেষু' (গল্পগ্রন্থ), নমস্কারী (গল্পগ্রন্থ), 'উড়ো খৈ' (কৌতুক কবিতা) উল্লেখযোগ্য। 'ভাদুড়ী মশাই' ও 'আই হ্যাজ' একসময়ে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর 'চীনযাত্রী' একটি রসোত্তীর্ণ ভ্রমণকাহিনী। ১৯৪৯ সালের ২৯ নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

আত্মকথায় কেদারনাথ লিখেছেন ঃ ''উপদেশাত্মক কথা —সার্মন্ নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। ... কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই।'' সরস হাস্যপরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকে ভরা তাঁর রচনাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে অনুপ্রাস ও যমকের সার্থক প্রয়োগে। ইংরেজিতে যাকে 'pun' দেওয়া বলে, তাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাঁর সুগভীর জীবনবোধ। সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকারা সাদরে গ্রহণ করেছেন 'মজলিশি' ভাষায় লেখা তাঁর রচনাবলী। ছোট-বড় সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'দাদামশাই'।

কেদারনাথের জন্মভূমি ছিল দক্ষিণেশ্বর। ফলে খুব কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার এবং তাঁর মুখ থেকেই তাঁর অমৃতবাণীর আস্বাদ নেওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল এই কথাসাহিত্যিকের। এছাড়া তিনি দেখেছিলেন কেশবচন্দ্র, রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীম, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামীজীর মতো জ্যোতিষ্ক-সমাবেশ। কিন্তু চাকরির প্রয়োজনে তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। বহুদিন পর হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হলো ঃ ''নিজে তো কিছুই করলাম না, বৃথাই দিন কাটাচ্ছি। তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেসব দুর্লভ অমিয়বাণীর কয়েকটিও যদি দেশের ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে রাখবার মতো করে সহজ গদ্যে রূপ দিতে পারি, চেষ্টা করে দেখি না কেন!'' শ্রীম ও স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থ এবং নিজের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পদ্যছন্দে তিনি নতুন করে লিখলেন ঠাকুরের অমৃতকথাগুলি। ১৯৪৬ সালে ছোট-বড় ৩১০টি পদ্য নিয়ে প্রকাশিত হলো এই সঙ্কলন—'বাণী-সুধা'।

সহজ ভাষা এবং সরল ছন্দ—এই দুইয়ের সাহায্যে ঠাকুরের বাণী প্রচার করেছেন কেদারনাথ। যেমন—

''অর্থ যার দাস হয়—মনুষ্যত্ব আছে তার,
অর্থের যে দাস—তার পশুর ব্যবহার।''

আরেকটি দৃষ্টান্ত—

''সংসারে যা বদ্ধ করে—জমি, পত্নী, টাকা
ঐ তিনে মন থাকলে—ভগবানে মন ফাঁকা!''

কেদারনাথের লেখনীর গুণে পদ্যছন্দেও ফুটে ওঠে ঠাকুরের সুপরিচিত কথনভঙ্গি। ঠাকুর যেখানে বলেছেন ঃ ''পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য

মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।"

কেদারনাথ সেখানে লিখেছেন—

"পরমহংস কাকে বলি? হাঁসের মতো তিনি,
দুধে জলে থাকলে মিশে—দুধটিই লন চিনি।
চিনিতে বালিতে যদি এক হয়েও রয়,
পিপীলিকা যেমন শুধু চিনিটুকু লয়।"

ঠাকুর বলছেন ঃ "সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো—শুধু ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে-জ্ঞানে খাওয়া-দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন—এইসব হয়। ভক্তের জ্ঞান যেন চাঁদের আলো, ভিতর-বার দেখা যায়। কিন্তু অনেক দূরের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখতে পান।"

কেদারনাথের লেখনীতে—

"সংসারী জীবের জ্ঞান—প্রদীপের আলো,
কেবল তায় ঘরটির ভিতর দেখা যায় ভাল।
ভক্তের জ্ঞান চাঁদের আলো—ভিতর-বার দেখা যায়,
দূরের কি খুব ছোট জিনিস—স্পষ্ট না দেখায়।
অবতারাদির জ্ঞান—সূর্যের আলো দেয়,
ভিতর-বার ছোট-বড়—সবই দেখে নেয়।"

গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেন ঠাকুর। তাঁর কোন কোন উপদেশ কেদারনাথ আমাদের শুনিয়েছেন গল্প-সমেত। যেমন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ঃ

"ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণে ডাকেন,
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন, যদি কাকেও বস্ত্র দিয়ে থাকেন।
কহেন কৃষ্ণা, 'স্নানের সময় ঋষির কৌপীন ভেসে যায়,
বস্ত্র হতে' অর্ধেক তার ছিঁড়ে দিয়েছিলাম তাঁয়।'
'তবে আর কি'—বলে কৃষ্ণ করেন লজ্জানিবারণ,
পূর্ব্বকৃত কাজ দেয়—সংস্কার সহায় হন্।"

আবার কোন কোন উপদেশ থেকে বাদ দিয়েছেন কাহিনীর অংশটুকু। যেমন—নোংরা, ফাঁকা মন্দিরে পদ্মলোচনের শাঁখ বাজানোর গল্প না বলে শুধু শুনিয়েছেন ঠাকুরের উপদেশ—

"মন্দির নয় পরিষ্কার, প্রতিমা নাই, পূজা নাই,
কি লাভ হবে যদি কেবল ভোঁভোঁ করে শাঁখ বাজাই।"

বলা বাহুল্য, কেদারনাথ নিজে নতুন কিছু লেখেননি। ঠাকুরের মুখ থেকে যা শুনেছেন, শ্রীম ও স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থে যা পড়েছেন—সেটাকেই পদ্যের আকারে লিখেছেন। ছোট ছোট পদ্যের মাধ্যমে নীতিকথা বা সরল সত্যের পরিবেশন বাঙলা সাহিত্যে অভিনব কিছু নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁর 'কণিকা'য়। এমন একটি গ্রন্থ লেখার ক্ষমতা কেদারনাথেরও ছিল। কিন্তু নীতিকথার বদলে উপজীব্য হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ঠাকুরের অমৃতবাণী। 'বাণী-সুধা' তাই ঠাকুরের প্রতি তাঁর সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক সার্থক বহিঃপ্রকাশ। দুঃখের বিষয়, এমন অমূল্য এক সৃষ্টি আজ বিস্মৃতি ও অপরিচয়ের অন্ধকারে তলিয়ে আছে। গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো বটেই, এমনকি বড়রাও এর মাধ্যমে নতুন করে 'কথামৃত'-এর রসাস্বাদন করার সুযোগ পাবেন। ❑

১ কেদার রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা-৮০০ ০০১
২ ঐ, ২য় খণ্ডের ভূমিকা—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড সং, উদ্বোধন কার্যালয়
৪ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হায়দরাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী এবং ভাষা শিক্ষা বিভাগের (ফরাসি) অধ্যাপক ডঃ তারাপ্রসাদ দাশ।

পাশাপাশি ঃ (১) ১৮৮৩, (৩) ১৮৬১, (৬) ৮৪, (৮) ৬৮, (৯) ৮৫, (১০) ১১, (১১) ৮১, (১৩) ৯৮, (১৪) ৮৫, (১৬) ৮৩, (১৭) ৭৫, (১৯) ৬৯, (২০) ৮২, (২২) ৮০, (২৩) ৭৭, (২৫) ৮০, (২৬) ১২৪১, (২৭) ১৮৮৪।

ওপর-নিচ ঃ (১) ১৮৫৩, (২) ৮৪, (৪) ৬৬, (৫) ১৮৬৩, (৭) ৮৫, (৯) ৮১, (১০) ১৮৩৬, (১২) ১৮৭২, (১৩) ৯৮, (১৫) ৫৫, (১৮) ১৮৭১, (২০) ৮০, (২১) ১৩০৪, (২২) ৮২, (২৪) ৭২, (২৫) ৮৮।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

নি ব ন্ধ......

রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার*

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

॥১॥

গান থেকে প্রাপ্তি সবার একই ধরনের নয়। তবে এই গানের 'কথা' যাঁদের টানে বেশি, তাঁদের প্রাপ্তি প্রায় একই রকমের। কেউ প্রায় সব গানেই 'কবিতা পাঠের' আনন্দ পান (যেমন সুকুমার সেন), কেউ 'গীতবিতান'কে বাঙলা ভাষার 'শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ' বলে ভাবেন (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত), কেউ বা বিশ্বাস করেন গানের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যপ্রতিভার' মহত্তম ও মধুরতম বিকাশ (সৈয়দ মুজতবা আলি)।

কবির গানে কাব্যই যে বড় হয়ে উঠতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কবি নিজে কি তাঁর গানে 'কথা' দিয়ে সব বলতে চেয়েছেন, সব পেতে চেয়েছেন? একটি বয়সের পর থেকে তিনি যে কেবল 'কথাহারা যে ভুবন' ('বীথিকা'), তারই মাঝে স্থান চেয়ে ফিরেছেন, চেয়েছেন নির্জনে নিভৃতে এক 'চরম সঙ্গীতের গভীরতায়' ('শেষ সপ্তক') সুর মিলিয়ে নিতে—একথা তো আমরা ভুলতে পারি না। একটু ভাবলেই দেখব, তাঁর গানের মর্মমূলে রয়েছে এই অভীপ্সা। এর ইতিহাসে আছে তারই ক্রমপরিণাম এবং তাতেই বিস্তীর্ণ হয়ে আছে এর শিল্পপ্রকরণের পরিণতি। এর অর্থ এই নয় যে, চেতনার ও টেকনিকের একটি সমান্তরাল পরিণতিতেই এই গান চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে। চেতনার নানা স্তরের পরিচয় যেমন রয়েছে এই গানে, তেমনি সঙ্গীত হিসাবে তার মূল্য প্রেরণার উৎস দিয়ে স্থির করা যাবে না। কোন গান তখনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, যখন তার প্রেরণার স্পন্দনকে—তা সে যে-ক্ষেত্র থেকেই আসুক—স্রষ্টা সঠিকভাবে সেই গানের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছেন। একথাও মনে রাখতে হবে, একদিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চেতনা একই গানে মিশে গেছে, তেমনি ঊর্ধ্বচেতনার প্রেরণা থাকলেও সব গান 'সঙ্গীত' হিসাবে সবসময়েই সার্থক হয়ে ওঠেনি।

একটি কথা আমরা জানি, সারাটা জীবনই রবীন্দ্রনাথ সুরকে নিজের মধ্যে শুষে শুষে নিয়েছেন। আর শৈশব থেকেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের নিয়ন্ত্রিত বন্ধন ও গঠনবিন্যাসের অভিঘাত তাঁর এই বোধটি পাকা করে দিয়েছিল যে, রাগরাগিণীর মধ্যে বড় আধারে অনির্বচনীয় বিশ্বরস ধরা আছে। এই বোধ থেকেই অগণিত হিন্দি গান ভেঙে অথবা রাগরাগিণীর রূপ ও কাঠামো নিয়ে নিজের সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছিলেন তিনি অনেকদিন ধরে। আবার অন্তরের তাগিদে বাঁধা কাঠামোগুলি ভেঙে নানা ছাঁদে নিজের ধরনে তাদের গড়ে নিয়েছিলেন। একইভাবে অন্তরের তাগিদে তিনি শুষে নিয়েছিলেন কীর্তন গানের হৃদয়াবেগ, লালিত্য ও নাটকীয়তা, বাউলগানের লৌকিক প্রাণধর্মের সুর, কোন কোন প্রদেশের ভজনগান। কিন্তু সুরের এই সারগ্রাহিতার গভীরে ছিল নিজের ভিতরের একটি তাগিদ—অন্তশ্চেতনার প্রেরণায় সঙ্গীতরচনা।

আসল কথা, জগৎ জুড়েই রূপের ও শক্তির যেসব স্পন্দন ক্রিয়া করে চলেছে চেতনার আস্পৃহায়, সেই বিপুল তরঙ্গগুলি কবি টেনে নিতেন তাঁর অন্তর্লোকে। সেই স্পন্দিত অনুভবেই তাঁর আপন জীবন ও সৃষ্টিকে একটি মহৎ ও বিরাট সম্পূর্ণতার মধ্যে মিলিয়ে নেওয়ার কাজটি তিনি সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন। এরই পরিচয় রয়েছে তাঁর সব রচনায়, প্রবন্ধে, পত্রে, উপন্যাসে, নাটকে, চিত্রে, কবিতায় এবং গানের মর্মে। আমরা আশ্চর্য হই না যখন দেখি নিতান্ত আনুষ্ঠানিক গান, হিন্দিভাঙা গান অথবা রাগরাগিণীর কাঠামো-আশ্রিত সঙ্গীত অবলম্বন করেও তাঁর গানে তাঁর জীবনসাধনা বিস্তীর্ণ হয়েছে প্রথম থেকেই।

অতএব এটা স্বাভাবিক যে, তাঁর ধ্রুপদী গঠনের ব্রহ্ম-প্রার্থনাগীতিগুলিও তাঁর নিজের কাছে নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ছিল না। সেখানেও চেতনার ঊর্ধ্বশিখা আন্দোলিত হয়েছে কখনো কখনো। কোন কোন সময়ে সৃষ্টির প্রথম লগ্নটিই সেই মুহূর্ত—

"কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে?
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥...
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া
ওরে, প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।"
('আর নাইরে বেলা')

এসব গানের বাঁধুনিতে মার্গসঙ্গীতের রিখাব, গান্ধার, ধৈবত, নিখাদের চলন ও ডৌল অক্ষুণ্ণ রেখেও কোন কোন আগন্তুক মুহূর্ত এক-একটি অন্য মাত্রার ঢেউ তুলে গেছে। আবার অনেক গানে রাগের চলন অনাহত রেখেও সম্পূর্ণ গানটিই একটি অব্যাহত প্রবাহের মতো বয়ে গেছে। 'কমল বনের মধুপরাজি', 'প্রতিদিন তব গাথা', 'ভুবনেশ্বর হে', 'আমি কেমন করিয়া জানাব', 'কত অজানারে জানাইলে তুমি', 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ', 'বিপুল তরঙ্গ রে', 'যদি

* রবীন্দ্রজয়ন্তী ২৫শে বৈশাখ স্মরণে

তোমার দেখা না পাই', 'নিশীথে শয়নে, ভেবে রাখি মনে', 'হেথা যে-গান গাইতে আসা', 'জীবনে আমার যত', 'জীবনে যত পূজা'—এমনি অনেক গানের কথা আমাদের মনে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ধারা লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনা যত নতুন নতুন এলাকায় বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই এলাকার স্পন্দনও ততই তাঁর গানের প্রাণকেন্দ্রে ঢেউ তুলছিল। 'কেদারা' রাগের চলনে নিবদ্ধ 'কে দিল আঘাত দুয়ারে আমার' গানটির 'সঞ্চারী' অংশটির কথা আমরা প্রথমেই ভাবি—"আজি এ বরষা নিবিড় তিমির, ঝরঝর জল জীর্ণ কুটিরে/ বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে জেগে বসে আছি একা রে।"

রূপের জগৎটিই যেন সুরে ভরে গেছে! গভীর প্রশান্তির মধ্যেও জেগে আছে অধীর উৎকণ্ঠা। এমনি আরো কিছু গানের 'সঞ্চারী' অংশের কথা আমরা ভাবতে পারি—

(১) "জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি/ তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।" ('তুমি রবে নীরবে') (২) "তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,/ কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।" ('মেঘের পরে মেঘ') (৩) "হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কুল—/ সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।" ('আষাঢ় সন্ধ্যা') (৪) "পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে/ জড়ালো রে অঙ্গ আমার ছড়ালো প্রাণে।" ('চিত্ত আমার') (৫) "কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,/ কোন্ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে—" ('কবে আমি বাহির')।

'বেহাগ', 'সাহানা', 'ইমনকল্যাণ' ইত্যাদি রাগের স্বরের বন্ধন এরা মেনে নিয়েছে। বাণীর অর্থময়তাকে মর্যাদা দিয়েছে এরা। কিন্তু এরা নিজেরা মুক্ত। হৃদয়ের আলোয় যে-মানুষটির যাত্রা আনন্দময়, তাঁকে যেন সেই পথের ঠিকানা দিয়েছে এই গানগুলি। আর সে-গানের চলা যেন চিরদিনের—'সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়'।

॥২॥

রবীন্দ্রগীতির কথা চিন্তা করলে দেখি এর স্রষ্টার চেতনা যত ভাস্বর হয়ে উঠেছে, ততই তাতে অন্তর্লোক ও রূপলোকের মিলনের নানা সুরও ধরা পড়েছে। এবং এর স্রষ্টার প্রাণবর্ষা শরত-বসন্তের তরঙ্গলীলায় অর্থাৎ মাটির পৃথিবীর টানে যত মুগ্ধ হয়েছে, ততটাই হয়েছে, আকাশপারের তারার রাগিণীতে। এ-গানের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য হলো—এই দুই জগতের মিলনের সুরটিকে এক বৃহৎ মুক্তির মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া।

কয়েকটি গান মনে রাখলেই এবিষয়টি আমরা বুঝতে পারব। শব্দময়, চিত্রময়, অবিশ্রান্ত গতিময় 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' গানটির সুরের চলন নিজের মধ্যে একটি ছন্দোময় বেগের সঞ্চার করে একই গতিতে এক-একটি আবর্ত রচনা করেছে। এবং প্রতিবার দণা—দা—গা। গা—র্স—া—া।

অপূর্ব স্বরবন্ধে 'নামো—না', 'থামো—না', 'কাঁদো—না' উচ্চারণ করে ফিরে এসেছে প্রথম চরণের সম্ভাষণে 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা'। আমরা অনুভব করি, কোন এক অনাদি উৎস থেকে এক বিপুল ধ্বনির তরঙ্গ যেন ছুটে চলেছে। এ-গানটির সঙ্গে তা জন্মায়নি এবং এখানেই তার লয়ও নেই। বরং এরই অনবদ্য অভিঘাত সৃষ্টি করেছে এ-গানের শব্দচ্ছবি এবং সুরের চলন।

বর্ষা ছিল রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। কারণ, বৃষ্টি-বাদলের প্রবল গীতিনাট্য তাঁকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করত একান্তভাবে।

১৩০২ সালের ৪ আশ্বিন এক পত্রে তিনি একটি গানের কথা লেখেন ঃ "কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটি হয়েছিল—'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' ইত্যাদি।... আমি কাল পরশু মাঝে মাঝে সেই গানটি গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা নতুন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল—চারদিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মতো দাঁড়িয়ে গেলাম।"

চৌত্রিশ বছরের এই রবীন্দ্রনাথ আটাত্তর বছর বয়সে প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন—শ্রাবণ এসে এসে ফিরে চলে গেলেও শ্রাবণের সম্মান ফিরে ফিরে বয়ে আনবে তাঁর 'সুরের খেতের প্রথম সোনার ধান'।

॥৩॥

শুধু বর্ষা কেন, গ্রীষ্মের রুক্ষতা, হেমন্তের ঋতুনাট্যের সূক্ষ্ম ইশারা, ফাল্গুনের রঙ, প্রেমের কত বেদনামধুর স্মৃতি তাঁর গানে এনেছে অরূপলোকের আলোকধ্বনি। যত দিন গেছে, ততই তাঁর গানের জগৎসীমার রূপকল্পগুলিতে বারেবারে ধ্বনিত হয়েছে সেই স্পন্দন, সঙ্গে এসেছে গানের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য—মীড়ের পেলবতা, স্পর্শস্বর ও অতিকোমল স্বরের অন্তর্গুঞ্জনের মন্ত্র। সেই জাদু সুরসজ্ঘকে সীমায় বেঁধে তাকে 'বিচিত্র আবর্তনে' ('শেষ সপ্তক') নাচিয়েছে এবং সেই নাচের আবর্তনে শব্দের প্রতিমাগুলি সুরের এক অখণ্ড ধারার মধ্যে লীন হয়ে গেছে।

আবার 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি' ও 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা'—দুটি গানেই মীড়গুলি যেমন ধ্বনিগাম্ভীর্য এনেছে, তেমনি মধ্য সপ্তকে ও তার সপ্তকে কোমলগান্ধার শুদ্ধ মধ্যম ছোট ছোট কথার তানের মাধুর্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তারা সবই একটিই অখণ্ড প্রবাহের অংশ—শব্দশরীর, বাক্‌প্রতিমা ও সুরের ধারা তারই মধ্যে লীন হয়ে গেছে।

অবশ্য কিছু গান আছে, যেখানে কথা ও সুর তাদের স্বাতন্ত্র্য রেখে চলেছে বেশ কয়েকটি মুহূর্তে। প্রথম স্পন্দনটি এসেছে উর্ধ্বচেতনা থেকে, কিন্তু যখন তা নেমে এসেছে মনোলোকে ও প্রাণলোকে, সেই স্পন্দন ভাব ও বাণীর ঐশ্বর্যের বন্ধনে আর অবিমিশ্র থাকেনি। এমনই কয়েকটি গান : (১) "আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া/ বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া।" (২) "পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি/ ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি।" (৩) "এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি/ বিজন ঘরের কোণে, এসো গো/ নামিলে শ্রাবণসন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে।" এই শেষ গানটির সঞ্চারিতে অমর্ত্যচেতনার মাধুর্য বড় সুন্দরভাবে ফিরে এসেছে—"হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি/ আমি কোন্ সুরে ডাকি তোমারে।"

কথা ও সুরের চারু ভাস্কর্যের অপূর্ব সৃষ্টি 'দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী পরে' গানটি। 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি এ-গানের ভাবনার পরিমণ্ডলের কাছাকাছি। 'পূরবী' রাগিণীর সুরকাঠামোয় রচিত এই গানটি কাব্যময়, কিন্তু 'দিনান্ত বেলায়' গানটি পরাচেতনার এক অন্তর্বাহী প্রবাহ। অনুকোমল রিখাব, কোমল গান্ধার, রিখাবের স্বরধ্বনি ও ছোট ছোট মীড়ের ঢেউগুলি হংসবলাকার ডানার ঝঙ্কার, মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনির ছন্দ ও বাক্‌প্রতিমার আবহ রচনা করেছে—"যাকিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়/ সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা/ শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, সৃষ্টি যেখানে সত্যের স্পর্শ পায়, স্রষ্টাও সেখানে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। আমরা ফিরে ফিরে অনুভব করি—অনন্তের সুর যখন তাঁর গানে এসে মিশেছে, সে-গানে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলে গেছে। আরো অনুভব করি, আপন গান দিয়েই কবি যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন, তেমনি তার মধ্যে রেখে গেছেন সেই মন্ত্র, যা দিয়ে আমরা আমাদের 'ভাঙাদিনের ঢেলা'গুলোকে জোড়া দিতে পারি। ❑

শব্দচেতনা ৩৪

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর পার্ষদগণ সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

১				২		৩		৪	
		৫		৬				৭	
৮									
		৯					১০		
	১১				১২				১৩
			১৪				১৫		
১৬			১৭						
১৮					১৯				

পাশাপাশি : (১) শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও বই বিক্রির পয়সা যিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় ব্যয় করতেন (৩) অঘোরমণির পিতা (৬) 'কথামৃত'-এ ইনি 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' (৭) 'যত —— তত পথ' (৮) '—— না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না' (৯) ঠাকুর যার ঘরকে বলেছিলেন 'সাকারের ঘর' (১০) '—— ফেলে মাছ ধরার মতো অধ্যবসায় চাই' (১১) মানিকরাজার এ-বাগান ছিল বালক গদাধরের প্রিয় জায়গা (১২) আলোয়ারের 'সিংহ' মহারাজ, যাঁর আতিথ্য পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ (১৫) ঠাকুর বলতেন : 'নরেন্দ্র যেন সহস্রদল ——' (১৬) 'মা' সম্বোধনে 'মৃড়ানী' (১৭) দক্ষিণেশ্বরের 'রসিক ——'-এর বাড়ি ঠাকুরের পদার্পণধন্য (১৮) আলমবাজার থেকে যাঁর বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল (১৯) ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হন।

ওপর-নিচ : (১) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বনাম (২) 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে যে-বাবুকে ডাকা হতো (৩) ঠাকুর যে-ভক্তের বাঁশি শুনে সমাধিস্থ হয়েছিলেন (৪) শ্রীম দক্ষিণেশ্বরের এই স্থানে ঠাকুরকে সিংহের মতো পায়চারি করতে দেখেছিলেন (৫) এঁর বাড়িকে ঠাকুর বলতেন 'দ্বিতীয় কেল্লা' (১০) '—— বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না' (১১) অধরলাল সেন কলকাতার যে-অঞ্চলে থাকতেন (১২) ঠাকুরের প্রথম রসদ্দার (১৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষের পিতা (১৪) ঠাকুরের অগ্রজ এক ভাই।

স্নেহাশিষ কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শঙ্করাচার্য বিরচিত 'মোহমুদ্গর'*

অনুবাদ ঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়

(১)
ওরে মূঢ়! ধনাগম-তৃষ্ণা পরিহর,
আনহ বিতৃষ্ণা তাহে, স্বল্প বুদ্ধিধর!
স্বকর্মে যে-ধন তুমি কর উপার্জন,
তাহাতেই হোক তব চিত্ত-বিনোদন।

(২)
অর্থই অনর্থ ইহা ভাব তুমি নিত্য,
তাহাতে সুখের লেশ নাই, ইহা সত্য।
ভীত রও, পুত্র যদি ধনলোভ করে,
এই তো সংসার-ধর্ম, কি কথা অপরে।

(৩)
কে তোমার পত্নী, আর পুত্রই বা কোথা,
সংসার বিচিত্র এত নহেক অন্যথা।
তুমি কেবা, কোথা হতে আসিলে হেথায়
এই তত্ত্ব-কথা ভাই, রাখিও চিন্তায়।

(৪)
যতদিন উপার্জন করার ক্ষমতা,
ততদিন স্বজনের রহিবে মমতা।
কিন্তু যবে জরাগ্রস্ত হইয়া জর্জর
গৃহে আসি পুছিবে না তোমার খবর।

*শ্রীশঙ্করপঞ্চমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত

তীব্র অন্ধকার

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খোল দ্বার, খুলে ফেল বেশখানি,
কি জানি এখনি বুঝি আসে অন্ধকার,
অন্ধকার আসে শুনি ঐ পদধ্বনি
এখনি তো শোনা যাবে শুভ সমাচার।
তোমার করুণা দিয়ে আমার এ করণীয়;
তাই বুঝি সরে যায় মেঘ, হৃদয়ের বেগ
যায় বেড়ে, নিবিড় বাসনা নিয়ে
বেড়ে ধরি বনভূমি, ধুলা-মাটি, জল,
তোমারি চরণে পড়ে ফুল হলো, ফল হলো,
চিত্ত অচঞ্চল, অঞ্চল বিছায়ে বসি, গাঁথি ফুলহার;
খোলা রাখি খুলে রাখি তীব্র অন্ধকার।

মধ্যযুগের সন্ত-কবিতা

অনুবাদ ঃ কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

॥১॥
চলরে চল ও মনরে, তোর যেথায় যাওয়ার আশ,
চরণবিনা চলরে ও মন, শোনরে শ্রবণ বিনা।
বিনা হাতেই বাজাবি বীণ—নাইরে যেথায় তনু,
মনন-পরাণ নেই যে কিছুই—আসবি সেথায় কিনা;
সেই যেখানে শব্দটি নেই, জিহ্বাও নেই যেথা;
রসনাহীন সেই মুখে তুই গাইবি মনোবীণা!

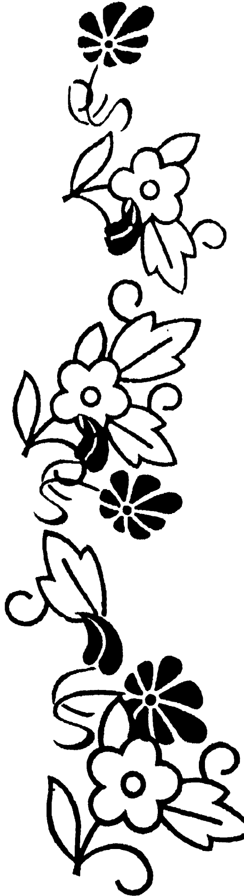
—দাদূদয়াল

॥২॥
সন্ত, মগন হয়েছে রে মন মোর,
ভরপুর সারা দিবস-রাত্রি কী এক রসের ঘোর।
ডেরা বেঁধে আমি রয়েছি এ ঠাঁই,
রসের পিপাসা বিনা তৃষ্ণা নাই;
ঢাল ঢাল প্রেম-কুসুম-আসব—
আকুল বিভোর হই।

—রজ্জব

॥৩॥
এক পলকের তরেও তোমার হলো নাকো পরিচয়
জগতের সাথে, মিথ্যেকপট বন্ধনে বাঁধা পড়ে
কত ছলনার আলাপ-প্রলাপ; মস্তকে গুরুভার—
কামনার বোঝা বয়েই চলেছ, নামাবে কেমন করে?
কবীর বলছে হৃদয়ের কথা—রাখ রাখ অন্তরে
জ্ঞান ও বিরাগ; অনুরাগ শুধু তাঁরই লাগি হিয়া ভরে।

—কবীর



হে নাথ!

অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়

সাজাতে চেয়েছি এ ঘর আমার—
এখনো তো শেষ হলো না,
চলে যেতে তুমি বলো না আমায়—
চলে যেতে প্রভু বলো না।
কত না যতনে সাজাব এ-ঘর,
বসাব তোমারে আসন-ওপর,
রাখিব এ-মাথা ঐ পদ 'পর,
যেন নাহি করি ছলনা।
জ্ঞান নাহি মোর অজ্ঞান আমি,
খুঁজে চলি পথ দিবস কি যামী,
কোথা পথ শেষ জানিনেকো স্বামী
তবু আশা আজও গেল না।
কাঁচের স্বর্গ যেন নাহি হয়,
এই মন প্রভু সেই কথা কয়,
তুমি হলে শেষ তুমিই প্রথম—
এই কথা যেন মনে রয়।
একদিন তুমি করুণা করে,
আনিবে যখন আপনার ঘরে,
আমি যেন ভুলে যাই নাকো সরে,
এ-মনেরে বলি টলো না।
তারপর এক প্রভাতবেলায়
সাথি করে নেবে তোমার খেলায়,
এই আশা মোর জীবনবেলায়,
আমারে হে নাথ ফেলো না।

দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক

শক্তিচরণ চট্টরাজ

প্রার্থনারত জীবনে আমার
একটি মনস্কাম—
দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক
'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম।
শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ইষ্ট
আমি তাঁর ভাবে ভক্তিনিষ্ঠ,
তাঁর কৃপাতেই এ জীবনতরী
ভেসে চলে অবিরাম;
দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক
'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম।
তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু
তিনিই মহেশ্বর
বেদ ও তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণ
তাঁরই কণ্ঠস্বর।
এ-জীবন যদি তাঁর কাজে যায়
তবে তার চেয়ে বড় কিছু নাই—
তিনি যে আমার ধ্যানের দেবতা
চিরপ্রভু প্রাণারাম;
দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক
'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম।

প্রার্থনা

অরুণলাল নন্দী মজুমদার

হে প্রভো!
সাঙ্গ হোক জীবনের দীর্ঘ আবর্তন।
বন্ধুর এই যাত্রাপথ হোক সমাপন॥
ফিরাইও না মোরে আর পুরনো মায়ায়।
পঙ্কিল এই পৃথিবীর কুটিল ছায়ায়॥

পরিহরি জরাজীর্ণ ছিন্নবসন এবার
নাহি চাহি লভিতে পুনঃ নূতন সম্ভার।
করিতে চাহি শুধু তোমারে বরণ,
আমার 'আমি'কে তোমায় করি সমর্পণ।

সমুদ্রগভীর হতে উঠি ঊর্মিমালা
ভেসে ভেসে পুনঃ মিলায় সেই সমুদ্রেরই জলে,
আমিও তেমনি নাথ, প্রবেশিতে চাই মোর
জীবন উৎসমূলে, শান্ত স্নিগ্ধ তোমারই কোলে।

সেথা আমি তোমা সনে মিশে হব একাকার,
সফল করহ সাধনা মোর, প্রভো! প্রার্থনা আমার



সমন্বয়ভাবনা—ইতিহাস

সাধনকুমার দত্ত

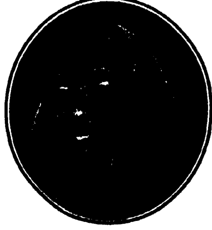
(১)
'যত মত তত পথ'
বিভেদ-ঘুচানো ঐক্যমত
বিবিধের মাঝে মহামিলন
শুভদায়ী ভাবনা, রামকৃষ্ণ-দর্শন
আক্ষরিক স্বীকৃতি সংবিধানে
গণতন্ত্রে প্রতিফলন
মত ও পথের সমন্বয়বিন্যাসের
প্রত্যয়ী এক আন্দোলন।
পরিণাম—
উলটোপুরাণ
সুস্থির এক সম্ভাবনার
বোধনের আগে বিসর্জন!!

(২)
যত নেতা তত দল
মত ও পথের বিভাজন
নতুন দল নতুন নেতার
নিত্য-নতুন সংস্করণ,
মতবাদের প্রসার-দ্বন্দ্বে-হাতিয়ার ঃ
সংবাদ-মাধ্যমে 'গোয়েবলীয়' প্রচার,
মগজ-ধোলাইয়ের চতুর ব্যবহার,
পাইয়ে দেওয়ার অকৃপণ অঙ্গীকার!
ফলশ্রুতি—
তোষণ-সর্বস্ব ভেদনীতি
বিভ্রান্ত জনতা, অস্তিত্বের দীর্ঘশ্বাস
অস্থির বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ,
সমন্বয়ভাবনা—ইতিহাস।

(৩)
'টাকা মাটি মাটি টাকা'
সত্যদর্শীর অনৃত ভাষণ
ভাবশিষ্যদের ত্যাগের ব্রত
সমাজকল্যাণে নিবেদিত মন;
বাস্তববোদ্ধাদের সঠিক প্রয়োগ
মাটির প্রশ্রয়ে এলাকা শাসন!
আপেক্ষিকতাবাদের জটিল তর্কে
আপাত সত্যের চালকের আসন
রামকৃষ্ণ-চর্চা অতীত বিলাস
ধরা এখন সরার মতন
আগ্রাসনের গোপন ইচ্ছায়
বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়ন।
এখানেই কি সমাপন?

জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবী

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'The Vedanta Kesari'-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৫৪) এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।—**সম্পাদক**



শ্রীশ্রীমায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা অথবা তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত। তাঁর চরিত্রের মহিমময় গুণাবলী অনুধাবন করার জন্য অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করা প্রয়োজন। গভীর অধ্যাত্মভাব-সমৃদ্ধ তাঁর জীবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়; এবং সেই মহান অধ্যাত্মমার্গ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী না হলে তাঁর জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, কারণ তাঁরা ছিলেন স্বরূপত অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ওকে (শ্রীশ্রীমাকে) আর একে (নিজেকে) অভিন্ন জানবে।" শ্রীশ্রীমাও তাঁর ভক্ত সন্তানদের অনুরূপ কথাই বলতেন। এঁদের যুগ্ম জীবনচরিত উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর জীবন ছিল গভীর অধ্যাত্মবন্ধনে আবদ্ধ। পতির জাগতিক ধনসম্পদের ওপর মৈত্রেয়ীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল পতির অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সুসমৃদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য লীলাসঙ্গিনী। তাঁরা ছিলেন অভিন্ন। সেকালের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন এবং চরম সত্যের উপলব্ধি ও তাকে ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন চূড়ান্ত অক্ষম। তাঁদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মূল ভাবটি ছিল সেই পরমাত্মা তথা অদ্বৈতভাবের সঠিক বিকাশসাধন। আমরা আমাদের দুর্বল ও চঞ্চল মনের সাহায্যে সেই মাহাত্ম্যের কণামাত্র ধারণা করতেও অক্ষম। আমরা শুধু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করতে পারি মাত্র। কোন মানুষই শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপা ও প্রেম সম্পর্কে বলে শেষ করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের সময় শ্রীশ্রীমায়ের বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ। তারপর সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি এই মর্ত্যধামে লীলা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর আরো আঠারো বছর তিনি এই ধরাধামে বিরাজ করেছেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনলীলা ছিল ঈশ্বরের এক পূর্ব পরিকল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুবক শিষ্যগণের অন্তরে নববেদান্তের বীজ রোপণ করেছিলেন। সকলেই জানেন, বেদান্তের সেই নবভাষ্যটিকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণকে সুসংহত করে তাঁর ভাবকে সার্থক রূপদানের ক্ষেত্রে প্রধান যন্ত্র ছিলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্তিমকালে তাঁর যেসকল ত্যাগী সন্তান তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরাই তাঁর মহাপ্রয়াণের পর প্রবল বিরহ ও হতাশায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের উদ্যোগেই তাঁরা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত লক্ষ্যপূরণের জন্য একত্রিত হন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ত্যাগী সন্তানগণের দায়িত্ব শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ন্যস্ত করে যান, তাঁর অসম্পূর্ণ কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য শ্রীশ্রীমাকে নির্দেশ দান করেন। শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেই ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের মূল শক্তি। তাঁরই কৃপায় শক্তিলাভ করে তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী প্রচারে সাফল্যলাভ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা যে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছি, তার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যদৃষ্টি ও অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তির কাছে আমরা অশেষ ঋণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতেন ঃ "ও সরস্বতী।" কল্পনা করুন, একজন গ্রাম্য নিরক্ষর রমণীকে স্বয়ং ভগবান বর্ণনা করছেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। আমাদের দেশে 'শিক্ষা' বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকেই বোঝানো হয়নি। ঐ 'চালকলা-বাঁধা' বিদ্যা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য হলো, গ্রন্থ পাঠ না করেও একজন প্রকৃত জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হতে পারেন। আমরা প্রাচীনযুগের এমন বহু ঋষির সন্ধান পাই, যাঁরা লিখতে, এমনকি পড়তেও অক্ষম ছিলেন; কিন্তু তবুও তাঁরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধাররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঋষিবরিষ্ঠ

(অবতার-বরিষ্ঠ), অথচ শুধু নিজের নামটুকু লেখার মতোই পুঁথিগত বিদ্যা ছিল তাঁর।*

শ্রীমা সারদাদেবীর লেখাপড়া ছিল তার চেয়েও কম। তিনি লেখাপড়ার চেষ্টা করলেও নানা কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি, অথচ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি সেকালের বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করে আনত এবং তাঁরা পরম শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা ও মনোযোগ সহকারে সেগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। পুঁথিগত শিক্ষা না থাকলেও প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সেই শিক্ষাই শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লাভ করেছিলেন। আপন কর্তব্যকর্মে শ্রীশ্রীমা যেন কোন অবহেলা না করেন, সেবিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি। অবিরত সমাধি অবস্থায় থাকলেও তিনি গার্হস্থ্য জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে, অতিথিদের সেবা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতএব জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দিক বিবেচনা করে একটি বিষয় স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় যে, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যলাভ করে তিনি চরম জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা ও বিনম্রতার জন্য দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে অতি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কোন ভক্ত বা অতিথি উপস্থিত না থাকলেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করতে পারতেন। এমন অনেকদিন হয়েছে—হয়তো দিনান্তে একটিবারও তিনি প্রভুর দর্শন পেলেন না, তবু তাঁর মন-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই নিত্য ভাবসমাহিত হয়ে থাকত। তাঁর অন্তর সদাই প্রভুর সঙ্গে একই সুরে অনুরণিত হতো এবং সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় জ্ঞান ও গুণাবলীর তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হয়ে উঠেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন দেবী সরস্বতীর জীবন্ত প্রতিমা এবং পরম্পরা সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমময় জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারিণী, সেই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে অনুরূপ আরেকজন মহীয়সী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হলেন মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী। তিনি মণ্ডন মিশ্র এবং শঙ্করাচার্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পতি সেই বিতর্কে পরাভূত হলে তিনি প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁর পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। প্রচলিত আছে যে, দেবী সরস্বতীর অংশজাতারূপে তিনিই 'সারদাপীঠম্'-এ অধিষ্ঠান করেছিলেন। একথাও বলা হয় যে, অদ্বৈতভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির মধ্যে সম্মিলন ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীমা ছিলেন অসীম প্রেম এবং জ্ঞানের দেবী সাক্ষাৎ সরস্বতীর মূর্ত বিগ্রহ। জীবনের প্রাথমিক পর্বে তৎকালীন সামাজিক শিক্ষার প্রভাবের ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীমাও অপরের ত্রুটি দেখলে তার সমালোচনা করতেন। অবশ্য এর কারণ একটা ছিল। স্বরূপত শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হওয়ার ফলে অপরের ত্রুটিগুলি অতি সহজেই তাঁর নিকট প্রকট হয়ে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে অবহিত ছিলেন, শ্রীমা সারদাদেবী একদিন জগজ্জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তাঁর প্রেমময়ী দৃষ্টির সম্মুখে ধার্মিক-অধার্মিক, পাপী-পুণ্যবান প্রভৃতি সকল ভেদাভেদ অন্তর্হিত হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা যদি শুধু অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন মানুষের জীবনে উন্নয়নের পথ সুগম করে, তাহলে তা সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে না এবং তার মূল্যই বা কী? সেইজন্যই দেখা যায়, সমাজে যারা পাপী, তাপী, পতিত, অবহেলিত—তাদের প্রতিই তাঁর প্রেম ও করুণাপ্রবাহ ফল্গুধারার মতো প্রবহমান এবং এসবই ছিল পূর্বনির্ধারিত। অতএব অচিরেই তিনি তাঁর সেই সমালোচনা করার অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করি, কী অসীম ধৈর্য সহকারে তিনি তাঁর এক ভ্রাতৃবধূ ও তার কন্যার অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্বিকারভাবে সহ্য করলেন! এক অনির্বচনীয় ঐশী শক্তিবলে তিনি তাঁর পরলোকগত ভাইয়ের কন্যাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, ঐ কন্যাটিকে উপলক্ষ্য করেই তাঁকে দেহধারণ করে থাকতে হবে; এটি ছিল দৈবনির্দিষ্ট। তাঁর ভাইয়ের গৃহেই হোক অথবা স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক নির্মিত তাঁর কলকাতার বাসগৃহেই হোক, সর্বত্রই দেখা যেত গার্হস্থ্য কর্মকে তিনি কোনদিন অবহেলা করেননি। ঘর পরিষ্কার করা, বাসন ধোওয়া, রান্না করা থেকে শুরু করে ভক্ত, অতিথি ও আত্মীয়স্বজনকে পরিবেশন করে খাওয়ানোর দায়িত্বটি পর্যন্ত তিনি স্বয়ং পালন করতেন।

একজন আদর্শ মা-কে সংসারে কীভাবে আচরণ করতে হবে, তিনি নিজের জীবন দিয়ে সকল মাকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেলেন। সেই কারণেই ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ভারতীয় নারীত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ

* এটি লেখকের মত। শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে পারতেন, তা বেলুড় মঠে 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির'-এ সংরক্ষিত তালপাতার পুঁথিতে তাঁর লেখা দেখলেই বোঝা যায়।—সম্পাদক

কথা হলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীমায়ের প্রেম এবং করুণা জাতপাতের বেষ্টনী মানত না। তাঁর সংস্পর্শে এলে সকলের মধ্যেই অধ্যাত্মভাবের অভ্যুদয় ঘটত। যেসকল অভাগা মানুষের জীবনে কোনরকম আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হতো না, তারাও যখন তাঁর কাছে এসে আকুলভাবে দীক্ষালাভের প্রার্থনা নিবেদন করত, তখন মনে হতো তিনি তাদের উদ্ধার করার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালিত হলো কিনা অথবা দীক্ষার্থী তথাকথিত বাহ্য শুচির অধিকারী কিনা বা সেই দীক্ষার্থী দীক্ষালাভের উপযুক্ত আধার কিনা—এই ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলি নিয়ে তিনি আদৌ উদ্বিগ্ন হতেন না। সন্তান এসে ব্যাকুলভাবে মায়ের শরণাপন্ন হয়েছে—এটিই ছিল তাঁর কাছে মূলকথা।

জনৈক ভক্ত একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ এক একজন অমূল্য রত্নস্বরূপ। তাঁরা প্রত্যেকেই মহান ব্যক্তিত্ব, সর্বত্যাগী এবং জগতে বেদান্তের চিরন্তন মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রভুর সন্তান-সংখ্যা নিতান্তই অল্প; তবু তাঁরা আদর্শ জীবনের মূর্তিমান প্রতীক। অপরদিকে আপনার সন্তানের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু তাঁদের মান নিতান্ত সাধারণ। এর কারণ কী? শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন ঃ এভাবে তুলনা করতে নেই বাবা। ঐ স্বল্পসংখ্যক যোগ্য ত্যাগী ও গৃহী সন্তানকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলে তাঁদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সন্তানের কল্যাণসাধনের জন্যই একালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। যারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত থেকে গেল, সেইসকল হতভাগ্য সন্তানের উদ্ধার করার জন্যই তিনি আমাকে রেখে গেলেন।

বস্তুত এই কারণেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা বিতরণের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। প্রকৃত মা তাঁর পণ্ডিত বা মূর্খ, সবল কিংবা দুর্বল সন্তানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন না। যদিও বা করেন, দেখা যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল সন্তানদের প্রতি মায়ের দুর্বলতা যেন কিঞ্চিৎ অধিক। শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃতিও ছিল এরকম। তাঁর কাছে সকলেরই ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত থেকেছে—এমন ভাগ্যহীনের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। একবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে এক মুসলমান সন্তানকে তিনি স্বহস্তে খাওয়ালেন। প্রবল সংস্কারাচ্ছন্ন এক ক্ষুদ্র গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মাতৃমহিমার স্ফুরণে বাধাদানকারী কোন বিধি-নিষেধকে তিনি আদৌ আমল দিতেন না। কৃপাবর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জাতপাত ও সকল কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে। তিনি তখন উদ্বোধনে আছেন। হঠাৎ এক মহিলার আর্তনাদ শুনে বারান্দায় এসে তিনি দেখলেন, মহিলাটির স্বামী তার ওপর শারীরিক অত্যাচার করছে। তিনি নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না, চিৎকার করে ওঠলেন ঃ "বলি ও মিনসে, বৌটাকে একবারে মেরে ফেলবি নাকি?" শ্রীশ্রীমায়ের সেই অগ্নিমূর্তি দেখে পুরুষটি ক্ষমা চেয়ে নিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাঁধভাঙা ভালবাসার কোন পরিমাপ করা যায় না। শুধু মানুষই নয়, জীবজন্তুও তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতো না। একবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে একটি বাছুরকে বেঁধে রাখার ফলে সে তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য অবিরত চিৎকার করতে থাকে। তার করুণ চিৎকার সহ্য করতে না পেরে শ্রীশ্রীমা এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে দেন। আরেকদিন একজন একটি বিড়ালের মাথায় পা দিয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সেটি দেখে বলে উঠেছিলেন ঃ "তুমি করছ কী বাবা, মাথা হলো গুরুস্থান। সেখানে পা দিয়ে কখনো স্পর্শ করা উচিত নয়। বিড়ালটিকে প্রণাম কর বাবা!" শুধু জীবন্ত প্রাণীই নয়, জড়বস্তু পর্যন্ত তাঁর কৃপালাভ করেছে। একদিন তাঁর বাড়ির রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ঘর পরিষ্কার করে ঝাঁটাটি একদিকে ছুঁড়ে রেখে দিলে তিনি বলে ওঠেন ঃ "যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও আদর করে রাখতে হয়।" শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসার নজির সীমাহীন। তাঁর ভালবাসা ছিল সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরিকল্পিত পথ অনুসরণ করে সমগ্র জগৎকে দিব্য মাতৃমহিমার আস্বাদ প্রদান করতেই তিনি একালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে, যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। তার মধ্যে একটি হলো ঈশ্বরকে পিতৃরূপের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃরূপেও কল্পনা করা। সেই দিব্যসত্তার উদ্দেশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি শ্লোক আছে—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"
(৪।৩)

—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ড সহায়ে চল এবং তুমিই জাত হয়ে নানা রূপ ধারণ কর।

এপ্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলছেন ঃ
"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।"
(৯।১৭)

—আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, সর্বপ্রাণীর কর্মফল-দাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বস্তু।

একটি সুপরিচিত প্রার্থনাস্তোত্র (প্রপন্নগীতা) হলো ঃ
"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।"

—হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ঐশ্বর্য, তুমিই আমার সর্বস্ব।

পূতপবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরে কোন লিঙ্গভেদ নেই। ঈশ্বরকে দিব্য পিতারূপে কল্পনা করা যেমন সত্য, তাঁকে জগজ্জননী-রূপে কল্পনা করাও সমভাবে শাস্ত্রানুমোদিত। ঈশ্বরকে শুধু পুরুষরূপে কল্পনা করা একটি প্রচলিত বিশ্বাসের পরিণাম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক মানসিকতায় লিঙ্গভেদের স্থান থাকতে পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতে এমন কোন ধারণার অস্তিত্ব নেই। মানুষের মনে যতক্ষণ তার ঐহিক মানবসত্তা সম্বন্ধীয় ধারণা থাকে, ততক্ষণ সে মানুষের মধ্যে দেবত্বভাব অবলোকন করতে অসমর্থ হয়। কিন্তু তাকে সেই সসীম সত্তার চেতনা থেকে আরো ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং তার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তার প্রথম পদক্ষেপ হলো, ঈশ্বরকে শুধু পুরুষরূপে কল্পনা না করে, তাঁকে নারীরূপে কল্পনা করার মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন সকল দেবদেবীর অন্তর্নিহিত মাতৃসত্তার জীবন্ত বিগ্রহ; আর ঐ মাতৃত্বের নির্যাসরূপে পরিবেশিত হলো তাঁর প্রেম—শুদ্ধ, পবিত্র প্রেম। তাঁর মন হলো মহাজাগতিক মন, হৃদয় সার্বজনীন হৃদয়। তিনি জগৎকে এই শিক্ষাই দিতে এসেছিলেন যে, এই প্রবল প্রতিকূলতা ও হিংসার মধ্যেও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে চিরসত্যস্বরূপ গভীর মাতৃপ্রেমের যথাযথ উন্মেষ। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, অপরাপর মানবধর্মগুলিও যেন সঠিকভাবে বিকাশ-লাভ করতে থাকে। জগতের অন্য কোন মনস্তাত্ত্বিক উপকরণের সঙ্গে এই মাতৃপ্রেম অথবা মাতৃত্ববোধকে এক করে দেখলে চলবে না। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের মধ্যেই এই পুরুষ ও নারী-সত্তার এক অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আমরা আমাদের প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকি। আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সত্তার মধ্যে পুরুষ এবং নারী-ভাবের প্রচ্ছন্ন সংমিশ্রণ বর্তমান। কারো ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণ প্রকাশিত থাকে, কিছু গুণ থাকে অপ্রকাশিত। আবার কিছু গুণ দেখা যায় তেজোদীপ্ত, কিছু গুণ নীরব অথবা অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির। এই উভয়জাতীয় গুণের সমাহার ব্যতীত কোন পূর্ণ মানুষ কল্পনা করা যায় না। কোমল বা মৃদু গুণগুলি হলো নারীসুলভ এবং শৌর্যপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক গুণগুলি হলো পুরুষসুলভ। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই দুধরনের গুণ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে প্রচ্ছন্ন থাকে । একমাত্র তখনি একজন নারীর মধ্যে নারীত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে, যখন তিনি একজন 'মা'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই মাতৃভাবের পূর্ণ আধার। জীবনের অন্তিমলগ্নে তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হওয়া সন্তানগণের প্রতি তাঁর প্রেমপূর্ণ আচরণ থেকে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যায় যে, একটি ঈগলপাখি যেমন তার দুটি ডানা দিয়ে শাবকদের রক্ষা করে, তিনিও সেরকম অসীম ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করছেন। জগৎকে তিনি এই শিক্ষাই দিলেন যে, মাতৃপ্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে জগৎ চিরস্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। শ্রীশ্রীমা সেই মাতৃপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহরূপে উদ্ভাসিত হয়ে মর্ত্যে লীলা করে গেছেন এবং জগৎকে প্রেমের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর তাঁর সেই অটুট প্রেমবন্ধনকে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সর্বভারতীয় পরিকল্পনাটি প্রথম উদয় হয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে। তাঁর আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য আমেরিকানদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা বা তাঁর নিজের নাম প্রচার করা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষকে এক সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শুধু ভারতবর্ষের কল্যাণ নয় পরন্তু তা ছিল সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলসাধন। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষকে যদি তার হীন অবস্থা থেকে মুক্ত না করা যায়, সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতিই ব্যাহত হবে। তিনি স্থির-নিশ্চিত ছিলেন যে, সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র অনাহার, দারিদ্র্য, রোগশোক এবং স্বাস্থ্যের অভাব তাঁকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। অনিয়ন্ত্রিতহারে ক্রমাগত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তিনি চিন্তান্বিত হলেন। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু সে-ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কোন আলোর সন্ধান পাচ্ছিলেন না। কিন্তু একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে তিনি কীভাবে এই জাতিকে শক্তি তথা মাহাত্ম্যের পথ প্রদর্শন করবেন?

মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) পৌঁছে তিনি শুনলেন, আমেরিকায় এক বিশাল ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে ঐ সভায় যোগদানের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং তিনি হৃদয়ে অনুভবও করলেন, এ এক উত্তম সুযোগ। কিন্তু সমস্যা হলো, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ না পেলে তিনি সেখানে যেতে পারেন না। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা করে একটি পত্র পাঠালেন এবং তাঁর গুরুদেবের

ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। একদিন তাঁর এক দিব্য দর্শন হলো। তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে নির্দেশ করছেন। ইতোমধ্যে আশীর্বাণী-সহ শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিপত্র এসে গেল। প্রবল উৎসাহে তিনি আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

আমেরিকায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত; তৎসত্ত্বেও ঈশ্বরের কৃপায় তিনি অলৌকিকভাবে সেই মহাসভায় যোগদানের অনুমতিলাভ করলেন। সেই সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ সমগ্র আমেরিকাবাসীর কাছে বজ্রনাদের মতো ধ্বনিত হলো। তাদের দীর্ঘদিনের ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিক ভিত্তির মূলে তিনি আঘাত হানলেন। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো, ভারতবর্ষ আদৌ অনুন্নত বা অশিক্ষিত দেশ নয়। এতদিন কেন তারা মিশনারি প্রেরণ করে সেই দেশকে সুসভ্য করে তোলার বৃথা চেষ্টা করেছে, সেকথা চিন্তা করে বিস্ময়বোধ করতে থাকে। স্বামীজী অনুভব করেন যে, একমাত্র বেদান্ত প্রচারের মাধ্যমেই তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে পাশ্চাত্যের দরবারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন। সেই উদ্দেশ্যেই শুরু হয় তাঁর প্রচারকাজ—আমেরিকানদের ধর্মান্তকরণের উদ্দেশ্যে নয়। আমার বিশ্বাস, এমন মনে করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় যে, আমেরিকানদের তিনি বেদান্তভাব গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ আধাররূপে বিবেচনা করে সেদেশে প্রচারকাজ শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমেরিকানদের হৃদয়ে ভারতীয় ভাব ও শিক্ষাধারার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই ভাব বা শিক্ষাটি হলো একটি দর্শনস্বরূপ, যা কদাপি সঙ্কীর্ণ বা প্রাদেশিক নয়, তা সর্বদাই উদার ও মহান এবং মানুষের মতোই সার্বজনীন। ভারতবর্ষ সেই বেদান্তদর্শনের উৎসস্থল হলেও তার ভাবটি কিন্তু সার্বজনীন। যেকোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির কাছে বেদান্তের আবেদন চিরন্তন। সমগ্র মানবসমাজের কাছে বেদান্ত এক অমূল্য সম্পদ। পাশ্চাত্যদেশবাসীর জন্য স্বামীজী বেদান্তের এই অমূল্য বাণীই বহন করে নিয়ে গেলেন।

অপরদিকে ভারতবাসীর জন্য তাঁর নির্দেশ ছিল সমাজ তথা মানুষের সেবা। তিনি উপলব্ধি করেন, এই দেশের সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় নবজাগরণ তথা সমষ্টিগত উন্নয়ন। আমরা প্রত্যেকেই অতি হীন আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার শিকার। আমাদের মধ্যে জাতীয় সংহতির একান্ত অভাব। আমরা সদাই নিজ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু প্রতিবেশীর ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের মধ্যে অমানবিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেগুলি ধর্মের ছদ্মবেশে আমাদের সর্বনাশ করছে। স্বামীজী যখন মালাবার গেলেন, সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে অস্পৃশ্যতা, দৈবনির্ভরতা এবং চারিত্রিক অনমনীয়তা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল হাজার হাজার বছর ধরে বিদেশীদের পদানত হয়ে থাকার কুফল এবং স্বামীজীর কাছে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কর্মযোগই ভারতবাসীদের পক্ষে প্রকৃষ্ট মার্গ; কারণ মানুষের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে উন্নয়নের ফলেই ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হতে পারে। তিনি স্থির করলেন, সর্বাগ্রে রাজনৈতিক উৎপীড়ন, অর্থনৈতিক হতাশা, নিরক্ষরতা এবং স্বাস্থ্যহীনতা দূর করতে হবে এবং ধাপে ধাপে মানুষকে সাধারণ স্তর থেকে এক উন্নত স্তরে উন্নীত করতে হবে। যাদের পেটে অন্ন নেই, তাদের মধ্যে ধর্মের কথা বলে কী লাভ? দরিদ্র, পীড়িতদের মাঝে গিয়ে স্বর্গের মাহাত্ম্যের কথা বা মৃত্যুর পরের পরিণতির কথা প্রচার করা নিতান্ত হাস্যকর। সুতরাং স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল, রামকৃষ্ণ মিশন সেবার মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নসাধন করবে, প্রয়োজনে তাদের আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করবে, তাদের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যথাযথ সাহায্য করবে এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা করবে। তিনি তাঁর অনুগামীদের এই মহান কর্মের দায়িত্বভার দিয়ে গেলেন। এদেশের মানুষ যদি সবল না হয়, মহৎ না হয়, তবে এই ভারতবর্ষ কোনদিনই জগৎকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

স্বামীজীর জীবনের এই মহান কীর্তিগুলি উল্লেখ করার কারণ হলো, তাঁর সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। তিনি স্বামীজীর সকল উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য। আজ আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নামক অধ্যাত্মচর্চার যে বিশাল কেন্দ্রটি প্রত্যক্ষ করছি, তার প্রধান ভিত্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা। অতএব আসুন, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁকে জগজ্জননীরূপে পূজা করি। প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় ভারতবর্ষ যেন তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে পুনরায় এক মহান দেশরূপে সমগ্র জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে সমগ্র জগৎকে যেন নেতৃত্বদান করতে পারে। ❑

টি. এম. পি. মহাদেবন *(১৯১১-১৯৮৩)*

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, দীর্ঘকাল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর লেখা দর্শনশাস্ত্রের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

প রি ক্র মা............

রাশিয়া ভ্রমণ ঃ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা

স্বামী গোকুলানন্দ

কথায় বলে, যাকিছু ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে। মস্কোয় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রের প্রধান স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী সংস্কৃতজ্ঞ, প্রায় প্রতিবছরই দিল্লিতে আসেন। তিনি একবার দিল্লিতে এলে আমি তাঁর কাছে মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, আর তিনিও তা চেয়েছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠের নীতি অনুযায়ী সেখানকার অনুমতি ছাড়া আমরা বিদেশে পাড়ি দিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৩ থেকে ১৮ জুলাই সেন্ট পিটার্সবার্গের রামকৃষ্ণ সোসাইটি এবং মস্কো কেন্দ্র—দুজায়গা থেকেই আমন্ত্রণ পেলাম। ভিসা ইত্যাদি যাকিছু প্রয়োজন তা তাঁরাই যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। ভাগ্যক্রমে রাশিয়াতে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আমাদের নিকট বন্ধু। তিনি প্রয়োজনীয় সবকিছু দ্রুত করে দিলেন। ফলে আমি ছাড়পত্র পেলাম এবং বেলুড় মঠও আমাকে ছাড়পত্র দিলেন। ৩ জুলাই সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হলাম। আমি যখন তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "গোকুলানন্দ, তুমি ওখানে গিয়ে সকলকে আমার আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানাবে। আমি দুবার ওখানে গিয়েছি। প্রথমবার ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাও দিয়েছি।"

মহারাজের আশীর্বাদ এবং অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের শুভেচ্ছা নিয়ে ৩ জুলাই মস্কো যাত্রা করলাম। ভোরবেলা নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগেই মস্কো বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখলাম, আমাদের উড়ান আগে পৌঁছানোর জন্য স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজীর আসতে তখনো দেরি। সৌভাগ্যক্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন ভক্ত সেখানে উপস্থিত। নাম রিতু, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। তার বাবা-মাও এখানে রয়েছেন। রিতু এই দেশে ডাক্তারি পড়ছে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। একা মালপত্র নিয়ে বসে থাকার সময় সে এসে বলল ঃ "মহারাজ, আপনার জন্য ফুল এনেছি।" ব্যাপারটা স্বভাবতই আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। সে আমাকে তাদের বাড়ি যাওয়ার অনুরোধ করল; আমরা পরে গিয়েওছিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী ও তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ডঃ লিলিয়ানা, অন্য একজন ভক্ত এবং ড্রাইভার অ্যানেক্সি এলেন। অ্যানেক্সি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, সে সবসময় বলত ঃ "স্বামী, আমি ইংরেজ নই, আমার স্ত্রী ইংরেজ।" জ্যোতিরূপানন্দজী সঙ্গে ছিলেন, ফলে কোন অসুবিধা হয়নি। নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেলাম।

সেদিন বিকালে রেড স্কোয়ারে গিয়ে আমি লেনিনের সমাধিস্থল দেখলাম। ক্রেমলিনের ঠিক বাইরে বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের সংরক্ষিত দেহ—সরকারি উর্দি পরে টানটান করে শোয়ানো, যেন ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর সংরক্ষিত দেহ দেখার জন্য এখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।



মস্কো কেন্দ্রের ঠাকুরঘর

সন্ধ্যায় মস্কো কেন্দ্রের বহু ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলাম। আমাদের মধ্যে অনেক মতবিনিময়ও হলো। 'রামকৃষ্ণ শরণম্', 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' গানের পর প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে সভা শেষ হলো।

পরদিন ট্রেনে চেপে সেন্ট পিটার্সবার্গে যাত্রা করলাম। সেখানে সাতদিন ছিলাম। 'মানসিক চাপ জয় করার উপায়' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখলাম। একজন রাশিয়ান আমার বক্তব্য রুশভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথম দিন (৫ জুলাই ২০০২) 'পিটার দ্য গ্রেট'-এর ছোট কাঠের বাড়িটি দেখে এসে নৌজাহাজ 'অরোরা' দেখলাম। এই জাহাজ 'অক্টোবর বিপ্লব'-এর সঙ্কেতের কাজে ব্যবহৃত হতো। ঐদিন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটির সম্পাদক মাইকেল রুশভাষায় অনূদিত কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দিলেন। যেমন ঃ Is Vedanta the religion of the future?, Swami Vivekananda on—Divine

love and women of India, Swami Vivekananda on 'My Life and Mission'—Letters to Alasinga, A bridged biography of Vivekananda by Swami Nikhilananda, Swami Vivekananda's Address—Parliament of Religions, Swami Vivekananda—My Master & Practice of Religion ইত্যাদি। গ্রন্থগুলির রাশিয়ান অনুবাদ দেখে ভারি ভাল লাগল।

দ্বিতীয় দিন রাশিয়ার একটি গ্রাম এবং সেন্ট আলেকজান্দ্রা নেভস্কির 'সেন্ট্রাল অর্থোডক্স চার্চ' দেখলাম। যাঁরা সেখানে বাতি জ্বালাচ্ছিলেন, তাঁদের ভক্তিভাব দেখেও ভাল লাগল। এখানে রাত সাড়ে ১০টায় সূর্যরশ্মি দেখা সত্যিই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এখানে একে 'আলোকিত রাত্রি' বলে।

৯ জুলাই সকালে ভারতীয় কনসাল জেনারেল রাজীব চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পরে হেরিটেজ মিউজিয়াম, একটি বুদ্ধমন্দির এবং একটি অর্থোডক্স চার্চ দেখলাম।

পরদিন নিকোলাস রোয়েরিখের খামারবাড়ি দেখলাম। সেখানে তাঁর আঁকা চিত্রের একটি সংগ্রহশালাও আছে। নিকোলাস রোয়েরিখ ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী এবং মানবতাবাদী। অল্পবয়সেই তাঁর চিত্রশিল্প মানুষের স্বীকৃতি আদায় করেছিল। শিশুকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'Tagore and Tolstoy' রচনায় তিনি সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করেছেন। ঐ লেখাতেই তিনি স্মরণ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীর মাধ্যমেই শ্রীমতী রোয়েরিখের ভারতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। রোয়েরিখ পরিবারে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র এক উচ্চ আসন আছে। ঐসব ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিকোলাস রোয়েরিখের খামারবাড়ি দর্শন আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকার শেষদিনে আমি পিটারগফের প্রাসাদ ও ঝরনাগুলি দেখলাম। পরদিন মস্কো ফিরলাম।

১২ জুলাই লেনিন হিলস্ এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখার সুযোগ এল। এগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখার পর একটি পুরনো গির্জা দেখলাম। বিকালে মস্কোয় ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে রুশভাষায় অনূদিত রোমাঁ রোলাঁর Life of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda গ্রন্থটি উপহার দিলেন। এরপর মেট্রোতে বিভিন্ন স্টেশন ছুঁয়ে একটি গির্জা দেখতে গেলাম, যা রুশবিপ্লবের সময় ধ্বংস করা হয়েছিল; এখন আবার তা নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। ১৩ জুলাই গিয়েছিলাম মস্কো থেকে ১২০ কিমি. দূরে বিখ্যাত 'সেরগিয়ভ' মঠে।

১৬ জুলাই ভারতীয় দূতাবাসে আবার যেতে হলো রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের আমন্ত্রণে। সেখানে বক্তৃতা দিতেও হলো। বিষয়ঃ 'নতুন সহস্রাব্দে বেদান্তের ভূমিকা'। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ই. পি. চেলিশভ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার বক্তব্যের পর তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। সেখান থেকে আমাকে 'জওহরলাল নেহরু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'-এ নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে অদ্ভুত দৃশ্য! দেখলাম রুশ বালিকা ও কিশোরীরা ভারতীয় নৃত্যবিদ্যা শিখছে, ছেলেরা তবলা বাজানো শিখছে।



মস্কো ইউনিভার্সিটি

রাশিয়া দেশটি ইউরোপ এবং এশিয়া—এই দুই মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। চরম আবহাওয়ার দেশ, উত্তরে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ আর দক্ষিণে গ্রীষ্মের ভয়ানক দাবদাহ।

ঐতিহাসিকভাবেই রাশিয়া অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ দেশ, বিশেষত অর্থোডক্স চার্চের প্রভাব এখানে যথেষ্ট। একটি গির্জা দেখিয়ে মিঃ রঘুনাথ বলেছিলেনঃ "স্বামীজী, এই গির্জাটি অবশ্যই দেখবেন, কমিউনিস্ট আমলে এটি ভূমিসাৎ করা হয়েছিল। কিন্তু গর্বাচভ ক্ষমতায় এসে মুক্তনীতির জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়ায় তখনি একটা সুন্দর গির্জা তৈরি হয়।" আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্য বলে নয়, আমাকে প্রভাবিত করেছিল গির্জার নিচের তলার দৃশ্য। সেখানে রুশ মায়েরা একেবারে হিন্দুদের মতো হাঁটু মুড়ে বসে বাতি জ্বালাচ্ছেন। উপবাসী না হলেও ভক্তিভরে তাঁরা মহান ঋষিদের পূজা ইত্যাদি করছেন। রাশিয়া বহু ঋষির জন্ম দিয়েছে। তাই এই দেশ দেখার ইচ্ছা আমি বহুদিন ধরেই পোষণ করেছি।

'ফিলোকেলিয়া' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। যিশুখ্রিস্টকে যাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, গ্রন্থটি সেইসব ঋষিদের অভিজ্ঞতার সঙ্কলন। একটি চার্চের অভ্যন্তরে গিয়ে আমি দেখলাম কীভাবে ভক্তরা বিশেষ একজন সাধুর কাছে উপলব্ধির জন্য একটি ঝরনা থেকে

জল সংগ্রহ করছে। আমিও সেই পবিত্র জল সংগ্রহ করলাম। বিগত দুই দশকে ৩,০০০-র বেশি গির্জার পুনর্নির্মাণ হয়েছে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর ক্ষমতায় এসে বলশেভিক সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল গির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রুশ সংবিধানে বলা হলোঃ "উপাসনার স্বাধীনতা আমরা সুনিশ্চিত করছি। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে উপাসনা করতে পার।" আবার একইসঙ্গে ধর্মবিরোধী প্রচারও চলতে থাকে। দেখা গেল, বিবৃতির দ্বিতীয় অংশটিই তখন গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য আশির দশকের শেষে নতুন নীতি 'গ্লাসনস্ত' (মুক্ত বাতাস)-এর ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, দীর্ঘদিন চেপে রাখার পরও রাশিয়ায় ধর্মের মৃত্যু হয়নি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৩,০০০-এরও বেশি গির্জা পুনরায় খোলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা-সহ সামগ্রিকভাবে ধর্মের পুনর্জাগরণ হয়েছে।



মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের সঙ্গে লেখক ও স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মহান সাহিত্যিক ঐতিহ্য রয়েছে। উনিশ শতক ছিল রাশিয়ার এক অসাধারণ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়। রুশ কবিতার স্বর্ণযুগে রাশিয়া উপহার দিয়েছে আলেকজাণ্ডার পুশকিনের মতো বিশ্বসাহিত্যের নক্ষত্র-প্রতিভা। তিনি রাশিয়ার জাতীয় কবি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন—ইভান তুর্গেনেভ, ফিওদর দস্তয়েভস্কি এবং লিও তলস্তয়। দস্তয়েভস্কি এবং তলস্তয়ের লেখনী ও সত্তার মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক ছিল না। তলস্তয় সম্পর্কে রুশ পণ্ডিত বালগভ বলেছেনঃ "গভীর মনোযোগ ও উৎসাহ নিয়ে তলস্তয় তাঁর সমসাময়িক স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়তেন।" বালগভ আরো বলেনঃ "ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়ে তলস্তয় তাঁর ডায়েরিতে ৪ জুলাই ১৯০৮ তারিখে লেখেন, '৪ জুলাই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি হয়—অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।... বিবেকানন্দের ঈশ্বর বিষয়ক চমৎকার লেখাটি আমি পড়েছি, এটির অনুবাদ জরুরি, তাই নিজেই করব মনস্থ করেছি'।" তলস্তয় নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের 'ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হওয়ার পথ' রুশভাষায় অনুবাদ করেন।

প্রাচ্যের খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠার পর রাশিয়ার রাজধানী মস্কোকে একসময় সসম্ভ্রমে 'তৃতীয় রোম' বলা হতো। স্তালিনের সময়ে বহু আকাশচুম্বী বহুতল গড়ে তোলা হয়েছিল। দুটি প্রসিদ্ধ আকাশচুম্বী বহুতল হলো বিদেশমন্ত্রক এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়—লেনিন পাহাড় ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে। এটি সত্যিই এক দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা। আমি কথা বলতে চাইছিলাম অথচ আমার ভাষাসমস্যা হচ্ছিল। তখন একজন এগিয়ে এসে বললেনঃ "আমি মরু-ভূতত্ত্ব পড়াই, ইংরেজিও জানি।" আমার সুবিধা হলো। কমিউনিস্ট যুগে এ ছিল এক নিস্তেজ এবং বিষণ্ণ স্থান, আর এখন বিদেশী মানুষ ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের এক উচ্ছল নগরী।

অবশ্য পুরনো আমলের একটি স্মৃতি রয়েছে—আড়ম্বরপূর্ণ সমাধিস্থলে লেনিনের স্মৃতিসৌধ, ক্রেমলিনের বাইরে রেড স্কোয়ারে। শুনলাম স্তালিনের দেহও কিছুদিন ঐ জায়গায় ছিল; তবে যেহেতু স্তালিন বহু মানুষের ওপর অত্যাচার করেছেন, অনেক মানুষকে হত্যা করেছেন, সেজন্য অনেকে তাঁকে সুনজরে দেখে না। তাই তাঁর দেহ সরিয়ে ফেলে অন্যত্র কবর দেওয়া হয়েছে।

মস্কোর হৃদয় হলো ক্রেমলিনের দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ, যাকে ঘিরে আসল শহর গড়ে উঠেছে। এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত, ত্রিভুজাকৃতি বিশাল ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এর অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুন্দর গির্জা, যেখানে রাশিয়ার জারেরা অভিষিক্ত হতেন। প্রাসাদগুলি বর্তমানে সম্মেলনস্থল, সরকারি ভবন এবং একটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ স্থাপত্য হলো 'ইভান দ্য গ্রেট বেল টাওয়ার'। স্তম্ভের ঘণ্টার ওজন ৬৫ টন। মস্কোর সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থাপত্যশিল্প এবং ঐতিহাসিক স্থান হলো ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি বর্ণময় সেণ্ট ব্যাসিল্‌স ক্যাথিড্রাল। দেখলে মনে হয় রূপকথার মতো, বিভিন্ন রঙ ও আকৃতির। এর নয়টি সাধনকক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। মস্কোর আরেকটি দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা হলো 'ওস্টাকিনো টেলিভিশন টাওয়ার'; উচ্চতা ৫৩৩ মিটার। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি ইউরোপের সর্বোচ্চ অট্টালিকা।

আমি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছি এবং ভূগর্ভস্থ পথ দেখেছি। কিন্তু মস্কোর ভূগর্ভস্থ পথ দেখে

অভিভূত হলাম। মস্কোর রাস্তার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৪,৫৩৫ কিলোমিটার। ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন মস্কোয়। তার ওপর ১০ লক্ষ লোক প্রতিদিন মস্কোয় যাতায়াত করেন। এই এক কোটি লোক প্রত্যহ বিভিন্ন পরিবহন যান ব্যবহার করেন। কিন্তু 'মস্কো মেট্রো' অত্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ও সুলভ। মস্কো মেট্রো প্রত্যহ ৭০ লক্ষ যাত্রী বহন করে। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলে এই ট্রেন। ভিড়ের সময় ৫০ সেকেণ্ড অন্তর ট্রেন পাওয়া যায়। সেই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে পাতাল রেল তৈরির প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এর রূপরেখা তৈরির জন্য একটি বিশেষ দপ্তর গঠন করা হয়। সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম ট্রেনটি চলে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে। এখানে এখন ১১টি লাইন-সহ ১৫০টি স্টেশন আছে, মোট দৈর্ঘ্য ২৫৫ কিমি.। প্রতিটি স্টেশনের স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য বিদ্যমান। বেশির ভাগই বিশিষ্ট শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন।

এরপর আকর্ষণীয় স্থান সেন্ট পিটার্সবার্গ। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'পিটার দ্য গ্রেট' রুশি জার হন। মস্কো তাঁর পছন্দ ছিল না বলে 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' নামে তিনি নতুন রাজধানী তৈরি করেন, যার নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং এই শহর নিউ ইয়র্কের চেয়ে বয়সে ১০০ বছরের ছোট। সেন্ট পিটার্সবার্গ তৈরি হওয়ার পর মস্কো তার গুরুত্ব হারালো এবং ইউরোপীয়রা মস্কোকে উপেক্ষা করতে শুরু করল। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে রুশীরা সাড়ম্বরে এই শহর নির্মাণের ৩০০ বছর উদ্‌যাপন করেছে। যদিও বলশেভিক বিপ্লব সেন্ট পিটার্সবার্গে ঘটেছিল, তবুও সোভিয়েত শাসকরা পরবর্তী কালে রাজধানী মস্কোতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

১৯২৪ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবার্গ 'লেনিনগ্রাদ' নামে পরিচিত ছিল। আমি যখন পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি তখন বলেছিলেন: "গোকুলানন্দ, তুমি সেন্ট পিটার্সবার্গে যাচ্ছ, কারণ এখন এর নাম আর লেনিনগ্রাদ নেই।" শহরটি আলাস্কার মতো একই অক্ষাংশে অবস্থিত এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সূর্যরশ্মি থাকে। আক্ষরিক অর্থে একদিন রাত্রি ১টায় আমি উজ্জ্বল সূর্যোদয় দেখলাম। শীতকালে এর বিপরীতটাই ঘটে। বরফ ও অন্ধকার দূর করার জন্য রাস্তার আলো সারাদিন জ্বালানো থাকে। সেই আলোয় বরফ জ্বলজ্বল করে।

৫০ লক্ষ জনসংখ্যার সেন্ট পিটার্সবার্গ বেশ জাঁকজমকপূর্ণ প্রশস্ত শহর। এটি নদী নাভার কোলে সুন্দর প্রাসাদ ও মাঝের উন্মুক্ত উদ্যান দিয়ে পরিবেষ্টিত। এর প্রধান রাজপথ 'নেভস্কি প্রসপেক্ট' মস্কো রেলস্টেশনের কাছে নদী অতিক্রম করেছে। এই রাজপথটি ইউরোপের সুন্দর ও বিখ্যাত রাস্তাগুলির অন্যতম। মূলত এটি দুপাশের সারিবদ্ধ দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

এই শহর তার সৌন্দর্যের জন্য ইতালীয় বংশোদ্ভূত স্থপতি রাস্ট্রেলির নিকট ঋণী। নাভার তীরে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বিশাল শৈত্যপ্রাসাদ। একদিন এক ভক্ত এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "স্বামীজী, আপনি বিখ্যাত শৈত্যপ্রাসাদ দেখেছেন?" প্রাসাদটিতে ১,০৫৭টি ঘর এবং ১১৭টি সিঁড়ি আছে। এটি বিশ্ববিখ্যাত হেরিটেজ মিউজিয়ামের একটি অংশ, যা রাজপরিবারের ব্যক্তিগত শিল্পসংগ্রহের জন্য নির্মিত হয়েছিল।



ভক্তসঙ্গে রাশিয়ার একটি গ্রামে

সেন্ট পিটার্সবার্গ রুশ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সুপরিচিত। উনিশ শতকে এই সাহিত্য চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। উনিশ শতকে বিখ্যাত রুশ লেখকদের অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস সেন্ট পিটার্সবার্গেই রচিত হয়েছিল। ফিওদর দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট', লিও তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা', নিকোলয় গোগোল, তুর্গেনিভ, সালতিকভ স্কেড্রিন এবং অন্যান্যদের গল্পের কথাও উল্লেখ করা যায়।

রাশিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, রাশিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের থেকে একেবারে অন্যরকম। কমিউনিস্টরা মানুষের ধর্মচর্চা বা গির্জায় যাওয়া পছন্দ না করলেও পরস্পরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করত, তাদের আন্তরিক ধর্মসচেতনতা সুপ্ত ছিল এবং প্রকাশিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। গর্বাচভ

যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাঁর কাছে মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা দিলেন।

মহান ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহু রাশিয়ান ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেছে। আগেই বলেছি, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন তলস্তয়। নিকোলাস রোয়েরিখের মতো বিখ্যাত শিল্পী উত্তর ভারতের কুলুতে দেহত্যাগ করেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রথম আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মাধ্যমে। তিনি বেশ কয়েকবার রাশিয়ায় এসেছেন। ১৯৯০ সালে তাঁর লেনিনগ্রাদ ভ্রমণের সময় রামকৃষ্ণ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার স্মারকলিপি গৃহীত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০। তাৎপর্যপূর্ণভাবেই মস্কোর এই কেন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রথম স্বীকৃত সঙ্ঘ। এখন এর দেখভাল করেন বর্তমান মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী। এক অট্টালিকার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ পাওয়া গেছে। লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রের প্রধান স্বামী ভব্যানন্দজী অর্থসাহায্য করেছিলেন। সেন্ট পিটার্সবার্গের স্বয়ংসম্পূর্ণ গৃহটি কেনার সম্পূর্ণ টাকাও তিনি দিয়েছিলেন।



সেন্ট পিটার্সবার্গ কেন্দ্রের ঠাকুরঘর

মস্কোর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে সদর দপ্তরে বিবেকানন্দ সোসাইটির পক্ষে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল—সর্বজনীন ধর্মের যে-ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন, তার প্রচারের জন্য একজন সন্ন্যাসীকে পাঠানো হোক। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বেলুড় মঠ একজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত করেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বামীজীর বিখ্যাত 'শিকাগো ভাষণের শতবর্ষে' বেলুড় মঠ মস্কো কেন্দ্রকে তার শাখারূপে অন্তর্ভুক্ত করেন। কেন্দ্রটিকে বলা হয় 'রামকৃষ্ণ সোসাইটি বেদান্ত সেন্টার'। চারবছর পর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রটি মস্কোতে ধর্মীয় সংগঠনরূপে স্বীকৃতিলাভ করে। এই কেন্দ্রে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবন বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত আলোচনা করা হয়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ভক্তগণ প্রার্থনায় যোগ দিতে আসেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মঠাধ্যক্ষ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ করেন। তিনি ২-৩ পাতা পড়েন এবং তাঁর সহকারী ডঃ লিলিয়ানা অনুবাদ করেন। আমি যে-কদিন ওখানে ছিলাম, সেই কদিন লক্ষ্য করলাম, কিছু আগ্রহী ভক্তের জন্য তিনি সংস্কৃত পাঠও নেন। ছাত্রছাত্রীরা 'ভাগবত'-এর শ্লোক অবিকল প্রাচীন সুরে আবৃত্তি করছেন শুনে দারুণ অভিভূত হলাম।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় ধর্ম সংক্রান্ত নতুন আইন গৃহীত হয়েছে। আইনটি অন্যান্য বড় ধর্মের অনুকূল বলে মনে হয় না। এখানে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য খুব বেশি। তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনকে পছন্দ করেন না, কিন্তু আমাদের চেলিশেভের মতো ভাল রুশ বন্ধু আছেন। আরো অনেকে আছেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মের প্রশংসা করেন, কারণ এই সংগঠন অসাম্প্রদায়িক। আমি দেখেছি, অবিকল ভারতীয়দের মতো তাঁরা চরম নীরবতায় ধ্যান করছেন; কারণ তাঁরা ধ্যানাভ্যাস পছন্দ করেন। কিন্তু ক্যাথলিকরা এখনো এসব পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেনঃ "আমরাই সবচেয়ে শক্তিশালী।" ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মহান ঐতিহ্য উপলব্ধি করতে আরো সময় লাগবে এবং এজন্য প্রচুর ধৈর্য্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রয়োজন। সেন্ট পিটার্সবার্গে রামকৃষ্ণ সোসাইটি স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রের আবেদন স্বীকৃতি পেয়েছে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই। আসলে আমার কাছে আমন্ত্রণ মস্কো কেন্দ্র থেকে আসার আগে রামকৃষ্ণ সোসাইটি থেকেই এসেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গে 'ভারতীয় দিবস'-এর উৎসব একবার সংগঠিত হয়েছিল। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পের সমন্বয়ে এই উৎসব বিচিত্র ও বর্ণময় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেছিলেন। এই কেন্দ্রে এধরনের আরো উৎসব সংগঠিত করার পরিকল্পনা আছে। চিঠির শেষে সম্পাদক মাইকেল সংযোজন করেছেনঃ "এই সুযোগে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তকে আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" মনে হয়, পশ্চিমে বেদান্তের বীজ বপনের সময় হয়েছে এবং এই বীজ স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে উপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র রাশিয়ায়।❑

স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক ভারতের ক্রীড়াজগৎ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

না, ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার তলায় টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষা করছেন। ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করছেন ঃ "মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" ইনি সেই বিবেকানন্দও নন, যিনি শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা করতে উঠে বলেন ঃ "হে আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।" ইনি সেই বিবেকানন্দ—যিনি প্রথম জীবনে শক্তিমান ক্রীড়াবিদ্ তথা শরীরচর্চার মূর্ত প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিভাত করেছিলেন। এই বিবেকানন্দ আশৈশব ক্রীড়ানুরাগী এবং ক্রীড়ামনস্ক জীবনজয়ী পুরুষ। তিনি প্রথম জীবনে আখড়ায় গিয়ে কুস্তি লড়েছেন রীতিমতো গুরুর কাছে 'নাড়া' বেঁধে। কলকাতা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছেন, সাঁতার, জিমনাস্টিক্স, এমনকি বিদেশের মাটিতে শুটিং ও গলফেও অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনিই তো বলেছিলেন ঃ "আমাদের কী প্রয়োজন?... আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হোক, অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হোন, আমি

ক্রিকেটার

● জয়ন্ত দত্ত

তখনকার কলকাতা আজকের মতো কেতাদস্তুর ছিল না। উত্তরাঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠলেও দক্ষিণাঞ্চল বলতে বোঝাত চোর-ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েদের আস্তানা। সেই কলকাতায় তখন ছিল গোরাদের দারুণ দাপট, কলকাতাটা যেন তাদেরই। অগোছালো সেই পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল সাহেবদের অবসর বিনোদনের একেকটা আস্তানা। ক্রিকেট হলো ব্রিটিশের 'ন্যাশনাল পাসটাইম' অর্থাৎ 'জাতীয় বিনোদন' সেই অর্থে শীত এলে কলকাতায় মাঠ-ময়দানে বসত ক্রিকেট।

কলকাতার সেইদিনে বাঙালিরা কিন্তু ঘরে বসেছিল না। তারাও সাহেবদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্লা দিচ্ছিল পুরোদমে। ফলে সাহেবদের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল দু-চারটে কড়-গোনা বাঙালি ক্লাব, আর এই বাঙালি ক্লাবের একটা হলো তখনকার দিনে বিখ্যাত 'টাউন ক্লাব'।

হেমেন্দ্রনাথ বসু অর্থাৎ হেমবাবু ছিলেন এই টাউন ক্লাবের হোতা। মানুষটা কি ক্রিকেট কি ফুটবল—দুটোতেই ছিলেন সমান পটু আর তাঁর পটুতা দেখে গোরা সাহেবরাও বেশ সমীহ করত তাঁকে। এই হেমবাবুর তত্ত্বাবধানেই সেদিন কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছিল কিছু বাঙালি ক্রিকেটার।

সেদিন শীতের দুপুরে টাউন ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট অনুশীলন। সবাই খেলা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় হেমবাবু দেখলেন অদূরে একটি বলিষ্ঠ গড়নের যুবক দাঁড়িয়ে আছে। খেলা দেখছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র হেমবাবুর মন টানল। দারুণ স্বাস্থ্য তো ছেলেটির। উৎসাহিত হয়ে তিনি তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। যুবকটি কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল হেমবাবুর মুখোমুখি। আত্মপ্রত্যয় মাখানো দুচোখের দৃষ্টি। হেমবাবু তার দিকে এক ঝলক তাকালেন তারপর বললেন সহজ গলায় ঃ "তুমি কি ক্রিকেট খেলতে চাও?" যুবকটি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল ঃ "সুযোগ পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

হেমবাবু খুশি হলেন। তিনি এইরকম উত্তরই আশা করেছিলেন। তাই দ্রুত তার হাতে বল তুলে দিয়ে বললেন ঃ "তোমার যা শরীরের গড়ন তাতে তুমি অনুশীলন করলে একজন বড় বোলার হতে পারবে।"

হেমবাবু তাকে শেখাতে শুরু করলেন 'রাউণ্ড আর্ম' বোলিং পদ্ধতি। অনুশীলনের প্রথমেই তিনি তাকে বললেন ঃ "দেখ হে, মনকে ঠিক রাখবে। মনকে ঠিক রাখতে পারলেই তোমার চোখও আপনাআপনি শাসনে আসবে। তখন আর নিশানায় পৌঁছুতে ভুল হবে না। অনুশীলনের মধ্যেই আছে অভ্যাস-সাধনতত্ত্ব। অভ্যাস একবার রপ্ত হলে লক্ষ্য নির্ভুল হয়।"

হেমবাবুর দরদমাখা কথাগুলো যেন চমকে দিল যুবকটিকে। বাঃ চমৎকার কথা তো। এ তো দর্শনের কথা। যুবকটি দর্শনের ছাত্র, তাই কথাগুলো শোনামাত্র তার বুকময় বেজে উঠল দর্শনের সেই কথা। মনই আসলকে চেনায়, চোখ চিনে নেয় মাত্র।

শুরু হলো ক্রিকেট নিয়ে যুবকটির নতুন করে ভাবনাচিন্তা—মনঃসংযোগ। পরের ম্যাচে হেমবাবু জায়গা করে দিলেন যুবকটিকে। বিপক্ষে সেদিন বাঘা ইউরোপীয়ান দল।

তরুণ নবাগত বোলারটিকে দিয়েই হেমবাবু সেদিন শুরু করলেন দলের আক্রমণ। নতুন পরিকল্পনায় কাজও হলো। যুবকটি করলে অসাধারণ বোলিং। তার লাল বলের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেল খাশ ইউরোপীয়ান দলের সাত-আটজন ব্যাটসম্যান। মাত্র কুড়ি রানের বিনিময়ে যুবকটির দখলে এল সাতটা উইকেট। তরুণ বোলারের দুরন্ত দাপট দেখে তো সাহেবদের চোখ একেবারে ছানাবড়া। তারা গিয়ে হেমবাবুকে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, কে এই যুবক? একে পেলে কোথা থেকে?

উত্তরে আনন্দিত হেমবাবু খুশি ভরা গলায় বললেন ঃ "এই তরুণ স্ফুলিঙ্গ আমার নতুন আবিষ্কার। আমার বিশ্বাস একদিন এর হাতেই তোমাদের খাস বিলিতি ক্রিকেট বিধ্বস্ত হবে।" একটু থেমে উত্তেজিত হেমবাবু যুবকটির পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ "এর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সিমলার দত্ত বাড়ির ছেলে আমাদের প্রিয় বিলে।"

আজ ভাবতে অবাক লাগে ভারতের একজন সত্যিকার নিজস্ব ক্রিকেটার কেমন করে নিজেকে ভারতপথিক হিসাবে রূপান্তরিত করলেন। একদিন তো এই ভারতপথিককেই ক্রিকেটার হিসাবে বলতে শোনা গিয়েছিল ঃ "ভগবানকে পাওয়া পরম আনন্দ বলে জানতাম, কিন্তু খেলার মধ্যেও যে এত আনন্দ পাওয়া যায় এখন তা উপলব্ধি করছি।"* ❑

* রচনাটি প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' পত্রিকায়। তারিখটি অজ্ঞাত। তবে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় স্বামী সোমানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের 'আশ্রম' পত্রিকায় (১৬শ সংখ্যা, ১৫শ বর্ষ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৭)।—সম্পাদক

তোমাদের স্পষ্টভাষায় বলছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।... দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না, আমাদের সবলমস্তিষ্ক হতে হবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হতে হবে, ধর্ম পরে আসবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের প্রতি এটাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হবে।... আমি তোমাদের ভালবাসি। আমি জানি সমস্যা কী, কাঁটা বিঁধছে কোথায়।... তোমাদের বলি, শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝবে। তোমাদের রক্ত আর একটু তাজা হলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করে অনুধাবন করবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হবে, যখন নিজেদের মানুষ বলে অনুভব করবে—তখনি তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করে বুঝবে। এইভাবে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।" (মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' বিষয়ে ভাষণ) এ এক চিরন্তন সঞ্জীবনী মন্ত্র।

শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত বিবেকানন্দ—তখন নরেন্দ্রনাথ—একবার কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন লাল বল হাতে। তখন বাঙালিদের নিয়ে গড়া 'টাউন ক্লাব'-এর সঙ্গে ইংরেজ আভিজাত্যের প্রতীক 'ক্যালকাটা ক্লাব'-এর লড়াই রীতিমতো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। সেই টাউন ক্লাবের হয়ে একবার মাঠে নেমে তিনি ক্যালকাটা ক্লাবকে পর্যুদস্ত করেছিলেন সাত-সাতটি উইকেট নিয়ে। ইংরেজ ব্যাটসম্যানেরা তাঁর বলের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। শুধু ক্রিকেট নয়, যেকোন খেলাতেই তিনি তাঁর পুরুষকারের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে মন জয় করে নিতেন দর্শকদের। তাঁর এই অপূর্ব শারীরিক সক্ষমতার মূলে ছিল বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গুহের আখড়া ও হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রের ব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক্স আখড়ায় নিয়মিত শরীরচর্চা। আখড়ায় তিনি লাঠিখেলা, অসি চালানো, কুস্তি, বক্সিং ও ব্যায়ামের বিভিন্ন কসরত শিখেছিলেন।

আমেরিকা পরিভ্রমণকালে একবার গলফের স্টিক হাতে বিবেকানন্দ এমন কাণ্ড করেছিলেন যে, জনৈক আমেরিকান বলে উঠেছিলেন ঃ "এটা শুধু ক্রীড়াদক্ষতা নয়, এ হলো ভারতীয় যোগবিভূতির অপার মহিমা।" কথাটা শুনে স্বামীজী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "এসমস্ত সামান্য ব্যাপারে ভারতীয়রা যোগবিদ্যার প্রয়োগ ঘটায় না।" ভারতীয়দের যোগ অনেক উচ্চমার্গের ব্যাপার, যার সন্ধান কিংবা প্রয়োগ ইংরেজ, আমেরিকানদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থানকালে স্বামীজীর যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানভঙ্গি দেখে পাশ্চাত্যের মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় যোগের মহিমা। যোগের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বামীজী স্বয়ং।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পূর্ণপ্রভায় বিশ্বজগৎকে আলোকিত করে রেখেছেন, তখন ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে অলিম্পিক আন্দোলন। অলিম্পিকের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ ও মানবতার অগ্নিমন্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর জীবনদর্শনের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতীয় ক্রীড়াজগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাই প্রেরণার আলোকস্তম্ভস্বরূপ। তিনি যখন তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেছিলেন, তখন ভারত ছিল পরাধীন। তাঁর রচনা ও জীবনধারা উদ্দীপ্ত করেছিল পরাধীন ভারতের ক্রীড়াবিদ্দের। তার প্রমাণ ১৯১১-র আই. এফ. এ. শিল্ডে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক বিজয়কীর্তি, পরবর্তী কালে মহামেডান স্পোর্টিং-এর টানা পাঁচবার লিগ জয়—ব্রিটিশ সামরিক দলগুলির যাবতীয় অহঙ্কার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েই। ভারতের হকিদলের অলিম্পিক বিজয় অভিযানেও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান হিসাবে উঠে এসেছে। মোটের ওপর স্বাধীনতাপূর্ব কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে খেলা ও শরীরচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ খেলোয়াড়দের কাছে প্রেরণার আধারস্বরূপ হয়ে উঠেছেন। বেদান্তদর্শনের আলোতে প্রদীপ্ত মহাদার্শনিক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীকে বীরধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে দেহ-মন-আত্মার সমন্বয়ে এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ উঠে দাঁড়াবে এবং বিশ্বসমাজকে পথ দেখাবে। তার অনেকটাই প্রতিফলিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের গরিমামণ্ডিত উত্থানে। তাই কমনওয়েলথ, এশিয়াড, অ্যাফ্রো-এশিয়াডের পর এবার ভারতবাসীর লক্ষ্য এথেন্স অলিম্পিক। ❑

অভিনন্দন

যেসকল সুধী পাঠক-পাঠিকা শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিবিধ রচনাসম্ভারে সজ্জিত এই বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য ভক্তমণ্ডলীর কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিশেষ সংখ্যাটির ক্রমাগত চাহিদার কারণে পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১০% ছাড় দিয়ে মূল্য ৫০ টাকার পরিবর্তে ৪৫ টাকা ধার্য হয়েছে। সীমিত সংখ্যক পুনর্মুদ্রণের কারণে সংগ্রহকারীকে যথাশীঘ্র পত্রিকাটি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই।

'CAPTION CONTEST'-এর ফলাফল

যেসব আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা 'CAPTION CONTEST'-এ যোগদান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-২৬; দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী বিনীতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৮ এবং প্রথম স্থানাধিকারী অনুপম সরকার, কলকাতা-৩৬। বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁদের বাড়ির ঠিকানায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন'-এর পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাটি যথারীতি পাঠানো হয়েছে।

লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকার মতামত

শ্রদ্ধেয় মহারাজজী,

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন'-এর বিশেষ সংখ্যাটি পেলাম। প্রবন্ধগুলি অপূর্ব। মায়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিষয়-ভিত্তিকভাবে লিখে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন চিরদিন এমনি সুন্দর লেখা দিয়ে 'উদ্বোধন'কে সাজিয়ে তোলেন।

প্রতিভা চক্রবর্তী, কলকাতা-৭৫

শ্রদ্ধেয় মহারাজজী,

স্বামী ঋতানন্দ মহারাজের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এত সুন্দর রচনাটি আমাদের কাছে উপহার দেওয়ার জন্য। সমভাবে সম্পাদক মহারাজকে ধন্যবাদ এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্য।

সুকন্যা ভট্টাচার্য (দত্ত), মুম্বাই-৫

সম্পাদক সমীপেষু,

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি অসাধারণত্ব লাভ করেছে নানা কারণেই, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার মনে একটু দুঃখ রয়ে গেছে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীসারদা মঠের সৃষ্টি ও বিকাশে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর মেয়েরা' রচনাটিতে একটি অনুমাননির্ভর সংবাদ পরিবেশনের জন্য আমি অনুতপ্ত। ৭২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে— "১৯১৬ সালের ২৯ মার্চ বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে একটি সদ্য বিবাহিতা যুবতী উপস্থিত হয়। তার নাম সরলা।" কথাটি ঠিক নয়। কেননা 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ২১) এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ থাকলেও সেখানে ঐ যুবতীর নাম 'সরলা' বলে উল্লেখ নেই। এবং স্বভাবতই এই যুবতী শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজী নন। ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ যাতে না থাকে, তাই এই বিনীত নিবেদন।

বন্দিতা ভট্টাচার্য, কলকাতা-৮৯

পূজনীয় মহারাজ,

'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ২০০৪ খুব ভাল হয়েছে। প্রবন্ধগুলি খুবই আকর্ষণীয়। তবে একটি রচনায় তথ্যভ্রান্তি রয়ে গেছে। 'রত্ন ছেলেঃ মায়ের চোখে' সঙ্কলনে সঙ্কলক শ্রীরামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুরেন্দ্রনাথ মিত্র' (পৃঃ ২৪) শিরোনামে যাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠাকুরের 'রসদ্দার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নন। সঠিক নাম হবে 'সুরেশ্বর সেন'। ইনি বিষ্ণুপুরের অধিবাসী। আমরা তাঁর বাড়ি দেখে এসেছি। তাঁর ভাই স্বামীজীর প্রিয়পাত্র বশীশ্বর সেন, যিনি পরবর্তী কালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত হন। আলমোড়ায় তাঁর গবেষণাগার ছিল। বিভূতিভূষণ ঘোষকে লেখা তাঁর একটি পত্র এই বিশেষ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে রেলপথে যখন কোথাও যেতেন, তখন এই সুরেশ্বর (সংক্ষেপে মায়ের 'সুরেশ') সেনের বাড়িতে বিশ্রাম করে যেতেন।

ডঃ নারায়ণচন্দ্র রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৬

সঙ্কলকের বক্তব্য

আমারই অনবধানতাবশত এই ভ্রান্তি ঘটেছে। এই কারণে আমি দুঃখিত। ডঃ রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০৩৫

পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ,

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত 'অবুঝমাড়ের সবুজ অঙ্গনে মানবসেবায় রামকৃষ্ণ মিশন' শীর্ষক রচনাটি পাঠ করে অভিভূত হলাম। দীর্ঘকাল দেশ-বিদেশের নানা দুরধিগম্য অঞ্চলে মিশন প্রশংসনীয় সেবাকার্যের দ্বারা পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে এসেছে। মানবসেবায় তাঁদের যথার্থ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং ক্লান্তিহীন শ্রম দেখে মানুষ চমৎকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রতিবেদন-বিধৃত সেবার মহৎ রূপটি যেন সবকিছু 'অতিক্রম' করে গেছে। সবিস্ময়ে ভাবি, মানুষের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন করা বরং সহজ, কিন্তু যে-কাজ রামকৃষ্ণ মিশন অবুঝমাড়ের সবুজ প্রান্তরে মনপ্রাণ ঢেলে নিষ্পন্ন করছেন, তা সহজসাধ্য নয়। নির্দ্বিধায় বলা চলে—অতুলনীয়। 'উদ্বোধন'-এ এটি প্রকাশ না পেলে মিশনের এই দুঃসাধ্য ব্রতের সাফল্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞই থেকে যেতাম।

মানবদরদী মহান সন্ন্যাসী ও ত্যাগী সেবাব্রতীদের ভূলুণ্ঠিত প্রণাম।

সুধাংশুভূষণ নায়ক, বাঁকুড়া-৭২২১৩৩

পূজনীয় মহারাজ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' (বিশেষ সংখ্যা, ২০০৪) পত্রিকার 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মাতৃমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবী' শীর্ষক নিবন্ধে তথ্যগত একটি ত্রুটি থেকে গিয়েছে। পূজনীয় স্বামী তপানন্দ মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়'। অনবধানবশত তা 'বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়' হয়েছে। (পৃঃ ১৪৭) অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

স্বামী শিবপ্রদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

আবেগ কোন অজুহাত নয়

শ্রীশ্রীমাকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কোন্ চোখে দেখেন? শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন—'সন্তানের মতো'। একটু আবেগের বশেই 'কথাপ্রসঙ্গে' আমি লিখেছিলাম, যেন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে সরাসরি বলছেনঃ "আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায় দেখি।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে সরাসরি একথা শ্রীশ্রীমা বলেছেন বলে কোথাও উল্লেখ নেই। একারণে আমি দুঃখিত। এবং বলে রাখি, এটিকে উদ্ধৃতি হিসাবে কোথাও ব্যবহার করাও যাবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, যেসব ভ্রান্তির কথা পূর্ববর্তী পত্রগুলিতে উল্লিখিত হলো, পুনর্মুদ্রিত সংখ্যায় সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, সম্পাদক

বিশেষ সংখ্যার 'শব্দচেতনা' ও 'শব্দসন্ধান'-এর সমাধান

সমাধান ঃ শব্দচেতনা

পাশাপাশি ঃ (১) শ্যামপুকুর, (৩) আমোদর, (৫) বিজয়, (৬) তাজপুর, (৮) রসিকলাল, (১০) সজনীবাবু, (১৩) রামলাল, (১৪) শরৎ, (১৭) নীলাম্বর, (১৮) বিল্বমঙ্গল।

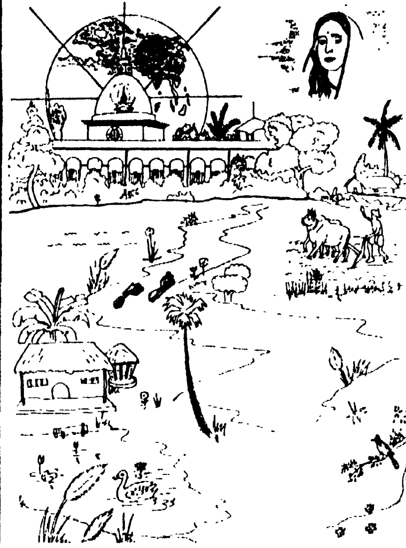
ওপর-নিচ ঃ (১) শ্যামবাজার, (২) পুরী, (৩) আট, (৪) রঘুবীর, (৫) বিমলা, (৭) জননী, (৯) কমলা, (১১) জগৎ, (১২) বুড়ো গোপাল, (১৩) রাধারানী, (১৫) সুর, (১৬) শ্রীম।

সমাধান ঃ শব্দসন্ধান

(১) **জ**য়াবিজয়া	(২) অভ**য়**
(৩) বা**রা**ণসী	(৪) আ**ম**জাদ
(৫) **বা**ঘা যতীন	(৬) পানিহা**টী**

উদ্দিষ্ট সমাধান ঃ **জয়রামবাটী**

যাঁরা সঠিক উত্তর-সহ চিঠি দিয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাই।—পত্রিকার কর্মিবৃন্দ



উত্তর : জয়রামবাটী

গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণধূলিতে*

ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় 'জয়রামবাটী'। শস্যশ্যামলা, শালুক-শাপলা কাশ-শিউলিতে ভরা ও কোকিলকূজনে মুখরিত জয়রামবাটী—বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামেই জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব লীলা এবং জাতিধর্মবর্ণ, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ, এমনকি জীবজন্তুকেও অকাতর কৃপাবিতরণের অন্যতম সাক্ষী জয়রামবাটী। আজও এখানে শ্রীশ্রীমায়ের করুণাধারার অনন্ত স্রোত বয়ে চলেছে। তাই বিশ্বের অগণিত মানুষের হৃদয়ে এই গ্রাম 'শিবপুরী'—

"জয়রামবাটীর মাটি চন্দন-সমান
মা সারদার জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান।

---

* শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দসন্ধান'-এর উত্তর এবং সেসম্পর্কে লেখা ও আঁকা পাঠিয়েছে অনুস্মিতা মণ্ডল, বাঁকুড়া।

ছন্দে ধৃত কথামৃত

ব্যাকুলতা

সে একজনের বাড়িতে অসুখ, অসুখটা খুবই ভারি,
রোগীর জীবন যায়-যায় প্রায়, ভয়ানক বাড়াবাড়ি।
কে যেন বলল, ওষুধ আছে গো, তবে চাই যোগাযোগ,
রোগী পুরোপুরি সুস্থ হবেই, কেটে যাবে সব রোগ।
স্বাতী নক্ষত্রটি ওঠার লগ্নে বৃষ্টি খানিক ঝরবে,
মড়ার মাথার খুলিতে সে-জল জমার মতন পড়বে,
তখন একটা ব্যাঙের পিছনে এক সাপ যাবে তেড়ে,
ছোবল মারার সময়ে ব্যাঙটা পালাবেই লাফ মেরে,
কিন্তু সাপের বিষটা পড়বে মড়ার খুলির মাঝে,
সেই বিষ থেকে তৈরি ওষুধ লাগবে রোগীর কাজে।
রোগী বেঁচে যাবে, তবে তিথিযোগে এই জোটপাট চাই,
একটা কিছুর অভাব ঘটলে সে-ওষুধে কাজ নাই।

এই কথা শুনে সেই লোক—অসুখ বাড়িতে যার,
নক্ষত্রের দিন-ক্ষণ দেখে হলো সে ঘরের বার।
ব্যাকুল হয়ে সে এখানে-ওখানে সেসব খুঁজতে থাকে,
মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানকে সে ডাকে।
বলে, ও ঠাকুর, সব জোটপাট যদি তুমি দাও করে,
তবেই রোগীর প্রাণ বাঁচে প্রভু তোমার কৃপার জোরে।

অবশেষে দেখে, মড়ার মাথার খুলিও রয়েছে পড়ে,
দেখতে দেখতে পশলাখানেক বৃষ্টিও গেল ঝরে।
লোকটা তখন বলে, কৃপাময়, খুলিতে জমল জল,
আর তা তো স্বাতী নক্ষত্রেই, তোমারই কৃপার ফল।
এবার ঠাকুর, বাকি যোগাযোগ তুমিই ঘটিয়ে দাও,
কী আশ্চর্য, একটু পরেই এসে গেল সাপটাও।
তা দেখে লোকটি খুব খুশি হলো, ব্যাকুলতা গেল বেড়ে,
এল এক ব্যাঙ, ছোবল মারতে সাপটাও গেল তেড়ে।
ব্যাঙটা পালায়, বিষও পড়ল খুলিতে জমা সে-জলে,
লোকটি তখন মহা আনন্দে হাততালি দিয়ে চলে।

ঠাকুর বলেন, ব্যাকুলতা যদি থাকে, তাঁর কৃপা মেলে,
সব যোগাযোগ তাঁর দয়াতেই ঘটে যায় হেসেখেলে।

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়



৩১ চিরন্তনী
শিশু ও কিশোর বিভাগ

বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আচার্য এলেন শৈবতীর্থ মধ্যার্জুনে। সেখানে তিনি অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। একদিন হঠাৎ—



হে আচার্য। আপনি অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যা বলছেন, তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু এই পীঠের প্রধান দেবতা মধ্যার্জুন শিব আপনার কথা যদি অনুমোদন করেন, তবেই বিশ্বাস করব।

ঐ পণ্ডিতের এধরনের সিদ্ধান্তে সকলে অবাক হয়ে গেল। আচার্য শঙ্কর সব শুনে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন, তারপর উপস্থিত হলেন মধ্যার্জুন শিবের মন্দিরে।

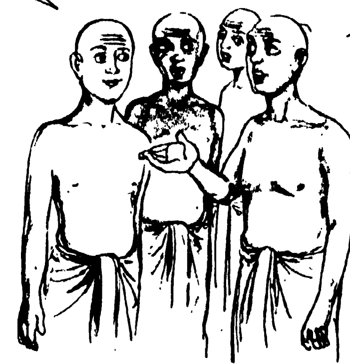


আচার্যের প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্র মন্দিরের অভ্যন্তর এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো। শোনা গেল এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।



সর্বত্র প্রচারিত হলো মধ্যার্জুন শিবের দিব্য মহিমা। প্রমাণিত হলো, আচার্য শঙ্করের বাক্য সম্পূর্ণ সত্য।

আচার্য আবার পথে নামলেন। গেলেন তান্ত্রিকদের আবাস তুলাভবানী, শৈবতীর্থ রামেশ্বর, বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙম এবং তন্ত্রপ্রধান স্থান কাঞ্চীপুরমে। তাঁর সঙ্গে চলেছে সহস্রাধিক ভক্তের এক উত্তাল জনস্রোত। তাদের মুখে মুখে আচার্যের মহান কীর্তিকথা।



কর্ণাট-উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বা সেই কেরল থেকে আচার্যের অনুগমন করে আসছিলেন। এবার তাঁর একান্ত অনুরোধে আচার্য তাঁর রাজ্যে এলেন ধর্মস্থাপনার জন্য। সেখানে তখন এক ভয়ঙ্কর কাপালিক ক্রকচের বাস। সে একাধারে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এরাজ্যে সে গড়ে তুলেছে সারা ভারতের কাপালিকদের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু ধর্মের নামে সে নানা অন্যায় কর্ম করে। আচার্য শঙ্কর সেখানে এসেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হলো ক্রকচ।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

পরদিন ক্রকচ আচার্য শঙ্করের কাছে এসে তাঁকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। ক্রুদ্ধ রাজা সুধন্বা তাঁর অনুচরদের ডাকলেন।



ক্রকচ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তার সৈন্যদের যুদ্ধের আদেশ দিল। বেজে উঠল রণভেরি।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।

ভাবপ্রচার ও সংগঠন ঃ সমস্যা ও প্রস্তাব

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৯ থেকে ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যার **'কথাপ্রসঙ্গে'** বিভাগে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন' আলোচনাটি অত্যন্ত বিশ্লেষণী ও প্রাসঙ্গিক। আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আজ গভীরভাবে ভাবনার বিষয়। ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি আমার দৃষ্টিতে ভাবান্দোলনের কতকগুলি **নেতিবাচক** দিক চোখে পড়েছে। এই পর্যবেক্ষণ ও মতামত সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত। সমস্যাগুলি সকলের জানা দরকার বলে মনে করি।

(১) **সুদক্ষ সক্রিয় কর্মীর অভাব ঃ** রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি ছাড়া যে অসংখ্য প্রাইভেট সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সুদক্ষ, পর্যাপ্ত ও সক্রিয় কর্মীর অভাব আছে। দক্ষতা অর্থে—(ক) ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার মনোভাব; (২) প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনার অর্থাৎ সম্পাদক ও সভাপতির পদের প্রতি লোভ না থাকা; (গ) বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা; (ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ভালবেসে কাছে টানার ক্ষমতা এবং (ঙ) দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা।

(২) **সংগঠিত যুবকেন্দ্রের অভাব ঃ** রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংস্পর্শে আসা যুবকদের বাদ দিলে দেশের বৃহত্তর যুবগোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কোন যোগাযোগ নেই। এর কারণ হলো—(ক) প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যুবকদের সংগঠিত করার মতো দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক কর্মসূচীর অভাব; (খ) স্বামীজীর বাণীকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টার অভাব; (গ) সংগঠিত যুবকেন্দ্রের অভাব; (ঘ) বছরে দু-একবার সকলকে নিয়ে উৎসবের মেজাজে, আনুষ্ঠানিকতা ও কৃত্রিমতার মোড়কে সম্মেলন বা অনুষ্ঠান করার প্রবণতা এবং (ঙ) যুবকদের ওপর ভরসা করতে এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসতে না পারা।

(৩) **সংগঠিত অপপ্রচার ও অসংগঠিত প্রতিবাদ ঃ** রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর একদল মানুষ সংগঠিতভাবে ক্রমাগত আক্রমণ, অপপ্রচার ও কুৎসা চালাচ্ছে। এদের শ্রেণিবিভাগ এইভাবে করা যেতে পারে—(ক) সাম্যবাদী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী, মানবতাবাদী, বাস্তববাদী ইত্যাদি বেশ কিছু আত্মপরিচয়প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (খ) কোন কোন রাজনৈতিক সংগঠন; (গ) মিশনের স্কুল থেকে পাশ করা এবং পাশ করতে না পারা ছাত্রদের একাংশ ও তাদের অভিভাবকগণ; (ঘ) মিশন থেকে কোন সুবিধা নিতে ব্যর্থ (ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করানো বা অন্যান্য) হওয়া মানুষজনের একাংশ। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নাম ব্যবহার করছে এমন কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন—যারা ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয়—তারাও সুকৌশলে মানুষজনের কাছে ভাবপ্রচার পরিষদের নিন্দা করছে। এর পিছনে যে-দুটি কারণ আছে তা হলো—(১) নিজেদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বা সংগঠন-প্রধানকে তুলে ধরার প্রয়াস অর্থাৎ ব্যক্তিপূজার অভীপ্সা এবং (২) এদের নেতিবাচক কাজকর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্তই অনুমোদন করেন না। এর ফলে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা এই কাজ করে। (ঙ) কিছু পত্র-পত্রিকা ও কয়েকটি টিভি চ্যানেল এবং (চ) অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত সাংসারিক মানুষজনের একাংশ।

এই সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্য আমাদের দরকার, তা নেই। বরং বিচ্ছিন্নভাবে বা এককভাবে এসমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার প্রয়াস ভাবান্দোলনের একটি দুর্বলতম দিক।

(৪) **নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা ঃ** বহু স্থানে বিভিন্ন প্রাইভেট সংগঠনের সঙ্গে স্থানীয় দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের যোগাযোগ খুবই কম। সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণে ও পরিচালনায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য দেখা যায়। কোথাও কোথাও উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

(৫) **সমন্বয়ের অভাব ঃ** বহু স্থানে ভক্তদের মধ্যে সমন্বয়, সদ্ভাব ও সহযোগিতার অভাব দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পারস্পরিক বিদ্বেষ এমন স্তরে পৌঁছাচ্ছে যে, তার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে! কোথাও আবার এমন মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন প্রাইভেট কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ। এইসব সুযোগ বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষ গ্রহণ করছে।

(৬) **আনুষ্ঠানিকতার প্রতি গুরুত্বদান ঃ** কোন কোন স্থানে প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির মূল লক্ষ্যই একটি মন্দির তৈরি অথবা উৎসব আয়োজনের প্রতি গুরুত্বদান। এতে সঙ্ঘের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে।" (পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পত্রসংখ্যা ১২৮) অন্যত্র বলেছেন ঃ "সাণ্ডেল [বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল] লিখছেন যে, হাজার হাজার লোক খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে। যদি একথা সত্য হয় তো ওপ্রকার লোক না আসাই ভাল। ওরা মেঠাই খেতে আসে; এদিকে মঠের লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়, তখন হাজার হাজার লোক কোথায়? আর আমরা কি সর্বত্যাগ করে স্যাণ্ডেলের জন্য ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? স্যাণ্ডেল কাঁসারিপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে।" (ঐ, পত্রসংখ্যা ২৫৫)

(৭) **সঙ্ঘজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণার অভাব ঃ** অনেক উৎসাহী ও সক্রিয় কর্মী সঙ্ঘজীবন কিংবা সন্ন্যাসীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসায় তাঁদের মধ্যে ত্যাগ, তপস্যা ও ভালবাসাময় জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে ওঠে না। ফলে এদের বাস্তব কর্ম ও সাধন-জীবনের গুণগতমান দুর্বল হয়ে পড়ে।

এসমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উল্লেখ করছি—

(১) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির সক্রিয় ও উৎসাহী কর্মীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। (২) প্রত্যেক প্রাইভেট কেন্দ্রের অধীনে একটি করে যুবকেন্দ্র স্থাপন করা এবং

কেন্দ্রীয়ভাবে সেই যুবকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুবকদের ব্যাপকভাবে যুক্ত করানো সম্ভব হবে। (৩) প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির ওপর মঠ ও মিশনের নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা। (৪) যেকোন রকমের আক্রমণ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার কর্মসূচী নেওয়া। (৫) দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষকে আরো বেশি করে সংগঠনে যুক্ত করার কর্মসূচী নেওয়া। (৬) যারা পদের জন্য বা অন্য কোন কারণে প্রাইভেট কেন্দ্রগুলিতে ঝগড়া-বিবাদ বা রাজনীতি করে, তাদের সরিয়ে দেওয়া। (৭) মাঝেমধ্যে মঠ ও মিশনের পরিচালনায় আধ্যাত্মিক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা। (৮) দীক্ষাদানের ব্যাপারে একটু সতর্ক নজর দেওয়া। (৯) ব্যক্তিগত জীবনগঠন ও ভাবান্দোলন সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা তৈরির অভ্যাসের ওপর গুরুত্বদান করা। (১০) ভাবান্দোলনের যেকোনরকম সংস্কার, পুনর্গঠন বা পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের হস্তক্ষেপ ও উদ্যোগ আরো দৃঢ় ও কঠোর করা। (১১) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৈরি একটি ব্যবহার-নীতি ও গঠনপদ্ধতি চালু করা।

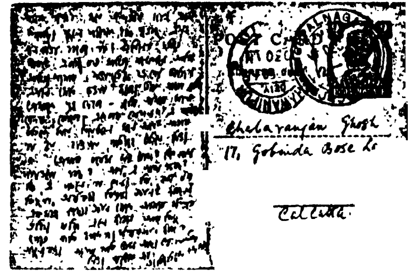
এইভাবে হয়তো বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে তা-ও অসম্পূর্ণ বা আংশিক হবে বলেই মনে হয়। সম্পূর্ণতা আনতে গেলে স্বামীজীর শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের বাণীটি স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে—"কাঁচা মন নিয়ে যাঁরা দেশের বা জগতের হিত করার জন্যে নিজেকে নিয়োগ করেন বা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁদের দ্বারা জগতের হিতের চেয়ে বরং অহিতই বেশি হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁরা আদর্শে দীর্ঘকাল অটুট থাকতে পারেন না। নামযশের ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রভুত্ব করবার স্পৃহা তাঁদের বলবতী হয়। দ্বেষ, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা তাঁদের এমনি পেয়ে বসে যে, সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেদের অন্তরের বিষ জনসমাজে ছড়িয়ে বহু সদিচ্ছাপরায়ণ লোককেও কলুষিত করেন এবং সৎকর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি, এমনকি ধর্মের ওপর সাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব উৎপাদন করেন।" (পরমার্থ-প্রসঙ্গ, ২৫তম পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৫০)

এই প্রসঙ্গে স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজের কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে ঃ "ত্যাগ-তপস্যা, সংযম, বিবেক-বৈরাগ্য এবং সচ্চরিত্র মানুষের প্রকৃত সম্পদ। এই সম্পদ না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। উন্নতি তো পরের কথা, এগুলি ভিন্ন আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করাই সম্ভব নয়। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা-দ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল অন্তরায়।" "ঠাকুরের ছেলেরা বলতেন, 'গুরুস্থান, ইষ্টস্থান, তীর্থস্থানে কখনো কোন বিশেষ সুবিধা নিতে নেই। বিশেষ সুবিধা নিয়ে গুরুর কাছে গেলে, বিগ্রহের কাছে গেলে, কিন্তু গুরুরূপী ইষ্টের, বিগ্রহের মধ্যে অন্তর্যামী ভগবানের থেকে দূরে রয়ে গেলে।' এসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়, নইলে ধর্মজীবন বিলাসিতা ও প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।" (দেবলোকের কথা, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১৩৬, ১৪০)

রাজু গোস্বামী
কল্যাণী

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বিভূতিভূষণ'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ও মাঘ ১৪১০ সংখ্যায় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে শ্রীঅজিতেন্দ্র সিংহের আলোচনা এবং এপ্রসঙ্গে গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত চিঠিগুলি পড়ে আমার এতদিনের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পেলাম। এইসূত্রে আমাকে লেখা বিভূতিদার ৫-১২-৪৫ তারিখের চিঠির একাংশ 'উদ্বোধন'-পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করছি ঃ "আই. এ. পাশ করেছ, বি. এ. পড়লে না কেন? বি. কম-টম কিছু না। অর্থকরী বিদ্যা। জ্ঞানই জীবনের একমাত্র কাম্য। জ্ঞান থেকে আসবে ঈশ্বরে ভক্তি। ভক্তি এলে জীবনে আর কিছু পেতে বাকি থাকে না। ঈশ্বরজ্ঞান জীবনের অমূল্য বস্তু।"



বিভূতিদার দিনলিপি পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি চিঠিপত্রের মাধ্যমে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের প্রথমদিক এবং ১৯৪৫ সালের শেষদিক থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। এর পরে ছন্দোভঙ্গ—'অর্থকরী বিদ্যার' কঠোর প্রবাহে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে (৭৬ বছর) পৌঁছে এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি—সঠিক পথের নির্দেশ অবহেলা করেছি।

আমার বিদীর্যমান ডায়েরিতে এবং স্মৃতির আলোয় যা এখনো দীপ্ত হয়ে আছে, তা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি। বিভূতিদার সান্নিধ্যে থেকে উপলব্ধি করেছি—তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে যতটা শ্রদ্ধা করতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসতেন।

একদিন তাঁকে জানালাম, রামকৃষ্ণ মিশন দেওঘর বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়েছি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ "খু-উ-ব ভাল—এই অল্প বয়সে চারপাশে বেড়া দেওয়ার সুযোগ পেলে। এগিয়ে যাও—চন্দনকাঠের সন্ধান মিলবে। মনে রাখবে, ঠাকুর-স্বামীজীই জীবনের ধ্রুবতারা।" লক্ষ্য করলাম প্রতীতি প্রকাশে তাঁর তৃপ্তিভরা চোখ-মুখ।

ঐ উক্তির মর্ম তখন বুঝতে পারিনি। পরে বিদ্যাপীঠের তৎকালীন সম্পাদক পূজনীয় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীকে বলায় তিনি ঠাকুরের উপদেশাবলী অবলম্বনে বুঝিয়ে দিলেন। বিদ্যাপীঠে থাকার সময় বিভূতিবাবুর যত চিঠি পেয়েছি, সবেতেই ঠাকুর ও স্বামীজীকে ঘিরে কিছু-না-কিছু ভক্তি ও বিশ্বাসে আপ্লুত বক্তব্য থাকত। পূজনীয় স্বামী নিরাময়ানন্দজী খুব আগ্রহ সহকারে চিঠিগুলি পড়তেন এবং আধ্যাত্মিক সাহিত্যের আসর জমাতেন।

এরই রেশ বিস্তৃত হয়েছিল পরবর্তী কালে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে থাকাকালীন স্বামী আদিনাথানন্দজী ও স্বামী বিতশোকানন্দজীর প্রণোদনে, আর অন্তরালে মহাপীঠস্থানের ভাবস্পর্শে।

কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য আমার, দেওঘর বিদ্যাপীঠ ও বেলুড় বিদ্যামন্দিরে পাওয়া চিঠিগুলি পরবর্তী কালে আমার চলমান চাকুরির অস্থির গতিতে পথহারা হয়ে যায়—পরে হদিশ করতে পারিনি। এখন জ্বলে-পুড়ে মরছি ক্ষমাহীন আপশোসে।

প্রায়ই লক্ষ্য করতাম পথে-ট্রেনে চলতে চলতে বিভূতিবাবুর উদ্দীপ্ত দৃষ্টি, কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন! রবীন্দ্রনাথের কাব্যের "আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় সনে আমার মনে"—যেন তাই। একদিন সাহস করে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম, থেমে থেমে বললেনঃ "খুঁজে বেড়াই অকৃপণ প্রকৃতির অজান্তে ছড়ানো অপরূপ সৌন্দর্য। প্রকৃতি যে ঈশ্বরের ভাষা। ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব রূপ, জলে-স্থলে ফুলে-ফলে অভিনবত্ব... রোদপড়া মাটির তাজা সোঁদা সোঁদা গন্ধ... হলুদ রঙের বিস্তৃত ছেদহীন গালিচায় ঢাকা হলুদ সরষেফুলের খেত, ওপরে ইন্দ্রনীল মণির মতো নীল আকাশ—কী অতুলনীয় combination—বিন্যাস আর সংযোজনের পরাকাষ্ঠা। এসব তো অমৃতস্বরূপ পুরুষের এককণা মাত্র। তিনি অফুরন্ত, অন্তহীন। তাই প্রকৃতি ছেড়ে জীবনের কোন কল্পনা হয় না।"

শুনে বলেছিলামঃ "আপনি আমাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থ।" তিনি চুপ করে রইলেন।

কলকাতায় এলে বিভূতিবাবু ১৪নং মির্জাপুর স্ট্রিটের (অধুনা সূর্য সেন স্ট্রিট) মেসে থাকতেন। একদিন দুপুরে দেখা করতে গিয়ে দেখি, চৌকির ওপর বসে অন্যমনস্ক হয়ে ধূমপান করছেন। আমাকে দেখেই বললেনঃ "ওরে আজ Calcutta University জানাল, 'পথের পাঁচালী' Matriculation Selection-এ নেবে। আমাকে সম্পাদনা করে দিতে বলেছে।" শুনে তো আমি আনন্দে আত্মহারা! কিন্তু আমার আনন্দোচ্ছ্বাসে বিভূতিদার কোন প্রতিধ্বনি নেই। বিলাসহীন, উদাসীন, সমাহিত মন কোথায় যেন তা দিচ্ছে, যেমন পাখি ডিমে দেয়। কিছুক্ষণ পরে টেনে টেনে বললেনঃ "তুই-আমি, দেশ-কাল, স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য... সবই তাঁর স্বপ্ন। লাঠি দিয়ে জলকে যেমন ভাগ করা। মোটকথা, সবই তিনি—অখণ্ডানন্দ।"

তাই বারবার মনে হয়, আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বা বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না। সসীমকে কাছে না টেনে অসীমকে বোঝা যায় না।

বিভূতিদার কথা মনে পড়লে আজও নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

ভবরঞ্জন ঘোষ

সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

১৪০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে পৌষ এবং ১৪১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতাঃ রাগে অনুরাগে' লেখাটি সম্পর্কে কিছু জানাতে চাই। শ্রীদেবাঞ্জন সেনগুপ্ত অনেক পরিশ্রম করে এই লেখাটি লিখেছেন যদিও এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে, তথাপি লেখাটির বক্তব্য বিষয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার যোগ্য বলে আমার মনে হয়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীতপোব্রত ভাদুড়ী গত ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যায় যে-চিঠিখানি লিখেছেন, সেখানে তিনি দেবাঞ্জনবাবুর প্রয়াসকে যথেষ্ট মর্যাদা দিলেও তাঁর নিজস্ব বক্তব্য আরো বেশি আপত্তিজনক। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নিবেদিতার চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে দেবাঞ্জনবাবু সরাসরি কিছু না লিখলেও কিছু কিছু ইঙ্গিত সেখানে অবশ্যই দিয়েছেন। বিবেকানন্দ-ভক্ত এবং সেইসূত্রে নিবেদিতা-ভক্ত সকলেই যেমন এই লেখাটি পড়ে আহত হয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীরাও যথেষ্ট আহত হয়েছেন বলে আমি মনে করি। জগদীশ ভট্টাচার্যের গবেষণার পশ্চাতে কী মানসিকতা কাজ করেছিল তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'উদ্বোধন' পত্রিকার পাতায় দেবাঞ্জনবাবুর এই ধরনের লেখা এবং তার রেশ টেনে তপোব্রত ভাদুড়ীর বক্তব্য কী করে স্থান পেল তা আমাদের জানা নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়ে আগে যাঁরা কটাক্ষ করেছেন এবং বর্তমানেও যাঁরা করেন—প্রত্যেকের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের নেওয়া উচিত এবং সেটাই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা নয় কি? শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজকে এব্যাপারে আলোকপাত করতে অনুরোধ জানাই।

জয়দীপ ঘোষ

সম্পাদকের বক্তব্য

পত্রলেখককে ধন্যবাদ। শ্রীদেবাঞ্জন সেনগুপ্তের গবেষণাধর্মী লেখা পড়ে অনেকেই ঋদ্ধ হয়েছেন বলে পত্র দিয়েছেন। তথাপি এই লেখা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে দেখে কোন কোন পাঠক-পাঠিকা আহত হয়েছেন বলে আমি দুঃখিত। বস্তুত, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার গুরু-শিষ্যা কিংবা পিতা-মানসকন্যা ইত্যাদি সম্পর্ককে খারিজ করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব মন্তব্য করেছিলেন, সেসব আলোচনা ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব আলোচনাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার মানসে শ্রীতপোব্রত ভাদুড়ী বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে তুলে এনে যেসব মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে গুরুতর অসাধু ইঙ্গিত আছে বলে আমি মনে করি। যদিও 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখকের, তবু বৃহত্তর পাঠকসমাজের কথা মনে রেখে এমন চিঠি প্রকাশ না করাই সমীচীন ছিল। এখানে স্পষ্টভাবেই বলে রাখি, জগদীশবাবুর মতামত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শবিরোধী। এবং একালেও এধরনের সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও যুক্তিহীন কথা প্রচার করে কেউ কেউ আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। তাঁদের চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা আনয়ন করার দায়িত্ব কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরেই বর্তায় না, গোটা ভক্তকুলের ওপরেও বর্তায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরো যেসব নিন্দাসূচক গ্রন্থ বাজারে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেব্যাপারে ভক্তগণের নীরবতা আমাদের বিস্ময় জাগায়। আমাদের অনবধানতাবশত এই লেখা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ পেয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকল না।

প্রত্নতত্ত্ব

বুদ্ধের নির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে

তুষারকান্তি ঘোষ



উনিশ শতকের কথা। দেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব চলছে। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এলেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি কিন্তু দেশে ফিরে গেলেন না, ভারতের লুপ্ত শহর ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এই কাজ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। তিনি ভ্রমণ করলেন পাঞ্জাবের মানিকিলায়, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের সারনাথে এবং মধ্যভারতের ভিলসা অঞ্চলে। অনুসন্ধান করে রচনা করলেন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ।

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের ভাইসরয়। সিপাহী বিদ্রোহের রেশ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্যানিং 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এই সংস্থার সার্ভেয়ার হিসাবে নিযুক্ত করলেন কানিংহামকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সংস্থার কাজ আপাতত একরকম বন্ধ রইল। কানিংহাম বসে না থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঐতিহাসিক নগরগুলির ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। তিনি এইসঙ্গে লুপ্ত নগরগুলি পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেসব নগরের নাম তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, তার মধ্যে কুশীনগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুশীনগরেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন এবং এইখানেই নির্মিত হয়েছিল তাঁর নির্বাণপ্রতিমা।

প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে কানিংহাম কুশীনগর নামে কোন স্থানের সন্ধান পেলেন না। কয়েকশো বছরের ব্যবধানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু স্থানের নাম সম্পূর্ণ পালটে গেছে, তাই কুশীনগরকে পাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কানিংহাম কার্লাইলকে বিশেষ সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করে কুশীনগরের অবস্থান অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে কুশীনগরের উল্লেখ আছে, কিন্তু অবস্থানের কোন উল্লেখ নেই। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যেও বিভিন্ন স্থানে কুশীনগরের নাম আছে, কিন্তু তার ঠিকানা পাওয়া মুশকিল। এমনকি সিংহল, পূর্ব উপদ্বীপ এবং তিব্বতের পালিগ্রন্থেও সন্ধান পাওয়া গেল না। নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা নেই। কানিংহাম সূত্র পেলেন—চিনদেশীয় পর্যটক হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের যুগে। তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। এমনকি কপিলাবস্তু, কুশীনগরও গিয়েছিলেন। বিক্ষিপ্ত বিবরণে এই কাহিনীর উল্লেখ থাকলেও হিউয়েন সাঙের ভারত-বিবরণের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। এই বিবরণী ছিল চিনাভাষায় লেখা এবং লেখাটি চিনের কোন্ মিউজিয়ামে রাখা আছে তারও সন্ধান কানিংহামের কাছে ছিল না।

কানিংহাম তখন ভারতে পাওয়া যায়—বুদ্ধদেবের এমন জীবনীমূলক গ্রন্থের অধ্যয়ন শুরু করলেন। বিশেষ করে প্রয়োজন হলো বুদ্ধদেবের শেষজীবনের ঘটনা ও স্থানিক বিবরণের। জীবনীগুলি পাঠ করে তিনি বুদ্ধদেবের শেষদিন-গুলির সঙ্গে যেন একাত্ম হতে চাইলেন। যদিও এই ঘটনাগুলি স্থাননির্দেশে কতখানি সাহায্য করবে সে-সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, তবুও তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বুদ্ধদেবের শেষজীবন।

বুদ্ধদেব তাঁর শেষজীবনে বর্ষাকালে বৈশালীতে বাস করতেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দ ছিল তাঁর সবসময়ের সঙ্গী। একবার বৈশালীর কাছে বেলুর গ্রামে বুদ্ধদেব মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হন। সর্বাঙ্গে তাঁর তীব্র যন্ত্রণা। কিন্তু অদ্ভুত শক্তিতে তিনি সেই যন্ত্রণা সহ্য করলেন। দু-একদিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বললেন ঃ "আনন্দ, আমি অনুভব করছি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। তুমি মহাবনের কুটাগার বিহারে সমস্ত ভিক্ষুমণ্ডলীকে একবার সমবেত কর। আমি তাদের কাছে আমার জীবনের শেষ উপদেশ দেব।" আনন্দ বিস্মিত হলেন। সকল ভিক্ষু সমবেত হলেন। তাঁদের দেখে বুদ্ধদেব বললেন ঃ "আমি যে-ধর্ম প্রকাশ করেছি, তা তোমরা

সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কর, সাধন কর ও নির্বাণলাভ কর।" এই উপদেশ দিয়ে বুদ্ধ বৈশালী থেকে কুশীনগরের দিকে রওনা হলেন। তাঁর চলার পথে বিভিন্ন গ্রাম পড়ল। 'পাওয়া' গ্রামে এলে এক চণ্ড তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে শূকরের মাংসমিশ্রিত অন্ন খেতে দিলেন। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আহারের জন্য কেউ কখনো মাংস দিত না। আহার প্রত্যাখ্যান করলে চণ্ড মনে কষ্ট পাবে—এই কথা ভেবে তিনি সেই আহার গ্রহণ করলেন। খাওয়ামাত্রই তাঁর তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। অসুস্থ ও দুর্বল দেহেই তিনি কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে পড়ল কুকুষ্ঠা নদী। এই নদীতে স্নান করে কিছুটা যন্ত্রণার উপশম হলো। এরপর কুশীনগরে তিনি মল্লরাজদের শালবনে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর শেষসময় উপস্থিত। তখন আনন্দকে ডেকে বললেন: "আনন্দ, অনেকে হয়তো বলবে চণ্ডের দেওয়া খাবার খেয়েই আমার মৃত্যু ঘটল। তুমি চণ্ডকে বলবে, সুজাতার অন্ন খেয়ে আমি বোধিলাভ করেছি আর চণ্ডের আহার খেয়ে এই সংসার থেকে পরিত্রাণলাভ করেছি। দুজনেই আমার হিতকারী বন্ধু।" এরপর উপদেশ দিতে দিতে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করলেন। বেদনাদায়ক সংবাদ শুনে ভিক্ষুরা সকলে সমবেত হলো চিতার পাশে। বুদ্ধদেবের দেহ চিতার ওপর স্থাপন করা হলো। চিতায় অগ্নিসংযোগ-মাত্রই তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল। পরে এই স্থানে নির্মিত হয়েছিল বুদ্ধদেবের শায়িত নির্বাণপ্রতিমা এবং মন্দির।

বুদ্ধদেবের জীবনীগ্রন্থে এই কুশীনগরের অবস্থান সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া গেল না। এইসময় এক ঘটনা ঘটল। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত স্ট্যানিস্লাস জুলিয়েন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ওপর গবেষণা করছিলেন। গবেষণাকালে তিনি জানলেন, হিউয়েন সাং নামে এক চিনদেশীয় পরিব্রাজক ভারত-ভ্রমণ করেছিলেন এবং পরিদর্শনের পর তিনি এক বিশাল অমূল্য গ্রন্থ চিনাভাষায় রচনা করেছিলেন, অথচ এই গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রাচীন ভারতের ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য এই গ্রন্থে জানা যাবে—এই আশায় তিনি এই গ্রন্থকে অনুবাদ করতে চারশো অক্ষরযুক্ত দুর্বোধ্য চিনাভাষা অধ্যয়ন করতে প্রয়াসী হলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে চিনাভাষা রপ্ত করে জুলিয়েন হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ ফরাসিভাষায় অনুবাদ করলেন। এই গ্রন্থ ইংরেজিতেও অনূদিত হলো অল্পসময়ের মধ্যে। ইতিহাসপ্রেমীদের হাতে হিউয়েন সাঙের বিবরণী এসে পৌঁছাল। কানিংহাম যেন আবিষ্কারের এক উজ্জ্বল আলোকের সন্ধানলাভ করলেন। হিউয়েন সাঙের ভারত-বিবরণী তাঁর অনুসন্ধানের কাজে বিশালভাবে সাহায্য করল। ভারত বিষয়ক পণ্ডিতেরা হিউয়েন সাঙের বিপদসঙ্কুল ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষকের দল শুরু করলেন বিভিন্ন স্থানের সন্ধান। কানিংহামের সর্বক্ষণের সঙ্গী হলেন কার্লাইল।

হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিন থেকে ভারতে এসেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে তিনি আসেন অহিচ্ছত্র। এরপর যেসব স্থানে তিনি ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, তাদের নাম হলো—বীরাসন, কপিত্থ, কনৌজ, অযোধ্যা, হয়মুখ, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, বিশাখা (বিশোধ), শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, কুশীনগর, বারাণসী, গর্জপুর, বৈশালী ইত্যাদি। হিউয়েন সাঙের পথ ধরেই কানিংহাম ও কার্লাইল চললেন কুশীনগরের সন্ধানে। সে এক অদ্ভুত তপস্যা আর অধ্যবসায়ের কাহিনী।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী বিখ্যাত শহর বা জনপদ বারাণসী, গয়া বা মথুরা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। কিন্তু বাকি স্থানগুলি, যেখানে হিউয়েন সাং ভ্রমণ করেছিলেন সেইসব স্থান সহজে উদ্ধার করা গেল না। হিউয়েন সাং ভারতের ভূমিমাপ ক্রোশ বা মাইল ব্যবহার না করে চিনদেশীয় মাপ 'লি'র উল্লেখ করেছিলেন। এখানেই অসুবিধা দেখা দিল। শেষে পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক করলেন ৬ লি = ১ মাইল।

কিন্তু এই মাপেও ছিল অসুবিধা। স্থানের সঙ্গে মানচিত্রের দূরত্বের মিল হয় না। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী তিনি গয়া থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে যে-স্থানের কথা লিখেছেন এবং যেখানে তিনি বিশাল এক নগরী দেখেছিলেন—সেখানে পৌঁছে দেখা গেল সেটা একটা জলাভূমি! অনুসন্ধানকারী গবেষকদল তখন অনুভব করলেন মানচিত্রের মাপ হয় সরলরেখায়, কিন্তু ভ্রমণ তো হয় পথ ধরে। সে-পথ আঁকাবাঁকা হতে পারে। তাছাড়া শত শত বছর আগে হিউয়েন সাং যে-পথে ভ্রমণ করেছিলেন, সে-পথের তো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবার শুরু হলো গবেষণা ও পায়ে হেঁটে পথে পথে ভ্রমণ। অনেকদিনের পরিশ্রমের পর পাওয়া গেল বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এবার প্রশ্ন হলো, এস্থান কোথাকার ধ্বংসাবশেষ—কিসের ধ্বংসাবশেষ? হিউয়েন সাং এই পথেই ভ্রমণ করেছিলেন কিনা? এবার প্রয়োজন হলো এইসব স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের। কানিংহাম ভারত সরকারের কাছে তখন এই স্থানগুলি খননের অনুরোধ জানালেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কাজ এতদিন বন্ধ ছিল। এবার শুরু হলো খননের কাজ। কানিংহাম এই সংস্থার কর্ণধার হলেন। [ক্রমশ]

গ্রিক মুদ্রার ইতিহাসে দেবতা অ্যাপোলো

মদনমোহন সাহা

ভারত একটি মহান প্রাচীন দেশ। বোধহয় সৃষ্টির পর থেকেই এখানে মূর্তিপূজা প্রচলিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই প্রথা অবলুপ্ত হলেও গঙ্গার পবিত্র জলধারার মতো এটি ভারতের জাতীয় জীবনে আজও প্রবহমান। এখনো ত্রিবেণী সঙ্গমে লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধর্মীয় সমাবেশ ঘটে চলেছে। কুম্ভমেলায় কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সমাগম বিস্ময় জাগায়। ভারতীয় জনজীবনে ঈশ্বরের প্রভাব সূর্যের মতো সর্বব্যাপী বিস্তারলাভ করেছে। ভারতের মতো প্রাচীন গ্রিসেও নানা দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই নিবন্ধে গ্রিক পুরাণে সূর্য দেবতা অ্যাপোলো যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন, তা আলোচনা করা হবে। শুধু দেবদেবীর কাহিনীই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন মুদ্রায় দেবদেবীদের আবির্ভাবের কথাও। মুদ্রা সংগ্রহ-কারীদের কিছু নতুন তথ্য গোচরে আনাই এর উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রিসের সূর্যদেব অ্যাপোলো রোমেও সূর্যের দেবতা হিসাবে পূজিত হতেন। তিনি যে শুধুই সকলের উপাস্য দেবতা ছিলেন তা নয়, প্রাচীন মুদ্রার ইতিহাসেও অ্যাপোলোর প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। জিউস ও লেটোর সন্তান—এই পরিচয়ের সুবাদে অ্যাপোলো গ্রিক দেবতাদের মধ্যে অচিরেই হয়ে উঠেছিলেন অগ্রগণ্য। সঙ্গীত, কলা ও ভবিষ্যদ্বক্তার দেবতা হিসাবে তিনি গ্রিসে সকলের পূজ্য ছিলেন। কেউ কখনো কোন বিপদে বা দুর্ভোগে পড়লে সবসময় তাঁকে মানুষ স্মরণ করত এবং তিনিও তাদের রক্ষা করতেন বলে সেকালের বিশ্বাস ছিল। অসুস্থদের আরোগ্যকরণেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি মেষপালকদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বও যেন ছিল তাঁরই কাঁধে। আবার অন্যের অনিষ্টকারী উদ্ধত, একগুঁয়েদের তিনি চিরকাল বিরোধিতা করতেন এবং বলা হয়, এদের শত্রুই হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সকলের উপাস্য এই দেবতার সঠিক জন্মবৃত্তান্ত কিন্তু আজও অন্ধকারে ঢাকা। ইতিহাস পড়লে জানা যায়, গ্রিসের উত্তরপ্রান্ত কিংবা এশিয়ার কোন এক অঞ্চল থেকে তাঁর আগমন। পরে গ্রিসের সর্বেশ্বরবাদে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। গ্রিক পুরাণ-মতে, অ্যাপোলো আর তাঁর যমজ বোন দেবী আর্টিমিস ডেলসের এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বহুমত থাকলেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, জিউসের পরবর্তী কালে একমাত্র অ্যাপোলোই গ্রিকদের দেবতাপদ আলোকিত করে সকলের পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। গ্রিকরা ডেলফির এক প্রত্যন্ত অংশে তাদের উপাস্য দেবতা অ্যাপোলোর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু জ্ঞানি-গুণী, এমনকি সম্রাটেরাও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে এখানেই জড়ো হতেন। অ্যাপোলোর অনুগত মহিলা ধর্মযাজকদের মুখে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হতো। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় ভক্তদের মনে তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো। এমনকি লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাসও এই বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্তি পাননি।

একবার ক্রোয়েসাসের ইচ্ছা হয় পারস্য আক্রমণ করার। তিনি এই মনোবাসনা গোপন না করে ইষ্টদেবতা অ্যাপোলোর শরণাপন্ন হন ইচ্ছাপূরণের আশা নিয়ে। তিনি অ্যাপোলোর কাছে জানতে চান পারস্য আক্রমণ করলে তিনি জয়ী হতে পারবেন কিনা। এর উত্তরে অ্যাপোলো যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তার অর্থ বুঝতে রাজার ভুল হয়। অ্যাপোলো বলেছিলেন, এই যুদ্ধে এক বিরাট রাজত্বের পতন হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তাঁরই অনুকূলে ভেবে নিয়ে ক্রোয়েসাস নির্ভয়ে পারস্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি বীরদর্পে পারস্য আক্রমণ করেন এবং অবধারিতভাবে পরাস্ত হন। পারস্যরাজ সাইরাসের কাছে পরাজিত ক্রোয়েসাস সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হন।

প্রাচীন ট্রয় নগরে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন ট্রয় নগরবাসীকে রক্ষার্থে দেবতা অ্যাপোলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, উদ্দেশ্য—গ্রিক বীর অ্যাকিলেসকে তাঁর তিরে বিদ্ধ করে হত্যা করা। অন্যান্য গ্রিক দেবতার মতো সাধারণ মানুষের সমস্যা নিরসনে হস্তক্ষেপ করতে অ্যাপোলো কখনোই অনিচ্ছুক ছিলেন না। গ্রিক বীর অ্যাকিলেসের মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে এতটাই গভীর রেখাপাত করে যে, হঠাৎ কেউ মারা গেলে বলা হয়—এর নেপথ্যে আছে অ্যাপোলোর অদৃশ্য তির।

এ হেন অ্যাপোলোর নিত্য সাথি ছিল একটি ত্রিপদ স্ট্যাণ্ড, সাত তারে বাঁধা গ্রিসের এক বিশেষ বীণা, তিরধনুক, গ্রিসের চিরসবুজ গুল্ম ল'রেল (এটি প্রাচীন গ্রিসে খ্যাতি ও সম্মানের প্রতীক), ওমফালস্ (মৌচাকের মতো দেখতে একধরনের পাথর)—যা পাওয়া যেত গ্রিসের ডেলফি নগরীতে, এছাড়া খেজুর গাছ ও আরো অনেক কিছু। গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর মূর্তি যেখানেই খোদাই করা হতো, সেখানেই তাঁকে সচরাচর বীণা-হাতে দেখা যেত। মুকুটশোভিত অ্যাপোলোর মূর্তি খোদাই করা হতো দাড়িগোঁফ-হীন এক যুবা হিসাবে, কখনো নগ্ন আবার কখনো বিশিষ্ট এক লম্বা ঢিলাঢালা পোশাকে। অ্যাপোলোর ব্যবহৃত প্রিয় জিনিসগুলিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিকৃতির পাশে জায়গা পেত।

'থেসালিয়ন লিগ' খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬ ও ১৪৬-এর মধ্যে কোন একসময়ে এক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করে, গ্রিক ভাষায় যার নাম ড্রাক'মা (Drachma)। এই মুদ্রার সামনের দিকে চিত্রিত ছিল অ্যাপোলোর মুকুটভূষিত শির, ডানদিকে ঘোরানো তাঁর মুখখানি TY মনোগ্রামের প্রেক্ষাপটে। উলটোদিকে দেবী অ্যাথিনার মূর্তি। দেবী ডানদিকে অগ্রসরমানা; এক হাতে বর্শা ঘোরাচ্ছেন, অন্য হাতে ফলক ধরে আছেন। মুদ্রায় গ্রিক লিপি দেখা যায়।

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে গারজারা শহরে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা—যার আরেক নাম 'টেট্রোবল' (Tetrobol)—তাতে খোদিত ছিল সূর্যদেবের মুখ। এখানেও তাঁর মুখখানি ডানদিকে ঘোরানো, মাথায় সম্মানীয় মুকুট। অন্য পিঠে গ্রিক উৎকীর্ণলিপির ওপরে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে এবং তার অভিব্যক্তিটা এমনই, যেন ঘাস চিবাচ্ছে।

এশিয়া মাইনরের লিসিয়ার বিভিন্ন শহরে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে এরকম বহু চিত্তাকর্ষক রৌপ্যমুদ্রা খুঁজে পাওয়া গেছে, যাতে রয়েছে অ্যাপোলোর মুখাবয়বের প্রতিকৃতি। মুদ্রার উলটোপিঠে কোনটিতে অ্যাপোলোর বিশেষ প্রিয় বীণার চিত্র, কোনটিতে গ্রিক অক্ষরের সঙ্গে অ্যাপোলোর বিশেষ কিছু ব্যবহৃত দ্রব্যের ছবি; কিন্তু সবই স্বল্পগভীর এক চৌখুপীর ভিতর আঁকা।

ইতালি শহরে এই গ্রিক দেবতার আগমন হয় বেশ তাড়াতাড়ি এবং সেখানেও গ্রিসের মতো ভবিষ্যদ্বক্তারূপে ও আরোগ্যকারীর বিশেষ ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সেসময় রোমের সম্রাট ছিলেন অগাস্টাস। দীর্ঘ যুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রোমের পুনর্গঠনে যখন তিনি মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময় সেখানে অ্যাপোলোর পদার্পণ ঘটে। রোমান সম্রাট অগাস্টাস তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। অ্যাপোলোর আবির্ভাব তাঁর মনে এক আশার সঞ্চার করে। অ্যাপোলোকে বিবিধ লাতিন পদমর্যাদায় এবং বিভিন্ন উপাধিতে বরণ করা হয়। যেমন 'Convervator' ও 'Propuguator', 'Palatinus'। শেষোক্ত পদভূষণটি প্যালাটাইন পাহাড়ের রাজপ্রাসাদে সুরক্ষিত রাখা হতো অ্যাপোলোর বিশেষ অবদানের জন্য।

অগাস্টাস থেকে শুরু করে অরোলিয়ন অবধি রোমান সাম্রাজ্যের রাজকীয় মুদ্রায় অ্যাপোলোর প্রতিকৃতি বিশেষ মর্যাদায় চিত্রিত হতো। অরোলিয়নের রাজত্বকালের (২৭০-২৭৫ খ্রিস্টাব্দ) পর মুদ্রায় তাঁর প্রতিকৃতির নমুনা ক্রমশ কমে আসতে থাকে। শুধু দ্বিতীয় জুলিয়েনের সময়ে (৩৬০-৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ) এর অল্প পুনরুত্থান ঘটে। কিছু গ্রিক মুদ্রাতেও এসময় তাঁর প্রতিকৃতির খোঁজ মেলে। অ্যাপোলোর প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে এমন বহু মুদ্রার মধ্যে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

প্রথমেই মনে আসে অগাস্টাসের রাজত্বকালে প্রবর্তিত এক রৌপ্যমুদ্রা 'Denarius'-র কথা। এখানে একদিকে অগাস্টাসের মুখাবয়বকে কেন্দ্র করে চারপাশে লেখা আছে 'AVGVSTVS DIVIF'। মুদ্রার বিপরীত পিঠে লেখা 'IMP.X.ACT'। সেখানে দেখা গেছে দেবতা অ্যাপোলোর একটি ছবি। তাঁর মুখখানি এক্ষেত্রে বাঁদিকে ঘোরানো, হাতে পেল্কট্রাম ও বীণা।



অ্যাপোলো দেবতার ছবিসহ একটি প্রাচীন মুদ্রার দু-পিঠ

আরেকটি দৃষ্টান্ত। সম্রাট সেপটিমিয়াস সেভারাসের (১৯৩-২১১ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে প্রবর্তিত একটি মুদ্রা 'Deuarius'-এর সামনের পিঠে লেখা হতো 'L.SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. IIII'। লেখাটি মুকুটভূষিত সম্রাটের ডান অভিমুখে চিত্রিত মুখের চারপাশে আবর্তিত। বিপরীতদিকে লেখা 'APOLLINI AVGVSTO'। অ্যাপোলো সেখানে বাঁদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, হাতে একটি উৎসর্গীকৃত পাত্র, গ্রিকভাষায় যার নাম 'পোটরা' এবং বীণা।

সম্রাট অ্যামিলিয়নের স্বল্পায়িত সময়ের (২৫৩ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বে প্রবর্তিত একটি মুদ্রা 'Antominious'-এ লেখা আছে—'IMP. AEMILIANVS PIVS FEL. AVG'। মুদ্রার সামনের ভাগে এই লেখাটি সম্রাটের একটি 'bust' ছবির চারধারে ঘিরে আছে। সম্রাট এখানে বর্মাচ্ছাদিত, তাঁর মাথা থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। মুদ্রার অন্য পিঠে লেখা 'APOL. CONSERVAT'। তার পাশে দেবতা অ্যাপোলো একটি গাছের ডাল ধরে একটি পাথরে বীণার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন।

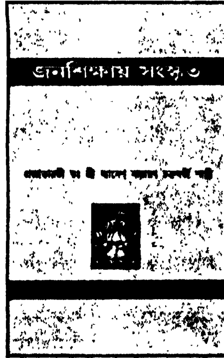
মুদ্রায় এই সূর্যদেবতার শেষ দেখা মেলে একটি রোমান মুদ্রায়। সেটি সম্রাট অরিলিয়নের রাজত্বেরই কোন এক সময়ের। এটি একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রা 'Antoninionus'। এখানেও মুদ্রার সামনের দিকে সম্রাটের 'bust' ছবি, পাশে লেখা 'IMP. C. L. DOM. AVELIANVS AVG'। অপর পিঠে লেখা 'APOLLINICONS'। অ্যাপোলো এখানেও যেন বেদির ওপর বীণার দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। দেবতা হিসাবে অ্যাপোলোর নানা কাহিনী অনেকেরই হয়তো জানা, কিন্তু মুদ্রার ইতিহাসে তাঁর গুরুত্বের কথা কজনেই বা জানে? ❑

যথার্থ 'মানুষ' হয়ে উঠতে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

জনশিক্ষায় সংস্কৃত ● লেখক : ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ● প্রকাশিকা : ঊষা দেবী চক্রবর্তী, ঋষিধাম, পোঃ দত্তপুকুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৪৮ ● মূল্য : ৫০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+১৪৪ ● প্রকাশকাল : ১৯৯৯

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা এবং বাগ্মিতায় সুপরিচিত অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী একসময় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাকে আবশ্যিক করার পক্ষে। সেই প্রচেষ্টার ফল বর্তমান গ্রন্থ **'জনশিক্ষায় সংস্কৃত'**। তাঁর বক্তব্যকে জনচিত্তে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ অনেকটাই সাহায্য করবে। গ্রন্থকার বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, জননেতা, সরকারের পদাধিকারী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার আবশ্যকতা কতটা এবং কোন্দিক থেকে। তাঁর যুক্তিবহ আলোচনা থেকে অন্তত দুটি বক্তব্য খুবই জোরালো হয়ে দেখা দেয়। প্রথমত, বহু ভাষাভাষী ভারতীয় সমাজে আত্মিক দিক থেকে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, বাঙলার মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলির উৎস সংস্কৃত এবং সেজন্য এই ভাষা না জানলে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে ব্যুৎপত্তিলাভ হতে পারে না।



শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষার স্থান যে গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা গ্রন্থকার দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে বিপুল মহনীয় ভাবধারা রয়েছে, সেগুলি আধুনিক কালেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র লঘু করে না দেখেও একথা প্রায় ধ্রুবসত্যের মতো বলা যায় যে, মানবিক বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ না থাকলে কোন মানুষের পক্ষেই যথাযথ অর্থে 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর, ভারতের ক্ষেত্রে মানবিক বিদ্যাচর্চাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয় স্তরে যে-শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সেখানে অন্তত দু-তিন বছর সংস্কৃত শিক্ষার স্থান করে দিলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশ সুগম হয়। একবার মানসিক বিকাশ সঠিক পথে ঘটতে আরম্ভ করলে তারপরে যার যেমন পছন্দ সেভাবেই সে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারবে। শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তির পথে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা অত্যন্ত উপযোগী। সংস্কৃত ব্যাকরণ যে পৃথিবীর অধিকাংশ বহুপ্রচলিত ভাষাগুলির ব্যাকরণের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক, সেকথা যেকোন ভাষাবিদ্ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য। সেইসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে সু-উচ্চ মানবিক আদর্শের ভাবধারা রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে শিক্ষার দুই মূল উদ্দেশ্য—চরিত্রগঠন ও জাতিগঠন—সহজেই ফলবতী হতে পারে। আধুনিক ভারতে আঞ্চলিক ভাষাগুলির দাবি কোনভাবে নস্যাৎ না করেই বরং তাদের সুষ্ঠু ও সুস্থ বিকাশের জন্যই সংস্কৃত ভাষাচর্চা একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের পক্ষে নিজের মাতৃভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচিতিলাভ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। জনগণ এবং সরকারের সামান্যতম সুস্থবুদ্ধি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, যার ফলে আমাদের সুস্থ মানসিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। আমরা জাতি হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদাও লাভ করতে পারব।

গ্রন্থটির শেষভাগে অধ্যাপক চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়। মাত্র দশদিনেই যেকোন সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তাই এই ভাষার কাঠিন্যের বিরুদ্ধে প্রচারও যুক্তিহীন।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি না থাকলে যেমন ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম উৎস 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু সঙ্গীত ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার অর্থ বোঝাও সম্ভব নয়। অন্যদিকে আধুনিক প্রজন্ম যতই পশ্চিমিমনস্ক হোক না কেন, এখনো দেখা যাচ্ছে, তারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা কোন পূজায় সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করছে। সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে মন্ত্রগুলির অর্থ বোঝা যায় এবং বোঝা যায় কত গভীর ও উদার ভাবধারা আছে সেসব বক্তব্যের মধ্যে। ভারতের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। এরকম অনেক কারণে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি ঘটাতে পারলে স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজ সহজ হবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা শেখা আবশ্যিক করলে দেশের মানসিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। এটাই গ্রন্থটির মূল বক্তব্য, যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা যায় না।

এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

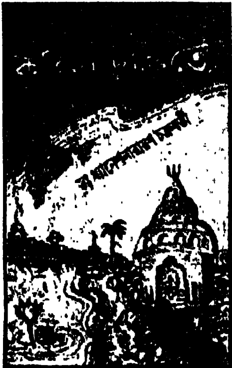
ভারতীয় কৃষ্টির আঠারো আনা

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

***কৃষ্টির দৃষ্টিতে* • লেখক : ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী • প্রকাশক : নিতাইচন্দ্র ভক্ত, প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯ • মূল্য : ৫০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+১৮৪ • প্রকাশকাল : ১৯৯৯**

এক বরেণ্য বিদ্যাব্রতী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে লিখেছিলেন : "আমি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি—এই শব্দত্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। (১) দেহের সুখবিধান যে কৃতির লক্ষ্য, তাহা সভ্যতা। সভ্যতা বাহ্য বিষয়ের। (২) যদ্দ্বারা মনের সুখসাধন হয়, তাহা সংস্কৃতি। (৩) যদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কৃষ্টি।" এই কৃষ্টি বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থ **'কৃষ্টির দৃষ্টিতে'** বর্তমানে আলোচনার বিষয়। গ্রন্থটি ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী-রচিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন।

এই গ্রন্থে বিষয়বস্তুর যে ব্যাপ্তি পাওয়া যায়, তাতে প্রবন্ধকারের বহুমুখী ভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক এদেশের জাতীয় কৃষ্টির প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন



সনাতন ভাবনার দর্পণে। তাঁর রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্যভিত্তিক। মহামনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করে কিভাবে স্ব-বক্তব্যের অনুকূলে সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়, তার নিদর্শনরূপে এই সঙ্কলনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি অলিখিতভাবে যেন চারটি বিভাগে বিভক্ত—সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন এবং মূলত রাজনীতি। রাজনীতি যেন প্রাসঙ্গিকে এবং অপ্রাসঙ্গিকে মেশামেশি হয়ে আলোচিত হয়েছে (যথা 'শতবর্ষের আলোকে আনন্দমঠ') যত্রতত্র। তবে এই গ্রন্থে প্রবন্ধকার-রচিত কিছু সংস্কৃত শ্লোক এবং দ্বিজেন্দ্রগীতি 'আমার জন্মভূমি'র সংস্কৃতানুবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্রন্থের সূচীতে সতেরোটি প্রবন্ধের নাম রয়েছে। কিন্তু এই সতেরোটি প্রবন্ধ ছাড়াও অন্য আরেকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয় হয়েছে, অথচ তার উল্লেখ সূচীতে নেই। সেই প্রবন্ধের নাম 'আচার্য শঙ্কর—সমন্বয়ের মহানায়ক'। সূচীতে নানা পত্রিকার নাম রয়েছে, যেগুলিতে এই প্রবন্ধগুলি আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকাগুলি কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অথবা কোন্ কোন্ সংখ্যায় পত্রিকাগুলি ঐসব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, সেবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। গ্রন্থের পরিশেষে একটি তথ্যসূচী থাকা জরুরি ছিল। 'বাংলার নবজাগরণ ও সংস্কৃত চর্চা' এবং 'সংস্কৃতসাধনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামাঙ্কিত প্রবন্ধ-দুটিতে কোন প্রকাশক-পত্রিকার নামোল্লেখ নেই। গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে। সূচীতে দুটি প্রবন্ধের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রমাদবহুল (পৃঃ ১৪৫ এবং ১৩২)।

অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-রচিত গ্রন্থভূমিকা এবং প্রাবন্ধিক-রচিত প্রস্তাবনা পড়লে বোঝা যায় যে, তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৌহার্দের ভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েও স্থানে স্থানে (পৃষ্ঠা vi, ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদ) যেন কিঞ্চিৎ পরিপ্লবায় পর্যবসিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় প্রাবন্ধিকের ক্ষোভ এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি তাঁর 'অনুভূত সত্যের ঋজু প্রকাশের জন্য বিত্তশালী সাহিত্য প্রকাশন সংস্থা এবং সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানাদির পৃষ্ঠপোষণ' থেকে বঞ্চিত (পৃষ্ঠা vii)। এত ক্ষোভের মধ্যেও সূচীতে 'দেশ', 'বর্তমান' ইত্যাদি পত্রিকার নামোল্লেখ এবং প্রস্তাবনায় তাঁর স্ব-উক্তি "সেই সূত্রে বিভিন্ন মেরুর বহু বিদগ্ধজনের আন্তরপ্রীতি ও সাধুবাদে ধন্য হয়েছি।"—তাঁর মহানুভবতাকেই ঘোষণা করেছে। ❑

মানবসভ্যতার এক দলিল

মৈনাক মজুমদার

***কোরআনের আলোকে ইসলাম জগৎ ও সূফীসমাজ* • লেখক : ডঃ ওসমান গণী • প্রকাশক : আবদুর রহমান মল্লিক, মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ • মূল্য : ১২০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫২০ • প্রকাশকাল : ২০০২**

যখন মানুষ উচ্চবর্ণের নাম ভাঙিয়ে তার মানবতাকে নির্বাসনদণ্ডে পাঠায়, তখন সমাজের এক মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের নামে কিছু পশুসম মানুষ এবং তার ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মনুষ্যত্বের কসাই। এরকম এক অস্থির সময়ে চৈতন্য আন্দোলন এবং ভক্তি আন্দোলন দেখা দেয়। মানবসমাজের এই সকরুণ অবস্থা সম্পর্কে কোরআন বলে : "তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু দেখে না, তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু শোনে না, তারা পশুর মতো। বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়।" (সুরা আরাফ, ৭ : ১৭৯)

আসলে এখনো ভারতবর্ষে, হয়তো বা পৃথিবীর সর্বত্রই আমরা যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিভেদ করে চলেছি, তার যে মূলগত কোন ভিত্তিই নেই তা আরো একবার বোঝা যায় ওসমান গণীর **'কোরআনের আলোকে ইসলাম জগৎ ও সূফীসমাজ'**

হাতে নিলে। একাদশ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতে শুরু হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ার পর ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে এই সুফী স্রোত বাংলাদেশে পৌঁছায়। তার ফলশ্রুতি জড়িয়ে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি আর প্রাত্যহিক জীবনের সর্বত্র।

যখন লেখক খোলা কলমে পাঠকের ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন মুসলিম লেখকের বদলে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের লেখা পড়তে বলেন, কিংবা কোরআনের বক্তব্যের সারবত্তা বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতি দেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বা 'নৈবেদ্য' থেকে, তখন সত্যি সত্যিই ধর্মভীরু সঙ্কীর্ণ পাঠক-মন চমকে ওঠে। সুফী তাই বলে, এ-সংসারে ধার্মিক ও অধার্মিককে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, যত সমস্যা ধর্মান্ধকে নিয়ে।



ডঃ ওসমান গণীর গবেষণাঋদ্ধ এই গ্রন্থ থেকে সুফীবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মূল শরীয়ত অথবা গোঁড়া ইসলামধর্মীদের সঙ্গে এর সম্পর্ক ও তার বিবর্তন বিষয়ে এক দীর্ঘ অথচ মনোগ্রাহী আলোচনা পাওয়া যায়, যা নিজ গুণেই পাঠককে চুম্বকের মতো আটকে রাখে। তবু কোথাও কোথাও যেন লেখক কোরআনের এক নির্দিষ্ট আলোকবৃত্তের মধ্যেই আটকে পড়েছেন বলে মনে হয়, যার ফলে সুফীবাদের সাফল্য, ইতিহাস, জনজীবনে বা ধর্মান্দোলনে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা গেলেও সুফীবাদের ভবিষ্যৎ বা তার ক্রমবিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি না। সুফীবাদের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক বারবার সাম্যবাদের কথা বলেছেন, যা একান্তভাবে সুফীবাদের অবদান। তিনি আরো বলেছেন, সুফীগণই ভারতীয়দের অধ্যাত্মসাধনার সার্বিক ও সুষ্ঠু ধারা শেখান। কিন্তু ভারতীয় বেদ, উপনিষদ্ বহু পূর্বেই মানুষকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ঘোষণা করেছে এবং মানুষের মধ্যে যে অখণ্ড শক্তি আছে, সেকথা বারবার উল্লেখ করেছে। তাই লেখক যেন এখানে এক সীমিত আলোকবৃত্তের মধ্যে আটকে গেছেন বলে মনে হয়। লেখক সুফীবাদের 'লতিফা' এবং বৈদিক যুগের 'কুণ্ডলিনী সাতচক্র ভেদ' সম্পর্ক টানতে গিয়ে 'কুণ্ডলিনী'কে 'কুন্দালিনী' বলে উল্লেখ করেছেন, যার পরিশুদ্ধ বানান 'কুণ্ডলিনী'। ভক্তি আন্দোলন ও সুফীবাদের প্রভাব বলতে গিয়ে লেখক ভক্তি আন্দোলনকে সুফীবাদের পরোক্ষ ফল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় ভক্তি আন্দোলন বহু পূর্বের প্রায় রামানুজ দ্বারা বিস্তারলাভ করেছিল। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বেদান্তের নিরাকার অদ্বৈতব্রহ্মের ও সাকার সগুণ ভগবানের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন। রামানুজের প্রভাব তখনো দক্ষিণ ভারতে লক্ষ্য করা যায়। এই ভক্তি আন্দোলনকেই একটি আধুনিক রূপ দিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি সাধন করে একই সত্যে উপনীত হয়েছেন এবং ঐ ধর্মগুলিতে নবশক্তি সঞ্চার করেছেন—তিনি ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রেমিক সাধক গোবিন্দরায়ের নিকট দীক্ষিত হয়ে ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হন এবং অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন। এর দ্বারা "একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে—একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, সাধক ভাব, শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ১৭৭) লেখক তাঁর গ্রন্থে এইসকল বিখ্যাত ঘটনার কোন উল্লেখ করেননি। তবু একান্তভাবে ধর্মনির্ভর হলেও এই গ্রন্থ যে শুধুমাত্র ধর্মালোচনামূলক গ্রন্থের সংজ্ঞা ভেঙে সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার দলিল হয়ে উঠেছে, তার একমাত্র কারণ অবশ্যই লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্য ও উদার মনোভাব। পরিশেষে বলতেই হয়, এমন মূল্যবান একটি গ্রন্থে যতিচিহ্নের নির্ভুল ব্যবহার নিঃসন্দেহে কাম্য, নইলে তা পাঠকের মনোনিবেশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। □

গৃহীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

সংসারীদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অভয়বাণী • সঙ্কলক ও প্রকাশক : নদীয়া বিনোদ দাশ, জি-৬/৮, ডানকুনি হাউজিং এস্টেট, ডানকুনি, হুগলি-৭১১২২৪ • মূল্য : ১৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+১০২ • প্রকাশকাল : ২০০২

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে সংসারীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য উপদেশগুলি সঙ্কলন করে **'সংসারীদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অভয়বাণী'**। মূল গ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি নিয়ে মাত্র ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে পুস্তক প্রকাশ শ্রমসাধ্য কাজ। এই বইটি থেকে সংসারী মানুষজন অতি সংক্ষেপে তাঁদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ জানতে পারবেন। কিন্তু এই কাজে সঙ্কলক যে ষোল আনা সফল, তা বলা চলে না। তৎকালীন অনেক বিখ্যাত অথচ সংসারী ব্যক্তির সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার ও উপদেশাদি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; যেমন



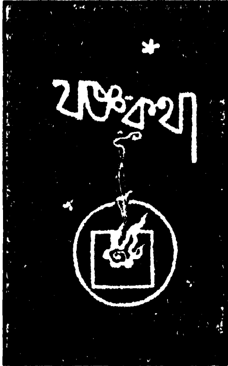
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এই সঙ্কলনে অনুল্লিখিত। দেবেন্দ্রনাথের কথা 'কথামৃত'-এ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে আছে। এইগুলি থাকলে গ্রন্থখানি আরো সুন্দর ও সুপরিকল্পিত হতো।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অমৃততুল্য। সঙ্কলক সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা তুলে ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর আশীর্বাণীটি এই গ্রন্থের অলঙ্কারস্বরূপ।

পুরনো হয়েও নতুন

যজ্ঞকথা ● লেখক : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ● প্রকাশক : এইচ. রায়চৌধুরী, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রিট (হেড অফিস), কলকাতা-৭০০ ০০১ ● মূল্য : ৪০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+১২৮ ● প্রকাশকাল : ১৯৯৬

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডিত্য বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের পর তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। শুধুমাত্র 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি' তাঁর অধীত বিদ্যার পরিমাপক নয়, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী তিনি।



'যজ্ঞকথা' গ্রন্থখানি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৯২০)। পরবর্তী কালে ১৪০২ বঙ্গাব্দে প্রাচী পাবলিকেশনস্ তাঁদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। বৈদিক যজ্ঞগুলির উদ্দেশ্য এবং তার অনুষ্ঠানপদ্ধতির আলোচনা এর বিষয়। আলোচনাগুলি ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, (২) ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, (৩) সোমযাগ, (৪) খ্রিস্টযাগ এবং (৫) পুরুষযজ্ঞ। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি আলোচনা মনোগ্রাহী; প্রাচীন কালের কথা হলেও তা উপেক্ষণীয় নয়। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য জীবনের কথা আছে। আবার গৃহকর্ম পালন না করে যাঁরা আজীবন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হয়ে থাকতেন এবং সমাজে তাঁদের স্থান কোথায় তা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের কারণ এবং বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে মানুষের সংস্কারের ভেদ ও অভেদের কথাও আলোচিত হয়েছে।

এইভাবে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি প্রকরণের আলোচনা করা হয়েছে। জেহোবার মন্দিরে ইহুদিদের পশুবলির ঘটনা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বরাত্রে শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনের সময় যিশুর মদ ও রুটি দিয়ে তাকে নিজের মাংস ও রক্তের সঙ্গে তুলনা, মৃত্যুর তৃতীয়দিনে যিশুর পুনর্জন্মলাভ ইত্যাদি বিষয়ক বর্ণনা রসসম্পৃক্ত করে উপস্থাপন বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। এসব গ্রন্থ কখনো পুরনো হয় না। ❑

যে-গল্পে মাটির গন্ধ মেলে

নদীয়ার লোককথা ● লেখক : ডঃ শ্যামপদ মণ্ডল ● প্রকাশক : দীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদ, পোঃ নগরউখড়া, নদীয়া-৭৪১২৫৭ ● মূল্য : ৪০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬+৯৮ ● প্রকাশকাল : ২০০০

'নদীয়ার লোককথা' গ্রন্থটি লেখকের গবেষণামূলক আলোচনার অংশবিশেষ—একথা জানিয়েছেন ভূমিকা-লেখক নিখিলেন্দু ভৌমিক। লোককথা বা লোকসাহিত্য নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা চলছে। অনেক রচনা এবং গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আশুতোষ ভট্টাচার্যের চার খণ্ডের সুবৃহৎ 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থ এবং তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ সুধীজনের মনোজ্ঞ আলোচনা ইতঃপূর্বে আমরা পড়েছি। বর্তমান গ্রন্থখানি তাতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যদিও নদীয়া জেলাকেন্দ্রিক আলোচনা, তবু বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস পাওয়া সম্ভব।



গ্রন্থখানি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। দ্বিতীয় খণ্ডটি সংগ্রহ ও সঙ্কলন নামে দীর্ঘায়িত। এই অংশে নদীয়া জেলার লোককথা বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণিত। যেমন পশুপাখি, ঐন্দ্রজালিক, ভূতপেত্নি, চাতুরি, বোকামি, পারিবারিক সমস্যাপূরণ এবং বীরত্ব পর্যায়ের লোককথা। তার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক পর্যায়ের 'স্বভাব' গল্পটি অন্য জেলাতেও প্রচলিত এবং ভূতপেত্নি পর্যায়ের 'পিণ্ডিকথা' গল্পটি দীর্ঘকাল আগে পড়া 'ভূতের কাছারি' নামে একটি গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য এমন মিল থাকতেই পারে। মোটের ওপর গ্রন্থখানি সুলিখিত, অতএব সুখপাঠ্যও বটে। ❑

—সন্তোষকুমার দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর

॥ 'প্রধান আড্ডা'॥

"কালে মাইসোর একটা প্রধান আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।"—লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে আগস্ট ১৮৯৪-এর এক চিঠিতে। স্বামীজীর এই প্রফেটিক উক্তি যে কতদূর সত্য, তা উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে মাইসোরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—যা ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে গত ২০০০ সালে। সেই আশ্রমের কথাই এবার আমাদের উপজীব্য। তবে, তার আগে স্মরণীয় কিছু প্রসঙ্গ, কিছু মহাপুরুষ-কথা।

॥ ফিরে দেখা॥

অজ্ঞাত, অপরিচিত সন্ন্যাসীর বেশে স্বামীজীর মাইসোরে প্রথম আগমন নভেম্বর ১৮৯২-এ। তখন তিনি ভারত-পরিব্রাজক। কিন্তু আগুন তো চাপা থাকে না; স্বামীজীর কথাও গোপন রইল না। রাজ্যের দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আইয়ারের কানে গেল এই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। স্বামীজীর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই লব্ধকীর্তি দেওয়ানজীর মনে হলো, ইনি কোন সাধারণ মানুষ নন। স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে তিনি পরম সমাদরে কয়েক সপ্তাহ রেখে তাঁকে নিয়ে গেলেন মাইসোরের রাজা চামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সভায়—রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। গেরুয়া কাপড় পরা নবীন যতি ও তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ দেখেই মহারাজের মন এক অজানা আনন্দে ভরে উঠল। কথায় কথায় তিনি স্বামীজীর বিদ্যার গভীরতা ও চিন্তার সূক্ষ্মতা ও অভিনবত্বের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হলেন। আর তখন থেকেই স্বামীজী পেলেন রাজ-অতিথির মর্যাদা। দিনের পর দিন মহারাজের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে গভীর আলোচনা হতে থাকল। মহারাজ বহু ব্যাপারে তাঁর মতামত নিতে থাকলেন। মাইসোরের রাজা ও মাইসোর রাজ্য স্বামীজীকে বরণ করে নিল। মহারাজার সঙ্গে স্বামীজীর নিবিড় যোগাযোগ ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর আজীবন সনিষ্ঠ আনুগত্য শুধু ঐ প্রজন্মেই থেমে থাকেনি, পরবর্তী কালে মাইসোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গড়ে ওঠার সঙ্গে রাজপরিবারের বদান্যতা ও ঔদার্যের দৃষ্টান্ত যুক্ত হয়ে রয়েছে।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সঙ্ঘনেতা বিবেকানন্দ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের আর যেসব সন্তান মাইসোরে পদার্পণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী, স্বামী অভেদানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের নাম মাইসোরের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তবে এঁদের সবার আগ্রহ ও আশীর্বাদেই মাইসোর আশ্রম যে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার এক 'প্রধান আড্ডা' হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ বীজ থেকে মহীরুহ॥

১৯১৭ সাল। স্বামীজীর মাইসোর ছাড়ার প্রায় আড়াই দশক পরের কথা। ওখানকার একদল ভক্ত মিলে শুরু করলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ'। উদ্দেশ্য—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন এবং মাইসোরে তাঁদের ভাবাদর্শে আগ্রহী সকলকে একত্র করা।' সংগঠনটি কর্ণাটকের আদি বাসিন্দাদের উন্নয়নে নিজের সাধ্যমতো কয়েক বছর ধরে কাজ করে। ১৯২৫-এর গোড়ায় মাইসোরে এলেন শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্য স্বামী শ্রীবাসানন্দজী। সেসময় নানা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি; একদিন মাইসোরের 'আদি কর্ণাটক সম্মেলন'-এ সভাপতিত্বও করেন। তাঁর আগমনের পর থেকেই মানুষের বিশেষভাবে মনে হতে লাগল যে, মাইসোর শহরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র হওয়া দরকার। তৈরি হলো বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটা প্রতিনিধি কমিটি। ঐ কমিটি বেলুড় মঠের কাছে যথাবিহিতভাবে আবেদন জানাল কেন্দ্রস্থাপনের জন্য। প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দজী। অবশেষে ১১ জুন ১৯২৫-এ ৩১৩ দেওয়ান শেষাদ্রি আইয়ার রোডের ভাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলো 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর'। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য, সুপণ্ডিত স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ) হলেন প্রথম অধ্যক্ষ।

আশ্রমের মাসিক ভাড়া ছিল ৪০ টাকা; টাকা উঠত ভক্তদের অনুদান থেকে। আশ্রমে তখন ছাত্রদের জন্য কোচিং ক্লাস ও ভক্তদের জন্য ধর্মীয় ক্লাস চলত। এই কোচিং ক্লাসের সূত্রে আশ্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। এদিকে আশ্রমের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। ফলে প্রায় তিনবছর পরে আশ্রমকে স্থানান্তরিত করতে হলো উইভার্স লাইন্স-এ (এখনকার নাম কৃষ্ণমূর্তিপুরম্) একটি ছোট বাড়িতে।

এল ১৯৩১ সাল। আশ্রমের ইতিহাসে স্মরণীয় একটি বছর। মাইসোরের মহারাজের অনুরোধে সেখানকার নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট আশ্রমকে দান করল ২ একর জমি। মাইসোরের কাছে বিখ্যাত 'বৃন্দাবন গার্ডেন্স' যাওয়ার পথে বড় রাস্তার ওপর 'বাণীবিলাস মহল্লা'য় অবস্থিত জমিটি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তদের দানে ৫,০০০ টাকায় নতুন জমিতে নির্মিত হলো ছোট্ট একটি আশ্রমবাড়ি। সেখানে একটি ঠাকুরঘর, দু-তিনটি সাধারণ ঘর ও একটি রান্নাঘর। ফেব্রুয়ারি ১৯৩১-এ আশ্রম এই নতুন জমিতে উঠে এল। এটিই আশ্রমের বর্তমান ঠিকানা। নতুন জমিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকল আশ্রমের কর্মকাণ্ড। সন্ন্যাসীরা নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচার করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁরা ধর্মের ক্লাস নিতে থাকলেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী শর্বানন্দজী ও স্বামী নিখিলানন্দজীর মতো প্রতিভাধর সন্ন্যাসী। বক্তৃতাস্থল—কখনো আশ্রম, কখনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কখনো বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান, কখনো বা শিয়া মসজিদ (এখানে বক্তৃতার বিষয় ছিল—হিন্দুধর্ম, বক্তা স্বামী শর্বানন্দজী, ভাষা উর্দু)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯২৮-১৯৩০ এবং ১৯৩১-১৯৩৩-এর সাধারণ কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, উল্লিখিত বক্তৃতাসূচী ছাড়াও আশ্রম তার চৌহদ্দির

ভিতরে ও বাইরে নিয়মিত ধর্মীয় ক্লাস পরিচালনা করত—বিশেষত শহরের পাঁচটি ছাত্রাবাসে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া হতো স্থানীয় দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যায়ের ছাত্রদের এবং কখনো কখনো মাইসোর জেলা কারাগারের বন্দি ও স্থানীয় টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের। এছাড়া আশ্রমে রোজ প্রার্থনা ও ভজন হতো। প্রতি রবিবার রেলওয়ে ওয়ার্কশপের একদল কর্মী আশ্রমে ভজন করতেন; তাতে আদি কর্ণাটিক সমাজের ভক্তরাও অংশ নিতেন। আশ্রমে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও ধর্মাচার্যের জন্মতিথি পালিত হতো। এছাড়া আশ্রমে ছিল একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, আশ্রম থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে কৃষ্ণরাজ সাগরে (বৃন্দাবন গার্ডেন্স) সাপ্তাহিক গীতা ক্লাস এবং স্থানীয় একটি মিলের শ্রমিকদের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন-সহ বক্তৃতারও আয়োজন করেছিল মাইসোর আশ্রম।

এইভাবেই সমগ্র মাইসোর ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচারিত হতে আরম্ভ করল মাইসোর আশ্রমের হাত ধরে। সে-ট্র্যাডিশন আজও চলছে, অব্যাহতভাবে। শুধু অব্যাহতভাবে বললে কম বলা হবে; আসলে কর্মস্রোতে এসেছে জোয়ার। মাইসোর আশ্রম ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে তার কর্মপরিধিতে, তার উদ্দেশ্যের ব্যাপকতায় ও ভাবের গভীরতায়। বীজ পরিণত হচ্ছে মহীরুহে। যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন সেবাযজ্ঞ।

॥ সারস্বত সাধনা ঃ প্রকাশনা বিভাগ ॥

এই আশ্রমের সঙ্গে যেসব সাহিত্যসেবীর নাম যুক্ত, তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হলেন কন্নড় সাহিত্যের 'রাষ্ট্রকবি' কে. ভি. পুট্টাপ্পা, যিনি 'কুভেম্পু' নামে পরিচিত এবং সমগ্র মাইসোরে দারুণভাবে আদৃত—আজও। স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত এই সাহিত্যিককে হঠাৎই একদিন একরকম 'আবিষ্কার' করেছিলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী। আত্মজীবনীতে কুভেম্পু লিখেছেন, কীভাবে এই আশ্রমের পরিমণ্ডল ও সাধুসঙ্গ তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। সহজ ভাষায় লেখা তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-জীবনী আজও কন্নড় সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। তিনি ছাড়াও আরো অনেক লেখক-সাহিত্যিক-দার্শনিকের সঙ্গে মাইসোর আশ্রমের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগটি যে আজ কন্নড় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য প্রসারের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তার পিছনে এঁদের অবদান বিরাট।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর খানেকের মধ্যেই (১৯২৬ সালে) প্রকাশিত হয় আশ্রমের প্রথম গ্রন্থ। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে ইংরেজি ও কন্নড় ভাষায় লেখা কিছু গ্রন্থ। ১৯৪২-এ স্বামী সোমনাথানন্দজীর সময় থেকে প্রকাশনা বিভাগটি বিশেষভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রকাশনা বিভাগ আশ্রমের প্রধান কর্মকাণ্ডগুলির অন্যতম। তার নিজস্ব প্রকাশনা দুশোর ওপর। এছাড়া প্রায় সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য কন্নড় ভাষায় আজ পাওয়া যায়—যার পুরো কৃতিত্ব এই আশ্রমের। ১ জানুয়ারি ২০০০ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কন্নড় ভাষার মুখপত্র 'বিবেক প্রভা', বর্তমানে যার মাসিক চাহিদা প্রায় ১৩,০০০।

আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার আছে। ইংরেজি, কন্নড়, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার প্রায় ১৪,০০০ গ্রন্থ রয়েছে এখানে। এটি এখন সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার-চালিত হওয়ার পথে।

॥ মাইসোর স্টাডি সার্কল ॥

আগেই বলা হয়েছে, মাইসোরের রাজপরিবার বংশানুক্রমে স্বামীজীর প্রতি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে। সেই সূত্রেই মাইসোর আশ্রমের ইতিহাসে এসেছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৩২ সালে মাইসোরের মহারাজার অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের প্রশিক্ষণের জন্য মাইসোর আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি Study Circle (পাঠচক্র)। এর উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণদান। পাঠচক্রের মুখ্য উপদেষ্টা বা আচার্য ছিলেন ভি. সুব্রহ্মণ্য আইয়ার। তিনি মাইসোরের মহারাজের শিক্ষকও ছিলেন। এক-একটি পর্বে ছজন করে সাধুর প্রশিক্ষণ হতে থাকল। নির্মিত হলো নতুন একটি বাড়ি (১৯৩৫)। একেবারে প্রথমদিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন স্বামী নিখিলানন্দজী ও স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। পরবর্তী কালে বেলুড় মঠ প্রতিবছর নিয়ম করে কয়েকজন সাধুকে এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাঠাতে থাকে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পূর্বতন ও বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ-দ্বয়—শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও অনেক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ ১৯২৬ সালে মাইসোর আশ্রমেই ব্রহ্মচারী হিসাবে প্রথম যোগদান করেন।

স্টাডি সার্কলটি ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ অবধি চলে নানা কারণে ৮ বছর বন্ধ থাকার পর আবার ১৯৫১-য় শুরু হয়। এর শেষ অধিবেশনটি হয় ১৯৫৪-৫৫-তে। মাইসোর আশ্রমের স্টাডি সার্কলকে ১৯৫৪-এ বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত (এবং বর্তমান বেলুড় মঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ) 'ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র'র পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। সেদিক দিয়ে সঙ্ঘের ইতিহাসে মাইসোর স্টাডি সার্কলের গুরুত্ব অপরিসীম।

॥ আশ্রম ও আশ্রম-প্রাঙ্গণ ॥

আশ্রমের প্রথম বাড়িটি নির্মিত হয় ১৯৩১-এ। ১৯৯৪-এ তার জায়গায় তৈরি হয় নতুন বাড়ি। এখানে রয়েছে অফিস, থাকার ঘর, রান্নাঘর ও ডাইনিং হল। আশ্রমের প্রায় মাঝখানে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক অনুপম মন্দির। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী এই মন্দিরটিকে উৎসর্গ করেন ১৯৫০ সালে। এছাড়া মঠ-প্রাঙ্গণে রয়েছে সাধুনিবাস, যেটি আসলে পূর্বতন স্টাডি সার্কল-বাড়ি।

মাইসোর আশ্রম বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমারোহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ, স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষ ও শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ উৎসব পালন করেছে। কর্ণাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের দ্রুত বিস্তারের পিছনে এই উৎসবগুলির বিশেষ সদর্থক ভূমিকা আছে। স্বামীজীর মাইসোর আগমনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৯২-এ মাইসোরের আকাশবাণী কেন্দ্রের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামীজীর

ব্রোঞ্জমূর্তি। আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন। বর্তমানে এই আশ্রম নিয়মিত বক্তৃতা-অনুষ্ঠান ছাড়াও যুবসম্প্রদায়, ভক্ত ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জন্য বছরের বিভিন্ন সময় যুবশিবির, সাধনশিবির ইত্যাদি পরিচালনা করে। এছাড়া আশ্রমের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পও পরিচালিত হয়ে আসছে ১৯৩৪ থেকেই। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২-এ বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের উন্নয়নের জন্য পরিচালিত 'সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প'।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা ॥

একথা বললে কমই বলা হয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাইসোরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা একটি। আসলে, সমগ্র ভারতের শিক্ষা-মানচিত্রেই এর এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। আর, তার সাক্ষ্য রয়েছে ভারতের অতীত-বর্তমান বহু খ্যাতকীর্তি মানুষের উক্তি ও স্মৃতিচারণায়।

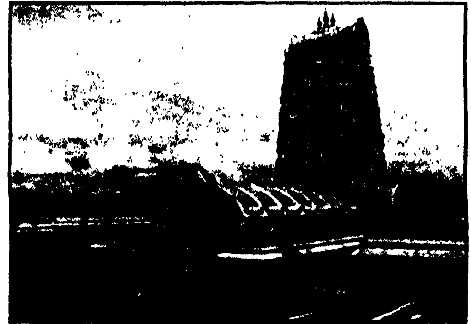


বিদ্যাশালার একাংশ

এই বিদ্যাশালার গোড়াপত্তন ১৯৩২-এর জুনে। মাত্র ১৪ জন আবাসিককে নিয়ে মাইসোর আশ্রমের খুব কাছে একটি বাড়িতে শুরু হয়েছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম'। শ্রীরঙ্গচার নামে এক আইনজীবী তাঁর বাড়িটি এ-কাজের জন্য আশ্রমকে দান করেন। ঐ ছোট্ট ছাত্রাবাসটির 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা' নামে এক বিরাট আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে যাঁর নাম, তিনি স্বামী সম্ভবানন্দজী—১৯৪১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত মাইসোর আশ্রমের অধ্যক্ষ। প্রচণ্ড আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনিই ১৯৪২-এ যাদবগিরি অঞ্চলে একটি বিশাল জমি কেনেন। ধীরে ধীরে সেই রুক্ষ জমিতেই গড়ে ওঠে এক মরূদ্যান। এই প্রসঙ্গে স্বামী সুরেশানন্দজীর নামও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১৯৫০-এর অক্টোবরে নতুন ছাত্রাবাস-ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। আর ১৯৫৩-র জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার। প্রায় ৭০ একর জমিতে অবস্থিত বিদ্যাশালাটিতে গড়ে ৪০০ প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজ ছাত্র সম্পূর্ণ আবাসিক-ভাবে পড়াশোনা করে। এখানে লেখাপড়া ও খেলাধুলায় উৎকর্ষের পাশাপাশি উচ্চতর মূল্যবোধ ও ভারতীয় আদর্শের শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গচরিত্র মানুষরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যাশালায় প্রায় ১৬,০০০ বইয়ের একটি গ্রন্থাগার আছে।

॥ রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মরাল অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়াল এডুকেশন (RIMSE) ॥

এটির সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। সম্পূর্ণ আবাসিক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে বি. এড, ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য কোর্স। কিন্তু এগুলি কোনমতেই প্রথাগত নয়। রয়েছে অনেক বিশিষ্টতা। বি. এড কোর্সটি RIMSE-র নিজস্ব। এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ওপর একটি আবশ্যিক স্পেশালাইজেশন আছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০। ডিপ্লোমা কোর্সগুলির বিষয়—মূল্যবোধ শিক্ষা। এতে যোগদান করতে পারেন কর্ণাটকের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নবোদয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের জন্য চলে একমাসের গ্রীষ্মকালীন কোর্স; বিষয়—মূল্যবোধের শিক্ষা। আর বছরের বিভিন্ন সময়ে মূল্যবোধ শিক্ষার ওপর অন্যান্য কোর্সও পরিচালিত হয়।



RIMSE-র মন্দির

বিদ্যাশালার মতোই এই প্রতিষ্ঠানটিরও সূচনার পিছনে রয়েছে স্বামী সম্ভবানন্দজীর শ্রম ও স্বপ্ন। ১৯৬৮-তে মোরারজী দেশাই এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৪-এর মে মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম সঙ্ঘগুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই প্রতিষ্ঠানটি উৎসর্গ করেন। পরে ১৯৮৩-তে নির্মিত হয় এর ১০০ ফুট উঁচু গোপুরম। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান রূপ গ্রহণের পিছনে RIMSE-র প্রথম প্রধান স্বামী হর্ষানন্দজীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। RIMSE-তে রয়েছে বিরাট প্রার্থনাকক্ষ, সভাগৃহ, শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি। ছাত্রদের জন্য ১৫০টি এক-শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে। RIMSE বোধহয় ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রথাগতভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইণ্ডিয়া কোয়ালিটি ফাউণ্ডেশন ও নিউ দিল্লির NIIT-র সহযোগিতায় RIMSE প্রস্তুত করেছে 'সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ'-এর ওপর একটি মাল্টিমিডিয়া কমপ্যাক্ট ডিস্ক (CD)। উপনিষদের শিক্ষা ও স্বামীজীর বাণীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিডিটিকে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে।

॥ এখানেই শেষ নয় ॥

নাগরিক কমিটি ও মাইসোর আশ্রমের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে প্রবর্তন করে এক

স্থায়ী 'বিবেকানন্দ চেয়ার'-এর। কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের 'চেয়ার' এই প্রথম। এর উদ্দেশ্য—বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর চর্চা করা এবং স্বামীজীর চিন্তা ও দেশ-বিদেশে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা।

মাইসোর আশ্রমের অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টায় কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে ও হচ্ছে। গড়ে উঠছে তাঁদের ভাবাশ্রয়ী অনেক প্রাইভেট সংগঠন, যারা মাইসোর আশ্রমের প্রদর্শিত পথে উপজাতি উন্নয়ন, অন্ধ-অনাথদের পুনর্বাসন, মানসিক স্বাস্থ্য, পেশাগত শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। এই সংগঠনগুলিকে সমন্বিত করে ১৯৯৭ সালে গড়ে উঠেছে 'বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশন'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যাশালার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র এস. এম. কৃষ্ণ বলেন, এই বিদ্যাশালার ইঁট-কাঠ-মাটি এবং এখানকার ত্যাগব্রতীদের সাহচর্য আজ আমাকে এই বিশাল প্রশাসনিক দায়িত্বভার বহনে নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। আর এইভাবেই মাইসোরের রামকৃষ্ণ আশ্রম ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে দেশের এই অঞ্চলে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পাবনী ভাবধারা বয়ে চলেছে; নতুন শতাব্দীতেও—নবরূপে, নববেগে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠ ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনে হাজার হাজার ভক্ত মঠে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ৩৩,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দজী এবং স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩৮,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ ঃ গত ৬ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 'মাঘ মেলা' উপলক্ষ্যে ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী বিষয়ক একটি প্রদর্শনী এবং একটি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রায় ৮০,০০০ দর্শনার্থীর সমাগম এবং শিবিরে প্রায় ১০,৫০০ রোগীর চিকিৎসা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, চণ্ডীপুর ঃ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি' পাঠ, ভক্তিগীতি, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২২ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,৬০০ গ্রামবাসী ও ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী স্তুতানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী প্রমুখ এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রভাতকুমার বেরা।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩০০ সাধু ও বৈষ্ণবকে সবস্ত্র দক্ষিণা এবং ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ২৩-২৫ এবং ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে রামায়ণ কথকতা পাঠ এবং রাসলীলা মঞ্চস্থ হয়। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন আলমোড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। এদিন বর্ষব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক ঃ গত ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বৈদিক প্রার্থনা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী,' 'পুঁথি' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ভজন, নাটক, নৃত্যনাট্য, রামায়ণ ও বাউল গান, আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পাঠ, নৃত্য, আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২২ তারিখ দুপুরে প্রায় ১২,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, সোমনাথ ভট্টাচার্য, বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির (সারদাপীঠ), বেলুড় মঠ ঃ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তা প্রদীপকুমার চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনশিক্ষা মন্দিরের কর্মিবৃন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভারতে ঃ **এলাহাবাদ, লিমডি, পোরবন্দর এবং টাকি।** বহির্ভারতে ঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল, পোরবন্দর ঃ গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সাধুনিবাস এবং 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ভ্যালু এডুকেশন অ্যাণ্ড কালচার' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাবনাবেন চিখালিয়া।

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ঃ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 'রামকৃষ্ণ দর্শন' নামাঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

শিষ্যগণের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটি স্থায়ী প্রদর্শনী, নবনির্মিত শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমঞ্চ এবং বিদ্যাপীঠের উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

শিক্ষাজগৎ ও ছাত্রকৃতিত্ব

ত্রিপুরার বিবেকনগরের 'রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল'-এর অষ্টম শ্রেণির দুজন ছাত্র 'ত্রিপুরা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি' আয়োজিত 'অঙ্কমেলা—২০০৪'-এ যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এদের মধ্যে একজন 'এন. সি. ই. আর. টি.' এবং 'এস. সি. ই. আর. টি' দ্বারা যুগ্মভাবে আয়োজিত 'পূর্বভারত বিজ্ঞানমেলা'য় (রাজ্যস্তর) প্রথম হয়েছে। এই মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, বিবেকনগরকে রাজ্যের 'শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল'-এর গৌরব প্রদান করা হয়। এই স্কুলের রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক রাজ্যের 'শ্রেষ্ঠ রসায়ন শিক্ষক'-এর মর্যাদালাভ করেন।

'ক্ষিতিজ আর্ট সোসাইটি, গুরগাঁও' আয়োজিত 'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড আর্ট একজিবিশন কাম কম্পিটিশন—২০০৩'-এ বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পাঁচজন ছাত্র স্বর্ণপদক ও তিনজন ছাত্র রৌপ্যপদক লাভ করেছে।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা (বাংলাদেশ)ঃ গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ ও আশ্রম পরিদর্শন করেন ঢাকা পৌরসভার মেয়র জনাব সাদেক হোসেন এবং বাংলাদেশের জলসম্পদমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী।

দেহত্যাগ

স্বামী প্রথমানন্দজী (প্রীতি মহারাজ) গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রাত্রি ২টা ৫৮ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ডায়াবিটিস ও বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫১ সালে তিনি করিমগঞ্জ কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি সারদাপীঠ ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে এবং দুই দশকেরও অধিক সময় ইটানগর কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। ১৯৭০-র দশকে সুরাট (গুজরাট), মনের (বিহার), পানিসাগর (ত্রিপুরা), পুলিগাড্ডা/ডিবি সিমা (অন্ধ্রপ্রদেশ)-এর পুনর্বাসন কার্য সুসম্পন্ন করেন। সেখানকার মানুষ এখনো তাঁর ঐ সেবাকার্যের প্রশংসা করে। গত দুবছর যাবৎ বেলুড় মঠে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি সঙ্গীতেও বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহশীল, সদাপ্রফুল্ল ও কঠোর পরিশ্রমী।

স্বামী ভাবাতীতানন্দজী (মানিক মহারাজ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শিবচতুর্দশীর দিন বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তমলুক, মুম্বাই, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, কাঁকুড়গাছি ও গড়বেতা কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত ১৫ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন অমায়িক ও কঠোর পরিশ্রমী।

স্বামী সূক্ষ্মানন্দজী (নরেন মহারাজ) গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে কিডনির বৈকল্যের কারণে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন বেলুড় মঠ, জয়রামবাটী ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা ও সিলেট কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। গত ২৩ বছর যাবৎ তিনি করিমগঞ্জ ও বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। শান্ত ও সদা প্রফুল্ল স্বভাব এবং সাধুগুণের জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত।

স্বামী গোপীনাথানন্দজী (নিতাই মহারাজ) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রাত্রি ১টা ৪০ মিনিটে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সকলের প্রিয় নিতাই মহারাজ ১৯৪০ সালে তিনি বৃন্দাবন কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে নিজ দীক্ষাগুরুর কাছেই সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি কনখল সেবাশ্রম ও বারাণসী সেবাশ্রমে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েক মাস তিনি বার্লোগঞ্জে স্বামী অতুলানন্দজীর সেবা করেন। গত ১৭ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল এবং কঠোর পরিশ্রমী। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ১০ মার্চ ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গিরিজানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

অঞ্জনগড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিরাটী (কলকাতা-৫১): গত ২০-২১ ডিসেম্বর ২০০৩ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দয়ামাতাপ্রাণাজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী প্রমুখ। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্মপুস্তক ও খাতা এবং দুঃস্থ নরনারীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন একটি বিনাব্যয়ে চিকিৎসা-শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ, বালী (হাওড়া): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, পূজা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। ১৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে কম্বল প্রদান করা হয়।

মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মেদিনীপুর): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, বাউল গান, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, স্বামী অঘোরেশানন্দজী প্রমুখ। ৯০ জন দুঃস্থ ছাত্রকে জামাপ্যান্ট দেওয়া হয়।

স্যাণ্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ বরুণহাট হাইস্কুল-এ 'বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩০০ যুবপ্রতিনিধি এতে যোগদান করে এবং ২০ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তরদান এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পরেশাত্মানন্দজী।

তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব (হাওড়া): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ ক্লাবের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। যুবপ্রতিনিধিরাও আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বাগুইআটি (কলকাতা-৫৯): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বামী আত্মবোধানন্দজী প্রমুখ। সবশেষে 'শ্রীশ্রীমায়ের চরণচিহ্ন' ভি. সি. ডি. প্রদর্শিত হয়।

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র (হুগলি): গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'ত্রিস্মরণ' নামে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশ করেন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, বামনগাছি (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ৪ ও ১২ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন এবং ও বাণী পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুবসমাবেশ, কম্বল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী গিরীন্দ্রানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী প্রমুখ।

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, পাটুলিগ্রাম (হুগলি): গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী আত্মভূতানন্দজী, স্বামী কৌশিকাত্মানন্দজী প্রমুখ। স্থানীয় ৫০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। পরদিন ১২ জানুয়ারি স্থানীয় হরিজনদের মধ্যে ফল, মিষ্টি, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি ও পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়েছে।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর): গত ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০০৪ যুব ও ভক্ত সম্মেলনে যথাক্রমে ৪০০ ও ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যুবসম্মেলনে স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ এবং ভক্তসম্মেলনে স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী প্রমুখ ভাষণ দেন। গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কালাতীতানন্দজী।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা শিবানী বসু গত ১২ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাবড়া-নিবাসী রমণীমোহন দাস গত ১৬ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী আরতি রায় গত ২৪ অক্টোবর ২০০৩ শ্যামাপূজার দিন পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, লখনৌ-নিবাসী সুস্থিরকুমার বসু গত ৩১ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি প্রায় ৪০ বছর স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বারাসত-নিবাসী কালীকুমার দত্ত গত ৩ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, 'রথতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী অলকা মজুমদার গত ১১ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।❑



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার

আন্দামান-৭৪৪-১০৪

ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২, ২৩৪৫৩৮

E-mail : pblrkmpb@sancharnet.in & Website : www.rkm-andaman.org

একটি আবেদন

ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ১,২০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত ও আদিম জাতি অধ্যুষিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। চতুর্দিকে সুবিস্তৃত বনরাজি, শৈলশ্রেণি ও অকূল সুনীল জলধি স্বভাবতই মনকে করে তোলে অন্তর্মুখী।

অপরদিকে এই আন্দামানেই কুখ্যাত সেলুলার জেল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত শত তরুণ বিপ্লবী বীরের ওপর ব্রিটিশের বর্বরোচিত নির্যাতনের কথা, মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে উৎসর্গীকৃত কত শত মুক্তিযোদ্ধার প্রাণবলিদানের কথা। আজ এই কুখ্যাত সেলুলার জেল রাষ্ট্রীয় স্মারক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ও পরিণত হয়েছে মুক্তিতীর্থে। শত শত দেশবাসী ভক্তিনম্র চিত্তে ভারতমাতার এই বীর সন্তানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে সারা বছর ধরে।

প্রায় পাঁচ দশক পূর্বের কথা। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কতিপয় যুবকের মিলিত প্রচেষ্টায় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সূচনা হয় অত্যন্ত সাধারণভাবে। সেই ভাবান্দোলনই 'রামকৃষ্ণ সেন্টার' নামে এক দাতব্য ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দানা বাঁধে ১৯৬১ সালে। এর প্রায় ২০ বছর পরে ১৯৮১ সালে অনাথ বালকদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠাই হয় এই সংস্থার প্রথম এবং প্রধান কার্য। ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পর এর কার্যধারা বিস্তৃত হতে থাকে।

আজ ৫০ জন অনাথ বালকের থাকা, খাওয়া ও পড়ার ব্যবস্থা ছাড়াও যুবকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, আই. এ. এস. প্রারম্ভিক পরীক্ষার কোচিং ও ছোটদের জন্য অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা এই আশ্রমের মুখ্য কার্যাবলী।

আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আলোকচিত্রে নিত্যপূজা এবং প্রতিবছর প্রতিমায় কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্তুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে পুনর্বাসিত করা হয়। পরে মূল ভূখণ্ড থেকে আগত তামিল, মালয়লি, পাঞ্জাবি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী কর্মসূত্রে এই দ্বীপপুঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দারূপে থেকে যায়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে এইসব ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকারি প্রচেষ্টার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

অদূর ভবিষ্যতেই রামকৃষ্ণ মিশন তার চিকিৎসা-সেবার অঙ্গ হিসাবে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার ইচ্ছা কার্যকরী করার আশা রাখে।

সরকারি অনুদানের সাহায্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকার্য পরিচালনার জন্য কয়েক বছর পূর্বেই দুটি ভবন তৈরি হয়। চিকিৎসা-সেবার জন্য তৃতীয় ভবনটি বর্তমানে নির্মাণরত। বর্তমান ছাত্রাবাসে স্থানাভাবহেতু নতুন ভবন, চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রের চিকিৎসক ও অন্য সেবাকর্মীদের বাসস্থান এবং বিভিন্ন কর্মচারী ও সাধুকর্মীদের বাসভবন নির্মাণ এই সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য আশু প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। মিশনের কার্যাবলী জনসাধারণের অর্থসাহায্যের দ্বারাই নির্বাহ হয়ে থাকে। অনাথ আশ্রম ও মিশনের অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ আর্থিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(১)	চিকিৎসা-সেবার জন্য বর্তমানে নির্মাণরত তৃতীয় তিনতলা ভবনটির জন্য আনুমানিক অতিরিক্ত প্রয়োজন	৫৬ লক্ষ টাকা
(২)	প্যাথোলজি, রেডিওলজি, শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি উপকরণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	৪৬ লক্ষ টাকা
(৩)	ছাত্রাবাসের ভবন নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	২৪ লক্ষ টাকা
(৪)	চিকিৎসক, অন্য সেবাকর্মী, কর্মচারী ও সাধু কর্মীদের বাসভবন ও গ্যারেজ নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	৩১ লক্ষ টাকা
(৫)	বৃষ্টি-জল সংগ্রাহক জলাধার, খেলার মাঠ, পুষ্করিণী ও রাস্তা নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	৯১ লক্ষ টাকা
(৬)	একটি অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসকদের যাতায়াতের নিমিত্ত একটি জিপগাড়ির জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	১৫ লক্ষ টাকা
(৭)	সভাঘরের Acoustic Treatment, Auditorium Chair, মাইক, আলো, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য আনুমানিক প্রয়োজন	২৭ লক্ষ টাকা
	মোট	২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা

এই প্রকল্প রূপায়ণে যেকোন দান **"Ramakrishna Mission, Port Blair"**—এই নামে A/c Payee Cheque বা Bank Draft দ্বারা অথবা M.O.-যোগে পাঠানো যেতে পারে। দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **সকল দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত।**

বিনীত

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

সম্পাদক

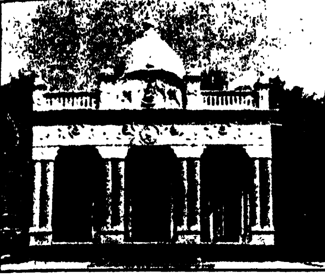


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

পোঃ বাঁকুড়া, জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১, দূরভাষ ঃ ০৩২৪২-২৫১২৫৪

একটি আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ পরম পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের পাদস্পর্শধন্য বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্র।



এখানকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর বিগ্রহে ভোগরাগ-সহ নিত্য পূজা করা হয়। এছাড়া এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন, নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা ও প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রতের অঙ্গ হিসাবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, একটি অবৈতনিক পাঠাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ করাও এই আশ্রমের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ।

অতি প্রাচীন এই মন্দির, তৎসংলগ্ন গৃহ ও প্রাচীরের সংস্কারসাধন, একটি নতুন সাধুনিবাস নির্মাণ এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পাড় সংস্কারের জন্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। আমাদের এই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সহৃদয় ভক্ত, শিষ্য, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক সাহায্য নগদে অথবা 'রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া'—এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট অথবা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক মারফত উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সকল আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন।

নিবেদক
স্বামী বিবেকাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর-৭১২৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
  কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন ঃ ২৬৭৩-৯২০৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ** (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
  পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন ঃ ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯
  ফোন ঃ ২৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
  উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন ঃ ২৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
  ফোন ঃ ২৬৬৩-৭০৪৬
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
  ফোন ঃ ২৬৮৪-৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- **শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র**
  গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬
  ফোন ঃ ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- **জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র**, প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
  জনাই-৭১২৩০৪, ফোন ঃ ৯১১২-২৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ৪/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
  ফোন ঃ ২৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**
  তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, বগুলা-৭৪১৫০২
- **নব রামকৃষ্ণ অপেরা**, বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, এ/২২, পোঃ তাহেরপুর

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫
  পিন ঃ ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**
  শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বোলপুর, ফোন ঃ ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩
- **দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামহরিপুর-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা-৭২২১৫০
- **কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩
  ফোন ঃ (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮

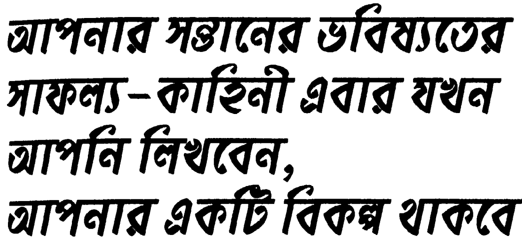
পুরুলিয়া

- **পুরুলিয়া বুক ডিপো**
  হাটতলা, ফোন ঃ (০৩২৫২) ২২৭২৯-২২৬৫১৩



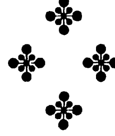
There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

Sri Ma Sarada Devi


আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের
সাফল্য-কাহিনী এবার যখন
আপনি লিখবেন,
আপনার একটি বিকল্প থাকবে

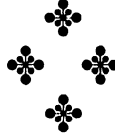
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No. 4
APRIL
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন ·

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ** ...র একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও **বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ ২০০৪ সালের জন্য **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'**কে পৌঁছে দিতে হবে। **'উদ্বোধন'** একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত ক... তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূ... গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ **'উদ্বোধন'**-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উ... তহবিল'**, অ... সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ** এবং **স্বামী** ... মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। **'উদ্বোধন'**-এর জন্য সকল আর্থিক দান ... **আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠা**... **...nanda Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ ... ১ উদ্বো... **বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবি... ন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700**... ট পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৬



জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ ৫ম সংখ্যা

"...সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হ'তে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা, যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।...ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart that conquers, not the brain (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য! লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা! এরই নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি'—স্বার্থ চলে গেছে।..."



১০৬ তম বর্ষ

উদ্বোধন
কার্যালয়

৩৪৭৫৪

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ● জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ ● মে ২০০৪



ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৭ আগস্ট থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে **(By Post)** পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ **আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - ✤ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।**
  - ✤ প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত** তারিখের পরে সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় **সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - ✤ **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া **সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে,** তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - ✤ **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯





জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশাং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্যানুরাগাদনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

(অধিকন্তু) সংসারভীতি-বিনাশকারিণী, সকল সিদ্ধি-প্রদানকারিণী, নিত্যানন্দ-বিধায়িনী, শাস্ত্রার্থ-স্বরূপিণী, নিত্যলীলাময়ী ও করুণারূপিণী তোমাকে আমি জানি না; বৃথা কাজে আসক্তির জন্য সবসময় সবদিকে দুঃখে পীড়িত হচ্ছি। হে বিকাশিতবদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি (ভীষণা), কৃপা করে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিও।

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

সজল মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়িতকেশা, (বামহস্তদ্বয়ে) খড়্গ ও মুণ্ড-ধারণে শোভমানা, (দক্ষিণহস্তদ্বয়ে) অভয় ও বরপ্রদানকারিণী, শবের মুণ্ডমালাধারিণী, দীর্ঘনয়না, সংসারের একমাত্র সাররূপিণী তোমাকে কখনো আমার অন্তঃকরণে ধ্যান-ধারণার দ্বারা চিন্তা করিনি। হে বিকাশিত-বদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি, কৃপা করে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো।

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

তুমি কালী, তারা, পার্বতী, ষোড়শী, ভৈরবী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, শিবাণী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, মঙ্গলা ও হিঙ্গুলা। হে বিকাশিতবদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি, কৃপা করে আমার অপরাধ তোমায় ক্ষমা করতে হবে।

শঙ্করাচার্য-কৃত 'অপরাধভঞ্জনস্তোত্র' (৭, ৮, ১৫)

শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নতির কথা স্বাভাবিক কারণেই আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের জাগরণ, প্রগতি এবং বিশ্বের দরবারে তাহার সার্থক উত্তরণ সম্ভব হয়। ভারতবর্ষের যে-চিত্র জনৈক পাকিস্তানি সাংবাদিক তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করে ঠিকই, কিন্তু তবু কিছু প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে যখন আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন কেন তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য রাজনীতি না করিয়া কেবল ধর্মপ্রচার করিতেছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসিত হইলে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরদিনই ভারতবর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসীর সামর্থ্য আছে কি যে সেই বীরভোগ্যা স্বাধীনতা যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত ধারণ করিয়া রাখিবে? স্বামীজী জানিতেন, ভারতবাসীর মন ও শরীর তখনো যথেষ্ট প্রস্তুত হয় নাই। দীর্ঘদিনের দাসত্ব-শৃঙ্খলের কারণে ভারতবাসী নিজের স্বরূপ ভুলিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় ক্লৈব্যে আপ্লুত হইয়াছে। তাই সর্বপ্রথম দরকার নিজের স্বরূপচেতনায় প্রত্যাবর্তন। এবং এই প্রত্যাবর্তন ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা নিজের জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরব করিতে শিখি নাই। বিদেশি মতবাদ ও আদর্শ নির্বিচারে গলাধঃকরণ না করিলে আমরা 'প্রগতিশীল' হইতে পারি না! সুতরাং বিদেশির পদানত হইয়া তাহাদের পদতলে নিজেদের সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়া অর্ধশিক্ষিতগণ অশিক্ষিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ করিবে—ইহা যেন এদেশের স্বাভাবিক চালচিত্র।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন।" ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু পরবর্তী প্রায় সাতান্ন বৎসরে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং দাসসুলভ স্বার্থান্বেষী মানসিকতা আমাদিগকে এই বীরভোগ্যা স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেয় নাই। বর্তমানে ক্ষমতার লড়াই এদেশের নেতৃবৃন্দকে যে-স্থানে লইয়া গিয়াছে তাহার নিন্দা করিবার ভাষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পর এখন আমরা কি কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখিতেছি? বিদেশি সাংবাদিকের প্রতিবেদন পড়িলে এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর হয়তো মিলিবে, কিন্তু মনে হয় প্রকৃত আত্মসমীক্ষা এখনি শুরু করা দরকার। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিচারে ভারতবর্ষের অগ্রগতি প্রবলভাবে হইতেছে, পরিসংখ্যান সেই সত্য উদ্ঘাটিত করিলেও তাহা কি প্রহেলিকাময়? অর্থাৎ এই অগ্রগতির পশ্চাতে যে প্রাণশক্তি ও মেধাশক্তি ক্রিয়াশীল, তাহা কি যথার্থই দীর্ঘস্থায়ী? না কি এদেশের অর্থনীতি পাশ্চাত্যের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া আগামী দুই দশকের মধ্যেই মুখ থুবড়াইয়া পড়িবে এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাহা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে এই দেশের শিক্ষানীতি কতখানি আত্মনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ব্যাপক, দূরদর্শী এবং বাস্তবসম্মত—তাহার উপর।

যেকোন দেশের 'শিক্ষানীতি' নির্ধারণ করিতে গেলে কয়েকটি মূল প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা প্রয়োজন। যথা—(ক) শিক্ষার লক্ষ্য কী? (খ) কে শিক্ষাদান করিতে পারে? (গ) কাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? (ঘ) কী শিক্ষা দেওয়া হইবে? (ঙ) কী উপায়ে শিক্ষাদান সম্ভব? (চ) কর্মকুশলতা বা কারিগরি দক্ষতার সহিত শিক্ষার সম্পর্ক কী? (ছ) সত্য কী, মিথ্যা কাহাকে বলে এবং বিশ্বাসের স্থান কোথায়? (জ) জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞানলাভের উপায় কী?

বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর বস্তুবাদী পাশ্চাত্যবাসী তাহাদের জড়দৃষ্টির সাহায্যে একপ্রকার প্রদান করিবে এবং অধ্যাত্মবাদী প্রাচ্য মহাপুরুষগণ এক চৈতন্যসত্তার নিরিখে এইসকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইবেন। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষাচিন্তা অন্য সকল দেশের শিক্ষাচিন্তা অপেক্ষা ভিন্নতর এবং ইহাও সত্য যে, স্থানীয় লোকাচার, সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন দেশের শিক্ষার প্রসার অসম্ভব। অতএব ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মের মাধ্যমেই শিক্ষানীতির প্রয়োগ ও শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইবে। বিগত এপ্রিল (২০০৪) মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ একটি আবেদনের উত্তরে রায় দিয়াছেনঃ "অনুগ্রহ করিয়া শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে টানিয়া আনিবেন না।" ঘটনা এইরূপঃ গত ইস্টার স্যাটার্ডেতে সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার দিন ধার্য হইয়াছিল। খ্রিস্টানদের নিকট ঐ পবিত্র দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হয়। কয়েকজন



খ্রিস্টান পরীক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাহিয়া আবেদন জানাইয়াছিল যাহাতে ঐ সর্বভারতীয় পরীক্ষাটি অন্য দিনে ব্যবস্থা করা হয়। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়। আপাতদৃষ্টিতে এই রায় ভারতীয় আদর্শের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। মনে হইতে পারে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়াছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে যাঁহারা অবহিত আছেন, তাঁহারা জানেন এই মন্তব্যের তাৎপর্য এখানেই সীমাবদ্ধ নহে। বস্তুত, প্রত্যেক ধর্মের দুটি অংশ থাকে, যাহার একটি ঐ ধর্মের মূল তত্ত্ব বা সারাংশ (essential part) এবং অপরটি বাহ্যাংশ (non-essential part)। যেমন বেলের শাঁস ও খোলা। মানুষ বেলের শাঁসটি গ্রহণ করে, খোলাটি নহে। কিন্তু ঐ শাঁসকে রক্ষা করিবার জন্য, এমনকি তাহার পরিপক্বতার জন্যও খোলাটি অপরিহার্য। অর্থাৎ একটি বিশেষ অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত বেলের non-essential part বা বাহ্যাংশটি অপরিহার্য। যেকোন ধর্মে সকলপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা (rituals) এবং পৌরাণিক অংশ (mythology) লইয়া ঐ ধর্মের বাহ্যাংশটি নির্ণীত হইয়া থাকে। এবং এই বাহ্যাংশ ধর্মের সারাংশকে (essential part) রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলিলেনঃ "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সারবস্তু বলিয়া মনে করি", তখন তিনি ধর্মের সারাংশকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ মন্তব্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় ধর্মের বাহ্যাংশকে শিক্ষায় টানিয়া আনিতে নিষেধ করিয়া যথোপযুক্ত রায় দিয়াছেন বলিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন বৈ নহে। বস্তুত, ধর্মের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানবীয় (তথা দৈবী) গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা বা কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিলাভ করে। এই দুইয়ের যথার্থ সংমিশ্রণ মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে (integrated personality) রূপান্তরিত করিয়া থাকে।

শিক্ষার লক্ষ্য কী?ঃ 'The Communist Manifesto' গ্রন্থে (Norton Critical Edn., p. 55) কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন (বাঙলায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল)ঃ "এতাবধি এই সমাজের ইতিহাস একটি নিবিড় শ্রেণি-সংগ্রামেরই ইতিহাস।" অতএব এই প্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য তিনি নির্ধারণ করিয়াছেনঃ "শিক্ষার সহিত কারিগরি শিল্পের উৎপাদনশীলতাকে মিলাইতে হইবে।" (ঐ, পৃঃ ৭৫) এবং এই দৃষ্টিতে দেখিলে, "শিক্ষা আসলে যুবগোষ্ঠীর জন্য একটি বহুমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণমাত্র, যাহার দ্বারা সমাজ ও দেশের বহুমুখী বিকাশসাধন সম্ভব হয়।" (ঐ, পৃঃ ১৯০)

কিন্তু ইহারও পূর্বে পাশ্চাত্যের শ্রুতকীর্তি দার্শনিক হেগেল (G. W. F. Hegel) অন্য মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হেগেল রচিত 'Phenomenology of Spirit' (Oxford University Press, 1977, reprint, p. 55) গ্রন্থে শিক্ষাকে অনুভবযোগ্য (experiential) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হেগেলীয় দর্শনের মূল তিনটি স্তম্ভ অর্থাৎ বস্তুর তিনটি স্বরূপ—(ক) অতীন্দ্রিয় (abstract), (খ) দ্বন্দ্ব (dialectic) এবং (গ) পূর্বানুমান (speculative) তত্ত্বের প্রেক্ষিতেই 'শিক্ষা'কে অনুভবযোগ্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এই যুক্তিপ্রবাহের শেষে হেগেল বলিলেনঃ "Education is a continued learning." (শিক্ষা অনন্ত।) [Hegel and Philosophy of Education, A paper by Nigel Tubbs, King Alfred College, Winchester, 2003] এত সব কিছু না জানিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেনঃ "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।"

কার্ল মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং অন্য দার্শনিকগণের অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) কিংবা বেন্থামের হিতবাদ (utilitaria-nism) ইত্যাদির সার্থক সমন্বয় ঘটিল স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ উপস্থাপনায়—"Education is the manifesta-tion of the perfection already in man." (শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রকাশ।)

সনাতন ধর্মের কথাই স্বামীজী বলিলেন। এই দৃষ্টিতে 'শিক্ষার লক্ষ্য'কে 'মানুষের পরম লক্ষ্য'-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্মানুযায়ী 'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ'—এই চার পুরুষার্থ প্রত্যেক মানুষের জীবনে যাহাতে রূপায়িত হইতে পারে তাহার সুবিধার্থেই মনুষ্যসমাজ নির্মিত এবং বর্ণাশ্রমাত্মক এই আদর্শ সমাজের পরিকাঠামো এমন হইবে যে, সদ্যোজাত শিশু হইতে অতি বৃদ্ধ পিতামহ পর্যন্ত সকলেই পরম-পুরুষার্থের (মোক্ষ) অভিমুখে চলিবে—"ভ্রান্তি হইতে সত্যের পথে নহে, বরং নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের দিকে।" সনাতন ধর্ম-অভীপ্সিত সেই পূর্ণাঙ্গ সমাজে ক্ষমতাদখলের লড়াই নাই, সহোদরের শত্রুতা নাই, শিক্ষক-ছাত্রের অসূয়া নাই, অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুবিধাভোগের প্রয়াস নাই, শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষার অভাব নাই, অতিরঞ্জিত শ্রেণিসংগ্রাম নাই, মানুষের পশুবৎ অসংযমী ইন্দ্রিয়চারিতা নাই। আছে প্রেম, সৌহার্দ্য, পরস্পরের সহযোগিতা, সত্যে উপনীত হইবার পরম আকাঙ্ক্ষা এবং অসীম প্রত্যয়ে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনের নিরলস আন্তরিক প্রয়াস। [ক্রমশ]

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দের চারটি পত্র

কালীসদয় পশ্চিমাকে লিখিত*

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

Bull Temple Road
Bangalore City
17.6.1921

শ্রীযুক্ত কালীসদয়বাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বর্তমানে আমি মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়া আছি। এ স্থানটী অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। এখানে আমার শরীর ভাল আছে।

আপনি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

Sri Ramakrishna Math
Bhuboneswar
8.1.22

কল্যাণবরেষু ঃ—

শ্রীমান কালীসদয় ঃ—

গতকাল তোমার পত্র ও উহার মধ্যে একটী টাকা আমি পাইয়াছি। শরীর আমার উপস্থিত একপ্রকার ভাল আছে। ২।৫ দিনের মধ্যেই আমার কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। সেজন্য তোমায় এখান হইতে তথায় আসিবার কথা বলিতে পারিলাম না। তথায় যাইলে তুমি আমায় পত্র লিখিও এবং যাহা ভাল হয় বিবেচনা করিয়া তোমায় পরে জানাইব।

*অসমের করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের শুরু থেকে যুক্ত কালীসদয় পশ্চিমা শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।—সম্পাদক

শুনিয়াছি মঠে এখন বড়ই ভীড়। বহু সাধু তথায় এ সময় আসিয়া আছেন—সেইজন্য অবস্থা না দেখিয়া তোমায় সঠিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

উপস্থিত শরীর আমার ভাল আছে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ।

॥৩॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

৫৭ রামকান্তবাবুর স্ট্রীট
বাগবাজার
কলিকাতা
8.2.22

কল্যাণবরেষু ঃ—

শ্রীযুক্ত কালীসদয় ঃ—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। তুমি এখানে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছ জানিলাম, কিন্তু উপস্থিত আমি এখানে নানান কাজে ব্যস্ত হইয়া আছি এবং একটী ভক্তের বাটীতে আছি—কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই, সেজন্য আমার নিকট বা মঠে থাকিবার কোনপ্রকার সুবিধা নাই। মঠে আজকাল নিজেদের লোকদের স্থানাভাব হওয়াতে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় তোমার এখানে থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না। শরীর আমার ভাল আছে। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ।

॥৪॥

Sri Ramakrishna Math
Belur P. O. Howrah
7.3.1922

কল্যাণবরেষু ঃ—

শ্রীমান কালীসদয় ঃ—

তোমার পত্র ও ১৲ টাকা কাল আমি পাইয়াছি। তুমি তথায় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম।

শরীর আমার উপস্থিত ভাল আছে। আমার ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কর্মরহস্য

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥৩০॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

শ্লোকার্থ ঃ *মিতাহারী যোগিগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল প্রাণে আহুতি দিয়া থাকেন। ইহাও একপ্রকার যজ্ঞ। এবং এইরূপে তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন।*

যাঁহারা অমৃতরূপ যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যাহারা অ-যজ্ঞ অর্থাৎ কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না—তাঁহারা পরলোক তো দূরের কথা, ইহলোকেও সর্বথা ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ ঈশ্বর-উপাসনা ব্যতীত মানবের জীবন পশুর সমান। তাই যেভাবেই হউক না কেন ব্রত, উপবাস, স্বাধ্যায়, যোগ ইত্যাদি সকল কর্ম সকল সময়ে ঈশ্বরের উপাসনাজ্ঞানেই করিতে হইবে। যেমন ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কিছু খাইলে এই জীবন পশুজীবন হইতেও অধিক উন্নত হইবে না, পরকালের সুখের তো কোন কথাই নাই। সেই কারণে শ্রীভগবানের ইহাই অভিপ্রায় যে, যাহা কিছু গ্রহণ করিবে ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু কর্ম করিবে 'শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ' বা 'সঙ্ঘের কাজ' ভাবিয়াই করিবে। ভাবিবে—'আমার জীবনটি যেন ভগবানের পূজাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।'

[**মন্তব্য ঃ** বস্তুত, এই শ্লোকদ্বয়ের সামাজিক তাৎপর্যও রহিয়াছে। এই সমাজব্যবস্থা যদি যজ্ঞের সহিত তুলনীয় হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হইলে এই সমাজই নরকতুল্য হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ শোচনীয় হইয়া উঠিবে। সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে শ্রীভগবান মানুষকে নিঃস্বার্থপর হইবার উপদেশ দিয়াছেন। সমাজেও দেখা যায়, নিঃস্বার্থপর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সমাজ সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইয়া উঠে।—**সম্পাদক**]

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

শ্লোকার্থ ঃ *বেদ-এ এইপ্রকার নানাবিধ (শ্রৌত) যজ্ঞের বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু এধরনের সকল যজ্ঞই কর্মজন্য অর্থাৎ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম হইতে সমুদ্ভূত। এই জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।*

ব্যাখ্যা ঃ অধিকারিবিশেষের জন্য বেদ-এ বহুপ্রকার ধর্ম-সাধনার কথা বলা হইয়াছে। নানাপ্রকার উপাসনা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। পুণ্যকর্ম করিয়াও জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ না পাইলে তাঁহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন; আর জ্ঞান-উপদেশানুযায়ী নিদিধ্যাসন করিলে তাঁহাদের মুক্তি হয়।

ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তাহা বাহির হইতে লাভ করিবার বিষয় নহে। তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতর রহিয়াছে। বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে একথা জানিতে পারা যায়। কোন সকাম কর্ম করিলে তাহার যে-ফল হয়, তাহা উৎপন্ন (যাহা ছিল না, এখন সৃষ্ট হইল—তাহাই 'উৎপন্ন') হয় বলিয়া একদিন তাহার ক্ষয় হইবেই হইবে। সুতরাং কোন সকাম কর্মের দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

শ্লোকার্থ ঃ *হে অর্জুন, দ্রব্যের সাহায্যে যেসব যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাহা অপেক্ষা (আত্মজ্ঞানাত্মক) জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ, সর্বকর্ম (ফল সহিত সকল কর্ম) জ্ঞানেই পরম সমাপ্তি লাভ করে।*

ব্যাখ্যা ঃ লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে, যজ্ঞে হাত-পা চালনা হয়, ধ্যানে সবই স্থির থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেন, তখন তো মন চঞ্চল থাকে, গতিময় থাকে? সত্য, তবে সেই মন জ্ঞানলাভ হইলে আর মন থাকে না, মন জ্ঞানে লয় পায়। ধ্যানের সময় আমরা ধীরে ধীরে সংসারকে পিছনে ফেলিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইতে থাকি।

আমরা যখন ধ্যান করিতে বসি, তখন সর্বাগ্রে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় বন্ধ হয়, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়; তারপর মন নিরুদ্ধ হয়, তারপর বুদ্ধি নিশ্চল হয়। তখন আমরা 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু' অর্থাৎ বুদ্ধির অতীত সেই সচ্চিদানন্দকে প্রত্যক্ষ করি। যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্রতম, তাঁহারা আনন্দময়কোশাবৃত সামান্যতম 'আমি'কেও নির্বিশেষে লীন করিয়া দেন। তখন বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম বোধে বোধ হয়। এই অবস্থাকে শাস্ত্রে 'পরামুক্তি' বলা হইয়াছে।

[**মন্তব্য ঃ** 'সর্বকর্ম'-এর প্রসঙ্গে শ্রীভগবান শ্রৌত এবং স্মার্ত সর্বপ্রকার যজ্ঞের কথা আনিয়া ইহাই বলিলেন যে, নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম করিলে ক্রমশ জ্ঞানাধিকার জন্মে এবং তখনি সর্বকর্ম আত্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।—**সম্পাদক**]

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥৩৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন, যে-বিধি (discipline)-র দ্বারা পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, হে অর্জুন, তাহা অবগত হও। প্রণিপাত (সভক্তি প্রণাম), সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা এবং গুরুসেবার মাধ্যমে 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মজ্ঞ' গুরু যখন সম্যক্ প্রীত হইবেন, তখনি সেই তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করিবেন।*

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমত, মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ এবং অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন গুরু চাই। গবেষণাগারে যেসব বিজ্ঞানী কর্ম করেন—তাঁহারা জানেন, প্রথমে theory ভাল করিয়া না বুঝিলে experiment (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করা সম্ভবই হয় না। আবার experiment করিবার সময় বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন না করিলে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মোক্ষ সাধনপথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। শরীরে মনে অল্পমাত্র দোষ থাকিলেও তাহাতে সাধনপথে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সাধ্য বিষয় পরিষ্কারভাবে না জানিয়া সাধন করিতে গেলে প্রায়শ মুমুক্ষু সাধক কেহ বা ভোগে লিপ্ত, কেহ বা যশ আকাঙ্ক্ষায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। আবার সাধনার ফল সহসা অনুভব করাও যায় না। তাহাতে অনেক সময় সাধক নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। সামান্য ২-৪ দিন সাধন করিলেও মনের মধ্যে একটা সংস্কার উৎপন্ন হয়; কিন্তু সাধারণ সাধকের নিকট তাহার ফল অনুভূত হয় না। তাই দেখা যায়, যাহারা কোন তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টার সঙ্গে না থাকিয়া সাধন করেন, তাহারা 'আমার কিছু হইল না, হইতেছে না'—এইরূপ অনুশোচনা করিয়া নিজেদের ক্ষতিসাধন করেন। একদিন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটি লোক পাথরে মুগুরের আঘাত করিল; পাথরটি ভাঙিল না, তবু সে আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। সপ্তমবার আঘাত করিতেই পাথর ভাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলাম, সাধনপথে সিদ্ধি এইরূপেই হইয়া থাকে। যতদিন সিদ্ধি না হয়, ততদিন এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লাগিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্য সহযোগী সাধক কিংবা সিদ্ধগুরুর নিকটে থাকিয়া সাধন করা একান্ত আবশ্যক। তাহাতে উৎসাহ নষ্ট হয় না।

গুরুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে; কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই মানুষের মন প্রীতিলাভ করে না। গুরুর সুখসুবিধা সম্পাদনের জন্য শিষ্যের শরীর-মন উপযুক্ত হইলে গুরু বুঝিতে পারেন, সে সত্যই তাঁহাকে ভালবাসে, তিনি যাহা বলিবেন তাহা সর্বান্তঃকরণে সে গ্রহণ করিবে। গুরুর মনে ইহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মানব-মনের ইহাই স্বভাব। মানুষের মনে সাধনপথে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। গুরুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া 'ঘোগ' (ছিদ্র) সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন করিবে।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৩৫॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥৩৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *সেই পরম আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কি হয়? শ্রীভগবান তাহাই বলিতেছেন। হে পাণ্ডব, (আমার দ্বারা উপদিষ্ট) এই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর মোহগ্রস্ত হইবে না। কারণ, একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভূতসমূহকে স্বীয় আত্মাতে (প্রত্যগাত্মাতে) এবং আমাতে (পরমেশ্বরের মধ্যে অর্থাৎ পরব্রহ্মে) দেখিতে পাইবে।*

আর যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপ করিয়া থাক, তাহা হইলেও এই জ্ঞানতরী তোমাকে ধর্মাধর্মরূপ এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই পরম মাহাত্ম্য।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ ভাল-মন্দ যাহা কিছু কাজ করে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যেই করিয়া থাকে এবং সেই পাপের সমস্ত চিহ্ন বা ছাপ চিত্ত নামক বুদ্ধির record book-এ লেখা থাকে। অনুকূল পরিস্থিতি হইলে প্রয়োজনমতো সেই ছাপ বা স্মৃতি (record) চিত্তের উপরিভাগে উঠিয়া আসে—ভাল কিংবা মন্দ। আত্মজ্ঞান হইলে মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে স্বীয় আত্মাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পায়। যেমন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দিয়াশলাই জ্বালাইলে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। তখন সকল record পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যায়।

[**মন্তব্য ঃ** অর্জুন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশস্বরূপ। আমরা জানি, তাঁহারা 'নর-নারায়ণ'। তাই অর্জুনের পাপকর্ম করার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ পাপ-প্রসঙ্গ আনিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিতেছেন। এই শ্লোকে অর্জুনের নিন্দা করা হয় নাই।—**সম্পাদক**] [ক্রমশ]॥উনিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**



জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
মে ১৯০৪

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা পরিচালিত নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার হইতে স্থির হইয়াছে, স্বামীজির জন্মোৎসব ও সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব একত্রে ১২ই জানুয়ারি তারিখে সম্পন্ন হইবে। এবারে ঐ ১২ই তারিখ মঙ্গলবারে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ মঙ্গলবারের অপরাহ্নে যে বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহা উৎসব উপলক্ষে বন্ধ রহিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়া ভক্তগণের দ্বারা আনীত পুষ্প, মাল্য, লতা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জীকৃত করা হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইলে স্তবাদি পাঠের পর ধ্যান হইতে লাগিল। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশক দুই-চারিটী উদ্দীপক বাক্য এবং স্বামী নির্ম্মলানন্দ স্বামীজির প্রিয় বৈদিক শ্লোকাংশসমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ছয় ঘটিকার সময় ধ্যান সমাপ্ত হইল—অনেকে কিন্তু বেদীর সমক্ষে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন।

আটটার সময় আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হইলে পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ ধ্যান হইল। পরে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্য সম্বন্ধে তেজোময়ী ভাষায় সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করিলে স্বামী নির্ম্মলানন্দ স্বামীজির জীবনচরিত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বামী নির্ম্মলানন্দের প্রবন্ধ শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি স্বামীজির ধর্ম্মপ্রচারকরূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বজীবনের অনেক অজ্ঞাত ঘটনা এবং ভারতে ধর্ম্মপ্রচার ও সাধারণ হিতোদ্দেশে যেসকল শুভকর অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইসকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সমিতির সভাপতি প্রোফেসার পার্কার বলিলেন—স্বামীজির সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইত, সেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার এই মোহিনীশক্তিই আমেরিকানগণের মনকে প্রথম বেদান্তের দিকে আকর্ষণ করে। তৎপরে স্বামীজির একজন পরম ভক্ত শিষ্য গুডইয়ার সাহেব বলেন, "স্বামীজিকে এখানে প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকল কষ্টই আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে আটটী করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। ইহা ব্যতীত একদিন প্রশ্নোত্তর দ্বারা শঙ্কাসমাধান ও একদিন সাধারণের জন্য বক্তৃতা দিতে হইত। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়েই তিনি তাঁহার প্রতি এবং বেদান্তের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমরা কয়েকজন যখন সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে স্বামীজির সহিত এক গৃহে বাস রূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার পবিত্র জীবনের শক্তিতে আমরা এতদূর উপকৃত হইয়াছিলাম যে, যাঁহারা যাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা কখন আর তাঁহার প্রাণপ্রদ প্রভাব ভুলিতে পারিবেন না।"

স্বামী অভেদানন্দ সর্ব্বশেষে বলিলেন, আমরা সকলেই জানি, স্বামী বিবেকানন্দ একজন শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু তিনি কাহার শক্তিতে এত শক্তিমান হইলেন? তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল শ্রদ্ধাবশতই তিনি মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও যদি সকলে তাঁহার অনুসরণ করিয়া যথার্থ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে আমরাও মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব। সর্ব্বশেষে স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক কবিতা পাঠের পর সভাভঙ্গ হয়।...

☆

স্বামী সারদানন্দ গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে শিবতলা রামকৃষ্ণ সমিতিতে 'ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম ও মুক্তির লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা দ্বারা আমাদের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। ইহা প্রবৃত্তিলক্ষণ। আমরা এক্ষণে ধর্ম্ম বলিতে সচরাচর মুক্তিই বুঝিয়া থাকি এবং আমরা মুক্তির অধিকারী কি অনধিকারী, তাহার বিচার না করিয়াই মুক্তি লইবার জন্য ছুটিয়া থাকি। আর মনে করি, মুক্তি লাভ করিতে হইলে শরীরকে কৃশ করিতে হইবে, মনকে দুর্ব্বল করিতে হইবে, বিচারশক্তিকে পদদলিত করিতে হইবে, এককথায়, মনুষ্যত্বকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রপাঠে দেখিতে পাই, যাঁহারা ধার্ম্মিক বা মুমুক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা দৈহিক, মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" মহাভারতপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন ভীষ্মাদির অপূর্ব্ব বীরত্ব ও মানসিক বলের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, এই সকল মহাপুরুষকে আমাদের জীবনের আদর্শ করিতে হইবে। যাহা কিছু দুর্ব্বল করে ও যাহা কিছু আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করে, তাহাই অধর্ম্ম—যাহা কিছু আমাদিগকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবলতাসম্পন্ন করে, তাহাই ধর্ম্ম।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষণ

অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর যে আরো একজন যুক্ত হলেন তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মানে একটি ভাবমূর্তি—যিনি স্থূলদেহে আমাদের মধ্যে মানুষের মতো বিচরণ করেছেন, যাতে তাঁর সান্নিধ্যে এসে মানুষ নিজেদের জীবনকে আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহের অবসানের পর তাঁর ভক্তরা তখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, সেইসময় একজন ভক্ত গুরুভাইদের বলছেন, একটা জায়গা আমাদের থাকা দরকার—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে যাঁরা অনুপ্রাণিত তাঁরা এসে শান্তি পান। তাঁর ভাষায় বলেছিলেন—একটি 'জুড়োবার জায়গা'। অর্থাৎ সংসারের দাবদগ্ধ মানুষের একটি জুড়োবার জায়গা যেন হয়। সেই কথা আজও সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, আশ্রম—এগুলি যেন 'জুড়োবার জায়গা'। এখানে এসে সকলে যেন শান্তি পায়, সেই পরিবেশ সকলকে যেন আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রেরণা যোগায় এবং অনুকূল পরিবেশে তাদের জীবন আধ্যাত্মিক সম্পদে যেন আরো সমৃদ্ধ হতে পারে—এটি বিচার্য বিষয়। আর সকলের যদি এইরকম সমবেত প্রার্থনা থাকে, তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সেই প্রার্থনা শুনবেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত এমন একটি স্থান তাঁর কৃপায় গড়ে উঠবে। এটি বিশেষ করে সকলকে মনে রাখতে হবে—অর্থ থাকলেই সুন্দর সুবিশাল মন্দির করা যায়, কিন্তু সে-মন্দির আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ হওয়াই হলো প্রধান কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সকলে বলে রাসমণির মন্দির। কেউ বলে না যে, ভগবানের ইচ্ছায় এই মন্দিরটি হয়েছে। দিল্লিতে যে বিশাল কারুকার্যমণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আছে, লোকে তাকে বলে 'বিড়লা মন্দির'। লক্ষ্মীনারায়ণের নাম পর্যন্ত করে না। ঠাকুরের মন্দির যেন সেরকম না হয়। সেখানে গেলে মনে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে এখানে বিরাজ করছেন। তাঁর স্থূলদেহে থাকাকালীন ভক্তেরা যেমন তাঁর সান্নিধ্য পেতেন, মন্দিরেও যেন তাই পান এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন যেন এইভাবে পরিপুষ্ট হয়—এটি সকলকে মনে রাখতে হবে।



শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছিলাম যে, তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর তিনি আরো একজন নন। অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁদের কয়েকটি সাধারণ কাজ এবং কিছু অসাধারণ কাজ থাকে। সাধারণ কাজ এই যে, তাঁরা এসে মৃতপ্রায় ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ধর্মের শক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, ধর্মের গ্লানি হয়—গীতায় যেমন বলা হয়েছে, তখনি ভগবান আবির্ভূত হন।

''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥'' (৪।৭)

তাঁর আবির্ভাবের ফলে ধর্ম নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়, পুনঃস্থাপিত হয়। এইজন্য তাঁদের বলা হয় ধর্মের স্থাপক। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্রে বলেছেন, তিনি ধর্মের স্থাপক—''ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।''

প্রত্যেক অবতারই ধর্মের স্থাপক। এটি তাঁদের একটি সাধারণ কার্য। কিন্তু তাছাড়াও তাঁদের আবির্ভাবে সমাজের তৎকালীন সকল সমস্যার সমাধান হয়। ধর্মের দুটি ভাব আছে। একটি চিরন্তন, আরেকটি দেশ-কালে সীমিত। চিরন্তন ভাবটি হলো ধর্মের প্রতিষ্ঠা। আর বিশেষ ভাবটি হলো—সেই কালের যা প্রয়োজন তাকে সিদ্ধ করার জন্য তাঁদের জীবন ও শিক্ষার ভিতর দিয়ে একটি নতুন ধারাকে প্রবাহিত করা। সেই ধারা একদিকে সমকালের সমস্যার সমাধান করবে এবং অন্যদিকে ভাবিকালের জন্য একটি পথ সৃষ্টি করে যাবে, যে-পথ অনুসরণ করে আবার পরবর্তী কালের মানুষেরা চলতে পারে।

অবতারগণের এই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একটি সাধারণ, আরেকটি অসাধারণ

কার্য। অসাধারণ কার্যের দিকে লক্ষ্য করেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তির কথা বলছি। কেউ তাঁকে অবতার বললে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হতেন। বলতেনঃ "কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বললেন। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে! কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি?... অবতার বলা তুচ্ছজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরা অবতার বলে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল?" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', গুরুভাব উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়) নিজেকে তিনি অবতার বলে প্রচার করতে চাইতেন না। তাঁর যে-ভাব ও আদর্শ সেটা তাঁর নিজের বলে তিনি প্রচার করছেন না, বরং তিনি বলছেন, তাঁকে যন্ত্র করে জগন্মাতা সে-আদর্শ প্রচার করছেন। সে-আদর্শ থেকে লোকে জীবনে নতুন প্রেরণা, নতুন পথের আলো দেখতে পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা জনে নানা ভাবে ভেবেছেন। কেউ বলেন তিনি সাধক, কেউ বলেন সিদ্ধপুরুষ, কেউ বলেন মহাপুরুষ, পরমহংস। এইসব বিশেষণ দিয়ে তাঁর পরিচয় হয় না। অবতার যখন আসেন তখন এমন ছদ্মবেশে আসেন যে, তাঁকে ধরা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অবতার এলে তাঁকে কেউ চিনতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রকে মাত্র বারোজন ঋষি চিনেছিলেন; বাকি সবাই জানতেন, তিনি দশরথের পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে না বলে ইঙ্গিতে বলেছেনঃ "অচীনে গাছ শুনেছ?... সে একরকম গাছ আছে—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।" (কথামৃত, ৩।৫।২) অচিনে গাছের সবই গাছের মতো—ডালপালা, ফল, ফুল, কিন্তু সেই গাছকে কেউ চেনে না। তাই নাম দেয় 'অচিনে গাছ'। সেই অচিনে গাছ তিনি স্বয়ং। অবতারকে কেউ চিনতে পারে না; দৈবাৎ এক-আধজন হয়তো কিছু অনুমান করতে পারে, কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁকে বোঝে না। অবতারই অবতারকে বুঝতে পারেন। গীতায় অর্জুন যেমন বলছেনঃ "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।" (১০।১৫)—হে পুরুষোত্তম, আপনার স্বরূপ আপনিই জানেন, অপরে জানে না। তবে সেই অজানা, অচিন পুরুষের স্মৃতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে জগৎ চলে। নতুন পথের সন্ধান পেয়ে তাদের জীবনকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করতে পারে। যখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবব, তখন এই কথাগুলি মনে করব। তাঁকে যাঁরা আদর্শ বলে মনে করেন, তাঁদের এই সম্বন্ধে একটু ভাববার থাকে।

তিনি কিসের আদর্শ দেখাচ্ছেন? প্রথম কথা, তিনি এমন একটি আদর্শ যা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এর ভিতরে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই, গোঁড়ামি নেই। কোন নতুন একটি দেবতা বা মতবাদকে খাড়া করার চেষ্টা নেই। চেষ্টা কেবল নিজের জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র, ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করা, রূপান্তরিত করা। সেই ভাবটি আবার কত বিশাল, কত সমৃদ্ধ—যারা তাঁর চিন্তা করবে, গবেষণা করবে তারা একথা বুঝতে পারবে। তবে তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, এককথায় তিনি 'অচিনে গাছ'। অবতারেরা প্রত্যেকেই আক্ষেপ করে বলেছেনঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

(গীতা, ৯।১১)

—অবিবেকিগণ সর্বভূতের মহেশ্বর-স্বরূপ আমার পরম তত্ত্ব না জেনে মানবদেহধারী বলে আমাকে অবজ্ঞা করে।

যদি ভগবান অবতার-রূপ ছদ্মবেশে না এসে স্ব-স্বরূপে সাক্ষাৎ আমাদের সামনে এসে আবির্ভূত হন, তাহলেও আমাদের সাধ্য কি যে তাঁকে বুঝি? ঐ গীতাতেই রয়েছে, ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ, নিজের স্বরূপ দেখাচ্ছেন; অর্জুন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে গেছেন। বলছেনঃ

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥"

(১১।১২)

—আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের উদয় হয়, তাহলে সে-দীপ্তি মহান বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হতে পারে।

অর্থাৎ তিনি অতুলনীয়, তাঁর উপমা হয় না। এইজন্য তাঁকে বোঝানো যায় না। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যতদূর বুঝতে পারে, তিনি তারও বাইরে। তাই আমাদের অন্তরে যতটুকু অবকাশ আছে, স্থান আছে, আধার যতটুকু—ততটুকু দিয়েই তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু বোঝা যায় না। তিনি ছাড়া তাঁকে আর কেউ জানে না। সকলে তাঁকে মানুষের মতো দেখে।

এই দেখার প্রয়োজনও আছে। তা নাহলে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বর তো আছেনই, কিন্তু আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, বাক্য-মনের অতীত। কাজেই তাঁকে জানার সামর্থ্য কোথায়? তাই ভগবান নিজেকে আচ্ছাদিত করে, জ্যোতিকে সংবৃত করে মানুষের মতো প্রকটিত হন, যাতে আমরা তাঁর একটু সান্নিধ্যলাভ করতে পারি। হাজার সূর্যের জ্যোতি আমরা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু যদি তিনি সেই জ্যোতিকে আবৃত করে আমাদেরই মতো হাত-পাবিশিষ্ট একটি মানুষ হয়ে আসেন, তাহলে কতকটা তাঁকে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, কিন্তু ধারণা করতে পারি না যে, সাড়ে তিন হাত মানুষের ভিতরে অনন্ত কি করে সীমিত হয়ে রয়েছেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভাগবত'-এ দেবকী বলছেন ঃ

"বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং
পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য
বিড়ম্বনং হি তৎ॥" (১০।৩।৩১)

—প্রলয়ের পর স্রষ্টা প্রত্যেক বস্তুর দূরত্ব বজায় রেখে সমগ্র জগৎকে তাঁর দেহের মধ্যে ধারণ করেন। সেই তিনি আমার গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন! নরলোকের এ কী বিড়ম্বনা!

জগৎটা কত বড়, তা-ই আমরা ধারণা করতে পারি না! বিজ্ঞানীরা আগে ভাবতেন, নীহারিকাই জগতের শেষ সীমা। এখন দেখছেন তা নয়। তারও পরে, তারও পরে আছে। সীমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তাই তা অনন্ত। দেবকী তাই বলছেন, সেই ভগবান যিনি অনন্ত, তিনি আবার 'মম গর্ভগোঽভূদ'—আমার গর্ভে সন্তানরূপে জন্মালেন! 'অহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ'—নরলোকের এ কী বিড়ম্বনা! এতটুকু একটি শিশুরূপে ভগবান আসতে পারেন—এ কল্পনার অতীত! আর এভাবে না এলে তাঁর অবতারত্ব গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকত না। কারণ, তাঁর জ্যোতিতে, তাঁর প্রভাবে আমরা ঝলসে যেতাম—তাঁকে ধারণা করতে পারতাম না। তাই তিনি মানুষরূপে আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দেহের যত কিছু সুখ-দুঃখ বরণ করে, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিকে স্বীকার করে নিয়ে অবতার সকলের সামনে নিজেকে তুলে ধরেন। কাজেই লোকে কী করে ধারণা করবে যে, তিনি ভগবান! সর্বসীমার অতীতে যিনি, তিনি এইরকম সাধারণ মানুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ তো কল্পনাতীত! কিন্তু সেটাই বাস্তব। সেই কল্পনাতীত ভগবানই নিজে এসে ধরা দেন। আর তা না দিলে তাঁকে ধরার সামর্থ্য কারো নেই; কেননা তিনি অসীম সমুদ্র, আর আমাদের পাত্র এক ছটাক, তার বেশি তাতে ধরে না। তাই সমুদ্র যেমন অসীম, তেমনই পড়ে থাকে। আমাদের এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু ধারণা করা যায় বা বোঝা যায়, ততটুকুই বুঝব। তার বেশি সামর্থ্য নেই বলে ভগবান নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে আমাদের মতো করে আবির্ভূত হন, যাতে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি। তখন মানুষরূপে দেখে ভগবানকে বুঝি।

এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র অনুধ্যান করি। তাঁর জীবন, চরিত্র সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'-এ। তাঁর অন্যতম পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে মানুষরূপে চিত্রিত করেছেন তা অসাধারণ। আর কোন জীবনে এরকম চিত্র আমরা পাই না। তাঁদের কেবল ঈশ্বররূপে পাই। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষের সবরকম ব্যবহারই দেখতে পাই। সংসারের সকলের প্রতি কর্তব্য পালন করা, আবার সংসার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর মতো উদাসীনতা একইসঙ্গে দেখি। তিনি যেমন গৃহস্থের আদর্শ, তেমনি সন্ন্যাসীরও। সর্ব আদর্শের এরকম পরিপূর্ণ সমাবেশ জগতে বিরল। এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ভগবানের তত্ত্ব জানার জন্য মানুষ জন্মের পর জন্ম কঠোর তপস্যা করে। তাঁর একটু-আধটু আভাস পেলে সে বিভোর হয়ে যায়। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন আর বলছেন ঃ "মা আমাকে বেহুঁশ করিসনি। আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলব।" সমাধির আনন্দকে পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করছেন। কেন? না, ভক্তদের সেই তত্ত্ব আস্বাদ করানোর জন্য। তিনি একটি গল্প বলছেন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় খুব আনন্দ-কোলাহল হচ্ছে। বাইরে দিয়ে তিন বন্ধু যাচ্ছে। একজন বলে ঃ "কি হচ্ছে দেখি।" পাঁচিলে উঠে সেই আনন্দ দেখে সে লাফিয়ে পড়ল, আরেকজনও দেখে লাফ দিল। আরেকজন পাঁচিলে উঠে দেখে বিভোর হয়ে গেল। সে লাফ দিল না। ফিরে এসে সকলকে বলল, এখানে কত আনন্দ! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারেরা তৃতীয় ব্যক্তির মতো সংসারের সারবস্তুরূপ ভগবৎ আনন্দকে সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্য আসেন এবং তার জন্য নিজের দেহকে যত্ন করে রাখেন। তাঁর ভাব পরিবেশনে যাতে কোন হানি না হয় সেজন্য তিনি তাঁর দেহেরও যত্ন নিতেন অথচ যখন সমাধিতে মগ্ন থাকতেন তখন একেবারে মৃতের মতো। অতদূর ঈশ্বরাভিমুখী যে-মন, সেখানে মানবভাব একটা স্বচ্ছ আবরণমাত্র। সেই মানবভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিমানব তিনি সকলকে ভগবৎ রস আস্বাদন করাচ্ছেন।

তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথনে। তা হলো—সমাধি চরম আনন্দ আস্বাদনের উপায় বটে, কিন্তু সেখানেই তার পরিসমাপ্তি যেন না হয়। স্বামীজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "আচ্ছা, তুই কি চাস বল?" স্বামীজী উত্তরে বলছেন ঃ "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয়দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বললেন ঃ "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক

আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৫১) শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি লক্ষণীয়। তিনি স্বামীজীকে তাঁর যন্ত্র করেছেন বলেই তাঁকে বলছেন—সমাধিও তুচ্ছ, তুমি জগৎকে এই আনন্দ বিতরণ করার জন্য এসেছ, কাজেই সেই যন্ত্ররূপে তোমাকে কাজ করতে হবে। স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধি দেওয়ার পর তিনি বললেন ঃ "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" (ঐ, পৃঃ ১৫২) তাঁর 'কাজ' কি? জগৎকে পথ দেখানো, আলো দেখানো তাঁর কাজ। তাঁর যেন একটি পরিকল্পনা করা আছে। তাঁর জীবনীতে সেগুলি সুন্দরভাবে দেখানো আছে। যে-শ্রীরামকৃষ্ণের পরনের কাপড়ের হুঁশ থাকত না, সেই তিনি কিরকম সুষ্ঠুভাবে একটি ধর্মপ্রচারের যন্ত্র তৈরি করলেন! সেই যন্ত্রটিকে গড়ার জন্য তাঁর কত আয়োজন!

প্রথম কথা, সেই সময়ের যত খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের কাছে গিয়ে স্বয়ং আলাপ করেছেন, তাঁদের ভিতরে ভগবদ্ ভাব যাতে প্রবিষ্ট হয় তার চেষ্টা করেছেন। বলেওছেন—অমুক ব্যক্তির কাছে যেতে হবে, যাতে তার ভিতরে কিছু ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও তিনি বাদ দেননি, ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। তারপর নতুন যুবসম্প্রদায়কে পেলেন, তাঁদের তিনি মনের মতো করে গড়েছেন যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁর ভাবধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রাখতে পারেন। এইরকম সুষ্ঠু পরিকল্পনা আগে কোথাও পাই না। প্রাচীন অবতারেরা কেউ কেউ চেয়েছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব যখন বলছেন ঃ ভগবান তুমি লীলা সংবরণ করবে বুঝতে পারছি, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। "উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি" (ভাগবত, ১১।৬।৪৬)—আমরা তোমার উপভুক্ত বস্তুভোগী দাস, তোমার প্রসাদ ভক্ষণে মায়াকে জয় করব। আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, আমাকে ফেলে যেও না। তখন ভগবান বললেন ঃ তা হবে না উদ্ধব। তুমি এই ভাব প্রচার করবে বলে তোমাকে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু এর চেয়ে বেশি পরিকল্পনা সেখানেও আমরা পাই না। অন্যান্য অবতারে তো তারও অভাব।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দেখছি, একটি সঙ্ঘকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তৈরি করলেন। শিক্ষা দিলেন তার নেতাকে, বিশেষভাবে এই সঙ্ঘ পরিচালনা করার শক্তি দিলেন। কেন করলেন? না, তাঁর ভাবধারা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। শ্রীশ্রীমা সেই ভাবধারাতে আরো বেগসঞ্চার করলেন, যাতে তা অব্যাহত থাকে। তারপর ঠাকুরের সন্তানেরা সকলে তাতে সহযোগিতা করলেন। এটি কেবল সঙ্ঘের ভিতর দিয়েই চলবে, তা নয়। তিনি অত সঙ্কীর্ণ অনুদার নন। তিনি জানেন, সর্বত্র এই ভাব প্রচারিত হবে—স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন বলা হয়েছে ঃ "পৃথিবীতে না রহিবে নগর ও গ্রাম/ যেথা না প্রচার হইবে হরিনাম।" সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যে প্রসারিত হবে, তার পূর্বাভাস এখনি দেখছি। আশা করি এই ভাব দিনে দিনে পরিস্ফুট হবে, মানুষ আরো স্পষ্টভাবে তাঁর আদর্শ বুঝতে পারবে।

অবতার যখন আসেন, তখন তাঁর কাজের সূত্রপাত মাত্র হয়। যত দিন যায় ততই তাঁর ভাব বেগবান হয়, আরো প্রসারিত হয় এবং কালে তা সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে যে, পূর্ব পূর্ব অবতারের জীবনে এমনটি দেখা যায়নি। আজ বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নরনারী—যারা তাঁর ভাবকে গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং যাদের হৃদয়ে তা ধারণা করার শক্তি আছে, তারা সকলেই এই ভাব গ্রহণ করছে। যাঁরা বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী—তাঁরাও এর তাৎপর্য দেখে অভিভূত হয়ে যাচ্ছেন। ইদানীংকালে অনেকে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন 'চলতি চাকতি'—Current coin, এখন তাঁর ভাব সকলকে নিতে হবে। তিনিও বলেছেন ঃ "যার শেষজন্ম তাকে এখানে আসতে হবে।" এটা গোঁড়ামির কথা নয়। ব্যক্তিমানুষের কথা তিনি কখনো বলেননি, বলেছেন—এর ভিতরে সেই মা ছাড়া আর কিছু নেই। 'মা' মানে কি? যিনি বিশ্বসংসার পরিচালনা করছেন, ধরিত্রীকে ধারণ করে রেখেছেন—তিনিই মা। বলছেন, এই খোলটার ভিতরে তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, কারণ নিজেকে তিনি জগন্মাতার একটি যন্ত্ররূপে জানতেন।

এই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা এখনি বুঝতে পারব না, কিন্তু ক্রমশ তাঁর ভাবকে ধারণা করার সামর্থ্য যাতে বাড়ে সেইজন্য তাঁর চরণে প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের ভিতরে সেই শক্তি দেন, যাতে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি এবং তার ফলে আমরা প্রত্যেকে যেন এক-একটি যন্ত্র হয়ে উঠি—যার ভিতর দিয়ে তাঁর ভাব বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত হবে।* ❑

---

* অসমের তেজপুর আশ্রমে প্রদত্ত দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি। স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ভাষণের তারিখ জানা যায়নি।

বন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা

স্বামী গণনাথানন্দ



শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যাশ্চর্য ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মের ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন এবং অতি বিস্ময়কর ঘটনা। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "আমাকে তোমার কী মনে হয়?" উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেনঃ "যে-মা (কালী) মন্দিরে আছেন, তিনি এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" এ শুধু কথার কথা নয়, অবতীর্ণ ভগবানের শাশ্বত সত্যের অনুভূতি। শ্রীশ্রীমায়ের প্রশস্তি করে ঠাকুর বলেছিলেনঃ "ও সারদা-সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে, মহাবুদ্ধিমতী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসীপ্রতিমা শ্রীমা সারদাদেবী এযুগের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। মায়ার অন্তরালে তাঁর মধ্যে যে এক মহা আবির্ভাব হয়েছিল, সেই শুভ সংবাদের ইঙ্গিত ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন। তিনি অবতারসঙ্গিনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে অবতীর্ণা। তাঁকে দেখতে একজন অতি সাধারণ মানবীর মতো, লজ্জাশীলা, অবগুণ্ঠনাবৃতা। অতি সাধারণ হয়েও অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। ঈশ-মাতৃত্বের মহিমামণ্ডিত শান্ত, সুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল মায়ের জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ঠাকুর রহস্য করে বলেছিলেন—যেন 'ছাইচাপা বেড়াল'; বোঝা কঠিন, ধরা না দিলে কি ধরা যায়? মায়ার আবরণে তিনি ঢেকে রাখতেন তাঁর স্বরূপ। রসিক ঠাকুর বৈষ্ণব দোঁহা উল্লেখ করে বলতেনঃ "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়, কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।" মা নিজে বলতেনঃ "আমি 'মা' ও 'মায়া' দুই-ই।" কখনো কখনো তিনি ধরা দিয়েছেন এবং ধরা পড়েছেন উপায়ান্তর না দেখে ও নিজের অজান্তে।

একটি ঘটনায় মায়ের স্বরূপসত্যটি চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর মা একবার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছিলেন, সঙ্গে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবুদাদা। জয়রামবাটীর প্রায় কাছে এসে মাঠের মধ্যে শিবুদাদা হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মা পিছন ফিরে দেখেন, শিবুদাদা দাঁড়িয়ে আছেন। মা বললেনঃ "ওকিরে শিবু, এগিয়ে আয়।" শিবুদাদা বললেনঃ "একটি কথা বলতে পার তাহলে আসতে পারি।" মাঃ "কি কথা?" শিবুদাদাঃ "তুমি কে বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।" মাঃ "আমি কে? আমি তোর খুড়ি।" শিবুদাদাঃ "তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।" এদিকে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মা উদ্বিগ্না হয়ে বললেনঃ "দেখ দেখি, আমি আবার কেরে? আমি মানুষ, তোর খুড়ি।" শিবুদাদা জেদ ভরে উত্তর দিলেনঃ "বেশ তো, তুমি যাও না।" চলল মায়ের ছেলেভোলানো কথা ও ছলনা। অভিনয়ের দৃশ্যপট অনন্ত আকাশের নিচে খোলা মাঠের মাঝে। শিবুদাদা ছাড়বার পাত্র নন (মনে মনে হয়তো ভাবছেন—এবার কোথায় লুকাবি শ্যামা)। শিবুদাদাকে না যেতে দেখে অবশেষে মাকে মুখ ফুটে বলতেই হলোঃ "লোকে বলে কালী।" শিবুদাদাঃ "কালী তো, ঠিক।" মাঃ "হ্যাঁ।" শিবুদাদা খুশিঃ "তবে চল।" মা স্বীয় আত্মপ্রকাশের মাঝে একটু মায়ার আবরণ রেখে দিলেন—'লোকে বলে'। এই আত্মপ্রকাশটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চিরভাস্বর। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে ঠাকুরের একই স্বীকৃতি আমরা এর আগে দেখেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাদৃতা শ্রীমা সারদাদেবী এক ঈশ-শক্তিসমৃদ্ধ মৌলিক অভিব্যক্তি। ঠাকুর এই সারদাপ্রতিমায় দেবী ষোড়শীর পূজা করে তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার ফল, জপমালা মায়ের চরণে সমর্পণ করেছিলেন। ষোড়শীপূজার মহানিশায় দেবী শ্রীশ্রীমা ও পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সমাধিস্থ। শ্রীশ্রীমায়ের অনুভূতিতে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—"যেই ঠাকুর, সেই আমি।" অগ্নি ও তাঁর দাহিকাশক্তির মতো তাঁরা পরস্পর অভিন্ন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ষোড়শীপূজার মাধ্যমে ঠাকুর তাঁর দেবীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যে মা কালী একরূপে মন্দিরে পূজা গ্রহণ করেছিলেন, অন্যরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ত্রিপুরাসুন্দরী ষোড়শীরূপে পূজিতা হয়েছিলেন। ধর্মের ইতিহাসে এটি অদ্বিতীয় ও চিরনতুন।

শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর দেবীত্বকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতেন আপন ভাবটি বজায় রাখার জন্য। কখনো কখনো তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে ভক্তের মনোবাসনা পূরণের জন্য। ভগবান-ভগবতী যখন ধূলির ধরায় অবতীর্ণ হন, তখন তাঁরা তাঁদের দেবভাবকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখেন; কারণ দেবত্ব বা দৈবীশক্তির বেশি প্রকাশ হলে ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মানুষ তাঁদের অত্যাশ্চর্য ঐশীশক্তির প্রকাশ দেখে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলবে, কিন্তু আপন করে নিতে দ্বিধা করবে। মায়ের দেবীত্বের প্রকাশ কদাচিৎ বিদ্যুৎচমকের মতো হতো। "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" শ্রুতিও বলেন ঃ "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" (কঠ উপনিষদ্)—তিনি যাকে বরণ করেন (কৃপা করেন), তাঁর কাছেই তিনি লভ্য হন। শ্রীশ্রীমায়ের কালী রূপটি সদা যোগমায়ার আবরণে সমাবৃতা। শিবুদাদা মহাভাগ্যবান, তাঁর কালো রূপটি না দেখেও তাঁকে ধরতে পেরেছিলেন তাঁরই কৃপায়।

শ্রীমা সারদাদেবী কালীরূপিণী, আবার জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীও। জ্ঞান ও পূর্ণতা তাঁর স্ব-স্বভাব। তিনি স্বকীয় মহিমায় মণ্ডিতা। কর্মে ও কথায় কোন ছন্দপতন নেই। মানুষের জীবনে চলার পথে কতভাবে তিনি জ্ঞানের আলো দান করেছেন, তার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট এখনো তৈরি হয়নি। তিনি 'মা', আবার 'গুরু'। 'সার' দেন (অর্থাৎ জ্ঞান দান করেন), তাই 'সারদা'। কবির মননালোকে সারদা-সরস্বতীর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে গানের কলিতে—

"সার দেবে বলে এসেছে সারদা অসার এ-সংসারে।
সতের তিনি, অসতেরও তিনি মাতা গুরু একাধারে।।"

এ-সংসার অনিত্য ও দুঃখময়। "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (গীতা, ৯।৩৩) এই মায়ার সংসারে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ও থাকবে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী? উপায় হলো তাঁর শরণাগত হওয়া। শরণাগত ভক্তের বিনাশ নেই। অনিত্য সংসারের 'সং' দেখে-চেখে 'সার'টুকু উঠিয়ে নিতে হবে। মায়ার সংসারে না থেকে মায়ের সংসারে থাকতে হবে অর্থাৎ মাকে নিয়ে সংসার করতে হবে, তাহলে আর জ্বলেপুড়ে মরতে হবে না এবং সংসার হয়ে উঠবে 'মজার কুঠি'। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে না কেঁদে কিভাবে হাসতে হয় ঠাকুর ও মা তাঁদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, আজও তা সমভাবে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। মায়ের নিজের উক্তি ঃ "সবসময় জানবে তোমার একজন মা আছেন—সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ না এলে শ্রীমা সারদাদেবীকে আমরা আপন আলয়ে আপন মায়ের মতো পেতাম কিনা কে বলতে পারে? গদাধরের বিবাহের জন্য মা চন্দ্রমণিদেবী ও দাদা রামেশ্বর যখন নাজেহাল হয়ে গেলেন, তখন গদাধর নিজেই জানিয়ে দিলেন জয়রামবাটীতে তাঁর পত্নী 'কুটোবাঁধা' আছেন। এ-সংবাদ জেনে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। ভগবানই ভগবতীকে চিনতে পারেন। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী? শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে দেখলে চিনতে পারবেন না বা সীতা শ্রীরামকে দেখলে চিনতে পারবেন না—এ হয় নাকি? কারণ, যুগ-যুগান্তরের শাশ্বত সম্বন্ধে তাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, লীলায় দ্বিধাবিভক্ত হন। ব্রহ্ম ও শক্তিরই যুগ্ম আবির্ভাব এযুগে রামকৃষ্ণ-সারদারূপে। মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। শ্রীরামকৃষ্ণ না এলে মাকে যেমন জানতে এবং চিনতে পারতাম না, তেমনি মা না এলে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্যে জানতে পারত কিনা কে বলতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণকে তত্ত্বত বোঝার জন্য স্বামীজীর যেমন প্রয়োজন, মায়েরও প্রয়োজন ততোধিক। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যকে অবলোকন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু তিনি যখন শ্রীসারদা-চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তাঁকে দেখা ও বোঝা সহজ হয়। তাঁর প্রকাশ হয় শান্ত, স্নিগ্ধ, চোখ ঝলসে যায় না। স্বামীজী ঠাকুরকে 'বাক্য-মনের অতীত' বলে স্তব করেছেন। শুধু তাই নয়, অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের জন্য চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

শ্রীমা সারদাদেবীর সমগ্র জীবন ঠাকুরের ভাবে বিভাসিত এবং অনুরঞ্জিত। তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ ঠাকুরেরই অনুশাসন ও উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাঘন ভাবটি 'সারদা-গঙ্গা'রূপে সহস্রধারায় প্রবাহিত জগৎ-তারণ-কারণরূপে। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা বলেছিলেন ঃ "ইচ্ছে হলো আমিও যাই। তিনি (ঠাকুর) দেখা দিয়ে বললেন—'না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকি আছে।' " কাশীপুরে একদিন ভাবের ঘোরে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন ঃ "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো।" মা বললেন ঃ "আমি মেয়েমানুষ, তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে আপন ভাবে বলে যেতে লাগলেন ঃ "এ (নিজেকে দেখিয়ে) আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ "পৃথিবীর সকলের প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব, কিন্তু তাঁর পুরুষ-শরীরে সেই ভাবের বাঞ্ছিত বিকাশ সম্ভব ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সমতুল শক্তিসম্পন্ন আরেকটি বিগ্রহের। সেই বিগ্রহ সারদাদেবী।" ঠাকুর জগতের সকলের জন্য দেবী-মানবী শ্রীমা সারদাদেবীকে রেখে গেলেন মানুষকে সংসার থেকে মুক্ত করার জন্য। যাঁর ভুবনমোহিনী মায়ায় জীব বদ্ধ হয়,

জীবকে মায়ামুক্ত করার দায়িত্ব তাঁতেই ন্যস্ত করলেন। যুগসহায়িকা শ্রীমা সারদাদেবী যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর স্বচ্ছ, সর্বপ্লাবী মাতৃত্ব দিয়ে। মা সন্তানের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে তাকে দিয়েছেন শান্তি ও সান্ত্বনা। এসবই তিনি করেছেন প্রেমের দায়ে—প্রাণের দায়ে নয়। মা 'নিখিল মাতৃহৃদয়সাগর মন্থনসুধামুরতি' কিনা!

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে করুণা ও দয়ার সাগরসঙ্গম হয়েছিল অতি স্বাভাবিকভাবে। তাঁর কাছে কোন বাছবিচার ছিল না, সকলকেই তিনি স্থান দিয়েছেন। শরৎ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ যেমন তাঁর ছেলে, তেমনি মুসলমান আমজাদও তাঁর ছেলে। রাধু ও মাকু—এই দুজনকে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন। সর্বংসহা করুণাময়ী মা স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দিয়ে তাদের আপন করে রেখেছিলেন। এর তুলনা নেই। তিরস্কার বা চোখ রাঙিয়ে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেননি। সহ্য ও ধৈর্যের অপূর্ব চিত্র! সংসারে এমন চরিত্রের মানুষ আছে ও থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে সংসারে কিভাবে চলতে হয়, মা নিজ জীবনে তা দেখিয়ে গেলেন। এটি মায়ের অভূতপূর্ব 'art of management' এবং ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত অনুসরণ। 'জগতের কেউ পর নয়'—এই বেদান্তসত্যটি মা ঘরোয়া ভাষায় বলেছিলেন ঃ "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" মায়ের এই শেষবাণীটি নিত্য মনন ও অনুধ্যান করলে জীবনের অনেক সমস্যা মিটে যাবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক থেকেই। ঠাকুর বলেছিলেন, আমার মা-ই সব হয়ে রয়েছে। সর্বত্র ছিল তাঁর ব্রহ্মদৃষ্টি ও মাতৃভাব। কালীর সচল বিগ্রহ শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে মাতৃভাবের প্রকাশ শৈশব থেকেই পরিলক্ষিত হয়। উত্তরকালে তিনি জগতে মানবজননী, ভক্তজননী, সঙ্ঘজননী এবং জগজ্জননী-রূপে সমাদৃতা ও পূজিতা।

এই চরাচর জগৎ মহামায়ার সৃষ্টি। জ্ঞানী ভক্তের দৃষ্টিতে সংসার মায়াময়। সেখানে মা-ই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। আবার তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৬) মায়ার সংসারে অজ্ঞান-অন্ধকারে যারা পোকার মতো কিলবিল করছে, তাদের জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করার দায়িত্ব ঠাকুর মায়ের ওপর দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "এ (নিজেকে দেখিয়ে) আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" মা ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেছিলেন সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। আজও তাঁর করুণা জগতে বিভাসিত হয়ে রয়েছে 'সদাদীপ্ত অক্ষয় জ্যোতি'রূপে। শ্রীসারদাদেবী চিরকালের জন্য সবার মা হয়ে রইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিতা মা, আনন্দময়ী আজ সত্যি সত্যি ঘরে ঘরে পূজিতা। বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিভূ শ্রীসারদাবিগ্রহে প্রথম পূজাটি করেছিলেন অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এই পূজার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর দেবীত্বকে ও ঈশ-শক্তিকে। এই হলো ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রকাশ।

জীবনসায়াহ্নে মা বলেছিলেন ঃ "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।" মায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য রইল তাঁর জগৎজোড়া অসংখ্য সন্তানের মঙ্গলকামনায়। মা নিজে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।" "আমি মা—জগতের মা, সকলের মা।" ❑

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা
৩ শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা—স্বামী বুধানন্দ
৪ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ
৫ আমি মা, সকলের মা—স্বামী প্রভানন্দ
৬ চিরন্তনী সারদা—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ

পাশাপাশি ঃ (১) সপ্তলোক, (৫) যম, (৬) বলরাম, (৭) শরভ, (৯) নাগমাতা, (১১) কাশ্যপ, (১২) তপন, (১৫) মন্দর, (১৮) মলয়, (১৯) সত্যবান, (২১) শমন, (২৩) সদাশিব, (২৫) ইল, (২৬) রামচন্দ্র।

ওপর-নিচ ঃ (১) সম, (২) কর্পূর, (৩) লব, (৪) কমলাপতি, (৫) যমুনা, (৭) শতানন্দ, (৮) ভরত, (১০) গঙ্গা, (১১) কান, (১৩) পদ্মাসন, (১৪) কমলাসনা, (১৫) ময়, (১৬) রমেশ, (১৭) শিবা, (২০) নকুল, (২২) মন্থরা, (২৪) বসু, (২৫) ইন্দ্র।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল

|প্র|ত্ন|ত|ত্ত্ব|

বুদ্ধের নির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে

তুষারকান্তি ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]



হিউয়েন সাঙের পরিক্রমার পথ অনুসরণ করে কানিংহামের দল গবেষণা শুরু করলেন অযোধ্যা থেকে। অযোধ্যা সরযূর তীরে। এই নগরীর প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানে কোন পরিবর্তন নেই। অযোধ্যার ৫০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৮৩ মাইল উত্তরে শ্রাবস্তী। এই সেই শ্রাবস্তী, যেখানে অনাথপিণ্ডদ নামে এক ধনী ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জন্য জেতবন কিনে দিয়েছিলেন। অযোধ্যার উত্তরে ৮৩ মাইল দূরে এসে এই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের দল দেখতে পেলেন এক নগরের ধ্বংসাবশেষ। অতীত ইতিহাসের এই স্থান এখন 'সাহেত মাহেত' নামে পরিচিত। বেশ বড় গ্রাম। এখানে পাওয়া গেল ধ্বংসপ্রাপ্ত এক বিশাল অট্টালিকা। আকুল আগ্রহে এই স্থানের খননকার্য শুরু হলো। কিছুদুর খোঁড়ার পর পাওয়া গেল সিংহাসনে উপবিষ্ট এক বুদ্ধমূর্তি। সেই মূর্তির সিংহাসনে উৎকীর্ণ আছে 'শ্রাবস্তী'। দীর্ঘদিনের ক্লান্ত অনুসন্ধানকারীর দল শ্রাবস্তীর ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন। আবিষ্কারের পরম আনন্দে তাঁরা উদ্বেলিত হলেন।

এবার তাঁদের লক্ষ্য হলো কপিলাবস্তু। শ্রাবস্তী থেকে কপিলাবস্তুর দূরত্ব ৫০০ লি। হিউয়েন সাং লিখেছেন ঃ "৫০০ লি-র মতো পথ ভাঙার পর কপিলাবস্তুতে এসে পৌঁছালাম।... এদেশটির বিস্তার ৪,০০০ লি-র কাছাকাছি। শহরের মধ্যে থাকা রাজপুরীর ঘের ১৪ থেকে ১৫ লি হবে।... সারা দেশ জুড়ে ১,০০০ কি তারও বেশি সঙ্ঘারাম আছে। প্রায় সবগুলিই ভাঙাচোরা বা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় এসে ঠেকেছে। দুটি দেবমন্দির আছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা বাস করেন। রাজবসতির মধ্যে কয়েকটা ভাঙাচোরা দালানের ভিত আছে। এগুলি রাজা শুদ্ধোদনের মূল রাজপ্রাসাদের অবশেষ। এই ভিতের ওপরেই এক বিহার গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে রাজা শুদ্ধোদনের মূর্তি আছে।"

এই বর্ণনা অনুসারে গবেষক দল এগিয়ে চললেন। পথ পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল, তবুও তাঁরা হাল ছাড়লেন না। কানিংহামের সহকারী কার্লাইল তাঁর দলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে মাইলের পর মাইল সন্ধান করে চললেন। কত ঢিবি, কত জলাভূমি, কত বনভূমি ও বন্য পশুর আবাসস্থল ভেঙে তাঁরা ভুঁই লাতালে এসে পৌঁছালেন। এখানকার এক বিশাল দীঘির পাশে দেখা গেল ধ্বংসস্তূপ। কার্লাইল এই ধ্বংসস্তূপে খননকার্য শুরু করলেন। এখান থেকেই বেরিয়ে এল শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদ। এমনকি মায়াদেবীর মন্দিরও তাঁরা খুঁজে পেলেন। খুঁজে পেলেন বেশ কয়েকটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ। অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে ধীরে ধীরে সফলতা আসছে দেখে তাঁদের মন আনন্দে ভরে গেল।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, এবার তাঁদের যেতে হবে মহাপরিনির্বাণের পথে—যেখানে বুদ্ধদেব শায়িত আছেন। হিউয়েন সাং কপিলাবস্তুর পর রামগ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ "লুম্বিনী থেকে এবার পূর্বদিকে চললাম। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে পূর্ণ ঘন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এবার আমাদের পথ চলতে হলো। প্রায় ৩০০ লি যাওয়ার পর আমরা রামগ্রামে এসে পৌঁছালাম।... রাজ্যটির আয়তন ঠিক কত তার হিসাব নেই। শহরগুলির অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু। পুরনো রাজধানী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইঁট দিয়ে বানানো একটি স্তূপের দেখা পেলাম। এটি ১০০ ফুটের মতো উঁচু। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পর এখানকার রাজা তাঁর দেহাবশেষের যে-অংশটুকু পান তা সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে এসে স্তূপটি বানিয়ে এর মধ্যে রেখে দেন। এর পাশেই জলাশয়। এর একটু দূরে একটি সঙ্ঘারাম আছে। এই সঙ্ঘারাম থেকে পূর্বদিকে ১০০ লি দূরে একটি বিরাট অরণ্য-মধ্যে রাজা অশোকের বানানো স্তূপ দেখা যায়। সারথিকে বিদায় দিয়ে এখান থেকেই যুবরাজ অনিত্যতার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে যাত্রা শুরু

"স্তূপের পূর্বদিকে, যেখান থেকে সারথি চণ্ডক (ছন্দক) ফিরে গিয়েছিল, সেখানে একটি জামগাছ আছে।... এর পাশে একটা ছোট স্তূপ আছে। এখানে যুবরাজ তাঁর মূল্যবান

রাজপোশাক ও আভরণ ছেড়ে মৃগচর্ম পরিধান করেন। এই স্তূপ থেকে অল্প একটু দূরে রাজা অশোকের গড়া আরেকটি স্তূপ দেখা যায়। এখানে রাজপুত্র তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন।''

কার্লাইল ও তাঁর গবেষক দল চললেন হিউয়েন সাঙের পথ অনুসরণ করে। কপিলাবস্তু বা ভুঁই লাতাল থেকে ২০০ লি বা ৩৩ মাইল পূর্বে পাওয়া গেল এক বিশাল স্তূপ। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপরই গড়ে উঠেছিল এই স্তূপ। গবেষকদল এই বিশাল স্তূপ পর্যবেক্ষণ করলেন। লোকমুখে জানতে পারলেন, লোকালয়টির নাম 'রামপুর দেওড়িয়া' গ্রাম। এই রামপুরই হয়তো রামগ্রাম।

কার্লাইল আরো এগিয়ে চললেন। কপিলাবস্তু থেকে ২৬০ লি অর্থাৎ ৪৩ মাইল দূরে দেখা গেল এক নদী। বড় ক্ষীণ তার ধারা। বুদ্ধদেব সংসারত্যাগ করে ঘোড়ায় চড়ে এক লাফে নদী পার হয়েছিলেন। কার্লাইলের দল অনেক নদীনালার সন্ধান করে শেষে 'তামেশ্বর নাথ' নামে একটি স্থানে এসে পৌঁছালেন। এখানে তিনি একটি শিবমন্দির দেখলেন। তার নিকটেই ছিল এক বৌদ্ধমন্দিরের জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। এখানে কার্লাইল দেখলেন, একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। গ্রীষ্মকালে জল থাকে না, বর্ষায় স্ফীত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনী অনুযায়ী এই নদীর নাম 'অনোমা' নয়, স্থানীয় লোকেরা এই নদীকে বলে 'কড়োয়া'। স্থানীয় ভাষায় 'কড়োয়া'-র অর্থ লাফ দিয়ে পার হওয়া। বুদ্ধদেবের এক লাফে নদী পার হওয়ার কাহিনী জড়িয়ে থাকায় কার্লাইল এই নদীকে 'অনোমা' বলে চিহ্নিত করলেন। কারণ, এর দূরত্ব কপিলাবস্তু থেকে ৪৩ মাইল। এছাড়া 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কপিলাবস্তু থেকে অনোমার দূরত্ব ৬ যোজন। ৭ মাইলে এক যোজন ধরলে ৪২ মাইল হয়। কার্লাইলের হিসাব ও অনুমান প্রায় মিলে গেল।

কার্লাইল অনোমা বা কড়োয়া নদী পার হয়ে ৪ মাইলের মধ্যে তিনটি স্থানে ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেলেন, তার মধ্যে একটি স্থানের নাম 'শিরসারা'। বুদ্ধদেবের জীবনের তিনটি ঘটনা কার্লাইলের মনে পড়ল। বুদ্ধদেব একটি স্থানে তাঁর রাজকীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এক স্থানে নিজের মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। এবং তৃতীয়, কিছুদূর এগিয়ে এসে তিনি তাঁর সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই তিনটি স্থানে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। 'শিরসারা' নামক স্থানে কার্লাইল একটি বিশাল স্তূপ দেখতে পেলেন। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি জানতে পারলেন, 'শিরসারা' শব্দের অর্থ মস্তকমুণ্ডন। বুদ্ধদেব যেখানে নিজের বস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, সেখানেও একটি স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেল। আর যে-স্থানে তিনি তাঁর সারথিকে বিদায় দিয়েছিলেন, সেই স্থানেরও সন্ধান মিলল। এই স্থানকে লোকে 'মহাস্থান' বলে অভিহিত করত। আবিষ্কারের নেশা কার্লাইলের মনে এক অদ্ভুত চেতনার সৃষ্টি করল। কুশীনগর যেন কার্লাইলকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করতে লাগল। পরম উৎসাহে তিনি এবার কুশীনগরের সন্ধানে যাত্রা করলেন।

হাতে তাঁর হিউয়েন সাঙের লেখা ভারত-বিবরণী। তিনি আরেকবার পড়ে নিলেন যেখানে হিউয়েন সাং লিখছেন : ''রামগ্রাম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে লাগলাম। বিরাট এক বনের মধ্য দিয়ে পুরোটা পথ যেতে হলো। এই পথ রীতিমতো কষ্টকর ও বিপজ্জনক। এই দুর্গম অরণ্য পার হওয়ার পর আমরা কুশীনগরে পৌঁছালাম। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে রাজা অশোকের তৈরি একটি স্তূপ চোখে পড়ল। এটি চণ্ডের (যিনি বুদ্ধদেবকে শেষ আহার দিয়েছিলেন) পুরনো আবাস। শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩ বা ৪ লি-র মতো গিয়ে অজিতবতী নদী পার হয়ে নদীর পশ্চিমতীরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই আমরা শালবনের দর্শন পেলাম।... বনের মধ্যে চারটি অস্বাভাবিক রকমের উঁচু শালগাছ আছে। তথাগত কোথায় দেহরক্ষা করেছেন এরাই সেকথা জানিয়ে দিচ্ছে।

''এখানে ইঁটের গড়া একটি বিহার রয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধের নির্বাণ অবস্থার মূর্তি আছে। উত্তরদিকে মাথা রেখে তিনি শুয়ে আছেন—বুঝিবা ঘুমিয়ে আছেন। বিহারের কাছাকাছি সম্রাট অশোকের তৈরি একটি স্তূপ। এটির এখন ভগ্নদশা। তবুও এর উচ্চতা এখনো ২০০ ফুটের মতো। স্তূপের সামনে বুদ্ধের নির্বাণ-বিবরণ লেখার জন্য গড়া হয়েছে পাথরের স্তম্ভ।''

কার্লাইল বহুবার হিউয়েন সাঙের বিবরণ পড়লেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হিউয়েন সাঙ রামগ্রাম থেকে কুশীনগরের দিকে যাত্রা করলেও এর দূরত্বের মাপ লিখতে ভুলে গেছেন। হয়তো পরমপুরুষের নির্বাণলাভের স্থানের কাছে এসে তিনি আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

গোরখপুর জেলার গড়ানদীর ধারে 'উপধোলিয়া' নামক স্থানে বহু প্রাচীন অট্টালিকা ও ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। কার্লাইল এখানে বহু ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখতে পেলেন। এখানে ছিল বিশাল ভগ্নস্তূপ ও অট্টালিকা ধ্বংসের চিহ্ন। কার্লাইল এই স্থানকে মৌর্য রাজাদের রাজধানী ও স্তূপটিকে 'অঙ্গার স্তূপ' বলে নির্ধারিত করলেন। বুদ্ধদেবের দেহাবসানের পর মৌর্যরা যখন তাঁর দেহাস্থি আনতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা দেখলেন বিভিন্ন রাজা সব দেহাস্থি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে চলে গেছেন। তখন মৌর্য রাজারা বুদ্ধদেবের চিতার মধ্য থেকে কয়েকটি পোড়া কয়লা নিয়ে এসে একটা স্তূপ নির্মাণ করে তাতে রেখে দেন। এই স্তূপের নাম ছিল 'অঙ্গার স্তূপ।' হিউয়েন সাঙের বিবরণী মিলে যেতে লাগল।

কানিংহাম বেশ কিছুদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এবার তাঁর দলবল নিয়ে গোরখপুর জেলার ৩০ মাইল দূরে

'কসিয়া' নামক স্থানে এক বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলেন। কানিংহাম এই কসিয়াকে কুশীনগরের অপভ্রংশ বলে মনে করলেন। কুশীনগর > কুশি > কসি > কসিয়া। বিচ্ছিন্নভাবে তিনি কয়েকটি স্থানের খননকার্য চালালেন। ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে কিছু ইঁট ও কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেল। কানিংহামের মনে আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু এরই মধ্যে চলে এল বর্ষাকাল। এই পরিত্যক্ত বিজন অরণ্যে খননকার্য বন্ধ হয়ে গেল।

আবার বিশ্রাম। এইভাবে গড়িয়ে গেল ১৮৭৬ সাল। কানিংহাম সংস্থার অধ্যক্ষ হিসাবে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী কার্লাইলকে এই স্থান খননের দায়িত্ব দিলেন। কার্লাইল সেই ধ্বংসস্তূপের পাশে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। নির্জন এলাকা। গভীর জঙ্গল। সামনেই মাটির বিশাল ঢিবি। তার ওপরে একটা স্তম্ভ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। চারপাশে এত জঙ্গল এবং কাঁটাগাছে ভর্তি যে, কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে মনে হতো যেন পাহাড়ের ওপর স্তম্ভ পোঁতা আছে। কার্লাইল বহু শ্রমিক নিযুক্ত করে জঙ্গল পরিষ্কার করালেন। এবার দেখা গেল ২০ ফুট উঁচু একটা নিরেট ইঁটের থাম। মাটি থেকে এই স্থানের উচ্চতা ৫৭ ফুট। কার্লাইল ভাবলেন, এই স্থানই বোধহয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্থান। এই ঢিবির ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারে মন্দির।

শুরু হলো কাজ। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় কাজ বন্ধ হয়ে যেত। নানারকম হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা যেত রাত্রে। অস্থায়ী শিবিরে কার্লাইলের সঙ্গীরা বিশ্রাম করত। শ্রমিকেরা তাঁবুর মধ্যে রান্নাবান্না করত। কার্লাইল সেই অন্ধকার রাত্রিগুলিতে এসে দাঁড়াতেন ঘন জঙ্গল ও কন্টকে ভরা স্তম্ভের সামনে। আকাশভরা তারার নিচে অজস্র শিয়ালের ডাক শোনা যেত। ভয়ঙ্কর নির্জনতাকে অতিক্রম করে কার্লাইল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন সেই স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের দিকে। বিশ্বের এক অমৃতমানব—যিনি মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য নিজে রাজপ্রাসাদের বৈভবময় জীবন, সোনার পালঙ্ক, অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী ও শুভ্রপুষ্পের মতো নিষ্পাপ শিশুকে ছেড়ে অনির্বাণের সন্ধানে বের হয়েছিলেন—সেই তথাগত কি এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে শায়িত আছেন? কে জানে? এক অশান্ত জিজ্ঞাসা তাঁর মনকে বড় অস্থির করে তুলত। নিদ্রা নেমে আসত চোখে। শিবিরে এসে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার ঘুম ভেঙে যেত। করুণাঘন বুদ্ধের চিন্তায় বিভোর কার্লাইল যেন তাঁর চরণের শব্দ শুনতে পেতেন! শয্যা থেকে উঠে বেরিয়ে এসে আবার গা-হিম করা সেই ঘন জঙ্গলঘেরা স্তূপের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। নিজের নির্বাণ-লাভ নয়, বুদ্ধের নির্বাণলাভের স্থানটি খুঁজে বের করাই কার্লাইলের জীবনে অনির্বাণ বাসনা-স্বরূপ হয়ে উঠল।

প্রভাত হলো। আবার শুরু হলো খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। জঙ্গল পরিষ্কার করানোর পর পাওয়া গেল ২০ ফুটের একটি ইঁটের থাম। তার পাশে একটি নিচু ভূমি ও স্তূপের পাশেই আছে একটি বিশাল ঢিবি, যার উচ্চতা প্রায় ৫৭ ফুট। কার্লাইলের মনে হলো এই স্তূপই নির্বাণসমাধির ভগ্নস্তূপ। তার পাশের স্তম্ভগুলি নির্বাণমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই অনুমানেই কার্লাইল নির্বাণমন্দিরের শীর্ষদেশ থেকে মাটির খনন শুরু করলেন। তিনি ভাবলেন, মন্দিরের মধ্যে যদি শুয়ে থাকা ২০ ফুটের মূর্তি থাকে, তবে কূপের মতো একটা গর্ত করলে বুদ্ধমূর্তির কোন না কোন অংশ পাওয়া যাবে। এই আশায় শুরু হলো খোঁড়ার কাজ। ১০ ফুট খোঁড়ামাত্রই কোদাল একটা পাথরে স্পর্শ করল। কার্লাইলের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে উঠল। প্রবল উৎসাহে চারিদিক থেকে শুরু হলো মাটিখোঁড়ার কাজ কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে, যাতে মূর্তির কোন অংশ ভেঙে না যায়। বড় পরিশ্রমে, বড় যত্নে বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রতিমার পুনরুদ্ধার হলো। বুদ্ধদেব দেহরক্ষার সময় ডানপাশ চেপে মাথায় হাত রেখে শুয়েছিলেন। দিক ছিল পশ্চিম। লাল বেলেপাথরের তৈরি মূর্তি, যা হিউয়েন সাং দেখেছিলেন প্রায় ১,২৩৬ বছর আগে। কিন্তু দেখা গেল, মূর্তির পা-দুটি নেই; বামজঙ্ঘার নিচের অংশ নেই। বাম হাত ও কোমরের কিছু অংশ নেই। মাথা ও মুখের কিছু অংশ ভাঙা। মন্দির ধ্বংস হওয়ার ফলে এই অংশগুলি কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! কার্লাইল সেই বিশাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন, কোথায় আছে এই অংশগুলি। কিছু অংশ তিনি পেলেন সিংহাসনের মধ্যে। এই অংশগুলি পাওয়ার জন্য সিংহাসন খুঁড়ে বের করা হলো। সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ছিল ২৩ ফুট এবং প্রস্থ ৬ ফুট।

কার্লাইল মূর্তির সংস্কার শুরু করলেন। সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তির এক-একটি অংশ খুঁজে বের করার জন্য কী গভীর প্রচেষ্টা চলল! মিস্ত্রিদের ওপর ভরসা না করে তিনি নিজের হাতে এক-একটি পাথর মূর্তির কোন্ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন সেই নিয়ে গভীর গবেষণা করে পাথরগুলিকে সঠিক স্থানে বসানোর চেষ্টা করলেন। এইভাবে বুদ্ধদেবের নির্বাণমূর্তির অনেকখানি অংশই উদ্ধার করা হলো, তবুও পূর্ণরূপে তথাগতকে নিয়ে আসা গেল না। দেহের যে-অংশগুলি বিচ্ছিন্ন থাকল, সেই অংশগুলি সিমেন্ট দিয়ে অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে তিনি জোড়া করে দিলেন। নির্বাণমূর্তি পূর্ণতালাভ করল।

এবার শুরু হলো সিংহাসন উদ্ধারের পালা। হিউয়েন সাং সিংহাসনের চারটি স্তম্ভ দেখেছিলেন। স্তম্ভগুলি ভাস্কর্যমণ্ডিত এবং অপূর্ব। কিন্তু সেই স্তম্ভের মাত্র দুটি অংশ পাওয়া গেল। পরে বিভিন্ন পাথরের অংশ দিয়ে কার্লাইল সিংহাসনটি সংস্কার করলেন। সিংহাসনের ওপর বুদ্ধের নির্বাণমূর্তির বিভিন্ন অংশ

জোড়া লাগানোর ফলে মূর্তির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই কার্লাইল এই ত্রুটি দূর করার জন্য স্থির করলেন, মূর্তিকে সম্পূর্ণ রঙিন করে তুলবেন। তাতে মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় মিস্ত্রিদের হাতে রঙের দায়িত্ব দিলে যদি বুদ্ধমূর্তির রূপ নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য তিনি নিজেই রং দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। বুদ্ধদেবের মাথার চুলগুলিতে দিলেন কালো রং, দেহে যে-কাপড় পরানো ছিল তাতে তিনি সাদা রং দিলেন। শরীরের অনাবৃত অংশে লাল ও হলুদ মেশানো রং দিলেন।

বুদ্ধমূর্তিতে রং দেওয়া নিয়ে কার্লাইলকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। অনেকে আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছিলেন। গারিফ সাহেব রং দেওয়ার জন্য কার্লাইলের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেছিলেন যে, ভগ্ন পাথরকে সিমেন্ট দিয়ে জোড়া দেওয়ার ফলে যে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মূর্তিকে রং না দিলে তার সৌন্দর্য আর প্রকাশিত হতো না।

কার্লাইল মূর্তি সংস্কারের পর মন্দির সংস্কার করতে গিয়ে দেখলেন, মাটির নিচে খিলানের কয়েকটি অংশ ভেঙে পড়ে আছে। মন্দির সংস্কারের সময় দেখা গেল মূর্তিকে সংরক্ষণ না করে কোনমতেই মন্দির নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়। সেজন্য কার্লাইল মূর্তিকে প্রথমে কাপড় দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিলেন। তার ওপর কয়েকটা মাদুর দিলেন। এরপর মূর্তির চারপাশে ১ ফুট চওড়া ও ৬ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে চারদিক ঘিরে ওপরে বাঁশের মাচা তৈরি করে গোবরমাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবার শুরু হলো মন্দির সংস্কারের কাজ। নির্বাণমন্দিরকে সংস্কার করতে গিয়ে কার্লাইল তার পাশে আরেকটি মন্দির দেখতে পেলেন। সেই মন্দিরে পেলেন দগ্ধ জিনিসপত্র। অঙ্গার এবং দগ্ধীভূত মানুষের অস্থি। কার্লাইল বুঝলেন, এই বৌদ্ধমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। কার্লাইল সযত্নে সেই বৌদ্ধভিক্ষুদের মন্দির পুনর্নির্মাণ করলেন। সংস্কার করলেন বুদ্ধমূর্তির। নবসংস্কৃত বৌদ্ধমন্দিরে আবার ভিক্ষুর দল এসে স্থান গ্রহণ করলেন। ত্রিশরণ মন্ত্রে আবার ভরে উঠল আকাশ।

কুশীনগর সংস্কারের জন্য সরকার কার্লাইলকে যে-অর্থ প্রদান করেছিল, তা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ হলো না। করুণাঘন বুদ্ধদেবের প্রতিমার দিকে তাকিয়ে কার্লাইল শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে বলছেন—আসক্তি থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় মায়াবোধ। অর্থ, যশ, আকাঙ্ক্ষা আসক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই মায়া মানুষকে দেয় যন্ত্রণা। শুধু এক জন্মের নয়, পুনর্জন্মের যন্ত্রণা। এর থেকে মুক্তির পথই তো নির্বাণলাভের পথ। বুদ্ধের এই নির্বাণপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লাইল স্থির করলেন, তাঁর সঞ্চিত অর্থ এই মন্দির সংস্কারের কাজে লাগাবেন। নিজের কোন অসুবিধার কথা কাউকে জানালেন না, কারো প্রতি কোন অভিযোগ করলেন না। নীরবে চলল কুশীনগরের সংস্কার। সঞ্চিত অর্থও শেষ হয়ে গেল, তবুও কার্লাইল থামলেন না। নিজের বেতনের কিছু অংশ তিনি ব্যয় করতে লাগলেন এই সংস্কারের কাজে।

মন্দিরের কাজ একদিন শেষ হলো। ভারততীর্থে কুশীনগর আবার নিজের মর্যাদা ফিরে পেল। এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির ফল্গুধারায় সিঞ্চিত হয়ে কার্লাইল কুশীনগর ত্যাগ করলেন। কী অপূর্ব নিষ্ঠা, কী পরিশ্রম আর ত্যাগ ছিল এই মানুষটির! আর ছিল তথাগত বুদ্ধের প্রতি এক অপূর্ব ভালবাসা। মাসের পর মাস তিনি জঙ্গলে রাত কাটিয়েছেন। অনাহার আর তৃষ্ণা তাঁর সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করেছে, তবুও শ্রমিক ও মিস্ত্রিদের সঙ্গে যেন নিজেও মিশে গিয়েছেন। নিষ্কাম কর্মযোগীর মতো তিনি তথাগতের বাণীকে অন্তরে ধারণ করে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সৎ কর্ম, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ সঙ্কল্পকে বুকে আঁকড়ে ধরে কুশীনগরের পবিত্র ধূলিকণায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

কতদিন পার হয়ে গেছে, কার্লাইল আজ নেই। কত ভক্ত ও বৌদ্ধভিক্ষুর দল আজ ছুটে আসেন কুশীনগরে তথাগতের মন্দিরে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য। আজও সন্ধ্যায় নির্বাণপ্রতিমার মন্দিরে জ্বলে ওঠে আলোকমালা। বৌদ্ধশ্রমণেরা তথাগতের শায়িতমূর্তির সামনে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। শীতল বাতাস বয়ে যায় ন্যগ্রোধ বৃক্ষগুলির ওপর দিয়ে। বেতস লতাপুঞ্জ সেদিনের আবিষ্কার-কাহিনী আজও যেন নীরবে স্মরণ করে। [সমাপ্ত] ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ (৪)—উপদেশনা সুকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৯

(২) বিদেশির চোখে ভারতবর্ষ—হিউয়েন সাং, সঙ্কলক ঃ প্রেমময় দাশগুপ্ত, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২

(৩) বুদ্ধচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮

(৪) The Buddha and five after centuries—Sukumar Datta, Sahitya Samsad, Kolkata, 1978

(৫) Biographical Note on the Cunningham's family from History of the Sikhs' Cunningham—Edited by H. L. O. Garrett, S. Chand & Co., New Delhi, 1955

প | র | ম | প | দ | ক | ম | লে

'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তিঃ গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যার পর]

নরেন্দ্রনাথ আজ (১৬ অক্টোবর ১৮৮২) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকবেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ! রাত গভীর হবে। হৈমন্তী রাত। প্রকৃতির সাজঘরে কুয়াশার সাজে সেজে বসে আছে শীত। হেমন্তের পালা শেষ হলেই শীতল শিহরণে তার আবির্ভাব হবে। পঞ্চবটী রাতের অন্ধকারে হয়ে উঠবে রহস্যময়। ছলছল গঙ্গা। নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসবেন। ধ্যানসিদ্ধ তিনি।

আজ যেন উৎসবের রাত। চটির শব্দ তুলে হয়তো ঠাকুর নহবতের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। চিকের আড়ালে শ্রীমা সারদাদেবীর ব্যস্ত ঘরকন্না। মাকে নিশ্চয় জানাবেন, নরেন আজ রাত্রে থাকবে। ঠাকুর বলার অনেক আগেই হয়তো খবর নহবতে ভেসে আসবে। মায়ের উনানে গনগনে আগুন। ময়দা ময়ান দিয়ে ঠাসা হয়ে গেছে। বড় বড় লেচি। মোটা মোটা রুটি। 'নরেন্দ্র স্পেশাল'। নরেন্দ্রনাথ যেকোন ডাল পছন্দ করেন না। পালোয়ান ছেলে। তাঁর ছোলার ডাল চাই।

ত্যাগী যুবক ভক্তদের ঠাকুর সন্ন্যাসের পথে নিয়ে যাবেন, রাতের আহার তিনি 'কন্ট্রোল' করছেন। 'কোটা' বেঁধে দিয়েছেন। মাকে জানিয়ে দিয়েছেন—নরেনের ভিতর আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে, তা ওকে চোদ্দখানা রুটি দিও, রাখালকে দিও ছখানা, আর লেটোকে পাঁচখানা, বুড়ো গোপাল আর বাবুরামকে চারখানা। ঠাকুরের নির্দেশ—সকালে খাবি তুবড়ি ঠাসা, রাতে কম কম। রাত যে ধ্যানজপের সময়।

আজ রাতে তিনজন থাকবেন—নরেন্দ্রনাথ, মাস্টার মশাই আর প্রিয়নাথ সিংহ। প্রিয়নাথ নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী বন্ধু, ব্রাহ্মভক্ত। মজার মানুষ নরেন্দ্রনাথ বাল্যবন্ধুকে কখনো বলতেন 'প্রিয় সিঙ্গি', কখনো শুধু 'সিঙ্গি', কখনো উলটে দিয়ে 'সিয় প্রিঙ্গি'। এই প্রিয়নাথ পরবর্তী কালে খ্যাতনামা শিল্পী হয়েছিলেন। 'গুরুদাস বর্মণ' ছদ্মনামে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' রচনা করেন। 'স্বামীজীর কথা'ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

নহবতে বিশাল ব্যস্ততা! সিমুলিয়ার রাজা আজ রাত্রিবাস করবেন। ঠাকুরের ঘরে আসর বসেছে। তানপুরা বাঁধার সুর বাইরে ছিটকে আসছে। খোলে মৃদু মৃদু চাঁটি। যেখানে নরেন্দ্রনাথ, সেখানেই সুরের সুরধুনী।

সিঁড়ির তলায় মায়ের রান্নাঘর। এতক্ষণ বাতাসে সুগন্ধ ভেসে আসছিল। এইবার সন্দেশ এল, রাতের আহার প্রস্তুত। জায়গা লাগাও, জায়গা লাগাও। নহবত থেকে আসছে মায়ের অমৃত। ঠাকুরের ঘরে দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় জায়গা হচ্ছে। ঠাকুর বসে আছেন তাঁর চৌকিতে।

পূর্বদিকে দরজার কাছটিতে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ, মাস্টার মশাই, প্রিয়নাথ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার বিষয় সামাজিক পরিস্থিতি। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পড়ছেন। কথায় কথায় ছাত্রদের নৈতিক জীবনের কথা এসেছে। নরেন্দ্রনাথ মাস্টার মশাইকে বলছেনঃ "আজকালকার ছোকরারা কিরকম দেখছেন?"

মাস্টার মশাই বলছেনঃ "মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।"

নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধহয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো—এসব সর্বদা দেখা যায়। এমনকি দেখেছি যে, কুস্থানেও যায়।"

মাস্টার মশাই বললেনঃ "যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।"

(মাস্টার মশাই স্বামীজীর চেয়ে প্রায় আটবছরের বড়।)

নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "আপনি বোধহয় তত মিশতেন না। এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধরে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে!"

মাস্টার মশাই অবাক হলেনঃ "কী আশ্চর্য!"

নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এসব বিষয়ে দেখেন তো ভাল হয়।"

দুজনে আলোচনায় মশগুল। ঠাকুর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বলছেনঃ "কিগো, তোমাদের কী কথা হচ্ছে?"

নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।"

ঠাকুরের মুখের প্রসন্ন হাসি মিলিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ। ঝড়ের আগের আকাশের মতো। থমথমে। মাস্টার মশাইকে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেনঃ "এসব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বৈ অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এসব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।"

সবাই চুপ। মাস্টার মশাই মাথা হেঁট করে বসে আছেন অপরাধীর মতো। মাস্টারের 'মাস্টার'-এর কাছে বকুনি খেয়েছেন মাস্টার। তিরস্কারের পর আহারে বসেছেন সবাই। মেঘ কেটে গেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে ভক্তদের খাওয়ার তদারকি করছেন। আবার সেই আনন্দময় পুরুষ। মহানন্দে ফেটে পড়ছেন আজ। নরেন্দ্র আজ রাতে থাকবে। নরেন এসেছে, নরেন।

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে নক্ষত্র-সভা। সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে খসিয়ে এনেছেন এক ঋষিকে। নরের ইন্দ্র নরেন্দ্র। অখণ্ডের ঘর। আহারের পর একটু আয়েস। নহবত থেকে মা পাঠিয়েছেন নিজের হাতে সাজা 'তরিবাদি পান'। মা দুধরনের পান সাজতেন। ভক্ত মহিলা জানতে চেয়েছিলেন, দুরকম কেন? মা

বলেছিলেন, ভালগুলো ভক্তদের—তাদের আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। সাধারণগুলো ঠাকুরের, উনি তো আপনার আছেনই।

ঠাকুরের স্তিমিত লোচন, নরম, কোমল। আনন্দের হাট বসেছে ঘরে। আনন্দে মাতোয়ারা ঠাকুর। কত কথা, কত গল্প! ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলছেনঃ "চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে—ঐ গানটি একবার গা না।"

নরেন্দ্রনাথ তানপুরাটি তুলে নিলেন। মা বলেন, ঠাকুর যখন গান করেন, তখন মনে হয় তিনি যেন গানের ওপর ভাসছেন! আর নরেন্দ্রনাথের গলা পঞ্চমে বাঁধা।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গান। ব্রাহ্মসমাজে গাওয়া হয়। ত্রৈলোক্যনাথ ছেলেবেলা থেকেই গান গাইতেন। স্বাভাবিক প্রতিভা। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে তাঁর যেন নবজন্ম হলো। কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে বসবাসকালে সঙ্গীত ও পুঁথিগত বিদ্যার শুরু। কেশবচন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এলেন। মধুর সুললিত কণ্ঠে ঠাকুরকে গান শুনিয়ে যান। তাঁর রচিত গানে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়। কেশবচন্দ্র তাঁকে 'চিরঞ্জীব শর্মা' উপাধি দিয়েছেন। তিনি নিজে নাম নিয়েছেন 'প্রেমদাস'। তাঁর লেখা 'নব বৃন্দাবন' নাটকে নরেন্দ্রনাথ 'পাহাড়ীবাবা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

কীর্তনাঙ্গের গান নরেন্দ্রনাথের গলায় নিমেষে জমে গেল। খোল, করতাল বাজছে। মহা মাতামাতি। নহবতে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। মা আর লক্ষ্মীদিদি। ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিজেকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তিনি গান ধরেছেন। সঙ্গে অপূর্ব সেই নৃত্য! ভক্তরাও তাঁকে বেড়ে নৃত্য করছেন। নরেন্দ্রনাথ গেয়ে চলেছেনঃ

"চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।..."

গঙ্গার বাতাসে সুর ভেসে যাচ্ছে। পঞ্চবটীতে গভীর রাতের পেঁচারা ডাকতে ভুলে গেছে। রাত এগারোটা বাজল। গান থেমেও যেন থামেনি। সুর রিমঝিম করছে। নৃত্য যেন নেচে নেচে অনন্তের দিকে চলেছে, ভগবানের খাসমহলে।

ভক্তরা সবাই মিলে ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা করেছেন। নরেন্দ্রনাথ উপুড় হয়ে শুয়েছেন। ভ্রূমধ্যে ভেসে উঠেছে জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ।

রাত অনেক হলো। নহবতে মা তখনো জেগে।

ও মা, আপনি এইবার খেতে বসুন। রাত তিনটের সময় ঠাকুর যে আপনাকে তুলে দেবেন—জপে বসো, জপে বসো, নিশি হলো ভোর। [ক্রমশ] (এগারো)

চ|য়|ন

নৈতিক দ্বিচারিতার বিপদ

আচার্য বিনোবা ভাবে

সারা বিশ্ব আজ সংঘর্ষময়। পুরনো বিবাদ ও অস্থিরতা অমীমাংসিত, এর সঙ্গে নিত্যনতুন উপসর্গ যুক্ত হচ্ছে। রাজনীতিকরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করছেন। সাধারণ যুদ্ধ এড়াতে তাঁরা হয়তো সাময়িকভাবে সফল হয়েছেন, কিন্তু এই ব্যাধির মূল কারণটি অপসারিত হয়নি। বাহ্য প্রতিকারে সাময়িক লাঘব হলেও সেগুলি কখনোই যথার্থ আরোগ্যবিধান করতে পারে না। অস্থায়ী উপশম প্রায়শই শরীরের অসুখ বাড়িয়ে তোলে।

রাজনীতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে। একে আমরা দেখি সামাজিক যাবতীয় সমস্যার প্রধান সূত্ররূপে। রাজনীতিকদের ঠেলে ওপরে তোলা হচ্ছে, আর তাদের বক্তব্যকেও অনুচিত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমি পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার স্বপক্ষে আইজেনহাওয়ারের একটি বক্তব্য পড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ "নতুন পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন, এটি আমেরিকার জাতীয় নীতির একটি অঙ্গ। আমরা যদি এই পরীক্ষা না করি তাহলে মুক্ত বিশ্বকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করতে পারব না। শান্তিরক্ষার স্বার্থেই এটি প্রয়োজনীয়।" আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এরকম কথা আগে কখনো শুনিনি। পারমাণবিক বোমা যে শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজন—এ এক নতুন আবিষ্কার! প্রাচীন যুগের মহাপুরুষ ও ধর্মীয় শিক্ষাগুরুরা এসম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁরা বলতেন, প্রেমই শান্তি আনতে পারে। ক্রোধ ও ঘৃণা জয় করার ওপর জোর দিতেন তাঁরা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনয়ের কথা তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন। তাঁরা বলতেন, মানুষকে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হওয়ার শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। যেকোন সমাজে সাম্য ও জীবনের নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন আর সমাজব্যবস্থায় রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভূত বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। মানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা থাকতেই হবে।

খ্রিস্ট, বুদ্ধ ও সকল মহান ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা এই উপদেশই দিয়ে গেছেন। খ্রিস্ট আরো এগিয়ে বলেছেন—যারা তরবারির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, তারা তরবারিতেই ধ্বংস হবে। তিনি বলতেনঃ "শত্রুকে ভালবাস।" দুঃখের বিষয়, যাঁরা নিজেদের খ্রিস্টান বলেন, তাঁরাই আজ পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের স্বপক্ষে ওকালতি করছেন! তাঁরা গির্জায় যান এবং ভক্তিভরে বাইবেল পাঠ করেন। যুদ্ধরত প্রতিটি সৈনিক নিজেদের ঝুলিতে এক কপি বাইবেল রাখে। এসব তারা করে সম্ভবত ইহলোকে এবং পরলোকে ক্ষমতা ও সুখ অর্জনের জন্য। হাইড্রোজেন বোমা এই পৃথিবীতে নিরাপত্তার প্রতীক আর বাইবেল পরলোকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি! এঁদের মতে, বাইবেল ব্যক্তির জন্য আর পারমাণবিক অস্ত্র সমাজের জন্য। প্রতিটি সংগঠিত ধর্ম এই নৈতিক দ্বিচারিতাকে উৎসাহ দেয়। যেসব মানুষ কোন ধর্মপুস্তকে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা অন্তত এই ভণ্ডামি থেকে মুক্ত। এঁরা সৎ কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ❑

স্বামী স্বাহানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত
মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন সৌমিত্র ঘোষাল।—সম্পাদক

মা|তৃ|তী|র্থ|প|রি|ক্র|মা

বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার সপ্তদশ পর্যায়ে বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি।—সম্পাদক

বরানগরে গঙ্গার ধারে ব্রাহ্মভক্ত, দানবীর, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে (৭০, অমৃতলাল দাঁ রোড, কলকাতা-৩৬) যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে মণিলাল মল্লিকের কন্যার আহ্বানে শ্রীমা সারদাদেবীরও শুভাগমন হয়েছিল।

কলকাতার সিঁদুরিয়াপটীতে মণিলাল মল্লিকের বসতবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুর যোগদান করেছেন বলে 'কথামৃত'-এ উল্লেখ পাওয়া যায়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব, পূর্বার্ধ) থেকে জানা যায়, মণিলাল একদা পুত্রশোকে কাতর হয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হলে তিনি নানা উপদেশদানে তাঁর শোকতাপ দূর করে তাঁর প্রাণে শান্তি এনে দেন। বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি সম্পর্কে শ্রীম লিখেছেন ঃ "মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া থাকেন ও সেইসঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান।"[১] এই বাগানবাড়িতে আহার গ্রহণ সম্পর্কে ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন ঃ "মণি মল্লিকের (বরানগরের) বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হলো।"[২]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ঠাকুর যখন অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর জাতিভেদ বুদ্ধি ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল এবং সেইসময়ে বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে গিয়ে সেখানকার রান্না খেলেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি।

মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা কন্যা নন্দিনীদেবীও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে কৃপালাভ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে বরানগরের এই বাড়িতে বাস করতেন বলে জানা যায়। তাঁর সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর যোগাযোগ থাকায় তিনি শ্রীশ্রীমাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

এই সম্পর্কে শ্রীদুর্গাপুরী দেবী জানিয়েছেন ঃ "মণি মল্লিকের পরিবারের নন্দিনী দেবী তাঁহাদের বরাহনগরের গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে একবার শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামলালদাদা প্রমুখ ত্যাগী ও গৃহী সন্তান এবং অনেক ভক্তিমতী মায়েরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রশস্ত একটি কক্ষে শ্রীশ্রীমাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া মায়েরা বসিলেন। পুরুষ ভক্তগণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বসিয়া কীর্তন করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদিদি চূড়া বাঁধিয়া পীতবাস পরিয়া মায়ের সম্মুখে নৃত্যসহ কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় জনৈকা কীর্তনীয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।



মণি মল্লিকের বাগানবাড়ির প্রবেশদ্বারের বর্তমান অবস্থা

আলোকচিত্র ঃ ডি. ডি. সাহা

"তাঁহার নাম চ—। সুদর্শনা, বয়সে প্রৌঢ়া, পরিধানে গৈরিকবাস। তিনি আমন্ত্রিত হইয়া আসেন নাই, সেইস্থানে শ্রীশ্রীমাতার আগমনবার্তা জানিতে পারিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদিদির কীর্তন শেষ হইলে তাঁহাকে কীর্তন করিতে বলা হইল। মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সুর-তাল-ভাব উচ্চাঙ্গের। শ্রোতৃবর্গ রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছেন, আর গায়িকার নয়নযুগল হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

"শ্রীশ্রীমা কিন্তু অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, সমস্ত শরীরে তাঁহার অসহ্য জ্বালা। যোগেন-মাকে বলিলেন, 'যোগেন আমি যে আর বসতে পারছি না এখানে।'

"যোগেন-মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আচ্ছা মাঠাকরুন, এ কেমনতর কথা! এতক্ষণ তুমি মন দিয়ে সবার গান শুনলে; এখন ভাল গান হচ্ছে, সবার ভাল লাগছে, আর তুমি কিনা বলছ, বসতে পারছি না!'

"মা বলিলেন, 'যে গান করছে তাকে জিজ্ঞেস কর, তার যে কত জ্বালা সে-ই জানে। তার বুকটা চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে।'

"কীর্তন সমাপ্তি পর্যন্ত মা সভায় বসিয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গায়িকাও তাঁহার অনুগমন করেন। জীবনের কত সঞ্চিত দুঃখের কথা অকপটে নিবেদন করিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার সে কী মর্মন্তুদ ক্রন্দন!

'মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'গানের ব্যবসা ছেড়ে দাও মা, সমাজ থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেল। দিনরাত ঠাকুরের নাম জপ, জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।'

"কিছুদিন পরে নারী পুনরায় আসিয়া মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। মায়ের কৃপাধন্য হইয়া তিনি পরমার্থের সন্ধানে তীর্থে চলিয়া গেলেন।"[৩]

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যলীলার স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটির মালিকানা বদল হয়েছে এবং সেই স্থলে একটি নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছে। ❑

পথনির্দেশঃ মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ির ঠিকানা—৭০, অমৃতলাল দাঁ রোড, বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬। বরানগর বাজার থেকে বাঁদিকে কুঠিঘাটের দিকে এগোলে দেখা যাবে, রাস্তাটি দুভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের অমৃতলাল দাঁ রোড ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে এই স্থানে আসা যাবে। বরানগর বাজার থেকে সাইকেল রিক্সায় এটি প্রায় মিনিট পনেরোর পথ।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ১৯০
২ ঐ, পৃঃ ৬৯৪
৩ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ৪০৯-৪১০

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শব্দচেতনা ৩৫

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

১				২		৩		৪	
৫	৬			৭					
							৮		৯
১০			১১						
		১২			১৩			১৪	
১৫	১৬								
			১৭				১৮		১৯
২০					২১				

পাশাপাশিঃ (১) স্বামীজী এই বেশেই ভারতবর্ষে ঘুরেছিলেন (৩) স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দ যে রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন (৫) স্বামীজী ১৮৮৯ সালে '——পুকুর' যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন (৭) স্বামীজীর পোষা এই প্রাণীটির নাম ছিল 'বাঘা' (৮) স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যা এডিথ অ্যালানকে যে-নামে ডাকতেন (১০) বিদেশে এক নৈশভোজে কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার মুহূর্তে স্বামীজীকে ঠাকুর বলেনঃ "খাসনি ও ——।" (১১) "হে ভারত, ভুলিও না তোমার —— জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী।" (১৩) স্বামীজী এই পর্বতে অবস্থান করেছিলেন (১৪) "—— চল নিজ নিকেতনে" (১৫) ছেলেবেলায় নরেনের যা হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল (১৭) বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে স্নানের সময় যে তাঁর কৌপিন নিয়ে পালায় (১৮) "আত্মজ্ঞানই গীতার —— লক্ষ্য।" (২০) বিদেশে স্বামীজী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন (২১) আমেরিকায় যে অজ্ঞেয়বাদী সুবক্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

ওপর-নিচঃ (১) "ত্যাগই ভারতের সনাতন ——।" (২) পরিব্রাজক স্বামীজী এখানে এসে ধ্যানে বসেন (৪) চোদ্দ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশের যেখানে গিয়েছিলেন (৬) "আমায় —— কর।" (৮) স্বামীজীর ছেলেবেলার নাম (৯) ১৯০২ সালে এই দেশের দুজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বামীজীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এক ধর্মসভায় (১০) স্বামীজী বলতেন 'অগ্নিময় ——'-এর কথা (১২) তাঁর পোষা পশুপাখির একটি (১৩) "সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী ——।" (১৪) ছোটবেলায় তাঁর খেলার অন্যতম সাথী (১৬) "—— বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে।" (১৯) স্বামীজী প্রতিমাপূজার তাৎপর্য বুঝিয়েছিলেন রাজা —— সিংহকে।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম শ্রাবণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"

সুনীলকুমার পাল

॥১॥

বহুদিনের থেকে আমার মনে
একটা কথা ঘুরছে বারেবার,
জায়গা, জমি কিংবা টাকাকড়ি
এ তল্লাটে আমার মতো কার?

॥২॥

দু-একজনা নাম করেছে শুনি
এদিক-ওদিক কানে আমার আসে।
গরু কিংবা ছাগল ওরা জানি
তুলনায় এই ঐরাবতের পাশে।

॥৩॥

আমার কথা মোটেও সেটা নয়,
লোকে আমায় মান্য করে কোথা!
যদিও আমি দান খয়রাত করি
দু-দশহাজার প্রায়ই হেথা হোথা।

॥৪॥

বুঝতে পারি লোকে আমার চেয়ে
কদর করে পাড়ার ভোলাকে,
চালচুলো নেই আধা পাগল, শুধু
মাঝে মাঝেই 'মা মা' করে ডাকে।

॥৫॥

এদিক ওদিক সভা-টভা হলে
আমার কথা কেউ রাখে না মনে।
সভাপতির পদে অন্য কেউ,
আমি বসি শ্রোতাদের মাঝখানে।

॥৬॥

এসব নিয়েই ভাবছি কিছুদিন,
অন্তরেতে হচ্ছে ভীষণ রাগ,
দু-চার জনকে সাঙ্গ করে দিলে
হয়তো নেভে আমার মনের আগ।

॥৭॥

প্রণাম করে ইষ্টদেবতাকে
রাত্তিরে কাল শুয়েছিলাম আমি।
হঠাৎ কখন ঘুমটা গেল ভেঙে,
সামনে দেখি দাঁড়িয়ে অন্তর্যামী।

॥৮॥

দুঃখটা তোর বুঝতে পারি আমি,
তোকে দেখে কষ্ট আমার হয়।
বলেন তিনি, উপায় আছে এক
এমন কিছু শক্ত মোটেই নয়।

॥৯॥

একটা মোটে, দু-চারটে নয় যদি,
কোনমতে করতে পারিস শেষ।
ঝামেলা সব খতম হয়ে যাবে,
মনের সুখে থাকবি তখন বেশ।

॥১০॥

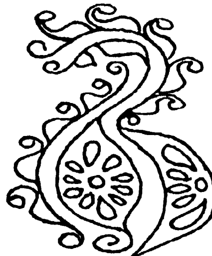
ধারালো এক ছুরি দিয়ে তুই
'আমি'টাকে ফেল কেটে ফালফাল।
কাটবে জীবন শান্তি এবং সুখে,
'আমি' ম'লে-ই ঘুচিবে জঞ্জাল।

হংস

তন্ময় ধর

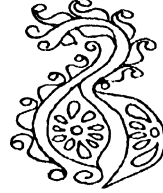
'এবং কৃত্বা হৃদয়ে অষ্টদলে হংসাত্মানং ধ্যায়েৎ'—হংস উপনিষদ্

আমি সেই হংস।
অনন্ত রাত্রির স্তরে স্তরে
কোটি সূর্যময় এই ডানা মেলে দিলে
অষ্টদলে নিঃশব্দ স্বরলিপি ফোটে।
পূর্বের শুভ্রতা
সৌম্যের প্রীতি
আর কর্ণিকার স্বপ্ন ছুঁয়ে
একদিন মিশে যাব অনন্তে,
প্রভাত তরল আলোয়, পূর্ণতায়...



নিমাইচরণ চক্রবর্তী

জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ জয় ভগবান,
ভিক্ষা দাও শুদ্ধাভক্তি করুণানিদান।
মান যশ নাহি চাহি, চাহি না সম্পদ,
সুখের মুখোশে তারা ঘটায় বিবাদ।
হে ভবপারের কড়ি তোমার শরণ,
তোমারি শ্রীপদে নিত্য স্মরণ মনন।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু, যারে কর দয়া,
পারে না বাঁধিতে তারে সংসারের মায়া।
ভাবঘন তনুখানি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়,
ভাবমুখে আছ সদা মায়ের তনয়।
পটেরে বাহন করি ফের ঘরে ঘরে,
যে চায় তোমারে শুধু সেই রাখে ধরে।
বড় সাধ ঐ পট আঁকি হৃদিপটে,
স্মরণ মনন তাহে রেখে দিন কাটে।



জবা হয়ে

মোহিত চক্রবর্তী

দুঃখ আসুক যখন খুশি তীব্র দহনজ্বালার মতো,
যন্ত্রণার নীল সাগরে যাব না ভেসে হৃদয়-ভেলা,
ব্যথার বাঁশি যাক না বেজে, জন্ম-মৃত্যু লীলাখেলা
খেলতে খেলতে জীবন জানে সত্য-শিবের মহান ব্রত।

দান, ধ্যান ও সেবাব্রতের শিক্ষা চলুক অনন্তকাল—
বাঁধনহারা হৃদয়মাঝে কোন্ প্রতিমার আশিসবাণী
প্রজ্ঞানদীপ দেয় জ্বালিয়ে, তারেই যে শাশ্বত মানি,
তুচ্ছতাকে ধ্বংস করে দেবেই আলোকদীপ্ত সকাল।

সাধন-ভজন শুভক্ষণে হোক না সময় স্রোতস্বিনী
নদীর মতোন সহজ-সরল, চাই না তো আর অন্য কিছু
কাম-কাঞ্চন ষড়রিপুর কাছে কে চায় হতে নিচু!
স্বার্থ থেকেই আধি-ব্যাধি, আকাঙ্ক্ষার বিকিকিনি।

দেউলে হয়ে যেতে যেতেই প্রার্থনা এক এই জীবনেঃ
মায়ের পায়ে জবা হয়ে ফুটুক হৃদয় পুণ্যক্ষণে।

হে মহিমময়

বলদেব দাস

হে মহিমময়!
তোমার কৃপার কৃপাণখানি হাতে
একলা অভয়, জাগছি নিকষ রাতে—
দস্যু ছজন থমকে গেছে বুঝি
আলোর আশায় পুবের আকাশ খুঁজি।

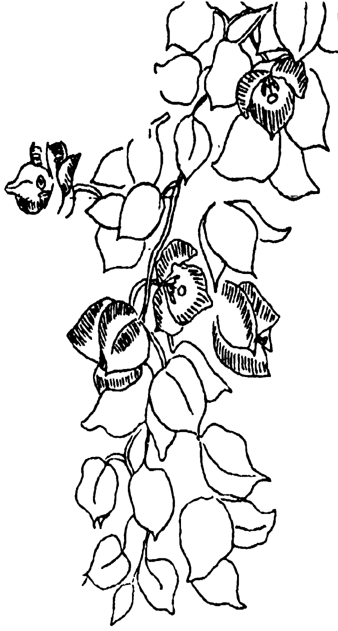
অন্ধকারেও দেখেছি তুমি ধ্রুব
তোমার কৃপায় প্রাণ পেয়ে যায় শবও
এবার তবে চোখের আলো হও—
ভয়শূন্যের চিত্তের গান গাও।

এই যে থাকা তোমার থেকে দূরে
বিরহভার মনবীণার সুরে—
সব কি বৃথা কান্না, চোখের জল!
সংস্কার বা প্রারব্ধ; নাকি কর্মফল—

সেসব দেখা আমার কর্ম নয়
শুধু আজ বুঝেছি, জীবন মৃত্যুময়!
যখন তোমায় চিনেছি আজ ওগো ক্রান্তিকারী
নাও তুমি সব সুখ ও দুঃখ হরি—

চাই শুধু তব অশেষ কৃপা
বলীর মাথায় যেমন তোমার ত্রিপা,
মন্ত্র দিলে জীবন্মৃতের কানে
'সোঽহম্' ধ্বনি তাই বাহিত প্রাণে।

এই জীবনেই জীবন্মুক্তি চাই—
এমন কথা আর কি কোথাও পাই!
জাগ্রত আজ সিংহশিশু, নয় ঘুমন্ত নয়
'কথামৃত' পান করেছি—হে মহিমময়।



মৃত্যু না জীবন

অসিত দত্ত

মৃত্যুর কোন দিনক্ষণ, পাঁজিপুঁথি লাগে না
মৃত্যুর কোন অঙ্ক-জ্যামিতিক হিসাব লাগে না
মৃত্যুর কোন কর্মসূচীর পূর্বপরিকল্পনা লাগে না
মৃত্যুর কোন পছন্দশীলতাও নেই
কিন্তু
মৃত্যু ইতিহাস রচনা করে
আর
জীবনই সেই ইতিহাসের মালমশলার মূলধন।

কে জয়ী আর কে বিজিত?
মৃত্যু না জীবন?
"তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে..."

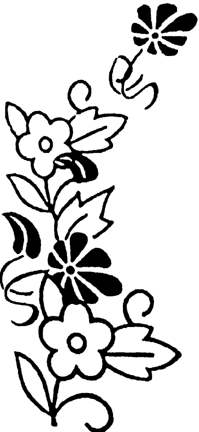
তবু বলা যায়
জীবনের শেষ নেই, প্রান্তিকতা নেই
মৃত্যুরও
কোনদিন তাদের আনন্ত্যকে
সমাপন করতে পারবে না।

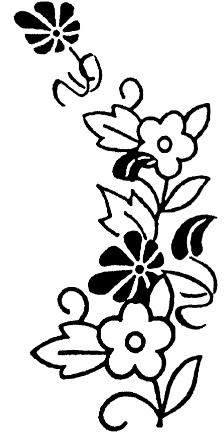
আকাশে আকাশে এখনো অনেক ফাঁক
মৃত্যুদের নক্ষত্রগুলো পারে না যে
জীবনের আকাশটাকে ঢেকে দিতে!

অন্বেষণ

বলাইচাঁদ বিশ্বাস

এতই পেলাম সারাজীবন
যা চেয়েছি যখন যেমন
তবু কেন আমার এ মন
সুধায় ভরে না?
কে জানে হায় কেমন সে-ধন
তুচ্ছ যা পেলে মণি ও রতন
আকুল আমার পরাণ ও মন
যাকে জানার তরে—
হৃদয়ে তা পাওয়া হলো না।
যত কিছু এই বসুধার
সবই অলীক, সবই অসার
মিলিয়ে যাবে স্বপ্ন, ছলনা।
যে প্রিয়জন কাছে দূরে
আজকে আছে হৃদয় জুড়ে
হারিয়ে যাবে কোথায় তারা
কেউ তা জানে না।
হয়নি আমার সময় বুঝি
তাই অরূপরতন আজও খুঁজি
জানি গো তাঁর দয়ায় বৃথা
কিছুই যাবে না।





যু	ব	স	ম্প্র	দা	য়ে	র	প্র	শ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক **শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।**

—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো অর্থাৎ কোন না কোন একদিন সকল মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে, তখনি তার মানবজন্মের সমাপ্তি ঘটবে। যার শেষ আছে, তার নিশ্চয়ই শুরু আছে। তবে মানবজীবনের (পার্থিব জীবনের) প্রারম্ভ কোথায় এবং কেন?* **—দেবজ্যোতি রক্ষিত, ছোটনীলপুর, বর্ধমান-৭১৩ ১০৩**

উত্তর ঃ শাস্ত্রদৃষ্টিতে জীবজগৎ অর্থাৎ এই সৃষ্টি অনাদি। কাজেই কবে মানব (তথা পার্থিব) জীবনের আরম্ভ, তা কেউ বলতে পারে না। মুক্তিলাভে শুধু মানবজন্মের সমাপ্তি ঘটবে তা নয়, পুনর্জন্মপ্রাপ্তিও সমাপ্ত হবে। বেদান্তের একটি মত আছে যে, কোনকিছুই সৃষ্টি হয়নি। অজ্ঞানবশত আমরা এই জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করি। একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই। অতএব অনিত্য সংসার অবলম্বনে যে-জীবনচক্র, তা সমাপ্ত হওয়া দরকার। সেটি তখনি হতে পারে যখন আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি হবে। এই প্রসঙ্গে মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কৃত কারিকার ২।৩২ শ্লোকে রয়েছে ঃ "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।/ ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।" অর্থাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হলে প্রলয় নেই, উৎপত্তি নেই, বদ্ধভাব নেই, সাধক নেই, মুমুক্ষু নেই এবং মুক্তও নেই। এইরূপ ভাবই পারমার্থিক সত্য।

প্রশ্ন ঃ *একজন সাধারণ মানুষকে জাগতিক, সামাজিক কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করতে হলে কী কী গুণাবলীর একান্ত প্রয়োজন?* **—কাকলী বিশ্বাস, ফরিদকাঠি**

উত্তর ঃ জীবনের দুটি গতি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিবৃত্তি মার্গাবলম্বনে আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বনে জাগতিক তথা সামাজিক উন্নতি লাভ হয়। সাধারণভাবে জাগতিক উন্নতি বলতে ধনাঢ্য, পণ্ডিত, অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড় ইত্যাদি হতে পারা। সামাজিক উন্নতিও তাই। তবে সামাজিক উন্নতি লাভ করে অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকেও নেতৃত্বে দেখা যায়। অর্থাৎ এরূপ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সদ্গুণরাজির প্রয়োজন আছে বলে নাও মনে হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখলে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি জাগতিক বা সামাজিক স্তরে সৎ এবং যে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করতে পারে—তাকেই সকলে মহান বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যিনি এরূপ সচ্চরিত্রবান, তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হলে তিনি সাধারণ জাগতিক জীবনের রুচি হারিয়ে এসবের পিছনে যে কারণের কারণ রয়েছে—তাঁকে জানার জন্যই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তখনি শুরু হয় অধ্যাত্মজীবন। তিনি তখন সেই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বনের মাধ্যমে জাগতিক বিষয়সকলকে ত্যাগ করে ঈশ্বরকে অবলম্বন করেই জীবন পরিচালিত করেন। এরূপ ব্যক্তি তাঁর বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা উন্নতিলাভ করে সমাজে পূজ্য হন।

প্রশ্ন ঃ *আজকাল চারপাশে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আদর্শের একান্ত অভাব। সমাজের সর্বত্র অন্যায়ের জয়, আর ন্যায়ের পরাজয় দেখে যুবকরা নিজেদের মানসিকতাকে সেইরূপেই গড়ে তুলছে। তাদের নিম্নরুচি, সত্যের প্রতি তথা ধর্মের প্রতি উদাসীনতা, স্বার্থপরতা, অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব—এই মনোভাবগুলো পরিবর্তন করার ব্যাপারে একজন যুবতী হিসাবে আমার কি কোন ভূমিকা আছে? আমার চারপাশের যুবক-যুবতীদের স্বামীজীর আদর্শে উন্নতি করার ক্ষেত্রে আমি কি কোনভাবে অংশ নিতে পারি? কিভাবে পারি তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।* **—সুদীপ্তা ঘোষ, আসানসোল-৭১৩ ৩০২**

উত্তর ঃ একজন যুবতী হিসাবে অবশ্যই তোমার ভূমিকা আছে। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলে অন্যদের কোন ভূমিকা নেই ভাবা নেতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক। স্বামীজী-প্রদর্শিত ইতিবাচক চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে নিজের জীবনকে তৈরি করা এবং সেইসঙ্গে অন্যান্যদেরও সেই পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ("Be and Make") একটি বড় কাজ। এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই যারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বামীজীর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে—

তাদের সঙ্গে যোগ দিলে বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলে কাজটি আরো সহজ হবে। তার ফলে স্বামীজীর চিন্তাভাবনাকে আরো গভীরে অনুধ্যান করতে পারবে। ফলস্বরূপ তাঁর প্রদর্শিত আদর্শানুযায়ী সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে নিজের ও সমাজের উন্নতিসাধন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আজকের সংশোধনাগারের আসামিদের সেবার জন্য কি কিছু করছেন? আমি একজন বন্দি আসামি, 'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়ি। দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ধন্য হব।*

দপনারায়ণ মাজী, বন্দি, এম. সি. সি. হোম

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমাদের মালদা, কুচবিহার আশ্রমের মাধ্যমে সংশোধনাগারে আসামিদের জন্য সেবাকাজ করা হচ্ছে। আরো কয়েকটি জায়গায় কাজ শুরু করার প্রস্তাব আছে। এই ধরনের কাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তরফ থেকে সদ্য আরম্ভ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে শান্তিতে রাখুন—এই প্রার্থনা জানাই।

প্রশ্ন ঃ *মহাপুরুষেরা বলেন, অন্যায় করলে নাকি এই পৃথিবীতেই শাস্তিভোগ করতে হয়। তবুও সমাজে কাউকে কাউকে দেখা যায় অনেক অন্যায় করেও বিনা কষ্টে মৃত্যুবরণ করতে। তাহলে তার ফলভোগ তাদের হলো না কেন?*

—রাজীব ভট্টাচার্য, ধর্মনগর, ত্রিপুরা

উত্তর ঃ অন্যায়ের ফল এই জীবনে ভোগ নাও হতে পারে, যদিও বলা হয়—যেকোন গুরুতর অন্যায়ের ফল এই জীবনেই প্রাপ্তি হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐসব ব্যক্তি নতুন জন্মগ্রহণের পর নানাভাবে প্রাক্তন কর্মের ফল ভোগ করে। এটি শাস্ত্রের কথা। আর যাদের অনেক অন্যায়কর্মের পরও বিনা কষ্টেই মৃত্যুবরণ করতে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে—বলতে গেলে তা যথার্থদৃষ্টি নয়, তা আপাতদৃষ্টি মাত্র। বাইরেটা দেখে সবসময় তাদের প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে বোঝা নাও যেতে পারে। কিন্তু নানাভাবে তাদের অপকর্ম বা অন্যায়ের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়েছে এবং হবে।

প্রশ্ন ঃ *আমি একজন গৃহবধূ। আমি কারো উপকার করতে না পারলেও অপকারের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি আমাকে হতাশ করে। অনুৎসাহী জীবনে মানসিক আনন্দলাভের জন্য সঠিক কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে, কৃপা করে তা জানালে আনন্দিত হব।*

—শুভ্রা ঘোষ, হাওড়া

উত্তর ঃ প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে নিজেদের মনের পরিধিকে আরো বড় করতে হবে। অর্থাৎ শুধু নিজের কল্যাণের চিন্তামাত্র না করে দেশের ও দশের কথা, তাদের কল্যাণচিন্তা করা দরকার। এজাতীয় সেবামূলক কাজ যেসকল প্রতিষ্ঠান করে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল। স্বামীজী বলেছেন, পরার্থে একটু কিছু করলে ভিতরের শক্তি জাগরিত হয়। আর তার ফলে হৃদয়ের বিস্তার হয়। স্বামীজীর কথায়—বিস্তারই জীবন ও সঙ্কোচনই মৃত্যু। শুধু নিজের কথা চিন্তা করলে হৃদয়ের বিস্তার না হয়ে সঙ্কোচন হয়। তাতে জীবন হয়ে ওঠে একঘেয়ে। এছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে একটু আগ্রহী হলে এবং ঈশ্বরনির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনাদির মাধ্যমে ও উচ্চ মানের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করলে মনের একঘেয়েমি ভাব কেটে যাবে।

প্রশ্ন ঃ *(ক) 'সংস্কার' বলতে কি বোঝায়? সংস্কারের কি প্রকারভেদ আছে? আমরা যে পূজা-পাঠ করি, সেটা কি সংস্কারবশে করি? (খ) 'সংস্কার' ও 'বিশ্বাস'-এর পার্থক্য কোথায়?*

—অমলেন্দু সরকার, কলকাতা-৭০০ ০৫৮

উত্তর ঃ (ক) আমরা যাকিছু জ্ঞান অর্জন করি বা বিভিন্ন কর্ম করে থাকি, সেসকল মনেতে ছাপ রেখে যায়। ঐ ছাপ বা দাগগুলিকে 'সংস্কার' বলা হয়। যেমন কম্পিউটারে কোন কাজ করে তা save করে রাখা। জন্মের সময় সব মানুষ একইরকম মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তা নয়। পূর্বজন্মগুলিতে অর্জিত সংস্কার অনুসারে বর্তমান জীবনে গতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মনের গভীরে যে স্মৃতিভাণ্ডার রক্ষিত আছে, যাকে শাস্ত্রে 'সংস্কার' বলা হয়েছে—তা-ই বর্তমান জীবনের মূল কারণ হয়। তবে ঐ পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার নতুন সংস্কারের দ্বারা অতিক্রম করা অসম্ভব নয়।

(খ) বিশ্বাস ও সংস্কার এক নয়। বিশ্বাস বলতে কোন কিছুকে সত্য বলে দৃঢ় ধারণা। যেমন—একজন দিল্লি দেখেনি, কিন্তু অন্যদের কাছে শুনে বা বই পড়ে দিল্লি ভারতবর্ষের রাজধানী রয়েছে বলে দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছে। এরকম ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারে বা সব আপেক্ষিক সত্যের পারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বিশ্বাস হতে পারে। তবে বিশ্বাস গভীর হলে সংস্কারকে নতুন রূপ দেওয়া যেতে পারে। ❑

দর্শন

সাংখ্যদর্শন, লুপ্তকারিকা ও জগৎকারণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ

দেবব্রত দাস

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় না। সাংখ্যসিদ্ধান্তে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নন; প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপত্তি। প্রকৃতিই সৃষ্টির উপাদান কারণ এবং সহকারী বা নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ জীবের পাপপুণ্য প্রভৃতি। জীবসমূহের ধর্মাধর্ম অনুসারে, তাদের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে থাকে। পুরুষের সন্নিধিবশত প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয় এবং তার ফলে মহদাদির আবির্ভাব হয়। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নেই; তাই তাকে সৃষ্টিকর্তারূপে অভিহিত করা যায় না। ঈশ্বরস্থানীয় কারো পরিচালনা ব্যতীতই প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হয়ে থাকে।[১]

প্রচলিত সাংখ্যদর্শন বলতে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্য-কারিকা'য় এবং কপিল প্রণীত 'সাংখ্যসূত্র'-এ আলোচিত সাংখ্যমতকে লক্ষ্য করা হয়। সাংখ্যকারিকায় কোথাও ঈশ্বরপ্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় না। সাংখ্যসূত্রে শুধু বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি প্রমাণের অভাব দেখা যায়; এই কারণেই ঈশ্বর অসিদ্ধ।[২] উক্ত গ্রন্থদুটির প্রামাণ্যের ওপর নির্ভর করেই সাংখ্যদর্শনকে 'নিরীশ্বর দর্শন'-এর (Atheist) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাংখ্যসূত্রে কোন একজন নিত্য-মুক্ত ঈশ্বরকে (One, Eternal and Free God) জগতের স্রষ্টা (Creator)-রূপে গ্রহণ করা হয়নি। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।৯২)—এই সাংখ্যসূত্রটির তাৎপর্য হলো ঃ ঈশ্বর যিনি অনাদি ও মুক্ত, তিনি জগতের স্রষ্টা হতে পারেন না।

কিন্তু মহাভারতে সাংখ্যমতের যে-উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা হতো। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সেশ্বর সাংখ্যমত (Theist Samkhya) বর্তমানের নিরীশ্বর সাংখ্যমতের (Atheist Samkhya) রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৩]

মহাভারতে সাংখ্যমতের যে-উল্লেখ দেখা যায়, তাতে মহামুনি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা-রূপে অভিহিত হয়েছেন—"সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।"[৪] মহাভারতে বলা হয়েছে, মহামুনি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে নির্গুণ, নির্বিশেষ নারায়ণ বা বিষ্ণুকে পরমাত্মারূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং মহাভারতে সাংখ্যমতের বর্ণনায় শুধু যে পঁচিশটি তত্ত্বই উল্লিখিত হয়েছে তা নয়, এতে বিভিন্ন স্থলে ছাব্বিশটি তত্ত্বের উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। তত্ত্বসমূহের মধ্যে যা ছাব্বিশতম তত্ত্ব, তাকেই 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে। নারায়ণরূপী ঈশ্বর সকল জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন—এই চতুর্ব্যূহ অবলম্বন করে তিনি সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করে থাকেন।[৫] তিনি অনাদি, অনন্ত—সকল সুখদুঃখের অতীত। তাঁকে লাভ করাই পুরুষার্থ। ঈশ্বরকে অনেক স্থলে 'পরমব্রহ্ম'ও বলা হয়েছে—

"কালাৎ স ভগবান্ বিষ্ণুর্যস্য সর্বমিদং জগৎ।
নাদির্ন মধ্যং নৈবান্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে॥
অনাদিত্বাদমধ্যত্বাদনন্তত্বাচ্চ সোঽব্যয়ঃ।
অত্যেতি সর্বদুঃখানি দুঃখং হ্যন্তবদুচ্যতে॥
তদ্ ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং পদম্।
তদ্ গত্বা কালবিষয়াদ্ বিমুক্তা মোক্ষমাশ্রিতাঃ॥"[৬]

মহাভারতে উল্লিখিত সাংখ্যমতের সঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত 'সাংখ্যকারিকা'য় বর্ণিত সাংখ্যমতের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যমতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বর; প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়নি। প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন—ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির পরিণাম হয়ে থাকে। মহাভারতে সাংখ্যের প্রবক্তারূপে মহামুনি কপিল স্বীকৃত হয়েছেন। অপরদিকে ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন সত্তার অধিকারী। ঈশ্বরের পরিচালনা ব্যতীতই প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হয়। অবশ্য ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তকরূপে কপিলের নামোল্লেখ করেছেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি 'ষষ্টিতন্ত্র' নামক সাংখ্য গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহকে সাংখ্যকারিকার সপ্ততিসংখ্যক শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন; কেবল এর আখ্যায়িকা ভাগ এবং পরমতখণ্ডন অংশ পরিত্যাগ করেছেন—

"সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি॥"[৭]

অর্থাৎ সাংখ্যকারিকায় সাংখ্যের তত্ত্বসমূহের আলোচনা সত্তরটি কারিকায় হওয়া উচিত।

সাংখ্যকারিকা মূল সংস্কৃতে 'আর্য-সপ্ততি' এবং ষষ্ঠ শতকের পরমার্থ-কৃত চিনা অনুবাদে 'সুবর্ণ-সপ্ততি' নামে

পরিচিত। কিন্তু এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, 'আর্য-সপ্ততি' এবং 'সুবর্ণ-সপ্ততি'—দুটি ক্ষেত্রেই সাংখ্যের তত্ত্বসমূহের আলোচনা উনসত্তরটি কারিকায় করা হয়েছে—সত্তরটি কারিকায় নয়। সুতরাং একটি কারিকা কম থাকার অর্থ নিশ্চয়ই সেটি কোন কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে। আবার, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'তেও 'ষষ্টিতন্ত্র'-এর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে ষষ্টিতন্ত্রের অধ্যায়-সমূহের নাম দেখতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্রহ্ম, পুরুষ, শক্তি, নিয়তি এবং কাল সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আলোচিত 'ষষ্টিতন্ত্র'-এর বর্ণিত সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জাগতিক বস্তুসমূহের উপাদান কারণ এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারে, কালের মাধ্যমে প্রকৃতির পরিণাম সম্ঘটিত হয়ে থাকে। পরমাত্মা এক, তিনি সকল পুরুষের সমষ্টি। কোনরূপ পরিবর্তন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই তিনি কূটস্থ—নিত্য। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—এসব পরমাত্মা বিষ্ণুর বিশেষ অভিব্যক্তি। সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উল্লেখ থাকায় সাংখ্যমত নিরীশ্বর নয়—এটাই স্বীকার করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃত ষষ্টিতন্ত্র গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি ষষ্টিতন্ত্রের কোন অধ্যায়ের উল্লেখ করেননি বা ঈশ্বর সম্পর্কেও কিছু বলেননি। খুব সম্ভবত তিনি ষষ্টিতন্ত্রের কোন একটি পরিবর্তিত সংস্করণের ওপর নির্ভর করে সাংখ্যকারিকা রচনা করেছিলেন, যেটি সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ প্রাচীন সাংখ্যমত নানাপ্রকার অবস্থার প্রভাবে ঈশ্বরকৃষ্ণের সময়ে নিরীশ্বর সাংখ্যমতে পরিণত হয়েছে।[৮]

যাহোক, সাংখ্যের তত্ত্বসমূহের আলোচনা উনসত্তরটি কারিকায় হওয়ায় সপ্ততিসংখ্যক শ্লোকের একটি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই একটি লুপ্তকারিকার অনুসন্ধান ভারতীয় দার্শনিকরা করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সর্বাগ্রগণ্য। তিনি সাংখ্যকারিকার ওপর গৌড়পাদভাষ্যে উনসত্তরটি কারিকায় সাংখ্যমতের আলোচনা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তখন নিজেই একটি কারিকা রচনা করেন এবং অভিমত দেন যে, এটি একষট্টি নং কারিকার পরের কারিকা হওয়া উচিত। তিনি তাঁর 'গীতারহস্য'-এ কারিকাটি প্রথম ব্যবহার করেন—

''কারণম্ ঈশ্বরম্ একে ব্রুবতে কালম্ পরে স্বভাবম্ বা।
প্রজাঃ কথং নির্গুণতো ব্যক্তঃ কালস্বভাবচ॥''

কিন্তু পরে তিলক গৌড়পাদভাষ্য ও মাঠরবৃত্তির ব্যাখ্যা দেখে তাঁর সৃষ্ট কারিকাটির প্রথম অংশ 'কারণম্ ঈশ্বরম্ একে ব্রুবতে'টি পরিহার করে তাঁর একটি প্রবন্ধে এর পরিবর্তিত রূপ দেন—'কারণম্ ঈশ্বরম্ একে পুরুষম্'। সুতরাং তিলকের মতানুযায়ী সাংখ্যকারিকার প্রকৃত বাষট্টি নং কারিকাটি হওয়া উচিত—

''কারণম্ ঈশ্বরম্ একে পুরুষম্ কালম্ পরে স্বভাবম্ বা।
প্রজাঃ কথং নির্গুণতো ব্যক্তঃ কালস্বভাবচ॥''[৯]

অর্থাৎ কেউ কেউ নির্গুণ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলেন, আবার কেউ পুরুষকে জগতের কারণ বলেন। কিন্তু সগুণ জগৎ কিভাবে নির্গুণ ঈশ্বর বা পুরুষ থেকে উৎপন্ন হতে পারে? আবার কাল ও স্বভাব ব্যক্ত হওয়ায় এরাও কারণ হতে পারে না। সুতরাং তিলক-কৃত এই কারিকাটি অনুসারে সাংখ্য নির্গুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তবে তাঁকে জগতের চরম কারণরূপে গ্রহণও করে না। জগতের কারণ প্রকৃতি, আর প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষী হলেন পুরুষ। তাহলেও 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই'—একথা বলা যায় না।

সুতরাং সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর (atheist) না বলে 'জগতের কারণরূপ ঈশ্বর-বিহীন' (non-theist) দর্শন বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ❑

১ ''সংহতপরার্থত্বাৎ' (১।১৪০)—এই সাংখ্যসূত্রটিতে বলা হয়েছে, প্রকৃতির পরিণাম পুরুষের উদ্দেশ্যে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে উক্ত পরিণামের কোন সম্পর্কের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না।

২ 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। (সাংখ্যসূত্র, ১।৯২)

৩ "The system of Samkhya had undergone many changes in the hands of various writers at different times." (A History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Dasgupta, Vol. IV, p. 36)

৪ মহাভারত, ১২।৩৩৩।৬৪

৫ "Behaves the cosmic creator and ruler in his four-fold personality as Vasudeva, Samkarsana, Aniruddha and Pradyumna." (Mahabharata, XII, 351 & Commentary of Nilkantha on it) [A History of Indian Philosophy, Vol. IV, p. 38]

৬ আর্যশাস্ত্র, ১২শ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৮০, ১২।২০৬।১২-১৪

৭ সাংখ্যকারিকা, ৭২

৮ "We know that the Samkhya Philosophy of Kapila had begun to change its form in some of its most important features, and it is quite probable that it had changed considerably by the time it was traditionally carried to Isvarakrissna had a chance of reading this original Sasti-tantra." (A History of Indian Philosophy, Vol. IV, p. 39)

৯ Sanskrit Research, Vol. I, No. 2, Oct. 1915, Tilak's article, p. 107ff

কৃত্রিম মেধা ও মানবচেতনা

আনন্দমোহন ঘোষ

মানুষ প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করেছে নানা ধরনের যন্ত্র, যা তার কায়িক পরিশ্রম বাঁচায় এবং কমিয়ে আনে কাজ করার সময়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের জটিল অঙ্ক কষার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইসব অঙ্ক নিখুঁতভাবে দ্রুত কষার জন্য আবিষ্কার হয় কম্পিউটার যন্ত্রের। যদিও প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয় ১৯৪৬ সালে, কিন্তু যন্ত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রায় ২০০ বছর আগে থেকেই। কম্পিউটার আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়িক হিসাবরক্ষার কাজেও এর প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন যেকোন কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজন।

কম্পিউটার আজ সকলেরই খুব পরিচিত। তবে কয়জন আর মনে রাখে যে, সব কাজই কম্পিউটার করে মানুষের তৈরি করা 'প্রোগ্রাম'-এর সাহায্য নিয়ে। কোন ব্যক্তি বা সংস্থার তৈরি করা প্রোগ্রাম আইনগতভাবে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করে অন্যেরা নিজেদের কাজ কম্পিউটারকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে সহজেই। একের সাধনার ফল ভোগ করতে পারে বহুজনে। 'কষ্ট না করেই কেষ্টলাভ'—এইজন্যই হয়তো কম্পিউটার এত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

কিন্তু কি কি ধরনের কাজ কম্পিউটার করতে সক্ষম? এর উত্তর—যেসব কাজের জন্য প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব মানুষের পক্ষে। এর থেকেই আবার প্রশ্ন জাগে—কোন্ ধরনের কাজের প্রোগ্রাম লেখা যায় আর কোন্ কাজের যায় না? কম্পিউটারকে সমাধান বা কাজের পথ এমনভাবে বলে দিতে হয়, যাতে তার হার্ডওয়্যার ধাপে ধাপে সেগুলি মেনে চলার ক্ষমতা রাখে ও ফল প্রকাশ করতে পারে মানুষের বোঝার উপযোগী করে। কম্পিউটারের পরিভাষায় একেই বলে 'algorithm'। কম্পিউটারকে দিয়ে শুধু সেইসব কাজই করানো যায়, যার জন্য algorithm তৈরি (design) করা সম্ভব। Algorithm-এর সাহায্য নিয়েই লেখা হয় প্রোগ্রাম। যেসব কাজ গণিতনির্ভর বা রুটিন-মাফিক, সেইসব কাজের algorithm অতি সহজেই তৈরি করা যায়, কিন্তু এমন কিছু কাজ আছে যা মানুষ সহজেই পারে অথচ তার algorithm তৈরি করা খুবই কঠিন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মানুষের কণ্ঠস্বর আলাদা আলাদা। মানুষ কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই কণ্ঠস্বরের মালিককে সনাক্ত করতে পারে, যা কম্পিউটারের পক্ষে আজও সম্ভবপর হয়নি। এর কারণ—মানুষের বিশেষ মেধা। এই মেধা কম্পিউটারের মধ্যে আরোপিত করা যায়নি। মেধার আরো কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন মানুষের হাতের লেখা অন্যের সঙ্গে মেলে না, যদিও একই অক্ষরমালা ব্যবহার করে সবাই। মানুষের কিন্তু হাতের লেখা পড়তে অসুবিধা হয় না, অথচ কম্পিউটার আজও তা করতে পারে না। আবার মানুষ নতুন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে চিন্তাভাবনা করে, যা কম্পিউটার পারে না। মেধা মানুষের সহজাত, কিন্তু কম্পিউটারে তা নেই—সেখানে কৃত্রিম মেধা সৃষ্টি করতে দরকার পড়ে মানবমেধার।

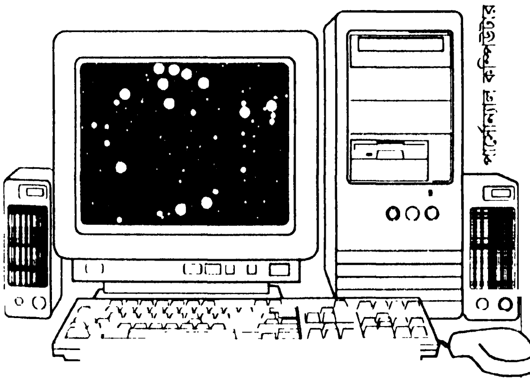
অসম্ভবকে সম্ভব করতে মানুষ সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে যায়, ফলে আবিষ্কার হয় নতুন জিনিসের। সেইভাবে বৈজ্ঞানিকরা ১৯৫৬ সাল থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কৃত্রিম মেধা কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্টি করতে—কম্পিউটারকে দিয়ে মানুষের মতো কাজ করাতে। 'কৃত্রিম মেধা' (Artificial Intelligence)—এই নামকরণ প্রথম



মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের চিত্র

করা হয় আমেরিকার ডার্টমথ কলেজ কনফারেন্সে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকগণ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জন ম্যাকার্থি, মার্ভিন মিনস্কি, ক্লড শ্যানন, অ্যালেন নিওয়েল এবং হার্বার্ট সাইমন।

১৯৫৬-১৯৬৫ সালের মধ্যে সম্ভব হয় symbolic logic-এর সাহায্য নিয়ে কম্পিউটারকে দিয়ে কিছু মেধাভিত্তিক কাজ করানো—যেভাবে মানুষ চিন্তা করে থাকে word symbol-এর সাহায্য নিয়ে। তবে ১৯৬৫-১৯৭০ সালের মধ্যে মেধা তৈরির কাজ বিশেষ না এগোলেও ১৯৭৫ সালে MYCIN নামের একটি AI software বাজারে আসে, যার দ্বারা রোগনির্ণয় বা তেলখনির অনুসন্ধান কম্পিউটারকে দিয়ে করানো সম্ভব হয়। দেখা যায়, মেধা লাগে এমন ধরনের কিছু কাজ MYCIN করতে সক্ষম। সঠিক সিদ্ধান্ত (decision) নিতে মেধা লাগে, তেমনি MYCIN-এর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। MYCIN তৈরিতে মস্তিষ্করূপে কাজে লাগানো হয় inference engine-কে, যা তথ্য বা জ্ঞান-ভাণ্ডারের (database/knowledgebase) সাহায্য নিয়ে মেধার কাজটি করে থাকে।



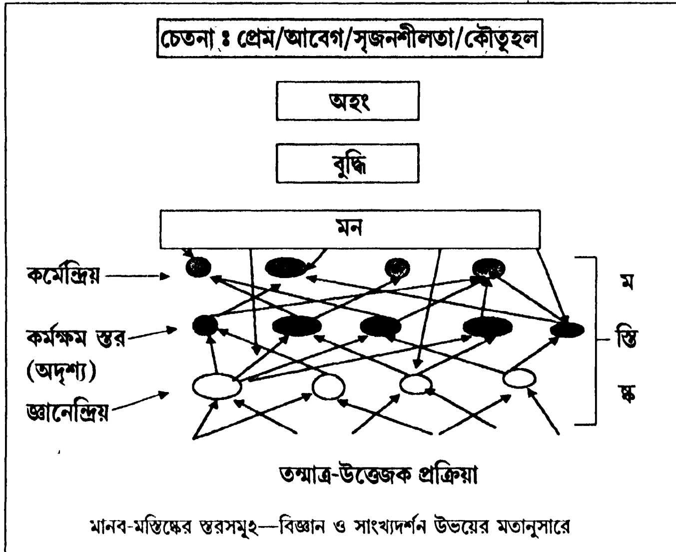
এইসময় কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অনুধাবন করলেন, কৃত্রিম মেধা সৃষ্টির সকল উপাদানকে চিহ্নিত করতে অন্য বহু বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রয়োজন। যেমন ভাষাবিদ্, মনস্তত্ত্ববিদ্, দার্শনিক, পরিচালক, চিকিৎসক ইত্যাদি। বিগত ২৫ বছর ধরে সকলে মিলে প্রভূত চেষ্টা চালিয়ে গেলেও মানুষের মেধারহস্য উদ্ঘাটন করা আজও পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে যেটুকু করা সম্ভব হয়েছে, সেটুকুর বিষয়ে খোঁজ নেওয়া যাক।

বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন, মেধার মূলে সাধারণভাবে দরকার হয় তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বা তত্ত্ব জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখা ও সেগুলিকে প্রয়োজনে কাজে লাগানোর দক্ষতা। যান্ত্রিক যুক্তি প্রয়োগে দ্রুত তথ্য বা তত্ত্ব ভাণ্ডার থেকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে আছে মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। সঠিক যুক্তি প্রয়োগ আবার নির্ভর করে পূর্বের জ্ঞান ও বর্তমান পরিস্থিতির যোগাযোগ নির্ণয় করার ক্ষমতার ওপর, যা মানুষের সহজাত। আমাদের চারধারে ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। সেইসব ঘটনা সৃষ্টি করছে বহু তথ্য, যার মধ্যে অনেক তথ্য নতুন ভাবনার সৃষ্টি করে ও অন্য সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে। এইসব মূল্যবান তথ্যই পরিক্ষিত হয়ে রূপান্তরিত হয় তত্ত্ব বা জ্ঞানসমূহে, যা সঞ্চয় করা হয় জ্ঞানভাণ্ডারে। তাই মেধা সৃষ্টিতে জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োজন খুব বেশি।

কম্পিউটারের স্মৃতিতে তথ্য, তত্ত্ব বা সাধারণ জ্ঞান সহজেই সঞ্চিত করে রাখা যায়, কিন্তু তার দ্বারা নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন বা কঠিন সমস্যার ক্ষেত্রে সেগুলির সঠিক প্রয়োগ মোটেই সহজসাধ্য নয়। বৈজ্ঞানিকরা Predicate Calculus, Horn Clause এবং Database-এর সাহায্য নিয়ে যেধরনের inference engine তৈরি করতে সক্ষম হলেন তা মানবমেধার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না।

আগেই বলা হয়েছে, সব তথ্যই তত্ত্ব নয়। তথ্য তত্ত্ব হয়ে ওঠে তখনি যখন তাকে কার্য-কারণ সম্পর্ক দিয়ে বাঁধা যায়। তাই তত্ত্ব বা জ্ঞান বলতে বোঝায়—কার্য-কারণ সম্পর্কের তথ্য, ঘটনা ঘটার নিয়মকানুন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করা নিয়মাবলী (heuristics), যা বিশেষজ্ঞ (expert)-দের কাছে সহজে মেলে। শুধু এগুলির সাহায্য নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে একধরনের কম্পিউটার মেধা তৈরি করা হলো, যার নাম দেওয়া হলো—'Expert System'। MYCIN এমনই একটি expert system সফটওয়্যার। সাধারণ জীবনে expert system-এর ব্যবহার নানা উপকারে আসতে পারে। যেমন—অভিজ্ঞ ডাক্তারদের জ্ঞান ও রোগনির্ণয় পদ্ধতি expert system-এর knowledge-base-এ সঞ্চিত থাকলে নতুন ডাক্তাররা তার সাহায্য নিয়ে আরো ভালভাবে চিকিৎসা করতে পারবেন। একইভাবে প্রমাণিত হলো যে, expert system-এর সাহায্যে কারখানা বা সরকার পরিচালনায় (e-commerce/e-governance) অনেক উন্নতিসাধন করা যায় যদি উপযুক্ত database বা knowledgebase-এর সহায়তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ একের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান অন্যেরা অতি সহজেই ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে expert system-এর সাহায্য নিয়ে। এর বেশি কিছু করা আজও সম্ভব হয়নি, কেননা মানবমেধা যে কিভাবে গড়ে ওঠে বা কাজ করে তা-ই বুঝে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

১৯৮০ থেকেই রোবটদের শিক্ষিত করার জন্য কৃত্রিম মেধার ব্যবহার শুরু হয়। রোবট হচ্ছে মানুষের মতো কাজ করতে পারে এমন এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার। সেই যন্ত্রের মধ্যে মেধা সৃষ্টি করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে আরম্ভ করলেন মানবমেধার বিশেষত্ব। আবার খুঁজে দেখার চেষ্টা চলতে লাগল কোথায় কৃত্রিম ও মানবমেধার মধ্যে তফাত। প্রথমেই দেখার চেষ্টা হলো কোন্ কোন্ বিষয়গুলি মানবমেধা পারে, কিন্তু কৃত্রিম মেধা পারছে না। কৃত্রিম মেধা পারে না নতুন কিছু আবিষ্কার করতে, সাহিত্য সৃষ্টি করতে, নানা ব্যক্তির মুখের ভাষা বুঝতে বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নিজে থেকেই জ্ঞান গ্রহণ ও সঞ্চয় করতে। পারে না অজানা বা অল্প জানা জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে। মানুষের মতো 'অহং' বোধ কম্পিউটারের নেই। কম্পিউটার মানুষের মতো ভালবাসতে পারে না বা রাগ করতে পারে না।



মানব-মস্তিষ্কের স্তরসমূহ—বিজ্ঞান ও সাংখ্যদর্শন উভয়ের মতানুসারে

স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ল জড়বস্তুর সীমানা ছাড়িয়ে মানব-মস্তিষ্কের দিকে। কী রহস্য আছে সেখানে? সেখানে আছে কোটি কোটি নিউরন কোষ আর তাদের মধ্যে যোগাযোগকারী বহু শাখা-উপশাখা, যাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'অ্যাক্সন', 'সাইন্যাপ্স' এবং 'ডেনড্রাইটস্'। ডেনড্রাইটগুলি ইন্দ্রিয় বা অন্য নিউরন থেকে পাঠানো সঙ্কেত গ্রহণ করতে সক্ষম, অ্যাক্সনগুলি এক নিউরন থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইটগুলিতে সঙ্কেত প্রেরণ করতে পারে, আর সাইন্যাপ্সগুলি পাঠানো সঙ্কেত বর্ধিত বা লঘু করার কাজে সাহায্য করে। একটি নিউরন শত-সহস্র ড্রেনড্রাইট, সাইন্যাপ্স এবং অ্যাক্সনের জালে (network) আবদ্ধ হয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শল্য চিকিৎসকদের সাহায্যে প্রমাণ করা গেল যে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি যত বেশি, তার নিউরনগুলি তত বেশি অন্য স্তরের নিউরনের সঙ্গে নানাভাবে নানা পথে যুক্ত থাকে। চেষ্টা হলো কৃত্রিম উপায়ে নিউর্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যা মানব-মস্তিষ্কের মতো কাজ করতে পারবে। বৈজ্ঞানিকরা এধরনের কৃত্রিম বুদ্ধির জালের নাম দিলেন 'Artificial Neural Network'। কৃত্রিম মেধা তৈরিতে যুক্ত হলো আরেক মাত্রা। আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো 'Artificial Neural Network' (ANN)-এর সাহায্য নিয়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিশ্চিত, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ সঙ্কেত গ্রহণ করেও প্রায় মানুষের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারা সম্ভব হলো ANN যুক্ত কম্পিউটারের পক্ষে। প্রোগ্রাম লেখায় প্রয়োগ করা হলো fuzzy logic ও probablity তত্ত্বের। এত করেও কিন্তু 'Fuzzy Neural Network'-যুক্ত কম্পিউটার মানুষের উন্নত বুদ্ধির ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না। কম্পিউটারের 'অহং' বোধ জাগানো গেল না! যান্ত্রিক উপায়ে কিছু বুদ্ধির নিদর্শন দেখালেও কম্পিউটার যে জানছে বা বুঝছে, সেই বোধ তার জন্মাল না।

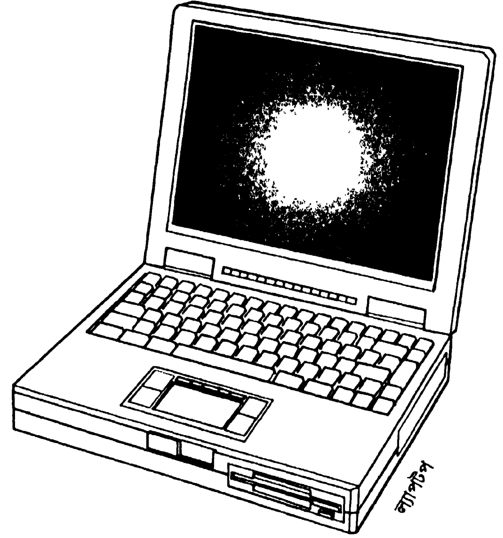
মানবমেধার আরেক বড় গুণ নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করা ও জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করতে পারা। কম্পিউটার কিন্তু নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না—প্রোগ্রামে যা লেখা থাকবে শুধু সেটুকুই নিষ্ঠাভরে করতে পারে। প্রোগ্রাম লেখে মানুষ—তাই কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষমতালাভ হয় মানববুদ্ধি বা মেধার সাহায্য নিয়ে। মানববুদ্ধি শুধু যুক্তি বা algorithm-এর ওপর নির্ভর করে না—চেতনা (consciousness) তাকে পথনির্দেশ করে। শুধু যুক্তিনির্ভর মনের কাজকে sub-conscious বা অবচেতন স্তরের কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কৃত্রিম উপায়ে ঐধরনের যান্ত্রিক মেধা হয়তো উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে কিছুটা, কিন্তু conscious বা superconscious স্তরের বুদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিনা তার উত্তর জড়বিজ্ঞানীদের আজও অজানা। উচ্চস্তরের মানবমেধা শুধুই algorithm মেনে কাজ করে না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় চেতনাবোধ।

একটা প্রশ্ন এখানে উঠে আসে ঃ মানুষই বা তার উচ্চ মেধা বা মনীষা কিভাবে অর্জন করে—জৈববস্তুর গুণের মাধ্যমে, নিউর‍্যাল জালের গঠনশৈলির জন্য, না অন্য কোন বাইরের শক্তি বা সাধনার সাহায্য নিয়ে? বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, নিউরন জাল যার যত বেশি, তার জাগতিক বুদ্ধি তত বেশি। প্রমাণিত হয়েছে অধ্যবসায়ের দ্বারা connectivity বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জাগতিক বুদ্ধিই শুধু মানুষকে 'মানুষ' করে না, দরকার হয় আরো অন্য কিছুর।

সেই আরো কিছুর খোঁজ আধুনিক বিজ্ঞান আজও দিতে অপারক, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সাংখ্যদর্শনে বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বে। সেখানে দেখানো হয়েছে—পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্), পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)-প্রযুক্ত দেহের সঙ্গে উপস্থিত থাকে মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণসম্পন্ন)। প্রকৃতি-প্রদত্ত শুধু এই ২৪টি তত্ত্বগুণের (properties) সাহায্য নিয়ে যে 'কাঁচা' বুদ্ধি লাভ করা যায় তা প্রায় যান্ত্রিক স্তরের। তবে সেই স্তরে উপনীত হতেও দরকার পড়ে 'অহং' বোধের। অহং না জড়বস্তুর ধর্ম (property), না জৈববস্তুর ধর্ম। সাংখ্য-মতে অহং বোধ থেকেই শুরু হয় 'পুরুষ'-এর বা চেতনার রাজত্ব। এখানে মস্তিষ্কের স্তরগুলি সাজানো হয়েছে সাংখ্যের model অনুযায়ী। নিচের তিনটি স্তর যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নিউরন স্তর, processing নিউরন স্তর ও কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নিউরন স্তর—বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে গঠন করতে পেরেছেন। কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে 'অহং' বোধ তৈরি করতে পারেননি তাঁরা। অহঙ্কার চেতনার reflection এবং চেতনা পুরুষেরই Universal property—প্রকৃতির নয়। চেতনা তাই চিৎ বস্তু—time independent বা নিত্য। প্রকৃতির সব বস্তুই transformable এবং time dependent, তাই অনিত্য। সেই কারণেই সাংখ্যদর্শন 'পাকা আমি'-যুক্ত বুদ্ধিকে বুদ্ধি না বলে চিহ্নিত করেছে 'মহৎ' বলে।

চেতনাসিক্ত 'মহৎ' কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই আজ epistemology-র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। যেহেতু মহৎ চেতনার ঊর্ধ্ব অঙ্গ আর চেতনা জড়বস্তু নয় চিদ্‌বস্তু, তাই কৃত্রিম উপায়ে তাকে তৈরি করা কি সম্ভব? সাংখ্য-মতে পুরুষ ও প্রকৃতির যথার্থ integration-ই তৈরি করতে পারে 'পাকা আমি'র বুদ্ধি বা মহৎকে। যেমন কম্পিউটার নিজে কিছুই করতে বা বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত করে আপন মেধা এবং চেতনাকে।

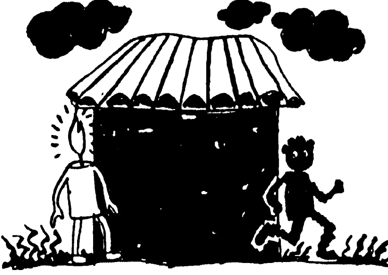
মানবদেহের জড় বা জৈব অংশ শুধু যন্ত্রের কাজগুলি করে, প্রকৃত দ্রষ্টা বা স্রষ্টা কিন্তু পুরুষ বা আত্মা। একইভাবে কম্পিউটার শুধু যন্ত্রের কাজটাই করে, কাজের অনুভূতি বা আনন্দ হয় ব্যবহারকারী মানুষটিরই। যন্ত্রের ক্ষেত্রে যা মানুষের কাজ, বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে তা পুরুষ বা পরমপুরুষের কাজ। কম্পিউটারে কৃত্রিম মেধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় মানবমেধার সাহায্য নিয়ে। একইভাবে জৈবিক মেধারও পূর্ণতা আসে না—যতক্ষণ না তার সঙ্গে যুক্ত হয় পুরুষচেতনা।



বিজ্ঞানের 'Theory of Induction' বা 'Analogy principle'-এর ওপর ভিত্তি করে তাই বলা চলে, মানুষ যা মহৎ কাজ বা সৃষ্টিধর্মী কাজ করে—তাও সম্ভব হয় শুধু পরমপুরুষের কাছ থেকে লাভ করা চেতনা বা অতিচেতনার সাহায্যে। সেই চেতনাযুক্ত 'পাকা' বুদ্ধি বিকাশের জন্য চাই মানুষের সাধনা। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুরই বিকাশ হয় মানুষের সাধনার ফলে। যেমন জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে বহির্জগতের রহস্য, তেমনি চিৎ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে অন্তর্জগতের রহস্য। জড়বিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবে তখনি যখন দুটি জগতের রহস্যের একটিমাত্র মূল কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। সেই মূল 'ব্রহ্ম' (Universal Truth) উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান আছে ভারতের বৈদিক ধর্মে। আমাদের বড় ভুল খণ্ড বিজ্ঞানকে পূর্ণ বিজ্ঞান ভেবে সন্তুষ্ট থাকা। ❑

সবুজ পাতা

ছন্দে ধৃত 'কথামৃত'



ধাঁধাই ছড়া

হাজার বছর ধরে জমা,
বলুন তো কোন্ জিনিস,
কি এলে তা এক নিমেষেই
যাবেই হয়ে 'ফিনিশ'?

ঠিক বলেছেন, অন্ধকার,
যেমনি আলো আসে,
এক লহমায় দূর হয়ে যায়,
পালায় সে এক পাশে।



ঠাকুর বলেন, অনেক দিনের
পাপ আর অজ্ঞান,
তাঁর করুণার আলো এলে
হবেই অবসান।

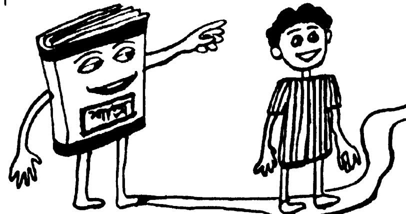
ফর্দের চিঠি



একজন লোক চিঠি পেয়েছিল কুটুম্ববাড়ি থেকে,
কিন্তু কিছুতে স্মরণে আসে না, কোথা সেটা দিল রেখে।
অথচ চিঠিটা যে করেই হোক খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন,
কারণ তাতে যে লেখা তত্ত্বের খুঁটিনাটি আয়োজন।
কাপড়-মিষ্টি কি পাঠাতে হবে, তার পরিমাণ কত,
কিনতে হবে তা চিঠিতে যা লেখা—সেই উল্লেখমতো।

এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি চলে, অবশেষে গেল মিলে,
শুধু তত্ত্বের ফর্দটি পড়ে চিঠিটাকে ফেলে দিলে।
এবার লোকটি বেরিয়ে পড়ল সোজা বাজারের পানে,
কোথা পাওয়া যাবে সে-জিনিসগুলি, ঘোরে তারই সন্ধানে।

ঠাকুর বলেন, বই বা শাস্ত্র—এরা পথ দেয় বলে,
গ্রন্থের বোঝা কিবা প্রয়োজন, উপায়টি জানা হলে?
এরপর তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা নিজেকে চালাতে হবে,
তাঁর দেখা পাবে তবে।



ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায় ছবি : সৌরীশ মিত্র

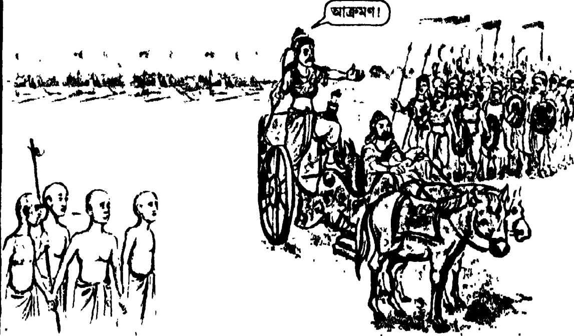


আদি শঙ্করাচার্য (৩২)

চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

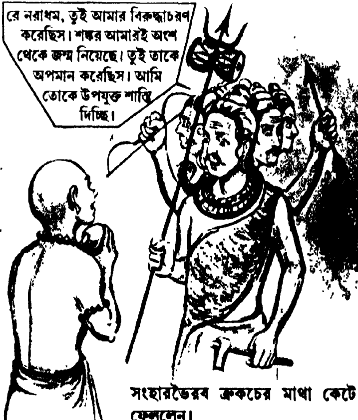
ক্রকচ ও তার সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের প্রচণ্ড আস্ফালনে ভয় পেয়ে আচার্য শঙ্করের শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। আচার্য কিন্তু নির্বিকার। এদিকে রাজা সুধন্বা তাঁর সৈন্যদের পাল্টা-আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।



প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। সুনিয়ন্ত্রিত রাজসৈন্যের আক্রমণে ক্রকচ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এবার ক্রুদ্ধ ক্রকচ এগিয়ে এল আচার্য শঙ্করের সামনে।

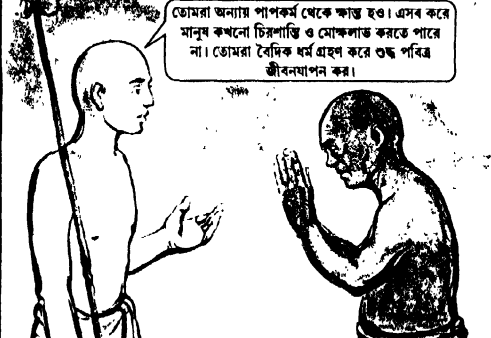


হাতে নরমুণ্ড নিয়ে ধ্যানস্থ হলো সে। ধ্যানভঙ্গের পর মদ্যপান করে সে সংহার-ভৈরবকে আহ্বান করতেই প্রচণ্ড শব্দে দশদিক কাঁপিয়ে আবির্ভূত হলেন সংহারভৈরব।



সংহারভৈরব ক্রকচের মাথা কেটে ফেললেন।

আচার্য শঙ্কর সংহারভৈরবের ধ্যান করে তাঁকে শান্ত করলেন। সংহারভৈরব তাঁকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলে অন্যান্য কাপালিকরা আচার্যের মহিমা বুঝতে পেরে তাঁর শরণ নিল। ক্রমে সেখানে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো।



আচার্য শঙ্কর এবার এলেন পুরীতে। শ্রীমন্দিরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে জগন্নাথের দারুময় বিগ্রহ নেই, শালগ্রাম শিলাতেই তাঁর পূজা হচ্ছে। তিনি সেখানকার পূজারীদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।





চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

ঐই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ পদ্ম এবং বৈদিক যুগ

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় 'প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্যে পদ্ম' নামক গবেষণাধর্মী নিবন্ধটির জন্য লেখিকা সান্ত্বনা বসুকে ধন্যবাদ। লেখিকা এবিষয়ে বলতে গিয়ে 'শতপথ ব্রাহ্মণ', 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ও 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এর বাইরে যাননি। তিনি 'অথর্ব বেদ' ও 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এর উল্লেখ এবং বৌদ্ধসাহিত্যের সামান্য আলোচনাও করেছেন। কিন্তু মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর মধ্যেও এপ্রসঙ্গে বিস্তর তথ্য আছে।

কালিদাসের রচনার কথাই ধরা যাক। পদ্মের কত ব্যবহার! 'মেঘদূতম্'-এর 'পূর্বমেঘঃ' অংশে আমরা দেখি—

"প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ।
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥" (৪০)

—সূর্য ও নলিনীর কমলবদন থেকে হিমরূপ অশ্রু দূর করতে আসবে, তুমি (মেঘ) কররোধ করলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হবেন তিনি।

'পূর্বমেঘঃ' অংশেই স্বয়ং পার্বতী কুবলয়শোভিত কর্ণে ধারণ করেন জ্যোতির্লেখামণ্ডিত বর্হ (ময়ূরপুচ্ছ)—

"জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী।
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দল প্রাপি কর্ণে করোতি॥" (৪৭)

আবার 'উত্তরমেঘঃ' অংশে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়াকে তুলনা করা হয়েছে শিশিরমথিতা পদ্মিনীর সঙ্গে—

"জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বাঽন্যরূপাম্।" (২২)

'উত্তর মেঘ'-এই যক্ষপ্রিয়ার প্রতীক্ষাশ্রান্ত চোখকে অর্ধমুদিতা স্থলকমলিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

"চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীম্।
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥" (২৯)

এখানে আমরা 'প্রেয়' অর্থে জলপদ্ম এবং স্থলপদ্মের প্রয়োগ দেখলাম। এবার 'শ্রেয়' অর্থে প্রয়োগ—যোগের পথে উত্তরণের জন্য। 'ষট্চক্রনিরূপণম্'-এ আমরা শরীরমধ্যস্থ সাতটি পদ্মের কথা জানতে পারি—'আধার পদ্ম', 'স্বাধিষ্ঠান পদ্ম', 'মণিপুর পদ্ম', 'অনাহত পদ্ম', 'বিশুদ্ধ পদ্ম', 'আজ্ঞা পদ্ম' ও 'সহস্রার পদ্ম'।

"অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধো গুদোর্ধ্বং চতুঃশোণপত্রম্।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যু তং বেদবর্ণৈঃ॥" (৫)

—মূলাধারদেশে 'আধারপদ্ম' বিদ্যমান। সুষুম্না নাড়ির মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রয়েছে। ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদির আধার। রক্তবর্ণ, চতুর্দলযুক্ত, অধোবদনে প্রস্ফুটিত ঐ পদ্মের পাপড়িসমূহে ব শ ষ স—এই বেদবর্ণচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত।

"সিন্দুর পূররুচিরারুণপদ্মমন্যৎ সৌযুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈর্বাদ্যৈঃ
সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ॥" (১৫)

—লিঙ্গমূলে (সুষুম্নার মধ্যে) যে চিত্রিণী নাড়ি শোভা পাচ্ছে, তাতে সিঁদুরের ন্যায় লোহিতবর্ণ, সুমনোরম, ষড়্দলযুক্ত একটি কমল বিরাজিত। ঐ ষড়্দল বিন্দুবিশিষ্ট ব ভ ম য র ল—এই ছয় বর্ণযুক্ত। ঐ পদ্মের নাম 'স্বাধিষ্ঠান'।

"তস্যোর্ধ্বে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে।
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপকৃতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ॥" (২০)

—নাভিমূলে গাঢ় জলদতুল্য নীলবর্ণ দশদলবিশিষ্ট 'মণিপুর' নামক পদ্ম বিদ্যমান। পদ্মদলসমূহে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ—এই দশটি বেদবর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

"তস্যোর্ধ্বে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধূককান্ত্যুজ্জ্বলং।
কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহতং সিন্দূররাগান্বিতৈঃ॥" (২৩)

—হৃৎপ্রদেশে বন্ধূককুসুমের ন্যায় সমুজ্জ্বল একটি দ্বাদশদল পদ্ম বিরাজিত; তার নাম 'অনাহত'। ঐ পদ্মের দ্বাদশ দলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ—এই দ্বাদশবর্ণ সন্নিবেশিত আছে।

"বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূম্রধূম্রাভভাসং।
স্বরৈঃ সর্বৈঃ শোণৈর্দলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ॥" (২৯)

—কণ্ঠদেশে 'বিশুদ্ধ' নামক ষোড়শদল পদ্ম বিরাজিত। এটি ধূম্রবর্ণ এবং ষোড়শদলে যথাক্রমে লোহিতবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর সন্নিবিষ্ট আছে।

"আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং।
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপদ্মং সুশুভ্রম্॥" (৩৪)

—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে 'আজ্ঞা' নামক দ্বিদল পদ্ম বিদ্যমান। এটি শশধরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এর দুটি দলে হ এবং ক্ষ—এই দুটি বর্ণ বিন্যস্ত।

"তদূর্ধ্বে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং।
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণ পূর্ণেন্দুশুভ্রম্॥" (৪২)

—শিরোদেশে শঙ্খিনী নাড়ির শীর্ষে যে শূন্যাকার স্থান আছে, সেখানে বিসর্গ শক্তি আছে। ঐ শক্তির নিচে প্রকাশমান 'সহস্রদল' পদ্ম বিরাজিত। এটি পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র, এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদক্ষরাত্মক ও নিত্যসুখস্বরূপ।

যোগ পদ্ধতিতে এইসকল পদ্মে যিনি চিত্তকে সংযত করতে পারেন তিনি প্রকৃত নীরোগ, জ্ঞানী ও আনন্দময় হন।

পদ্মের প্রয়োগ অন্য অর্থেও দেখা যায়। সুপ্রাচীন 'কৌষীতকী উপনিষদ্'-এ পৃথিবীকে বলা হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ পদ্ম বা 'কালকঞ্জ' ('পৃথিব্যাং কালকঞ্জান্', ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোক)। এই পদ্মের উদ্ভব 'কর্দম' (Interstellar dust-এর সঙ্গে তুলনীয়) থেকে।

আবার 'মহানারায়ণ উপনিষদ্'-এ (১২শ অনুবাক, শ্লোক ১৬) বলা হয়েছে—

"দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।"

—সূক্ষ্ম, পাপরহিত, পরমাত্মার উপলব্ধি স্থানভূত শরীরের মধ্যে অষ্টদল 'পুণ্ডরীক' পদ্ম বিদ্যমান। সেই ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকে সূক্ষ্ম আকাশবৎ অমূর্তব্রহ্ম বিরাজিত। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যে পদ্ম ব্যাপক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে হাতের লীলাকমল থেকে উদ্বর্তিত হয়ে পরমাত্মার আসন হয়ে উঠেছে।

চৈত্র ১৪১০ সংখ্যাতেই অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় 'বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা' নিবন্ধের শুরুতে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারকে উদ্ধৃত করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে যে-বক্তব্য পেশ করেছেন (অর্থাৎ বৈদিক যুগ হলো খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ থেকে ৫০০-এর মধ্যে), তা ভ্রান্ত বলেই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকদের কটাক্ষ করার জন্য নয়, সত্য উদ্ঘাটনের জন্যই আমার বক্তব্য পেশ করছি।

বৈদিক কাল নিরূপণের সঠিক, সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত পন্থা হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে আছে, তখন বসন্ত-বিষুবচ্ছেদ (vernal equinox) হতো মৃগশিরা নক্ষত্রে। মৃগশিরা থেকে রোহিণী নক্ষত্রে বসন্তবিষুবচ্ছেদ সরে আসার আগেই শেষ

হয়েছে ঋগ্বৈদিক যুগ। বার্ষিক অয়নচলনের মান যেহেতু আমরা জানি, তাই খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের রচনাকাল। ডাঃ নবরত্ন রাজারামের হিসাব অনুযায়ী এই সময়টি হলো খ্রিস্টপূর্ব ৩,৭০০-৩,৮০০ প্রায়। অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের রচনা আরম্ভ ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেরও আগে। আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলিও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। 'বিষ্ণুপুরাণ' বলছেঃ

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।।" (৪।২৪।৩২)

অর্থাৎ মহাপদ্মনন্দের অভিষেকের সঙ্গে পরিক্ষিতের জন্মের ব্যবধান সহস্র বছর। মহাপদ্মনন্দের অভিষেক এক ঐতিহাসিক ঘটনা, সেটি ঘটেছে ৪১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কাজেই পরিক্ষিতের জন্ম ১৪১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পরিক্ষিতের জন্ম থেকে পৌরাণিক কালের মান নির্ধারণ করেছেন গিরীন্দ্রশেখর বসু 'পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্থে। পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী তিনি রাজবংশগুলির (ইক্ষ্বাকু, পুরু ইত্যাদি) পর্যায়ক্রমে (genealogy) সাজিয়ে এবং প্রজন্মের গড় মেয়াদ ২৮ বছর ধরে দেখিয়েছেন, হরিশচন্দ্রের (যিনি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক) সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩,২০০। প্রজন্মের গড় মেয়াদ ৩০ বছর ধরলে সময়টা দাঁড়াচ্ছে ৩,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ আবারও প্রমাণিত হচ্ছে, ঋগ্বেদের রচনারম্ভ অন্তত ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা ম্যাক্সমুলারের কল্পনা সহায়ে নির্ণয় করা (সোমদেব রচিত একটি ভূতের গল্পের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত; এর কোন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই) ইতিহাস এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের অনুসরণ করছি আজও! প্রকৃত বিজ্ঞানের আলোকে ইতিহাসকে দেখার শক্তি আমরা আজও পেলাম না!

তন্ময় ধর

নবগ্রাম, হুগলি-৭১২২৪৬

প্রসঙ্গ ধর্ম

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যায় সেখ হাসান ইমামের 'ধর্ম কী, কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম এবং সেইসঙ্গে 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'ধর্ম অনুভূতির জিনিস' শীর্ষক রচনাটিও পড়লাম। দুটি আলোচনাই পড়ে ভাল লাগল। এপ্রসঙ্গে দু-একটি কথা নিবেদন করছি।

অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি যুক্তিহীন ভয় বা ভক্তি থেকে মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মায়। এই ভয় বা ভক্তি থেকে খুব কম মানুষই মুক্ত হতে পারে। মানুষ বিশ্বাস করে, এমন একজন আছেন—যিনি সর্বশক্তিমান। তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকেই হয়েছে ধর্মবিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাসই হলো ধর্ম। এই সংসারে যাকিছু ঘটে, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান ও দর্শন দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চায়। কিন্তু এই দুনিয়ায় এমন কিছু ঘটনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্য নিয়েও তা করা যায় না। শেক্সপিয়ার তাই বলেছেনঃ "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in our philosophy." তাই বলতে হয়, সব ধর্মের মূলেই থাকে এই ভাবনা। আগেই বলা হয়েছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসই হলো ধর্ম। সকল ধর্মের মূলেই থাকে সেই বিশ্বাস। পরম ঈশ্বরবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়।" স্বামীজী বলেছেনঃ "The secret of religion lies not in theories but in practice. To be good and to do good—that is the whole of religion." ভাল হওয়া ও ভাল করাই হলো ধর্ম। মানবকল্যাণের জন্যই ধর্ম। ঈশ্বর সকলের পিতা—একথা ধর্মই মানুষকে শেখায়। শেখায় মানুষকে তাঁর যোগ্য সন্তান হতে, সৎ ও ধার্মিক জীবনযাপন করতে। স্বামীজী বলেছেনঃ "ঈশ্বরোপলব্ধিই হইল সকল ধর্মের চরম উদ্দেশ্য। ধর্ম অনুরাগে, অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত। ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না।" সুতরাং ধর্ম যে অনুভূতির জিনিস—একথায় কোন সন্দেহ নেই।

ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিকে অনেকে ধর্ম বলে মানেন—হাসান সাহেবের এই কথাটি পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্পকথা মনে পড়ল। তিনি বলেছেনঃ "অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করব? ওর দ্বারা কি ঈশ্বরলাভ হয়? ঈশ্বর যদি না লাভ হলো, তাহলে সকলই মিথ্যা। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমায় শিখালে—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এল। ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বললে, ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পাল ভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেইসঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে-পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো। যারা হীনবুদ্ধি, তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া—এইসব। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া কিছুই চায় না।" সম্পাদক মহারাজ লিখেছেনঃ "আজ পৃথিবীর সভ্যসমাজ সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ হইয়া গিয়াছে। দয়া, অনুকম্পা, সহানুভূতি, হৃদয়ের উষ্ণতা ভারতবর্ষে এখনো কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হইলেও বিশ্বের অপর সকল দেশে এই শব্দগুলির বাস্তব প্রয়োগ নাই বলিয়াই শুনা যাইতেছে।"

স্বামীজী তাই বলেছিলেনঃ "আমি পৃথিবীর যেসকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, সেগুলিই মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের সমাজের সেইসব গুণ বর্জন করে মিথ্যা পাশ্চাত্য-অনুকরণমোহ আমরা বাড়িয়ে তুলছি। স্বামীজী বহুদিন আগেই বলে গিয়েছেনঃ "পাশ্চাত্য-অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না।" এই যখন অবস্থা, তখন কে আর আমাদের দিকে চেয়ে থাকবে যান্ত্রিক বিশ্বের বেদনামুক্তির জন্য!

অজিতেন্দ্র সিংহ

চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

সিয়ামে ভারত-সংস্কৃতি

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ৫,০০০ বছর আগে—যখন একদিকে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর উত্তুঙ্গ বিকাশ, অন্যদিকে আরণ্যক আর্যদের কণ্ঠে কণ্ঠে বেদগান রচিত হয়ে চলেছে। কিন্তু কেবল আর্য ও দ্রাবিড় নয়, এই উপমহাদেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে নানা ভাষাগোষ্ঠী ও জাতির ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তি কেমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, তার ইতিহাস কৌতূহলজনক ও আকর্ষণীয়।

এদেশে দ্রাবিড় ও আর্যদের আবির্ভাবের আগে যাদের অস্তিত্ব নির্ণয় করা গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো কিরাত, নিষাদ, নাগ প্রভৃতি অস্ট্রিক জাতির মানুষ। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা একসময় ছড়িয়ে ছিল ভারতবর্ষ এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ইন্দোচিন থেকে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে।

ভারতবর্ষে অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিলন ঘটে দ্রাবিড় জাতির। অস্ট্রিকদের বাসস্থান ছিল মুখ্যত পাহাড়ে, নদীর ধারে এবং অরণ্যে। কিন্তু অনেক বেশি পরিণত চিন্তা ও সংস্কৃতির বোধ নিয়ে দ্রাবিড়দের বিকাশ। তারা নগর গড়ে তুলেছিল সিন্ধুনদের অববাহিকায়। তাদের শিল্পবোধ ও ধর্মচেতনা আকৃষ্ট করেছিল অস্ট্রিকদের। স্থাপত্যশিল্পে দ্রাবিড়দের অসাধারণ দক্ষতা সমস্ত পৃথিবীর কাছেই বিস্ময়ের বস্তু। সিন্ধুসভ্যতার পতনের পর দ্রাবিড় সমাজের মানুষ ভারত থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র।



সিয়াম জাদুঘরে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি

একথা আজ ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন যে, অস্ট্রিক জাতির কর্মদক্ষতা এবং দ্রাবিড়দের শিল্পবোধ ও ধর্মচেতনার সঙ্গে মিশেছিল আর্যদের জ্ঞান ও মননশীলতা এবং এই মহামিশ্রণের ফলে জন্ম নিয়েছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি।

পাহাড়ের বুক ভেদ করে নির্গত হয় যে অসংখ্য জলধারা, সেই ধারাই একদিন মহানদী হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমগ্র সমভূমি। আর্য ও অনার্যের মিলিত সংস্কৃতির ধারা একদিন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ নিয়ে শুধু ভারতবর্ষকেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে—বর্মা, মালয় থেকে ইন্দোচিন এবং সুবর্ণদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বালি পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিকে প্লাবিত করেছে। মনে রাখতে হবে, সেযুগে সমুদ্রযাত্রায় কোন বাধা ছিল না। ঋগ্বেদেই উল্লেখ রয়েছে—ধনার্থী বণিকেরা সমুদ্র ব্যাপিয়া সকলদিকে সঞ্চরণ করে। (সূক্ত ১।৫৬।২) অধ্যাপক উইলসন ঋগ্বেদের অনুবাদগ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন: "তাঁরা সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ও বাণিজ্যে লিপ্ত মানবসম্প্রদায় ছিলেন।"

ভারত থেকে যেমন ছুটে গিয়েছে বণিক ও ক্ষত্রিয় রাজারা, চিনের দক্ষিণাঞ্চল থেকেও তেমনি বিভিন্ন উপজাতি দল বেঁধে নেমে এসেছে ইন্দোচিন ও মালয়ে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'তাই' উপজাতি—যারা দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে নেমে এসেছে এশিয়ার ভূখণ্ডে। প্রথমে 'তাই', তারপর আসে 'খামের' ও 'মন'—যাদের ভাষা এসেছে 'তাই'দের থেকে। দ্বাদশ শতকে কাম্বোডিয়ার (কম্বোজ) একটি মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, সিয়াম (বা শ্যাম)-এর অধিবাসীরা খামের সম্রাটের প্রজা ছিল।[১] কম্বোজের অর্ধাংশ তখন খামের সম্রাটের অধীন রাজ্য।

খামের ও মন—এই দুটি উপজাতিই দক্ষিণ চিন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসে খ্রিস্টজন্মের ৯০০ বছর আগে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। খামের জাতির লোকেরা বসতি গড়ে মেকং নদীর উপত্যকায় এবং মন জাতির লোকেরা থাইল্যাণ্ডের উত্তরে ও মধ্য সমভূমে স্থিত হয়। কিছু লোক আবার বর্মাতে চলে যায়। ফু-নানের আধিপত্য কমে আসে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি। মন জাতি তখন ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এদের মধ্যে উত্তরাংশে দ্বারাবতী একসময় ফু-নানের অধীনে ছিল।

খামের সম্প্রদায়ও ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়তে শুরু করেছে। কাম্বোডিয়ার আঙ্করকে কেন্দ্র করে এই

১ Thailand: A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Thailand

সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় নবম শতকের শেষে। খামের সম্প্রদায়ও ভারতের ধর্মচেতনায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ধর্ম তখন মূলত হিন্দুধর্ম, যা তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। তাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা।

ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল মন গোষ্ঠীর মানুষদের। শ্রীলঙ্কা থেকে এসে ধর্মপ্রচারকরা এই মন সম্প্রদায়কেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে। তাদের প্রেরণায় খামেররাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ফল হলো এই যে, মন ও খামেরদের মধ্যে ভারতের ধর্মচেতনার দুটি ধারাই দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একইসঙ্গে একই মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়েছে মন ও খামেরদের মধ্যে। তবে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্মরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল।

শিল্প-সাহিত্য ও ধর্মচিন্তায় প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনীতিতে মনদের নতিস্বীকার করতে হয়েছে খামেরদের কাছে। আঙ্কোরের ইতিহাস ও খামের রাজ্যের বিরাট গৌরব যে-মন্দির ও হর্ম্য (আঙ্করভাট)-কে কেন্দ্র করে, তার মধ্য দিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খামের সাম্রাজ্য।

প্রাচীন কাম্বোডিয়ায় (কম্বোজ) সংস্কৃতই ছিল মুখ্যভাষা। সিয়ামেও 'তাই' ও 'পালি' ভাষার পাশাপাশি থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে সংস্কৃত। কম্বোজের প্রাচীন নাম ছিল ফু-নান—একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দুরাজ্য। যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্ববর্তী সহস্রাব্দে উপজাতিসঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্বে এমনই একটি রাজ্য ফু-নান—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য রাজশক্তি। এই ফু-নান দখল করেছিল ভারত থেকে আগত এক হিন্দুরাজা।

চম্পার লৌকিক উপকথা থেকে জানা যায়, প্রথম খ্রিস্টাব্দে একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ—যাঁর নাম ছিল কৌণ্ডিণ্য, তিনি দৈববাণী শুনে ইন্দোচিনের সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হন। মহাভারতের দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার কাছে পাওয়া বর্শা তিনি বালির চরায় প্রোথিত করেন। সেই সমুদ্রকূলেই কৌণ্ডিণ্যের সঙ্গে দেখা হয় নাগরাজ-কন্যা সোমার। রাজকন্যা সোমা ছিলেন আবরণহীনা। কৌণ্ডিণ্য তাঁকে বিবাহ করেন এবং কম্বোজ নামে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। ফু-নানই হিন্দুরাজা কর্তৃক 'কম্বোজ' নাম পায়।

"The oldest Sanskrit inscription of Fu-nan is only one and half centuries later than the date fixed by the Chinese for the foundation of Fu-nan by the union of a brahmin and a naked woman.... "He changed all the rules according to the methods of India."[২]

ফু-নানের হিন্দুরাজাই তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেন থাইল্যাণ্ডের (সিয়াম) মধ্যবর্তী দেশ অবধি। ভারতের ব্রাহ্মণ বণিকেরা হিন্দু-সংস্কৃতি নিয়ে আগেই সিয়ামে বা শ্যামদেশে গিয়ে পৌঁছান। ফু-নানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু-সংস্কৃতি প্রসারের কাজ ফু-নানকে কেন্দ্র করেই বিস্তারলাভ করেছিল। "Fu-nan maintained a close commercial contact with India and served as a base for the Brahman merchant missionaries who brought Hindu culture to South-East Asia."[৩]

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইন্দোচিন, মালয় উপদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপে (বা দ্বীপগুলিতে) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গৌরবময় ধারা রয়েছে। ভারত থেকে হিন্দু বণিক ও রাজাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অগ্রগমন ও বিস্তার ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের ধারাকে পরবর্তী কালে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আধুনিককালে ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ গড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা অনগ্রসর ও দুর্বল জাতিগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ ও ধ্বংস শুরু করে। তারপর শক্তির নির্দয় প্রয়োগে আদিম অধিবাসীদের হত্যা করে তাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে এবং সেখানে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে, মায়াসভ্যতাকে ধ্বংস করে পাশবশক্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে স্প্যানিশ, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ প্রভৃতি ইওরোপীয় জাতিগুলি। একই রকম আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ গড়ার ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়ায় মাউড়িদের মেরে শেষ করে রাজ্য গড়েছে ইংরেজরা। স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ইওরোপীয়দের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় হিন্দুরা আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে; তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাচীন বন্যতাকে সংস্কৃত করে ভারত-সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। "The ancient Indian immigrants... allowed themselves to be assimilated by the people of the country where they migrated contributing at the same time to the development of their civilization."[৪] খ্রিস্টীয় অব্দ আরম্ভের কাছাকাছি সময়ে

২ Early Indian Culture in S. E. Asia—Ed. by Himansa Bh. Sarkar, R. C. Majumder Volume, p. 2 & 6

৩ Thailand : A Country Study, p. 5

৪ The Indian Colony of Siam—Phanindra Nath Bose, Forwarded by Dr. P. C. Bagchi, pp. 98-99

ভারতের হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন থেকেই পৌঁছেছে ইন্দোচিন ও মালয় উপদ্বীপে এবং হিন্দু-প্রভাবিত রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে কম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) ও সিয়াম (বা থাইল্যাণ্ড)-এর মতো রাজ্য, যেগুলির অগ্রগামী সংস্কৃতির ধারা পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু।

এইভাবেই প্রতিষ্ঠা সিয়ামের। 'সিয়াম' শব্দ খামের ভাষা থেকে এসেছে। চিনাভাষায় সিয়েন ও মালয়ের শ্যাম সমার্থবোধক। সিয়েন বা শ্যাম থেকে এসেছে শান > আহাম > আসাম। "The word 'Syam' is the same as 'Syam' of the Khmer inscriptions and 'Sien' of the Chinese sources. The Maloy has Syam. The original Sien-Syam is identical with Shan and Aham (Ahom) > Aham > Asham > Assam.... The people of Syam or the Siamese were a branch of the Laotian Thai which migrated to the south, mixed up constantly with Khmer people already Hinduised and built up in course of time the Siamese nation."[৫]

ভারত থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথম প্রবেশ করেছে সিয়ামে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব সিয়ামিজদের জীবনে কত গভীরে ছিল তার নিদর্শন এখনো ছড়িয়ে আছে সিয়ামের পথে ঘাটে—শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তিতে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবের মূর্তি থেকে জানা যায়, কামফেংফেটের রাজা ধর্মাশোক সেখানে শৈবধর্মের প্রচলন করেন। 'টাকোপা' নামের এক বিষ্ণুমন্দিরে উৎকীর্ণ রয়েছে তার ইতিহাস; নবম শতকে সেই মন্দির স্থাপিত। সিয়ামের ব্রাহ্মণসমাজ এখন 'ফ্রাম' নামে পরিচিত।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরে সিয়ামে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবেশ। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে 'রামাথিবোধি' নামের এক শক্তিশালী রাজা (থেরবাদ) বৌদ্ধধর্মকে তাঁর রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন।[৬] তখন থেকেই সিয়ামের অধিবাসী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত; বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি জাতীয় জীবনের সংস্কৃতিরূপে পরিগণিত।

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজা উথুং চাউ ফ্রায়াতে নিয়ে যান তাঁর রাজধানী। রামায়ণে রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যার অনুসরণে তাঁর নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন 'আয়ুথায়া'। এই উথুংই পরবর্তী কালে 'রামাথিবোধি' নাম গ্রহণ করেন। এই রামাথিবোধি সিলোন (শ্রীলঙ্কার রাজধানী) থেকে এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীদেরও নিয়ে আসেন সিয়ামে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র (হিন্দুশাস্ত্র) অনুযায়ী আইন ও আইনবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন রামাথিবোধি।

রামাথিবোধি 'দেবরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁকে লোকে শিবের অবতার বলে মনে করত। রাজা দেশের ধর্মাচরণের জন্য একদল ব্রাহ্মণকেও নিযুক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না সিয়ামে, তাঁরা সমভাবে সম্মানিত হয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রাজা যোৎফা থাইভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করান, যার নাম 'রামাকিয়ান'।

থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক নগরীর মিউজিয়ামে যেসব মূর্তি সাজানো আছে, অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু তাঁর গ্রন্থে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকাতে রয়েছে গণেশ, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, শিব, শাক্যমুনি (বুদ্ধ), বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বুদ্ধ ও উপাসনারত ভক্তবৃন্দ, শিব, শঙ্খচক্রভূষিত চতুর্ভুজমূর্তি (বিষ্ণু) এবং মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য প্রভৃতি। এছাড়া আরো অনেকগুলি মূর্তি রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিহেতু ব্যাঙ্ককের সর্বত্রই এখন বুদ্ধমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। ❑

● **আরো যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে:**

১ Ancient Indian Colonies in the Far East—Dr. Ramesh Chandra Majumder, Vol. I & 2

২ দ্বীপময় ভারত—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩ Culture and Civilisation of Ancient India—D. D. Koshambi

৫ The Indian Colony of Siam

৬ Thailand : A Country Study

অনুষ্ঠান-সূচী : আষাঢ় ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	:	**গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)** আষাঢ় পূর্ণিমা ১৮ আষাঢ়, শুক্রবার (২ জুলাই ২০০৪) **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ** আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৩১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই ২০০৪)
পূজাতিথি-কৃত্য	:	**রথযাত্রা** আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া ৫ আষাঢ়, শনিবার (১৯ জুন ২০০৪)
একাদশী-তিথি	:	১৫, ২৯ আষাঢ় মঙ্গলবার, মঙ্গলবার (২৯ জুন, ১৩ জুলাই ২০০৪)

ভারতীয় সাহিত্য

রামবহাল তেওয়ারী

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান এবং বিধান—ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য রূপগত অর্থাৎ বাইরের, ঐক্য ভাবগত অর্থাৎ ভিতরের। ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই ভারত তার এই প্রাচীন সাধনার ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে। তাহলেও ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় সাহিত্য বলতে কী বোঝায়, সেসম্পর্কে একটা স্পষ্টতর ধারণার প্রয়োজন আছে। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলতে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উল্লেখ করা যায়। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বলতে বাঙলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, অসমিয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় এবং মালয়ালম প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি যায়। এটাও অস্বাভাবিক নয়। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যেক ভাষার সাহিত্য একই সঙ্গে প্রাদেশিক এবং ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের পরিচায়ক। তাহলেও ভারতীয় সাহিত্যের ধারণাটি অস্পষ্টই থেকে যায়। ধারণাটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দেন ১৯০৭ সালের প্রথম দিকে। দ্বিতীয় বক্তৃতায় 'বিশ্বসাহিত্য' বিষয়ে ব্যক্ত তাঁর অভিমত অনুসরণে আমরা অগ্রসর হব।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা জানি না। সুতরাং সেসবের অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই। তেমনি তাদের কাছে আমরাও নেই। পারস্পরিক যোগের দ্বারাই এই অস্তিত্বের সত্যতা আমাদের একেকে অপরের কাছে সত্য করে তোলে। এইভাবেই আমরা সত্যকে পাই। এই পাওয়াটা প্রাদেশিক ভূমিতে যেমন, ভারতভূমিতে তেমনি, তেমনি বিশ্বভূমিতেও। সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যোগের মাধ্যম তিনটি—বুদ্ধি, প্রয়োজন এবং আনন্দ। বলা যায়—বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ এবং আনন্দের যোগ। বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্য জানার চেষ্টা করে বুদ্ধি। যত জানতে পারে ততই বাড়ে তার গর্ব ও অহংভাব। তাতে স্পষ্ট হয় বুদ্ধির শক্তির পরিমাণ। নগ্ন হয়ে ওঠে বুদ্ধির প্রতিযোগী মনোবৃত্তি। প্রয়োজন অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কাজের গরজে সত্য আমাদের অনেক কাছে এসে যায়। তবু দূরত্ব পুরোপুরি ঘোচে না। আমরা সত্যকে কাজে লাগিয়ে আপন মনোরথ সিদ্ধ করি এবং জলবায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গকে ইচ্ছার দাস মনে করে যেমন চাই তেমনি চালাই। তৃতীয় পর্যায়ে আনন্দ অর্থাৎ সৌন্দর্যের যোগে সত্য ও ব্যক্তির মাঝের সমস্ত পার্থক্য লোপ পেয়ে যায়, অহং উবে যায়; তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছের কাছেও আত্মসমর্পণে দ্বিধা থাকে না। আনন্দের যোগে সৌন্দর্যের প্রভাবে বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তির অস্তিত্বের অনুভূতি চাপা পড়ে যায়। তখন কেবল নিজের অনুভূতিই জাগে, মাঝে কোন আড়াল বা হিসাব-নিকাশ থাকে না। সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ যেন বিদ্যালয়, যেখানে বুদ্ধির চর্চা ও তীক্ষ্ণতা বিধান চলে। প্রয়োজনের যোগ যেন দপ্তর, জীবনের পাথেয় আহরণই সেখানে প্রধান। আর আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। সেখানে সহজ, সুন্দর পরিবেশে মানুষের মন বিশ্রাম করে। বিদ্যালয়ে সাজসজ্জা নেই, দপ্তর নিরাভরণ আর ঘরখানি সুন্দর, সুসজ্জিত, মিলনমন্দির। আনন্দযোগের ভিতরের কথাটি হলো—পরকে আপন করে জানা ও পাওয়া, নিজেকে পরের বলে মানা। এই জানা ও মানা কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। মানুষ যেমন নিজেকে ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে অন্যকেও। এই পরকে নিজের মতো এবং নিজেকে পরের মতো করে দেখা ও পাওয়াতেই যথার্থ যোগ এবং তার আনন্দ। এই আনন্দানুভূতিই প্রেমের পরিচায়ক। এই প্রেম সত্যেরই অন্য নাম। সমস্ত দেশকে, দেশের মানুষকে যখন এই সত্য-প্রেমের আলোতে দেখা যায় এবং আনন্দে এক হওয়া যায়—সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে অনুভব করা যায়, তখনি আমাদের হৃদয় দৈশিক আনন্দানুভূতিতে ভরে ওঠে। এই আনন্দ, এই অনুভূতির উৎসমূলে পুরো দেশ, তাই এই দেশজ আনন্দের ভাগ সকলকে দিতে ইচ্ছা হয়, আর সেই ইচ্ছাপূর্তির সুফল হলো সাহিত্য।

অবশ্য এক্ষেত্রে সকলের মধ্যে সকলের মতো করে নিজেকে জানার প্রবল বাধা স্বার্থ ও অহঙ্কার। তা আমাদের স্বদেশে যেমন, তেমনি অন্যত্রও। এইসব খণ্ড-ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তির তাড়নায় আমাদের আত্মিক গতিস্রোত টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তখন আর মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। আর আজ এই স্বার্থ ও অহঙ্কার এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আমাদের আবহমান কালের শান্ত, শিব ও সুন্দরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে প্রকারান্তরে অতিবাস্তব সাহিত্যরূপে গুরুত্ব ও স্বীকৃতি পাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এবং অহঙ্কার বাস্তব হলেও অপরিহার্য নয়। সুতরাং তা যে সাহিত্যের স্রষ্টা ধারক ও

বাহক, সেই অতি আধুনিক সাহিত্যও অপরিহার্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু তার স্বাভাবিকতা ও শাশ্বততা নিয়ে প্রশ্ন জাগতেই পারে।

যে-ধর্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তার পূর্ণ প্রকৃতিকে জানার জন্যই, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্যই তাকে বিশ্লেষণ করা দরকার, তার অন্তর্গঠন বোঝা দরকার। এইভাবে যে নিজেকে সচেতনভাবে জানতে সক্ষম হয়, তার আত্মচৈতন্য যত পূর্ণতা লাভ করে, তার আনন্দ ততই নিবিড় হয়। একথাটি সব বিষয়ে খাটে। বুদ্ধির একটা ধর্ম কার্যকারণ সম্পর্ক ঠিক করা। যা সহজ ও প্রত্যক্ষ তাতে কাজ করার সময় সে নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতের কার্যকারণ সম্পর্ক এমনভাবে সংগুপ্ত যে, তার উদ্ধার করতে বুদ্ধিকে বেশ বেগ পেতে হয়। সেই তৎপরতায় সে বিজ্ঞান-দর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড়ভাবে অনুভব করে, তাতেই বাড়ে তার গৌরব, তার মর্যাদা। আসলে বিজ্ঞান-দর্শন জাতীয় বিষয়ের মধ্যে আত্মোপলব্ধিই বুদ্ধির একমাত্র লক্ষ্য। আপন নিয়মে সে বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখে। আর এটিই হলো তার নিজেকে বুঝতে পারা। এই দেখা এবং বোঝাতেই বুদ্ধির আনন্দ। জগতের ব্যাপক ব্যাপার আমার বুদ্ধিতে পেলাম, সর্বত্র আমার বুদ্ধির প্রসার ও অস্তিত্ব অনুভব করলাম। ধূলিকণা থেকে সূর্য, চন্দ্র,' তারা সবই পেলাম। এইভাবে অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে টেনে এনে যতটা সম্ভব বেশি করে মানুষের কাছে প্রকাশ করছে, বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে আবার তা মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে সবকিছুর বুদ্ধির মাধ্যমে মিলনই জ্ঞান। আর এই মিলনেই আমাদের বোধশক্তির প্রত্যাশিত আনন্দ। একই নিয়মে সমস্ত মানুষের সঙ্গে নিজের মনুষ্যত্বের মিলনকে পুরোপুরি পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাতেই তার যথার্থ আনন্দ। এই প্রাপ্যকে পূর্ণ সচেতন-রূপে পাওয়ার জন্য তাকে বাইরে-ভিতরে কেবল বিরোধের ও বিঘ্নের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। তাই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এমন অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এইসব প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যেখানেই মানুষের ধর্ম পরিপূর্ণ সুন্দররূপে সুস্পষ্টরূপে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানেই তার বড় আনন্দ। সেখানেই আমরা ভারতবাসীরা নিজেকে বড় করে পাই। দেশের মহামানবের জীবন ও বাণীর মধ্যে যেন নিজের বদ্ধ আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রকাশিত-প্রসারিত পাই। দেশের ইতিহাসেও একই প্রাপ্তি ঘটে। আমরা আমাদের স্বভাব-চরিত্রকেই নানা লোকের মধ্যে নানা কালে, নানা ঘটনায়, নানা আকারে বিচিত্র পরিমাণে দেখে রস বা আনন্দ উপভোগ করে থাকি। তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সকল মানুষকে নিয়েই আমি এক। এই ঐক্যবোধের মাত্রা যত বেশি গভীর ও নিবিড় করে অনুভব করব, ততই বেশি মঙ্গলময় আনন্দ লাভ করব। এই যে সকল মানুষকে নানাভাবে পাওয়া এবং নিজের সাধ মিটিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে চিরকালের মতো ধরে রাখার একটা প্রয়াস, তাতে সবকিছুই হৃদয়ের সহজ-সুন্দর প্রীতিপ্রদ সামগ্রী হয়ে ওঠে। পেয়ে যায় স্থায়ী অক্ষয় রূপ। সে তখন আর সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভেসে যায় না।

সংসারে মানুষের আত্মপ্রকাশের দুটি পথ—কর্মশৃঙ্খলা ও সৃজনশীলতা। ধারা-দুটি বহমান পাশাপাশি। তার মধ্যে আবার কাজ-কর্মে এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিয়েছে। এ-দুটি যেন একটি অন্যটির পরিপূরক। এদের ভিতর দিয়েই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরোপুরি জানার প্রয়াস করতে হবে।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবাসী তার প্রকৃতি দেশের ও বিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে নানা রূপে সকলের মাঝে নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছে। এইভাবে যা ভাবের মধ্যে ঝাপসা ছিল, তা আকার পেয়েছে কর্মে; যা একের মধ্যে ক্ষীণ ছিল, তা অনেকের মধ্যে নানা অঙ্গ লাভ করে একটি বড় এবং বিশিষ্ট ঐক্যের জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফলস্বরূপ মনে হয়, মানুষ ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের প্রয়াসকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কারণ মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের প্রকাশ সম্ভব নয়। হলেও তা হবে অর্থহীন। সেই কারণেই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপই সমস্ত মানুষকে নিয়ে সৃষ্টি করেছে সভ্যতার। সভ্যতার এক অর্থ মনুষ্যত্বের বিকাশের পূর্ণতা। সেই সভ্যতার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না, যেখানে আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, পৃথক, সকলে সকলের সঙ্গে যুক্ত নই। সকলকে নিয়েই তো সভ্যতা। তাই দেখা যায়, সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে আঘাত লাগলে তা সকলের বৃহৎ কলেবরে লাগে, সমাজ বা রাষ্ট্রের অংশবিশেষ সঙ্কীর্ণ হলে প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস খর্বিত হয়। ব্যক্তির মানসিক উদারতা তার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। যেখানে সঙ্কোচনের পরিমাণ যত বেশি, মানুষের আত্মপ্রকাশের মাত্রা সেখানে ততই কম, মনুষ্যত্ব জীর্ণ ও দুর্বল। কারণ, সংসার কাজের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্য এবং এই প্রকাশই তার সমস্ত আনন্দের মূল উৎস। সুন্দর সাহিত্যে যে আনন্দের সামগ্রী তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই প্রকাশটিই আসল লক্ষ্য নয়। প্রকাশ করতে গিয়ে যে-অভিপ্রায় সাধিত হয়, তা কাজের ওপর দিয়ে ঠিকরে পড়ে, স্পষ্ট করে তোলে তার প্রকৃতিকে। তারই সঙ্গে নানা আকার-ইঙ্গিতে সে নিজের মনের আনন্দকে অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে, জাগিয়ে

তুলতে চায়। আপন মনের অভিপ্রায়কে সানন্দে সাজিয়ে-গুছিয়ে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করে সৌন্দর্যের আধাররূপে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। সহজ-স্বাভাবিক এই আত্মসংযোগ ভারতবাসীর একটি বিশেষ ধর্ম। সে আপন মনের আবেগকে বাইরের জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়, তার হৃদয়ের সত্যকে সকলের সহযোগে বাইরের সত্য করে তুলতে পারলেই যেন সে বাঁচে। কারণ, নিজের মধ্যে যেন সে নিজে পরিপূর্ণ নয়। বাইরের বস্তুসত্যকে সে আপন হৃদয়মাধুরীর প্রলেপে মনোমতো রূপ দিয়ে নেয়। তাতে পায় সে সৃষ্টির আনন্দ। অন্যকেও সে আনন্দ দিতে চায়, তা নাহলে তার হৃদয়কে সে বাইরে দেখবে কী করে? এরকমই দরকার। তা নাহলে হৃদয় হয়ে উঠবে নিষ্ক্রিয়, উদাস! আর উদাস মানেই মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কটি রসের। রস স্থবির নয়, জঙ্গম। তাই রস থাকলেই চলে দেওয়া-নেওয়া। বস্তু থেকে রস নিয়ে হৃদয় জগৎকে ফিরিয়ে দিতে চায়। এই দেওয়াটা ভাষা, স্বর, তুলি, মুদ্রা, পাথর ও সঙ্কেত ইত্যাদির সাহায্যে ঘটে। তাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হলে ভাল, আর নাহলে আরো ভাল। এমনকি প্রয়োজনের বিনষ্টি ঘটলেও ক্ষতি নেই। তবে নিজেকে প্রকাশের ব্যাপারটি সিদ্ধ হওয়া চাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের প্রকৃতিতে এই প্রকাশের বিভাগটি আসলে কি একটি বাজে খরচ? এখানে বুদ্ধি হতবুদ্ধি।

মানুষের হৃদয়ধনের কাছে বাইরের সব ধর্মই তুচ্ছ। মানুষ সেই পরম ধনকে বাইরে প্রকাশ করতে চায়, সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। তা সেই হৃদয়ধন প্রেম হোক, স্নেহ হোক, শ্রদ্ধা হোক—যাই হোক না কেন? অন্তরের সামগ্রীকে বাইরের সামগ্রী করতে সে ধন-মান-প্রাণ সমস্তই বিসর্জন দিতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বিরোধী পক্ষরা শত্রুকে হারাতে চায় যেন-তেন-প্রকারেণ। তাহলেও তার সঙ্গে আনন্দের একটা যোগ থাকে। সৈন্যরা রংচং মেখে, চিৎকার করে, বাদ্যাদি বাজিয়ে, তাণ্ডবনৃত্য করে অন্তরের অভিপ্রায়টি প্রকাশ করে। আসলে আত্মপ্রকাশের তৃপ্তিতেই তার সার্থকতা। তাই এই কাজে খরচের হিসাব পড়ে। তবে এই বাজে খরচ সৌন্দর্যেরই অন্য নাম—যা দৃষ্টিনন্দন, মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ। ভারতবাসীর কাছে ভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যা সুন্দর তা সুন্দরই, যা বিরাট তা মহান, আর যা রুদ্র তা ভয়ঙ্কর। জগতের রস আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়ের রসকে বের করে আনে। এসবের লক্ষ্য আর যাই হোক, এই প্রকাশ ও মিলনই যে মূল তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সমাজে মানবসংসার ও জগৎসংসারে একটা মিল আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ, মঙ্গলরূপ প্রকাশ পাচ্ছে নানা কাজে, আর তাঁর আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হচ্ছে জগতের নানা রূপে ও রসে।

আমাদের জীবনের নির্ঘণ্টে আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজে উৎসাহ যোগাচ্ছে, আর আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করছে। আমরা কাজে করি আত্মরক্ষা আর রসে করি আত্মপ্রকাশ। আত্মরক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে আত্মপ্রকাশ সেই প্রয়োজনেরও অধিক। আপাতভাবে প্রয়োজন প্রকাশকে এবং প্রকাশ প্রয়োজনকে বাধা দেয়। কারণ, স্বার্থ বাজে খরচের বিরোধী। কিন্তু বাজে খরচেই আনন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটে! তাই স্বার্থ আত্মপ্রকাশে সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী আর আনন্দোৎসবে স্বার্থ অনাহূত। তাকে আমরা যতই ভুলতে পারি, আমাদের উৎসব ততই উজ্জ্বল হয়। সুতরাং সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোন বাধা নেই। সেখানে স্বার্থের কোন স্থান নেই। দুঃখ চোখের জল ঝরায়, কিন্তু সংসারে বিঘ্ন ঘটায় না। ভয় হৃদয়ে দোলা দিলেও শরীরে আঘাত করে না, সুখ হৃদয়ে পুলক জাগায়, কিন্তু লোভকে বাড়িয়ে তোলে না। তাই ভারতবাসী নিজের প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশাপাশি অপ্রয়োজনের সাহিত্য রচনা করে চলেছে। তাতে নিজের বাস্তব কোন ক্ষতি না করে রসের মাধ্যমে নিজ প্রকৃতিতে নানা রূপের অনুভব করে আনন্দ পায়, আর আপন প্রকাশকে করে রাখে মুক্ত, নির্বাধ। সেখানে নেই দায়দায়িত্ব, নেই পেয়াদা-বরকন্দাজ, আছে একমাত্র খুশি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার খুশি। তাই মানুষের যে-প্রাচুর্য, যে-ঐশ্বর্য সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, যা সংসারের বাস্তবের গণ্ডিতে সীমিত নয়—ভারতীয় সাহিত্যে আমরা তারই বিশদ পরিচয় পাই।

ভারতের শাশ্বত বাণী—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখং অস্তি।" এই সুখ আনুভূতিক রসের সুখ। তা ভোজনরসের নয়। কারণ, ভোজনের রস ভোজ্যসামগ্রীতেই সমাপ্তি পায়, তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তির সাময়িক তৃপ্তিতেই তার ক্ষান্তি। আমাদের ভাণ্ডারে যা কুলোয় না, সেইসব রসের বন্যাই সাহিত্যের শিরা-উপশিরায় কলধ্বনি করতে করতে প্রবাহলাভ করে। মানুষ কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তাই ভরা হৃদয়ের বেগে তাকে সাহিত্যে মুক্তি দিয়ে, প্রকাশ করে তবে বাঁচে। এই প্রাচুর্যের প্রকাশের সাহায্যে ভারতবাসী তার যাকিছু বড়, যাকিছু নিত্য, যা কাজেকর্মে ফুরিয়ে যায় না—তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করে তার বিরাট রূপটি গড়ে তোলে। সংসারে যা আমাদের চোখে পড়ে তা ছড়ানো-ছিটানো—এখানে একটু সেখানে একটু, এখন একটু তখন একটু—আরো দশটার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তবে সাহিত্যে সেইসব ফাঁকফোকর থাকে না, মিশেলও থাকে

না। থাকা সমীচীনও নয়। তার জন্য যে-স্থানটি নির্দিষ্ট হয়, সেখানে কেবল সে-ই দীপ্যমান। মানুষ যাকে করুণায় বা বীর্যে, শান্তিতে বা স্বস্তিতে আপন যথার্থ প্রতিনিধিরূপে যে-প্রকাশকে স্বীকার করে, যা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত সহ্য করে—সহজেই তাকে সাহিত্যে স্থান দেয়। তবে মানুষের বিচারবুদ্ধি, সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছুই তো আর বড় মাপের নয়, মহৎও নয়, কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহ আমাদের সহজেই ছোট করে দেয়। তখন সেই বিকৃত, অপ্রকাশিত রূপই সাহিত্যদর্পণে বড় হয়ে দেখা দেয়। আর সেই কলঙ্কের ওপরই স্পর্ধার আলো পড়ে। তখনি কলার বদলে কৌশল, গৌরবের বদলে গর্ব, বিনম্রতার বদলে ঔদ্ধত্য আত্মপ্রকাশ করে নগ্নভাবে। এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জীবনে যাকিছু বড়, যাকিছু নিত্য, যা আমরা কাজেকর্মে ফুরিয়ে ফেলতে পারি না—তা-ই ভারতীয় সাহিত্যের মূল উপকরণ হয়ে ভারতবাসীর মহৎ বিরাট রূপকে গড়ে তোলে। তবে মহাকালই শেষ বিচারক। তিনি সমস্ত কিছু ছেঁকে নেন। যা ছোট, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ তা তাঁর চালুনিতে গলে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়, হারিয়ে যায়। কেবল সেই বস্তুই টেঁকে, যাতে সকল মানুষ নিজেদের দেখতে পায়। এই বাছাবাছির পর যা থেকে যায়, তা কেবল ভারতেরই নয় সব দেশের, সব কালের পরম সম্পদ। অবশ্য তাতেই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভারতের মর্মবাণী।

এইভাবে ভেঙেচুরে গড়ে ওঠে সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতি, মানুষের প্রকাশের একটি চিরন্তন আদর্শ সহজেই রূপলাভ করে। সে-আদর্শ নতুন যুগে সাহিত্যসৃজনকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতীয় ভাষায় রচিত যে সাহিত্যের মূলসুর ভারতের মর্মবাণী, তাকেই ভারতীয় সাহিত্যরূপে গণ্য করা যায়। অবশ্য বিশ্বের মর্মবাণীর সঙ্গে তার সাম্য নিশ্চয়ই আছে।

যদিও সাহিত্যকে দেশ-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে ছোট করে না দেখাই ভাল, তবু কার্য-কারণ বিশেষে মানুষের আত্মরতির জন্য, দেশের মানুষের আত্মিক তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য, তাদের জীবনাশ্রিত সাহিত্যকে 'ভারতীয় সাহিত্য'রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি ভারতের যেকোন অঞ্চলের মানুষ হই না কেন, নিজেকে মাত্র উপলক্ষ্য রেখে, রচনায় নিজের ভাবনায় সমগ্র দেশের, এমনকি সমগ্র বিশ্বের ভাব আয়ত্ত করে তার চিত্রণ যদি করি, তবে তা সাহিত্য হয়ে উঠবে। তাতে প্রকাশ পাবে সকল মানবের অনুভূতির জগৎ, ব্যথা-বেদনা, হর্ষ-আনন্দের জগৎ। ভাবা ভাল—সাহিত্যমন্দিরটি নির্মাণ করেছেন ভারতীয় চিত্তরূপ মিস্ত্রি, নানা প্রদেশের নানা ভাষার লেখকরা হলেন মজুর। পুরো মন্দিরের পরিকল্পনার কথাটি জানা নেই। তাই ভুলভ্রান্তি ঘটা ও কোন কোন অংশ বারবার ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্য আপন আপন স্বাভাবিক শক্তিতে রচনায় সমগ্র দেশের রূপ-বর্ণ-গন্ধ-ধন-মান-যশ-অভিরুচিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রসে পরিপুষ্ট করে চলেছেন। তাতেই আছে তাঁর যথার্থ পরিচয়, যা তাঁকে দান করে সাহিত্যিকের গৌরব।

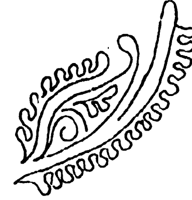
আপন আপন কাজ-কর্মে, বাইরে ও মর্মে ভারতবাসী কী বলতে চাইছে, তার চেষ্টা কী, লক্ষ্যই বা কী—যদি এসব বুঝতে হয়, অনুসরণ করতে হয়, তাহলে দেশের পুরো ইতিহাসের মধ্যে তার অভিপ্রায়টি সুস্পষ্ট করে পেতে হবে। ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান-কাল—এসবের ওপরে উঠে সমষ্টির মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে, অনুভব করতে হবে। নিত্য মানুষের নিত্য সচেষ্ট অভিপ্রায়কে অনুধাবনের চেষ্টা করাই যথার্থ এবং স্বাভাবিক সার্থকতা। খণ্ড ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে পরম একের অনুভূতি ও দর্শন করাই ভারতীয় জীবনসাধনার মহৎ অভিপ্রায়। শান্ত শিব অদ্বৈতের সাধনাই ভারতের চিরন্তন সাধনা—একথা তো সকলেরই জানা। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপন আনন্দকে কেমন করে প্রকাশ করছে, সেই প্রকাশের মধ্যে তার আত্মা আপন কোন্ নিত্যরূপকে দেখতে চায়—এসবই একদিকে ভারতীয় সাহিত্যের, অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের পরম ধন। ভারতবাসীর চোখে রোগী, ভোগী না যোগী—কোন্ রূপটি আনন্দে ভরা? তাতে তার দেশব্যাপী আত্মীয়তা কতদূর সত্য হয়ে উঠেছে? অর্থাৎ সত্য কতদূর তার নিজের হয়ে উঠতে পেরেছে? এসবই জানিয়ে দেবে ভারতীয় সাহিত্য। তা যেন মানুষের চারপাশ ঘিরে ভাষা-আশ্রিত একটি প্রকাশমণ্ডল—যেখানে বইছে জ্যোতির ঝড়, ঘটছে জ্যোতির উৎসরণ, রূপ নিচ্ছে জ্যোতির্বাষ্পের সঙ্ঘাত। তাতে ভারতীয় জীবনের বলিষ্ঠতা দীপ্ত আলোকিত হয়ে উঠছে—নিজেকে ব্যক্ত করে দান করে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে—ভারতীয় সত্তা। এ এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার!

লোকালয়ের পথ ধরে যেতে যেতে চোখে পড়ে মানুষের অবকাশহীনতা। মুদি দোকান দিচ্ছে, কামার লোহা পিটছে, মজুর বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, বিষয়ী হিসাবের খাতা মিলিয়ে দেখছে—এরকমই আরো কত কী! তবে একটি ছবি এসমস্ত কিছুর আড়ালে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তা হলো, এসব কিছুকে আশ্রয় করে যেসব মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা, দারিদ্র্য অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তা প্রশস্ত-প্রসারিত এবং উপভোগ্য করে চলেছে এক রসের ধারা। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কীর্তন-পাঁচালি, কথকতা, বেদ-পুরাণ-

ভাগবত পাঠ, পূজার্চনা—ভারতের চিত্তসুধাকে প্রত্যেক লোকের কাছে বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গিতে অসম-বিষম নানা পরিবেশে বিতরণ করে চলেছে। দেশের নিতান্ত তুচ্ছ অশিক্ষিত লোকের ক্ষুদ্র কাজ ও চিন্তার পিছনে রাম-লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে থেকে সঞ্চালিত করে চলেছেন। ছোট্ট অন্ধকার বাসাটিতে পঞ্চবটীর স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, করুণা ও সহানুভূতিময় বাতাবরণ গড়ে উঠেছে। ভারতবাসীর হৃদয়ের সৃষ্টি ও প্রকাশ, তার কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে কল্যাণ ও মঙ্গলের ছোঁয়ায় মধুর-মনোরম ও সরস করে তুলেছে। আসলে সব জায়গার সব রকমের সব কিছুকে নিয়েই ভারতের পরিচয়। তাই ভারতীয় সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম না ঘটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দেশের সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারদিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা দরকার। তখন দেখা যাবে, মানুষ তার বাস্তব সত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চারদিকে আরো অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার বর্ষার চারপাশে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতির দল বিরাজ করছে। তার ছোট্ট ঘরখানির সুখ-দুঃখ, কত সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীর মধ্যে বিশদ ও অনন্ত হয়ে উঠেছে। তার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরে নগাধিরাজকন্যার করুণা ও সহানুভূতি সর্বদা সঞ্চরণ করছে। কৈলাসের দরিদ্র দেবতার মহিমার মধ্যে সে তার দুঃখ-দারিদ্র্যের দুর্দশাকে সম্প্রসারিত করে তুলেছে। এইভাবে অনবরত ভারতবাসী নিজের চারদিকে যে বিকিরণবলয় সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করে চলেছে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, তাতে সে চারদিকে যেন নিজেকে নিজেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও ছড়িয়ে যাচ্ছে। অবস্থার দুর্বিপাকে সঙ্কীর্ণ হলেও ভারতবাসী নিজের ভাবসৃষ্টির মাধ্যমে নিজের যে বিস্তারসাধন করছে, সৃজন করছে, তথাকথিত সংসারের চারদিকে একটি বৈকল্পিক সংসার—এই সংসারই হলো ভারতীয় সাহিত্য।

ভারত দেশটা আমার জমি, তোমার জমি, তার জমি নয়—তাকে এইভাবে জানা নির্বোধের মতো জানা। ভারতীয় সাহিত্যও তেমনি। আপাত উৎসমূলের বিচারে বাঙলা, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কোঙ্কনি আদি ভাষার সাহিত্যরূপে পরিচিত হলেও তা আমার রচনা, তোমার রচনা, তার রচনা নয়—সবটাই ভারতবাসীর রচনা, তাই ভারতীয় সাহিত্য। প্রাদেশিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকলেও প্রাদেশিক বর্ম ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাতে ভারত-মানবতা এবং ভারত-চিত্তের প্রবাহকে, এককথায় ভারতীয়ত্ব অনুভব করার প্রয়াসী হতে হবে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে, তা সে যে-অঞ্চলের, যে-ভাষার রচনাই হোক না কেন, একটি সমগ্রতাকে সৃজন ও বরণ করার অভিলাষ চরিতার্থ করতে হবে। সেই সমগ্রতার মধ্যে দেশের সমস্ত মানুষের প্রকাশের প্রয়াস সুসম্বদ্ধ থাকবে। এই বিশেষ দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যকে দেখা ও পাওয়ার উদার মানসিকতার আশু প্রয়োজন। এইভাবে প্রদেশকে ছাড়িয়ে দেশকে এবং দেশকে ছাড়িয়ে বিশ্বকে তুলে ধরবে সাহিত্য। আমরা পাব ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্য।

বর্তমানে যে পাই না, এমন নয়। তবে কম! বুঝি আরো কম। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বাজে খরচের দুশ্চিন্তা। তা কাটিয়ে উঠতে পারলেই প্রাদেশিক সাহিত্যের, ভারতীয় সাহিত্যের এবং বিশ্বসাহিত্যের আনন্দে কোন তারতম্য থাকবে না। তার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। আসুন সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করি। ❑



প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি স্পষ্ট রূপ উন্মোচিত হয়েছিল স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সেবাযজ্ঞের মাধ্যমে। মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে। সেখানে তিনি দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য শুরু করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাত্র দু-সপ্তাহ পর। ঐদিন মহুলা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সেবাকেন্দ্র খুলে গ্রামের আঠারো জন নরনারায়ণকে চাল বিতরণ করেছিলেন তিনি। এর কয়েক মাস পর ৩১ আগস্ট মাত্র দুটি অনাথ বালককে নিয়ে তিনি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনের সংগঠিত সেবাকার্যের সেটাই সূচনা।

স্বামীজীর অগ্নিময় পত্রাবলী স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে নিরন্তর প্রেরণা যোগাত। সকলেই তাঁকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই মহাতীর্থে আশ্রমের ঠাকুরঘর ও 'বাবা'র থাকার ঘর যে-বাড়িতে আছে, তার দেওয়ালে 'জয় রামকৃষ্ণ' লেখাটি বহুদূর থেকে দেখা যেত। পীড়িত মানুষ দলে দলে 'জয় রামকৃষ্ণ' শব্দে দিগ্বিদিক মুখরিত করে ছুটে আসত পরম আশ্রয়ে—জাতিধর্মনির্বিশেষে। সে-ধারা শতাধিক বর্ষ পরে আজও সমভাবে প্রবহমান।

গল্পের ছলে আদর্শের বিস্তার

সুজাতা সিংহ

হারানো পথের সন্ধান ● লেখক : সুফলচন্দ্র দাস ● প্রকাশক : সুনীতকুমার দাস, ৮৫৭ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া-৭১১১০৪ ● মূল্য : ৫০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+২৬২ ● প্রকাশকাল : ১৯৯৫

'হারানো পথের সন্ধান' গ্রন্থটি সুফলচন্দ্র দাসের এক মানস পরিক্রমা। যেকোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করার প্রথম ধাপ হলো শ্রবণ, দ্বিতীয়টি হলো মনন। যুগ ও জীবনের আদর্শ নিয়ে সুফলচন্দ্রের যে মনন, এই গ্রন্থে তারই পরিচয় রয়েছে। বর্তমানের স্বার্থদীর্ণ সমাজ ও যুগজীবনের পটে নানাভাবে তিনি আদর্শ সন্ধান করেছেন। বেদ, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ—এই পথে হেঁটেই তিনি আদর্শের বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছেন এবং সেই সূত্রেই গড়ে উঠেছে কল্পকাহিনী **'হারানো পথের সন্ধান'**।

গ্রামীণ পটভূমিতে কাহিনীর বিস্তার, কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়, এটি এক সাধারণ গ্রাম মাত্র নয়। এখানে পাই অমিত ও সমীরের মতো আদর্শবাদী যুবক, বড়মা, তাঁর কন্যা সুমিতা, তাঁর পুত্রবধূ বউমা-র মতো সনাতন ভক্তিমতী আদর্শ নারীকে। গ্রামের জমিদার রমেশবাবু ও তাঁর পত্নী ইন্দুমতী দেবী, লতা দিদিমণির মতো মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ—যাঁরা অমিত, সমীর, সুমিতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও রূপান্তরিত হয়ে যান। মণিমোহনবাবু, মহেশবাবু, যুবক ছাত্র বিশ্বজিৎ প্রমুখের আচরণে সঙ্কীর্ণতা ও ঈর্ষার প্রকাশ দেখা গেলেও 'সত্যমেব জয়তে'—অমিতের এই দৃঢ় প্রতীতি জয়ী হয়। মানবতার শুভ্র কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঘোষালপুর গ্রাম।

হারানো পথের সন্ধান



সুফল চন্দ্র দাস

লেখক জানেন, সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও ধর্মাশ্রিত। অন্তরের সেই ধর্মবোধ ও তাগিদ কাহিনীকে ধারণ করে আছে। ভক্তিমূলক গান, মন্দিরনির্মাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দুর্গাপূজা, কালীপূজার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বক্তৃতা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের সেবা, পূজাপার্বণে গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে সেই মানবিক ও ধর্মমূলক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। এইসকল কর্মযজ্ঞেরই মূল হোতা হলো অশেষ গুণশালী, গ্রামের লোকের সমস্যা ও বিপদে অগ্রণী, ভালবাসার মানুষ অমিত। যুবক অমিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে ভাবিত। ধর্ম ও সেবা তার সকল কর্মের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের সেবার জন্যই সে ডাক্তার হয়েছে। আবার দেখা যায়, গ্রামের ভোটে দাঁড়িয়ে এম. পি. হয়ে সে দিল্লি যায়। তার ব্যক্তিত্বে সকলেই প্রভাবিত হয়।

লেখক ধর্ম ও রাজনীতিকে জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করেন। গ্রন্থের এক স্থানে বলা হয়েছে : "পৃথিবীতে যতদিন না প্রকৃত ধর্মজ্ঞ ও রাজনীতিক নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন না হচ্ছে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না।" (পৃঃ ১৫৪) সকলেই যে তাঁর সঙ্গে সহমত হবেন তা নয়।

সুফলচন্দ্র দাসের উদ্দেশ্য মহৎ। যেভাবে তিনি অসংখ্য হৃদয়প্লাবী ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের স্নিগ্ধতায় তাঁর রচনাকে ওতপ্রোতরূপে উপস্থিত করেছেন, তাতে অনুমানের অপেক্ষা থাকে না যে, তিনি ভক্তকবি। মানবজাতির মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে মূলত তিনটি বিষয় তাঁকে ভাবিয়েছে—(১) ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা, (২) ধর্ম ও রাজনীতি এবং (৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা।

প্রথম প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে কোন ধর্মই সাম্প্রদায়িক নয়। ধর্ম মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা সত্য, প্রেম ও ঐক্যের মধ্যে। জগৎ ও মানবসমাজের অন্তঃসলিলা ঐক্যকে যে-সাধক যখন যেভাবে উপলব্ধি করে আলোকিত হয়েছেন, সেখানেই একটি ধর্মের (ধর্মমতের) উদ্ভব হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা কোন ধর্মে নেই, আছে মানুষের বিভেদবুদ্ধি ও যথাযথ বোধের অভাবের মধ্যে, অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতার মধ্যে। সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ 'man-making religion'-এর কথা বারবার বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, লেখক ধর্ম ও রাজনীতির মিলনে একটি পথ খুঁজেছেন। মহাজনপন্থা অনুসরণ করে আমরা দেখি, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা যেন রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। এটা সত্য যে, ধার্মিকের দৃষ্টি ও শুদ্ধ রাজনীতিকের দৃষ্টি কখনো এক হতে পারে না।

লেখকের তৃতীয় চিন্তা প্রসঙ্গে বলতে হয়, 'রামকৃষ্ণ' শব্দটির মধ্যে রয়েছে সমন্বয়বার্তা। 'মঠ' ও 'মিশন' শব্দদুটি নির্দেশ করে সংগঠন। সংগঠন শব্দটির সঙ্গে প্রাচীর বা সীমারেখার সাদৃশ্য আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা অমূলক। লেখক ভূমিকায় বলেছেন : "কোন সমালোচক যদি মানবজাতির মুক্তির কোন পথ দেখিয়ে সমালোচনা করেন, অতীব প্রীত হব।" লেখকের গ্রন্থে কিন্তু মানবজাতির মুক্তির পথনির্দেশ রয়েছে তাঁর অলক্ষ্যে।

গ্রন্থে চিরাচরিত রীতি মেনেই যেন মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে অনেক, বিশেষত সংস্কৃত উদ্ধৃতি যেখানে আছে। যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' উদ্ধৃতিতে 'অহং'-এর স্থানে 'অহৎ' হয়েছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ আরো আকর্ষণীয় হওয়া উচিত ছিল—বিশেষত

যুবগোষ্ঠীর কথা মনে রেখেই। যুবমানসের উপযুক্ত করে লেখা এই **'হারানো পথের সন্ধান'** রচনাটিকে আমরা বলতে পারি উপন্যাসকল্প, আদর্শবাদী বর্ণনাত্মক গদ্য রচনা। গ্রামের পটভূমিতে গড়ে উঠলেও মনে রাখতে হয়, প্রকৃতপক্ষে এই গ্রামটি লেখকের মনোদর্পণ। ❑

চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রার্থীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

অধীরকুমার অধিকারী

কৃতী চিকিৎসক হতে কি কি করা উচিৎ • লেখক : ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী • প্রকাশিকা : অঞ্জলি চক্রবর্তী, বিবেক ভবন, রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ • মূল্য : ৩৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪+৭৪ • প্রকাশকাল : ১৯৯৯

ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনের সারকথা **'কৃতী চিকিৎসক হতে কি কি করা উচিৎ'** গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

সাধারণত রোগনির্ণয়ের জন্য প্যাথোলজিস্টের ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপত্র (prescription) দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক সত্য হয়। তাই রোগীও সম্পূর্ণ আরোগ্য হন না। উদাহরণস্বরূপ, কোন রোগীর হাতে-পায়ে ও সমস্ত দেহে তীব্র জ্বালা হচ্ছে। কিন্তু প্যাথোলজিস্টের যন্ত্রে জ্বালা অনুভূত হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তাঁর বক্তব্যে জ্বালার কোন উল্লেখ থাকবে না। ঠিক একইভাবে রোগী ক্রোধী, অভিমানী, হিংস্র প্রকৃতি না কলহপ্রিয় তা কোন নিদানতত্ত্বের (pathology exam.) সাহায্যে সংগ্রহ করা অসম্ভব। অথচ রোগীর মানসিক লক্ষণকে গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ, লিখিত ব্যবস্থাপত্রের ফল শূন্য। প্যাথোলজির চোখে কেবল দৈহিক পরিবর্তন দেখা যাবে। তাই প্রতি রোগের এক-একটা বিশেষ অবস্থার কাল্পনিক নাম দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়, যার সঙ্গে মানসিক অবস্থার কোন মিল থাকে না।

কৃতী চিকিৎসক হতে কি কি করা উচিৎ

তৃতীয় সংস্করণ

ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

ডাঃ চক্রবর্তী রোগীর কষ্টকর অবস্থা এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনের বক্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ রোগীই জানেন না যে, কিভাবে তাঁর কষ্টকর অবস্থার কথা চিকিৎসকের কাছে বলতে হবে। নিজ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে ডাঃ চক্রবর্তী রোগলক্ষণগুলির সমষ্টিকে নানাভাবে প্রশ্নাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা অধ্যয়ন করলে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের কাছে বিষয়টি সহজ হবে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সোপান অতিক্রম করে তৃতীয় সংস্করণে পৌঁছেছে। এর দ্বারা সহজেই অনুধাবন করা যায়, হোমিও চিকিৎসক ও রোগী-সমাজের কাছে গ্রন্থটি কতখানি আকর্ষণীয়।

ডাঃ চক্রবর্তী যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, তবে অন্য ভাষার চিকিৎসকগণ ও রোগীদের প্রভূত উপকার হবে বলে মনে হয় ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

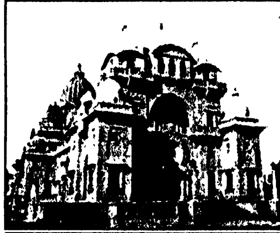
* *শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ঈশ্বর • সঙ্কলক, সম্পাদনা ও প্রকাশক : দীপ্তিকুমার শীল • বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০ • মূল্য : ১২ টাকা • প্রকাশকাল : ১৯৯৬*
* *হিমগিরির তীর্থে তীর্থে • লেখক : অজয়কুমার নন্দী • প্রকাশক : সুজয়কুমার ভৌমিক, সাহিত্যায়ন, ১/১বি, ডঃ অমল রায়চৌধুরী লেন, কলকাতা-৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+৭০ • মূল্য : ৪০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০০*
* *জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন • লেখক ও প্রকাশক : স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ, ৬০/১ রামচন্দ্র বাগচী লেন, কলকাতা-৩৫ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫+৬১+১০ • মূল্য : ১৫ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০০*
* *বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত • লেখক : পরিমল চক্রবর্তী • প্রকাশক : তপন সাহা, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২২ • মূল্য : ২০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০১*
* *তব কৃপা • লেখক : সুনীলকুমার রুদ্র • প্রকাশক : অন্নপূর্ণা রুদ্র, ১২৯ ফিডার রোড, 'রুদ্র ভিলা', পোঃ আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৬ • মূল্য : ৩০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০১*
* *পরমার্থ প্রসঙ্গে (১০ম খণ্ড) • লেখক : মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ • অনুবাদক ও সঙ্কলক : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ • প্রকাশক : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১০ গ্যালিফ স্ট্রিট, সুইট নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৩ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+২০০ • মূল্য : ৪৫ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০২*
* *মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী • লেখক ও প্রকাশক : মিহিরকুমার বিশ্বাস, শেলা, মগরা, হুগলি • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৮ • মূল্য : ৫০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০৩*

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

১৯২৬ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটির দুটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম—এই আশ্রমটি তার সূচনাকাল থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ বেলুড় মঠের অনুমোদনপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়—আশ্রমটির সঙ্গে ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতন জড়িত। ২০০১ সালে সগৌরবে প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে পদার্পণ করা এই আশ্রমের সূচনায় ছিলেন সুধীর নামের এক স্থানীয় যুবক। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী বাণীতে উদ্দীপ্ত জমিদার বংশের এই সন্তান একসময়ে বেলুড় মঠে যেতে শুরু করেছিলেন। সংস্পর্শে এসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দের প্রেম-নির্ঝরিণীর। পরে কাশীতে সঙ্গলাভ করেন বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী তুরীয়ানন্দের। জীবনটা বদলে যায় সুধীরের। কলকাতায় ফিরে তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাঁর সন্ন্যাসনাম হয় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ*।

একবার একটি কাজে সুধীর মহারাজ বাগেরহাটে এলে স্থানীয় প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঋষিতুল্য কামাক্ষাচরণ নাগ এবং বাগেরহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁর কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন—বাগেরহাট অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি আশ্রম স্থাপনের। তাঁদের এই প্রার্থনা সুধীর মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করায় তাঁদের সানন্দ সম্মতিলাভ করেন। অতঃপর বাগেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কেনা বর্তমান জমিতে ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট—বেলুড় মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্ররূপে। প্রথম অধ্যক্ষ হলেন স্বামী রামানন্দ। প্রয়োজনীয় যোগাযোগগুলি কতকটা অভাবনীয়ভাবেই ঘটে যাওয়ায় আশ্রমের শুভ সূচনায় বিঘ্ন বা বিলম্ব হলো না। একটি চালাঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবাপূজা আরম্ভ হলো। প্রসঙ্গত, আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির পিছনে যেসব বিশিষ্ট ভক্তের অসামান্য অবদান ছিল, তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার রায়চৌধুরী, নাট্যকার নিশিকান্ত বসুরায়, জমিদার রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আইনজীবী ক্ষেত্রনাথ মিত্র, মানদাসুন্দরী বসুরায়, রজনীময়ী নন্দী প্রমুখ।



পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অনুরাগী ভক্তের চেষ্টায় এই আশ্রমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে, মাঝে গেছে বিষাদাচ্ছন্ন কিছু সময়। ১৯৭১-এর মার্চে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন শুরু হলে যেকোন মুহূর্তে আশ্রমে পাক হানাদারবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করে তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজ বাধ্য হলেন আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। সঙ্গে নিলেন ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং আশ্রমের দলিলপত্র। গ্রাম থেকে গ্রামে গোপনে ঘুরতে হলো তাঁকে। সঙ্গে ছিলেন একজন ছাত্র। এদিকে দুষ্কৃতকারীরা অনতিবিলম্বেই আশ্রম-বাড়িটিকে সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠন করে বিধ্বস্ত করল। কোন সংবাদাদি না পেয়ে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ যখন ধরে নিয়েছিলেন যে, উক্ত অধ্যক্ষ মহারাজ আর বেঁচে নেই; তখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে, এমনকি প্রয়োজনে ছদ্মবেশ পর্যন্ত ধারণ করে তিনি তাঁর সঙ্গিসহ কোনক্রমে বেলুড় মঠে পৌঁছাতে সমর্থ হলেন—১৯৭১-এর জুলাইয়ে। পেরিয়ে গেল আরো কয়েক মাস। অবশেষে কেটে গেল কালো রাত। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ঘোষিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ঐ অঞ্চলের বিপন্ন মানুষের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭২-এর ৪ মার্চ কর্মীদের পাঠাল। মিশনের তরফ থেকে ঐ অঞ্চলে সূচনা হলো এক ব্যাপক সেবাযজ্ঞের। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হলো শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচীও। এদিকে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ ও বেলুড় মঠের অর্থসাহায্যে বিধ্বস্ত আশ্রমটির সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করে সেটিকে আরো সৌষ্ঠবমণ্ডিত করা হলো এবং ১৯৭২-এর ২৬ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথিতে আশ্রমের পুরনো মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নবগঠিত আশ্রমের শুভ উদ্বোধন করা হলো। পরবর্তী কালে নির্মিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন শোভন মন্দির। প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের প্রধান অঙ্গরূপে সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ—গত ২৯ মার্চ ২০০১-এ। তার দুদিন আগে নবনির্মিত প্রেমানন্দ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর নিত্যপূজা ছাড়া প্রতিবছর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে চলে ধর্মীয় আলোচনা। আশ্রমে আছে একটি



শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বাগেরহাট

* ১৯৫৮-১৯৬৭ বাগবাজারে মায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ, অধুনা প্রয়াত।

গ্রন্থাগার (গ্রন্থসংখ্যা ৪,০০০-এর বেশি), দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র (রোগীর সংখ্যা বার্ষিক প্রায় ৪০,০০০) ও একটি ছাত্রাবাস (ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০ জন, যাদের মধ্যে ৩-৪ জন বিনা খরচায় থাকে)। এছাড়া আশ্রমে একটি গো-খামার ও একটি হাঁস-খামার আছে। আশ্রমের অধীনে নির্মীয়মাণ শাখাকেন্দ্ররূপে পাঁজাখোলা ও খেজুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের নাম উল্লেখযোগ্য। বিগত প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে আশ্রম থেকে একটি সুন্দর স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রচনা ৪১৮ পৃষ্ঠার এই সুদৃশ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেওয়া হয়েছে প্রচুর রঙিন ছবি। গ্রন্থটি বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আদরণীয় হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার ঃ গত ১ এপ্রিল ২০০৪ কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারের বন্দিদের জন্য স্বাক্ষরতা প্রকল্প ও নৈতিক মানোন্নয়নকার্যের উদ্বোধন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী অজরানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মঠের অন্যান্য সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দিলীপ নাহা। তিনি ঐদিন জানান, প্রয়োজনে এই কাজে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরাও এগিয়ে আসবেন। ঠিক হয়, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল ও শুক্রবারে পুরুষ ও মহিলা বন্দিদের জন্য ক্লাস হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা ঃ গত ৩-৫ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদগান, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, গ্রাম-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, বাউল গান, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, গীতিনাট্য, ধর্মসভা, যাত্রাভিনয়, পুতুলনাচ, যুবসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩ এপ্রিল আয়োজিত যুবসম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে ভাষণ দেন স্বামী রাজীবানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী পররূপানন্দজী। এই অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। ৪ এপ্রিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এদিন আয়োজিত সাধুসেবায় প্রায় ১৫০ জন সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং দুপুরে প্রায় ১৭,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দজী, স্বামী যোগস্বরূপানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী ও ডায়মণ্ডহারবারের উপ-মহকুমাশাসক প্রশান্তকুমার মল্লিক।

রামকৃষ্ণ মঠ, পুনে (মহারাষ্ট্র) ঃ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্টপ টি. বি. পার্টনারশিপ ফোরাম টি. বি. রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য সারা ভারতের ৬টি কেন্দ্রকে সম্মানিত করেছেন। পুনে মঠের পলিক্লিনিক তাদের মধ্যে একটি, যেখানে ১৯৯৮ সাল থেকে ৫০০ রোগী আরোগ্যলাভ করেছেন। ২৪ মার্চ ২০০৪ এই উপলক্ষ্যে নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র-গুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভারতে ঃ **কানপুর, পুনে, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম** এবং **বারাণসী হোম অফ সার্ভিস**। বহির্ভারতে ঃ **দিনাজপুর (বাংলাদেশ)**।

কৃতিত্ব

২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দশজনের মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সরিষা স্কুলের এক ছাত্র ৩য় স্থান এবং রামহরিপুর স্কুলের একটি ছাত্র ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মিশন, নাডি (ফিজি) ঃ গত ১২ মার্চ ২০০৪ স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে নব-প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ফিজির উপরাষ্ট্রপতি রতু জোপে সেনিলোলি।

দেহত্যাগ

স্বামী জ্যোতিরানন্দজী (পঙ্কজ মহারাজ) গত ৯ মার্চ ২০০৪ ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যের কারণে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ডায়াবিটিস ও কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন এবং গত কয়েক বছর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫০ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তিনি বৃন্দাবন, শিলং, মায়াবতী ও রহড়া কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সুযোগ্য চিকিৎসক হিসাবে তিনি বেলুড় মঠের চিকিৎসাকেন্দ্রে বেশ কয়েক বছর অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকার্য করেন। গত ২০ বছর যাবৎ বেলুড় মঠে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, আত্মপ্রচারবিমুখ ও পরিশ্রমী স্বভাবের।

স্বামী অখিলাত্মানন্দজী (বিজন মহারাজ) গত ১৬ মার্চ ২০০৪ সকাল ৬টা ৪৩ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ইসকিমিক হৃদ্‌রোগ ও তীব্র রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে তিনি জামসেদপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জামসেদপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। যোগদান-কেন্দ্রেই তিনি তাঁর সাধুজীবনের সমগ্র কর্মক্ষমকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে অতিবাহিত করেন। গত তিনমাস যাবৎ তিনি জামসেদপুর ও বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কৃচ্ছ্রতাপরায়ণ ও মধুর স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২৪ এপ্রিল ২০০৪ শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কথামৃত সঙ্ঘ, রসা রোড সাউথ থার্ড লেন (কলকাতা-৩৩) : গত ১-২৩ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শ্রীসারদা-জীবন-পরিক্রমা' নামে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজী। গত ২-২২ নভেম্বর প্রতিদিন 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থের একটি করে অধ্যায় অবলম্বনে পাঠ ও আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসিনী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী।

সাঁকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ১১ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, গল্প বলা, ক্যুইজ, বসে আঁকো ও হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, কম্বল বিতরণ, সঙ্ঘের প্রবেশপথের দ্বারোদ্ঘাটন, পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজ পরিচালনা ও ভাষণ দান করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তকুটীর, প্রসাদপুর (হুগলি) : গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি ২০০৪ বৈদিক প্রার্থনা, শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, গল্প বলা, অঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, নাটক, শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪,৭০০ জনের বসে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বরানন্দজী, স্বামী বেদানন্দজী ও স্বামী কমলেশানন্দজী।

উত্তর কলিকাতা যোগিপাড়া বলাকা (কলকাতা-৬) : গত ১১ জানুয়ারি ২০০৪ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৫০-র বেশি প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণ ঘোষ, সমর ভৌমিক ও শ্যামল সেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শীর্ষানন্দজী, স্বামী ক্ষেমানন্দজী, বেদান্ত মঠের স্বামী সুদর্শনানন্দজী, শিবাজী ঘোষ প্রমুখ।

পূর্বসিঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩০) : গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি ২০০৪ অঙ্কন, ক্যুইজ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, নগর-পরিক্রমা, আলোচনা, কালীকীর্তন এবং কম্বল, ধুতি, শাড়ি ও বিছানার চাদর বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাধুসেবায় প্রায় ৩০ জন সাধু-ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সিটিজেন্স ভলেন্টিয়ার ফোর্স (কলকাতা-১২) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। সাগরমেলায় আগত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য এবং তীর্থযাত্রিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, ক্যুইজ, বসে আঁকো, বক্তৃতা, ইংরেজি রচনা লেখা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়-এর প্রাক্তন ছাত্র শ্যামল দত্ত এবং স্থানীয় বিধায়ক আই. ইমকং। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সমিতির সভাপতি এস. আর. চক্রবর্তী ও সম্পাদক জহর ভট্টাচার্য। 'কল টু দি নেশন' পুস্তিকাটি ৩০০ ছাত্রছাত্রী-সহ উপস্থিত সকল অতিথির মধ্যে বিতরণ করা হয়।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ পতাকা উত্তোলন, স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্থানীয় এম. আর. বাঙুর হাসপাতালে ৬০ জন দুঃস্থ শিশুর মধ্যে ফল, মিষ্টি, বিস্কুট, কেক, লজেন্স ইত্যাদি বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও ডঃ প্রিয়তোষ খাঁ।

পাকুড় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী, স্বামী আনন্দ গিরিজী, জেলাশাসক এবং বদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারী। হরিজন ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মণ্ডলগ্রাম (বর্ধমান) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ, 'বিবেক পরিচিতি' পরীক্ষা, ক্যুইজ, স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। ২০০ ছাত্রছাত্রী 'বিবেক পরিচিতি' পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৪৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কাশীনাথপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ পথ-পরিক্রমা, পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ক্যুইজ, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুধীরকুমার

সাহা। গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ, ভজন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'মায়ের কথা' প্রভৃতি পাঠ ও আলোচনা, জপধ্যান, ভক্তিগীতি ইত্যাদির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। ৩৪ জন দুঃস্থ নরনারীকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), মূলাজোড় (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ বসে আঁকো, আবৃত্তি, কুইজ, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যেন্দ্রানন্দজী। এদিন প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আবাডাঙা গোপেশ্বর হাই স্কুল (বীরভূম) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ গান, আবৃত্তি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। ৫০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক মদনমোহন পাল। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবদিবস' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপলকুমার দাস।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অখণ্ড হরিনাম, পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, লোকনৃত্য, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন, বক্তৃতা, 'বিভিন্নরূপে মা সারদা' ও যেমন খুশি সাজো, সঙ্গীত, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, যোগব্যায়াম প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব ও 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শিশির, স্বামী সর্বানন্দজী, সুশীল বেরা, রবীন্দ্রনাথ মাল, সুকুমার সামন্ত প্রমুখ। এদিন প্রায় ৬,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুঃস্থ নারায়ণদের মধ্যে ১০০ শীতের চাদর, ২৫টি ধুতি, ২৫টি শাড়ি, ২০০ প্যান্ট, ২৫০টি গেঞ্জি, ১০টি কম্বল, ১৫টি সোয়েটার, ৭৫টি মহিলা ও শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ১,০০০ 'অমৃতবাণী' পুস্তিকা, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি এবং খাতা দেওয়া হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) ঃ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন সুব্রত চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত ও শম্ভুনাথ দালাল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, গান, প্রসাদ বিতরণ, আলোচনাসভা, কম্বল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ৪টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গান, আবৃত্তি, নৃত্য, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। চারটি বিদ্যালয়েই স্বামী দিব্যানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়গুলির ১,৮০০ ছাত্রীর মধ্যে 'আমি মা সকলের মা' পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। ১৬ তারিখ আশ্রমে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, সহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, গান, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, অনুন্নত গ্রামে অবস্থিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রীদের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ১৭ জানুয়ারি মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে ও স্বামী দিব্যানন্দজীর উপস্থিতিতে কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত প্রায় ৬৫০ জন বন্দির মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তিনমাস আগে বন্দিদের মানবিক বিকাশে উন্নতি ও স্বনির্ভর প্রকল্পে আশ্রম কর্তৃক এই সংশোধনাগারে কাজ শুরু হয়েছে। এদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বামী সদ্‌রূপানন্দজী এবং ৩৩ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'স্বামীজীর জীবন ও বাণী' পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়।

রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দজী, অরিন্দম চক্রবর্তী প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, জেলাশাসক সুব্রত গুপ্ত, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৮ তারিখ প্রায় ২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সবশেষে শ্রুতিনাটক 'মা সারদা' পরিবেশিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পরিষদের দশম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ পল্লী, বনগ্রামে।** সম্মেলনে ৮৩ জন প্রতিনিধি এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুবসম্মেলনে ১২৮ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্বায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ।

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৩৫০ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী উমানন্দজী, প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুবোধ চৌধুরী।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহ ও সেবাকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন, বার্ষিক উৎসব এবং শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৭ তারিখ অপরাহ্ণে আয়োজিত শোভাযাত্রায় হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা যোগদান করে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। ৬ জন সন্ন্যাসি-সহ প্রায় ২,৫০০ ভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। একটি

সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সাজে তিনটি শিশুর অংশগ্রহণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮ তারিখ সকাল ৯টায় প্রার্থনাগৃহ ও সেবাকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপনের পর তিনি অর্ঘ্যপ্রদান ও আরতি করেন। এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান ও একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী, স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী ও স্বামী শান্তাত্মানন্দজী। সঙ্ঘের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়। ১৯ তারিখে আলোচনাসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদ্‌ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা শুচিপ্রাণাজী এবং বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজয় দাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, চকচণ্ডীনগর (হুগলি) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজা ও হোম করেন স্বামী সাংখ্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সৎপ্রভানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস এবং সমীর নিয়োগী।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, নৈহাটী (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, বিবেকানন্দ বন্দনা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শুকদেবানন্দজী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা বীথিকা ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ দেবাশিস নাথ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘ-সভাপতি অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য।

বহির্ভারত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোর (বাংলাদেশ) : গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) বেলায়েত হোসেন। যশোর জেনারেল ও টি. বি. হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণের সূচনা করেন জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হাসান আল-মাসুন। আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই ও ফল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা নার্গিস বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের সভাপতি গোবিন্দলাল সাহা।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, শ্রীমঙ্গল শাখা, মৌলভীবাজার (বাংলাদেশ) : গত ১৪ জানুয়ারি বৈদিক মন্ত্র ও স্বামীজীর গ্রন্থ থেকে পাঠ, বিশেষ পূজা, জপধ্যান, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, রক্তদান, আলোচনাসভা, প্রসাদ ও দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিন ২০০৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উপজেলার প্রতিটি স্কুলে সর্বোচ্চ জি. পি. এ. প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্রনাথ দাশ, সেবাশ্রমের সাধারণ সম্পাদক প্রমথেশ দেবচৌধুরী, রনজিত রায়রন ও সংগঠনের সভাপতি দীপেন্দ্র ভট্টাচার্য। এদিন পরিষদের তৃতীয় মুখপত্র 'সনাতন' প্রকাশ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হুগলি-নিবাসিনী সুবর্ণনলিনী ঘোষ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কল্যাণী-নিবাসী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়া-নিবাসী কল্যাণকুমার সিংহ গত ২০ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়া-নিবাসী রবিলোচন সিংহরায় গত ২০ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী শচীনকুমার রায় গত ২৭ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবীর মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী দীনদয়াল সাহা গত ২৮ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। বাল্যকালে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন। পরবর্তী কালে রাজা মহারাজ, শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, লাটু মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, মাস্টার মহাশয় প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদলাভে তিনি ধন্য হন। কাশীতে তিনি বেশ কিছুদিন লাটু মহারাজের সেবা করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মালুয়া, শ্রীগৌরী (অসম)-নিবাসী অনাদিচরণ দত্ত গত ১ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী গীতা রায় গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বাড়িতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ (বালী) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চন্দননগর (হুগলি)-নিবাসী প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বহুদিন তিনি বেলুড় মঠের পোস্টমাস্টার ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী নীরেন্দ্রনাথ সেনশর্মা গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সহোদর বর্তমানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী। নীরেনবাবু 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন সদস্য ছিলেন। ❑

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

※

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

※

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

অনুবন্ধ চতুষ্টয়

- **অধিকারী**
  - **গৌণ**
    - অধীত বেদ ও বেদাঙ্গ
      - বেদ
        - ঋক্
        - সাম
        - যজুঃ
        - অথর্ব
      - বেদাঙ্গ
        - শিক্ষা
        - কল্প
        - ব্যাকরণ
        - ছন্দ
        - জ্যোতিষ
        - নিরুক্ত
    - আপাতত অধিগত অখিল বেদার্থ
    - কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মবর্জিত
    - নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্মের দ্বারা নির্মলস্বান্তঃ
  - **মুখ্য** (সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন)
    - নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক
    - ইহামুত্রফল ভোগবিরাগ
    - ষট্‌সম্পত্তি
      - শম [মনের নিগ্রহ]
      - দম [বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি]
      - উপরতি [অন্তরিন্দ্রিয়ের উপরমণ]
      - তিতিক্ষা [শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা]
      - শ্রদ্ধা [গুরু ও শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস]
      - সমাধান [সমাধি]
    - মুমুক্ষুত্ব
- **বিষয়** [জীব-ব্রহ্ম ঐক্য i.e. *প্রমেয়*]
- **সম্বন্ধ** [বোধ্য (ব্রহ্ম)-বোধক (শাস্ত্র) সম্বন্ধ] ***i.e. Relation between the Path and the Goal***
- **প্রয়োজন** [ব্রহ্মাত্ম-ঐক্যগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি i.e. *মোক্ষ*]

উৎস ঃ সদানন্দযোগী কৃত 'বেদান্তসারঃ'



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

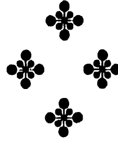
- **রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত**
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া**
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩১৪৫
- **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী-৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শ্রীকৃষ্ণগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  বনগ্রাম ৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ২৫৯২-১২৩০
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া
  বারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন ঃ ২৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ঃ ২৫৫৩৯২
- **অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা**
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কল্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন ঃ ২৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-২৬০৪৫০
- **দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশত-৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর-৭৪৩ ৩৫২

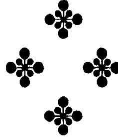
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ





UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No. 5
May
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা সডাক ১০০ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা

If undelivered, Please return it to:
Udbodhan Office,

উদ্বোধন

॥১০৬॥

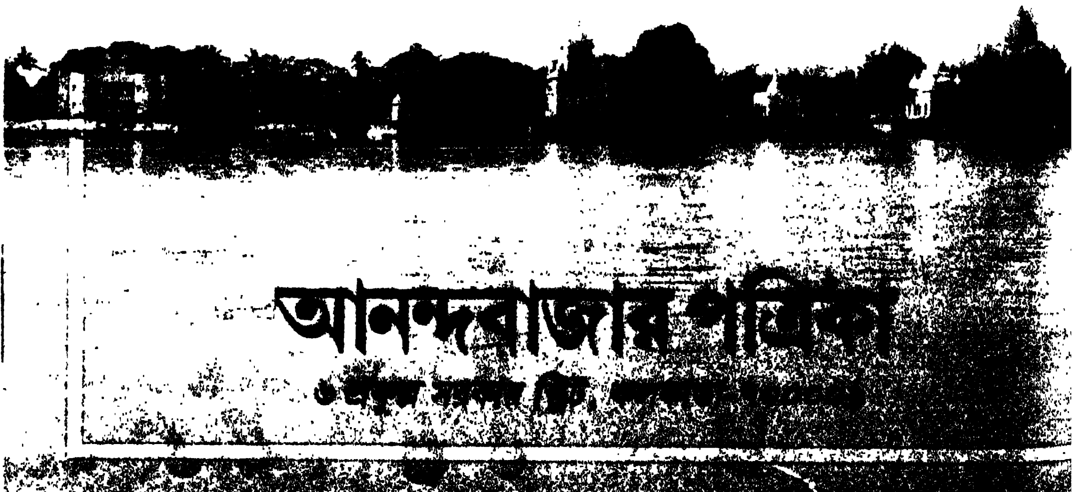
আষাঢ় ১৪১১ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে।
বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে
একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের
মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো,
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে,
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ





রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।


প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

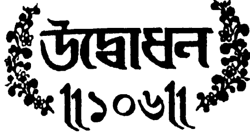
মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।



রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

সূচীপত্র



১০৬তম বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● আষাঢ় ১৪১১ ● জুন ২০০৪



ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক: স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ: সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ: ৮০ টাকা; সডাক: ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য: ১০ টাকা



'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৭ আগস্ট থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে **(By Post)** পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ **আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন।** গ্রাহকের **নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।**
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে)** সংখ্যা থেকে **এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া **সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর** ২০০৪-এর মধ্যে, তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯





যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥

ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে জগতের প্রাণিগণকে ভুলিয়ে রেখেছেন। অথচ সেই সত্যবস্তুকে অবলম্বন করেই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট। তাই আপাত-মিথ্যা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে এক সত্যবস্তুই বিদ্যমান। সেই পরম সত্তাই শ্রীগুরুরূপ ধারণ করেন। তিনিই আশ্রিতগণকে 'তত্ত্বমসি'—এই বেদবাক্যের সাহায্যে সাক্ষাৎ জ্ঞান দান করেন। গুরুরূপী সেই সত্যের দর্শনলাভ হলে সংসারসাগরে পুনরাগমন হয় না। সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করি।

নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥

মানবশরীরে ইন্দ্রিয়রূপ ছিদ্র আছে। [উপমা-সহ আচার্য শঙ্কর বললেন ঃ] বহুছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে স্থাপিত উজ্জ্বল দীপের আলোক যেমন স্ফুরিত হয়, সেরকম আমার অন্তরে অবস্থিত দীপ্তচৈতন্য-জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে বাইরে আসে এবং 'আমি জানছি' ইত্যাদি প্রকারে বহির্দেশে স্পন্দিত হয়। গুরুরূপী সেই চৈতন্য প্রকাশমান বলেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। শ্রীগুরুরূপধারী সেই শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করি।

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে।
নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥

ওঁ যিনি প্রণবের বাচ্য, বিশুদ্ধজ্ঞানই যাঁর স্বরূপ—তাঁকে নমস্কার। যিনি নির্মল ও প্রশান্ত, সেই (শ্রী)দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥

সমস্ত বিদ্যার আকর, ভবরোগিগণের চিকিৎসক, ভূরাদি সকল লোকের গুরু (শ্রী)দক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার।

শঙ্করাচার্য-কৃত 'দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র' (৩, ৪, ১৩, ১৪)

শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভারতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিধিঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও তাহার রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন সংহিতাতেও ভারতীয় চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। দেখা যায় সর্বত্রই একটি মূল নীতি অনুসৃত হইয়াছে। তাহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি গৃহ নির্মাণ করিতে চাহিলে সর্বপ্রথম যে-উপাদানটি দরকার তাহা অবশ্যই ইষ্টক বা ইঁট। অতি উচ্চমানের ইঁট ব্যবহার করিলে বাড়িটি অত্যন্ত মজবুত হইয়া উঠে। তখন বাহিরের সৌন্দর্যও সার্থক হয়। নতুবা বাড়ি নিম্নমানের ইঁটে নির্মিত হইলে তাহার স্থায়িত্ব হ্রাস পাইয়া অবশেষে উহা ভাঙিয়া পড়ে। বাহিরের আড়ম্বরও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া থাকে। মানুষই সমাজরূপ সৌধের মূল উপাদান অর্থাৎ গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইঁটের ন্যায়। ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী এই সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ প্রতিটি মানুষের যেন যথার্থ উন্নত আধ্যাত্মিক চরিত্র বজায় থাকে। ইহাই চিরন্তন লক্ষ্য। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সমাজ মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ-চরিত্র আছে পাশ্চাত্যে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। অবশ্য সম্প্রতি দলবদ্ধ (organised and institutionalised) প্রয়াস এদেশেও বহুল পরিমাণে দেখা যাইতেছে। কারণ, এই যুগ যৌথ প্রচেষ্টা বা team work-এর যুগ। স্বামীজী সেকথা যথেষ্ট পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।

সবকিছু বিশ্লেষণ করিয়া মহামুনি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-সূত্রে 'যম' ও 'নিয়ম' নামক মানসিক ও শারীরিক কিছু অভ্যাসের উল্লেখ করিলেন, যাহার দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রের 'সুষম বিকাশ'-সাধন সম্ভব। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রশাসক সকলের ক্ষেত্রেই এই যম ও নিয়ম নামক "সার্বভৌমামহাব্রতম্" সমভাবে প্রযোজ্য এবং যথাযথ অনুশীলিত হইলে তাহা এই সমাজকে যথার্থ 'মনুষ্যসমাজ'-এ পরিণত করিবে, সেকথা অল্প বিশ্লেষণেই সুপ্রমাণিত হয়। সংক্ষেপে সেই কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ*—এই পাঁচটি সদ্গুণের সমষ্টি 'যম'। ইহা মূলত মানসিক অভ্যাসের ফল। আসলে মহামুনি পতঞ্জলি প্রথমেই মানুষের মনের মূল প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করিলেন। ষড়রিপুর উল্লেখ শাস্ত্রে রহিয়াছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ষড়রিপু ব্যক্তিমানুষকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি বৃহত্তর সমাজকেও ক্রমশ পঙ্গু করিয়া তোলে। পতঞ্জলি বলিলেন, হিংসাও মানুষের (বা যেকোন প্রাণীর) স্বাভাবিক। সুতরাং মনকে উন্নততর করিতে হইলে 'অহিংসা' অভ্যাস করিতে হইবে। প্রাণিহিংসা, দ্বেষ (jealousy) কিংবা পরশ্রীকাতরতা—সবই হিংসা-পদবাচ্য। মানুষের মনের মধ্যে (আশ্চর্য! যেন শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে) মিথ্যাচারিতার ভাবও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং উন্নততর মনের জন্য 'সত্যাভ্যাস' করিতে হইবে। কায়ে, মনে ও বাক্যে এই সত্যাভ্যাস করা উচিত। প্রাণিমাত্রেরই কাম সহজাত। পশুসমাজে সংযমের প্রয়াস নাই এবং সে-ক্ষমতাও পশুর নাই। পশুর মধ্যে যেটুকু সংযম দেখা যায়, তাহা ভয়ে। মানুষ স্বেচ্ছায় সংযত হইতে পারে এবং সেই স্বেচ্ছাকৃত সংযম বা ব্রহ্মচর্য তাহাকে যথার্থ মনুষ্যপদবিতে টানিয়া তোলে। মানসিক সংযমের সহিত কায়িক ও বাচিক সংযমকেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য বলা হয়। মানবতার অবমাননা হয় যখন মানুষ চুরি করে অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাকেই বলা হয় 'স্তেয়'। মনের মধ্যে অপরের বস্তু বা ধন ব্যবহার করিবার ইচ্ছাই স্তেয়। ইহার বিপরীত অভ্যাসের নাম 'অস্তেয়'। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি এই অস্তেয় অভ্যাসে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, এই সমাজই নরকতুল্য না হইয়া অবিলম্বে স্বর্গে পরিণত হইবে, সেকথা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। এবং 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ নিজের যেটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক গ্রহণ না করার অভ্যাস। মহামুনি দেখিয়াছিলেন, এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণিকুলেও কখনো কখনো প্রয়োজনের অধিক গ্রহণের অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। মানুষ বুদ্ধিমান জাত। অতএব মানুষের মধ্যে এই কু-অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই থাকিতে পারে। তাই তিনি বলিলেন—'অপরিগ্রহ' অভ্যাস করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। যুক্তিদ্বারা ইহাও

* "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।" (যোগসূত্র, ৩০।২)

প্রমাণিত হয় যে, এই অপরিগ্রহ বৃহত্তর সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি মূল্যবোধ, কারণ যদি অর্থনীতির দিক হইতে চিন্তা করা হয়, সমাজে অশান্তি-হিংসাদির অন্যতম কারণ অর্থের সুষম বণ্টন-পদ্ধতির অভাব। কোথাও দারিদ্র্যে, অনাহারে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কোথাও কাহারো ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ একশত কোটি টাকা বা তাহার অধিক। ক্রটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা যেমন ইহার কারণ, অপরদিকে যথার্থ শিক্ষার অভাবও ইহার একটি গুরুতর কারণ। সনাতন শিক্ষাপদ্ধতিকে সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী উপেক্ষা করিয়াই আজ ভারতবাসী বহির্মুখী হইয়া নিজের জাতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া বহিরাগতের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে— এইক্ষণে রাজনৈতিকভাবে না হইলেও অন্যভাবে।

এই পঞ্চ-ব্রতকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলিলেন— "সার্বভৌমামহাব্রতম্"। তিনি আরো বলিলেন যে, ব্যক্তিমানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে যদি সে 'নিয়ম'-এও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ বা তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান*—এই পাঁচটি ব্রতই 'নিয়ম'। ইহা শারীরিকও বটে, মানসিকও বটে। 'শৌচ'-এর অর্থ শুচিতা —বাহ্য ও আন্তর অর্থাৎ শুদ্ধ শরীর ও বস্ত্রের সহিত মনও শুদ্ধ রাখিতে হইবে। কাম-ক্রোধাদি চিত্তমল দূর করিয়াই মন শুদ্ধ করিতে হয়। 'সন্তোষ'-এর অর্থ মনের প্রফুল্লতা, অর্থাৎ সদানন্দময়তা। সকলের সহিত মধুর ব্যবহার এবং যেকেহ নিকটে আসিবে, তাহার মনেও সেই প্রফুল্লতার সঞ্চার হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মুখে শ্রীভগবানও এই প্রসন্নতার কথা বলিয়াছেন, যথা—"প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপ-জায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।" (২। ৬৫) অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির দুঃখ শীঘ্রই নাশ হয়। এবং সেইরূপ প্রসন্নচিত্ত সাধকই যথার্থ অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। জাগতিক কর্মক্ষেত্রেও দেখা যায়, হাসিখুশি মানুষকে সকলে পছন্দ করে এবং সে সহজেই সাফল্যলাভ করে। 'তপঃ' অর্থাৎ তপস্যা মূলত তিনপ্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক ক্লেশ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিবার ক্ষমতা, বাক্‌সংযম ও সত্যবচন এবং মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করাই শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার সংজ্ঞা। সদ্‌গ্রন্থ ও সাধনানুকূল গ্রন্থপাঠ এবং দীক্ষিত ব্যক্তির ইষ্টমন্ত্র বা গায়ত্রীজপকে 'স্বাধ্যায়' বলা হয়। ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ। 'ঈশ্বরপ্রণিধান'-এর অর্থ ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে সর্বকর্মফল নিবেদন এবং ঈশ্বরের (ইষ্টের) অনুক্ষণ স্মরণ-মনন। এই পাঁচটি ক্রিয়া বা ব্রতকে 'নিয়ম' বলা হয়।

সামান্য বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, যতই ethics বা 'মূল্যবোধ'-এর প্রয়োগের কথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চারিত হউক না কেন, এযাবৎ সবই বৃক্ষের পল্লবে পল্লবে বারিসিঞ্চন করা হইয়াছে। গভীরতা কিছুই নাই। যেসব নীতি, সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাসের কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতদিন শুনাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের বিশ্লেষণ শতগুণে শক্তিশালী ও গভীর। কারণ, এই বিশ্লেষণ মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া তাহার আদি-প্রবৃত্তিসকল চিহ্নিত করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টিস্তরে কিরূপ আচরণ করিলে সর্বথা মঙ্গল হইবে তাহাই নির্দেশ করে। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদ্‌গণ নিজেদের দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া একটি সার্বকালিক, সার্বভৌমিক ও সর্বজনীন নীতি বা মূল্যবোধের কথা খুব কমই বলিয়াছেন। সেই কারণে বিশ্বের একদা প্রবলতম মতবাদগুলি ধীরে ধীরে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রিয়াশীল হইয়া "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক-নীড়ম্" না হইয়া বরং আরো শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যম ও নিয়মের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মচর্যাদি যম এবং শৌচ-সন্তোষ-তপস্যাদি নিয়ম পৃথিবীতে যেকোন দেশে, যেকোন কালে, যেকোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে, মানুষে-মানুষে দৃঢ় বন্ধন ও প্রীতি সৃষ্টি করিতে পারে, সমাজ হইতে শোষণ দূর করিয়া শ্রেণিসংগ্রাম নির্মূল করিতে পারে, এই সমাজকে 'যৌবনের উপবন' কিংবা 'বার্ধক্যের বারাণসী' করিয়া তুলিতে পারে, জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হইতে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত 'যম ও নিয়ম'-এর প্রয়োগ ব্যাপারে অনেকেরই মতপার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিসকলের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিণতির জন্য অহিংসা-সত্যাদি ব্রতের কোন বিকল্প নাই, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শিশু অনুকরণপ্রিয় থাকে। সুতরাং তাহার সম্মুখের গৃহচিত্র এবং সমাজচিত্রটি যদি যথার্থ পবিত্র ও মনুষ্যোচিত হয়, তাহা হইলে তাহার মনও

* "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।" (যোগসূত্র, ৩২।২।)

অনুরূপে গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু শিশু যদি সম্মুখে কেবল হিংসা, প্রতারণাদি পশুবৎ আচরণ দেখে, তাহার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের আর কোন সুযোগ থাকিবে না। ছাত্রছাত্রীকে আত্মবিকাশের উপযোগী একটি সুন্দর পরিবেশ উপহার দেওয়ার দায়িত্ব কেবল সরকারের নহে, অভিভাবক ও আচার্যকুলের উপর সমভাবে বিদ্যমান। শিশুর কোমল মনে যে-ভাব উপ্ত হইয়া যায়, কৈশোর বা যৌবনে সেই ভাব শতগুণে তীব্রতালাভ করে। পুলিশ হেফাজতে এবং দেশের বিভিন্ন সংশোধনাগারে কুড়ি বা তাহার কমবয়সী অসংখ্য অপরাধীদের দেখিয়া মনে ক্ষোভ হয় যে, ইহারা সঠিক পরিবেশ পাইলে আজ নানা ক্ষেত্রেই সদ্ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোরী কিংবা যুবক-যুবতী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিশুমনে দৃঢ়মূল হইয়া যাইতেছে। ইহার সহিত রাজনীতি আসিয়া তাহাকে নূতন মাত্রা দান করিয়াছে। অপরপক্ষে বিভিন্নপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে সহজেই অনুমান করা যায়, অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্যাদি অনুশীলনকারী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীগণ যথার্থই 'সম্পূর্ণ মানুষ' বা integrated personality-র লক্ষ্যে চলিয়াছে। এই যম-নিয়ম সাধনা ব্যাহত হয় কয়েকটি বিশেষ কারণে, যথা সংশয়যুক্ত মন, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, পারিবারিক দারিদ্র্য, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে অসদ্ভাব ইত্যাদি। ইহাও সত্য যে, শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাবের গুরুত্ব অসীম। প্রায়শ দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকগণের দায়ভার বহনের যত ক্ষমতা, তাহার অধিক তাহাদের সন্তানসংখ্যা, অপরদিকে হয়তো বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মা। সংযম ও ব্রহ্মচর্য শিক্ষার অভাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সমস্যার তীব্রতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, অর্থলোভীর লোলুপতা, দরিদ্রের শোষণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমরা সকলেই চাক্ষুষ করিতেছি। হতদরিদ্র গ্রামের কোন কোন পরিবারে দেখা যায়, পশুপালনের ন্যায় শিশুপালন হইতেছে। সেই শিশু বড় হইয়া শ্রমিক হইবে এবং সামান্য অর্থ রোজগার করিবে—এই আশা। বিদ্যালয়-ছুটের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন পরিবার আছে যেখানে শিশু জ্ঞান হইবার পরেই দেখিতেছে, সন্ধ্যার পর গুরুজন কেহই আর সুস্থ থাকেন না। ভারতবর্ষের শতকরা সত্তরভাগ গ্রামের এই চিত্র! ইহার সহিত জাতিভেদ সমস্যা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসংখ্য ভাষার সমস্যা ইত্যাদি সব একসঙ্গে আসিয়া পড়ে। এই সুযোগে ভারতবর্ষের বহিরাগত কিছু অশুভ শক্তি আমাদের জাতীয় ঐক্যের বিনাশের জন্য প্রাণপণ সক্রিয়। এই অবস্থায় কোন্ শিক্ষানীতি অবলম্বন করিলে জাতির যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা নির্ণয় করা সত্যই দুষ্কর। তথাপি কখনোই আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টা বন্ধ করা চলিবে না।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মহামন্ত্র 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' উচ্চারিত হইবার শতাধিক বৎসর পরে UNESCO সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে সেবার প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়াছে। অবশ্য তাহাদের জড়বাদী সেবার সহিত স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদী সেবাদর্শের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাহা হউক, ১৯৯৮ সালে ১৮০টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধ, যথা স্বাধীনতা, ন্যায় (justice) এবং সাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। (৩১ জুলাই ২০০১-এর 'The Hindu' পত্রিকায় কে. সুব্রহ্মণ্যম্ রচিত 'Fostering Human and Ethical Values' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ সঞ্চার করিবার উপায় হিসাবে ইউনেস্কো 'সেবা'র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে ঃ "উচ্চশিক্ষার কার্যক্রমে সমাজসেবাকে অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকরী করিয়া দারিদ্র্য, অসহিষ্ণুতা, হিংসা, অশিক্ষা, বুভুক্ষা, পরিবেশদূষণ এবং ব্যাধি দূরীকরণে রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবার উপায় নির্ধারণ" করিতে হইবে এবং সেইপ্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ঐ সভায় অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। এবং এই সেবাপ্রকল্পের মাধমে কী ফললাভ হইবে তাহাও সভায় আলোচিত হইয়াছিল। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে ঃ "সেবার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব।" ইহা স্বামীজীর কথারই অনুরণন। তবে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক বিকাশের কথাই বলিয়াছেন। UNESCO-র মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের লক্ষণ কী? সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে ঃ স্মৃতি ও মেধার বৃদ্ধি, মনের ভাব সঠিক প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, মানুষের সহিত মানুষের সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করিয়া যেকোন কার্যকে সাফল্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলার শক্তিবৃদ্ধি, এককথায় সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত আচরণশৈলীর উৎকর্ষসাধন। অর্থাৎ ব্যাবহারিক কর্মকুশলতার সহিত জ্ঞান ও পেশাদারি দক্ষতার সংমিশ্রণ। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য এখানে থামেন নাই। তিনি আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করিয়া ইহার তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছিলেন। [ক্রমশ]

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র*

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত



॥ ১ ॥

৯২১ ওয়েস্ট টুয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রিট
লস এঞ্জেলেস
৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমার এখানে আসাটা নিজের পক্ষে এবং আমি যাদের ভালবাসি তাদের পক্ষে মোটের ওপর মঙ্গলপ্রদ হয়েছে। শেষপর্যন্ত এখানে এই ক্যালিফোর্ণিয়ায়! আমাদের একজন কবি বলেছেন ঃ "কোথা বারাণসী, কোথা কাশ্মীর, কোথা খোরাসান, কোথা বা গুজরাট! হে তুলসী [রহিমন?]! এমনি করেই মানুষের অতীত কর্ম তাকে টেনে নিয়ে চলে।"[১] আর তাই আমি এখানে। এটাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক হয়েছে; নয় কি? তুমি কি বস্টনে যাচ্ছ? আমার আশঙ্কা, তুমি যাচ্ছ না। তোমাদের কোন পরিকল্পনা আমি বানচাল করিনি; করেছি কি?—অপ্রয়োজনীয় খরচপত্র? বেশ, তা যদি কিছু হয়ে থাকে, আমি পুষিয়ে দেব। তোমারই শুধু ঝামেলা হলো। আমার খামখেয়ালিপনার জন্য আমি লজ্জিত। আচ্ছা, তুমি কেমন আছ? কি করে কাটাচ্ছ? তোমার সবকিছু কেমন চলছে? যদি ঘুম আসে তবে বেশ করে ঘুমাও; জেগে জেগে কাটানোর চেয়ে ঘুমানো ভাল। প্রার্থনা করি তোমার সর্বথা মঙ্গল হোক, সকল শান্তি তোমাতে নামুক এবং কাজ করার ও দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করার সকল শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হোক। আমার কাজ করার অমিত শক্তি আছে, কিন্তু দুঃখযাতনা সইবার ক্ষমতা খুবই সামান্য।

আমি আবার এত স্বার্থপর যে, অপরের কথা না ভেবে নিজের দুঃখভোগের কথাই ভাবছি। আমার জন্য প্রার্থনা করো, আর প্রবল চিন্তারাশি প্রেরণ করো যাতে আমি দুঃখযাতনা ভোগ করার মনোবল পাই। আমি জানি তুমি তা করবে। এখন আমি এই শহরটিতে কয়েক সপ্তাহ থাকতে চাই। তারপরে 'মা'-ই জানেন। শারীরিকভাবে গত কয়েক মাস আমি যা ছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক ভাল। হার্টের দুর্বলতা প্রায় চলে গেছে। অজীর্ণ রোগটাও অনেকটা ভালর দিকে, সামান্যই আছে। হার্টে কোনরকম কষ্টকর অনুভূতি ব্যতিরেকেই আমি এখন মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করতে পারি। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে আশা করি জীবনের অতিরিক্ত মেয়াদ লাভ করব। তোমাকে বস্টনে আসতে বলে নিজেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুব, খুবই দুঃখিত। যদি তুমি সেখানে গিয়ে থাক, তবে আশা করি স্থানটিকে এবং সমাবেশসমূহ উপভোগ করবে। যদি যাওয়া বাতিল করে থাক—! বেশ, তুমি কি ছুটি নিয়েছ, অথচ বস্টনে গেলে না? ওঃ, সবই ভণ্ডুল হলো! বেশ, ব্যাপারটা যদি তাই হয়ে থাকে তবে হাজারবার মার্জনা চাইছি। যেভাবেই হোক অচিরে বা বিলম্বে পরিস্থিতি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। জীবনের সামান্য এই কয়েকটা দিনে কী আসে যায়!

---

* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রদুটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় যথাক্রমে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১ অনুসন্ধানে জানা গেছে, কবিতাটির রচয়িতা তুলসীদাস নন, 'রহিমন' বা আবদুর রহিমন খানখানা (১৫৫৬-১৬২৭)—যিনি সম্রাট আকবরের সেনাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী ছিলেন। দোঁহাটি নিম্নোক্ত প্রকার ঃ "কহঁ কাশী কহঁ কাশ্মীর কহঁ খুরাসান গুজরাত।/ রহিমন ঐসে জীব কো পরারব্ধ লৈ জাতা॥"

মিসেস ফাঙ্কে কেমন আছেন? তাঁর জন্য অনন্ত ভালবাসা রইল। তুমি বড়দিন উপলক্ষ্যে কতদিনের ছুটি পাও? কবে থেকে তা শুরু হয়? যদি তোমার লেখার ঝোঁক ও ইচ্ছা হয় তবে আমাকে একখানা লম্বা চিঠি দিও; দেবে কি? কিন্তু আমার বন্ধুদের আমার ঠিকানাটা বলো না। যদি পারি তো কিছুদিনের জন্য আমি সংসার থেকে দূরে সরে যেতে চাই। ভাল কথা, মিঃ ফ্রেরের ঠিকানাটা দয়া করে মিসেস বুলের কাছে পাঠিয়ে দিও। তাঁর এটা প্রয়োজন। এখানে গত রাত্রে আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছি। তেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি বলে সভাস্থলে বিশেষ ভিড় হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও বেশ ভালসংখ্যক শ্রোতার সমাগম হয়েছিল বলা যায়। আমার মনে হয় তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যদি অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করি তবে এশহরে শীঘ্রই ক্লাস নিতে শুরু করব।...

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

॥ ২* ॥

প্যারিস
২৮ আগস্ট ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম, এই স্বস্তিটুকু দিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ। তোমার সম্পর্কে আমি কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

তাহলে মিস ওয়াল্ডোর ওখানে বেড়ানোর মজা উপভোগ সেরে তুমি ডেট্রয়েটে ফিরেছ এবং আবার ঘাড়ে জোয়াল তুলে নিয়েছ!! এই হলো জীবন, ক্লান্তিকর কাজ আর কাজ। তা নইলে, আমাদের অন্য কীই বা করার আছে? কাজের চাকায় পেষণ; শুধু পেষণ! এর ফল কিছু একটা ফলবেই—কোন না কোন পথ নিশ্চয়ই খুলে যাবে। যদি তা না হয়—সম্ভবত তা কোনদিনই হবে না—তাহলে, তাহলে—তারপর কি? আমাদের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুকে শুধু একটি ঋতুর জন্য ঠেকিয়ে রাখা! হায় মৃত্যু, তুমি না থাকলে দুনিয়ার কী পরিণাম হতো! তুমি মহান ত্রাতা! এই জগৎকে যেমনটি দেখা যায় তা যে সত্য নয় বা নিত্য নয়, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!!

ভবিষ্যৎ কী হতে পারে—কিছুমাত্র উৎকৃষ্টতর? ফুঃ! তা অবশ্যই হবে বর্তমান অবস্থার পরিণতি, বড় জোর এরই মতো, যদি না নিকৃষ্টতর কিছু হয়!! স্বপ্ন! অহো, স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে যাও ক্রিস্টিনা। স্বপ্ন, স্বপ্নের ইন্দ্রজালই জীবনের সেতু—এটাই আবার প্রতিবিধান। স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখে যাও—স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্নকে বিনাশ কর। আমার সংবাদ কীই বা আছে? খবর কিছুই নেই; পুরাতনের কবল থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি না। 'খবর, পুরনো খবর'—ব্যস্। আমি ফরাসি ভাষা শেখার চেষ্টা করছি। এখানকার হোমরাচোমরাদের সঙ্গে কথা বলছি। এসব কথা ইতোমধ্যেই কয়েকজনের খুব তারিফ পেয়েছে। সকল জগতের কাছে বলছি চিরন্তন ধাঁধার কথা—যাকে বলা যায় অদৃষ্টের এক আদি-অন্তহীন কাটিম এবং যার সূতিপ্রান্ত কেউ খুঁজে পায় না, অথচ প্রত্যেকেই ভাবে তার নিজের মতো করে একবার অন্তত পেয়েছে—শুধু ক্ষণেকের জন্য নিজেকে বোকা বানাতে, তাই না? এখন কথা হলো—মহৎ কার্য সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু মহৎ কার্যকে কে বা মূল্য দেয়? তার চেয়ে ছোট ছোট কাজ কর না কেন? একটি অপরটির মতোই উৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে মহত্ত্বকে দেখা, এই হলো গীতার শিক্ষা; পবিত্র এই প্রাচীন গ্রন্থখানি!!

"অতীত ভূগর্ভে নিহিত এবং ভবিষ্যৎ অগ্নিগর্ভে ভস্মীভূত।" মুক্তির এই কি একমাত্র পথ? তাই তো মনে হচ্ছে। দেহের বিষয়ে ভাবনা করার অবকাশ আমার বিশেষ ছিল না। সুতরাং সেটি নিশ্চয় ভালই ছিল। এই জগতে চিরদিন ভাল কোন কিছুই নেই। মাঝে মাঝে আমরা সেকথা ভুলে যাই। অর্থাৎ ভাল থাকা এবং ভাল কাজ করা। আমি মাঝে মাঝে শক্তিশালী ও সুখী থাকি। শুধু আমার সঙ্গে দুঃখের এত দীর্ঘকালের সখ্য যে, আমি তাকে বেশিদিন দৃষ্টির অগোচরে রাখতে পারি না। এই সবকিছুই ইচ্ছার খেলা—ক্রিয়া করে চলেছে।

এখানে আমরা আমাদের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি—তা ভালই হোক বা মন্দই হোক। যখন স্বপ্নের অবসান হবে, রঙ্গমঞ্চ থেকে যখন আমরা সরে যাব, তখন এইসব যাবতীয় ব্যাপারের জন্য আমরা একচোট প্রাণখোলা হাসি হাসব। কেবল এই বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

* এই চিঠির কিছু কিছু অংশ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে (৪৯৪ নং পত্র) ভুলক্রমে নিবেদিতাকে সম্বোধন করে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হলো।



আষাঢ় ১৩১১.
জুন ১৯০৪

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

একবারকার রোগী আর একবার রোজা।

(স্বামী শিবানন্দ)

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট সব-ডিভিজনস্থ ঝিক্‌রা চট্‌কাবেড়ে গ্রামে উপেন্দ্র নাথ নাথ নামক ৩০।৩১ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবকের বাস। পিতলের তালা প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয়ের দ্বারা বেশ দশটাকা উপায় করিত। বহুদিন হইতে সে ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমাগত জ্বরভোগে বিরক্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর হইল, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অবিমুক্তপুরী ৺কাশীধামে দেহত্যাগ মানসে উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন, সত্রে ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ উদরপূরণ ও সত্রের ছাদবিহীন বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ' এই শাস্ত্রবাক্যটীই এই সময়ে যেন তাহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল।

উপেন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।... এইরূপে কয়েকমাস যায়, একদিন কোন ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া উপেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কথা জানান এবং বলেন, সেখানে গেলে বিনা ব্যয়ে ঔষধ, পথ্য এবং থাকিবার স্থান সমস্তই পাওয়া যায়। উপেন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া প্রথম প্রথম সেবাশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া যাইত, কিন্তু সেবাশ্রমের অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, ইহাতে রোগের কিছু উপশম হইতেছে না। তখন তাঁহারা তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় প্রায় ৭।৮ মাস রোগভোগের পর উপেন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল ও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আশ্রমাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যদি আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে আশ্রম সাহায্য করিতে প্রস্তুত। উপেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া বলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই। আপনারা যদি দয়া করিয়া আশ্রমে রাখিয়া উহার কোন কার্য্য করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষেরা সম্মত হইলে উপেন্দ্র অতি আনন্দের সহিত জীবসেবারূপ মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হইল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ ও অন্যান্য রোগিগণকে সে যে কিরূপ যত্নের সহিত সেবা করিত, তাহা বর্ণনাতীত।... উপেন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে সেবাশ্রমের একজন উপযুক্ত সেবক হইয়া দাঁড়াইল।...

পাঠক মহাশয়দের জানা উচিত যে, সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য এখানে কাশীবাসী অনেক সহৃদয় ব্যক্তির বাটীতে একটী করিয়া হাঁড়ি দিয়া আসা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যহ পাকের পূর্ব্বে এক মুষ্টি চাল ঐ হাঁড়িতে ভিক্ষা হিসাবে ফেলিয়া রাখেন এবং সপ্তাহে একদিন আশ্রমস্থ একজন ব্রহ্মচারী বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই উপায়ে মাসে প্রায় ৫।৬ মণ চাল সেবাশ্রমে আসে এবং তদ্দ্বারা অনেক দীন দরিদ্র পীড়িতের সেবা হয়। উপেন্দ্রনাথ এখন এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় হাঁড়ির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দুই শত বৃদ্ধি করিলেন। তদ্দ্বারা আশ্রমের যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল।

সম্প্রতি প্রায় এক মাস হইল, সেবাশ্রমের জনৈক তত্ত্বাবধায়ক এক বসন্ত রোগীর সেবা করিয়া নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। উপেন্দ্র তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল, কিন্তু নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬ই মে শুক্রবার ৺কাশীলাভ করিয়াছে।

উপেন্দ্র আশ্রমস্থ যে সকল রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিত, তাহাদের বাড়ী গিয়া যেসকল দরিদ্র অনাথ অসক্ত রোগীদের ঔষধপথ্য নিত্যই দিয়া আসিত, সকলেই তাহার এই অকালে কালগ্রাসে দিবারাত্র তাহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছেন। ধন্য উপেন্দ্রনাথ! তুমি যে মূল মন্ত্র পাইয়াছিলে, সে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য তুমি যথার্থ অকপটভাবে প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সতত যত্নবান ছিলে। পাঠক, সে মন্ত্রটী কি শুনিবেন? ঈশ্বরই জীবরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, নিঃস্বার্থভাবে জীবসেবা করিলে স্বয়ং ঈশ্বরেরই সেবা হয়; নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, তপস্যা ইত্যাদিতে মনুষ্য যে ফল লাভ করে, নিষ্কাম জীবসেবাতেও সেই ফল হয়; বরং কাহারও কাহারও মতে আরো অধিক। উপেন্দ্র যখন সেবাশ্রমের সেবকরূপে গৃহীত হয়, তখন এই মন্ত্র পাইয়াছিল এবং জীবনটী এই মন্ত্র সিদ্ধির জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিল। যে সেবাশ্রমে রোগী হইয়া প্রবিষ্ট হইল, সেইখানে আবার রোজা হইয়া ভগবানের কার্য্য নিঃস্বার্থভাবে করিতে করিতে এই অবিমুক্তপুরী কাশীধামে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ধন্য শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী কথিত কর্ম্মযোগ উপদেশ, ধন্য তাঁহার গুরুদেব, যিনি লোকহিতসাধক জীবন্ত মহামন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা আবার স্বামীজি দ্বারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—**সম্পাদক**

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কর্মরহস্য

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে, শুভ বা অশুভ, ভস্মীভূত করে।*

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলে মনে হইতে পারে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তো নিজেকে স্থূল-সূক্ষ্ম হইতে স্বতন্ত্রবোধ করে। তাহা হইলে পাপরাশি তো তাহার পরিত্যক্ত চিত্তের মধ্যে রহিয়াই গেল। তখন এই পাপ জগতের আর দশটা বস্তুর মতো এই জগতের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে পরে অন্য কাহারো অনিষ্ট হইতেও তো পারে। 'পুণ্য'-এর ক্ষেত্রেও একই কথা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা যখন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং পাপের অস্তিত্ব কিছুমাত্রই থাকে না। পাপের সংস্কার বলিতে মানুষের চিত্তের একটি বিশেষ গঠনপ্রণালী মাত্র বুঝায়, যাহা পরবর্তী দেহে আবার ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। কিন্তু চিৎ-বস্তুর সংস্রব ঐ জড়রাশি হইতে সরিয়া গেলে উপদ্রষ্টা-অনুমন্তার অভাবে তাহার কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। মানুষের অন্তরে অবস্থিত চৈতন্যের চিদংশের অনুমোদন হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া হয়; সেই চৈতন্য যাবতীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইলে দেহ-মন নির্বীজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রারব্ধকর্মের ফল সাধনা দ্বারা ক্ষয় হয়, সঞ্চিত কর্মের ফল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ইহাকেই শ্রীভগবান 'ভস্মসাৎ' শব্দের দ্বারা বুঝাইলেন।

[**মন্তব্য ঃ** এই শ্লোকে মূলত জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকেও জ্ঞানের প্রশংসা করা হইবে। কিন্তু গীতার এই জ্ঞান শুষ্ক নহে, ইহার মধ্যে ভক্তিরস সিঞ্চিত হইয়া আছে। ১২শ অধ্যায়ের শেষে তাই বলিয়াছেন ঃ "যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে/ শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।।" অর্থাৎ শ্রদ্ধাশীল হইয়া যেসকল ভক্ত এই মোক্ষধর্ম সাধন করেন, তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়।—**সম্পাদক**]

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *এই জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) অজ্ঞাননাশক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। ইহার তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে অন্য কিছু নাই। কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত সংসিদ্ধ (সংস্কৃত) হইলে স্বয়ং সাধক স্বীয় আত্মাতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জ্ঞানগম্য যত বিষয় আছে, তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অর্থাৎ 'আমি চিন্মাত্র'—এই বোধ হইলে নিজেকে সর্ববিধ সংস্কারবিমুক্ত বলিয়া জানা যায়। আর কোন জ্ঞানেই নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধির পাপ-পুণ্যাদি হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায় না। নিজেকে সর্বপ্রপঞ্চ-বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক বলিয়া জানিবার কী উপায়?

কর্মযোগী চিন্তা করেন ঃ আমি পূর্ব সংস্কারে বাধ্য হইয়া যাহা কিছু করি, তাহার কোন কিছুরই ফল আমি চাহি না। ভক্ত ভক্তির দিক হইতে নিজেকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করিতে থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধক যথার্থই ভাবিবেন, আমি স্বরূপত অকর্তা; দেহ-মন-বুদ্ধি কাজ করিতেছে। তাহার কর্ম ও ফলের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। দীর্ঘ সময় যত্নের সহিত এইরূপ অভ্যাস করিয়া মনে নিষ্কামভাব প্রবল হইয়া উঠিলে পর স্থির হইয়া যোগশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্বস্বরূপের বা ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান করিতে করিতে মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে তাহাকেই বলা হয় 'যোগাবস্থা'। সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানে সকল বস্তু উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

[**মন্তব্য ঃ** স্বীয় শারীরিক বা মানসিক প্রবৃত্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না। এই কারণে দীর্ঘ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্/ স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।" (৪৬) নিজের

স্বভাবগত কর্মের দ্বারাই ঈশ্বরার্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এবং এইরূপে "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।" (গীতা, ১৮।৫০) অর্থাৎ এইরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠার পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে পরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।—সম্পাদক]

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥৩৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ, ঈশ্বরপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্যই অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন লোকের বাহ্য ব্যবহারে মনে হয় শাস্ত্র, সাধু ও গুরুর উপদেশে খুব শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাহারা তদনুযায়ী কার্য করে না। সাধনপথে কেবল শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকিলে অগ্রসর হওয়া যায় না; যথারীতি সেই সাধনে লাগিয়া থাকিতে হয়।

ইন্দ্রিয়সংযম তো অধ্যাত্মসাধনার প্রথম কথা। ইন্দ্রিয়সংযম না করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় প্রবিষ্ট হইলে বরং অনিষ্টই হয়। সেইজন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমত ইন্দ্রিয়সংযম, দ্বিতীয়ত গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এবং সাধনে লাগিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। জ্ঞান একবার হইয়া গেলে আর বিন্দুমাত্র অশান্তি থাকে না এবং সেই শান্তি কখনো নষ্ট হয় না।

অতএব সংযম, শ্রদ্ধা ও সাধননিষ্ঠায় যোগ্যতালাভ হইলে জ্ঞানলাভ করিতে আর বিলম্ব হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত সাধনায় লাগিয়া থাকিলে জ্ঞানলাভ হইবেই হইবে। ভগবান এই বিষয়ে যেন 'গ্যারাণ্টি' দিতেছেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥৪০॥

শ্লোকার্থ ঃ *অজ্ঞ (জ্ঞানহীন বা ব্রহ্মজ্ঞানহীন), শ্রদ্ধাবিহীন এবং সর্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত বা সংশয়ী ব্যক্তি পরমার্থসাধনের অযোগ্য। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির ইহলোকেও সুখ-শান্তি লাভ হয় না, তাহার পরলোকও নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ কিসে মানুষের অভ্যুদয় (কল্যাণপ্রদ জাগতিক উন্নতি) হয় এবং কিসে নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) লাভ হয়—যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের ইহ-পরকালে সুখলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং ধার্মিক হইতে গেলে কিংবা মুক্তিলাভ করিতে হইলে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জ্ঞানলাভ (theoretically) সর্বাগ্রে কর্তব্য। আবার জ্ঞান থাকিলেও পূর্বে কৃত পাপের ফলে কাহারো কাহারো সাধনপথে শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়। যেমন সাধু হইব, না গৃহস্থ হইব; সন্ন্যাসী না বাবাজী, কাহার নিকট দীক্ষা লইব—এইরূপ নানাপ্রকার সংশয়ে তাহাদের মন সর্বদা আন্দোলিত হয়। এইপ্রকার অস্থির মনোবৃত্তিযুক্ত লোকের ইহলোকে দারুণ অশান্তিতে জীবন কাটে এবং শরীর-মনের যোগ্যতার অভাবে জীবনান্তেও কোনপ্রকার উর্ধ্বগতি হয় না।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪১॥

শ্লোকার্থ ঃ *স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং ধর্মাধর্ম ত্যাগ হইয়াছে, সেই আত্মবান অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে কর্মরাশি (দৃষ্ট কিংবা অদৃষ্ট) বদ্ধ করিতে পারে না। তাহার কর্ম নিষ্কাম এবং কর্তৃত্বরহিত বলিয়া ইষ্ট, অনিষ্ট বা মিশ্র কোন ফলই উৎপন্ন করে না।*

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং লীলা (সৃষ্টিতত্ত্ব) বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার উপর মনের এক তীব্র আকর্ষণ বোধ হয়। তখন সাধক ভগবানের চিন্তাতে সর্বদা এত মগ্ন থাকেন যে, তাঁহার বাহ্যকর্ম আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। এইরূপে অনেকদিন যোগস্থ থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ হইতেই তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না; কেবল এক দারুণ ভ্রমবশত এই দেহ-মনের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় তিনি কি কর্ম করেন?

হ্যাঁ, গুরুর আদেশে হয়তো কোন লোকহিতকর কার্য করেন। শরীররক্ষার জন্য যেসব কার্য তাঁহাকে করিতে হয়, সেইসব কার্য শরীর-মন করিতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত—এইরূপ বোধ করেন। এইরূপে কাজ করিয়া যদি ঘটনাচক্রে কোন দোষত্রুটি হয়, কিংবা কোন পুণ্যকার্য সম্পাদিত হয়—তাহার সঙ্গে সেই পুরুষের কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥৪২॥

শ্লোকার্থ ঃ *অতএব হে ভারত (অর্জুন), বুদ্ধিতে অবস্থিত অজ্ঞান হইতে জাত এই আত্মবিষয়ক সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর। এবং উত্তিষ্ঠ অর্থাৎ যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।*

ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই, আগে theory জানিয়া পরে পরীক্ষাগারে practical বা experiment করিতে হয়; ঠিক সেইরূপ আগে তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে সব কথা বুঝিয়া নিয়া সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জীব কী এবং কী উপায়ে তাহার স্বস্বরূপের জ্ঞানলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে সব কথাই বলিলেন। এখন 'আমি অমুকের পুত্র অমুক' বা 'অমুক আমার আত্মীয়-কুটুম্ব' —এইসব ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া 'আমি জন্মমরণরহিত আত্মা'—এইসব সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া সংশয়মুক্ত হইয়া মোক্ষসাধনের উপায়স্বরূপ নিষ্কামকর্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন।

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

[ক্রমশ] ॥কুড়ি॥

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

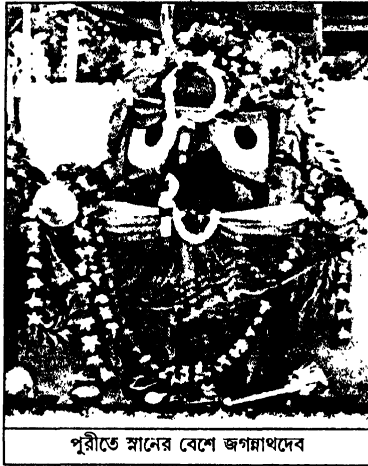
ধর্ম

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা

বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে 'স্কন্দপুরাণ' সবচেয়ে বড়। এর মধ্যে 'উৎকল খণ্ড' নামে একটি খণ্ড আছে। এই খণ্ডে প্রভু শ্রীজগন্নাথ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র (জগন্নাথক্ষেত্র) সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলা আছে। এখানে দেখা যায়, ভগবান জগন্নাথ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলছেনঃ "আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি।" তাঁর নির্দেশে এই দিনেই স্নানপূর্ণিমা বা জগন্নাথদেবের পুণ্য স্নানযাত্রা পালন করা হয়। এটি স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর অর্থাৎ সত্যযুগের প্রথমদিকের কথা। সর্বজনসমক্ষে জগন্নাথ ঐদিন স্নান করেন।

পুরাণের মতে, ব্রহ্মার একদিনে ১৪ জন মনুর সময়কাল চলে। স্কন্দপুরাণের মতানুযায়ী এখন বৈবস্বত মনু—সপ্তম মনুর সময়। এরপর আরো সাতজন মনু আসবেন। উক্ত পুরাণ অনুযায়ী স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা দ্বিতীয় মনুর সময় প্রবর্তিত হয়। সেটি ছিল সত্যযুগ। এখনো সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে আর পুরাণের মতানুযায়ী এই প্রথা এখনো বহুদিন ধরে চলবে।



পুরীতে স্নানের বেশে জগন্নাথদেব

প্রথমে স্নানযাত্রার কথাতেই আসা যাক। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের যে বিশেষ স্নান অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই 'স্নানযাত্রা' বলে এবং এই দিনটিকেই জগন্নাথদেবের আবির্ভাবদিবস হিসাবে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি খুবই ছোট, কিন্তু বড়ই সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে পালিত হয়। ঐদিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রেশমি বস্ত্র পরিয়ে শোভাযাত্রা করে মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি নির্দিষ্ট, সুসজ্জিত এবং সুগন্ধী জল ও ধূপে পবিত্র বেদিতে এনে বসানো হয়। একটি বিশেষ কূপ থেকে জল এনে ১০৮টি সোনার কলসি ভর্তি করা হয়। এই কারণে বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে পবিত্র জল এনে কূপটিতে জমা করা হয়। এই জলে দেবতাদের অভিষেক হয়। এর সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। স্নানের পর জগন্নাথদেব হাতিবেশ ধারণ করেন।

জগন্নাথদেবের নির্দেশ অনুযায়ী এই উৎসবের পর তিনি এক পক্ষকাল অদর্শন থাকেন। জনসাধারণ এই এক পক্ষকাল তাঁর দর্শন পায় না। তখন গর্ভগৃহে তাঁর দেহ সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত করা হয়, তাঁকে বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন ও পানীয় দেওয়া হয় এবং তাঁর 'জ্বর' নিবারণ করতে 'দশমূলা' নামক পাঁচন দেওয়া হয়। এই সময়কে বলে 'অনবসর কাল' বা বিশ্রাম মুহূর্ত। এর এক পক্ষকাল পরে তিনি আবার দর্শন দেন। একে বলে 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবনোৎসব'।

জগন্নাথদেবের স্নানপর্বটিই বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অন্য দেবতাদেরও ঐ পবিত্র জলে পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য মিশিয়ে বৈদিক মন্ত্র সহযোগে স্নান করানো হয়।

এই অনুষ্ঠানের সবটিই মনে হয় আবহাওয়ার সঙ্গে জড়িত। এইসময় প্রচণ্ড গরম পড়ে, তাই দেবদেহকে ঠাণ্ডা করার জন্যই এই বিধি। ভক্তরা নিজেরাও এইসময় এইভাবে স্নান করেন। যদিও এখন পুরীতেই এই উৎসব বিশেষভাবে পালিত হয়, কিন্তু এর সূচনা বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁদের ভক্তরা এইসময় এইভাবে স্নান করাতেন। এখনো বৃন্দাবনে এই প্রথা প্রচলিত আছে। অনেক ভক্ত আবার সারাদিন বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে ঘুরে এইভাবে স্নান করেন।

এবার আসা যাক জগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিবরণে। স্নানযাত্রার পরই আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব পৃথিবী-বিখ্যাত। এটি খুবই প্রাচীন উৎসব। লক্ষ লক্ষ হিন্দু এইসময় রথযাত্রা দর্শন করতে পুরীতে আসেন।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—রথে জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে দেহরথে জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে মুক্তিলাভ ঘটে। বর্ষাকাল মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। তাই এই কালকে সর্বঋতুর অগ্রগণ্য এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এও বর্ষাকালের প্রশংসা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রথের উৎপত্তি সম্পর্কে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রথযাত্রাকে স্থানীয় লোকেরা 'গুণ্ডিচাযাত্রা' বলে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম ছিল গুণ্ডিচা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই পুরীর বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ

করে সেখানে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা—সে-কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত। মূর্তিগুলি কাঠের। প্রথমে গুণ্ডিচা মন্দির নামে একটি ছোট মন্দিরে সেগুলি নির্মিত হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে এনে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় থেকেই প্রতি বছর মূর্তিগুলি একবার করে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, রথযাত্রা বৌদ্ধদের কাছ থেকে নেওয়া। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির এখন যেখানে, সেখানে আগে বুদ্ধমন্দির ছিল। বৌদ্ধরা প্রতি পাঁচবছরে একবার রথযাত্রা উৎসব করত। বুদ্ধের বিশাল মূর্তি ও তাঁর পবিত্র দাঁত মন্দিরে রাখা হতো, যা শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হতো। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্যের প্রচেষ্টায় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হলো, তখন হিন্দুরা বুদ্ধের জায়গায় বিষ্ণুমূর্তি রথে বসিয়ে রথযাত্রা শুরু করল এবং ক্রমে ক্রমে এভাবেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত হলো।

জৈনরা আবার জগন্নাথদেবকে 'জিন' হিসাবে দাবি করেন। ইতিহাস প্রমাণ করে, মগধের সম্রাট অশোক কলিঙ্গযুদ্ধের পর 'কলিঙ্গ জিন' বা 'আদি জগন্নাথ'কে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসাবে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার একটি রথে করে কলিঙ্গ-রাজ করভেলা উৎসব সহকারে 'কলিঙ্গ জিন'কে নিজের দেশে নিয়ে যান। পরবর্তী কালে এর অনুকরণেই হিন্দুরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে রথযাত্রার প্রবর্তন করেন।

এই রথযাত্রা উৎসবে প্রতি বছর তিনটি নতুন রথ তৈরি হয়। আগে পুরীর রাজা রথের কাঠ যোগাতেন, যা বর্তমানে সরকার করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন একটি বনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে রথনির্মাণ শুরু হয়। প্রত্যেকটি রথই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জগন্নাথদেবের রথের নাম 'নন্দীঘোষ' বা 'চক্রধ্বজ' বা 'গরুড়ধ্বজ'। রথটি ষোলটি দৈত্যাকার চাকার ওপর স্থাপিত। প্রত্যেকটি চাকার পরিধি ৭ ফুট। রথটির উচ্চতা ৪৫ ফুট ও প্রস্থে ৪৫ ফুট। রথটি হলুদ রঙের। বলভদ্রের রথের নাম 'তালধ্বজ' বা 'হলধ্বজ'। এটি ১৪টি ঐরকম বড় চাকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। রথটি ৪৪ ফুট উঁচু ও ৪৪ ফুট চওড়া। রথটি নীল রঙের। সুভদ্রার রথের নাম 'পদ্মধ্বজ' বা 'দেবদলন'। এটির উচ্চতা ৪৩ ফুট। এটি গাঢ় লাল রঙে রঞ্জিত। প্রত্যেকটি রথের রঙ ভিতরে উপবিষ্ট দেবদেবীর পোশাকের সঙ্গে এক। জগন্নাথ পীতাম্বর, বলভদ্র নীলাম্বর ও সুভদ্রা রক্তাম্বরী।

যখন রথ তৈরি সম্পূর্ণ হয়, তখন সেগুলিকে মন্দিরের প্রধান ফটক বা সিংহদুয়ারের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। উৎসব যেদিন শুরু হয়, সেদিন প্রত্যূষে মন্দিরের ভিতর দেবতাদের প্রাত্যহিক পূজা ইত্যাদি সমাপনান্তে ফুলের মুকুটে (তাহিয়া) সাজিয়ে পাণ্ডারা তাঁদের দোলাতে দোলাতে এমনভাবে সিঁড়ির ২২টি ধাপ নামিয়ে আনেন যা দেখে মনে হয়, দেবতারা নিজেরাই যেন হেঁটে হেঁটে নেমে আসছেন। প্রথমে বলভদ্র, তারপর সুভদ্রা ও সবশেষে জগন্নাথকে এনে রথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই পুরো পদ্ধতিটিকে 'পহণ্ডি' বলে।

রথগুলি তখনি চলে না। পুরীর রাজা পালকিতে করে এসে তিন দেবদেবীকেই যথারীতি ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করেন ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথ ও পথ ঝাঁট দেন। পুরীর রাজা 'চলন্তি বিষ্ণু' নামে অভিহিত। এই পদ্ধতিটির নাম 'ছেরা পহরা'। এরপরই ড্রাম ও বিভিন্ন বাজনা বেজে ওঠে। সারা আকাশ-বাতাসে এই বাজনার সুর ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি আসে, যার জন্য হাজার হাজার পুণ্যার্থী অপেক্ষা করে আছেন। সকলেই মহা উৎসাহে রথের দড়ি ধরে টানেন। আস্তে আস্তে রথ চলতে শুরু করে ও অবশেষে গুণ্ডিচাবাড়ি পৌঁছায়। সেখানকার মন্দিরে দেবতারা অধিষ্ঠিত হন। রথ মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ৫ দিন পর 'হেরাপঞ্চমী'। ৭ দিন পর দেবতা-সহ রথ মূল মন্দিরে ফিরে আসে। সেদিন দেবতা-সহ রথ মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। পরদিন একাদশীতে দেবতাদের সোনার গহনায় সাজিয়ে সিংহদুয়ারে আনা হয়। এর নাম 'সুনাবেশ'।

মন্দিরে ঢোকার সময় আবার লক্ষ্মী ও জগন্নাথের 'বাক্‌বিতণ্ডা' হয়। জগন্নাথ লক্ষ্মীকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, তাই অভিমানে ও দুঃখে লক্ষ্মী মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখেন তাঁকে ঢুকতে দেবেন না বলে। এই সময় লক্ষ্মীর কথাগুলি বলেন দেবদাসীরা এবং জগন্নাথের কথাগুলি বলেন অব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। সবই গানের মাধ্যমে হয়। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকও উচ্চারিত হয়। এর নাম 'লক্ষ্মীনারায়ণ ভেট'। এরপর দামী উপহার কবুল করে জগন্নাথ লক্ষ্মীকে তুষ্ট করেন। লক্ষ্মী দুয়ার খুলে দেন। দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। রথযাত্রার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ইংরেজরা এদেশে আসার আগে পুরীর রাজাই ওড়িশা শাসন করতেন। প্রজারা রাজাকে দেবতাজ্ঞান করত। ক্রমে রথযাত্রা ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তারপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী এই অনুষ্ঠানের কদর। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যে বহু কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। রথযাত্রা আজ এক সার্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। ❑

মা তৃ তী র্থ প রি ক্র মা

ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর বাড়ি

নির্মলকুমার রায়*

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে **শ্রীশ্রীমায়ের** ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার অষ্টাদশ পর্যায়ে ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর বাড়ি।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত গৌরীমার জননী, কালীসাধিকা গিরিবালাদেবীর দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের বাড়িতে (১১৪/১এ, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদাদেবীর পদার্পণ হয়েছিল। গিরিবালাদেবী ছিলেন হাওড়ার শিবপুর-নিবাসী পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। তিনি বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং তাঁর রচিত 'নামসার' ও 'বৈরাগ্য সঙ্গীতমালা' নামে দুটি পুস্তকও তৎকালে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং তাঁর সুকণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীতশ্রবণে সকলে মুগ্ধ হতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গিরিবালাদেবীর নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালাদেবী কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ব্রজবালা এবং আরো দুই-একজন আত্মীয়ও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিবালার রচিত সঙ্গীত তাঁহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুর ভালবাসিতেন। কিন্তু গিরিবালা পুরুষমানুষের সম্মুখে গাহিতে বড়ই লজ্জানুভব করিতেন। ঠাকুরও ছাড়িতেন না, তামাসা করিয়া বলিতেন, 'আচ্ছা, আমি সব লোক ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি! সেই গানটি একবার গাও, মা!' ঠাকুরের আদেশে গিরিবালাদেবীকে অগত্যা গাহিতে হইত—

'হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কী এতই শোভা,
কত যোগী ঋষি চিন্তে যাঁরে, চিন্তামণির মনোলোভা।
যেন মুক্তি অভিলাষী, নখরে পড়েছে শশী,
বিনাশে হৃদি-তামসী তরুণ অরুণ জিনি আভা।
'কিঙ্করী' মনেরে বলে, পূজ ও-পদকমলে,
রাখিয়ে হৃদিকমলে মনে মনে দাওরে জবা।'

"গিরিবালা শ্রীশ্রীমাকেও ভক্তি করিতেন; কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল অধিক। মা ও মেয়েতে সময় সময় এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক চলিত।... এইরূপ বাদানুবাদের পর একবার গৌরীমা গিরিবালাকে একপ্রকার জোর করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, তাঁহারা যাইতেই তিনি সহাস্যবদনে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিবালা শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চাহিতেই বিস্মিত কণ্ঠে 'এ্যাঁ, মা তুমি! তুমি! এ যে আমার সেই—' বলিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পদধূলি কপালে ও মাথায় মাখিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা হাসিয়া উঠিলেন, 'কি হয়েছে গো, অমন কচ্ছ কেন?' ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বুঝিয়া গৌরীমা বিজয়গর্বে বলিলেন, 'হবে আবার কি? যা হবার তাই হয়েছে।' শ্রীশ্রীমা খুব হাসিতে লাগিলেন।"[1]

একদা ভক্তিমতী গিরিবালাদেবীর আন্তরিক আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা-সহ যে তাঁর বাড়িতে শুভাগমন করেছিলেন, সেসম্পর্কে জানা যায়ঃ "গিরিবালাদেবীর আমন্ত্রণে ঠাকুর ও ঠাকুরানী ভবানীপুরে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। গিরিবালা ছিলেন বিদুষী এবং কবি, অনেক কালীসঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কালীসঙ্গীত-শ্রবণে ঠাকুর আনন্দ পাইতেন।"[2]

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদও গিরিবালাদেবীর বাড়িতে আগমন করেছিলেন—"ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরখানি গিরিবালার অবর্তমানেও দীর্ঘকাল পূজাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীম (মাস্টার মহাশয়), বলরাম বসু প্রভৃতি ভক্তগণ অনেকেই একাধিকবার গিরিবালার ভবনে গিয়াছেন এবং পরমানন্দে মা কালীর প্রসাদ পাইয়া আসিয়াছেন।"[3]

* শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার সিঁথি-নিবাসী নির্মলকুমার রায় গত ১২ মে ২০০৪ রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় ফুসফুসে সংক্রমণজনিত কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য একটি কাজ করে চলেছিলেন, যা 'মাতৃতীর্থপরিক্রমা'-রূপে 'উদ্বোধন'-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। (আগামী আরো কয়েক মাস প্রকাশিত হবে।) কিন্তু তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলো। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে গানের তালিম নিয়েছিলেন। সত্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে' উল্লেখযোগ্য। ঐ গ্রন্থটির জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি 'মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার' লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তিনি চিরশান্তিতে আশ্রয়লাভ করুন—এই প্রার্থনা করি।—**সম্পাদক**

ঠাকুরের অবর্তমানেও একদা শ্রীশ্রীমা কালীঘাটে কালীদর্শনে গেলে গিরিবালাদেবীর বাড়িতে শুভাগমন করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় "ভক্তিমতী মায়েরা একদিন মাতাঠাকুরানীর শ্রীমুখ হইতে ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, 'ঠাকুর বলতেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী আর খড়দার শ্যামসুন্দর—এঁরা জ্যান্ত। হেঁটে চলে বেড়ান, কথা কন, ভক্তের কাছে খেতে চান।' সকলে আবেদন জানাইলেন, মায়ের সঙ্গে তাঁহারা কালীঘাটে মা কালী দর্শনে যাইবেন। মা তাহাতে সম্মত হইয়া গৌরীমাকে একদিন কালীদর্শনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। গৌরীমা সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।... মাতাঠাকুরানীর সহিত সকলে মা কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।... গিরিবালার পুত্র অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা বিপিন-কালীদেবী তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য গলবস্ত্র হইয়া মায়ের নিকট নিবেদন জানাইলেন। গৃহ নিকটে নহে, গাড়িতে করিয়া তাঁহারা তথায় গেলেন। বৃদ্ধা গিরিবালা গৃহদ্বারে প্রতীক্ষায় ছিলেন, সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। পূর্বে ঠাকুর এই গৃহে পদার্পণ করিয়া যে-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, ভক্তগণ তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।... সন্ধ্যাকালে বিদায়ের পালা। পরিবারের সকলে একে একে মাতাঠাকুরানীর শ্রীপাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বৃদ্ধা গিরিবালার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া মা আবেগভরে বলিলেন—'আজ খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম।' "[৪]

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরবর্তী কালে এই বাড়ির মালিকানা বদল হয়েছে। ❑

পথনির্দেশ: গিরিবালাদেবীর বাড়ির ঠিকানা: ১১৪/১এ, হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫। দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত হরিশ পার্কের গেটের ঠিক উলটোদিকে যে সরু গলি রয়েছে, সেখান দিয়ে একটু এগোলেই এই বাড়ি পড়ে। অনিবার্য কারণে এই বাড়িটির আলোকচিত্র দেওয়া সম্ভব হলো না।

১ গৌরীমা—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ৯৬-৯৭
২ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ সং, পৃঃ ১০৭
৩ গৌরীমা, পৃঃ ৯৭-৯৮
৪ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ২০৩-২০৪

এই রচনাটি 'স্বামী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শব্দচেতনা ৩৬

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

১	২			৩					৪
						৫			
				৬					
৭		৮					৯		
						১০			
		১১			১২				১৩
১৪					১৫			১৬	
			১৭						
১৮									
				১৯					

পাশাপাশি: (১) গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন: "অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ——— তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন, তার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।" (৫) রাধুর এই গ্রামে বিবাহ হয় (৬) "ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, —— ভারতবাসী আমার ভাই।" (৭) ঠাকুরের এক দাদা (৯) মায়ের এক ভাইঝি (১০) ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ ———ভেলোর মাঠে (১১) 'ভগবান ভক্তির ———' (১৪) শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী ঋতানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম (১৫) জয়রামবাটীর দক্ষিণ-পশ্চিমে যে-গ্রাম (১৭) "দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, ——— ইহারাই তোমার দেবতা হউক।" (১৮) যাঁর সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন 'নৈকষ্য কুলীন' (১৯) ঈশ্বরকোটীর একজন।

ওপর-নিচ: (১) মায়ের পোষা চন্দনা পাখির নাম (৩) ঠাকুরের এক 'রসদ্দার' (৪) 'পাগলী মামী'র আসল নাম (৫) জয়রামবাটীর সন্নিকটেই '———পুকুর' (৭) বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যে-গোমস্তার ভাড়াবাড়িতে শ্রীমা কিছুদিন বাস করেন (৮) তীর্থভ্রমণ-কালে ঠাকুর বৃন্দাবনের এখানে এসেছিলেন (৯) স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের লেখা একটি গ্রন্থ (১২) সেকালে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে কামারপুকুর যেতে হতো (১৩) "হে ———, সাহস অবলম্বন কর।" (১৪) "——— ব্রহ্মবারি, ওতে কি শৌচ করতে আছে?" (১৬) নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর বলেছিলেন: "জানি প্রভু, তুমি সেই ——— ঋষি, নররূপী নারায়ণ।" (১৭) "——— ও কাঞ্চন এই দুটি ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্র ব ন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ ও উনিশ শতকের নবজাগরণ

প্রিয়ঙ্কর ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের নবজাগরণ বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এই নবজাগরণ আমাদের ভারতীয় সভ্যতার ধারার সঙ্গে কিছু সার্থক বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে—যা বাঙালি তথা ভারতবাসীর স্থায়ী সম্পদ। সনাতন ধর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে বাংলার নবজাগরণের প্রকৃতি আমরা বিচার করি ইউরোপীয় নবজাগরণের মাপকাঠিতে। অর্থাৎ আমাদের বারেবারে বিচার্য হয়েছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপে যে-নবজাগরণ হয়েছিল, তার সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগত কোন মিল আছে কিনা।

কাজেই ইউরোপীয় নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। এই নবজাগরণের দুটি ধারা লক্ষণীয়। প্রথমত সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও দ্বিতীয়ত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। এই দুটি ধারার মধ্যে অবশ্যই আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে বণিক শ্রেণি এবং তাদের সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই নতুন চেতনার বিকাশ দেখা যায়।

এ হেন নতুন চেতনার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্যই যুক্তিবাদ। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রকৃতির সব ঘটনাই কারণ-কার্য পরম্পরা অনুসরণ করে ঘটে। কোন ঘটনাই অলৌকিকভাবে অর্থাৎ কারণ-কার্য পরম্পরা অনুসরণ না করে ঘটে না। অতএব প্রকৃতির কোন ঘটনার কারণ জানতে হলে তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, সবক্ষেত্রেই ঐ ঘটনার পূর্বশর্ত হিসাবে কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা বিদ্যমান, তাহলে পরীক্ষণের সাহায্যে ঐ ঘটনার সঙ্গে পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট ঘটনাগুলির আন্তঃসম্পর্ক নিখুঁতভাবে জানতে হবে।

যুক্তিবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রকৃতি স্বয়ংসৃষ্ট, অর্থাৎ প্রকৃতিকে বাইরে থেকে কেউ নির্মাণ করেনি। প্রকৃতি নিজেই নিজেকে নির্মাণ করেছে। অতএব প্রকৃতির উপাদান বিশ্লেষণ করলেই আমরা প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্য জানতে পারব।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবাদ। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, এমনকি দেবদূতদের থেকেও সে শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা আমরা সেমেটিক ধর্মগুলিতে পাই। কিন্তু নবজাগরণের মানবতাবাদের ধারণা এর থেকে ভিন্ন। মানুষ পশু নয়—তার জীবন পশুর মতো আহার, নিদ্রা ও জৈবতৃষ্ণা-সর্বস্ব নয়। আবার মানুষ দেবতাও নয়—তার জীবন আহার, নিদ্রা ও জৈবতৃষ্ণার ঊর্ধ্বে নয়। তার মধ্যে একাধারে আছে জৈবতৃষ্ণা ও গভীর মননশীলতা। নবজাগরণের মানবতাবাদ মানুষের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই স্বীকার করে নেয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যায় জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কিভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সুখী মানবজীবন ও সুখী সমাজ গঠন করা যায়। নবজাগরণের সময়ে 'মুক্তি' সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। পুরনো খ্রিস্টীয় নীতিতে আমরা পাই, ইহলোকের দুঃখভোগ দ্বারা পারলৌকিক সুখভোগ সম্ভব। কিন্তু নবজাগরণের সময়ে উদ্ভূত চিন্তা এই কল্পিত পারলৌকিক স্বর্গসুখের জন্য ইহলোকের সুখ বিসর্জন দিতে রাজি হয়নি, বরং নবজাগরণের আকাঙ্ক্ষা হলো এমন একটি মুক্ত সমাজ নির্মাণ, যেখানে দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা থাকবে না। নবজাগরণ সুখভোগকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু সেই সুখভোগ বলতে কেবল স্থূল সুখভোগ বোঝায় না। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা এবং জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত মৌল প্রশ্নগুলির সমাধান করার যে বৌদ্ধিক আনন্দ, তাকেই সর্বোচ্চ সুখ হিসাবে মান্যতা দিয়েছে। নবজাগরণের চিন্তাধারা অনুযায়ী এমন একটি সমাজ হলো আদর্শ সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা থাকবে। যেখানে ধর্ম ও রাজশক্তি স্বাধীন জ্ঞানান্বেষণে বাধা দেবে না। তবে এই 'মুক্ত সমাজ' সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট পরিণতি পেয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

এবার আমরা দেখব ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান কিনা।

প্রথমত, যুক্তিবাদের কথায় আসা যাক। বাংলার নবজাগরণের পুরোধা হিসাবে পরিচিত রামমোহন আমাদের ঐতিহ্যের কিছু অংশ সংরক্ষণ এবং কিছু অংশ বর্জন করতে বলেছেন। এখন প্রশ্ন, গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি কী হবে? রামমোহন যুক্তিকে মাপকাঠি করতে চাইলেন। তাঁর মতে, উপনিষদের অভেদমূলক দর্শন যুক্তিবিরোধী নয়, অতএব গ্রহণীয়। আবার সতীদাহের ন্যায় কুপ্রথা যুক্তিবিরোধী, অতএব বর্জনীয়।

এরপর মানবতাবাদের কথায় আসা যাক। রামমোহন মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদের ভিত্তি ছিল উপনিষদের দর্শন। অর্থাৎ মানুষ তার অন্তর্নিহিত সমস্ত মানসিক বৈপরীত্য অতিক্রম করে স্বরূপত শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। তা অমর, অজড় ও অবিভাজ্য।

ব্যক্তিমানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত পরমাত্মার সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করা। সে অবশিষ্ট জীবজগৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, সে-ই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। রামমোহনের পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতারা, যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরাও এই মানবতাবাদের অনুসারী ছিলেন।

রামমোহন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকগুলির সমন্বয়ে এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। লক্ষণীয়, সমষ্টির জীবনে বেদান্তের ভূমিকা কি হবে এব্যাপারে রামমোহনই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বলেন। বেদান্তের একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়তে চেয়েছিলেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর জোর দেন একদল মানুষ তৈরির ওপর, যারা যুক্তিবাদকে আত্মস্থ করবে। বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের মতো অধ্যাত্মচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার সমন্বয়ে এক নতুন ভারত গড়ে তোলার কথা বলেন। তবে নতুন সমাজ গঠনের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কের বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নায়কদের অনেকেই সচেতন ছিলেন না।

অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে আত্মস্থ করেছিলেন? নবজাগরণে তাঁর মৌলিক অবদানই বা কী? দীর্ঘ আত্মিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' হয়েছেন। তাঁর এই যন্ত্রণার মূলে ছিল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন। তিনি এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান পেলেন পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শনে। কিন্তু পুনরায় নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন। যদি ঈশ্বর কিংবা আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষের বিষয় হবে না কেন? এখানে বিবেকানন্দ পরোক্ষভাবে আরেকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। রামমোহন যুক্তিবাদ ও ঔপনিষদিক চিন্তার সমন্বয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর—এদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-লব্ধ কোন প্রমাণ আছে কি? এগুলি বিশ্বাসের বিষয়—এইভাবে উপরি উক্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া উচিত? এক শালিক দেখা অমঙ্গলজনক—এই বিশ্বাস প্রমাণকে এড়িয়ে গেছে, আবার ঈশ্বরবিশ্বাসও প্রমাণকে এড়িয়ে যায়। তবে উভয়প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্পষ্ট উত্তর পেলেন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ তো ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হতে পারে। তা বিচার করার উপায় কী? ঈশ্বরদ্রষ্টা যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অপর কেউ যদি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে একইরকম প্রত্যক্ষ করেন, তবে বুঝতে হবে সেই প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ নয়। অধ্যাত্মসাধনার শেষ সোপান নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি। উপনিষদের ঋষিগণ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত যাঁরাই সাধনার শেষ সোপানে আরোহণ করেছেন, তাঁদের সবারই একই উপলব্ধি হয়েছে। প্রশ্ন ছিল, অধ্যাত্মবোধ ও বিজ্ঞানচেতনা—এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সম্ভব? বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, অধ্যাত্মচেতনা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ। এক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের বিষয় হলো স্বীয় মন।

এব্যাপারে ধারণা আরো স্পষ্টতর করার জন্য স্বামীজী বললেনঃ "ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বে যেসকল বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে 'যুক্তি' বলে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন?

"আমরা পুনঃ পুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি; আমরা স্বীকার করিয়া লই, বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই ঐগুলি লব্ধ হয়। আবার সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ্ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদরাও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক—বিশেষত বর্তমান কালে—ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্মলাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে; আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বল না কেন, তাহা দ্বারা ধর্মলাভ হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয়দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কিনা—এই

প্রশ্ন এখনো মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের (Realism and Idealism) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি—জগৎও রহিয়াছে এবং চলিতেছে। আমরা কেবল একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য ধর্মের যেকোন মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই অযৌক্তিক দাবি স্বীকার করা অসম্ভব, ইহা মানুষের মন অবনত করে। যে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকে অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হইবে। জগতের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্যলাভ করিব। সত্যলাভ করিলে তখনি আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল ভিত্তি এইখানে।"[১]

মানবতাবাদের ব্যাপারে স্বামীজীর অভিমত কী? ইউরোপীয় মানবতাবাদের মতো বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেননি। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ অনুযায়ী মানুষের মননশীলতা এবং জৈবতৃষ্ণার অধীনতা—দুই-ই সমভাবে গ্রাহ্য। বিবেকানন্দ প্রবৃত্তির অধীনতাকে অনিবার্য বলে স্বীকার করলেন না। তিনি অনুশীলনের দ্বারা প্রবৃত্তিকে জয় করার ওপর জোর দিলেন। "অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনা এই কয়টি কথায় সংক্ষেপে বলা যায় ঃ এই দর্শন ইন্দ্রিয়ভোগের সহায়ক নয়। আমরা সানন্দে ইহা স্বীকার করি।"[২] তবে জৈবতৃষ্ণাকে রিপু হিসাবে চিহ্নিত করলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করলেন না।

আমাদের অনুভূতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে—এব্যাপারে বিবেকানন্দের কোন দ্বিমত ছিল না। " 'সংসার ত্যাগ কর'—সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে—এসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।"[৩] কিন্তু বাহিরে ত্যাগ, অথচ অন্তরে বিষয়বাসনার সহাবস্থান—কপটতামাত্র। এই কপট ত্যাগ ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবাসী ভোগ করতে শিখুক। তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারবে ভোগে তৃপ্তি আসে না। তখনি সার্থক ত্যাগ সম্ভব হবে।

এবারে আমরা জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেকানন্দের বিশিষ্ট ধারণার কথা উল্লেখ করব। তাঁর সমসাময়িক কালে অর্জিত জ্ঞানের সত্যাসত্যের মানদণ্ড কী এবং সেই জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ দ্বারা সুখী ব্যক্তিজীবন ও সমাজ গঠন করা যাবে কিনা—একথা বুদ্ধিজীবীরা জানতেন না। কারণ, অর্জিত জ্ঞান সত্য কিনা আর অর্জিত জ্ঞানের উপযোগিতা আছে কিনা—এদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করি, অর্জিত জ্ঞান সেই প্রমাণের মানদণ্ডে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই অর্জিত জ্ঞানকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায়। স্বামীজীর মতে, সত্য কখনো সমাজের সঙ্গে আপস করে না। সমাজকেই সত্যের উপযোগী করে গঠিত হতে হবে। "সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনো সমাজের সহিত আপস করিবে না।"[৪] বিবেকানন্দ বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন। অদ্বৈতবোধ ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অদ্বৈতবোধ অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে—মুক্তি সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই ধারণা। কিন্তু এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হলো দৃঢ় শরীর ও দৃঢ় মনের সমবায়। এই কারণেই আত্মিক মুক্তির শর্ত হিসাবে তিনি দারিদ্র্য থেকে সমাজকে মুক্ত করার কথা বলেছেন। সেই সমাজই আদর্শ সমাজ, যে-সমাজে নরনারীগণ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত। "যদি সকল মানুষ আজ এই মহান সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সারা পৃথিবী আরেক রূপ ধারণ করিবে; অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি অপর সকলকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে; উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকলপ্রকার অশান্তি, সকলপ্রকার ঘৃণা, সকলপ্রকার ঈর্ষা ও সকলপ্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে।"[৫] কিন্তু সেই আদর্শ সমাজে পৌঁছানোর প্রাথমিক শর্ত হলো দারিদ্র্যমুক্ত সমাজগঠন। সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য বিবেকানন্দ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বৈষয়িক শিক্ষা প্রসারের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন, নবজাগরণের চিন্তারাজিকে আত্মস্থ করেও বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব কোথায়? প্রথমত, রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকেই অধ্যাত্মবোধ ও বিজ্ঞানচেতনার সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দই

এদুটির মধ্যে সঙ্গতি কোথায়—তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের পূর্বসূরিগণ সন্ন্যাসের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরমধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মা-বলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না।"[৬] বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বললেন, ত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মানুভব সম্ভব নয়। ধর্মপ্রচারকদের গার্হস্থ্যাশ্রমে আসক্ত হলে চলবে না। তাদের লোকশিক্ষার্থে গার্হস্থ্যাশ্রম বর্জন করতে হবে। আবার অপরদিকে সাধারণ মানুষকে সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বলেছেন, কারণ তার দ্বারাই সংসারের প্রতি মোহভঙ্গ সম্ভব। ত্যাগ সকলের জন্য নয়।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা তাঁর চিন্তার অভিনবত্বের পরিচয় পাই। বর্তমান সমাজের 'চাহিদা অনুযায়ী বেদান্তের প্রয়োগ'—এধারণাকে তিনি অপ্রতুল মনে করেছেন। এমনকি নানাপ্রকার হিতকর সামাজিক কাজকেও তিনি প্রায়োগিক ধর্ম বলতে চাননি। কারণ, ধর্মকে প্রয়োগ করার ইচ্ছাই প্রমাণ করে সেই ব্যক্তি একেবারে প্রাথমিক স্তরে (প্রবর্তক) রয়েছে। যে ঠিক ঠিক ধার্মিক, সে ধর্মের পিছনে চলে না, ধর্মই তার পিছনে চলে। তার জীবনই ধর্ম। সেই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মকে চোখ বুঝেও যেমন, চোখ খুলেও তেমনি উপলব্ধি—এই ছিল স্বামীজীর কাছে প্রায়োগিক ধর্মের অর্থ। কিন্তু দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাযুক্ত সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার যোগ্য নয়। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য চাই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা-মুক্ত সমাজগঠন। অর্থাৎ সমাজের উপযোগিতা অনুযায়ী বেদান্তের প্রয়োগ নয়, ঔপনিষদিক সত্যকে বরণ করে নিতে হবে, এই লক্ষ্যপথে অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই উপযুক্ত একটি সমাজ গঠন করতে হবে।

এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ নিজের বোধকে জাগ্রত রেখে নবজাগরণের ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করেছেন, আবার নবজাগরণজাত চিন্তারাজির অপূর্ণতাকেও চিহ্নিত করেছেন। এককথায় আমরা বলতে পারি, বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যকে যতটা গ্রহণ করা সম্ভব, ততটাই তিনি গ্রহণ করেছেন। ❑

তথ্যসূত্র

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ১৪২-১৪৩
২ ঐ, পৃঃ ৩৬১ ৩ ঐ, পৃঃ ১২৭ ৪ ঐ, পৃঃ ২৭
৫ ঐ, পৃঃ ৪৭ ৬ 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ

স্মৃ | তি | ক | থা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ



স্বামী সর্বগতানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী। বর্তমানে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ। অন্ধ্রপ্রদেশের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দজী যখন মুম্বাই যান, তখন তিনি বাইশ বছরের যুবক—সেখানকারই একটি ব্যাঙ্কে কর্মরত। অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে দীক্ষাপ্রার্থনা করেন ও সাধু হতে চান। অখণ্ডানন্দজী তাঁকে দীক্ষা দেন কিন্তু বলেন, সাধু হতে গেলে তাঁকে পদব্রজে কনখল গিয়ে সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগ দিতে হবে। (স্বামী অন্নদানন্দ-লিখিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' জীবনীগ্রন্থের ২১ অধ্যায়ে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, তবে সেখানে স্বামী সর্বগতানন্দকে ভুল করে 'একটি মারাঠি যুবক' বলা হয়েছে।) স্বামী সর্বগতানন্দ (পূর্বাশ্রমের নাম নারায়ণ) সেইমতো ১৯৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর মুম্বাই থেকে যাত্রা করেন ও খালি পায়ে হাজার মাইলের মতো পথ হেঁটে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কনখল পৌঁছান। সেখানে তিনি সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজীর আদেশে ১৯০১ সালে কনখলে গিয়ে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্বামী কল্যাণানন্দ সেইখানেই থেকে যান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। এখানে স্বামী কল্যাণানন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বামী সর্বগতানন্দের সাধুজীবনের শুরু। বর্তমান স্মৃতিকথায় সর্বগতানন্দজী ত্যাগ ও সেবার জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বামী কল্যাণানন্দের পূত জীবনের শেষ কয়েকটি বছরের ও সেবাশ্রমের তৎকালীন পরিবেশ ও ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়।—সম্পাদক

ত্যাগ ও সেবার আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। একদিন তিনি কল্যাণ মহারাজ (স্বামী কল্যাণানন্দ)-কে পাঁচটি টাকা দিয়ে হাওড়া থেকে কিছু বরফ নিয়ে আসতে বলেন। কল্যাণ মহারাজ এক বিশাল বরফের চাঙড় কিনে সমস্ত পথ মাথায় করে বয়ে আনেন। তাই দেখে বিস্মিত স্বামীজী বলে ওঠেন ঃ "এ কিরে! তুই এত বরফ এনেছিস!" "আপনি আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন, তাই আমি পাঁচ টাকার বরফ এনেছি।" একথা শুনে স্বামীজী বলেন ঃ "আমি তো তোকে পুরো পাঁচ টাকারই বরফ আনতে বলিনি।" তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান শিষ্যের মাথা তখন ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে স্বামীজীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঃ "কল্যাণ, একদিন তুই পরমহংস হবি।" কালক্রমে কল্যাণ মহারাজ সত্যই তাই হয়েছিলেন—প্রশান্ত, ধীর, অবিচলিত, সুদৃঢ় শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি।

আমি কনখল সেবাশ্রমে পৌঁছালাম

সেটা ছিল ১৯৩৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। হরিদ্বারে পৌঁছে আমি বাজারের মধ্যে কয়েকজন লোককে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় কেন্দ্রটি কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু আমি কী জানতে চাইছি তা কেউই বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। খুঁজতে খুঁজতে শেষে চোখে পড়ল গঙ্গার ক্যানালের ধারে বেশ সুন্দর একটি বাড়ি, গায়ে সাইনবোর্ড লাগানো—'মাদ্রাজী ধর্মশালা'। ভিতরে ঢুকে একজন সাধুকে দেখে তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র সম্বন্ধে খোঁজ করলাম। তিনি বললেন ঃ "তুমি কি বাঙালি হাসপাতালের কথা বলছ?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, তাই হবে মনে হয়।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি জন্য সেখানে যেতে চাইছি? রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব শুনে আমি কোথা থেকে আসছি তা জানতে চাইলেন। আমার উত্তর শুনে সাধুজী আমাকে এবিষয়ে নিরুৎসাহ করতে লাগলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি তাঁরই আশ্রমে যোগ দিই। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি তাঁকে শুধু বললাম ঃ "না, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প।" তখন তিনি আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার পথ বলে দিলেন ঃ "পুল পেরিয়ে সোজা কনখল রোড ধরে চলে যাও।"

তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলতে চলতে আমি একজায়গায় এসে পৌঁছালাম। সেখানে একটা পায়ে-চলা পথ মূল রাস্তা থেকে ডানদিকে বেরিয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটি বিশাল ঘেরা এলাকা দেখতে পেলাম। তার পাঁচটি বড় বড় ফটক। প্রত্যেকটির কাছে গিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবকটিই বন্ধ। দেখে মনে হলো না সেগুলি কেউ কখনো ব্যবহার করে। তবে একটি ফটকের পাশে একটি বাঁশের দরজা ছিল, বোধ হলো তার মধ্য দিয়ে লোক যাতায়াত করে। সেই পথে প্রবেশ করে আমি হাসপাতালের সীমানার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে কোন লোকজন ছিল না, আরো এগিয়ে একটি বেড়ার ধারে এসে পৌঁছালাম। ওপারে যাওয়ার কোন দরজা না থাকায় ডিঙিয়েই সেটি পার হতে

হলো। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই দেখতে পেলাম আবার একটি বেড়া। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখে পড়ল কিছুদূরে একটি বড়সড় ঘাসের চত্বর, আর তার লাগোয়া চমৎকার একটি বাড়ি। হাফহাতা জামা পরা একজন সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল বিশালকায় একটি কুকুর। কুকুরটি আমার দিকেই তাকিয়েছিল, তাকে দেখে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। তা সত্ত্বেও বেড়া পেরিয়ে আস্তে আস্তে আমি মহারাজের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি একদৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমিই নারায়ণ?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ মহারাজ।" তিনি বললেন ঃ "বেশ বেশ। কদিন আগে আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে তুমি যে আসছ তা তিনি লিখেছেন।" ইনিই স্বামী কল্যাণানন্দজী। দেখে মনে হলো আমার আসায় তিনি বেশ খুশি হয়েছেন। মহারাজ আমার সঙ্গে কথা বলছেন দেখে কুকুরটি বোধহয় ভাবল, আমরা পরস্পরের পরিচিত। সে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কাছে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

"স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ"

আর বেশি কথা না বলে শুধু বললাম ঃ "আমি আজই এখানে এসে পৌঁছেছি।" স্বামী কল্যাণানন্দজী তখনি বাসুদেব নামে একজন ব্রহ্মচারীকে ডাকলেন। তাকে বাঙলায় বললেন, তিনি নিজে যেখানে থাকেন সেই বাড়িতেই আমার থাকার জায়গা করে দিতে। তাছাড়া আমার স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে এবং আমাকে কিছু কাপড়চোপড় দিতেও বললেন। ব্রহ্মচারীটির স্বভাব ছিল বেশ মধুর ও স্নেহপ্রবণ। অল্পক্ষণের মধ্যে আরেকজন ব্রহ্মচারীও এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। দুজনেই আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের মতো ব্যবহার করতে লাগল। তারা আমাকে স্নান করে নিতে বলে পরার জন্য কাচা জামাকাপড় দিল। ঠিক আপনার লোকের মতো ব্যবহার—দেখে তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! এমনকি তারা আমার শোওয়ার বিছানাও পেতে দিল। সন্ধ্যা হতেই আমার বেশ ভালরকম আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার দুদিন আগেই ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের তিথিপূজা, কাজেই প্রচুর মিষ্টি মজুত ছিল। ব্রহ্মচারী দুজন পাশে বসে আমাকে যত্ন করে খাওয়াল।

অতঃপর আমি কল্যাণানন্দজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ "তোমাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।" তারপর তিনি আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। (আমার পা নিয়ে তখন কিছু সমস্যা হয়েছিল, এছাড়া ছোটখাট অন্য অসুখও কিছু ছিল। এইসবের জন্য পরদিনই আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়।) মহারাজ সস্নেহে আমার পূর্বজীবনের কথা—কীভাবে আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম সেকথা—জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি অখণ্ডানন্দজীর পূর্বোল্লিখিত চিঠিটি আমাকে পড়ে শোনালেন। তাতে লেখা ছিল ঃ "ছেলে পাঠাচ্ছি, যত্ন করে দেখবে।" শুধু এই কথাকটি, আর কিছু নয়; এমনকি আমি যে সাধু হতে চাই, চিঠিতে সেসম্বন্ধেও কোন আভাস ছিল না। পরবর্তী কালে কল্যাণানন্দজী আমাকে বলেছিলেন ঃ "আমার সারাজীবনে কেউ কখনো যত্ন করে রাখতে বলে কাউকে আমার কাছে পাঠায়নি। আর এটা তো স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ।"

স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎলাভ

এর কয়েকমাস আগে আমি প্রথম স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কী হতে চাই? তাঁকে বলি, আমি স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রন্থাবলী পড়েছি এবং তা আমার মনে দারুণ ছাপ ফেলেছে। আরো বলি, আমি অরবিন্দ ঘোষ ও রমণ মহর্ষির কথাও কিছু কিছু জানি এবং ইতোমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর আশ্রমে সমাজসেবামূলক কিছু কাজও করেছি। এঁরা সকলেই মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, স্বামীজীর আদর্শের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আছে। তা হলো, শুধু আধ্যাত্মিক জীবনযাপন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও সাহায্য করা, অন্যেরও সেবা করা। স্বামীজীর এই ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে পূজার ভাবে অন্যকে সেবা করার ব্যাপারটা জুড়ে দেওয়া আমার খুব মনে ধরেছে। আমি অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে এইসব কথা বলে শেষে যোগ করলাম ঃ "আমি এমন কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে চাই, যেখানে এই আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পাব।" তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাকে ঠিক এইরকমই এক চমৎকার জায়গায় পাঠাব; সেখানে তুমি উপযুক্ত লোকও পাবে, পরিবেশও পাবে।" এরপর তিনি কল্যাণানন্দজী মহারাজকে যে আমার যাওয়ার বিষয়ে লিখবেন, সেকথা বললেন। এই হলো অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আমাকে কনখলে পাঠানোর, স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজীর কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর পূর্ব-ইতিহাস। বস্তুত, আমার হৃদয় যে-আদর্শের অনুসরণ করতে চাইছিল, স্বামী কল্যাণানন্দজী ছিলেন তারই মূর্তিমান বিগ্রহ।

স্বর্গলোকে হিসাব রাখা!

কনখলে এসে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর কল্যাণ মহারাজকে বললাম, আমি সেবাশ্রমের কাজে সাহায্য করতে চাই। তিনি কিন্তু বলতে লাগলেন ঃ "করা তো সোজা, জানাই শক্ত।" কী জানা—আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম। যাই হোক, আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম ঃ "এঁদের তো কাজের লোকের অভাব, আর সেবাশ্রমে এত কাজ। আমি এঁদের কোন না কোন কাজে সাহায্য করতে চাই। বিশেষ করে, আমি

তো এখানে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতে আসিনি।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এখানে আসার আগে তুই কী কাজ করছিলি?" আমি বললাম, আমি অল্পস্বল্প ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজ ও হিসাব রাখার কাজ করছিলাম। তিনি খুশি হয়ে বললেন ঃ "আরে! ঐ কাজের জন্যই তো আমার লোকের দরকার। কয়েকমাস আগে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ দেহ রাখার পর থেকে হিসাবপত্রের ব্যাপারে কিছুই দেখা হয়নি। তুই ঐ দিকটা দেখ দিকি।" তারপর তিনি একটা হাসির কথা বললেন ঃ "ধর একজন চুনসুরকির কারবারি স্বর্গে গেল। সেখানে গিয়ে সে কী করবে? সেই চুনসুরকিই বেচবে। তুই এখন স্বর্গলোকে এসেছিস। কিন্তু তাতে কি? তুই যা করছিলি তাই করবি।" মহারাজ আমাকে এই কাজে নিশ্চয়ানন্দজীর অনুসৃত পদ্ধতি মেনে চলতে বললেন। প্রসঙ্গত, নিশ্চয়ানন্দজী ছিলেন স্বামীজীর আরেকজন অনুগত শিষ্য। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কনখল সেবাশ্রমের সেবা করে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে দেহত্যাগ করেন।

কল্যাণ মহারাজ যেকথা বলেছিলেন তা সত্যি—নিশ্চয়ানন্দজীর দেহত্যাগের পর থেকে সেবাশ্রমের হিসাবপত্রের দিকে একবারেই নজর দেওয়া হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও হিসাবের খাতা 'আপ-টু-ডেট' করতে আমার দিন দুয়েকের বেশি লাগল না। তারপর মহারাজকে জানালাম, কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বললেন ঃ "এত চটপট করে ফেললি?" অতঃপর তিনি বেলুড় মঠে পাঠানোর জন্য একটি বিবৃতি তৈরি করতে বললেন। এক্ষেত্রে তিনি যে-পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তা ছিল বেশ মজার। ক্যালেণ্ডার থেকে আগের মাসের পাতাটি ছিঁড়ে নিয়ে তার উলটোপিঠে তিনি হিসাবের বিবৃতি লিখে ফেলতেন। তারপর বেলুড় মঠের নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী চূড়ান্ত অঙ্কগুলির একটি অনুলিপি তৈরি করে তা বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ক্যালেণ্ডারের পাতাটি 'অফিস কপি'র কাজ করত। কল্যাণ মহারাজ এভাবে অল্প জিনিসে অনেক কাজ সারতেন।

আমার ওপর মহারাজের অবিচল আস্থা

একদিন আমার চোখে পড়ল, ডাকবিভাগ আমাদের ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট থেকে ট্যাক্স কেটে নিচ্ছে। আমার বুদ্ধিতে মনে হলো জিনিসটা ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ আমাদের সঙ্ঘ একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। মহারাজকে সেকথা বললাম। কিন্তু তিনি "ওরা তোর আমার চেয়ে এসব ব্যাপার অনেক ভাল জানে"—এই বলে আমার বক্তব্য উড়িয়ে দিলেন। আমি একথার প্রতিবাদ করলাম, তবে তিনি তা কানে তুললেন না। আমি কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে পারলাম না, পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা উত্থাপন করলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন, আমাদের যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান—এই মর্মে ঘোষণা করে তাঁর কাছে একটি চিঠি পেশ করতে। এর কিছুদিন পর ডাকবিভাগ মহারাজকে জানাল, বেশ মোটা অঙ্কের একটি টাকা—কয়েক হাজার টাকার মতো—আমাদের অ্যাকাউণ্টে ফেরত জমা করে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ আমার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে আমি তাঁকে পোস্টমাস্টারের দেওয়া পরামর্শের কথা বললাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ "তার মানে তুই বলছিস যে, ওরা আমাদের এত টাকা এতদিন ধরে অযথা কেটে নিয়েছিল?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ মহারাজ।" সেদিন থেকে আমার ওপর মহারাজের অবিচল আস্থা জন্মে গেল।

এর কিছুদিন আগে আমি মহারাজের কাছে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে হিসাব রাখার জন্য 'জার্ণাল', 'লেজার' ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কয়েকটা জিনিস চেয়েছিলাম। সেদিন আমাকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছিলেন ঃ "ওসব আবার কি? আমি এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ওসব ছাড়াই কাজ চালিয়েছি। আর তুই আজ এসে বলছিস, ওসব না হলে চলবে না।" আমি তৎসত্ত্বেও জোর দিয়ে বলেছিলাম ঃ "ওগুলি আমাদের হিসাবপত্র নির্ভুল রাখতে খুব সাহায্য করবে মহারাজ।" এখন ডাকবিভাগ অত টাকা ফেরত দেওয়ায় তিনি বললেন ঃ "তোর যা যা দরকার কিনে নে।" আমার ওপর পূর্ণ আস্থা জন্মে যাওয়ায় এসব ব্যাপারে তাঁর আর কোন চিন্তা রইল না।

শিক্ষার শুরু

হিসাবপত্র রাখা ছাড়া আমাকে ছায়ার মতো সদাসর্বদা কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে ঘুরতে হতো। তিনি যেখানে যেতেন, যাকিছু করতেন—আমি ছিলাম সবকিছুরই সাক্ষী। এর অতিরিক্ত আর কিছু আমাকে করতে হতো না, আমার কাজ ছিল শুধু তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকা। কয়েক সপ্তাহ এভাবে কাটবার পর আবার তাঁকে বললাম, আমি হাসপাতালে কাজ করতে চাই। তিনি বললেন ঃ "বেশ, তাহলে তুই ওদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, ওরা তোর কাছে কী ধরনের কাজ চায়।" হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি সাফ করার কাজ আমাকে দেওয়া হলো। আমি একজন জমাদারনীর কাছ থেকে কিভাবে ঘাসের বুরুশ দিয়ে পিকদানি আর বেডপ্যান পরিষ্কার করতে হয় তা শিখে নিলাম। তবে মহারাজ যখনি চাইতেন, আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হতো। তিনি যখন রোগীদের খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে টহল দিতেন, আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হতো; আবার যখন বাগান পরিদর্শনে যেতেন, তখনো সঙ্গে থাকতে হতো। তিনি চাইতেন, আমি সেবাশ্রমের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকি—রোগী কারা, বাগানে কী হচ্ছে—সমস্ত কিছু। একদিন তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন ঃ "আজ বাগানে গিয়েছিলি তো? ঐ ছোট ম্যাগনোলিয়া গাছটায় কটা ফুল ফুটেছে দেখলি?" আমি উত্তর দিতে

পারলাম না। তিনি বললেন ঃ "ঐটা একটা বিশেষ গাছ তা মনে রাখবি। এসমস্ত ব্যাপারে চোখ রাখার চেষ্টা করবি।" আমি যাতে খুঁটিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে শিখি, তাই কল্যাণ মহারাজ ঐধরনের প্রশ্ন করতেন। আরেকদিন তিনি একটি বিশেষ রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন, আমি বলতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ "তুই হাসপাতালে ঘুরে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখিস না?" আমি তখনি ছুটে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলাম। এইভাবে মহারাজ এসে পৌঁছানোর আগেই ঘুরে সবকিছু দেখে রাখার অভ্যাস আমার হয়ে গেল। আমি প্রতিটি রোগীর, বিশেষ করে সঙ্কটাপন্ন রোগীদের অবস্থা ভাল করে জেনে নিতাম, যাতে মহারাজকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করতে পারি। মাঝে মাঝে মহারাজ তাঁর বহুমূত্র রোগের জন্য হাসপাতাল পরিদর্শনে আসতে পারতেন না। তখন তাঁর আদেশমতো আমি সব খুঁটিনাটি জেনে আসতাম। এইসব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব খবর আমি সংগ্রহ করে রাখতাম। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রশিক্ষণ দিতে এবং কিভাবে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয় তা দেখাতে লাগলেন।

মহারাজের প্রাত্যহিক কর্মসূচী

প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আমি মহারাজের ঘরে যেতাম। মহারাজ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ড, বাগান, গোশালা ও গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতেন এবং মন্দিরে যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। কোনদিন বা পাচককে কিছু বলতে পাকশালায় যেতে হতো। এরপর আমরা মহারাজের ঘরে ফিরে আসতাম। পুনর্বার হাসপাতালে যাওয়ার আগে এইসময় মহারাজ একটু কিছু খেয়ে নিতেন। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের অপেক্ষা না রেখে নিয়ম করে তিনি স্বয়ং প্রতিটি রোগীর কাছে যেতেন এবং তার অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন—সে কেমন বোধ করছে? কি পথ্য ও ওষুধ খাচ্ছে? গতরাতে ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা?—ইত্যাদি। হাসপাতালের ৩৫ থেকে ৪০ জন রোগীর প্রত্যেকের জন্য তিনি এইভাবে বেশ খানিকটা সময় দিতেন, তাদের পাশে বসে পরম সহানুভূতি ও স্নেহের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। যদি কিছু দরকার থাকত, আমাকে বলতেন অথবা ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। এই ছিল কল্যাণ মহারাজের প্রাত্যহিক কর্মসূচী।

"আনন্দে থাক, আর অপরকেও আনন্দে রাখ"

কল্যাণ মহারাজ ছিলেন খুব কম কথার মানুষ। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা মুখের কথা দিয়ে তত দিতেন না, দিতেন আপন জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। সেইজন্য আমরা তাঁর আচার-আচরণ ভাল করে লক্ষ্য করতাম। তিনি কাজকর্ম করতেন খুব নিখুঁতভাবে, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে; আর কিছু বলার থাকলে প্রসঙ্গের বাইরে না গিয়ে সোজাসুজি তা বলতেন। একদিন সকলে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ডিস্পেন্সারির দিকে যাচ্ছিল। মহারাজ লক্ষ্য করলেন, তাদের মধ্যে একজন বেশ বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কী ব্যাপার? তুই এরকম হয়ে রয়েছিস কেন? রাত্রে ভাল করে ঘুমিয়েছিলি তো? সকালে খেয়েছিস?" কিন্তু তাতেও ব্রহ্মচারীর বিমর্ষভাব কাটল না। মহারাজ তখন বললেন ঃ "দেখ, তোরা এখানে হাসপাতালে সেবার কাজ করিস। সেখানে রোগীরা আগের থেকেই পীড়িত হয়ে রয়েছে। তাদের মন চাঙ্গা করে তুলতে হবে। তোরা নিজেরাই যদি এমন গোমড়া হয়ে থাকিস, সে-কাজ করবি কি করে? গোমড়া মুখ নিয়ে রোগীদের কাছে যাস না। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তারপর প্রসন্ন হাসিখুশি মুখ নিয়ে ডিস্পেনসারিতে যা। তোদের রোগীদের উজ্জীবিত করতে হবে, সাহায্য করতে হবে, দু-চারটে সহানুভূতির কথা বলে তাদের মনে আনন্দ আনতে হবে। তোদের নিজেদেরই যদি এমন বিষণ্ণ রুগ্ন দেখায়, তাহলে তোরা তাদের উৎফুল্ল করে তুলবি কি করে?" কল্যাণ মহারাজ চাইতেন না কেউ মনমরা হয়ে হাসপাতালে যাক। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন ঃ "তোমরা এখানে আনন্দ পাওয়ার জন্য এসেছ। আনন্দে থাক, আর অপরকেও আনন্দে রাখ। এর চেয়ে জরুরি আর কিছুই নেই।" এই প্রসঙ্গে তিনি যিশুখ্রিস্টের উক্তি যোগ করে দিতেন ঃ "তোমরা যখন উপবাস করবে, তখন যেন বিমর্ষ হয়ে থেকো না।" আর বলতেন ঃ "তোমরা কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করতে পার, কিন্তু তার ফলে যেন তোমাদের মনমরা না দেখায়।"

"মন্দিরে ও হাসপাতালে একই ভাব নিয়ে থাকতে হবে"

অনেক সময় হাসপাতালে কাজে পাঠানোর আগে মহারাজ আমাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন ঃ "দেখ, আমাদের এখানে মন্দিরও আছে, হাসপাতালও আছে। আমরা মন্দিরে যাই ফল ও ফুল নিয়ে; সেখানে স্তোত্রপাঠ করি, মন্ত্র উচ্চারণ করি। আর হাসপাতালে যাই পথ্য ও ওষুধ নিয়ে, সেখানে গিয়ে দুটো মিষ্টিকথা বলি। দুটো পুরোপুরি একই জিনিস। আমরা মন্দিরে যা করি আর হাসপাতালে যা করি—দুইয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই। এই হলো স্বামীজীর আদর্শ। তাই তোরা এখানেই থাকিস আর ওখানেই থাকিস, একই শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে থাকবি। সবকিছু ঝকঝকে তকতকে করে রাখবি। রোগীদের ভালবাসা ও সহানুভূতি দেখাবি। তোদের সেবা তাদের বড় দরকার। যা, এইবার কাজে যা।"

মহারাজ আমাকে একবার বলেছিলেন ঃ "এই জায়গাটাকে 'হসপিটাল' (hospital) বলা হয়, 'রুগ্নাবাস'

বলা হয় না কেন জানিস? আমাদের 'হসপিটেবল্' (hospitable) অর্থাৎ অতিথিপরায়ণ হতে হবে—সেইজন্য। লোকে যখন আমাদের কাছে আসবে, তখন মূল যে-জিনিসটা তাদের দেব তা হলো 'হসপিটালিটি' (hospitality) অর্থাৎ আতিথ্য। একথাটা যেন কখনো ভুলে যাস না। আর রোগীদের 'পেশেন্ট' (patient) বলে কেন? তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের 'পেশেন্স' (patience) অর্থাৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে—সেইজন্য। রোগীদের 'পেশেন্ট' বলে, কারণ তারা আমাদের কিভাবে সহিষ্ণু হতে হয় তা শেখায়।"

তুচ্ছতম সেবারও সার্থকতা আছে

একদিন কয়েকজন লোক একটি গুরুতর অসুস্থ রোগীকে আশ্রমে নিয়ে এল। তখন দুপুরবেলা, হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। তারা রোগীটিকে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় শুইয়ে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে চলে গেল। আমি গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে দেখলাম, সে রাস্তায় শুয়ে আছে। আমি তখনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলাম, কিন্তু তিনি তাকে পরীক্ষা করে বললেন ঃ "একে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই—কিছুক্ষণের মধ্যেই এর মৃত্যু হবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন, আমি কিন্তু যেতে পারলাম না। এসব ব্যাপারে ডাক্তারের মতামতই চূড়ান্ত, কাজেই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেইখানে রোগীটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, আশ্রমগৃহের ভিতর থেকে কল্যাণ মহারাজ কী হয়েছে জানার জন্য ইশারা করে আমায় ডাকছেন। আমার কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে মহারাজ বললেন ঃ "না, রোগীটির জন্য বিছানা তৈরি করে ওকে ভিতরে নিয়ে এস। ও যদি মরেই যায়, তাহলেও যেন শান্তিতে মরে। এইভাবে আমরা তার কিছুটা সেবা অন্তত করতে পারব। কে কখন মারা যাবে তা আমাদের জানা নেই। আমাদের এটা সেবাশ্রম—রোগীদের সেবা করার স্থান। আমরা কাউকে দু-মিনিট না দু-মাস সেবা করতে পারছি—সেটা বড় কথা নয়। তাকে আমাদের সেবা করতে হবে—এইটাই একমাত্র বিবেচ্য। একজন মানুষ রাস্তায় পড়ে মারা যাবে?" আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে বাইরে গেলাম এবং দুটি ছেলের সাহায্যে রোগীটিকে ভিতরে নিয়ে এলাম। মহারাজ এসে তাকে দেখে কিছু ওষুধের বিধান দিলেন, আর আমাকে বললেন তাকে লেবুর রস মিশিয়ে গ্লুকোজের জল খাওয়াতে। চার ঘণ্টা পর রোগীটি মারা গেল। ইতোমধ্যে যে-দুজন লোক তাকে এনেছিল, তারা ফিরে এসেছে। তাদের দেখিয়ে মহারাজ বললেন ঃ "এইসব এরা আসে দূর দূর গ্রাম থেকে। এদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ঐ লোকটি যদি রাস্তার ধারেই মরত, কে তাকে দেখত? এদের জন্য আমরা যাকিছু করি, সবই সেবার কাজ। ঐ মৃতদেহটি গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। দেখিস, যেন এর অন্ত্যেষ্টির কাজ সব ঠিক ঠিক করা হয়।" এই কথা শুনে সেই লোকদুটি খুব আনন্দিত হলো। মৃত ব্যক্তিটির সৎকারের দায়িত্ব নিয়ে মহারাজ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জোর দিয়ে বোঝালেন—সেবা কতক্ষণ ধরে করা হচ্ছে, সেটা বড় কথা নয়; যা প্রয়োজন তা করতেই হবে। তুচ্ছতম সেবারও সার্থকতা আছে।

রোগীদের প্রতি মহারাজের দরদ

আরেকবার গুরুতর অসুস্থ একটি রোগীর প্রসঙ্গে মহারাজ বলেছিলেন ঃ "ধর, যদি তোর নিজের ভাই-ই এইরকম অসুস্থ হতো। সেক্ষেত্রে তার জন্য তুই কী না করতিস? তোদের ঐরকমভাবে ভাবতে হবে। আমাদের ওপর আন্তরিক বিশ্বাস আছে বলেই না এরা সব এখানে আসে। আমরা যদি এদের পরিত্যাগ করি, এদের আর অন্য কেউ নেই। বস্তুত, আমরা তো এখানে সেবা করার জন্যই আছি। সেকথা কখনো ভুলিস না। আমাদের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে লোকে এখানে আসে। এদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করতে হবে আপনার লোকের মতো। কখনো কোন রোগীকে প্রত্যাখ্যান করবি না।" আর ডাক্তারবাবুর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল ঃ "নারায়ণকে না বলে কখনো কোন রোগীকে ফেরাবেন না, আর তার অজান্তে কোন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেবেন না।" এবিষয়ে মহারাজের যুক্তি ছিল এইরকম—ডাক্তারবাবু হয়তো রোগীটিকে ছেড়ে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করতে পারেন, কিন্তু যতদিন না সে বাইরে কাজে যাওয়ার মতো বল শরীরে পাচ্ছে, ততদিন তাকে বসিয়ে পুষ্টিকর খাবার যোগানো তার বাড়ির লোকজনের পক্ষে কঠিন হতে পারে। বস্তুত, আমাদের হাসপাতালে যেসব রোগীরা আসত, তাদের বেশির ভাগই এত গরিব ছিল যে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হতো। তাই মহারাজ বিশেষ নজর রাখতেন, যাতে স্বাস্থ্য ও শক্তি পুরোপুরি ফিরে পাওয়ার পরই তাদের হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ "ওকে আরো দিন দুই রেখে দাও এবং ভাল করে খাওয়াও। শরীরে যথেষ্ট বল পেলে তারপর বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পার।" রোগীদের ছেড়ে দেওয়ার সময় তাদের রান্নাঘর থেকে ভালমতো খাওয়ার জিনিস দিয়ে দেওয়া হতো। আর ওষুধপত্র তো থাকতই—তার জন্য 'রামকৃষ্ণ মিশন' ছাপ মারা নানা আকারের শিশি-বোতল আমাদের মজুদ থাকত।

এইভাবে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সম্বন্ধে খবর রাখা আমার একটা করণীয় দাঁড়িয়ে গেল। কোন বিশেষ ওষুধ যদি আমাদের না থাকত, আমরা বাইরে থেকে তা যোগাড় করার চেষ্টা করতাম। কোন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য যদি আমাদের ডাক্তার উপযুক্ত না হতেন, আমরা

'মেডিকেল স্কুল' বা 'মিউনিসিপ্যাল হসপিটাল' থেকে বিশেষজ্ঞ কাউকে 'কল' দিতাম। ডাঃ বসু নামে একজন বেসরকারি চিকিৎসকের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রাখতাম; প্রয়োজনে তাঁর সাহায্যও পাওয়া যেত। এইভাবে কল্যাণ মহারাজ দেখতেন, যাতে সাধ্যমতো প্রতিটি রোগীর চিকিৎসা সেবাশ্রম থেকে যতদূর সম্ভব করা হয়। সকলে বলত, কল্যাণ মহারাজ তাদের কাছে ঈশ্বরের মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্থানীয় লোকেদের মুখে আমি প্রায়শই স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী মহারাজেরও প্রশংসা শুনতাম—কিভাবে পরম যত্ন ও ভালবাসার সঙ্গে তিনি আপনজনের মতো তাদের পরিচর্যা করতেন। যখনি নিশ্চয়ানন্দজী মহারাজের প্রশংসা আমার কানে যেত, আমি বিস্ময়াপন্ন হয়ে ভাবতাম, আমরা কি কখনো তাঁর ধারেকাছে পৌঁছাতে পারব?

আরেকটি জিনিস কল্যাণ মহারাজ আমাদের বলতেনঃ "তোরা এখানে সেবা করতে এসেছিস, সেবা নিতে নয়। দেখিস যেন এমন অসুস্থ হয়ে পড়িস না, যাতে অন্য কাউকে তোদের সেবা করতে হয়।" এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, আমাদের যখন শরীর খারাপ হতো বা আমরা অসুস্থবোধ করতাম, এমনকি ম্যালেরিয়া জ্বরেও আক্রান্ত হতাম, মহারাজের কানে কদাচিৎ সে-খবর পৌঁছাত। আমরা তাঁকে কিছু না বলে নিজেরাই এটা-ওটা ওষুধ খেয়ে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিতাম।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে মহারাজের রাত্রিকালীন টহল

আগেই উল্লেখ করেছি, কি করে অন্যের সেবা করতে হয় কল্যাণ মহারাজ তা আমাদের শুধু মুখে বলে শেখাতেন না, তাঁর নিজের জীবন ছিল আত্মোৎসর্গের মূর্ত আদর্শ বা 'মডেল'-স্বরূপ। গভীর রাত্রেও হাসপাতালের দিক থেকে কোন আওয়াজ শুনতে পেলে তিনি নিঃশব্দে উঠে পড়তেন। তারপর পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে সেইদিকে যেতেন। তাঁর কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে যেত। সিমেন্টের মেঝের ওপর কুকুরের পায়ের নখের খচখচ শব্দ হতো। আমার ঘর ছিল মহারাজের ঘরের পাশেই। সেই শব্দ শুনে আমিও সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠতাম ও মহারাজকে অনুসরণ করে হাসপাতালে যেতাম। তিনি বুঝতে পারতেন, আমি তাঁর পিছনে আসছি। কোন ওষুধের প্রয়োজন হলে আমি তা এনে দিতাম। রোগীদের নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তিনি তাদের নিরীক্ষণ করতেন। কেউ ঘুমোচ্ছে না দেখতে পেলে তার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। এইভাবে ওয়ার্ডগুলিতে টহল দেওয়া শেষ করে তিনি নিজের শয্যায় ফিরে যেতেন। প্রতি রাতে দু-তিনবার এরকম ঘটত—মহারাজ কাউকে এসম্বন্ধে কিছু বলতেন না। এইভাবে না ঘুমানোর ফলে তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্যই করতেন না। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও এবং বহুমূত্রের আক্রমণে তাঁর কর্মক্ষমতা যখন কমে গেল তখনো তিনি এই অভ্যাস চালিয়ে যেতেন।

মহারাজের প্রশান্তি ছিল সংক্রামক

কল্যাণ মহারাজ ছিলেন অটল মানসিক প্রশান্তির অধিকারী। কিছুতেই তিনি মনের স্থৈর্য হারাতেন না, কোনকিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। একবার টাইফয়েড-আক্রান্ত একটি রোগী বিকারের ঘোরে তাঁকে সজোরে আঘাত করে—এত জোরে আঘাত যে, তিনি মাটিতে পড়ে যান, তাঁর চশমা ভেঙে যায়। আমরা যারা আশপাশে ছিলাম, লোকটিকে আটকানোর জন্য ছুটে যাই। "ওর গায়ে হাত দিও না, ওকে শান্ত হয়ে বসতে দাও।"—এই বলে মহারাজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। তারপর রোগীটির পাশে বসে তার গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে বলেনঃ "তোমার কি এখন ভাল বোধ হচ্ছে?" তখনি তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। সেসময়ে আমরা সকলে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু মহারাজের প্রশান্তি ছিল দেখার মতো। বস্তুত, তাঁর প্রশান্তির প্রভাবে বিকারগ্রস্ত রোগীটিও ততক্ষণে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। খানিক পরে মহারাজ তাকে ধরে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যান।

"বাংলাকে ভুলে যা"

সেবা ও আত্মোৎসর্গ কাকে বলে তা কল্যাণ মহারাজকে দেখে আমরা শিখেছিলাম। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে তা নিজের জীবনে রূপায়িত করে তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন। কনখলে আসার পর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা তিনি একবারের জন্যও মনে স্থান দেননি। কনখলে থেকে গিয়ে সেবা করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেনঃ "বাংলাকে ভুলে যা।" কল্যাণ মহারাজ সদাসর্বদা ঐ কথাটি মনে রাখতেন। ব্রহ্মানন্দজী, শিবানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী পরপর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু এঁদের কেউই কল্যাণ মহারাজকে বেলুড় মঠে যেতে রাজি করাতে পারেননি। বেলুড় মঠে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সঙ্ঘের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁকে মঠে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাসত্ত্বেও তিনি যাননি। ১৯৩৭ সালে এই উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে যাওয়ার জন্য বলেন। আমি বলেছিলামঃ "আপনি না গেলে আমিও যাব না—এখানেই থাকব।" আমি মহারাজের কাছেই রয়ে গেলাম।

সেবার আদর্শ অনুসরণ করা অতীব কঠিন। স্বামী কল্যাণানন্দজী মহারাজ জানতেন, অবিচল নিষ্ঠা ব্যতীত একাজ করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। [ক্রমশ]

শা|স্ত্র|আ|লো|চ|না

বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্

(বিদ্যার দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হয়)

রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

"বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—কেন উপনিষদের (২।৪) এই উক্তিটির অর্থ বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ করা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিদ্যা কী? অমৃতই বা কী? প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আগে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। কারণ, যে-বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ করা যায়, এখানে সেই বিদ্যাকেই বোঝানো হয়েছে। অতএব অমৃত বলতে কি বোঝায়, আগে তা জানা দরকার।

অমৃত কি—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ব্রহ্মই অমৃত। মুণ্ডক উপনিষদেও (২।১।১০, ২।২।২) ব্রহ্মকেই 'অমৃত' বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর 'অমৃত' পদের অর্থ করেছেন—'অবিনাশী'। ব্রহ্ম যে অবিনাশী, সেকথা কঠ উপনিষদে (১।২।১৮) বলা হয়েছে (তুলনীয় গীতা, ২।২০)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২৪।১) বলা হয়েছে, যিনি ভূমা তিনিই ব্রহ্ম। এই ভূমা হলেন 'নিত্যব্রহ্ম' (দ্রঃ শাঙ্করভাষ্য, কেন উপনিষদ্, ২।১)। অতএব ব্রহ্মই অমৃত। 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্' অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে লাভ করে—একথাটির অর্থ দাঁড়ায়, বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করে। ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলতে মোক্ষ বোঝায়। অতএব বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মলাভ বা মোক্ষলাভ হয় বললে অমৃত কথাটির দ্বারা মোক্ষকে বোঝাবে। 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্'—এই স্থলে আচার্য শঙ্কর অমৃতপদে অমৃতত্ব বুঝেছেন এবং অমৃতত্ব পদের অর্থ করেছেন, স্বরূপাবস্থান অর্থাৎ মোক্ষ। জীবের স্বরূপ হলেন 'ব্রহ্ম'। অতএব স্বরূপে অবস্থান বলতে ব্রহ্মে অবস্থান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বোঝাবে এবং এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ। (তুলনীয় ছা. উ., ৮।৩।৪; ব্রহ্মসিদ্ধি, পৃঃ ১২১)

মোক্ষ এবং অবিদ্যানিবৃত্তি সমার্থক। আচার্য শঙ্কর মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্রের (১।১।৫) ব্যাখ্যায় বলেছেন, অবিদ্যার নিবৃত্তিই পরপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষ। সংসাররূপ বন্ধনের কারণ অবিদ্যা। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৫।১) বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে অবিদ্যাজনিত সংসাররূপ বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। বিদ্যার উদয় হওয়ার অর্থ অবিদ্যানিবৃত্তি এবং অবিদ্যানিবৃত্তি হওয়ার অর্থই মোক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রহ্মসিদ্ধিকার আচার্য মণ্ডন মিশ্র অপর সকলের ন্যায় বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার কথা স্বীকার করলেও অবিদ্যার দ্বারাও অবিদ্যা নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন। (দ্রঃ ব্র. সি., পৃঃ ১৩)

এখন প্রশ্ন হলো, অমৃতত্বের সাধনবিদ্যা কোন্ বিদ্যা? বিদ্যা কী ও কয়প্রকার—এবিষয়ে মনুসংহিতায় (৭।৪৩) বলা হয়েছে, বিদ্যা পাঁচপ্রকার। যথা, ত্রয়ী বা ঋগ্বেদাদি বেদত্রয়, দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং বার্তা। (কৃষিবাণিজ্য পশুপালনাদি বার্তা—কুল্লূকভট্ট, মনু-সংহিতা, ৭।৪৩) তবে সাধারণত চোদ্দপ্রকার বিদ্যার কথা শোনা যায়, যথা—চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্ম, মীমাংসা, তর্ক বা ন্যায় এবং পুরাণ। উপনিষদেও নানাপ্রকার বিদ্যার কথা শোনা যায়। আত্মবিদ্যা (শ্বে. উ., ১।১৬) বা ব্রহ্মবিদ্যা (মু. উ., ১।১।২, ১।২।১৩, ৩।২।১০), অগ্নিবিদ্যা (ক. উ., ১।১।১৩), মধুবিদ্যা (ছা. উ., ৩ অধ্যায়), শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ঐ, ৩।১৪), পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ঐ, ৫।৪), ত্রয়ীবিদ্যা (ঐ, ১।১।৯), দহরবিদ্যা (ঐ, ৮।১), দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা (ঐ, ৭।১।২)—ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যার কথা উপনিষদে আছে। মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৪) পরা ও অপরা ভেদে দুরকম বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। পরাবিদ্যা হলো সেই বিদ্যা, যার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে (মু. উ., ২।২।২) জানা যায় (ঐ, ১।১।৫)। আচার্য শঙ্কর পরাবিদ্যার অর্থ করেছেন পরমাত্মবিদ্যা (শা. ভা., মু. উ., ১।১।৪)। আর ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এগুলি অপরাবিদ্যা (মু. উ., ১।১।৫)। এসকল বিদ্যার মধ্যে একমাত্র আত্মবিদ্যার দ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ সম্ভব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৫।১৫) দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, অন্য কোনপ্রকার সহকারিকারণ ব্যতীত একমাত্র আত্মদর্শনই অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষের সাধন। মুণ্ডক উপনিষদে পরাবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায় বলায় আত্মবিদ্যাই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তির কারণ, তা বোঝা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৫) আবারও বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রাপ্তির প্রতি সেতু অর্থাৎ উপায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।১) বলা হয়েছে, বিদ্যা মুক্তির কারণ। এই উপনিষদেই (৬।১৫) আবার বলা হয়েছে, পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমপদপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষের অন্য কোন পথ নেই। এইভাবে উপনিষদ্গুলির বহুস্থলেই আত্মবিদ্যাকেই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের কারণ বলায় "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা বলতে আত্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝতে হয়, অন্য কোন বিদ্যা নয়।

লক্ষণীয় এই যে, "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—কেন উপনিষদের এই বাক্যটির অনুরূপ একটি বাক্য ঈশ উপনিষদে (১১) পাওয়া যায়। সেই বাক্যটি হলো—"বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"। কিন্তু এস্থলে বিদ্যা কথাটির অর্থ আত্মবিদ্যা নয়।

কারণ, ঈশ উপনিষদের যে-মন্ত্রে ঐ বাক্যটি পাওয়া যায়, সেই একাদশ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যা বলতে আত্মবিদ্যা বোঝালে তার সঙ্গে অবিদ্যার সমুচ্চয় হতে পারে না। এজন্য বিদ্যা বলতে এখানে দেবতাজ্ঞান বা উপাসনা বুঝতে হবে (দ্রঃ শা. ভা., ঈ. উ., ১১; তুলনীয় বৃ. উ., ১।৫।১৬)। প্রশ্ন হতে পারে, বিদ্যা শব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান হলে বিদ্যার দ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ কি করে লাভ করা যাবে? মোক্ষ আত্মবিদ্যার দ্বারা লাভ করা যায়। উত্তরে বলা যায়, ঈশ উপনিষদে (১১) যে 'অমৃত' কথাটি পাওয়া যায়, তা মোক্ষকে বোঝায় না, তার অর্থ দেবতাত্মভাব (দ্রঃ শা. ভা., ঈ. উ., ১১; তুলনীয় বৃ. উ., ১।৫।১৬)। এই অমৃতত্ব পারমার্থিক অমৃতত্ব নয়। এটি আপেক্ষিক অমৃতত্ব। কারণ, পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতিলাভরূপ মুক্তি দেবতাজ্ঞানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। পারমার্থিক অমৃতত্ব একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিদ্যার দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জ্ঞান থেকে যে-মুক্তির কথা বলা হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ কিন্তু সেই জ্ঞান বলতে উপাসনা বোঝেন। একথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞানমাত্র মুক্তির কারণ নয়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষাত্মক যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে আত্মজ্ঞান হয়, তা বস্তুত ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান। এই আত্মভ্রম প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ আত্মভ্রমকে বিনাশ করতে গেলে যে দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন, তাকেও প্রত্যক্ষাত্মকই হতে হবে। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করতে পারে না। প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞানই প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদে সক্ষম। কেবল শ্রবণের দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মদর্শন সিদ্ধ হতে পারে না। তার জন্য মনন ও নিদিধ্যাসনও আবশ্যক। এইজন্যই ভাগবতী শ্রুতি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে আত্মদর্শনের হেতু বলেছেন (বৃ. উ., ২।৪।৫)।

আত্মাই ব্রহ্ম (ঐ, ২।৫।১৯, ৪।৪।৫)। ব্রহ্মের অধিক আর কিছু জ্ঞাতব্য নেই (শ্বে. উ., ১।১২)। শাস্ত্রানুযায়ী এই ব্রহ্মজ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায়। বেদের দুটি কাণ্ড—পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। এদুটি কাণ্ডের বিষয় যথাক্রমে ধর্ম ও ব্রহ্ম। পুরুষার্থানুশাসনে বলা হয়েছে, ধর্ম ও ব্রহ্ম একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (৫।৬) বলা হয়েছে, আত্মতত্ত্ব উপনিষদসমূহে নিহিত আছে। আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা লভ্য। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, ব্রহ্ম শ্রুতি থেকে অবগম্য হলেও শ্রুতির পরিপোষক যুক্তিও আছে (তুলনীয় তৈ. উ., ২।৭)। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ বলে পরমাত্মা তাদের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন না (ক. উ., ২।১।১; তুলনীয় কে. উ., ১।৩; মু. উ., ৩।১।৮)। ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রুতি (কে. উ., ৪।৮) বলেছেন, তপঃ অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান বা স্থিরীকরণ, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, কর্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগহোম, চার বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ। যাতে কিছু প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকেই 'প্রতিষ্ঠা' বলে। তপঃ প্রভৃতিকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বলায় ব্রহ্মবিদ্যা যে এদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ এগুলি ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির কারণ, তা বোঝা যায়। শ্রুতিতে উল্লিখিত ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির এই কারণগুলি ব্যতীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানোৎপত্তির উপকারক বা সাধন বলা হয়েছে। এই সাধনগুলি অবলম্বন করলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মুণ্ডক উপনিষদেও (৩।১।৮) বলা হয়েছে, বুদ্ধি নির্মল হলে লোক ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য হয়। গুরু কাদের ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করবেন, সেবিষয়ে মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১৩) বলা হয়েছে—উপসন্ন অর্থাৎ সমীপে আগত, প্রশান্তচিত্ত এবং শমান্বিত অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় যে-শিষ্য, তাকেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করবেন। এই উপনিষদে (৩।২।১০) আরো বলা হয়েছে, যাঁরা যথাবিধি কর্মপরায়ণ, শ্রোত্রিয় বা বেদপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপরব্রহ্মের উপাসক এবং পরব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছুক, যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি দেন এবং যাঁরা শিরোব্রত অর্থাৎ মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত পালন করেন, তাঁদের নিকটই গুরু ব্রহ্মবিদ্যা বলবেন।

বলা যেতে পারে, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অমৃতলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয় বললে জ্ঞান মুক্তির কারণ হয়। সেক্ষেত্রে মুক্তি 'কার্য' হওয়ায় অনিত্য হয়ে পড়বে। কারণ, কার্যমাত্রেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ থাকায় অনিত্যতা স্বীকার করা হয়। আবার এইভাবে যদি মুক্তি অনিত্য হয়ে পড়ে, তাহলে মুক্তিকে আর পরমপুরুষার্থ বলা যাবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের মধ্যে নিত্যত্বহেতু মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয় (দ্রঃ, বেদান্ত পরিভাষা, পৃঃ ৪)। ইহজগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত ফল যেমন ক্ষীণ হয়, পরলোকেও সেইরকম পুণ্যের দ্বারা অর্জিত ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ছান্দোগ্য উপনিষদের (৮।১।৬) এরূপ বচন থেকে ধর্মের অনিত্যত্ব বোঝা যায়। আর প্রত্যক্ষ দ্বারা অর্থ ও কামের অনিত্যত্ব জ্ঞাত হয়ে থাকে। মোক্ষ কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত হওয়ায় নিত্য। বলা যেতে পারে, বিদ্যার উদয়ে যখন মোক্ষ হয়, তখন মোক্ষেরও তো উৎপত্তি আছে। এর উত্তরে বলা যায়, মোক্ষ উৎপাদ্য নয়, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম বলে নিত্যমুক্ত। অবিদ্যাবশত জীব নিজেকে সংসারে আবদ্ধ ও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। বিদ্যালাভে অবিদ্যানিবৃত্তি হলেই জীবের স্বরূপাবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয় মাত্র। অতএব বিদ্যার উদয়ে মোক্ষের উৎপত্তি হয়—একথা বলা যায় না। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে জীব তার স্বরূপে অবস্থান করে—একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৩।৪) বলা হয়েছে। শ্রুতিকে অনুসরণ করে অদ্বৈতবেদান্তী সুরেশ্বরাচার্য তাঁর ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে (পৃঃ ১২১, ১২৮) জীবের স্বরূপাবির্ভাবকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন।

মোক্ষ যে বিনাশরহিত, সেকথাও শ্রুতি প্রতিপাদন করেছেন। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৯) বলা হয়েছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন। ব্রহ্ম জন্ম-মৃত্যুহীন, তিনি নিত্য (ক. উ., ১।২।১৮)। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তজীবও যখন ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন তারও পুনর্জন্মের কোন প্রশ্ন ওঠে না। মুক্তজীবের মর্ত্যলোকে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষাবস্থার অবিনাশিত্বই বোঝায় (তুলনীয় কে. উ., ৪।৯)। এইভাবে মুক্তি উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত হওয়ায় তা নিত্য। আচার্য শঙ্কর মুণ্ডক উপনিষদের (৩।২।৯) ভাষ্যে মোক্ষকে নিত্য বলেই বর্ণনা করেছেন। মুক্তি নিত্য বলেই ধর্ম, অর্থ, কামরূপ অন্য তিন অনিত্য পুরুষার্থ থেকে তাকে পৃথগ্‌রূপে চিহ্নিত করতে পরমপুরুষার্থ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পুনরায় বলা যেতে পারে, শ্রুতি কোথাও বলেছেন, বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ হয় (কে. উ., ২।৪); কোথাও বলেছেন, আত্মদর্শন অমৃতত্বের সাধন (বৃ. উ., ৪।৫।১৫); কোথাও বা বলেছেন, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা অমর হন (শ্বে. উ., ৪।১৭)। আবার অন্যত্র (ঐ, ৫।১) বলেছেন, বিদ্যা অমরত্বের কারণ। এইভাবে বারংবার বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্বলাভের কথা বলে শ্রুতি অমরত্ব অর্থাৎ মোক্ষ ও বিদ্যার মধ্যে কার্যকারণ-ভাবের উল্লেখ করেছেন। আচার্য শঙ্করও অবিদ্যানিবৃত্তি বা মোক্ষকে বিদ্যার কার্য বলে বর্ণনা করেছেন (শা. ভা., তৈ. উ., ২।৮।৫; শা. ভা., বৃ. উ., ১।৪।৭)। আচার্য মণ্ডন বলেছেন, নিরুপাধিক ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের নিমিত্ত বা কারণ (ব্র. সি., পৃঃ ১২৬)। বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থে আচার্য বিদ্যারণ্য আত্মদর্শনকে অমৃতত্বের সাধন বলেছেন। এইভাবে শ্রুতি ও প্রথিতযশা আচার্যগণ মুক্তিকে তো বিদ্যার কার্য বলেই বর্ণনা করেছেন। সেক্ষেত্রে ঘটপটাদি অপরাপর কার্যের ন্যায় মুক্তিও অনিত্যই হয়ে পড়ে। তাহলে মুক্তি নিত্য বলে তাকে পরমপুরুষার্থ আখ্যা দেওয়া হয় কি করে?

প্রত্যুত্তরে বলা যায়, 'মুক্তি বিদ্যার কার্য'—একথা শ্রুতি বা আচার্যগণ বললেও মুক্তির কার্যত্ব প্রতিপাদন করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। বিদ্যার উদয়ে মুক্তি হয় বলে তাঁরা মুক্তিকে বিদ্যার কার্য বলেছেন। বস্তুত, বিদ্যার উদয়ই মুক্তি। রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানে যখন রজ্জুসর্পের বোধ হয়, তখন সেখানে রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানের উদয়েই রজ্জুসর্পের বিনাশ। রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানের উদয় ও রজ্জুসর্পের বিনাশ যুগপৎ ঘটে। এদের মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য নেই। এমন নয় যে, রজ্জুতত্ত্বজ্ঞান আগে হলো, তার পরক্ষণে রজ্জুসর্পের বিনাশ হলো। যেক্ষণে রজ্জুতত্ত্বজ্ঞান হয়, সেইক্ষণেই রজ্জুসর্পের বিনাশ হয় বলে তাদের মধ্যে কোন পূর্বাপরভাব থাকে না। সেইরূপ বিদ্যার উদয় ও মুক্তিও যুগপৎ সঙ্ঘটিত হয়। বিদ্যার উদয় হওয়ার অর্থই মুক্তি হওয়া। বিদ্যা ও মুক্তির মধ্যে পৌর্বাপর্য না থাকায় এদের মধ্যে কার্যকারণভাব কল্পিত হতে পারে না। কারণ সর্বদা পূর্বক্ষণে থাকে, আর কার্য থাকে অব্যবহিত পরক্ষণে। এইভাবে কার্যকারণভাব যাদের মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যেই পৌর্বাপর্য থাকবে। বিদ্যা ও মুক্তির মধ্যে পৌর্বাপর্য না থাকায় মুক্তিকে বিদ্যার কার্য বলে অভিহিত করে তার অনিত্যত্ব কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। 'মুক্তি নিত্য'—একথা আগেই প্রতিপাদন করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, বিদ্যার দ্বারা যে অমৃতলাভের কথা বলা হয়েছে, সেই অমৃতলাভ কোথায় হবে? ইহলোকে না অন্য কোথাও? এপ্রশ্নের উত্তর শ্রুতিই দিয়েছেন। কঠ উপনিষদে (২।৩।১৪) বলা হয়েছে, আত্মদর্শী বিদ্বান পুরুষের বিদ্যালাভের পূর্বে হৃদয়ে যেসকল কামনা থাকে, তারা যখন বিদীর্ণ হয় তখন বিদ্যালাভের পূর্বে যিনি মর্ত্য অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মৃত্যুর (দ্রঃ শা. ভা., ক. উ., ২।৩।১৪; শা. ভা., বৃ. উ., ৪।৪।৭) অধীন ছিলেন, তিনি বিদ্যালাভের পরে ঐ মৃত্যুর বিনাশের ফলে (তুলনীয় শ্বে. উ., ৩।৮) অমৃত হন এবং এই দেহেই অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মলাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম হন (তুলনীয় ক. উ., ২।৩।১৫)। 'মুক্তপুরুষ মুক্ত হন'—এইরূপ উক্তির দ্বারাও কঠ উপনিষদে (২।২।১) জীবিতাবস্থাতেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কেন উপনিষদেও (২।৫) বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে অর্থাৎ এই জীবনেই যদি ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহলে সত্য অর্থাৎ পরমার্থ লাভ করা যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয়, জীবিতাবস্থাতেই অর্থাৎ ইহলোকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানবশত অমৃতলাভ বা মুক্তি হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১৭) বলা হয়েছে, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা অমর অর্থাৎ মুক্ত হন। ত্রিশঙ্কুমুনি আত্মজ্ঞান লাভ করার পর নিজেকে অমর বলেই বর্ণনা করেছেন (তৈ. উ., ১।১০)। এইজন্যই বিদ্যা বা জ্ঞানকে অমরত্ব বা মুক্তির কারণ বলা হয়েছে (শ্বে. উ., ৫।১)। বলা হয়েছে, তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, পরমপদপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তির অন্য কোন পথ নেই (ঐ, ৬।১৫)। যথার্থ জ্ঞানই যে অমৃতত্বের কারণ, সেকথা কেন উপনিষদেও বলা হয়েছে। ঐ উপনিষদের একস্থলে (২।৪) বলা হয়েছে, ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুর জ্ঞানে যখন ব্রহ্ম প্রতিভাত হন অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুকে ঘট, পট প্রভৃতি রূপে না জেনে যখন 'ব্রহ্ম জানছি' বলে মনে হবে, তখন সেটাই হবে যথার্থ দর্শন বা সম্যক্ জ্ঞান। এই জ্ঞানকে যথার্থ বা সম্যক্ বলা হয়, কারণ এইপ্রকার জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়।

বলা যেতে পারে, ত্রিশঙ্কুমুনি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করার পর নিজেকে অমর বলেছেন, তখন বোঝা যায় আত্মজ্ঞানবশত মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দেহপাত হয়নি। দেহই যদি রইল, তাহলে তিনি নিজেকে অমর অর্থাৎ মুক্ত বলছেন কি করে? আত্মজ্ঞান লাভ করে যদি মুক্তিলাভ করা যায়, তাহলে আত্মজ্ঞানলাভ করার পরপরই বিদ্বান পুরুষের দেহপাত হওয়া উচিত। জ্ঞানলাভের পরও যদি জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত থাকেন অর্থাৎ দেহধারণ করেন, তাহলে তাঁর আর মুক্তি হলো কোথায়?

এর উত্তরে বলা যায়, মুক্তি দুপ্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। বিদ্যালাভ করার পর বিদ্বান পুরুষের জীবদ্দশায় যে-মুক্তি, তা হলো জীবন্মুক্তি। আর বিদ্বান পুরুষের দেহপাতের পর যে-মুক্তি, তা হলো বিদেহমুক্তি। এই বিদেহমুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে তাঁর সেই জ্ঞানের দ্বারা তাঁর যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ যেসকল কর্ম তখনো ফল দেয়নি, তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর প্রারব্ধ কর্মসকল অর্থাৎ যেসকল কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করেছে, যার জন্য তিনি জন্মলাভ করেছেন, শরীরধারণ করেছেন—সেই প্রারব্ধ কর্মসকল জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫), তারা কেবল উপভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়ে থাকে (ঐ, ৪।১।১৯)। অতএব জ্ঞানলাভ করার পর জ্ঞানী পুরুষ যতদিন না উপভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করছেন, ততদিন তাঁকে দেহধারণ করতেই হবে অর্থাৎ জীবিত থাকতেই হবে। বিদ্বান পুরুষের জীবিত থাকাকালে জ্ঞানলাভ হেতু যে-মুক্তি, তা হলো জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্ত পুরুষের উপভোগবশত যখন প্রারব্ধকর্মের বিনাশ হয়, তখন তিনি ব্রহ্মসম্পন্ন হন অর্থাৎ তখন তাঁর দেহপাত হয় এবং তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন (ঐ)। কেন উপনিষদেও (১।২) বলা হয়েছে, যাঁরা ধীর অর্থাৎ যাঁদের ধৈর্য অর্থাৎ অপ্রমাদ বা অব্যাকুলতা আছে, তাঁরা মৃত্যুর পর অমৃত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। এজন্মের প্রারব্ধ ভোগ করতেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, গঙ্গাস্নান করলে সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু কানার কানাচোখ ঘোচে না। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের মধ্যেই ধৈর্য দেখা যায় বলে তাঁরা ধীর-পদবাচ্য। এঁরাই জীবন্মুক্ত। মৃত্যুর পর এঁরাই অমরত্ব লাভ করেন অর্থাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি (মু. উ., ৩।২।১০) বলেছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন। আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ সুখস্বরূপ নিত্যব্রহ্মকে (বৃ. উ., ৩।৯।২৮।৭) প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষও সুখস্বরূপ হয়ে যান। এজন্যই উপনিষদে (ক. উ., ২।২।১২; শ্বে. উ., ৬।১২) আত্মদর্শনে শাশ্বত সুখের কথা বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৯) বলা হয়েছে, ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোনকিছু থেকে ভীত হন না। শ্রুতিতে (বৃ. উ., ৪।৪।২৫) ব্রহ্মকে 'অভয়' বলা হয়েছে। অভয় ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন পুরুষও অভয় বা ভয়শূন্য হন। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ (তৈ. উ., ২।১।৩; বৃ. উ., ৩।৯।২৮।৭)। আত্মজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই তৃপ্ত হন, অন্য কিছুর দ্বারা নয় (মু. উ., ৩।২।৫)। জ্ঞান তো ব্রহ্মেরই নামান্তর। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ কেবল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানেই তৃপ্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। শ্রুতি বারংবার আত্মজ্ঞানী পুরুষের শোকহীনতার কথা বলেছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।৩) বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক অতিক্রম করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।১৪) বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানী বীতশোক হন। ঈশ উপনিষদে (৭) বলা হয়েছে, সবকিছুই আত্মজ্ঞানীর নিকট আত্মাই হয়ে যায়, একত্বদর্শী তাঁর মোহ বা শোক কিছুই হয় না। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৯) বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক অতিক্রম করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৩) আবার বলা হয়েছে, দেব অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলে পুরুষ সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এই উপনিষদেই (১।১০) তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের মায়ার নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি (মু. উ., ২।২।৮) বলেছেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাঁর হয়ে থাকে, তাঁর হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আশ্রিত সকল কামনার বিনাশ ঘটে, সকল সংসার ছিন্ন হয় এবং কর্মসকল ক্ষীণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের বিগতক্লেশ হওয়ার কথাও শ্রুতিতে (মু. উ., ৩।১।৩) উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

এখন কথা হলো, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ কী? অর্থাৎ এই ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হওয়া সম্ভব? কারণ, ব্রহ্ম চক্ষু প্রভৃতি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি সকল কর্মেন্দ্রিয় ও মনের অগোচর (কে. উ., ১।৩, ৫-৯)। মনঃসংযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই কোন বস্তুর জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম যদি মন ও ইন্দ্রিয়সকলের অগোচর হন, তাহলে তাঁর জ্ঞান কি করে হওয়া সম্ভব? বস্তুত, কেন উপনিষদে (১।৩) বলা হয়েছে—আমরা তাঁকে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে জানি না।

এর উত্তরে বলা যায়, সাধক মনের দ্বারা ব্রহ্মের সমীপবর্তী হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে নিরন্তন স্মরণ বা ধ্যান করতে থাকলে ব্রহ্ম তাঁর নিকট প্রতিভাত হন (তুলনীয় কে. উ., ৪।৫)। ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক তাঁর শিষ্যকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। এইভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় (দ্রঃ বৃ. উ., ৬।৫।৩) ব্রহ্মবিদ্যা বিধৃত (তুলনীয় কে. উ., ১।৪; ক. উ., ১।২।৭, ২।২।১২)। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ, জীবন্মুক্ত আচার্যের নিকট থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় (তুলনীয় ছা. উ., ৬।১৪।২)। অতএব একথাই স্থির হলো, ব্রহ্মজ্ঞান বেদবাক্য ও গুরুবাক্য থেকেই হয়ে থাকে, অন্য কোনপ্রকারে নয়।

এইভাবে "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—এই শ্রুতিবাক্যটি পর্যালোচিত হলো। ❑

সঙ্কেত পরিচয়

ঈ. উ. = ঈশ উপনিষদ্; ক. উ. = কঠ উপনিষদ্; কে. উ. = কেন উপনিষদ্; ছা. উ. = ছান্দোগ্য উপনিষদ্; তৈ. উ. = তৈত্তিরীয় উপনিষদ্; মু. উ. = মুণ্ডক উপনিষদ্; বৃ. উ. = বৃহদারণ্যক উপনিষদ্; শ্বে. উ. = শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্; গী = শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ব্র. সি. = ব্রহ্মসিদ্ধি (ম. ম. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী সম্পাদিত); ব্র. সূ. = ব্রহ্মসূত্র; বে. প. = বেদান্ত পরিভাষা (পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ); শা. ভা. = শাঙ্করভাষ্য।

কবিতা

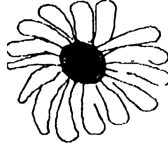
কথামৃত

দেবী রায়

তুমি সেই সত্য—যে-সত্য রুক্ষ, মরু এজীবনে
করে পারাপার
সেই সত্য সার
যার মহিমা অপার।

তুমি সেই কাণ্ডারী অবতার, দিনে দিনে
শিখিয়েছে যে
সতত অস্থির মনে
কিভাবে হতে হবে বিক্ষুব্ধ এই ভবনদী পার।

প্রবহমান তোমার নামে গতির সঞ্চার—
সেই সত্য কণ্ঠহার,
'কথামৃত' সব শাস্ত্রের সার
সত্যের সারাৎসার।



পরমাপ্রকৃতি মা সারদা

সঙ্ঘমিত্রা সুরচৌধুরী

তোমার স্নিগ্ধ আঁখি দুটি
প্রভাতের শুকতারার মতো
পুণ্য কিরণধারায় স্নাত করায়
চেতনার গভীরে জাগায় এক পরম সত্য,
উদ্বোধিত করে নবীন প্রেমের মন্ত্রে।
তোমার সেই পরমবাণী—"জগৎকে আপনার করে
নিতে শেখ, জগৎ তোমার"
জীবনে চলার পথে চির পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়।

সারদা তুমি, তুমি সরস্বতী
জগতের সকলের মা।
যখনি বেদনায় দীর্ণ হই, যন্ত্রণায় হই ক্ষতবিক্ষত
গভীর তমসায় আবৃত হয় সমগ্র সত্তা
তখনি অহরহ হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে—
"আর কেউ না থাক,
জানবে তোমার একজন মা আছেন।"

তুমি সারদা, তুমি চিরন্তনী
তুমি যুগজননী।
তোমার আশিস সকলের তরে
সকলের পরে
শতধারায় পড়ুক ঝরে।

তোমারে স্মরি, মাগো!

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

হে মাতঃ সারদা, হইয়া বরদা কর কত অভয়দান—
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান!
তুমি অলক্ষ্যে থাকি যা শিখাও, তারে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া
চলিয়াছি নিতি জীবনের রথে দুঃখেরে স্থান না দিয়া!
সকল যামিনী শুনায় রাগিণী ঝঙ্কারি তুলি বেদনা
বরণের কালে নাচিছে যে ভালে জাগায়ে স্মৃতিরে কত না!
সুখেদুখে গড়া জীবনবৃন্তে রব মাথা পাতি স্থিরচিত্তে—
তোমার করুণা মাগিতে গো মাতা, হব নাকো কভু ম্লান,
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান!
অসীম অপার কালের যাত্রা সদা অনন্তে ধায়—
প্রবাহের কালে আপন খেয়ালে তোমারি মহিমা গায়!
ব্রহ্মাণ্ডরূপী তোমার ক্ষেত্র বিরাট বিশাল শিক্ষাসত্র
সিঞ্চন করে পূতবারি ভরে মানিয়া সংস্থান,
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান!
ফুরায় না তব জ্ঞানভাণ্ডার যা রাখ উজাড়ি সাধ—
কেমনে ওগো মা, লইব বাছিয়া আজিকে তাহাই ভাবি!
তাই আজ আমি হয়ে অনুগামী সঁপেদিনু মনপ্রাণ—
শিখাও আমারে প্রেম ও ভক্তি চেতনা অনুধ্যান!
হে মাতঃ সারদা, হইয়া বরদা কর কত অভয়দান—
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান!

প্রণতি

সৌম্যজিৎ আচার্য

তোমার জন্য সকালবেলায় ফুটল হরেক ফুল
সেই ফোটাতেই ঘুচুক আমার জীবনভরা ভুল।
সাগর থেকে দূর সুদূরেও কত না শোরগোল
চোখের জলে ভাসিয়ে ডিঙি শুনি সে-হিল্লোল।
তোমার পায়ের নূপুর খুলে বইল যখন নদী
চিন্তা কি আর, এবার আমার সাঁতার নিরবধি।
হাওয়ার তালে দোলনা দুলুক—চোখটি বোজ মন
দেখাও আমায় দেখাও তোমার অমোঘ গুপ্তধন।
আমার শূন্য বাগান, শূন্য ডালি
হৃদয়-ফুলেই ভক্তি ঢালি
তোমার প্রেমে বিছিয়ে রাখি আসন অনুখন।

ভাবের দালান মুক্তহাসির আলোয় ভিজে আছে
এবার জীবনধুলো ঝেড়ে আমায় রেখো তোমার কাছে।

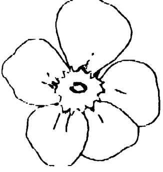
আলোর দিশারী

ভুবন রায় সরস্বতী

ভোগবাদ আর জড়বাদের গোলোকধাঁধা
বাসনা-কামনার হাতছানি
অতৃপ্ত জীবনে গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বর।
ঝলমলে আলোয় তুফান তোলে সফেন বুদ্বুদ।

তৃপ্তিহীন জীবনে অতৃপ্ত কামনা—
অশান্ত মন লক্ষ্যহীন। উদ্দেশ্যবিহীন
মায়া মোহ মান যশ লালসার অক্টোপাস
কোথায় পরিণতি?

দিশাহীন জীবনে মুক্তির নিঃশব্দ পাদচারণা,
ধীরে ধীরে আলোকবর্তিকা হাতে
এগিয়ে আসে পথের সন্ধানে—
এযুগের মুক্তিদাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ
অন্ধকারে আলোর দিশারী।



নোঙর

সৈয়দ আনিসুল আলম

শুরু হলো এগনোর পালা
সামনে অচেনা ভরা নদী।
অঙ্কের ফরমুলার মতো পথচিত্র আঁকা।
যেতেই হবে। পাপড়ি-ঢাকা ভবিষ্যৎ।
কিন্তু জেনে রাখতে হবে পথ হারানোর
বিপদ পদে পদে।
ভাসালাম তরি প্রভাতের হাওয়ায়
কিন্তু কোন্ বন্দরে নামব কোথায়?
ক্ষিপ্র শরের মতো তীব্র স্রোত
শব্দহীন বহে নিরবধি।
তবু নির্ভয়ে আমি শক্ত হাতে চালাই তরি।
নির্জন আঁধার কোথাও, কখনো কানে আসে
ব্যাঘ্রের গর্জন।
ঘন বরষায় কখনো বা বজ্রের ধ্বনি।
জাগর চোখে ইশারায় ঊর্ধ্বগগনে
ধ্রুবতারা বলে—চালাও ডাইনে, যাবে না বামে।
মাটি যে এখনো অনেক, অনেক দূরে।
যেখানে ফেলিব আমার ক্ষুব্ধ তরীর নোঙর?
বলে—বেয়ে চল জোরে, আরো জোরে
পাবে কাঙ্ক্ষিত বন্দর, পাবে শুভদিন।

মায়াবতীতে কিছুক্ষণ

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

শ্যামলিমার বিস্তারে নীলিমার শামিয়ানায়
মেঘ-রোদ্দুরের ঝালরে
বিমূর্ত হয়েছিল প্রহরগুলি,
ইচ্ছে হয়েছিল তোমার হাতে
অবিস্মরণীয় এমন এক উপহার তুলে দিই—
যারা বাহারি ফুলের রঙ ঐশ্বর্যে
হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো নিবিড় সুগন্ধে
তরঙ্গ-স্থির শৈলমালার ধোঁয়াশা-মাখা শৈত্যে
ভোরের গা ছুঁয়ে অলৌকিক স্বপ্ন হয়েছিল।

অবাধ অখণ্ডের তুষারস্তব্ধ ভাস্বরতা
সর্বাঙ্গে ঝলমলিয়ে স্বর্গীয় করে তুলেছিল যখন আমাকে
দোদুল্যমান বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায়
অজান্তে কখন আনত হলাম মহান অদৃশ্যের প্রতি—
কে ঐ, যার অবয়ব নেই কোন, নড়াচড়া নেই
অথচ, আলোর উৎসারে অপরূপ প্রকাশ!

ভুল মনে হচ্ছিল কিনা তাও জানি না
অবাক বিভোর চোখ মেলে ঐ মুহূর্তে দেখলাম
অদ্বিতীয় আমার সত্তাকে—
অমলিন আনন্দ ছাড়া শোক-দুঃখ বিরহ-বিচ্ছেদ
যার কিছু নেই।
আঘাত সঙ্ঘাতময় রূঢ় বাস্তবে দাঁড়িয়েও
মনের বেদিতে প্রলেপ নেই
বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা কলুষতার।

বিস্মিত সত্যের সঙ্গ নিয়ে অপার আনন্দে
ঘরে ফিরেছিলাম এক নতুন মানুষ।

তোমারে পর ভাবি

প্রবোধচন্দ্র মাহাত

তোমারে পর ভাবি, দিন তো গেল সবই
তাই তোমারে নাহি পাই হে,
আপন ভাবিলে ও চরণতলে
দিতে তুমি জানি ঠাঁই হে।
আমার মাঝে তুমি বিরাজিছ সদা,
তোমাতে আছে সব, ভুলেছি সেকথা,
মায়ার আবরণে দ্বিধাভরা মনে
সংশয়ে ছিনু তাই হে।
আমার 'আমি' যত উচ্চকিত রাখি,
তোমা থেকে দূরে তত সরে থাকি
এ অহমিকা লয় কর দয়াময়,
আর কিছু নাহি চাই হে।

মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা*

অয়ন বিশ্বাস



বেদের ঋষি গেয়েছিলেনঃ

"এতদ্ বচো জরিতর মাঽপি মৃষ্ঠা
আ যৎ তে ঘোষান্ উত্তরা যুগানি।"
(ঋগ্বেদ, ৩।৩৩।৮)

অর্থাৎ—ভুলো না তোমার এ গান, হে কবি
ঘোষণা করবে যা ভাবী যুগেরা।

আজ সহস্রাধিক বছর পরেও সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সম্যক্ উপলব্ধি বিঘোষিত হচ্ছে তাঁর অমোঘ আর্ষ উচ্চারণে। এমন কিছু চিরন্তন উচ্চারণ থাকে, যা সর্বদেশে সর্বকালেই শ্রাব্য। এ এক অপূর্ব সিদ্ধি, বহু পরিশ্রমের সুফল —যা কালাতীত কালপুরুষের বাণী।

'ঋষি' শব্দটি আমাদের মনে একটি সাধারণ ধারণার উদ্রেক করে। মানসপটে ভেসে ওঠে একজন পক্বশ্মশ্রু সুদর্শন মনোহর পুরুষমূর্তি—যিনি বায়ুভুক, সর্বদাই ধ্যানসমাহিত, দৈব অনুগ্রহে যাঁর উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয় ঈশ্বরের বাণী এবং তা তাঁর মুখ ফুটে প্রকাশিত হয়। রামনামজপে নিরত রত্নাকরের ঠিক যেমনটি হয়েছিল। চোখের সমক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুনকে শরবিদ্ধ হতে দেখে যাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে এসেছিল সেই শ্লোকঃ "না খলু না খলু বাণঃ!" শোক থেকে স্বতোৎসারিত বলে তার নাম হলো 'শ্লোক'। বল্মীকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর দস্যু থেকে রত্নাকর রূপান্তরিত হয়েছিলেন অমর রামকথাকাব্যের মহাকবি ঋষি বাল্মীকিতে।

আধুনিক ভারতের এক শাশ্বত মন্ত্রের উদ্গাতা বলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়েছিল 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'। তাঁর উদাত্ত উদার মন্ত্রোচ্চারণে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বহুজন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি এই উপন্যাসেরই অন্তর্গত, যদিও দেশপ্রেমের বাণীরূপ এই মহামন্ত্রটি রচিত হয়েছিল তার সাতবছর আগেই। এমনকি তা প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেও। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির অর্থঃ মাকে বন্দনা করি বা তোমাকে বন্দনা করি, হে দেশমাতৃকা! প্রকাশকালে এই সঙ্গীত প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেনঃ "উহা ভাল কি মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভাবনা, তুমি থাকিতে পার।"[১]

সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি ধমনিতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে এই সঙ্গীতের মর্মবাণীর খুব বেশি সময় লাগেনি। দেশমাতৃকাকে দেবীকল্পনায় রূপদানের সঙ্কল্পের প্রয়াস দেখে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে পুষ্প-চন্দনের অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে 'ঋষি' অভিধা প্রদান করেন। এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে আপ্লুত হয়ে তিনি গানটির ইংরেজি অনুবাদও করলেন। সেইসঙ্গে ব্যক্ত করলেন তাঁর মহা উপলব্ধির কথাঃ "যে-মহাসঙ্গীতটি বঙ্কিম রচনা করলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনে সমস্ত জনতা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়ে গেল। দেশজননী এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।"[২]

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের প্রথম অংশটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে মাতৃভূমির স্তুতিতে। দ্বিতীয় অংশে শক্তিশালী ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্য রচয়িতার বেদনাহত মনের বহিঃপ্রকাশ যেন পীড়া দেয় পাঠককেও।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি সেই অগ্নিযুগে বেদ ও গীতার মতোই সমাদৃত ছিল। আর সেই সপ্তাক্ষরে বিধৃত মাত্র দুটি শব্দে গাঁথা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে একসময় দুলে উঠেছিল আসমুদ্রহিমাচল। 'আনন্দমঠ'-এ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদলের স্বপ্নসাধনা ছিল দেশের কল্যাণ। আর সেই স্বপ্নপূরণে তাঁরা নিজেদের জীবন-যৌবন সবকিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সুরে মেঘমল্লার রাগে বিন্যস্ত এই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি বাঁধা হয়েছিল কাওয়ালি তালে। বাঁধা হয়েছিল "সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে'র সমবেত জীবনতানে—যে-তানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশমাতার বীর সন্তানেরা বলতে পেরেছিলেনঃ "আমরা

* বঙ্কিমচন্দ্রের ১৬৭তম জন্মজয়ন্তী (১৮৩৮-২০০৪) উপলক্ষ্যে নিবেদিত

১ বঙ্কিম প্রসঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২

২ দ্রঃ Rishi Bankim Chandra—Sri Aurobindo Birth Centenary Edition, Vol. 17, p. 347

অন্য মা মানি না—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—।"[৩] একথার সুর শুনি সপ্তঋষির এক ঋষি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট নির্দেশে ঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি (nation)—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।"[৪] এও এক দুর্নিবার আর্ষ উচ্চারণ।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আমরা দেশমাতার তিনটি রূপ দেখতে পাই—মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন এবং মা যা হবেন। প্রথম—"এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি।" দ্বিতীয়—"অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী।" তৃতীয়—"দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ!"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস বা তার অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির সাহিত্য বা শিল্প-মূল্য নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বাংলা তথা জাতীয় আন্দোলনে এই মন্ত্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে দলে দলে বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসকের শানিত সঙ্গিনের সামনে বুক পেতে দিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চে কালসূত্রের ফাঁস গলায় পরে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। এই একটি মন্ত্রে একসময় উন্মাদ উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। মৃন্ময়ী অমূর্ত দেশমাতাকে চিন্ময়ী রূপদান করেছিল এই মন্ত্র।

'বন্দে মাতরম্' গানটিতে যেহেতু 'সপ্তকোটীকণ্ঠ' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু অনেকে মনে করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের পটভূমিকায় তাকে রচনা করেছেন। কারণ, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ছিল সেটাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গীতের মূলসুর ছিল ভারতবর্ষের অখণ্ডতা। সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে বাঁধা সে-সুর। জাতীয় ঐক্যসাধনাই সেই মহাব্রত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় আস্থাবান ছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখতেন সেই রাষ্ট্রের—যেখানে স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হবে, সুপ্ত শক্তির ঘটবে জাগরণ। তাই ভাবালুতা কাটিয়ে সকলকে কর্মযজ্ঞে সাদর আহ্বান করেছেন তিনি। 'আনন্দমঠ', সর্বোপরি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির অভীষ্ট সেটাই। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরও সেই অভিপ্রায়।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি সর্বভারতীয় মর্যাদায় ভূষিত হয়। কলকাতার বিডন স্কোয়ারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পুরুবিক্রম' নাটকের একটি গানে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটিকে ধ্রুবপদ হিসাবে ব্যবহার করেন—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম্।"

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বয়কট আন্দোলনে, স্বদেশী সভা-সমিতিতে এই 'বন্দে মাতরম্' অনিবার্য আবশ্যিক ধ্বনিতে রূপপরিগ্রহ করল। ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করল 'বন্দে মাতরম্' গান ও শ্লোগান। পরে অবশ্য বন্ধু কেশবচন্দ্র সেনের সহায়তায় রাজরোষ থেকে সে-যাত্রায় রেহাই পান বঙ্কিমচন্দ্র। রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে মুক্তি পায় 'আনন্দমঠ'।[৬]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখলেন ঃ "বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে-পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে-কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে-মন্ত্র বন্দে মাতরম্।"[৭]

আজ দ্বিখণ্ডিত স্বদেশের বিষমুক্ত মুক্ত বাতাসে উড়ছে জাতীয় পতাকা। তবু তার বুকে আকাশের গন্ধ নেই। আজও শত শহীদের কালো মৃত্যু আর লাল রক্তের গন্ধ লেগে আছে সেই তিনরঙা অলৌকিক কাপড়ে। আজও তাই কান পেতে শুনি সেই রক্তগন্ধা স্বাধীনতা আর মৌনী নিস্তব্ধতার নিবিড় স্তব্ধ উদাত্ত আহ্বান—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সে-মন্ত্রের মন্ত্রমুগ্ধ সুরে, মেঘমন্দ্র সেতারের সে-তারে ঃ

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।" ❑

বঙ্কিমচন্দ্র রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮০, পৃঃ ৬৭৩

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৫৩

৫ বঙ্কিমচন্দ্র রচনাসংগ্রহ, পৃঃ ৬৭৭

৬ বঙ্কিমচন্দ্র ঃ মনীষী ও মানুষ—অভয়চরণ দে, পৃঃ ১৩৫

৭ বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৭৩

পরমপদকমলে

'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আকাশে আলো ফুটছে। দক্ষিণেশ্বরের আকাশে। পঞ্চবটীর অন্ধকার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে পলায়মান। কার্তিকের শিশির পাতা থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। শীত আসছে। শান্ত গঙ্গা ভোরের আলোয় ভাসছে।

ঠাকুরের চোখে সারারাত ঘুম থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে সমাধি। রাতের রহস্যে কত অনুভূতি, শব্দ, দর্শন ঠাসা! গুরু তোতাপুরী বলে গেছেন—যে জাগে সে শুনতে পায়, রাত দ্বিপ্রহরের পর থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে প্রণবধ্বনি। পৃথিবী তখন অনন্তের কোলে সাধনায় বসে।

তবু ঘরে একটি অনাড়ম্বর বিছানা পাতা থাকে। নিভাঁজ শুভ্র চাদর। মাঝে মাঝে তিনি বসতে পারেন। হয়তো বা শুয়েই পড়লেন অল্পক্ষণের জন্য। কেউ বলতেই পারবেন না কখন কি হবে! রাতের সঙ্গে তাঁর খেলা চলে। কখনো এখানে, কখনো ওখানে।

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছেন তিনজন ভক্ত—নরেন্দ্রনাথ, মাস্টারমশাই, প্রিয়নাথ। ভোরের আবছা আলো, গঙ্গার মিষ্টি বাতাস, নিদ্রিত তিন ভক্ত। শ্রীম দেখছেন, ঠাকুর ঘরের ফাঁকা অংশে পায়চারি করছেন। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন, ঠাকুর কখনো পশ্চিমের খোলা দরজা-পথে ভোরের গঙ্গা দর্শন করছেন, কখনো ফিরে আসছেন ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর যেসব ছবি ঝুলছে সেখানে; সেইসব ছবির কাছে প্রণাম করছেন। সুমধুর স্বরে নামকীর্তন করতে করতে সরে যাচ্ছেন অন্যদিকে। মাঝে মাঝে গান থেমে যাচ্ছে, তখন বলছেন—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।

তিনি প্রায়ই ভক্তদের বলেন, গীতা পড়লে যা হয় আর দশবার 'গীতা' শব্দ উচ্চারণ করলে তাই বোঝায়, যেমন—গী তাগী তাগী তাগী। কি না, হে জীব! সব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

এই প্রভাতে ঠাকুর সেই কথাই বলছেন। ভক্ত তিনজনের কানে যাচ্ছে—গীতা গীতা গী-ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। আবার বলছেন—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী, তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

ভক্তরা অবাক হয়ে তাঁদের জীবনের এই দুর্লভ ভোরে ঠাকুরের বিভোর অবস্থা দেখে ধন্য হচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন—মা! তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এ যে সাংখ্যদর্শনের কথা! সাংখ্য-মতে, চব্বিশটি মূল পদার্থ নিয়ে জগতের যত খেলা—প্রকৃতি, মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, লিঙ্গ, আর মন।

কালীমন্দির আর রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারতি শুরু হলো। শাঁখ আর ঘণ্টার শব্দে ভোরের ঘুম ভাঙছে। ভূমিশয্যা ছেড়ে ভক্তত্রয় ঠাকুরের ঘরের বাইরে এসেছেন। কী দেখছেন? কোন স্বপ্নে জেগে উঠলেন নাকি? পশ্চিমে প্রবাহিত তরতরে গঙ্গা। প্রভাতী বাতাস। কালীবাড়ির ফুলবাগানে কর্মীরা ফুল তুলছেন ঘুরে ঘুরে। নহবতে সানাই ধরেছে ভোরের ভৈরবী। পাখিদের আনন্দলহরী বৃক্ষশাখে।

ভক্তরা চলেছেন উদ্যানের উত্তরপ্রান্তে দিশাজঙ্গলের দিকে। তাঁরা দেখছেন, পঞ্চবটীতে বসে আছেন কয়েকজন নানকপন্থী সাধু।

প্রাতঃকৃত্য সেরে ভক্তরা ফিরে আসতে আসতে দেখছেন, উত্তর-পূর্ব বারান্দার পশ্চিমে ঠাকুর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন হাসির হাত বাড়িয়ে বলছেন—সুপ্রভাত! ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন ঃ "তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি।"

মাস্টারমশাই, নরেন্দ্রনাথ আর প্রিয়নাথ মেঝেতে মাদুরে বসলেন। হুগলি জেলার মাদুর। নহবতে মায়ের ঘরেও একটি মাদুর আছে। মাস্টারমশাই উমেরে বড়। ঠাকুর বয়স বলেন না, বলেন 'উমের'। আরবি শব্দ 'উমর' ঠাকুরের কাছে এল কি করে? কামারপুকুর গ্রামখানির অবস্থান ইতিহাসের পথের ধারে। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন ঃ "কামারপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বে কোনকালে এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত করা হইয়াছিল।"

এই মান্দারণ গ্রামের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করা যাক। কামারপুকুরকে বলা হয় 'গণ্ডগ্রাম'। তা নয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের টানাপোড়েনে এই গ্রামের মর্যাদা একদা কিছু কম ছিল না। ইংরেজ শাসনে ক্রমশই সব স্তিমিত হয়ে গেল। মুসলমান আমলের জাহানাবাদ—বর্তমানের আরামবাগ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সরকারি 'হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'। গেজেটিয়ার গড় মান্দারণ সম্পর্কে

লিখেছে : "This fort is the scene of the story 'Durgesa Nandini' by the celebrated Bengali novelist, Bankim Chandra Chatterjee who was Sub-Divisional Officer of Jahanabad about 20 years ago."

বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন : "মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এইজন্যই তাহার নাম 'গড় মান্দারণ' হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত। এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা লাভ করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুইদিক বেষ্টিত হইয়াছিল, তৃতীয় দিকে মানব-হস্ত-নিখাত এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত; দুইদিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে। অট্টালিকা কালের করালস্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে। তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।"

ঠাকুর ১৮৩৬ সালে কামারপুকুরে অবতীর্ণ হলেন। পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৮৬-তে ফিরে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন ১৮৯২-তে। ঠাকুর তখন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! হেঁয়ালির মতো শোনালেও হেঁয়ালি নয়। ঠাকুরের দেহান্তর ঘটলেও লোকান্তর ঘটেনি। মা জানতেন, গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, স্বামীজী প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। কামারপুকুরের ইতিহাসে ঠাকুরের চির-অবস্থান। লোকজীবন, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির অঙ্গীকার ও বিকাশ। পথ নয় অতিপথ, শ্রীরামকৃষ্ণ-মার্গ পৃথিবীর ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে মা চলেছেন মানব-পূজার নৈবেদ্য-হাতে। পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ, তন্ত্রধারক শ্রীরামকৃষ্ণের অগণিত সন্ন্যাসী সন্তানবৃন্দ। গড় মান্দারণ রূপান্তরিত গড় শ্রীরামকৃষ্ণে।

স্বামী সারদানন্দজী লিখছেন : "মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তূপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনো বর্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এইসকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড় মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বর্ধমানে গমনাগমন করিবার পথ প্রসারিত।"

"পথের দুই ধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়।" একটি দীঘির নাম 'কাজলা দীঘি'। কাজলের মতো কালো জল। দীঘিতে দুটি পোষা কুমির ছিল। তাদের নাম ছিল, 'ছাদারি-মাদারি'। জনশ্রুতি, মানুষ কোন কামনা নিয়ে দীঘির পাড়ে যেত, সঙ্গে হাঁস অথবা পায়রা। তারা ডাকত, 'ছাদারি-মাদারি'। কুমির ঘাটের কাছে এসে যার 'নৈবেদ্য' গ্রহণ করত, তার মনস্কামনা পূর্ণ হতো।

আশ্চর্য হওয়ার মতো আরো খবর দুটি গ্রন্থে আছে—একটি 'আইন-ই-আকবরী', অন্যটি 'রিয়াজ-উস-সালাদিন'। মান্দারণে হীরের খনি ছিল। হীরে পাওয়া যেত। অবশ্যই। শেষ, শ্রেষ্ঠ হীরকখণ্ড উঠল কামারপুকুর গ্রামে, বিচ্ছুরিত শ্রীরামকৃষ্ণ—'হোপ ডায়মণ্ড'।

'উমের' শব্দটি এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইসলাম-সংস্কৃতি থেকে আসতে পারে, আবার লাহাবাবুদের ধর্মশালায় পশ্চিমী সাধুরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলেও ঠাকুর পেয়ে থাকতে পারেন।

তিন ভক্তকে মাদুরে বসিয়েছেন ঠাকুর। আনন্দে দেখছেন। মাস্টার—উমের একটু বেশি। গম্ভীরাত্মা। বয়স ২৯। নরেন্দ্রনাথ ২০ বছরের প্রস্ফুটিত যুবক। পাশে সমবয়সী প্রিয়নাথ। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর দেখছেন। ঠাকুর হাসছেন। সানাই এখনো বাজছে। [ক্রমশ] (বারো)

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার-মাধ্যম হলো মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা। স্বামীজী এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। প্রথমাবধি তাঁর ইচ্ছা ছিল দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবেন। ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে একটি পত্রিকা স্বামীজীর প্রেরণায় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। আরো যুগোপযোগী নাম দিয়ে একটি 'সম্পূর্ণ' পত্রিকা স্বামীজী প্রকাশ করতে চাইছিলেন। ১৮৯৬-এর জুলাই মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হলো মাদ্রাজ থেকে। পরে সেটি মায়াবতীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশ পেল। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ থেকে 'বেদান্ত কেশরী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে মালয়ালাম ভাষায় প্রকাশিত হয় 'প্রবুদ্ধ কেরলম্'। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নথিভুক্ত ১২টি পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। নথিভুক্ত হয়নি এমন আরো অন্তত ৫টি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

|ব্য|ক্তি|ত্ব|

মাতৃসান্নিধ্যে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আরামবাগে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠকগণ এই নামটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। জয়রামবাটীতে থাকাকালে মায়ের শরীর খারাপ হলে তাঁর সন্তানরা এবং পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে মা স্বয়ং সংবাদ পাঠাতেন ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়কে। মায়ের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি এবং তাঁর প্রতি মায়ের অপরিসীম স্নেহ তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের পারিবারিক চিকিৎসকে পরিণত করেছিল। সে-আমলে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পাশ-করা ডাক্তার বিরল ছিল। সে-কারণেই আরামবাগের ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জয়রামবাটীতে ডাক পড়ত ঘনঘন। তিনি নিজেও সে-আহ্বানের প্রত্যাশায় থাকতেন। তিনি প্রথম যখন মাতৃসান্নিধ্য লাভ করেন, তখন ডাক্তারি পাঠরত।

মাতৃসান্নিধ্যের সৌরভগুণে ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কালে সমাজসেবী চিকিৎসকে পরিণত হয়েছিলেন। দুপুরে ডাক্তারি কাজ সেরে খেতে বসেছেন, এমন সময় সংবাদ এল—দূরের এক গ্রামে কলেরা মহামারীতে লোক মারা যাচ্ছে। ডাক্তারের আর খাওয়া হলো না। ভাতের থালা সরিয়ে রেখে চললেন কলেরা মোকাবিলায়।[১] সাঁওতাল পাড়ায় জনৈক শিশু দীর্ঘদিন ধরে টাইফয়েডে ভুগছে। অভাবী, ওষুধ কেনার পয়সা নেই। বন্ধুর মুখ থেকে এ-সংবাদ পেয়ে তিনি ওষুধ নিয়েই হাজির হলেন সেই সাঁওতাল পল্লিতে।[২] সারারাত রোগীর কাছে থেকে তার জ্বর কমিয়ে তারপর তিনি বাড়ি ফিরলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলতেনঃ "যখনি আমি কোন রোগ ও রোগীর সংবাদ পেতাম, তখনি শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করতাম; মা যেন তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী শুনিয়ে জানাতেন, 'তুমি এখনি যাও বাবা, ও কত কষ্ট পাচ্ছে।' "[৩]

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীগ্রন্থে ডাক্তার প্রভাকরের প্রসঙ্গ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে প্রভাকর মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে জানিয়েছেনঃ "প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের পথ চলিতে চলিতে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল, পান না খাইয়া চলিতেই পারিতেন না। দাঁতের অসুখ থাকায় খড়িকাও ব্যবহার করিতে হইত। জয়রামবাটী হইতে আরামবাগ যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে পাতার ঠোঙায় কতকগুলি পান দিয়া বলিলেন, 'এইগুলি পথে খাবে।' ঠোঙাটি খুলিয়া দেখা গেল উহার মধ্যে একটি খড়িকাও সযত্নে রক্ষিত আছে।"[৪] "প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আরামবাগ হইতে জয়রামবাটীতে আসিবার সময় নিজের ছেলেটির হাম হইয়াছে দেখিয়াছিলেন। যখন তিনি বাড়ি ফিরিয়া যাইবেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'কামারপুকুরে শীতলার পূজা দিয়ে যাবে।' "[৫] প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "আমার দীক্ষার পর শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'লোকে বলে, ব্রাহ্মণশরীর হলেও যদি মড়াকাটা ইত্যাদি করে, তার হাতে দেবতারা পূজা নেন না, পিতৃপুরুষেরা পিণ্ড গ্রহণ করেন না, তা কি সত্যি?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ।' আমি পিতার একমাত্র ছেলে অথচ ডাক্তারি শিখিতে আমাকে মড়াকাটাদিও করিতে হইয়াছে, তাই কাতর হইয়া বলিলাম, 'তাহলে কী হবে মা?' মা বলিলেন, 'আর কোন ভয় নাই, এখন হতে সকল পূজায় অধিকার হলো।' কোন সময়ে আমাকে মা ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়া বলিলাম, 'মুখে পান রয়েছে, কী করে যাব?' মা বলিলেন, 'পান পবিত্র—এস।' "[৬] জয়রামবাটীতে এক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "মা ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথতে বলেছিলেন। শ্যাম, শ্যামা বা শিব-ভাবে দেখে তদনুরূপ মালা করব চিন্তা করছি, হঠাৎ মনে হলো—ঠাকুর তো সবই, সুতরাং সবরকম ফুল, তুলসী, বেলপাতা—সবকিছু দিয়েই মালা করা ভাল। নতুন বাড়িতে ঘরের বারান্দায় মা একটু তফাতে বসেছিলেন, স্নিগ্ধ মধুর হাসলেন।"[৭]

স্বামী ঈশানানন্দ 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে জানিয়েছেনঃ "১৩২৬ সাল (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)... আমি ও বৈকুণ্ঠ মহারাজ পরদিন সকালে জয়রামবাটী গিয়া দেখিলাম, ন্যাড়ার গলার স্বর খুব বসিয়া গিয়াছে;... বৈকুণ্ঠ মহারাজ ন্যাড়ার গলা পরীক্ষা করিয়াই বলিলেন, 'দুপুরে এখানে অপেক্ষা না করে এখনি কোয়ালপাড়ায় মায়ের নিকট ফিরে গিয়ে এর ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো খুব বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'... পথে বৈকুণ্ঠ মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'অসুখ খুব মারাত্মক, রোগটি ডিপথেরিয়া। এতে খুব কম ছেলেই বাঁচে।'...

"যাহা হউক স্থির হইল, ইনজেকশনের জন্য এখনি আরামবাগে গিয়া কলিকাতায় শরৎ মহারাজের নিকট টেলিগ্রাম করিতে হইবে।... ঐদিন রাত্রেই আরামবাগ হইতে ডাক্তার প্রভাকরবাবু ও উকিল মণিবাবু জয়রামবাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ন্যাড়ার গলায় ভেপার গ্যাস দিতে আরম্ভ করিলেন।...

"সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া... (৫ বৈশাখ ১৩২৬) বেলা ৫টা নাগাদ ন্যাড়া মারা গেল। মা সে-রাত্রে খুবই কান্নাকাটি করিলেন।... মা কয়েকদিন যাবৎ ন্যাড়ার কথাই খুব বলিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলিতেছেন। তিনি ন্যাড়ার সৎসংস্কারের কথা নারায়ণ আয়েঙ্গার, প্রভাকর ডাক্তার ও উকিল মণীন্দ্রবাবুর নিকটও বারবার বলিতে লাগিলেন।"[৮]

"একদিন সকালে গড়বেতা ও পিয়ালডোবার নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে একটি যুবক আসিয়াছিল। ছেলেটি জাতিতে বাগদি। সে তাহার মামার বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করার পর মায়ের নিকট তাহার দীক্ষা লইবার বাসনা হয়। ঐদিন দুপুরে মাকে ঐবিষয়ে প্রার্থনা জানাইলে যুবকটির পরিচয়াদি অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমা দেশে বাগদি ছেলেকে দীক্ষা দিতে একটু ইতস্তত ভাব দেখাইয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের কুলগুরু আছেন তো? এত তাড়াতাড়িই বা কেন? আমার শরীর এখন তত ভাল নয়। এখানে বড় ঝামেলায় আছি। না হয় কলকাতা গেলে তখন সেখানে দীক্ষা হবে।'

"মা এইসকল কথা বলিতে থাকায় উক্ত যুবকটি বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ মা, বুঝতে পেরেছি। আমি বাগদির ছেলে কিনা, তাই বাগদির মা হতে একটু কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই তেলোভেলোর মাঠে আপনার বাগদির মেয়ে হতে কিছুই বাধে নাই।' মা একটু একটু হাসিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। একটু পরে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, কাল সকালে স্নান করে তৈরি থেক।'...

"পরদিন... দীক্ষার পর দুপুরবেলা আরামবাগের ডাঃ প্রভাকরবাবু হাতজোড় করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, 'দাদা, বেটা বাগদির পো যেন লাঠির জোরেই আদায় করলে গো। আমরা ব্রাহ্মণকুমার, আর কত মুনি-ঋষিরা স্তব-স্তুতি করে কত সাধ্য-সাধনা করে পান না। সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। দয়া যে কার উপর কখন কিসে হয়, তিনিই জানেন, দাদা।' "[৯]

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "১৩২৬ সালের বৈশাখের শেষে কোয়ালপাড়ায় সংবাদ পৌঁছিল যে, শ্রীমায়ের সেবিকা নবাসনের বউয়ের বৃদ্ধা মাতা তাঁহাদের বাড়িতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই এবং দেখাশোনারও লোক নাই। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীমা বৃদ্ধাকে কোয়ালপাড়ায় আনাইলেন এবং আরামবাগের ডাক্তার শ্রীযুত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিলেন; কিন্তু বৃদ্ধার আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছিল—দু-একদিনের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।... নবাসনের বউয়ের মা দেহত্যাগ করিলে প্রভাকরবাবু বিদায় লইতে আসিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, 'মা, সংসারে বড় যন্ত্রণা। কী করব! সংসার করে ফেলেছি। মা, আমাদের কিসে শান্তি হবে? সংসার মোটেই ভাল লাগছে না।' শ্রীমা চক্ষের জল ফেলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা বাবা, সংসারে কোন শান্তি নেই। ঠাকুর আছেন, রক্ষা করবেন তোমাদের।' "[১০]

১৩২৭ সালের আষাঢ় মাস। মায়ের লীলাসংবরণের কাল। কলকাতার উদ্বোধনে তিনি রোগশয্যায় শায়িত আছেন। "একদিন আরামবাগের প্রভাকরবাবু ও মণীন্দ্রবাবু আসিলে তিনি ক্ষীণস্বরে থামিয়া থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল আছ, বাবা? বাঁচব কি? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল।' তারপর দেশের খবর লইলেন, 'জল হয়েছে কি?' "[১১]

ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক চালচিত্র

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮ আশ্বিন ১৩০০ আরামবাগের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা ডাঃ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায় উদ্দীপিত ছিলেন। যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কথা আলোচনা হতো, সেখানেই তিনি হাজির হতেন। তাঁর গৃহে ঠাকুরের একাধিক পার্ষদ পদার্পণ করেছেন। এই পরিবারকে কেন্দ্র করে আরামবাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই বিশ শতকের শুরুতেই। সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় (সাতু মহারাজ বা স্বামী অসিতানন্দ), ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ বসু, রাসবিহারী গোস্বামী প্রমুখ। ঘাটাল-নিবাসী এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পণ্ডিত শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে অল্পবয়সে তাঁর বিবাহ হয়। প্রভাকর-জননী বরদাসুন্দরী ও সহধর্মিণী ব্রজেশ্বরীও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন।[১২]

প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা[১৩]

"আমি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত এই পরিবারের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। কারণ আমার পিতৃদেবের সময় হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সাধুর শুভাগমন আমাদের গৃহে ঘটিয়াছিল। আমি তখন খুব ছোট, সেইসময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সহিত আমার পিতৃদেবের পরিচয় হইয়াছিল। বোধহয় আরামবাগ হইয়া বেলুড় যাওয়ার পথে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আমার পিতৃদেবের সহিত চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বামী সুবোধানন্দজী কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার পিতৃদেবের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি সেইসময় হাই স্কুলের থার্ড ক্লাস অর্থাৎ বর্তমান অষ্টম শ্রেণিতে পড়িতেছিলাম। তিনি আমার ইংরেজি পড়া গ্রহণ করেন এবং বেলুড় মঠে যাইতে আমাকে আদেশ করেন। বাবা নিয়মিতভাবে 'কথামৃত' পাঠের স্থানে যোগদান করিতেন এবং তিনি যত্নসহকারে স্বামীজীর

গ্রন্থাদিও পাঠ করিতেন। আমি সেসময় নবম শ্রেণিতে পড়ি। আমার পিতৃদেবের প্রবল ইচ্ছা হয় যে, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একবার দর্শন করেন। আমি তাঁহাকে যুক্তি দিলাম—মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার দর্শন মিলিতে পারে। কারণ, এই সময় গিরিশবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'লুলিয়া' নামক নাটক অভিনীত হইতেছিল। কিন্তু আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম যে, গিরিশবাবু ঐদিন আসিবেন না। মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছি, এমন সময় যে তরুণ সন্ন্যাসীটি (খোকা মহারাজ—স্বামী সুবোধানন্দজী) আমার পড়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'তুমি বেলুড় মঠ গিয়াছিলে?' আমি বলিলাম, 'না।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় যাইও।' কিছুদিন পরেই পিতৃদেবের গিরিশচন্দ্র দর্শন হইল। চুঁচুড়ায় প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের দলসহ গিরিশচন্দ্র চুঁচুড়ায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত 'মিরকাসেম' অভিনীত হইয়াছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র মিরজাফরের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

"তাহার পরে আমি ডাক্তারি পড়িতে যাই ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের সময় বেলুড় মঠ দর্শনের সৌভাগ্য হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমি ডাক্তারি পাশ করিয়া আরামবাগে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করি। ইতোপূর্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইয়া কিছু কিছু সাধনভজন করি। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানাবিধ সৎ আলোচনা করি। সাতকড়ি আরামবাগের গভর্ণমেণ্টের উকিল স্বর্গীয় রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করা। বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে উৎসাহ দিলেন না বা কাহার নিকট যাইলে দীক্ষালাভ হইবে তাহাও বলিলেন না। দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইল, কিন্তু কাহার কাছে যাইব? কে আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে বা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে লইয়া যাইবেন? বিষম সমস্যায় পড়িলাম! এমন সময় একদিন উকিল ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় একটি লোক পাঠাইয়া জানাইলেন যে, বেলুড় মঠের একটি সাধু আপনার সহিত দেখা করিতে চান। আমি তৎপরতার সহিত ভূদেববাবুর বাসায় গেলাম ও সেই সাধুকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, 'অনেকদিন পূর্বে তোমাদের বাড়ি আসিয়াছিলাম ও তোমার ইংরেজি পড়া ধরিয়াছিলাম। তোমার বাবা পরলোক-গমন করিয়াছেন ও তুমি ডাক্তার হইয়াছ জানিলাম।' আমি তাঁহাকে বৈকালে আমাদের বাড়িতে চা পান করিতে ও রাত্রে আহার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বিশেষ একটি জরুরি রোগীকে দেখিবার জন্য আরামবাগের বাহিরে যাইতে হইল। সাধুসেবা করিবার জন্য আমার মাতৃদেবীর উপর ভার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম। সাধুজী আমার এই আচরণে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—'আমার সেবার জন্য যদি প্রভাকর তাহার দায়িত্বকর্মে অবহেলা করিত, তাহা হইলে আমি অসন্তুষ্ট হইতাম। তাহাকে বলিও আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছি এবং আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।'

"ইহার কিছুদিন পরে দৌলতপুর (পূর্ববঙ্গ)-নিবাসী একজন সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প করি। আরামবাগ হইতে দৌলতপুর যাওয়া সহজ নয়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু আরামবাগের উকিল বিনোদবিহারী রায়ের সহিত যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। আরামবাগ হইতে নৌকাযোগে রানীচক হইয়া যাইতে হয়; কিন্তু যাত্রাপ্রাক্কালে আমার অসহ্য কষ্ট হইতে লাগিল—কেন জানি না সহজে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিলাম না, মন যেন বিষাদে পূর্ণ! কোথায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করিব, সেই জায়গায় এক চরম অশান্তি? আমি যাত্রা স্থগিত করিয়া দিলাম। নৌকা বিনোদবাবুকে লইয়া ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কী আশ্চর্য, নৌকা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবার পরই স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলাম! ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ বেরা আরামবাগে আসিয়া আমার বন্ধু সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহার নিকটেই জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতেই আছেন। স্থির হইল যে, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতে হইবে। আষাঢ় মাস। তখন ধান্যরোপণ কার্য চলিতেছে। বন্ধুবর সাতকড়ি, সুধীরবাবু ও আমি যাত্রা করিলাম। সুধীরবাবু সেইসময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র, পূর্বে কখনো জয়রামবাটী যান নাই। দিক লক্ষ্য করিয়া বহু ঘুরপথে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। পরিশ্রান্ত দেহ! যাত্রা করিবার সময় আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করিয়া জল পান করিব। শ্রীশ্রীমার সেবক জ্ঞান মহারাজের নির্দেশমতো বাঁড়ুজ্যে পুকুরে স্নান করিয়া যেন প্রাণ পাইলাম বলিয়া মনে হইল। স্নান সমাপন করিবামাত্র শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে আহ্বান আসিল মাকে প্রণাম করিবার জন্য। প্রথমেই সাতকড়ি, পরে আমি ও তারপরে সুধীর শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিল। সাতু (সাতকড়ি) প্রণত হইয়াই শ্রীশ্রীমার পূত পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল। আমি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় মনে হইল—'কোন্ সাহসে ঐ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শ্রীচরণ স্পর্শ করার স্পর্ধা রাখি? মাত্র শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই সৌভাগ্যবান মনে কর! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-চরণ পূজা করিয়াছিলেন, সে-চরণ কি সামান্য জিনিস?' প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা যে-ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই মৃত্তিকার ধূলিমাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। সুধীরও ঐরূপ করিয়া প্রণাম শেষ করিল। আমরা ফিরিলে পর বাতাসা, জল প্রসাদ আসিল। খাইতে খাইতে মনে হইল—যাত্রাকালে আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ

দর্শন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিব। ক্লান্তি ও পথশ্রমে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কল্যাণময়ী জননী সে-কথা ভুলেন নাই। বেলা দুটায় আমরা প্রসাদ পাইলাম। মাখা দুধ-ভাত প্রসাদ আমাদের নিকট পৌঁছিল, সেই প্রসাদও আমরা ধারণ করিলাম। সেইসময় পুলিশের লোক গ্রামে নবাগত লোক আসিলে তাহাদের পরিচয় চৌকিদার মারফত জানিয়া লইতেন। জ্ঞান মহারাজের নির্দেশমতো কোয়ালপাড়া মঠে রাত্রিযাপন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলাম। রাত্রি কাটাইয়া আমরা কামারপুকুর আসিলাম। শ্রীধাম কামারপুকুর দর্শনান্তে আরামবাগ প্রত্যাবর্তন করিলাম। পরে থানা হইতে লোক আসিল এবং আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিল, আমরা জয়রামবাটী গিয়াছিলাম কিনা! থানার দারোগাবাবুর নিকট সকল কথা অকপটে বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে কী স্বর্ণবলয় দেখিলেন?' আমি বলিলাম, 'তাহা তো লক্ষ্য করি নাই!'

"আরো কিছুদিন পরের কথা। একদিন ভোরে সাতকড়ি আমায় ডাকিয়া বলিল যে, সে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের জন্য জয়রামবাটী যাইতেছে। আমি মনে মনে তাহার শুভকামনা করিলাম। দুইদিন পরে সাতকড়ি ফিরিল এবং হর্ষোৎফুল্ল মুখে তাহার পরম সৌভাগ্যের কথা জানাইল। আমার প্রাণের মধ্যে কী একটা আকর্ষণ অনুভব করিলাম! আমি তাহার কয়েকদিন পরই, হাঁড়িতে করিয়া কিছু মিষ্টি লাঠিতে লাগাইয়া কাঁধে উহা ঝুলাইয়া লইয়া জয়রামবাটী যাত্রা করিলাম। জয়রামবাটী পৌঁছিয়াই শুনিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের সেবক জ্ঞান মহারাজ জ্বরে শয্যাগত এবং শ্রীশ্রীমা তাঁহার জন্য বড়ই চিন্তিত। তিনি বলিতেছেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরই আরামবাগ হইতে ডাক্তার আনাইয়া দিয়াছেন।' আমি অবিলম্বে নিকটবর্তী জিবটা গ্রাম হইতে ঔষধাদি আনাইয়া জ্ঞান মহারাজের চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। জ্বর ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল ও পরে ছাড়িয়া গেল। শ্রীশ্রীমায়ের আর কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই, বাড়ির ছেলেরা যেমন তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন, তেমনই দর্শনলাভ করিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বর যাত্রাপথের বিবরণ সব শুনিতে লাগিলাম। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত ঘাটাল-নিবাসী পণ্ডিত শিরোমণি* বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শ্বশুর। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, 'তুমি আমার শিবুর জামাই? শিবু আমার বড় ভাল ছেলে।' আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

"এইভাবে দিন যায়। একদিন সসঙ্কোচে মায়ের নিকট নিবেদন করিলাম, 'মা, আমায় কৃপা করিতে হইবে।' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি? মন্ত্র নেবে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মা।' শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল হইবে, তোমার মন্ত্র আমার নিকট আছে। পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান সমাপন করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজান্তে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে মা আদেশ করিলেন গায়ত্রী জপ করিতে। গায়ত্রী জপকালে ব্রহ্মসাধনার ভাবই উদিত হইল। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও জপপ্রণালী উপদেশ করিলেন। আমি কৃতার্থ হইয়া পরম শান্তিলাভ করিলাম।

"এরপর দয়াময়ী শ্রীশ্রীমা লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইয়া যে নবলীলা মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিয়া উপসংহার টানিতে পারিতেছি না। মায়ের লীলাসংবরণের বছর বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার সময় হাজির হইয়াছিলাম। সেখানের পূজাদর্শনান্তে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সাধারণভাবে জয়রামবাটীতে মায়ের ঘরে ঢুকিলেই যে-স্বরে মা ডাকিতেন — 'প্রভাকর', (আমি উত্তর দিতাম, 'যাই মা') সেই অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চমকিত হইয়া উপরে গেলাম। প্রভু সারদানন্দজী পশ্চিমাস্য হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি প্রণত হইলে শ্রীশ্রীমা যেমন করিয়া আশীর্বাদ করিতেন ও চুমা খাইতেন ঠিক সেইরূপ করিয়া আশীর্বাদ ও মুখচুম্বন করিলেন; বলিলেন, 'আর এ-চোখে দেখা পাবে না, তপস্যা কর, যেমন আমাকে দেখছ, তেমনি দেখতে পাবে।' ভিতরে শ্রীশ্রীমা, বাহিরে শ্রীশ্রীসারদানন্দজী—ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" ❑

* শিবনারায়ণবাবু 'শিরোমণি' উপাধি পেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

১ ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শী ও বন্ধু-পত্নী হরিভামিনী গোস্বামীর (৯৮ বছর বয়সে ২০ শ্রাবণ ১৪১০ প্রয়াতা হন) কাছ থেকে প্রাপ্ত।
২ ঐ
৩ ঐ
৪ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ১১শ সং, পৃঃ ৯২
৫ ঐ, পৃঃ ৯৩
৬ ঐ, পৃঃ ১৮৪
৭ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ৩য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭, পৃঃ ৭২৬
৮ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৩-১০৬
৯ ঐ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮
১০ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ২৩৪-২৩৫
১১ ঐ, পৃঃ ৩৮৭
১২ ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ভবতারিণী দেবীর সূত্রে প্রাপ্ত।
১৩ যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, লিলুয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'শ্রীমা সারদা'-এর বৈশাখ ১৩৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ঐ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ সন্ত রামদাস

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যায় 'পরাধীন জাতিকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সমর্থ রামদাস' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু নিবেদন। পৃথিবীর সমস্ত মিস্টিক সাধকের জীবন-কাহিনীকে তাঁদের ভক্তরা 'মিথ'-এর জড়োয়া গহনায় এমনভাবে মুড়ে দেন যে, তাতে আসল মানুষটি ঢাকা পড়ে যান। বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য—সকলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীরামকৃষ্ণ। তার কারণ, তিনি এমন একটা যুগে জন্মেছিলেন যখন মানুষকে যাচাই করা হতো যুক্তির কষ্টিপাথরে। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর ভক্ত ছিলেন না। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে আস্তিক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নাস্তিকও। তাঁর ধর্মমতকে সকলে মেনে না নিলেও তাঁকে বরিষ্ঠ মহাপুরুষরূপে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ দ্বিধা করেননি। তাছাড়া গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনী রচনার সূত্রপাত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনীতে মিথের দৌরাত্ম্য নেই।

ধান ভানতে মহীপালের গীত গাইতে হচ্ছে এইজন্য যে, লেখক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামদাসের জীবনের অনেক মিথ ও মিরাকল শুনিয়েছেন, যেগুলি সম্ভবত সংগৃহীত হয়েছে ১৮শ শতকের মারাঠি কবি মহীপতির 'সন্তবিজয়' (ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে 'Stories of Indian Saints' নামে, অনুবাদক Justin E. Abbot ও Narhar R. Godbole) কাব্য থেকে। মহারাষ্ট্রের সন্তদের জীবনকাহিনী কাব্যটির উপজীব্য। ঐতিহাসিকেরা গ্রন্থটিকে গুরুত্ব না দিলেও কেউ কেউ একে প্রামাণিক ভেবেছেন, যেমন ভেবেছেন বিচারপতি ও ঐতিহাসিক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। তিনি তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় এমন সব কথা বলেছেন, যার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। প্রথমত তিনি জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকারামের সঙ্গে রামদাসকে একাসনে বসিয়ে মারাঠি ভক্তি আন্দোলনের বিচার করেছেন, যদিও এঁদের ধর্মমতে বিভিন্নতা ছিল। তিনি এঁদের সুন্দর করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানদেব intellectualistic, নামদেব democratic, একনাথ synthetic, তুকারাম personalistic এবং রামদাস activistic। এঁদের temperament-এও প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়ত, রাণাডে মারাঠার ভক্তি আন্দোলনকে তুলনা করেছেন ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সঙ্গে। তাঁর মতে, এই ধর্মান্দোলন নাকি ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে, কেতাবী বিদ্যার বিরুদ্ধে, ধ্রুপদী ভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে। রাণাডের একথা খাটে একমাত্র 'বারকরি' আন্দোলন সম্পর্কে। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, ক্যাথলিক চার্চের সন্ন্যাসীরা যে-সুবিধা ভোগ করতেন, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের সে-সুবিধা ছিল না। তাছাড়া ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের মতো এখানকার ব্রাহ্মণরা সংগঠিত শ্রেণি (organised class) ছিলেন না। মহারাষ্ট্রে এমন কোন বড় জমিদার ছিল না, যার বিরুদ্ধে আর্থিক কারণে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। রাণাডে মারাঠি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ধর্মমতকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলে ভুলের ফাঁদে পড়েন। ঐতিহাসিকের ভাষায় : "His approach to the subject was synthetic, but not analytical."

রাণাডে পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না, ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা। সে-কারণে তাঁর আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আলেকজাণ্ডার ডাফ বলেছিলেন, মহারাষ্ট্রের উত্থান সহ্যাদ্রি-অরণ্যের দাবানলের মতো এক আকস্মিক ঘটনা। এই মতের প্রতিক্রিয়া শোনা যায় রাণাডের কণ্ঠে। তাঁর মতে, এই উত্থান আকস্মিক নয়, বরং এর পিছনে আছে বেশ কিছু ঘটনা—যার অন্যতম ধর্মীয় আন্দোলন। রাণাডের চেয়ে আরো উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন রাজওয়াড়ে। তিনি রাণাডের কথার প্রতিবাদ করে বলেন যে, অন্য ধর্মগুরুরা নন—একমাত্র রামদাসই ছিলেন শিবাজীর প্রত্যক্ষ উৎসাহদাতা। রামদাস শিবাজীর রাজনৈতিক গুরু—এই বহুল প্রচলিত কিংবদন্তিকে সমর্থন করে তিনি বললেন, রামদাসই 'বারকরি'কে 'ধারকরি'তে পরিণত করেছেন। বারকরিরা মূলত ভক্তিমার্গের পথিক, যাঁরা বছরে দুবার নিয়ম করে পান্ধারপুরে বিঠ্‌ঠল-মন্দিরে যান। এইসব তীর্থিকদের রামদাস নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ সহিষ্ণুকে করেছেন জয়িষ্ণু। পান্ধারপুরের স্থাণু দেবতা নন, গতিশীল হনুমান তাঁর উপাস্য। রামদাসকে শিবাজীর গুরু-রূপে জোরদার প্রচার তিনিই শুরু করেন। অবশ্য তাঁরও কিছু সমর্থক ছিল। রাজওয়াড়ের মতের ভিত্তি হলো নব আবিষ্কৃত ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'Wakenisi Tippan' নামের পুঁথি, যাতে লিপিবদ্ধ আছে রামদাসের জীবনের কিছু ঘটনা। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প। ইতোমধ্যে রাণাডের জীবদ্দশাতেই তাঁর মতকে চ্যালেঞ্জ জানান সি. জি. ভাটে। রামদাসের ইংরেজি জীবনীকার রেভারেণ্ড ডেমিং ও রেভারেণ্ড অ্যাবটও বলেছেন, তাঁর ধর্মমতের প্রভাব "Primarily spiritual and only secondarily political." (দ্রঃ Social Contents of Indian Religious Movements—Edited by S. P. Sen, p. 155)

লেখক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামদাসের যে 'দাসবোধ' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, সেটি "Neither a political testament nor a philosophy of history, but a work of religious instruction." (Ibid., p. 156) শিবাজীর সঙ্গে রামদাসের সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল তা এক বিতর্কিত বিষয়। শেষপর্যন্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হলো যে, সে-সাক্ষাৎকার ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নয় অর্থাৎ শিবাজী যখন অমিততেজে বিরাজ করছেন মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশে। তাছাড়া শিবাজীর গুরু কেবল রামদাস ছিলেন না, ছিলেন মৌনী বাবা বা বাবা ইয়াকুৎও। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মগুরুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন রামদাস। সে-কারণে ঐতিহাসিক আর. ডি. রাণাডে তাঁকে তুলনা করেছেন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের সঙ্গে। (দ্রঃ Mysticism in Maharastra, p. 20) 'সমর্থ' নামের এক পৃথক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস। তাঁর মত ও পথের প্রচারের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রে ও তার বাইরেও অনেক মঠ ও মন্দির গড়ে তোলেন, যদিও তাঁর ধর্মমত সীমাবদ্ধ ছিল মহারাষ্ট্রের চতুঃসীমায়। তুলনায় জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ বা তুকারামের প্রভাব ছিল অনেক গভীর ও ব্যাপক।

শিবাজী ও রামদাসের সম্পর্কটা তাহলে কেমন ছিল? ঐতিহাসিকের ভাষায় : "Both Ramdas and Shivaji worked in

their own ways for a common cause, namely, the creation of a Maratha nation, and to that extent they assisted each other indirectly." (দ্রঃ Social Contents of Indian Religious Movements, p. 157) গজেন্দ্র গাদকরও বলেছেন, তাঁদের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক। তবে রামদাসের শেষ জীবনের রচনায় যে কিছু রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ পড়েছে তা স্বীকার করেছেন তিনি। (দ্রঃ Cultural Heritage of India, Vol. IV, p. 359) Jolly-র মতে, এই রাজনৈতিক চিন্তার পিছনে সক্রিয় ছিল রামদাসের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। রামদাসের জন্মলগ্নে মহারাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটছিল, তারই আংশিক প্রভাব তাঁর রচনায় পড়া অস্বাভাবিক নয়। তবুও তাঁকে 'Political philosopher' বলা যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেকালের বাংলার বিপ্লববাদীরা। পরবর্তী কালে তাঁদের অনেকে যোগ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে। তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের 'Political Guru'। আসলে তাঁরা ছিলেন 'Spiritual Guru', রামদাস যেমন ছিলেন শিবাজীর।

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

কেশাপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯

প্রসঙ্গ 'মাতৃতীর্থপরিক্রমা'

'উদ্বোধন' পত্রিকা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর দেহস্বরূপ। তাঁদের অশেষ কৃপায় ও অদৃশ্য নির্দেশে ভক্তপ্রাণ শ্রীনির্মলকুমার রায় এই পত্রিকার পাঠকদের তাঁর সঙ্গে নিত্য মাতৃতীর্থপরিক্রমার সুবর্ণ সুযোগ দান করছেন এবং অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হচ্ছেন। এতে একদিকে পাঠকবর্গের ঐসকল তীর্থস্থান চাক্ষুষ দর্শনের আগ্রহ বাড়ছে, অপরদিকে অপারগদের পঠনের মাধ্যমে তৃপ্তিসাধন হচ্ছে। নির্মলবাবুকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন।

সুনীলকুমার রুদ্র

আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০ ০৫৭

আমরা আহত!

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীমতী জয়িতা লাল লিখিত 'শৈবতীর্থ উনকোটি' ভ্রমণকাহিনীর ৮ম পরিচ্ছেদে একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমি বদরপুর রেলওয়ে হেড কোয়ার্টারের একজন অবসরপ্রাপ্ত গার্ড এবং এই সুপ্রাচীন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হিসাবে এর প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

লেখিকা তাঁর রচনাটিতে উল্লেখ করেছেন : "শোনা গেল, পথে শালখিরা নামে একটি জায়গা আছে, সেখানে প্রায়ই ডাকাতি ও লুটপাট হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডের সহযোগিতাতেই এই কাজকর্ম হয়।" আমার বোধগম্য নয়, লেখিকা কোথায় এবং কাদের কাছ থেকে এই মিথ্যা তথ্য পেলেন। অতি পরিতাপের সঙ্গে জানাই, অদ্যাবধি এই ধরনের ঘটনা সরকারি বা বেসরকারি কোন স্তরেই স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়। সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ে সারা ভারত জুড়েই আজ এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় রেলের অনেক কর্তব্যরত কর্মীকে অকালে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছে। এই ব্যাপারটি একান্তভাবেই আইনশৃঙ্খলার অন্তর্গত। একটি বিশেষ শ্রেণি, যারা কপালের ঘাম ঝরিয়ে দিবারাত্রি ভারতীয় রেলের এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সচল রেখেছেন, তাঁদের উদ্দেশে এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অভিযানকান্তি মজুমদার

করিমগঞ্জ, অসম-৭৮৮৭১০

লেখিকার উত্তর

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শৈবতীর্থ উনকোটি' রচনাটিতে যে আমি লিখেছিলাম—শিলচরগামী ট্রেনে শালখিরা নামক স্থানে ডাকাতি ও লুটপাট হয়, তা আমার সহযাত্রীরাই বলছিলেন। দেখলাম, বদরপুর স্টেশন পার হতেই সকল যাত্রী একটা কামরাতেই চলে এলেন এবং সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় মানুষই বেশি ছিলেন। তাঁরাই বললেন, ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডের সহযোগিতাতেই এই ডাকাতি হয়। কেননা, অন্য সময় ট্রেন দ্রুতগতিতে চললেও এই স্থানটিতে এসেই হঠাৎ মন্থর হয়ে যায়। দেখলামও তাই। অবশ্য ভাগ্য ভাল বলে আমাদের ঐ দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। যাই হোক, রেল কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীদের আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু যা ঘটেছে এবং স্থানীয় মানুষের মুখে শুনেছি—তারই উল্লেখ করেছি। এতে যদি কেউ মনে আঘাত পেয়ে থাকেন, তবে তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে আরেকটি তথ্য আমার অনবধানতার জন্য ভুল হয়ে গেছে। আমি লিখেছিলাম, শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে করিমগঞ্জ যেতে শুকতালের কাছে বরাক নদী পার হতে হলো। নদীটির নাম বরাক নয়—কাতাখাল।

জয়িতা লাল

গল্ফ গ্রিন, কলকাতা-৭০০০৯৫

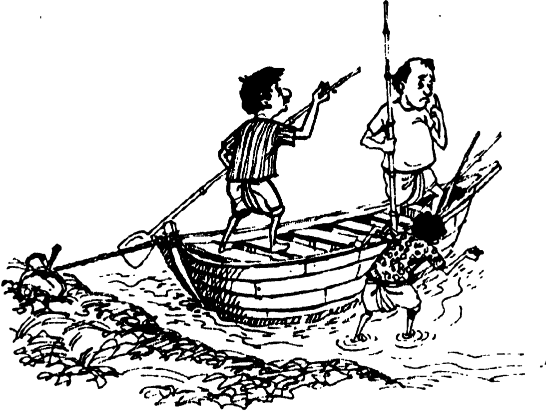
প্রসঙ্গ ধর্ম

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যায় 'সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর' পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এতে প্রকাশিত অনেক কিছুই অজানা ছিল। ইতোপূর্বে আমি দুবার মহীশূর ভ্রমণ করেছি, বৃন্দাবন গার্ডেনেও গিয়েছি; কিন্তু কোন গাইড কখনোই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সম্পর্কে অবহিত করেননি, ফলে সে-আশ্রম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়নি। আমি যেখানেই ভ্রমণ করি, অবশ্যই সেই স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শনে সচেষ্ট হই। মহীশূরের মহারাজার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও মহীশূরবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বীজ থেকে যে মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছে মহীশূরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে, তার সুফল ভোগ করছে অগণিত মানুষ। বিদ্যাদান থেকে শুরু করে কারিগরি শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মযোগের মাধ্যমে সমাজ ও দেশ-সেবা এক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী কথিত জীব-রূপী শিবসেবা। এই কর্মকাণ্ডে জড়িত সকলেই আমাদের প্রণম্য।

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১

'কথামৃত' পরিচয় ঃ ছবি ও ছন্দে



নোঙর ফেলে দাঁড় টানা

সে এক মাঝির দল,
নৌকা ভাসিয়ে নদীপথ বেয়ে
যারা করে চলাচল।
একদিন তারা রাত্রিবেলায়
নৌকা কিনারে ঠেলে
সেটিকে বাঁধতে পাড়ের মাটিতে
নোঙরটি দেয় ফেলে।
পরদিন ভোর হতে,
নৌকা ছাড়তে তারা আর দেরি
করল না কোনমতে।
যথারীতি ঐ মাঝিদের দল
দাঁড়টানা শুরু করে,
কিন্তু হায়রে, নৌকাটা যদি
একটুখানিও নড়ে!
নড়বে বা কেন? নোঙর তুলতে
মাঝিদের হলো ভুল,
তাই তো নৌকা দাঁড়ের টানেতে
আগায় না একচুল।



ঠাকুর বলেন, মাঝিদের মতো
আমাদেরও একই দশা,
ঈশ্বরে নয়, সংসারেতেই
ষোল আনা মন বসা।
তাই মালা জপি, শাস্ত্রও পড়ি,
মেলে না কিছুই ফল,
সংসারে পুরো আসক্তি রেখে
কি করে তা হবে বল?

ছবি ঃ সৌরীশ মিত্র

ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়



আদি শঙ্করাচার্য (৩৩)

কিছুক্ষণ ধ্যানের পর আচার্য শঙ্কর মুখ খুললেন।



আচার্যের এই ঘোষণায় উপস্থিত পুরোহিত ও জনসাধারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

চিল্কা হ্রদের তীরে বটগাছের নিচে শুরু হলো মাটি খোঁড়ার কাজ।



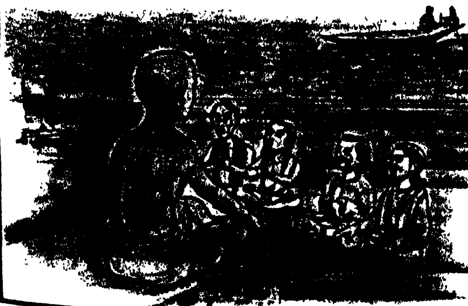
মহাসমারোহে রত্নপেটিকা পুরীর শ্রীমন্দিরে আনা হলো। ধূমধামের সঙ্গে, হাজার হাজার নরনারীর জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো।



আচার্য এবার এলেন বারাণসীতে—প্রায় বারো বছর পর। শিবের অবতার আচার্য শঙ্করের আগমনে বিশ্বনাথের মন্দির ভাবে গাম্ভীর্যে গমগম করতে লাগল। আচার্য ধ্যানের পর করলেন স্তোত্রবন্দনা।



আচার্য গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রতিদিন মানুষ নানা প্রশ্ন নিয়ে ও উপদেশলাভের জন্য আচার্যের কাছে আসতে লাগল। হিন্দুধর্মের মধ্যে মত ও পথের সে কত বিচিত্র ধারা! আচার্য সকলের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করে মূল বেদান্ত-তত্ত্বে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন।



বারাণসী থেকে আচার্য এবার এলেন মধ্যভারতের উজ্জয়িনীতে। মহাকালের মন্দিরে প্রণাম করে তিনি মন্দিরের বিশাল মণ্ডপে এসে বসলেন। আহ্বান করলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদকে।



চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু

বি জ্ঞা ন

রাসায়নিক দূষণ

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুকুরের জলে ফলিডল মেশানোর কথা মাঝেমধ্যে শোনা যায়। ফলিডলের বিষক্রিয়ায় পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হয়। ফলে জলজ প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও জলের ওপর ভেসে ওঠে। যেকোন প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাঁচতে হলে তার উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে বা কলুষিত হলে জীবজগতের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জেনেছি অনেক, বুঝেছি অনেক, তুলনায় সচেতন হয়েছি খুব কম। গল্পে আছে, কালিদাস গাছের যে-ডালটি কাটছিলেন, সেই ডালেই নাকি বসেছিলেন। আমাদের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। যে-পরিবেশে আমরা বাস করি —সেই পরিবেশকে আমরাই দূষিত করে তুলছি!

যেদিন পৃথিবী নামক গ্রহটি সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই এই গ্রহের ভিতরে ও চারপাশে পরিবেশ বিদ্যমান। সেই পরিবেশের অনেক রূপান্তর ঘটেছে ঠিকই, তবে তা ঘটেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের তেমন কোন হেরফের হয়নি। আধুনিক সভ্যতায় সভ্য মানুষের হাতে পরিবেশের যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। যেসব কারণে বর্তমানে স্থল, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি দূষিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি কারণ মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার।

আধুনিক সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে রাসায়নিক শিল্পকে অস্বীকার করা যায় না। খাদ্যবস্তু, প্রসাধন, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু, কৃষিক্ষেত্র, যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক পদার্থ। এমনকি চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও ভেষজ ওষুধের জায়গায় এসেছে রাসায়নিক পদার্থে তৈরি ওষুধ। উন্নত জীবনধারণের জন্য অত্যধিক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কুফল সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা এখনো এর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারিনি। রাসায়নিক দূষণ নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের যেদিন জন্ম হয়েছিল, সেদিন কি আমরা আদৌ ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনই আমাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে? পরিবেশ এবং আমাদের জীবনের ওপর এর প্রভাব সম্বন্ধে সেদিন আমরা কতটা সচেতন ছিলাম—সে-ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়।

পৃথিবীর কয়লা ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে। তবু এখনো পৃথিবীতে যে-পরিমাণ কয়লা পোড়ে, তা থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস, সঙ্গে মুক্ত কার্বন পরিবেশকে দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। এইসব বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের শ্বসনতন্ত্রের, বাড়ছে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি নানা রোগ। এছাড়াও এইসব বিষাক্ত গ্যাস বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে নেমে আসার ফলে জলজ প্রাণী, কংক্রিটের দেওয়াল, বনভূমি প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করছে।

কলকারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্যপদার্থ ইদানীং প্রায়শই প্রকৃতির সঙ্গে মিশছে। এইসব বর্জ্যপদার্থের মধ্যে একটি হলো ধাতব পদার্থ। এইসব ধাতব পদার্থ যে শুধু কলকারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকেই নির্গত হয় তা নয়, যানবাহন, গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি থেকেও অনবরত নির্গত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশে যে 'ধাতব দূষণ' হচ্ছে তা সকলের অগোচরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলছে।

নানাভাবে এইসব ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। এদের অনেকগুলিরই শরীরে সামান্যতম সঞ্চয়নে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতুগুলি আমাদের প্রয়োজনীয় হলেও শরীরে এর



পথ ঢেকে যায় প্লাস্টিক বর্জ্যপদার্থে

আধিক্য ঘটলে দেখা দেয় নানা রোগের উপসর্গ। অপরদিকে সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক প্রভৃতি ধাতুগুলির সামান্য পরিমাণই শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। মূলত জল ও মাছের মাধ্যমে এগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এখন দেখা যাক, এইসব ধাতু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

সীসা ঃ সীসা বা লেড খাদ্য, পানীয়, জল এবং যানবাহন থেকে উদ্ভূত গ্যাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এই ধাতুর অল্প পরিমাণই আমাদের শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রভাবে রক্তাল্পতা, মানসিক বিকার, মস্তিষ্ক শোথ (cerebral aedema), এনসেফালোপ্যাথি, বৃক্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস প্রভৃতির মতো নানা রোগ দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রঙ শিল্পে, ব্যাটারি শিল্পে ও ছাপাখানায় সীসা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পারদ ঃ পারদ বা মার্কারি শরীরে সঞ্চিত হলে এর বিষক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বাগ্‌বৈকল্য, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মদান প্রভৃতি হতে পারে। পারদের বিষক্রিয়ায় জাপানের মিনামাটি ও নাগাটা গ্রামে যেমন শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছিল। এমন ঘটনা ঘটেছিল সুইডেন, ইরাক, গুয়াতেমালা, ঘানা ও ভারতের ভূপালেও।

ক্যাডমিয়াম ঃ এই ধাতুর প্রভাবে বৃক্ক-ধমনীতে কাঠিন্যের সৃষ্টি (renal arterioselerosis) হতে পারে। দেখা দিতে পারে ধমনীতে উচ্চচাপজনিত রোগ ও ক্যান্সার। গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে এই ধাতুর প্রবেশ ঘটলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

ক্রোমিয়াম ঃ শরীরে এই ধাতুর সঞ্চয়ন আলসার বা বিভিন্ন ক্ষতরোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তামা ঃ শরীরে রক্তোৎপাদী কোষ বৃদ্ধির জন্য তামার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত তামা শরীরে প্রবেশ করলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এর বিষক্রিয়ায় পাণ্ডুরোগ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ হতে পারে, এমনকি চেতনা-হীনতার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।

দস্তা ঃ অতিরিক্ত দস্তা বা জিঙ্ক বিপাককার্য ব্যাহত হয়।

অ্যালুমিনিয়াম ঃ তবক দেওয়া সন্দেশ খাওয়ার চল আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই আছে। আগেকার দিনে তবক হিসাবে ব্যবহৃত হতো রুপোর পাতলা স্তর। কিন্তু বর্তমানে রুপোর পরিবর্তে অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা স্তর। শরীরে এই ধাতুটির অধিক সঞ্চয়নের ফলে দেখা দিতে পারে 'অ্যালজাইমা' রোগ।

এ তো গেল ধাতু-দূষণের কথা। এছাড়াও আছে আরো নানাধরনের রাসায়নিক দূষণ। আধুনিক সভ্যতায় ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেশিন, প্লাস্টিক, রঙ, ফোম, তাপনিরোধক প্রভৃতি নানা শিল্পে এই পদার্থটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। বর্তমানে বায়ুস্তরে এই যৌগটির উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করছে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি—যার ক্ষতিকর প্রভাবগুলির একটি হলো ত্বকের ক্যান্সার।

আর্সেনিক দূষণের কথা আজ আর কারো অজানা নয়। ভূগর্ভস্থ জল অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তোলনের ফলে পানীয় জলে আর্সেনিক বিষের উপস্থিতি বহু অঞ্চলেই দেখা যাচ্ছে। এর প্রভাবে চর্মরোগ এবং ক্যান্সারের কথা আজ সর্বজনবিদিত। আর্সেনিক-ঘটিত কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার এবং মিশ্রিত পাথরের স্তর থেকে জল তোলার ফলেও পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ দেখা দিতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক বিষ অর্থাৎ পেস্টিসাইডের প্রয়োগ ব্যাপক। এর প্রতিক্রিয়ায় মারা পড়ছে কীটপতঙ্গের দল। ফলে পরাগসংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি কৃত্রিম উপায়ে পরাগসংযোগ ঘটাতে হয়, তবে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বৃষ্টির জলে এইসব কীটনাশক ধুয়ে নালা-নর্দমা দিয়ে গিয়ে পড়ছে খাল-বিল-নদীতে এবং সেখান থেকে সমুদ্রে। এর বিষক্রিয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে বহু প্রজাতির মাছ। চ্যাং, ন্যাদশ, খলসে ইত্যাদি মাছের আকাল এই কারণেই। শস্যদানা এবং মাছের মাধ্যমে এই বিষ প্রবেশ করছে আমাদের শরীরেও। দেখা দিচ্ছে কিডনি, স্নায়ু, পরিপাকতন্ত্রের নানাবিধ জটিল রোগ। রাসায়নিক কীটনাশকের পাশাপাশি জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক সার। এর প্রয়োগে ফলনবৃদ্ধি হলেও ভবিষ্যতে জমির উর্বরতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রঙের বাহার যেন আমাদের পেয়ে বসেছে! সর্বত্র রঙের সমারোহ না দেখলে আমরা বোধহয় খুশি হতে পারি না!

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ শ্রাবণ ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

একাদশী-তিথি ঃ ১২, ২৬ শ্রাবণ
বুধবার, বুধবার
(২৮ জুলাই, ১১ আগস্ট ২০০৪)

রঙের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের খাদ্যবস্তুতেও। সতেজ দেখাবার জন্য আনাজপত্র রঙ-জলে ডোবানো এখন প্রাত্যহিক ব্যাপার। মাছের কানকো লাল করার জন্য ব্যবহৃত হয় লাল রঙ। আনারসকে হলুদ রঙে চুবিয়ে করা হয় আকর্ষণীয়। ইদানীং মিষ্টির দোকানে রঙের ছড়াছড়ি। অনেক খুঁজলে তবে বর্ণহীন মিষ্টি পাওয়া যায়। খাদ্যবস্তুতে যেসব রঙ ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো মেটানিল ইয়েলো, কঙ্গো রেড, ওনিয়ন ইয়েলো, কপার সালফেট, অরেঞ্জ-১ ও ২, মিথাইল ভায়োলেট, সুদান-২ ও ৩, লেড ক্রোমেট, আয়রন অক্সাইড ইত্যাদি। এই সবকটি রঙই খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এগুলি সবই শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।

মেটানিল ইয়েলো ঃ প্রধানত হলুদ রঙের জন্য ব্যবহৃত এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে বাজারে 'কেশরি রঙ' নামে চালানো হয়। ডাল, ছাতু, বেসন, শোনপাপড়ি, বোঁদে, লাড্ডু, মিহিদানা, জিলাপি, চানাচুর প্রভৃতি খাদ্যবস্তুতে এই রঙের ব্যবহার অত্যধিক। এই রাসায়নিক পদার্থটির প্রভাবে রক্তে নিউট্রোফিল ও ইয়োসিনোফিল কণিকার মাত্রা কমে যেতে পারে, কোষবৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কঙ্গো রেড ঃ বিভিন্ন খাদ্য, পানীয়, মাছের কানকো প্রভৃতিকে লাল রঙ করার জন্য এই বিষাক্ত রঙটি ব্যবহৃত হয়। এর বিষক্রিয়ায় রক্তের প্রোটিন ও অ্যালবুমিনের মাত্রা কমে যায়, গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়।

ম্যালকাইট গ্রিণ ঃ এই বিষাক্ত রঙটি ব্যবহৃত হয় সবুজ রঙ করার জন্য। খাদ্যবস্তুর সঙ্গে দীর্ঘদিন এই রঙ শরীরে গেলে গর্ভধারণ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। কমে যেতে পারে হৃৎস্পন্দনও। এছাড়াও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বৃক্ক, যকৃত প্রভৃতির স্বাভাবিক কাজ। এই রঙের প্রভাবে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরোমাত্রায়।

রোডামিন বি ঃ বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয়কে আকর্ষণীয় গোলাপি রঙ করার উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে এই রঙটি ব্যবহার করা হয়। এর প্রভাবে বৃক্ক ও যকৃতের ক্ষতি ছাড়াও ক্যান্সার দেখা দিতে পারে।

অরেঞ্জ-২ ঃ নাম থেকেই বোঝা যায় এই রাসায়নিক পদার্থটির সাহায্যে কমলা রঙ করা হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রায়শই আমাদের শরীরে যায়। এই রঙের প্রভাবে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা ধরনের উপসর্গ। এর মধ্যে আছে রক্তে লোহিতকণিকা কমে যাওয়া, যকৃত ও প্লীহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি।

ব্লু-ভি আর. এস. ঃ এই পদার্থটির সাহায্যে লাল রঙ করা খাদ্য ও পানীয় শরীরে গিয়ে ক্যান্সারের মতো রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়াও এর প্রভাবে যকৃতের ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

মুড়ির সঙ্গে ইউরিয়া প্রায়শই আমাদের শরীরে যাচ্ছে। এটি শরীরে জমে কিডনির অসুখ হতে পারে। এটা সকলে জানলেও কি এব্যাপারে আমরা সচেতন হতে পেরেছি? বরং যত দিন যাচ্ছে, মুড়ি শিল্পে ইউরিয়ার ব্যবহার তত বাড়ছে।

মশা তাড়ানোর ধূপে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তার কুপ্রভাব আজ সর্বজনবিদিত।

সিন্থেটিক পলিমারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক এখন অপরিহার্য। ফলে পৃথিবী জুড়ে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিকের পাহাড়। এগুলি bio-decomposable নয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে এগুলির বিনাশ নেই। এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে—এমন সাবধানবাণী পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগেই শুনিয়েছেন।

রাসায়নিক দূষণের কথা আরো অনেক আছে। এই স্বল্প পরিসরে সবগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। যেটুকু আলোচিত হলো তা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞানের অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারই এই সঙ্কটের কারণ। এর থেকে রেহাই পেতে গেলে প্রয়োজন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সচেতনতা ও পরিকল্পনা। ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩৪

পাশাপাশি ঃ (১) হরমোহন, (৩) কাশীনাথ, (৬) গোলাপ, (৭) মত, (৮) সরল, (৯) রাখাল, (১০) চার, (১১) আম, (১২) মঙ্গল, (১৫) কমল, (১৬) গৌরী, (১৭) মেথর, (১৮) নীলাম্বর, (১৯) বুড়ো গোপাল।

ওপর-নিচ ঃ (১) হরিপ্রসন্ন, (২) নবগোপাল, (৩) কালীপদ, (৪) নাটমন্দির, (৫) বলরাম, (১০) চালকলা, (১১) আহিরীটোলা, (১২) মথুরবাবু, (১৩) নীলকমল, (১৪) রামেশ্বর।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, সরোজকুমার দাস, পার্বতী দাস, রমা রায়চৌধুরী, রুনা রায়চৌধুরী, অর্চনা বেরা, নন্দদুলাল ঘোষ, কল্পনা চৌধুরী, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, রমণীমোহন বর্মন, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পরেণু হালদার, স্বপনকুমার গাঙ্গুলী, অনিমা ঘোষ, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, রঞ্জু ঘোষ, গদাধর রাণা, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, অনিলেশ বসু, শশাঙ্ক অধিকারী, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত।

গ্রন্থ পরিচয়......

গীতার প্রাঞ্জল অনুবাদ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সহজ পাঠ • লেখক : ডঃ কমলকুমার ঘোষ • প্রকাশক : লেখক, পোঃ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪ • মূল্য : ২০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৬+২১০ • প্রকাশকাল : ১৯৯৩

গীতা ভারতবাসীর নিত্য জীবনসঙ্গী। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ কোন্‌টি—এই প্রশ্ন উঠে এলে গীতার নামই প্রথমে উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের বাইরে প্রতীচ্যের নানা দেশে গীতা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। আর ভারতবর্ষে গীতার ব্যাখ্যা বিভিন্ন গুণিজন কতভাবেই না করেছেন! ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে গীতার অনুবাদও হয়েছে; আমাদের বাঙলা ভাষায়ও হয়েছে। তবে সেই-সব অনুবাদ গীতোক্ত বাণী ও তত্ত্বকে পরিচ্ছন্নভাবে এবং মূল সংস্কৃতের নির্যাসকে অনেকাংশেই তুলে ধরতে পারেনি। পেশায় চিকিৎসক ডাঃ কমলকুমার ঘোষ গীতার বঙ্গানুবাদ এবং তার পাশাপাশি গীতার তত্ত্বকেও ব্যাখ্যা করে **'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সহজ পাঠ'** গ্রন্থটি রচনা করেছেন।



আমরা জানি—"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।/ পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"—সব উপনিষদ্ যেন গাভীর সমষ্টি, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকারী, অর্জুন বৎস, মহৎ গীতামৃত হলো গাভীর দুগ্ধ এবং সুধীজন সেই দুগ্ধের পানকর্তা। আসলে উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু গীতার পরিধি আরো ব্যাপক। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতায় সব শাস্ত্রের যেমন সারমর্ম রয়েছে, তেমনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে সাংসারিক কর্তব্যকর্মের নির্দেশ রয়েছে, সকল সাধনার পরম মিলন দেখানো হয়েছে, দর্শনের সঙ্গে কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। তাই আমাদের জীবনে গীতার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই অভিজ্ঞানই ডাঃ ঘোষকে সহজ, সরলভাবে গীতার অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো—অনুবাদ হবে আক্ষরিক ও অবিকৃত। এদিক থেকে ডাঃ ঘোষ সযত্ন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বাক্যবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য আছে তবে মূলের ভাব, অর্থ ও নির্যাস সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে। শব্দের ব্যবহারেও তিনি কোন শিথিলতা ও তরলতার প্রশ্রয় দেননি। ডাঃ ঘোষ এই অনুবাদে কোথাও শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ, আবার ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল। তিনি ভাব অনুযায়ী কবিতার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন, কোথাও চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের স্বচ্ছন্দ চলন, আবার কোথাও আঠারো অক্ষরের মহাপয়ারের ধ্রুপদী, গম্ভীর গতি; আবার মাঝে মাঝে আছে ত্রিপদী ছন্দের মধ্যমিলযুক্ত বাক্যের ব্যবহার। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ্য, ডাঃ ঘোষ এই অনুবাদে সাধুভাষাকে পরিত্যাগ করে যদি চলিতভাষার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতেন, তাহলে এই অনুবাদ হতো আরো স্বচ্ছ এবং আধুনিক। তবুও তাঁর অনুবাদ অন্যান্য অনুবাদ থেকে প্রাঞ্জল; শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিবাহী। ডাঃ ঘোষ অনুবাদের আগে উনিশ পৃষ্ঠা জুড়ে গীতার পটভূমিকা ও তার মর্মবাণী যেভাবে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন তা গীতাতত্ত্ব পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নবতম সংযোজন।

আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থটি যে ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে, তার সামীপ্যে কিন্তু গ্রন্থটির মুদ্রণ, আকার ও অঙ্গসজ্জা পৌঁছাতে পারেনি। সাম্প্রতিক কালে মুদ্রণশিল্পে ও আঙ্গিক পারিপাট্যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে। ডাঃ ঘোষ যখন নিজেই প্রকাশক, তখন এদিকটায় সুনজর দিলে গ্রন্থটি দৃষ্টিনন্দন হতো অবশ্যই। আরো একটি কথা, প্রচ্ছদে এবং তার পরবর্তী দুটি পৃষ্ঠায় চিকিৎসক লেখকের নামের পূর্বে যে 'ডঃ' লেখা হয়েছে, তা হওয়া উচিত ছিল 'ডাঃ'। ❑

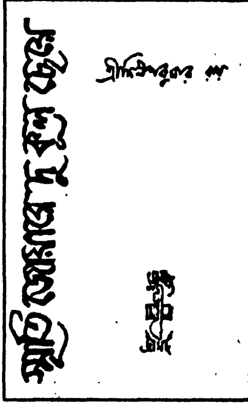


মনোরম আত্মকথা

স্মৃতি জোয়ারে দুকূল ছেয়ে • লেখক : দিলীপকুমার রায় • প্রকাশক : মিলন সেন, সুরকাব্য ট্রাস্ট, ১০এ লালা লাজপৎ রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০২৫ • মূল্য : ৩০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+১৪৮ • প্রকাশকাল : ১৯৯২

আত্মজীবনী বা আত্মকথা লিখতে গেলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষভাবে এগোতে হয়, তা নাহলে সংশ্লিষ্ট আত্মজীবনী গতিহারা হতে বাধ্য।—একথা বলেছেন জর্জ বার্ণাড শ। তাই আমরা দেখি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই আত্মজীবনী রচনায় হাত দেননি; রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বার্ণাড শ প্রমুখ এঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবুও তো কত আত্মজীবনী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। প্রশ্ন একটাই, বার্ণাড শ-য়ের কথায় বলা যায়, সেইসব আত্মজীবনী কতটা সত্যের মোড়কে আবৃত—তা বোঝা কঠিন।

বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের আত্মজীবনী **'স্মৃতি জোয়ারে দুকূল ছেয়ে'** পাঠ করতে গিয়ে এই কথাগুলি মনে পড়ে। আমাদের বিশ্বাস—দিলীপকুমার তাঁর অপর আত্মজীবনী 'স্মৃতির শেষ পাতায়' যে সততা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তার ব্যত্যয় ঘটেনি।



'স্মৃতি জোয়ারে দুকূল ছেয়ে'—এই নামকরণটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের একটি পঙ্‌ক্তি থেকে নেওয়া। দিলীপকুমার গায়ক এবং ধর্ম-নীতিনিষ্ঠ মানুষ। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তিনি বহুদিন অতিবাহিত করেছেন, গানের সূত্রে দেশ-বিদেশের নানা স্থানে ঘুরেছেন। এই ভ্রমণের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে জীবনের নির্যাসটুকু যুক্ত করে রচনা করেছেন এই আত্মজীবনী। আত্মজীবনীর মধ্যে ভ্রমণের প্রেক্ষাপটটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাই দেখি বিদেশযাত্রাকালে ব্যাঙ্ককের কাছে বিমান-দুর্ঘটনার হাত থেকে কেমন করে তিনি রক্ষা পেলেন, আমেরিকায় গান শুনিয়ে কত ডলার তাঁর হাতে এল—এসব বৃত্তান্ত যেমন আছে; তেমনি আছে দিল্লি, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরে অবস্থানের কথাও। আবার এলাহাবাদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, তেমনি উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে। সবকিছু ছাপিয়ে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নানা কথা পল্লবিত আকারে উঠে এসেছে। জীবনের পথে চলতে গেলে কত না মানুষের সঙ্গে, কত না সুখ-দুঃখের সঙ্গে, চিত্র-বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়! দিলীপকুমার খুব আন্তরিকতার সঙ্গে এসকলের মনোরম ছবি এঁকেছেন।

দিলীপকুমারের অধ্যাত্মজীবন, ভাষা, শব্দের দ্যুতি, বর্ণনার স্বচ্ছতা—এসবই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি সঙ্গীতও সংযুক্ত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। তবে ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলি আত্মকথা রচনার সাবলীলতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা তেমন উচ্চমানের নয়। ❑

তাপস বসু

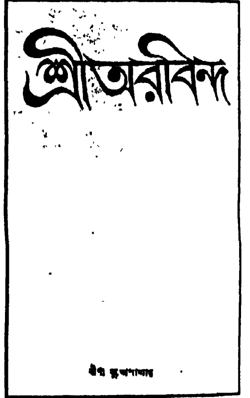


শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা

শুভঙ্কর ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ ● লেখিকা : বীণা মুখোপাধ্যায় ● প্রকাশিকা : পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ ● মূল্য : ১৮ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২+১২০ ● প্রকাশকাল : ১৯৮৮

জীবনচরিত নিছক ইতিহাস নয়। এটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে সৃজনধর্মী সাহিত্যের পর্যায়-ভুক্তও হতে পারে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের এই দৃষ্টিভঙ্গির পাশে লিটন স্ট্রাচির কথাও বলা যায়। জীবনের আগাগোড়া সব ঘটনা ও তথ্যের পাহাড় তৈরি করলেই জীবনচরিত হয় না। জীবনীকারের বা চরিতকারের লক্ষ্য থাকবে ব্যক্তিজীবনের বাহ্য ঘটনার narration-ই নয়, অন্তর্জীবনের পরিচয় উদ্ঘাটনও। ড্রাইডেন, হেমকেথ পিয়ার্সন বা লুই মামফোর্ডের আলোচনাগুলি মনে রাখলে বোঝা যায়, নিছক জীবনকথা বিবৃত করাই জীবনচরিত রচনার তাৎপর্য বহন করে না। একজন মানুষের outward manifestation and inward working—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপনার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির জীবনের তথ্যসঙ্কলনই নয়, তার পারিপার্শ্বিক, যুগজীবন ও জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কেও জীবনচরিতকারকে অবহিত হতে হবে। পাশ্চাত্যে ডঃ জনসন ও জেমস বসওয়েল জীবনচরিত রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে জীবনচরিত রচনায় অসামান্যতা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে Biography-র পাশাপাশি Hagiography (কেবল প্রশংসাসূচক) লেখারও নজির আছে। তবে শেষোক্ত ধারাটির স্বাতন্ত্র্য হলো—সন্তজীবনের ক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব ও দিব্য ভাবনা প্রাধান্য পায়। যিশুখ্রিস্ট, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা লেখার বিপদ ও ঝুঁকি এই কারণেই। কিন্তু একটি ভারসাম্যযুক্ত জীবনকথা রচয়িতার পক্ষেই সন্ত, সাধক বা ধর্মগুরুর জীবনী লেখা সম্ভব।



বীণা মুখোপাধ্যায়ের **'শ্রীঅরবিন্দ'** এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর being ও becoming-এর বৃত্তান্ত কঠোর অনুশীলন ও নিষ্ঠারই ফসল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিকে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। আপাতজীবন ও প্রকৃত জীবন, বাহ্যজীবন ও ভাবজীবনের সমন্বয়েই কবির জীবন গড়ে ওঠে। তবু স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রজীবনী, বিশেষত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত পালের সুবাদে পাওয়া গেছে বলেই কবির কাব্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। শ্রীঅরবিন্দেরও অভিমত ছিল, তাঁর জীবনী লেখা কঠিন। 'শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় বীণা মুখোপাধ্যায় তাঁর সাবধানবাণী উল্লেখ করেছেন : "আমার জীবনী লেখা অসম্ভব। কে ইহা লিখতে পারে? শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, যোগী, দার্শনিক, কবি এঁদের জীবনচরিত লেখা খুবই কঠিন; কারণ তাদের জীবন বাইরে থেকে বোঝা সহজ নয়।" লেখিকাও মানেন, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বহির্জীবন রচনা সম্ভব হলেও 'অন্তর্জীবনের ইতিহাস রচনা' বিশেষ কঠিন। 'যুগপুরুষ', 'ঋষি', 'দার্শনিক' শ্রীঅরবিন্দ নিয়ে চর্চার দুরূহতা সর্বজনস্বীকৃত। তবু চর্চা অব্যাহত। আর. আর. দিবাকর, অম্বালাল পুরাণী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ইংরেজি জীবনচরিতের প্রামাণিকতা স্বীকৃত, কিন্তু বাঙলায় ব্যাপক ও গভীরভাবে শ্রীঅরবিন্দের জীবনচরিত রচনা লক্ষ্য করা যায় না। এদিক থেকে বীণা মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার দাবি করতে পারে।

বীণা মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭০-১৯৫০) পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেননি। ১৮৭২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের ৫৪ বছরের জীবন ও সাধনার একটি ভক্তিস্নিগ্ধ, তথ্যনিষ্ঠ ও ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ উপস্থাপনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ১৯২৬ সালে তাঁর 'অধিমানস' সিদ্ধিলাভের পরবর্তী পর্যায়ে 'অতিমানস' চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই শ্রীঅরবিন্দের ব্রত হবে। ফলে তিনি 'অতিমানস' বিশ্লেষণে আর অগ্রসর হননি। বেদে কথিত সত্যচেতনাকেই শ্রীঅরবিন্দ 'অতিমানস' বলেছেন। 'নিজের কথা' জানাতে গিয়ে তিনি জরুরি মনে করেছেন—অধিমানসের স্তরকে ক্রমশ অতিমানসগত করে আনা। দ্বিতীয় কাজ হিসাবে তাঁর বক্তব্য : "নিশ্চেতনার যে গুরুভার মানব-অজ্ঞানতাকে সমর্থন দিয়ে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্বকে ও ব্যক্তিকেও কোনরকমে বদলাতে দিচ্ছে না—সেই বাধাকে হালকা করে দেওয়া।" বীণাদেবী 'অতিমানস' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যার স্তরে পৌঁছাবার চেষ্টা করেননি।

ডঃ রমেশ মজুমদার 'শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন' আলোচনা-সূত্রে তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন : "প্রথম বাল্যজীবন ও বিলাতে শিক্ষা; দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় অংশগ্রহণ, তৃতীয় পণ্ডিচেরীতে আধ্যাত্মিক জীবন।" প্রথম দুটি পর্যায় শ্রীমজুমদারের আলোচ্য বিষয় ছিল। বীণা মুখোপাধ্যায় প্রধানত ১০টি অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনাকে (১৯২৬ পর্যন্ত) বিশদ করেছেন। সেক্ষেত্রে জন্মকথা ও ইংলণ্ডে, স্বদেশপ্রেম, সিভিল সার্ভিস, দেশে প্রত্যাবর্তন, কর্মজীবন, অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চা, বিবাহ ও পারিবারিক জীবন, বারীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, রাজনীতি, প্রাণায়াম ও যোগাভ্যাস, ঈশ্বরনির্ভরতা ও প্রত্যাদেশ, স্বামী বিবেকানন্দ, চন্দননগর, পণ্ডিচেরীর ইতিহাস ইত্যাদি ছোট ছোট পরিসরে উপস্থাপন করে বীণা মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে ও চেনাতে চেষ্টা করেছেন।

১৯০৯-এ কারাবাস থেকে মুক্তি শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতির জগৎ থেকে ক্রমশ দূরবর্তী করে তুলেছিল। ১৯১০ সালে তাঁর পণ্ডিচেরীর জীবন সূচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনগতি ভিন্নমুখী হয়ে ওঠে। ১৯১৮ সালে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে। ১৯২০ সালে শ্রীমার প্রত্যাবর্তন। যোগজীবনে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের পাশে থেকেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রদ্ধেয়জনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী অভিজ্ঞতারঞ্জিত সম্বন্ধস্থাপন ও মতবিনিময়ের কথা বীণাদেবী উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ১৯২৪-১৯২৫-এ শ্রীঅরবিন্দের অধিমানস চেতনা ও সিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত। শ্রীমায়ের ব্যাখ্যাসূত্রে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখিকা বলেছেন : "মন আর অতিমানস—এদুয়ের মাঝে যে-জগৎ রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ সেটির স্বতন্ত্র নাম দিয়েছেন অধিমানস (Overmined)।" মন → অধিমানস → অতিমানস—এভাবেই উত্তরণের পথ।

বীণা মুখোপাধ্যায় ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও একটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য চালচিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

* *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা • লেখক : শরণাগত • প্রকাশিকা : বেলা লাহিড়ী, ডি ৩১।৫৮ মদনপুরা, বারাণসী-২২১০০১ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১২ +৯৮ • প্রকাশকাল : ২০০১*
* *ধর্মের আলোকে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ • লেখক : চন্দনকুমার ভৌমিক • প্রকাশক : লেখক, পোঃ সাতবাঁকুড়া, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২৫৩ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২ +৮০ • মূল্য : ২০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০৩*
* *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতা • লেখক: ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় • প্রকাশক : নিরাময় পাবলিকেশন, ডাঃ অলক মুখোপাধ্যায়, হ্যানিমান হোমিও ডিস্পেনসারী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (বর্ধমান) • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৭ +৩৯ • মূল্য : ৭৫ টাকা • প্রকাশকাল : ১৯৯৯*
* *সারদা মায়ের মেয়েবেলা • লেখক : পরিমল চক্রবর্তী • প্রকাশিকা : মীনা সাহা, মাদার হাউস, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫৪ • মূল্য : ১০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০১*
* *হাজরা মার রোজনামচার কয়েক পাতা • সম্পাদনা: শচীদুলাল হাজরা • প্রকাশিকা : পম্পা সাহু, গেঁওখালী, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬০৩ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২ +৮৬ • মূল্য : ৪০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০২*

|বা|

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বৃন্দাবন

স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্রপূত বাণীতে উদ্দীপ্ত কয়েকজন স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায় বৃন্দাবনে ১৯০৭ সালে অতি সাধারণভাবে গড়ে উঠেছিল যে ছোট্ট হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারিটি, কালের সরণি বেয়ে সেটিই আজ পরিণত হয়েছে সুবৃহৎ 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম'-এ। ঐ ১৯০৭-এই ওখানে যুক্ত হয়েছিল চারটি শয্যা-সহ কিছু অ্যালোপ্যাথিক বিভাগ। আর ১২ জানুয়ারি ১৯০৮-এ বৃন্দাবনের এই হাসপাতালটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালটি তার বর্তমান অবস্থানে উঠে আসে ১৯৬২-তে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর পুণ্য উপস্থিতিতে এটির উদ্বোধন করেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। পরবর্তী কালে এখানে 'রামকৃষ্ণ মঠ'-এর সূচনা হয় ১৯৬৫-তে। একটি সুন্দর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি (১৯৭৩)। এখন সেখানে নিত্যপূজা এবং নানাবিধ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়—সারা বছর ধরে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বৃন্দাবন।

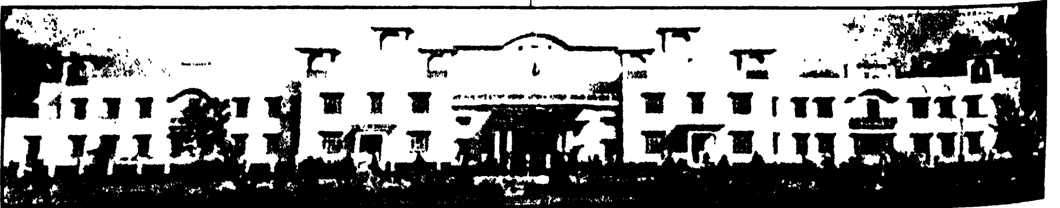


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সারা ভারত জুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের যে অগ্রগণ্য চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি আছে, তাদের অন্যতম বৃন্দাবন সেবাশ্রম। এখানে মাত্র ২১টি 'কেবিন' আছে। সেগুলিতে থাকতে হলে সামান্য অর্থ দিতে হয় (খরচের সিংহভাগ মিশন ভর্তুকি হিসাবে দেয়)। এছাড়া সেবাশ্রমের সুবৃহৎ চিকিৎসাযজ্ঞের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোন রোগীকে খরচ বহন করতে হয় না। বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের সমস্ত রোগী এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শল্যচিকিৎসা করান (শয্যাসংখ্যা ১৩০), রক্ত ও পথ্য পান এবং নানারকম মেডিকেল পরীক্ষা করাতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, মিশনের 'পল্লিমঙ্গল' প্রকল্পের অধীনে একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ভ্যান মথুরা জেলার বহু দূরবর্তী গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও চোখের অস্ত্রোপচার-সহ বিভিন্ন মেডিকেল সুযোগ-সুবিধা—এবং অবশ্যই বিনামূল্যে। সেবাশ্রম নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে এইসমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার নির্বাহ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে কেবল মানুষের স্বেচ্ছাদত্ত অনুদানের সাহায্যেই—কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনরকম আর্থিক সহায়তা গ্রহণ না করেই। আসলে, এখানকার যাবতীয় সেবার নেপথ্যে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মাদর্শে 'রোগী' নারায়ণের সেবা তথা উপাসনার ভাব।

বর্তমানে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে রয়েছে ১৫১টি শয্যাযুক্ত অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতাল; আছে বিভিন্ন বিভাগ—যেমন সাধারণ শল্যচিকিৎসা, চোখ, দাঁত, ই. এন. টি., শিশু ও মাতৃবিভাগ, অর্থোপেডিক, রেডিওলজি, প্যাথলজি, আলট্রা-সোনোগ্রাফি, এক্স-রে, ই. সি. জি., সাধারণ মেডিসিন, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক। এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন বহু তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় ও সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দা। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ অনুসারে এখানে চিকিৎসার ব্যাপারে জাতিধর্মের বিন্দুমাত্র ভেদ করা হয় না। রোগীদের শারীরিক ও মানসিক—দুরকম স্বাস্থ্যের দিকেই নজর রাখা হয়। আর তাই, সেবাশ্রমের নিজস্ব গোশালার সৌজন্যে অন্তর্বিভাগের সমস্ত রোগীর জন্য যেমন খাঁটি দুধের বন্দোবস্ত আছে, তেমনি তাদের জন্য রয়েছে ১৬ মিমি. মুভি প্রজেক্টর ও ভিডিও প্রজেক্টরের মাধ্যমে নিয়মিত অডিও-ভিসুয়াল বিনোদনের ব্যবস্থাও।

সেবাশ্রমের অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নার্সিং স্কুল। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল-স্বীকৃত এই স্কুলে (ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৫০) দুঃস্থ মেয়েদের



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের হাসপাতাল

জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৩ বছরের জন্য সাধারণ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্স চালানো হয়। এছাড়া সেবাশ্রম থেকে প্রত্যেক বছর দরিদ্র মানুষদের, বিশেষত কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের, দরিদ্র বিধবাদের এবং ছাত্রদের রান্না করা খাবার, খাদ্যশস্য, বইপত্র, জামাকাপড়, বাসনপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র প্রভৃতি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। এছাড়া দরিদ্র পরিবারে বিবাহ ও শেষকৃত্যাদির খরচও প্রয়োজনানুসারে দেওয়া হয়। সাধন-ভজনের জন্য সাধু-বৈষ্ণবদের পুরনো সেবাশ্রমে সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

মন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর যথাবিহিত পূজা, আরতি ও সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে রামনাম, শ্যামনাম সঙ্কীর্তনাদি হয়। মহাতীর্থ বৃন্দাবনে অবস্থিত এই রামকৃষ্ণ মঠের অধীনে রয়েছে ৮,০০০-এরও বেশি বই ও পত্রপত্রিকা এবং একাধিক পাঠকক্ষযুক্ত একটি বিরাট গ্রন্থাগার। মঠপ্রাঙ্গণে একটি নতুন দোতলা বাড়িতে এই গ্রন্থাগারটি ছাড়াও আছে বই বিক্রির কেন্দ্র এবং একটি প্রথাবহির্ভূত নৈতিক শিক্ষাদান কেন্দ্র। প্রত্যেক বছর এখানে একটি যুবসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে প্রায় ৭,০০০ ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র-গুলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে : **বাঁকুড়া, ইছাপুর, জলপাইগুড়ি ও সরিষা।** বহির্ভারতে : **ফিজি।**

নতুন উপ-শাখাকেন্দ্র স্থাপন

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, কুড্ডাপার কাছ থেকে জমি ও বাড়ি অধিগ্রহণ করে কুড্ডাপায় 'রামকৃষ্ণ মঠ, কুড্ডাপা' নামে রামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই শাখাকেন্দ্রের একটি উপ-শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এর ঠিকানা : রামকৃষ্ণ মঠ, ৫/৪৭৬ ট্রাঙ্ক রোড, কুড্ডাপা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পিন-৫১৬০০১। ফোন : (০৮৫৬২) ২৪১৬৩৩।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাবতিথি পালন : গত ৪ মে ২০০৪ শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাবতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসব : গত ২৩ মে ২০০৪ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধন বাটীতে ৯৫তম পদার্পণ উৎসব আয়োজিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। 'ভবিষ্যৎ' নাট্যগোষ্ঠীর 'বহুরূপে সম্মুখে' নাটক এবং 'রূপ ও রঙ' যাত্রা ইউনিটের 'হরিদাস উদ্ধার' যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। সকালের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বাণেশানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। উৎসবে সারাদিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি ও লাড্ডু প্রসাদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমা প্রথম যেবার এই বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন, সেদিন যে-তিথি, যে-তারিখ ও যে-বার ছিল, এবছরেও একই দিনে সেই তিথি, তারিখ ও বার পড়েছিল।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর (হুগলি) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে ৩৩ জন দরিদ্রনারায়ণকে কম্বল প্রদান করা হয়।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, বিধান সরণি (কলকাতা-৬) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ বিবেকানন্দ সোসাইটি হল-এ স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী অমৃতরূপানন্দজী এবং এই সংগঠনের শিবাজী ঘোষ ও ডাঃ আর. আই. খান। এদিন 'সংস্কার-ভারতী'র শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ 'জাগরণ' নাটক অভিনয় করে।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, খড়দহ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। কলকাতার চার প্রান্ত থেকে চারটি সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ময়দানের সভাস্থলে মিলিত হয়। বহু স্কুল, কলেজ ও সংস্থার ছেলেমেয়েরা এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ময়দানে মহামণ্ডলের সঙ্ঘগীতি ও স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন মহামণ্ডলের সভাপতি ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। বক্তা হিসাবে ছিলেন স্বামী নিত্যজ্ঞানানন্দজী, মহামণ্ডলের সহ-সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন উৎপল সিংহ এবং স্বামীজীর লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন তপনকুমার বসু।

বেতালবসান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ১৮ তারিখ সকালে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের

পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীশ্রীমা'। সভায় ভাষণ দেন স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী, রূপা দত্ত ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। দুপুরে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। পরদিন ধর্মসভায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী কালাতীতানন্দজী। দুদিনই সন্ধ্যায় পরিবেশিত 'রামায়ণ গান' খুব আকর্ষণীয় হয়। দুদিনে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর (বীরভূম)ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী সম্মেলন ও যুব উৎসব পালিত হয়। এই সম্মেলনের সংগঠনে ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী সংসদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, সহাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং স্বামী দেবরাজানন্দজী ও স্বামী পরেশাত্মানন্দজী। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং ২০ ও ২১ জানুয়ারি দুই শতাধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন অ্যাভিনিউ (দুর্গাপুর)ঃ গত ২২ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ হয়। এদিন সায়াহ্নে দুর্গাপুরের 'স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি', 'এ. বি. এল. শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি', 'সাধুডাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম', 'রামকৃষ্ণ ধাম' এবং 'শরৎপল্লী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'-এর সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি-সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সেবাশ্রমে উপস্থিত হন। সেবাশ্রমের সম্পাদক বাসুদেব মুখার্জি সকলকে স্বাগত জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা এবং আশীর্বাণী প্রদান করেন। গত ২৫ জানুয়ারি ২০০৪ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনে প্রায় চারশতাধিক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী।

তালপুকুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, বারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয় দিনে আয়োজিত ভক্তসমাবেশে আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও স্বামী পূতানন্দজী। সবশেষে 'করুণাময়ী মা সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ, রামকৃষ্ণ আশ্রম (কলকাতা-৩৯)ঃ গত ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথমদিন বিশেষ পূজা ও হোম করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী গোবিন্দানন্দজী, বন্দিতা ভট্টাচার্য ও সুনন্দ সান্যাল। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। দ্বিতীয়দিন বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী, ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। এরপর 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, এয়ারপোর্ট ১নং গেট (দমদম)ঃ গত ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, উপনিষদ পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ২৫ তারিখে বিশেষ পূজা করেন স্বামী প্রাণারামানন্দজী। 'মায়ের কথা' ও 'কথামৃত' পাঠ এর্বং 'দুঃস্থ' নারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। এদিন প্রায় ১,২০০ ভক্ত হাতে হাতে এবং প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী ঋতানন্দজী ও সন্তোষকুমার ঘোষ। ২৬ তারিখ ভজন, ভক্তিগীতি ও সন্ধ্যারতির পর সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও পবিত্রকুমার ভট্টাচার্য।

বিবেকানন্দ আদর্শ মিলনমন্দির (কলকাতা-৪২)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ সরস্বতীপূজার দিন মিলনমন্দির পরিচালিত তিনটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চোপচারে পূজা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেন স্বামী মুক্তরূপানন্দজী ও প্রব্রাজিকা ধীরেশপ্রাণাজী। এদিন প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ডঃ তাপস বসু ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল।

আগরা সারদামণি পল্লিমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদ ও 'গীতা' পাঠ, ভজন, বস্ত্রবিতরণ, নরনারায়ণসেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কীর্তন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মবিদানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও ডঃ শ্যামল গুপ্ত। এছাড়া প্রায় ৬০ জন মহিলার উপস্থিতিতে একটি 'মাতৃ সচেতনতা শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, স্বাস্থ্যকর্মী ও সন্ন্যাসিনীবৃন্দ।

হাবড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ, স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির,

যুবসম্মেলন, জনসভা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, নৃত্যনাট্য, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। নবনির্মিত রামকৃষ্ণ পাঠভবন, ত্রিগুণাতীতানন্দ ভবন এবং অদ্বৈতানন্দ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী প্রভানন্দজী। আলোচনাসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী বীতরাগানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা ও ডাঃ সাধন সেন ও ডাঃ কৃষ্ণপদ দাস (পৌরপ্রধান, হাবড়া)। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত যোগদান করেন।

বেলডাঙা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ) : গত ৩১ জানুয়ারি—১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের নির্দেশনায় স্থানীয় নেতাজী পার্ক সম্মেলন-কক্ষে যুব-প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিভিন্ন সংগঠনের ২১ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। স্বামীজীর ভাবধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক প্রশান্ত শ্রীমানী। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক ডঃ দীপক দত্ত, জেলা-আহ্বায়ক অসিত চট্টোপাধ্যায়, যুব সংগঠক অতনু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। শিবির সমাপ্ত হয় স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের মাধ্যমে। এই সম্মেলনে শতাধিক যুব-প্রতিনিধি ও স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যুব প্রতিনিধিগণ। উপস্থিত সকলের মধ্যে 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন' পুস্তিকা ও ছবি বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ৩১ জানুয়ারি—১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ **খেজুরী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (পূর্ব মেদিনীপুর)** বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮টি আশ্রম থেকে ৪১ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন, বাণী ও ভাবান্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। পরিষদের আহ্বায়ক কমলকুমার মান্না বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব পেশ করেন। স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী পরিবেশিত সঙ্গীত সম্মেলনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শতবৎসর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি, বড়িশা, ঠাকুরপুকুর, জোকা অঞ্চল (কলকাতা) : গত ৩১ জানুয়ারি—১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, পূজা, প্রসাদ বিতরণ, গল্পবলা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও কুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, তরুণ গোস্বামী ও সীতাংশুকুমার চক্রবর্তী। পরদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। ১৯ ফেব্রুয়ারি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বামী লোকনাথানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী। অনুষ্ঠানগুলি 'বড়িশা বিবেকানন্দ গার্লস হাই স্কুল'-এ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সোদপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পানিহাটী লোকসংস্কৃতি ভবনে ভক্ত-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বাগত-ভাষণের পর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা রায়, মাধুরী ঘোষ, ভারতী সরকার ও নন্দা ঘোষ। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী।

পাতুল মিলনমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি) : গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বরানন্দজী, দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা), সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশু ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে তাপস মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ দে।

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মহারাজগঞ্জ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ স্থানীয় 'কৃষ্ণপ্রসাদ আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর স্কুল মাঠে 'ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত প্রায় ৩০০ প্রতিনিধির প্রত্যেককে একটি করে স্বামীজীর বই ও ছবি প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী শান্তিদানন্দজী। এদিন সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উৎসবে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী শান্তিদানন্দজী, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী উত্তমানন্দজী, নুরিণ তামান্না খাতুন, সঙ্ঘের সহ-সভাপতি অশোক দাস ও সম্পাদক উপলকুমার গায়েন। মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য পঞ্চানন পড়ুয়া ও ডাঃ কমলকান্তি গায়েনের পরিবারকে এদিন ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ফটো প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজীর বই উপহার দেওয়া হয়।

বেলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া) : গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী, স্বামী বিদ্যানন্দজী, কাজল বৈতালিক ও সুমিত্রা গাঙ্গুলি। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিপাশা বৈতালিক ও অমলকৃষ্ণ রায়। ৬০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) : গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনাসভা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় 'সুকান্ত ভবন'-এ স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৭০ জন রক্তদান করে। বৈকালিক আলোচনাসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুরেশানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ ও বিষ্ণুপদ বসাক। স্বাগত ও সমাপ্তি-ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন বসাক ও রসময় ভট্টাচার্য।

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, শান্তিপুর (নদীয়া)ঃ গত ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমে এসে একরাত্রি বাস করেন এবং ৭ তারিখ মাধবানন্দ ভবনের উদ্বোধন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে (দুই শতাধিক বছরের পুরনো দুর্গামণ্ডপ বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে রূপান্তরিত এবং আশ্রমের অন্তর্গত) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এদিন পূর্বাহ্ণে স্বামী শান্তাত্মানন্দজী ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী যথাক্রমে বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করেন। ৬ তারিখ দুপুরে সাধুসেবায় ৩০ জনের বেশি সাধু-ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী, স্বামী ভবহরানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী শিবনাথানন্দজী ও অধ্যাপক ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনই সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৭ তারিখ দুপুরে নরনারায়ণ-সেবায় প্রায় ১৫,০০০ মানুষকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সেবাব্রত

বিশ্ববিবেকতীর্থ, অরবিন্দ নগর (কলকাতা-৩২)ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতা লায়ন্স নেত্র নিকেতনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা 'আজাদগড় বালক বিদ্যাপীঠ' প্রাঙ্গণে ১৪২ জনের চক্ষু-পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যে ৩০ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হবে বলে স্থির হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০০৪ ইছাপুর (ময়াল) রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় একটি দন্তচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। ঐ শিবিরে ৬২ জনের দাঁত তোলা, ১০ জনের দাঁতে ফিলিং এবং ২৩ জনের দাঁতের সাধারণ চিকিৎসা করা হয়। প্রত্যেক রোগীকে মঠের পক্ষ থেকে বিনাব্যয়ে ওষুধ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্গালোরের ভি. এস. ডেন্টাল কলেজের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান করুণাদেবী ও দুই সহকারী মহিলা চিকিৎসা করেন। ইছাপুর মঠের স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী ও সাতজন সহযোগী এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, খোসকদম্বপুর (বীরভূম)ঃ গত ২২ জানুয়ারি ২০০৪ সেবাসমিতির প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তিনি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর শ্রীচরণে অর্ঘ্যপ্রদান করার পর সমিতির উন্নতিকল্পে আশীর্বাণী প্রদান করেন। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হালিশহর (নদীয়া)-নিবাসী জগদীশচন্দ্র বসু গত ২৮ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি কৈলাসহর ও গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণোৎসব কমিটি ও পাঠচক্রের সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটী-নিবাসিনী শোভারানী অঙ্কুর গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-নিবাসী সুধীর সেনগুপ্ত গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি চট্টগ্রামের 'সমন্বয়' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-চর্চা ও প্রচারকেন্দ্রের আজীবন সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ এবং 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ধুবড়ি (অসম)-নিবাসী গোপালচন্দ্র দত্ত গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দমদম-নিবাসী, স্বাধীনতা-সংগ্রামী গণেশচন্দ্র বিশ্বাস গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ প্রয়াণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী কল্যাণী দাশগুপ্ত গত ৬ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্থানীয় গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী ডাঃ হরিকুমার দে গত ৭ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার নববারাকপুর-নিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১০ জানুয়ারি ২০০৪ প্রয়াণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মৌড়ী (হাওড়া)-নিবাসী মানসকমল মাজী গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ প্রয়াণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি মৌড়ী কথামৃত পাঠচক্র ও মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জি গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কামারপুকুর (হুগলি)-নিবাসী রবীন্দ্রনাথ গুহ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাটানগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)-নিবাসী সৃষ্টিধর পাল গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কোন্নগর (হুগলি)-নিবাসিনী অনিমা মুখোপাধ্যায় গত ২৮ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ❑



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ : এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা : বাঁকুড়া



Come out into the universe of Light. Everything in the universe is yours, stretch out your arms and embrace it with love.

Swami Vivekananda

With Best Compliments From :

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 2241-5248 ❑ FAX : (033) 2241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 2548-4500

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration

Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :

31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch :

71A, Park Street, Kolkata-700 013

Phone : 2244-1764/2184, 2237-5435

শ্রীকৃষ্ণের যেমন 'গীতা', শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি 'কথামৃত'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর এক অনন্যসাধারণ নিষ্কর্ষ—হাজার জনের হাজার সমস্যা, সংশয় এবং সন্ধিৎসা-বিজড়িত প্রশ্ন আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এবং সাবলীল উত্তরসমন্বিত এক অভিনব গ্রন্থ—

কৃষ্ণনয়নের
কল্পতরু কথামৃত

এই বই কেনা মানে—শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য—শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, সারাজীবন ধরে পড়ার জন্য—শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, বন্ধুর জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সঞ্চালক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ● শ্রী বলরাম প্রকাশনী

বিধান সরণি বিবেকানন্দ রোড ক্রসিং

সাহিত্যায়ন ● কোলে মার্কেট, ২৩৫০-৫১২০

এভারগ্রীন ইমেজেস ● বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭

বুক কর্ণার ● রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,** আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব),** বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক,** ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  গুসকরা-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **ডঃ শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
  ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৬১২৩৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ,** সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ-৭১৩৪০৩,ফোন ঃ০৩৪৩-২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ**
  নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯
- **অজয়কুমার গাঙ্গুলী**
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল,** হাওড়া রেলস্টেশন

পাতঞ্জল যোগসূত্র অবলম্বনে

- অনিত্যে নিত্যদর্শন
- অশুচিতে শুচিদর্শন
- দুঃখে সুখপ্রতীতি
- অনাত্মাতে আত্মপ্রতীতি

সংজ্ঞা ← অবিদ্যা → অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ

↓

ক্লেশ
(কর্মাশয়*)

↓

জাতি | আয়ু | ভোগ

আহ্লাদ + পরিতাপ

↓

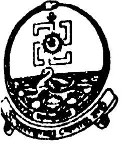
সর্বং দুঃখম্ বিবেকিনঃ
(বিবেকীর কাছে এই জগৎসংসার দুঃখপূর্ণ)

↑

কর্মফল

প্রারব্ধ (যে-জীবন শুরু হয়েছে) | অনাগত (যা ভবিতব্য) | অতীত (যা সঞ্চিত)

* *কর্মাশয় = কারণশরীর বা যে 'থলি'তে লক্ষ লক্ষ জন্মের সংস্কার জমা থাকে।*



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম (সেবাকেন্দ্র)

কার্সিয়াং, দার্জিলিং-৭৩৪ ২০৩ ফোনঃ (০৩৫৫৪) ২৩৪৪-২৭০

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

হিমালয়ের প্রায় ৫,০০০ ফুট উঁচুতে **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের শাখাকেন্দ্র** শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম সুদীর্ঘ ৪৭ বছর যাবৎ কার্সিয়াং পার্বত্য এলাকায় গরিব ও দুঃস্থদের ঔষধদান, অনাথ বালকদের প্রতিপালন, বর্ষাকালে দুর্গত ব্যক্তিদের বস্ত্র ও কম্বলদান, অন্নদান; তাছাড়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মতিথিতে উৎসব পালন ও স্থানীয় এলাকায় আর্তসেবার কাজ করে চলেছে। এছাড়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রচার, নেপালি ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়, অন্তেবাসীদের শিক্ষাদান ইত্যাদি নিত্যকর্ম। ইদানীং আশ্রমের দালানের একটি অংশ মাটিতে বসে যাওয়ার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগঘর ও ভোজনালয়টিও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উৎসবাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদির কাজও ব্যাহত হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ারের মতে, যথাশীঘ্র উক্ত দালানটি মেরামত না করলে অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে। দালানটির মেরামত বাবদ খরচ পড়বে আনুমানিক ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা)।

সহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা যেন উপরি উক্ত কাজের জন্য মুক্তহস্তে দান করেন, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ অব্যাহত থাকে ও পার্বত্যবাসী দুঃস্থ ও গরিবদের উপকার হয়।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র এই অমূল্য সুযোগ গ্রহণ করতে সকলকে আহ্বান জানাই। **মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফ্ট "Ramakrishna Vedanta Ashrama, Kurseong"—এই নামে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি। দানের** সকল অর্থ ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

বিনয়াবনত

স্বামী অশেষানন্দ

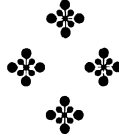
সম্পাদক

ঠিকানা ঃ

RAMAKRISHNA VEDANTA ASHRAMA (SEVA KENDRA)
P.O. : KURSEONG, DT. : DARJEELING-734 203 (W. B.)
PHONE : (03554) 2344-270

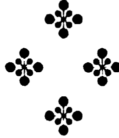
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ





UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No.6
June
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

ISSN 0971-4316
9 770971 431004 06

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ **সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও **বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'**-এর **সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ ২০০৪ সালের জন্য **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'**কে পৌঁছে দিতে হবে। **'উদ্বোধন'** একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ **'উদ্বোধন'**-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ**, স্বামী বিরজানন্দ, **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ**, স্বামী **অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ** এবং স্বামী **ভূতেশানন্দ মহারাজের** নামে উৎসর্গীকৃত। **'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ **সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ**

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা সডাক ১০০ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা



শ্রাবণ ৭ম সংখ্যা

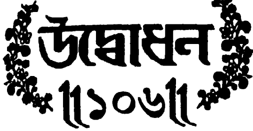
উদ্বোধন

॥ ১০৬ ॥

১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

৩৭২২৭

সূচীপত্র



১০৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ● শ্রাবণ ১৪১১ ● জুলাই ২০০৪



ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ **আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন** সংবাদ **কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন।** গ্রাহকের **নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো** প্রয়োজন।
- **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ** আবশ্যক।
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক** নির্ধারিত তারিখের পরে সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের** সহৃদয় **সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া **সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে**, তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. **প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ** এবং **শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯





জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন শর্ত করো না, তাহলেই তোমার ঘাড়েও কোন শর্ত চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।



সাহসী ও অকপট হও—তারপর তুমি যে-পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে। একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে পারবে! গাছের মূলে যদি জল দাও, সমগ্র গাছটাই জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল।



আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সেবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যেকোন চিন্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী মনে করিতেন, যেকোন দেশে যেকোন জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া একটি মূল শিক্ষানীতি থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষেও উহা রহিয়াছে কেবল নহে, এদেশের ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রভাব এখনো গ্রাম-গঞ্জে যথেষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু ইংরেজের কেরানি-গড়া শিক্ষানীতির সহিত পাশ্চাত্যের ভোগবাদী প্রভাব এদেশের মূল শিক্ষানীতিকে বিকৃত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছে। বর্তমান শহরকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির মধ্যে তাই সনাতন শিক্ষার সুর বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল উপমহাদেশে আঞ্চলিকতার নিরিখে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে, ধর্মীয় সংস্কারভেদে নানাধরনের শিক্ষানীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। মূলত প্রাচীন বেদভিত্তিক সনাতন শিক্ষানীতিই আমাদের বর্তমান আলোচ্য, কারণ এই শিক্ষানীতি এমনই উদার, অভিনব এবং সর্বজনীন যে ইহা অনুসরণ করিলে যেমন হিন্দুকে হিন্দুত্ব ত্যাগ করিতে হয় না, তেমনি মুসলমানকে ইসলাম ত্যাগ করিতে হয় না কিংবা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করিতে হয় না। অত্যন্ত জটিল এই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত করিয়াই এই সনাতন শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করা একান্তই সম্ভব—ইহা অবাস্তব কল্পনা নহে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সনাতন শিক্ষাধারার দুইটি রূপ—একটি আপাত, একটি প্রকৃত। আপাত রূপটি লইয়া বিবাদ-কলহ হইবার অবকাশ হয়তো আছে, তাহা না হইলে চারিদিকে এত অশান্তি কেন? কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত রূপ লইয়া কোন বিতর্কের অবকাশ নাই, কারণ এই শিক্ষার স্বরূপ হইলঃ "Manifestation of the Perfection already in man"—মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশসাধনই শিক্ষা। অবশ্য শিক্ষাপদ্ধতির আপাত রূপে এমন প্রতীতি হইতেই পারে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর সহিত মূল নীতির কোন সম্পর্ক নাই। আসল কথা, অজ্ঞ মানুষকে ধীরে ধীরে মূল লক্ষ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাচার্যগণ 'অরুন্ধতী ন্যায়' অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যাহারা অরুন্ধতী নক্ষত্র চেনে না, তাহাদের জন্য প্রথমে চাঁদ হইতে শুরু করা হয়। এইবার হয়তো বলা হইলঃ "ঐ দেখ চাঁদের উত্তরদিকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দপ্‌দপ্ করিতেছে। উহারই এক হস্তপরিমাণ দূরে একটি নক্ষত্রমণ্ডলী রহিয়াছে, যেন 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন'-এর ন্যায়।" এইরূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া ক্রমশ অতীব সূক্ষ্ম 'অরুন্ধতী' নক্ষত্রকে দেখাইয়া দেওয়ার নাম 'অরুন্ধতী ন্যায়'। প্রবল পরহিতচিকীর্ষু প্রাচীন ঋষি-মুনিগণ সাধারণ মানুষের কল্যাণ এইভাবেই সাধন করিতেন। কিন্তু মূল লক্ষ্যের কোন বিচ্যুতি কোনদিন ছিল না। আজ যুবক-যুবতীর সম্মুখে 'জীবনের লক্ষ্য কী'—এই প্রশ্নটি বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহারা অনেকেই ভাবিতেছে অর্থ-উপার্জন, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা এবং ক্ষমতাভোগ—ইহাই বোধ হয় মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। কারণ, সমাজের প্রায় সকলেই এই কথা বলিতেছে এবং এই লক্ষ্যেই ছুটিতেছে। অথচ অন্তরে তাহারা একধরনের শূন্যতা অনুভব করে। কেহই তাহাদিগকে বলে নাঃ "তুমি পূর্ণ স্বরূপ। তোমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সব সংযত করিয়া যদি একাগ্রচিত্ত হইয়া কিছুক্ষণ নির্জন পবিত্র স্থানে বসিয়া স্বস্বরূপের কথা চিন্তা করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার অন্তরে একটি 'আনন্দপূর্ণ ঘট' যেন কেহ পূর্ব হইতেই বসাইয়া রাখিয়াছেন।" কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী কেবলই বাহ্য অর্থাৎ শারীরিক সৌন্দর্য, আড়ম্বর ও সুখের সন্ধানে উন্মাদপ্রায় হইয়া থাকে, অথচ কোনদিন তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না। বিদ্যাচর্চা করিবারও মূল লক্ষ্য যেন এই দেহগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই পর্যবসিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি বিখ্যাত সংজ্ঞা—একটি শিক্ষাসংক্রান্ত (যাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে) এবং অপরটি ধর্মসংক্রান্ত (Religion is the manifestation of the Divinity already in man—মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই ধর্ম) বস্তুত একই বক্তব্যকে দুইভাবে উপস্থাপিত করা। 'পূর্ণত্ব' এবং 'দেবত্ব'-এর একই তাৎপর্য। পূর্ণকাম ব্যক্তিই দেবতা হইতে পারেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ 'পূর্ণত্ব' শব্দটি যেমন একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিও বুঝেন, তেমনি একজন নাস্তিক ব্যক্তিও বুঝেন যে, ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। এজন্য জড়বিজ্ঞানী এই 'পূর্ণত্ব' শব্দটির গভীর অর্থ অনুধাবন করেন। 'Perfection' ব্যতীত বিজ্ঞান অগ্রসর

হইতে পারে না। এই Perfection-ই বিজ্ঞানের প্রাণবায়ু।

বলিলেন, এই Perfection-এ প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে যে values বা মূল্যবোধ অনুশীলন করা দরকার, তাহার ভিত্তি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ যেকোন মূল্যবোধ বা নীতিবোধ ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহা সার্থক, নতুবা উহার দাম নাই। যদি কেবল সামাজিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা চিন্তা করিয়া মূল্যবোধের কথা বলা হয়, তাহা হইলে সেই মূল্যবোধের সার্বজনীনতা এবং দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে তাহার সার্বিক প্রযোজ্যতার হানি হয়। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, বিভিন্ন বৈদেশিক দর্শনে যে নানাবিধ মূল্যবোধের কথা আছে তাহা শুনিতে ভালই লাগে, কিন্তু তাহার উপযোগ দেশ ও কালকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কারণ, ঐ মূল্যবোধের কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই। উদাহরণস্বরূপ বিবিধ দার্শনিক কিংবা রাজনৈতিক মতবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। যতগুলি প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদগুলির অন্যতম গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদের একটি প্রাথমিক শর্তই হইল, যে-ব্যক্তি সাম্যবাদী, সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইবে এবং সমাজের সকলকে নিঃস্বার্থ হইতে সাহায্য করিবে। সকল মানুষ নিঃস্বার্থপর হইলে এই সমাজই একটি সুন্দর শোষণমুক্ত সমাজে পরিণত হইবে। কথাটি শুনিতে ভালই লাগে। কিন্তু মানুষের অন্তরের গভীরে উহা প্রবেশ করে না, কারণ ব্যক্তিমানুষের মনের গভীরে অবস্থিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সৎ ও নিঃস্বার্থপর হইবার উপদেশের কোন মূল্য নাই। মানুষ কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে। তাহার অন্তরে কর্মপ্রবণতা (শ্রম) যেরূপ আছে, তেমনি আবেগ বা ভক্তি আছে, জ্ঞান-বিচারও আছে। এইসব উপেক্ষা করিয়া মানুষকে কেবল যান্ত্রিক করিয়া তুলিবার শিক্ষা ভারতের শিক্ষাবিদ্‌গণ দেন নাই। এবং সেই কারণেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাম্যবাদী নেতার জীবন দৃষ্টান্তমূলক হইলেও সমষ্টিগতভাবে ঐ তত্ত্ব ব্যর্থ হইতেছে।

নিঃস্বার্থপর হইতে গেলে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। কর্মফলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে নিঃস্বার্থ কর্ম হইল না। আবার চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মফলে স্পৃহাত্যাগই একমাত্র উপায়। চিত্তমল দূর হইলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপু, অভিমান, লজ্জাদি অষ্টপাশ এবং বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, আলস্য, সংশয় ইত্যাদি সহকারী চিত্তদোষই চিত্তমল। চিত্তশুদ্ধির সহিত সত্যনিষ্ঠা সমানুপাতিক। যতই মন সত্যনিষ্ঠ হইবে, ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। যতই মন সত্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ হইবে, ততই তাহার 'অহং' বা 'কাঁচা আমি' হ্রাস পাইবে। অহং-এর গণ্ডি মানুষকে অসীমের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। তাই যত 'অহং' হ্রাস পাইবে, ততই সীমা হইতে ব্যষ্টির অসীমে উত্তরণ ঘটিবে। এবং তখনি সে অনুভব করিবে, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—অনন্তত্বই যথার্থ সুখ, ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই। সেই পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির তখন—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি"—তখন তাহার কোথায় মোহ, কোথায় শোক? কারণ, সে 'এক'-কে দর্শন করিয়াছে। তখন সে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই নিঃস্বার্থ-পরতার 'মূল' সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই তত্ত্ব যাহার নিকট পরিষ্কার নহে, সে "কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব?"—এই প্রশ্ন করিতেই পারে। যদি উপযুক্ত উত্তর না পায়, ক্রমে এই মতবাদে শ্রদ্ধাহীন হইয়া বিপরীত আচরণে লিপ্ত হইবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কেন নিঃস্বার্থপর হইব, কেন সত্যনিষ্ঠ হইব, কেন কর্তব্যনিষ্ঠ হইব, কেন স্বেচ্ছাচারী হইব না ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর সকল কিশোর বা যুবার স্পষ্টভাবে জানা থাকা প্রয়োজন।

UNESCO-র সেবাপ্রীতির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। এইরূপে আরো বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতি-নির্ধারকগণও সেবাপ্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা সচরাচর যে-শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার দৃঢ়ভিত্তি কিছু নাই বলিয়া সাধারণ মানুষের অন্তরে দাগ কাটিতে পারে না। শ্রীশ্রীমা একদা পাশ্চাত্যবাসীদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন: "ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ।... যদি অন্তঃস্থ হতো তাহলে কথা ছিল না।" যেমন UNESCO কর্তৃক আহুত সভায় বলা হইয়াছিল: "উচ্চশিক্ষার কার্যক্রমে সমাজসেবাকে অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকরী করিয়া হিংসা, দারিদ্র্য, অসহিষ্ণুতা, বুভুক্ষা, অশিক্ষা, পরিবেশদূষণ এবং ব্যাধি দূরীকরণে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা..." ইত্যাদি। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। সেখানে দারিদ্র্য আছে এবং তাহা সহজে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এখানে বুভুক্ষা আছে এবং শিক্ষার অভাবের কারণে পরিবেশদূষণ আছে, ব্যাধিও আছে। এসব যত না মানসিক, তদপেক্ষা অধিক বাহ্য ব্যাপার। পাশ্চাত্য দেশে এসব প্রায় শূন্য বলা যাইতে পারে। যে-মুহূর্তে মানসিক প্রসঙ্গ আসিল, অমনি পাশ্চাত্য দেশের সমস্যা ঘনীভূত হইল। তাহারা কি মাথা উঁচু করিয়া বলিতে পারিবে—

তাহাদের মধ্যে হিংসা নাই, অসহিষ্ণুতা নাই, অশিক্ষা নাই? আসলে মানব-মনের মূল বিশ্লেষণেই তাহারা অক্ষম। যে ছয় রিপুর কথা হিন্দুশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—সবই পরস্পর-সম্বন্ধ। হিংসা দূর করিতে চাহিলে ক্রোধ সংবরণ করিতে হইবে। ক্রোধ সংবরণ করিতে গেলে কামকেও দমন করিতে হইবে। গীতায় সেই অসাধারণ শ্লোকটি ভগবান উচ্চারণ করিলেন ঃ "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু... বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" অর্থাৎ কোন জড়বিষয় চিন্তা করিলেই উহাতে সঙ্গ বা সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। সম্পর্ক স্থাপিত হইলে উহাতে আসক্তি (কাম) জন্মিবে; আসক্তি বৃদ্ধি হইলে উহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা জাগিবে; উহা না পাইলে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইবে। ক্রোধ জাগিলে মন মোহগ্রস্ত হইবে। মোহগ্রস্ত মনে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, গুরু-লঘু জ্ঞান থাকে না। স্মৃতিভ্রংশ হইলে সেই ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বড় বড় সভা করিয়া বলা হইল—হিংসা দূর করিতে হইবে, অথচ ব্যক্তি-মানুষের মনের মধ্যে আদি রিপুগুলিকে চিহ্নিত করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা হইল না—এই নীতি বা প্রবচন মূর্খতারই পরিচয় দেয়। এবং জীবনে যদি একটি উচ্চতর আদর্শ না থাকে, মানুষ এই ছয় রিপুকে অবদমন করিবেই বা কেন? ফলে পাশ্চাত্য সমাজে আপাতদৃষ্টিতে নিয়মানুবর্তী হইয়া সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে বলিয়া প্রতীত হইলেও অন্তরে অন্তরে হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভাদির একটি অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ ক্রমশ পাশ্চাত্যবাসীকে এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহারই ফলশ্রুতি হইল পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা। বরং ভারতবর্ষের অপরাধপ্রবণতা তাহাদের তুলনায় অর্ধেকও নহে। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্যের যুবসমাজ এই ইলেকট্রনিক যুগে ক্রমশ মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে—এখবর নিত্য সংবাদপত্রে দেখা যায়। কাজেই মানুষের আদিম প্রবৃত্তিসকল ইউরোপ বা আমেরিকায় আজ হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল—আজও, যদি বৃদ্ধি না ঘটিয়া থাকে, তেমনই আছে, সভ্যতার উন্নতির সহিত কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

এবং সেই অশান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই আমরা প্রগতির মাপকাঠি করিয়া থাকি! তাহাদের শিক্ষানীতি এদেশে চালাইতে চাহি! যখন কেহ হিমালয়ের গহন অরণ্যপথে দুর্গম তীর্থাভিলাষী হইয়া চলিতে চাহেন, তখন অচেনা পথ দেখাইবার জন্য একজন 'গাইড' অবশ্যই প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিও যদি বহিরাগত কেহ হয়, তাহা হইলে—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" (এক অন্ধ ব্যক্তি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া চলিতেছে)—এই অবস্থাই হয়। আমাদের দেশেও একইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। ইংরেজের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দেশের মানুষের অন্তরে এই দেশেরই প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলা। এবং উহারা সেব্যাপারে যথেষ্ট সফলকাম হইয়াছে। পাশ্চাত্যের একটি শংসাপত্র সঙ্গে থাকিলে এদেশে ঝাড়ুদার আর ঝাড়ুদার থাকে না, নানাবিধ সংবাদমাধ্যমে তাহাকে লইয়া মাতামাতি শুরু হয়। কিন্তু যতক্ষণ ঐ শংসাপত্র হস্তগত হয় নাই, ততক্ষণ তাহার ঝাড়ুদার জীবনের কোন স্বীকৃতি নাই! ইতিহাসের লৌকিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কেও একথা খানিকটা সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যবিজয়ের রাজটীকা পরিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখনি তাঁহাকে লইয়া মাতামাতি শুরু হইল।

অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি নহে—বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে স্বাগত জানাইয়া, পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষানীতি কী তাহা উত্তমরূপে গবেষণার মাধ্যমে জানিয়া লইয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসূচী নির্ধারণ করাই বর্তমান পবিত্র কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দেশিত শিক্ষাধারা সম্পূর্ণভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ এই শিক্ষাসূচীর মধ্যে সকল ধর্মকেই সমান মর্যাদায় গ্রহণ করিবার সুযোগ আছে।

স্বামীজীর চিন্তার আলোকে যুগোপযোগী শিক্ষাদর্শনের বাস্তবায়ন যথার্থই একটি 'চ্যালেঞ্জ'। বিশেষ করিয়া বর্তমান শিক্ষা পরিকাঠামোয় স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী 'সর্বশিক্ষা অভিযান', আর যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' আমরা সরকারিভাবে দেখিতে পাইতেছি—উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এবং সে-পার্থক্য মৌলিক। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের শিক্ষানীতি রুটির জন্য। স্বামীজী-নির্দেশিত শিক্ষানীতির মূল রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতায়।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্বামীজীর নির্দেশকে রূপায়িত করিতে দেয় না। এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রেও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

[ক্রমশ] (পাঁচ)

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যার জন্য 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি' ৪৮২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের পত্র*

সংগ্রহ ঃ নারায়ণচন্দ্র গুহরায়

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, স্থূলশরীর ত্যাগ করলেও বিমূর্ত শরীরে জগতের কল্যাণসাধনে তিনি চিরকাল ব্রতী থাকবেন। মনে হয় সেই কারণেই তাঁর মহাসমাধি তাঁর ব্যক্তিত্বের নতুনতর এবং প্রবলতর অভিপ্রকাশের সূচনাস্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধিলাভ হয়েছিল ৪ জুলাই ১৯০২। কোন কোন বিদগ্ধ চিন্তাবিদ্ ঐ তারিখটিকেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত জন্মদিন বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'স্বামী অভেদানন্দের পত্র সঙ্কলন'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭ বছর পর ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজীকে তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ জানিয়ে দুটি পত্র দিয়েছিলেন। সেইসময় মদীয় গুরুদেব স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন, সেই পত্রদ্বয় থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

॥১॥

বেলুড় মঠ, হাওড়া
৭ই আগস্ট ১৯০২

ভাই কালী

গত ৪ঠা জুলাই রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটের সময় আমাদের পূজনীয় স্বামিজী সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৬ই জুলাই তোমাকে জানাইবার নিমিত্ত তার করিয়াছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন খবর না পাওয়াতে সকলে বিশেষ ভাবিত আছি। তার-অফিসে সন্ধান লইতে যাওয়ায় তাহারা বলিল তুমি নিশ্চিত তার পাইয়াছ। নতুবা খবর আসিত। এই ঠিকানায় তার পাঠাই ঃ অভেদানন্দ, বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক। এতদিন সকলের মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল বুঝিতেই পার, সেজন্য চিঠি লিখিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবে। স্বামিজীর মৃত্যু বড়ই অদ্ভুত। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে তিনি কাশীধামে যান্, সেখান হইতে শরীর খুব খারাপ হইয়া আসেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করান। তাহাতে বেশ সারিয়া উঠেন। একমাস ঔষধ ব্যবহারে হাত পা ফোলা সারিয়া গেল, পেটেও (উদরী হইয়াছিল) জল রহিল না। শরীরে লাবণ্য আসিল এবং জোরও বেশ হইল। কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন—এক মাইল দুই মাইল পথ হাঁটিতে কোন কষ্টবোধ হইত না। এমনকি এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা হইতে কিছুদূরে জাগুলে নামক পল্লীগ্রামে এক বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলেন এবং তাহাতেও কোন অসুখ হইল না। মঠের সমস্ত দেখাশুনা তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন। ইদানীং পূর্ব্বের ন্যায় বৈরাগ্যভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সকলকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া জপধ্যান করিতেন এবং সর্ব্বদাই বলিতেন—'আমার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব কর্ দ্যাখ্ শোন্, আমায় ছুটি দে।' কখনও বলিতেন—'আমার মৃত্যু শিয়রে, কাজকর্ম্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন জগৎ নিক্, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে। ও খেলা কি চিরকাল করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।' ৪ঠা জুলাই তারিখে সকালে ঠাকুরঘরে যাইয়া ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন, দু'চারদিন আগে রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলিয়াছিলেন—'এবার যা হয় একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যানজপ করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।' অন্যদিন সকলের সহিত বসিয়া জপধ্যান করিতেন। সেদিন ঠাকুরের শয়নঘরে একলা বসিয়া ধ্যান করিলেন। তারপর ঠাকুরের বিছানা স্বহস্তে ঝাড়িয়া দিলেন ও নীচে নামিয়া সকলের সহিত বসিয়া বেশ ক্ষুধার সহিত ইলিশমাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়া ভাত খাইলেন। খাবার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সকলকে ডাকিয়া ব্যাকরণ ও যোগ সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল শিক্ষা দেন, যজুর্ব্বেদের "সুষুম্নঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ"—এই পদের টীকা ঠিক করা হয় নাই বলিয়া ঐ পদের নিজের ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইলেন। পরে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে মঠের বাহিরে দুই মাইল বেড়াইয়া আসিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা কেমন করিয়া হইল, এসম্বন্ধে যত

* চিঠি-দুটির বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হলো।—সম্পাদক

ইতিহাস গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলেন। ফিরিয়া আসিয়া পায়খানায় যাইলেন এবং বলিলেন—'আজ শরীর যেমন সুস্থ, এমন অনেকদিন বোধ করি নাই। দাস্তও খুব সাফ্ হইয়াছে।'

সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে যাইয়া মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং বলিলেন—'যতক্ষণ না ডাকি, অন্য ঘরে গিয়া জপধ্যান কর।' একঘণ্টা পরে ডাকিয়া শয়ন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। একজন ব্রহ্মচারী কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ স্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবার পর ডান হাতখানি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। মিনিট দুই ঐরূপ হইবার পর মুখ দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। পরে মিনিট দুই আবার স্থির থাকিয়া মুখ দিয়া আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং সেইসঙ্গে মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির হইয়া রহিল, আর মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল। এইরূপ দেখিয়া মঠের সকলকে ডাকা হইল, সকলে দেখিল হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ী নাই। ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার মজুমদার আসিয়া বলিল—শরীর ত্যাগ করিয়াছেন।

পরদিন অপরাহ্নে বেলা ৪টার সময় শরীর অগ্নিসাৎ করা হইল। মুখের সে অপূর্ব্ব ভাব শেষপর্য্যন্ত যে দেখিয়াছিল সেই মোহিত হইয়াছিল।

তাঁহার সমাধিস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার কথা হইয়াছে। যদি তাঁহার বন্ধুরা এবিষয়ে কিছু সাহায্য করেন তো পাঠাইও।

গঙ্গার পশ্চিমপারে মঠের ভিতরেই তাঁহার শরীর অগ্নিসাৎ করা হয়। ইহার ঠিক অপর পারেই গুরু মহারাজের শরীর অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল।

তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়া চলিয়া গেলেন। এখন যেসকল কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি, রাখাল প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যাহাতে বজায় থাকে তাহার উপায় করিও।

হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ) স্বামিজীর শরীর ত্যাগের ১৫দিন পরে এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছে বুঝিতেই পারিতেছ। তিনি তো একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমার এবং মঠের সকলের ভালবাসা ও নমস্কার জানিও ও পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও। ইতি—

দাস
শরৎ

॥২॥

বেলুড় মঠ
২০ আগস্ট, ১৯০২

ভাই কালী,

আমরা এখন যেন জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। সে শক্তি, সে উৎসাহপূর্ণ আদেশ, সে উদার ভাবের আলোচনা আর নাই! কবিরাজী চিকিৎসায় তাঁর শরীর বেশ সেরে উঠেছিল, বিশেষ কোন অসুখই ছিল না। ঠিক ইচ্ছা করে শরীর ছেড়ে দিলেন!

প্রায় দুইমাস হতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যান ভজন করাতেন এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হতে বৈরাগ্যের ভাব খুব প্রবল দেখতুম। 'কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জয়েৎ' প্রায় এই শ্লোক আওড়াইতেন। আর জিজ্ঞাসা কত্তেন—'হাঁরে, ঠাকুর কোন্ দুটি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন', বলে 'ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী' ও 'কবে সমাধি হব শ্যামাচরণে' এই গানগুলি গাইতেন। তুমি জান, কাজকর্ম্মের ভাব তাঁতে কোনদিন কম ছিল না। ১০।১৫ দিন পূর্ব্বেই কাশীতে একটা আশ্রম খুলিবার জন্য তারকদাদাকে পাঠাইয়াছিলেন। মঠে একটী বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন—এই ইচ্ছা কদিন হতে খুব প্রবল হয়েছিল। শেষের দিনেও বেদ-সংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়। আমার সঙ্গে ঐদিন বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বেদ পড়িয়া কি হবে? 'কুসংস্কারগুলো যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন।

কার্য্যগতিকে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ২।৪ দিন কলিকাতায় ছিল। পুরাতন লোকের মধ্যে গোপালদাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ও আমি মঠে ছিলাম। কোন অসুখই ছিল না, বুঝতে পাচ্ছ? ঐদিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফূর্ত্তি কত্তেন সেইরূপ স্ফূর্ত্তি হাসি বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কত হলো। যেমন গরম দুধ ও ফলাদি খান সেইরূপ খেলেন ও আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ কল্লেন। তারপর গঙ্গার একটা ইলিস মাছ এ বৎসরে এই প্রথম কেনা হলো। তার দাম নিয়ে আমার সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙ্গাল ছেলে ছিল, তাকে বল্লেন—'তোরা নতুন ইলিস পেলে

নাকি পূজা করিস্, কি দিয়ে পূজা কত্তে হয় কর্।' তারপর বেড়াতে বেড়াতে আমায় বল্লেন—'আমার কেন নকল করবি, ঠাকুর নকল কত্তে বারণ কত্তেন। আমার মত উড়নচড়ে হবিনে।' ঐ বেদ-বিদ্যালয় নিয়ে আবার কত কথা হবার পর সুষুম্না সম্বন্ধে বেদে কি লিখেছে দেখিয়া বলিলেন—'টীকা ঠিক নহে, তোরা মূল থেকে মানে করবার চেষ্টা করিবি।'

আন্দাজ ৮।।০টা বেলার সময় তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করবার জন্য উঠিলেন। আমি প্রায় ৯।।০টায় পূজার জন্য ঠাকুরঘরে উঠিলাম। আমায় দেখে কহিলেন—'আমার আসন ঠাকুরের শয়নঘরে করে চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দে।' অন্যদিন আমি পূজা করিলেও ঐ পূজার ঘরের এক কোণে স্বামিজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্যমত করিলেন। আন্দাজ ১১টার পর ধ্যান থেকে উঠিয়া—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো' গুণগুণ রবে এই গান গাহিলেন। আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত সেই ইলিস মাছের ঝোল অম্বল ভাজা দিয়া ভোজন করিলেন। কহিলেন—'একাদশী করে খিদেটা বেড়েছে, ঘটিবাটিগুলো ছেড়েছি কষ্টে।' আহারের পর নানা কথা কয়ে কিছু বিশ্রাম করলেন।

বেলা একটার পর আমায় তুলে বলিলেন—'চল পড়িগে, সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুম হলো না। একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে, brain weak হয়েছে, দেখছি।' তারপর library-র ঘরে বসে তিন ঘণ্টা পাণিনী ব্যাকরণ পড়াইলেন। চারিটার পর আমায় সঙ্গে নিয়ে বাগানের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলেন। একটা বাগান দেখিয়া তোমাদের Leggett সাহেবের বাগানের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে দেশে অল্প লোকে machine-এর সাহায্যে বড় বড় বাগান কেমন সাফাই রাখে। ৫।।টার পর মঠে ফিরিয়া বাহ্যে করে এসে আমায় European Civilisation-এর History তন্ন তন্ন করে বুঝাইলেন, তারপর History of Colonies-এর কথা বলিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমি ঠাকুরঘরে গেলে আমাদের শশীর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) বাবার (ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী) সহিত অনেকক্ষণ কথা কয়ে স্বামিজী উপরে গিয়া আর একবার পায়খানায় গেলেন। ব্রজেন্দ্র বলে একটা বাঙ্গাল ছেলে তার সঙ্গে সেসময় ছিল। পায়খানা হতে এসে বলেন যে,—'আজ আমার শরীর বড় হাল্কা বোধ হচ্ছে। আজ বেশ আছি।'

নিজের ঘরে বসে ঐ ব্রজেন্দ্রকে 'আমার মালা দুছড়া দে' কহিলেন। আর উহাকে অন্য ঘরে যাইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন, 'ডাকিলে আসিস।' প্রায় একঘণ্টা বাদে উহাকে ডাকিয়া বাতাস করিতে ও পা টিপিয়া দিতে বলিলেন। পা টিপিয়া দিতে দিতে তাঁর নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধঘণ্টা নিদ্রাবেশের পর তাঁর হাত ঈষৎ কাঁপিল ২।৪ সেকেণ্ডের জন্য। ইহার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস মুখ দিয়া ত্যাগের পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গোপালদাদাকে ডাকিয়া বলে—কি হইল দেখুন। ইহার দু-এক মিনিট পরে আমি গিয়া সমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে ডাকিয়া স্বামিজীর কানে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের নাম করিতে লাগিলাম—যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। কি সে জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল! কি সে স্বর্গীয় তেজোপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র! কেবল কৌপিন পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব্বকান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল! তারপর দিবসেও সে মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখ শোক দূর হয়েছিল। ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন! কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মজুমদার (বরানগরবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডাক্তারকে আনান হইল। শরৎ, রাখাল ও সাণ্ডেল (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) রাত্রে আসিল। ডাক্তারেও ঠিক করে বলিতে পারিল না যে, কোন্ রোগে এরূপ হইল।

ঠাকুর যে বলিতেন—'তুই যেদিন স্বস্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি।' তাই হইল! যেস্থানে দাহ হয় সেইস্থানে একটি শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে নাটমন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে।

কলিকাতার লোকেও একটা Memorial Meeting করবার চেষ্টা কচ্ছে। মাদ্রাজে এরূপ একটা হয়ে গেছে, টাকাও উঠছে।

রাখালভায়া তোমায় চিঠি লিখিতেন, কিন্তু কদিন হতে তাঁর সর্দ্দি ও জ্বর হয়েছে। শরৎ কলিকাতায় গিয়াছে। এখানে এসেই হরিভায়ার জ্বর হয়েছিল। আজকাল ভাল আছেন। সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছে হরিভায়ার স্থানে; স্বামিজী পূর্ব্বেই ইহা বন্দোবস্ত করেছিলেন।

আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামিজীর কার্য্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এই আমাদের সংকল্প। তুমি কেমন আছ লিখিবে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে। পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী জয়রামবাটীতে ভাল আছেন।

শুনিলাম সু— আমেরিকায় যাইতেছে। সে আমাদের অপবাদই করে থাকে। তুমি সাবধানে তার সহিত ব্যবহার করিও। ইতি

দাস
বাবুরাম

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥১॥

শ্লোকার্থ ঃ *অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, আপনি প্রথমে শাস্ত্রীয় কর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। পরে শাস্ত্রসম্মত কর্ম অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন। ইহাতে আমি বিভ্রান্ত হইয়াছি। এই দুইটি পথের যেটি যথার্থ মঙ্গলপ্রদ (মোক্ষপ্রদ), সেইটি সুনিশ্চিত করিয়া আমাকে বলুন।*

ব্যাখ্যা ঃ ২য় অধ্যায় হইতে ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীভগবান কখনো জ্ঞানের কথা, কখনো কর্মের কথা বলিয়াছেন। এখন আবার অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। তাহাতে অর্জুন স্থির করিতে পারিতেছেন না যে, তিনি জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবেন, না কর্মের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন।

[**মন্তব্য ঃ** তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেও অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নিবৃত্তিমূলক জ্ঞাননিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিমূলক কর্মনিষ্ঠার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া অর্জুন বলিয়াছিলেন—"জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন/তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥"—আপনি বলিয়াছেন জ্ঞাননিষ্ঠা শ্রেষ্ঠতর, তবু আমাকে কেন ঘোর কর্মকাণ্ডের সহিত (যুদ্ধ ইত্যাদি) যুক্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন?—সম্পাদক]

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥২॥

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন, কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ—দুই পথেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ লাভ সম্ভব। তবু এই উভয় পথের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস (কর্মত্যাগ) অপেক্ষা কর্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম)-ই শ্রেয়স্কর।*

ব্যাখ্যা ঃ নিষ্কামভাবে কর্ম করা জ্ঞানলাভের আদি এবং অপরিহার্য উপায়। জ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হইলে জ্ঞানলাভ ব্যতীত অন্য কোনদিকেই মন যায় না। এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদিধ্যাসন করাই কর্তব্য। একজন জ্ঞানলাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করিতেছে এবং অপর একজন সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস করিতেছে। শ্রীভগবান বলিলেন, উভয়েই মুক্তিলাভ করিবে। তবে যাহার মন হইতে দেহ এবং আত্মা অভিন্ন—এই ভ্রমবুদ্ধি দূর হয় নাই, তাহার নিষ্কামভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। কর্মের সঙ্গেই ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে মনে যতই বাসনা কমিবে, ততই জ্ঞাননিষ্ঠা বাড়িবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, গৃহবধূ অন্তঃসত্ত্বা হইলে শাশুড়ি কাজ কমাইয়া দেয় এবং সন্তানলাভের পর তাহাকে লইয়াই বৌমা থাকে।

[**মন্তব্য ঃ** শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, কর্মসন্ন্যাসই মোক্ষলাভের উপায়। কিন্তু আত্মজ্ঞানহীন কর্মসন্ন্যাস বিফল। তাহা অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম (ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ফলসমর্পক কর্ম) করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তখন জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং পরিশেষে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।—সম্পাদক]

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৩॥

শ্লোকার্থ ঃ *যিনি দুঃখ ও দুঃখের কারণকে দ্বেষ করেন না, সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না—সেই রাগদ্বেষ-শূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জানিবে। কারণ, হে মহাবাহু, রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন।*

ব্যাখ্যা ঃ সাধকের প্রয়োজন মুক্তিলাভ। জগতের বস্তুর সঙ্গে দেহমনের সংযোগে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়। তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে দেহমনের অতীত আত্মার অনুভব অসম্ভব। তাই বলা হইতেছে, কর্মই কর কিংবা ধ্যানই কর—তোমার মূল উদ্দেশ্য রাগদ্বেষ পরিহার। যে-ব্যক্তি কর্ম করিতে করিতে রাগদ্বেষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারে, সে-ই তো সন্ন্যাসী।

শ্রীভগবান বলিতেছেন, সন্ন্যাস অর্থে কর্মত্যাগ বা অন্য কোন কিছু কিনা তাহা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই

যে, তুমি কর্ম করিবে না কেন? যদি তুমি রাগদ্বেষমুক্ত হও, তাহা হইলেই তো তুমি সন্ন্যাসী হইলে; তাহাতে তোমার কর্মত্যাগ হইল কি না হইল—সেদিকে দেখিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। প্রাথমিক অবস্থা হইতেই রাগদ্বেষ ত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ বিচার ইত্যাদি) এবং যোগ (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ)—উভয়কে পৃথক বলিয়া ভাবিতে থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানিগণ কেহই তাহা বলেন না; কারণ তাঁহারা জানেন, উভয় সাধনেরই একই ফল অর্থাৎ মোক্ষ। সেইজন্য একটি ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফলই লাভ হইবে।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মনে সর্বদাই এই চিন্তা উঠে—'কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট'? লোকে সর্বদাই কেবল 'face value' লইয়া কলহ করে। কিন্তু জ্ঞানলাভের পথে কে কোন্ অবস্থায় আছে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বিচার করা যায় না। সাধারণত কর্মত্যাগ করিলেই লোকে মনে করে, জ্ঞানলাভের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু জ্ঞান বস্তুটি জগতের অতীত। সুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জগতের সহিত সম্পর্ক ছাড়িতে হইবে।

যে জ্ঞানলাভের জন্য মনকে নিষ্কাম করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কর্মযোগী; যে মনকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিচারপূর্বক শান্ত করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে জ্ঞানযোগী। মূলত এই দুই ব্যক্তিই একপথে চলিয়াছে। তবে বাহ্যদৃষ্টিতে একজনকে বিষয়াসক্ত এবং অন্যজনকে অনাসক্ত বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে। ভগবান এই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

মনে কর কর্মযোগকে যদি বলা হয় স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং জ্ঞানযোগকে গবেষণামূলক শিক্ষা, তাহা হইলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। যে স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়াছে, তাহারই গবেষণা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। সুতরাং এদুটিকে পৃথক পথ বলা যায় না।

স্বামীজী কিন্তু বারংবার বলিয়াছেন, আমাদের জন্য জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ (রাজযোগ)—এই চারটির সুষম ও সমবেত সাধনই উপযুক্ত পথ। একই সঙ্গে ভক্তি-সাধন, জ্ঞান-সাধন, নিষ্কাম (ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) কর্ম করিবার অভ্যাস এবং মনকে একাগ্র করিয়া ধ্যানাভ্যাস করা চাই। এই যুগের ইহাই সাধন। এই চারপ্রকার যোগসাধনার কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলিবে না।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

শ্লোকার্থ ঃ *জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে-মোক্ষধাম লাভ করিয়া ব্রহ্মলীন হইয়া থাকেন, নিষ্কাম-কর্মযোগীও সেই একই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ) উভয় পথই একই মোক্ষফলপ্রদায়ক বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত লোকের ধারণা, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিগণই মুক্তপুরুষ আর গৃহস্থরা বদ্ধজীব। কিন্তু শাস্ত্রে বাহ্যসন্ন্যাসকে মুক্তিলাভের একটি উপায়মাত্র বলিয়া মনে করা হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ মনোগত বাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ। গৃহত্যাগ করিবার কথা লইয়া অধিক আলোচনাতে মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়। তাই ভগবান এই শ্লোকে সাধকের দৃষ্টি মোক্ষলাভের মূল কারণটির দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রও একদা B. A. পাস করিতে পারে এবং I. A. শ্রেণির ছাত্রও যথানিয়মে B. A. পাস করিতে পারে—এই কথায় উভয়কেই B. A. পাসের অধিকারী বলা হইল। ঠিক তেমনি ভগবান বলিতেছেন—যদি কেহ মুক্তিকামী হয়, সেক্ষেত্রে গৃহস্থও ধীরে ধীরে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সন্ন্যাসীর কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কর্মযোগ ঃ আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত—এই ধারণা মনে রাখিয়া পূর্বসংস্কারবশত কর্ম করিতে করিতে মনকে ধ্যানমুখী করিবার প্রচেষ্টা।

জ্ঞানযোগ (সাংখ্য) ঃ আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত—এইটি দৃঢ় ধারণা করিয়া কর্মসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা নিদিধ্যাসন (ধ্যান) অভ্যাস করা।

'যোগ' শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান কর্মযোগকেই বুঝাইয়াছেন। কর্মযোগী ভাবিতে থাকেন, 'আমি অনাদিকাল হইতে কর্ম করিয়া আসিতেছি। এখন, আমি অকর্তা চিন্মাত্র—একথা বুঝিলেও হঠাৎ কর্ম ছাড়িতে পারি না। তাই স্বস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্মপ্রবণতার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব—আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয়।'

[**মন্তব্য ঃ** যে যেমন অধিকারী, তাহার অধ্যাত্মসাধন সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে জ্ঞানের অধিকারী, তাহার পক্ষে কর্ম না করিয়া কেবল স্বস্বরূপ চিন্তা দোষনীয় নহে; কিন্তু যাহার মনের মধ্যে কর্মপ্রবণতা আছে, তাহার হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান-সহিত বা বিচার-সহিত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই তাহার পক্ষে কল্যাণজনক। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" অর্থাৎ যাহার যেটি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাব, সেই পথেই তাহাকে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া চলিতে হইবে, অন্যকে কখনো অনুকরণ করিয়া নহে।—**সম্পাদক**] [ক্রমশ] ।।একুশ।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**



শ্রাবণ ১৩১১
জুলাই ১৯০৪

ভক্তের জাতি।

(ভক্তমাল হইতে গৃহীত।)

ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতিবিচার নাই। ভক্তেরা এক স্বতন্ত্র জাতি। এই শাস্ত্রবাক্যের কার্য্যে পরিণতির অনেক উদাহরণ বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।

মুরারিদাস নামে এক ভক্ত ছিলেন—তিনি জাতিতে চর্ম্মকার। তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল। তিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা কহিতেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা ভক্তিরসানন্দে বিভোর থাকিতেন।

সেই স্থানে রসিক মুরারি নামে একজন মোহান্ত বাস করিতেন। তিনি সেই দেশের রাজার গুরু। তিনি সদ্গুণের অতিশয় আদর করিতেন বলিয়া মুরারিদাসকে চর্ম্মকার জানিয়াও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। মুরারিদাস মোহান্তজীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার এগিয়ে যান আবার পাছু হাঁটিয়া আসেন, ঘরে তাঁহাকে বসিতে দিবার উপযুক্ত আসন নাই। কি করিবেন, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দূরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রসিক মুরারি তাঁহার দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুরারিদাস অতি কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর, আমাকে কেন স্পর্শ করিতেছেন? আমি অতি নীচ জাতি—আমি কুক্কুরের অধম।' তখন রসিক মুরারি কহিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্রেষ্ঠ—আপনার আবার জাতি কি? আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিব।' এইরূপ বলিয়া কোনরূপ কৌশলে ঐ চর্ম্মকারের পাদোদক পান করিলেন ও তাঁহাকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া নিজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা পরম্পরায় ঐ সংবাদ শ্রবণে গুরুর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মোহান্তজী একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণাদি কিছুই করিলেন না। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার গুরু, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অথচ আপনি আমাকে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিতেছেন না কেন?' রাজা মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এখানে কেন আসিয়াছেন? যান, সেই মুরারিমুচির বাড়ী যান।' মোহান্তজী দেখিলেন, রাজার অতিশয় জাত্যভিমান। তাঁহার ঐ জাত্যভিমান দূর করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন, 'রাজা, আপনি অতি মুর্খ। বুঝিলাম, ভগবান্ যে আমায় মুরারিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছেন, সে কেবল আপনার তমোনিবারণের জন্য। আপনি আপনাকে একজন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু জানেন না কি, ভক্তে যে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার কখন ভক্তিলাভ হয় না? তাহার প্রতি ভগবানের কৃপাও হয় না, তাহার সকল ধর্ম্মই নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত যেকোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পরম পবিত্র।'

এই সকল উপদেশে রাজার চৈতন্য উদয় হইল।

সংবাদ ও মন্তব্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা শাখা হইতে ইংরাজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। পুস্তকে ঘটনাসন্নিবেশ যদিও অল্প, কিন্তু ইহাতে একবিন্দু অসত্য বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা স্থান পায় নাই। বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তাহা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ এবং ছাপা অতি সুন্দর। আমরা ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের এই কার্য্যতৎপরতায় বিশেষ সুখী হইয়াছি। আশা করি, তাঁহারা একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবনীসঙ্কলনের চেষ্টা করিবেন।



পাশ্চাত্যজাতি ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন, আজকাল তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লাহোরের ভূতপূর্ব্ব বিশপ সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'ধর্ম্মভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত, আধ্যাত্মিকতা তাহার প্রাণ। ভারতবাসী জড়জগতের উন্নতিকেই সভ্যতার মূলমন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করে না। আমরা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইতে যাইতেছি। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত।'



মিস্টার এস. এইচ. সুইনি পজিটিভিস্ট রিভিউ পত্রিকায় হিন্দুগণের সমাজসংস্কার নামক প্রবন্ধে অনেক সারকথা বলিয়াছেন,—'অনেক সংস্কারক অন্ধভাবে ইংরাজদের সবই ভাল ও ভারতের সবই মন্দ, দেখিয়া থাকেন। এই জন্যই অধিকাংশ ভারতবাসী এই সকল সংস্কারের বিরোধী। ভারত ইউরোপীয় সভ্যতার সারগুলি, যথা উহার বিজ্ঞান—আপনার করিয়া লইতে পারে, কিন্তু ধীরভাবে ও বিচারের সহিত অগ্রসর হইলেই প্রকৃত উন্নতি হয়, অপরের অন্ধ অনুকরণে কিছু হয় না।'

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ীরামকৃষ্ণকথামৃত ঃ উৎস প্রসঙ্গ*

স্বামী ভূতেশানন্দ

"ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি॥"

ঠাকুরের 'কথামৃত'-এর সূত্রকার নির্দেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে বসতেন, তখন নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হতো। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রসঙ্গগুলির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত নোট নিয়ে রাখতেন। এঁদের ভিতর একজন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ—তখন 'তারক'—একদিন নোট নিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বললেন ঃ "ওরে, ও তোর করতে হবে না। ওর লোক আছে।" তখন কে কে 'লোক' আছে, তা কেউ জানত না। এইটুকু বোঝা গেল যে, তাঁকে করতে হবে না। মাস্টারমশাই—যিনি 'কথামৃত'-এ 'শ্রীম' নামে বিখ্যাত—তিনি এই কথাগুলির নোট রাখতেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?—সেই নোটগুলি নিয়ে তিনি মনে মনে চিন্তা করবেন। তিনি অতিশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। খালি শুনে গেলেন, তাতে তাঁর তৃপ্তি নেই। কথাগুলি নিয়ে মনন করবেন—এইজন্য তিনি টুকে রাখতেন। তাঁর ডায়েরিতে এই নোটগুলি যথাসম্ভব সংগৃহীত ছিল।

'কথামৃত'-এর সূত্রপাত

বলা বাহুল্য, ডায়েরিতে সংগৃহীত তথ্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে থাকায় কারো তার থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। অবসর সময়ে যখন তিনি নোটগুলি নিয়ে বসতেন, তখন এক



একদিনের ঘটনা নিয়ে সেগুলির ওপর আধারিত তাঁর চিন্তাধারাকে রেখে, মনে মনে সেদিনের কথাগুলি ভাবতেন। এককথায়, ঐগুলি তাঁর ধ্যানের সহায় ছিল। ধ্যান করতে করতে যখন সেদিনের সমস্ত চিত্রটা চোখের সামনে ভেসে উঠত, তখন তিনি কলম ধরতেন এবং সেই চিন্তাগুলি ও সেদিনের ঘটনাগুলি লিখতেন।



তাঁর স্মৃতিশক্তি যে কী অসাধারণ ছিল তা তাঁর 'কথামৃত'-এর লেখনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ঘটনাকে যেন চোখের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাই যখন আমরা এই 'কথামৃত' আলোচনা করি, অনেকসময় বলি যে, সেদিনের ঘটনাটি আমরা যেন ধ্যানের মধ্যে আনতে চেষ্টা করি। তাহলে তার ভিতর নতুন আলোক পাব, নতুন রস পাব, তা জীবনের পক্ষে আরো বেশি কার্যকর হবে। মাস্টারমশায়ের ধারা হলো এরকম। এইভাবে তিনি লিখেছিলেন।

'কথামৃত'-এর আত্মপ্রকাশ

যাঁরা মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যেতেন, তাঁরা কেউ কেউ জানতে পেরে সংগ্রহটি দেখতে চাইলেন। তিনি কাউকে কাউকে তাঁর লেখাগুলি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন, এগুলি প্রকাশ করা দরকার, জগতের অনেক কল্যাণ হবে। মাস্টারমশাই কিন্তু তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এগুলি তাঁর নিজের জন্য লেখা। কিন্তু পরে সকলের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে তিনি 'কথামৃত' প্রকাশ করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রকাশ হলো যখন, তখন স্বামীজী তার প্রশংসা করে যে-কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি 'কথামৃত'-এর ভূমিকাতে উল্লিখিত রয়েছে। শ্রীমাও বলেছেন, 'কথামৃত'-এর লেখাগুলি পড়ে মনে হয় যেন ঠাকুর নিজে সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন।

বৈশিষ্ট্য

'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য হলো—স্বামীজী বলেছেন, এমনভাবে জগতে এর আগে কোন মহাপুরুষের কথাগুলি সংগ্রহ করা হয়নি। কারণ, আগে যেসব মহাপুরুষের কথা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি সংগ্রাহকের প্রকাশশৈলী অনুযায়ী অনুরঞ্জিত হয়েছে। মাস্টারমশাই কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ গুপ্ত রেখে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, ফলে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব ঠাকুরের চিন্তাধারাকে কোনভাবে বিকৃত করতে পারেনি। এটি 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। সেজন্য শ্রীমা বলেছেন যে, যেন সাক্ষাৎ ঠাকুরের মুখ থেকে কথাগুলি শোনা যাচ্ছে। আর স্বামীজী বলেছিলেন, প্লেটো সক্রেটিসের যে-জীবনী লিখেছিলেন, সেটি হচ্ছে 'Plato all over'। সব জায়গাতেই প্লেটো ফুটে উঠেছে। সক্রেটিসের থেকে সেখানে প্লেটোর প্রাধান্য বেশি। কিন্তু ঠাকুরের কথার ভিতর কথামৃতকারের ব্যক্তিত্ব এসে যাতে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না করে, সেইভাবে

* ১৯ অক্টোবর ১৯৮২ কলকাতার যোগোদ্যান মঠে প্রদত্ত ভাষণ। স্বামী ঋতানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

'কথামৃত'কে ভক্তসমাজে পরিবেশন করেছেন। এজন্য এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

কথাসাহিত্যের দিক দিয়েও 'কথামৃত' অসাধারণ। এর পরিচয় আমরা দিন দিন পাচ্ছি। যখন এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তা দু-চারজনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আজ 'কথামৃত' সমগ্র বিশ্বমানবকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করছে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার ফলে যারা বাঙলাভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারাও 'কথামৃত'-এর রস আস্বাদন করতে পারবে। যাদের কাছে 'কথামৃত' পৌঁছেছে—তাদের যদি বিন্দুমাত্র আধ্যাত্মিক পিপাসা থাকে, তাহলে সেই পিপাসা শতগুণে বেড়ে যাবে। এই হলো 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। ভাগবতে আছে—"স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" যত আলোচনা করা যাবে, ততই তার ভিতরে স্বাদ পাওয়া যাবে। 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্যও ঠিক সেইরকম। 'কথামৃত' এমন অপূর্ব জিনিস, যা খানিকটা পড়ে ছেড়ে দেওয়ার নয়। এসম্বন্ধে 'লৌহকপাট'-প্রণেতা জরাসন্ধ তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা বলেছেন আসানসোল রামকৃষ্ণ আশ্রমে উৎসব উপলক্ষ্যে ভাষণ দেওয়ার সময়।

'কথামৃত' পাঠ সম্পর্কে তিনি বলছিলেন: "সব বই কি পড়া হয়ে যায়?" তারপর বললেন: "আমি বক্তা নই। আমি গল্প লিখি।" বলে একটি ঘটনা বললেন—একটি জেলের কয়েদি মেয়ে। দুর্দান্ত মেয়ে। তাকে কেউ সামলাতে পারে না। জরাসন্ধ জেলর ছিলেন। তিনি ভাবলেন, দেখি না মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে। তিনি আলাপ করতে গেলেন। কথায় কথায় সে একেবারে গর্জন করে! তাকে বললেন: "মা, তুমি একটা বই পড়বে?" সে বলল: "বই আবার কি পড়ব? আপনাদের বই মানে তো নীতিকথার প্রেরণা। ওসব নীতিকথা আমি চাই না। ও অনেক জানি।" জরাসন্ধ বললেন: "না, না, খুব সুন্দর কথা। গল্পের ভিতর দিয়ে কথা।" মেয়েটি বলল: "আচ্ছা দেবেন, দেখব।" তা জরাসন্ধ তাকে একখানি 'কথামৃত' দিয়েছিলেন। জেলের ওয়ার্ডেনরা জেলের লাইব্রেরিটি দেখাশুনা করত। ওয়ার্ডেন কিছুদিন পর বইটি ফেরত চাইলে মেয়েটি বই ফেরত দিল না। ওয়ার্ডেন জরাসন্ধের কাছে মেয়েটির নামে নালিশ করল। জরাসন্ধ তখন মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন: "কি গো, তোমার এখনো বইটা পড়া হয়নি?" সে বলল: "সব বই কি পড়া হয়ে যায়?" জেলর বললেন: "বুঝলাম।" তিনি ভাবলেন, মেয়েটি বইটি অনাদরে কোথাও ফেলে রেখেছে, দিচ্ছে না। তিনি আবার বললেন: "আমি তোমায় একটি কিনে দেব, তা তোমার কাছেই রাখতে পারবে।" তিনি একটি 'কথামৃত' কিনে দিলে মেয়েটি বই ফেরত দিল। ঐ যে "সব বই কি পড়া হয়ে যায়?"—ঐ কথাটি আমাদের স্মরণ করবার।

'কথামৃত' পড়া হয়ে যায় না। আরম্ভ করলে ক্রমশ তার ভিতর থেকে নতুন নতুন রস আবিষ্কৃত হয়—সাহিত্যিকের কাছে, আধ্যাত্মিকের কাছে তো বটেই। এই বই কখনো পুরনো হয় না। 'পুরাণ' কথাটি আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত। এর অর্থ 'পুরাপি নবৈব', যা পুরনো হয়েও নবীন, নিত্যনতুন। যত দিন যায়, তত যেন মনে হয় নতুন। যাঁরা 'কথামৃত' খুব আগ্রহ করে পড়েন, তাঁরাও নিশ্চয়ই এটি অনুভব করেছেন। এটি 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য।

'কথামৃত'-এর রচনাশৈলী অদ্ভুত। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেভাবে কথা বলে, যেভাবে চিন্তা করে—হুবহু সেইভাবে কথাগুলি পরিবেশিত। ঠাকুর নিজে কথাগুলিকে পাণ্ডিত্যের প্রলেপ দিয়ে বিকৃত করতেন না, সাদা ভাষায় কথা বলতেন। এইজন্য মানুষের অন্তরকে কথাগুলি সোজা স্পর্শ করত। তাই এটি সর্বজনসমাদৃত। এর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা আছে, সাহিত্যের রস আছে, বৈষয়িক পরামর্শ পর্যন্ত আছে। এর হাল্কা কথার মধ্যে গুরুগম্ভীর ভাব দেখে মনীষীরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এটাও এর বৈশিষ্ট্য।

ভগবান যখন কথা বলেন, তখন পণ্ডিতের জন্য কথা বলেন না। তিনি কোন দু-চারটি লোক, কোন গোষ্ঠীর জন্য কথা বলেন না—সকলের জন্য বলেন। কথাগুলি তাই পুরনো হয়েও নতুন। 'গীতা'য় ভগবান অর্জুনকে বলছেন:

"স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥" (৪।৩)

—আমি সেই পুরনো যোগের কথা তোমাকে বলছি। পুরনো যোগ। প্রাচীন যোগ। ভগবান যেমন নিত্য পুরাতন, কিন্তু আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য নয়, সর্বদা প্রয়োজনীয় বস্তু—এইরকম 'কথামৃত'। এই তার বৈশিষ্ট্য।

আমরা যখন কোন জিনিসের সমাদর করি, তখন বুঝতে হবে—তার রূপটি আমাদের অন্তরের দরজায় আঘাত করছিল প্রকাশিত হওয়ার জন্য। বাইরে তার অভিব্যক্তি যখন দেখি, তখন বলি—এই তো আমি চাইছিলাম। এর নাম হচ্ছে 'সমর্থন', 'সমাদর'। অন্তর থেকে যা চাইছি, তা যেন কেউ আমাদের সামনে রূপ দিয়ে প্রকাশ করছে। 'কথামৃত' তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবরূপ হয়ে 'কথামৃত'-এর ভিতরে ছত্রে ছত্রে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন। এইজন্য 'কথামৃত'-এর এত সমাদর। 'কথামৃত'-এ যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা অপ্রতিহত গতিতে চলবে, দিকে দিকে প্রাণে প্রাণে তা প্রসারিত হবে, যুগে যুগে তার আরো সমৃদ্ধি হবে। দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় তা অনূদিত হচ্ছে এবং হবেও।

আশ্চর্যের বিষয়, আপনারা শুনলে আনন্দবোধ করবেন, জাপানে—যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজি ভাষা বোঝে না, বাঙলা ভাষার তো কথাই নেই—সে-জায়গায় 'কথামৃত' কিভাবে প্রসারিত হয়েছে! আমার সঙ্গে তাদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বছরে বছরে তাদের আগ্রহে আমি জাপান যাই। অনেক সময় চিন্তা করি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে আমরা প্রচার করছি কিনা বা কতটুকু করছি। ভেবে অবাক হতে হয়,

আমাদের সামর্থ্য এত সীমিত, অথচ এত প্রচার চারিদিকে কেমন করে হচ্ছে! এ বোঝা যায় না। অবতার যখন আসেন—'অবতার' শব্দটি বলতে যদি মনে লাগে, তাহলে বলব সেই অসাধারণ বিভূতি যখন প্রকাশিত হন—তখন তাঁর ভাব কি করে চারিদিকে প্রবাহিত হয়, তা আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে বুঝতে পারি না। যেমন আমরা দেখি, কোন একটা সূত্রের এক জায়গার ভাব আরেক জায়গায় প্রচারিত হয়। এখানে যেন কোন একটা স্থায়ী সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আপন বেগে ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কারো চেষ্টায় নয়। ব্যক্তিগতভাবে কারো কৃতিত্ব এর ভিতর নেই। আপনিই সেইসব চারিদিকে প্রসারিত হয়, কেননা মানুষের এর প্রয়োজন ছিল। মানুষ সংসারতাপে তাপিত, নানা সমস্যায় জর্জরিত, নিজেকে অসহায় বোধ করে। মানুষ এর থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল। তাই তাঁর ভাব পৌঁছাল দিকে দিকে। এর জন্য মানুষের প্রচার দরকার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা এখানে স্মরণ করব—"এখানে তো সাইনবোর্ড দেওয়া হবে না। বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হবে না, এখানে তাঁর কথা আলোচনা হবে।" 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যখন ফুল ফোটে, মধুকরকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয় না যে, এখানে ফুল ফুটেছে। যারা মধুপিপাসু, তারা আপনি আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এক বিশেষ সময়ে—যেসময়ে জগতে তাঁর প্রয়োজন ছিল। এইভাবে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর স্থূলশরীর অবসানের পরেও তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলভাবে আছে এবং কাজ করে যাচ্ছে।

'কথামৃত'-এর কথা বোধহয় শেষ হয়েছে। কথা যেখানে ব্যক্তভাবে হয়, সেখানে তার শেষ হয়। আর অব্যক্ত ভাবরূপে যখন সে থাকে, তখন সে অনাদি, অনন্ত, অফুরন্ত। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্থূলশরীরের স্থূলশব্দরূপে না হলেও সূক্ষ্মরূপে ভাবরূপে জগতের কোণে কোণে প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এটি 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। আমরা এই অর্থে 'কথামৃত'কে দেখব। কেবল যে গ্রন্থের কয়েকটি পাতায় ঠাকুরের 'কথামৃত' সীমিত আছে তা নয়; তাঁর অনন্ত ভাবরাশি, তার ভিতর কিছুমাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রন্থের পাতায় আর বাকি সব এখনো অসংগৃহীত। কিন্তু চারিদিকে আকাশে বাতাসে তা ভেসে বেড়াচ্ছে, যেখানে প্রাণ গ্রহণ করতে উৎসুক এবং সমর্থ, সেখানেই তা প্রকাশিত হচ্ছে। যখন ঠাকুর স্থূলদেহে অবস্থান করছিলেন, তখন কয়জনই বা তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন? তখন কয়জনই বা তাঁকে জানতে পেরেছিলেন? একদিন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যখন বাস করতেন, তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির কর্মচারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বরবাসী ঠাকুরের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসতে সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনে তাঁর প্রভাব আমরা কতটুকু দেখতে পাই? শাস্ত্রে বলে, তত্ত্বকথা হলো অনন্ত, বেদ অনন্ত। ঋষিদের ভিতর দিয়ে সেই বেদের প্রকাশ। অমুক মন্ত্রের অমুক ঋষি, তমুক মন্ত্রের তমুক ঋষি। কিন্তু কোন জায়গায় সেই ঋষিরা মন্ত্রের কর্তা নয়, মন্ত্রের প্রকাশক মাত্র। মন্ত্র তাঁদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছে, ফুটে উঠেছে। সেইরকম 'কথামৃত'-এর ঋষিরা—মাত্র একজন, 'শ্রীম' হলেন প্রথম, উৎস বলা যায়। কিন্তু তারপর চারদিকে সেই মন্ত্র বিভিন্ন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এই মন্ত্রের ঋষিরা বহু, বিচিত্র এবং তা কোন দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত নয়। অনন্ত ভাবরাশি অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষেত্র পেলেই সেখানে উপ্ত হয়, অঙ্কুরিত হয়, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়।

'কথামৃত' সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে—কেবল ভাষা হিসাবে নয়, কেবল একটি শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে নয়। অন্তরের ভিতরে আমাদের যে-আকৃতি রয়েছে, যে-আহ্বান রয়েছে, যে-জিজ্ঞাসা রয়েছে—সেগুলিকে আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে যে, কতখানি আমরা 'কথামৃত'-এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি, কতখানি এর দ্বারা আমাদের জীবনের পথ পরিষ্কৃত হতে পারে? আর তা যদি না হয়, 'কথামৃত' আলোচনার দ্বারা হয়তো ভাষাসাহিত্যে কিছু সমৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনে তা ফলপ্রসূ হবে না। এইজন্য অবতার যখন আসেন, তখন তাঁকে কেউ জানতে পারে না। যত দিন যায়, তত জানা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ 'গীতা'য় বলছেন ঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (৯।১১)

—মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে মানবদেহধারী বলে অবজ্ঞা করে। আমার পরমতত্ত্ব তারা জানে না। পরমতত্ত্ব জানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তত্ত্বপিপাসুর কাছে সেই তত্ত্ব ধীরে ধীরে স্বতই প্রকাশিত হয়।

এজন্য কালের প্রয়োজন আছে। আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আর করতে হবে আমাদের অন্তরকে নির্মল ও শুদ্ধ, যাতে আমাদের হৃদয়মুকুরে সেই তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হতে পারে। ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "আমার মুক্তি নেই। আমাকে যুগে যুগে আসতে হবে।" তাঁর কথা আমাদের জীবনে যাতে কার্যকর হয়, সেজন্য আসুন আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রাণভরে প্রার্থনা করি ঃ "হে প্রভু, তোমার আগমন আমাদের জীবনে সার্থক হোক।" ❑

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



মাতৃতীর্থপরিক্রমা

বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার উনবিংশ পর্যায়ে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়।—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর চরণাশ্রিতা ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের (১৬ নং বোসপাড়া লেন—বর্তমানে ১৬এ, মা সারদামণি সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৩) প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। অধিষ্ঠাত্রীও বটে।

নিবেদিতার পূর্বনাম—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামে এক ক্ষুদ্র শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তাঁর জন্ম। পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল ছিলেন পেশায় ধর্মযাজক। মাতার নাম—মেরি ইসাবেল। তাঁর আরো একটি বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি ছিলেন পিতামাতার প্রথম সন্তান। মাত্র দশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তাঁদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাতামহ হ্যামিল্টন—যিনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

মার্গারেটের পাঠ্যজীবন শুরু হয় ইংল্যাণ্ডের এক বোর্ডিং স্কুলে; পরে স্থানীয় কলেজে অধ্যয়ন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৮৪ সালে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৯২ সালে তিনি নিজেই উইম্বলডনের এক অঞ্চলে 'রাস্কিন স্কুল' খোলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখতে থাকায় লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলেও সুলেখিকারূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। প্রথম থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি চার্চে যেতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের পিপাসা মিটত না।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার শেষ করে ১৮৯৫ সালে যখন স্বামীজী লণ্ডনে আসেন, সেইসময় ১৫ নভেম্বর বিকালে ওয়েস্ট এণ্ডের এক অভিজাত মহিলা লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে মার্গারেটও উপস্থিত ছিলেন। মার্গারেট প্রথম দর্শনেই উজ্জ্বলকান্তি ভারতীয় সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ শিশুর মতো কমনীয় চেহারায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হন। এরপর থেকে লণ্ডনে যেখানেই স্বামীজীর বক্তৃতা বা প্রশ্নোত্তরের ক্লাস হতো, তিনি নিয়মিত সেসব স্থানে উপস্থিত হয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করে সব সংশয় দূর করতে চাইতেন। অবশেষে তাঁর বিশ্বাস হয়, যে-ধর্মজীবনের সন্ধানে এতদিন তিনি দিশাহারা হচ্ছিলেন, এই ভারতীয় সন্ন্যাসীই তার সন্ধান দিতে সমর্থ। স্বামীজীও মার্গারেটের সত্যনিষ্ঠা ও মানবদরদি মনের পরিচয় পেয়ে পরবর্তী কালে তাঁকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের, বিশেষত নারীদের শিক্ষার কাজে আহ্বান জানান।

স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্গারেট তাঁর স্বদেশ, স্বজন, প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি চলে আসেন। ভারতে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৭ মার্চ বাগবাজারের ১০।২ নং বোসপাড়া লেনের (অধুনা লুপ্ত) ভাড়াবাড়িতে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রথম দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেন। স্বামীজীর অন্য দুই বিদেশিনী ভক্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গেলে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি সমস্ত সামাজিক রক্ষণশীলতার গণ্ডি



শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য এবাড়িতেই শুরু হয়েছিল নিবেদিতার বিদ্যালয়

ছাড়িয়ে শ্বেতাঙ্গিনী মার্গারেটকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেন। বস্তুত, তিনি সেদিন থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি' হয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন, এমনকি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে তিনি ঠাকুরের ভোগরান্নার অধিকারও লাভ করেছিলেন।

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নামকরণ করেন 'নিবেদিতা'। এর পর থেকেই নিবেদিতার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্বামীজীর কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হয়ে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নানা জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ, এমনকি পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন করে গুরুপ্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেন।

নানা কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি ১৯১১ সালের পূজার ছুটিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে যান। সেখানে ম্যালিগন্যান্ট আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর মাত্র ৪৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ দার্জিলিঙে নিবেদিতার অন্ত্যেষ্টিস্থলের ওপর একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দেহাবশেষের কিছু অংশ বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে, কিছু কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরে, কিছু বাগবাজারে ভক্ত বশীশ্বর সেনের বাড়িতে রক্ষিত হয়। বাকি অংশ ১৯১২ সালের ১২ অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর পিতামাতার সমাধিপার্শ্বে প্রেরণ করা হয়।

❊ ❊ ❊

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার মাতা-কন্যার এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মায়ের কাছে থাকবেন বলে তিনি প্রথমে ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি এই বাড়িতে ৮-১০দিন বাস করেন; পরে নিকটবর্তী ১৬ নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে চলে গেলেও তিনি প্রতিদিন দুপুরবেলা মায়ের কাছেই কাটাতেন।

নিবেদিতাকে স্বামীজী ভারতবর্ষে এনেছিলেন এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। নিবেদিতা যখন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে মেয়েদের স্কুল খুলতে উদ্যোগী হলেন, তখন স্বামীজীর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি উদ্যোগী হয়ে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের মেয়েরা যাতে নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি হয়, তার ব্যবস্থা করেন। এরপর আসে সেই শুভদিন—১৩ নভেম্বর ১৮৯৮। এদিন প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতার স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ও সকলকে আশীর্বাদ করেন। এদিন ছিল দীপান্বিতা কালীপূজা। পূর্বদিন শ্রীশ্রীমা বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "পরদিন (১৩।১১। ১৮৯৮) রবিবার, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীমা স্বয়ং ১৬ নং বোসপাড়া লেনে আগমন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।... শ্রীমা গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত আগমন করেন। তিনি তখন অতি নিকটেই (১০।২ বোসপাড়া লেনে) অবস্থান করিতেন। বলরাম বসুর ভবন হইতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি তাঁহার মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশে আশীর্বাণী করিলেন—'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।' গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া সমবেত সকলকে আশীর্বাণীটি শুনাইয়া দিলেন। এইরূপে স্বামীজীর সঙ্কল্পিত একটি মহৎ কার্যের উদ্বোধন হইল। 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।'—ইহাই নিবেদিতার অভিমত।... ১৪ নভেম্বর, সোমবার বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। ঐদিনও স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে লইয়া বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন।"[১]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি নিবেদিতার গভীর ভালবাসা এবং তাঁর বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে যে অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হতো, সেসম্পর্কে সরলাবালা সরকার লিখেছেনঃ "ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি, একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে-আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐসময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন।

"মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐকথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্রপুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনো বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনো দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।"[২]

নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনের একটি মর্মস্পর্শী চিত্রঃ "একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 'মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মায়ের গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরদালানে বসাইলেন। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।"[৩]

নিবেদিতার বিদ্যালয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "১৩১০ সালের পৌষ মাসে স্বামী সারদানন্দজী মাতাঠাকুরানীর অবস্থানের জন্য ২।১ নং বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িটি (নীলমণি শান্তিধাম) ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ মাসে (১৯০৭-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি) কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমা ঐ বাড়িতে উঠেন। এখানে তিনি প্রায় দেড়বৎসর ছিলেন।... বাগবাজারের ঐ বাটীতে অবস্থানকালে শ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাঁহার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়িতে তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং ছুটির দিনে ঐ গাড়িতে কখনো কখনো গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কোম্পানি বাগান, কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া আসিতেন।"[৪]

১৬ নং বাড়িটি সম্পর্কে আরো জানা যায়ঃ "এই বাড়িতে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারির শেষে নিবেদিতার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত চা-চক্রে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ মিলিত হয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা ১৯০০ সালের অক্টোবর থেকে রাধু, সুরবালা, নীলমাধব ও ভানুপিসিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মাস বাস করেন।"[৫]

নিবেদিতার দেহত্যাগে শোকাহত শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "আহা নিবেদিতার কী ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কী করবে ভেবে পেত না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিয়েও সঙ্কুচিত হচ্ছে।" কিছুক্ষণ পর আক্ষেপের কণ্ঠে তিনি বলেনঃ "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?"[৬]

❊ ❊ ❊

নিবেদিতার বাসভবন তথা স্কুলবাড়িটির নম্বর ছিল '১৬'। বর্তমানে এটির নম্বর '১৬এ'। এবাড়িতে নিবেদিতা বেশ কয়েক বছর বাস করেছিলেন। এটি ছিল সাবেক কালের এক দোতলা বাড়ি। এই বাড়ির তৎকালীন বর্ণনা পাওয়া যায় সিস্টার দেবমাতার এক পত্রে। অনূদিত পত্রটি এইরকমঃ "বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরি প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে গাড়ি ঢোকার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি সরু লম্বা খিলানযুক্ত ঘরের মধ্যে—সেটাই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির ওপরে ছড়িয়ে থাকা বারান্দার দিকে—এই দুইদিকে জানালা আছে। স্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক রবিবার গোটা বিকাল বসেছিলাম।"[৭]

প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়ের কোন নাম ছিল না; পাড়ার লোকেরা বলত—'নিবেদিতা স্কুল'। নিবেদিতা স্বয়ং পরে এর নামকরণ করেন—The Ramakrishna School for Girls। তাঁর তিরোধানের পর ১৯১৮ সালে এটি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে আসে, তখন এর নাম হয়—The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girls' School। অবশেষে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধীনে আসার পর ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে—Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School। এর বর্তমান

ঠিকানা—৫ নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩। ১৯২০ সালে এই নতুন ভবনের ভিতপূজা হয় এবং ১৯২২ সালে এর উদ্বোধন হয়।

১৬ নং বাড়িতে ৮ মাস স্কুল চলার পর ১৮৯৯ সালের গরমের ছুটির আগে ১৬ মে শেষ ক্লাস করেছিলেন নিবেদিতা। তারপর এই বাড়ি ছেড়ে তিনি উঠেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থানে। জুন মাসের ২০ তারিখে স্কুল বন্ধ করে তিনি পাশ্চাত্যে রওনা হয়েছিলেন স্কুলের জন্য অর্থসাহায্যের উদ্দেশ্যে। আড়াই বছর পর ১৯০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতে ফিরে ওঠেন পাশের ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং সেখানেই আবার স্কুল শুরু হয় সরস্বতীপূজার দিন থেকে। পরে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্থানাভাবের কারণে কিছু-দিনের জন্য আবার ১৬ নং বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়; কিন্তু পরে অর্থাভাবে ছেড়ে দিতে হয়, ১৭ নং বাড়িতেই স্কুল চলতে থাকে। (বর্তমানে এই বাড়িটির অস্তিত্ব নেই, এখন-কার পি/১১ ও ১৭ নং বাড়ি জুড়ে ছিল এর অবস্থান।)



বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

১৯০৭ সালে দ্বিতীয়বার নিবেদিতা পাশ্চাত্যে গিয়ে ১৯০৯ সালে ফিরে আসেন এবং তৃতীয় ও শেষবারের মতো পুনরায় ১৯১০ সালে পাশ্চাত্যে যান এবং ১৯১১ সালে ফিরে আসেন। ঐবছরই পূজার ছুটিতে দার্জিলিঙে 'রায় ভিলা'তে বসে তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ৭ অক্টোবর ১৯১১ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের নামে অর্পণ করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরা স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়টি নিবেদিতার উইল অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে আসার পর এটির নিজস্ব ভবনের জন্য মিশনের কর্তৃপক্ষ তৎপর হন এবং পরবর্তী কালে বর্তমান নতুন ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সালে বিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত ভবনের (৪সি, নিবেদিতা লেন) দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত। ১৯৬৩ সালে বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশন নবগঠিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করেন।

১৬ ও ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি-দুটিতে ভাব ও কর্ম-বিনিময়ের সূত্রে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয় সরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলি প্রমুখ। এছাড়া ই. বি. হ্যাভেল, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, কাকুজো ওকাকুরা, লেডি মিণ্টো প্রমুখ বিশিষ্ট বিদেশিও এখানে এসেছেন।

১৬ নং বাড়িটির সম্মুখে একটি পাথরের ফলকে লেখা আছেঃ "এই ঐতিহাসিক ভবনে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার (অধুনা ১৬এ বোসপাড়া লেন)। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার পুণ্যদিনে এখানেই ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বালিকা বিদ্যালয়টি (বর্তমানে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) শুরু করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এও শ্রীশ্রীমা কিছুদিন বাস করেছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৮ বা তার পরদিন শ্রীশ্রীমা রাধুকে নিয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন। এসম্পর্কে ব্রহ্মগোপাল দত্ত লিখেছেনঃ "শ্রীশ্রীমা অসুস্থ রাধুকে নিয়ে 'উদ্বোধন' থেকে ৫৩।২, বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এর দোতলার ঘরে (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘর) কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসেন, কারণ ওখানকার গোলমাল রাধুর সহ্য হতো না। এই বাড়িতে ১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি যোগীন-মা দৌহিত্র

কার্ত্তিকের (পরে স্বামী নির্লেপানন্দ) হাত দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য আনাজ-ফল-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠান। কার্ত্তিককে মা বললেন, 'আহা বাবা, তুমি এগুলো কষ্ট করে নিয়ে এলে! যোগীনের যেমন কাণ্ড!...' কার্ত্তিক বললেন, 'কেমন আছেন আপনি যোগীন-মা জিজ্ঞেস করেছেন।' মা বললেন, 'আছি আর কেমন! এই দেখ না, বাঁখারি বেঁকিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে ধনুক করে, কাঠের লম্বা তীর লাগিয়ে সারাটা দিন কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কাকের আওয়াজে পর্যন্ত রাধুর কষ্ট হয়।' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আর বোলো, রাম অবতারে সীতাকে তীরধনুক ধরতে হয়নি, এবার রাধু আমাকে দিয়ে তাও ধরালে!' ঐবাড়িটি বর্তমানে ৫৩।২এ ও ৫৩।২বি—এই দুই অংশে বিভক্ত। ৫৩।২এ অংশটি দেখলে বাড়িটির প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। ৫৩।২বি অংশেই দোতলায় মা থাকতেন; এটির অনেক অদলবদল হয়েছে।"[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালের শেষদিকে ভগিনী সুধীরাদেবী 'মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে আশ্রম বিভাগ ও ছাত্রীনিবাস খোলেন। কিন্তু ১৭ নং বাড়িতে স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় অল্প কিছুদিন পর তা ৬৮।২বি, রামকান্ত বোস স্ট্রিটে উঠে আসে। এর তিনবছর পর ছাত্রীনিবাসটি ৫৩।২ নং বোসপাড়া লেনে স্থানান্তরিত হয়। এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "[সম্ভবত ১৭ নং বাড়িতে] মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সুধীরার অনুরোধে শ্রীশ্রীমা একদিন আসিয়া স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন।... একবার শ্রীশ্রীমা বোর্ডিং বাড়িতে [৫৩।২ নং বাড়িতে] আসিয়া কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র সুধীরা 'মা'র জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নিজে বোর্ডিং-এর ছাত্রীদের সঙ্গে অপর বাড়িতে গিয়া কষ্ট করিয়া থাকিতে লাগিলেন। মায়ের সেবার জন্য একজন বয়স্কা ছাত্রীকেও নিযুক্ত করিলেন। শ্রীশ্রীমা প্রায় মাসাধিক কাল মাতৃমন্দিরে [স্কুল বোর্ডিং-এ] বাস করেন ও এসময়ে তিনি স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিতেন।"[৯] ❑

পথনির্দেশঃ বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ঠিকানাঃ ১৬এ, বোসপাড়া লেন (মা সারদামণি সরণি), বাগবাজার, কলকাতা-৩। বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পাশের গলিতে ঢুকে ডানদিকে প্রায় শেষ প্রান্তে এই বাড়ি। এর পরে আরেকটু এগিয়ে বামদিকের গলি (এটিও মা সারদামণি সরণি) দিয়ে কিছুটা গেলে ডানদিকে পড়ে ৫৩।২বি নং বাড়িটি—যেখানে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং ছিল। এই রাস্তাটি উত্তরদিকে বাগবাজার স্ট্রিটে গিয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র

১ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১ম সং, পৃঃ ১৩৫-১৩৬
২ নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৪ সং, পৃঃ ৪০-৪১
৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ২০শ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৩০৮-৩০৯
৪ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩শ সং, পৃঃ ১৫৫-১৫৬। পরবর্তী কালে প্রাপ্ত আরো কিছু তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, ২।১ নং বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে (নীলমণি শান্তিধাম) শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ১৯০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি—১৯০৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়। (দ্রঃ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮০৮)
৫ 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩। ঐসময়ে স্কুল বন্ধ ছিল এবং নিবেদিতা তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। মা প্রায় একবছর এই বাড়িতে ছিলেন।
৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১০
৭ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৩৮
৮ 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩
৯ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ঃ সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃঃ ২৫-২৬

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অনুষ্ঠান-সূচীঃ ভাদ্র ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী নিরঞ্জনানন্দ**
শ্রাবণ পূর্ণিমা
১৪ ভাদ্র, সোমবার
(৩০ আগস্ট ২০০৪)

শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী
২১ ভাদ্র, সোমবার
(৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

স্বামী অদ্বৈতানন্দ
শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী
২৮ ভাদ্র, সোমবার
(১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ১০, ২৫ ভাদ্র
বৃহস্পতিবার, শুক্রবার
(২৬ আগস্ট, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় কৃষিগবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী বশী সেন

রণতোষ চক্রবর্তী

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ভাবনা আছে, যেন বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী। অতীত দিনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বিজ্ঞানের সত্যকে ধর্মীয় কারণে বাধ্য হয়ে অন্তত সাময়িক কালের জন্য অন্ধকারে থাকতে হয়েছে। সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীকে অত্যাচারিত হতে হয়েছে ধর্মান্ধ মানুষের কাছে। যদিও একথা সকলেই মানবেন, বিজ্ঞান হলো এক সুশৃঙ্খল সুষম চিন্তাধারা বা প্রণালী, যার ভিত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন, যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্ম যে কোন বিপরীতমুখী ধারা নয়, তা যুগে যুগে চিন্তাশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা বলে গিয়েছেন। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতির কার্য-কারণের সম্পর্কের রহস্যই হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবনা হলো ধর্মীয় ভাবনা। বলা বাহুল্য, 'ধর্মীয়' বলতে এখানে আচার-সর্বস্ব ধর্মকে তিনি বোঝাননি। এভাবে আধুনিক যুগের অনেকেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মেলবন্ধন সম্পর্কে নানা মত দিয়েছেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে তেমন কোন ভেদ নেই বলে জানিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত—বলেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ। বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দের জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।" বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের শেষকথা হলো ঃ "Science informs but religion transforms." অর্থাৎ বিজ্ঞান তথ্য দেয়, কিন্তু ধর্ম মানুষের পরিবর্তন ঘটায়।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চা অত্যন্ত জরুরি। এই কারণে প্যারিসে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তরুণ বশীশ্বর সেন। পরবর্তী জীবনে তিনি 'বশী সেন' নামেই বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন। আধুনিক, প্রগতিশীল এবং একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েও বশী সেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবনাকে তাঁর জীবনসাধনার মুখ্য শক্তি হিসাবে স্বীকার করতেন।

বশী সেনের পৈতৃক নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর গড়দরজা পাড়ায় তাঁর জন্ম ১৮৮৭ সালে। অকালে পিতা রামেশ্বরের মৃত্যু হলে সাংসারিক অবস্থার খুব অবনতি ঘটে। স্থানীয় পাঠশালায় পড়া শেষ করে বশী কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পড়াশোনা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। রাঁচিতে এক দিদির কাছে থেকে তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করেন। কিছুদিন বর্ধমানে পড়াশোনা করে অবশেষে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এসসি. পাশ করেন।

ছাত্র বশী সেন যখন কলকাতায়, তখন তাঁর জন্মভূমি বাঁকুড়ার আরেক তরুণ বিভূতিভূষণ ঘোষ কলকাতায় আইন পড়ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বশী সেনের পরিচয় হলো। বিভূতির যাতায়াত ছিল বেলুড় মঠে। একদিন তিনি বন্ধু বশীকেও সঙ্গে নিলেন। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা বশীর কাছে মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। পরিণত বয়সে তিনি বন্ধু বিভূতিকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন ঃ "তুই ত জানিস ভাই যে আমি পাড়াগেঁয়ে মুখ্খু মানুষ ছিলাম।... প্রথম দিন তুই যখন শ্রীশ্রীগুপ্ত মহারাজকে [স্বামী সদানন্দ] দর্শন করিয়ে দিস, পেটভরে তাঁর গালাগালি খেয়েছিলাম। তার পরদিন তিনি আমাকে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন, যার জন্য শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীগুপ্ত মহারাজ এবং মঠের সকলেরই স্নেহ খেয়েচি।"[১]

গুরু স্বামী সদানন্দ শুধু নয়, সেকালের অনেক সাধুর স্নেহ লাভ করেছেন তিনি। তাঁর কথায় ঃ "আমি মহারাজকে [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] প্রথম দেখি হাওড়া স্টেশনে। তিনি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে ফিরছিলেন (১৯০৬ সাল)। আমরা ছাত্ররা ঠিক করলুম গাড়ি থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিজেরাই উহা টেনে নিয়ে যাব গন্তব্যস্থলে। আমি এখনও অনুভব করি তাঁর আশীর্বাদযুক্ত হস্তের স্পর্শ আমার মাথায়, যখন আমি তাঁর পদধূলি নিয়েছিলুম। তারপর মহারাজকে দেখি ১৯১০ সালে। তিনি এসেছিলেন

১ 'উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা ঃ সার্ধ শতবর্ষ সংখ্যা, ২০০৪, পৃঃ ৩২

আমার গুরু সদানন্দকে দেখতে বোসপাড়া লেনে। সিস্টার নিবেদিতা ঐ বাড়ি ভাড়া করেন, যাতে বিভূতি ঘোষ, আমার ভাই টাবু ও আমি স্বামী সদানন্দের শেষ অসুখের সময় সেবা করতে পারি।... লোকে আমাদের তিনজনকে 'সদানন্দের কুকুর' বলত; এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুরা আমাদের তিনজনকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন।"[২]

ইতোমধ্যে ১৯১১ সালে কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটল বশীর অত্যন্ত কাছের দুজন মানুষের। একজন তাঁর গুরু স্বামী সদানন্দ, অন্যজন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী ভগিনী নিবেদিতা। বশী পড়লেন মহা সমস্যায়। নিবেদিতা বশীকে কলেজে পড়ার বা বোসপাড়া লেনে থাকার ব্যবস্থাই শুধু করেননি, তিনি ছিলেন বশীর অভিভাবকও। তাই বশী যখন স্থির করলেন, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেবেন, তখন নিবেদিতা তাঁকে নিরস্ত করেন এবং বিজ্ঞান-কর্মের মাধ্যমে দেশসেবার পরামর্শ দেন। মঠে যোগ না দিলেও বশী আজীবন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুরাগী ছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর বশী জগদীশচন্দ্রের অধীনে কাজ করতে থাকেন। প্রসঙ্গত, ভগিনী নিবেদিতাই বশীকে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বশীকে প্রতি মাসে ২০ টাকা করে দিতেন। জগদীশচন্দ্রের স্নেহধন্য বশী জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকাজের সহকারী হিসাবে উদ্ভিদ বিষয়ে গবেষণা করতেন। আচার্যের সহকারী হয়ে তাঁর সঙ্গে বশী পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে। ১৯২৩ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী গ্লেন ওভারটন জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকাজে আগ্রহী হয়ে এদেশে আসেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ বশীর কাজ দেখে মার্কিন বিজ্ঞানী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে যান।

বিদেশ থেকে ফিরে বশী নিজেই একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন। ১৯২৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুদিন ৪ জুলাই বশী সেন ৮ নং বোসপাড়া লেনে (কলকাতা-৩) তাঁর বাড়ির রান্নাঘরে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি'। শুরুতে দুটি বড় বাক্সই ছিল তাঁর ল্যাবরেটরির সম্বল। বাক্সদুটি পাশাপাশি রেখে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং দিনে করতেন গবেষণাকাজ। অবশ্য এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নানা যন্ত্রপাতিতে ল্যাবরেটরিটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্নেহধন্য, 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ গবেষণারত বশী কি কারণে কলকাতার ওপর আরেকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন?—এই প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়। নানা বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, জগদীশচন্দ্র ও বশীর মধ্যে কিছু মতানৈক্যের ঘটনা ঘটেছিল। তারই ফলে বশীর নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। যদিও তাঁদের মতানৈক্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠিতে বশীকে লিখছেন ঃ "আমার কিছু শিষ্য (ছাত্র) আমার বিশ্বাসের দীপশিখার ঔজ্জ্বল্য যে অম্লান রেখেছে তার থেকে আনন্দের জিনিস আর কি হতে পারে?" প্রত্যুত্তরে বশী জানালেন ঃ "Beloved Master, my little contribution to physiology is from the sparks which emanate from you.... So long as life endures, wherever I might be or whatever fate may bring, you will have at least one disciple, I ask for your blessings."[৩]

রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ভক্ত ও ভগিনী নিবেদিতার স্নেহধন্য হওয়ায় তিনি মিশনের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিদেশি ভক্ত ও অনুরাগীর কাছ থেকে ল্যাবরেটরির জন্য নানা সাহায্য পেয়েছেন। পুরনো বিবরণ থেকে জানা যায়, সিস্টার ক্রিস্টিন ছিলেন নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের একসময়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি বশীকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। বশী ক্রিস্টিনকে মায়ের মতো দেখতেন। মিস ম্যাকলাউড হিমালয়ের নিভৃত স্থান আলমোড়ায় 'কুন্দন-হাউস' নামে একটি বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন। এই বাড়ির পাশেই বশী তাঁর গবেষণাগারটি কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন ১৯৩৬ সালে। বশী সেন আলমোড়াকে তাঁর গুরুর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় জায়গা হিসাবে জ্ঞান করতেন। এছাড়া তাঁর মতে, হিমালয়ের কোলে নিভৃত পরিবেশ হলো সাধনার আদর্শ স্থান। শহরাঞ্চলের বাইরে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়াতে সাহায্য করবে। আলমোড়ায় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পিছনে এই ছিল বশী সেনের ভাবনা।

ইতোমধ্যে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো, সোসাইটি অফ উইমেন জিওগ্রাফার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, আমেরিকান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা গারট্রুড এমার্সনের সঙ্গে বশীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গারট্রুড ভারতে একাধিকবার এসেছেন। এদেশের গ্রামে এসে থেকেছেন বেশ কিছুকাল। এদেশ সম্পর্কে জেনেছেন, লিখেছেন নানা প্রবন্ধ ও একাধিক গ্রন্থ। তাঁর লেখা 'ভয়েসলেস ইণ্ডিয়া'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা—স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত, ১৪১০, পৃঃ ৩৭৩
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া, ১৯৯৮-১৯৯৯; বশী সেন সম্পর্কে স্বামী শিবপ্রদানন্দের লেখা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থটির বিদেশি সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গারট্রুড এমার্সনের সঙ্গে বশী সেনের বিবাহ হয় কলকাতায়, একেবারে হিন্দুমতে। দিনটি ছিল ১৯৩২ সালের ২ নভেম্বর। বশী প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ গবেষণাগারটি তাঁর জীবনের মহত্তম অবদান হলেও আসলে এটি ছিল বশী সেন ও তাঁর স্ত্রী গারট্রুড এমার্সন সেনের সার্থক যুগলবন্দী।

বশী শুধু একজন অসামান্য আধুনিক বিজ্ঞান গবেষকই ছিলেন না, ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন দেশপ্রেমিক, দেশমাতৃকার জন্য আত্মবলিদানে সদাপ্রস্তুত একজন নির্ভীক সৈনিক। এদেশের দুঃখযন্ত্রণা, দৈন্যদশায় তিনি স্থির থাকতে পারেননি। দেশের খাদ্যাভাব, অন্নাভাব—এইসব মৌলিক সমস্যা সমাধানে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেখা যায়, উদ্ভিদ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে গবেষণা থেকে বশী ১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তরে তাঁর যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে গিয়েছেন ফলিত বিষয় নিয়ে গবেষণায়। তিনিই এদেশে প্রথম গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদির সফল সঙ্করায়ণ ঘটিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে তিনি কৃত্রিম মাসরুম চাষের প্রবর্তন করেছিলেন। নানা সবজির গুণগত মান উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁর গবেষণা ছিল সেকালের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া উদ্ভিদের কোষ, কোষতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ হরমোন, সঙ্করায়ণ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণার খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। দেশি-বিদেশি নানা গবেষণা-পত্রিকায় তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর গবেষণাগারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের অধীনে এটি পরিচালনার ভার দেন। হিস্ট্রি অফ আই. সি. এ. আর.-এ বশী সেনের প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ " 'বিবেকানন্দ পার্বত্য কৃষি অনুসন্ধানশালা'—এই নামে এখন যেটি পরিচিত, সেটি 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি' নামে ১৯২৪ সালের ৪ জুলাই অধ্যাপক বশী সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।... স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর সেবার জন্য বশী সেন নিজে এই ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন।... ১৯৩৬ সালে বশী সেন এই ল্যাবরেটরি আলমোড়ায় স্থানান্তরিত করেন।... ল্যাবরেটরিটি উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে আই. সি. এ. আর-কে হস্তান্তর করেন।"

বিজ্ঞান গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করে বশী সেনকে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে তাঁকে 'ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশন' পুরস্কার দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশের নানা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় সদস্যপদে ছিলেন বশী সেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি একাধিকবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

বশী সেনের সঙ্গে প্রথম আলাপের বর্ণনা দিয়ে গেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল 'দেবাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেনঃ "একজন বিশিষ্ট বাঙালির নাম আমরা প্রায়ই শুনছিলুম কথায় কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁর নিজস্ব, সেখানে মস্ত বড় খেতখামার এবং গবেষণাগার... ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন। সাহস করে একদিন সকালে... গেলুম।... শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, বয়স ষাট বছরের কম নয়।... বশীদার বৈজ্ঞানিক সবজির খেত। একটি পেঁয়াজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগুন আড়াই সের। এই অনুপাতে অন্যান্য সবজি। এসব হচ্ছে গবেষণালব্ধ উদ্ভিদ, বিজ্ঞানসম্মত ক্রসব্রিডিং।... ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজস্বত্ব' নিয়ে আণুবীক্ষণিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া (micromanupulation) শুরু করেন।"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।

প্রতি মাসে আমাদের দপ্তরে উৎসব-সংবাদ এত বেশি আসে যে, সেগুলি প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাতে স্বাভাবিকভাবে সংবাদ-মূল্যও হ্রাস পায়। তাই সাধারণভাবে বছরে কোন সংস্থার ২টির বেশি সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আশা করি প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

—সম্পাদক

বশী সেন শুধু একজন বিজ্ঞানীই ছিলেন না, একজন হৃদয়বান মানুষ হিসাবে তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। প্রায় সমবয়সী পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে ভারতের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। প্রসঙ্গত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন সেটি তাঁর লেখা একমাত্র বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়'-এর সূচনা থেকেই স্পষ্ট : "আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটিকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হলো আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশি হয়েছেন, এইটেই আমার সবচেয়ে লাভ।" 'লেখাটি' এবং 'রচনা' বলতে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের কথা বলেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের একজন পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ছিলেন বশী সেন। অথচ তাঁর চিন্তা ও মননের কেন্দ্রটি ছিল ধর্ম ও ভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপাত বিপরীতধর্মী চরিত্রের সার্থক সমন্বয়ে বশী সেনের জীবনসাধনা। প্রথম যেদিন তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলেন, সেদিন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে মনে মনে চেয়েছিলেন—ভক্তি ও বিশ্বাস। শ্রীশ্রীমা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন : "ভক্তি-বিশ্বাস হোক।" আর আঁচলে মুড়ি ও লঙ্কা দিয়েছিলেন।[৪] শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর গেলে বশী সেনের বাড়িতে থাকতেন। বিখ্যাত হয়েও বশী কখনো তাঁর গুরুর কথা ভোলেননি। তাই পরিণত বয়সের লেখা তাঁর চিঠিতেও ধরা পড়ে পূজ্যপাদ গুরুর কথা, পুরনো স্মৃতি। যেমন তাঁর আবাল্য বন্ধু বিভূতি ঘোষকে ১৯৩৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে লিখছেন : "তোর কথা মনে হয় ভাই, সেই বৃহস্পতিবার আগস্ট ১৯০৭ মঠে নিয়ে গিয়ে আমার জীবন সকল রকমেই সার্থক করে দিয়েছিস।... আগামী Oct 22শে Gretrude এবং আমি ২৪শে অক্টোবর দিল্লি থেকে Broadcast-এ বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত।... আমি Science and Religion বিষয়ে বলিব। যদি ওখানে Radio থাকে শোনবার চেষ্টা করিস্।"

অন্য একটি চিঠিতে (২৭ আগস্ট ১৯৪১) লিখছেন : "ভাই বিভূতি,... আজকাল সকালবেলায় যখন 'বেগার' দিই তোর ও টাবুর কথা বেশী করে মনে আসে। ভাবি সেই সব ১৯০৯ ও ১৯১১ শালের দিনগুলি... জয় স্বামী সদানন্দজী কি জয়।।... আমি Business কিছুই বুঝি না। মাত্র এইটী বুঝি যে তুই আমাকে যেখানে জুটিয়ে দিয়েছিলি তার দ্বারা অন্য কিছু হোক বা না হোক 'ভগবান লাভ হয়'। ..... একটা ঠিক জানি যে তিনি আমাদের হাৎ ধরে আছেন। যতটুকু ভালমন্দ যেভাবে পেলে উপকার হয় সেটুকু তিনি ঠিকই দিবেন।" (বানান অপরিবর্তিত)

বশী সেন তাঁর স্বগ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নামে তিনি বিষ্ণুপুরে স্থাপন করেছিলেন একটি শিশু বিদ্যালয়। এইজন্য বশী ও তাঁর স্ত্রী অর্থব্যয়ে কোন কার্পণ্য করেননি। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বিষ্ণুপুরে বশী সেনের বাড়িতে বর্তমানে মায়ের নামে কোন কিছু আছে বলে জানা যায় না। বশী সেন নেই, আছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার গবেষণাগার। স্রষ্টা নেই, আছে তাঁর সৃষ্টি। ❑

৪ 'উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা : সার্ধ শতবর্ষ সংখ্যা, ২০০৪, পৃঃ ৩২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রের জন্য লেখক শ্রীশ্রীমায়ের 'কালোমানিক' বিভূতি ঘোষের পুত্র ও পৌত্রের নিকট কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূচী

- দেবাত্মা হিমালয়—প্রবোধকুমার সান্যাল, ২য় খণ্ড
- 'অমৃত', ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭—২৬ আগস্ট ১৯৭৭ সংখ্যা

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সেবা। সেবার বিভিন্ন উপায় স্বামীজী নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক উপায়ে আর্ত, পীড়িত, অশিক্ষিতের সেবা করা সম্ভব। রোগাক্রান্ত ও পীড়িতের সেবা প্রথম শুরু হয়েছিল বারাণসীতে। এবং পরবর্তী কালে কনখল, বৃন্দাবন ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি হোমিওপ্যাথিক কিংবা অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেনসারি অথবা চলমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে বিভিন্ন মানুষের সেবা মিশন করে চলেছে। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম এবারের প্রচ্ছদে মূল বিষয়বস্তু। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ পাথেয় করে আজ বারাণসী সেবাশ্রম একটি মহীরুহে পরিণত। তেমনি আছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলকাতা), তিরুবনন্তপুরম স্বাস্থ্যমঙ্গলম্, লখনৌ সেবাশ্রম, ইটানগর হাসপাতাল। এগুলি বড় আকারের হাসপাতাল। মাঝারি আকারের আছে রাঁচী স্যানাটোরিয়াম, মুম্বাই, নারায়ণপুর ইত্যাদি।

নি | ন্ধ |

ভক্তিরসের কবি দিলীপকুমার রায়

নিতাই নাগ

প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ "প্রাকৃতজন কাব্যান্ধ; নিজেদের বিচার করবার শক্তি না থাকায় ফরমুলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রে সেইসব ফরমুলার বড় কদর। রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক, সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।"[১] অনুরূপভাবে দিলীপকুমার রায়ের নামেও এই ফরমুলা প্রযোজ্য হয় 'সুরসাধক' তথা 'সুরসুধাকর' হিসাবে। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্র ছাড়াও সাহিত্য-ক্ষেত্রে গদ্যে গল্প-রমন্যাস-স্মৃতিচারণার পাশাপাশি গীতরচনা ও কবিতা লেখায় তাঁর কবিপ্রতিভা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিখ্যাত নাট্যকার, কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র হিসাবে জন্মসূত্রে ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি যেমন কবিসত্তা লাভ করেছিলেন, তেমনি যোগি-কবি গুরু শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে পণ্ডিচেরী আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থিতিকালীন তাঁর কবিসত্তার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বিশেষত, যোগ-শক্তির সংস্পর্শে ও আন্তরিক প্রয়াসে যে তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল—একথা তিনি নানা স্মৃতিচারণায় স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় 'Arts for the sake of Divine Life'-এর আদর্শে সাহিত্য-শিল্প যোগের সহায়ক হিসাবে তাঁকে কবিতা রচনায় আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল।


সুরসাধক দিলীপকুমার রায়

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনামী' থেকে মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রতিদিনের প্রার্থনায়' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিতার মূল সুর ভক্তি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় সঙ্গীতেই কাব্যের সূত্রপাত। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' যেমন গান ও কবিতা হিসাবে সমধর্মী, তেমনি কবি দিলীপকুমারের রচিত সুমধুর গানগুলিও কবিতা হিসাবে সমানভাবে রসোত্তীর্ণ। ভক্ত দিলীপকুমার এখানে যেন 'ভক্তিরস ভাবিতা মতিঃ' নিয়ে ইষ্ট তথা কৃষ্ণের প্রতি 'লোল্যমপি মূল্যমেকল' লোলুপতা তথা আকুলতার ভাব নিয়ে গান ও কবিতা রচনা করেছেন।

এই ভক্তিভাব তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের আদিপর্বে যখন মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠের মাধ্যমে। তারপর শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, কথামৃতকার শ্রীম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রিয়জনদের পূতসঙ্গ ও সাক্ষাৎকার করে ধন্য হন। 'কথামৃত' পড়ার পর থেকে তিনি ভালবাসতে শেখেন ভক্তিরসবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে।

'কথামৃত' বারবার পড়ার ফলে ঠাকুরের উক্তিগুলি জপমন্ত্রের মতো তাঁর অন্তরস্থ হয়ে গিয়েছিল। পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে তাঁর চোখের জলে গ্রন্থের পাতা সিক্ত হতো। ঠাকুরের ভাবধারায় অভিস্নাত হয়ে বাল্যকালেই তিনি জেনেছিলেন—"ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য" এবং পরবর্তী কালে এই লক্ষ্যটি সামনে রেখে তাঁর সমগ্র জীবন পরিচালিত হয়েছে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে একথার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ "আমি ভাগ্যবান বলেই এত অল্প বয়সে পেয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা।... সর্বকারণকারণম্—the light of lights, the cause of causes, the king of kings, the leader of leaders—তিনি যুগে যুগে তাঁর প্রিয় প্রতিনিধি সন্তানদের মুখ দিয়ে কথা কন—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের মধ্যে একজন সেরা প্রতিনিধি। যে করেই হোক তাঁকে আমার বালক মন এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছিল যুগাবতার বলে, কারণ আমার স্বধর্ম ছিল সন্ধান—আর চাইতাম সত্যি ভক্তিকেই বটে—যে নিত্য করে অসাধ্য-সাধন।"[২]

তিনি আন্তর অভিজ্ঞতায়, আধ্যাত্মিক চেতনায় উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের একটি বিশেষ ছন্দ আছে, যার নাম দেবতা আবাহনের ছন্দ—ভক্তি-উচ্ছ্বাসে যার সহজ প্রকাশ। এই ভক্তিভাব ছিল তাঁর স্বধর্ম। ভক্তির সূত্রে তাঁর অন্তরে সঞ্জাত evocative power বা আবাহনী শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল যেমনি তাঁর গানে, তেমনি তাঁর কবিতাতেও। এভাবে দেখা যায়, দিলীপকুমার রায়ের কবিসত্তার ভিত্তি হলো ভক্তিরস—যে-ভক্তিরসের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। পরে তাঁর সাধুসঙ্গপিয়াসি মন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধুসন্তের সঙ্গ

পেয়ে মধুকরের মতো ফুল থেকে ফুলে ভক্তির মধু আহরণ করে মনের মৌচাককে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। তবে ভক্তির উচ্ছ্বাসে যুক্তিবাদকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তাঁর সমসাময়িক স্বদেশ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, দেশনেতা, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখদের সাহচর্যলাভের মধ্য দিয়ে একথার যথার্থতা বোঝা যায়। কবির জীবন থেকে তাঁর সৃষ্ট কবিতা পৃথক নয়; তাঁর জীবনসমুদ্র মন্থন করে যে-অনুভূতির অমৃত উত্থিত হয়, তারই প্রকাশ ঘটে কবিতায়। দিলীপকুমারের জীবনদর্শন এভাবে তাঁর কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি দিলীপকুমারের কবিতাগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণির কবিতাগুলি হলো অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক অনুভূতি—ভাবকল্পনা ও সাধনার আলোকে দীপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির কবিতাগুলি হলো অনুবাদ কবিতা। তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি জীবনাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ।

১৯৩৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'অনামী' প্রকাশিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'অনামী' পড়ে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সরস্বতী তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন।"[৩] কবিগুরু স্বয়ং দিলীপকুমারের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন। এরপর তাঁর 'অনামিকা', 'সূর্যমুখী', 'মধুমুরলী', 'প্রতিদিনের তীরে', 'দিনে দিনে', 'প্রতিদিনের প্রার্থনায়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দিলীপকুমারের কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধের ছাপ যথেষ্ট। কবিতা রচনায় আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দ নিয়ে তিনি কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি।

ভক্তিরসের প্রগাঢ়তা তাঁর কবিতাগুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল। যেমন 'মধুমুরলী' কাব্যে 'অকিঞ্চন' কবিতায়—

"বহু দুর্লভ তুমি হে শ্যামল! আপনি না দিলে ধরা
কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুস্বরা?"[৪]

আবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতায় তিনি ঠাকুরের প্রতি ভক্তিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন এভাবে ঃ

"তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার;
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানেনি আর।"[৫]

এভাবে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামদাস প্রমুখ মহাপুরুষগণের স্তবস্তুতি ও মহিমাব্যঞ্জক বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন।

তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিদিনের প্রার্থনায়' প্রকাশিত হয় তাঁর দেহত্যাগের পর ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে। এখানে কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে ভক্তসাধক দিলীপকুমার তাঁর ইষ্টের চরণে অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন। কবিতাগুলিতে তাঁর ধর্মীয় সাধনার বর্ণাঢ্য অনুভূতির সাক্ষর যেমন রয়েছে, তেমনি এগুলির ভাষা, ছন্দ, পদবিন্যাস, ভাবলালিত্য ভগবদ্‌ভাবুক রসিকদের মুগ্ধ করবে। এরকম দু-একটি উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি হলো 'অন্তঃশ্রুতি' কবিতায়—"নিঃস্ব পায় বিশ্ব ফিরে—তোমারি প্রসাদে বিশ্বম্ভর।"[৬] 'রুদ্র' কবিতায়—"মৃন্ময়ের ছদ্মবেশে চিন্ময়ের নিত্য অভিসার/ শুধু ফুলে নয়, শুনি বজ্রেও যে শঙ্খ অভয়ারি।"[৭] এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় দিলীপকুমারের বিখ্যাত গান —"সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই/ আজো পড়ে মনে সখি পড়ে যে কেবলি মনে"[৮] একদা সারা ভারতের ভক্তমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কবি দিলীপকুমারের অনূদিত কবিতাগুলিও অনন্য। তিনি নিজে ছিলেন বহু ভাষাবিদ্‌। দেশীয় ভাষা বাঙলা-সংস্কৃত-হিন্দি ছাড়া তিনি বিদেশি ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি প্রভৃতি ভাষাতেও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর অনূদিত কবিতাগুলি প্রধানত হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে সর্বাধিক বাঙলাভাষায় রচিত। হিন্দি ভাষায় সাধিকা মীরাবাঈয়ের ভজন গীতগুলি তিনি অনবদ্য বাঙলায় কবিতা ও গানরূপে অনুবাদ করেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর শিষ্যা ইন্দিরাদেবী ভাবসমাধি অবস্থায় মধ্যযুগের মহীয়সী সাধিকা মীরার যেসকল অপ্রকাশিত গান শুনতে পেতেন, সেগুলি মুখে মুখে বলার পর তিনি তা লিখে নিতেন এবং বাঙলায় অনুবাদ করতেন। এরকম অনূদিত মীরার ভজনের সংখ্যা ৯০০-র বেশি। এসম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো—'শ্রুতাঞ্জলি', 'সুরাঞ্জলি', 'তারাঞ্জলি', 'সুধাঞ্জলি' প্রভৃতি। এছাড়া, মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধক কবীর দাস, সন্ত তুকারাম, দাদূ প্রমুখের রচনার কিছু অংশের অনুবাদও তিনি অপূর্বভাবে সম্পন্ন করেন।

মহাভারত ও ভাগবত থেকে বিশেষ বিশেষ ভক্তিরসাত্মক উদ্দীপনাময় অংশগুলির মূল সংস্কৃত থেকে তিনি বাঙলায় কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। এজাতীয় রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'ভাগবতী কথা', 'মহাভারতী কথা' ও 'কৃষ্ণকাহিনী' গ্রন্থে। 'ভাগবতী কথা'র মুখবন্ধে এজাতীয় রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "আমি বৈষ্ণবচরণের রেণুকামী—এই উপলব্ধিই 'ভাগবতী কথা'র আদিম প্রবর্তনা। তাই তো ভক্তির ছন্দে লিখতে সাধ জাগল—বিশেষ করে ভক্তের কথা, যিনি ভক্তিপ্রবাহের নীলসিন্ধু মূর্তি।"[৯]

হুবহু তরজমা না করে ছন্দের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে এখানে তিনি ভাবের দোলা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাবের প্রগাঢ়তায়, ছন্দোবৈচিত্র্যে, অনুবাদের নৈপুণ্যে দিলীপকুমারের অনুবাদ-কৃতি যেমন অসামান্য, তেমনি তা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধও করেছে।

তিনিই প্রথম শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেন। তৎকালীন পণ্ডিচেরী আশ্রমের অন্য কোন শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য বা সাধক এর আগে একাজে এগিয়ে

আসেননি। এক্ষেত্রে তাঁর অনূদিত উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হলো—'In the moon light', 'The Vedantin's prayer', 'Who', 'Revelation', 'Shiva', 'Ahana' প্রভৃতি। তিনি শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের প্রথম অধ্যায়েরও অনুবাদ করেন। এগুলি রসোত্তীর্ণ হিসাবে গুরু শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসালাভে সক্ষম হয়েছিল। এখানে কবি দিলীপকুমারের স্বীকারোক্তি খুবই অনুধাবনযোগ্য ঃ "আমার অনুবাদ-সাধনার সম্পর্কে আরো একটু বলার আছে এই যে, এ সাধনাকে আমি সত্যিই মনেপ্রাণে বরণ করেছিলাম, যার ফলে আমার সাহিত্যিক জীবন প্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল।" এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, তিনি শ্রীঅরবিন্দের ছাড়া জর্জ রাসেল (AE), ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিলটন, ইয়েটস, গ্যেটে প্রমুখ ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান কবিদের রচনার কোন কোন অংশ ভাষান্তর করেছিলেন।

দিলীপকুমারের তৃতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য জীবনাশ্রয়ী কাব্যনাট্যগুলি হলো 'শ্রীচৈতন্য', 'মীরা বৃন্দাবনে' ও 'ভিখারিনি রাজকন্যা'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যরসে ও কাব্যরসে নিজস্ব আঙ্গিকে কবির এজাতীয় রচনা প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। অভীপ্সা, দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধি শিরোনামের তিনটি অঙ্কে 'শ্রীচৈতন্য' কাব্যনাট্য রচিত। একটি আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রেরণায় তিনি এর রচনায় ব্রতী হন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এক অসামান্য চরিত্রচিত্রণ ও অব্যভিচারী ভক্তির কথা এতে স্থান পেয়েছে। মহাপ্রভুর অসীম মহিমার একটি কণা তুলে ধরা যাক। রমা নামে এক ভক্তিমতী নারী শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করে উপলব্ধি করেছেন ঃ "সংশয়ের গ্রন্থি যত হয়েছে মোচন যেন কার জাদুস্পর্শে—সুগভীর কল্পনা-অতীত শান্তি এক অন্তর আমার ছায়, গন্ধ যথা ছায় পুষ্প-পুটে।"[১০] 'মীরা বৃন্দাবনে' দেখা যায়, সাধিকা মীরাবাঈয়ের আরাধ্য প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রতি যে-ব্যাকুলতা তা যেন কবির নিজস্ব অন্তরের অনুভূতি ঃ "শিখাও শরণাগতির রীতি—প্রতি মর্মে কর্মে সাধনায় জাগে যেন এক চিন্তা—কেমনে তোমার রাঙা পায় লভিব আশ্রয়।"[১১]

পরিশেষে বলা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তসঙ্গীতের ঐতিহ্যের পথ ধরে ভক্তিরস হয়তো দিলীপকুমারের কবিতার মধ্যে অকৃত্রিমভাবে রয়েছে, তবে তাদের মতো সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিমা নেই। ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগের সংশয়, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা, সমস্যাসঙ্কুলতা, স্ববিরোধিতা মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। কবির ওপরেও তাঁর কালের ছায়া পড়েছে। তবে কবিতায় নতুন শব্দসম্ভার, ছন্দোবৈচিত্র্য, চিত্রকল্প, উপমা, অলঙ্কার, সূক্ষ্মবোধ, দার্শনিকতা, নির্মিতি, কলা, আঙ্গিকের দিক দিয়ে নব নব প্রকাশোন্মুখতা ছিল। অতিমাত্রায় ভাবালুতা থেকে মুক্ত হার্মনির আমেজ ও ভক্তিপারিজাত-সুরভিত কাব্যসুষমা কবির মৌলিকত্বকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। আজকের আত্মঘাতী সংশয়ী সময়ে তাঁর কাব্য সমাদৃত না হলেও আগামী দিনে চেতনার রূপান্তরে তাঁর গান-কবিতা সুনিশ্চিতভাবে মানুষ মাথায় তুলে ধরবে। ❑

তথ্যসূচী

১ 'নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'—প্রমথনাথ বিশী, কথাসাহিত্য সম্পাদকমণ্ডলী, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮৩
২ স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়, অখণ্ড, সুরকাব্য সংসদ, ৯ম সং, পৃঃ ২১৫
৩ বরণমালিকা ঃ রবীন্দ্রনাথের পত্র, সুরকাব্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪৫
৪ মধুমুরলী—দিলীপকুমার রায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪২
৫ ঐ, পৃঃ ৭
৬ প্রতিদিনের প্রার্থনায়, সুরকাব্য সংসদ, ১৩৮৭, পৃঃ ৫৪
৭ ঐ, পৃঃ ৫৫
৮ গ্রামাফোন রেকর্ড N 9991 অথবা N 1937, ক্যাসেট EMI/4TC 02B 2451, দি গোল্ডেন ভয়েস অফ দিলীপকুমার রায়, 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' (ভজন গান)
৯ ভাগবতী কথা, ১ম সং, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পৃঃ ১৩
১০ শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১ম সং, পৃঃ ৪৭
১১ মীরা বৃন্দাবনে, প্রদীপ প্রকাশনী, ১ম সং, পৃঃ ৬১

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩৫

পাশাপাশি ঃ (১) পরিব্রাজক, (৩) হাতরাস, (৫) কামার, (৭) কুকুর, (৮) বিরজা, (১০) বিষ, (১১) নারী, (১৩) আবু, (১৪) মন, (১৫) সহিস, (১৭) বাঁদর, (১৮) চরম, (২০) কর্মযোগ, (২১) ইঙ্গারসোল।

ওপর-নিচ ঃ (১) পতাকা, (২) কন্যাকুমারী, (৪) রায়পুর, (৬) মানুষ, (৮) বিলে, (৯) জাপান, (১০) বিশ্বাস, (১২) হাঁস, (১৩) আমার ভাই, (১৪) ময়ূর, (১৬) হিন্দুধর্ম, (১৯) মঙ্গল।

সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

মানবেন্দ্র শীল

স্মৃ | তি | ক | থা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কনখল সেবাশ্রমের গোড়ার কথা

স্বামী কল্যাণানন্দজী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামীজীর আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের আগেই তিনি বরানগর মঠে আসেন। স্বামীজীকে সেখানে না পেয়ে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যান এবং তাঁর পূতসঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। আরো কয়েকজন তরুণ সেসময়ে মঠে এসেছিলেন—এঁদের অন্যতম ছিলেন স্বামীজীর আরেক শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ। এঁরা সকলেই এসেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আকর্ষণে, কারণ শুধু তিনিই তখন অন্য কোথাও না গিয়ে মঠে খুঁটি আগলে পড়েছিলেন। তাঁর গুরুভ্রাতারা এখানে-ওখানে পরিব্রজ্যায় যেতেন, তিনি কিন্তু কখনো মঠ ছেড়ে যাননি। সেখানে দৃঢ়মূল হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার্চনা করে যাচ্ছিলেন। কাজেই তরুণেরা সকলে তাঁরই চারপাশে এসে ভিড়েছিলেন। তিনিও তাঁদের উৎসাহ দিয়ে স্বামীজীর ফিরে আসা অবধি ধৈর্য ধরে থাকতে বলেছিলেন। স্বামীজী ফিরে এলেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।


স্বামী কল্যাণানন্দ

দায় অর্পণ

স্বামীজী কল্যাণ মহারাজকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। দীক্ষার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ "কল্যাণ, গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার মতো তোর কী আছে?" কল্যাণ মহারাজ এগিয়ে এসে বলেনঃ "এই আমাকেই আমি দক্ষিণারূপে আপনাকে নিবেদন করলাম। আমি আপনার ক্রীতদাস—আপনি যা বলবেন তাই আমি করব।" স্বামীজী বলেনঃ "আমি ঠিক এই জিনিসই চাই। তুই হরিদ্বারে চলে যা। আমি তোকে কিছু টাকা দিচ্ছি। তাই দিয়ে একখণ্ড জমি কিনে নিবি। বনজঙ্গল সাফ করে সেখানে কয়েকটা চালা তুলে ফেলবি। অনেক তীর্থযাত্রী হরিদ্বারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। কেউ এব্যাপারে কিছু করে না। আমি যখন হরিদ্বারে যাই, তখন ডাক্তার দেখাবার জন্য আমাকে ১০০ মাইল দূরে মীরাটে আসতে হয়েছিল। মীরাটে একটা হাসপাতাল আছে, কিন্তু কজনই বা আর সেখানে যেতে পারে। তাই হরিদ্বারে একটা কিছু গড়ে তোল। রাস্তার ধারে কেউ পীড়িত হয়ে পড়ে আছে দেখলে তাকে তুলে ঐ চালাঘরে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করবি। বাংলাকে ভুলে যা! আর ফিরে আসিস না! যা, রওনা হয়ে পড়।" স্বামীজীর ঐ আদেশ মাথায় নিয়ে কল্যাণ মহারাজ হরিদ্বারে এলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ তখন মায়াবতীতে ছিলেন। তিনি এই খবর পেলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজও এখবর শুনলেন। স্বামী স্বরূপানন্দজী কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কল্যাণ মহারাজকে পাঠিয়ে দিলেন। হরিদ্বারে এসে তাঁর সঙ্গে দেখাও করলেন।

গোড়াপত্তন

কল্যাণানন্দজী ৩০ একর জমি কিনে নিলেন। হরিদ্বার ইতোমধ্যেই ছিল বাড়িতে বাড়িতে ঠাসা—ফাঁকা জায়গা বলতে কিছু ছিল না। তাই সেখানে জমি পাওয়া গেল না। তবে হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে গঙ্গার ক্যানালের ধারে জঙ্গলাকীর্ণ হলেও খানিকটা খালি জমি পাওয়া গেল। তিনি জমিটা কিনে নিয়ে সেখানে কয়েকটা চালাঘর তুলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী বুঝতে না পেরে আশপাশের লোকেরা খুব অবাক হয়ে গেল। কল্যাণ মহারাজ তাদের বললেন, তিনি ঐ জায়গায় একটা চিকিৎসালয় গড়ে তুলতে চান, যাতে সকলে চিকিৎসার সুযোগ পায়। তাই শুনে কিছু স্থানীয় লোকও তাঁর সহায়তা করতে এগিয়ে এল। এইভাবে ছিমছাম কয়েকটি চালাঘর তৈরি হয়ে গেল—তার মধ্যে একটি বড় চালা রোগীদের পরিচর্যার জন্য রাখা হলো, আরেকটি ছোট চালা রইল মহারাজের নিজের বসবাসের জন্য।

এইসময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ হরিদ্বারে এসে একটি ছোট কুটিরে বাস করছিলেন। কল্যাণ মহারাজ যে কাছেই আছেন, সেকথা তিনি জানতে পারলেন। নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ছিলেন খুবই বলশালী। তিনি ভারী ভারী কাঠের কড়ি হাতে তুলে, যতক্ষণ না সেগুলি ঠিকমতো সাজানো হচ্ছে ততক্ষণ ধরে রাখতে পারতেন। কল্যাণ মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন বিশাল আকারের একটি কড়ি মাটি থেকে ওঠানো দরকার হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তিনি তার জন্য কোন লোক পাচ্ছিলেন না। এমন সময় নিরঞ্জনানন্দজী সেখানে এসে শুনলেন, কড়িটা তুলে বসানো দরকার। কল্যাণ মহারাজের সহায়তায় তিনি অক্লেশে সেটিকে তুলে ফেললেন। তারপর সেটি ঠিকমতো বসানো হলো। এইভাবে নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ অনেক কাজ করে কল্যাণ মহারাজকে সাহায্য করতেন। সেসময়ে তিনি নিভৃত জীবনযাপন করছিলেন, বেশির ভাগ সময় নিজের কুটিরে ধ্যানজপে কাটাতেন।* তবু মাঝেমধ্যে কল্যাণ মহারাজকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে আসতেন। আর যখনি আসতেন, অযাচিতভাবে এইরকম সব কাজ করে দিতেন।

* এই সময়ে গুরুতর আমাশয় রোগাক্রান্ত হয়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ শেষজীবন কাটাতে হরিদ্বারে আসেন।—সম্পাদক

স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী কনখলে আসেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। স্বামীজীর মহাসমাধির পর তিনি পরিব্রাজকের জীবনযাপন করছিলেন। তখন তাঁর কনখলে আসা অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি এসে দেখলেন, একা কল্যাণানন্দজীকে সব কাজ নিজের হাতে করতে হচ্ছে। (নিশ্চয়ানন্দজী আসার কয়েক মাস আগে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন।) তাই দেখে নিশ্চয়ানন্দজী স্থির করলেন, তিনি কল্যাণ মহারাজের সঙ্গেই থাকবেন। তিনিও খুব বলবান ছিলেন, আর কাজকর্মের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ দৃঢ়চেতা। তিনি এসে সর্বপ্রকারে কল্যাণ মহারাজের যোগ্য সহকারী হয়ে উঠলেন। ভিক্ষা করে তিনি নিজের ও কল্যাণ মহারাজের জন্য আহার্য সংগ্রহ করে আনতেন। কখনো কখনো তাঁকে এর জন্য হৃষীকেশ পর্যন্ত যেতে হতো।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ

সেবছরই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে কনখলে আসেন। সেখানে তখন ছোট ছোট কয়েকটি কুটির ছাড়া তাঁকে থাকতে দেওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। সাধুরা নিজেরা তাই দিয়ে কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কাজেই আগে কোন খবর না দিয়ে মহারাজ যখন একাকী কনখলে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো: "কী হয়েছে মহারাজ? আপনাকে কী জন্য এখানে আসতে হলো?" মহারাজ প্রথমত কিছুই বললেন না। বেলুড় মঠে মহারাজ রাজকীয় মর্যাদায় থাকতেন, কিন্তু সেসময়ে কনখলে তাঁর যথোচিত সেবা করার মতো কোন বন্দোবস্তই ছিল না। যাহোক, মহারাজের থাকার উপযোগী মোটামুটি একটা জায়গা প্রস্তুত করা হলো। পরে কল্যাণ মহারাজ আবার মহারাজকে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন: "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে বিশাল এক জমিদারি দিয়েছেন। এর দায়িত্ব অনেক। কী করে এই জমিদারি চালাব তা এখন আমাকে শিখতে হবে। তাই তাঁর কাছে পথনির্দেশ ও সাহায্য চাইতে আমি এখানে এসেছি।" তিনি কিন্তু কনখলে থাকতে চাইলেন না। হরিদ্বার থেকে কিছু দূরে নিরিবিলি একটি ছোট গ্রাম ছিল, সাধুরা সেখানে ধ্যানজপ করতে যেতেন। মহারাজ বহু দিন আগে সেখানে থেকেছিলেন। এখন তিনি সেইখানেই গিয়ে থাকতে চাইলেন। কল্যাণ মহারাজের অবশ্য এব্যবস্থা পছন্দ হলো না। তিনি মহারাজের সঙ্গে সেখানে গেলেন এবং সেখানকার পরিচিত কিছু লোককে মহারাজকে সাহায্য করার জন্য বলে এলেন। পরবর্তী কালে আমি কল্যাণ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "আপনি মহারাজের কাছে জানতে চাননি, ওখানে একজায়গায় বসে জমিদারির ব্যাপারে ধ্যান করে তিনি কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "মহারাজ একটা শান্ত নির্জন পরিবেশ চাইছিলেন, এমন একটা জায়গা যেখানে থেকে প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে প্রেরণালাভ করে তিনি বেলুড়ে ফিরে যেতে পারবেন।" এরকম আচরণ কিন্তু মোটেই গতানুগতিক ছিল না। কিছুদিন এইভাবে কাটিয়ে মহারাজ যখন বেলুড়ে ফিরে গেলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড কর্মশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ।

পরবর্তী কালে ব্রহ্মানন্দজী কেন বেলুড় মঠ থেকে চলে এসেছিলেন, সেসম্বন্ধে আরো কিছু খবর আমার কানে এসেছিল। স্বামীজী ছিলেন একজন ডাকসাইটে বক্তা—বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসতেন। কিন্তু মহারাজের প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। তিনি নীরবে ধ্যানের মাধ্যমে সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। স্বামীজীর কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি, তাঁরা ভেবেছিলেন মহারাজ সঙ্ঘকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত নন। তাঁরা চাইছিলেন, মহারাজ স্বামীজীর মতো নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। অপরপক্ষে মহারাজ চাইছিলেন নিভৃতে কিছু লোককে শিক্ষা দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠন করতে এবং তারপর তাদের কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে। তিনি বলতেন: "সাধারণ কাজ যেকেউ করতে পারে। কিন্তু তোদের কাজ সাধারণ কাজ নয়—আধ্যাত্মিক কাজ। তার জন্য তোরা নিজেদের আগে তৈরি কর।" কোন শিষ্য তাঁর কাছে গেলে তিনি প্রথমেই বলতেন: "চুপ করে বসে ধ্যান কর।" প্রত্যেকটি শিষ্যকে তিনি এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন। কালে স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যরাও বুঝতে পেরেছিলেন, মহারাজের পদ্ধতিও কম ফলপ্রসূ ছিল না।

ব্রহ্মানন্দজীর জন্য একটি বিশেষ চেয়ার তৈরি করা হয়েছিল। তিনি কনখলে এলে তা ব্যবহার করতেন—আর কাউকে তাতে বসতে দেওয়া হতো না। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন কনখলে গেলাম, চেয়ারটি তখনো সেখানে ছিল। তবে সেটি খুবই পুরনো হয়ে গিয়েছিল, ইতোমধ্যে সেটিকে আর রঙ করাও হয়নি। আমি চেয়ারটির ইতিবৃত্ত জানতাম না, তাই একদিন কল্যাণ মহারাজকে গিয়ে বললাম: "এই চেয়ারটার তো খুব বাজে অবস্থা। হয় আমরা এটাকে মেরামত করে নিই, নাহলে বিদায় করে দিই।" "এই চেয়ারটা বিদায়?" তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন: "জানিস, এই চেয়ারেই একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বসেছিলেন!" প্রতিদিন সকালে মন্দির থেকে ঘরে ফেরার আগে কল্যাণ মহারাজ পরম শ্রদ্ধায় চেয়ারটির পাদস্পর্শ করতেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আমরা এটিকে রঙ করে এর ওপর একটু বার্নিশ লাগিয়ে দিতে পারি কি?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তা কর। কিন্তু তারপর এটিকে ভিতরে কোথাও লুকিয়ে রাখিস না—এটি এখানেই থাকবে।" আমরা তখন সেটিকে

ভাল করে পরিষ্কার করে বার্ণিশ লাগিয়ে তার গায়ে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিলামঃ "এই চেয়ারটি কেহ ব্যবহার করিবেন না।" কল্যাণ মহারাজ আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী [পার্থিব শরীর নিয়ে কনখলে উপস্থিত না থাকলেও] সেখানে এসে বসে থাকেন। অবশ্যই আমি এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনো তর্ক করিনি।

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দজী কনখলে আসেন। প্রথমে তিনি কাছাকাছি কোন প্রাচীন মঠে উঠেছিলেন। পরে কল্যাণ মহারাজ সেখানে আছেন জানতে পেরে তিনি তাঁর সঙ্গে থাকতে আসেন। তুরীয়ানন্দজী মহারাজ সর্বপ্রকার বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন; তিনি বলতেনঃ "আমি যেকোন জায়গায় থাকতে পারি।" সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মানন্দজীর জন্য তৈরি করা থাকার জায়গাটি প্রস্তুত ছিল, সেটি তাঁর ব্যবহারে এল। ক্যানালের ওপার থেকে চণ্ডীপাহাড় অবধি এলাকা তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি বুনো মোষ রাত্রে সেখানে দাপিয়ে বেড়াত, তার পথে যাকিছু পড়ত সে ছিন্নভিন্ন করে দিত। কখনো যদি সেটা বেশি কাছাকাছি চলে আসত, কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয়ানন্দজী উঠে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতেন। তুরীয়ানন্দজী যখন সেখানে ছিলেন, তিনি মোষ আসার অনেক আগে থেকেইঃ "ওহে কল্যাণ, মোষটা আসছে" বলে তাঁদের সতর্ক করে দিতেন। আশ্রমে একটা বড় 'ড্রাম' ছিল, মহারাজরা সেটি পিটিয়ে মোষটিকে তাড়িয়ে দিতেন। বেশ কয়েকদিন এইরকম হওয়ার পর কল্যাণ মহারাজ একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞেস করেনঃ "মহারাজ, আপনি কি রাত্রে ঘুমোন না? নাহলে এত সামান্য শব্দে আপনি জেগে ওঠেন কি করে?" তিনি উত্তরে শুধু বলেনঃ "তোমাদের মতো নয়।" কল্যাণ মহারাজ তাঁর ডায়েরিতে উত্তরটি লিখে রেখেছিলেন।

কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের পর আমার ওপর তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়ে। সেইসময় ঐ ডায়েরিটি আমার হাতে আসে। সেটা ছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ, স্বামী জগদানন্দজী তখন সেবাশ্রমে ছিলেন। আমি তাঁকে বলিঃ "মহারাজ, আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। এই দেখুন, কল্যাণ মহারাজ এই ডায়েরিতে স্বহস্তে ব্রহ্মানন্দজী আর তুরীয়ানন্দজীর সেবাশ্রমে আসার কথা, আর সেই বুনো মোষের কাহিনী লিখে রেখেছেন। তুরীয়ানন্দজী কল্যাণ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'তোমাদের মতো নয়।' এর অর্থ কী?" স্বামী জগদানন্দজী বললেনঃ "তিনি সাধারণের মতো ছিলেন না। তিনি ঘুমোতেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে সজাগ থাকতেন। আমরাও এটা লক্ষ্য করেছি। সেইজন্যই তিনি মোষ আসার শব্দ এত আগে থেকে শুনতে পেতেন। জান তো, শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, 'ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।' শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এইসব মহাত্মারাও এব্যাপারে কিছু কম যেতেন না।" স্বামী জগদানন্দজীর তুরীয়ানন্দজী মহারাজের সঙ্গ ও সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কাজেই এক্ষেত্রে তিনি যা বলেছিলেন তা জেনেবুঝেই বলেছিলেন।

স্থানীয় সাধুসমাজের অবজ্ঞা

সেবাশ্রমের ক্রমবিকাশের কাহিনীতে ফিরে যাই। স্বামী কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজী ঐভাবে ধীরে ধীরে পুরো হাসপাতালটি গড়ে তুললেন। প্রথমে এটি ছিল খুবই ছোট—দু-তিনটি চালাঘরমাত্র। সন্ন্যাসিদ্বয়কে তখন নানা সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হতো। ক্রমে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাঁরা আরো কয়েকটি চালাঘর নির্মাণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি সীমাবদ্ধতা থেকেই গিয়েছিল—হাসপাতালটি ছিল শুধু পুরুষদের জন্য। মেয়েদের যে ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রাখা হতো তা নয়। কিন্তু যেহেতু সন্ন্যাসীরা নিজেরাই হাসপাতালে রোগীর পরিচর্যা করতেন, তাই কেবল পুরুষদেরই ভর্তি করা সম্ভব হতো।

সেসময়ে কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজী স্থানীয় সাধুদের দ্বারা 'ভাঙ্গি সাধু' (ভাঙ্গি = অস্পৃশ্য মেথর) আখ্যায় অভিহিত হতেন। কারণ, তাঁরা রোগীদের মলমূত্রাদিও পরিষ্কার করতেন। তখন তাঁদের কোন পরিচারক ছিল না। মা যেমন আপন সন্তানের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন, হাসপাতালের রোগীদের ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও তাই করতেন। এই কারণে স্থানীয় সাধুসমাজের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁদের কখনো আমন্ত্রণ জানানো হতো না। মোটামুটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ অবধি এই অবস্থা চলেছিল। তখন ধনরাজ গিরি নামে একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'কৈলাস আশ্রম'-এর মোহান্ত। এই সময়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তিনি কনখলে অবস্থান করছিলেন এবং সেই সূত্রে কাছাকাছি বসবাসকারী সমস্ত সাধু একটি বড় ভাণ্ডারায় মিলিত হন। ধনরাজ গিরি তাঁদের বলেনঃ "শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা এইখানেই কোথাও থাকেন। তাঁরা আপনাদের পরিচিত কিনা অবশ্য আমি জানি না।" স্থানীয় সাধুরা উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, তারা কাছেই থাকে। কিন্তু তারা আমন্ত্রণ জানানোর যোগ্য নয়। তারা ভাঙ্গি সাধু, সবরকমের নোংরা কাজ করে।" ধনরাজ গিরি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কেন, তাঁরা কী করেন?" "তাঁরা এমনকি মেথর-জমাদারের কাজও করে।" "মেথর-জমাদারের কাজ? আপনারা নিজেরা অসুস্থ হলে কোথায় যান? তাঁদের হাসপাতালে যান না?" "হ্যাঁ, তা যাই।" "আশ্চর্য! আপনারা নিজেরা তাঁদের হাসপাতালে তাঁদের কাছ থেকে পরিচর্যা গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের 'ভাঙ্গি সাধু' আখ্যা দেন! এখনই যান, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসুন।" এই বলে তিনি তাঁদের আনার জন্য একজন সাধুকে পাঠালেন।

কল্যাণ মহারাজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিশ্চয়ানন্দজী আসতে রাজি হলেন না। পূর্বজীবনে তিনি সেনাদলে কাজ করতেন। তিনি বললেনঃ "আমি যাব না।" নিশ্চয়ানন্দজীকে ফেলে কল্যাণ মহারাজ একা যেতে পারলেন না, কাজেই তাঁদের কেউই গেলেন না। যে-সাধুটি তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে জানালেন যে, কল্যাণানন্দজীরা ভাণ্ডারায় যোগ দিতে অনিচ্ছুক। ধনরাজ গিরি সেই সাধুকে আবার পাঠালেন এবং বললেনঃ "তাঁদের বল, আমি চাই যে তাঁরা আসুন।" একথা শুনে কল্যাণ মহারাজ নিশ্চয়ানন্দজীকে বললেনঃ "আমাদের ধনরাজ গিরিকে অসম্মান করা উচিত হবে না। চল, আমরা যাই।" নিশ্চয়ানন্দজী বললেনঃ "কেন আমরা যাব? আমরা তো ওদের মুখ চেয়ে বসে নেই। আজ তারা ভাণ্ডারায় চর্ব্যচোষ্য খাওয়াবে। কাল থেকে তো আমাদের সেই শুকনো রুটিই চিবোতে হবে।" অতএব প্রেরিত সাধুটি দ্বিতীয়বারও বিফল হয়ে ফিরে গেলেন। ধনরাজ গিরি যখন শুনলেন, মহারাজেরা তখনো আসতে অনিচ্ছুক, তিনি তখন তাঁর নিজের সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে দিলেন। সেক্রেটারি স্বয়ং ছিলেন একজন সুপরিচিত সাধু। গিরিজী তাঁকে বললেনঃ "ওঁদের যে করে হোক নিয়ে আসবে। বলবে যে, ওঁরা না এলে এখানে ভাণ্ডারাই হবে না।" তিনি এইরকম জোরালো এক ঘোষণা করে দেওয়ায় সেক্রেটারি গিয়ে কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীকে অনুনয় করে বললেনঃ "উনি বিশেষ করে চাইছেন যে, আপনারা ভাণ্ডারায় যোগ দিন। অনুগ্রহ করে আসুন। আপনারা না এলে উনি অনুষ্ঠানটি হতে দেবেন না।" তখন বেশ বেলা হয়েছে, দুপুর গড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে পৌঁছে গেছে। নিশ্চয়ানন্দজী তখনো যেতে চাইছিলেন না। কল্যাণ মহারাজ তাঁকে অনেক করে বোঝালেনঃ "ধনরাজ গিরির কথা ভেবে আমাদের যাওয়া উচিত। উনি একজন উচ্চকোটির সাধু—ওঁর আমন্ত্রণের মর্যাদা আমাদের রক্ষা করা উচিত।" এতে নিশ্চয়ানন্দজী কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা দুজনেই তখন ভাণ্ডারায় গেলেন।

অনুষ্ঠানক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে ধনরাজ গিরি স্বয়ং এসে আলিঙ্গন করে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। এমনকি তিনি তাঁদের প্রণামও জানালেন। তাই দেখে সমাগত সাধুরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর ধনরাজ গিরি তাঁদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং নিজের আসনের দুপাশে দুজনকে বসালেন। সাধুমণ্ডলীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ "আপনারা ভাবেন, আপনারা সবাই খুব বড় সাধু। এখানে যদি সত্যিকারের সাধু কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তাঁরা এই দুজন। এঁদের জীবন নিখাদ—এঁরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত। বর্তমান যুগের জন্য এই হলো আদর্শ। আপনারা পীড়িত হলে এঁরাই আপনাদের পরিচর্যা করেন, আর আপনারা কিনা এঁদের 'ভাঙ্গি সাধু' মনে করেন! আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা যখন শিশু ছিলেন, কে আপনাদের মলমূত্র পরিষ্কার করতেন? আপন আপন জননী। তার জন্য কি আপনারা জননীকে 'ভাঙ্গি' বলেন?" সকলকে এইরকম তীব্র ভর্ৎসনা করে ধনরাজ গিরি কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীকে বললেনঃ "এরা এতদিন ধরে যে স্তূপীকৃত অপমানের বোঝা আপনাদের ওপর চাপিয়েছে, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি।" এই বলে তিনি স্বয়ং ক্ষমাভিক্ষা করতে লাগলেন। কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয় মহারাজ বললেনঃ "মহারাজ, অনুগ্রহ করে ওকথা বলবেন না। তাছাড়া আমরা ওসব অপমান গায়েই মাখিনি।" সেইদিন থেকে স্থানীয় সাধুরা তাঁদের স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করলেন। কোন অনুষ্ঠান হলে তাঁরা সেবাশ্রমের সাধুদের নিমন্ত্রণ করতেন এবং কল্যাণ মহারাজ তাতে যোগ দিতেন। অবস্থার উন্নতি যেমন হলো, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কও গড়ে উঠল।

এরপর ঐ অঞ্চলের প্রাচীনপন্থী সাধুরা যে শুধু মহারাজদের স্বীকৃতিই দিলেন তা নয়, তাঁরা সেবাশ্রমকেও সাহায্য করতে লাগলেন। নিচের ঘটনা এর একটি দৃষ্টান্ত। স্বামী বিবেকানন্দের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিশ্চয়ানন্দজী বহু বছর ধরে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন—বেশি কিছু নয়, সামান্য অর্থ। একবার হিসাবের খাতা দেখার সূত্রে ঐ তহবিলটি আমার নজরে আসে। আমি কল্যাণ মহারাজকে ঐটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ "নিশ্চয়ের ইচ্ছা ছিল স্বামীজীর একটি মর্মরমূর্তি হোক। ঐ যে বড়সড় জায়গাটা দেখছিস, মধ্যিখানে একটা বেদি—ঐটে সে প্রস্তুত করে রেখেছিল। ঐখানে সে স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট টাকা যোগাড় করে উঠতে পারেনি।" সেসময়ে তহবিলটিতে জমার পরিমাণ ছিল ২,০০০ টাকার মতো। তারপর থেকে আমি তহবিলটি বাড়াতে সচেষ্ট হই—'বিবিধ জমা'র খাতে কোন টাকা এলে তা আমি ঐখানে ঢুকিয়ে দিতাম। শেষ অবধি মোট ৪।৫ হাজার টাকার মতো হয়েছিল। আমি কনখল ছেড়ে করাচি চলে আসার পর খবর পেলাম, ঐ তহবিলটিকে সাধারণ তহবিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আশ্রম কর্তৃপক্ষকে বললামঃ "না, আপনাদের এরকম করার অধিকার নেই। একজন মহাপ্রাণ সাধুর ইচ্ছা হয়েছিল স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার, তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের সম্মান জানানো উচিত। তহবিলটিকে পৃথক করে রাখা হোক, যাতে সেটি সুদে বাড়ে। ভবিষ্যতে কেউ না কেউ সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করবে।" এটা ছিল ১৯৪৪ বা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। ষাটের দশকে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের প্রাক্কালে তহবিলটি পুনরাবিষ্কৃত হয়। নিশ্চয়ানন্দজীকে

জানতেন আমাদের সকলের পরিচিত এমন কয়েকজন স্থানীয় সাধু বললেন ঃ "আমরা মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য আরো অর্থসংগ্রহ করে দেব।" তাঁরা তা করলেনও এবং তার ফলে স্বামীজীর একটি অপূর্ব মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা গেল। এর থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী কালে স্থানীয় সাধুরা কীভাবে প্রকৃত অর্থে আমাদের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন।

'সেবাশ্রম প্রথমত একটি হাসপাতাল'

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আবার কনখলে আসেন। সেসময়ে যক্ষ্মারোগীদের জন্য নতুন একটি ভবন সবে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি প্রশস্ত হলঘর সমেত বৃহৎ ভবনটি ছিল বেশ সুদৃশ্য—রোগীদের জন্য সেটি তখনো খোলা হয়নি। মহারাজ বললেন ঃ "এবাড়িটি তো বেশ সুন্দর। আমরা এখানেই দুর্গাপূজা করি।" অতএব সেইখানেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলো—সকলেই তা উপভোগ করল। পরে মহারাজ বললেন ঃ "কল্যাণ, এই বাড়িটি পূজাগৃহ করার পক্ষে খুব উপযুক্ত। এখানে পূজা হলে অনেক লোক আসবে।" কল্যাণ মহারাজ চুপ করে রইলেন। আরো যেসব সাধু সেখানে ছিলেন, মহারাজ তাঁদেরও একথা বললেন। এঁদের মধ্যে তাঁর আপন শিষ্য স্বামী দুর্গানন্দজীও ছিলেন—তিনি কনখলেই সঙ্ঘে যোগ দেন। মহারাজ কনখল থেকে চলে যাওয়ার পর দু-তিনজন সাধু কল্যাণ মহারাজকে মনে করিয়ে দিলেন ঃ "ব্রহ্মানন্দজী চাইছিলেন এই ভবনটি পূজাগৃহ হোক।" কল্যাণ মহারাজ তখন বললেন ঃ "দেখ, যক্ষ্মারোগীদের জন্য ওয়ার্ড করব বলে আমি জনসাধারণের কাছ থেকে দানগ্রহণ করেছি। কিছুতেই আমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই বাড়িটি ব্যবহার করব না। এটি কেবল রোগীদের কথা মনে করেই তৈরি হয়েছে। ঠিক কথা, এক্ষেত্রে মহারাজের ইচ্ছা অন্যরকম। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছে, তা পূরণ করার গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি। এই সেবাশ্রম প্রথমত একটি হাসপাতাল।" অতএব বাড়িটি রোগীদের জন্যই রেখে দেওয়া হলো।[১]

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সেবাশ্রম পরিদর্শনে আসেন। 'বুয়র যুদ্ধে' আহতদের শুশ্রূষার কাজ করার পর তিনি ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। সেসময়ে তিনি সেখান থেকে সদ্য ফিরেছেন। আশ্রমে অভ্যাগতদের মন্তব্যের খাতায় তিনি লিখেছিলেন ঃ "আপনারা বিদেশি ঔষধের পরিবর্তে দেশজ ঔষধ ব্যবহার করুন।" তিনি এই বিষয়টির ওপর খুব জোর দিতেন। নিশ্চয়ানন্দজী এরপর ফলপ্রদ আয়ুর্বেদিক ঔষধের সন্ধান করতে ও সেরকম কিছু পেলে তা ব্যবহার করতে থাকেন। ঐজাতীয় একটি ভেষজ আমি 'নিউমোনিয়া' রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রয়োগ করতাম। এটি ছিল একধরনের ক্বাথ—একটি বিশেষ্ গাছের ছাল ফুটিয়ে তা প্রস্তুত করতে হতো। প্রয়োগের পর তা চব্বিশ ঘণ্টা অবধি নিজের তাপ ধরে রাখতে পারত। এই আয়ুর্বেদীয় প্রলেপটি ব্যবহারের আগে এসব ক্ষেত্রে আমরা একটি অ্যালোপ্যাথিক মলম লাগাতাম। কিন্তু তার ফল ৮-১০ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হতো না, তারপর আবার তা লাগাবার প্রয়োজন হতো। আমরা শুনেছিলাম, নিশ্চয়ানন্দজী এই জাতীয় বেশ কিছু ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা

নিশ্চয়ানন্দজী ও কল্যাণানন্দজী পরস্পর খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। বয়সে নিশ্চয়ানন্দজীই কিছুটা বড় ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কল্যাণানন্দজীর কথা মান্য করে চলতেন এবং তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। দেখার মতো ছিল তাঁর আচরণ। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কনখলে গিয়ে আমি কল্যাণ মহারাজের ঘরে ইচ্ছামতো যেতাম আসতাম। কোন কোন সাধু ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁরা আমাকে বলেন ঃ "তুমি ওভাবে মহারাজের ঘরে ঢুকো না। জান, নিশ্চয়ানন্দজী পর্যন্ত তাঁর ঘরে ঢুকতেন না—বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।"

কল্যাণ মহারাজের ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। আর অবশ্যই সব সাধুকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি কথা খুব কম বলতেন। এনিয়ে সমস্যা হতো। তিনি কদাচিৎ আগ বাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতেন। এর ফলে যারা তাঁর কার্যকলাপ বুঝতে পারত না, তারা ভুল ভাবত। আগেই বলা হয়েছে, কনখলে আসার পর তিনি একবারের জন্যও বেলুড় মঠে ফিরে যাননি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বেলুড় মঠের মূল মন্দির প্রায় সম্পূর্ণ, সকলেই চেয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজার দিন তিনি মঠে আসুন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবর্তে আমাকে যেতে বললেন। আমি বললাম ঃ "ওঁরা আমাকে বলেছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনাকে ছাড়া আমি যেতে পারি না।" এর সঙ্গে আমি যোগ করলাম ঃ "আপনি কিন্তু মহারাজ বড় একগুঁয়ে। কারোর অনুরোধই আপনি গ্রাহ্য করেন না।" "আপনি বড় একগুঁয়ে"—আমার এই অনুযোগ শুনে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম ঃ "আপনি কেন বেলুড় মঠ যাচ্ছেন না, মহারাজ?" এর উত্তরেই তিনি আমাকে তাঁর প্রতি স্বামীজীর বাংলাকে ভুলে যাওয়ার অনুজ্ঞার কথা বলেন।* [ক্রমশ] (দুই)

১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকীর কাছাকাছি সময়ে সরকারের তরফে জানানো হয় যে, একই হাসপাতালে অন্য রোগীদের সঙ্গে যক্ষ্মা-রোগীদের রাখা চলবে না। যক্ষ্মারোগীদের জন্য পৃথক একটি সরকারি হাসপাতাল নির্মিত হয়। ফলে এই হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের রাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়।—সম্পাদক

* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়।
—সম্পাদক

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত

অসিত দত্ত

'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১১-১৮৫৯) অপ্রতিহত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। তিনি তাঁর পত্রিকার প্রয়োজনে পত্রিকা-সম্পাদনার পাশাপাশি সাহিত্যরচনাও করে যেতেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর যাদুস্পর্শে তাঁর লেখা পাঠকসমাজে বিস্ময়করভাবে আলোড়ন তোলে এবং বহু যশস্বী লেখক-পণ্ডিত নিঃশব্দে ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য হয়ে ওঠেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশনায় তাঁর একাগ্র নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকাটির অপরিসীম জনপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে। পত্রিকার 'জঠরপূর্তি'র জন্য তাঁকে লিখতে হতো গদ্য, পদ্য তথা প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতাদি। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "ঈশ্বর গুপ্ত কবি ও সাংবাদিক। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য—সাহিত্যের যে-অংশ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণায়ু তাহার নাম সাংবাদিকতা (Journalism) এবং সাং মধ্যে যে-অংশটুকু রচনা-পারিপাট্যের জন্য দীর্ঘজীবী হয়, তাহার নাম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ কবিতাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এর জঠরপূর্তি ও স্থানপূরণের জন্য রচিত হইয়াছিল।"[১]



উনিশ শতকে সাহিত্যসৃজনে সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল—একথা বোধহয় অস্বীকার করার উপায় নেই। সাময়িক পত্রকে নির্ভর করে বাঙলা গদ্য যেন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়—বলা যেতে পারে।

সাংবাদিক তথা সম্পাদক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত একদিকে যেমন পাঠককুলের আহার মেটাতে নিজে লেখক ও কবি হিসাবে নিত্যনতুন লেখা উপহার দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে কলেজের নবীন ছাত্রদেরও লেখা ছাপানোর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সুকুমার সেন এব্যাপারে মনোজ্ঞ ভাষায় লিখেছেন ঃ "কলেজের ছাত্রদের নবীন গদ্য-রচনা ছাপিবার জন্য তাঁহার পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আধুনিককালে ভারতবর্ষে কবিতা-স্কুলের বা কবিগোষ্ঠীর প্রথম প্রবর্তক বলিয়া ঈশ্বর গুপ্তের নাম স্মরণ করিতে হইবে।"[২]

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতা ভরাতে ক্রমশ একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে উঠেছিলেন। সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ "ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক, প্রধান লেখক এবং প্রায়শই একমাত্র লেখক ছিলেন।"[৩]

সমসাময়িক কালে অনেক লেখকের লেখায় যা প্রায় অনুপস্থিত ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় তা প্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ফুলেরই মতো। সেই প্রস্ফুটিত ফুল হলো ইতিহাস-চেতনা। জানা যায়, যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাঁর পত্রিকায় পুরনো কবি ও কবিওয়ালাদের পরিচয় এবং রচনা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' তিনি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং শুধু প্রকাশ করেন বললে সত্যের অপলাপ হবে, উক্ত লেখাগুলির আবিষ্কারকও ছিলেন তিনি। এমনকি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলার পাঠককুল যাকিছু জেনেছে, তাও ঈশ্বর গুপ্তেরই কৃতিত্বের ফল। 'সংবাদ প্রভাকর' ছিল বস্তুতপক্ষে নবীন ও প্রবীণের মিলনের অঙ্গন। দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসায় ইতিহাসবোধ তাঁর সাংবাদিক-লেখক অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল চিরকাল।

ঈশ্বর গুপ্তের ইতিহাসচেতনা, দেশপ্রেম তথা প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সেতুরচনার প্রয়াস সম্বন্ধে সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "ঈশ্বর গুপ্তের এই ইতিহাসচেতনার মূলে ছিল তাঁহার অবিসংবাদিত দেশপ্রেম। সেইসঙ্গে ছিল মজ্জাগত কবিতাপ্রীতি। যে-আন্তরপ্রেরণার বশে তিনি প্রাচীন কবিদের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহারই বলে তিনি নবীন কবিদের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। এই হিসাবেই তাঁহার 'যুগসন্ধির কবি' নামের সার্থকতা।"[৪]

সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করে নিঃশব্দে নীরবে ঈশ্বর গুপ্ত একজন জনপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছিলেন এবং পারমার্থিক, সামাজিক ও প্রেমরসাত্মক কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি অপার বিশ্বাস এবং নাস্তিকতার প্রতি প্রবল বিরোধিতার প্রকাশ দেখা যায় ঃ

"আছি গুপ্ত পরিশেষে গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সেসময়ে গুপ্ত কোথা রবে?"

সংবাদপত্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, সাহিত্য যতদিন থাকবে, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের মনোলোকে 'গুপ্ত কবি' অমর হয়ে থাকবেন বলেই বিশ্বাস। ❑

---

১ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ২১
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, পৃঃ ১০১
৩ ঐ, পৃঃ ১০২
৪ ঐ, পৃঃ ১০৩

কবিতা

৪

তুমি হে জগৎস্বামী

দিব্যেন্দু হালদার

বনের প্রান্তে এসে, দিনান্তের শেষে, অহরহ খুঁজি তায়।
গভীর আঁধারে, নিঝুম প্রহরে, যদি কিছু বোঝা যায়॥
নদী-কলতানে, পাখিদের গানে, কী যাদু যে, মহিমা।
ছুটে যাই রোজ, করি তব খোঁজ, কোথা আছ, তুমি ভূমা?

পাহাড়-পর্বত, কত জনপদ, গুহা-কন্দরে, কত ঘুরি।
চাঁদের আলোয়, পথের ধুলোয়, পাইনি গো রাজপুরী॥
তরুলতা-পাতা, জীবনের খাতা, উলটে দেখিতে চাই।
অনল-অনিলে, জলে আর স্থলে, কিভাবে তোমারে পাই॥

ফুলের হাসিতে, গন্ধরাশিতে, মৌমাছি গুঞ্জনে।
কোকিল-কণ্ঠে, অবগুণ্ঠনে ঢাকা, আছ ফাল্গুনে॥
বৃষ্টির জলে, ফোটা শতদলে, হয়তো রয়েছ ফুটে।
বৃথা প্রাণ যায়, কেন যে হেলায়, পাথরেতে মাথা কুটে॥

মেঘগর্জনে, দম্ভোলি-সনে, আলোছায়া লীলামাঝে।
হয়তো বা তুমি, রয়েছ সমুখে, অথবা অন্য কাজে॥
বহুরূপে তুমি, রয়েছ বিছায়ে, বুঝিতে পারি না আমি।
কৃপা করে প্রভু, দেখা দাও তবু, তুমি হে জগৎস্বামী॥

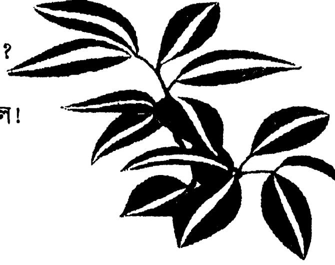
দেবালয়, মসজিদ, গির্জায়, আছ কিনা তুমি, জানি না।
বেদান্ত-মতে, সব মত পথে, এক হয়ে গেছ কিনা?
পথে-প্রান্তরে, গিরি-কান্তারে, সত্যি কী তুমি আছ?
প্রভাতের বায়ু, বহে আনে আয়ু, কেন তীর্থের ধূলি বাছ?

সৌমিত্র সেন

মহাকাশের কোলে অনন্ত গতিময় পৃথিবী,
তার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরছে
দারিদ্র্য, অন্ধকার, লোভ, স্বার্থ...

তুমি বিন্দু বিন্দু করে নিংড়ে দিয়েছ এই মাটিতে
তোমার রক্ত...
আমি তোমার ঘাম, রক্ত, উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যে
জন্মেছি, পেয়েছি প্রাণ।
তুমি পৃথিবীর দুঃখগুলোকে তোমার প্রাণপুটে নিয়ে
চলে গেছ অনন্ত সমুদ্র-অতলে,
ঝিনুক যেমন চলে যায়... আর মুক্তো হয়।
তোমার মুক্তো আজ পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার
শিয়রে থেকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে অবিরাম... অবিরল...

এই ঘাসে তুমি হেঁটেছ,
এই ধুলোয় রয়ে গেছে তোমার স্পর্শ,
ঐ আকাশের পানে তাকিয়েছ তুমি, মেলে দিয়ে বিশাল চোখদুটি
প্রশ্বাসে নিয়েছ তুমি এই বায়ু,
এই পথেই পড়েছে তোমার ছায়া—
এইখানেই আমি আছি, এই ঘাসে, ধুলোয়, আলোয়
আমি আর আমার সঙ্গের এই পৃথিবী, মানুষ
আজ ধন্য হচ্ছে প্রতিদিন—প্রতি রাত... ঋতু... যুগ।
রোমাঞ্চ জাগছে আজ আমাদের শিরায়, রক্তে, চৈতন্যে।
এই পৃথিবীর কিছু উজ্জ্বল ইতিহাসের গায়ে এখনো
গন্ধ লেগে তোমার রক্তের!
আমাদের জন্য এত কাঁদতে কে বলেছিল তোমায়?
ঝরাতে কে বলেছিল এত প্রেম?
হায় বীর, অবসন্ন সভ্যতার ছায়াময় রূঢ় অন্তরালে!



স্বর্গ

তুষার মুখোপাধ্যায়

ছুটছিস কেন 'স্বর্গ স্বর্গ' করে—
স্বর্গ যে আছে, হেথা মানুষের মাঝে
ভালবাসা দিয়ে, ফুলের সাজিতে দেখ,
প্রেম, মমতায় শান্তির পারাবত।
তুমি যে রয়েছ হৃদয়ের প্রতি কোণে
তোমার হাসিতে স্বর্গসুষমা ঝরে—
স্পর্শে তোমার সব কলুষতা মোছে
মনের আঁধার নিঃসাড়ে মুছে যাবে,
স্বর্গ এখানে পেতেছে আসন নীল আকাশের নিচে!
দীন-হীন মাঝে সুখের খেলনা—
অফুরান হয়ে মাতে।

বিবেকানন্দের প্রতি

সমীর ভট্টাচার্য

ফুল গন্ধ দেয়, ধ্যান নির্মাণ
সমগ্র সুন্দরে।
তুমি অন্ধকারের আলো
অচেতন শরীর ভাঙ
এই অস্থির সময়ে।

এখন তুমিই পালন কর
তেমন জীবন গড়
তোমারই চেতনা দিয়ে—
আরো একবার
আসন্ন সময়ে।

অর্কপ্রতিম

স্বপন নন্দী

যখন কোন অমলকিশোরের অসুখ
যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে আমার বারমাস্যার ফুল্লরা-ভারতবর্ষ
তখনো এক যুবকের সত্যি জীবনের গল্প
বিস্তীর্ণ চরাচরে সহস্র শতদল অনন্ত বীক্ষণ।

স্বপ্নে তাঁর করতল ছুঁয়েছি
জাগরণে তাঁর মনীষার দাহ থেকে পেয়েছি দ্রোহ
বৃক্ষের মতো পুষে রাখেন মহাসন্ন্যাস শিকড় থেকে শীর্ষডালে
প্রশান্ত পল্লবে মহাপিতা তিনি
আমরা তৃষিত আত্মজ।
আনন্দিত বিবেক যাঁর তাঁর ভুবনডাঙায় থাকে না তামসিক প্রহর
তবু মিনার ছুঁয়ে থাকি, আমরা ক্লান্ত যুযুধান তীর্থে যাব
পর্যটনে খুঁজে নেব তমসা থেকে 'তম'কে।

মনন-মঞ্জুষায় যাঁর আশ্চর্য বৈভব
প্রণামের সমস্ত মুদ্রা বিনত নিরুচ্চারে
ছড়িয়ে রেখেছি তাঁর নগ্ন পায়ে,

তার জন্য
আমাদের বেদ সৌম্যপ্রমা
আমাদের বেদান্ত যুদ্ধের পাঞ্চজন্য
আমাদের উপনিষদ্ বিশ্ববীক্ষা;
তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন
কুড়িয়ে নিচ্ছি, কুড়োতে যাচ্ছি, ফুরোচ্ছে না পথ
ফুরাবে না পথ, পথের ধুলো, ধুলোর রেণু।
তাঁর হাতে হার্দিক চাবুক
ক্ষত হব, বিক্ষত হব, ক্ষত মুছে হব সময়ের দীপ।

অরুণ মৈত্র

কী যে তোমার অন্তরেতে তুমিই জান—
সাধ্য কি তার আঁচটুকু পাই যখন তখন;
ঘোর রজনী কাটছে শুধু দোদুল দোলায়
খোয়াব দেখায় চিরটা কাল দিনের স্বপন।

অনেক কিছুই চাইতে গেলে হয় না পাওয়া
হাজার জন্ম ব্যর্থ শুধুই আসা-যাওয়া;
এবার যখন সকল চাওয়া শূন্য করে
তোমার দিকে সকল পাওয়ার মুখ ফিরালাম,
তখন দেখি পূর্ণ করে মনের ক্ষুধা
বুকের মধ্যে তোমার পরশ প্রথম পেলাম।

হে মহাজীবন

প্রসিত রায়চৌধুরী

হে মহাজীবন,
মারী আর মৃত্যুভরা দেশে অমৃতসাধনা
দুঃসহ তিমিরতীর্থে আলো আবাহন,
জীবন আহুতি দিয়ে করে গেছ সমাপন।
দীন যারা আর্ত নতশির, কাঁদে যারা গোপন ব্যথায়,
সে-ব্যথায় হয়ে কি অস্থির
এলে তুমি আলোকের দূত?
আশ্চর্য অদ্ভুত!
আত্মমোক্ষ তুচ্ছ আবর্জনা
পথপ্রান্তে অবহেলে দিলে ফেলে।
হে সন্ন্যাসী বৈদান্তিক কবি,
জলভরা চোখে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অস্পৃশ্য অচ্ছুত
'ভাই' বলে, 'রক্ত' বলে বুকে তুলে নিলে।
মর্ত্যের বেদনা স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যদি করে থাকে
জানি সুনিশ্চয়—
তোমার গুরুর মুখ ভরিয়াছে সুস্মিত হাসিতে।
হে নির্ভয়,
নিঃস্ব এজাতির ভাণ্ডারে,
দিয়ে গেছ অফুরন্ত প্রাণের সঞ্চয়,
অভিনব মন্ত্র তব 'অভীঃ',
ওগো কবি, বেজেছিল বজ্ররবে
যাহাদের বুকের বীণায়—
ফাঁসিমঞ্চে দূর দ্বীপান্তরে
তাহাদের আগ্নেয় আত্মারা
মৃত্যুহীন প্রাণের স্বাক্ষর লিখিয়াছে তারায় তারায়।
সমাপিয়া কর্মভার সহস্র বর্ষের
চলে গেছ বিমুক্ত বাসনা,
পশ্চাতে রাখিয়া গেছ
বীর্যদীপ্ত আদর্শ অম্লান।
বাণী তব দীপ জ্বালে মূঢ় যত মানুষের
অন্তরে অন্তরে
জয়ধ্বনি ওঠে তব—প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যের
দূর সিন্ধুপারে,
অসীমের অভিযাত্রী নির্মোহ পথিক,
শুনিতে কি পাও—
মন্দ্রিছে তোমার নাম—অবিরাম,
জগতের যত আর্ত ভীত নত মানুষের হৃদয়কন্দরে,
দেখিতে কি পাও—
মহাকাল লিখিয়াছে মহাকাশে নাম তব
দুনিরীক্ষ্য জ্যোতির অক্ষরে।

প্রা|স|ঙ্গি|কী

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ 'আস্তিকতার স্বরূপ কী'

[১]

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীনরেশ বিশ্বাসের 'আস্তিকতার স্বরূপ কী' শীর্ষক পত্রটি পড়ে ভাল লাগল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য অভিমত প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই নিবেদন করছি।

আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, প্রায় ৩,৮০০ মিলিয়ন বছর (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) আগে প্রথম এককোষী জীবের সূচনা হয়। পৃথিবীর বয়স এখন প্রায় ৪,৫৫৫ মিলিয়ন বছর। ফসিল (fossil), পাথরের গায়ে শ্যাওলা, সামুদ্রিক প্রাণীর হাড়ের ডি. এন. এ. পরীক্ষার পর আমরা জানতে পারি, কিভাবে প্রায় ১৫০ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ 'Evolution of Natural Selection' এবং Genetic Mutation-এর ফলে Neanderthal Homosepiens হয়ে Hominid Afarensis দুপেয়ে মানুষ হয়ে প্রথম চলতে শুরু করল মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এবং ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। (দ্রঃ Evolution : Triumph of an Idea —Carl Zimmes, Herpce Collins Publication, 2001)

আজ আমরা Hybridization, Cloning, Gene Bank রপ্ত করে ফেলেছি। মহাকাশ, চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ—কোথাও আমাদের কল্পনার তৈরি 'ভগবান' নেই।

ক্রমবিবর্তনের ফলে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণের পথ স্বীকার করেছেন মনীষীরা। যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন মহাপুরুষ, মহামানব—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। তাঁদের দেখানো আদর্শ অবলম্বন না করে আমরা পূজা, পাঠ, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, নিয়তি, বিধাতাপুরুষ, জন্মান্তরবাদ—এইসব নিয়ে মজে আছি। কারণ, সমাজের একশ্রেণির মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে আমরা চরম সত্য উপলব্ধি করতে না পারি। তাহলে তাদের রুজিরোজগার, ব্যবসা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাধাপ্রাপ্ত হবে। সত্যদর্শী মহামানবেরা কঠোর যোগসাধনা করে প্রথমে পঞ্চেন্দ্রিয় জয় করেন ও পরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (sixth sense) সন্ধান পেয়ে তাঁরা আলোকপ্রাপ্ত হন বা 'বুদ্ধ' হয়ে তুরীয় আনন্দ, অসীম, অনন্ত, অমৃতের সন্ধান পান। পার্থিব সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা—কোনকিছুই তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

সুতরাং কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'য় আকাশে পাথর ছুঁড়লে সে নিচেই পড়বে। আগুনে হাত দিলে তা পুড়বেই। আমাদের জীবনও সেই কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত। "প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।"

আমাদের ব্যর্থতা-সফলতা, সুখ-দুঃখ—সবকিছুকেই বিশ্লেষণ করা যায়। নিজের ভাগ্য আমরা নিজেরাই রচনা করি। এতে তৃতীয় পক্ষের কোন হস্তসঞ্চালন নেই। আকাশ থেকে আচমকা কিছু পড়ে না। তবে আমাদের সমস্যাজড়িত দুঃখপীড়িত জীবনে একটা অবলম্বন থাকা উচিত। হতাশার মধ্যেও আশা জাগিয়ে দেয়। সেই অর্থে 'ভগবান' আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান, করুণাসিন্ধু, সর্বপাপঘ্ন এবং শেষ বিচারক। তাই মানুষ একখণ্ড পাথরকে শালগ্রামশিলা বলে পূজা করতে ভালবাসে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।" এ তো সত্যি কথা, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু নানারকম আচার, বিচার, প্রতারণায়—ভগবানের নামে ব্যবসাভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতে। অন্যেরা জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান পাবেন। নিজের মনে ধ্যান করে নিজেকে প্রশ্ন করলেই সব উত্তর ভিতর থেকে উঠে আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যার গুরু নেই, সে নিজের মধ্যেই গুরু খুঁজে নিক। তাছাড়া আছে "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম", আছে "মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাং চ দৈবতম্", আছে "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর", আছে "যত মত তত পথ"।

Zen Buddhism-এর একটি গ্রন্থে পড়েছিলাম ঃ "Man must be master of himself—intellectually, morally and spiritually. To be so he must be able to examine his own states of consciousness and direct his thoughts and desires to the end where lies the rationale of existence." অর্থাৎ মানুষ নিজের ওপর প্রভুত্ব করতে শিখবে—বৌদ্ধিকভাবে, নৈতিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে। এবং এর জন্য তার নিজের [আধ্যাত্মিক] অবস্থাকে যাচাই করে নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে; নিজের চিন্তাপ্রবাহ ও ইচ্ছাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যে, শেষে সে পরম অস্তিত্ব বা চিদাবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

এস. কে. চ্যাটার্জি
আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০১৬

[২]

'আস্তিকতার স্বরূপ কি?' বিষয়ে 'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় এক অদ্ভুত 'ভাষ্য' পাঠ করে মর্মাহত হলাম। এই রচনার ঠিক পরেই আছে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব। তাতে বারবার এক শ্রদ্ধেয় ও প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী আমাদের প্রাচীন ও সুমহান বৈদিক ও তদাশ্রিত সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বলেছেন আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধের ঐতিহ্য নিয়ে—যা আমাদের শাশ্বত ভারত-সভ্যতাকে চালিত করত। এটিকেই তিনি 'প্ল্যাটফর্ম' বলেছেন। অথচ তার আগে এই লেখা—যেখানে হারিয়ে গেল মূল্যবোধ, হারিয়ে গেল সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীলতা। শুধু বিভ্রান্তি, শুধু সংহতিহীনতা, শুধু অপব্যাখ্যা, শুধু বৃথা আস্ফালন। আর মাঝে মাঝে অযথা শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দকে টেনে আনা।

স্বামীজী বলেছেন, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। সত্য কথা। এর ভিতরের spirit কী? জীবাত্মা বা self-এর এক evolutionary progression, এক উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতনায় শাশ্বত যাত্রা—এটিই তো আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। তাই প্রথমে 'ছোট আমি' বা self-কে বিশ্বাস করতে হয়; না হলে তার ঊর্ধ্বগতি হবে কী করে? স্বামীজীর এই উক্তি এক বৃহত্তর আস্তিকতারই নামান্তর। শ্রীঅরবিন্দ 'Life Divine'-এ বলেছেন ঃ "The earliest formula of our ancient wisdom—God, light, freedom and immortality promises to be the best." পত্রলেখক এই উক্তিকে কী বলবেন—আস্তিকতা, নাস্তিকতা, নাকি কিছুই নয়?

কে বলেছে, আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বাস করতেন না? তাঁর নিজের উক্তি : "আমি একজন বিজ্ঞানী হয়েছি এইটুকু উপলব্ধি করার জন্য যে, ঈশ্বর তাঁর ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিতে নিজের স্বাধীনতা রাখেন কিনা।" ('Where science is going'—Albert Einstein দ্রষ্টব্য) লেখক বলেছেন, ঈশ্বরবোধের মূল স্তম্ভ হলো এই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে কোন শক্তিকে ভাবা। এটি মূল স্তম্ভ নয়, এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। মূল স্তম্ভ হলো ব্যাকুলতা। Urge to know God. শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কী পরিলক্ষিত হয়? শুধু ভাবা নয়, অনুভব করা, আস্বাদন করা; তারপর তা 'হয়ে' যাওয়া। এর প্রত্যেকটি ধাপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপলাভ করেছিল। স্বামীজী বলেছিলেন : "I will be continuing to do work till the whole world realises it is one with God." শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন : "To the nihilist, God remains ambused in the midst of annihilation." এসব তো ফাঁকা আওয়াজ নয়। আমাদের বৈদিক প্রজ্ঞায় বলা হয়, 'আমিই ব্রহ্ম'। এটি মানবজাতির সামনে তার highest and widest possibility-কে তুলে ধরা। শ্রীঅরবিন্দের কথায় : "We are the form of the formless, we are the defini-tions of the indefinable." তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন : "নিজেকে বিশ্বাস কর। নিজেকে যে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক।"

জন্মান্তর এক অভ্রান্ত দর্শন। 'Cause and effect'-এর অবশ্যম্ভাবী 'relation'। কেউ মানলে এটি সত্য, না মানলে নয়—এরকম সত্য নয়। এটি কারোর মানা, না মানার ওপর নির্ভর করে না। এ আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষিদের ধ্যানলোকে অনুভূত ও শ্রীভগবান-মুখনিঃসৃত 'Unpolluted Pure Truth'। একে অদৃষ্ট বলে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন, মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন; কিন্তু তাতে সত্যের কিছু হানি হয়নি। জন্মান্তর হলো সত্তার 'Evolutionary Progression'-এর একমাত্র রাস্তা। লড়াইটা যদি করতে হয়, তবে তা করা দরকার সেই স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরুদ্ধে, যারা সত্যকে বিকৃত করে। সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে—এ-বিশ্বাস কারা দিয়েছিল? কিছু অবৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তা বলে কি সত্যই পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করছিল? যা সত্য তা ছিল, আছে, থাকবেও। হয়েছে শুধু মানুষের শিক্ষাচেতনার অগ্রগতি। নিউটনের আগেও আপেল মাটিতেই পড়েছে, আকাশের দিকে যায়নি। ঠাকুর কি জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন না? তিনি তো বলেছেন : "যতক্ষণ না জীবের ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ তার সংসারে যাওয়া-আসা লেগেই থাকে।" এর থেকে আর জন্মান্তরের ভাল ব্যাখ্যা কী হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত 'গীতা'—যা সারা বিশ্বে অমরত্বের মর্যাদা পেয়েছে, যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জ্ঞানরাশির এক অতল জিজ্ঞাসা, যা চির অক্ষয়, তা লেখকের মতে 'মতলব-প্রণোদিত'! চালাকি দ্বারা কিংবা সমাজের চাপে পড়ে এত গভীর দর্শন সৃষ্টি করা যায় না। জন্মান্তর, কর্মফল অভ্রান্ত সত্য। তা না হলে স্বামীজী বলতেন না—মানুষ মৃত্যুর সময় যেসব বাসনা প্রবলভাবে পোষণ করে, মৃত্যুর পর সেই বাসনাগুলি সূক্ষ্মভাবে সত্তার মধ্যে আবরণের মতো থাকে—সত্তাকে আবৃত করে থাকে এবং পরজন্মের যাত্রাও সেইরূপই হয়। Universal consciousness এবং Living in infinite and eternity-ই মানুষকে জন্মমৃত্যুর আবরণ থেকে মুক্ত করে, তাকে তার ultimate resting place দেখায়। সে তখন এক অনির্বাণ শিখাকে নিজের মধ্যে জ্বলতে দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" একথার যদি কেউ এরকম অর্থ করেন যে, পেট ভরানোই ধর্ম, তাহলে বলার কিছু নেই। কর্মফল, জন্মান্তরবাদ মানুষকে হীনমন্য করার জন্য নয়; কোন সত্যই মানুষকে হীন করে না বরং তা আত্মিক বিবর্তনের সহায়ক হয়। হ্যাঁ, অবশ্য এর যদি কেউ অপব্যাখ্যা করে থাকে, লড়াইটা তার সঙ্গেই হওয়া উচিত। স্বামীজী কি বলেননি : "হিন্দুধর্ম হইতে পুরোহিত শাসন উঠাইয়া দাও, দেখিবে এই ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তোমরা কি নিজের ধর্মকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় সমাজকে ইউরোপীয় সমাজে পরিণত করিতে পার?" কেন স্বামীজী বলেছেন—'নিজের ধর্মকে আশ্রয় করিয়া'? আমার মনে হয়, আমাদের সভ্যতার যে impulse towards Perfection, search for pure and unmixed Bliss, sacred sense of immortality and divinity in Godhead—এরকম বৈদিক ঈশ্বরচেতনাকেই তো স্বামীজী ধর্ম বলেছেন। লেখক যদি পুরোহিত প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালু করেন, তাহলে স্বামীজীর ঠিক ঠিক পূজা হবে—স্বামীজীর কথাকে অপব্যাখ্যা করে তাঁর পূজা হয় না। এরকমই এক আন্দোলন হলে আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্তন আসবে সব দিক দিয়ে—আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, এমনকি রাজনৈতিক চিন্তাতেও। সেই ভবিষ্যতের দিকেই আমরা তাকিয়ে। মনে হয় কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি। তবে এর মধ্যেই যা হয়েছে, আমার মনে হয় তা অপূর্ব ও অবর্ণনীয়।

স্বামীজী বলেছিলেন : "Face the brute." এর মধ্যে দৃঢ়তা আছে, জিঘাংসা নেই। যাঁর গুরু অতিচেতন, চেতন, অর্ধচেতন এমনকি অচেতন অবস্থাতেও সেই এক চিদ্রূপিণী মাকেই দেখতেন, তাঁর শিষ্য হয়ে তিনি কি করে এরকম কথা ভাবতে পারেন যে, 'মানিয়ে নাও—ঈশ্বর দিচ্ছেন'! এরকম চিন্তাকে 'Politicisation of spiritual science' বললেই ভাল। ঈশ্বরের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া কী? সবই তো তিনি—সুখও তাঁর, দুঃখও তাঁর; ঐশ্বর্যও তাঁর, দারিদ্র্যও তাঁর; মানও তাঁর, অপমানও তাঁর; পাপও তাঁর, পুণ্যও তাঁর; ভ্রান্তিও তাঁর, বুদ্ধিও তাঁর—আবার এসবকিছুর ওপরেও তিনি। স্বামীজী শুধু 'Face the brute'-এর মানে বলেছেন ঈশ্বরকে ভুলে থাকা নয়, বরং দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথা-বেদনার মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করা। কবিগুরুর কথায়—"দৈন্য-মাঝে অসন্তোষে প্রসাদ তব চাই।"

স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না কতকগুলি স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল বানানো। এর জন্য তাঁর মতো যুগপুরুষের দরকার নেই, একজন সমাজসেবকই যথেষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ', যার মধ্যে Psychic, Vital, Mental, Physical এবং Spiritual Con-sciousness-এর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটবে। স্বামীজী যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, আরতি—এসবকে কোনদিনই হেয় করেননি। তাহলে তিনি বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার প্রচলন করতেন না, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বৈদিক আচারে এত পূজা, যাগযজ্ঞ হতো না। আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সমস্ত কর্মযজ্ঞের প্ল্যাটফর্ম তো এই মঠই। স্বামীজী এই মঠস্থাপনা করলেন কেন? কারণ, মানুষকে যদি ভালবাসতে হয়, শিবজ্ঞানে সেবা করতে হয়, প্ল্যাটফর্মটা মঠের হতে হবে অর্থাৎ ত্যাগের হতে হবে। নাহলে তার 'mechanical comradeship'-এ পরিণত হওয়ার ভয় আছে।

দেবদ্বিজে পূজার্চনা, জপধ্যান করলে আত্মশুদ্ধি সহজ হয়, অহঙ্কারের নাশ হয়, সমর্পণের ভাব আসে। যতক্ষণ না আত্মশুদ্ধি

হচ্ছে, যতক্ষণ না নিজের বিশ্বসত্তার ওপর শ্রদ্ধাভক্তি আসছে—ততক্ষণ মানুষের সেবা করা যায় না। এভাব না থাকলে প্রকৃত সেবা হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন ঃ "There is no ego so terrible as the passion of an altruist." এই পূজার্চনাকে পরিশেষে মানুষের পূজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে—তবেই তার সার্থকতা। যুক্ত করতে হবে জীবন আর অধ্যাত্মবাদকে। এটিই বিবেকানন্দের 'যোগ'।

আর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারে আমাদের মতো মানুষের কোন মন্তব্য না করাই ভাল। তিনি যে কী তা তিনিই জানতেন। এই ধৃষ্টতা আমাদের যেন কখনো না আসে।

লেখক যদি ঠাকুরের অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান বুঝতেন, তাহলে এরকম লিখতেন না। ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন ঃ "তুমি কি ঈশ্বরের কাছে চাইবে—হে ভগবান আমাকে যেন কতকগুলো হাসপাতাল, স্কুল করে দাও যাতে মানুষের সেবা করতে পারি, না তাঁকে চাইবে?"

আমরা সেবা করার কে? তিনি যদি আমাদের দিয়ে সেবা করান, তবেই সেবা। আমার আড়ালে একজন শক্তিমান আছেন, তিনি সব ঠিক করছেন, তিনি মঙ্গলময়, তিনি শুধু মঙ্গল করেন। এরকম ভাব তো ভাল; এ তো নির্ভরতা, সমর্পণের ভাব। যিনি নিখিলবিশ্বের স্রষ্টা, যিনি কবিগুরুর ভাষায় "সপ্তসিন্ধু দিগ্‌দিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে"—তাঁর কি কিছু করতে বাতাসা নকুলদানার দরকার হয়? নিজের ভাবের সীমাবদ্ধতা লেখক এরকমভাবে ব্যক্ত না করলেই পারতেন। ঈশ্বরতত্ত্বই হলো ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, নিরহঙ্কারিতা, অহিংসা ও আত্মসমর্পণের তত্ত্ব। এতে cynicism-এর কোন স্থান নেই। ভক্ত যদি তার সাধ্যমতো মাকে অর্ঘ্য দেয়, তাতে দোষটা কোথায়? কেউ ধনের অর্ঘ্য দেয়, কেউ ভক্তির অর্ঘ্য দেয়, কেউ জ্ঞানের অর্ঘ্য দেয়—যার যেমন আধার। ভক্ত যদি 'মা'য়ের কাছে মেয়ের পাত্র, ছেলের পাশের ব্যাপারে চেয়ে থাকে তো দোষটা কোথায়? মা ছাড়া আর কি কেউ দেওয়ার আছে? যখন চাইতেই হবে, মায়ের কাছেই চাইব। তিনি সকলের মা। শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন ঃ "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন ঃ "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি।" ছলনা তো ভুলাবার জন্যই। ছলনায় পড়ব কেন? পূজা করব, পূজার ছলনা করব না।

বোধি তথা জ্ঞানের চর্চাই শাশ্বত ভারতবর্ষের জীবনচর্যা। তারই ফলস্বরূপ আমরা বহু রত্ন লাভ করেছি। জন্মান্তরবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা—এরকমই অমূল্য রত্ন। এটা কোন ঠাট্টার জিনিস নয়। এ অনুভূত সত্য। স্বামীজী বারবার বলেছেন ঃ "তোমরা অনন্তের সন্তান, অমৃতের সন্তান—তোমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। তোমাদের কিসের ভয়, কাকে ভয়?" এ তো আত্মার অবিনশ্বরতারই এক অপূর্ব উচ্চারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি আমাদের সনাতন বৈদিক বিজ্ঞান-বিভূতির তত্ত্বধারক এবং শ্রীশ্রীমা, যিনি সর্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি, আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি—তাঁরা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিকে হেয় করতে আসেননি, বরং এসেছিলেন তাকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর পথে এগিয়ে দিতে। মা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন পুরাতনকে অবহেলা করতে নয়, তাকে গ্রহণ করে এক অভূতপূর্ব সংহতির দিকে এগিয়ে দিতে।

যে-কথাগুলি লেখক লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই লড়াই করতে পারেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে কালাতীত পুরুষদের টেনে আনার কী দরকার? পুরোহিত যদি বেশি বিল নেয়—দেবেন না, প্রতিবাদ করুন। বিলের সীমা আপনি নির্ধারণ করুন, পুরোহিত নয়। মা দীক্ষা দিয়েছেন একটি বেলপাতা গ্রহণ করে। জীবন তো সামনে! লড়ুন না! পুরোহিত শাসনে যে আমরা জর্জরিত, সে তো সর্বজনবিদিত। তার অভেদ্য জাল ভাঙতেই তো ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব। ঠাকুর নিজের এঁটো খাবার মা ভবতারিণীকে নিবেদন করতেন। আমাদের পুরোহিত প্রথা কি একে সমর্থন করে? লেখক বাস্তব তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, দর্শন, আচার—কোনকিছুর মধ্যেই সমন্বয় করতে পারেননি, খালি তালভঙ্গ হয়েছে। ঠাকুরের উক্তি ঃ "দিনে তারা দেখা যায় না বলে কি তারা নেই?" লেখকের উচিত ছিল ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আলোকে আমাদের অজ্ঞানতা, হীনতা দূর করতে চেষ্টা করা। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ শুধু বাণী রেখে যাননি, রেখে গেছেন জীবন। কবিগুরুর কথায়—

"এ পরিপূর্ণ সন্দেহের মাঝে
নিয়ে এস একটি জীবন
নিমেষে সরিয়া যাবে সকল সন্দেহ
থেমে যাবে সহস্র বচন।"

ঠাকুর, মা তাঁদের দেহাতীত সূক্ষ্ম সত্তায় অনেককে কৃপা করেছেন এবং এখনো করেন। যাঁরা মারণব্যাধির আবিষ্কার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষ, কিন্তু যে spirit তাকে এই কাজ করতে বাধ্য করে তিনিই ভগবান। আইনস্টাইন বলেছিলেন ঃ "The state of mind which furnishes driving power resembles that of a devotee or lover. The long sustained effort is not inspired by any set plan or purpose, but its inspiration comes from the hunger of the soul."

লেখক জানিয়েছেন, মাকে আড়াই কিলো সোনার গহনা পরানো হয়েছে। হ্যাঁ, ভক্ত যদি মৃণ্ময়ী মাকে চিন্ময়ী ভেবে তার সাধ্য ও আধার অনুসারে মায়ের চরণে নিবেদন করে, তবে দোষটা কোথায়? ঠাকুরও তো মা সারদাকে ডায়মন-কাটা বালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মময়ী মা সারদাদেবীকে বেনারসী পরানো হয়। ঈশ্বরের সেবার urge থেকেই মানবসেবার যে urge আসে তা স্থায়ী হয়। Ego থেকে যে মানবসেবার urge আসে, তা প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তা স্থায়ী হয় না। বঙ্গভূমিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পদ্মফুল আহরণ করতে গিয়ে সর্পদংশনে বালকের মৃত্যু সত্যি খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এর পুনরাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়। উপযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। মানুষকে এবিষয়ে সচেতন ও সর্বপ্রকারের সহায়তা করা দরকার। মানুষ বাঁচলে তবেই তো তার হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করবেন। মাকে পদ্মফুল না দিলেই তো হয়। লেখকের কী মত? মা মাটির, তিনদিন পরে বেটি জলে গলবি, পদ্মফুল দেওয়া না দেওয়া একই ব্যাপার—কম্পিউটার যুগে এরকম চিন্তাই বোধহয় খাপ খায়। তার চেয়ে সেই পয়সায় মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক। মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু সেই দৈহিক সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য কী? মস্তবীর হওয়া? রাজনীতিকদের হাত শক্ত করা? স্ত্রীলোকের অপমান করা? মায়েদের চোখের জল ফেলা? নোবল প্রাইজ চুরি করা? দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিও প্রয়োজন। তাই মায়ের চরণে ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ পদ্মফুল নিবেদন করাও অবশ্যই দরকার।

মায়ের কোন পিপাসা নেই। লেখক 'পিপাসু' বললেন, আর মা-ও 'পিপাসু' হয়ে গেলেন? মায়ের যদি পিপাসা থাকত তবে লেখকের এইরকম লেখার স্বাধীনতা মা অবশ্যই হরণ করে নিতেন। মায়ের কাছে 'সব পিপাসার অবসান'। মা কোল থেকে ফেলে দেন বুকে তুলে নেওয়ার জন্য।

কিছু বস্তু-বিত্তসম্পদ বৃদ্ধি পেলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হওয়া যায় না। ভারতের সমস্যাও অত্যন্ত জটিল। নিম্নমানের রাজনীতি আমাদের উন্নতির পথে বাধা। তেমনি কিছু বস্তুসম্পদের অধিকারী হলেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায় না। তা যদি হয় তবে মাফিয়ারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং তাদের ঐশ্বর্যই বিকাশের মাপকাঠি হতো। শ্রেষ্ঠতা আসে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্য থেকে। সেদিক দিয়ে ভারত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আভিজাত্য চির অম্লান। ভারত সেদিক দিয়ে অনতিক্রম্য। এটি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন বলেই স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র।

দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানিতে আমরা হীনমন্য হয়েছি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েছি, জাগতিক ঐশ্বর্যে পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু দিব্য জীবনের ধারা এখনো ভারতেই বইতে দেখা যায়। ৬০০-৭০০ বছর শারীরিক, মানসিক, ধর্মীয়—সবদিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত ও প্রবঞ্চনার পরও ভারতের সাধকই বলতে পেরেছিলেন: "যত মত তত পথ।" অন্য কোথাও এ-সত্য পরীক্ষিত হয়নি, তার ইচ্ছাও জাগেনি।

পরিশেষে বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—পৃথিবীতে এই দুটি চরিত্রকে যদি অনন্তকালের জন্যও আলোচনা সমালোচনার বৃত্তে আবৃত্ত করানো হয়—এক ফোঁটা দাগ পাওয়া যাবে না, এক ফোঁটা 'মতলব' পাওয়া যাবে না। এমন অসীম পরহিতচিকীর্ষা, সরলতা, পবিত্রতা, সাধুতা পৃথিবীর অন্য কোথাও দানা বাঁধেনি। সে-সম্ভাবনাও নেই।

তাপসরঞ্জন ঘোষ
জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহ

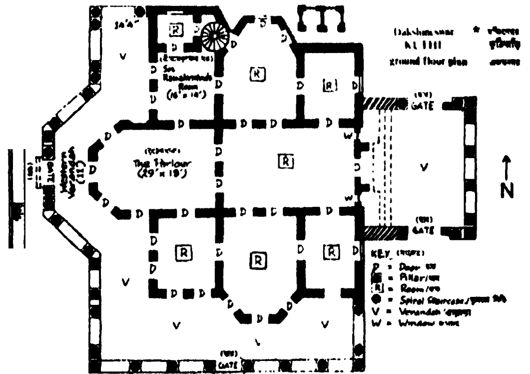
'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যার প্রচ্ছদে কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের ছবি ছাপা হয়েছে। সেপ্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে প্রায় সকলেই জানেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বহু বছর (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় ৩০ বছর) বাস করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমের গঙ্গামুখী কোণের ঘরটি 'শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর' বলে সকলের কাছে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থমালার বহু গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর উপরি উক্ত ঘরটিতেই তাঁর দক্ষিণেশ্বরের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৩য় মুদ্রণ, পৃঃ ৪০) উপযুক্ত তথ্য সহযোগে প্রমাণ করা হয়েছে যে, [illegible]। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ১৬ বছর কুঠিবাড়ির একটি ঘরে বাস করেছেন। এপ্রসঙ্গে উপরি উক্ত গ্রন্থ থেকে প্রামাণ্য তথ্যের কিছু অংশ পাঠকের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করছি—

"শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাড়ির একতলায় গঙ্গার দিকে পশ্চিমের ঘরে বহু বৎসর বাস করেন। জননী চন্দ্রমণি দেবী ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাছে থাকতে আসেন; তিনি এই ঘরেই ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ও আসেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

"শ্রীম দীর্ঘ আটাত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলি অবধি ভক্তদের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে যেতেন ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত প্রতিটি স্থান দর্শন করতেন। প্রতিবারই যখন তিনি যেতেন, তখন পশ্চিমদিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন। এবিষয়ে কখনো তাঁর ভুল হতো না এবং বারান্দা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে প্রণাম করে বলতেন, 'এই ঘরে ঠাকুর ষোল বছর (১৮৫৫ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ছিলেন। ঠাকুরের মা-ও এই ঘরে থাকতেন। কত নাম, কত চিন্তা, কত দর্শন হয়েছে এই ঘরে।' অক্ষয়ের মৃত্যুর পর তিনি এই ঘর পরিত্যাগ করেন। এখন যে-ঘরে তাঁর শয্যাদি রয়েছে তিনি সেই ঘরে বাস করতে থাকেন এবং ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চোদ্দ বছর ছিলেন।



"স্বামী সারদানন্দ তাঁর এই কুঠিতে থাকা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেননি, কিন্তু এক জায়গায় লিখছেন, '...অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মথুরবাবুর বৈঠকখানা বাটীতে অতঃপর আর কখনো বাস করিতে পারেন নাই।' "

ঐ গ্রন্থে দেওয়া কুঠিবাড়ির নকশা সঙ্গে নিয়ে ৩-৪ বছর আগে 'শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর' দর্শনের চেষ্টা করি উপস্থিত পুলিশের অনুমতি নিয়ে। অনুমাননির্ভর হয়ে ঐ ঘরে যাই। অন্ধকার ঘরটি ধুলো-ময়লায় পূর্ণ, অবহেলার শিকার হয়ে আছে দেখে মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আজ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত ও তাঁর পদস্পর্শে ধন্য বহু স্থান পরম নিষ্ঠাভরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখন কুঠিবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেরও যথাযথ সংরক্ষণ হবে নিশ্চয়ই।

সরোজ সিংহ
লালপুর, চাকদহ, নদীয়া

যু|ব|স|ম্প্র|দা|য়ে|র|প্র|শ্ন...

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। অজস্র অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা। একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

প্রশ্ন ঃ *'মানুষ হও'—স্বামীজীর এই বাণীর বাস্তবায়নের জন্য পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা কী? অনুগ্রহ করে উত্তর প্রদান করলে ধন্য হব।*

—রামপ্রসাদ রায়, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর ঃ প্রশ্নটা সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু ভূমিকা আছে। যদি বল, একেবারে শিশুর তো জ্ঞানোন্মেষ হয়নি; তা মেনে নিয়েও অন্তত চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি থেকেই আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সচেতনতা দেখা যায়। সুতরাং প্রশ্নের মধ্যে 'ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা কী'—একথাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষত আজকের এই অস্থিরতার যুগে। আসলে সমাজ হলো একটা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব (impersonal personality)। আমাদের সমাজ বা ইউরোপীয়ান সমাজ কিংবা আমেরিকান সমাজ—প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যুগ থেকে যুগান্তে, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সেই বৈশিষ্ট্য অনুসঞ্চারিত হতে থাকে। পিতা-মাতা থেকে সন্তানে যেমন এই বৈশিষ্ট্য অনুসঞ্চারিত হয়, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ছাত্রেও অনুসঞ্চারিত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সনাতন সংস্কৃতিকে পরম্পরাক্রমে বাঁচিয়ে রেখে পরমপুরুষার্থ বা মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী সকলেরই গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী শিবানন্দজী মহারাজকে এক দম্পতি প্রণাম করে তাঁদের সন্তানকে দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ "মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের ছেলে যেন মানুষ হয়।" স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ তার উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দিয়েছিলেন ঃ "বাবা, আগে তোমরা মানুষ হও।" বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেবেন, তেমনি বাড়িতেও পিতা-মাতা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, যাতে সেই সনাতন আদর্শের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সন্তান অনুভব করে। মনে রাখা দরকার, শিক্ষকের জীবনধারা এমন হওয়া চাই যে, সেই জীবনধারা শ্রেণিকক্ষে তাঁর আলোচ্য বিষয়কে আরো উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকের আচার-আচরণকে নকল করে বেড়ে ওঠে।

মানুষ হওয়ার জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ একদিনে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প করে যদি শিক্ষক ও অভিভাবকদের কোন গোষ্ঠী সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে, তাহলে এই সমাজ একটি 'model' দেখতে পাবে। অতঃপর সেই 'model'-কে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে অপর সকলে নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" (৪।৩৯) অর্থাৎ শিক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীর ভূমিকা কি হবে—সেটাই বলা হলো। যদি কেউ শ্রদ্ধাবান হয় অর্থাৎ পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি যদি তার অটুট ভক্তি-বিশ্বাস থাকে তখন সে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। এই প্রকার শ্রদ্ধালু শিক্ষার্থী যদি ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ হয়, সংযমী থেকে আদর্শনিষ্ঠ ('তৎপরঃ') হয়ে শিক্ষার্জন করে তাহলে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের আদর্শ বলতে কি বোঝায়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাষায় যেমন বলতেন ঃ "মন মুখ এক করা", "সত্যকথা কলির তপস্যা" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা যেমন বলতেন ঃ "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই", "দয়া যার শরীরে নেই সে কি মানুষ? সে তো পশু", "যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবানকে ছাড়া কাউকে বেসো না", "কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে?... তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে।" স্বামীজী বলতেন ঃ "শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হবে —"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। ঠাকুর বলেছেন ঃ "আগে যো সো করে ঈশ্বরদর্শন কর, তারপর ইচ্ছা হয় তো কাঙালিবিদায় কর।" এইসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি উচিত নয় যে আগে ঈশ্বরলাভ করা, তারপরে জনসাধারণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা?*

—বিশ্বজিৎ ঘোষ, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন ঃ "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ।" এটি সিদ্ধান্তবাক্য অর্থাৎ এবিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। আব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই সেই এক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে—একথা স্বামীজীও বলেছেন। যে-বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তা হলো সেই মুক্তি বা ভগবান লাভের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? গীতায় যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছেন ঃ "সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি/ যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ (৫।১) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি একই সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং নিষ্কামকর্মের উপদেশ করেছ, কিন্তু তার মধ্যে আমার ক্ষেত্রে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর তা নিশ্চিত করে বলে দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগের প্রশংসা করেছেন। আবার পরেই বলেছেন, নিষ্কামভাবে কর্ম করাই সমীচীন। সুতরাং অর্জুন বিভ্রান্ত। আসলে একটি ব্যক্তির পক্ষে কর্মত্যাগ করা, আবার একইসঙ্গে নিষ্কামভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। যে যেমন অধিকারী, তার জন্য সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট পথ রয়েছে। যে অধিকারী নয়, তার কাছে "ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য"—বাণীটি কথার কথা মাত্র। তার জন্য আপাতত চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই ঠিক। অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিভরে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মাধ্যমে অপরের সেবা করা এবং নিজের মনের মধ্যে ছয় রিপু, অষ্টপাশাদি চিত্তমল দূর করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ঃ *ধ্যান কিভাবে করতে হয়? ধ্যান করার জন্য কোন আধিকারিত্বের প্রয়োজন আছে কি? অর্থাৎ যেকেউ ধ্যান করার অধিকারী কিনা?*

—অনিমেষ হালদার, বেহালা, কলকাতা

উত্তর ঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুযায়ী অষ্টাঙ্গিক যোগসাধনের একটি অঙ্গ ধ্যান। আটটি অঙ্গ বা সাধন হলো—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যম এবং নিয়ম—এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সাধন। এই দুইটি সাধন ছাড়া ধ্যানাভ্যাস করা বিপজ্জনক হতে পারে। যমের পাঁচটি ক্রিয়া যথা—ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ। নিয়মের পাঁচটি ক্রিয়া যথা—শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপঃ, ঈশ্বর-প্রণিধান। [৫৪৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য] এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থে করেছেন। যেকোন বস্তুতে মনকে একাগ্র করার নাম, সাধারণভাবে, 'ধ্যান'। ধ্যান খুব গভীর হলে ধ্যাতার স্থানকালবোধ লোপ পায়। তখন ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে ধ্যাতা নিজেকে প্রায় একাত্ম করে ফেলেন। এই অবস্থার নাম 'সমাধি'। এইসময় সকল চিত্তবৃত্তি একটিমাত্র বৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। এই সমাধি অবস্থা লাভ করতে গেলে শরীর ও মনের ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। উচ্চ অধিকারী ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে ধ্যানের গভীরে ধ্যেয়-বস্তুর সঙ্গে (অর্থাৎ নিজের ইষ্টের সঙ্গে) নিজেকে প্রায় একাত্ম করে ফেললেও সামান্য অহংবোধের কারণে পূর্ণ সমাধি লাভ করতে পারে না। ঈশ্বর যখন অবতাররূপে আর্বিভূত, তখন তাঁর কৃপাতে অহঙ্কারের ঐ অবশিষ্টাংশটি বিনষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মহামায়া দ্বার না ছাড়লে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে না। তাই ধ্যানের জন্য আধিকারিত্বের প্রয়োজন আছে, আবার ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করলেও তাঁর কৃপায় ধ্যানসিদ্ধিলাভ হতে পারে।❑

কথামৃত পরিচয় : ছবি ও ছন্দে



চোর হলো সাধু

কপট সাধনা যদি আনে চৈতন্য,
আসল সাধন সাধক জীবন করে তুলবেই ধন্য।
আর তা বোঝাতে ঠাকুর* বলেন সে এক গল্পকথা,
বোঝালেন তাঁর মন্তব্যের অপরূপ সত্যতা।
তিনি বললেন—শোন গো, সে এক জেলে
বাগানের মাঝে পুকুরেতে মাছ চুরি করে জাল ফেলে।
মাছ-চোরটাকে পুকুর-মালিক ধরবেই হাতেনাতে,
তাই লোক দিয়ে ঘিরল বাগান চুপিচুপি এক রাতে।
শুধু হাতে নয়, লোকজন এল জোরালো মশাল জ্বেলে,
গাছের আড়ালে লুকালেও যাতে ধরা পড়ে সেই জেলে।
চোরটা তখন করল কি জান? মেখে খানিকটা ছাই
সাধু সেজে গিয়ে গাছের তলায় নিল বেশ পাকা ঠাঁই।
ওদিকে পুকুর-মালিকের লোক পায় না চোরকে খুঁজে,
দেখে, এক সাধু গাছের তলায় বসে আছে চোখ বুজে।

পরের দিনেই সারা পাড়া জুড়ে জবর খবর রটে,
বাগানে এসেছে এক সাধুবাবা, খুব বড় সাধু বটে!
আর কোথা যায়, খবর পেয়েই লোকেরা দলকে দল
সাধুর জন্য আনে সন্দেশ, আনে নানাবিধ ফল।
শুধুই কি তা-ই, টাকা-পয়সায় প্রণামীও বেশ পড়ে,
ব্যাপার দেখে তো নকল সাধুর বিস্ময়ে চোখ ভরে।
আসলে আমি তো চোর, সাধু নই—জেলেটা তখন ভাবে,
সত্যিকারের সাধু যদি হই, আরো কত পাওয়া যাবে!
নকল সাধুর অভিনয় করে যদি এত কিছু পাই,
সাধু হলে আমি ভগবানকেও পাবো, সন্দেহ নাই।
ভাবতে ভাবতে সেইদিন থেকে মাছ-চোর সেই জেলে
সন্ন্যাসী হতে সোজা চলে গেল পিছে সংসার ফেলে।

ছবি : সৌরীশ মিত্র • ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

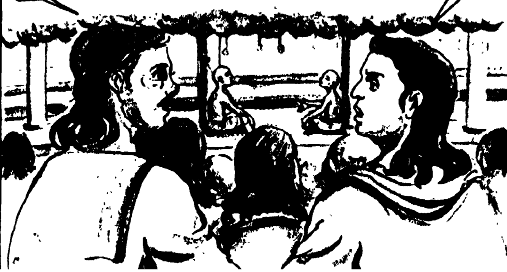


আদি শঙ্করাচার্য ৩৪

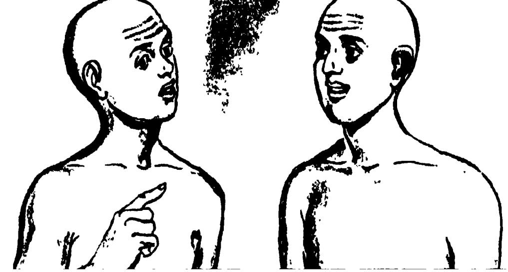
চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

নির্দিষ্ট দিনে মহাকাল-মন্দিরের নাটমন্দিরে বিচার আরম্ভ হলো। আচার্য শঙ্কর ও ভাস্কর পণ্ডিত উভয়ের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং দৃঢ়তা দেখে চমকিত হলো সকলেই।



বহুক্ষণ পর ভাস্কর পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করলেন। আচার্যের শিষ্যরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁদের চোখে তখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন।



কিছুকাল পর। আচার্য শঙ্কর সশিষ্য বাহ্লিক দেশে এসে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিচারে বসলেন। সেখানেও তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রইল। মানুষ তাঁর মুখে শুনল এক অদ্ভুত কথা।



আচার্য এবার এলেন বিভিন্ন মতের সাধক ও পণ্ডিতদের আবাসস্থল কাশ্মীরের সারদাপীঠে। এই স্থানটি তখন ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র।





শিষ্যদের অনুরোধে আচার্য মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছালেন। মন্দিরের চার দ্বার পণ্ডিতগণ পাহারা দিচ্ছেন। একে একে বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, মীমাংসক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন মতের পণ্ডিতদের সঙ্গে আচার্য শঙ্কর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহু কঠিন প্রশ্নের সামনে পড়তে হলো তাঁকে। কিন্তু তিনি অবলীলায় সেসকলের উত্তর দিতে লাগলেন।



পণ্ডিতেরা সকলেই আচার্যকে পথ ছেড়ে দিলেন। জনতা প্রবল জয়ধ্বনি করে উঠল। আচার্য শঙ্কর দেবী সরস্বতীর মন্দিরদ্বারে এসে



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

বি জ্ঞা ন

মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষায় পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

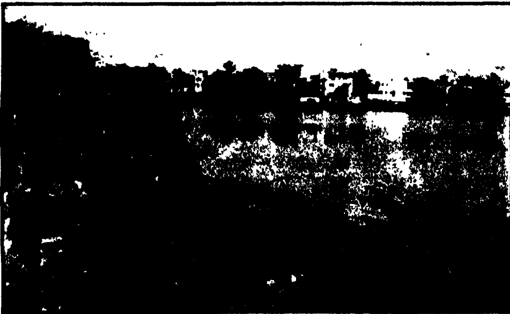
কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কিংবা তিলোত্তমা, দুঃস্বপ্নের কিংবা আনন্দের—যেমনই হোক না কেন কলকাতা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী। সম্প্রতি এই শহর বিশ্বে মহানগরী-সংলগ্ন বৃহত্তম জলাভূমিহেতু 'রামসার ক্ষেত্র'-এর শিরোপা লাভ করেছে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির এই মর্যাদাপ্রাপ্তিকে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে জলাভূমি বাঁচানো সহজ হবে।

'Wetland' বা 'জলাভূমি' ইদানীংকালে একটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দ। বিশেষত ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রামসার শহরে অনুষ্ঠিত 'রামসার আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-এর পর জলাভূমি-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'রামসার কনভেনশন'-এর প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য জলজ বিহঙ্গ (যেমন waterfowl) সংরক্ষণ হলেও বিগত তিন দশক কালে রামসার ঘোষণাপত্রের ক্ষেত্র বহুমুখী হয়েছে। 'রামসার ক্ষেত্র'-এর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে লক্ষণীয়ভাবে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই আমাদের দেশে চিল্কা, লোকতাচে, উলার, ভরতপুর, সাম্ভার ও হারিকে—এই ৬টি জলাভূমি 'রামসার ক্ষেত্র' হিসাবে চিহ্নিত হয়। গত ২০০২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে আরো ১৩টি জলাভূমির মধ্যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিও তালিকাবদ্ধ হয়েছে।

সাধারণত জলাভূমি বলতে যে জলময় ভূখণ্ডকে বোঝানো হয়, তার গভীরতা ৩-৪ মিটারের বেশি নয়। এই অগভীর বৈশিষ্ট্যের জন্যই আলোচ্য জলাভূমি Terrestrial (শুষ্কভূমি) এবং Aquatic (গভীর জল)—এই দুই প্রতিবেশ ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত ভাবা হয়।

জলাভূমি হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র (Eco System)। বিখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী অ্যাসলে মন্টবি তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থ 'আবদ্ধ জলের সম্পদ'-এ বলেছেন, জলা অঞ্চলগুলি হলো জীবনরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা। কেবল মাছ বা কৃষিপণ্য উৎপাদনই নয়, কলকাতার মতো দূষণদুষ্ট ঘনবসতিপূর্ণ শহরবাসীর কাছে এই জলাভূমি ফুসফুসের মতো। এর অন্যতম কাজ বর্জ্য জলের ভারী ধাতু (Heavy metal) ও অন্যান্য Toxic substance-এর মতো ক্ষতিকর উপাদানকে সূর্যালোকে নষ্ট করে জলকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা। অর্থাৎ জলাভূমি এখানে শহরের কিডনিও বলা যায়। কেবল জলজ প্রাণীদের খাদ্যশৃঙ্খল সৃষ্টিই নয়, জলজ অক্সিজেন, কার্বন প্রভৃতি উৎপাদনের এক প্রাকৃতিক রসায়নাগারও এই জলাভূমি। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, এক বর্গমিটার জলাভূমি জলজ প্রাণীদের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রতি মিনিটে ২৩ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করে। এখানে বলা দরকার, একজন মানুষের মিনিটে ২.১ গ্রাম অক্সিজেনের প্রয়োজন।



পূর্ব কলকাতার জলাভূমির একাংশ

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ পাওয়া যায়, রঘুরাজ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে উশীনর-পুত্র বঙ্গ ও শুহ্মকে পরাজিত করার জন্য বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আরাকান আক্রমণকালে সুন্দরবন নিকটবর্তী এই জলাভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। হুগলি নদীর মোহনা সন্নিহিত পরিণত ব-দ্বীপের এক বিরাট কর্দমাক্ত অংশই এই জলাভূমি। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের এক লেখা থেকে জানা যায়, এই বিশাল অগভীর জলা অঞ্চল উত্তরে দমদমে নবাবদের শিকারঘর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে এই শিকারঘরই 'ক্লাইভ হাউস'-এ পরিণত হয়। অসংখ্য জলজ ও পরিযায়ী পাখি এবং মাছের ভাণ্ডার এই জলাভূমি ছিল ভূ-জীব বৈচিত্র্যের রত্নপ্রসবিনী।

এই শহর পত্তনের আদিপর্বে ইংরেজরা এখানকার বহু-বিভক্ত নদীপথকে বরিশাল, খুলনা, এমনকি অসম পর্যন্ত কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্যই প্রধানত ব্যবহার করত। নিকাশীর বিষয়টি ছিল অনুবর্তী ভাবনা। টলি-নালার মাধ্যমে বিদ্যাধরী-হুগলি সংযোগের পর থেকে (১৭৭৬) একে একে বেলেঘাটা (১৮১০), সার্কুলার (১৮২৯), ভাঙরকাটা (১৮৩০-১৮৩৪), নিউকাট (১৮৫৯) প্রভৃতি খননের দরুন পূর্ব কলকাতার বিপুল জলাভূমির জলছবি পাল্টাতে শুরু করে। অবশেষে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাধরীকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করার পর ২৮ কিলোমিটার লম্বা একজোড়া খাল ও ৬৯টি লকগেটের মাধ্যমে ঘুসিঘাটার কাছে কুলটি গাঙে ফেলা হচ্ছে।

বর্তমানে ১,৪৫০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী প্রায় দেড় কোটি নাগরিকের প্রতিদিনের সৃষ্ট ১৩৫ কোটি লিটার বর্জ্য ও তাতে ভেসে থাকা ২,০০০ টন বর্জ্যকণার ৭০ শতাংশই কুলটি গাঙে পড়ছে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিশোধিতভাবে। বাকিটা এই বদ্ধ জলাভূমি ধারণ করছে নীলকণ্ঠের মতো। সেইসঙ্গে উজাড় করে দিচ্ছে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ কুইন্টাল ধান, ৭০ হাজার কুইন্টাল মাছ ও প্রায় ৭ লক্ষ কুইন্টাল টাটকা সবজি। কেবল তরল বর্জ্যই নয়, মহানগরীর সৃষ্ট দৈনিক ৩,০০০ মেট্রিক টন আবর্জনারও ঠিকানা এই জলাভূমি,

যার ৫৬ শতাংশ স্বাভাবিকভাবে জারিত হয়ে জৈবসারে পরিণত হয়। প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথন সম্প্রতি 'Feeding the Billion' শীর্ষক বক্তৃতায় এই জলাভূমির বিস্ময়কর বহুমুখী কার্যকারিতা ও তার ব্যবহারকে Unique experiment বলে বর্ণনা করেছেন।

শতাব্দীপ্রাচীন কলকাতার চর্মশিল্প তথা ট্যানারি এবং এখানকার জলাভূমি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রায় ৫৫০টি ছোট-বড় ট্যানারি এখানে উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। এই ট্যানারিগুলি কেবল বয়সের হিসাবে প্রাচীনই নয়, পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর, প্রযুক্তিগতভাবে অনুপযোগী এবং অর্থনীতির দিক থেকে কম সম্ভাবনাময়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বানতলার কাছে কড়াইডাঙা মৌজায় ৪৪০ হেক্টর জমিতে নতুন চর্মনগরী গড়ে তুলছে। এই চর্মনগরী এমন এক স্থানে গড়ে উঠছে, যা ইতোমধ্যেই জলাভূমি হিসাবে ঘোষিত। চর্মনগরী নির্মাণের সিদ্ধান্তকে বিশেষজ্ঞ মহল নানা দিক থেকে একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে।

বর্তমানে কলকাতা জলাভূমির মোট এলাকা ১২,৫০০ হেক্টর বলা হচ্ছে। প্রকৃত পরিমাণ অনেক কম। গত বিশ বছরে আগ্রাসী নগরায়ণের মর্মান্তিক শিকার হয়েছে এই জলাভূমি। পরিবেশের প্রশ্নটি হয়েছে উপেক্ষিত। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো রাজারহাট। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে এই প্রকল্পের শিলান্যাসের প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছিল, এই এলাকায় কোন মাছচাষের ভেড়ি বা স্থায়ী জলাশয় নেই। অথচ রাজ্য সরকারেরই সংস্থা 'ইনস্টিটিউট অফ ওয়েটল্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট অ্যাণ্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাইন' থেকে পাওয়া উপগ্রহ মানচিত্র বলছে, ঐ এলাকার ৮০ শতাংশই জলাভূমি।

কলকাতার জলাভূমি—একনজরে (২০০১)

অবস্থান	২২°৩৫'—২২°৪০' উত্তর অক্ষরেখা ৮৮°২০'—৮৮°৩৫' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা
বিস্তৃতি	জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা মৌজা : ৩২টি
সংরক্ষিত অঞ্চলের মোট আয়তন	১০,৬৯৬ হেক্টর
জমি ব্যবহার	ধান : ২,৬৬৬ হেক্টর মাছ : ২,১৮৫ হেক্টর সবজি : ৩০০ হেক্টর
বার্ষিক [illegible] পাদ[illegible]	ধান : [illegible]২৮ লক্ষ কুইন্টাল মাছ : [illegible]৭০ [illegible] কুইন্টাল সবজি : [illegible] কুইন্টাল
[illegible]	[illegible] কৃষি : [illegible],৯০০ [illegible] [illegible] অন্যান্য : ৩,০৫০ পরিবার
মোট জনসংখ্যা	১ লক্ষ ৪ হাজার
[illegible] হ্রাস [illegible]	
[illegible] পরিমাণ	১,৫০০ হেক্টর
এই সঙ্কুচিত পরিমাণ জমির মোট সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ	[illegible]৬৪ কোটি টাকা

[illegible] Conservation and [illegible] Calcutta Wetlands [illegible] Kolkata [illegible]

কলকাতার এই মহার্ঘ সম্পদটি সম্পর্কে এখানকার নাগরিকদের ধারণা ও আর্থ-পরিবেশ সংক্রান্ত এক গবেষণা সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে সংগঠিত হয়। এক বিরাট সংখ্যক white collar পেশার (অর্থাৎ অফিসযাত্রী, যারা মাঠে-ঘাটে কাজ করেন না) নাগরিকের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এই জলাভূমি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অতলান্তিক।

এশহরের ভূমিভাগের ঢাল পূর্বদিকে। পশ্চিমে গঙ্গার দিকে কলকাতা শহরের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬ মিটার। আর যত পূর্বদিকে যাওয়া যায়, রাজারহাটে এই উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। এই

কলকাতা জলাভূমির সঙ্কোচন

বছর	মোট জলাভূমির পরিমাণ (হেক্টরে)	বর্জ্যসেবিত মাছ উৎপাদন অঞ্চলের পরিমাণ (হেক্টরে)
[illegible]	[illegible]	৭,০০০
[illegible]	[illegible]	৬,০০০
১৯৬৭	[illegible]	৫,৮০০
[illegible]	[illegible]	৪,৬০০
[illegible]	৫,২০০	[illegible]
[illegible]	[illegible]	৩,[illegible]০০
২০০[illegible]	[illegible]	২,২০০*

* এই হিস[illegible] পূর্ব[illegible] অঞ্চলের বাইরে কিছু অঞ্চল আছে।

তথ্যসূত্র : জলাভূমির কলকাতা—কুণাল চট্টোপাধ্যায়, 'পরন্তপ', [illegible]



জলাভূমি গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে বহুতলের জঙ্গলে

ঢালকে কাজে লাগিয়েই গড়ে উঠেছে এখানকার নিকাশীব্যবস্থা। কিন্তু পরবর্তী কালে একদিকে অস্বাভাবিক জনস্ফীতি, অন্যদিকে জলাভূমির সঙ্কোচন এই নিঃশুল্ক পরিশোধনের প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে অনেক কমিয়েছে। ফলে শহরের সামগ্রিক নিকাশী-ব্যবস্থা আজ এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বর্জ্যজলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাবদ ৩৫০ কোটি টাকার মতো অর্থ বিনিয়োগ দরকার। প্রয়োজন আরো ৫০ থেকে ৮০ কোটি টাকার মতো রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়। গত ২৫ বছর যাবৎ বানতলা সেডিমেন্টেশন প্ল্যান্টটিও অকেজো অবস্থায় পড়ে। এই বাস্তবের মুখে এক প্রচ্ছন্ন উদাসীনতায় তিল তিল করে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহানগরীর নিকাশীব্যবস্থাকে।

কবি বলেছেন : "শুভবুদ্ধি সমাচ্ছন্ন, চারপাশে গুপ্ত কুমন্ত্রণা/ একটি রুমাল শুধু, ডেসডিমনা হারিয়ে ফেলো না।" একদিন যে-জলাভূমিতে এদেশের বৃহত্তম বার্ড স্যাংচুয়ারি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তদানীন্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু, তা আজ বিশাল মহানগরীর তুলনায় লেডিস রুমালেরই মতো। বায়রণ বলেছিলেন : "যতদিন কলোসিয়ম ততদিন রোম।" তেমনই বলা যায়, যতদিন এই জলাভূমি, ততদিন কলকাতা। কলকাতার অস্তিত্ব যে অনবদ্য প্রকৃতিকে ঘিরে, তার প্রতি আমাদের 'সচেতন উদাসীনতা' থাকলেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তার মূল্যায়নে ভুল করেনি। মেডিসিন, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, শান্তি ও অর্থনীতির নোবেলজয়ী কলকাতা আজ কেবল টেরিজা, ল্যা-পিয়ের, স্টিভ ওয়াদের চ্যারিটি দেখানোর শহরই নয়, বিশ্বে বৃহত্তম নগর-সংলগ্ন জলাভূমিরও শহর। একে রক্ষা করতেই হবে। ❑



আলোকচিত্রী : ডি. ডি. সাহা

শব্দচেতনা ৩৭

স্বামীজী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

১			২	■	৩			■	■
	■	■		■		■	■	৪	
৫	৬	■	৭						■
■		■		■	■	■	■	৮	৯
১০		১১	■	■	১২		১৩	■	
	■	১৪			■	■	১৫	১৬	
১৭	১৮	■	■	■	■	১৯	■		■
■	২০			২১			■	২২	২৩
২৪		■	■		■		■	■	
■	■	২৫			■	২৬			

পাশাপাশি : (১) এখানে থাকাকালীন স্বামীজী 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য তিনটি প্রবন্ধ লেখেন (৩) 'যন্ —— তন্ সিদ্ধি' (৪) "—— অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত।" (৫) ভগিনী দেবমাতার আসল নাম (৭) 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (৮) স্বামীজী যত মাস প্যারিসে ছিলেন (১০) এই বিদেশিনীর অশান্ত জীবনে স্বামীজী শান্তি এনেছিলেন (১২) জয়পুরের সর্দারজিকে স্বামীজী বলেছিলেন : "দেখুন দেখুন, কেমন চেতন ——।" (১৪) ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতার অন্যতম বিষয় ছিল 'বেদান্ত——' (১৫) কলকাতার এই কলেজে স্বামীজীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল (১৭) নরেন্দ্রনাথের লাঠিখেলা, সাঁতার, কুস্তি প্রভৃতির শিক্ষক ছিলেন '——গোপালবাবু' (২০) 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় স্বামীজীর লেখা প্রথম কবিতা (২২) ছেলেবেলায় বিলে এই বাগানে বসে ধ্যান করতেন (২৪) স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত আমেরিকার শহর (২৫) অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় এই শহরে (২৬) "যিনি এই —— মায়ার পারে লইয়া যান, তিনিই যথার্থ গুরু।"

ওপর-নিচ : (১) ছেলেবেলায় স্বামীজী এটাও খেলতেন (২) স্বামীজীর প্রচারকার্যে আত্মোৎসর্গকারী স্বামী রামতীর্থের আসল নাম (৩) শ্রীমতী উডসের বাসস্থান (৪) নরেন্দ্র-প্রিয় রবীন্দ্র-গান 'তাঁরে —— করে চন্দ্রতপন, দেবমানব বন্দে চরণ' (৬) গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম (৯) "—— ধ্যানসিদ্ধ, জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।" (১০) "কাম—— ত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নামযশে বদ্ধ হয়ে পড়ে।" (১১) "মত —— নয়, মতের সামঞ্জস্য ও শান্তি।" (১৩) গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দের পূর্বনাম (১৬) স্বামীজীকে বলা হয় 'ভারত——' (১৮) "গেরুয়া ভিক্ষুকের ——।" (১৯) লস এঞ্জেলেসে থাকাকালীন স্বামীজীর বক্তৃতার অন্যতম বিষয় 'ভারতের ——' (২১) স্বামীজীর মতে, এই বিষয়টিরও স্থূল মর্মগুলি মেয়েদের শেখানো উচিত (২৩) পরিব্রাজক স্বামীজী শিয়ালকোট থেকে এখান হয়ে দেরাদুন পৌঁছেছিলেন।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আশ্বিন ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গ্র ন্থ প রি চ য়...........

কালের প্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনা

শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ • লেখক : অমরেন্দ্রনাথ আদক • প্রকাশক : এস. বি. নায়ক, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ • মূল্য : ৪৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৩৬ • প্রকাশকাল : ২০০৩

২৫টি অধ্যায়ে বিধৃত 'ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কয়েক দশক আগে থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীকালের প্রসারকে ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার পাশাপাশি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘটন ও পটপরিবর্তনগুলি লেখক অমরেন্দ্রনাথ আদক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন (তবে বর্ণনাসৌকর্যের অনুরোধে সবক্ষেত্রে কালখণ্ডগুলি অন্যোন্যবিচ্ছিন্ন রাখা হয়নি)। প্রথম তিনটি এবং শেষ তিনটি অধ্যায়ের শিরোনাম যথাক্রমে : 'ওই মহামানব আসে (১৭৫০-১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ)', 'কল্পারম্ভ (১৮১৪-১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ)', 'সংশয় ও সৃষ্টি (১৮৫৩-১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ)' এবং 'লীলা-বসান (১১-১৭ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ)', 'আঁধারে আলো' ও 'দেবত্বের অন্বেষণ'।



গ্রন্থটিকে ঠিক জীবনীগ্রন্থ বলা যায় না। জীবনী সাধারণত ব্যক্তির জীবনকে অবলম্বন করে লেখা হয়, সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনা ও ব্যক্তিবর্গের অবতারণা করা হয় উপজীব্য ব্যক্তির কার্য ও চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রবহমান কাল যেন এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত। তাই একই কালের আপাত সম্পর্কহীন ঘটনাও এখানে পাশাপাশি সন্নিবেশিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত কেউ যদি তাঁর জীবনলীলার পটপরিবর্তনের প্রতি পর্যায়ে সেই সময়ে বহির্জগতে কি হচ্ছিল তা জানতে চান, তাহলে গ্রন্থটি তাঁর আগ্রহ মেটাবে। এইভাবে কালানুক্রমিক পর্যালোচনার বিশেষ সুবিধা হলো, অনেকক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে অপ্রত্যাশিত গূঢ় সংযোগ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' ও তার ঠিক আগের সপ্তাহে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এছাড়া আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখকের চকিত মন্তব্য পাঠককে উদ্দীপিত করবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'পিছনে বাঁধা শোলা'টি আসলে 'পাশ্চাত্য শিক্ষার শোলা', শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামগৃহে শেষবারের মতো পদার্পণ ও দিন সাতেক অবস্থান করার সঙ্গে পরবর্তী কালে ঐ গৃহে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য যোগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রনাথকে 'শিক্ষে দেওয়ার' চাপরাশে শ্রীরাধার জয়ঘোষণার সঙ্গে পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে 'জীবে প্রেম'-এর অপূর্ব বিকাশের সম্পর্ক প্রভৃতি।

গ্রন্থটি যেহেতু ইতিহাস-সম্পর্কিত, তাই তথ্য উপস্থাপনে সতর্কতা সর্বতোভাবে কাম্য। কয়েকটি ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিচ্যুতি নজরে পড়ে (কিছু হস্তলিখিত সংশোধন দেখে অনুমান হয়, এর কয়েকটি সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই ওয়াকিবহাল)। যথা—(১) পৃঃ ১৯, শ্রীরামকৃষ্ণের বোন 'সর্বমঙ্গলা'র জায়গায় পিসতুতো বোন 'হেমাঙ্গিনী' হবে। (২) পৃঃ ৩৩, 'বাংলার বড় লাট'। (৩) পৃঃ ৩৬-৩৭, 'ব্রহ্মসাধনা', 'ব্রহ্মবাদী' ও 'ব্রহ্মলোকে' না বলে যথাক্রমে 'অদ্বৈতসাধনা', 'অদ্বৈতবাদী' ও 'ব্রহ্মসত্তায়' বলা উচিত। (৪) পৃঃ ৩৮, শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্মসাধনার গুরুর নাম 'গোবিন্দ রায়' হবে; এইপ্রসঙ্গে 'অবতার' শব্দের প্রয়োগ অসমীচীন—'পয়গম্বর' বা ঐজাতীয় কিছু বলা উচিত ছিল। তাছাড়া 'লীলাপ্রসঙ্গ' (সাধকভাব, ১৬শ অধ্যায়)-এর বিবরণ এখানে একটু অন্যরকম। (৫) পৃঃ ৪২-৪৩, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তানের তালিকায় স্বামী অদ্ভুতানন্দ অনুপস্থিত। (৬) পৃঃ ৪৫, মথুরবাবুর ব্যবস্থাপনায় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সঙ্গে তীর্থযাত্রায় চন্দ্রমণি দেবী কি গিয়েছিলেন? যদিও লীলাপ্রসঙ্গকার হৃদয়ের মুখে সেইরকম শুনেছিলেন (সাধকভাব, ১৮শ অধ্যায়), 'কথামৃত' (২২।১০।১৮৮৪ ও ২৯।৯।১৮৮৪-এর প্রতিবেদন) এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' অনুসারে চন্দ্রমণি দেবী সেসময় দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। পারিপার্শ্বিক বিচারে সেটাই সম্ভব মনে হয়। (৭) পৃঃ ৪৬, গঙ্গামায়ীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'দুলালী' (রাধিকা)—'প্রাণগোপাল' শব্দের দ্যোতনা অন্যরকম। (৮) পৃঃ ৫৪, ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত সন্তান আসার আশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শাশুড়িকে দিয়েছিলেন, শ্বশুরকে নয়। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৭)। (৯) পৃঃ ৬৩, বলরাম বসুর বাড়ি 'সিমলা'য় নয়, 'বাগবাজার' অঞ্চলে। (১০) পৃঃ ৬৫, পঙ্‌ক্তি ১৪, আছে—"শ্রীশ্রীমা বলতেন, নরেনের পরে শরৎ ছাড়া আমার ভার বয়ে বেড়াবার মতো এত শক্তি আর কারও ছিল না।" হবে—"শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'আমার ভার কি সকলে নিতে পারে? পারত যোগীন, আর পারে শরৎ।' " (১১) পৃঃ ৮৭, বিনোদিনী অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন 'শ্যামপুকুরে'—'কাশীপুরে' নয়। (১২) পৃঃ ১০১, আছে—"অরণ্যচারী প্রাচীন ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন, 'জীবঃ ব্রহ্ম ন পরঃ'।" হবে—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" (১৩) পৃঃ ১০৭, পাদটীকা ১, "পিতার জন্য তাঁর (পূর্ণচন্দ্র ঘোষের) পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়নি" না বলে "পিতার জন্য তিনি সংসার-জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন" বলাই সঙ্গত। (১৪) পৃঃ ১০৮, 'দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' নয়, 'দেবেন্দ্রনাথ বসু'/'দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার' হবে। (১৫) পৃঃ ১১১, 'ডাঃ সরকারের বন্ধু ছিলেন

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক' উক্তিটি বিভ্রান্তিকর। কুমুদরঞ্জনের জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, ডাঃ সরকারের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২২ বছর মাত্র। (১৬) পৃঃ ১১৯, গিরিশচন্দ্রের ভাইয়ের নাম 'অতুলকৃষ্ণ' নয়—'অতুলচন্দ্র'। (১৭) পৃঃ ১৩৩-১৩৪, অন্য কয়েকজন মহাপুরুষ কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপরিধি ও বিশ্বব্যাপী প্রসারের তুলনা না করলেও চলত। তাছাড়া এখানে তথ্য যথাযথ হওয়া উচিত। 'অরবিন্দ আশ্রমের কর্মধারা পণ্ডিচেরীতেই সীমাবদ্ধ' এবং 'দ্বিশতাধিক তার (রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের) শাখা-প্রশাখা' (মঠ-মিশনের এপ্রিল ২০০৩-এর প্রতিবেদন অনুসারে এই সংখ্যা ১৪৭) কথাগুলি ঠিক নয়।

পরবর্তী সংস্করণে উপরি উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সাধারণ মুদ্রণ-প্রমাদগুলি (বাহুল্যভয়ে সেগুলি উল্লেখ করা হলো না) আশা করি সংশোধন করে নেওয়া হবে। তাছাড়া এই গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি উদ্ধৃতিচিহ্ন না দিয়ে লেখক নিজের মতো করে লিখেছেন। এতে পাঠক-মনে বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। যেহেতু এটি ইতিহাস-নির্ভর, তথ্যমূলক গ্রন্থ, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলিকে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা উচিত ছিল।

"যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়"—তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনকে যত বিভিন্ন দিক থেকে আমরা দেখব, ততই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পারব। আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণে 'চালচিত্র' শব্দ ব্যবহার করায় মনে হয়, লেখক এখানে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কেবল অলঙ্করণরূপে দেখে নিজেকে স্বনির্ধারিত একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। অন্তর্জগতে যা ঘটে বহির্জগতের ঘটনাবলী তার স্থূল প্রতিফলনমাত্র। সেদিক থেকে অন্তর্লোকের ইতিহাস বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের ভাষা সাবলীল, উপস্থাপনাশৈলী পাঠকের মনকে ধরে রাখতে পারে, ইতিহাস-সচেতনতাও প্রশ্নাতীত। আশা করব, কালপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারত তথা বিশ্বের অন্তর্জগতে যে তরঙ্গাভিঘাত, যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ও করে চলেছে, ভবিষ্যতে লেখক সেসম্বন্ধে গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় হাত দেবেন।❑

গবেষকের চোখে স্বামী অভেদানন্দ

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও দার্শনিক বাণী ● লেখক : ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী ● প্রকাশক : স্বামী অশেষানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯-এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬ ● মূল্য : ৪০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+১৬৮ ● প্রকাশকাল : ১৯৯৬

গ্রন্থকার দর্শনশাস্ত্রের সুখ্যাত অধ্যাপক এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন স্বামী অভেদানন্দজী, যাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অভেদানন্দ স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করে। '**স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও দার্শনিক বাণী**' গ্রন্থে অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রদত্ত 'অভেদানন্দ স্মারক বক্তৃতা'-দুটি রয়েছে এবং সেইসঙ্গে 'পরিশিষ্ট'-এ রয়েছে তাঁর আরো তিনটি প্রবন্ধ। মূল স্মারক বক্তৃতার বিষয় হলো 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও তাঁর দার্শনিক বাণী'। 'পরিশিষ্ট' অংশে আছে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রসারে স্বামী অভেদানন্দ', 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ' এবং 'যোগ-সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ'।

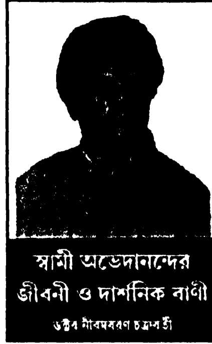
স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভাই। তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব গৃহী-জীবনের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র, জন্ম কলকাতার আহিরীটোলায়। তাঁর পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির সম্মানিত শিক্ষক, যাঁকে তৎকালীন কলকাতার বিদ্বজ্জনেরা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কালীপ্রসাদ যখন যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁর সহপাঠী ছিলেন বাবুরাম ঘোষ (পরে স্বামী প্রেমানন্দ)। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে কালীপ্রসাদ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে পড়েছিলেন অঙ্কশাস্ত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র। এই স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি যোগসাধনার প্রতি আকর্ষণবোধ করেন এবং যোগশিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিজে একা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে যোগশিক্ষালাভের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যোগশিক্ষালাভের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই যোগে উৎসাহী কালীপ্রসাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ তিনি নির্বিকল্প সমাধিলাভে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন, বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবী ও প্রবর্তকদের মাধ্যমে একই সত্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাকার এবং নিরাকার উভয়প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রথমে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা তিনি তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে পেয়েছিলেন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিরজা হোম করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কালীপ্রসাদ 'স্বামী অভেদানন্দ' নামে পরিচিত হন। এরপর অন্য গুরুভ্রাতাদের মতোই তিনি পদব্রজে ভারতভ্রমণে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল, শাশ্বত ভারতের ধ্যানধারণার বাস্তব রূপ স্বচক্ষে দেখা। তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, ভারতবাসীদের বিভিন্ন ভাষা, পরিধান ও খাদ্যাভ্যাস সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি বিশেষ ঐক্য ও অখণ্ডতা আছে।

ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন এবং শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানে মগ্ন হন। এইসময় অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনা ও বিচার এবং সেই আদর্শে জীবনগঠন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অভেদানন্দ তাঁর স্বভাবেই একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে তাঁর উৎসাহ তাঁর গুরুদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদন করেছিলেন, কেননা লোকশিক্ষার জন্য অন্যের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। অভেদানন্দ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতের মূল গ্রন্থগুলি পড়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বুদ্ধি ও যোগের যুগ্মপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে তিনি অলৌকিকী প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন।

১৮৯৬ সালের পর থেকেই অভেদানন্দ লোকশিক্ষার কাজে নেমে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা এবং ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও সাধনার মর্মবাণী প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। পাশ্চাত্যে প্রচারের কাজে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন। বিবেকানন্দই তাঁর গুরুভ্রাতা অভেদানন্দকে ১৮৯৬ সালে পাশ্চাত্যে নিয়ে আসেন। পরবর্তী কালে অভেদানন্দ একজন অসাধারণ বক্তা ও প্রচারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি লণ্ডন থেকে আমেরিকায় যান। সেখানে বেদান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রচার করতে থাকেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর আমেরিকায় ছিলেন এবং সেখানকার প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বক্তৃতা করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন, সেগুলির মূল বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি এবং ইংরেজ-শাসনে ভারতের দুর্গতি। আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগিয়ে তুলতে অভেদানন্দের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।



আমেরিকা থেকে ফিরে অভেদানন্দ আবার পরিভ্রমণে বের হন এবং এবার তিনি তিব্বত ও লাদাক অঞ্চলে যান। তিব্বতে যিশুখ্রিস্টের অজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে তিনি যে পুঁথি পান তা তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেন জনৈক তিব্বতি লামার সাহায্য নিয়ে। তিনি আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ ছিলেন, পরে কলকাতা ও দার্জিলিঙে শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর দেহাবসান হয়। অভেদানন্দ নিজেকে সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণের 'সন্তান ও সেবক' বলে উল্লেখ করতেন। তাঁর জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল।

স্মারক বক্তৃতায় অভেদানন্দের দর্শনচিন্তা বিশদ ব্যাখ্যা করার সুযোগ না থাকায় অধ্যাপক চক্রবর্তী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, তবে তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই করেছেন। দর্শনচিন্তার ব্যাপারে অভেদানন্দ পুরোপুরি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতকেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মূলকথাগুলি হলো : (১) বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; দর্শন হলো জ্ঞানবৃক্ষের ফুল, আর ধর্ম হলো ফল। দর্শনে যে-সত্য আমরা বুদ্ধিস্থ করি, ধর্মে সেই সত্য আমরা জীবনস্থ করি।

(২) অভেদানন্দের মতে, অদ্বৈতবেদান্ত সবচেয়ে সুন্দর ও সঠিকভাবে বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করতে পেরেছে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'সত্য' সর্বদাই 'এক', তবে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

(৩) অদ্বৈতবেদান্ত 'সত্য'কে চিৎ-রূপ ব্রহ্ম বা আত্মা বলেছে। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই হতে পারে। ব্রহ্ম বা চিৎ নিত্য ও অবিভাজ্য। ভগবদ্গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে।

(৪) দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি থেকে অভিন্ন, 'মায়া' শক্তি তেমনই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। 'মায়া' শক্তি বা অজ্ঞানতা সম্বন্ধে বৈদান্তিক ব্যাখ্যানে অভেদানন্দের স্বকীয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

(৫) অভেদানন্দের মতে, বেদান্তের কয়েকটি স্তর আছে। তাদের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত বলা হয়। যেকোন ধর্মমতই এই তিন স্তরের কোন একটিতে পড়বে।

(৬) বেদান্তধর্ম সনাতন। এর কোন প্রবর্তক নেই, কেননা চিরন্তন সত্যই এর ভিত্তি। একে উপলব্ধি করতে হয় সাধনার মাধ্যমে, সেকারণে বেদান্তদর্শন বা ধর্মকে বিজ্ঞান বলা যায়।

(৭) সাধনার পথকে বলা হয় যোগ, যা চার ধরনের—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। মানুষ তার রুচি-প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন যোগ অনুসরণ করে, তবে প্রাপ্তি সকলের একই। এই অর্থে বিভিন্ন ধর্মসাধনায় যেসব বিভিন্ন পদ্ধতির কথা আছে, বেদান্ত তাদের সমন্বিত করে মানবজাতির জন্য বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেছে।

(৮) মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ বা লক্ষ্য হলো 'ভাগবতচেতনা' লাভ করা। একেই ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা হয়। আসলে এসবই হলো ব্যক্তির স্বরূপ উপলব্ধি। উপনিষদে এই বক্তব্য সংক্ষেপে রূপ পেয়েছে 'তত্ত্বমসি' কথাটির মধ্যে। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার এক সহজ উপায় হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ 'শিব'জ্ঞানে 'জীব'সেবার কথা বলেছেন।

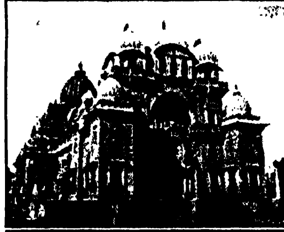
স্মারক বক্তৃতা-দুটিতে স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তারই সম্প্রসারণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে 'পরিশিষ্ট'-এর অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে। এর মধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মননগ্রাহী। যেকোন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে এই সহজভাবে লেখা প্রবন্ধটিতে। 'যোগসমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি একই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু এর বৌদ্ধিক আবেদন উচ্চস্তরের। শুধু স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শনচিন্তা নয়, একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তার প্রাথমিক পরিচয়ও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। তাই অধ্যাপক চক্রবর্তীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাতেই হয়, না হলে এই গ্রন্থের সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। ❑

রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর

মাত্র দুটি টাকা। তবে, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর দান। সেই দানকে মাথায় করে যাত্রা শুরু করেছিল যে-প্রতিষ্ঠান, তা আজ বিরাট এক যজ্ঞশালার রূপ নিয়েছে। বাস্তবিকই নাগপুরের এই রামকৃষ্ণ মঠে আজ বিশাল একটি মন্দির, প্রকাশনা বিভাগ, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, ডিস্পেনসারি প্রভৃতি নিয়ে চলছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। এই মঠ সম্প্রতি তার প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালন করল।

ঘটনার শুরু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী (তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ) বোম্বে থেকে বেলুড় মঠে ফেরার পথে নাগপুরের কিছু ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহে সেখানে দিন পাঁচেকের জন্য পদার্পণ করেন; ওঠেন ধানতলীতে হীরালালজী বর্মার বাড়িতে। তাঁর শুভাগমনে ঐ অঞ্চলের ভক্তদের মধ্যে বিশেষ আনন্দ-প্রেরণার সঞ্চার হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার, আনন্দমোহন চৌধুরী নামে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এক সজ্জন কিছুকাল আগেই ক্র্যাডক টাউনে (ধানতলী) বিশাল এক জমি কিনেছিলেন—নাগপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হবে, এই আশায়। জায়গাটিতে একটি ছোট মাটির বাড়িও তৈরি হয়। স্থানীয় ভক্তেরা মাঝে মাঝে সেখানে জমায়েত হয়ে ধ্যানজপ, পাঠ, ভজন প্রভৃতি করতেন। মহাপুরুষজী এসে ঐ ভক্তদের আগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন এবং নাগপুরে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। সেই অনুসারে মহারাজ চলে আসার পর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর আনন্দমোহন চৌধুরী ঐ জমিটি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়কে আনুষ্ঠানিকভাবে দান করে দেন।



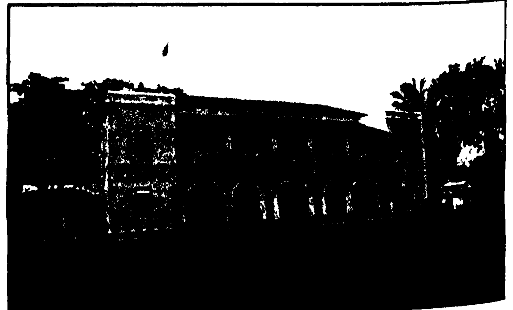
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

নাগপুরে আবার মহাপুরুষ মহারাজের শুভাগমন হয় প্রায় দুবছর পর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। এবার তিনি কোন ভক্তবাড়িতে না থেকে আশ্রমের জন্য প্রদত্ত জমিতে এক অস্থায়ী তাঁবুতে প্রায় ৭ দিন অবস্থান করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি যে-স্থানটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করেন, সেখানে এখন গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। সেইসঙ্গে তিনি ভবিষ্যৎ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তরটিও স্থাপন করেন। পূজা করার সময় মহারাজ দিব্যভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ঐদিন মহাপুরুষজী সুধীশচন্দ্র দত্তচৌধুরী নামে একজন তরুণ আইনজীবীকে দীক্ষাদান করেন। ইনি পরে (সম্ভবত ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) সংসারত্যাগ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। তাঁর সন্ন্যাস-নাম হয় স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ। নাগপুর আশ্রমের প্রায় সূচনাকাল থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দেহাবসান পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমেই ছিলেন।

এদিকে নাগপুরে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা মোটামুটি সম্পূর্ণ হওয়ায় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দকে সেখানে গিয়ে আশ্রমের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি এতে অবাক হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন—মহারাজ, আমি হিন্দি জানি না, মারাঠি জানি না। নাগপুরে গিয়ে কী করে কাজ করব? সেখানে কেই বা আমাকে সাহায্য করবে? মহাপুরুষজী বলেন—ব্যক্তিত্বেই কাজ হয়; টাকায় নয়। তুমি ওখানে গিয়ে কেবল থাকবে। তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না... ঠাকুরই সব করবেন। তোমার কাছে যারা আসবে, তুমি শুধু তাদের ভালবাসা দেবে। তাদের ঠাকুরের কথা বলবে। নিজের জীবন দেখাবে। যতদিন পার শাস্ত্রের ক্লাস নেবে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নাগপুরে ঠাকুরের আশ্রম গড়ে উঠেছে। এই বলে তিনি তাঁর সেবককে বললেন ভাস্করেশ্বরানন্দজীকে দুটি টাকা দিতে। আর বললেন—এই দুটি টাকা নিয়ে কাজ শুরু কর।

মহাপুরুষ মহারাজের দেওয়া দুটি টাকা নিয়ে ভাস্করেশ্বরানন্দজী হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বাক্স কিনে নাগপুর রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছালেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। পূর্ব-উল্লিখিত মাটির বাড়িতেই আশ্রমের কাজ শুরু হলো। তখন সেখানে রয়েছে একটি ঠাকুরঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি। স্থানীয় ভক্তদের সহযোগিতা নিয়ে শুরু হয়ে গেল আশ্রমের কাজ। ভাস্করেশ্বরানন্দজী স্থানীয় বিদ্যালয়ে, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নে এবং নিকট-দূরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাবপ্রচারের জন্য যেতে আরম্ভ করলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে কখনো কখনো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। তাঁর সাধু ব্যক্তিত্ব, অপরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং ইংরেজিতে গভীর জ্ঞান ও বক্তৃতাশৈলীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ আশ্রমে যাতায়াত করতে আরম্ভ করল। যে-তরুণ আইনজীবী সুধীশচন্দ্র দত্তচৌধুরীর কথা আগে বলা হয়েছে, তিনিও এইরকম সময়েই আশ্রমে যোগদান করেন। সমাজে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত যেসব মানুষ সেই সময়ে আশ্রমকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার বি. কে. বসু, অ্যাডভোকেট পি. এন. রুদ্র এবং পটবর্ধন হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক এন. কে. বেহরে।

আশ্রমের মূল বাড়িটি তৈরি হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। একতলার ছোট একটি ঘরে গ্রন্থাগার চালু হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। সেই বছরেই



নাগপুর আশ্রমের পুরনো মন্দির

সংলগ্ন একটি হলঘরে দুজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয় একটি ছাত্রাবাস। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির। এরপর ধীরে ধীরে আশ্রমের কাজকর্ম বাড়তে থাকে। স্বামী শিবানন্দজীর দেহত্যাগের পর মঠ-মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ হন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দুদিনের জন্য নাগপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইভাবে নাগপুর আশ্রমটি ধন্য হয়ে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুজন সাক্ষাৎ শিষ্যের পুণ্য পদার্পণে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। ঐসময়েই শুরু হয় আশ্রমের প্রকাশন বিভাগটির। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-স্মৃতি-গ্রন্থমালা' শিরোনামে প্রকাশিত হতে শুরু করে মারাঠি ও হিন্দি গ্রন্থ। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ডিস্পেনসারি, গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, প্রকাশন বিভাগ ও ছাত্রাবাসের জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়। এর পর থেকে ছাত্রাবাসে বেশি সংখ্যায় ছাত্র নেওয়া হতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় পৃথক একটি বাড়ি—'বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন'। এখানে ১৯ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হয়; আগের বাড়িটিতে থাকে ৬ জন। এই নতুন বাড়ির দোতলায় নির্মিত হয়েছে 'শিবানন্দ সভাগৃহ' নামে প্রশস্ত একটি অডিটোরিয়াম। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে নির্মিত হয় সাধুনিবাস। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয় আশ্রমের রজত জয়ন্তী। ততদিনে আশ্রমে নির্মিত হয়েছে মন্দিরসহ একটি দোতলা বাড়ি (১৯৩৪), অপর একটি দোতলা বাড়ি (বর্তমান পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, ১৯৪২) এবং একটি রান্নাঘরসহ খাবার বাড়ি (১৯৪৪)। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি স্বামী শিবানন্দজীর জন্মতিথিতে নতুন একটি জমিতে নির্মিত বড় একটি দোতলা বাড়িতে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয় স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উৎসব। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশন বিভাগ ও আশ্রম-প্রকাশিত মারাঠি মাসিক 'জীবন বিকাশ'-এর অফিসের জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়।



আশ্রমের পুরনো মন্দিরের বেদিতে স্থাপিত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পট

নাগপুর আশ্রমের কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—চিকিৎসা, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গ্রন্থপ্রকাশ এবং প্রচার। আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রটি ইন্দোরার দরিদ্র এলাকায় কাজ করে। বর্তমানে প্রতিবছর এখানে লক্ষাধিক রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সামান্য খরচে ওষুধপত্র পেয়ে থাকে। মঠের মোবাইল ডিস্পেনসারিটি কাজ শুরু করে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। দৈনিক প্রায় ৭০ কিলোমিটার ভ্রমণ করে এটি সপ্তাহে ৭৫টিরও বেশি গ্রামে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেয়। এছাড়া মঠের অধীনে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত একটি দাতব্য ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র আছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সূচিত হওয়া ছাত্রাবাসের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ২০ জন ছাত্র এখন 'বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন'-এ থাকে। এখানেই রয়েছে একটি পাঠচক্র, যেটি বিতর্ক, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নাগপুর আশ্রমের গ্রন্থাগারের রয়েছে নিজস্ব ভবন; সেখানে এখন বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৪৫,০০০ গ্রন্থ আছে।

একদিন যখন মহাপুরুষ মহারাজকে ভাস্করেশ্বরানন্দজী নাগপুর আশ্রমে নির্মীয়মাণ একটি বাড়ির ছবি দেখাচ্ছিলেন, তখন মহাপুরুষজী অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বলেছিলেন—এই আশ্রম থেকে হিন্দি-মারাঠি গ্রন্থ বেরবে। তাঁর স্বপ্ন সাকার রূপ নেয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবর্ষে—১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দি ও মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থাবলী। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে মারাঠিতে ১০ খণ্ডে স্বামীজীর বাণী ও রচনা প্রকাশিত হয়। এখনো পর্যন্ত এখান থেকে ৩৩৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭০টি মারাঠিতে ও ১৬৪টি হিন্দিতে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে সূচনা হয় মারাঠি মাসিকপত্র 'জীবন বিকাশ'-এর। বর্তমানে এর গ্রাহকসংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি। নাগপুর মঠে এইসব কাজকর্ম ছাড়াও নিয়মিত পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা আশ্রমে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালিত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০০৪-এ। তার মধ্যে ২৬-২৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনের এক অধ্যাত্মশিবির। এটিতে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। এতে ৬০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ২৭-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। অধ্যাত্মশিবির ও ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দেন রায়পুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দজী, চেন্নাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী, ইন্দোর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিষ্ণুপদানন্দজী, নারায়ণপুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী প্রমুখ। প্রত্যহ প্রায় ১,০০০ ভক্ত উপস্থিত থেকেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ২১৩ জন ভক্তকে দীক্ষাদান করেন। ২৯ তারিখ ধর্মসভার সমাপ্তিদিবসে তিনি আশীর্বাণীও প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নাগপুর আশ্রমে গড়ে উঠছে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সর্বজনীন মন্দির।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর: গত ১১ এপ্রিল ২০০৪ দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় স্বামীজীর সেবাদর্শ বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দজী ও মঠের চিকিৎসা বিভাগের ডাঃ বি. কে. ঘোষ।

গত ১ মে ২০০৪ ভজন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী ও স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী। প্রায় ৩০০ ভক্ত এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়—বলরাম-মন্দির, দেওঘর, জয়পুর, কিষাণপুর, নরেন্দ্রপুর, রাজকোট ও সেবাপ্রতিষ্ঠান।

নতুন কেন্দ্র স্থাপন

সম্প্রতি জমি ও বাড়ি-সহ ঘাটশিলার শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম অধিগ্রহণ করে এখানে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা : রামকৃষ্ণ মঠ, দহিগোড়া, ঘাটশিলা, জেলা—পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড, পিন-৮৩২৩০৩। ফোন : (০৬৫৮৫) ২২৭১৪৪।

ছাত্রকৃতিত্ব

সি. বি. এস. সি.-র অধীনে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের দশম শ্রেণি (এ. আই. এস. এস.) ও দ্বাদশ শ্রেণির (এ. আই. এস. এস. সি) পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়	পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
আলং	১০ম শ্রেণি	৮৬	৬২	২৭
	১২শ শ্রেণি	৭৪	৩৪	৬
দেওঘর	১০ম শ্রেণি	৭১	৭১	৬৫
	১২শ শ্রেণি	৪৩	৪৩	৩৬
নরোত্তমনগর	১০ম শ্রেণি	৩৭	৩৬	২২
	১২শ শ্রেণি	৩০	২৮	১০
বিবেকনগর (ত্রিপুরা)	১০ম শ্রেণি	৪১	৩৯	২৭
	১২শ শ্রেণি	২৬	২২	১১

কেরল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরিচালিত ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (কলা বিভাগ) কালাডি বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র ২য় স্থান অধিকার করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী (নারায়ণ মহারাজ) গত ১১ মে ২০০৪ বেলা ৮টা ৪৫ মিনিটে কোঝিকোড় (কালিকট) কেন্দ্রে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিচুর মঠে যোগদান করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোর বেদান্ত কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ দীক্ষাগুরুর কাছ থেকেই সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন বেলুড় মঠ, তিরুবনন্তপুরম, চেন্নাই মঠ, নটরামপল্লি, কাঞ্চিপুরম এবং কালাডি কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় ১৭ বছর তিনি কোঝিকোড় কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন এবং এই কেন্দ্রেই গত ৬ বছর যাবৎ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং তপস্বী স্বভাবের। মালয়ালাম ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে কিছু অনুবাদ-গ্রন্থও রয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

স্বামী নির্লেপানন্দজী (বিদ্যাধর মহারাজ) গত ১৯ মে ২০০৪ বেলা ১টা ৫ মিনিটে দেওঘর বিদ্যাপীঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ ব্রঙ্কাইটিস ও পারকিন্সন রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৩ সালে তিনি চেন্নাই মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, রাঁচি মোরাবাদি, দিল্লি, পাটনা, চেন্নাই মিশন আশ্রম, মুম্বাই, রাজমুন্দ্রি ও দেওঘর কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। শান্ত ও তপস্বী স্বভাবসম্পন্ন বিদ্যাধর মহারাজ গত ৭ বছর যাবৎ তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা : প্রতি ইংরেজি মাসের ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ও ৩য় বৃহস্পতিবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১ম ও ৩য় রবিবার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং ২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা (ওড়িশা) : গত ৫-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ গীতি-আলেখ্য, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৫ তারিখ সন্ধ্যায় আয়োজিত সাধারণ সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ মঙ্গলদীপ জ্বেলে শুভসূচনা করার পর আশীর্বাণী প্রদান, সঙ্ঘের স্মরণিকা প্রকাশ ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। সঙ্ঘের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠের পর ভাষণ দেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী। ৬ ও ৭ তারিখ সন্ধ্যায় কথা ও গানের মাধ্যমে 'রামকৃষ্ণচরিত' পরিবেশন করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দজী। ৮ তারিখ পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজীর উপস্থিতিতে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ মহারাজজী ৮৮ জন দীক্ষার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খড়ার সারদাদেবী মহিলা সমিতির পরিচালনায় সারাদিনব্যাপী এক 'মাতৃসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনশতাধিক মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী কালাতীতানন্দজী এই সম্মেলনে ভাষণ দেন।

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, প্রভাতফেরি, বসে আঁকো ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, আদিবাসী ও সুতরা নৃত্য, কাঠিনাচ, লীলাকীর্তন, গীতি-আলেখ্য, গোষ্ঠী আলোচনা, যেমন খুশি সাজো প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী নিত্যসত্যানন্দ, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ, ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায়, অমলেশ দত্ত, জে. এস. গিল প্রমুখ। ৮ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৭ তারিখ স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী পতাকা উত্তোলন করে উৎসবের সূচনা করার পর তাঁর সভাপতিত্বে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা শিবির, চন্দ্রকোণা লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় ২৮৫ জন রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান এবং সন্ধ্যায় পাঠচক্রের সদস্যাবৃন্দের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়। ৮ তারিখ শোভাযাত্রা, গীতা ও চণ্ডী পাঠ, বিশেষ পূজা, রক্তদান শিবির, বস্ত্র ও পুরস্কার বিতরণ, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, আনন্দপুরী (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পদযাত্রা, বেদ ও গীতা পাঠ, ভক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী ও নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ৯ তারিখ ভি. ডি. ও.-তে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা' প্রদর্শিত হয়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী এবং স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী ও স্বামী গিরিধরানন্দজী এই উৎসবে যোগদান করেন। এদিন দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (হুগলি) : গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অজিত ঘোষাল। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী, স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রায় ৩,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পীঠ (হাওড়া) : গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, রঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত মুখার্জি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক সুবলচন্দ্র কুণ্ডু।

বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির (কলকাতা-৪২) : গত ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ভক্তিগীতি, কবিতা আবৃত্তি, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়'-এ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৮ তারিখ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তরূপানন্দজী, স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী ও স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী। এদিন ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৯ তারিখ আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজী। বক্তব্য রাখেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী, ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

বিজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৩ তারিখ 'কলকাতা ব্লাড ব্যাঙ্ক'-এর সৌজন্যে রক্তদান-শিবির এবং 'বিকশিত' (মুরারীপুকুর, কলকাতা) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সৌজন্যে ই. সি. জি., ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ব্লাড সুগার, চক্ষুপরীক্ষা ইত্যাদি সেবামূলক কাজ অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সন্ন্যাসিনীবৃন্দ। ১৫ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাতা বিতরণ, ২০০৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীকে রৌপ্যপদক প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। স্থানীয় মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করেন হালিসহর পৌরসভার প্রধান দীনবন্ধু পাল।

হালিসহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১৪ তারিখ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, মাতৃবন্দনা, শিশুদের মধ্যে 'কথামৃত' পাঠ, বেদ-পুরাণের গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা করেন প্রব্রাজিকা তন্ময়প্রাণাজী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা শঙ্করপ্রাণাজী, বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। ১৫ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন একজন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দান করা হয়। প্রায় ২,৫০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ পান। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী ঈশ্বরাত্মানন্দজী ও ডঃ নমিতা দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, পুইনান (হুগলি)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ তারিখ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, হরিনাম, পালাকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বরানন্দজী, স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও স্বামী সুখানন্দজী। এদিন দুঃস্থ নরনারায়ণের মধ্যে ২০০ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ১৫ তারিখ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও উর্মিলা বিদ এবং ভাগবৎ-প্রসঙ্গ করেন হরিমোহন গোস্বামী। উভয়দিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হরিপাল (হুগলি)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ তারিখ উষাকীর্তন ও নগর-পরিক্রমা করা হয়। ১৫ তারিখ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী বরানন্দজী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। বিকালে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (কলকাতা-৮১)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, নাটক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, পাঠচক্রের সভাপতি শ্রীশচন্দ্র দাস, প্রফুল্লচন্দ্র অঙ্কুর, অশোককুমার মুখার্জি, মিহিরকুমার ঘোষ প্রমুখ। ১৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৪ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, 'মায়ের কথা' ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী, ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য (বগছড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ), কমলকুমার মান্না এবং শক্তিকুমার কয়াল (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ড ডেপুটি কালেক্টরেট, ঘাটাল)। স্বাগত ভাষণ-সহ সম্পাদিকার প্রতিবেদন পাঠ করেন ব্রহ্মচারিণী সুপ্রভাদেবী। ১৫ তারিখ ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় 'ওঠো, জাগো' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বারাকপুর সেবাকেন্দ্রের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সহযোগিতায় 'শ্রীমা সারদা স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও রোগনির্ণয় শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১৩৬ জনের ই. সি. জি., ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার পরীক্ষা এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী বিভাবতী ঘোষ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ছিলেন প্রয়াত জননেতা অতুল্য ঘোষের সহধর্মিণী। তিনি কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর-নিবাসী অন্নদাচরণ সামন্ত গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নদীয়া-নিবাসী পরিতোষকুমার সাধ্য গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বাঁকুড়া-নিবাসিনী নন্দরানী মণ্ডল গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর স্বামী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী উষারানী দত্ত গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নিউ দিল্লি-নিবাসী পীযূষকান্তি রায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন সুলেখক; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-নিবাসী স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৬ বছর, বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ার পূর্বে বারাসত শিবানন্দ আশ্রমে ১৬ বছর এবং এই আশ্রমে প্রায় ২০ বছর শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী যূথিকা মজুমদার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর-নিবাসী জগদীশচন্দ্র ভৌমিক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী প্রীতি ঘোষ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন সদস্যা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার বনগ্রাম-নিবাসী অনন্তকুমার ভট্টাচার্য গত ৮ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর দিনাজপুর-নিবাসী স্বামী সাধনানন্দজী মহারাজ গত ১৪ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।❑



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**
  কাঁকুড়গাছি, ফোন : ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
  হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন : ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন : ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ**, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন : ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**
  ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
  ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন : ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স**
  ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক**, সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র**, চেতলা
- **শোভনা ভৌমিক**, ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ২৪৯৭-০১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স**
  ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল**
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫
  ফোন : ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক**
  ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
  ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **দাসানুদাস সাহা**, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট
  কলকাতা-৫, ফোন : ২৫৫৪-৬২৯৯
- **রবি হাজরা**
  ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**
  ২৪/৬১ যশোর রোড
  ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮
  ফোন : ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর আইচ
  ৯/এইচ, দমদম রোড, রাজাবাগান
  কলকাতা-৩০, ফোন : ২৫৫৭-০৫৭৬, ৯৮৩০১৩২৩৯২
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, প্রযত্নে বিকাশ সাহা
  মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা-৭৯
  ফোন : ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**
  প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন : ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক)
  ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১
  ফোন : ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন : ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**
  ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড, সন্তোষপুর
  যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন : ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর**
  প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা
  কলকাতা-৪৯, ফোন : ২৫৪১-০১২২
- **রূপম চক্রবর্তী**
  প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
  বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬,
  ফোন : ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪
- **বিবেকানন্দ পাঠমন্দির**
  প্রযত্নে কানাইলাল বসু
  ৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর
  কলকাতা-৬৩, ফোন : ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪
- **অলক পাল চৌধুরী**
  প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, সন্তোষপল্লী
  ঘোলা বাজার-১১১, ফোন : ২৫৯৫-২১৮৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র**
  ১১/৫৪ ঋষি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৫১

পাতঞ্জল যোগসূত্র অবলম্বনে

অবিদ্যা → নাশের ফল কী → (অন্তরঙ্গতম) দৃশির কৈবল্য লাভ

অবিদ্যা → নাশের উপায় কী → অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি

জ্ঞানদীপ্তি → অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান → জ্ঞানদীপ্তি

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান → কাকে বলে?

অন্তরঙ্গ সাধন: সমাধি | ধ্যান | ধারণা

বহিরঙ্গ সাধন: প্রত্যাহার | প্রাণায়াম | আসন | নিয়ম | যম

যম → সু-অভ্যাস** (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ)

নিয়ম → শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপঃ, ঈশ্বর-প্রণিধান

ক্রিয়াযোগ → সংজ্ঞা কী? → স্বাধ্যায়, তপঃ, ঈশ্বর-প্রণিধান

সু-অভ্যাস**	কু-অভ্যাস
অহিংসা	হিংসা
সত্য	অনৃত
অস্তেয়	স্তেয়
ব্রহ্মচর্য	অ-ব্রহ্মচর্য
অপরিগ্রহ	পরিগ্রহ
শৌচ	অশৌচ
সন্তোষ	অসন্তোষ
স্বাধ্যায়	বৃথাবাক্য
তপঃ	অ-তিতিক্ষা
ঈশ্বর-প্রণিধান	হীনপুরুষের চরিত্রভাবনা

কু-অভ্যাস (অনৃত … অ-তিতিক্ষা) — বিতর্ক*

* 'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্' অর্থাৎ কু-অভ্যাসকে সু-অভ্যাসের দ্বারা নষ্ট করতে হয়।

** বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'রাজযোগ' দ্রষ্টব্য। আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগেও এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

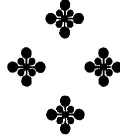
স্বামী বিবেকানন্দ



> There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
>
> Sri Ma Sarada Devi

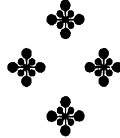
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ





UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol. 106
No.7
July
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

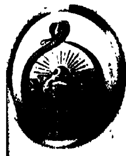
If undelivered, Please return to :
Udbodhan Office,

ার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা সডাক ১০০ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

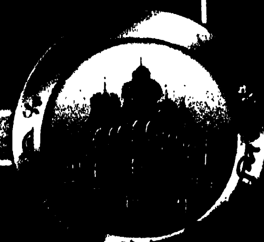
উদ্বোধন

১০৬



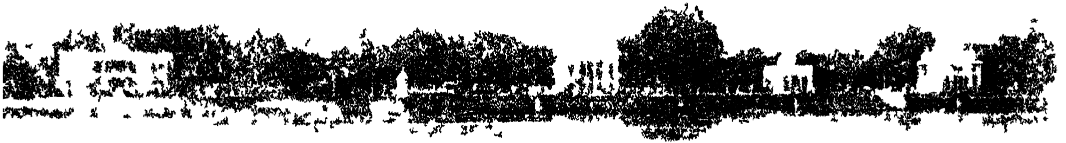
ভাদ্র ১৪১১ ৮ম সংখ্যা





১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন-কার্যালয় কলকাতা







রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।



প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ● ভাদ্র ১৪১১ ● আগস্ট ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য : ১০ টাকা



‘উদ্বোধন’ ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **‘উদ্বোধন’-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। ‘উদ্বোধন’-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে **(By Post)** পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ** আবশ্যক।
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু অনেক **গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে **(By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে**, তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির ‘ক্যাশমেমো’/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির ‘ফাইনাল পেমেন্ট’-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে।**








বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥

পদ্মের পাপড়ির ন্যায় বিস্তৃত যাঁর নয়ন; কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র যাঁর দন্ত; যিনি গোপালবালকের বেশধারী; যাঁর পাদপীঠ ইন্দ্রাদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত—সেই বৃন্দাবনবিহারী বসুদেবপুত্র মুকুন্দকে আমি বন্দনা করি।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

দেবকীর আনন্দবর্ধনকারী (পুত্র) এই দেবতার জয় হোক, বৃষ্ণিবংশের প্রদীপস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক, মেঘের মতো শ্যামবর্ণ এবং কোমলশরীরধারীর জয় হোক, পৃথিবীর ভারহরণকারী মুকুন্দের জয় হোক।

মুকুন্দ মূর্ধ্না প্রণিপত্য যাচে, ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে, ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥

হে মুকুন্দ, আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করে একান্তভাবে শুধু এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপায় কখনো তোমার পাদপদ্ম না ভুলি।

অপরাধসহস্রসঙ্কুলে, পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে, কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

হে হরি, সহস্র অপরাধে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর সংসারসাগর-মধ্যে পতিত নিরুপায় শরণাগতকে কেবল কৃপা দ্বারা নিজের করে নাও।

মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ (১, ৩, ৪, ১৩)



শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাকে সঠিক অনুধাবন করিয়া এবং তৎসহ বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়া সঠিক শিক্ষানীতি নির্ধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। যথার্থ কল্যাণকামী শিক্ষক ও অভিভাবকগণের নিকট ইহাই আবেদন, তাঁহারা স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে যথার্থ অনুধাবন করিয়া সেইভাবে শিক্ষার্থিগণকে জীবনগঠন করিতে সাহায্য করুন। রামকৃষ্ণ মিশনে কোন ধর্মমত বলপ্রয়োগ করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় না। সকলেই যাহাতে সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া উঠে, তাহার জন্য সকল ধর্মগুরুর জীবনবৃত্তান্ত শ্রদ্ধার সহিত চর্চা করা হইয়া থাকে। ইহাই যথার্থ ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ছাত্রাবাসগুলিতে অ-হিন্দু কাহাকেও স্ব স্ব ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হয় না। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের কথা স্বামীজী যেভাবে বলিয়াছেন, সেভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ বলেন নাই। এই অন্তর্নিহিত দেবত্ব কেবল হিন্দুর শরীরেই বিদ্যমান, মুসলিম বা খ্রিস্টানের মধ্যে নাই—তাহা স্বামীজী কখনো বলেন নাই। তাই নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, যদি কোন হিন্দু নিজের অন্তরের দেবত্বের বিকাশ ঘটাইতে পারে, সে যথার্থ হিন্দু হইবে; যে মুসলিম ছাত্র/ছাত্রী নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটাইবে, সে নিঃসন্দেহে যথার্থ মুসলিম হইবে; যে খ্রিস্টান নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটাইবে, সে অপরাপর খ্রিস্টান অপেক্ষা যিশুর আরো নিকটবর্তী হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এই কথাগুলি না বলিয়া খেলার ছলে এই ধারণা শিশুদের মনে কিভাবে অঙ্কিত করা যায় তাহার উপায় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই শ্রদ্ধা জাগাইতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরাল আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন কিনা সেকথা চিন্তা করিবার সময় হইয়াছে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' মন্ত্রে 'শিব' শব্দটি কি ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী? কখনোই নহে। কারণ, 'শিব'-এর অর্থ মঙ্গলময়। 'শিব'-এর পরিবর্তে 'গড' কিংবা 'আল্লা' শব্দ বসাইলে স্বামীজীর বক্তব্য কিছুমাত্র বদলাইবে না।

অর্থাৎ আত্মবিকাশের সহায়ক শিক্ষায় যেমন একদিকে জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শরীরবিজ্ঞান, খেলাধূলা, সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা থাকিবে; অপরদিকে তেমনি সেবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ থাকিবে। সমান্তরালভাবে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাকে স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকিবে। এবং সেইসঙ্গে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, গুরুজন ও আচার্যগণকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, সকলের প্রতি প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শে তাহার জীবন গঠন করিবার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত জরুরি, যাহার লক্ষ্য একটিই—"মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন"।

যদি কেহ ঈশ্বরবিশ্বাসী মন লইয়া স্বামীজীর নির্দেশিত পথে চলিতে চাহেন, স্বামীজীর বাণী তাঁহার মনে অবশ্যই শক্তিসঞ্চার করিবে। কিন্তু যদি কাহারো ঈশ্বরে কিংবা অদৃষ্টে বিশ্বাস না থাকে, তাহার জন্যও স্বামীজীর বাণী যথেষ্ট অর্থবহ। কারণ যখন স্বামীজী বলিলেন: "শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশসাধন", তখন স্পষ্টত এখানে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোন প্রসঙ্গ নাই। অর্থাৎ শিক্ষার এই সংজ্ঞা নাস্তিক, আস্তিক, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ না থাকিলেও এখানে আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিকাশের প্রসঙ্গ আছে। আছে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রগঠনের প্রসঙ্গ। পার্থিব কিংবা পারমার্থিক পূর্ণতাই যেকোন শিক্ষার চরম লক্ষ্য—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে-ব্যক্তি জুতা সেলাই করিতেছে, যে হিসাবরক্ষক, যে-ব্যক্তি প্রশাসক কিংবা যে ফুটবল খেলিতেছে, অথবা যে সঙ্গীত পরিবেশন করে, কিংবা কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ—সকলেরই একটিমাত্র লক্ষ্য—পূর্ণতা বা perfection-এ পৌঁছানো। যেন একটি পেশাদারি দক্ষতায় (professional skill) কাজটি সুনিষ্পন্ন হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। এক্ষেত্রে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ না আনিলেও চলে। এব্যাপারে আমরা পাশ্চাত্যবাসীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারি। সাধারণত দেখা যায়, তাহারা যখন যে-কাজটি করে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া করিয়া থাকে। এবং তাহাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়, কিভাবে কাজটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হইবে। একথার ভুরি ভুরি উদাহরণ রহিয়াছে। যেমন মনিয়ার-উইলিয়ামসের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান। মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত

উভয়ের কাহারো মাতৃভাষা নহে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় সাড়ে তেরোশো পৃষ্ঠার এই বৃহদাকার গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পূর্বেই দক্ষিণ ফ্রান্সের কেন্স শহরে মনিয়ার পরলোকগমন করিয়াছেন। হয়তো তিনি এই তৃপ্তি লইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন যে, এই গ্রন্থ একদিন ভারতবর্ষের সকল সংস্কৃতভাষা-বিশারদের অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। এবং ঘটনাও তাহাই। গ্রন্থটির বিপুল সমাদৃতি দুই বিদেশি ব্যক্তি সংস্কৃত অভিধান লিখিয়াছেন বলিয়া নহে, পরন্তু ইহার অতি উৎকৃষ্ট মানের জন্য—যাহা ইহাকে একটি অপরিহার্য গ্রন্থের মর্যাদাদান করিয়াছে। কেবল গ্রন্থ ছাপাইতে নহে, অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যবাসী যাবতীয় 'টেকনিক্যাল' দৃষ্টিকোণ হইতে নিজের অভীষ্ট বস্তুকে কল্পনাসহায়ে দেখিয়া মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া কাজ শুরু করে এবং যতক্ষণ না উহা পূর্ণতালাভ করে ততক্ষণ লাগিয়া থাকে। দায়সারা কাজ তাহারা করিতে জানে না। সেব্যাপারে আমরা অনেক বেশি দক্ষ!

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে সরকারি নীতি নিশ্চয়ই আত্মপ্রত্যয়, আত্মশক্তি, অভীষ্ট লক্ষ্য এবং ত্যাগ ও সেবার জাতীয় মহান আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই নির্ধারিত হইবে—ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তত্ত্ব এবং বাস্তবের মধ্যে উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরুর পার্থক্য। একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হইল, জাতীয় রক্তপ্রবাহের গতির বিপরীতে শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই একটি প্রহসনে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রচুর সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর সমাজে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের স্বার্থবিরোধী কিম্ভূত-কিমাকার শিক্ষানীতি কার্যকর করিতে সচেষ্ট। ফলে এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। যুবসম্প্রদায়ের পায়ের নিচে মাটি নাই। বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ক্রমশ প্রবল হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষের যুবসমাজ সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমান গোষ্ঠী—একথা আজ প্রমাণিত সত্য। বহু মনস্বী ব্যক্তিই বলিয়াছেন যে, IT (Information Technology)-কে অবলম্বন করিয়া অদূর ভবিষ্যতে ভারত পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দান করিবার মতো কোন কার্যকরী বিল এখনো সংসদে উত্থাপিত হয় নাই। বরং বিগত বৎসরে (২০০২-২০০৩) প্রবাসী ভারতীয় সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারগণ বিদেশে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অপরদিকে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ যে জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে এদেশের অত্যাচারিত, শোষিত জনসাধারণ সযত্নে আপন বক্ষে আগলাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাও সরকারের তাচ্ছিল্যে নূতন প্রজন্মের নিকট ক্রমশ অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। বেশি দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। মহাত্মা গান্ধীর একটি ছবি দেখাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণির একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহা কাহার ছবি? সে বলিয়াছিল, বেন কিন্‌সলে। [বেন কিন্‌সলে একদা মহাত্মা গান্ধীর জীবনভিত্তিক ছায়াছবিতে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।] শিক্ষার পাঠ্যক্রম যদি জাতির জাতীয় পরিচয়কে ভুলাইয়া দেয়, সেই পাঠ্যক্রমকে কি করিয়া জাতির যথার্থ কল্যাণকারী বলিয়া অভিহিত করা হইবে? সেই জাতি ক্রমশ একটি আত্মঘ্ন জাতিতে পরিণত হইবে।

অবশ্য ইতিহাস তাহার নিজস্ব গতিতেই চলিতে থাকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন যে সাম্প্রতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা এখনো স্পষ্টভাবে অনুভূত না হইলেও আমাদের উত্তর-প্রজন্ম তাহা চাক্ষুষ করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে-মূল্যবোধ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হইয়াছিল, সেসম্পর্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী সকলের জ্ঞাতব্য কয়েকটি তত্ত্ব বা মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত মতাদর্শের একটি সুন্দর আলোচনা স্বামী ভজনানন্দ মহারাজ তাঁহার 'Integral Education: Swami Vivekananda's Educational Vision' পুস্তিকায় (শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা, মহীশূর কর্তৃক প্রকাশিত) করিয়াছেন। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নের সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

(১) সনাতন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা অনুসারে মূল্যবোধের ধারণা মানুষের পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা হইতে আহৃত।

(২) কেবল 'মূল্যবোধ'-এর উৎকর্ষসাধন মানুষকে চিরন্তন তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশেই মানুষ চিরন্তন তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।



(৩) যতক্ষণ শিক্ষার্থিগণ সত্যপরায়ণতা, সাহস, সময়ানুবর্তিতা, আজ্ঞাবহতা, সেবা, পবিত্রতাকে স্বেচ্ছায় স্বীয় জীবনে বিকশিত করিয়া না তুলে, ততক্ষণ এই শব্দসমূহের তাত্ত্বিক আলোচনার কোন মূল্য নাই। এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে এই শব্দগুলির অন্তর্ভুক্তিও অর্থহীন। চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত জীবন দেখিলে শিক্ষার্থিগণ সহজে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। একজন শিক্ষার্থীর কখনোই ভাবা উচিত নহে—'আমি নানাবিধ ভয়ে ভীত বলিয়াই সত্যপরায়ণতা, অহিংসা, অক্রোধ ও ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতেছি।' এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চনা।

(৪) পাশ্চাত্যে 'মূল্যবোধ'-এর মাপকাঠি হইল—সত্য (বাচিক), সুন্দর হইয়া উঠা, ভাল হওয়া। ইহার অধিক আর কিছুই নহে। কিন্তু চরম মূল্যবোধ তখনি সার্থক হইবে, যখন জীবনে চৈতন্যের প্রকাশে তাহা সাহায্য করিবে। অর্থাৎ 'মূল্যবোধ' কখনো জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না।

(৫) পারমার্থিক চৈতন্যসত্তার বিকাশের মধ্যেই মূল্যবোধের প্রকাশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত চিৎ-সত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি 'মূল্যবোধ'-এর অভিপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তখন পৃথক করিয়া 'মূল্যবোধ'-চর্চার প্রয়োজন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাই 'মূল্যবোধ' শব্দটি বিরল কখনো ব্যবহার করিয়াছেন।

(৬) স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন, নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বানপূর্বক জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। যখন অন্তরের শক্তি জাগ্রতা হইবেন, তখন আত্মমহিমার যথার্থ প্রকাশ ঘটিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু উত্তম সবই জীবনে অভিব্যক্ত হইবে।

সারকথাগুলি উপরের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে। আমাদের শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য উপর্যুক্ত তত্ত্বগুলি সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভাল কথা শুনাইতে, মনের জন্য স্বাস্থ্যকর চিন্তা সরবরাহ করিতে শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ব্যর্থতার কারণেই আমাদের কিশোর ও যুবসম্প্রদায় চিন্তাজগতে ক্রমশ দুর্বল ও পরনির্ভর হইয়া পড়িতেছে। এবং ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতিতে আকৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষের যুবগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তীক্ষ্ণধী ও কর্মদক্ষ। কিন্তু তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা শূন্যায়মান, সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা তাহাদের নাই। একটা গতানুগতিক জীবন (easy-going life)-এর প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ বলিবেন, দারিদ্র্যই ইহার কারণ। কথাটি সত্য বটে, অসত্যও বটে। একটা ধন্ধমূলক বৃত্তের মধ্যে যেন আমরা ঘুরিতেছি! একদা মিশনের একটি কেন্দ্রে কিছু জাপানি পরিদর্শক আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকে লইয়া গ্রামবাংলার জীবন দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রসেতুর পূর্বপ্রান্তে উড়ালপুলে উঠিবার সময় বাস হইতে একজন দেখিয়াছিলেন, কিছু মানুষ ফ্লাইওভারের নিচে নিদ্রামগ্ন। তখন বেলা প্রায় দশটা। ঐ জাপানি পর্যটক গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "এই অসময়ে ইহারা ঘুমাইতেছে কেন?" গাইড মনোমতো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেনঃ "ওরা অত্যন্ত দরিদ্র।" জাপানি ব্যক্তি প্রতিপ্রশ্ন করিলেনঃ "দরিদ্র বলিয়া তাহারা নিদ্রামগ্ন, না কি নিদ্রিত বলিয়াই দরিদ্র?"

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিচিত্র সমস্যা দেখা যায়। যেমন ছাত্র যদি মানসিক প্রতিবন্ধী হয়, অভিভাবক কিংবা শিক্ষক যদি অহঙ্কারী ও অসংযমী হন, গুরুজন যদি বদরাগী হন, বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ যদি দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ হয়, শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো যদি অপ্রতুল হয়, যদি প্রাইভেট টিউশনের বাড়বাড়ন্ত বিদ্যালয়ে প্রভাব ফেলিতে থাকে, যদি রাজনীতির কারণে ঐ এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়, যদি আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে দরিদ্র ছাত্র সর্বতোভাবে বঞ্চিত হয়, যদি দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার্থী দুর্বলদেহ ও দুর্বলচিত্ত হয়, যদি দুর্নীতির কারণে পাঠ্যপুস্তকের অভাব হয় এবং সর্বোপরি যদি পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার শিক্ষা না দেয়—তাহার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী পৃথক পৃথক সমাধান লইয়া লোককল্যাণচিকীর্ষু বড়দেরই ভাবনাচিন্তা করিতে হইবে। পড়াশুনার সহিত শিশুর স্বাস্থ্য-সচেতনতাও জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। শহরতলীর একটি বিদ্যালয়ে মেডিকেল ক্যাম্প হইয়াছিল। প্রায় ৩০০ শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিতে গিয়ে দেখা গেল ২৫০-র বেশি শিশুর (চতুর্থ শ্রেণি) চশমা আছে, ২০০-র বেশি শিশুর দাঁত খারাপ এবং ১৫০-র বেশি শিশুর ওজন ৫০ কিলোগ্রামের বেশি (হওয়া উচিত ৩৫ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম)। অভিভাবকগণ শিশুর স্বাস্থ্য লইয়া চিন্তিত নহেন, তাঁহারা কেবল বলেন 'পড় পড়'। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীও শিশুর পক্ষে পীড়াদায়ক। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই বলিয়া আমরা ইতিবাচক মূল নীতির অনুধ্যান ও আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ রহিব।



শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া তোলা। শিক্ষার্থীর অন্তরে শ্রদ্ধা জাগিবে তখনি, যখন সে দেখিবে তাহার শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধার অভাব আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্যন্ত শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক বা শিক্ষিকা পরম শ্রদ্ধার সহিত সকলপ্রকার অশ্লীলতা বর্জন করিয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ক্লাসে পড়াইবেন। এই স্তরেই সকলপ্রকার 'ভাল কথা', শিক্ষার্থী বুঝিল বা না বুঝিল, তাহাদের মুখস্থ করানো প্রয়োজন। কারণ "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"—শাস্ত্রবাক্য না বুঝিলেও উহা মুখস্থ করা কল্যাণকর। প্রাথমিক স্তর হইতেই মহাপুরুষ ও শাস্ত্রের বাণী ছাত্রছাত্রীকে মুখস্থ করাইতে হইবে। ইহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুগঠিত হইবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ দিগন্ত উন্মোচিত করা (to give a good exposure)। পাঠ্যক্রম পড়াইবার কালে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীকে গল্পচ্ছলে সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা যায়। আবার কলাবিভাগের শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম দৈনন্দিন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও সহজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী যদি সাহিত্য-ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামান্য না জানে, তাহার শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি কলা কিংবা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী যদি ন্যূনতম বিজ্ঞান না জানে, তাহার শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকে।

স্নাতকস্তরে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশসাধন এবং মূল্যবোধের চর্চা ও ইহার মূল কোথায় সন্নিহিত (অর্থাৎ অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশে), সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা শিক্ষকের কর্তব্য। অর্থাৎ শিক্ষক সর্বদা perfection (পূর্ণতা)-এর দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। কারণ, জীবনের লক্ষ্যই হইল এই পূর্ণতা বা perfection-এ উপনীত হওয়া।

অভিভাবকগণের পরম কর্তব্য গৃহে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত শিশুর মনোবিকাশের একটি স্বাভাবিক গতি থাকে। ঐসময়ে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজের মতো চলিতে দেওয়াই বিধেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শাসন করিবার প্রয়োজন আছে। স্নেহবিগলিত চিত্তে যে অভিভাবক নিজের সন্তানকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তিনি তাহার উপকার না করিয়া বরং অত্যন্ত ক্ষতিসাধনই করেন। শিশুও প্রতিক্রিয়াশীল (reciprocative) হইয়া পড়ে। সুতরাং একদিকে যেমন শিশুকে শাসন করা প্রয়োজন, তাহাকে ভালবাসাও প্রয়োজন; অপরদিকে তাহার সম্মুখে অভিভাবকগণের নিজেদের দ্বিচারিতা সম্পূর্ণ দূর করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে পাশ্চাত্য রীতি অনুকরণ করিয়া সন্তানকে 'স্মার্ট' বা 'পরিণত' করিবার অজুহাতে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়াও অভিভাবকগণের ভবিষ্যৎ জীবনে নিশ্চিতভাবেই অশান্তির সূচনা করিবে। স্বগৃহেই শিক্ষার্থী পবিত্র ধর্মভাবে ভাবিত হইবে—ইহাই বাঞ্ছনীয়। নিউক্লিয়ার-পরিবারের ধারণা যখন ছিল না, একান্নবর্তী-পরিবারে শিশুদের বৃদ্ধি, মনের বিকাশ, ধর্মভাবে প্রতিষ্ঠা সবই অনায়াসে হইত। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও এই পরিবর্তনের অভিঘাত প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতেছে। এই অবস্থাতেও গৃহে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যথেষ্ট কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। প্রবল উদ্যম, শ্রদ্ধা, সংযম, বাস্তববুদ্ধি, ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রীতিসাধনের জন্য তীব্র বাসনা অভিভাবকগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিক্ষার্থীর কর্তব্য কী? শ্রদ্ধাপূর্বক শিক্ষাগ্রহণ। এবং এই specialization-এর যুগে job-oriented (কর্ম-নির্দিষ্ট) শিক্ষায় perfection (পূর্ণতা বা নিখুঁত কাজ)-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ। জীবনে এই perfection-ই মোক্ষস্বরূপ। সুতরাং ধর্ম, অর্থ, কাম সবই এই perfection-কে কেন্দ্র করিয়াই অনুশীলিত হইবে—এই তত্ত্ব অনুধাবন করা। এবং জীবনে চলার পথে ক্ষমা, দয়া, প্রেম, মিষ্টবাক্য, সত্যপরায়ণতা, পরোপকার, পবিত্রতা, সাহস, অধ্যবসায় ইত্যাদি দৈবীগুণের বিকাশসাধনের দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণরূপ দান করা (Integral personality) ও কার্যে দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীর পরম কর্তব্য। শিক্ষার ইহাই সারকথা। এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শিক্ষানীতি নির্ণেয়। এবং সেই শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করাই বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা। ❑ [সমাপ্ত]

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যার জন্য 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি' ৫৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী সুবোধানন্দের চারটি পত্র*

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

রবিবার
SRI RAMAKRISHNA MATH
BHUBANESWAR P.O.
Dt. PURI (ORISSA)
৯ই শ্রাবণ 1926

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু,

কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন শুনিলাম। আমি সেসময় কলিকাতায় মঠে থাকিলে দেখা হইত।

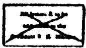
শ্রীমান কার্ত্তিক এই কয়দিন এখানে ছিল। গতকল্য সন্ধ্যার পর এক্স্প্রেস্ গাড়িতে মেদ্নীপুর সুধীরের বোনের সহিত দেখা করিবার জন্য গিয়াছে। সে এখানে শারীরিক ভালই ছিল, বলিত, এখানকার জল বাতাস খুব ভাল; মেদ্নীপুরে সে ২।৩ দিন থাকিবে, পরে কলিকাতার বাসায় যাইবে। শ্রীমান গোপালের পত্র পাইয়াছি, ভাল আছে।

আমি উল্টারথের সময় ৺পুরী জগন্নাথ দুই দিন ছিলাম। সেসময় কার্ত্তিক আমার কাছে ছিল। সে... কখনো আসে নাই, সমস্ত দেখেশুনে খুব সন্তুষ্ট।

চার তারিখ অগষ্ট মাসে উটকামণ্ড পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও মঠ প্রতিষ্ঠা হইবে। তারপর মহাপুরুষ মহারাজ বাঙ্গালোর মঠেতে আসিবেন, তিনি শারীরিক ভাল আছেন।

গতকল্য এখানে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। আজকাল আমি ও এখানকার সকলে ভাল আছি। আপনি আমার আন্তরিক ভালবাসা, শুভ ইচ্ছা জানিবেন। পণ্ডিত মহাশয়, ভূপতিবাবু ও সকলকে জানাইবেন। ভূপতিবাবুকে শ্রীমান কার্ত্তিকের কথা বলিবেন। সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ





॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

বৃহস্পতিবার
Ramkrishna Mission
BELUR P.O. HOWRAH Dist.
Dated ৯ই ভাদ্র 1926

বিনোদেশ্বরবাবু,

পূর্ব্বে আপনাদের পত্র লিখিয়াছিলাম বেলুড় মঠ হইতে বোধ হয় পাইয়াছেন। আজকাল শারীরিক ভালই আছি, আর কোন অসুখ বোধ করি না, এখন দুইবেলা রুটি খাই। ডাল, ভাত, আলু ও মিষ্ট কোন জিনিস খাই না। আর সবরকম খাই।

মেদ্নীপুর দিকে খুব বন্যা হইয়াছে সেইজন্য মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী অনেকে রিলীফ কাজের জন্য সেইসব জায়গায় গিয়াছে; কন্টাই, তোম্লুক, ঘাটাল এইসব জায়গাতেও বন্যা হইয়াছে। সেইসব দেশের লোকেরা ছেলেপুলে নিয়ে গাছের উপর, চালের উপর বসিয়া আছে, সে দেশে ধান চাল যাহা ছিল সমস্ত ডুবিয়াছে ও ভাসিয়াছে। এখান হইতে ২০ মন চিড়া ও গুড় গিয়াছে আরো জিনিসপত্র সমস্ত যাইতেছে; ছোট২ [ছোট ছোট] নৌকা কলিকাতা থেকে যাবে।

বর্ম্মাদেশে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের লোকরা লিখেছে কোন২ [কোন কোন] নদী বাড়িয়া অনেক গ্রাম ভাসাইয়াছে, সেখানকার সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলে সাহায্য করিতে লেগে গেছে। ভগবান যাকে মারেন তার আর কোন উপায় নাই।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

পুঃ ভূপতিবাবুর পত্র পাইয়াছি ঢাকা হইতে, সকলে ভাল আছেন।

।।৩।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

দেবীপক্ষ—বৃহস্পতিবার

RAMKRISHNA MATH

BELUR P. O. HOWRAH DIST.

DATED...২০শে আশ্বিন...1926



প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু—

কয়েকদিন হইল আপনাদের সকলের পত্র পাইয়াছি, সকলে শারীরিক ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। গতকল্য, কলমা রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি (১৩৩২)।

মধ্যে ৮।১০ দিন পূর্ব্বে আমার ইউরীণ পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে [ডাক্তার] চার গ্রেণ সুগার দেখেছিল; এ অসুখের আহারাদি সম্বন্ধে একটু এদিক ওদিক হইলেই বাড়ে ও কমে। এখন ডাক্তারের কথামত আহারাদি করিতেছি ও ভাল আছি।

ঢাকা মিশনে যখন পি. সি. রায় গিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত দেখে শুনে বলিয়াছিলেন, সেবাশ্রমের জন্য যদি কোন ঔষধপত্র আবশ্যক হয়, আমার কাছে পত্র লিখিবেন। বেঙ্গল কেমিকাল ফার্মেসিতে যাহা তৈরি হয়, যথাসাধ্য আমি পাঠাইতে চেষ্টা করিব। কলমা সেবা সমিতির জন্য একবার লিখিয়া দেখুন পি. সি. রায় মহাশয়ের কাছে, যদি কিছু পাঠায় ভাল।

গতকল্য সকাল হইতে বেলা পর্য্যন্ত খুব বৃষ্টি ছিল, আজকে আকাশ পরিষ্কার। ইচ্ছা আছে ৺পূজার পর পশ্চিম দেশে কোন ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকিব।

মঠের ও বাগবাজারের খবর সব ভাল আছেন। আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা আপনারা জানিবেন। পণ্ডিত মহাশয় ও ভূপতিবাবুদের জানাইবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুবোধানন্দ

।।৪।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

The RamKrishna Mission Sebashram

NARAYANGANJ.

Dated.........৫. ২..........192৬

EASTERN BENGAL

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। আপনাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম—আমার শরীর অসুস্থ। এখানে ঢাকার ডাক্তার প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—প্রস্রাবে Sugar আছে। আহারাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ডাল, ভাত, তরকারী খাইবার আবশ্যক নাই। সকালে রুটী ও শাক সিদ্ধ, কফি সিদ্ধ, মটরশুটী এই সমস্ত। রাত্রিতে আধ সের তিন পোয়া দুধ—এই বন্দোবস্ত। মিষ্টি নিষেধ, চলাফেরাও নিষেধ। ৫।৭ দিন ডাক্তারের কথামত চলিতে হইবে। বলিয়াছেন, ইহাতেই ভাল হইবে। ঢাকার উৎসবের দিন আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। মনে করিয়াছি ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেলুড় মঠে চলিয়া যাইব। যদি শরীর ভাল থাকে। আপনারা আমার অসুখের জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত হইবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। বেলুড় মঠে যাইয়া আবার আপনাদের সকলকেই পত্র লিখিব। আমার অসুখ সম্বন্ধে ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন, ভূপতিবাবু ও পণ্ডিত মহাশয়কে জানাইবেন।

ঢাকার উৎসবে আপনারা কেহ আসিবেন না কি?

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা আপনারা জানিবেন এবং পণ্ডিত মহাশয় ও ভূপতিবাবুকে জানাইবেন ও সকল মেয়েদের জানাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজার দিন ঢাকাতে উৎসব।

শুভাকাঙ্ক্ষী

আপনাদের **শ্রীসুবোধানন্দ**

পুনশ্চ ঃ মেয়েদের কাছে আর লিখিলাম না, এই পত্রই সকলকে জানাইবেন।

---

* ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নিকটবর্তী কলমা-নিবাসী বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিণী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত—উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন। 'মহাযোগে রাজে যোগী' ইত্যাদি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করে বিনোদেশ্বরবাবু মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণকে শোনাতেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজীর সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।—সম্পাদক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সন্ন্যাসযোগ

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥৬॥

শ্লোকার্থঃ *হে মহাবাহু অর্জুন, সন্ন্যাস বা পরমার্থ সন্ন্যাস লাভ করা সুকঠিন। বস্তুত, নিষ্কাম কর্মযোগ বিনা এই সন্ন্যাস লাভ করা অসম্ভব। যাঁহারা নিষ্কাম কর্মযোগী সন্ন্যাসী [মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীধরস্বামী 'মুনি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সন্ন্যাসী], তাঁহারা অচিরেই ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দেহমন রজোগুণপ্রধান। তাই কর্মের দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। দেখা যায়, মানুষ কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। আবার সকলে নানাবিধ কর্ম করে বলিয়াই সমাজটা চলে। কিন্তু কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে বাহ্যদৃষ্টিতে সে-ব্যক্তি কর্ম তো করিতেছে না। জ্ঞানাধিকারী তো বস্তুবিচারে ব্যস্ত। তবু তাহার আহার যোগাইবার ব্যবস্থা সমাজ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজ সন্ন্যাসীকে পোষণ করে, যাহাতে তাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার গবেষণা করিতে অবসর পান। সুতরাং সেই মননশীল যোগী সমাজে সন্ন্যাসী-রূপে বিচরণ করিবেন। তাঁহাকেই বলা হইল 'মুনি'।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥৭॥

শ্লোকার্থঃ *যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং এইরূপে যিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের আত্মাকে নিজের আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি নিত্য-নৈমিত্তিকাদি স্বাভাবিক কর্ম বা লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম করিয়াও লিপ্ত বা বদ্ধ হন না।*

ব্যাখ্যাঃ যাহার মন যোগে যুক্ত অর্থাৎ যাহার মন ব্রহ্মের সহিত কোনপ্রকারে যুক্ত হইয়াছে, তাহার নিম্নতর সত্তা (lowerself) 'বুদ্ধি' স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব বাসনার মলিনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি বিশুদ্ধাত্মা। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে স্থূলদেহস্থিত ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সর্বতোভাবে বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে 'বিজিতাত্মা', 'জিতেন্দ্রিয়' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। যোগীর এই অবস্থা হইলে তিনি প্রথমে অনুভব করেন যে, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য চিন্মাত্র। তাহার পরে আর একটু উচ্চভূমিতে উঠিয়া দেখিতে পান—সর্বজীবের ভিতরেই একই আমি আত্মা বিরাজমান। এই অবস্থালাভ হইলে যদি দেহত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তিনি স্থূলদেহকৃত সকল কর্মের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কশূন্য বোধ করেন। তাঁহার দেহমনের দ্বারা কোন কর্ম সম্পাদিত হইলে লোকে দেখে তিনি অমুক অমুক কাজ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখেন, তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। ইহা এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। কখনো কখনো কাজকর্ম হইতে অবসর নেওয়া একান্ত আবশ্যক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিকটবর্তী হইলে অভিভাবকগণ ছাত্রগণকে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে প্ররোচিত করেন। ঠিক সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দীর্ঘকাল আত্মচিন্তা লইয়া মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্মের দিকে ঝোঁক থাকিলে সূক্ষ্মতম বস্তু সচ্চিদানন্দের চিন্তা করা তো একান্ত অসম্ভব। তাই কর্মের ঝোঁক নিঃশেষ না করিয়া বলপূর্বক কর্মত্যাগ করিলে দারুণ মানসিক কষ্ট হয়। সেইজন্যই দেখা যায় যে, যাহারা কর্মপ্রবণতা নষ্ট না করিয়া কর্মত্যাগ করে, পরে তাহারা কোন কর্মের সুযোগ পাইলে কর্ম লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে। এবং তাহার কর্ম সমাজের উপযোগী না অনুপযোগী তাহা বিচার না করিয়াই কাজ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করে। ইহাই সন্ন্যাসের কুরূপ।

অযোগতঃ = কর্মের গতিকে নিস্তব্ধ (অর্থাৎ momentum শেষ) না করিয়া সহসা কর্মত্যাগ করিয়া নিদিধ্যাসনে বসা অর্থাৎ যোগে আরূঢ় হওয়া যায় না। ধ্যানে মন বসে না। যোগযুক্তঃ = যিনি কর্মের গতি নিঃশেষে স্তব্ধ করিয়া যোগারূঢ় অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। মুনি = (মন্ + কি

মাতৃতীর্থপরিক্রমা

বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার বিংশ পর্যায়ে বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির।—সম্পাদক

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বিত্তশালী ভক্ত গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে নিত্যপূজিত মদনমোহন বিগ্রহ আসলে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কুলদেবতা, যাঁর অনেক মাহাত্ম্যের কাহিনী প্রচলিত আছে।



মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বার

আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

গোকুলচন্দ্র মিত্রও বাগবাজারের আদি বাসিন্দা ছিলেন না। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া জেলার বালিগ্রামে এক অতিশয় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশে তাঁর জন্ম। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে যখন বর্গিরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে, তখন গোকুলচন্দ্র মাত্র ১৮ বছর বয়সে পিতা সীতারাম মিত্রের সঙ্গে বালিগ্রাম ত্যাগ করে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে এসে বসবাস করতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে তিনি লবণের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের আহার্যবস্তু, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস সরবরাহের মাধ্যমেও আশাতীত অর্থ উপার্জন করে কলকাতা শহরে বিশিষ্ট ধনীব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। তাঁর দানও ছিল প্রচুর। ঘাটনির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ, জলাশয় খনন প্রভৃতি জনসেবামূলক ও ধর্মীয় কাজে তিনি বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ প্রত্যেকেই কৃতী সন্তান। বাগবাজারে মদনমোহন-প্রতিষ্ঠা তাঁর বিশেষ কীর্তি। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্বাধীন রাজবংশের প্রবল প্রতাপশালী রাজা বীর হাম্বির ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালেই বিষ্ণুপুর পরগনার অন্তর্গত বৃষভানুপুর গ্রামে শিকার করতে গিয়ে 'ধরণি' নামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁর গৃহদেবতারূপে পূজিত অপূর্ব মদনমোহন মূর্তি দর্শন করে তা অপহরণ করেন এবং নিজ গৃহে নিয়ে এসে সেই বিগ্রহকে কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের এই রাজবংশের মহারাজা গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকালে মারাঠা বর্গিদের অমানুষিক অত্যাচারে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রায় শ্মশানের রূপ ধারণ করে। মারাঠা দস্যুরা এক রাত্রে অতর্কিতে বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করলে শেষ-রাত্রের দিকে হঠাৎ মহারাজার অজ্ঞাতসারেই তাঁর কামান গর্জে ওঠে এবং বহু বর্গি সেই কামানের গোলায় হতাহত হয়ে পলায়ন করে। অতঃপর রাজা সন্ধান করে সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা জানতে পারেন, তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহনই সেই রাত্রে এক বালকের বেশে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কামান দেগে সব বর্গিদের হঠিয়ে দেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর থেকেই জাগ্রতদেবতা মদনমোহনের মহিমার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

মহারাজা গোপালসিংহদেবের পৌত্র মহারাজা চৈতন্যসিংহদেবের আমলে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের পর থেকে স্বাধীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের ওপর নানাদিক থেকে আঘাত আসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় বিষ্ণুপুর রাজ্য ইংরেজ সরকারের খাসদখলে আসে। এইসময় চৈতন্যসিংহদেবের জ্ঞাতিশত্রু দামোদরসিংহদেব সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন এবং নবাব মীরজাফরের সহায়তায় অবশেষে বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই গৃহবিবাদের ফলে চৈতন্যসিংহদেব তাঁর প্রাণের দেবতা মদনমোহনকে বিষ্ণুপুর থেকে সরিয়ে এনে কলকাতার বাগবাজারে ভক্ত ও বিত্তবান গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন এবং কলকাতার আদালতে দামোদরসিংহদেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করেন। মকদ্দমার ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় তিনি অজস্র অর্থব্যয়ের দরুন ঋণগ্রস্ত হয়ে অবশেষে তাঁর কুলদেবতা মদনমোহনকে গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে বন্ধক রেখে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্দিষ্ট দিনে ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারায় তিনি 'খোসকয়ালা'য় গোকুলচন্দ্রকে সাধের বিগ্রহটি বিক্রয়

করে লেখাপড়া করে দেন এবং চোখের জলে রিক্তহস্তে বিষ্ণুপুর ফিরে যান। প্রথমে মূর্তিটি গোকুলচন্দ্রের বসতবাটিতে ছিল, পরে তিনি তাঁর বাসভবনের কাছে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করে সেখানে মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীরাধিকার মূর্তি নির্মাণ করে মদনমোহনের বামে স্থাপন করেন।[২]



শ্রীরাধা ও সহচরীদের সঙ্গে মদনমোহন

আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

মদনমোহনের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ গোকুলচন্দ্রের জীবদ্দশায় বিষ্ণুপুরের ন্যায় বাগবাজারের বাড়িতেও নানা অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। মন্দির-সংলগ্ন গোকুলচন্দ্রের মূল বাড়িতে বর্তমানে কেউ বাস করেন না। দোতলা প্রাসাদের ওপর মদনমোহনের মূল মন্দির। একতলার পশ্চিমদিকের মার্বেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডানদিকে প্রকাণ্ড হলঘরটি ভক্তদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই হলঘরের উত্তরদিকে একটু উঁচুস্থানে পাথরের বেদির ওপর রৌপ্য সিংহাসনে স্বর্ণপ্রধান অষ্টধাতুর উজ্জ্বল মনোহর মদনমোহন বিগ্রহ বিরাজিত। বামে অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকা, সামনের দুদিকে পিতল-নির্মিত ললিতা ও বিশাখা দুই সখি। একতলায় বিশাল অঙ্গনের মধ্যে বড় বড় থামওয়ালা বিরাট চাঁদনি। চাঁদনির ডানদিকের পূজামণ্ডপটি ঝুলনের দালানরূপে পরিচিত। মূল মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে গোকুলচন্দ্রের পুরনো বসতবাড়ির পাশেই রাসমঞ্চ।

কালীপূজার পরে প্রতিপদ তিথিতে 'অন্নকূট' এখানকার প্রধান উৎসব। এছাড়াও ঝুলন, দোল, গোষ্ঠ ও রাধাষ্টমীর দিন মদনমোহন একতলার পূজামণ্ডপে আসেন এবং রাসের দিন রাসমঞ্চে বসেন। জন্মাষ্টমীতেও বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে গোকুলচন্দ্রের এই প্রখ্যাত মন্দিরটি একটি ট্রাস্টিবোর্ডের অধীনে আছে এবং বর্তমানে ৬০ জন সেবায়েত উত্তরাধিকার-সূত্রে পালাক্রমে এখানকার পূজার ভার পান।

মাহাত্ম্যসমৃদ্ধ এই মদনমোহনকে দর্শন করতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এই মন্দিরে শুভাগমন করেছিলেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও এখানে এসেছিলেন। আবার জগন্মাতা শ্রীমা সারদাদেবীও তাঁর লীলাবিলাসের আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যের আনন্দঘন উচ্ছলতায় এখানে শুভাগমন করায় মন্দিরটির তীর্থমাহাত্ম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "এই মদনমোহন মন্দির এবং তার দক্ষিণে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে (৫১২ রবীন্দ্র সরণি) শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। কুমারটুলির কাছাকাছি রবীন্দ্র সরণির ওপর এদুটির অবস্থান। এদুটি স্থানে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণও এসেছেন।"[৩] ❑

পথনির্দেশঃ মদনমোহন মন্দিরের ঠিকানাঃ ৫২০, রবীন্দ্র সরণি (পূর্বতন চিৎপুর রোড), কলকাতা-৭০০ ০০৫। উত্তর কলকাতার কুমারটুলির কাছে রবীন্দ্র সরণির ওপর ধনুকের ন্যায় খিলানযুক্ত বাড়ি। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের উত্তর-পশ্চিমে মদনমোহনতলা স্ট্রিট ধরে আরো পশ্চিমদিকে এগোলে রবীন্দ্র সরণি পড়বে। এখান থেকে ডানদিকে কিছুটা গেলে এই বিশাল মন্দিরে আসা যাবে।

১ কীর্তিভূমি বিষ্ণুপুর—ফকিরনারায়ণ কর্মকার
২ মদনমোহন ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
৩ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর বাগবাজার—ব্রহ্মগোপাল দত্ত, 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৫

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

'মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানী'

সুজিতকুমার রায়



"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানী॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গোস্বামীশাস্ত্র বলেন, 'মধুরারতি' যখন 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে 'কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী', তখন তাকে 'সমর্থারতি' বলে। এতে স্বসুখবাসনার লেশমাত্র নেই। এই রতি উত্তরোত্তর ঘনীভূত হয়ে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ-অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব আবার রূঢ়, অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাবের চরম অবস্থাই 'মাদন'। শ্রীরাধা এই মাদনাখ্য 'মহাভাবস্বরূপিণী'। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শক্তি, হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধা। "মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী/ সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি।" শ্রীরাধা না হলে শ্রীকৃষ্ণ অসম্পূর্ণ। রাধিকা তো রাধিকারমণেই নিবেদিতপ্রাণ।

বৈষ্ণবতত্ত্বের এই প্রাণপ্রতিমাই রাধারানী। 'গাথা সপ্তসতী', 'ধ্বন্যালোক', 'বেণীসংহার', 'পদ্মাদিপুরাণ', 'পঞ্চতন্ত্র'—সব শাস্ত্রেই রাধার কথা আছে। আশ্চর্যের বিষয়, খোদ বৈষ্ণব আকরগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ কিন্তু রাধা নামের উল্লেখ নেই। গীতা, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ—কোথাও রাধার কথা নেই।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ কবিরাজ কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ "মহাভাব চিন্তামণি শ্রীরাধাস্বরূপ/ ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ।" (কোন কোন গ্রন্থে 'মহাভাবস্বরূপিণী'ও লেখা আছে।) 'চিন্তামণি' এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নদীয়ার প্রাণেশ্বর। তিনি মহাভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। 'মহাভাব' কি? না, জাগতিক সমস্ত পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে যিনি স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবানকে নিয়েই সর্বদা মেতে আছেন, তারই মহাভাব প্রাপ্তির অবস্থা হয়। এক্ষেত্রে শ্রীরাধা যেমন মহাভাবের ভাবরসে বিগলিত করুণা, মহাপ্রভুও তদ্রূপ। ললিতাদি সখী শ্রীরাধারই আপন অঙ্গ যেন। রসেশ্বর তো এঁদের নিয়েই জলকেলি, রাসলীলা ইত্যাদি করেছেন। এখানে উল্লিখিত চরণে অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, নিতাই প্রমুখ পরিকর নিয়ে নরদেহেই নারায়ণের লীলা করেছেন মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গদেবের লীলাখেলাও রাধারানীর সদৃশ। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণকেও আমরা অনুরূপ সাধিকার ভাবে সাধন করতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এসেছিলেন বলেই কিন্তু রাধার মহিমা এতটা প্রচার পেল। তাই পদকর্তা গাইলেন ঃ "রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাতো কে? যদি গৌর না হতো?"

বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারানীর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত প্রতীক এই রাধারানীই পরমভাবস্বরূপা শ্রীমতী। তাঁর মতো সাধিকা তো জগতে দুর্লভ। লোকগল্পে শুনি ঃ প্রতিদিন তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে বাহ্যক্রিয়াসমাপনান্তে নামজপে বসতেন। প্রতি ১০৮ সংখ্যক জপ সম্পূর্ণ হলে একটি করে আতপচাল সাক্ষী মানতেন। এইভাবে সেগুলির পরিমাণ রন্ধনযোগ্য হলে দ্বিপ্রহরে তা ফুটিয়ে প্রাণপ্রভুকে নিবেদন করে তবে তিনি প্রসাদ পেতেন। তারপর পুনরায় জপে বসে তিনি গভীর রাত অবধি এই অনির্বচনীয় সাগরে ডুবে থাকতেন। কী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন! ভবের ভাবে নয়, সর্বদা ভাবের ভাবে ডুবে থাকা!

রাজাধিরাজ গোবিন্দদাসের 'অভিসার'-এর একটি অনুপম পদ আলোচনা করলেই তাঁর জপ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় পাই—"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহী ঝাঁপি/ গাগরি বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।" একেই বলে কৃচ্ছ্রসাধন, ভগবৎ সাধন। ভাবগ্রাহী জনার্দনের ভাবে রাধা সর্বদা আবিষ্টা। 'নাম পরতাপেই' সাধিকা 'কাঁলিয়া বঁধুকে' খুঁজে পান।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বোঝা যতটা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন রাধাতত্ত্ব বোঝা। দেহবুদ্ধিতে এতটুকু কামের আঁশগন্ধ থাকলে এই দুরূহ তত্ত্ব বোঝা যাবে না। সে-প্রেম তো কামজ প্রেম নয়, সে-প্রেম স্বর্গীয় সুধাসঞ্জীবিত প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"—কবিরাজের উক্তিতে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। মামুলি কাব্যগ্রন্থের রসাস্বাদন দিয়ে রাধাতত্ত্ব বোঝা যায় না। সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র হয়ে স্বয়ং আস্বাদন করতে হয়। যা

অনুভূতির বিষয় তা টীকাকারের ব্যাখ্যায় প্রকট হয় না! সেরকম সাধারণ মানুষের পক্ষে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বোঝা বড় কঠিন।

রাধারানীর সঠিক জন্মতারিখ জানা দুষ্কর। লোকশ্রুতি ঃ ভাদ্রমাসের (দ্বাপর যুগে) শুক্লা অষ্টমী তিথিতে রাধার জন্ম। বর্তমানে পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী যদিও 'জন্মাষ্টমী'র পনেরো দিন পর এই তিথি আসে, তবু কৃষ্ণ না রাধা—কে বয়সে বড় সে বিতর্কের বস্তু।

লোকপ্রচলিত পুরাণগাথায় দেখা যায়ঃ ভগবানের জন্মগ্রহণের পর সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে যখন বসুদেব তাঁকে গোকুলে নন্দরাজের ঘরে রেখে এলেন, তখন পুরনারীদের সঙ্গে রাধাও সেই শিশু কানাইয়াকে আদর করেছিলেন, দোলনায় শায়িত কৃষ্ণকে দোলনও দিয়েছিলেন রাধারানী। যদিও এই ঘটনার তেমন একটা সাযুজ্য দেখা যায় না, তবু যদি এই ঘটনা মানতে হয়, তাহলে রাধার জন্ম কিন্তু অনেক আগে।

'ভাগবত'-এ (১০।৩০।২৮) কবি গাইলেনঃ ''অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।/ যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥''—গোপীগণ বনপথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে কোন রমণীর পদচিহ্ন দেখে বলেছিলেন, এঁর দ্বারা ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছেন, যেহেতু গোবিন্দ এঁর প্রতি প্রীত হয়ে আমাদের ত্যাগ করে তাঁকে নিয়ে এই নিভৃত স্থানে এসেছেন। 'গোস্বামীশাস্ত্র'-এর ব্যাখ্যায় 'আরাধিত' শব্দ থেকেই 'রাধা' শব্দের নিষ্পত্তি।

ছোট থেকেই 'নবীনাং হেমগৌরাঙ্গিং' রাধা দেখতে পরমাসুন্দরী। রাধা উদ্ভিন্নযৌবনা, তাঁর সমুন্নত কুচযুগ। চণ্ডীদাসের 'যোগিনী' আজন্মসাধিকা মনোহারিণী রাধার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপাল অলকাতিলকায় সুশোভিত। শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় তাঁর দৈহিক লাবণ্য পরিবর্ধমান।

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের গান 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামেই সমধিক প্রচলিত। এই পর্যায়ে তাঁর গানের সংখ্যা কুড়ি। কবিচেতনার প্রথম উন্মেষলগ্নে রচিত বলে এর কাব্যমূল্য অপরিসীম। এই পর্বের গানে শ্রীরাধিকার কথা বারবার এসেছে। কবি 'বৃক্‌ভানুনন্দিনী' রাধা, 'শ্যামপ্রেয়সী' রাধার কথা আঠারোবার এবং 'রাধিকা' শব্দটি একবার মাত্র প্রয়োগ করেছেন। এ-পর্বের গানগুলির সবই প্রায় 'মাথুর' শ্রেণির, নায়কের জন্য উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ব্যাকুল আর্তি ঐ সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাধাও তদনুরূপা। কিন্তু রাধা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' মতে, রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না। 'পদ্মপুরাণ'-এ অবশ্য রাধার জননী কীর্তিদা। মতান্তরে, বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করে যমুনাস্থ কমলবনে একটি মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন, ঐ ডিম্বেই রাধার উদ্ভব। অন্যত্র পাই—পর্বতরাজ বিন্ধ্য ব্রহ্মার বরে রাধাকে কন্যারূপে লাভ করেন এবং দ্বারকা-লীলায় ইনিই সত্রাজিৎ কুমারী সত্যভামা। পদ্মাবতী রাধার পিতামহী। এই 'পদুমা উদরে' 'সাগরের ঘরে'র বংশেই রাধার জন্ম। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ এই তথ্য পাওয়া যায়।

অভিমন্যু > অহিমন্নু > অহিবন্নু > আইহন > আয়ান হলো রাধার স্বামী। জটিলা রাধার শাশুড়ি ও কুটিলা তাঁর ননদ। রাধার লৌকিক জীবনে শ্বশুরঘরের অবস্থা কৃষ্ণপ্রেমের অন্তরায়। শাশুড়ি, ননদ-বেষ্টিতা রাধার প্রেমের সঙ্কট, সমাজ ও নীতির রক্তচক্ষু, অনুশাসন, অপবাদ, কলঙ্ক—সবকিছুই তাঁর জীবনে ঘটেছে। তবু 'প্রিয়েরে দেবতা' মেনে তিনি কৃষ্ণ-অনুধ্যানে সদা সচেষ্ট। আয়ান একদিন আড়াল থেকে দেখলেন, তাঁদের পারিবারিক ইষ্ট কালী ও রাধার ইষ্ট কৃষ্ণ একই, অভিন্ন মূর্তি। 'কৃষ্ণকালী' মূর্তির বোধহয় সেখান থেকেই উদ্ভব। অর্ধ অঙ্গ কৃষ্ণ আর অর্ধ অঙ্গ কালী।

তুলনামূলকভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ ব্রজাঙ্গনা রাধা একটু বেশিই আলোচিত। রাধা আবার সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী। ঐ গ্রন্থের 'দানখণ্ড'-এ পাওয়া যায়—''তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ'', অন্যত্র—''তোহ্মে তো ভগিনা কাহ্ন আহ্মে তো মাউলানী।''

''রাধা বৃষভানুরাজ সাগরের দুহিতা। 'বৃষভানু' বা 'বৃষভানুকর' উপাধি বিশেষ। উত্তর মথুরার রাজা সাগর আবার শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য। বৃষভানুশ্রেষ্ঠ রাধাকে উদ্ভিন্নযৌবনা দেখে রায়ান করে সমর্পণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৯তম অধ্যায়) মহাভাগবত পুরাণে আয়ান (অভিমন্যু) রাধিকাকে বিধিপূর্বক বিবাহ করেন। 'গর্গসংহিতা' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত'-এর মতে, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সহ শ্রীরাধার যথাশাস্ত্র উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন হয়। প্রথমত, আয়ান ছিলেন নপুংসক। সে-কালটা ছিল দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণ। সুতরাং অন্যপূর্বা হলেও বিবাহের কাজে বাধা হয়নি। দ্বিতীয়ত, বরবধূর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাছাড়াও সেই সুদূর অতীতে পাণিগ্রহণের বিষয়ের এটা প্রতিবন্ধক হয়নি। আর মাতুলী-ভাগিনেয় সম্বন্ধ তো যশোদার সুবাদে। সুভদ্রা অর্জুনের মাতুল কন্যা, পিতৃষ্বসা পুত্রী মিত্রবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। বিদেহরাজ নন্দিনী সীবলী জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য-পুত্র মহাজনক কুমারকে পতিত্বে বরণ করেন।'' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই গবেষণালব্ধ ধারণাকে আজও কোন পণ্ডিতের খণ্ডাবার মতো ধৃষ্টতা হয়নি।

আয়ান ছিলেন যশোদার এক দূর-সম্পর্কিত ভাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পাইঃ ''আল বড়ায়ি/ এগার বৎসরের বালী.../ আল বড়ায়ি/ কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে/...

নিপাতনে) যোগারূঢ় ব্যক্তির মন ধ্যানেই প্রবণতা অনুভব করে। সেই ব্যক্তি ধ্যান-নিদিধ্যাসন করিতে করিতে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেই ব্যক্তির আহার-বাসস্থান জুটিবে কোথা হইতে তিনি যদি কেবল বসিয়া বসিয়া পরমার্থ চিন্তা করেন?

[মন্তব্য ঃ এই প্রশ্নের উত্তর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে আছে—"শাশুড়ি-বৌমার কর্ম কমাইয়া দেয়..." ইত্যাদি। অবশ্য গীতায় এই অধ্যায়ের শেষেও এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান দিবেন।—**সম্পাদক**]

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *তত্ত্বদর্শী নিষ্কাম কর্মযোগী কি দেখেন? তিনি দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, প্রশ্বাস-গ্রহণে, কথনে, মলমূত্রপরিত্যাগে, বস্তুগ্রহণে, চক্ষুর উন্মীলন-নিমীলনে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত, বস্তুত স্বয়ং অকর্তা—ইহাই দেখেন বা ইহাই অনুভব করেন। অর্থাৎ শরীর-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মে তাঁহার কোন কর্তৃত্ববোধ থাকে না। এই 'অহং কর্তা'-বোধহীনতাই তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ।*

[মন্তব্য ঃ এই দুই শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট বলিয়া পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দজী ব্যাখ্যা করেন নাই।—**সম্পাদক**]

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥১০॥

শ্লোকার্থ ঃ *যখন মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের উদ্দেশেই সকল কর্ম করিয়া থাকেন, তখন কর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেমন করিয়া? যেমন জল পদ্মপত্রের উপর অবস্থান করিলেও পদ্মপত্রকে স্পর্শ করিতে পারে না।*

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম করিলেই তাহার প্রেরণায় আবার কর্ম করিতে বাধ্য হয়। এবং কর্ম কিছু করিলেই ভাল বা মন্দ একটা ফল হইয়াই থাকে। এই দারুণ সঙ্কট হইতে অব্যাহতিলাভের 'ইহা' (ভগবানের প্রদর্শিত পথ) একটা কৌশল 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। কাজ করিয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করা। তবে একটি কথা আছে। ঈশ্বর কী, আমি কী এবং কর্ম কী—এই তিনটি বিষয় না জানিলে এই কৌশল অবলম্বন করা যায় না। ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার একটি অংশ; যেমন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর আমরা যে কাজ করি, তাহা স্বাধীনভাবে নহে। আমাদের পূর্বকর্মকৃত সংস্কার এখনকার কাজ করাইতেছে। এই কথাকয়টি বুঝিতে পারিলে 'আমি ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্রমাত্র'—ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই শ্লোকে পাপ বলিতে পাপ-পুণ্য উভয়কেই বুঝাইতেছে। কারণ, পাপ ও পুণ্য কখনো বিচ্ছিন্ন নহে।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

শ্লোকার্থ ঃ *ফলাসক্তি বর্জন করিয়া নিষ্কাম কর্মযোগিগণ 'মমত্ব-ভাব'-শূন্য হইয়া (মমত্ব = 'ইহা আমার'—এই ভাব) কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম করিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আরেকটি কৌশল বলা হইতেছে। কায়—স্থূলশরীর, মনবুদ্ধি—সূক্ষ্মশরীর। আনন্দময় কোশাবৃত পাকা আমি। এই পাকা আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কর্মের দ্রষ্টামাত্র—এই বিচার করিতে করিতে যোগী অনুভব করেন যে, তিনি সর্বপ্রকার কর্ম হইতে মুক্ত। যোগী দেখিবেন যে, দেহমন যে-কাজ করে, তাহা পূর্ব সংস্কারবশেই করিয়া থাকে। আমি কেবল দ্রষ্টামাত্র। আমরা যেমন কেহ ভাল কাজ করিতেছে দেখিলে সুখী হই, মন্দ কাজ করিতেছে দেখিলে দুঃখী হই—তিনিও প্রথমে এইপ্রকারে নিজেকে সুখী দুঃখী দেখিবেন। তখন তত্ত্বরূপে তিনি বুঝিতেছেন। নিজে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এই বুদ্ধি পাকা হইয়া গেলে (অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হইলে) তিনি অনুভব করিবেন, সর্বপ্রকার অজ্ঞান ও অপবিত্রতা দূর হইয়াছে। [ক্রমশ]।।বাইশ।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩৬

পাশাপাশি ঃ (১) নাগ মহাশয়, (৫) তাজপুর, (৬) চণ্ডাল, (৭) রামকুমার, (৯) সুশীলা, (১০) তেলো, (১১) বশ, (১৪) গগন, (১৫) মসিনাপুর, (১৭) কাতর, (১৮) বাবুরাম, (১৯) নিরঞ্জনানন্দ।

ওপর-নিচ ঃ (২) গঙ্গারাম, (৩) শম্ভুচরণ, (৪) সুরবালা, (৫) তাল, (৭) রাজু, (৮) কুঞ্জবন, (৯) সুলোচনা, (১২) অমরপুর, (১৩) বীর, (১৪) গঙ্গাবারি, (১৬) পুরাতন, (১৭) কাম।

সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক অধিকারী, রমা রায়চৌধুরী, আশিসকুমার ঘোষ, রুণা রায়চৌধুরী, সরোজকুমার দাস, পার্বতী দাস, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, শঙ্করচন্দ্র মাইতি, নিখিলেশ পাল



ভাদ্র ১৩১১
আগস্ট ১৯০৪

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্প্রতি শোলাপুরে ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২১শে জুলাই সঙ্গীত রঙ্গালয়ে 'সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি ঈশা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের জীবনী বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেন, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক, সকলেই আত্মাকে নানা উপায়ে উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই কারণে অপর ধর্ম্মের দোষ দর্শন বা নিন্দা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, তবে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান। ২৮শে জুলাই রিপন হলে 'সুখ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন যে, পরিবর্ত্তনশীল বা অসৎ পদার্থ হইতে কখন প্রকৃত সুখলাভ হইতে পারে না, আত্মজ্ঞানেই প্রকৃত সুখ। ৩১শে জুলাই 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে উক্ত স্থানেই আর এক বক্তৃতা দেন। তিনি যে কয়দিন শোলাপুরে ছিলেন, প্রতিদিনই প্রাতে ও অপরাহ্নে অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। তিনিও অতি সরলভাবে সকলের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন।

*

হিমালয় প্রদেশের কুমাউন জেলায় মায়াবতী নামক পাহাড়ে বেলুড় মঠের শাখাস্বরূপ অদ্বৈত আশ্রম প্রায় পাঁচ বৎসরের অধিক হইল, স্থাপিত হইয়াছে। এই মায়াবতী পাহাড় সমুদ্রসমতল হইতে ৬৮০০ ফিট উচ্চ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় এবং ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে যাইতে হইলে কলিকাতা, হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে মোগলসরাই যাইতে হয়। তথা হইতে আউধ রোহিলখণ্ড রেলযোগে বেরিলি ষ্টেশনে পঁহুছিয়া তথা হইতে রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলযোগে কাটগুদাম ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই শেষ রেলওয়ে ষ্টেশন। কাটগুদাম ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য যাত্রীর নয়নপথে পতিত হয়। এখান হইতে মায়াবতী ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য পথটুকু ঘোড়ায় চড়িয়া, ডাণ্ডি নামক কুলিবাহিত যানযোগে অথবা পদব্রজে যাইতে হয়। এই স্থান ভারতীয় যুক্ত প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের শীতাবাস নাইনিতাল হইতে প্রায় ৭০ মাইল এবং এই জেলার রাজধানী আলমোড়া হইতে ৪৭ মাইল দূরবর্ত্তী। এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য এবং আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সেভিয়ার বাস করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য—অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষা ও তদুপযোগী সাধনা। এই আশ্রমে শিক্ষিত হইবার জন্য ব্রহ্মচারী গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি দুইজন ব্রহ্মচারী শিক্ষালাভ করিতেছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ [বানপ্রস্থী] এই আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বা চিরকালের জন্য বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে। আশ্রমের নিয়মাবলী জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়। অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট, পোঃ (আলমোড়া)।

উক্ত আশ্রম হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রবুদ্ধ ভারত নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্র প্রচারিত হয়। বিগত জুলাই মাস হইতে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সাধারণের অধিকতর উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পত্রগুলির মূল ইহাতে ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইতেছে। সন্ন্যাসিগণ লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির ইংরাজী অনুবাদ, শাস্ত্রোক্ত বা মহাপুরুষরচিত সংস্কৃত স্তোত্রের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাল ভাল ইংরাজী গ্রন্থকারের মূল্যবান উক্তিসমূহ ইহাতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যতীত পাঠকগণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর দ্বারা ভাব আদানপ্রদানের জন্য এক পৃষ্ঠা রাখা হইয়াছে। ভাল গ্রন্থের চিন্তাশীল বিস্তৃত সমালোচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে Hindu Social Progress ও আগষ্ট মাসের পত্রে সিষ্টার নিবেদিতার The Web of Indian Life-এর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য ১৷৹। কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবুদ্ধ ভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট, পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমুদয় বিবরণ জানা যায়।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ চাহে বলে/ সব গোপী ছাড়ি বনমালী/ মোরে কেহে বোল এ ধামালী।''—ওগো বড়াই, আমি যে তোমাদের কানুর চেয়ে এগারো বছরের বড়, তবে আমাকে কেন কানু ঐরকম বিশ্রীরকম প্রেমালিঙ্গন করে?... আমি তো তার মামি। অন্য গোপিনীদের ছেড়ে কেন কানু আমাকে...। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বড়ই আদিরসের কাব্য। তাই গোঁড়া বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের তথ্যকে বিশেষ মানতে চান না।

ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণের আয়ানই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রায়ান। ইনি বৃন্দাবনবাসী জনৈক গোপ, যশোদার ভাই। লৌকিকভাবে আয়ানের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই দ্বাপরের রাধা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-পড়া গোঁসাই (গু আর ছাই মাখা তথাকথিত ভেকধারী)-রা কিন্তু রাধার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। রাধার মতো সতী কুললক্ষ্মী জগতে আর কি দুটো ছিল? সব গোপিনীই একই কালে দেখেছেন কৃষ্ণ আমার ঘরে, আমার সঙ্গে শৃঙ্গাররত, কিন্তু আদপে তিনি প্রিয় প্রাণেশ্বরী রাধার অন্তরের অন্তঃপুরেই। বৈষ্ণবশাস্ত্রমথিত 'মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরানী' ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা। তাঁকে 'শ্রীরাধা' বলা হয় কেন? তিনি কি পুরুষ? হ্যাঁ, কৃষ্ণই তিনি। বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে, একমাত্র জনার্দন গোবিন্দই স্বয়ং পুরুষ আর সবই যে প্রকৃতি। বিপরীত লিঙ্গ না হলে তো আকর্ষণ আনন্দঘন হয় না। অতএব, ভগবান নিশ্চয়ই পুরুষ, আর বাকি সব প্রকৃতি। নাহলে তাঁর প্রতি আমরা ঝুঁকি কেন? তিনি পরমপুরুষ, আত্মারাম, আনন্দময়, রসময়—রসেশ্বর। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ্' (২।৭) বলেছেন ঃ ''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'' যিনি স্বয়ং কর্তা, তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করেই তো আনন্দিত। বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলকথাই হলো—জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। তিনিই সেই পরমাত্মা।

রাধারানীর মধ্যেই শাস্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ রসের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রাণপতিকে একান্ত প্রিয়রূপে, সখারূপে পাওয়ার সাধনা করেছেন। প্রিয়তমকে পেতে প্রাণেশ্বরী প্রিয়ার কী সযত্ন প্রয়াস! অভিসার, কলহান্তরিতা, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মাথুর—সর্বত্র রাধাই উপজীব্য। মালবশ্রী রাগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ গাওয়া যায় রাধাবিরহ। এখানে তো কৃষ্ণের জন্য রাধার উৎকণ্ঠা, হাহাকার। শ্রীকৃষ্ণ ঘুমন্ত রাধার বুকের ওপর মুরলীখানা নিঃশব্দে রেখে দিয়ে কংসধ্বংসের কর্মে চলে যান চিরতরের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন ঃ ''রাধে, আবার কাল আসব, দুঃখ করো না।'' কিন্তু কাল আসতে গেলে তো রাত্রি প্রভাত হওয়া চাই। ঐ ঘটনার পর তো বৃন্দাবনে কৃষ্ণবিহনের শোকরাত্রি শেষ হয়নি! অতএব, 'কাল' তো আসেনি। কী দারুণ রূপকাশ্রয়! আসলে অক্রূর মারফত রাধা সংবাদ পান, আগামী কাল প্রভাত হওয়ার আগেই খুব ভোরে কংসধ্বংসের জন্য কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবেন। সুতরাং তিনি ভাবলেন, যেভাবেই হোক এ-যাত্রা রোধ করতেই হবে। তিনি সখীদের বললেন ঃ ''নামহি অক্রূর নাহি যা সম...।'' (গোবিন্দদাসের পদ)

রাত্রি যাতে প্রভাত না হতে পারে, সেব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর চরণে স্মরণ নিয়ে সাধ্যসাধনা করে তাঁকে দিয়ে চন্দ্রকে আটকে রাখতে হবে, যাতে নক্ষত্র, চন্দ্র গগনে প্রকাশিতই থাকেন। পদটিতে রাধার কী আকুলতা! সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ অন্য একটি পদে পাই, রাধাকে সখীদের প্রবোধ ঃ ''রাই, ধৈর্য্য ধর। আমি ওঁকে ফিরিয়ে আনতে মথুরায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে গৃহে গৃহে তাঁকে খুঁজব।'' রাধা বললেন ঃ ''ধৈর্যং রহু রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে ঢুঁড়ব পুরী/ প্রতি প্রতক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে/ ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।'' এখানে 'ঢুঁড়ব' অর্থে 'তন্নতন্ন করে খুঁজব', 'ভদ্রং অতি ভদ্রং' অর্থে 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।' 'মাথুর' পর্বের (গোবিন্দদাসের) পদটি ভারি সুন্দর। পাশ থেকে বিদ্যাপতিও সান্ত্বনা দিলেন ('অব মথুরাপুর মাধব গেল' পদ) ঃ রাই, তুমি দুঃখ করো না। তিনি চিরতরে চলে যাননি, কৌতুক দেখার জন্য তিনি সেখানে লুকিয়ে আছেন। রাধার কাছে কৃষ্ণ আর ফিরে আসেননি। বৃন্দাবন-মথুরা ত্যাগ করে প্রেমঘন কর্তব্যপরায়ণ ভগবান যে তখন কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে বীর্যঘন ক্ষাত্রমূর্তিতে। তাঁর হাতে তো তখন বংশী নেই, তাঁর হাতে তখন সুদর্শন চক্র এবং কর্তব্যের চেতনাসখা পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

কথিত আছে ঃ ''শত বৎসরান্তে কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ (রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সত্যা, মাদ্রী, মিত্রবৃন্দা, মদ্রা, কালিন্দী, রোহিণী, রুক্মবতী প্রমুখ)-সহ তথায় আগমন করেন। নন্দ ও যশোদাও গোপ-গোপিনীদের সঙ্গে রাধাকে সেখানে নিয়ে আসেন। রাধা প্রাণারামকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্, শ্রদ্ধায় অবনত, নয়নে অবিরাম ধারা। পাগলপারা যোগিনী মুক্তকেশী, বস্ত্রাভরণ উদ্ভিন্ন। বিরহানলে দগ্ধ রাধা 'স্বামী' সম্ভাষণে অগ্রসর হয়ে ছিন্নমূল ব্রততীর মতো শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর সংজ্ঞা চিরতরে লুপ্ত হয়।'' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ভূমিকায় যা লেখা হয়েছে, হয়তো সেখানেই শ্রীরাধার পার্থিব জীবনের উপসংহার ও প্রাণপ্রিয় প্রাণেশ্বরের শ্রীচরণে বিলয়, পূর্ণাহুতি তথা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

- শ্রীশ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস, সাহিত্য পরিষদ্
- শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম—জগদীশ ঘোষ

ব্য | ক্তি | ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন

মণ্টু দাস

শ[illegible]-অনুগতপ্রাণ ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের বাসনা ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনলীলা সত্যপীরের পাঁচালির মতো সহজ সরল করে কাব্যভাষায় বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন এবং আপামর ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ত্যলীলামৃত পান করে তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। তিনি যেমনটি ভাবলেন, ঠিক তেমনটিই করলেন। স্বল্প-শিক্ষিত অক্ষয়কুমার সেন 'পয়ার' কাব্যছন্দে রচনা করলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। এ এক বিস্ময়! এত স্বল্প-শিক্ষিত, অতি সাধারণ ভক্তের পক্ষে 'পুঁথি' রচনা এক বিরল দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মতে, স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর অক্ষয়ের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে এই মহান কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন। এই কাজটি করেই অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে, তাঁকে কাছ থেকে দেখে ও সেবা করে উপলব্ধি দ্বারা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' রচনা করেন। এমনকি যেকয়জন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্ম স্পর্শ করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম।



'পুঁথি'র প্রথম খণ্ড পাঠ করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ "শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দিবে। তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী। শাঁকচুন্নীর ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোলতাবোল লিখে নাই। শাঁকচুন্নীর পুঁথি যাতে খুব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে তার চেষ্টা করবে।... আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব।... আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোরে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন, দ্বারে দ্বারে তার নাম শোনাও, সন্ন্যাসী হবার আবশ্যক নাই।... কুছ পরোয়া নাই। প্রভু তোর সহায় হবেন।" জানা যায়, স্বামীজীর নির্দেশে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত ঠাকুরের জন্মোৎসবে ভক্তগণের সমাবেশে অক্ষয়কুমার 'পুঁথি' পাঠ করেছিলেন। লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) এই পুঁথি শুনে অভিভূত হয়ে অক্ষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 'পুঁথি'টি ১৮৯৪ থেকে চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে চারটি খণ্ড একত্রিতভাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' নামে প্রকাশিত হয়। এই পুঁথি সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের উক্তি ঃ "Shri Akshay Kumar Sen first wrote the sacred looks 'Sri Ramkrishna Punthi' a few chapters of which were already written during the life time of Sri Ramkrishna."

স্বামী শিবানন্দ বলেছেন ঃ "অক্ষয় সেন—যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' লিখেছেন—জগতের অনেক মঙ্গল করলেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, ভক্তিমান, বড় গরিব ছিলেন। অক্ষয় সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার বহুলোকের থেকে এবং শিহড়, কামারপুকুর প্রভৃতি জায়গায় নিজে গিয়ে সব fact (ঘটনা) জোগাড় করেছেন এবং অতি সরল ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের মতো পদ্যে লিখেছেন। বিদ্বান লোক এখন এই পুঁথির আদর করছেন। তিনি তো বিদ্বান লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মনের আগ্রহ ছিল খুব।"

এই 'পুঁথি' রচনা কিভাবে শুরু হয়েছিল, সেসম্বন্ধে অক্ষয়কুমার লিখেছেন ঃ

"দেবেন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে গ্রন্থারম্ভ হয়।
যেসময়ে লিখি বাল্যলীলা পরিচয়॥
স্বামীজী শুনিয়া কথা লোকপরম্পরে।
ডাকাইয়া লইলেন মঠের ভিতরে॥"

স্বামীজী তাঁকে প্রেরণা জুগিয়ে আশীর্বাদ

"লীলাংশ করিয়া পাঠ বিনা প্রতিবাদ।
বৃহৎ হইবে পুঁথি কৈলা আশীর্বাদ॥"

এমনকি 'পুঁথি' শোনাবার জন্য স্বামীজী বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের সন্নিকটে অক্ষয়কে নিয়ে যান। শ্রীমা সারদাদেবী 'পুঁথি' শুনে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেকথা অক্ষয় সেন তাঁর 'পুঁথি'তে লিখেছেন ঃ

"শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ।
নির্বিঘ্নে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ॥"

স্বামীজী স্নেহভরে অক্ষয় সেনকে 'শাঁকচুন্নী' বলতেন, এমনকি শাঁকচুন্নীকে তিনি 'ভাই' বলেও সম্বোধন করতেন। অপরদিকে অক্ষয়কুমার স্বামীজীর 'শাঁকচুন্নী' ডাকে বড়ই প্রীত হতেন। বাস্তবক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার ছিলেন বেঁটেখাট আকৃতির, কদাকার, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গ্রামীণ সারল্যে ভরা 'বড় ভালমানুষ' ছিলেন তিনি। তিনি অতীব নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন।

তিনি এই 'পুঁথি'র কাজটি করার জন্য ঠাকুরকে আকুল হয়ে ডাকতেন : "ঠাকুর! তুমি আমায় শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার অমূল্য জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখে যেতে পারি।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ছাড়াও অক্ষয় সেন পদ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা ও উপদেশাবলী' প্রণয়ন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় স্নাত মহাপ্রাণ অক্ষয়কুমার সেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত জয়পুর থানার ময়নাপুর (বাজে ময়নাপুর) গ্রামের সেনপাড়ায় এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলধর সেন, মাতা বিধুমুখী। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মাত্র বিঘে কয়েক এক-ফসলি জমির ওপর নির্ভর করেই পরিবারটি দিনাতিপাত করত। অক্ষয়কুমারের আরো দুটি ভাই প্রসন্ন ও নগেন্দ্রের মধ্যে প্রথমজন অকালেই মারা যান এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন নিঃসন্তান। অক্ষয় সেনের সহধর্মিণী কুমুদিনী। তাঁদের দুই সন্তান—গোপালকিঙ্কর ও গৌরীকিঙ্কর। গোপালের স্ত্রী চণ্ডীবালা ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা।

দারিদ্র্যের কারণে অক্ষয়কুমার উচ্চ শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত ছিলেন। গ্রামে কাজের অভাবহেতু অল্প শিক্ষাকে সম্বল করে তিনি কলকাতায় কাজের অনুসন্ধানে আসেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গৃহশিক্ষকের কাজে খাওয়া-থাকা এবং যৎকিঞ্চিত বেতনে নিযুক্ত হন। ঠাকুর পরিবারে শিক্ষকতা করতে করতে অক্ষয়কুমার 'অক্ষয় মাস্টার' নামে পরিচিত হন। এইসময় তিনি বসুমতী প্রেসে সামান্য কাজ করতে থাকেন এবং প্রেসের মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনেন। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি সেরেস্তার দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় অক্ষয় সেন কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। এরপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। অক্ষয়কুমার বলেছেন : "আমার ত্রিশ বৎসর যখন বয়স, তখন রামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করি।... রামকৃষ্ণদেবকে তিনদিন দর্শন করেই আমি পাকা বুঝেছিলাম যে, যদি কেউ কৃষ্ণ দেখাতে পারেন, তা হলে ইনিই পারেন, আর কেউ না। এসময় আমি মোটেই জানি না যে, যেই কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণদেব।"

"করুণ-কটাক্ষপাতে, জানি না কি আছে তাতে,
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্তি নয়নদ্বারে, প্রবেশি হৃদয়পুরে,
হৃদয় করিলা অধিকার॥
মোহন মুরতি দেখি, তখন মোহিত আঁখি,
প্রাণ মন মুগ্ধ তার সনে।"

প্রভুদর্শনে আপন অনুভূতি অক্ষয়কুমার সেন 'পুঁথি'র পাতায় লিপিবদ্ধ করেন—

"সঙ্কেতে আভাসে চলে, আঁখি ঠারে আঁখি বলে,
বলাবলি বোবায় বোবায়॥"

অক্ষয়কুমার সেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঁচালি লিখতে গিয়ে লিখে ফেললেন এক বিশাল মাপের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। এই 'পুঁথি'ই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্যের আকরগ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই মহৎ গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁকে যাঁরা অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিলেন, 'পুঁথি'তে তিনি তাঁদের নাম স্মরণ করেছেন।

"প্রথমত গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হইল প্রভু দরশন॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তাঁর পায়॥
দ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর।
দিলা যেবা গুহ্য গুহ্য লীলার খবর॥
অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়া আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তাঁর পায়॥
তৃতীয়ত যোগানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী।
আমার উপরে যাঁর কৃপা রাশি রাশি॥
করুণ প্রার্থনা যেবা কৈলা বারে বারে।
জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে॥
স্বার্থশূন্য প্রীতি স্নেহ কৈলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তাঁর পায়॥
চতুর্থ যেজন তিনি নিত্য নিরঞ্জন।
সদা আস্যে হাস্যরাশি সুসরল মন॥
পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলী।
বিতরিয়া সুদুর্লভ চরণের ধূলি॥
সার্থক জীবন মম যাঁহার কৃপায়।
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তাঁর পায়॥
শেষে রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশশীঠাকুর।
সতত উন্মত্ত যিনি সেবায় প্রভুর॥
লীলাতত্ত্ব সিন্ধুতীরে দিলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তাঁর পায়॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে যাওয়ার পর অক্ষয়কুমারকে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম দিনেই ঠাকুরের সমাধি দর্শন এবং স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত অক্ষয় দু-একদিন পর থেকেই মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো ছুটে যান দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর কিন্তু সচরাচর অক্ষয়কে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন : "আগে মনের ময়লা কাটুক, তারপর ওসব হবে।" এমনকি অক্ষয়ের ছোঁয়া খাবারও ঠাকুর খেতেন না। বলতেন : "ও একটা আছে রে। সবাই কি সমান? আসুক যাক, মনের ময়লা কাটুক, এরপর হবে।" অক্ষয়কুমার বলেছেন : "কত লোক তাঁর পায়ে হাত বুলাচ্ছে;

আমি হাত বাড়ালেই 'অমনি হয়েছে' বলে পা গুটিয়ে নিতেন। কখনো কখনো পদরজ নিতে গেলে পিছিয়ে চলে যেতেন আর বলতেন, 'হয়েছে হয়েছে'।"

অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'পুঁথি'র পাতায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ঃ

"বড়ই দারুণ দুঃখ রৈল মনে মনে।
মম স্পর্শ ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে॥
অন্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন।
বিনা তব সেবা-ভক্তি সেবার কারণ॥
দেহ যার লাগিল তোমার সেবনে।
মিছার জনম তার কি ছার জীবনে॥"

অবশেষে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অক্ষয়ের জীবনে তার পরম কাঙ্ক্ষিত দিন সমাগত হলো। সেসময় ঠাকুরের গলদেশ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত। এই সময় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তিতিক্ষায় অক্ষয়কুমার ৬ এপ্রিল ১৮৮৫ দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে নিয়ে আসা হলে অক্ষয়কুমার নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরের সেবা করতেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি 'কল্পতরুদিবস'-এ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের আশীর্বাদ জানিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক।" অক্ষয়ের পরম সৌভাগ্য যে, সেদিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীচরণে দুটি চাঁপাফুল অঞ্জলি দিয়েছিলেন।

"কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্রবাক্য ভাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥
প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়।
রামকৃষ্ণনাম গেয়ে দিন যেন যায়॥"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থাবস্থায় স্বামীজী সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম না করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার ভক্তির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে সবকিছু ভুলে ঠাকুরের চরণে চাঁপাফুল অর্পণ করেছিলেন। 'পুঁথি'তে আছে ঃ

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়।
তোলা দুটি চাঁপাফুল দিনু দুটি পায়ে॥"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তিম সময়ে অক্ষয়কুমার তাঁকে সুজির পায়েস খাইয়েছিলেন। ঠাকুর সমাধি থেকে উঠে অক্ষয়ের হাতে "পাত্রপূর্ণ সুজি খান অবহেলে।" শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির সময়েও অক্ষয় তাঁর শয্যার পাশেই ছিলেন। তিনি সেকথা 'পুঁথি'তে উল্লেখ করেছেন ঃ

"ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর।
কন্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর॥
নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির।
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গভীর॥
এই সমাধিতে হইল সমাধি মহান।
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান॥"

১২৯৩ সন। শ্রাবণ সংক্রান্তির রাত্রি।

"একটা বাজিয়া মাত্র দু-মিনিট পার।
মহাসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রভু আমার॥"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ত্যলীলার পর অক্ষয়কুমার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সকাশে আসেন। তিনি স্বামীজীর নির্দেশমতো শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকাজ করতেন। অনেক সময় মাথায় আনাজের বোঝা নিয়ে তিনি পদব্রজে ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটীতে যেতেন। কারণ—

"স্বামীজী সঁপিয়া মোরে মায়ের চরণে।
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ-পর্যটনে॥
মায়ের কৃপার স্বাদ পাইয়া এখন।
পাছু পাছু রহি মার স্বদেশে যখন॥"

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন ঃ "অক্ষয় মাস্টারের পুঁথি বেশ।"

অক্ষয় সেন কৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছেন ঃ

"লীলা-গীতি-বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা॥"

৪ শ্রাবণ ১৩২৭ (২১ জুলাই ১৯২০) শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাবসান ঘটে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরবৃন্দের স্নেহধন্য অক্ষয়মাস্টার শেষজীবন অতি কষ্টের ভিতর অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পিতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা অবসানের তিনবছর পর ১৩৩০ সালের ২১ অগ্রহায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন।

অক্ষয়কুমার ভক্তি, নিষ্ঠা, সেবা ও তিতিক্ষার দ্বারা যে-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কৃপালাভ করে এক সাধারণ জীবনকে মহাজীবনে উত্তোরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথায় বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে গেছেন। একাজ তাঁর নয়, ঠাকুর তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে নিজ কাজ নিজেই করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই অক্ষয়কুমার অক্ষয় হয়ে আছেন সর্বজনের অন্তরে। ❑

■ **সহায়ক গ্রন্থ ঃ** • স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা • শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা • শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা • রামকৃষ্ণলীলামৃত • শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

আ লো চ না

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বদেশচিন্তার পটভূমি—নিজ জন্মভূমি

সতী দত্ত*



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন সজাগ, সতর্ক ও সুশিক্ষিত মানুষ। সুদীর্ঘ ৮৩ বছরের অক্লান্ত, বৈচিত্র্যময় ও অনাসক্ত জীবনচর্যার দ্বারা তিনি জীবন্ত ইতিহাসের ভূমিকা পালন করে গেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্বে অর্থাৎ কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি, অহিংস-সহিংস আন্দোলন, গান্ধী-সুভাষ-জওহরলালের বিচিত্র কর্মপন্থা, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ইত্যাদি লক্ষ্য করার সুযোগ আচার্য রায়ের হয়েছিল। তা নিছক পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তা লব্ধ হয়েছিল। সুদীর্ঘ জীবনের কোন পর্বেই তিনি সংগঠিত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও[১] তাঁর কর্মময় জীবন ছিল অসাধারণ আপসহীন এক সংগ্রাম। কেবল বিদেশি শাসন থেকেই মুক্তি নয়, সকলপ্রকারের অধীনতা বা দাসত্ব থেকে মুক্তি—সমগ্র দেশবাসীকে সাথী করে আলোর জগতে পৌঁছানোর এই তপস্যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট—ভারতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। বিভিন্ন ঘটনা ও ভিন্নমুখী চিন্তাধারা তখন দেশকে জাতীয় অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে। পশ্চিমের যুক্তিবাদের প্রভাবে তদানীন্তন বঙ্গদেশের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসে বিভিন্ন ধারার আন্দোলনে উদ্বেল। এই আন্দোলনের পুরোধাগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং রাজেন্দ্রলালের প্রভাব প্রফুল্লচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়

মাত্র ২৪ বছর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধটি[৩] ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এক মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রবন্ধটির মাধ্যমে তদানীন্তন পরাধীন ভারতের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে, নজিরবিহীন ব্যবস্থার প্রতি শ্লেষযুক্ত আক্রমণে পূর্ণ ছিল প্রবন্ধটি। এই নির্ভীক সমালোচনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট। এই প্রবন্ধ এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মানসিক বৃত্তি স্ফুরণে পিতৃগৃহের প্রভাব ছিল।[৪] পিতা হরিশ্চন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, চিন্তার প্রসারতা এবং স্বচ্ছতা এসেছিল ডিরোজিওর ছাত্র, শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর সাহচর্যে।[৫] উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় চিন্তা ও কর্মচাঞ্চল্যের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এই ডিরোজিও। তাঁর শিক্ষা অনুগামীদের মধ্যে অভূতপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সততার প্রতি নিষ্ঠার জন্ম দেয় যুক্তিবাদী মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে। রামতনুর ছাত্র হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। কেবল রামতনু লাহিড়ীই নন, হরিশ্চন্দ্রের জীবনে অপর এক মনীষীর প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। তাঁরও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বাংলার নারী-সম্প্রদায়ের জন্য অপার শ্রদ্ধা হরিশ্চন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল[৬] এবং তারই ছটায় উদ্ভাসিত ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্র। দেশে-বিদেশে সম্মানিত এই প্রখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপনার দুর্লভ আকর্ষণী শক্তিতে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানগোষ্ঠী সৃষ্টির দ্বারা ভারতের অগ্রগতির পথে গতিসঞ্চার করেছিলেন। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম রসায়ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করে রসায়নচর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষায়, কর্মকৃতিত্বে ও স্বদেশপ্রেমে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

পিতা হরিশ্চন্দ্রের চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তাঁকে পৃথক করেছিল। সেযুগের অনেকের মতো তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির দুটি ধারা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ্ ও সঙ্গীতের অনুরাগী। আচার্য রায়ের আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, তাঁর ইংরেজি সাহিত্যপাঠ শুরু হয়েছিল পিতার নিকটে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় পারিবারিক জীবনের আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকে। সেখান থেকে তাঁর স্বদেশচেতনার সুখস্মৃতি পর্বের শুরু। পিতার প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁকে দেশীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে। তবে পল্লিজীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং পারিবারিক গ্রন্থাগারের বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থরাজি স্বদেশের সমস্যাবলী হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল, সুপ্রাচীন

* বড়িশার 'বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওম্যান'-এর ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা।

সভ্যতার ধারক ও বাহক স্বদেশভূমি ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে কতটা বঞ্চিত এবং ধ্বংসের প্রতি ধাবমান। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করেন—সমগ্র দেশ যে-শিকড় দিয়ে রস আস্বাদন করবে, সেই শিকড়ে ধরেছে ঘুণ। যে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা জাতির আশ্রয়ভূমি, তার বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় বিদেশি শাসনের আঘাত কমবেশি প্রায় সকলের ওপরেই পড়ত এবং তা তাঁদের অনুভূতির গভীরে এক তীব্র ক্ষত সৃষ্টি করত। সেই আঘাতেই ভারতীয়দের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তাঁদের বিকাশের সকল দ্বারই রুদ্ধ। তাই চাই সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। আচার্য রায়ের এই বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমেই একমাত্র সেই মুক্তি ত্বরান্বিত হতে পারে। দারিদ্র্যরূপী অবক্ষয়ের হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারে শিক্ষা, যা কিনা প্রত্যেকের জীবনকে করে তুলবে কর্মময়। কলকাতা এবং বিদেশকেন্দ্রিক তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা চললেও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কপোতাক্ষ নদীতীরে স্নেহময়ী গ্রামখানি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর জেলা ও সমাজের সাথে একাত্ম ছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মধারা সমগ্র দেশের মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও নিজ জেলা খুলনা সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। শ্রীহীন গ্রামের বাস্তব করুণ চিত্র তাঁর হৃদয়কে করে তুলত ব্যথিত। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না নিজ গ্রামকে কেন্দ্র করে।[৭] গ্রামের অর্থনৈতিক ভগ্ন অবস্থার মরা গাঙে জোয়ার আনতে অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি।[৮] তাঁর বক্তব্য ছিল—প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আর্থিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হবে। খুলনা জেলা নদীপ্রধান, জমি উর্বরা, সমাজ কৃষিভিত্তিক, কিন্তু বিশাল অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্গত হওয়ায় বহু নদীতে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। তাছাড়া বছরব্যাপী চাষের কাজ থাকে না। সুতরাং সেই কৃষিনির্ভর মানুষদের অন্য কোন উপায়ে অতিরিক্ত রোজগারের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ শিক্ষা প্রসারিত করে তাদের অজ্ঞতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল শিক্ষাদানেরও প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন।

জেলার জনসমষ্টির মধ্যে কৌমপ্রথা বিদ্যমান। তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঁধ নির্মাণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, নালা কেটে চাষের জমিতে জল আনা প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা তিনি বলতেন।[৯] তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত জেলার যুবকরা সহজে গ্রামে আর ফিরতে আগ্রহী হয় না। তাই খালিশপুর আশ্রমে পরীক্ষা-মূলকভাবে কৃষিকার্যে নিযুক্ত যুবসঙ্ঘের সদস্যদের তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন।[১০] নিজ গ্রামে স্বনির্ভর কর্মে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি স্থাপন করেন ট্যানারি; প্রতিষ্ঠা হয় তাঁতশিল্প ও খাদি উৎপাদনের কর্মকেন্দ্র। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত এই খাদি প্রতিষ্ঠানের ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীবাদ, স্বনির্ভরতা ও স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করেছিলেন।[১১] ১৯২২ সালে আচার্য রায় বাজিতপুরের ব্রহ্মচারী বিনোদকে ৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন স্বনির্ভরতা প্রকল্প স্থাপন করার জন্য। সাতখিরার আশাসূনী গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে এবং জেলার নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঐ আশ্রমে তাঁতবস্ত্র নির্মাণের সকলপ্রকার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল।[১২] তবে ঐ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। আচার্য রায়ের মতে, বঙ্গদেশে গঠনমূলক কাজ করা ছিল রীতিমতো কঠিন।

১৯২৭ সালে সাতখিরায় অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যই ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের কবল থেকে দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ নির্ধারণ করা। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল—জাতি বড় হয় শিক্ষার প্রভাবে। শিক্ষাই ছিল তাঁর কাছে স্বলক্ষ্যে পৌঁছানোর মূলকথা। এই ভাষণ সম্পর্কে পুলিশের অভিমত ছিল—"Nothing new, not concerned with sedition or politics."[১৩] আচার্য রায়ের প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল পুলিশ বিভাগেই নয়, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার বীজ সুপ্ত ছিল। তাঁর মতে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দ্বারাই দেশবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। যে-সমাজব্যবস্থায় অগণিত দেশবাসীর মানবিক অধিকার অস্বীকৃত, সে-ব্যবস্থা সর্বথা বর্জনীয়[১৪]। এ ছিল ১৯২৯ সালের বাগেরহাট সম্মেলনের মূল বক্তব্য। জেলার জনগণের কাছে বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এই নিষ্ঠুর প্রথা অবসানের জন্য তিনি আবেদন রেখেছেন। ১৯২৬ সালে খুলনায় অনুষ্ঠিত নমঃশূদ্র সম্মেলনে তিনি বলেন, এই অমানবিক নিয়মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হোক। দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় সার্বিকভাবে সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা।[১৫] ১৯২০ সালে ফরিদপুরের হিন্দু সম্মেলনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে স্মরণ করার আহ্বান জানান।[১৬]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, জাতি বড় হয় শিক্ষার প্রভাবে। শিক্ষা তাঁর কাছে ছিল সব লক্ষ্যে পৌঁছানোর মূলকথা। স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও বলতেন, শিক্ষার আলো নিয়ে যেতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পিতা হরিশ্চন্দ্রের মাধ্যমে যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁদের নিজ গ্রামে, পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সেই অঙ্কিত পথে বহুদূর এগিয়ে গেলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হলো বহু বিদ্যালয়, যার আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন

করতেন। জেলায় উচ্চ শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ব্রজলাল চক্রবর্তী দৌলতপুর নামক স্থানে স্থাপন করলেন 'হিন্দু একাডেমি'। সেখানে আচার্য রায় প্রায়শই আসতেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে একাডেমি কিছুকালের মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানভবনটি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর তদারকিতে এবং বহু বিদেশি যন্ত্র বিজ্ঞানাগারের জন্য আনা সম্ভব হয়েছিল তাঁরই অর্থানুকুল্যে। যেমন জার্মানি থেকে এসেছিল টেলিস্কোপ। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জেলায় গড়ে ওঠে নতুন এক পরিমণ্ডল। যুবকদের উচ্চ শিক্ষালাভের রঙিন স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের মাধ্যমে জেলার জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত বাতাস অন্দরমহলে প্রবেশের পথ খুঁজে নেয়। অন্তঃপুর-বাসিনীরা শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। সামাজিক-ভাবে মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শহরে ও গ্রামে স্থাপিত হয় বহু বালিকা বিদ্যালয় এবং জেলাশহরে স্থাপিত হয় একটি বালিকা মহাবিদ্যালয়। জেলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে-কর্মোদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা ছিল অনন্যসাধারণ। নিজ জেলায় অনুসৃত শিক্ষার আদর্শের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়।

জন্মভূমি খুলনা জেলার সাতখিরা মহকুমায় ১৯২১ সালে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে প্রফুল্লচন্দ্র 'Famine Relief Fund' গঠন করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য রায়ের শয়নকক্ষ হলো এই সংগঠনের সদর কার্যালয়, যেখানে সেবার কাজে হাত মেলাতে দলে দলে ছাত্রদের আসা-যাওয়া চলত। খুলনা জেলার যুবছাত্র নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে রইল না। এদের সঙ্গে যোগ দিল সন্নিহিত জেলার তরুণ সম্প্রদায়। বিশেষত বাজিতপুরের ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে এই কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের এই সেবাব্রত আচার্য রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবিভক্ত ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে যশোর-খুলনা জেলার যুবসঙ্ঘের অবদানের কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ঐ যুবসঙ্ঘের যাত্রাপর্বে সদস্যদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। আচার্য রায় এই সকল ত্রাণকার্যের মাধ্যমে সেই আত্মনিবেদনের সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। কর্তব্যরত যুবকেরা আচার্যের জীবনচর্চা ও আত্মত্যাগের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল।

খড়্গপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ জ্ঞান ঘোষ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। তিনি আচার্য রায়ের 'আত্মচরিত'-এর মুখবন্ধে যা লিখেছেন, তার মধ্যেই আচার্যের সমগ্র চরিত্রের প্রতিভাস বর্তমান। তিনি লিখেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপলব্ধি করেছিলেন—আমাদের পরাজয়ের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মশক্তির অভাব, যার প্রভাবে দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করে তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়ে ছাত্রসম্প্রদায়কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন আচার্য রায়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়ঃ "তিনি তাঁর ছাত্রদের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাদের জ্ঞান দেননি, নিজেকেও দিয়েছেন।" জ্ঞানচন্দ্র লিখেছেনঃ "দেখিয়াছি বিজ্ঞানের মায়া কাটাইয়া তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া। দুর্যোগে, ভূমিকম্পে, সঙ্কটে, জলপ্লাবনে আর্তের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।... দলে দলে যুবকেরা তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খুলনা, দামোদর, উত্তরবঙ্গ ও বিহারে অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণের জন্য।... স্বার্থ বলিতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না।... তিনি দেশের অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।... সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার অভিনব চিন্তাশক্তির ধারায়।"[১৭] ❑

সূত্রনির্দেশ

১ যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র, ২য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃঃ (ছয়)
২ উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়—ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কপোতাক্ষ, পঞ্চবিংশতি সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃঃ ৩৯
৩ আত্মচরিত—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯
৪ ঐ, পৃঃ ২২
৫ ঐ, পৃঃ ২১
৬ ঐ, পৃঃ ৭, ২১
৭ আই. বি. ফাইল নং—৮০জি/২৮ (অনুমতি অনুসারে)
৮ ঐ, সাতখিরার রাজনৈতিক সম্মেলন—১৯২৭, সভাপতির ভাষণের মূল বক্তব্য
৯ ঐ
১০ আই. বি. ফাইল নং—২৩২/২৯ (অনুমতি অনুসারে)
১১ কর্মযোগী প্রফুল্লচন্দ্র—লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কপোতাক্ষ, আগস্ট ১৯৯৩, পৃঃ ৪৫
১২ আই. বি. ফাইল নং—৮০জি/২৮ (অনুমতি অনুসারে)
১৩ ঐ
১৪ ঐ
১৫ ঐ
১৬ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৫ মে ১৯২০
১৭ আত্মচরিত, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য

স্মৃতিকথা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মানুষ কল্যাণ মহারাজ—আরো কিছু চিত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ আমাকে সন্ন্যাসজীবনের পাঠলাভের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থানেই পাঠিয়েছিলেন। আমি নয় বছর কল্যাণ মহারাজের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা কনখল সেবাশ্রমে থাকতে পেরেছিলাম—এ এমন এক সুযোগ যা বর্ণনার অতীত। জায়গাটি সব দিক দিয়েই একজন সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছু সাধকের পক্ষে অতীব অনুকূল ছিল। আমাদের জীবন ছিল উত্তমরূপে সংরক্ষিত। আর আমাদের দিনচর্যায় কর্ম, উপাসনা, অধ্যয়ন ও নিদিধ্যাসন এমনভাবে নিবেশিত ছিল যে, সবকিছুই খুব মসৃণভাবে চলত। অন্য কোন কেন্দ্র তখন কনখলের মতো ছিল না। কনখল সেবাশ্রমের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল—সেখানে হাসপাতালের কাজ থেকে মঠকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছিল। মঠ থেকে বেরিয়ে আমরা হাসপাতালের কাজ করতাম অথবা সন্ধ্যাবেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতাম। আবার কাজের শেষে মঠে ফিরে গিয়ে পুরোপুরি নিজেদের মতো থাকতে পারতাম। সেবাশ্রমে কেবল রোগী আর তীর্থযাত্রীরা থাকত—ভক্তদের আনাগোনা বলে কিছু ছিল না। অন্য প্রতিটি কেন্দ্রে আশ্রমবাসীদের ভক্ত ও অন্যান্য লোকেদের জন্য সময় দিতে হতো। আমাদের কেন্দ্র ছিল সেদিক থেকে অন্যরকম। সেবাশ্রমে আমাদের মুখ্য করণীয় কাজ ছিল হাসপাতালে; তাছাড়া নিজের নিজের সুবিধামতো আমরা মন্দিরে উপাসনা করতাম। অবশ্য প্রাতঃকালীন নিয়মিত ভজন, ধ্যান ও পাঠ ছিল। তাছাড়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী ও মহাপুরুষ মহারাজের তিথিপূজা উদ্‌যাপন করা হতো। কিন্তু এসব কোনকিছুর জন্যই হাসপাতালের কাজে অবহেলা করা চলত না। কেউ না কেউ সবসময়েই ঐ কাজের ভার নিত।



আমার মৃতদেহভীতির অন্তিম সংস্কার

স্বামী কল্যাণানন্দজী নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। এক রাত্রে আমার হাসপাতালে কাজ করার পালা ছিল। সেইসময় একটি রোগীকে দেখার জন্য কল্যাণ মহারাজ মৃদুপদে সেখানে প্রবেশ করলেন। স্বভাবতই তিনি যখন ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখতে লাগলেন, আমি তাঁর সঙ্গে রইলাম। অবশেষে আমরা শবাগারে এসে পৌঁছালাম। আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটা তীব্র ভীতি ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের মৃতদেহের কাছে যেতে দেওয়া হতো না। বড় হওয়ার পরও এমন পরিস্থিতি কখনো হয়নি যাতে আমাকে কোন মৃতদেহের কাছে যেতে হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে নরক-যন্ত্রণারও অধিক ছিল। যখনি সেবাশ্রম থেকে শব বহন করে নিয়ে যাওয়ার দরকার হতো, অন্যেরা সে-কাজ করে দিত। কেন জানি না, আমাকে সেই কাজে কেউ ডাকত না। কাজেই কনখলে আসার পর থেকে আমি কখনো শবাগারে যাইনি, এ কয়মাস সেটিকে এড়িয়েই চলেছি। সেদিন রাত্রে কিন্তু কল্যাণ মহারাজ ধীরে ধীরে শবাগার অভিমুখে যেতে যেতে একটি বিশেষ রোগীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম যে, রোগীটি মারা গেছে এবং তার মৃতদেহ ঐ ঘরে রাখা আছে। যেহেতু মহারাজ এগিয়ে চললেন, আমি পিছিয়ে আসতে পারলাম না। তিনি শবাগারের দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন ও ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে আছি, আমার আর ভয় কি? আমারও সাহস তখন তাঁরই মতো! তিনি মৃতদেহটির কাছে গিয়ে আচ্ছাদনটি মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দেখলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেনঃ "দেখ, লোকে মৃতদেহকে ভয় করে। কিন্তু পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিরীহ বস্তু যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই মৃতদেহ—আঙুল তুলতে পারে না, কথা বলতে পারে না। তা সত্ত্বেও লোকে কেন যে ভয় করে! অভয়ে ভয়দর্শন!" আমি বললামঃ "হ্যাঁ মহারাজ, সে-কথা সত্যি।" একথা শোনার পর তিনি ধীরপদে সরে এসে হাত ধুলেন এবং তারপর বাইরে যাওয়ার উপক্রম করলেন। কাজেই আমাকেই তখন আচ্ছাদনটি শবের মুখের ওপর টেনে দিতে হলো। আমি তা করলাম এবং আমার একটুও ভয় করল না। এরপর আমিও হাত ধুয়ে নিলাম এবং আমরা দুজনেই বেরিয়ে এলাম।

সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে আমার আর কখনো মৃতদেহকে ভয় করেনি। কল্যাণ মহারাজ আমার ভীতির অন্তিম সংস্কার করে ছাড়লেন। পরবর্তী কালে একটা সময়ে হাসপাতালে বহু কলেরা রোগী আসে। তখন বেশ কিছু মৃতদেহ আমাদেরই সরাতে হয়। একবার তো পুরো একটা রাত্রি ঐ করতে করতেই কেটে গেল। কিন্তু তখন আমার মৃতদেহভীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, শবাগারে গিয়ে কল্যাণ মহারাজ সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেনঃ "লোকে মৃতদেহকে

ভয় করে।" তাঁর প্রতিটি কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। তিনি যা বলেছিলেন, তাঁর মনেও তাই ছিল এবং আমিও তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলাম—এছাড়া ঐ ঘটনায় আর কিছু ছিল না। তিনি আমাকে অপমান করেননি, বলেননি—'তুই বড় ভীতু, মেয়েলি স্বভাবের।' এরকম কোনকিছুই বলেননি। তাঁর শিক্ষাদানের ধারা সবসময়েই ছিল এইরকম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক অমূল্য শিক্ষা লাভ করা যেত—এমন অনেক কিছু যা সারাজীবনের সম্পদরূপে আগলে রাখার মতো।

করলার সঙ্গে আমার তিক্ত সম্পর্ক

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই। করলার তিক্ত স্বাদ আমার একেবারেই ভাল লাগত না। মহারাজ আমাকে তা খেতে রাজি করাতে চাইছিলেন, কিন্তু তিনি কেমন চমৎকারভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করলেন! তিনি মোটেই বললেন না—'তুই বড় এটা খাব না ওটা খাব না করিস। যা পাবি তাই তোকে খেতে হবে।' তার পরিবর্তে একদিন তিনি এমনভাবে একটা তরকারি রান্না করলেন যে, আমার খেতে ভালই লাগল। তখন তিনি আসল কথা ভাঙলেন ঃ "এটা কিসের তরকারি জানিস?—করলা।" আমি বললাম ঃ "কই, এটা তো তেতো লাগছে না।" তিনি বললেন ঃ "এটা রাঁধার একটি বিশেষ প্রণালী আছে।" আরো খেতে খেতে আমি ক্রমশ তার তিক্ত স্বাদ টের পেতে লাগলাম এবং বললাম ঃ "হ্যাঁ, এইবার তেতো তেতো লাগছে।" তিনি বললেন ঃ "তা হলেও এতে তোর কোন ক্ষতি হবে না।" কল্যাণ মহারাজ এইরকম করে কোন একটা ভাব অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করতেন। এখন আমার করলা খেতে ভালই লাগে। বস্তুত, তাঁর সবকিছু করার মধ্যে একটা অপূর্ব স্নিগ্ধতা ছিল। হুড়ুম-দুড়ুম ভাব, উগ্রতা একেবারেই ছিল না। এমন অনেক ধারণা তিনি আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যা আজও মনে গেঁথে আছে।

অর্থের প্রতি তাঁর মনোভাব

সেবাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে অনেক আমগাছ ছিল—১২৫টার মতো। সেগুলি কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয়ানন্দজী লাগিয়েছিলেন। সেগুলিতে যখন ফল ধরতে আরম্ভ করল, একজন সাধু বললেন ঃ "আমাদের এত হাজার হাজার আম হচ্ছে। এগুলি যদি আমরা বিক্রি করি, অনেক টাকা আসবে।" কল্যাণ মহারাজ বললেন ঃ "তা যদি বল, টাকা রোজগারের জন্য আমি এই গাছগুলি বড় করে তুলিনি। তোমরা নিজেরা যা পার খাও। বাকি যা থাকবে তা থেকে প্রত্যেকটি ভিক্ষার্থী সাধুকে দুটি করে আম দিও। নিশ্চয়ানন্দ আর আমি কত খেটেছি এর পিছনে, যাতে লোকে পেট ভরে আম খেতে পারে। গরিব লোকেদের ভাল আম খাওয়ার মতো পয়সা থাকে না। তাদের মধ্যে এগুলি বিলিয়ে দাও।" মহারাজ কখনোই এর থেকে পয়সা করতে চাননি। কী চমৎকার ভাবটি—মানুষের জন্য, অর্থের জন্য নয়! কী খাটাই তিনি খাটতেন! প্রতি বছর স্থানীয় সাধুদের নিমন্ত্রণ করে তিনি তাঁদের আম আর পায়েসের ভোজ দিতেন। তাঁরা সকলে এই ভোজে যোগ দিতেন ও খুব উপভোগ করতেন। বস্তুত, তাঁরা কল্যাণ মহারাজের ভোজের নিমন্ত্রণ কবে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। শুধু পায়েস আর আম—আর কিছু নয়। বলতে কি, মহারাজ ছিলেন ভিন্ন এক প্রজন্মের মানুষ, নিজস্ব ধাতুতে গড়া—এরকম আর দেখা যাবে না।

আগেই বলেছি, আমার ওপর সেবাশ্রমের হিসাবপত্র রাখার দায়িত্ব ছিল। কোন এক ব্যক্তি কথা দিয়েছিলেন যে, প্রতি মাসে সেবাশ্রমকে একটি করে টাকা দেবেন। পর পর কয়েক মাস তিনি কথা রাখেননি। বাজারে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো। আমি একদিন কল্যাণ মহারাজকে বললাম ঃ "ঐ লোকটির সঙ্গে বাজারে আমার প্রায়ই দেখা হয়। ওকে কি আমি টাকাটার কথা মনে করিয়ে দেব?" তিনি বললেন ঃ "কেন? তুই এখানে আসার সময় অখণ্ডানন্দজী মহারাজ কি তোকে টাকা তোলার কথা বলে দিয়েছিলেন?" উত্তরে আমি 'না' বলতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আমি কি তোকে তা বলেছি?" আমি আবার 'না' বলতে তিনি বললেন ঃ "তাহলে তুই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? যা টাকা আসবে তাই দিয়ে আমরা চালিয়ে নেব। আজ তুই টাকা তুলতে, তহবিল বাড়াতে, আরো বাড়ি-ঘর তৈরি করতে চাইছিস। এর ফল কি হবে? মন ঐসবের দিকেই যাবে, আধ্যাত্মিক জীবনের আর কিছু থাকবে না। তুই এখানে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে এসেছিস, সেইজন্য সংগ্রাম কর, সেইভাবে দিন কাটা। সেটাই বেশি জরুরি। টাকাকড়ি আর বাড়িঘরদোর নিয়ে মাথা ঘামাস না। লোকে যদি দান করতে চায় তো করুক; আর যদি নাও করে, কিছু এসে যায় না। তোকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। কেউ যদি ভুলেই যায়, সেক্ষেত্রে তোর কী করার আছে? তোকে তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না। তাদের মনে বিষয়টা কি নেই? তুই বিষয়টা মাথা থেকে নামিয়ে ফেল।" তিনি খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, টাকাকড়ির ব্যাপারটা আমার বিবেচ্য বিষয়ই নয়। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটল।

কল্যাণ মহারাজ বলতেন ঃ "আসল জিনিস হচ্ছে কাজটা ভালভাবে করা। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যা আমাদের হাতে আসবে, তাই আমরা কাজে লাগাব—এই হলো মূল কথা। কাজের পরিমাণ নয়, গুণগত উৎকর্ষকেই গুরুত্ব

দিতে হবে। তোরা যদি কেবল একটিমাত্র রোগীরই সেবা করতে পারিস, তাই যথেষ্ট। সেবা করছিস কিনা, সেটাই বড় কথা। যা তোদের হাতে আছে তাই কর, তা সামান্য হয় তো হোক। মনের ভাব এরকম না হলে মন নানারকম পরিকল্পনা করতে থাকবে, আর তার ফলে তোদের পুরো জীবনটাই নষ্ট হবে। এসব জিনিস যেমন আছে তেমনি থাকতে দে।" মহারাজের এইরকম মনোভাবের জন্য সেবাশ্রম বেড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল।

আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার এটি এক অতি উচ্চ আদর্শ। আমরা এখানে টাকা উপায় করতে আসিনি, বাড়ি বানাতেও আসিনি। আমরা এসেছি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে। এইরকম পথনির্দেশের আমাদের প্রয়োজন, না হলে আমরা পথভ্রষ্ট হব। কল্যাণ মহারাজ নজর রাখতেন যাতে আমরা যাকিছু করি না কেন, এই কথাটা নিশ্চিতভাবে মনে রাখি। আমরাও সবসময় জীবনের প্রতি এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে চলতাম। এখন সেবাশ্রমে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। তার জন্য লোকের কাছে আবেদন করে লেখালেখি করতেই হচ্ছে—সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু কল্যাণ মহারাজের এসম্বন্ধে খুব সুচিন্তিত অভিমত ছিল। তিনি অর্থের কথা ভাবতেনই না। একবার একজন পাঁচশো টাকা চুরি করায় মহারাজ মন্তব্য করেন: "বোধহয় ওর টাকাটার দরকার ছিল।" কেউ টাকাপয়সা চুরি করল কিনা তা নিয়ে তিনি কখনোই মাথা ঘামাতেন না।

তাঁর ভালবাসা জীবন বদলে দিত

একবার একটি চোর আমাদের বাগানে কাজ করতে আসে। বাগানের দায়িত্বে যে-সাধুটি ছিলেন তিনি তাকে দেখে বলে উঠলেন: "হতভাগা! তুই অমুক জায়গা থেকে কীসব চুরি করেছিস, আর এখন এখানে এসে কাজ চাইছিস? বেরো।" আমি এই ঘটনাটা জানতাম না। লোকটি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কী হলো? তুমি এখানে কাজ করতে এলে, আমি তোমাকে বাগানে যেতে বললাম—এখন চলে যাচ্ছ যে?" সে বলল: "ঐ মহারাজ আমাকে চলে যেতে বললেন।" আমরা যখন কথাবার্তা বলছিলাম, কল্যাণ মহারাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং লোকটিকে বাগানে গিয়ে কাজ করতে বললেন। সে বলল: "কিন্তু ঐ মহারাজ যে আমাকে চলে যেতে বললেন।" একথা শুনে মহারাজ হেসে বললেন: "ওরে, ঐ মহারাজ তো আর জানেন না যে, তুই আগে একবার একটা অন্যায় কাজ করে ফেললেও আমার কাছে তার জন্য দোষস্বীকার করেছিস। আয়, আমার সঙ্গে আয়।" মহারাজ লোকটিকে সঙ্গে করে বাগানে নিয়ে গেলেন এবং বাগানের ভারপ্রাপ্ত সাধুকে বললেন: "দেখ, ও যে একটা অপরাধ করেছিল সে-কথা ঠিক, কিন্তু এখন ও তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে।" কল্যাণ মহারাজ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু বাগানের ভারপ্রাপ্ত মহারাজের এব্যাপারটা পছন্দ হলো না। তিনি পরে খাওয়ার ঘরে আমাকে বললেন: "নারায়ণ, ও লোকটা যে কী করবে তা কে জানে?" আমি বললাম: "আমি সবাইকেই অপরাধ না করা অবধি নিরাপরাধ বলে গণ্য হওয়ার সুযোগ (benefit of doubt) দিতে চাই। শুধু ঐ লোকটিকেই নয়, সবাইকে।" তিনি বললেন: "তাহলে আমি এখন কী করি?" আমি বললাম: "হয় মনে সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা পোষণ করতে থাকুন অথবা লোকটিকে একটা সুযোগ দিন।" তিনি বললেন: "আমি বুঝতে পারছি না কী করা উচিত।" আমি বললাম: "আমিও তা জানি না। তবে আদর্শ হিসাবে মহারাজ যা নির্ধারণ করেছেন, তা আমাদের বিবেচনার অনেক ওপরে। মহারাজের মতো মানুষ যখন চাইছেন, তখন আমাদের ঐ লোকটিকে একটি সুযোগ দিতেই হবে।"

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। একটি লোক মাঝে মাঝে মহারাজের কাছে আসত এবং টাকাপয়সা চাইত। মহারাজের কাছে কিছু পেলে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যেত। বেশ কয়েকবার এইরকম ঘটতে দেখার পর একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "মহারাজ, ও লোকটা কে? ও আপনার কাছে কেবল টাকা নিতে আসে এবং নিয়েই চলে যায়। কুটোটি নেড়েও উপকার করে না। ব্যাপারটা কী?" এই প্রশ্নের উত্তর মহারাজ আমাকে কখনোই দেননি। কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি সেবাশ্রমে এসে মহারাজের খোঁজ করল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি কত টাকা চাও?" সে বলল: "আমি টাকা-পয়সা চাই না, মহারাজ কোথায় তা জানতে চাই।" তখন আমি তাকে বললাম, মহারাজ শরীর রেখেছেন। শুনেই লোকটি ভেঙে পড়ল এবং একেবারে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। তারপর বলল: "আপনারা জানেন না, মহারাজ আমার জন্য কী করেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কেন? কী করেছেন?" সে বলল: "সে এক দীর্ঘ কাহিনী। একদিন আমি বাজারে গিয়েছিলাম। আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু ছিল না। আমি এক দোকান থেকে কিছু জিনিস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। তারপর পুলিশ আমাকে পিটুনি দিতে আরম্ভ করল। মহারাজ সেসময় একটা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে পুলিশকে থামতে বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?' সবাই বলল, 'এই লোকটা এইসব জিনিস চুরি করেছিল।' মহারাজ জিনিসগুলির দাম

কত তা জানতে চাইলেন। তারপর সেই টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'ভবিষ্যতে তোমার যদি কখনো টাকার দরকার পড়ে, আমার কাছে এসো। চুরি করো না। তোমাকে দেখে তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। তুমি চুরি করবে কেন?' এরপর আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম। তা সত্ত্বেও কখনো কখনো আমার উপার্জন প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হতো না। তখন মহারাজের কাছে এলেই তিনি টাকা দিতেন। সেই থেকে আমি চুরি করা ছেড়ে দিই। তিনি আমার সঙ্গে এত সদয় ব্যবহার করতেন! কোন প্রশ্ন না করেই সরাসরি দিয়ে দিতেন।" ভেবে দেখার—শুধু কয়েকটা টাকা দিয়ে মহারাজ লোকটিকে সৎপথে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার সমস্ত মনটাকে, তার সমগ্র আচার-আচরণের ধরনটাকেই বদলে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি লোকটিকে বললাম, আমি তাকে কিছু টাকা দিতে চাই—কিন্তু সে 'না' বলে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল।

কল্যাণ মহারাজের হৃদয় ছিল অসম্ভব রকমের দরাজ। সেবাশ্রমে বিচিত্র সব লোক থাকত। যেমন একজন বোবা লোক ছিল, সে কোন কাজ করত না। চুপচাপ বসে থাকত, খেত, চলে যেত, ফিরে এসে আবার চুপচাপ বসে থাকত, আবার খেত—এই চলত। আরেকজনের মাথার গোলমাল ছিল এবং অল্পস্বল্প ক্ষিপ্তও হয়ে উঠত। সকলকেই খেতে দেওয়া হতো এবং যত্নও করা হতো। কিন্তু তাদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় আমাদের খুব সাবধান হয়ে থাকতে হতো। এছাড়া একজন সাধু ছিলেন—একজন সত্যিকারের মহাত্মা। তাঁর বুকে বন্দুকের একটা গুলি লেগেছিল—গুলিটা বের করা যায়নি। তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতো। যন্ত্রণা উপশমের জন্য কাউকে দিয়ে প্রতিদিন তাঁর মাথায় চন্দনের তেল মালিশ করাতে হতো। কল্যাণ মহারাজ এরকম সকলের কথাই ভাবতেন। কাউকে কখনো বিদায় করে দেওয়া হতো না। সকলেরই সেবাশ্রমে জায়গা হতো এবং সকলেরই যথাসাধ্য সেবাযত্ন করা হতো। এদের প্রসঙ্গে মহারাজ আমাদের বলতেনঃ "আমরা কি এদের সামান্য দু-মুঠো অন্ন যোগাতে পারি না? কেন এদের তাড়াতে যাব? বাইরে গিয়ে এরা কী করবে?" কেউ সেবাশ্রমে আশ্রয়ের খোঁজে এলে অবধারিতভাবে সেখানে তার জায়গা হয়ে যেত।

একবার একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী সেসময় কনখলে ছিলেন। একজন ব্রহ্মচারীকে আশ্রমে ঘোরাফেরা করতে দেখে তিনি কল্যাণ মহারাজকে বললেনঃ "আপনি ঐ ছেলেটিকে চেনেন?" মহারাজ বললেনঃ "হ্যাঁ চিনি।" মাধবানন্দজী বললেনঃ "ওকে আমাদের সঙ্ঘের তিন তিনটি কেন্দ্র থেকে বের করে দিতে হয়েছে। ওর স্বভাব বড় খারাপ। ওকে এখানে রাখা চলবে না।" যেহেতু মাধবানন্দজী তখন সাধারণ সম্পাদক, তাই তিনি কর্তৃত্ব নিয়ে একথা বলতে পারলেন। কল্যাণ মহারাজ বললেনঃ "শুনুন, ছেলেটি আমার কাছে তার পূর্বকথা সব বলেছে। নিজের সব দোষ স্বীকার করেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'আমি এখানে ভাল হয়ে থাকার চেষ্টা করব। আপনি যা বলবেন, তাই করব। নিজেকে সামলে চলব।' সেইজন্যেই ওকে এখানে রাখা হয়েছে।" তারপর ঈষৎ গলা চড়িয়ে তিনি বললেনঃ "ভেবে দেখুন, শ্রীরামকৃষ্ণ সোনাকে সোনা করার জন্য আসেননি। তিনি কম দামি ধাতুকে ছুঁয়ে সোনা করে দেন। আমরা যদি এইরকম একটা ছেলেকে বদলে দিতে পারি, তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? আপনারা কেবল ভাল ভাল ছেলে চান। তারা তো আগে থেকেই ভাল আছে। কিন্তু এই ব্রহ্মচারীটির মতো ছেলেরই সহায়তা দরকার।" আশ্চর্যের ব্যাপার, কালে সেই ব্রহ্মচারীটি কল্যাণ মহারাজ ও সেবাশ্রমের একজন উত্তম সেবক ও কর্মীতে পরিণত হয়েছিল। এর আগে সে ছিল ভয়ানক রগচটা—ক্রোধের বশে জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করত। তিনটি কেন্দ্রে এইরকম ঘটেছিল। কিন্তু কনখলে সে খুব সংযত হয়ে থাকত। কালক্রমে সে সম্পূর্ণরূপে নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিল এবং জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল।

আদর্শ—নিঃস্বার্থ ও সপ্রেম সেবা

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে একদিন লাইব্রেরিতে বসে আমরা কজন ব্রহ্মচারী গল্পসল্প করছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠলঃ "আমরা সবকিছু ত্যাগ করে এসে এখানে কল্যাণ মহারাজের স্নেহচ্ছায়ায় আনন্দে কাটাচ্ছি।" কল্যাণ মহারাজ তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে একটি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি বললেনঃ "কে বলেছে যে, তোমরা সবকিছু ত্যাগ করেছ? তোমরা কী ত্যাগ করেছ? নিজের নিজের বাবা, মা, ভাই, বোন আর বাড়ি তো? প্রথম কথা, তোমরা কি সেগুলির মালিক ছিলে? এমন কিছু ত্যাগ কর যা তোমাদের অধিকারে আছে। নিজস্ব বলতে তোমাদের কী আছে? আপন আপন অহঙ্কার আর স্বার্থবোধ। ঐগুলিকে ত্যাগ কর। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ত্যাগ ও সেবা।' তোমাদের অহঙ্কার ও স্বার্থবোধ ত্যাগ করে সপ্রেম সেবা কর। সেই হলো প্রকৃত ত্যাগ।" তারপর আমার দিকে ফিরে মহারাজ বললেনঃ "নারায়ণ, এই জিনিসটা লিখে রাখ—'নিঃস্বার্থ, সপ্রেম সেবাই আমাদের

সঙ্ঘের আদর্শ।' " এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম।

রোগীদের প্রতি ভালবাসা

কল্যাণ মহারাজ একবার আমাদের বলেনঃ "তোরা যদি রোগীদের ভাল না বাসিস, তাহলে হাসপাতালে যাস না। কাজটা যদি তোদের প্রিয় মনে না হয়, ওখানে যেতে হবে না।" এই শুনে ব্রহ্মচারীদের মধ্যে দুজন কয়েকদিন হাসপাতালে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললঃ "আমরা ঐ কাজ ভালবাসি না, তাই যাইনি।" আমি বললামঃ "তোমাদের কি ধারণা, মহারাজ যা বলেছিলেন তার অর্থ এই?" তারা বললঃ "হ্যাঁ, আমাদের বুদ্ধিতে—মহারাজ একথাই বোঝাতে চাইছিলেন।" আমি তখন তাদের বললামঃ "মনে কর, তোমরা অসুস্থ হয়ে এখানে এলে। তখন আমাদের কাছে তোমাদের কী প্রত্যাশা হবে এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে কীরকম ব্যবহার পাবে? আমরা কি তোমাদের বলব যে, আমরা তোমাদের ভালবাসি না এবং সেবার কাজটাও আমাদের মনঃপূত নয়? তাহলে তোমাদের দশা কী হবে? তোমাদের এই কাজটাকে ভালবাসতে হবে—যেহেতু তোমরা নিজেরা যদি কখনো এখানে রোগী হয়ে আস, তাহলে তোমরা সেই জিনিসই পেতে চাইবে। আমাদের সকলকেই ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে, যাতে আমরা রোগীদের ভালবাসতে পারি। এরা সব মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালে না গিয়ে আমাদের এখানে আসে কেন? আমরা সাধুরা এদের সেবাযত্ন করি, ভালবাসি বলেই তো? আর ভেবে দেখ, কল্যাণ মহারাজ সাঁইত্রিশ বছর ধরে একনাগাড়ে এই কাজ করে আসছেন। আমাদের এই তো সুযোগ—এইসব মহাত্মারা জীবিত থাকতে থাকতে এঁদের দৃষ্টান্ত দেখে শিখে নেওয়ার।" এই কথা শুনে তারা বিষয়টা বুঝতে পারল—অন্তর থেকে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল।

সেবার প্রতি ঠিক ঠিক মনোভাব

কোন কোন আশ্রমবাসী এইরকম বলতঃ "আমরা কেবল মন্দিরের কাজ আর লাইব্রেরির কাজ করব, হাসপাতালের কাজে আমরা নেই।" হাসপাতালের কাজ এড়াতে চাওয়ার কারণ—সেখানে আমাদের সবকিছুই করতে হতো, এমনকি ঘর মোছা, বেডপ্যান পরিষ্কার করা প্রভৃতি জমাদার-মেথরের কাজ পর্যন্ত। তাদের কেউ কেউ এজাতীয় কাজ পছন্দ করত না। মহারাজ তাদের স্পষ্ট বলেছিলেনঃ "তোমরা যদি সত্যিকারের সাধু হতে চাও, তাহলে এইসব কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করতেই হবে।" একজন ঝাড়ুদারনী ছাড়া আমাদের কোন নার্স বা পরিচারক ছিল না। ঝাড়ুদারনী যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়ত, তার কাজও আমাদেরই করতে হতো। আমাদের সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো—এই ছিল কল্যাণ মহারাজের শিক্ষা। আর আমরা সব কিছু ঠিক ঠিক করছি কিনা, তার ওপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং ঐরকম করতেন। একবার তিনি একটি রোগী দেখতে যান। সেসময় আমরা কেউ ধারেকাছে ছিলাম না। তিনি গিয়ে দেখেন, রোগীটি সব নোংরা করে ফেলেছে। তিনি কাউকে না ডেকে নিজেই পুরো জায়গাটা পরিষ্কার করে বিছানার চাদর পালটে দেন। তারপর রোগীর কাপড়-চোপড় একটি জলের বালতিতে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে, সেগুলি কেচে শুকাবার জন্য রোদে মেলে দেন। আমরা এসে এইসব দেখে 'কে এসব করল' তা রোগীদের কাছে জানতে চাই। তারা বলেঃ "আমরা কিছু করিনি, কল্যাণ মহারাজ নিজে সবকিছু করেছেন।"

কোন কোন আশ্রমবাসী চাইত শুধু ধ্যান-ধারণা আর পড়াশোনা করতে। একজন ব্রহ্মচারী আমাকে বলেছিলঃ "আমি জ্ঞানযোগী হতে চাই।" আমি তাকে বলিঃ "ভাল কথা, জ্ঞানযোগী হও না। স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' বইটা পড়। সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেও তো তুলতে হবে। আমাদের পক্ষে কর্মযোগই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই যোগের অভ্যাসে যদি তুমি সফল না হও, তুমি জ্ঞানযোগী হতে পারবে না।" এসব ব্যাপারে লোকে অবশ্য নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে এবং তার সমর্থনে শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতেও ছাড়ে না!

কনখলে থাকাকালীন চোখের সামনে আমি এমন বহু লোককে দেখেছি, যারা সেবা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পালিয়ে গিয়েছিল। সেবাশ্রমে কিছুদিন কাজ করার পর বেশির ভাগ লোকেরই স্বাস্থ্য ভেঙে যেত। এর কারণ—এখানে ছিল হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ। যে নয় বছর আমি সেবাশ্রমে ছিলাম, তার মধ্যে আমার হিসাবমতো দুশো জন এরকম সেবার কাজ করবে বলে এসেছিল। কল্যাণ মহারাজ যেমন করতেন, আমিও তেমনি আগন্তুকদের কাজ দিতাম, আর দু-তিনদিনের জন্য তাদের থাকার জায়গা দিতাম। তারপরই তারা চম্পট দিত। কেবল তিনজন টিকে গিয়ে সাধু হয়েছিল। কনখল একটি তীর্থস্থান—সবরকমের লোক সেখানে আসত। কারোর জায়গাটা ভাল লাগত, কারোর লাগত না। জোর করে তো আর কাউকে আটকে রাখা যায় না। অনেক সময়ে আমরা জানতেও পারতাম না কারা কখন চলে গেল—কিছু না জানিয়েই অনেকে বেমালুম কেটে পড়ত। এই ছিল পরিস্থিতি। কল্যাণ মহারাজের বিধিনিষেধের ওপর কোন আস্থা ছিল না। এই কারণেই যার ওপর নির্ভর করতে পারা

যায়, এরকম কাউকে তিনি পাননি। যারা আসত, ইচ্ছা মতো আসত আর ইচ্ছামতোই চলে যেত—তারা সেবাশ্রমের কী হলো না হলো তা গ্রাহ্যই করত না।

সান্ধ্যভ্রমণ

হাসপাতালে বহু কাজ পড়ে থাকলেও অনেকে সন্ধ্যাবেলা এক প্রস্থ ঘুরে আসতে যেত। আমি কখনো এইরকম সান্ধ্যভ্রমণে যেতাম না। বলতামঃ "আমাদের ঘুরতে যাওয়ার দরকার কী? যারা অলস বা বৃদ্ধ, তাদের হাঁটাহাঁটির দরকার হতে পারে। কমবয়সিদের কাজ করার কথা—তাদের হাঁটবার কী দরকার? কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের ব্যায়াম হবে। আমরা কী জন্য হাঁটতে যাব? এই বদ অভ্যাস আমাদের জন্য নয়। স্বামীজী ব্যায়াম করতেন—ঐ করলেই হলো।" এমনকি যেসব সাধু তীর্থযাত্রা করতে কনখলে আসতেন, তাঁদেরও বলতামঃ "আমাদের বেড়াবার ফুরসত নেই। সময় কোথায়?" সন্ধ্যাবেলা আরতির সময়, হাসপাতালের কাজও থাকে। কল্যাণ মহারাজ এইরকম মনোভাব পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের বেড়াতে যাওয়ার মতো সময় হাতে থাকত না। আমরা তাঁকে ফেলে রেখে হাওয়া খেতে যাই কী করে? বাঙলা ভাষায় 'বেড়াতে যাওয়া' কথাটার প্রচলন আছে। আমাদের ওখানে জিনিসটার চলই ছিল না—নিশ্চয়ানন্দজী বা কল্যাণ মহারাজ কেউই কখনো বেড়াতে যেতেন না। দুজনেই কঠোর পরিশ্রম করতেন। আর আমরা কিনা বেড়াতে যাব? অনেকে সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে গঙ্গার আরতি, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করতে যেতে চাইত। আমি কখনো যেতাম না। আমাদের সেবাশ্রমের মন্দিরে ঠাকুর রয়েছেন, আমাদের যা প্রয়োজন ঐখানেই মিলবে। সেসব ফেলে গঙ্গার আরতি দেখতে যাব কোন্ দুঃখে? তা যদি যেতেও হয় তাহলে সেবাশ্রমে মন্দির রাখার কী প্রয়োজন? কল্যাণ মহারাজ আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেনঃ "এই দেখ মন্দির রয়েছে—উপাসনা, ধ্যান আর প্রার্থনার জন্য; আর ঐ দেখ হাসপাতাল রয়েছে—সেবা করার জন্য। দুটোর মধ্যে কোন তফাত নেই।" এসব ছেড়ে কী করতে বেড়াতে যাব? আমি কোনদিন এই বেড়াতে যাওয়া ব্যাপারটায় কারো দলে যোগ দিইনি।

সেবাশ্রমের কঠোর জীবন

আরেকটা কথা বলি। সেবাশ্রমের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা দুবছর সকালে কোন জলখাবার খেতে পাইনি—তেমন সংস্থানই ছিল না। বেলা ১২টার সময় আমাদের দুপুরের খাওয়া জুটত—খানিকটা ভাত আর ঝোল। রাতের খাওয়া ছিল খান-দুই রুটি, তার সঙ্গে কিছু তরকারি। আমার ওজন কখনো ৯৮ পাউণ্ড (৪৫ কেজির মতো)-এর ওপরে ওঠেনি। নয় বছর ধরে তা একই ছিল। এমনিতে আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি ভালই ছিল। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ওজন কখনো বাড়তে পারেনি। নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য আমরা হাসপাতালের টাকায় কখনো হাত দিতাম না। কেউ যদি সাধুসেবার জন্য কিছু দিত, তা নেওয়া চলত; কিন্তু হাসপাতালের টাকা নয়। আমাদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ফলে, যারা আসত তারা টিকতে না পেরে চলে যেত। আমি কনখলে আসার দু-তিন বছর পরে একবার একজন ভক্ত থাকতে আসেন। আমাদের দুরবস্থা দেখে তিনি সাধুসেবার জন্য একটি মোটা অঙ্কের টাকা উৎসর্গ করে যান। তারপরই কেবল যেসব সাধু আমাদের এখানে এসে থাকতে চাইতেন, তাঁদের স্বাগত জানাতে পারতাম। এমনিতে আমাদের আহার্যের মান ছিল খুবই খারাপ। কল্যাণ মহারাজ কিন্তু এসব গ্রাহ্যই করতেন না—আমাদের সকলের সঙ্গে তিনিও সমানে কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। [ক্রমশ] (তিন)

* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়। —সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ আশ্বিন ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**স্বামী অভেদানন্দ** ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ২১ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (৭ অক্টোবর ২০০৪) **স্বামী অখণ্ডানন্দ** ভাদ্র অমাবস্যা ২৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (১৪ অক্টোবর ২০০৪)
পূজাতিথি-কৃত্য	ঃ	**মহালয়া** ভাদ্র অমাবস্যা ২৭ আশ্বিন, বুধবার (১৩ অক্টোবর ২০০৪)
একাদশী-তিথি	ঃ	৮, ২৪ আশ্বিন শুক্রবার, রবিবার (২৪ সেপ্টেম্বর, ১০ অক্টোবর ২০০৪)

কবিতা

শ্রীশ্রীসারদা-প্রশস্তি

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

বঙ্গে যেদিন করুণা-প্লাবনে ভাসালে দেবী সারদামণি।
গাইল সবে সে কী আনন্দে, আনন্দময়ীর প্রেম-আগমনী॥
ঘোষিল জগতে নবীন আলোতে সারদা-রূপে বেদ-মূরতি।
তাপদগ্ধ অভয় চিত্তে লভিল শরণ শকতি-ভকতি॥
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মনের গরিমা-গ্লানি।
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-ঘরনি, দাও হে স্মরণে মরম-বাণী॥

পঞ্চতপায় বিজয়িনী তুমি, সুপ্ত মনে দিলে নবশিক্ষা।
নিখিল মানবে করিয়া কৃপা দিয়াছ জগতে ত্যাগের দীক্ষা॥
তোমার দিব্য জ্যোতির ধারায় মলিন যত গ্রহ-তারা-শশী।
বিশ্বজননী শ্যামানন্দিনী প্রচারিলে মাতৃভাব দিবানিশি॥
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মনের গরিমা-গ্লানি।
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-ঘরনি, দাও হে স্মরণে মরম-বাণী॥

শ্যামের বাঁশি

হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশরী বাজাও শ্যামরায়।
যে-বাঁশি শুনিয়া রাধা ঠেলিয়া সকল বাধা
উন্মাদিনী সম ধায়॥

শুনিতে মোহন বাঁশি এ শ্রবণ অভিলাষী
হেরিতে সে-শ্যামরূপ দু-নয়ন উপবাসী
এ অঙ্গ মাখিয়া ধুলি মুখে 'হরি হরি' বলি
ব্রজভূমে লুটাইতে চায়॥

পথে পথে ঘুরে মরি কোথা সে-বৃন্দাবন
বল নাথ কত দূরে তব লীলা-নিকেতন
ডাক আজি নাম ধরি সে-সুরে নিশানা করি
প্রাণ মোর যেন ছুটে যায়॥

তোমার বিরহ নাথ আর না সহিতে পারি
হৃদয় আকুল অতি নয়নে ঝরিছে বারি
শুনি সে-বাঁশির সুর যেন গো সকল ছাড়ি
এজীবন চরণে লুটায়॥



মায়ের মুখ

রাজারঞ্জন দাশ

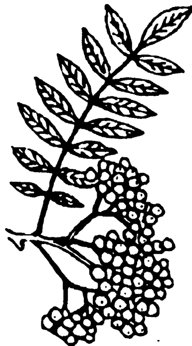
আকাশভরা মেঘের মাঝে
খুঁজি মায়ের মুখ
ঝাপসা চোখে, ব্যথার ছায়া
দুঃখভরা বুক।
কোথায় আমার মায়ের হাত?
কোথায় আঁচল খুঁট?
সবার চোখে স্বপ্ন আমার
মায়ের হাসিমুখ।



বন্দি

অপরূপ চক্রবর্তী

ঠাকুর আমার পাশের বাড়ির উঠানটাতে বসো
আমার ঘরের আবর্জনা এই উঠানে জড়ো।
জন জোটেনি ফেলে দেওয়ার, রোজ জমছে আরো
সখা আমার, রাগ করো না, কিয়ৎকাল বসো।
পঞ্চমুখের প্রদীপখানায় আগুন অবিরত
বায়ুর মুখে আগল খুলে তেল ঢেলেছি ভুলে,
আগুনমুখো অতৃপ্তিতে সব খেয়েছে ছলে
আলমারিতে লুকিয়ে রাখা ফর্দ ছিল যত;
এই সকালে তোমার জন্য শিউলি শিউলি চোখে
ঝাপসা কেন? ওগো তোমার শরীরখানা কই?
এবড়োখেবড়ো জমির মতো উলটোরকম বই,
পাঁচ পাগলে দ্বার আগলে ধাঁধাঁ লাগায় শেষে।



গর্জন বর্জন!

সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

যারা ঐ ভাঙছে তোকে শাবলে আর কুড়ালে,
তোরও পিঠ যাচ্ছে বেঁকে সারাটা দিন ফুরালে,
যেন তুই কলুর বলদ, চাবুকেই রোজ ফুরালে,
গতরে দুবো গজায়, মনিবের হাড় জুড়ালে।

একবার পিঠ বাঁকা তুই ছিঁড়ে ফেল অলস আসন
প্রতিদিন ভয়ের সাথে যোঝা এই অনুশাসন
ডাঁটিয়ে, দাবিয়ে রাখা চিরকাল দমন-ত্রাসন
প্রতিবাদে নে হাতিয়ে অমল এক পুনর্বাসন।

এ যে তোর অধিকারের ন্যূনতম পাওনা রুজি,
ভীরুতাই গ্রাসবে তোকে থাকলে শুধু মুখটা বুজি,
পুরুষকার জাগিয়ে তুলে রুখে দাঁড়া সোজাসুজি,
শয়তান খুঁজবে নরক, থাকবেই গর্ত খুঁজি।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নির নিকট প্রার্থনা

অনুবাদক : কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি॥
(১।১।৭)

রাজন্তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে॥
(১।১।৮)

ইমং স্তোমমর্হতে
জাতবেদসে রথমিব
সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য
সংসদ্যগ্নে সখ্যে
মা রিষামা বয়ং তব॥
(১।৯৪।১)

ত্বয়া হ্যগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো
মিত্রঃ শাশদ্রে
অর্যমা সুদানবঃ।
যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা
বিভুররান্ন নেমিঃ
পরিভূরজায়থাঃ॥
(১।১৪১।৯)

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে
নম উক্তিং বিধেম॥
(১।১৮৯।১)

অগ্নি[১]! তোমারে প্রণাম জানাই
দিবাভাগে রজনিতে;
তোমার মহিমা হৃদয়ে হৃদয়ে
অনুমান করে নিতে।

তুমি রক্ষক যজ্ঞকর্মে
বিতরণ কর আলো,
গোপামৃতের স্পর্শে তোমার
হৃদয়ের ধন ঢালো।

সপ্তাশ্বের টানা রথে তুমি
বিশ্বভুবন জান
আমরা জানিব বন্ধু তোমারে—
সেই সুবুদ্ধি আন।
সেই শুভবোধ—বন্ধু, তোমার
হলে অঙ্গের সাথি
সব হিংসার ঊর্ধ্বে রহিয়া
সুখে কেটে যাবে রাতি॥

অগ্নি! তোমার কৃপায় বরুণ[২]
আপনার ব্রত-পাশে
অর্যমা[৩] আসে, করে যায় দান,
মিত্র[৪] আঁধার নাশে।
রথের নেমিতে ঢাকা থাকে পাখি—
তেমনি ঢেকেছে ধরণি
বিশ্বাত্মক! তোমারই কৃপায়
চিনেছি আপন সরণি॥

হে দীপ্তিমান! সব প্রজ্ঞান
তব করতলগত,
তাই বারবার মিনতি আমার
রাখ পদে অবনত।
কুটিল জটিল পাপের ওধারে
কোন্ সুপথের বাণী
তাই এনে দিবে কোন একদিন—
এই মনে মনে জানি॥

---

১ ঋগ্বেদের তিন দেবতা (অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য)—নিরুক্তকার যাস্কের মত। ভূলোকের দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষের দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য।

২ বরুণ—রাত

৩ অর্যমা—উভয়োর্মধ্যবর্তী দেব : দিন-রাত্রির মধ্যবর্তী দেবতা।—সায়ন

৪ মিত্র—দিন [অদিতি (অনন্ত আকাশ)-র ৮ পুত্র : ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান।]

আক্ষেপ

মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস

ডাকার মতো ডাকতে
কি আর পারি।
ডাকি তখন, যখন আমি
ঘোর বিপদে পড়ি॥

ঘটা করে তোকে সাজাই
পূজি চরণ রক্ত 'জবা'ই
শাস্ত্রমতে লোকদেখানো
মন্ত্র দুটি পড়ি॥

সংসারেতে কর্ম করি
লাভালাভের মোহে
সময় যে যায় জলের মতো
শুধুই নেচে গেয়ে॥

সুখের দিনে থাকি ভুলে
আমি যে তোর এমনি ছেলে
দুখ পেলে মা, সুখের আশে
'মা' 'মা' 'মা' শুধু করি॥



হৃদয় খোঁজে

মোহিত চক্রবর্তী

হৃদয় খোঁজে
আত্মত্যাগের
মুক্তি নয়,
সিদ্ধিলাভের

সেই সাধনার বাণী,
অনন্ত ভুবন—
সেবাব্রতেই ধ্যানী
পাবে নিমন্ত্রণ।

তুচ্ছতাকে
রিক্ততার
হৃদয়েরই
অনন্তের

বিলীন করাই ধ্যান—
অলোক ইশারায়,
অনন্য সম্মান
গহীন সত্তায়।

স্বার্থ হতে
ভুবনখানি
সাহস হোক
শ্রদ্ধা-ভক্তি

স্বার্থহীনতার
জাগুক হৃদয়মাঝে,
তারই অলঙ্কার—
থাকুক নিত্য কাজে।

নরনারায়ণ
হৃদয় খোঁজে

এই সাধনার বাণী
বিশ্ব ভুবনখানি।

নি ব ন্ধ

হিরোশিমার হিবাকুশার ডায়েরি*

চিরশ্রী ব্যানার্জি

৬ আগস্ট ১৯৪৬। আমেরিকার ঘড়িতে তখন ভোররাত দুটো বেজে সাতাশ মিনিট। ক্যাপ্টেন কোলোনেল টিব্বেট তার মায়ের নামাঙ্কিত 'ইনোলা গে' প্লেনটিকে রানওয়েতে নিয়ে আসে। তার ধূসর রঙের ব্রোঞ্জের ছুঁচালো মুখকে জাপানের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ঠিক দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্লেনটি উড়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে—হিরোশিমার দিকে।



বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে — আণবিক বোমা

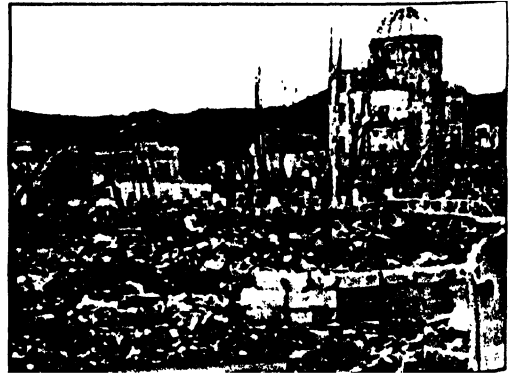
পশ্চিম জাপানের সুন্দর শহর হিরোশিমা (Hiroshima)। চারদিকের নিচু পাহাড় ও ঢুকে যাওয়া সামুদ্রিক জলে ঘেরা তার রূপ মনোমহী। আর রয়েছে চির প্রবাহিতা ওটা নদী ও তার সপ্তধারা শাখাপ্রশাখার বিচরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন সকাল আটটা পনেরো। বোমাবিধ্বস্ত জাপানের নিরঙ্কুশ শহর হিরোশিমায় তখন সবে 'অল ক্লিয়ার'-এর সঙ্কেত বাঁশি বেজেছে। পরিবারে জলযোগের ব্যবস্থা চলছে। শিশুরা স্কুলের পথে রওনা দিয়েছে। বয়স্করা 'Volunteer Demolition Squads'-এর কাজে শহরের কেন্দ্রস্থলে একত্রিত হয়েছে। পুরুষ ও মহিলারা অফিসের কাজে ব্যস্ত ও হিরোশিমার বিস্তৃত আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যদল তাদের দিনারম্ভের প্রাক্কালে কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সমস্ত শহরের মানুষ যখন কর্মজীবনের তুঙ্গে, সেই মুহূর্তে হিরোশিমার শুভ্র আকাশে হঠাৎ দেখা যায় 'ইনোলা গে'র অভিশপ্ত বিমানটিকে। তার ছায়া এসে পড়ে নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ কিছু সরল মানুষের ওপর। সবার অলক্ষ্যে ঠিক আটটা বেজে ষোল মিনিট আট সেকেণ্ডে ঘটে পৃথিবীর জনবহুল অংশে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ।

* ৬ আগস্ট 'হিরোশিমা ডে' স্মরণে

চোখকে অন্ধ করে দেওয়ার মতো একঝলক আলো, প্রাণীকে ভস্মীভূত করে দেওয়ার মতো এক অগ্নিপরশ (এক পলকে দশ লক্ষ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা) ও আকাশে মাশরুমের আকৃতির এক করালগ্রাসী বিশালকায় ছাতার বিস্তার হয়, যার ভয়ঙ্কর পুচ্ছ টর্নেডোর গতিতে পাক খেয়ে খেয়ে ধেয়ে চলতে থাকে। সেই 'flash bomb' (যাকে জাপানিরা 'পিকাডন' বলে) মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমার নির্মল আকাশে, ঠিক শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে, সাড়ে তেরো হাজার টন টি. এন. টি.-র গরল শক্তি উদ্গার করে।

এক পলকে দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। যারা বিস্ফোরণ-বিন্দুর (hypocenter) কাছে ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয় বা জ্বলন্ত পথের মাঝে অনল-পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। আর যারা বিস্ফোরণ-বিন্দু থেকে এক-দেড় মাইল পরিধির মধ্যে ছিল, তারা জ্বলন্ত আগুনের হলকা ও তীব্রতম পারমাণবিক রশ্মির দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সেসময় বেঁচে থাকা মানুষজন পরবর্তী কালে 'হিবাকুশা' (hibakusha) অর্থাৎ পরমাণু-আক্রান্ত জনগণের আখ্যা পায়। তারা মুহূর্তের অবস্থান্তরকে দেখে বুঝে উঠতে পারে না যে, আসলে কী ঘটছে। ঝলসানো জামাকাপড়ে, অর্ধনগ্ন অবস্থায়, পুড়ে ও ঝুলে যাওয়া চামড়ার শরীরে এবং চেনারও অতীত গলে যাওয়া মুখাকৃতি নিয়ে তারা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। একপলকে স্বর্গপুরী পরিণত হয় নরকে। অল্প কয়েকজন তাদের শেষ শক্তি সঞ্চয় করে শহরের পুবদিকে হিজিয়ামা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করে। সেখান থেকে তারা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে তাদের হিরোশিমা শহরের দিকে। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হিরোশিমা উধাও!



বিস্ফোরণের পরিণাম : ঘৃণ্য পাশবিকতার পরিহাস

নিক্ষিপ্ত বোমার ভয়ঙ্করী ভূকম্পনের তরঙ্গ প্রথমে বহির্মুখী বৃত্তাকারে ও পরবর্তী সময়ে অন্তর্মুখী হয়ে বিস্ফোরণ-কেন্দ্রের দিকে বেগে ধাবিত হলে তীব্রতম ঘূর্ণিঝড়ের সূত্রপাত করে।

ফলে আট কিলোমিটার পরিধির প্রায় সমস্ত বাড়ি তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ হয় এবং অনেকের বাড়ির ছাদ খুলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই মর্মন্তুদ হাহাকার ও মুহূর্তে বিনষ্ট হওয়া হিরোশিমার হিসাব আছে। আছে বহু মর্মস্পর্শী ছবি। বোমা নিক্ষেপকালে আমেরিকার নিজস্ব বিমান থেকে তোলা ও আরো বহু উৎসাহী মানুষজনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়ে সেগুলি আজ অমরত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এই ধ্বংসলীলা ও অমানবিক ক্ষতিই পারমাণবিক বোমার শেষকথা নয়। হিরোশিমার নির্মল আকাশে ও স্নিগ্ধ বাতাসে ৬ আগস্ট আমেরিকা যে বিষের পেয়ালা নিঃশেষ করে ঢেলেছিল, তার ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে আজও মুক্ত হয়নি সাধারণ মানুষজন। দীর্ঘ আটান্ন বছর পরেও বংশপরম্পরায় জন্মানো হিবাকুশার রক্তকণিকার অণুতে লুকানো পরমাণু-বিষের প্রক্রিয়া কখন কিভাবে দেখা দেবে তা কেউ জানে না।

সেই অগণিত হিবাকুশাদের অসংখ্য অলিখিত হৃদয়স্পর্শী কাহিনী ছড়িয়ে আছে আজকের গর্বিত আধুনিক হিরোশিমার আকাশে বাতাসে। সেই শোকবিস্মৃত প্রাণবন্ত শহরের একাংশে 'শান্তি উদ্যান'-এ 'Memorial Mound for the Unknown Dead' নামের প্রাচীন মাটির বাড়ির একটি সুন্দর স্তূপ বানানো হয়েছে। এখানে সেইসব হিবাকুশাদের নামের তালিকা রয়েছে, যারা বোমায় জীবিত থেকেও পরবর্তী কালে তার জীবননাশী বিষাক্ত গরলে একে একে প্রাণ হারিয়েছে। আজও কোন হিবাকুশার মৃত্যু হলে তার নাম তালিকাভুক্ত হয়।

কয়েকজন হিবাকুশার জীবনবার্তা এইরকম—

(১) হিরোশিমার 'শান্তি উদ্যান'-এ বারো বছরের বালিকা সাদাকো সাসাকির (যাকে 'The Anne Frank of Hiroshima' বলে) মৃত্যুতে ১৯৫৮ সালে 'Children's Monument' নির্মিত হয়। বোমানিক্ষেপের দীর্ঘ দশ বছর পর তার মৃত্যু হয়েছিল দীর্ঘকালীন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে। যখন তার বয়স সবেমাত্র দুই, তখন তার বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মুহূর্তে সে জলখাবারের আসন থেকে ঘরের কোণে ছিটকে পড়ে। বাহ্যত তার কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি ভেবে তার মা তাকে ও তার বড় দাদাকে নিয়ে ওটা নদীর দিকে পালিয়ে যায়। সেখানে বাঁধা একটি নৌকায় তারা নদী পারাপার করে এবং সারাদিনে বারে বারে তেজস্ক্রিয় কালো বৃষ্টিতে ভিজে যায়।

বারো বছর বয়স অবধি সাদাকো স্বাস্থ্যবতী সুন্দর বালিকার আকারে বেড়ে ওঠে। যে-বছর সে তার স্কুলে সেরা দৌড়বীরের সম্মান পেয়েছিল, সেবার তাকে ভয়ঙ্কর লিউকোমিয়ায় ধরে। শোনা যায়, সে খুবই সাহসী মেয়ে ছিল। তার মাকে সে বলেছিলঃ "মা, আমি মরতে চাই না।" হাসপাতালে থাকাকালীন তার সঙ্গিনীরা দেখা করতে এলে সে তাদের সঙ্গে হাসত, গান করত। প্রতিদিনের শ্বেতরক্তকণিকার তালিকা সে লুকিয়ে তার বিছানার তলায় রেখে দিত আর সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন একটা করে paper crane (কাগজের তৈরি সারস) বানিয়ে রাখত।

জাপানি পৌরাণিক কথায় রয়েছে, একটি ক্রেন একবছর বাঁচে আর কেউ যদি একহাজার পেপার ক্রেন তৈরি করতে পারে (প্রাচীন জাপানি হস্তশিল্প যাকে 'ওরিগামি' বলে), তাহলে সে রোগমুক্ত হবে। কিন্তু সাদাকো তার সকল শক্তি, সময় ও কর্মক্ষমতা সঞ্চয় করেও হাজার ক্রেন তৈরির কাজ শেষ করতে পারল না। ২৫ অক্টোবর ১৯৫৫, যখন সে নয়শো চৌষট্টিটি ক্রেন তৈরি করতে পেরেছে, তখনি তার মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট কটি ক্রেন তার বন্ধুরা তৈরি করে তার কফিনে বিছিয়ে দেয়। শোনা যায়, পেপার ক্রেন তৈরির সময় সাদাকো একটি গান গাইত, যার অর্থ—আমি তোমার পাখায় শান্তিবার্তা লিখে দেব আর তুমি উড়ে যাবে। ("I will write peace on your wings and you will fly.")



চিলড্রেন্স মনুমেন্ট

পরে সাদাকোর ক্লাসের বন্ধুদের প্রচেষ্টায় ও 'National School Campaign'-এর মাধ্যমে তার নামে একটি মনুমেন্ট তৈরি হয়, যা বোমায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ছেলেমেয়েদের সম্মানিত করবে। সেই স্মৃতিস্মারকের নিচে লেখা আছেঃ "This is our cry, this is our prayer: Peace in the world!"

(২) এবারের কাহিনী রোয়োকো হাতসুয়ার। তেত্রিশ বছরের এই সুন্দরী ললনা ছিল মিতভাষিণী, সাহিত্যানুরাগিণী এবং কবিতা পাঠের প্রতি বিশেষ অনুরক্তা। ৬ আগস্টের

প্রাক্কালে সিটি হল-এর পিছনে 'Women's Brigade'-এর সঙ্গে সেও ফায়ার লাইন পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়েছিল। হঠাৎ এক পলকের জন্য তার মুখের ওপর প্রায় দশ লক্ষ জোরালো আলোর ঝলকানি বিদ্যুৎবহ্নির মতো জ্বলে ওঠে। পরক্ষণেই সে জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরে পেলে সে তার একদা পরিচিত শহরকে চিনে উঠতে পারে না। বিলুপ্ত হিরোশিমার একটি চেনা রেললাইনকে কোনরকমে আশ্রয় করে সে বাড়ির পথে রওনা হয়। তার স্বামী ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া সোয়াবিন কারখানার পিছনে অর্ধমৃতা স্ত্রীর জন্য একটা তাঁবু খাটায়। তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল ও ফুলে যাওয়া মুখ থেকে চামড়া ঝুলে পড়েছিল। কিন্তু তার স্বামীর কাছে রান্নার তেল আর ময়দার প্রলেপ ব্যতীত সেই জ্বলন্ত শরীরে দেওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না।



অশ্রুসিক্ত স্মৃতির বেদি 'সেনোটাফ'

। শাশুড়ি হিরোশিমা নিঃশেষ হয়েছে শুনে সত্বর টোকিও থেকে সেখানে চলে আসেন। তিনি তাঁর পুত্র-পুত্রবধূর শেষকৃত্য করার কথা ভেবেই সেখানে আসেন এবং তাদের জীবিত দেখে বিস্মিত হন। কিন্তু তবু দেরি হয়ে গিয়েছিল। রোয়োকোর চুল পড়ে যেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সে ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয় ও বমি করতে থাকে। তার শাশুড়িকে পেয়ে সে ছোট্ট মেয়ের মতো কোল আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়। সে তার স্বামীকে কোন সন্তান দিয়ে যেতে পারল না বলে শাশুড়ির কাছে ক্ষমাভিক্ষা চায়। তারপর তাঁরই কোলে একটি বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো ঢলে পড়ে।

রোয়োকোর শাশুড়ি নিজে শক্ত মনের মহিলা ছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ ও হিরোশিমার অবশিষ্ট মানুষজনের অসীম কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। ফলে স্বস্থানে না ফিরে তিনি কাছেই পবিত্র দ্বীপ মিয়াজিমার একটি পাহাড়ি গুহায় তিন বছর থেকে নিজেকে শুদ্ধ করতে মনস্থ করেন। ক্রমে তিনি তপস্বিনী হয়ে যান, যাঁকে লোকে 'Yama-no-obaasan' (The grandma of the mountain) নামে ডাকত। বিশিষ্ট পাহাড়ি শিকড়, ওষধি ও তথাকথিত দিব্যশক্তির সাহায্যে তিনি বোমাপীড়িত বহু মানুষকে কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেন।

(৩) ১৯৫৬ সালে তৈরি হিরোশিমার 'A Bomb Hospital'-এর ১৭০টি শয্যা সারা বছরই হিবাকুশাদের আনাগোনায় ভর্তি থাকে। অগণিতবার যাওয়ার ফলে বহু মানুষের কাছে এটা আজ তাদের দ্বিতীয় বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হাসপাতালে নিঃশুল্ক চিকিৎসার অধিকারী তারাই—যারা বোমানিক্ষেপের দিন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং যারা পরবর্তী দুসপ্তাহের মধ্যে তাদের প্রিয়জনের খোঁজে সেখানে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার কবলে পড়ে।

শিগিয়ো তাগুচি সেই হাসপাতালেরই একজন যুবক হিবাকুশা, যাকে ক্রমান্বয়ে বহুবার বাম কনুইয়ের অপারেশন করাতে হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের পরে কয়েক মাসের মধ্যে তার পরিবারের সকলে দীর্ঘকালীন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে একে একে প্রাণ হারায়। তার দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কনুই অকেজো হয়ে যায়। সে আমেরিকানদের ঘৃণা করত। মদ্যপান করে মাতাল হয়ে সে একটা ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াত আমেরিকানদের প্রাণ নেওয়ার জন্য। তার এক বান্ধবী সেই ছুরি কেড়ে নিয়ে তাকে এই নৃশংস আগ্রহ থেকে বিরত করে এবং অতীতের শোক ভুলে ভবিষ্যতের প্রতি আগ্রহী হতে বলে।

তিন ছেলের বাবা তাগুচি আজ একটি স্কাউট ট্রুপের অধিনায়ক এবং কার্যসূত্রে আমেরিকানদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে থাকে। বড় রেয়ন কোম্পানিতে কাজ করে সে আজও মনে করে যে, ক্রমান্বয়িক অসুস্থতার ফলে তার মতো হিবাকুশা সাধারণ মানুষের থেকে সবসময় এক ধাপ পিছিয়ে থাকে, শত চেষ্টা করেও চাকুরি বা জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

৬ আগস্টের সঙ্গে শিগিয়ো তাগুচির এক মর্মন্তুদ কাহিনী জড়িয়ে আছে। তার বয়স তখন ২৩। ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। ৬ আগস্টের সকাল পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারছিল না। কারণ, সেই দিন পাশের বাড়ির একটি মেয়ের জন্মদিনে তার আমন্ত্রণ ছিল। তাকে সে আগেই চিনত। তাই ৬ আগস্ট মেয়েটির জন্মদিনের সকালে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিল। এমন সময় সে আকাশ থেকে গোলাপী বলের মতো কিছু পড়তে দেখে। হঠাৎই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই বুঝতে পারে, সে বাড়ির তলায় চাপা পড়েছে।

তার মা তাকে কোনরকমে টেনে বের করে সেখান থেকে পালাতে তৎপর হন। চারদিক থেকে তখন বহ্নিশিখা ঘিরে ফেলেছে। বাগানের পথ ধরে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে হঠাৎ দেখে, তার সেই প্রতিবেশিনী একটি ভারী কাঠের গুঁড়ির তলায়

আহত অবস্থায় আটকে রয়েছে এবং তার মা তাকে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। নিজের প্রাণহানির কথা ভুলে সে সত্বর মেয়েটিকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। মেয়েটির তখনো জ্ঞান ছিল, তাই সে তক্ষুণি তার মা ও তাগুচিকে সে-স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করে। কারণ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আগুন তখন তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছিল। আলকাতরার মতো কালো পারমাণবিক বৃষ্টির মাঝে তারা পালাতে বাধ্য হয়।



মানবতার উপর চাবুক

বেশ কিছুদিন পর তাগুচি তার পুরনো বাড়ি দেখতে এসে সেই চাপাপড়া তরুণীর ভস্মীভূত অস্থিসম্ভার দেখতে পায়। তার মা পাগলিনীর মতো তার সেই ৬ আগস্টের অপূর্ণ জন্মদিনের কথা আওড়াতে থাকে।

(৪) সবশেষে আসা যাক ইচিরো মোরিতাকির কথায়, যাঁর আরেক নাম 'Human Reactor'। যখনি পৃথিবীর কোন প্রান্তে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়, তখনি মোরিতাকিকে হিরোশিমার নতুন তৈরি 'শান্তি উদ্যান'-এর বেদির সামনে বসে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। যখন তিনি এই নীরব বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। আজ তাঁর সঙ্গে সেই নিশ্চল নির্বাক প্রতিবাদে ছাত্র, গৃহবধূ, কর্মরত মানুষ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর দলকে একত্রিত হতে দেখা যায়।

হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মোরিতাকি সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা বলেন, যে তাঁকে বহুক্ষণ এভাবে বসে থাকতে দেখে একটি সরল প্রশ্ন করেছিল : "আপনি কি শুধু বসে থেকে একে থামাতে পারবেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "A chain reaction of spiritual atoms must defeat a chain reaction of material atoms."

বোমানিক্ষেপের কালে মোরিতাকি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর ডান চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকেই তিনি হিবাকুশাদের শারীরিক উন্নতি ও বোমায় মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য জাতীয় অনুদান সংগ্রহ করে বহু কাজ করছেন।

যুগে যুগে এই পৃথিবীর বুকে বহু ভয়ঙ্কর যুদ্ধের খেলা চলেছে ও বোমাবর্ষণের আতসবাজিতে বিনষ্ট হয়েছে বহু মানুষের অমূল্য প্রাণ। শুধু পরমাণু বোমায় মৃত মানুষের রক্তবীজাণু থেকেই জন্ম নিয়েছে এক চির অভিশপ্ত প্রজন্ম, যার আরেক নাম 'হিবাকুশা'। এই নতুন প্রজন্মে রয়েছে সেই হতভাগ্যের দল—যারা ৬ আগস্ট ক্রমান্বয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল, যারা পারমাণবিক বিকিরণের প্রভাবে পরবর্তী কালে প্রাণ হারায়, যারা আজও একে একে শেষ হয়ে যাচ্ছে, যারা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করছে, যারা তাদের সমস্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে আজ বিপর্যস্ত ও একা এবং যারা বংশানুক্রমে এই সর্বনাশী বীজাণুকে ধারণ করে এক বিকৃত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনায় আতঙ্কে কাল অতিবাহিত করে চলেছে। হিবাকুশার দল (উভয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের চতুর্থ প্রজন্ম)—জীবনের পথে সমস্ত ব্যাপারে সাধারণ মানুষের থেকে এক পা পিছিয়ে রয়েছে, তাই সকলের কাছে তারা নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখে। 'চির আতঙ্ক' তাদের জীবনবিমুখ জীবনের পাথেয়। তারা সর্বদা এক অদৃশ্য মৃত্যুর হাতছানিকে দেখে ভয় পায়। তখন বেঁচে যাওয়া হিবাকুশা তার 'অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী মৃত্যু'র জন্য দিন গোনে। এখনো তাদের কোন রোগে ধরলে (হোক বা না হোক) তারা সেই একই কারণ মনে করে।



প্রতিবাদমুখর হিবাকুশার দল

যুদ্ধের গ্লানিকে মুছে ফেলে আজকের জাপান আবার উন্নতির শিখরে। পারমাণবিক বোমায় বিলুপ্ত হিরোশিমাকে আজ তারা স্বর্গপুরীতে রূপায়িত করেছে। তারই এক প্রান্তে রয়েছে 'অ্যাটম বোম মেমোরিয়াল'। সমস্ত পৃথিবীর সহানুভূতিশীল দর্শনার্থীদের ভিড়ে উপচে পড়ে মেমোরিয়ালের প্রাঙ্গণ। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস ও পাখির প্রথম কূজনের লগ্নে আজও একে একে বহু হিবাকুশা এসে একত্রিত হয় সেই স্মৃতিবেদির কাছে। নতজানু হয়ে তারা করজোড়ে প্রার্থনা করে। সে কি নরকজীবনবাহী মৃত হিবাকুশাদের উদ্দেশে, না কি ভবিষ্যৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণ প্রতিরোধের প্রত্যাশায়? ❑

উৎস : হিরোসিমা পিস (শান্তি) মিউজিয়ামে রক্ষিত তথ্য।

'কথামৃত' পরিচয় : ছবি ও ছন্দে





বহুরূপী

এক বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজে
এল বাবুদের ভিড়ে,
বাবুরা একটি টাকা দিতে গেলে
'উঁহু' বলে গেল ফিরে।

খানিক বাদেই গা-হাত-পা ধুয়ে
এসে বাবুদের কাছে
বলে, কৈ দেখি, এইবার দাও,
দেখি তো ক'টাকা আছে।
বাবুরা বলেন, তখন নিলি না,
এখন যে চাস তুই?
বহুরূপী বলে, ত্যাগী সাধু সেজে
টাকা কি করে বা ছুঁই?

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধিমত্তা



কলকাতায় বিশাল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসেছে। নাম 'সিরাপিস'। নরেন্দ্রনাথের বন্ধুরা বলল, যাবে দেখতে। কিন্তু চৌরঙ্গীতে 'বাবু'র সই ছাড়া গেটপাস পাওয়া যাবে না। এদিকে দরখাস্ত নিয়ে নরেন্দ্র ইংরেজ সাহেবের কাছে যেতে চাইলে দারোয়ান দোতলায় উঠতেই দিল না। নরেন দেখল একটা ঘরে সব মানুষ লাইন দিয়ে ঢুকছে, আর খানিক পরে হাতের দরখাস্তে সই করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে এল নরেন। দেখল পিছন দিকে একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। চুপি চুপি উঠে গিয়ে সে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিকে সাহেব তো মাথা নিচু করে কেবল সই করে যাচ্ছে। যথাসময়ে নরেন্দ্র দরখাস্ত বাড়িয়ে দিল। সই হয়ে গেল। এবার হৈহৈ। প্রধান সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দরখাস্তটা দারোয়ানের নাকের ওপর ঘুরিয়ে নরেন মুচকি হাসল। দারোয়ান বলল : "তুম ক্যায়সা উপর গয়া থা?" নরেন বলল : "হাম জাদু জানতা।"

ছবিগুলি এঁকেছেন সৌরীশ মিত্র

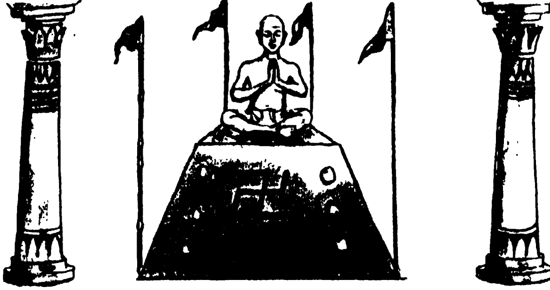


আদি শঙ্করাচার্য (৩৫)

চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

দৈববাণী শুনে আচার্য শঙ্কর অন্তরে এক দিব্য আনন্দ অনুভব করলেন। ধীরপদে নতশিরে তিনি সারদাপীঠে আরোহণ করে দেবী সারদার স্তব করতে লাগলেন। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মুখরিত হলো চারদিক।

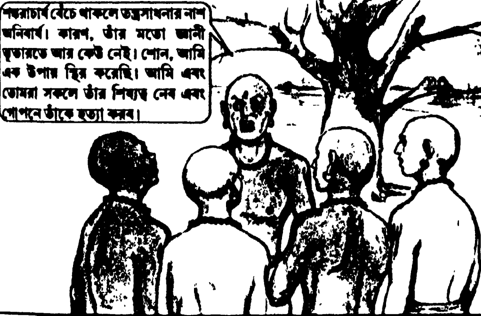


সারা ভারতবর্ষে এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। যে মহান অদ্বৈতবাদের কথা আচার্য শঙ্কর সর্বত্র প্রচার করে আসছিলেন, এতদিনে তা সম্পূর্ণতা পেল। বুদ্ধদেবের মহৎ আদর্শ ভুলে মানুষ বিপথগামী হয়েছিল, তাকে সত্যের আলোতে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আচার্য শঙ্কর।

আচার্য এবার এলেন শ্রীনগরে। পর্বতের পাদদেশে তখন বহু সাধক দেবী ভগবতীর সাধনা করছেন। সেখানে এসে আচার্যের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'আনন্দলহরী'—এক অপূর্ব মাতৃবন্দনা।



এরপর নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, মিথিলা, নালন্দা, গয়া, বঙ্গদেশ হয়ে আচার্য অসমে এলেন। কিছুদিন পর বৌদ্ধ-প্রভাবিত তান্ত্রিক, অভিনব গুপ্ত আচার্যকে বিচারে আহ্বান করলেন। তুমুল বিচারের পর তিনি আচার্যের কাছে পরাজিত হলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন অভিনব গুপ্ত।



কিছুদিনের মধ্যেই আচার্যের দেহশরীরে সাংঘাতিক ঘা হলো। অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে অবিরত পুঁজ ও রক্ত বেরোতে লাগল। কিন্তু যিনি সকলকে মহান অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেন, তিনি কি এতে কাতর হবেন? আচার্য আগের মতোই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মানুষকে বেদান্তের উপদেশ দিতে লাগলেন।



আচার্য শঙ্করের মন তাঁর নশ্বর দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না সত্য, শত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আনন্দে থাকতেন সত্য; কিন্তু শরীরের যা ধর্ম, তা তো একদিন প্রকাশ পাবেই। তিনি একদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর শিষ্যরা কখনো তাঁকে এমন অসুস্থ দেখেননি। উদ্বিগ্ন পদ্মপাদ এগিয়ে এলেন।





চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

বি জ্ঞা ন

মানবকল্যাণে সৌরশক্তি

মমতা দত্ত

'ভাগবত'-এ উল্লিখিত অবধূতের চব্বিশজন গুরুর অন্যতম সূর্যদেব ছিলেন তাঁর অষ্টম গুরু। তিনি আমাদেরও গুরু। গুরু যেমন কৃপাবারি বর্ষণ করে শিষ্যকে সদাসর্বদা রক্ষা করেন, সূর্যও সেরকম তার তেজঃপুঞ্জ ও আলোকমালা বর্ষণ করে ধরিত্রীর বুক থেকে অনেক পাপ অর্থাৎ দূষিত জীবাণু হরণ করে আমাদের রক্ষা করেন। সূর্য পৃথিবীর বিষাক্ত জল শোষণ করে আবার পৃথিবীকেই বিশুদ্ধ জল প্রদান করেন। সূর্য শুধু যে গাছপালাদেরই কিরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন তা নয়, সূর্য তার কিরণ দিয়ে মানুষকেও সরাসরি খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। এ-নিবন্ধ তারই এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

দিগন্তব্যাপী ঘন কালো মেঘে যখন আকাশ ছেয়ে যায়, যখন দিবার মধ্যাহ্নেই মধ্যরাত্রি নেমে আসে—ঠিক তখনি আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণে সৃষ্ট বিদ্যুতের ঝলক দেখে মানুষ চমকে যায়। এভাবেই মানুষ প্রথম বিদ্যুৎশক্তির পরিচয় পায়। পৃথিবীর বুকে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার দূর করতে মানবকল্যাণে যে আকাশের বিদ্যুৎ সহায়ক হবে, তা মানুষ একদিন উপলব্ধি করে। তারপর আকাশ থেকে বিদ্যুৎকে ধরায় ধরার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া শুরু হয় সেদিন থেকে, যেদিন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে ধরার আঙিনায় আনার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর নানা পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলবিদুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, খনিজ বিদ্যুৎ, গ্যাসীয় বিদ্যুৎ, এমনকি তৈলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়েছে। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বহু দেশে এখনো বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় মূলত কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পরমাণু শক্তির সাহায্যে। কিন্তু প্রবল জনসংখ্যার চাপ এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক শক্তির ভাণ্ডার থেকে নিয়ত যে-ব্যয় হয়ে চলেছে, সেই অভাব পূরণ করতে বহু কোটি বছর লেগে যাবে। আবার পরমাণু চুল্লি থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এবং তা রাখারও সমস্যা।

সূর্যের উত্তাপ বা শক্তি থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে—একথা বিশ্বাস করা দূরে থাক, একসময় কেউ তা ভাবতেও পারত না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা সৌরশক্তিকে আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছে। যে-সৌরশক্তি এতদিন বাড়ির বাইরে মাঠে-ঘাটে উপেক্ষিত ছিল, সেই শক্তিই এখন আমাদের রান্নার জ্বালানি শক্তি হিসাবে গৃহে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদ্‌গণ চিরাচরিত ও অচিরাচরিতের (অপ্রচলিত) সমন্বয়ে এভাবে নতুন সম্ভাবনাময় শক্তির বিকাশের দিক উন্মোচন করেছেন। চিরস্থায়ীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুননবীকরণযোগ্য বিকল্প শক্তি এগিয়ে এসেছে। এবার একটু হিসাবের কথায় আসা যাক।



দুর্গাপুরের এনার্জি এডুকেশন পার্কে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট

২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা বার্ষিক ৮.৩%, গৃহস্থালিতে ১২.৮%, কৃষিতে ১২%, শিল্পে ৬.৭% ও বাণিজ্যে ৯.৮% হারে বাড়বে। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষে সৌরশক্তি, জলশক্তি এবং বায়ুশক্তি-সহ বিভিন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিকল্প শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। এগুলি থেকে ১ লক্ষ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে ভারতবর্ষ সক্ষম। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৯৯ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী এই সহস্রাব্দে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শক্তির অর্ধেকই আসবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উৎস থেকে। সেইসব উৎসগুলিকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'অপ্রচলিত শক্তি'। ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবে এধরনের উৎস। কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দহনজাত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্য 'গ্রিণহাউস' গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। যে-গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধরে রাখে, জ্বালানির জন্য তার নির্বিচার ছেদন পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে আনছে। বিশ্ব শক্তি পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫-এর মধ্যে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ১২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। 'ইন্টার গভর্ণমেন্টাল প্যানেল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর বিজ্ঞানীদের হিসাবে, এই প্রবণতা চলতে থাকলে এই সহস্রাব্দে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হবেই। এর ফলে আগামী ১০০ বছরে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রায় ১ থেকে ৩½ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে

যাবে। যাকে আমরা বলছি 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। সমুদ্রতলের উচ্চতা গড়ে ১৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার বাড়বে, ডুবিয়ে দেবে অনেক শহর ও দ্বীপরাষ্ট্র এবং জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনে ম্যালেরিয়া-সহ নানাবিধ রোগের প্রকোপ ভীষণভাবে বাড়বে। এর আভাস মিলছে এখনি।

সৌরশক্তি বিকল্প শক্তির একটি অন্যতম প্রধান উৎস। সূর্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন আলোককণিকা—যেমন গামা-রে, এক্স-রে, রেডিও তরঙ্গ, তাপ, অবলোহিত বা ইনফ্রা রেড রশ্মি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলি বেশির ভাগই আবহমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে মিশে যায় এবং পৃথিবীর উপরিভাগের (Stratosphere, Troposphere প্রভৃতি) ওজনস্তরগুলিতে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর কণাগুলি বাধা পেয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে তেমন ক্ষতি করতে পারে না। তবে সূর্যের আলো থেকে উত্তাপ পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। সূর্যের আলোক-শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করতে যে-যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে 'সৌর সংগ্রাহক' (Solar Collector) বলে। সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বৈজ্ঞানিকগণ জল গরম করা, পরিশ্রুত করা, শুষ্ক এবং ঘর গরম করার যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ৮ লক্ষ লিটার জল সৌরশক্তির সাহায্যে গরম হয় প্রধানত নানা হাসপাতাল, কারখানা, হোটেল এবং ক্লাবে। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিনা জ্বালানিতে, সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদকে অক্ষুণ্ণ রেখে কোন অসুবিধা ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ করা যায়।

সৌরশক্তি অফুরন্ত, শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে সৌরশক্তি ব্যবহারের অনেক সুবিধাও আছে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী অসম, মেঘালয়, মিজোরামকে বাদ দিলেও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য বছরে ভাল সূর্যালোক পায়। ১৯৭০-র দশকে সৌরশক্তি সম্পর্কে মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করলেও ১৯৮০-র দশক থেকে সারা বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে পরিবেশবিদ্, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্‌গণ সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছেন।

সময়সচেতন মানুষ সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে—যেমন সৌর সংগ্রাহক, সৌর কুকার, সৌর সেল, মোটর, পাম্প, রাস্তার আলো, সিগন্যাল প্রভৃতি। সম্প্রতি প্রবল তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'সোলার টুপি' বাজারে এসেছে। মাথার ওপরে ব্যাটারি কপালের ওপর পাখা, সৌরশক্তিতে ব্যাটারি চার্জ হয়ে পাখা ঘুরে ঘর্মাক্ত মানুষকে আরাম দিচ্ছে। সোলার ফটোভোল্টাইক সেলের প্রধান উপাদান সৌর আলোক। ১৯৫৪ সালে প্রথম সিলিকনের তৈরি সৌরকোষ তৈরি হয়। এগুলি থেকে মাত্র ১ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাই অনেকগুলি সৌরকোষকে একত্র করে 'মডিউল' তৈরি করা হয় এবং সৌরকোষের ক্ষমতা বাড়িয়ে মোটামুটি ১০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মডিউল পাওয়া যায়। অনেকগুলি মডিউলকে একত্রে জুড়ে 'Array' তৈরি করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যেতে পারে এবং এই মডিউলগুলিকে সৌরকোষের দিকে মুখ করে রাখলে সৌরকোষগুলি অধিক মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৭ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে সাগরদ্বীপ সকলের ওপরে স্থান পেয়েছে। কমলপুর গ্রামে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ২৬ কিলোওয়াটের এক সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া হয়েছে এবং সেটি প্রায় দ্বিগুণ করার চেষ্টাও চলছে। এছাড়া সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরে ডিজেল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। তবে বর্তমানে সৌরপ্যানেল বসিয়ে সাগরদ্বীপকে সৌরশক্তি ব্যবহারের নিরিখে এশিয়ার শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সভ্যতার প্রয়োজনে বিদ্যুতের আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু এখনো বহু গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পারেনি বলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৮০ হাজারের বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছায়নি। সর্বোপরি বিদ্যুৎ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানেও মাত্র ৩১ শতাংশ বাড়ি বিদ্যুতের আওতায় পড়েছে। কিন্তু দুর্গম জায়গায় যেখানে বিদ্যুতের পরিবাহী তার টানা সম্ভব নয়, সেইসকল জায়গাতেই বিকেন্দ্রীভূত শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। নবগঠিত 'রাজ্য গ্রামোন্নয়ন শক্তি উন্নয়ন নিগম'কে রাজ্য সরকার গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের দায়িত্ব দিয়েছে। এই উন্নয়ন নিগম কম পয়সায় সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে ঐসব গ্রামকে আলোকিত করবে। এছাড়া কম খরচে দরিদ্র জনগণের বাড়িতে রাজ্য সরকার 'লোকদীপ কুটির জ্যোতি' প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আবার 'হোমলাইটিং'-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে ২-৩ পয়েন্টের জন্য সৌরপ্যানেলও বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে খরচ অনেক কম হচ্ছে। কারণ বিদ্যুতের খুঁটি, তার চুরি, হুকিং, ট্যাপিং প্রভৃতি থাকছে না।

গ্রামীণ শক্তির আরেকটি উৎস বায়োগ্যাস। এটি একটি পরিচ্ছন্ন, দূষণহীন, ধোঁয়া ও ভুসামুক্ত জ্বালানি। এতে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ মিথেন আছে। বায়োগ্যাস মূলত 'গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট' নামে পরিচিত। গোবর, মানুষের মল ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে ডাইজেশন পদ্ধতিতে এই গ্যাস তৈরি হয়।

গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় নানা জৈব আবর্জনা থেকে জ্বালানি গ্যাস উৎপাদনে বেশ সাফল্যলাভ করা গেছে। এই সাফল্যের মূলে আছে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এই

ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে ১৫° থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপে ওজনভিত্তিক ৪-৫ ভাগ জলের সঙ্গে মিশ্রিত জৈব পদার্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রধানত মিথেন এবং অল্প পরিমাণে ইথেন, ইথিলিন ইত্যাদি সরল গ্যাসীয় জৈবযৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগ জ্বালানি হিসাবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এইভাবে পাওয়া জ্বালানি গ্যাসকেই 'জৈব গ্যাস' বলা হয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে একই সঙ্গে জ্বালানিশক্তি এবং গোবর থেকে তৈরি উর্বর সার পাওয়া যায়। একই সঙ্গে আলো জ্বালানোর কাজে এবং ডুয়েল-ফুয়েল ইঞ্জিন চালানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। বায়োগ্যাস তৈরির পদ্ধতি খুব সরল। প্রথমে ট্যাঙ্কে গোবর এবং জল মেশানো হয়। এই মিশ্রণটিকে 'স্লারি' বলা হয়। মিশ্রণটি ইনলেটের মধ্য দিয়ে গিয়ে ডাইজেস্টারে প্রবেশ করে, সেখানে স্লারির পচন হয় এবং বায়োগ্যাস তৈরি হয়। সমস্ত গ্যাস স্টোর-হোল্ডার এবং গ্যাস স্টোরেজ ডোম-এ রাখা হয়। তারপর পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে গ্যাস প্রবাহিত হয়ে যেখানে গ্যাসের ব্যবহার হয়, সেখানে যায়। এই প্ল্যান্ট মূলত খোলা উঁচু জায়গা, যেখানে বেশির ভাগ সময় রৌদ্র আসে এবং রান্নাঘর ও গোয়ালের কাছাকাছি হতে হবে। এতে স্ত্রীলোক এবং শিশুরা জ্বালানি কাঠ কুড়ানো এবং সেগুলির ভারী বোঝা বয়ে আনার কষ্ট থেকে রেহাই পায়। স্ত্রীলোকেরা রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে বসে গরমে রান্না করার কষ্ট থেকে অব্যাহতি পায়, গ্রামের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নত এবং হিতকার্যে ব্যবহৃত হয়, উপরন্তু জ্বালানি কাঠের সাশ্রয়ের জন্য বনভূমি প্রসার হয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি হয় এবং সর্বোপরি সকলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের দেশের ব্যক্তি-চাহিদার ৩৪ শতাংশ যোগান দেয়। এর মধ্যে চাহিদার ৬০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। তেল আমদানি বাবদ বছরে আমাদের খরচ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো এক মিশ্রণ, যার প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস। এই গ্যাস বায়ুর চেয়ে হালকা এবং গন্ধহীন। আর পেট্রোলিয়াম হলো পাথরের তেল, কিন্তু পাথর থেকে তৈরি হয় না। সমুদ্রের নিচে জমা আবর্জনার মধ্যে উদ্ভিদ আর প্রাণী আটকে পড়ে এবং ক্রমে তা পাথরে পরিণত হয়। এখানেই ধীরে ধীরে তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম। পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের অসংখ্য উৎস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তাই পেট্রোলিয়াম সরবরাহ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথমে পাইপের মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম সমুদ্রের কাছে আনা হয়। তারপর তা ভরা হয় পেট্রোলবাহী জাহাজে। জাহাজ তা পৌঁছে দেয় বাণিজ্যিক বন্দরগুলিতে। বন্দরে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে পেট্রোলিয়াম পরিশ্রুত করা হয়। পাওয়া যায় গাড়ির উপযোগী পেট্রোল, আলো জ্বালাবার কেরোসিন, ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি ইত্যাদি। গ্যাস ওয়েল, উত্তাপ সৃষ্টি করার ভারী তেল ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ ট্যাঙ্কারে করে নিয়ে আসা হয় পেট্রোল পাম্পে।

সহজ সত্যটি হলো—কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস কোন উৎসই অনন্ত নয়। ফলে নির্বিচারে খরচ করলে তা একসময় ফুরোবেই। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি। বেহিসাবিভাবে খরচ করলে সারা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত তেলের সঞ্চয় দিয়ে বড় জোর আগামী পঞ্চাশ বছর চালানো যাবে। আমাদের দেশে কয়লা দিয়ে চলবে খুব বেশি হলে আর মাত্র দেড়শো বছর। তাই এমন শক্তির উৎস দরকার, যা বারবার ব্যবহার করা যায়।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর ১৯৯৬-১৯৯৭, ১৯৯৭-১৯৯৮, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে সারা ভারতের মধ্যে সৌরশক্তি-প্রচারের ক্ষেত্রে ভারত সরকার (M.N.E.S.) কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ উদ্যোগী'র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

১৯৯০-২০০০ সালে 'শ্রেষ্ঠ সোলার শপ'-এর পুরস্কার ভারত সরকার নরেন্দ্রপুরকে দান করেন। সম্প্রতি SESI (Solar Energy Society of India, Bangalore) তাদের সর্বভারতীয় বাৎসরিক পুরস্কার 'SESI-NGO AWARD' নরেন্দ্রপুর সোলার ইউনিটকে দান করেছে।

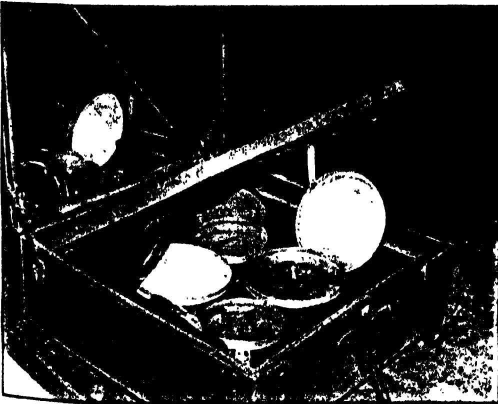
নরেন্দ্রপুর মিশনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলায় কাজ হচ্ছে এবং প্রতিবছর গড়ে ১,৮০০ পরিবার নরেন্দ্রপুর মিশন থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে SHS (Solar Home System)-এর সাহায্যে স্বগৃহ আলোকিত করে থাকেন।

শুধু তাই নয়, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে বাঁচবে অরণ্য। তাই নানাভাবে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের চেষ্টাও চলছে। এই উদ্দেশ্যে দেশে আপাতত ২৯ লক্ষের বেশি পশু ও মানুষের বর্জ্যপদার্থ দিয়ে তৈরি শক্তিকেন্দ্র বসানো হয়েছে। ফলে বছরে ৩০ লক্ষ টন কাঠ এবং ৭ লক্ষ টন ইউরিয়ার সমতুল সার বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে রাজ্যে ১২ লক্ষ উন্নত চুলা বসানো হয়েছে, যার ফলে প্রায়

৫০ লক্ষ টন কাঠ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। নিত্য জীবনে প্রচলিত জ্বালানির ব্যবহার এখন স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। শিল্পসংস্থা থেকে নির্গত ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া আর জীবাশ্মজাত জ্বালানির দহনজনিত দূষণের ফলে প্রতিবছর বিশ্বে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ উন্নয়নশীল বিশ্বে—যেখানে প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ মারা যায় ঘরের ভিতর দূষণের কারণে। অর্থাৎ কাঠ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহারের কারণে ও শ্বাসযন্ত্রজনিত নানা অসুখে। মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ ঘটে এশিয়ায়। এই দূষণ ঠেকাতে পারে ধোঁয়াবিহীন চুলা।

"একটি গাছ একটি প্রাণ।" আমরা প্রায়ই শুনি—গাছ লাগান এবং প্রাণ বাঁচান। প্রাণের তাগিদে নিজের স্বার্থেই গাছকে হত্যা না করে বরং তার সুরক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। তাই গাছের কোন ক্ষতি না করে এবং প্রকৃতির ওপর আঘাত না হেনে অসীম অনন্ত তেজঃপুঞ্জের অধিকারী সূর্যকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরো নিবিড়ভাবে প্রয়োগ করে আমরা অনেক কিছু লাভ করতে পারি। যেমন রান্না করা বিশুদ্ধ আহার্য পেতে পারি, জ্বালানি খরচ অনেকাংশে কমাতে পারি এবং সুস্থ পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি।

প্রকৃতির অনন্ত শক্তির কাছে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিকতম নিদর্শন 'সৌর উনুন'। আমরা নানাবিধ উনুন সম্বন্ধে পরিচিত। কিন্তু সকল উনুনেই রন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় উত্তাপের জন্য গ্যাস, কয়লা, কাঠ, জ্বালানি তেল এবং বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার হয়। কিন্তু সৌর উনুনের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনপ্রকার জ্বালানির প্রয়োজন হয় না। ফলে রান্নার কাজে কোন আর্থিক খরচ নেই। সৌর উনুনের জ্বালানি কেবল সৌরশক্তি।



সৌর তাপে রান্না চলছে

সৌর উনুন এককথায় অভিনব। এই উনুনে খুব সহজ সরল পদ্ধতিতে কেবল সৌরতাপে সম্পূর্ণ রান্না করা যায়। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এবং শহরের চাপ কমানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে গাছপালা কেটে বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি পরিমাণে মিশে পরিবেশ দূষিত করছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ জ্বালানির প্রয়োজনে দিনের পর দিন গাছপালা কেটে নেওয়ার ফলে এখন গ্রামবাংলায় ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় নানাবিধ পাখির কলকাকলির ঐকতানে আর মানুষের ঘুম ভাঙে না। ধীরে ধীরে গাছপালা কমে যাওয়ায় পরিযায়ী পাখিরা তাদের আস্তানা খুঁজে পায় না, ফলে মিষ্টি সুরের ঐকতান সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে কয়েকদিন অন্তর গ্যাসের দ্রুত দাম বাড়ার ফলে মধ্যবিত্ত মানুষও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এই নাজেহাল অবস্থা কাটতে না কাটতে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির নিদারুণ কশাঘাত এসে পড়ে।

সৌর উনুনে রান্না করলে কেবল জ্বালানির সাশ্রয় হবে তা নয়, বছরে আনুমানিক ৮-৯ মাস (বর্ষাকাল ছাড়া) জ্বালানি খরচ অনেকাংশে বাঁচানো যাবে, বিশুদ্ধ ভিটামিনযুক্ত খাবার পাওয়া যাবে এবং সর্বোপরি পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে। সৌর উনুনে রান্না করা খাবার হয় সুস্বাদু এবং বিবিধ খাদ্যগুণ-সম্পন্ন। এতে কোনপ্রকার স্বাস্থ্যহানি হয় না। এই উনুনে ধোঁয়া, কালি এবং চোখ জ্বালা করার মতো কোন বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় না। ফলে গৃহিণীদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয় অনুকূলে থাকে। সৌর উনুনে ৩-৪টি পদ একইসঙ্গে প্রস্তুত করা যায়।

প্রকৃতি আমাদের বিভিন্ন শক্তির উৎস—নদনদী, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, বায়ু, ভূগর্ভের বিভিন্ন সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি। সূর্য নিজেই এক মহান শক্তির উৎস, প্রধান শক্তি সরবরাহকারী। সূর্যের আলোকশক্তিকে বলা হয় 'বিশুদ্ধ শক্তি'। কারণ, এই শক্তি অফুরন্ত এবং দূষণ ছড়ায় না। ইতোমধ্যে সূর্যের আলো ঘর গরম করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন কাচের ঘর বা গ্রিণহাউস। এই সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব আলোক তড়িৎকোষ বা ফটো ইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন, তরাই, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে স্বনির্ভর সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং বেশ কিছু বাড়ি সৌর আলোকের দ্বারা আলোকিত হয়েছে। তাছাড়া স্বনির্ভর সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ৫ থেকে ২৬ কিলোওয়াট ক্ষমতার অনেকগুলি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র যোগাযোগহীন বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুতের চাহিদা কিছুটা মেটাচ্ছে। এছাড়া ৫ কিলোওয়াটের কম ক্ষমতার স্বনির্ভর সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাসপাতাল, সরকারি আবাসন, অফিস, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ জোগান দিচ্ছে। মূলত সৌরকোষে সৌরকিরণ আপতিত হলে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা

direct current (d c)। তাই সৌর মডিউল থেকে পাওয়া বিদ্যুৎকে আগে বিশেষ ধরনের ইনভার্টারের সাহায্যে alternate current (a c)-এ রূপান্তরিত করে তা থেকে গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। সৌর মডিউলগুলি কম্পিউটারের সাহায্যে সূর্যের মুখোমুখি রাখার ফলে এতে আপতিত সৌরকিরণের পরিমাণ সবসময়েই সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে এবং এভাবে কেন্দ্র থেকে গ্রিডে বেশি বিদ্যুতের জোগান নিশ্চিত করা যায়। তাই মনে হয় আগামী দিনে এই ধরনের গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। এই ব্যবস্থায় যেকোন বাড়ির ছাদে একটি ছোট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালে তা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে তা সরাসরি গ্রিডে চলে যাবে। কলকাতার সল্ট লেকে বিদ্যুৎ পর্ষদের দপ্তর 'বিদ্যুৎ ভবন'-এর ছাদে ২৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং এখান থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ দিয়ে বিদ্যুৎ ভবনের একটি তলার প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে কর্ণাটকের সেই হতদরিদ্র ছোট গ্রামটির কথা। সেখানে অনেক কিছুর অভাব থাকলেও দিনেরাতে আলোর অভাব নেই। দিনে সূর্যের আলো এবং রাতে সমগ্র গ্রাম সৌরশক্তির আলোকে আলোকিত হয়ে থাকছে। শুধু প্রতি গৃহে নয়, ছোট গ্রামের অপ্রশস্ত স্বল্প দূরত্বের রাস্তায় প্রতি রাত্রে ১৯টি আলো জ্বলে।

পুরুলিয়ার তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু গ্রামও এখন সৌর আলোকে ঝলমল করছে। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির বহু গ্রামে সৌরশক্তির সাহায্যে আলো, পাখা চলছে, ফলে গ্রামের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। গোসাবার বালি গ্রামেও এখন হোমলাইটিং সিস্টেম যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। ফলে গ্রামের মহিলারা অনেকটা স্বনির্ভর হতে পারছে। অনেক গ্রামে সাক্ষরতা অভিযান সফল হতে পারছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এনার্জি এডুকেশন পার্কে একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। বর্তমানে 'সিগমা সোলার সংস্থা' পুরোপুরি সৌরশক্তির সাহায্যে ০ ডিগ্রির নিচে অবস্থিত সুইমিং পুল হিটিং সিস্টেমের সূচনা করে ইতোমধ্যে কলকাতার স্প্যাসটিক সোসাইটি, সেন্ট জোসেফ কলেজ-সহ বেশ কয়েকটি সুইমিং পুলের উত্তাপ বাড়াতে সফল হয়েছেন। এছাড়াও সূর্যের তেজঃপুঞ্জ কাজে লাগানোর বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন—রুগ্ন চটশিল্পের বয়লারে (কয়লা দিয়ে চালিত বয়লারের পরিবর্তে) সোলার হিটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন করা, এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ইনকিউবেটরে অপরিণত শিশুদের উত্তপ্ত রাখা, স্টেডিয়াম আলোকিত করা ইত্যাদি। সৌরশক্তির ওপর নির্ভর করে মোটরগাড়ি চলা শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে এরোপ্লেনও চলতে পারে। সুতরাং আগামী দিনে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানি শেষ হলেও পারমাণবিক বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।



পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে সৌরশক্তির ব্যবহার

অবশেষে 'ভাগবত'-এর কথায় ফিরে আসা যাক। অবধূতের অষ্টম গুরু সূর্যদেব পৃথিবীর প্রাণিকুল তথা মনুষ্যজাতিকে তার কৃপালোক দিয়ে সর্বতোভাবে রক্ষা করছেন। আমরা শুধু তাঁর কৃপা গ্রহণ করার অপেক্ষায়। ❑

তথ্য-সহায়িকা

- শক্তির উৎস—ভের্দে-জ-পিয়ের ও প্রোজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭
- বিকল্প শক্তির খোঁজে—অংশুমান বসু, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯
- বায়োগ্যাস গ্রামীণ শক্তির একটি উৎস—ভারত সরকার, অপ্রচলিত শক্তিসমূহ মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
- সৌর রান্না—মমতা দত্ত, দি প্রেসম্যান, ১৯৯৯
- আনন্দবাজার পত্রিকা—২৫ জুলাই ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ এবং ১৫ মার্চ ২০০৪
- আজকাল—৪ নভেম্বর ২০০১

এ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।

প্রসঙ্গ 'বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা' শীর্ষক নিবন্ধ প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। উল্লিখিত নিবন্ধের শুরুতেই 'আর্যজাতির ভারতে আগমন' প্রসঙ্গে গতানুগতিক ধারণার উল্লেখ অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট অভিমত—"আর্যরা খাঁটি ভারতীয়।" সম্ভবত গত বছর বা তার আগের বছর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে এবিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল এবং তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল—আর্যরা বহিরাগত নয়, তারা খাঁটি ভারতীয়। একথা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার 'ভারতীয় আর্যরা বহিরাগত'—অনুমানভিত্তিক এই কাল্পনিক ধারণাটি প্রকাশ করেন। ভারতের তদানীন্তন শাসক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 'European Superiority Theory' প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হওয়ায় তারাই এটি বিপুলভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। এই অনুমানের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের বশংবদ কিছু ভারতীয় তা বিনা বিচারে এবং প্রতিবাদে মেনে নেয়। এবিষয়ে সম্পাদকের মন্তব্য আশা করেছিলাম।

আরেকটি কথা, এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' শীর্ষক রচনাতে একটি তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে। এই রচনার ১৮৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১ম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'আয় মা সাধন-সমরে' গানটি রামপ্রসাদের রচনা নয়। এই গানটির রচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়। (দ্রঃ শাক্ত পদাবলী, সংগ্রাহক—অমরেন্দ্রনাথ রায়)

অরুণেশ কুণ্ডু
এন. কে. ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা-৪২

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা' নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক স্বামী গণনাথানন্দ স্বল্প কথায় শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরস্পর সম্পর্কের যে-ছবি এঁকেছেন তা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় নিঃশব্দে, আমার মতো পাঠক-মনকে নিয়ে যায় এক পরম বিস্ময়ের জগতে। তাই মনের আবেগে দু-একটি কথা না লিখে পারলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হয়, দুজন দুজনের পরিপূরক। লৌকিক জীবনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। আবার একটু ভিতরে গেলে মনে হয় দুজনেই দেবদেবী—যেন শ্রীরামচন্দ্র-সীতাদেবী।

লেখক মন্তব্য করেছেন, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা পরস্পর অভিন্ন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের আধার ছিলেন। সেই প্রেম ছিল সর্বজীবে—উচ্চ-নিচ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সকলের প্রতি। শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে সেই ভাব যেন আরো স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বামী ভূতেশানন্দ ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে একবার বলেছিলেনঃ "সংসার-তাপদগ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য জগজ্জননী নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে প্রকাশিত করেছেন।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম, পৃঃ ৪৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে আমরা মানব-মানবী রূপে দেখি। সেই রূপে মানুষের সাধারণ জীবনের ছবি ফুটে ওঠে এবং সেই কারণেই সংখ্যাতীত ভক্ত তাঁদের অধ্যাত্মজীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছেন। একদিকে রক্তমাংসের মানুষ, অপরদিকে জীবন্ত দেবতা, 'জ্যান্ত দুর্গা'। আমরা ভাগ্যবান, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা যে-দেশের মাটিতে জন্মেছেন, সেই পবিত্র ভারতভূমির সন্তান আমরা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা আজ বিশ্বহৃদয়ে শাশ্বত হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের 'জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা' শীর্ষক রচনাটি পড়ে অপার আনন্দ পেয়েছি। স্নানযাত্রা প্রসঙ্গে লেখিকা যা লিখেছেন, তাতে একটি কথা সংযোজন করতে চাই। রচনাটিতে লেখা হয়েছেঃ "একটি বিশেষ কূপ থেকে জল এনে ১০৮টি সোনার কলসি ভর্তি করা হয়।... এই জলে দেবতাদের অভিষেক হয়।" যতদূর জানি, এই বিশেষ কূপটি 'স্বর্ণকূপ' নামে পরিচিত। রচনাটিতে উল্লেখ রয়েছে, স্নানের পর জগন্নাথ হাতিবেশ ধারণ করেন। জানা যায়, তিথির রকমফেরে জগন্নাথদেবকে ২১ বার বেশ ধারণ করতে হয়। জ্যৈষ্ঠে হস্তিবেশে, প্রভু তখন বস্তুতপক্ষে গণেশ। এই প্রসঙ্গে এও জানা যায়, গাণপত্য ব্রাহ্মণ গণপতি ভট্টের মনোবাঞ্ছা পূর্ণের জন্য প্রভু জগন্নাথ স্নানযাত্রার মহোৎসবের পর গণেশ বেশ ধারণ করেছিলেন।

শ্রীজগন্নাথের লীলাবিলাসের মধ্যে স্নানযাত্রা বা রথযাত্রা তাঁকে ভক্তের হৃদয়ে নিকট আত্মীয়তার বন্ধনে গেঁথে রেখেছে বলা যায়। আজো রথের রশিকে স্পর্শ করার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে সংখ্যাতীত ভক্ত, পুণ্যার্থী, দর্শনার্থী শ্রীক্ষেত্রে আসেন। প্রভুকে ভক্তরা নিজের ভাবে সেবা করে থাকেন। কেউ পুত্র, কেউ সখা, আবার কেউ পিতাভাবে জগন্নাথদেবকে দেখেন। ভাবগ্রাহী জনার্দন শ্রীজগন্নাথ তাঁদের মনস্কামনা অপূর্ণ রাখেন না। ভক্তের আনন্দেই যেন ভগবানের আনন্দ!

অসিত দত্ত
বি. এস. সেকেণ্ড বাই লেন, হাওড়া-২

সংশোধনাগার ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা

কিছুদিন আগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম, খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই

যুবক তাদের বিশেষ অনুরোধে, জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ দিবসে উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি'তে এসেছিল। খবরটি পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর করুণা ফল্গুধারার মতো সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হয়ে সঞ্জীবিত করে চলেছে। ঐ দুজন যুবক জেলে বন্দি হওয়ার আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকাও পাঠ করেছে। জেলে থেকেও তাদের অনুরাগ কমেনি।

কিছুদিন আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকার 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমরা সব কর্ম করি তাহলে সুকর্ম যেমন, তেমনি কুকর্মও তো তাঁরই ইচ্ছাতে হয়। এসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মত খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ। তাঁর মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া জগতে কিছুই হয় না। এমনকি গাছের একটি পাতাও নড়ে না। আমরা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামতো কর্মে লিপ্ত হই, তবে ঈশ্বর সকলের জন্য একটু স্বাধীন ইচ্ছা (free will) রেখে দেন। যেমন একটি গরুকে মাঠের মধ্যে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কিছুটা দড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো। কর্তার ইচ্ছা, ঐ দড়ি-ব্যাসার্ধে গোলাকার ক্ষেত্রটিতেই যেন গরুটি বিচরণ করে। এখন গরুটি যদি তা না মেনে দড়ি ছিঁড়ে কোন বাগানে ঢুকে পড়ে, তা কি কর্তার ইচ্ছামতো কাজ হয়? এই অপকর্মটি করে গরু তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে। মা তাঁর ছোট ছেলেটিকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিলেন, মায়ের ইচ্ছা ছেলেটি খেলনা নিয়ে খেলুক এবং আনন্দলাভ করুক। এবার ছেলেটি খেলনাগুলি নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ পর একটু দূরে বঁটিতে হাত দিয়ে হাত কেটে ফেলল বা উনুনে হাত ঢুকিয়ে দিল। এভাবে স্বাধীন ইচ্ছার অপপ্রয়োগ হলে কর্তার কিছু করার নেই। তবে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ যদি যথাযথ হয়, তবে কর্মটি সুকর্ম হয় এবং তার ফলও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, সৎকর্ম করলে পূর্বজন্মের কর্মফলজনিত অঘটনের প্রভাব অনেক কমে যায়—যেখানে কেটে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে সামান্য ছড়ে গেল। এই স্বাধীন ইচ্ছার সুপ্রয়োগের জন্য চাই ঈশ্বর-কৃপা। চঞ্চল অবিবেকী মন সর্বদা দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়, মাহুত নারায়ণের কথা শুনতে পায় না বা বুঝতে পারে না। স্থিতধী ব্যক্তিগণের মন অচঞ্চল, শুদ্ধ, পবিত্র ভাবান্বিত হয়ে থাকে। তখন ঠাকুরের কথায়, ঠিকমতো তালে তালে পা পড়ে। তাই তিনি বলেছেন—হে জীব, শরণাগত হও। মা বলছেন—শরণাগতের কোন ভয় নেই। অভয় পদ শরণ নিলে কর্মফলের বন্ধন নাশ হয় এবং ধীরে ধীরে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়।

ঐ দুই যুবক কুকর্ম করে শাস্তিভোগ করছে, কিন্তু সেটাও সেই 'রামের ইচ্ছে'। তারা শরণদায়িনী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শরণ নিতে এসেছিল—এটাও 'রামের ইচ্ছে'। শ্রীশ্রীমা তাদের কল্যাণ করবেন—এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। জেল কর্তৃপক্ষের এই মহানুভবতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁরা সংশোধনাগারের বন্দিদের সংশোধনে প্রকৃতই আগ্রহী।

'উদ্বোধন'-এর সন্ন্যাসী মহারাজগণের ঐ যুবকদ্বয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম, আন্তরিক ব্যবহার তাদের জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় হয়ে রইল। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, স্বামী দিব্যানন্দজী মালদহে সংশোধনাগারের বন্দিদের সুপথে চালিত করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করছেন।

এভাবে দিকে দিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ আমাদের মতো ত্রিতাপদগ্ধ, 'সংসারপাকের ফেরে বিপাকে' পড়া মানুষগুলিকে করে তুলছে সুন্দর, পবিত্র, স্নিগ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈপ্সিত নরেন্দ্রনাথ নামক বটবৃক্ষটির শাখাপ্রশাখা-স্বরূপ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ আমাদের মতো পথভ্রান্তদের পান্থধাম। তাঁদের সকলকে প্রণাম।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি
হালিশহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

সাম্প্রতিক কালে 'উদ্বোধন'-এর উত্তরোত্তর উন্নতি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এজন্য আপনাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদ এবং নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মনোজ্ঞ নিবন্ধ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। গত বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যাটিই প্রধানত আমার আলোচ্য বিষয়।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক ভারতের ক্রীড়াজগৎ' এবং তৎসংলগ্ন জয়ন্ত দত্তের সংযোজন 'ক্রিকেটার স্বামীজী' প্রশংসার দাবি রাখে। লেখাটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকার কাজ করবে। এপ্রসঙ্গে জানাই—স্যার গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত 'ব্রতচারী আন্দোলন' অতীতে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল, আজ তা বিস্মৃতপ্রায়। এবিষয়ে আলোকপাত করলে বর্তমান প্রজন্ম উপকৃত হতে পারে।

'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে বিগত চৈত্র ১৪১০ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা' বহু তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক মনোজ্ঞ আলোচনা। আমাদের দেশে শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন এবং রাজনীতির দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের আত্মচিন্তন ও মননের খোরাক যোগাবে এই আলোচনাপ্রবাহ। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতা এবং মূল্যবোধের শিকড় সুদৃঢ় হবে, আগামী দিনে ভারতবর্ষ আরো সমৃদ্ধ হবে, সফল হবে স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভারতের স্বপ্ন।

স্বামী গোকুলানন্দজীর 'রাশিয়া ভ্রমণঃ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা' অতীত এবং বর্তমান রাশিয়ার একটি ঐতিহাসিক দলিল। তিনি লিখেছেনঃ "সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রথম আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মাধ্যমে। তিনি বেশ কয়েকবার রাশিয়া এসেছেন।" অংশটি পড়ে পুলকিত হলাম। কারণ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর পদপ্রান্তে বসে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে।

'সংবাদ' বিভাগে 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর', 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট, বাংলাদেশ' এবং 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন' পড়ে ভাল লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবান্দোলন যে কিভাবে এবং কাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে—এসব খবর ভক্তদের কাছে সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গক্রমে একটি অনুরোধ জানাই। আগামী দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ঢাকা (বাংলাদেশ) এবং সুদূর সিঙ্গাপুর কেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যাদি পরিবেশন করলে বিশেষভাবে আনন্দিত হব। মনে পড়ে, ১৯৩৭ সালে ঢাকা কেন্দ্রেই আমি প্রথম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় পরিচিত হই। সিঙ্গাপুর কেন্দ্র আমার দেখার সুযোগ হয়নি, তবে আমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী প্রয়াত দেবীপ্রসাদ গুহ (পরবর্তী কালে দেবী মহারাজ) এবং স্বামী জয়দেবানন্দ জীবনের শেষপর্বে ঐ কেন্দ্রে ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়নের কাজ করে গেছেন।

'দেহত্যাগ' বিভাগে 'উদ্বোধন'-এর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের মহাপ্রয়াণের কথা ছাপা হয়। এঁদের অনেকেই তাঁদের জীবন ও কর্ম দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনকে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মনে হয়েছে, এবিষয়ে একটি প্রামাণ্য স্মরণিকা সঙ্কলনের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। আগামী প্রজন্মের ভক্তদের কাছে তা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। ভেবে দেখার আবেদন জানাই।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
বিধাননগর, কলকাতা-৬৪

প্রসঙ্গ 'অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' রচনায় 'আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধর'—এই গানখানির সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি থাকার জন্য 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না'—এই গানটি লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বেহাগে নিবদ্ধ 'আমি তোমার ধরব না হাত' গানখানি অতুলপ্রসাদের রচনা হলেও 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' গানখানি আদৌ অতুলপ্রসাদের রচনা নয়। 'আমার জীবন-নদীর ওপারে এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে আমার'-সহ উল্লিখিত গানখানি পূর্ণিমা পিকচার্স পরিবেশিত 'ছুটি' ছায়াছবির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রচয়িতাগণ ছিলেন যথাক্রমে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং ধীরেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অরুন্ধতী দেবী এবং শিল্পী ছিলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধর' গানখানি অতুলপ্রসাদ রচিত অন্য একটি গান—'আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো'-র সঙ্গে ভাবার্থের দিক দিয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গানটির শেষ অন্তরাতে আছে—

"রয়েছিস যদি সাথে
দারুণ আঁধার রাতে
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে।
হস্ত আমার হলেও শিথিল
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।
তোর পায়ে পড়ি
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।"

অতুলপ্রসাদ রচিত এই গান-দুটিতে ঈশ্বরের প্রতি পরম নির্ভরতাসূচক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—"তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে। কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই।"

উপরি উক্ত প্রবন্ধটি অতুলপ্রসাদ সেন রচিত গানগুলির সূচীপত্র মাত্র না হয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্বসমৃদ্ধ হলে 'অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' নামকরণটি সার্থক হতো বলে মনে হয়।

নিত্যরঞ্জন মণ্ডল
ডাঃ জি. এস. বোস রোড, কলকাতা-৩৯

ভুল ওষুধ এবং জাল ওষুধ

সম্প্রতি এক প্রেসারের রোগিণীকে আমি 'Ativan' দিয়েছিলাম। এই ওষুধটির সঙ্গে আরো সহযোগী ওষুধও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ মহিলা ওষুধ খেয়েও সুস্থ হচ্ছিলেন না। আমি বিস্মিত হয়ে তাঁকে বললাম : "আপনার কাছে যা যা ওষুধ আছে সব নিয়ে আসুন, একটাও যেন বাদ না যায়।" তিনি অনুগতের মতো সব ওষুধ নিয়ে এলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, 'Ativan' ট্যাবলেটের স্থলে তিনি 'Wysolone 5 mg' ব্যবহার করছেন। "কেন এটা ব্যবহার করছেন?" জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন : "এটিই তো 'Ativan'!" আসলে ওষুধটির মোড়ক, তার চেহারা, তার আকার, রঙ সবই 'Ativan'-এর মতো। ফলে রোগী এবং ওষুধবিক্রেতা উভয়েই একই ভুল করেছে—ঐটিকেই 'Ativan' বলে ভেবেছে। কিন্তু 'Wysolone' সম্পূর্ণ অন্য ওষুধ। তাই সকলের কাছে আবেদন—

(১) ওষুধ কিনে সর্বদা পরীক্ষা করে নেবেন যে-ওষুধ প্রেসক্রিপশনে আছে, সেই ওষুধই দোকানদার দিল কিনা।

(২) নিরক্ষর ব্যক্তি কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে ওষুধ ও প্রেসক্রিপশন নিয়ে গিয়ে যাচাই করবেন।

(৩) ডাক্তারদের প্রতি আবেদন, প্রেসক্রিপশন পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবেন এবং রোগী যদি ওষুধ কিনে আপনাদের কাছে যাচাই করার জন্য আসে, অনুগ্রহ করে সহানুভূতির সঙ্গে পরীক্ষা করে দেবেন।

(৪) দোকানদারদের প্রতি অনুরোধ, ওষুধের গ্রুপ এবং কম্পোজিশন না যাচাই করে এক ওষুধের বিকল্প হিসাবে অন্য ওষুধ দেবেন না। আজকাল অনেক জাল ওষুধেও বাজার পূর্ণ হচ্ছে। ফলে ডাক্তারবাবুরা যদি প্রেসক্রিপশনে ওষুধের কোম্পানির নাম লিখে দেন, তাহলে রোগীর উপকার হবে।

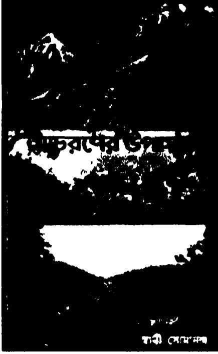
ডাঃ এ. কে. লাহা
হাওড়া-৪

যে-গ্রন্থ মানুষের নিত্যসময়ের সাথী

দিলীপকুমার মোহান্ত

আচরণের উপাসনা • লেখক : স্বামী সোমানন্দ • প্রকাশক : লেখক, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিষড়া, হুগলি • মূল্য : ১২ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০ • প্রকাশকাল : ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

স্বামী সোমানন্দ রচিত **'আচরণের উপাসনা'** নামক ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি দেখলে মনে হয় তাড়াতাড়িই পড়া হয়ে যাবে। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে সূত্রাকারে রচিত গ্রন্থ—তার ভাষ্য করলে গ্রন্থের তিন-চার গুণ তো হবেই। আচরণকে সাধনা হিসাবেই দেখিয়েছেন গ্রন্থকার। আর উপাসনার বিষয় ১৩টি বিভঙ্গে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত, অথচ খুবই অল্পকথায় বিন্যস্ত হয়েছে। এধরনের গ্রন্থ পড়তে হয় ধীরগতিতে, কেননা এতে জানার চেয়ে বোঝার বিষয় থাকে বেশি।



আচরণ যে একধরনের শ্রেষ্ঠ উপাসনা, তাতে কোন সংশয় নেই। দর্শনের ভাষায় যা 'সত্য উপলব্ধি', তা-ই আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'ঈশ্বরলাভ'। যেকোন বিষয়ে সফল হতে গেলে একটা অনুশীলন অবশ্যই দরকার। সত্যদৃষ্টি বা ঈশ্বরলাভের জন্য ভক্তকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপাসনা করতে হয়। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-ভেদে তা দুপ্রকার। আমাদের আচার-আচরণকে নিয়মিত করেই গড়ে ওঠে আচরণের উপাসনা। এ হলো একটি সাধনা। উপাসনার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। অহংবুদ্ধি, কর্তৃত্বাভিমান, দ্বেষ, আসক্তি—এগুলি ধীরে ধীরে সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে কমানোর প্রক্রিয়াও আচরণের উপাসনা। কেননা অহংবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সত্য উপলব্ধি হয় না।

বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক ধর্মমতই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় সত্যের/ঈশ্বরের উপলব্ধির কথা বলে। আর প্রচলিত ধর্মীয় জীবন-যাত্রার তুলনায় উন্নততর নৈতিক মানভিত্তিক জীবনযাত্রার কথা সকল ধর্মমতই বলে। সাধনায় উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। ফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত গড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ে তফাত নেই—তা হলো 'ধর্মসাধনার ফল'। প্রচলিত ধর্মমতগুলি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সম্পূরক। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষ্য করলে প্রতিটি ধর্মমতই গ্রহণীয় হয় এক-একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে—"A lamp emiting lusture and illumination to others which is one LIGHT." এই বহুমুখী, অনেকান্তিক চেতনা মানুষকে নিজ মতের মতো পর-মতে শ্রদ্ধাবান, দ্বেষহীন করে তোলে, অহিংস অভীযুক্ত, অনাসক্ত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এমন সংস্কৃতির সাফল্যের মূল প্রোথিত 'আচরণের উপাসনা'য়। আচরণের শিক্ষা মানুষকে 'ধর্মীয় ফেনাটিসিজম'-এর কবল থেকে রক্ষা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর মধ্যে ধর্মীয় জীবনমার্গের অনেকান্তিক রূপটিই সহজ সরলভাবে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, আমরা আচরণের সাধনায় কিছু যুগোত্তীর্ণ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচারে অগ্রসর হতে পারি। আমরা যেকোন ধর্মমতানুসারী হই না কেন, এই আচরণের উপাসনা—সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি গুণের অভ্যাস ও অনুশীলন শুধু ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রেই নয়, যেকোন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনেও কল্যাণকর। "ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়, আচরণে। সৎ হওয়া, সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।" গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দের এই বিবৃতি যথার্থই উদ্ধৃত করেছেন। কোন ধর্মমতই সমাজে গৃহীত হতে পারে না যদি তা নৈতিক উৎকর্ষতার ওপর প্রোথিত না হয়। গ্রন্থকার যথার্থই বলেছেন, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি "প্রেম প্রীতি সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকেন। তাই নৈতিকতার পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব।" (পৃঃ ১৫) নৈতিকবোধ ও অনুশীলনের সমন্বয়েই মানবজীবনে সংযম আসে, আসে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা। অহংবোধের বিনাশ, পরার্থচিন্তন ও তদনুযায়ী কার্য করাই নৈতিক জীবনের মূল কথা। প্রকৃতপক্ষে অপরের সেবার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে আদর্শ নৈতিক জীবন। 'প্রকৃতিকে জয় করা' (পৃঃ ২১) বিভাগে বিচার ও ভাব অবলম্বনে দুধরনের উপায়ের কথা গ্রন্থকার বলেছেন। 'ইতিমূলক শিক্ষা ও গুণগ্রাহিতা' বিভাগে জ্ঞান ও অজ্ঞানের তফাতকে লেখক প্রতীচ্যের ঐতিহ্যে দেখেননি, বরং যথার্থ বৈদান্তিক সংস্কৃতির আলোকে তাদের 'মাত্রাগত তফাত'-এর কথাই বলা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, গঠনমূলক সাম্যদৃষ্টির উত্তরণেও আচরণের অনুশীলন স্বীকার্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অভিমানশূন্যতা, অহঙ্কার নাশ, শরণাগতি, শ্রদ্ধা, ঈর্ষাত্যাগ, অভী, অনাসক্তি প্রভৃতি মানবজীবনে উপাসনার বিষয় হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের রশ্মিচ্ছটায় প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থকারের প্রস্থনা অভিনবত্ব পেয়েছে 'অভী' নামক আচরণের নৈতিক বিষয়ের ব্যাখ্যায়। ভয়শূন্য কখন হতে পারব? যখন প্রকৃতভাবে লোভ, আসক্তি, ঈর্ষা, অহং থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন নামক সেবার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতে পারব। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে প্রকৃত মানুষ কি, তা বুঝতে হলে 'অভী'র তাৎপর্য বুঝতে হবে। গ্রন্থকার

যখন বলেনঃ "অভী, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, সবলতা, তেজস্বিতা শুধু সাংসারিক দৃষ্টিতেই প্রয়োজন তা নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রবল সহায়ক। অভী একটি মানসিক উপাসনা।" (পৃঃ ৬৫) তখন বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে স্বচ্ছদৃষ্টির পাঠক গ্রন্থকারের সঙ্গে মতৈক্য পোষণ করা ছাড়া উপায় দেখেন না। গ্রন্থটির উপসংহার টানা হয়েছে চিত্তশুদ্ধি ও অভ্যাসকে সকল বিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য করে। নৈরাশ্যময় জগতে এ এক বড় আশার বাণী।

বাসনাক্ষয়ের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে "বেশি ভোগের বা লোভের বিষয় অল্প ভোগের দ্বারা বিচার করে ত্যাগ বা বাসনা কমানো যায়।" (পৃঃ ৭৬) কিন্তু মহাভারতে রয়েছে "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"—আগুনে ঘি দিলে আগুন যেমন নির্বাপিত না হয়ে বর্ধিত হয়, তেমনি কামনা বাসনা কখনোই উপভোগের দ্বারা উপশমিত হয় না। গ্রন্থকারের বক্তব্য ও মহাভারতের বক্তব্যের মধ্যে কি কোন প্রকৃত বিরোধ আছে? গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা থাকবে।

গ্রন্থের শিরোনাম যতটা সরল, বিষয়বস্তু ততোধিক গম্ভীর। ঈশ্বরলাভে যারা আগ্রহী নয়, তাদের কাছেও এ গ্রন্থের বিষয় ও বিন্যাস সমাদৃত হবে শুধু সুন্দর ব্যক্তিমানুষ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার উপায় বলে দেওয়ার জন্য। 'Myth and Reality'-র ব্যাখ্যায়ও গ্রন্থকারের মুনশিয়ানা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষান্তর কাম্য বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে গ্রন্থটির বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য। ❑

স্বামীজীকে নিয়ে নাটক

তাপস বসু

স্বামী বিবেকানন্দ • লেখক : শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত • প্রকাশক : নিবেদিতা সেনগুপ্ত, 'প্রফুল্ল নিলয়', নূতন পল্লী, বর্ধমান • মূল্য : ২৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬+২৮৮ • প্রকাশকাল : ১৯৯৩

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গবেষণা গ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ বহু লেখা হয়েছে, তবে তাঁর জীবনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা কমই হয়েছে। শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি নাটক রচনা করেছেন। নামকরণ করেছেন '**স্বামী বিবেকানন্দ**'। এইরকম সাদামাটা, সহজ, সরল নামকরণ নাটকের গুরুত্বকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। আধুনিক বাঙলা নাটক যে-স্তরে পৌঁছেছে কিংবা বাঙলা নাটকের ইতিহাস যে-সাক্ষ্য বহন করে, তাতে নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাধর্মিতা বিশেষভাবে কাম্য।

স্বামীজীর জীবন নিয়ে নাটক। তার কাহিনী স্বভাবতই তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বটিকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। আলোচ্য নাটকটি শুরু হয়েছে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগাক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান এবং তাঁর সেবা করার জন্য ত্যাগী যুব শিষ্যদের (যার মধ্যে স্বামীজী অন্যতম) উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। শেষ হয়েছে বেলুড় মঠে স্বামীজীর জীবনাবসানে। স্বামীজীর জীবনের একটা দীর্ঘ অধ্যায়কে নাট্যকার প্রথাগত পদ্ধতিতে অর্থাৎ সেক্সপীরীয়ান আদর্শে পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য নাটকটির প্রথম অঙ্কে আছে ৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৯টি, তৃতীয় অঙ্কে ৬টি, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ১০টি। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছাড়া স্বামীজীর গুরুভাই এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্ত্রী চরিত্রে আছেন শ্রীশ্রীমা, নিবেদিতা, মিস হেল, ক্রিস্টিন, লেডি গ্রেগরি প্রমুখ।

স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত

নাটকটির সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতার ছাপ রাখতে পারেননি। স্বামীজীকে নিয়ে নাটক রচনার ক্ষেত্রে দৃপ্ত ও প্রেরণাসঞ্চারী সংলাপ সৃষ্টি করতে পারেননি। নাটকের মধ্যে '**পটান্তর**' শব্দটি কেন ব্যবহৃত হলো? ওটি আসলে '**দৃশ্যান্তর**' হবে। স্বামীজীর জীবনের এত বড় অধ্যায়কে নাট্যকার কেন নাটকের পটভূমিরূপে বেছে নিলেন? এত দীর্ঘ নাটক কখনোই অভিনয় করা সম্ভব নয়; আর নাটক তো পড়ার জন্য নয়, অভিনয়ের জন্য।

নাট্যগ্রন্থটির মুদ্রণ, কাগজ ও অঙ্গসজ্জা নিম্ন মানের। আশা করব, এরপর যখন নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তখন এইসব ত্রুটি সংশোধন করে অভিনয়যোগ্য একটি মনোজ্ঞ নাটক আমাদের উপহার দেবেন নাট্যকার। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।—সম্পাদক

লীলাশুক অক্ষয় কবি

অমরেন্দ্রনাথ আদক

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন • লেখক : অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য • প্রকাশক : শিবশঙ্কর সিংহ, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র, অক্ষয়পল্লী, ময়নাপুর, বাঁকুড়া • মূল্য : ৩০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২+৯৮ • প্রকাশকাল : ২০০১

ব্যক্ষমাণ গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন' শুধু জীবনীগ্রন্থ নয়, গ্রন্থ নামে নিহিত আছে গভীর তাৎপর্য। যমুনাপুলিনে লীলাকুঞ্জের পত্রান্তরাল থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় লীলাদর্শনের পর কৃষ্ণকথাই শুকপক্ষীর জীবনের সারকথা হয়, অন্য কথা বৃথা বাক্য। শুকের এই ভাগবতী ভাবতন্ময়তা নিয়ে বৈষ্ণব কবিগণ নিজ নিজ হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা দর্শন করে রচনা করেন পদাবলী। এই হলো বৈষ্ণব কবিদের লীলাশুকবৃত্তি।



'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র কবি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিশুদের শিক্ষক অক্ষয়কুমার সেন ছিলেন পক্ষীস্বভাব। গুণী জনারণ্যে তিনি সভয়-সঙ্কোচের অন্তরালে অবস্থান করতেন। কারণ, তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা, তদুপরি তাঁর শরীরী গঠনেও ছিল না কোন শ্রী। যেটুকু বিদ্যার সম্পদ, তাও গ্রাম্য পাঠশালা থেকেই আহৃত। তবু তিনি কৃষ্ণলীলার শুকপক্ষীর মতো সমকালীন অবতারপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত হলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় অখ্যাত অক্ষয়কুমার সেন হলেন তাঁর ভাগবত লীলার শুকপক্ষীতুল্য প্রত্যক্ষদর্শী, উদ্গাতা ও কথক। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রচারই সার জ্ঞান করে তিনি রচনা করলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', যেন কৃপাপ্রাপ্ত মূক হয়ে উঠলেন বাচস্পতি! তাঁর রচিত গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ভক্তকুলের গৃহে গৃহে দ্বিতীয় রামায়ণ জ্ঞানে পঠিত হতে থাকল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কবির জীবনকথা, যা জানলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় হয়—তার অনেকটাই হারিয়ে গেল কালগর্ভে।

বিদগ্ধ লেখক অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমারের পুঁথি থেকে মূলতথ্য নিয়ে কঠোর শ্রমে ও সনিষ্ঠ গবেষণায় আরো অনেক দুর্লভ তথ্য সংযোজন করে রচনা করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন' গ্রন্থ। কবির জীবনের প্রাথমিক রেখাচিত্র রচনার পর গুরুত্ব দিয়েছেন কবির ভাগবত লীলাদর্শন পর্বে, লীলাশুকবৃত্তিতে। এভাবে গ্রন্থ-নামে এসেছে এক নিবিড় তাৎপর্য, অর্জিত হয়েছে গ্রন্থটির সবিশেষ গুরুত্ব।

অক্ষয়কুমার সেনের পত্রাবলী 'ভক্তবাণী' নাম দিয়ে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে স্বামী সারদানন্দের ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ উমেশ দত্তকে লিখিত ১৬টি পত্র 'পাঁচফুলের সাজি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ। 'ভক্তবাণী' ও 'পাঁচফুলের সাজি' এখন দুষ্প্রাপ্য। ঐ দুই পুস্তিকায় প্রকাশিত পত্রগুলি আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তৎসহ কবি অক্ষয়কুমার সেনের কুলপঞ্জী গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থের ভাষাও প্রশংসনীয়—সহজ, স্বচ্ছন্দ, গতিশীল ও ভাবোদ্দীপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অন্যতম ঋত্বিক স্বামী প্রভানন্দজী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন' রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক উল্লেখ্য সংযোজন। তাঁর রচনা তথ্যঋদ্ধই নয়, সুগ্রথিত ও সাহিত্যরসস্নিগ্ধ। তাঁর বক্তব্যের গভীরতা, বিষয়-বিন্যাসের নৈপুণ্য ও রচনাশৈলীর মাধুর্যে আমি আনন্দ লাভ করেছি।" আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ পাঠে সকলেই আনন্দ পাবেন। ❑

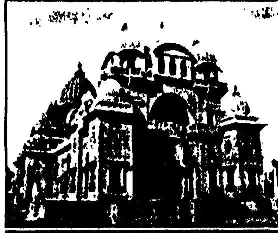
প্রাপ্তি-সংবাদ

* *তন্ত্র-বিজ্ঞান—শক্তিবাদ ও পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে • লেখক : ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী • সঙ্কলক ও প্রকাশক : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১০ গালিফ স্ট্রিট, সুইট নং-৬৩, ব্লক নং-৫, কলকাতা-৩। • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১০ +৩৮ • মূল্য : ১২ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০৪*
* *সারদা সঙ্গিনী গৌরী-মা • লেখক : পরিমল চক্রবর্তী • প্রকাশিকা : মীনা সাহা, মাদার হাউস, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬৪ • মূল্য : ১০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০১*
* *নৈমিত্তিক পূজা • সঙ্কলক : সদানন্দ ব্রহ্মচারী • প্রকাশক : সদানন্দ-অছি-পরিষদ, 'আনন্দধাম আবাসন', ১/১এ খানপুর রোড, কলকাতা-৪৭ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৬ • মূল্য : ৩০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০২*
* *ঋষিকণ্ঠ বিবেকানন্দ • লেখক : চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ • প্রকাশিকা : সুচেতা ঘোষ, বেণুছায়া, পোঃ কর্তিয়া, গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর-৭২১৫০৬ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩২ • মূল্য : ৫ টাকা • প্রকাশকাল : ১৯৯৫*
* *ঈশ্বর সন্ধানে • লেখক : পরিমলকান্তি বসু • প্রকাশিকা : ডলি বসু, প্রযত্নে—পরিমলকান্তি বসু, চণ্ডীতলা, মাসুন্দা, নব ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৪ • মূল্য : ৩৫ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০২*
* *স্বামী অমলানন্দ • সম্পাদনা : হরিপদ মণ্ডল • প্রকাশক : হরিপদ মণ্ডল, সুভাষপল্লী, হেঁড়িয়া, মেদিনীপুর • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬ +৯৮ • মূল্য : বিক্রয়ের জন্য নয় • প্রকাশকাল : ২০০০*
* *গদ্যে গীতা • লেখক : ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য • প্রকাশক : মৃগাঙ্কমৌলী চৌধুরী, রাণার, ১৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬ + ৫৮ • মূল্য : ১২ টাকা • প্রকাশকাল : ১৯৮৯*

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি

খড়ের চালের একটি কাঁচা বাড়ি, তাও আবার বালিয়াড়ির মধ্যে। এত বেশি ধুলো ওড়ে যে, ঘনঘন ঝাঁট দিতে হয়; আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে যায় এক-দেড় ইঞ্চি বালি। এইভাবেই শুরু কাঁথির রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের। তবে সে আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা। পূর্ব মেদিনীপুরের এই কেন্দ্রটি আজ অনেক উন্নত, অনেক বলিষ্ঠ। বিভিন্নমুখী ত্রাণ ও সেবাকাজে এই কেন্দ্রের ভূমিকা আজ সুদূরপ্রসারী। আশ্রমটি ২০০৩-২০০৪-এ যথাযোগ্য সমারোহে তার 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি' উৎসব পালন করেছে।

বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে অবস্থিত কাঁথিতে বন্যা লেগেই থাকে। সেরকমই হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তবে সেবার শুধু ধ্বংসই হয়নি, সম্ভাবনাপূর্ণ কিছু সৃষ্টির বীজও উপ্ত হয়েছিল। সেবার সুবর্ণরেখা ও কেলেঘাই নদীর বন্যায় সমগ্র কাঁথি মহকুমা, মেদিনীপুর জেলার সদর এবং তমলুক মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেসে গেলে বন্যাপীড়িতদের ত্রাণের জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ কাঁথিতে পাঠায় স্বামী ভূমানন্দজীকে; সঙ্গে সমাজসেবী মাখনলাল সেন-সহ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ত্রাণের কাজ শেষ হওয়ার পর ভূমানন্দজী কাঁথি ছাড়ার প্রাক্কালে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ স্থানীয় কিছু সজ্জনের কাছে প্রস্তাব রাখেন, এরপর তাঁরা যেন গরিব ছেলেদের শিক্ষা, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। আর এইভাবেই উপ্ত হয় এক মহা-সম্ভাবনার বীজ।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

এর কিছুদিনের মধ্যেই মনোহরচকে রাজা কৈলাশচন্দ্রের বাড়িতে সূত্রপাত হলো শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের। কিন্তু হঠাৎই আগুন লেগে ঐ বাড়িটি পুড়ে যাওয়ায় সেবাশ্রমের পরবর্তী কাজ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে কালীপ্রসাদ দত্তের বাড়িতে ১৯১৩ সালে নতুনভাবে আরম্ভ হলো। এই কাঁচা বাড়ির একাংশের খিলান-দেওয়া বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ও আরতি এবং সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরণ করা হতো। চারটি ছেলেকে আহার ও শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য সেবাশ্রমে স্থান দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে সেবাশ্রমে 'বিদ্যার্থী ভবন' নামে একটি ছাত্রাবাস শুরু হয়। ঐসময়ে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক (পরে স্বামী পুণ্যানন্দ) ঢাকা থেকে তাঁর পিতার কর্মস্থল কাঁথিতে এসেছিলেন। প্রমথনাথের আহ্বানে তিনি সেবাকর্মের জন্য কিছুদিন সেবাশ্রমে থাকেন।

সেবাশ্রমের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা থেকে ফেরার পর কাঁথিতে এসেছিলেন এবং সেবাশ্রমে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে **'টাকা মাটি, মাটি টাকা, মানবজীবন অসার করে'** গানটি গাইতেন এবং ভক্তরা তাঁর অনুগমন করত। তিনি কাঁথিতে থাকাকালে একটি ধর্মসভায় বক্তৃতাও দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাঁথি সেবাশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন ত্যাগী পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীরও পদার্পণধন্য।

মনোহরচকে কালীপ্রসাদের বাড়িটি বিক্রির পরে সেবাশ্রম এই শহরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য দেবেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের একটি ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হতো। শ্রীশ্রীমায়ের অপর এক মন্ত্রশিষ্য সিদ্ধুনাথ পণ্ডা ঐসময় সক্রিয় কর্মিরূপে সেবাশ্রমের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উল্লিখিত ভাড়াবাড়িতে সেবাশ্রম স্থানান্তরিত হওয়ার আগে কাঁথির জমিদার সুরেন্দ্রনাথ শাসমলের মা নারায়ণী দাসী ১৯১৭ সালে ১০ কাঠা জমি বেলুড় মঠকে দান করেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উদ্যোক্তাদের আগ্রহে যুবক প্রিয়নাথ বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী শিবানন্দজীর কাছে কাঁথি আশ্রমে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজজী সম্মত হয়ে তাঁকে কাঁথি সেবাশ্রমের 'ইন-চার্জ' করেন ও দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে কাঁথি ফিরে এসে প্রিয়নাথ সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য কাজ আরম্ভ করেন। পরে ১৯২৬ সালে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হয়ে তিনি 'স্বামী পুণ্যানন্দ' নামে সুপরিচিত হন। ১৯২৩ সালে সেবাশ্রমের জন্য পাওয়া জমিতে খড়ের চালের কাঁচা বাড়ি তৈরি করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ স্থায়িভাবে আরম্ভ করেন। এখানেই সূচনা হয় 'সুরেন্দ্র পাঠাগার' এবং হোমিওপ্যাথি ডিস্পেনসারির। চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতেন ডাঃ হেমচন্দ্র মাইতি। সেবাশ্রমের এই কাঁচা বাড়ির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু ধুলোবালির সমস্যা নয়; কেন্দ্রটিকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। এমনকি উপযুক্ত বেড়া না থাকায় বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারও যখন তখন আশ্রমে ঢুকে পড়ত।

১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথ শাসমল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের মগরা চণ্ডীপুরে প্রায় ৫ বিঘা বাস্তু



সেবাশ্রমের প্রাণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

এবং ৪৫ বিঘা কৃষি জমি কাঁথি সেবাশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দান করেন। পরে তাঁর পুত্র নটেন্দ্রনাথ সেবাশ্রমের প্রথম পাকা বাড়ি তৈরির জন্য (বর্তমান আশ্রমের প্রবেশদ্বারের কাছে) ১৯২৬ সালে অর্থ দান করেন। এই বাড়িটি তৈরি হওয়ার পরে ১৯২৮ সালে কাঁথি সেবাশ্রম বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করে। ঐ বৎসর স্বামী রম্যানন্দ অধ্যক্ষ এবং স্বামী নির্বাণানন্দ প্রধান পর্যবেক্ষক হিসাবে মিশনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সালে স্বামী পুণ্যানন্দ অধ্যক্ষ-পদে এবং সুরেন্দ্রনাথ বসু পরিচালন কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। পুণ্যানন্দজীর কাজে ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী ইষ্টানন্দ) বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকেন। এরপর ধীরে ধীরে আশ্রমের কাজ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অধ্যক্ষের সময়ে কাঁথি আশ্রমে পদার্পণ করেছেন স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী প্রমুখ বরেণ্য সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কাঁথি আশ্রম গড়ে ওঠার পিছনে যেসব দাতা ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ শাসমল, নারায়ণী দাসী, মেঘনাদ নাগ, নটেন্দ্রনাথ শাসমল, পদ্মলোচন মাঝি, প্রমিলাসুন্দরী গিরি প্রমুখ।



নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়

স্বামী পুণ্যানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজের উদ্যোগে কাঁথি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শাখাকেন্দ্র হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের মনসাদ্বীপে ১৯২৮ সালে একটি আশ্রম ও পরের বছরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে আশ্রমটি বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করে এবং কাঁথি আশ্রমের পরিচালনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরিপূর্ণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে জেলা স্কুল বোর্ড এই বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করেছে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রথম দিকে কাঁথি আশ্রমে একটি কাঁচা বাড়িতে ঠাকুরের পূজা হতো। ১৯৫৯ সালে নতুন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হয় এবং বেলুড় মঠের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী উক্ত মন্দিরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করে মন্দিরটি ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গ করেন। আবার ১৯৭৯ সালে মন্দিরের সংস্কার, নাটমন্দির নির্মাণ প্রভৃতির কাজ আরম্ভ হয়। বেলুড় মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ১৯৮৪ সালে স্নানযাত্রার দিন মন্দিরে প্রতিকৃতি স্থাপন এবং মন্দিরের উদ্বোধন করেন। পরে ১৯৮৬ সালে রান্নাঘর ইত্যাদির জন্য নির্মিত হয় 'মা সারদা ভবন'। ঐ ভবন এবং মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তির উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের একাদশ অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী।

বর্তমান কাঁথি আশ্রমের উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিভিন্ন পল্লি-উন্নয়ন প্রকল্প। ছাত্রাবাসটির সূত্রপাত হয় ১৯১৭ সালে। ১৯৫১ সালে একটি একতলা বাড়ি তৈরি করে সেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠা হয় 'বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস'-এর। বর্তমানে এই ছাত্রাবাসে প্রায় ৩০ জন গ্রামীণ ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আশ্রমের গ্রন্থাগারের (সুরেন্দ্র পাঠাগার) সূচনা ১৯২২ সালে। এখন এখানে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৬,০০০। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পটি ১৯৮৮ সাল থেকে এলাকার গরিব ও অনুন্নত মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনিযুক্তি প্রকল্প, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ১৩টি অবৈতনিক প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল ও তার কাছাকাছির কয়েকটি গ্রামের ৫০০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐরকম আরো ১০টি কেন্দ্রে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মৎস্যজীবী, রিক্সাচালক, দিনমজুর প্রভৃতি ঘরের সেইসব ছাত্রের জন্য অবৈতনিক টিউশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাদের অন্য কোথাও টিউশন নেওয়ার উপায় নেই। এছাড়া চিকিৎসা-পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন গ্রামের ৭টি কেন্দ্রে সপ্তাহে দুবার করে গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যুবক-যুবতীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও স্বনিযুক্তির জন্য কাঠের, সেলাইয়ের ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লিখিত প্রধান কর্মসূচীগুলি ছাড়াও বয়স্ক মহিলাদের জন্য বিনাবেতনের শিক্ষা, কর্মরত মেয়েদের জন্য নৈশবিদ্যালয়, বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা (অ্যালোপ্যাথিক), দরিদ্র রোগী ও জনসাধারণকে সাহায্যদান, বস্তিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থসামাজিক কল্যাণে সাহায্যদান প্রভৃতির জন্যও কাঁথি আশ্রম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর আশ্রমের নিত্য ধর্মীয় কর্মের মধ্যে আছে পূজা, সঙ্কীর্তন প্রভৃতি। এছাড়া ঠাকুর, মা, স্বামীজী, ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ, বুদ্ধ, যিশু প্রমুখের জন্মতিথি পালন করা হয়। সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা।

গত ১-২ মে ২০০৪ আশ্রমের 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি' উৎসবের সমাপ্তি-পর্ব উদ্‌যাপিত হয় বিশেষ পূজা, সাধুসেবা, ভজন, কীর্তন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে। ২ তারিখ উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হিসাবে আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ। ঐদিন ১৪১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং তাদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করা হয়। উৎসবের উভয় দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রমানন্দজী। 'কথামৃত' ও 'শ্রীরামচরিতমানস' পাঠ ও আলোচনা

করেন যথাক্রমে স্বামী শ্রীনিবাসানন্দজী ও স্বামী আত্মদেবানন্দজী। কয়েক হাজার ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে উৎসবটি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। *(প্রতিবেদক : সোমনাথ ভট্টাচার্য)*

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গৌহাটি : গত ২১ মে ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ আগমন করেন এবং ৩১ মে ২০০৪ পর্যন্ত দীক্ষা প্রদান করেন। গত ৫-৬ জুন ২০০৪ পূজ্যপাদ মহারাজজীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ৫ তারিখ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের সূচনা ও সমাপ্তিতে পূজ্যপাদ মহারাজজী ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে আশীর্বাণী প্রদান করেন এবং সম্মেলন-শেষে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর এক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইটানগর, চেরাপুঞ্জি ও শিলং আশ্রমের অধ্যক্ষ-সহ কয়েকজন সন্ন্যাসী এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ৬ তারিখ পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথমে তিনি স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে কয়েকটি তাঁত-শাল (স্থানীয় তাঁতযন্ত্র) ও সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ 'মাতৃ অনুধ্যান' প্রকাশ করেন। সমাপ্তি ভাষণে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দেবী-মানবী ভাবের ব্যাখ্যা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী দেবময়ানন্দজী ও স্বামী বিমলাত্মানন্দজী এই সভায় ভাষণ দেন। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক : গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ শান্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত ধ্যান, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে যুব ও ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যথাক্রমে ২৬৮ জন প্রতিনিধি ও ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। দুদিনে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী প্রমুখ। ব্রহ্মচারিবৃন্দ, যুব-প্রতিনিধি ও ভক্তবৃন্দ সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। যুব-প্রতিনিধিদের স্বামীজীর ছবি ও গ্রন্থ এবং শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উভয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র উপহার দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক (কলকাতা-২৯) : গত ১২ জুন ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টায় 'বিবেকানন্দ হল'-এ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে শ্রীমতী বার্কের অবদান' বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, মেরি লুই বার্ক বা সিস্টার গার্গীর নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যপাঠকদের কাছে সুপরিচিত। গত ২০ জানুয়ারি ২০০৪-এ ৯২ বছর বয়সে এই বিদগ্ধা বিবেকানন্দ-গবেষিকার জীবনাবসান হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সহাধ্যক্ষ মহারাজজী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের সেবক থাকার সৌভাগ্যে সঙ্ঘের বহু ভক্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু সিস্টার গার্গীর মতো 'ঐকান্তিক আন্তরিক ভক্ত' কদাচিৎ দেখা গেছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানতেন না। ধনী, বিদুষী এই পাশ্চাত্য মহিলা ঠাকুরের প্রসাদ যেরকম ভক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন, তা দেখে অবাক হতে হতো। তিনি যথার্থই ছিলেন 'প্রজ্ঞাপ্রাণা'। স্বাগত ভাষণে স্বামী প্রভানন্দজী সংক্ষেপে সিস্টার গার্গীর জীবনালেখ্য বর্ণনা করে বলেন, গুরু স্বামী অশোকানন্দজীর নির্দেশে তিনি ছয় খণ্ডে 'Swami Vivekananda in the West: New Discoveries' রচনা করেন। এই বিরাট সাহিত্যকৃতির জন্য তদানীন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ৩ জানুয়ারি ১৯৮৩ ইনস্টিটিউটের প্রথম 'বিবেকানন্দ পুরস্কার'-এ তাঁকে ভূষিত করেন। 'সিস্টার গার্গী' নামটি তাঁরই দেওয়া। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ('শঙ্কর' নামে খ্যাত) ইংরেজিতে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি প্রথমে সিস্টার তাঁর গুরু স্বামী অশোকানন্দজীর মননশীল জীবনের কথা উল্লেখ করেন—যাঁর নির্দেশে গার্গীর বিবেকানন্দ-অন্বেষণ। অতঃপর এই গবেষণায় তাঁর বিপুল পরিশ্রম, ক্ষুরধার বিচারক্ষমতা এবং একান্ত নিষ্ঠার কথা সুললিত ভাষায় বর্ণনা করে তিনি মন্তব্য করেন, গার্গী হলেন ভারতের প্রতি আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর মননদীপ্ত ভাষণে বলেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাছে সিস্টার গার্গী যে কতটা গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী, তার প্রমাণ এই সভায় পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক মহারাজজী, অছি পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং শ্রীসারদা মঠের পূজনীয়া সন্ন্যাসিনীদের উপস্থিতি। গার্গীর মহান সাহিত্যকৃতির বিশদ পরিচয় দিয়ে ও তাঁর গবেষণার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক বসু বলেন, বিবেকানন্দ-অন্বেষণার পথিকৃৎ হলেন গার্গী এবং তাঁর নিজের জীবনব্যাপী বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষণাও এই নিবেদিতপ্রাণ গবেষিকার পথ অনুসরণ করেই। বিবেকানন্দ-জীবনের পাশ্চাত্যের দিনগুলির বহু অজানা অপরিচিত তথ্য গার্গীর গবেষণার ফলে জগতের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। সভাপতির ভাষণে গার্গীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ সিস্টার গার্গীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সভায় সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর : গত ১১ জুলাই ২০০৪ ভক্তিগীতি, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্গাপুর তারকনাথ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভার সভাপতি স্বামী অমেয়ানন্দজী। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী কৃত্তিবাসানন্দজী। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী কৌশিকানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী কেশবাত্মানন্দজী। বৈকালিক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১,৬০০ ভক্ত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়—**ভারতে :** ছাপরা, গৌহাটি, ইন্দোর, মায়াবতী। **বহির্ভারতে :** টরন্টো (কানাডা)।

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে ২০০৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়গুলির ফলাফল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়	পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
আসানসোল	১৩৬	১৩২	৮৪
বরানগর	১৪২	১৩৮	৯৪
কামারপুকুর	৮৯	৮৬	৩৭
কাটিহার	৬৮	৬৩	৩৩
মালদহ	১০১	১০১	৭৪
মনসাদ্বীপ	৭৪	৫৫	২২
মেদিনীপুর	১২২	১২১	৫৮
নরেন্দ্রপুর (বিদ্যালয়)	১৩৫	১৩৫	১২৬
(ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি)	১২	১২	১২
পুরুলিয়া	৯২	৯১	৬৭
রহড়া	১৮৮	১৮৮	১৩৯
রামহরিপুর	৭৬	৫৪	১৪
সারগাছি	৮২	৭২	২২
সরিষা (বয়েজ স্কুল)	১৫২	১৪৫	৭২
(গার্লস স্কুল)	১৩৮	৮১	১২
টাকি	৬১	৬০	২২

মেঘালয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরিচালিত ২০০৪ সালের পরীক্ষায় **চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ের** ফলাফল নিম্নরূপ :

পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	পাশের হার
মাধ্যমিক	৫৯	৩৩	৯৮.৩%
উচ্চ মাধ্যমিক	৫৯	৩৭	১০০%

অরুণাচল প্রদেশের ২০০৪ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় **নরোত্তমনগর বিদ্যালয়ের** ফলাফল নিম্নরূপ :

পরীক্ষা	নির্বাচিত ছাত্র	স্থান
ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫	১, ২ ও ৪
মেডিক্যেল	৯	১, ৪ ও ৫

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৪ সালের স্নাতক (পার্ট টু) পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ :

মহাবিদ্যালয়	পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	পাশের হার
বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ)	১১০	৫৪	৯৮.১৮%
আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুর	১৩৫	৪৯	৯৫.৫৫%

দেহত্যাগ

স্বামী মহানন্দজী (সিতাংশু মহারাজ) গত ২ জুন ২০০৪ বেলা ১০টা ৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে 'বারাণসী হোম অফ সার্ভিস'-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবিটিস রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ সালে দিনাজপুর (অধুনা বাংলাদেশে) কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী ও কলকাতা), চেরাপুঞ্জী, বাগবাজার, ইনস্টিটিউট অফ কালচার (কলকাতা), বাঁকুড়া এবং জয়রামবাটী কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। প্রায় দশ মাস তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের সেবা করেন। ১৯৬৮ সালে ওড়িশার ঢেঙ্কানল জেলার হিনডোলে খরাত্রাণে এবং ১৯৭৭ সালে অসমে বন্যাত্রাণে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি রামহরিপুর, পাটনা এবং বরানগর কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। গত ২১ বছর যাবৎ তিনি 'বারাণসী হোম অফ সার্ভিস'-এ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মোদ্যমী, সুবক্তা ও বিভিন্ন কাজে দক্ষ। তিনি একজন ভাল লেখকও ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনাও করেছেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

বিশেষ অনুষ্ঠান : গত ২ জুলাই ২০০৪ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে স্বামী অমলাত্মানন্দজী বিশেষ পাঠ ও আলোচনা করেন।

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১৫ জুলাই ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

জগৎপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পূর্বকৃষ্ণপুর (হুগলি) : গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী সুজয়ানন্দজী, স্বামী শক্ত্যানন্দজী, স্বামী বাণীশ্বরানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী জাতবেদানন্দজী ও হিমাংশু মুখার্জি। ১৫ তারিখ সারাদিন ধরে ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ৩৫০ জন প্রতিযোগীকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও ছবি দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি) : গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১৫ তারিখ সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা অচলপ্রাণাজী। তারপর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী জিনানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী ও হর্ষ দত্ত।

বীরনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ তারিখ সকালে অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভক্তিগীতির পর 'যৌবনে বিবেকানন্দ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৫ তারিখ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন শীলা সেন, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য ও বাসবী চক্রবর্তী। এদিন ২০০৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী বীরনগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৃপানন্দজী।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভজন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, চিত্র-প্রদর্শনী, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র এবং ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী, সন্তোষকুমার ঘোষ, স্বর্ণকমল বিশ্বাস ও ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। ১৫ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বেলডাঙা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ)ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় মানবসেবা করার উদ্দেশ্যে বহরমপুর-নিবাসিনী অঞ্জলি রায়চৌধুরী কর্তৃক পাঠচক্রকে প্রদত্ত জমিতে (৬ কাঠা) ভূমিপূজা করেন স্বামী গোপেশানন্দজী। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী। স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক প্রশান্ত শ্রীমানী। এদিন প্রায় ১৮০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বনগ্রাম ললিতমোহন বাণীভবনে সারাদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুব/শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী ও সন্তোষকুমার ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের মুখপত্র 'অভিঃ' প্রকাশিত হয়। এতে ৩৭০ জন প্রতিনিধি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমরুল (হুগলি)ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সানাইবাদন, বৈদিক মন্ত্র, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

শব্দচেতনা 

পুরাণভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

■	১			২	■	৩	■	■	৪
৫		■	■		■	৬			
	■	■	৭		৮	■	■	■	
৯				■		■	১০		
■	■	■		■	১১	১২		■	
১৩	■	১৪		১৫	■		■	■	■
১৬			■		■	১৭			১৮
	■	■	■	১৯	২০		■	■	
২১			২২	■		■	■	২৩	
	■	■		■	২৪				■

পাশাপাশিঃ (১) অন্যতম অংশাবতার (৫) কিষ্কিন্ধ্যাপতি কপিরাজ (৬) কন্দর্পদেবের এক নাম (৭) বিভীষণের পত্নী (৯) চন্দ্রের এক নাম (১০) দশমহাবিদ্যার এক রূপ (১১) কার্তিকের দ্বারা নিহত অসুরবিশেষ (১৪) সতীর পতি (১৬) ব্রহ্মার এক মানসপুত্র (১৭) কাশীরাজকন্যা ও ভীমের পত্নী (১৯) ঋগ্বেদের এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি (২১) পঞ্চম পাণ্ডব (২৩) অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের গুপ্ত নাম (২৪) ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র।

ওপর-নিচঃ (১) বামন অবতারে বিজিত দৈত্যরাজ (২) গঙ্গাদেবীর বাহন (৩) সূর্যের এক পুত্র (৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (৫) দেবগুরু বৃহস্পতির এক নাম (৭) আর্যদের উপাস্যা (৮) সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজা (১০) ভীমের দ্বারা নিহত রাক্ষস (১২) শ্রীরামচন্দ্রের এক নাম (১৩) পাক নামক অসুরের নিহন্তা ইন্দ্র (১৪) ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এক পুত্র (১৫) শচীর পতি (১৮) যে-নামে নিজের পরিচয় দিতেন কর্ণ (২০) শ্রী-যুক্ত এই নামে অযোধ্যার এক রাজা (২২) গঙ্গার অষ্ট পুত্র (২৩) এই অসুরকে দমন করে বিষ্ণু হয়েছেন 'জনার্দন'।

প্রশান্ত গুপ্ত

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম কার্তিক ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গুরুদাসনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫০৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহকুমাশাসক অমিতাভ মৈত্র। স্বাগত ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক ডাঃ সুকুমার গোস্বামী। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী এবং স্বামী অচ্যুতানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রদত্ত 'স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থ এবং স্বামীজীর ছবি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা-১১০) ঃ গত ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। তিনদিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অবক্তাপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা শিবলোকপ্রাণাজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, মধুমিতা ঘোষ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। ১৬ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বেড়াচাঁপা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও জনকল্যাণ সংস্থা (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী ও স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, শিকড়াকুলীন গ্রামের ব্যবস্থাপনায় ১২০ জন মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (কলকাতা-৩২) ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে পদার্থবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক কে. পি. বসু মেমোরিয়াল হল-এ এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বক্তাদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আহ্বায়ক অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ জোয়ারদার এবং অধ্যাপক আনন্দময় মান্না। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কুশলেন্দু গোস্বামী প্রমুখ। এই সভায় ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অনেক বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে পদার্থবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৯) ঃ গত ২০-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা', বেদ ও স্তোত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, পুরস্কার প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস ও রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি আশীর্বাণী প্রদানের পর স্মারকগ্রন্থ 'অমৃতম্-২০০৪' প্রকাশ করেন। এদিনের ধর্মসভায় সকলকে সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও সম্পাদক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূতানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে সারদা মহিলা শাখার উদ্যোগে ১০ জন মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের শিলচর-নিবাসী শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য গত ১৫ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির মাহেশ-নিবাসী রাখালদাস রায় গত ১৭ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কলকাতার বাগবাজার-নিবাসী বিদগ্ধ অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন গত ১৮ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী মায়া রায় গত ২৭ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী কমলেন্দ্রনাথ দত্ত রায় গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজের ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন ঃ "নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।" নরেন্দ্রনাথ এতে অসম্মতি জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "তোর হাড় করবে।" উক্ত চিরকুটে তিনি এঁকেছিলেন একটি পুরুষের মুখাবয়ব—হয়তো তাঁর নরেনকে মনে করে। তার পিছনে এঁকেছিলেন একটি ময়ূর। আধুনিক কালের পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে নরেন্দ্র তথা স্বামী বিবেকানন্দের মহাপরিক্রমা—ময়ূরের পিঠে চড়ে কার্তিকের বিশ্বপরিক্রমার মতোই শ্রীশ্রীঠাকুরের শক্তিকে অবলম্বন করে তাঁর ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য অভিযান। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসভা ছিল তার প্রথম প্রকাশ। এরপর দীর্ঘ প্রায় নয়বছর ধরে বিভিন্ন সময় তিনি পাশ্চাত্যভূমিতে 'হাঁক' দিয়েছেন, ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্যবাসীকে 'শিক্ষে' দিয়েছেন। আজও সেই মহান ব্রতকে সযত্নে পালন করে চলেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। প্রচ্ছদে উপস্থাপিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সান ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি ভারতবর্ষের বাইরে সুদূর পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম শাখাকেন্দ্র। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই কেন্দ্রের স্থাপনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের এই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ৭ জানুয়ারি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই মন্দিরটিই সমগ্র পাশ্চাত্যজগতে প্রথম হিন্দু মন্দির।



আগন্তুক: আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত: আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক: আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী



> There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
>
> Sri Ma Sarada Devi



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ২

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা ঃ হাওড়া

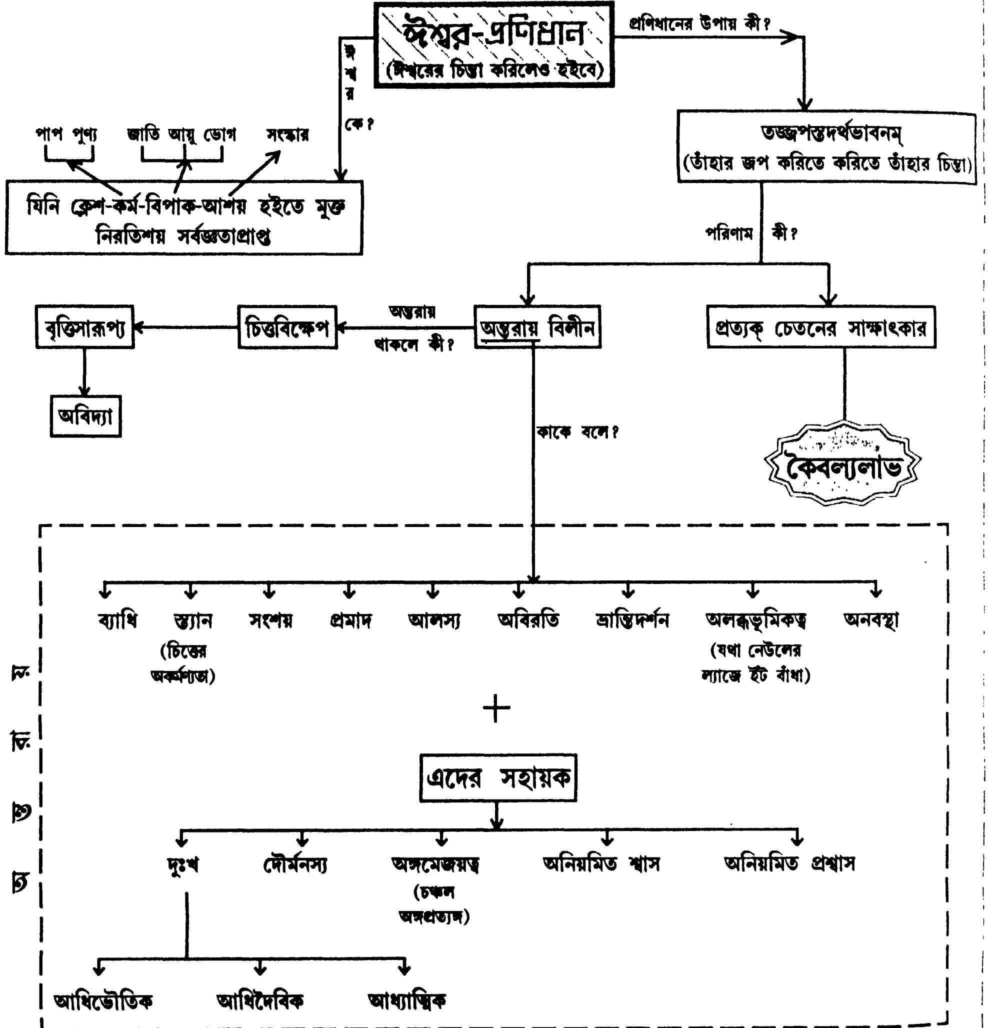
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন ঃ ২৬৪২-০৯৩২
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা ঃ শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন ঃ ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন ঃ ২৬৬০-১০৮৪
- **শুকদেব সাঁতরা**, গ্রাম ঃ উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল-৭১১ ৪০৪
- **সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন ঃ ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন ঃ ২৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫
  ফোন ঃ ২৬৫৯-১১৪৪
- **দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন ঃ ২৬২৯-০০৮৮
- **বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ বেলাড়ী, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫
- **দীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্কাশী, থানা ঃ বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭
  ফোন ঃ ২৬৬১-৮১১২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন**
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন
  বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন ঃ ২৬৬৮-০০১৪
- **সম্পাদক, উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ**
  উলুবেড়িয়া

জেলা ঃ মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন ঃ (০৩২২৭) ২৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৬২১০৫
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম ঃ বরুণা (ভুতা), পোঃ ভুতা, থানা ঃ দাসপুর
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৬০২৭১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬
- **ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন ঃ (০৩২২২) ২৭০৩৪৬

পাতঞ্জল যোগসূত্র অবলম্বনে

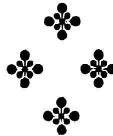
পরবৈরাগ্য অবলম্বনে শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞার মাধ্যমে নির্বীজ সমাধিলাভ সাধারণের জন্য কষ্টসাধ্য বিধায় মহামুনি পতঞ্জলি একটি বিকল্প উপায় নির্ণয় করিলেন ঃ



জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

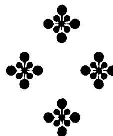
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



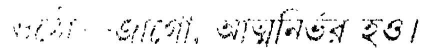
ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ


আত্মনির্ভর হও।

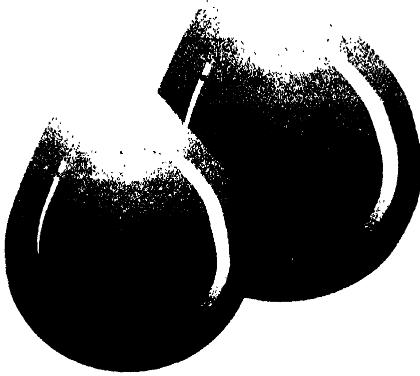
UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

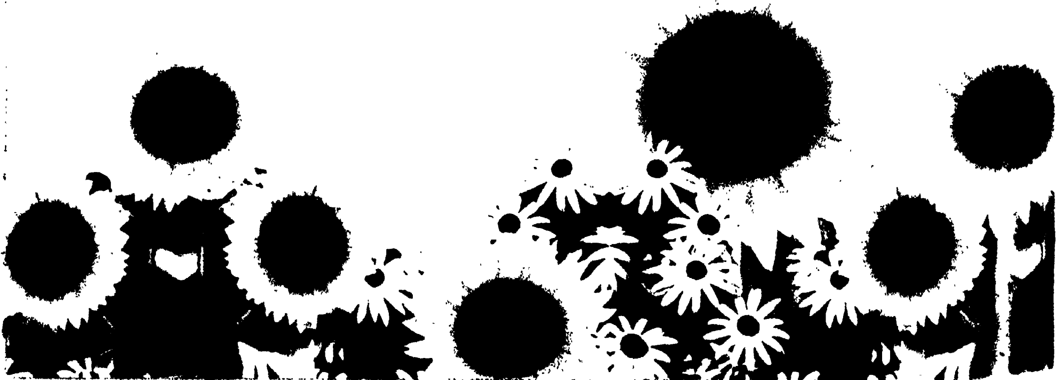
Vol.106
No.8
August
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06









উদ্বোধন সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা । সডাক ১০০ টাকা । এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা

If undelivered, Please ret[illegible] it to
Udbodhan Of[illegible]ice,
1 udbodhan Lane, Kolk[illegible]a-3

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৬ ॥

শারদীয়া সংখ্যা



অঘ্রান ১৪১১ * ৯ম সংখ্যা * উদ্বোধন কার্যালয় * কলকাতা-৩

মনে রাখবেন

ভারত সরকার কেবল
আসল মার্কার
ওপরই Ⓡ চিহ্ন লাগাবার
অধিকার দেন।

তাই সবসময়ে
আসল দুলালের Ⓡ
তালমিছরির লেবেলে



শিশুর খাদ্য,
রোগীর পথ্য এবং
সর্দিকাশি উপশমে
ঘরে ঘরে সমাদৃত



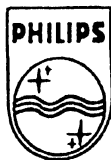


Ⓡ
দুলালের
তালমিছরি কিনুন

৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২২১৮-৫৬৭৩, ২২১৮-০৫৪৩

PRASA/96

Let's make things better.



PHILIPS

He is a true hero who performs all the duties of the world with his mind fixed on God.

Sri Ramakrishna

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● সারদাপীঠের ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২
ই-মেল ঃ rmsppp@vsnl.com ● (বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৫৭০০-০৩)

যেসব অ্যালবামের ক্যাসেট (মূল্য ঃ ৩৫ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য ঃ ১০০ টাকা) দুই-ই আছে

ক্যাসেট/সিডি কোড নং	অ্যালবামের নাম
(SP-1)/(CD/SP-1)	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
(SP-3)/(CD/SP-3)	শ্রীরামনাম-সংকীর্তন
(SP-9)/(CD/SP-9)	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
(SP-13)/(CD/SP-13)	শ্রীসারদাবন্দনা
(SP-23)/(CD/SP-23)	ওঠো জাগো
(SP-27)/(CD/SP-27)	বেদমন্ত্র
(SP-31–34)/(CD/SP-31–34)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *(১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড)*
(SP-37)/(CD/SP-37)	সবাই মিলে গাই এসো
(SP-38)/(CD/SP-38)	যুগে যুগে হরি
(SP-39)/(CD/SP-39)	শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্
(SP-36,40)/(CD/SP-40)	ভজন সুধা *(২ খণ্ডে)/(১ খণ্ড—CD)*
(SP-41-44)/(CD/SP-41-44)	শ্রীশ্রীচণ্ডী *(১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড)*
(SP-45)/(CD/SP-45)	অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর

অংশগ্রহণে ঃ
স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, প্রদ্যোৎ মৈত্র, অনুপ জালোটা ও আরো অনেকে।

সারদাপীঠ প্রকাশিত ভি.সি.ডি. (মূল্য ঃ ২০০ টাকা)

(VCD/SP-1A, 1)	শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন *(বাঙলা ও ইংরেজিতে)*
(VCD/SP-2, 2A)	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক
(VCD/SP-3A, 3B, 3)	মা সারদার চরণ রেখা *(বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে)*

সারদাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূল্য ঃ ২৫০ টাকা)

All India Youth Convension & All India Devotees Convention at Belur Math (1988)

সারদাপীঠ থেকে প্রস্তুত ভেষজ গঙ্গা ধূপ

৫০ কাঠি প্যাকেট—১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট—২৪ টাকা

সারদাপীঠের উৎপাদিত অন্যান্য পূজাসামগ্রী

পঞ্চপ্রদীপ *(জার্মান সিলভার)*	৮০০ টাকা	ঝাড়প্রদীপ *(পিতলের সীট)*	৭৫০ টাকা
কর্পূরদানি *(পিতলের সীট)*	৩৭৫ টাকা	দীপদানি *(পিতলের সীট)*	৩৫০ টাকা

এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধূপদানিও পাওয়া যায় (পিতল ঢালাই করে তৈরি)

ক্যাসেট/সিডি/ভি.সি.ডি. প্রাপ্তিস্থান ঃ
বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং
মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন’ ঃ **১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **‘Udbodhan Office’**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের **গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **‘নতুন গ্রাহক হতে চাই’** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

‘চেক’ গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে ‘উদ্বোধন’কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে ‘উদ্বোধন’ ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে ‘উদ্বোধন’-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ‘উদ্বোধন’, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥
১০৬তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা আশ্বিন ১৪১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

[পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৫০ টাকা





পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উদ্বোধন কার্যালয়ের সকল বিভাগ ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর (২০০৪) বন্ধ থাকবে।




দিব্য বাণী

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরিদং মহেশঃ, শক্ত্যা তবৈব হরতে ননু চান্তকালে।
ঈশা ন তেঽপি চ ভবন্তি তয়া বিহীনা-স্তস্মাত্ত্বমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্ত্রী॥
কীর্ত্তির্মতিঃ স্মৃতিগতী করুণা দয়া ত্বং, শ্রদ্ধা ধৃতিশ্চ বসুধা-কমলাজপা চ।
পুষ্টিঃ কলাথ বিজয়া গিরিজা জয়া ত্বং, তুষ্টিঃ প্রমা ত্বমসি বুদ্ধিরুমা রমা চ॥
বিদ্যা ক্ষমা জগতি কান্তিরপীহ মেধা, সর্ব্বং ত্বমেব বিদিতা ভুবনত্রয়েঽস্মিন্।
আবির্বিনা তব তু শক্তিভিরাশু কর্ত্তুং, কো বা ক্ষমঃ সকললোকনিবাসভূমে॥
স্মরিষ্যামো যথা তেঽম্ব সদৈব পদপঙ্কজম্।
তথা কুরু জগন্মাতর্ভক্তিং ত্বয্যপ্যচঞ্চলাম্॥
অপরাধসহস্রাণি মাতৈব সহতে সদা।
ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্‌যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ॥



হে জননি! আপনার শক্তিতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিণামে জগতের লয় করে থাকেন। হে দেবি! আপনার শক্তি বিনা তাঁরা স্ব স্ব কার্য করতে অক্ষম। আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্রী। হে দেবি ভগবতি! আপনিই যে এই সংসারে কীর্তি, মতি (মন), স্মৃতি, গতি, করুণা, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, বসুধা, কমলা (লক্ষ্মী), অজপা (আধ্যাত্মিকতা), পুষ্টি, কলা, বিজয়া, গিরিজা, জয়া, তুষ্টি, প্রমা (ইন্দ্রিয়ানুভব), বুদ্ধি, উমা ও রমারূপে বিরাজ করেন এবং বিদ্যা, ক্ষমা, কান্তি, মেধাদি অখিল শক্তিই যে আপনি—ত্রিভুবনে একথা কারও অজানা নেই। হে মাতা! আপনাতেই অখিল জীব অধিষ্ঠিত। আপনার শক্তি ভিন্ন কে কবে কোন্ কার্য করতে সমর্থ?

হে অম্ব! সর্বদা যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করতে পারি, হে জগন্মাতা! আমাদের সেইপ্রকার অচলা ভক্তি দিন। জগতে একমাত্র আপনিই, হে জননি, সন্তানের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, একথা জেনেও না জানি কেন লোকে আপনার ভজনা করে না!

দেবীভাগবতম্ (৫।১৯।২-৪, ৩৭-৩৮)

"দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ"

কলিকাতার রাজপথ আলোর মালায় সুসজ্জিত। রাত্রি যত গভীর হইতেছে, বিচিত্র বর্ণের আলোয় যেন চতুর্দিক ততই উদ্ভাসিত হইতেছে। দিকে-দিগন্তে বিচিত্র বাদ্য ও সঙ্গীতধ্বনি প্রাণে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছে। এখানে-সেখানে বিশালায়তন পূজামণ্ডপে স্রোতের ন্যায় মানুষের ঢল। কেহ বা তাহার পথপার্শ্বস্থ চতুর্বিধ খাবারের দোকান লইয়া ব্যস্ত, কেহ ব্যস্ত মাইকে পরবর্তী কোন্ গান বাজাইবে তাহা লইয়া, কেহ দ্রুতপদে গমন করিতেছে মায়ের ভোগারতি দেখিবে বলিয়া, কেহ ব্যস্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিয়া পথিকের সুবিধা করিয়া দিতে। কাহারো মাথার উপর শামিয়ানায় কতই না চালচিত্র আর ঝাড়ের বাহার! কেহ বা দাঁড়াইয়া আছে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। পদতলে সর্বংসহা মেদিনী, অন্তরে পুলক, প্রাণে পূতিগন্ধময় অতীতকে ভুলিয়া নূতন করিয়া বাঁচিবার অনির্বচনীয় প্রেরণা। একদা আমাদের জন্ম হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবু সৃষ্টি ও লয়-এর মধ্যবর্তী এই স্থিতিকালে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনির্ণেয়। অনবরত একটা নূতন জীবনলাভের জন্য তাহার অদম্য প্রচেষ্টা। এই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাই জীবন। যাহার এই চেষ্টা নাই, সে মৃত। যাহার যেটুকু সীমা, সে উহারই মধ্যে নূতন জীবনের সন্ধানে রত। ভূমিকম্পে গৃহ যদি ভাঙিয়া পড়ে, তখন সে ছুটিয়া বাহিরে আসে নূতন জীবনের অন্বেষণে। অনন্ত সমুদ্রে তরী দ্বিখণ্ডিত হইলে এক কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া অন্বেষণ করে, 'নূতন জীবন কোথায়?' মেধা ঋষি অতি সুন্দর ছন্দে, কাব্য-লালিত্যে এই অন্বেষণের কথাই সূচনা করিয়া বলিলেন—

"ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।১১৬)

—তখন সেই মহনীয়া দেবী জগদ্ধাত্রী দুর্গা ভগবতী বাহিরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেও হাস্যপূর্ণ অন্তরে ইহাই বলিলেন।

কাহাকে বলিলেন? কী বলিলেন? কেন বলিলেন?

সুগ্রীবকে বলিলেন। সুগ্রীব আসিয়াছিল শুম্ভ-নিশুম্ভের দূতরূপে। স্বর্গ হইতে ইতোমধ্যে দেবতাগণ বিতাড়িত হইয়াছেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ এখন স্বর্গাধিপতি। মর্ত্যের যজ্ঞভাগ সবই তাহারা গ্রহণ করিতেছে। ফলে চতুর্দিকে দেবপ্রাধান্য খর্ব হইতেছে। অগ্নির তেজ কমিয়াছে, বায়ুর চলিবার শক্তি নাই, বরুণের কৃপার অভাবে পৃথিবী জলশূন্য। চতুর্দিকে হাহাকার। দেবতাগণ কোনক্রমে আত্মগোপন করিয়া দেবীর স্তুতি করিতেছেন: "দুর্গা দুর্গতিহারিণী", "যয়েদং ধার্যতে জগৎ"—যিনি এই বিশ্বচরাচর ধারণ করিয়া থাকেন। বিশ্বচরাচর ও সর্বপ্রাণিকুলের অস্তিত্বের কারণ-স্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিয়া দেবতাগণ দেবীকে প্রীত করিয়াছেন। পার্বতীর সন্তুষ্টি যেন রূপপরিগ্রহ করিয়া হইলেন মহাদেবী কৌশিকী। সেই কৌশিকীকে তুষারশৃঙ্গে স্বমহিমায় বিরাজিতা দেখিয়া চণ্ড-মুণ্ড ছুটিয়া গেল প্রভু শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট। বলিল: হে দেব, আপনাদের পদতলে ত্রিভুবন। সংসারের সকল ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধীশ্বর আপনাদের যোগ্যা গৃহিণীকে আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি। এমন রূপ কোথাও দেখি নাই। এই চার্বঙ্গী দেবী নিজের রূপে যেন হিমালয় আলো করিয়া বসিয়া আছে। সেই দেবী ব্যতীত আপনাদের রাজসভা কখনোই শোভা পাইবে না। সবই তো আপনারা অধিগত করিয়াছেন। কেন এই অতুলনীয়া তন্বীর পাণিগ্রহণ আপনারা করিবেন না? এখনই তাহার ব্যবস্থা করুন। চণ্ড-মুণ্ডের বর্ণনা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ সুগ্রীব নামক দূতকে প্রেরণ করিল দেবীর সকাশে। সুগ্রীব শক্তিমদগর্বিত শুম্ভ-নিশুম্ভের গুণগান করিয়া প্রস্তাব রাখিল, দেবী যেন সত্বর তাহাদের গৃহ আলো করিবার জন্য তাহার সঙ্গে চলিয়া আসেন।

দেবী গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। অন্তরে হাসিলেন। বলিলেন—

"সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥

শারদ প্রার্থনা

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দেবী-আরাধনার পুণ্যলগ্ন সমাগতপ্রায়। শুধু বাঙালি নহে, অবাঙালির ঘরেও এই 'অকাল-বোধন' আনন্দময় হইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই শুভক্ষণে 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত সকল পাঠক-পাঠিকা, শুভার্থী, ভক্ত, বিজ্ঞাপনদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রার্থনা করি—প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ে, ত্যাগ ও সেবায়, পবিত্রতা ও কর্মোদ্যমে আমাদের অন্তর পূর্ণ হউক, স্বার্থবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হউক, "মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর"—এই মহামন্ত্র নিরবধি আমাদের অন্তরে অনুরণিত হউক। নবজীবনের পথে আমাদের মহান উত্তরণ ঘটুক।





—সম্পাদক

শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥"

(ঐ, ১১৮-১২০)

—তুমি ঠিকই বলিয়াছ। শুম্ভ-নিশুম্ভের ন্যায় শক্তিশালী আর কাহাকেও তো ত্রিভুবনে দেখিতেছি না। কিন্তু আমি মূর্খ নারী। নিজেরই অল্পবুদ্ধির কারণে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, যে-ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, যে আমার অহঙ্কার বিনাশ করিবে, সে-ই আমার ভর্তা বা পতি হইবে, অন্যে নহে।

কী সাঙ্ঘাতিক কথা! যে-শক্তি অহঙ্কার-স্বরূপ, তাঁহার অহঙ্কার কে বিনাশ করিবে? নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হইলে এই বহুত্ব কোথা হইতে আসিল? বেদান্তের এই চরম প্রশ্নের একটিই উত্তর, যে-শক্তিবলে 'এক' বহু হইলেন, তিনিই অনির্বচনীয়া আদ্যাশক্তি মহামায়া, ত্রিগুণাত্মিকা পরা প্রকৃতি। ক্রমে সত্ত্ব-রজঃ-তমোর বিভিন্ন সংমিশ্রণে এই জগৎপ্রপঞ্চ রূপপরিগ্রহ করিল। এই জগৎপ্রপঞ্চেরই অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবগণ, যক্ষ, কিন্নর, অসুর, দানব, মানুষ, পশুপক্ষী, জড় প্রকৃতি, আন্তরপ্রকৃতি, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। আর সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী আদ্যাশক্তি মহামায়া নাকি বলিতেছেন—আমাকে যে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, যে আমার 'অহঙ্কার' চূর্ণ করিবে, সে-ই আমার পতি হইবে! সেই "বহে মাত্র আমি আমি—এই ধারা" যদি বিনষ্ট হয় তখন তো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরও অতীত নির্বিকল্প চিদানন্দঘন এক অনির্বচনীয় সত্তাই কেবল বিরাজ করিবেন, তখন কোথায় স্বর্গ, কোথায় মর্ত্য, কোথায় ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ-যম-অগ্নি, কোথায় বা 'আমি' আর 'তুমি'? আর সেই 'চ্যালেঞ্জ' মূর্খ শুম্ভ-নিশুম্ভ নিশ্চিন্তে গ্রহণ করিয়া বীরদর্পে দেবীকে 'চুলের মুঠি' ধরিয়া ('কেশাকর্ষণনির্ধূত...') লইয়া যাইবার উপক্রম করিল! ইহাই তাহাদের নিকট নূতন জীবনের অন্বেষণ। আলঙ্কারিক এবং আক্ষরিক—দুই অর্থেই।

যে-শক্তিতে আমরা বাঁচিয়া আছি, যে-শক্তি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছে—সেই শক্তিই ধর্ম-শক্তি, যাহা ধারণ করিয়া থাকে। তাই ঋষি বলিলেনঃ "যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" দেবতারাও বলিয়াছিলেনঃ "ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ/ ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।" (ঐ, ১।৭৫)—হে দেবি, আপনিই পালন করেন, প্রলয়কালে আপনিই সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ধারকশক্তি না থাকিলে আমাদের জীবনধারণ হইত না। তাই পরমা সেই দেবীশক্তিই আমাদের নূতন জীবন অন্বেষণের প্রেরণা। শুম্ভ-নিশুম্ভ যে দেবীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গৃহিণীরূপে স্বগৃহে আনিবে—স্থূল অর্থে ইহাই তাহাদের নবজীবনের অন্বেষা। কিন্তু তাহারা মূর্খ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই যে, ঐপ্রকার প্রলুব্ধ মনই তাহাদের বিনাশের কারণ হইবে।

সত্যই কি তাহারা বিনষ্ট হইয়াছিল? শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে আমাদের অন্যরূপ বোধ হইতেছে। কিছুটা বিস্তারিত বলাই ভাল। যখন মধুকৈটভের জন্ম হইল শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল হইতে, তখন যে-মহাশক্তি যোগমায়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া ঐ অসুরদ্বয়ের বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন—তিনি মহাকালী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের এই বর্ণনায় মহাকালী তমোগুণাত্মক কারণ যোগমায়া সুপ্তাবস্থায় ছিলেন, দেবতাগণ নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে দেবী দুর্গা সকল দেবতার শক্তিতে সুসজ্জিত হইয়া আপন জ্যোতির্ময়ী কলেবরে জগৎকে আলোকিত করিয়া দশভুজা সিংহবাহিনী হইয়া যখন মহিষাসুরকে বধ করিলেন, তখন তিনি মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী—রজোগুণাত্মিকা। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তরচরিত্রের শুরুতেই আমরা দেখিব, দেবী পার্বতীর অঙ্গ-নিষ্ক্রান্ত শুভ্র জ্যোতির্ময়ী কৌশিকী মহাসরস্বতীস্বরূপা, সত্ত্বগুণাত্মিকা, দিব্যজ্ঞানপ্রদায়িনী। অর্থাৎ দেবী স্বীয় জ্ঞানের দ্যুতিতে যে-মুহূর্তে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদের অন্তরেও সেই জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইল এবং তাহাদের 'অহং'-এর বিনাশ ঘটিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞানীর আবির্ভাব হইল; দেবীর মাহাত্ম্য সেই মাতৃবৎসল সন্তানের মাধ্যমে জগতে সম্প্রচারিত হইল। ইহাই এই উপাখ্যানের মুখ্যার্থ।

অতএব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেবী ভগবতী কল্যাণময়ীরূপে (ভদ্রা) আবির্ভূতা হইয়া এই শারদ পুণ্যলগ্নে আমাদের সর্বতোভাবে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করুন এবং তাঁহার করুণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। এই প্রার্থনাই যেন ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

(ঐ, ১১।৩৫)

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের শাশ্বতের অন্বেষণ চলিতেছে, চলিবে। জান্তে-অজান্তে। যাহার অন্তরে জ্ঞান ও উপলব্ধির যতটুকু উদ্ভাস, তাহাকে পুঁজি করিয়া সে নূতন জীবনের সন্ধানে চলিতেছে। সম্মুখে যে পরম লক্ষ্য আমাদিগকে সর্বদা হাতছানি দিতেছে, প্রেমিক কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

"আর কেন মন এ-সংসারে যাই চল সেই নগরে—
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।"

দেবীর কৃপায় শুম্ভ-নিশুম্ভও কি মৃত্যুর পর 'সেই নগরে' গমন করিয়া 'নব আনন্দে' জাগিয়া উঠিবে? ❑



স্বামী সুবোধানন্দের পাঁচটি পত্র



স্বামী সেলানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত
অপ্রকাশিত ছবি

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

শুক্রবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ
রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
৺কাশীধাম

প্রিয় বিনোদবাবু,

গতকল্য আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। সম্মেলনের উৎসবের কাজ ভালভাবে হইয়াছে জানিয়া আরো সুখী হইলাম। আমি আজকাল শারীরিক ভাল আছি, মধ্যে একদিন বৃষ্টি হওয়াতে আর তেমন গরম নাই, পূর্ব্বে যেমন গরম ছিল। গতকল্য রাত্র ১০টার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়াছিল, ৪।৫ সেকেণ্ড ছিল। ৺কাশীতে কারোর ঘরবাড়ী কিছু লোকসান হইয়াছে কিনা, এখনো খবর পাওয়া যায় নাই। স্নানযাত্রার পর এলাহাবাদের দিকে বেড়াইতে যাবার ইচ্ছা আছে। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, চেনাশুনা সকলকে জানাইবেন। শ্রীমতী সাধনা, গৌরী, শিবু সকলকে শুভেচ্ছাদি জানাবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

৺কাশীধাম
১০ই কার্ত্তিক

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু,

আপনাদের "রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির ১৩৩৩ সনের কার্য্যবিবরণী"র ছাপা কাগজ পাইয়াছি। সমস্ত বিষয় জানিয়া সুখী হইলাম।

মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল মধুপুরে শারীরিক ভাল আছেন ও খুব বেড়াইয়া বেড়ান। সম্প্রতি ডাক্তার আমার 'ইউরিন' পরীক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছে পাঁচ গ্রেণ পারসেন্ট সুগার আছে, স্পেসিফিক গ্রাভিটি ১০২৩। সে যাহা হউক, আজকাল শারীরিক ভাল আছি, পূর্ব্বাপেক্ষা শরীরে বল পাইয়াছি। এখন আমাকে পাটনা, দেওঘর, রাঁচি, কলিকাতা প্রভৃতি হইতে ডাকিতেছে, কোথায় অন্নজলের বরাৎ হয় ঠাকুরই জানেন।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবেন, শ্রীযুত ভূপতিবাবু ও অন্যান্য সকল ভক্তদের জানাইবেন। আশাকরি আপনাদের ও সকলের কুশল সংবাদ। এখানে এখন সকালবেলা বেশ শীতবোধ হয়, গঙ্গার জল যাহা বাড়িয়াছিল এখন অনেক কমিয়াছে।

ইতি
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ

॥৩॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

৺কাশীধাম
১২ই অগ্রহায়ণ
সোমবার

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু,

আমি আজকাল শারীরিক ভাল আছি। এখানে আজকাল শীত পড়িয়াছে, শীতে আমি শারীরিক ভালবোধ করি। মহাপুরুষ মহারাজ মধুপুর হইতে এখানে আসিয়াছেন, শারীরিক ভাল আছেন।

এখানে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে কত লোক আসিতেছে, ৫।৭ লক্ষ লোকের ভীড় হইবে। একবার আমি চন্দ্রগ্রহণের সময় ৺কাশীতে ছিলাম, সেসময় লোকের ভীড় দেখিয়াছিলাম।

শুনিয়াছিলাম শ্রীমতী সাধনা নিবেদিতা বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হইয়া যাইবে, তাহার কি হইল? শ্রীমতী গৌরী, শিবু ও আপনারা সকলে কেমন আছেন। আজকাল কলমায় শীত কিরকম?

আমাকে পাটনা, দেওঘর, রাঁচি প্রভৃতি জায়গা হইতে ডাকিয়াছে, মনে করিয়াছি গ্রহণের পর এখান হইতে বাহির হইব, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। তিনি যদি ৺কাশীতে দিনকতক আটকে রাখেন তাহা হইলে থাকিতেই হইবে।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, চেনাশুনা সকলকে জানাইবেন।

ইতি
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আপনাদের **শ্রীসুবোধানন্দ**

।।৪।।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

রবিবার
RAMKRISHNA MATH
BELUR P.O. HOWRAH DIST.
DATED ৩০শে ফাল্গুন, 1926

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু,

কয়দিন হইল আপনার, শ্রীমতী গৌরী ও শ্রীমতী শিবরানীর পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও সুখী হইয়াছি। ডায়াবিটিস্ অসুখ সারিয়াছে, সময়২ আমাশা অসুখ দেখা দেয়। তাইতে কষ্ট হয়; বোধহয় দুইবেলা রুটি খাই সেইজন্য।

যখন আমাশা হয় সেইসময় সকালে ভাত খাই, শারীরিক দুর্ব্বলতা এখনো যায় নাই, আশাকরি শীঘ্রই সব সারিয়া যাইবে।

আমি এখন ফেরি ইষ্টিমারে কোরে রোজ বেড়াই, তাহাতে কিছু ভাল বোধ করি। মহাপুরুষ মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদ সকলে জানিবেন। মঠের সকলেই ভাল আছে, উদ্বোধনের সকলে ভাল আছে।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, ভূপতিবাবু, পণ্ডিত মহাশয়দের জানাইবেন ও আশ্রমের সকলকে জানাইবেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিবেন গতকল্য তাঁদের পত্র পাইয়াছি।

মধ্যে২ সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

।।৫।।
ওঁ

বেলুড় মঠ
হাওড়া
২৭.৪.৩৮

কল্যাণীয়া,

স্নেহের ইন্দুমায়ী তোমাদের সকলের পত্রই আমি পাইয়াছি এবং উপস্থিত তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে খুব আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর সতত তোমাদের কল্যাণ করুন এবং দিন২ তার দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি দিন।

আমার শরীর ভাল নয়, কয়েক দিন যাবৎ জ্বর হচ্ছে। সেরে যাবে কোনও চিন্তা করিও না। আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ ও শুভেচ্ছা তোমরা সকলেই জানিবে এবং চেনাশুনা সকলকে জানাবে। মহাপুরুষজী ও মঠের অন্যান্য খবর ভাল।

এবার চারি দিকেই জলপ্লাবন। শ্রীশ্রীঠাকুর মঙ্গলময়। আমরা বুঝি আর না বুঝি, তিনি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই জানিবে। সেদিককার জল কমছে কিনা জানাইও। ইতি

তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্বর্তী কলমা-নিবাসী বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিণী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত—উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন। 'মহাযোগে রাজে যোগী' ইত্যাদি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করে বিনোদেশ্বরবাবু মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণকে আনন্দ দান করতেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজীর সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।—সম্পাদক







আশ্বিন ১৩১১
সেপ্টেম্বর ১৯০৪

শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রেমোন্মত্ততা।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—যত মত, তত পথ। জগতের যত ধর্ম্মমত, সকলই ঈশ্বরানুভূতিকল্পে এক একটী পন্থা মাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। তাঁহার মতে, সকল মতেই যে অল্পাধিক সত্য নিহিত আছে তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মমতই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব সকলগুলি সমভাবে সত্য।...

প্রত্যেক মতের সারকথা ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়,—তাঁহাতে একান্ত অনুরাগ। বৈধী ভক্তির ক্রমে ঐকান্তিকতায় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার তাহা হয় নাই, জানিব সে ধর্ম্মজীবনের অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। জপ, ধ্যান, হোম, পূজা প্রভৃতিতে নিষ্ঠা দ্বারা যাহার হৃদয়ে উদ্দাম অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই, তাহার জপ-পূজাদি পণ্ডশ্রমে পরিগণিত। কিন্তু জপ-হোমাদি বৈধী গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত না হইয়াও যাঁহার মন ভগবান্ লাভে নিতান্ত ঐকতানবৃত্তি, তিনিই জগতে বহু ভাগ্যবান্। বহুশাস্ত্রান্তদর্শী উদ্ভিন্নপ্রতিভা মনুষ্যাপেক্ষা অনুরাগরঞ্জিতনেত্র ভক্তই জগতের বহুকল্যাণকারী হয়েন। ভগবদনুরাগের প্রবল স্রোতে তিনি বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত অনুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই লাভ করিয়া নিজে ধন্য হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে-অনুরাগে ভগবান্ ঈশা ৪০ দিন অনাহারে কাননে অবস্থিত ছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীপুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া নৈশতিমিরে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাসৈকতে লুণ্ঠিতকলেবরে শিশুর ন্যায় 'মা মা' বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেন—সেই অনুরাগের শতাংশের একাংশ পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়। কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহুজন্মার্জ্জিত মার্জিত-সংস্কারাপন্ন মানব ভিন্ন অনুরাগের উদ্দাম তরঙ্গে কেহ ঐরূপে তরঙ্গিত হয় না।...

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এজগতে ধন-মানাদি সকলি জীবিত কাল পর্য্যন্ত; কিন্তু ধ্বংস যখন অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, দেহ যখন পঞ্চত্বগত হইবেই, তখন মৃত্যুর পর আমি থাকিব কিনা—একথা জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক।

এই সন্দেহেই নচিকেতা যমসদনে বিজিজ্ঞাসু হইয়া গমন করেন। এই সন্দেহনিরাকরণোদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই সন্দেহের ফলেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়।... দেশকালসর্ব্ববাধাউল্লঙ্ঘিনী, ঘৃণালজ্জাভয়াদি অষ্টপাশছেদিনী, গোপীকুলোদ্দামানুরাগোল্লাস-মন্দাকিনীতে একবার স্নান করিলে মানব কৃষ্ণময় নবীন জীবন লাভ করিয়া যাবতীয় বিধিনিষেধের পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকাঞ্চনমোহিত জীবের নিকট উন্মত্তবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু সে-উন্মত্ততা বহুসুকৃতিলভ্য।...

হে জীব! সেই উন্মত্ততার সাধক হও, ঐ তোমার সম্মুখে প্রেমোন্মাদের জ্বলন্ত ছবি শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অভয় দিয়া বলিতেছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকৃত হইবে—কারণ, আমি নিজ জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে মানব! বৃথা তোমার বেদাদি পাঠে শ্রম; বৃথা বিধিনিষেধ সীমার গণ্ডীতে অবস্থান; বৃথা ধন, মান, বিদ্যা, যশের গৌরব। যদি এই দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত না হইলে—যদি মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার অগ্রেই সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুলাভ করিতে না পারিলে।

প্রেমোন্মত্ততালাভ করিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী—সে বলে, কালসহায় মৃত্যু! আমি কি তোমায় ভয় করি? ঐ দেখ আমায় মা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দেহ থাক্ বা যাক্, আমি ঈশ্বর দর্শন স্পর্শন করিয়াছি—আমার "জাত গিয়াছে!" প্রেমোন্মাদ জন্ম-মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আবার অহেতুক দয়ার প্রেরণায় জীবের পরিত্রাণে দেহ ক্ষয় করিতেছেন। তাঁহারই পদধূলিতে দেশ প্রদেশ তীর্থীভূত হয়। এ প্রকার প্রেমোন্মাদ জগতে কয়টা দেখা যায়? যাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই জগতের যথার্থ উপদেষ্টা—বেদাদি-প্রকাশক ব্রহ্মভাবাপন্ন—ঈশ্বরকল্প অবতার।

বদ্ধজীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারে না বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করায় তাঁহাদের আচরণ কাকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কথায় বলে, কাক বেশী বুদ্ধিমান, তাই জঘন্য পদার্থই তাহার আহার। ঐরূপ বুদ্ধিজীবীরা সত্য সত্যই কৃপাপাত্র, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ন্যায় প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত ৪০০ বৎসরের মধ্যে আর কেহ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন নাই। যখনই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, সনাতন ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নির্দেশে তাদৃশ মহাপুরুষের আবার অভ্যুদয় হয়। ইদানীন্তন কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে যে-অনুরাগের প্রবল বন্যা, যে-প্রেমোন্মত্ততা, যে মহা সমন্বয়ভাব, যে ভাব-ভক্তি-জ্ঞান-ধ্যানাদির অদ্ভুত একত্র সম্মিলন দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য সূচনা করে। যাঁহার নামে সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরা আজ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যিনি নিরক্ষর পূজক ব্রাহ্মণ হইয়াও আজ আম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়াছেন—তাঁহার বিষয় অনুচিন্তন, তাঁহার পূত জীবনের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা দ্বারা ভারতে কেন, সমগ্র জগতে ব্রহ্মবিবিদিষা এবং ঈশ্বরানুরাগ শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহা আমার স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশক্তির জাগরণ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন, ঠাকুর এবার এসেছেন মহাশক্তিকে জাগাবার জন্য। মহাশক্তিকে জাগাবেন তাঁর সাধনার ভিতর দিয়ে। তাই গোড়া থেকে তাঁর পরম্পরা চলছে বিধিনির্দিষ্টরূপে। ঠাকুর 'plan' করে কিছু করতেন না। বলতেন ঃ "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও তেমনি চলি—যেমন করাও তেমনি করি।" (কথামৃত, ৫।৩।২) অর্থাৎ তিনি মায়ের হাতের যন্ত্র, মা যেমন বাজাবেন তেমনি বাজবে।

ঠাকুর যাঁকে 'মা' বলছেন, সেই মা কে—এই সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে খুব কৌতূহল জাগে। ঠাকুরের জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো, গোড়া থেকেই তিনি কারো দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজের খুশিমতো কতকগুলি সাধনা করেছিলেন—যার ধারাবাহিক ইতিহাস কেউ জানে না। বিক্ষিপ্তভাবে দু-চারটি কথা কখনো উল্লিখিত হয়েছে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কেউ কিছু সংগ্রহ করেনি, ঠাকুরও বলেননি। তবে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে কারো দ্বারা পরিচালিত না হয়ে শক্তির আরাধনা আরম্ভ করেছিলেন। শ্মশানে গিয়ে ধ্যান করতেন, পূজার্চনা করতেন। বাল্যে দেখা যায়, তিনি ছবি আঁকছেন, মূর্তি গড়ে পূজা করছেন অথবা খেলার সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রাভিনয় করছেন। শিল্পী মন, নানাভাবে তার প্রকাশ হয়েছে।

একবার কোন দেবীমূর্তির প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঠাকুর দেখে বললেন, দেবীর চক্ষু ওরকম হয়? প্রতিমা যে গড়ছিল তার মনে লাগল। বলল, কে তুমি ছোকরা? আমরা বংশপরম্পরায় মূর্তি করি, আমরা জানি না কিরকম চোখ হয়? তুমি আরো ভাল করে আঁকতে পার? ঠাকুর আর কোন কথা না বলে তুলি দিয়ে চোখের ওপর একটু টান দিতেই সকলে একেবারে অবাক, যেন চেহারা বদলে গেল!

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা এমন নিপুণভাবে হয়েছে যে, শক্তি তাঁর ভিতরে জাগ্রতা। কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে সাধনা তিনি তখনো কিছু করেননি। তারপর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। তাঁর বড়ভাই রামকুমার দেখলেন, গ্রামের ছেলেদের নিয়ে হৈহৈ করা ছাড়া গদাইয়ের আর কোন কাজ নেই! লেখাপড়া করার নাম নেই! তখন ভাবলেন, ওকে কলকাতায় নিয়ে যাই, সেখানে পরিবেশ ভিন্ন হবে, হয়তো লেখাপড়ায় মন যাবে। নিয়ে এলেন। রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি টোল খুলেছিলেন। মনে করলেন সেখানে ভাইয়ের পড়াও হবে, আর তাকে দিয়ে কোন কোন কাজও হবে। ভাইয়ের কিন্তু পড়ায় মন ছিল না। যখন রামকুমার বললেন, এখানে নিয়ে এলাম পড়াশুনা করবি বলে, তা করছিস না? তখন সেই কিশোরের উত্তর ঃ "চালকলাবাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৩য় অধ্যায়) দাদা তো এইরকম কথা কখনো শোনেননি। ভাবলেন ওকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বাড়িতে থাকলে সংসারের ভারবৃদ্ধি হবে, এখানে তবু পূজার কাজ করলে কিছু আয় হবে।

এক বাড়িতে তাকে পূজায় নিযুক্ত করে দিলেন। এটি গদাইয়ের মনের মতো কাজ। তিনি পূজা আরম্ভ করলেন। সে-পূজার ভাবই অন্যরকম। পূজা মানে সেখানে দেবতার উদ্দেশে কিছু মন্ত্র বলা নয়, দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখে তাঁর সঙ্গে সেইমতো ব্যবহার করা। বিধিবদ্ধ পূজা নয়, কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা সব জড়ো হয়ে পূজা দেখে মুগ্ধ। সেই পূজাতে দেবতাকে গদাই গান শোনাতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর। মেয়েদের অবকাশ কিছু বেশি। বিশেষ করে তাঁরাই সেই গান শুনে মুগ্ধ হতেন এবং আবার ফরমাশ করতেন।

তারপর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে হলো। এটা দৈবপ্রেরিত। দক্ষিণেশ্বরে তিনি কেন এলেন? না, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির এবং দ্বাদশ শিব ও রাধাকান্তের মন্দির—যাকে 'বিষ্ণুঘর' বলতেন—সেগুলিতে পূজারীর দরকার। ঠাকুরের বড় ভাই রামকুমার সেখানে প্রথম পূজারি-রূপে নিযুক্ত হলেন। তাঁরই সহকারি-রূপে গদাই কাজ আরম্ভ করলেন। পরে পূজারি-পদে গদাইকে নেওয়া হলো। সেখানেও প্রথমে রাধাকান্তের মন্দিরে, তারপরে মা কালীর মন্দিরে তিনি পূজা করেছেন। পূজা করার সময় শক্তিপূজা করতে হবে, কাজেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা চাই। কেউ বলেছেন, এইজন্য কেনারাম ভট্টাচার্য তাঁকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এপ্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গকার বলছেন ঃ "শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৫ম অধ্যায়) কিন্তু সেই মন্ত্র তিনি কতদূর অভ্যাস করেছিলেন, আর তাতে তিনি কতদূর এগিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ঠাকুর তাঁর এই গুরুর বিশেষ কোন উল্লেখ করতেন না। তাতে মনে হয়, কেনারাম ভট্টাচার্যের প্রভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বিশেষ কিছু পড়েনি। যাই হোক, মা কালীর পূজা করতে গিয়ে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। আগেই বলা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বর শক্তির স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শক্তিরই আরাধনায় এমনভাবে ডুবে গেলেন যে, জগৎ ভুল হয়ে গেল! এভাবে নিজের খেয়ালমতো বা বলা যায় 'মা'য়ের ইচ্ছামতো তিনি সাধনা করতে লাগলেন। মায়ের পূজার সময় তিনি বিহুল হয়ে গেলেন।

* *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত পরম পূজ্যপাদ দ্বাদশ অধ্যক্ষ।*

মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, মাকে খাওয়ান আর বলেন ঃ "মা, আমি না খেলে তুই খাবি না?"

রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবু জমিদারির দেখাশোনা করতেন। তিনি কর্মচারীদের বলে দিয়েছিলেন, বাবা [অর্থাৎ ঠাকুর] যা করেন কেউ তার প্রতিবাদ করবে না। কাজেই কারো কিছু বলার সাহস নেই। যেমন সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ, ঠিক সেইরকমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করতেন। মা সেখানে পাষাণপ্রতিমা নন। চিন্ময়ী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টির সমক্ষে প্রতিভাত। আদুরে ছেলে মাকে যেমন আদর করে, মায়ের কাছে তার সবরকম স্বাধীনতা থাকে—ঠাকুরেরও সেইরকম। কিন্তু বাহ্য পূজাতে তৃপ্তি হচ্ছে না, মাকে স্পষ্টভাবে অন্তরে তিনি অনুভব করতে চান। বলছেন, মা তুই পাষাণময়ী না চিন্ময়ী, আমাকে দেখিয়ে দে। তিনি তুলো নিয়ে মায়ের নাকের কাছে ধরে দেখতেন মায়ের নিঃশ্বাস পড়ে কিনা। এইভাবে মায়ের দর্শন করার জন্য তাঁর মনে যখন তীব্র ব্যাকুলতা, মায়ের অদর্শন সহ্য করতে পারছেন না—তখন একদিন নিজের জীবনকে শেষ করার জন্য একটি খাঁড়া নিয়ে নিজের গলায় দিতে গেলেন। সেই সময় তাঁর একটি অনুভূতি হলো। সেই অনুভূতিকে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" (ঐ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই হলো প্রথম অনুভব। সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা কাটার পর যখন তাঁর প্রথম সংজ্ঞা ফিরে আসছে, তখন তিনি 'মা' 'মা' বলে ডাকছিলেন। এবিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন ঃ "ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।" (ঐ)

এর পরে ঠাকুর তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞা বিদুষী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিয়ন্ত্রণে বিধিসম্মত তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করলেন। ঠাকুরকে তিনি সাধনার পথগুলি দেখালেন। ঠাকুর বলেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী এক এক করে চৌষট্টিটি তন্ত্রের সাধনা করালেন। প্রত্যেকটি সাধনারই পরিণামে অতি অল্প সময়ে তাঁর পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হলো। তন্ত্রশাস্ত্রে নিষ্ণাত হয়ে যে-সাধনা, মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা—তা তিনি করলেন। তারপর তাঁর অন্যান্য সাধনা আরম্ভ হলো।

ঠাকুর বলছেন, মাকে বললাম—মা ও তো তুই এখন অন্য অন্য পথের পথিকেরা, অন্য অন্য সাধকেরা তোকে কিরকম করে দেখে আমাকে দেখা। এইভাবে একের পর এক সাধক এসে ঠাকুরকে সাধনা শেখালেন, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে সেইটিতে সিদ্ধিলাভ করতে লাগলেন। বহু রকমের সাধনা ঠাকুর করেছিলেন, সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। কথাপ্রসঙ্গে একটু-আধটু উল্লেখ করেছেন।

এইভাবে একবার তোতাপুরী নামে একজন বেদান্তী সাধু এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে দেখেই তাঁর মনে হলো, বেদান্তশাস্ত্রের এমন অধিকারী বিরল। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন ঃ "তুমি বেদান্ত সাধনা করবে?" ঠাকুর বললেন ঃ "আমি জানিনে, মাকে জিজ্ঞাসা করব।" তোতাপুরী ভাবলেন, হয়তো তাঁর গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করবেন। বললেন ঃ "জিজ্ঞাসা করে এসো।" ঠাকুর সোজা কালীমন্দিরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, মা বলেছেন ঃ "যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।" (ঐ, ১৫শ অধ্যায়) তোতাপুরী অদ্বৈতবাদী, এসব মানতেন না। তিনি ভাবলেন পাষাণ-প্রতিমার কাছে কী জিজ্ঞাসা করে এল! যাই হোক এসব কুসংস্কার বেদান্ত সাধনা করলেই দূর হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তাঁকে বেদান্তমতে সাধনা করালেন। বেদান্তমতে কিভাবে ধ্যান করতে হবে বললেন। এমন উল্লেখ আছে, সন্ন্যাস দিয়ে ঠাকুরকে সাধনায় নিয়োজিত করলেন। ঠাকুরের মন একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বরে যে-সাধনকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ ছিলেন, তোতাপুরী তার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন যাতে কেউ সমাধির ব্যাঘাত না করে। তারপরে ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙে না। তোতাপুরী নিজেও কখনো এমন দেখেননি। প্রবাদ আছে, তাঁর নিজের নির্বিকল্প সমাধির অনুভব হয়েছিল, অদ্বৈতজ্ঞানের যা শেষ কথা। মাত্র তিনদিনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর তত্ত্বজ্ঞানের এমন গভীর প্রকাশ দেখে তিনি অবাক হলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ "চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন!" (ঐ)

তোতাপুরী অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুরের কাছে থেকে গেলেন। তিনি বেদান্তের সাধনা করেছেন, মাতৃভাবের সাধনা করেননি, বরং 'মায়া' বলে উপেক্ষা করেছেন। অদ্বৈত বেদান্ত-মতে অবিদ্যা-মায়া-অজ্ঞান সমার্থক। সুতরাং ঠাকুরের 'মা' 'মা' করা দেখে তোতাপুরী হাসেন, ভাবেন—বেদান্তের এত বড় অধিকারী, তবুও 'মা' 'মা' করেন! শুধু তাই নয়, ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করতেন। তোতাপুরী একদিন বললেন ঃ "আরে, কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো?" (ঐ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়) অনেকে হাত চাপড়ে চাপড়ে রুটি তৈরি করে। ঠাকুরের হাততালি দিয়ে হরিনাম করা দেখে তোতাপুরীর

সেই রুটি তৈরি করার কথা মনে হয়েছে। তাঁর কথা শুনে ঠাকুর হেসে বললেন ঃ "দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটি ঠুকচি?" (ঐ)

তোতাপুরী এসব বোঝেন না। তিনি শুধু ঠাকুরকে শিক্ষা দিতে আসেননি, ঠাকুরের কাছেও তাঁকে শিক্ষা নিতে হবে। একবার তিনি অসুস্থ হলেন। কঠিন রক্ত আমাশয়। পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বেড়েছে। এত ধ্যানসিদ্ধ তিনি, কিন্তু সেদিন কিছুতেই ধ্যানে মন বসছে না। ভাবলেন ঃ "মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল! তখন... নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন—এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হোক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব।" (ঐ) এই ভেবে তিনি দেহত্যাগ করবেন বলে গঙ্গায় গিয়ে নামলেন। কিন্তু যত যাচ্ছেন, ডুব জল আর নেই। প্রায় অপর পাড়ে চলে এলেন, তবুও ডুব জল পেলেন না। তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন, এ আবার কি? এমন সময় দেখলেন, সবই মায়ের ভেলকি। বলছেন ঃ "এ কেয়া দৈবীমায়া হ্যায়।" "এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!" (ঐ) দেখলেন, সে-মায়া মিথ্যা অলীক নয়, অজ্ঞানের কল্পনামাত্র নয়—সাক্ষাৎ জাজ্বল্যমান মাতৃরূপ। "মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!" (ঐ) তোতাপুরী দেখে মুগ্ধ হলেন এবং সেই ভাবে নিষ্ণাত হয়ে, গভীর ভাবমগ্ন হয়ে সমস্ত রাত্রি মায়ের ধ্যানে কাটালেন। সকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন ঃ "রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম!" (ঐ) তোতাপুরী আনন্দে বিভোর। ঠাকুরও নানা মাতৃনাম, মাতৃসঙ্গীত তাঁকে শোনালেন। তোতাপুরীর সাধনার যে-অপূর্ণতা ছিল ঠাকুরের কৃপায় সেটি দূর হলো।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তিনি তো নিষ্ণাত। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে থেকেই যেতেন। যখন তোতাপুরী এসেছেন, ঠাকুরকে ভয়ে ভয়ে বলছেন ঃ "বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপ সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করো না, বেশি মেশামেশি করো না; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।" (ঐ) কিন্তু ঠাকুর সাক্ষাৎভাবে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন। কাজেই ভৈরবীর কথায় তিনি নিরস্ত হননি, সাধনা করেছেন।

ভৈরবী তখনো ঠাকুরের কাছে আছেন। কিন্তু দেখা গেল, ঠাকুরের কাছে থাকতে থাকতে ক্রমশ ঠাকুরের ওপরে তাঁর একটা আধিপত্যের ভাব এসে গিয়েছে। আর কেউ ঠাকুরের কাছে আসে, ঠাকুরকে ভালবাসে—এটা পছন্দ করতেন না। মনে করতেন বুঝি তাঁর সন্তানকে কেউ পর করে নিয়ে যাচ্ছে। এইরকমভাবে তিনি কয়েকদিন ধরে নিজের মনে যন্ত্রণা অনুভব করলেন। তারপরে বুঝলেন, এটাও এক মায়ার খেলা। তখন ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। তারপরে তাঁর আর ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

ঠাকুরের এই মাতৃভাবে সাধনা মাতৃরূপা ভৈরবী করালেন। তাঁর এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা। ঠাকুরের আগেই বিবাহ হয়েছিল। তারপরে শ্রীশ্রীমা যখন ঠাকুরের সেবা করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে রইলেন, ঠাকুর তাঁকে স্থান দিলেন এবং শ্রীশ্রীমা পাকাপাকিভাবে দক্ষিণেশ্বরে থাকলেন। ওখানে মায়ের এই উপস্থিতি তখন ভৈরবীর একটা ঈর্ষার বিষয় হলো। যেমন শাশুড়ি-বৌয়ে পরস্পরে ভুলবোঝাবুঝি হয়, সেইরকম। ভৈরবী ভাবলেন, মা এসে বুঝি ঠাকুরকে সংসারে লিপ্ত করবেন। আসল কথা, তাঁর স্নেহের ভাগীদার যেন কেউ না থাকে। যাই হোক ভৈরবী তো ঠাকুরের কাছ থেকে পরে চলে গেলেন, মা রইলেন। সেই মাকে ঠাকুর মাতৃরূপে পূজা করলেন।

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে মা বলছেন ঃ "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর তার উত্তরে বললেন ঃ "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এশরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন; আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" (শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৮) অদ্ভুত দর্শন ঠাকুরের! তিনি নিজের সমস্ত জীবনকে কেমন করে এই মাতৃভাবে ওতপ্রোত করে দিয়েছেন, সেটি এখানে ভাবার কথা। তিনি যেখানে যত স্ত্রীরূপ দেখতেন, সব জগন্মাতার রূপ। "স্ত্রিয়ঃ

সমস্তাঃ সকলা জগৎসু''—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১১।৬) বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীমাকে সেই রূপেই ঠাকুর দেখলেন এবং সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি ঠাকুরের এই মাতৃভাব বরাবর ছিল। তিনি তাদের অন্য কোনভাবে দেখতে পারতেন না।

শ্রীশ্রীমাকে এই মাতৃভাবে দেখাতেই শেষ নয়, তিনি চাইলেন—এই মাতৃভাব, যে-ভাবে ঠাকুর তাঁকে উপলব্ধি করেছেন, শ্রীশ্রীমা যেন সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে ঠাকুরের আরব্ধ জগদুদ্ধার কাজে তাঁর সহায় হন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহের অবসানের পরেও শ্রীশ্রীমা যেন সেই কাজ চালিয়ে যান, এই ভাবে তিনি তাঁকে তৈরি করেছেন। এই যে ঠাকুরের শ্রীশ্রীমাকে পূজা করা—যাকে 'ষোড়শীপূজা' বলি—সেই পূজা করার তাৎপর্য এই যে, মা দেবী, কিন্তু নিজের দেবীরূপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না। তাই ঠাকুর তাঁর দেবীত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যেন তাঁর আরাধনা করে তাঁর চরণে নিজের সমস্ত সাধনা সমর্পণ করলেন। তারপরে তাঁকে ধীরে ধীরে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন, যাতে তাঁর ভিতর থেকে সেই জগদুদ্ধারকারিণী শক্তি আবির্ভূতা হয়ে জগৎকল্যাণ করে, যে-কল্যাণসাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ।

অবতার যখন আসেন, এইভাবে জগদুদ্ধারকার্য করেন। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসারে। ঠাকুর এইসব কাজ যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে যন্ত্রচালিতের মতো করতেন, নিজের চেতনা থাকত না। আবার কখনো কখনো চেতনা আসত। বলতেন, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির স্থাপিত হয়েছে এই এখানকার জন্য অর্থাৎ ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র করার জন্য। ঠাকুর সেখানে তাঁর সাধনসম্পদ, সেই অমূল্য রত্নসম্ভার সংগ্রহ করে বসে আছেন। তিনি উত্তরাধিকারী খুঁজছেন, কাকে এই সম্পদ দিয়ে যাবেন। মা সেইসময় দেখিয়ে দিয়েছেন—শুদ্ধসত্ত্ব গুণীরা সব তোমার কাছে আসবে এই ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়ার জন্য। ঠাকুর তাঁদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কুঠিবাড়ির ছাদে গিয়ে সন্ধ্যার সময় চিৎকার করে ডাকছেন ঃ "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়।" (কথামৃত, ৩।৫।২) এইভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের আকর্ষণ করতেন।

ঠাকুর নিজে কে? এই সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, ঠাকুরের উত্তর হলো—দেখ, এই খোলটার ভিতরে মা ছাড়া আর কেউ নেই। 'মা' মানে জগন্মাতা, সেই মহাশক্তি, যাঁর দ্বারা এই জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে। তিনিই ঠাকুরের দেহমনকে অবলম্বন করে বিপুল শক্তির প্রকাশ করে জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। তার জন্যই ঠাকুরের শুভাগমন। এই কথাটি আমরা সংক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করি।

স্বামীজী বলছেন ঃ "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৪৯) তাই নিজের পত্নীকে মাতৃভাবে পূজা করা এবং মায়ের সন্তান হয়ে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সেই স্নেহের আস্বাদন করা—এই হলো ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর কি তাহলে শক্তির উপাসক ছিলেন? নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু কোন সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। 'শক্তি' মানে যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন। যাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন, বিষ্ণু পালন করছেন, শিব সংহার করছেন—সেই তিনি। মহান যে মহিমময়ী মূর্তি, ঠাকুর সেই মূর্তিরই পূজারী ছিলেন। যেমন রামপ্রসাদ বলছেন ঃ "প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।/ সেটা চাতরে কি ভাঙব হাড়ি, বুঝরে মন ঠারেঠোরে।।" (শাক্তপদাবলী)

সর্বময়ী, বিশ্বরূপিণী, বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি—তাঁকেই ঠাকুর 'মা' বলছেন। এই মা বহুরূপে বহু জায়গায় বিরাজিতা, সর্বোপরি তিনি প্রতি ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর মাতৃভাব শুধু ভক্তহৃদয়ে নয়, সর্বজীবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (৫।৭৩) আছে—"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" সর্বভূতে তিনি মাতৃরূপে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মায়ের সাধক এবং এই মায়ের উপাসনা করলে জগতে যে একটা মহান শক্তির বিকাশ হবে—স্বামীজী এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। সেইভাবে অভিষিক্ত হয়ে নিজের ভিতরে সেই দেবীকে অনুভব করা এবং বিশ্বে সকলের ভিতরে তাঁকে জাগানো—এই হচ্ছে স্বামীজীর মস্ত দায় আমাদের কাছে। তিনি বলেছেন, ঠাকুরের যে-মা, সেই মা আমাকে এখানে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন, একজায়গায় বসতে দিচ্ছেন না। আমি কোন গুহায় ধ্যানে কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম, সেখান থেকে মা টেনে এনে আমাকে চারিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। স্বামীজী এই অভিমান করেছেন মা কালীর ওপরে, ঠাকুরের ওপরেও।

কাশীপুরে ঠাকুর একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন ঃ "নরেন শিক্ষে দিবে।" স্বামীজী ঠাকুরকে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "আমি ওসব পারব না।" ঠাকুর বললেন ঃ "তোর হাড় করবে।" ('কথামৃত', অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১২৩০) আবার এই কাশীপুরেই স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করার পর ঠাকুর তাঁকে বলছেন ঃ "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" (ঐ) সেই 'কাজ' কী? মহাশক্তিকে চারিদিকে জাগানো। স্বামীজী তাঁর ঐ অল্পপরিসর জীবনে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন, সেই 'কাজ' করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের ওপরে সেই ভার ন্যস্ত করে গিয়েছেন।

আমরা যেন সেই মহাশক্তিকে আমাদের ভিতরে জাগিয়ে তুলি এবং বিশ্বের সব জায়গায় সেই মাতৃরূপ যাতে বিকশিত হয়, তার জন্য আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করি।* ❑

* ১৭ জুলাই ১৯৮৬ গৌহাটীতে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।

ত্রিপুরারহস্য

দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী*

তন্ত্রশাস্ত্র এক অতি গহন অরণ্য। এতে প্রবেশ যেমন দুঃসাধ্য, আবার প্রবেশ করে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে বহির্গত হওয়া অধিকতর দুঃসাধ্য। আধুনিক মনীষী তন্ত্রজ্ঞ গোপীনাথ কবিরাজও এটি উপলব্ধি করে দ্বৈত শৈবাগম ও দ্বৈত শাক্তাগমের কথাই বেশি বলেছেন। মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দও 'Cultural Heritage of India' গ্রন্থে 'তন্ত্রের দর্শন' লিখতে গিয়ে দ্বৈতবাদী শৈবাগমের কথাই উল্লেখ করে পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক অনেক কথা বলেছেন। তবে তিনি তন্ত্রের দর্শনের একটি মূল ভাব যথার্থই উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো—যেসকল পদার্থ বা শক্তির দ্বারা মানুষ বা সাধকের পতন ঘটে, শাস্ত্রানুসারে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে তার দ্বারাই সাধকের উত্থান ও সিদ্ধিলাভ হতে পারে। তিনি লিখেছেন : "Man must rise with the aid of that Sakti which made him fall. Or, as Saktanandatarangini puts it—'the poison which kills becomes the elixir of life when suitably treated and tested by the wise physician.'" (Cultural Heritage of India, Vol. III, 1953, RMIC, p. 440) অর্থাৎ যে-শক্তির দ্বারা মানুষের পতন ঘটে, সেই শক্তির দ্বারাই মানুষকে উঠতে হবে, অথবা শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর ভাষায় যেমন বলা হয়েছে—যে-বিষ মানুষকে বধ করে, সেই বিষই বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রযুক্ত হলে জীবনপ্রদ সুধা হতে পারে।



এই আলোচনা প্রধানত দ্বৈত শৈবাগম ও দ্বৈত শাক্তাগম এবং মৃগেন্দ্রতন্ত্র ও শিবাচার্য উমাপতির 'শতরত্নসংগ্রহ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে পরিশেষে 'ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র'-এর অদ্বৈত শাক্তদর্শন প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই বিশাল তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনা কিছু বৈদেশিক প্রভাবে এবং কাপালিক ও ভৈরব-তন্ত্রের প্রভাবে বিকৃত ও অধোগামী হয়েছিল। তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, পাশ্চাত্যদেশীয় তন্ত্রানুরাগী স্যার জন উড্রোফ প্রমুখ মনীষী তন্ত্রকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

দ্বৈতবাদী শৈবাগমে ও শাক্তাগমে শিব এবং শিবের অন্তর্লীন বা অন্তঃসংহৃত শক্তি অভিন্ন তত্ত্বাতীত পদার্থ। তাতে শিব ও শক্তির সামরস্য থাকে বলে কোন ভেদপ্রতীতি থাকে না। কিন্তু বিন্দুরূপ মহামায়া থেকে পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্বের এবং অশুদ্ধ বিন্দু মায়া থেকে ৩১টি অশুদ্ধতত্ত্বের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে শুদ্ধতত্ত্ব পাঁচটির প্রথম শিবতত্ত্ব শুদ্ধ, নিত্য, বিভুস্বরূপ। এর অপর চারটি কারণ। তা জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক। তারপরে শক্তিতত্ত্ব—যা জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কিন্তু তত্ত্বাতীত শিব-শক্তি থেকে ভিন্ন 'পরিগ্রহ শক্তি', যা নানা পরিণামকে সম্ভব করে। এই শক্তিতত্ত্ব থেকে সদাশিবের উদ্ভব, যাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সাম্যাবস্থায় থাকে। তা থেকে ঈশ্বরতত্ত্বের উদ্ভব, যাতে জ্ঞানশক্তি অভিভূত হয়ে ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য ঘটে। আবার শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বে ক্রিয়াশক্তি অভিভূত হয়ে জ্ঞানশক্তিরই প্রাধান্য হয়। এই শুদ্ধবিদ্যার সাহায্যেই সকল শুদ্ধতত্ত্বের এবং শিবের অনুগ্রহে তত্ত্বাতীত শিবের সাক্ষাৎকার হয়ে জীবের শিবত্বলাভ সম্ভব হয়।

মহামায়া থেকে এই পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্বের উদ্ভবের পর অশুদ্ধ বিন্দু বা মায়া থেকে অনন্তেশ, জীব, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ প্রভৃতি অশুদ্ধতত্ত্ব এবং সাংখ্যে প্রসিদ্ধ প্রধানাদি ২৪ অশুদ্ধতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই 'রাগ'বশতই জীব সংসারে আসক্ত ও বদ্ধ হয়। এস্থলে লক্ষণীয় যে, যেহেতু অশুদ্ধ মায়া থেকে কালের উৎপত্তি, সুতরাং শুদ্ধতত্ত্ব পাঁচটি অর্থাৎ শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবিদ্যা কালের অতীত তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বরের পাঁচটি কার্য—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আচরণ ও অনুগ্রহ। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই শক্তিপাত হয়ে দীক্ষালাভের দ্বারা জীবের ত্রিবিধ বন্ধন—অবিমল, কর্ম ও মায়া দূর হয়ে জীবের মোক্ষলাভ হয়। মুক্ত জীব পশু নয়, সে পশুপতি শিবতুল্য হয়ে যায়। শৈবাগমে পশু জীব, পশুপতি শিব ও পাশ বা বন্ধনের প্রাধান্য বলে একে 'ত্রিকদর্শন'ও বলা হয়। পশু জীবের সাধনপূর্বক মোক্ষলাভের জন্যই শাস্ত্র, তাই প্রথমেই জীবের লক্ষণে উমাপতি 'শতরত্নসংগ্রহ'-এ উদ্ধৃত করেছেন :

* অধুনা প্রয়াত। সংস্কৃত কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-অধ্যাপক, বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রাক্তন আচার্য, ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের অন্যতম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

"দেহান্যোঽনশ্বরো ব্যাপী বিভিন্ন সমলোঽজড়ঃ।/ স্বকর্মফলভুক্ কর্তা কিঞ্চিৎজ্ঞ সেশ্বরঃ পশুঃ॥" অর্থাৎ দেহাদি থেকে ভিন্ন, নিত্য, সর্বব্যাপী, ভিন্ন ভিন্ন জীব 'সমল' অর্থাৎ রাগাদির কারণ অনাদি অজ্ঞানবিশিষ্ট। 'অজড়' শব্দের দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া স্বভাববিশিষ্ট—এটিই বোঝানো হয়েছে। কেবল জ্ঞানগুণক নয়। মলরূপ 'পশুত্ব' সংযোগবশত তার পশুত্ব হয়ে থাকে। মুক্ত জীবাত্মা পশু নয়, সে শিব হয়ে যায়। স্বরূপত বিভু জ্ঞানস্বরূপ হলেও কলা প্রভৃতি ব্যঞ্জকের অভাবহেতু সে অল্পজ্ঞ—সর্বজ্ঞ নয়। এই জীবাত্মার সুখদুঃখভোগ হয়ে থাকে নিজেরই কর্মানুসারে। আগম-মতে, দৃক্‌ক্রিয়া যাঁর সদা বিদ্যমান তিনিই চৈতন্য এবং তা সর্বদাই আত্মাতে আছে; কিন্তু মুক্ত হলে জীব শিবতুল্য সর্বজ্ঞ হয়ে যায়। জীবাত্মার একটা অনাদি অশুদ্ধি স্বীকার করতেই হয়, নতুবা তার ভোগে আসক্তি হয় কীরূপে? জীব পরমার্থ বিষয়ে অচেতন, অতএব বোধ্য ও শোধ্য। অবিমল অর্থাৎ মলযুক্ত আত্মা বদ্ধ থাকে; কিন্তু দীক্ষা দ্বারা মুক্ত হয়ে যায়। এই দ্বৈতাগম মতে, জীব ত্রিবিধ—(১) কেবল অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসহায়, অনুগ্রহশূন্য। (২) সকল জীব কলাদ্বারা বদ্ধ—"সংসারী বিষয়ী ভোক্তা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।/ শরীরী চেতি বদ্ধাত্মা সকলঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (শতরত্নসংগ্রহ) এখানে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে ক্ষেত্র অর্থাৎ পাশজাল যাঁর ভোগ্যরূপে উপস্থিত। এই বদ্ধজীবই দীক্ষারূপ সাধনের দ্বারা মুক্ত ও শুদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অমল বা বিমল হয়ে থাকে।

যদিও জীবের জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি ঈশ্বরশক্তিবৎ নিত্যা ও ব্যাপিকা, তথাপি অনাদি মল কর্তৃক আবৃত থাকার কারণে কলা প্রভৃতি ব্যঞ্জক বিনা বিষয় প্রকাশক হয় না। তাই জীব অল্পজ্ঞই হয়ে থাকে। অনাদি মল যে অজ্ঞান, তার সপ্তবিধ কার্য হয়ে থাকে—"মোহো মদশ্চ রাজশ্চ বিষাদঃ শোক এব চ।/ বৈচিত্যং চৈব হর্ষাখ্যং সপ্তেতে সহজা মলাঃ।।" (ঐ, ১০।১)

এই দ্বৈত শৈবাগম সিদ্ধান্তে সৃষ্টি দ্বিবিধ—শুদ্ধসৃষ্টি ও অশুদ্ধসৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টিতে মহামায়া নামক বিন্দুই উপাদান। ঈশ্বর বা শিব নিমিত্ত কারণ। তাঁর দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সহকারী কারণ। আবার অশুদ্ধসৃষ্টিতে অশুদ্ধামায়া উপাদান কারণ। অনন্তেশ নিমিত্ত কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট সহকারী কারণ।

কোন কোন গোঁড়া বেদপন্থী গ্রন্থকার আগমশাস্ত্রকেই বেদবাহ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু বিচার করলে তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদবাহ্য বলে অভিহিত করা যায় না। বৈদিক ব্রহ্মশক্তিতত্ত্ব, কর্ম-কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ, মোক্ষবাদ ও মোক্ষের সাধন প্রভৃতি সকল বৈদিক তত্ত্ব যেহেতু তন্ত্রেও গৃহীত, সুতরাং তাকে 'বেদবাহ্য' বলে অভিহিত করা সমীচীন হয়। বেদও যেমন অপৌরুষেয় বলে স্বতঃপ্রমাণ, তেমনি আগমশাস্ত্রও সর্বজ্ঞ শিববাহিত বলে অথবা আগম অর্থাৎ পরম্পরাগত অনাদি বলে 'প্রমাণ'-স্বরূপ। বিশেষ করে সাধক-সমাজে এমনকি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী সমাজেও তন্ত্রেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হওয়ার জন্য এর প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকার্য।

কতকগুলি তন্ত্র নিজেদের দ্বৈতাদ্বৈতপর বা বিশিষ্টাদ্বৈতপর বলে দাবি করলেও সকল তন্ত্র বা আগমই মূলে শিবশক্তিরূপ অদ্বৈততত্ত্বেই পর্যবসিত। ফলত অদ্বৈতপর বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়। সকল শক্তিই চৈতন্যের শক্তি, তাই চিৎস্বভাব। ক্ষোভিত অশুদ্ধ মায়ার কার্যসকলে মৃগেন্দ্রতন্ত্রে কথিত আছে—"গ্রন্থিজন্য কলা কাল বিদ্যারাগ নৃমাতরঃ।/ গুণধীগর্বচিত্তাখ্য মাত্রাভূতান্যনুক্রমাৎ॥" অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মায়া থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় এইসকল কার্য উৎপন্ন হয়। মায়াতত্ত্ব থেকে প্রথম কলা ও নিয়তি নামক দুটি তত্ত্ব এবং কাল-তত্ত্বের অভিব্যক্তি হয় এবং 'নৃ'শব্দের বাচ্য পুংপ্রত্যয়হেতু পুরুষেরও—এই চারটি তত্ত্বের সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে ক্ষুব্ধ অশুদ্ধমায়া থেকে কল্পতত্ত্ব এবং তা থেকে প্রধানতত্ত্ব উৎপন্ন হয়ে আর সকল তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

এইরূপে দ্বৈত শৈবাগমে যে ৩৬ তত্ত্বের উল্লেখ আছে—সেসমস্তই তত্ত্বান্তর্গত। পরমবস্তু—শিব-শক্তি তত্ত্বাতীত। তা উপলব্ধি করতে হলে পৃথিব্যাদি শিবান্ত সকল তত্ত্বই হেয়। মায়া থেকে কলা, তা থেকে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, পুরুষ, অনন্তেশ, পাশ, পশু, পশুপতি এবং বন্ধনের স্থূল কারণ পঞ্চকঞ্চুক। এই ৩৬ তত্ত্ব শৈবাগম ও শাক্তাগম উভয়েই স্বীকার করেছে। কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ—এই পাঁচটি কঞ্চুক অর্থাৎ কোষের ন্যায় বন্ধনের কারণ।

এইরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি করণযুক্ত পুরুষ রাগতত্ত্বের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে দুঃখমোহাত্মক ভোগ্যবস্তুকে সুখাত্মক মনে করে আসক্ত হয়ে ভোগ করতে থাকে। তাতে তৃপ্তও হয় না, আবার বিরাগপ্রাপ্তও হয় না। ধর্মাধর্মরূপ কর্মই তাকে এইভাবে চালিত করে। এইরূপে ভোগ্যব্যাপৃত বদ্ধাত্মার কোনপ্রকারে কর্মনাশ ও মলের পরিপাক হলে ভগবান শিবের অনুগ্রাহিকা শক্তি তার ওপর পতিত হয়, একে তন্ত্রশাস্ত্রে 'শক্তিপাত' বলা হয়। তাই মৃগেন্দ্রতন্ত্রে বলা হয়েছে, যাদের ওপর শিবের এই শক্তিপাত হয়, তাদের লিঙ্গ বা চিহ্ন এইরূপ হয়—মুক্তিতে তাদের ঔৎসুক্য দেখা দেয়, সাংসারিক অবস্থার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, শিবভক্তের প্রতি ভক্তি জন্মে এবং শৈবশাস্ত্রে শ্রদ্ধা আসে। এই

শক্তিপাত হলে নানা অভিলাষযুক্ত মানুষের আত্মবিবেক জাগ্রত হয়। আমি প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শিবের অধীন—এই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন প্রভু শিব তাকে সংসার থেকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় সংসার নিবৃত্তিহেতু ঈশ্বর-পুরুষবিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছাযুক্ত করেন ও পরমার্থযুক্ত করেন। তিনি পশু জীবকে যোগ্য আচার্যের কাছে প্রেরণ করেন। আচার্যকেও সেই শিষ্যের কাছে প্রেরণ করেন। পরমেশ্বরই শিষ্যাচার্যের উভয়কে প্রেরণ করেন। এতাদৃশ দুর্লভ গুরুশিষ্য সম্বন্ধই মুক্তির হেতু হয়।

তারপর শিষ্য সেই দেশিক অর্থাৎ গুরুকে লাভ করে দীক্ষালাভের দ্বারা ছিন্নবন্ধন হয়ে নির্মল হয়ে শিবসাযুজ্য লাভ করে; মায়া, মল ও কর্ম-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে।

শিব থেকেই জ্ঞানলাভ হয়—একথা বলা হয়েছে। এখন তন্ত্রমতে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। প্রধানত জ্ঞান দুইপ্রকার—পর জ্ঞান ও অপর জ্ঞান। পরম বস্তুর প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকারই পরম জ্ঞান। আর শাস্ত্রলব্ধ যে পরোক্ষ জ্ঞান, তাই অপর জ্ঞান। এই পরাপর উভয় জ্ঞানই সাধকদের লব্ধ অলৌকিক জ্ঞান—সাধারণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতুল্য জ্ঞান নয়। সাংখ্যের ন্যায় তন্ত্রাগমও প্রত্যক্ষ, শাব্দ ও অনুমান ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। (শতরত্নসংগ্রহ, ৬)

উমাপতি একটি শ্লোকে বলেছেনঃ "এই যে পরম শিবজ্ঞান তা অগ্নির প্রভার ন্যায় শম্ভুর অবিনাভাবিনী অর্থাৎ শিবে সমবেতা। তা ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করে শিবের সঙ্গে আত্মার (শিষ্যের) সন্ধি স্থাপন করে। (ঐ, ৬৫-৬৬)

একমাত্র দীক্ষা দ্বারাই মল-কর্ম-মায়ারূপ ত্রিবিধ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীব শিবত্ব অর্থাৎ শিব-সাযুজ্য লাভ করে। "দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবং ধামং নয়ত্যপি।" (শতরত্নসংগ্রহ, ৩৮) 'দীক্ষা' শব্দের অর্থও বুঝতে হবে। 'ক্ষপণ' শব্দে পশুত্বনাশকে বোঝায়, আর 'দান' শব্দের দ্বারা শিবত্বদায়িকা শিবশক্তিকেই বোঝায়। "দীয়তে জ্ঞানসদ্ভাবঃ ক্ষীয়তে চ মলত্রয়ম্।/ দীয়তে ক্ষীয়তে চেতি দীক্ষা শব্দে দ্বিধোচ্যতে॥" (ঐ, ৬৯) এইরূপে জীবন্মুক্ত পুরুষ পৃথিবী থেকে শিবতত্ত্ব পর্যন্ত সকল তত্ত্বে বীতস্পৃহ হয়ে তত্ত্বাতীত শিব-শক্তিস্বরূপ পরম বস্তুকে সর্বদা শিবের অনুগ্রহে দর্শন করেন, অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা নয়। এতাদৃশ জীবন্মুক্তের চিত্ত স্বভাবত পরতত্ত্বে লীন হয়। (ঐ, ৮২)

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বামকেশ্বর তন্ত্র অনুসারে একটি অদ্বৈত শাক্তমতের উল্লেখ করেছেন।* পরমশিব তত্ত্বাতীত শুদ্ধ প্রকাশ, যদিও জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপ বিমর্শশক্তি তাতে অন্তঃসংহৃতরূপে অবস্থান করে। তত্ত্বাতীত শিব থেকেই তত্ত্বপ্রধান দ্বৈতের আবির্ভাব ঘটে। তত্ত্বাতীত অবস্থায় শিব ও বিমর্শরূপ শক্তির সামরস্য অর্থাৎ সমরূপতা (sameness) থাকে। যখন সেই পরাশক্তি স্বেচ্ছাবশত নিজের স্ফুরত্তা অর্থাৎ মহিমার প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্বের দর্শন করে তা-ই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্বদর্শনই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্ব ভিন্ন না হলেও যখন ভিন্নবৎ অবভাসমান হয়, তখনি সৃষ্টি। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হয় না। অধিকাংশ শৈবাগম ও শাক্তাগমই দ্বৈতাগম। সুতরাং পূর্বোক্ত ৩৬ তত্ত্বের ও তত্ত্বাতীত শিবের বিবরণে পরিপূর্ণ।

মৃগেন্দ্রতন্ত্র ও শতরত্নসংগ্রহ অনুসারে দ্বৈত শৈবাগম ও শাক্তাগমের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে অপর একটি অদ্বৈত শাক্তাগম 'ত্রিপুরারহস্যতন্ত্রে'-এর কথা কিছু বলা হচ্ছে। এই শাক্তাগমের মতে, যিনি মহেশ্বর তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি শুদ্ধচৈতন্য বা প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য (unrestricted freedom) বিদ্যমান। সেই স্বাতন্ত্র্য তার শক্তিরূপে তাঁর মধ্যেই অন্তর্লীন অবস্থায় থাকে। প্রলয়কালে আছে বলে বোঝা যায় না। সৃষ্টিকালে সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছারূপ স্বাতন্ত্র্য শুদ্ধ ও অত্যন্ত স্বচ্ছ চিদাত্মাদর্পণে এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাসিত করেন। যদিও সাধারণ জড়দর্পণে কিছু প্রতিবিম্বিত হতে হলে দর্পণের বাইরে বিম্বরূপে তার অবস্থিতি প্রয়োজন, কিন্তু এই নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত পরতত্ত্বরূপ চিদাত্মদর্পণে প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাসিত হওয়ার জন্য বাইরে বিম্বের অর্থাৎ বিশ্বের কোন প্রয়োজন নেই। মহেশ্বর সদা পূর্ণ, সুতরাং আর স্থান কোথায় যে তাঁর বাইরে আরেকটা সত্য জগৎ থাকবে? সুতরাং প্রতীয়মান জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বস্বরূপ মিথ্যা। স্বচ্ছ শুদ্ধ চিদাত্মাই একমাত্র সত্য।

ঐ তন্ত্র আরো বলছেনঃ "সাধারণ দর্পণ জড়ত্বহেতু এবং স্বাতন্ত্র্যবর্জিতহেতু প্রতিবিম্বের জন্য বাইরে বিম্বের অপেক্ষা করে, কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ পরতত্ত্বের স্বচ্ছতা ও স্বাতন্ত্র্যহেতু এবং স্বত নির্মলতাহেতু বাইরে বিম্বের কোন অপেক্ষা নেই। (১১।৩৭, ৫৬-৫৭)

সেই পরমতত্ত্ব শিব কেবল চিৎস্বরূপ—চিদতিরিক্ত বিগ্রহবর্জিত। আবার অন্তর্লীন নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্টা সেই চিতি শক্তিই 'ত্রিপুরা' বলে কথিত হয়। এটিই ত্রিপুরারহস্য-তন্ত্রের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্ত।❑

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

* তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন—গোপীনাথ কবিরাজ, পৃঃ ২৭

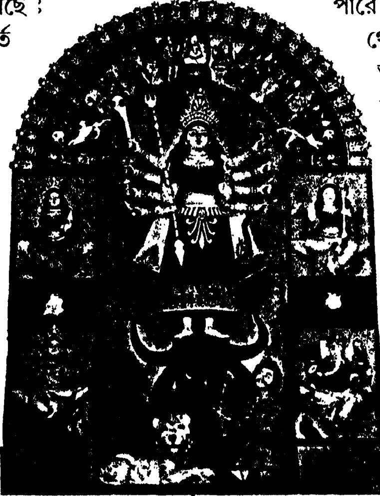


শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ঃ শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ*

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সূচনা

দুর্গাপূজা বাঙালির প্রাণের উৎসব—একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু কোন্ সময় এবং কোথায় এ পূজা-উৎসবের সূচনা হয়েছে তা নির্ণয় করা দুরূহ। ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত' ও 'রাত্রিসূক্ত'-এ শক্তি আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। 'চণ্ডী' ও 'গীতা'তেও 'মায়া', 'মহামায়া' ইত্যাদি উল্লেখের মধ্য দিয়ে দেবীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। 'চণ্ডী'তে আছে : "তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।/ মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা॥" (১।৫৩) শ্রীভগবান গীতামুখে বলছেন ঃ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।/ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (৭।১৪) পুরাণে দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেবীপূজা করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয়কামনায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এবং সফল অজ্ঞাতবাসের আশায় যুধিষ্ঠির শ্রীশ্রীদুর্গার স্তব করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের দ্বারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা করে পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করার কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য বিনাশের জন্য দেবীর আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। সুরথ ও সমাধি দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনে নিজ নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য দেবীর আরাধনায় ব্রতী হন।



কিন্তু এযাবৎ কথিত শক্তিপূজার কোনটিই ইতিহাস-স্বীকৃত নয়। তবে ইতিহাস থেকে যতটা জানা যায়, তাতে বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টের রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতকে প্রথম মূর্তিতে দুর্গাপূজা করেন। ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের রাজশাহীর রাজা কংসনারায়ণও মূর্তিতে দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে জানা যায়। এরপর থেকে বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণি তাঁদের ধর্মীয় আকুতির নিরসন ও আভিজাত্যের প্রকাশক হিসাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার উদ্দেশ্যেও মধ্যযুগে হিন্দু জমিদারশ্রেণি এই পূজার আয়োজন করতেন বলে জানা যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ঃ শক্তিসাধনা

উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই দেবীকে সকল শক্তির আধার মনে করে তাঁর অনুগ্রহলাভের জন্য পূজার আয়োজন। মর্ত্যমানব আমরা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, কায়িক-বল, বন্ধু-বল, শস্ত্র-বল—সবকিছু থাকা সত্ত্বেও একসময় স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশক্তির কাছে এসবই অতি নগণ্য। যেকোন সময়েই এসব বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও বলের সমস্ত অহঙ্কার ফুৎকারে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই নিরহঙ্কারিতা ও নিরভিমানিতা থেকেই ভক্তমানুষ মহাশক্তির সামনে আনত হয়। আবার অসহায়, দুর্বল মানব তার অজ্ঞাতসারেই মগ্ন হয় শক্তির আরাধনায়। এই আরাধনা তাই কেবল বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ মূর্তিপূজাই নয়—এ আরাধনা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত এক স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও স্বতোৎসারিত আকুল আবেদন।

এই অর্থে পৃথিবীতে কেউই নাস্তিক নয়, সকলেই আস্তিক। এস্থলে কোনরূপ রাজনৈতিক বিশ্বাসই মানুষের মহাশক্তি-নির্ভরতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কারণ যেকোন ব্যক্তিই, যিনি নিজ সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন এবং যিনি নিজ পুরুষকার দিয়ে সকল শক্তিকে সংহত ও আয়ত্ত করতে অপারক ও অসমর্থ—তিনি শক্তিসঞ্চয়মানসে কোন না কোন ভাবে জগতের মহাশক্তির মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য। কেউ এটি সত্যের অনুরোধে সহজে একবাক্যে স্বীকার করেন, কেউ অহঙ্কার বা অজ্ঞানতাবশত তা অস্বীকার করেন। যাহোক, এজগতে এমন কেউই নেই, যে কোন না কোন প্রকারে শক্তিলাভ করতে আগ্রহী নয়। সে-অর্থে আমরা সকলেই শক্তি-আকাঙ্ক্ষী, শক্তি-সন্ধানী ও শক্তি-পূজারী। আমরা কেউই দুর্বল হতে বা দুর্বল থাকতে চাই না। আমরা চাই 'মহতো মহীয়ান' হতে। শাস্ত্রে আছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।২।২৪) আমরা বলহীন দুর্বল হতে চাই না, কারণ আমাদের

* রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ-এর প্রধানশিক্ষক।

স্বরূপই হলো শক্তি ও বলবীর্য। আমরা সেই মহাশক্তিরই অংশ বা আমরা শক্তিস্বরূপই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"অহং ব্রহ্মাস্মি।" আবার ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাই শক্তি ও আমাতে ভেদ নেই। এই অর্থেও আমরা শক্তির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়েও শক্তির পূজারী—সর্বদাই শক্তির আকাঙ্ক্ষী।

সমন্বয়ের ভূমিকায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার দেবদেবীগণ

দেবী দুর্গা এই পূজার প্রধানা দেবী হলেও বঙ্গদেশে তিনি সপরিবারে পূজিতা হন। এ যেন বঙ্গদেশের যৌথ পরিবারেরই প্রতিচ্ছায়া। দেবী যেন সাধারণ বাঙালি পরিবারের গৃহকর্ত্রী, মমতাময়ী, সন্তানবৎসলা মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণা। এখানে তিনি এসেছেন পুত্র কার্তিক-গণেশ ও কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে। পুত্রকন্যাদের সঙ্গে আবার এসেছে তাঁদের পোষ্য ময়ূর, ইঁদুর, প্যাঁচা ও হাঁস। একই কাঠামের মধ্যে সকলের আসন। ওপরে চালচিত্রে রয়েছেন স্বামী শিব। রয়েছেন তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—সকল মতের দেবদেবীরই সম্মিলিত উপস্থিতি এই অপূর্ব চালচিত্রে। দেবী সিংহবাহনা, কিন্তু প্রবল প্রতাপ ও বিক্রমশালী হিংসাশ্রয়ী সিংহ এখানে পরম মিত্র। সে মায়ের একান্ত অনুগত অনুচর। নিজের জীবন পণ করেও দেবী ও তাঁর সন্তানসন্ততিদের সেবায় সে যেন সদা নিরত। সে যেন অতন্দ্র প্রহরী। মায়ের অসুরবিনাশকারী ভূমিকায় সে-ই প্রধান সহযোগী।

দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোর সমগ্র পরিকল্পনাটিতেই রয়েছে এক অপূর্ব সমন্বয়ের ভাব। এখানে কেউই বাদ যায়নি। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সভ্যমানুষ থেকে বনের পশুপাখি এবং অসভ্য দুরাচারী অসুর বা দানব পর্যন্ত এখানে স্থানলাভ করেছে। দেবী দুর্গা ঈশ্বরীরূপে যেমন পূজিতা, তেমনি শত্রু হলেও অসুরকেও সমান শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পশুরাজ সিংহ বলবিক্রমের প্রতীক হিসাবে আমাদের সসম্ভ্রম পূজা পেতেই পারে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু গৃহের অনিষ্টকারী ইঁদুরও সমানভাবে পূজিত। হাঁস গৃহপালিত উপকারী প্রাণী হিসাবে আমাদের ভালবাসা দাবি করতেই পারে, কিন্তু ভীতিপ্রদ নিশাচর প্যাঁচাও এখানে বাদ যায়নি। বাদ যায়নি বনপ্রান্তরে বিচরণকারী ময়ূরও। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পূজায় সিংহ বনের হিংস্র প্রাণীদের, ময়ূর স্থলচর পক্ষীকূলের, নিশাচর প্যাঁচা খেচর প্রাণীদের, ইঁদুর স্থলচর এবং হাঁস উভচর প্রাণীদের প্রতিনিধি। এভাবে দেবদেবীদের পাশে যাদের পূজিতের আসনে আসীন করা হয়েছে, তাদের সামগ্রিকভাবে জগতে দৃষ্ট সকল প্রজাতির প্রাণীর মধ্য থেকে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। স্থলচর, জলচর, খেচর, উভচর—কেউই এখানে বাদ যায়নি। এমনকি রয়েছে বিষধর সর্পও।

তবে একটি বিষয় যুগের বিবর্তনে বেশ পরিবর্তিত রূপ নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেটি হলো—পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, একই কাঠামে সকল দেবদেবীর উপস্থিতি আমাদের বঙ্গদেশের যৌথ পরিবারের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থারই প্রতিরূপ। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে গিয়ে যেমন পৃথক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, তেমনি বারোয়ারি পূজাগুলিতে দেবদেবীর প্রতিমাগুলিও পৃথক স্থানে পৃথক আসনে আসীন। এ যেন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার শৈলীতেও রূপান্তর বা বিবর্তন!

পূজোপকরণ নির্বাচনে সমন্বয়ের আদর্শ অনুসরণ

উপরি উক্ত নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন সত্ত্বেও একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই সমন্বয়ের পূজায় বনের মহীরুহ থেকে লতাগুল্ম পর্যন্ত কেউই বাদ যায়নি। এখানে রয়েছে অশ্বত্থ, বট, অশোক, যজ্ঞডুমুর ও আমের শাখা, রয়েছে অপরাজিতা লতা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র ইত্যাদি বনস্পতি, উদ্ভিদ ও লতাগুল্মের প্রতিনিধিরা। নবপত্রিকাপূজায় কলা, কালকচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান গাছের উপস্থিতি ভারতের চিরন্তন কৃষিসম্পদ-নির্ভর সমাজব্যবস্থার দ্যোতক। এই পূজায় মহাস্নানের জন্য প্রয়োজন হয় মরু-পাহাড়-পর্বত-সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তীর্থরাজির পবিত্র মৃত্তিকা। প্রয়োজন হয় নদ-নদী, ঝরনা, সরোবর, সাগর-মহাসাগর, পুষ্করিণী, কুয়ো ইত্যাদি নানা স্থানের জল। প্রয়োজন হয় সবুজ ঘাসের সূক্ষ্মশীর্ষে জমে থাকা শুদ্ধস্ফটিক শিশিরবিন্দুর। এই নানা তীর্থমৃত্তিকা ও বিভিন্ন স্থানের জল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সমগ্র ভারত-পরিক্রমার। কে জানে প্রাচীন বুধমণ্ডলী বর্তমান যুগের তথাকথিত জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা বা দেশাত্মবোধ সঞ্চারের কোন গূঢ় অভিপ্রায় নিয়ে এসব পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা! যদি তা নাও হয়, তবুও বর্তমান অস্থিরতার যুগে পূজোপকরণ সংগ্রহকল্পে ভারতভ্রমণ বিধান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে উপকরণ নির্বাচনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন ভেদই করা হয়নি, বরং অতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে যেন নিতান্ত নগণ্য দ্রব্যটিও বাদ না যায়। ধান, দূর্বা, তিল, সর্ষে, হরীতকী, পান, সুপারি, চাল, যব, কলাই, ফল, ফুল, অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দুধ, দই, ঘৃত, খই, গোময়, গোমূত্র, কাষ্ঠ, চন্দন, সিদ্ধি, মাটি, বালি, জল ইত্যাদি সবই এই পূজায় সমাদরে আহৃত ও ব্যবহৃত হয়।

সকল বৃত্তিভোগী মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমন্বয়ের দ্যোতক

দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়। এই পূজায় একেবারে আক্ষরিকভাবেই সকল শ্রেণির সকল বৃত্তিভোগী মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়। প্রথমেই প্রয়োজন সম্পন্ন গৃহস্থের, যিনি এই পূজার মূল আয়োজক। প্রয়োজন বিদ্বান শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের, যিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ করে শাস্ত্রবিধান মেনে সুচারুরূপে সমগ্র পূজাটি সম্পন্ন করবেন। পূজায় মৃন্ময়ী মূর্তি ও মৃৎপাত্র নির্মাণে মৃৎশিল্পীদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বলির জন্য প্রয়োজন কর্মকারের। দেবীর অলঙ্কার নির্মাণে অলঙ্কারনির্মাতাদের রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। দেবদেবী তথা পূজায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই এইসময় নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। তাই তন্তুবায় ও দরজিগণ এই কাজে সাহায্য না করলে সমগ্র পূজার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই পূজায় স্থানসঙ্কুলানের জন্য সুবিশাল মণ্ডপ নির্মাণে ঘরামি বা আধুনিক যুগের ডেকরেটরদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পূজামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে আলোকোজ্জ্বল করার জন্য প্রয়োজন আলোকশিল্পীর। ঢাকি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রীরা না থাকলে এই পূজার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়। ঢাক তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় চর্মকারদের। এই পূজায় ফুলমালার জন্য প্রয়োজন মালাকারদের। দুধ, দই ও ঘৃতের জন্য গোয়ালাশ্রেণির মানুষের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। পর্যাপ্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ময়রা ও হালুইকরদের সাহায্য না হলেই নয়। বিপুল ভোগরাগের জন্য রাঁধুনী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ভোগরাগের জন্য প্রয়োজন প্রচুর খাদ্যশস্য ও শাকসবজির। একাজে কৃষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আধুনিক শিল্পসভ্যতার যুগে শ্রমিকশ্রেণির উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী ভিন্ন কোন কাজই করা কঠিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিনোদন ও সাজসজ্জার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শিল্পীর। মেলাপ্রাঙ্গণকে জমজমাট করে তোলার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পসরাধারী ব্যবসায়ীদের। এসব দিক বিবেচনা করলে এই পূজার সমন্বয়কারী ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা সহজেই ধারণালাভ করতে পারি। অতএব দুর্গাপূজা নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানমাত্র নয়, এর এক সর্বাবগ্রাহী ও সর্বানুস্যূত ভাবব্যাপকতা আছে, যা লোকলোচনের অন্তরালে নিঃশব্দ পাদচারণে সমগ্র সমাজব্যবস্থার ওপর অমোঘ প্রভাববিস্তার করে স্মরণাতীত কাল থেকে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ও এগিয়ে চলেছে। তাই সংশয়াতীতরূপেই আমরা বলতে পারি, দুর্গাপূজা শক্তির সাধনা, দুর্গাপূজা সমন্বয়ের সাধনা। ❑

শব্দচেতনা ৩৯

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ শব্দছক

১				২	■	৩		৪	
	■	■	■		■		■		■
৫	৬		■	৭			■		■
■		■	৮		■	■	৯		১০
১১		■	■		■	■		■	
	■	১২	■	■	১৩	■	■	১৪	
১৫	১৬		■	■	১৭		■		■
■		■	১৮			■	১৯		২০
■		■		■		■	■	■	
২১				■	২২				

পাশাপাশি ঃ (১) একালে দুর্গাপূজার প্রবর্তক কংসনারায়ণ যেখানকার রাজা ছিলেন (৩) দুর্গাপূজা 'কলির —— যজ্ঞ' (৫) দেবী ছিন্নমস্তার ভৈরব (৭) এদের বিনাশ করে দেবী ত্রিলোককে আশ্বস্ত করেন (৮) পূজান্তে উচ্চারিত শেষ মন্ত্র (৯) অগ্নির তেজে দেবী মহামায়ার যে-অঙ্গের উদ্ভব হয় (১১) লক্ষ্মীর এক নাম (১৪) দেবীর শ্রীহস্তে দশপ্রহরণের একটি (১৫) "দানবদমনী ——শমনী ভবানী ভবসংসারে গেঁ" (অন্নদামঙ্গল) (১৭) অন্যতম শক্তিপীঠ অমরনাথে পতিত সতীর দেহাংশ (১৮) সরস্বতীর এক নাম (১৯) পার্বতীজননী (২১) কার্তিকের এক নাম (২২) দুর্গাপূজায় এঁর পূজা অবশ্যপালনীয়।

ওপর-নিচ ঃ (১) দেবসেনাপতি এই অসুরকে বধ করেছিলেন (২) চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর রূপবিশেষ (৩) পদ্মফুল (৪) শরৎকালের অন্য নাম (৬) দশমহাবিদ্যার এক রূপ (৯) "হিমাচলে মহাপুণ্যে ——দেবী ততঃস্মৃতা (দেবীপুরাণ) (১০) মধ্যভারতে অন্যতম সতীপীঠ (১১) ব্রহ্মা (১২) হৃৎপদ্মে দেবীর রূপচিন্তন (১৩) ইন্দ্র (১৪) এবারে দেবীর 'দোটকে ——' (১৬) দুর্গা যাঁর ঘরনি (১৮) অন্যতমা পীঠদেবী অপর্ণার ভৈরব (২০) চণ্ডিকাদেবীর রূপভেদ।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম অগ্রহায়ণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।



স্মৃতিকথা

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ



মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান ভক্ত। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন এবং বহু বিষয়ে স্বামীজীকে সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজীর ভক্তরা তাঁকে 'ট্যান্টিন' (পিসিমা) বলে ডাকতেন। মঠ-মিশনের বহু কার্যে তাঁর সাহায্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি স্বামীজীর প্রচারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং মমতারই মতো মমতাময়ী।" ১৯৪৯ সালে তিনি হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রে ৯৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে হলিউড কেন্দ্রে স্বামী কৃষ্ণানন্দ মিস ম্যাকলাউডকে তাঁর ছবির অ্যালবাম দেখান এবং গ্রামাফোনে তাঁদের কথোপকথন রেকর্ড করেন। পরবর্তী কালে লিণ্ডা প্রু স্বামী কৃষ্ণানন্দ ও মিস ম্যাকলাউডের কণ্ঠস্বর ক্যাসেট থেকে শ্রুতিলিখন করেন এবং স্বামী চেতনানন্দ তা বাঙলায় অনুবাদ করেন।

—সম্পাদক

২ জুলাই ১৯০২ নিবেদিতা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল; আর স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ৪ জুলাই। ঐ চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিল যে, স্বামীজী তাকে বলেন ঃ "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। (দুদিন পরেই তিনি চলে গেলেন।) তুমি এস এবং খাও।" নিবেদিতা খেল। নিবেদিতা ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আমাকে চিঠিতে লিখেছিল যে, স্বামীজী আমার সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "I was as pure as purity and loving as love itself."—আমি স্বয়ং মূর্তিমতী পবিত্রতা ও ভালবাসা। আমার সম্বন্ধে এটাই ছিল স্বামীজীর শেষ উক্তি।

স্বামীজীর দেহ দাহ কালে নিবেদিতা চিতার কাছেই উপস্থিত ছিল। সাধুরা যে গেরুয়া চাদর গায়ে দেয়, স্বামীজীর শরীর ঐরকম একটি চাদরে ঢাকা ছিল। [স্বামীজীর শরীর যখন লেলিহান অগ্নির মধ্যে তখন] নিবেদিতা ভাবছিল, উঃ! ঐ চাদরের একটুকরো যদি আমার কাছে আসে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাদরের একটু অংশ বাতাসে উড়ে তার কাছে এল এবং পরে সে আমাকে পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন সেখানে ছিলাম না।

(১) গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িখানি

বেলুড় মঠের পুরনো বাড়িখানির ছবি দেখে নিজের মনেই বলে চলেন—এই সেই বেলুড়ের ছোট বাড়িটি—এখন বেলুড় মঠে পরিণত হয়েছে। যারা গঙ্গাতীরে নৌকা গড়ত ও সারাত, তারা এই বাড়িটি তৈরি করেছিল। এই বাড়িটির একদম নিরাপত্তা ছিল না, কারণ চোর-ডাকাত বা যেকেউ নদীপথে এসে বাড়িতে ঢুকতে পারত। তাই স্বামীজী তাঁর প্রথম শিষ্যকে [স্বামী সদানন্দকে] বাড়িটি পাহারা দেওয়ার জন্য রাখেন। সদানন্দ ছিলেন বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। মিসেস ওলি বুল ও আমি তাঁকে বড় জানতাম না। স্বামীজী প্রতিদিন এই বাড়িতে আমাদের দেখতে আসতেন। একদিন নিবেদিতা আমাদের দেখতে এল। উঃ, তার মুখখানা মশার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। তার মুখে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে মশা কামড়ায়নি। এই বাড়িতে একটা পৃথক ছোট ঘর ছিল, সেখানে নিবেদিতা এসে মিসেস বুল ও আমার সঙ্গে থাকতে শুরু করল। একটা ঘরে আমরা দুটো বিছানা রেখেছিলাম। আমাদের বৈঠকখানা ঘরের একপাশে একটা কার্পেট বিছানো ছিল আর আমরা মেঝেতেই বসতাম। অপর একটি বড় ঘরে আমরা চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র রেখেছিলাম; সেখানে আমরা অতিথি ও অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতাম। নিবেদিতার জন্য আলাদা ঘর ছিল, সেখানে সে তার শিক্ষালাভ করেছিল। স্বামীজী প্রতিদিন আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন।



১৯৩৫-এ বেলুড় মঠে উৎসবের দিনে, স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত

(২) শ্রীশ্রীমায়ের ছবি

পূজাবেদিতে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেখে—কী সুন্দর ছবিখানি! তুমি [কৃষ্ণানন্দকে] কী করে এই রঙিন ছবি তৈরি করলে? দেখ, কোন অজানিত পুরুষ কখনো সারদাদেবীর মুখ দেখতে পায়নি। সারা বুল ও নিবেদিতা তাঁকে অনুরোধ জানাল ঃ "মা, আমরা আপনার ছবি তুলতে চাই।" আমি তাঁকে বললাম ঃ "মা, আপনি কি ক্যামেরার সামনে স্থির হয়ে বসে ছবি তুলতে রাজি আছেন?" তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ।" তিনি ফটোগ্রাফারের সামনে বসলেন—যেন সারাজীবনই তিনি এব্যাপারে অভ্যস্ত! উঃ, কী অপূর্ব ছিল তাঁর সংযম! কী শান্ত ভাব! ঐ ছবিতে যেন তিনি সদা বিদ্যমান। আমরা চেয়েছিলাম বলেই মায়ের এই ছবি হলো। কিন্তু তিনি এসব ধূমধাম বা নিজেকে জাহির করা পছন্দ করতেন না। ❑

মল্লভূমে দুর্গোৎসব

সুদর্শন নন্দী*

কথায় বলে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কথাটি যদি বঙ্গবাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে মল্লভূমের অধিবাসীদের পার্বণের সংখ্যাটি কিঞ্চিৎ বেশিই ছিল। আর তার মধ্যে বিরাট বিস্তৃত উৎসব যা এখনো গতানুগতিকভাবে চলে আসছে, তা হলো মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের রাজদরবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। যদিও মল্লভূমের এই সাবেকি পূজাব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন বর্তমানে ঘটেছে, তবুও এই দুর্গোৎসব এক অভিনব পদ্ধতি ও পরিবেশে সম্পন্ন হয়। বিষ্ণুপুরের মূল দুর্গাপূজা রাজদরবারে মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ীর। মন্দিরে তাঁর যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তা অন্যান্য দুর্গাপূজা থেকে স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে (৪০৪ বঙ্গাব্দ, ৩০৩ মল্লাব্দ)। তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রয়েছে এক বিচিত্র কাহিনী।

মল্লভূমের ঊনবিংশ মল্লরাজ জগৎমল্ল খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মল্লভূমের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে শিকারে বেরিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে বিষ্ণুপুরের ভয়াল অরণ্যে উপস্থিত হন। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে তিনি যখন ভাবছেন কী করবেন, তখন এক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হন। হঠাৎ দেখতে পান এক হরিণকে। এই হরিণকে শিকার করার জন্য পিছনে ছুটে যান জগৎমল্ল। হঠাৎ হরিণ হয় অদৃশ্য। এরপর তিনি দেখলেন এক বক সামনের চারুলতা গাছে বসে আছে। বককে দেখে মল্লরাজ তাঁর শিকারি বাজপাখিকে ছাড়লেন। কিন্তু ফল হলো উলটো। বক তাড়া করল বাজপাখিকে। বাজপাখি ত্রস্ত হয়ে ফিরে এল রাজার কাছে। এমন সময় আরেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তিনি দেখলেন এক নারী হেঁটে যাচ্ছেন সামনেই। মল্লরাজ চিৎকার করে উঠলেন। নারী অদৃশ্য হলেন। শোনা গেল নারীকণ্ঠ। দৈবকণ্ঠে শোনা গেল—এই হরিণ, বক, নারী সবই ঘটিয়েছেন এক দেবী। দেবীর আদেশমতো রাজা তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন এবং ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন মৃন্ময়ী মূর্তি। কুশ এবং গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরি হলো প্রতিমা। পরবর্তী কালে তৈরি হয় মায়ের মন্দির, যেখানে আজও প্রতিদিন পূজার্চনা হয়। বাংলার তিনটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দুর্গাপূজার অন্যতম এই পূজা।



বিষ্ণুপুরের দেবী মৃন্ময়ী

প্রবাদ আছে ঃ "মল্লে 'রা', শিখরে 'পা'/ সাক্ষাৎ দেখবি তো শান্তিপুরে যা।"

মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুর রাজদরবারের এই দুর্গাপূজায় আজও কান পাতলে মহাষ্টমীর দিন যে তোপধ্বনি চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয় তাতে এক অভিনব শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, যা মল্লের 'রা' ('রা' অর্থে রব বা শব্দ) নামে পরিচিত। কথিত আছে, শিখরভূমে সিঁদুরের ওপর পড়ত মায়ের পদচিহ্ন আর শান্তিপুরে মাকে দেখতে পাওয়া যেত পূর্ণ মহিমায়।

আগেই বলা হয়েছে, বিষ্ণুপুরের মূল দুর্গাপূজা মল্ল-রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই পূজা অন্যান্য দুর্গাপূজা থেকে আলাদা। সাধারণ দুর্গাপূজা হয় যে বেদ ও পুরাণ-মতে, এ তা নয়। এখানে যে-মতে পূজা হয় তার পুঁথি এখনো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়নি। এই হাতে লেখা পুঁথি বিষ্ণুপুরের রাজপুরোহিত মহাপাত্রদের বাড়িতে রাখা আছে। পূজাপদ্ধতি, বলা বাহুল্য, স্বতন্ত্র। এই পূজাপদ্ধতি বিভিন্ন ধারার মিশ্রণকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছে। এর কারণ সঠিকভাবে বলা মুশকিল। হয়তো রাজারা তাঁদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই ধরনের পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন এবং পূজায় বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই পূজায় তন্ত্র, বৌদ্ধ সংস্কার, ভাগবতের প্রভাব, কাত্যায়নী পূজা ইত্যাদি ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'ভাগবত'-এ গোপীদের কাত্যায়নী পূজা, দক্ষের কন্যাদের পিত্রালয়ে আগমন ইত্যাদির বর্ণনা আছে। 'চণ্ডী'তে

উৎসাহী লেখক, বর্তমানে খড়্গপুর-নিবাসী, চাকুরিরত।

অষ্টাদশভুজা কর্তৃক মহিষাসুর নিধন করার বিষয়টি উল্লিখিত আছে। এসমস্ত বিষয় এখানকার দুর্গাপূজায় স্থান পেয়েছে। মিশেছে তন্ত্র, বৌদ্ধ সংস্কারও। আবার বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে এই পূজায়, যার কারণ বোঝা বেশ মুশকিল।

সাধারণ দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ হয় দেবীপক্ষের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের এই দুর্গাপূজা পিতৃপক্ষের নবমী তিথি থেকে শুরু হয়ে দেবীপক্ষের দ্বাদশী তিথি পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ উনিশ দিন ধরে চলে। পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে কল্পারম্ভ হয় বলে একে 'নবম্যাদি কল্পারম্ভ' বলে। তার আগের দিন অর্থাৎ অষ্টমীর দিন জীমূতবাহন পূজা (জীতাষ্টমী) হয় এবং সেইদিনই মা মৃন্ময়ীর বিল্ববরণ। বিষ্ণুপুরের এই দুর্গাপূজায় মৃন্ময়ীদেবীর সঙ্গে পটে আঁকা তিন ঠাকরুনের পূজা হয়। এঁরা বড় ঠাকরুন, মেজ ঠাকরুন ও ছোট ঠাকরুন নামে পরিচিতা। নবমী তিথিতেই মৃন্ময়ীদেবীর মন্দিরে পটে আঁকা মহিষাসুরমর্দিনী তাঁর ঘট-সহ আসেন। পরে দেবীপক্ষের চতুর্থীতে বড় ঠাকরুনের মতো পট ও ঘট-সহ আসেন মেজ ঠাকরুন। ইনি 'মাইতর ঠাকরুন' নামেও পরিচিতা। তিনি বড় ঠাকরুনের মতো অবস্থান করেন না। তিনি পরদিন সকালে বিদায় নেন। ষষ্ঠীর দিন আবার বিল্ববরণ ও আমন্ত্রণ-অধিবাস হয়। পরদিন সপ্তমীতে একই ধরনের পট ও ঘট-সহ আসেন ছোট ঠাকরুন। ইনি 'পটেশ্বরী' নামেও পরিচিতা। উল্লেখ্য, এই ছোট ঠাকরুনের সঙ্গে মেজ ঠাকরুনের পুনরাগমন হয়। এবার চলে তিন ঠাকরুন ও মৃন্ময়ীদেবীর পূজা। সপ্তমীতে ব্রহ্মাণী, কালিকা, রক্তদন্তিকা, শোকহারিণী, কার্তিকী, শিবা, দুর্গা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মীদেবী—এই নয় রূপের প্রতীক নবপত্রিকায় বিস্তৃতভাবে পূজা হয়। এই পূজায় স্নানের সময় সমুদ্র, বিভিন্ন নদনদীর জল ও মাটির প্রয়োজন হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয় অষ্টমীর দিন। সেদিন অষ্টধাতু-নির্মিত অষ্টাদশভুজাকে বাইরে আনা হয়। এরপর দেবীর স্নান হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। রাজা পুষ্পাঞ্জলি দেন। এসময় আর কারো পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার থাকে না। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে বৈষ্ণব রীতিতে বলিদান হয়। এই সন্ধিক্ষণটি সূচিত করার জন্য রাজ-দরবারের কাছে মূর্চার পাড়ের ওপর রাখা কামানে আগুন দিয়ে তোপধ্বনি করা হয়। এই কামানদাগার অনুষ্ঠান দেখতে জমায়েত হয় হাজার হাজার নরনারী। তোপধ্বনি শুনে শুধু রাজদরবার নয়, মল্লভূমের পারিপার্শ্বিক অঞ্চল তথা গ্রামের বিভিন্ন দুর্গামণ্ডপে বলিদান হয়।

নবমীতে অনুষ্ঠান একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই পূজা সর্বসাধারণের দেখার কোন অনুমতি নেই। তাই এই সময় বিশেষ জনসমাগমও হয় না। কেবল রাজা এবং রাজপরিবারের অন্য সকলের এই পূজা দেখার অনুমতি আছে। এই পূজায় যে-মূর্তি পূজিতা হন, সেটিও পটে আঁকা এবং ইনি 'খচ্চরবাহিনী' নামে পরিচিতা। তাই এই পূজাকে 'খচ্চরবাহিনী মহাপূজা'ও বলা হয়। কথিত আছে, মৃন্ময়ীদেবী এক অশ্বতর (খচ্চর)-এর পিঠে চড়ে দুর্গের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেইসময় দুর্গের অভ্যন্তর পরিদর্শনরত হাম্বিরমল্লকে দেবী দর্শন দেন। এর পর থেকেই রাজা দুর্গোৎসবের মধ্যেই এই পূজা শুরু করেন। নবমীর পরদিন বিজয়াদশমীতে শুরু হয় বিসর্জন পর্ব। একমাত্র মা মৃন্ময়ী ছাড়া সকলকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। আগে এই বিসর্জন খুব জাঁকজমক করে কৃষ্ণবাঁধে হতো। এখন তা হয় না। বিসর্জন দেওয়া হয় পাশের গোপালশায়ের পুষ্করিণীতে। ঐদিন সন্ধ্যাবেলা দেবীমন্দিরে প্রথমে অপরাজিতা পূজা ও দীপদান হয় এবং পরে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হয়। আগে অপরাজিতা লতা ধারণ করে রাজা পালকিতে করে নগর পরিক্রমা করতেন এবং পরিক্রমার শেষে তোপধ্বনির মাধ্যমে রাজার রাজদরবারে আগমন ঘোষণা করা হতো। এখন আর এসব হয় না। এছাড়া আরো কিছু অনুষ্ঠান আগে হতো, যাতে কালের গতিতে ছেদ পড়েছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকত গানবাজনার আসর। হতো এক নির্মম অনুষ্ঠানও। দশমীর দিন যে-তোপধ্বনির মাধ্যমে রাজার প্রত্যাগমন হতো রাজদরবারে, তার সূত্রপাত হতো এক শূকরের নির্মম হত্যার মাধ্যমে। একটি শূকরকে নিচে ফেলে তার ওপর দিয়ে একটি হাতিকে পার করানো হতো এবং হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে যখন শূকরটি যন্ত্রণায় চিৎকার করত, তখনি হতো ঐ তোপধ্বনি। কী বিচিত্র অনুষ্ঠান!

আগেই বলা হয়েছে, বিষ্ণুপুরের এই ঐতিহাসিক দুর্গাপূজা উনিশ দিন ধরে চলে। শুরু পিতৃপক্ষের নবমীতে, শেষ দেবীপক্ষের দ্বাদশীর দিনে। তাই সাধারণ দুর্গাপূজা দশমীর দিন শেষ হলেও মল্লভূমের এই দুর্গোৎসব চলে আরো দুদিন ধরে। এই দুদিন সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতির মুখোশ পরে নাচগানের মাধ্যমে হয় 'রাবণকাটা' অনুষ্ঠান। দশমীতে মাটির তৈরি ইন্দ্রজিৎ বধ হয় এবং একাদশী-দ্বাদশীতে হয় যথাক্রমে কুম্ভকর্ণ ও রাবণবধ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানগুলি হয় রাজদরবারের অদূরে কাঁটানধার স্থানে। এরপর হয় নৃত্যানুষ্ঠান। সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির মুখোশ পরে নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য করতে করতে সারা শহর পরিক্রমা করে। রাস্তার দুধারে প্রচুর জনসমাগম হয়। শিল্পীরা নৃত্যানুষ্ঠান করে রাজদরবারেও। শেষ হয় উনিশদিন ধরে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গোৎসব।

এরপর শুরু হয় পরের বছরের জন্য প্রতীক্ষা। ❑

সর্বতীর্থসার বেলুড় মঠ

নির্মলকুমার রায়*

বেলুড় মঠের সূচনা থেকেই শ্রীশ্রীমা এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে তাঁর মর্মস্পর্শী আকুল প্রার্থনা ও অন্তর-মথিত ক্রন্দনের ফলশ্রুতি এই বেলুড় মঠ। তাঁর নিজের কথায়ঃ "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যাকিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করল।"[১]

"মঠের নতুন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে; বললে, 'মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।' বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হতো!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো। একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।'"[২]



১৯৩৫ সালে জনৈক আমেরিকান ভক্তের তোলা শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের আলোকচিত্র, স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি মঠের জমি কেনার পর ৩০ মার্চ স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করেন; কারণ, এইসময় তাঁর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু মে মাসেই কলকাতায় প্লেগরোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়; এই সংবাদে জীবদুঃখে কাতর স্বামীজী আর স্থির থাকতে না পেরে ৩ মে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং আর্তগণের সেবায় সঙ্ঘের সকলকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু সেবাকাজের জন্য আর্থিক টানাটানি পড়ায় স্বামীজী এই মঠের জমি বিক্রি করে দুর্গতদের সাহায্যে অর্থব্যয় করতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা এইসময় এই বিক্রির প্রচেষ্টায় বাধা দিলে স্বামীজী আর এবিষয়ে অগ্রসর হননি; অর্থাৎ জগন্মাতার কৃপাতেই সেদিন মঠের জমি বিক্রি বন্ধ থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের যুক্তি ছিল—বেলুড়ের জমি স্বামীজীর একার নয়; আর তাছাড়া প্লেগরোগীদের অন্যভাবে সাহায্য করা হোক, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি বিতরণকেন্দ্র বেলুড়ের যেন ক্ষতি না হয়। যে মহাশক্তিকেন্দ্র বেলুড় মঠ যুগ যুগ ধরে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে—তা একটা সেবাকাজেই শেষ হয়ে যেতে পারে না। শেষপর্যন্ত অবশ্য জমি বিক্রির প্রয়োজন হয়নি, কারণ অন্য সূত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ এসে পড়েছিল। এইভাবে শুরু থেকেই মঠকে রক্ষার দায়িত্ব যেন শ্রীশ্রীমাই গ্রহণ করেছিলেন। এই বিশেষ ঘটনাটি তাঁর দূরদর্শিতার অভিনব প্রকাশ।

মঠে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ ও ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী শ্রীমাকে সঙ্ঘজননীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিশনের তহবিল থেকে তিনি প্রতি মাসে শ্রীমায়ের জন্য ২৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আলোচ্য সময়ে সঙ্ঘজীবনে শ্রীমায়ের প্রভাব নীরবে অথচ সুনিশ্চিতভাবে কিরূপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা দেখবার মতো।

* *'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরিচিত নাম, বিদগ্ধ সত্যনিষ্ঠ গবেষক, অধুনা প্রয়াত।*

"শ্রীমা বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে কখনো যাননি। মা যখন নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে, সেসময়ে ৯ এপ্রিল ১৮৯৮ তিনি মঠে প্রথম পদার্পণ করেন। মঠবাসিগণ শঙ্খধ্বনি করে সঙ্ঘজননীকে অভ্যর্থনা করেন, তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করেন। নতুন কেনা জমিতে মঠ স্থানান্তরের আগেই শ্রীমা অন্তত তিনদিন সেই জমি ও নতুন তৈরি বাড়িঘর দেখতে যান। ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীমা নিজে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সুসম্পন্ন করে প্রথম মঠবাড়িখানি উৎসর্গ করেন। সেদিনই সন্তানগণ শ্রীমায়ের পদরজ সংগ্রহ করে যে-কৌটায় রাখেন সেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের একটি কুলুঙ্গিতে স্থাপিত হয়েছে।"[৩] প্রসঙ্গত, গর্ভমন্দিরের অপর কুলুঙ্গিতে বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন।



মঠের ও শ্রীশ্রীমা বেলগাছ, যার নিচে স্বামীজী খাটিয়া পেতে বসতেন

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য যে-জমি কেনা হয়েছিল, সেই জমিতে একটি অতি পুরনো একতলা বাড়ি ছিল। সেই একতলা বাড়িতে দুখানা বড় ঘর ও দুখানা ছোট ঘর, একটি বারান্দা এবং ভৃত্যদের থাকার জন্য আরো তিনখানা ঘর—সবসুদ্ধ মোট সাতখানা ঘর ছিল, আর প্রবেশদ্বারের কাছে একখানা ভাঙা ঘরও ছিল। বেলুড় মঠের জন্য এই জমি কেনার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে ঐ পুরনো বাড়িটির সংস্কার করা হয় এবং একটি নতুন ঠাকুরঘর নির্মিত হয়। ঐ বাড়ির উত্তরদিকের দুখানি ঘরের মেঝে আগে থেকে পিচ ঢালা থাকায় ঘর দুখানি বসবাসের উপযুক্ত ছিল। উত্তর-পূর্বকোণের ঘরটি পরে 'ভিজিটার্স রুম' হয় এবং অন্য ঘরটিও সাধুদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়। অবশ্য জমি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড কিছুদিন ঐ ঘরদুটিতে বাস করায় প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই বেলুড় মঠের সর্বপ্রথম অধিবাসিনী-রূপে গণ্য হন। এই বাড়িটিকেই বেলুড়ের 'আদি মঠ' বলা যেতে পারে। এইসময় কিছু সাধু নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে ও কিছু সাধু মঠের এই পুরনো বাড়িতে বাস করলেও পুরনো বাড়িটির সংস্কারের পর ও কিছু নতুন সংযোজনের পর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে মঠ বেলুড়ের তৎকালীন নতুন মঠে স্থানান্তরিত হয়; অবশ্য প্রয়োজনবোধে কিছুদিনের জন্য নীলাম্বরবাবুর বাড়িটিও তখন আংশিক ব্যবহৃত হতো মঠভূমিতে নতুন দোতলা বাড়ি নির্মাণের পর একদিকের অংশে দোতলায় ঠাকুরঘর এবং তারই সংলগ্ন পূর্বদিকের দোতলায় স্বামীজীর ঘর নির্দিষ্ট হয়।

এখানে উল্লেখ্য, বরানগরের আদি রামকৃষ্ণ মঠ যেমন পরবর্তী কালে বেলুড়ে পরিপূর্ণতা গ্রহণ করে, তেমনি বাগবাজার বলরাম-মন্দির থেকে আদি রামকৃষ্ণ মিশনও বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয়ে ব্যাপক কর্মপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের বহু শাখাকেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়রূপে অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য বেলুড়ের জমি আরো ক্রয় করায় এর আয়তন বৃদ্ধি পায়।

স্বামীজী মঠের জন্য বেলুড়ে যে-জমি কিনেছিলেন, সেখানে একদা শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল; অবশ্য স্বামীজী সেই ঘটনা না জেনেই জমিটি কিনেছিলেন। এই অমূল্য তথ্য পরিবেশন করেছেন স্বামী সারদানন্দের শিষ্য স্বামী নির্লেপানন্দ—যিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী যোগীন-মায়ের দৌহিত্র কার্তিকচন্দ্র মিত্র। 'রামকৃষ্ণ-সারদামৃত' গ্রন্থে তিনি যে-বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের পর স্বামী সারদানন্দ যে-'নোটবুক' রাখতেন ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায়ে (যা পরে আর প্রকাশিত হয়নি)—সেই নোটবুক স্বামী নির্লেপানন্দের কাছে গচ্ছিত থাকায় তিনি পরবর্তী কালে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বেছে 'রামকৃষ্ণ-সারদামৃত' গ্রন্থে 'লীলাপ্রসঙ্গের বাড়তি উপাদান' নামে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থেরই এক স্থানে 'শ্রীরামকৃষ্ণের নব সমাচার' প্রসঙ্গে উল্লেখ আছেঃ

"যোগেন স্বামী কালোকে—ওরে, নরেন মঠ করবার জন্য যে-জমি কিনেছে, ওজমিতে তাঁর [ঠাকুরের] পায়ের ধুলো পড়েছে। নেপালের রাজার কাঠগোলা এখানে ছিল। কাপ্তেনের সঙ্গে তিনি একদিন ওখানে বেড়াতে যান।"

বলা আবশ্যক, এখানে 'যোগেন স্বামী' হলেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ, কালো—জনৈক ভক্ত আর কাপ্তেন হলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট নেপালি ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

এই তথ্যের অনুকূলে আরেকটি প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণেঃ "বেলুড়ে নেপালের কাঠের টালে [ঠাকুর] গিছলেন। গঙ্গায় ভাসিয়ে আনত কাঠ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নিয়ে গিছলেন। ঠাকুরের মুখে শোনা এই কথা।"[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত বিবরণাদি অনুযায়ী বর্তমান বেলুড় মঠের জমিতেই ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং

ঠাকুরের এমনই মহিমা যে, স্বামীজী যেন দৈবনির্দেশে অজ্ঞাতসারেই ঠাকুরের পদরজঃপূত বেলুড়ের এই স্থানটি মন্দিরনির্মাণের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

বেলুড় মঠের স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি ঃ "আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার ঐজায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।"[৫] প্রসঙ্গত, তখনো মঠ হয়নি। শ্রীশ্রীমা আরো বলেছেন ঃ "যাঁর জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।"[৬]

এই সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দের একটি সমীক্ষা ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে পূজিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিরূপে স্বীকৃত শ্রীমা সারদার সাধনভজন, বিশেষত আলোচ্য কালে বেলুড় গ্রামে তাঁর তপস্যাদির তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা ধরনের আলোচনা শোনা গিয়েছে। আমাদের মনে হয়, শ্রীমায়ের নিম্নলিখিত কথার মধ্যেই রয়েছে এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত। শ্রীমা বলেছিলেন, 'আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কী শান্ত জায়গাটি; ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল।' এর পরেও শ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ও বেলুড় মঠের 'সোনার বাগান'-এ (লেগেট হাউস-এ) বাস করেছিলেন। বর্তমান জমিতে মঠ স্থানান্তরের আগে তিনি তিনবার এবং স্থানান্তরের পরে বেশ কয়েকবার পদার্পণ করেছেন।... বেলুড়ের স্থানমাহাত্ম্য শ্রীমাই ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন।... এসব কাহিনী স্মরণ করলে মনে হয়, বেলুড় মঠের অধিকৃত ভূমিখণ্ড যেন মঠের জন্য 'কুটোবাঁধা' হয়েছিল। বোধ করি একারণেই অন্যত্র জমি সংগ্রহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং দৈবনির্ধারিত এই জমিতেই অবশেষে স্থায়ী মঠ গড়ে উঠেছিল।"[৭]



মূল মন্দিরের পূর্বে বেলুড় মঠে যেখানে স্বামীজী 'আত্মারামের কৌটা' স্থাপন করেন

স্বামীজী প্রবর্তিত বেলুড় মঠে প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাস্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। অবশ্য এর পরে আরো দুবার বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা প্রবর্তনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েরই অলৌকিক দর্শন হয়। অতঃপর কলকাতার বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে স্বামীজী পূজার অনুমতি নিয়ে আসেন এবং ষষ্ঠীর দু-একদিন আগে কলকাতার কুমারটুলী থেকে প্রতিমা আনা হয়।

এই পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীভক্তদের এনে পার্শ্ববর্তী নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয় এবং সেখান থেকেই প্রতিদিন তাঁরা পূজায় যোগদান করতেন। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী ভূমানন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ "এই পূজায় শ্রীশ্রীমা আসিবেন। পূজার সময় তিনি যাহাতে মঠে উপস্থিত থাকিয়া পূজাদর্শন করিতে পারেন, তাহার জন্য নীলাম্বরবাবুর যে-বাড়ি পূর্বে মায়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, সেই বাড়িই ভাড়া করা হইল। যথাসময়ে রাধু, ছোটমামি ও আপন খুল্লতাতকে সঙ্গে করিয়া মা বেলুড় মঠে আসিলেন ও নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে উঠিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে পুরোভাগে লইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণত হইলেন। যথাসময়ে কলিকাতা হইতে গোলাপ-মা, যোগেন-মা ও ঠাকুরের মেয়ে ভক্তেরা মায়ের কাছে থাকিয়া পূজা দেখিবার জন্য আসিলেন। কলিকাতা হইতে নরেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী জননীও নিত্য পূজা দেখিতে আসিতেন।"[৮]

এই পূজা অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পূজক ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ এবং তন্ত্রধারক ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা, তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। পূজাশেষে শ্রীশ্রীমায়ের হাত দিয়ে স্বামীজী তন্ত্রধারককে পঁচিশ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। এই পূজায় স্বামীজীর নির্দেশে সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর নামেই 'সঙ্কল্প' করা হয়। আজও শ্রীশ্রীমায়ের নামেই বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার 'সঙ্কল্প' হয়। শোনা যায়, স্বামীজী এই দুর্গামণ্ডপেই শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা'জ্ঞানে স্বয়ং পূজা করেছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা থাকলেও শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে দেবীপূজায় পশুবলি চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যায়। দুর্গাপূজার পর স্বামীজী বেলুড় মঠে যথারীতি লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজাও করেছিলেন। পশুবলি সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দজী লিখেছেন ঃ "বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়,

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার পর মঠে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে-পূজাতে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। অনুমান করতে দ্বিধা নেই, শ্রীমায়ের আদেশে তারপর থেকে চিরতরে মঠে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীমায়ের যুক্তি ছিল—সন্ন্যাসী সর্বভূতে অভয়দান করবে, সন্ন্যাসীদের মঠে পশুবলি দিয়ে পূজা করা অনুচিত।"[৯]

মঠবাড়ির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে (মঠবাড়ি ও পুরনো ঠাকুরমন্দিরের মাঝখানে) হোগলার চালা তৈরি করে প্রথম দুর্গাপূজা হয়েছিল। প্রতিমা ছিলেন পশ্চিমমুখী। বর্তমান মঠ অফিস প্রাঙ্গণে কাঁঠালতলার পশ্চিমে পূজার তিনদিনই অসংখ্য ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়েছিল। নিত্য সন্ধ্যারতির পর সন্ন্যাসিগণ দেবীর সামনে কালীকীর্তন করতেন। নবমীর রাত্রে স্বামীজী স্বয়ং মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন

দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর রাত্রে স্বামীজীর জ্বর হয়। তিনি পরদিন কিছুটা সুস্থ হয়ে স্বয়ং 'কুমারীপূজা' করেছিলেন এবং সন্ধিপূজার সময় দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এইদিন শ্রীশ্রীমা যে 'এয়োরানী পূজা' করেন, সেসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "মাতাঠাকুরানী এইদিন কৃষ্ণময়ীদিদিকে [রামলালদাদার জ্যেষ্ঠা কন্যা] এবং আরো কয়েকজন সধবাকেও 'এয়োরানী পূজা' করেন।। সমবেত কোন কোন ভক্তিমতী মহিলাও তাঁহাদিগকে এয়োরানী পূজা করিয়াছিলেন।"[১০]

প্রকৃতপক্ষে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের নানা লীলার মধ্যে শারদীয়া দুর্গাপূজায় তাঁর কল্যাণময়ী ভূমিকা ভক্তগণের হৃদয়ে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করেছিল। স্বামীজীর অবর্তমানেও তিনি দুবার (১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় যোগদান করেছিলেন। এসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "১৩১৯ সালের ৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর ১৯১২) ৺দুর্গাপূজার বোধনের দিন অপরাহ্ণে শ্রীমা বেলুড় মঠে আসিবেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত, অথচ শ্রীমায়ের শুভাগমন হইল না দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দজী ছুটাছুটি করিতেছেন। মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ বসানো হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এসব এখনো হয়নি, মা আসবেন কি!' দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গাড়ি মঠের ফটকে পৌঁছিল। অমনি স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ সাধু-ভক্তবৃন্দ গাড়ির ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া উহা টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিলেন। গাড়ি টানিতে টানিতে প্রেমানন্দজী আনন্দে টলিতে লাগিলেন—চোখে-মুখে যেন আহ্লাদ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গাড়ি প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিলে গোলাপ-মা শ্রীমাকে হাত ধরিয়া সন্তর্পণে নামাইলেন। নামিবার পর সমস্ত দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।' শ্রীমা তদবধি একাদশী পর্যন্ত বেলুড়েই বাস করিয়াছিলেন; মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। শ্রীমা দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে থাকিতেন। ঐ বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি এবং ভানুপিসিও ছিলেন।


স্বামীজীর গৃহসংলগ্ন ঘাটের প্রাচীন আলোকচিত্র

"মহাষ্টমীর দিনে তিন শতাধিক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন; তিনি তক্তপোশের উপর পশ্চিমাস্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সকলের প্রণাম লইলেন ও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। সেদিন তিন-চারিজনের দীক্ষাও হইল। ... এক সপ্তাহ বেলুড়ে থাকিয়া শ্রীমা (৬ কার্তিক ২২ অক্টোবর) উদ্বোধনে ফিরিয়া যান।

"শ্রীমায়ের বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে যোগদান ইহাই প্রথম বা শেষ নহে; এই ঘটনার পূর্বে স্বামীজীর সময়ে এবং পরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূজা দর্শন করিয়াছিলেন।... পূজার দিন শ্রীশ্রীমা মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে দুই হস্তে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতেন; ইহা না করিতে পারিলে যেন তাঁহাদের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে প্রসন্না দেখিলে সকলের মনে হইত, দেবী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক পূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহাষ্টমীর দিনে একশত আটটি পদ্মফুল দিয়া শ্রীমায়ের চরণপূজা করিয়াছিলেন।



"১৩২৩ সালে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে) ৺দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন শ্রীমা মঠে আসিয়া উত্তরের উদ্যানবাটীতে উঠিয়াছিলেন। ... অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারী বুঝিলেন উলটা—তিনি মনে করিলেন, দুর্গাপ্রতিমার সামনে প্রণামী দিতে হইবে; তাই নিঃসন্দেহ হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'ও-বাগানে মা আছেন; তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তাঁরই পূজা হলো।' "[১১]

এবার বেলুড় মঠে রক্ষিত ঠাকুরের 'আত্মারামের কৌটা'র সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের অভিনব লীলার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঠাকুরের দেহাবশেষ যে-তাম্রপাত্রে রক্ষিত আছে, স্বামীজী সেইটিকেই 'আত্মারামের কৌটা' বা 'শ্রীজী' বলতেন। 'আত্মারামের কৌটা' প্রথমে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি, পরে বরানগর মঠ হয়ে বেলুড় মঠে স্বামীজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। " 'আত্মারামের কৌটা'র প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল ঠাকুরঘরে প্রবেশের পর ঠাকুরের চরণামৃত পান, তাঁহার শ্রীপাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ ও ঐ কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।"[১২]

এই 'আত্মারাম'-এর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের আত্মিক যোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী আশুতোষ মিত্র জানিয়েছেনঃ "শ্রীমা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সকলের প্রণাম গ্রহণপূর্বক হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সোজা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আত্মারামের পূজায় বসিয়া গেলেন। শ্রীঠাকুরের শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত বেদিমধ্যস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কাষ্ঠদ্বার আজ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীমা সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর হইতে আত্মারামকে স্বহস্তে বাহির করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে বসিয়া গেলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ আত্মারামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন।

"তাঁহার এই আত্মস্থ হইবার সংবাদ বৈদ্যুতিক গতিতে মঠবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ফলে সকলে আনন্দে অধীর হইয়া নিম্নে বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া খোল-করতাল সহকারে গাহিতে ও নৃত্য করিতে থাকিলেন।... সকলে একত্রিত। একতানে প্রাণ মাতাইয়া এবং নিজেরাও মাতিয়া গাহিতেছেন—

'বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' বলে।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলি মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা ওরে দেখরে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছিরে, আমরা মায়ের ছেলে।'

"স্বামীজী এতক্ষণ উপরে নিজ কক্ষে ছিলেন। নৃত্যগীত শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া নিচে আসিয়া দলে ভিড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলের ভিতর অমানুষিক শক্তি জাগিয়া উঠিল, সকলে আত্মহারা হইয়া 'বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে' ইত্যাদি আখর দিয়া দিয়া গাহিতে লাগিলেন। স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'গা, গা।' যাঁহারা নাচিতেছেন, তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া নাচিতে উৎসাহ দিলেন। এইবার নিজেই খোল লইয়া বাজাইতেছেন, আর গাহিতেছেন, আর নাচিতেছেন। এ এক *অপূর্ব দৃশ্য—ইহা যে দেখিয়াছে, সে-ই ধন্য!... প্রায় দেড়ঘণ্টা* কাল পূজার পর শ্রীমা বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে জড়াইয়া ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই কম্পিত হস্তে আত্মারামকে প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন।"[১৩] দিনটি ছিল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর, শ্যামাপূজার পূর্বদিন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ) মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টায় উত্তর কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন বাড়িতে শ্রীশ্রীমা স্থূলদেহে তাঁর মর্ত্যলীলা সমাপন করেন এবং পরদিন প্রাণহীন নশ্বরদেহে তাঁর শেষ আগমন ঘটে এই বেলুড় মঠেই। স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে নৌকাযোগে তাঁর দিব্যদেহ বরানগর কুঠিঘাট থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয় এবং মঠের পূর্বপ্রাঙ্গণে গঙ্গার তীরে তাঁর স্থূলশরীর দাহ করা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণাঃ "সে-ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মহাসমাধির পরদিন মায়ের শরীর মঠে আনা হলো। এখন যেখানে তাঁর মন্দির, সেখানেই তাঁর স্থূলশরীর দাহ করা হয়। তখনো কোন ঘাট হয়নি। তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা নদীর দিকে ঢালু ছিল। যথাসময়ে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া হলো। চিতা জ্বলছে। ঠিক ঐসময় দেখা গেল, গঙ্গার অপর তীরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এমন বৃষ্টি যে, ওপারের ঘরবাড়ি, গাছপালা কোনকিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বৃষ্টি গঙ্গার মাঝামাঝি পর্যন্ত এল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এপারে তখন বেলুড় মঠে খটখটে রোদ। চিতা যথারীতি জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মায়ের দেহ সম্পূর্ণ দাহ হয়ে গেল। এবার চিতার আগুন নেভাতে হবে। সেখানে একজন ছিলেন—তিনি তান্ত্রিক। তিনি চেয়েছিলেন, তান্ত্রিক বিধিতে আগুন নেভানো হোক। সেজন্য যেসব জিনিসের দরকার ছিল, তা তখন ওখানে ছিল না। তিনি তাই সেসব আনতে বাজারে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) অধৈর্য হয়ে বড় একটা কলসি নিয়ে গঙ্গা থেকে জল ভরে এনে শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বললেন,



'আপনি জল ঢেলে চিতা নেভান। আমাদের আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।' শরৎ মহারাজ চিতায় জল ঢাললেন। অনেকেই এর মধ্যে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসেছে চিতায় ঢালবার জন্য। কিন্তু কারুরই আর ঢালা হলো না। শরৎ মহারাজের যেই চিতায় জল ঢালা শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে ওপারের বৃষ্টি এপারেও এসে গেল। সে এমন জোর বৃষ্টি যে, তাতেই তৎক্ষণাৎ চিতার আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেল। ফলে শরৎ মহারাজের পরে কারো আর জল ঢালা হলো না। আমরা সবাই বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম। এরকম ঘটনাও ঘটে। শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলেও বাস্তব এ ঘটনা।''[১৪]

সেই বর্ষণে মঠ-মন্দির সকল স্থান প্লাবিত হয়েছিল, চিতার আগুনও প্রকৃতির দরবিগলিত ধারায় নির্বাপিত হয়েছিল; কিন্তু অগণিত মাতৃহারা সন্তানদের হৃদয়ের শোকের আগুন কি নির্বাপিত হয়েছিল? পরবর্তী কালে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তাঁর জন্মতিথিতে সেই স্থানের ওপরেই তাঁর সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

মায়ের দাহকার্য সমাপনের পরেই সেদিন বেলুড় মঠে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) বলেছিলেন ঃ ''দেবতারা মহামায়ার চিতায় শান্তিবারি বর্ষণ করে চিতার আগুন নেবাচ্ছেন। আজ থেকে এই স্থান মহাতীর্থ হয়ে গেল। সতীর দেহের এক একটি অংশ পড়ে একান্নটি পীঠ হয়েছে আর আজ সেই সতীর সারা দেহটা এখানে দাহ করা হলো। তাহলে বোঝ, বেলুড় মঠ কী জায়গা! শুধু পীঠ নয়, মহাপীঠ! মহাপীঠ! জয় মা! জয় মা!!''[১৫]

বেলুড়ে মায়ের সমাধিমন্দিরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কথামৃতকার মাস্টারমশায়ের প্রায় অনুরূপ উক্তি ঃ ''মায়ের পূর্বাবতার সতীর দেহ একান্ন পীঠ সারা ভারত ব্যাপিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এবারে ব্রহ্মশক্তির সমগ্র দেহ একই স্থানে সন্নিহিত। তাই, অত বড় মাহাত্ম্য এই মন্দিরের। 'উদ্বোধন'-এ যখন মা বাস করিতেছেন, তখন নিত্য রজনীর শেষভাগে উঠিয়া গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গা মায়ের অতি প্রিয়। তাই গঙ্গাতটে এই মন্দির পূর্বমুখীন ও গঙ্গামুখীন। দুই পাশে মায়ের দুইজন প্রধান সন্তান স্বামীজী ও রাজা মহারাজের সমাধিমন্দির। তাঁহারা যেন মায়ের দুইজন প্রহরী। তাই তাঁহাদের মন্দির পশ্চিমমুখীন। মা সিংহাসনে বসিয়া অহর্নিশ গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।''[১৬]

প্রকৃতপক্ষে, এখানে শ্রীশ্রীমায়ের অবগুণ্ঠিতা চিন্ময়ী শক্তির অফুরন্ত করুণাধারা নিত্য বর্ষিত হচ্ছে ভক্ত-অভক্ত সকল সন্তানের প্রতি। এটি শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকট লীলামাধুর্য।

মঠ পরিদর্শনের সময় ঃ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সকাল ৬.৩০ থেকে দুপুর ১১.৩০, বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০। অক্টোবর-মার্চ সকাল ৬.৩০ থেকে দুপুর ১২টা, বিকাল ৩.৩০ থেকে রাত্রি ৮টা। বিশেষ উৎসবাদিতে এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়।

পথনির্দেশ ঃ জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ—সবদিক দিয়েই বেলুড় মঠে আসা যায়। হাওড়া, বাগবাজার বা দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকা বা লঞ্চে এসে বেলুড়ে কাঠগোলা ঘাটে নেমে মঠে আসা যায়। বাসে বা অন্য যানবাহনে এলে বেলুড় বাজারের উত্তরদিকে জি. টি. রোডের ধারে পূর্বমুখী রাস্তা দিয়ে মঠে প্রবেশ করা যায়। অথবা হাওড়া স্টেশন থেকে নতুন রেলপথে সরাসরি বেলুড় মঠ স্টেশনে নেমে আসা যায়।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন ও অবস্থান

('শতরূপে সারদা' গ্রন্থের জীবনপঞ্জী অনুসারে)

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ ৭ এপ্রিল (মতান্তরে ৯ এপ্রিল)—নির্মীয়মাণ মঠে আগমন ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন। ১২ নভেম্বর—মঠভূমিতে ঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ আগমন ও স্বহস্তে পূজা। ১০ ডিসেম্বর—মঠে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিতি।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি—ঠাকুরের জন্মোৎসবে বেলুড় মঠে আগমন। ১৮-২২ অক্টোবর—স্বামীজী কর্তৃক মঠে প্রথম দুর্গোৎসবে যোগদান।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দ ঃ ১১ এপ্রিল—বেলুড় মঠে অভ্যর্থনা।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দ ঃ ১৬-২১ অক্টোবর—মঠের দুর্গোৎসবে যোগদান।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ ৩-৬ অক্টোবর—মঠের দুর্গোৎসবে যোগদান।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দ ঃ ২১ জুলাই—বরানগর থেকে নৌকাযোগে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মরদেহ আনয়ন ও দাহকার্য।❑

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ৮ম সং, পৃঃ ২৭৮
২ ঐ, পৃঃ ১৯০
৩ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা স্বামী প্রভানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ২৫৯
৪ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১৫ ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৪৩৪
৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৯০
৬ ঐ, পৃঃ ৩৪৭
৭ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ২৩৩-২৩৪
৮ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা—স্বামী ভূমানন্দ, ৩য় সং, পেলিকান প্রেস, পৃঃ ১৫১-১৫২
৯ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ২৬১
১০ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭৪, পাদটীকা
১১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ২০৭-২০৯
১২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩২৯
১৩ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—সঙ্কলক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ২য় খণ্ড, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ২৮১-২৮২
১৪ শতরূপে সারদা—সম্পাদক ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৮৫, পৃঃ ৭১৫-৭১৬
১৫ ঐ, পৃঃ ৮৩-৮৪
১৬ শ্রীম-দর্শন, ১১ ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ১২৮

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**



মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভব ও ব্যবহার

স্বামী নিরন্তরানন্দ*



মানুষ সর্বক্ষণ চিন্তা করে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, শয়নে স্বপনে মানুষ চিন্তা করে চলেছে। চিন্তা করাই তার শীল অর্থাৎ স্বভাব। তাই বলা হয়, মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তার চিন্তার বিষয় কী? এই প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজেই আমরা বলতে পারি—'সবই'। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এসবই মানুষের চিন্তার বা ভাবনার বিষয়। এসকল বিষয়েই মানুষ গড়ে তুলেছে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, যা এখনো ক্রমবর্ধমান। মানুষের অন্তর্জগতের আবিষ্কারে ভারতের নরনারী অনন্য কৃতিত্বের দাবি রাখেন। মানুষের অন্তর্জগৎ আজও এক প্রহেলিকা, এক রহস্য। সর্বপ্রথম ভারতের মানুষই এই প্রহেলিকাকে বা রহস্যের আবরণকে ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সমর্থ ব্যক্তিরা 'ঋষি' নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁদের অনুভবসকল বিধৃত হয়ে যে-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম 'বেদ'। মানুষের এই আত্মসচেতনতা মানুষকে অন্য জীবদের থেকে পৃথক করেছে ও তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। তাই মানুষ কেবল চিন্তাশীল প্রাণী মাত্র নয়, সর্বোচ্চ চিন্তাশীল প্রাণী। মানুষের স্বরূপ, প্রকৃতি ও বিশ্বে তার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অন্বেষা ভারতবাসীর মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান। স্বয়ং বিধাতা যেন এবিষয়টি ভারত-ভারতীর ললাটে অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

ভারতের বাণী ঃ মানুষ মহান

ভারতের ইতিহাস-গবেষণা শুরু করা হয় বৈদিক সাহিত্য অবলম্বন করে। বেদের প্রথম ভাগে কর্মসাধনের আলোচনা আছে, দ্বিতীয় ভাগে জ্ঞানের আলোচনা। ঋষিরা আবিষ্কার করেছেন, মানুষ বস্তুত জড় দেহমাত্র নয়। মানুষের আত্মা অবিনাশী, তা চৈতন্যস্বরূপ। এখনো নিজস্বরূপের জ্ঞানের সন্ধানে সমগ্র জীবন ব্যয় করতে প্রস্তুত—এমন ব্যক্তি ভারতে দুর্লভ নয়। পাশ্চাত্যে আত্মজ্ঞানের যে কোন চেষ্টা হয়নি, তা নয়। গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন, মানুষ এক চিন্তাশীল প্রাণী। ফরাসি মনীষী পাস্কালের কথায় পাই, মানুষের মহত্ত্ব তার জ্ঞানে। তাসত্ত্বেও পরিষ্কার বলতে পারা যায় যে, এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বিষয়ে ভারতের মানুষ সকলের অগ্রে। মানুষ নিজের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যা আবিষ্কার করেছে, তার সিংহভাগই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচ্যদেশগুলিতে, বিশেষত ভারতবর্ষে। স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করেন ঃ "হিন্দুদের মধ্যেই সর্বপ্রথম আত্মার ধারণা উদিত হয়। পরে অন্যান্য আর্যজাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে।"[১] উপনিষদ্, সেই সুদূর অতীতে যেখানে ইতিহাস উঁকি দিতে অসামর্থ্য বোধ করে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিল ঃ এই আত্মাই ব্রহ্ম।[২] সেই ব্রহ্ম কিরূপ? উত্তর পাই ঃ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।[৩] মানুষ এক অসাধারণ প্রাণী। এই আত্মাই মহান, অজ, অজর, অমর, অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম।[৪] কবি গাইলেন ঃ "চণ্ডীদাস ভণে, শুন মানুষ ভাই! সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানুষের আধ্যাত্মিক মহিমাকীর্তনই যেন ভারত-সঙ্গীতের প্রধানতম সুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ 'নরনারায়ণ'

শ্রীরামকৃষ্ণও সেই একই সুরে ভারতসঙ্গীত তথা বিশ্বমানবসঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি সর্বত্র সর্ব মানুষের নিকট মানুষেরই মহিমা খ্যাপন করেছেন। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে তিনি উপস্থিত মানুষদের বলেছেন ঃ "মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।"[৫] মানুষ কেন তা জানে না? উত্তরে বললেন ঃ "মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে

বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আচার্য, বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১

বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী, তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী।"[৬] পুনরায় কাব্যিক সুর আরোপ করে তিনি বলছেন: "এই মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।"[৭] "আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রধান শিক্ষা—মন ও মুখ এক করা। তাই আলোচ্য বিষয়টিকে দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখা উচিত। একটি তাত্ত্বিক, অপরটি প্রায়োগিক। মানুষের স্বরূপ নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রভূত ব্যাখ্যান দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের পরিবর্তিত সমাজে মানুষের দেবস্বরূপের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক রূপ কি প্রকার হওয়া উচিত তার এক সুন্দর নিদর্শন পাই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক এবং অভিন্ন—এই সর্বশাস্ত্রবিঘোষিত তত্ত্বের ওপরই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিককেই বলছেন: "ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন—তিনিই মণি মল্লিক হয়েছেন।"[৯] সেবক লাটুকে দেখিয়ে বলছেন: "ওই লোটো—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। তিনিই (ঈশ্বর) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।"[১০] শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের শুরু হয়েছিল 'কালীঘর'-এ মা কালীর পাষাণময়ীর মূর্তিকে অবলম্বন করে, আর পরিণতি বা পূর্ণতা লাভ হয়েছিল মনুষ্যশরীরধারী ঈশ্বরের পূজার মধ্য দিয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও ক্লিষ্ট মানুষের সেবার জন্য তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন জমিদার মথুরবাবুর কাছে। জীবশিব তত্ত্বে অনুভবসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন: "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজীবের ভিতর এক ঈশ্বরকেই দেখতেন, তথাপি তিনি মানুষের স্থান দিতেন সকলের ওপরে। তাঁর কথায় পাই: "অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতের ভিতরে তিনি (ঈশ্বর) আছেন; কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ।"[১১] "ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে আসেন—মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন, ঘুটির ভিতর মাছ এসে জমে।"[১২] "এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ। নরনারায়ণ।"[১৩] মানুষ নিজস্বরূপ বা ঈশ্বর দর্শন করতে সমর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: "মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না।"[১৪]

মানুষের মানসিক অবস্থা বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ চার অবস্থার কথা বলেছেন: "আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়। জীব চার প্রকার বলেছে—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব, নিত্যজীব।" বুঝতে অসুবিধা নেই, ঠাকুর জীবনের পরম প্রাপ্তি বা লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই সমস্ত মানুষকে চার অবস্থায় ভাগ করেছেন। আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলেছেন: "ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার: অভিন্ন দৃষ্টি

ধর্মের ভাষায়, মানুষের সঙ্গে প্রেম ও মৈত্রীর সহিত ব্যবহার করার অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাকে স্বীকার করা—ঈশ্বরদর্শনের নিমিত্ত সাধন করা। শ্রীরামকৃষ্ণ সমদৃষ্টিতে সর্বমানুষের প্রতি প্রেম অর্পণ করেছিলেন। তিনি 'প্রেমার্পণ সমদরশন'। তাঁর দৃষ্টিতে যথার্থ মানবপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমে পর্যবসিত। তাঁর ঐশদৃষ্টিলব্ধ প্রেমপ্রবাহে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান বা স্ত্রী-পুরুষ—কোন ভেদই ছেদ ঘটাতে পারত না। তিনি স্বকৃত পাপে অনুতপ্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বকলমা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিত্রকর, গায়ক, বাদক, সাধক, আচার্য, পণ্ডিত, ডাক্তার, কবিরাজ, জমিদার, উকিল, মোক্তার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই তাঁর ভালবাসা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তেমনি সমাজে অনুন্নত বা উপেক্ষিত চিনু শাঁখারি, রসিক মেথর, ভর্তাভারী মালি, মধু যুগী, শম্ভু কুমোর, পাচক গাঙ্গুলি, গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতনামা গৃহভৃত্য, গুণ্ডা মন্মথ, বোবা উপেন, মাতাল বিহারি, ডাকাত বাগদী পাইকও ঠাকুরের প্রেম ও করুণা থেকে বঞ্চিত থাকেননি, তাঁরাও তাঁর প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। সেই ধন্য মানুষদের হৃদয়ের মণিকোঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা চিরতরে বাসা বেঁধেছিল। মানুষটি চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেলেও সেই অপার্থিব ভালবাসা তাঁদের হারিয়ে যায়নি। "নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।" ঠাকুরের ভালবাসায় মুগ্ধ, অভিভূত হয়েছেন কত মানুষ, তার ইয়ত্তা কে করবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে-উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই।"[১৫] ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিতে তিনি তৃপ্তিবোধ করেছেন বহুবার। বলরাম বসু ভিন্ন অনেক অব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি আহার করেছেন, যা তৎকালীন সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে আহার করেছেন। তিনি আবার মাস্টার মশাই অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথকে তা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন, পাছে দক্ষিণেশ্বরে হাঙ্গামা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তিনিই আবার পরদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে পূর্বদিনের কেশবচন্দ্রের বাড়িতে আহারের কথা বলে দিলেন।[১৬] জগন্মাতার বালকের সবই অদ্ভুত! স্বতন্ত্রপুরুষ তিনি; তিনি কেন

সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে যাবেন! তিনি মথুরানাথ বিশ্বাসের জানবাজারের বাড়িতে বহুদিন বাস করেছেন; নিশ্চয়ই সেখানেও তিনি আহার করেছেন। তেমনি সুবর্ণবণিক অধরলাল সেনের বাড়িতে আহার করেছেন ও উপস্থিত কেদার চাটুজ্যেকে সেখানে আহার করতে বাধ্য করিয়েছেন। কারণ, তিনি সমাজের ভয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন।[১৭]

ঈশ্বরের ভক্তমাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতির পাত্র—তিনি যে-ধর্মপথের অনুবর্তী হন না কেন। তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত ঃ তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গেঁড়াতলা মসজিদের সম্মুখে এক মুসলমান ফকির দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন ঃ "প্যারে আও।" তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বেশ প্রেমের স্বরে বলে চলেছে ঃ "প্যারে আজাও, আজাও"। এমন সময়ে একটি ভাড়াটে গাড়ি এসে সেখানে থামল। গাড়ি থেকে নেমেই ঠাকুর সোজা সবেগে চললেন সেই মুসলমান ফকিরের দিকে। তিনি ঐ ফকিরকে আলিঙ্গন করলেন।[১৮]

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের লক্ষ্য—স্বাভাবিক জৈব বাসনা ও আকর্ষণকে অতিক্রম করে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান ও বিষয়াসক্তির অতীত প্রদেশে উত্তরণ। ভাল-মন্দ, সুরূপা-কুরূপা—জগতের প্রত্যেক স্ত্রীলোক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ছিল জগন্মাতার এক-একটি রূপ। পদসংবাহনরতা নিজ স্ত্রী সারদাদেবীকে তিনি বলেছিলেন ঃ "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"[১৯] প্রত্যক্ষ জগদম্বা-জ্ঞানে তিনি তাঁকে পূজা করেছিলেন। নিষ্কাম প্রেমলাভে ধন্যা এক স্ত্রীভক্তের স্মৃতিচারণে পাই ঃ "এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরিনি। তাঁর যে কী দয়া ছিল, তা কে বলবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব!"[২০]

সৌজন্যবোধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও মধুরভাষী। কর্কশ ভাষায় কথা বলে কাউকে তিনি কষ্ট দেননি। তিনি খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বা কানাকে 'কানা' বলতে চাইতেন না। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় পাই, মা বলছেন ঃ "ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?—তাহলে বলতে হয়, তোমার পা-টি অমন মোড়া হলো কি করে'?"[২১] মায়ের প্রতি ঠাকুরের সৌজন্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাই। এক স্থানে মা বলছেন ঃ "আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে, তিনি কখনো আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেননি। ঠাকুর আমাকে কখনো ফুলটি দিয়েও ঘা দেননি; কখনো 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি।"[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় পাই ঃ "সতের স্বভাব কি জান? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না—ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব—হয়তো বললে, আমি আলাদা বসব। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না—কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।"[২৩]

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর তিনি যেন নিরুপায় হয়ে, অনুনয়ের সুরে রামলালকে বলছেন ঃ "কিরে, তোর কলিকাতায় কোন দরকার নাই?" রামলাল—"আজ্ঞে, আমার কলিকাতায় আর কি দরকার? তবে আপনি বলেন তো যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"না, তাই বলছিলাম; বলি, অনেক দিন বেড়াতে-টেড়াতে যাসনি, তাই যদি বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা হয়ে থাকে তা একবার যা না।" এরপর তিনি আবার রামলালকে টিনের বাক্স থেকে পয়সা নিতে বললেন ও বরানগর থেকে সেয়ারের গাড়ি করে যেতে বললেন—কেননা রোদ লেগে রামলালের অসুখ হতে পারে। তারপর ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ "আর ঐ মিছরি, বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি—সে অনেকদিন আসেনি; তার খবরের জন্য মনটা 'আটুপাটু কচ্চে'।" রামলাল পরবর্তী কালে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ কালে বলতেন ঃ "আহা, (ঠাকুরের) সে কত সঙ্কোচ, পাছে আমি বিরক্ত হই!"[২৪]

অপরের দোষ দেখা বা নিন্দাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি প্রতাপ হাজরাকে শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ "কারু নিন্দা করো না—পোকাটিরও না।... যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে, তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি'।"[২৫]

ঠাকুরের জীবন অবিশ্বাস্য রকমের সরলতার দ্বারা সুমণ্ডিত ছিল। তাঁর ভাষা রসে টইটম্বুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা যখন আমরা পড়ি, তখন মনে হয়—যেন দুই মহাপুরুষের মিলনমুহূর্তে রসের ফোয়ারা ছুটছে। অন্য সময়ও ঠাকুরের আচরণে লক্ষিত হতো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও নিরভিমানতা। একাধিক ব্যক্তি ভুলবশত ঠাকুরকে বাগানের মালি ভেবে একটি ফুল তুলে দিতে তাঁকে নির্দেশ করেছে। ঠাকুরও কোন প্রতিবাদ না করে অম্লানবদনে সেই ফুলটি তুলে তার হাতে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে দেখতেন চেতনার দুই স্তর থেকে। একটি সাধারণ স্তর—যে-স্তর থেকে তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ, গরু, উদ্ভিদ ইত্যাদিকে মানুষ, গরু, উদ্ভিদ ইত্যাদি

রূপেই দেখতেন। আর দ্বিতীয়টি অসাধারণ স্তর—যে-স্তর থেকে জগৎকে দেখবার সামর্থ্য তাঁরই ছিল, আমাদের সাধারণের তা নেই। আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের মনকে শুদ্ধ ও একাগ্র করতে সমর্থ হয়েছেন, কেবল তাঁরাই ঐ অসাধারণ দৃষ্টির অধিকারী। চেতনার এই ঊর্ধ্বস্তর থেকে যখন ঠাকুর জগতের বিষয়গুলোকে দেখতেন, তখন সেই সেগুলোর বাহ্য ও আন্তর—উভয় রূপই দেখতে পারতেন। তাই মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর নিকট প্রতিভাত হতো। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখকে বলছেন: "মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ।" উপমা টেনে বলছেন: "পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।"[২৬]

ঠাকুর গুণীর গুণের কদর ও মানীর মান রক্ষা করে চলতেন। কারণস্বরূপ বলতেন: "ওরে, মানীকে মান না দিলে ভগবান রুষ্ট হন; তাঁর (শ্রীভগবানের) শক্তিতেই তো তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন—তাদের অবজ্ঞা করলে তাঁকে (শ্রীভগবানকে) অবজ্ঞা করা হয়।"[২৭]

কিন্তু ভদ্রতা, সৌজন্য বা সামাজিকতা রক্ষার জন্য মিথ্যা বা কৃত্রিমতার আশ্রয়গ্রহণ তাঁর সত্যস্বরূপ জীবনের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে বলেছিলেন: "তা বাবু, আমি কিন্তু তোমায় রাজা বলতে পারব না; মিথ্যাকথা বলব কিরূপে?"[২৮]

আবেগপ্রবণতা বর্জনীয়

অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কিংবা উগ্রতা আমাদের দুর্বলতার কারণেই ঘটে, সেজন্যই এগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ক্রুদ্ধস্বভাব বালক ভক্ত নিরঞ্জনকে ঠাকুর ক্রোধ ত্যাগ করার শিক্ষা দিয়েছেন: "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হইয়াই মিলাইয়া যায়। হীনবুদ্ধি লোকেরা কত কী অন্যায় কথা বলে, তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়।" অপরদিকে, যোগীন্দ্রনাথকে ঠাকুর তাঁর কোমল স্বভাবের জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন। একবার কিছু লোক যোগীন্দ্রনাথের সামনেই অকারণে ঠাকুরের নিন্দাবাদ করছিল। তিনি ভাবলেন—ঠাকুরের সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশত তারা ঐরূপ আচরণ করছে, তাতে নিরভিমান ঠাকুরের কিছুই যায় আসে না। সুতরাং তিনি সেখানে শান্ত রইলেন, ঠাকুরের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না। ঠাকুর কিন্তু এঘটনা শুনে যোগীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করলেন: "আমার অযথা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস?—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না!"[২৯]

শ্রীশ্রীমা সাধন-ভজন, এমনকি লোকব্যবহারের প্রথম পাঠ ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। একবার মা যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটীতে ফিরে যাচ্ছেন, ঠাকুর তাঁকে বলে দেন: "পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভাব রাখবে। অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে।" ঠাকুর মাকেই আবার বলেছিলেন: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন।"[৩০]

প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার

প্রকৃতি বুঝে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ একথার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর কথিত 'হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' গল্পের মধ্য দিয়ে। একদিন তাঁর সম্মুখে প্রসঙ্গ চলছিল—বিষয়াসক্ত সংসারী লোকেরা ঈশ্বরের ভক্তদের নিন্দা করে। সেক্ষেত্রে ভক্তের কী করা উচিত? এ-ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) জিজ্ঞাসিত হলে বললেন: "আমি মনে করব, কুকুর ঘেউঘেউ করছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সংশোধন করে দিলেন: "নারে, অতদূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন। তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বল, বাঘ তো নারায়ণ; তবে কেন পালাব? তার উত্তর—যারা বলছে, 'পালিয়ে এস' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?"[৩১]

দুষ্ট লোক থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত, কিন্তু তার জন্য দুষ্ট লোকের অনিষ্ট করা উচিত নয়। ঠাকুর ব্রহ্মচারী ও সাপের গল্পের শেষে বলছেন: "দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই।"[৩২]

ঠাকুর বলতেন: "এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ।... তারপর কুকুর।... তারপর ষাঁড়।... তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন—বলে গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।" "অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি—আছে।"[৩৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার কী উঁচু তানে বাঁধা থাকত তার কিছুটা বুঝতে পারি একটি ঘটনা থেকে। তিনি

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে আছেন। রাত তখন টা। তিনি বালক ভক্ত বাবুরামকে তামাকের কলকেতে আগুন নিয়ে আসতে বললেন। বাবুরাম বাইরে এসে দেখেন, হাজরা মশায় রাখালকে বলছেন ঃ "এখানে কি শুধু রসগোল্লা খেতে এসেচ? না চাইলে উনি (ঠাকুর) কিছু দেবেন না।" বাবুরাম সামনের খাপরা থেকে আগুন নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলেন। তাঁর বিলম্বে আসার কারণ জানতে চাইলে বাবুরাম সব জানালেন। ঠাকুর তা নিজে শুনতে চাইলেন। হুঁকোর ওপর কলকেটি চাপিয়ে ঘরের পূর্বের দরজা পার হয়ে এসে যেই ডান পা তুলেছেন, পা আর নামল না; তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। বাবুরামকে বললেন ঃ "আড়ালে কওয়া কথা শুনতে নাই।"[৩৪] ঠাকুরের ভিতরে নীতিজ্ঞানের কী সুমহান মূল্যবোধ ছিল।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মানের হুঁশ না থাকলে মানুষশরীরধারী হলেও মানুষ 'মানুষ' পদবাচ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতির নিকট দায়স্বরূপে এটি ন্যস্ত করেছেন ঃ মানের, আত্মসম্মানের অর্থাৎ নিজস্বরূপের প্রতি হুঁশ বা সচেতনতা আনয়ন। তিনি গায়ক নীলকণ্ঠকে বলেছিলেন ঃ "সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁশ। তুমি তাই মানহুঁশ।"[৩৫] মানুহুঁশের কার্য ও কারণ-রূপে প্রকাশিত হয় 'দয়া'। দয়াহীন মানুষ মানুষ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।"[৩৬] বেণী পালকে প্রশংসা করে বলছেন ঃ "আজ খুব আনন্দ হলো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের, কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি, এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।"[৩৭]

শোকসন্তপ্ত মানুষের মনে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়া প্রত্যেক মানুষের এক প্রধান কর্তব্য। বৃদ্ধ মণিমোহনের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। পুত্রের সৎকারের পরই মণিমোহন সোজা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত। আশা—এঁর কাছে একটু সান্ত্বনা পাবেন। ঠাকুর মৃত্যুর ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তারপর অর্ধবাহ্যদশায় দাঁড়িয়ে উঠে তাল ঠুকে গান ধরলেন—'জীব সাজ সমরে'। ঐ গান শোনার পর মণিমোহন ও অন্য সকলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলের প্রাণে আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত হলো। ঠাকুর তখন 'সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা' এবং ঈশ্বরে শরণাগতি ইত্যাদি বিষয়ে মণিমোহনকে অনেক কথা বললেন। মণিমোহন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন ও ঠাকুরকে বললেন ঃ "এই জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম—এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"[৩৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ মানবের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগের দারিদ্র্যের করাল রূপ দেখে দিশাহারা। একদিন তিনি তাঁর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে কথামৃত পান করছেন। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর উপস্থিত অন্নদা গুহ প্রমুখকে বললেন ঃ "নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।" এসব কথাবার্তার পর অন্নদা গুহ প্রমুখরা ঘরের বাইরে গেলে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিরস্কার করে বললেন ঃ "কেন, আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন?" তখন ঠাকুর অশ্রুবিসর্জন করে তাঁকে বলেন ঃ "ওরে, তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।"[৩৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের জন্য ভিক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাত্র, শুধু তাই নয়। যা আমরা লিখিত বিবৃতি পাই তার থেকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, একসময়ে তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখতে গিয়ে গাড়ির ভাড়া ভিক্ষা করেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক লাটুকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য—যদু মল্লিকের বৃদ্ধা মাকে দেখবেন। অনেকদিন ঠাকুর তাঁর কোন সংবাদ পাননি। তিনি তাই নিজেই তাঁর বাড়িতে যাচ্ছেন একটি গাড়ি ভাড়া করে। গাড়ির মালিক বেণী সাহা। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, ভাড়া দুই টাকা চার আনা। ঠাকুরের কলকাতা থেকে ফিরতে দেরি হয়। তাই ঐ দুই টাকা চার আনার সঙ্গে আরো এক টাকা বেশি দিলে গাড়ির গাড়োয়ান আর ঠাকুরকে বিরক্ত করবে না, তা ফিরতে যত রাত্রিই হোক না কেন। সেদিন গাড়িতে তুলে নিলেন 'অ'-কে। বর্ণনা থেকে অনুমান করতে পারি, এই 'অ' ভক্তভৈরব গিরিশবাবুর ভাই অতুলবাবু। তাঁরা প্রথমে 'গি'-র (সম্ভবত গিরিশবাবুর) বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর অতুলকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে জানতে পারলেন যে, গিরিশবাবু তখন বাড়িতে নেই। ঠাকুর অতুলবাবুকে বলছেন ঃ "তাই তো, গি-র সঙ্গে দেখা হলো না, ভেবেছিলাম, তাকে আজকের বেশি ভাড়াটা দিতে বলব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানাশুনা হয়েছে; বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান, যদু মল্লিক কৃপণ লোক; সে সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া কখনও দেবে না।... যদু দুই টাকা চার আনা দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই আজকের ভাড়ার আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বলছি।" অতুলবাবু 'ঐ সব শুনে' লাটুর হাতে একটা টাকা দিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ঠাকুরও যদু মল্লিকের বাড়ির দিকে গেলেন।[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকেও তুচ্ছজ্ঞান করতেন, যদি তার দ্বারা একজন লোকেরও উপকার হয়। তাঁর কথা ঃ "যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।"[৪১]

উপসংহার

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বেলঘরিয়ার এক বাগানবাড়িতে। সেই সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ভদ্র, নম্র ও ধ্যানপ্রবণ' বলা হয়েছে।[৪২]

আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে যতই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসছি, ততই আমাদের সমস্যার পরিমাণ বেড়ে চলেছে; যেন আমাদের শরীরগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব কমছে আর মনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। তার মূল কারণ আমাদের পারস্পরিক ব্যবহার। তাই ভালবাসার জমাটবাঁধা রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার প্রণিধান করা এবং নিজ নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করা আজ আমাদের জরুরি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে; যেহেতু তাঁর মধ্যেই আমরা পাব উক্ত সমস্যার সমাধানসূত্র। ❑

১ The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Vol. 9, 1st Ed., p. 261
২ মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ২
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১।৩
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২৫
৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ২১২
৬ ঐ, পৃঃ ২১১
৭ ঐ, পৃঃ ৩৪২
৮ ঐ, পৃঃ ৭১৪
৯ ঐ, পৃঃ ৪৬৬
১০ ঐ, পৃঃ ১১২৪
১১ ঐ, পৃঃ ৫২১
১২ ঐ, পৃঃ ২৯০
১৩ ঐ, পৃঃ ৪৮৩
১৪ ঐ, পৃঃ ৫২১
১৫ ঐ, পৃঃ ১২০
১৬ শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—স্বামী চেতনানন্দ (সম্পাদিত), উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ২৮৯
১৭ কথামৃত, পৃঃ ৭১১
১৮ 'উদ্বোধন', ৫৭তম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬২, পৃঃ ৬১৮
১৯ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং, পৃঃ ৩৮
২০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৪
২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, অখণ্ড, পৃঃ ২৮৯
শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬৬
২৩ কথামৃত, পৃঃ ৩০০
২৪ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৯৭
২৫ কথামৃত, পৃঃ ৬৬৬
২৬ ঐ, পৃঃ ১০৩
২৭ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২২৬
২৮ ঐ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৫০
২৯ ঐ, পৃঃ ১৮৬-১৮৭
৩০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬৬-৬৭
৩১ কথামৃত, পৃঃ ২৩
৩২ ঐ, পৃঃ ২৪-২৫
৩৩ ঐ, পৃঃ ৬৮৮
৩৪ প্রেমানন্দ প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, পৃঃ ২৪
৩৫ কথামৃত, ৭৪৪
৩৬ ঐ, পৃঃ ৭৭৬
৩৭ ঐ, পৃঃ ৭৮৬
৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ২২-২৪
৩৯ কথামৃত, পৃঃ ১২২৫
৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ৭৮-৮০
৪১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪০৬
৪২ "...so gentle tender and contemplative." (দ্রঃ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫, পৃঃ ৩)

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শোনা যায়, প্রায় একহাজার বছর পূর্বে রাজা জগৎমল্ল দৈবনির্দেশে বিষ্ণুপুরে ৺মৃন্ময়ী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে যে মন্দির ও মূর্তি রয়েছে তা একাধিকবার সংস্কারের নবতম রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। মূর্তিদর্শনের পূর্বেই তাঁর ভাবসমাহিত অবস্থায় দেবী মৃন্ময়ীর দর্শন হয়েছিল। শ্রীশ্রীমাও পরবর্তী কালে তাঁকে দর্শন করেছিলেন। দেবী মৃন্ময়ী মূলত চণ্ডীর একটি রূপ। কিন্তু ফকিরনারায়ণ কর্মকার বলেন, তিনি বৈষ্ণবী শক্তির প্রকাশ। তাঁকে কেন্দ্র করেই 'বিষ্ণুপুর'।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে দৃষ্ট মায়ের মুখের সঙ্গে মৃন্ময়ী-মন্দিরে দৃষ্ট মায়ের মুখের মিল ছিল না। পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে, কোন উন্মাদিনী মায়ের মূর্তির মাথা ভেঙে ফেলে। সে অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন নতুন মুখ বসানো হয় মায়ের মূর্তিতে। পুরনো মুখটি কোন পুরোহিত নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে নিজেই বাকি দেহাংশ নির্মাণ করে সম্পূর্ণ দেবীমূর্তির পূজা শুরু করেন। মায়ের ঐ মূর্তিই এখন 'সর্বমঙ্গলা'-মন্দিরে নিত্যপূজিতা। এই গ্রন্থের পিছনের পৃষ্ঠায় ৺সর্বমঙ্গলার মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমা এবং স্ত্রীমঠ—স্বামী শঙ্করানন্দের দৃষ্টিতে

বিশ্বনাথ

বংশে বৈরাগ্যের ধারা। মাতুল সেই বিখ্যাত স্বামী সদানন্দ—গুপ্ত মহারাজ, স্বামীজীর স্নেহধন্য সন্ন্যাসী শিষ্য। 'অমূল্য' নামটাও তাঁর দেওয়া। আসল নাম অমৃতলাল সেনগুপ্ত। পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সপ্তম অধ্যক্ষ—স্বামী শঙ্করানন্দ। জন্ম ১৮৮০ সালে, তিরোধান ১৯৬২-তে।

সুদীর্ঘ জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মঠের আদিপর্বের ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে সঙ্ঘে তাঁর ভূমিকা নায়কোচিত। তাঁর অধ্যক্ষতার কাল জুন ১৯৫১ থেকে জানুয়ারি ১৯৬২। ১৯০২ সালে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ২২ বছর বয়স তখন।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় তাঁর তিনটি কাজ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত আন্দোলনে চিরস্মরণীয়—বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির গড়ে তোলার দায়িত্ব-গ্রহণ, জয়রামবাটীর মাতৃ-মন্দির নির্মাণকার্যে তদারকি ও সম্পাদন এবং শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-গ্রহণ। "পরম্পরার দিক দিয়ে স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় ও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যোগসূত্র।... স্বামী শঙ্করানন্দ যেন এই ভূমিকার জন্য শ্রীশ্রীমা কর্তৃক নির্বাচিত। কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! কী তাৎপর্যমণ্ডিত নির্বাচন!"[১]

১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর অল ইণ্ডিয়া রেডিওয় শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বক্তৃতারত স্বামী শঙ্করানন্দজী

সুদীর্ঘ ৬০ বছরের সঙ্ঘজীবনে তিনি লাভ করেছিলেন দুর্লভ 'পার্ষদসঙ্গ'। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পদপ্রান্তে কেটেছে গোড়ার দিকের বেশ কয়েকটি বছর। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ—নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতেন না, লিখে যাননি আপন গৌরবকথা। কেউ তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গেলে বাধা দিতেন, সেজন্য পিছিয়ে এসেছেন ঘনিষ্ঠজনেরা। স্বামী শঙ্করানন্দ সেই মহাপুরুষ—গুপ্তযোগী। নিন্দা, প্রশংসা, স্তুতি, প্রতিষ্ঠা কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করত না। বসে আছেন পিঠ ফিরিয়ে—"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবম্/ প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা তস্মাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁর অপূর্ব ভাষণে। এপ্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, মায়ের সঙ্গ এবং প্রসঙ্গের কিছু কথা এখনো রয়ে গেছে সকলের অগোচরে।

সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা ছিলেন 'সুপ্রিম কোর্ট'। তাঁর কথাই ছিল শেষকথা। কত জটিল প্রশ্নের সমাধান তিনি করে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এরকমই একটা প্রশ্ন ছিল—ঠাকুরকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সকলেরই কি মুক্তি হবে? এবিষয়ে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ডায়েরি (তারিখ ১৬.৩.১৯৫৯) থেকে এপ্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে।[২] ডায়েরির ভাষা অবিকৃত রাখা হয়েছেঃ

মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) আমাকে বললেন, "শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন—তখনকার দিনের একটা কথা মনে পড়ছে।

"কথা হয়েছিল ঠাকুরকে যারা দেখেছে তাদের সকলেরই কি মুক্তি হবে? না, ঠাকুর কি ছিলেন তা যারা বুঝেছে তাদের মুক্তি হবে?... মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) বলতেন, তাঁকে যারা দেখেছে তাদেরই মুক্তি হবে। সূর্যকে

** অর্থোপেডিক সার্জন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক। এই অনবদ্য লেখাটি লেখকের গুরুপূজাতুলা।*

কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, তার আলো সকলের দিকে যাবেই। সকলেই পথ খুঁজে পাবে। ভগবৎকৃপা সকলের উপরই সর্বকালে সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে, হয়েছে এবং হবে। ঠাকুরকে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, যারা একবার দেখেছে তাদেরও মুক্তি হবে। ঠাকুরের তিরোধানের পর কত লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁকে না দেখেও তাঁর নাম শুনে অপার কৃপার অধিকারী হচ্ছে।

"আর এক মত হলো—তাঁকে বুঝতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর কি ছিলেন সেটুকু বুঝলেই হলো, সেটার উপরেই সব। তাঁকে বুঝলেই তাঁর প্রতি টান হবে, ভালবাসা আসবে, তাঁকে ধ্যানের বস্তু করে তোলা হবে, সেই পরশমণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। তবে চুম্বকের যেমন স্বভাব লোহাকে আকর্ষণ করা, তেমনি চুম্বক-স্বরূপ ঠাকুরও অদৃশ্যভাবে সকলকে আকর্ষণ করে থাকেন। তাই তাঁর তিরোধানের পর কত নরনারী তাঁর নামগুণগান কীর্তন করে, তাঁকে স্মরণমনন করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। ভক্তের হৃদয় ঠাকুরের দুর্বার আকর্ষণে তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। একটা চুম্বকপাথরের পাহাড়ের নিকট দিয়ে যখন কোন জাহাজ চলতে থাকে তখন ঐ চুম্বকের আকর্ষণে জাহাজের লোহা-লক্কড় সব খসতে থাকে, জাহাজের সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরও এমনি করেই পরম করুণায় সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দুর্জয় বেগে তাঁর দিকে টেনে নিচ্ছেন। জীব তাঁর স্পর্শ পেয়ে ভববন্ধন হতে চিরমুক্তি লাভ করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। তাঁকে চিনি বা না চিনি তিনি তো আমাদিগকে চেনেন। তাই তাঁর প্রবল প্রেমের টানে এই ক্ষুদ্র জীবনতরীখানি তাঁর কাছে গিয়ে অবশ্য পৌঁছাবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে চলতে হবে। যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।

"উপরোক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। কেউ কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ঐসব প্রশ্ন মীমাংসার জন্য করা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে চলতে পারলে আর ভাবনা নাই। আপনার বোধ হলেই হলো। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তিনি কৃপা করে যাকে গ্রহণ করেন, যার কাছে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন সেই ধন্য। মানুষ চেষ্টা করে কি তাঁকে পেতে পারে?' ব্যস্, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের অল্প কথাতে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছল।"

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিক আবির্ভাবতিথিতে স্বামী শঙ্করানন্দ উপযুক্ত ত্যাগী নারীদের ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান করেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠের উদ্বোধন করেন। ৬ নভেম্বর ১৯৫৫ বেলুড় মঠের সপ্তম সন্ন্যাসিসঙ্ঘ সভায় সভাপতির ভাষণে স্বামী শঙ্করানন্দ তৃপ্তির সঙ্গে বলেছিলেনঃ "বড় আনন্দের সংবাদ যে, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ও আপনাদের সহযোগিতায় শ্রীসারদা মঠ নামকরণে মেয়েদের মঠ স্থাপিত হয়েছে। গঙ্গার অপর পারে মঠের নিজস্ব বাড়িতে মেয়ে মঠের শুভারম্ভ আমাদের, স্বামীজীর ও তাঁর গুরুভাইদের পরম ঈপ্সিত...।"

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির শেষরাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের প্রিয় শিষ্যা এবং স্বামী সারদানন্দের স্নেহধন্যা সরলাদেবীকে বেলুড় মঠে স্বামী শঙ্করানন্দ সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। তাঁর নতুন নাম হলো—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী। তিনি হলেন সদ্যগঠিত শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা। ঐ বছরই আগস্ট মাসে কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাতে শ্রীসারদা মঠের পরিচালনভার তুলে দেন। ১৯৬১ সালের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মিশন রেজিস্ট্রির পরে স্বামী শঙ্করানন্দ স্বস্তি অনুভব করেন।

"মায়ের জন্য একটি মঠ।" ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে মহাপুরুষ মহারাজকে লিখেছিলেন স্বামীজীঃ "আগে মায়ের জন্য একটি মঠ করতে হবে। আগে মা এবং মায়ের মেয়েরা।" সেই ভাগবৎ ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভাবের পর থেকে এপর্যন্ত কোন স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানা নেই। বৈদিক ভারতে সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ কোনদিনই ছিল না। এবার সময়োপযোগী আধুনিক ধাঁচে স্বামীজীর নির্দেশ অনুযায়ী সন্ন্যাসিনীদের জন্য শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। কিন্তু 'স্ত্রীমঠ' বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার লক্ষণ ১৯৫১ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না।[৩] ১৯৫২ সালে স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁর অধ্যক্ষ জীবনের প্রথম সাধুসম্মেলনে (Monks' Conference) সভ্যদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিশেষ আলোচনার পর তা গৃহীত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, স্বামী শঙ্করানন্দ মায়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার কথা তেমন বলতেন না। ১৯০২ সালে সঙ্ঘে যোগদানের আগে, জীবনের সেই প্রস্তুতিপর্বে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কোন প্রসঙ্গই জানা যায় না। তবে সঙ্ঘে যোগদানের পর শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন লীলাপরিকরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার কথা কিছু জানা যায়। তিনি আত্মকথায় বলেছেনঃ "১৯০৪ কি ১৯০৫ সাল। খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ), আমি ও বিশ্বরঞ্জন (স্বামী হরিহরানন্দ) মায়ের দেশে গেছি। মা তখন জয়রামবাটীতে। আমরা পৌঁছাতেই তিনি জেলে ডাকিয়ে পুকুরে মাছ ধরালেন। প্রথমবারেই

দুটো মাছ পড়ল মাঝারি রকমের। দুটোই রেখে দিলেন। মা বললেন, 'তোমরা এসেছ বলে প্রথমবারেই মনোমত মাছ পাওয়া গেল। তোমরা পয়মন্ত। এই সেদিন কালীর (কালী-মামা—শ্রীশ্রীমায়ের তৃতীয় ভ্রাতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়) বিয়ের পাকা দেখার দিনে অনেকবার জাল ফেলে কয়েকটি ছোট ছোট মাছ পাওয়া গেল।' মা নিজেই সব রান্না করলেন। আমাদের কাছে বসিয়ে কত আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। সে স্নেহ-ভালবাসা কত সহজ সুন্দর! একেবারে নাগালের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্তলে।

"ভোররাত্রে উঠে আমি আর খোকা মহারাজ শৌচে বেরিয়েছি। মাঠের মাঝখান দিয়ে আমোদর নদের দিকে এগোচ্ছি। খোকা মহারাজ লক্ষ্য করলেন, একটি মেয়ে মাথায় ঝুড়ি কিংবা চ্যাঙাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখতে পেয়ে আরেকটি মেয়ের মাথায় বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একটু চোখের আড়ালে চলে গেলে তারা মায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। আমি খোকা মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি চিনতে পেরেছেন, উনি কে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি চিনেছি, বেশ স্পষ্ট করে দেখেছি। আমাদেরই মা। কত রাত থেকে উঠে পাশের গ্রামের হাট থেকে আমাদের জন্য তরিতরকারি সংগ্রহ করতে গিছলেন।' পাড়াগাঁয়ে কী আর পাবেন? কয়েকটি ডাঁটা, থোড়, কাঁচকলা ছিল ঐ চ্যাঙাড়িতে। আমি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাহলে তো বেশিদিন আর এখানে থাকা হবে না! আমাদের জন্য মায়ের কষ্টের অবধি নেই! সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাত্রেও একটু ঘুমোতে পারেন না। তেরাত্রি বাস করে আমরা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আরামবাগে এলাম।

"১৯১২ সাল। (রাজা) মহারাজের সঙ্গে আমি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে। মহারাজ আমায় বললেন, 'দেখ অমূল্য, মাকে আজ চপ তৈরি করে খাওয়াতে হবে।' আমি বাজার থেকে মোচা ও আলু কিনে আনলাম। সিদ্ধ করলাম। মোচা ভিতরকার পুর। আলু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে মাখছি, দেখলাম—থসথসে নরম। তখন আরেকটা জিনিস দিয়ে সেটাকে শক্ত করে নিলাম। চপ তৈরি করে যখন একটি থালায় সাজিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলাম, তখন মা পূজা শেষ করেছেন। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে মা চপও ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মা অন্য প্রসাদের সঙ্গে চপ-প্রসাদও খেলেন। খুব ভাল লেগেছে। অবশ্য মায়ের স্বভাবই ছিল—সব জিনিসকে ভালভাবে দেখা। গোলাপ-মাও খেয়েছেন। বেশ মচমচে চপ। খেয়ে তারিফ করলেন। বিকেলে ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা আমায় জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁ অমূল্য, এত চমৎকার চপ কি করে তৈরি করলে? কেমন মচমচে, খুব সুস্বাদু।' মহারাজও তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমায় চোখ টিপে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম না। মহারাজ উত্তর দিলেন, 'গোলাপ-মা, তোমরা ভেবেছ তোমরাই ভাল রান্না করতে জান। এখন দেখ, আমরাও তোমাদের চেয়ে ভাল রান্না করতে পারি।' মহারাজ পরে আমায় তৈরি করার প্রণালী জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললাম, 'যখন আলু চটকাতেই নরম চটচটে হয়ে গেল, তখন সুজি ভেজে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। মশলাও ভেজে গুঁড়িয়ে পুরের সঙ্গে ঠেসে নিয়েছিলাম।' "[৪]

জগজ্জননী প্রসঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দের কথাঃ "বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বলতেন, 'মা যে কী বস্তু, পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারো বুঝবার শক্তি নেই। তিনিই কালে তোদের কৃপা করে বোঝাবেন। এখন তাঁর কথা স্মরণ করে যা। আহা, লোককল্যাণের জন্য তিনি কী না করেছেন, নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়েছেন।' কেশবানন্দ মহারাজ (কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ, মায়ের শিষ্য) বলতেন, 'মায়ের কথা তোমাদের কী আর বলব? তিনি যে কী এবং কে এখনও বুঝতে পারিনি। তপস্যা না থাকলে মাকে বুঝা ভারি শক্ত। যদিও আমরা তাঁর নিকটেই আছি। তাঁকে বুঝলুম কই?' একদিন তিনি মাকে বলেছিলেন, 'মা, আপনার শরীর সুস্থ নয়, প্রায়ই ভুগছেন। আপনার যে রান্না করে দেয় তার সম্বন্ধে আপনি সব জানেন। আপনি যদি দয়া করে বলেন তবে অন্য একটা রান্নার লোক দেখি।' মা বললেন, 'তোমরা ছাড়লে ছাড়তে পার, আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়?' আমরা যেমনই হই না কেন, মার কাছে আমরা তাঁর ছেলে ভিন্ন অন্য কিছুই নই। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার ছেলেরা যদি ধুলোকাদা মাখে আমাকেই তা ধুয়ে তাদের কোলে নিতে হবে। আমি যে তাদের সত্যিকারের মা, পাতানো মা নই।'

"সবার চেয়ে মা দয়াল। নাগ মহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ, ঠাকুরের গৃহী ভক্ত) বলতেন—'শ্রীশ্রীমা বলতেন, "পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), হরির (স্বামী তুরীয়ানন্দ) কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়"।' "[৫]

স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী (১৯৫৩-১৯৫৪) উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে (১২ পৌষ ১৩৬০, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩) বেলুড় মঠের জনসভায় একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণটি পরে 'উদ্বোধনঃ শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা'য় (বৈশাখ ১৩৬১) 'শুভেচ্ছাবাণী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শঙ্করানন্দের সেই বক্তৃতা থেকে

জানা যায় সঙ্ঘের সাধুরা শ্রীশ্রীমাকে কি চোখে দেখতেন এবং তাঁর সম্পর্কে কি ভাবতেন। তাঁর সেই বক্তৃতা এখনো সমান প্রাসঙ্গিক। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো ঃ "বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর অন্তরে জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ঘোর সংশয় ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া লক্ষ্যভ্রষ্টের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তদনুযায়ী সমাজগঠন করাই বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন। জীবনের সেই উদ্দেশ্য কী এবং কিরূপে উহা সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। এই দিব্য দম্পতির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবানলাভ।... শ্রীসারদা-দেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনাবৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক, তদ্দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাই, উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী চরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা, এক সার্বভৌম আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ, যাহা সমস্ত জাতি ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।... শ্রীসারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী এবং জগতে তাঁহারই মহান আদর্শের পরিপূর্তির সহায়িকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশই ছিল সারদাদেবীর জীবনে মহত্তম দিক।... সারদাদেবীর জীবন নারীত্বের যথার্থ মহিমাদ্যোতক দিব্য মাতৃভাবকে বিকশিত করিবার জন্য বর্তমান যুগের নারীজাতিকে আহ্বান জানাইতেছে। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে আজ এই যে অমূল্য সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সর্বসাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে।"

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH DT HOWRAH

শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠায় স্বামী শঙ্করানন্দজীর স্বহস্ত লিখিত আবেদনপত্র

উপরি উক্ত বক্তৃতা অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশন থেকেও শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩, রবিবার) দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। এই শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ সারদা সঙ্ঘ আয়োজিত ভক্ত মহিলাবৃন্দের কনভেনশনে (২ এপ্রিল ১৯৫৪) সভাপতি হিসাবেও স্বামী শঙ্করানন্দ ইংরেজিতে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন এবং শঙ্করাচার্যের 'মা ভগবতী বন্দনা'র শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করে শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা প্রচার করেন স্বীয় প্রাণের আবেগেঃ " 'চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো/ জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারঃ পশুপতিঃ/ কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং/ ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী-ফল-মিদম্‌॥'[৬]—জীবের কর্তা শিব দিগম্বর, চিতাভস্ম গায়ে লেপন করেন, হলাহল পান করেন, জটাজুট ধারণ করেন, অহিপতিকে মাল্যরূপে গ্রহণ করেন আর করোটি ভিক্ষার পাত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন। (এই তো তাঁর অবস্থা!) মা ভবানি! তোমাকে ভার্যারূপে লাভ করেছেন বলেই তো তিনি আজ জগতের পতি! শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'ও সারদা, সরস্বতী... ও জ্ঞানদায়িনী। ... ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' আবার বলেছেন, 'ঐ যে-মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।' "

স্বামী শঙ্করানন্দের কথায়ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে কত সংস্থা হয়েছে, হচ্ছে। মা ও স্বামীজীর নামেও অগণিত প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। সারদা সঙ্ঘে সবাই শিক্ষিতা মেয়ে। পৃথিবীব্যাপী এর পরিধি। সব জাতের সব ভাষার মেয়ে এতে যোগদান করতে পারে। Lady Huxer ঐ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। মায়ের শতবার্ষিকী বছর থেকে এর পত্তন। ওঁরা

Womens Conference করল। নানান দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর চল্লিশজন delegate এসেছেন। সকলে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। তাঁর উপদেশপূর্ণ ভাষণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ। সংবাদগুলো সংবাদপত্রে ফলাও করে লিখেছিল।" মা এবং ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট সংস্থাগুলি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "'রামকৃষ্ণ আশ্রম', 'বিবেকানন্দ আশ্রম', 'বিবেকানন্দ মিশন', 'বিবেকানন্দ চক্র' প্রভৃতি কত প্রতিষ্ঠান আছে। সকলেই আমাদের সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা করে। সভাসমিতি, উৎসবাদিতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে, আমাদের সাধুরা সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেন। দেশের হাওয়া যে বদলেছে এতে বোঝা যায়, মানুষের মনের গতি ঠাকুর-স্বামীজীর দিকে ফিরছে। যেকোন প্রকারে হোক তারা ভগবানকে চায়। কেউ জ্ঞাতসারে তাঁকে চাইছে, কেউ অজ্ঞাতসারে তাঁর দিকে এগোচ্ছে।"[৭]

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সেই ১৯০১ সালে বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা'র আসনে বসিয়ে পুজো করবেন। অমূল্য মহারাজ—পরবর্তী কালের স্বামী শঙ্করানন্দ তখনো সঙ্ঘজীবনে প্রবেশ করেননি, পরের বছর যোগদান করবেন। ১৯০৯ সাল থেকে শ্রীশ্রীমা স্থায়িভাবে 'উদ্বোধন' ভবনে থাকতে লাগলেন। সেইসময় থেকে ১৯২০ সালের ২১ জুলাই মহাসমাধি পর্যন্ত জগতের কল্যাণে তিনি 'মহাতপস্যা'য় ব্রতী ছিলেন। এসমস্ত ঘটেছে স্বামী শঙ্করানন্দের চোখের সামনে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৯৫৩ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে কতজনই বা তাঁর অপার্থিব মহিমা সম্পর্কে জানত! বাস্তব অর্থেই সেই ১৯৫৩ সালের পর শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসব, অনুষ্ঠান এবং মাতৃনামের সর্বব্যাপী প্রচারের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এখনো ঘটে চলেছে তার বিস্তার, বিশ্বব্যাপী প্রসার।

প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে, স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানাননি। তাঁকে লোকচক্ষুর সামনে আনা ঠাকুরের অনেক সন্তানের অভিপ্রেত ছিল না। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বলেছিলেনঃ "ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের কাছে প্রচার করলে তাঁর শরীর থাকবে না। ঠিক ঐ একই কথা মায়ের সম্পর্কে খাটে।" স্বামীজী সেকথায় সায় দিয়েছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় মায়ের নশ্বর দেহত্যাগের পর শ্রাবণ সংখ্যায় (২২তম বর্ষ) শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার আগে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সংক্রান্ত কোন কিছুই 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়নি। 'উদ্বোধন'-এর ২২তম বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় সরলাবালা দাসীর 'মায়ের কথা' প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন'-এ শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এটাই প্রথম।[৮]

শ্রীশ্রীমা যেমন স্বামী শঙ্করানন্দের ওপর স্ত্রীমঠ স্থাপনের 'কাজ' নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তেমনি তাঁর আদরিণী কন্যা সরলাদেবীর ওপরও যেন নির্দেশ ছিল বিশেষ কাজের। সরলাদেবী তখন কাশীতে তপস্যাপূত জীবন যাপন করছেন। কিন্তু স্বামী শঙ্করানন্দের নির্দেশে শ্রীসারদা মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আসতে হয়েছিল। তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। শঙ্করানন্দজী বলেছিলেনঃ "মেয়েদের মঠ হলে তোমাকে যেতে হবে।" উত্তরে সরলাদেবী বলেছিলেনঃ "আমি পারব না।" তাঁর দ্বিধা দূর করে শঙ্করানন্দজী বলেছিলেনঃ "আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তোমার দ্বারাও হবে। শ্রীশ্রীমার উপর নির্ভর করে থাকবে, তাহলেই হবে। তুমি যেরকম শ্রীমার কাছে ছিলে, শ্রীমার সেই ট্রেনিংটা তুমি এই মেয়েদের দেবে।"[৯] নবপ্রতিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষা সেই সরলাদেবী—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজী।

কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির কথা আচার্য শঙ্কর বলেছেন। শ্রীশ্রীমা এযুগে বললেনঃ "কাজ করা চাই বইকি। কাজ করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়।" স্বামী শঙ্করানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী ভাষণে বলছেনঃ "শ্রীঠাকুরকে চেনার অনেক পরে আমরা শ্রীশ্রীমাকে চিনতে আরম্ভ করেছি। দুঃসহ জীবনের আঁধারে আশ্বাস ও আশ্রয়ের দীপশিখা জ্বেলে তাকিয়ে আছেন জন্মজন্মান্তরের মা। তিনি আদর করে ডাকছেন—এসো, তোমরা সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ কর।" ❑

তথ্যসূত্র

১ 'পঞ্চপ্রদীপে মাতৃদর্শন'—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শতরূপে সারদা, সম্পাদকঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৮৭

২ স্বামী সর্বদেবানন্দজী মহারাজের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩ ১৯৫১ সালের ১৯ জুন স্বামী শঙ্করানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

৪ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা—স্বামী আপ্তকামানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, ১৯৬৬, পৃঃ ৯, ১৭-১৮ এবং 'উদ্বোধন', ৯৮তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃঃ ২২০

৫ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া আশ্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৬ স্বামী শঙ্করানন্দ—অমিয় বসু, পৃঃ ১৫৯

৭ স্বামী শঙ্করানন্দ স্মারক গ্রন্থ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, ২০০১, পৃঃ ৪৯-৫০

৮ ১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন': দৃষ্টিপাত—জলধিকুমার সরকার, 'উদ্বোধন', ১০১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৪০৫, পৃঃ ১৭

৯ ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা—সম্পাদিকাঃ প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৫

দেবী দুর্গা ঃ তত্ত্বে ও কাহিনীতে

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

"যদা যদা হি সাধূনাং দুঃখং ভবতি দানব। তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সন্ধারয়াম্যহম্।/ অরূপায়াশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ। সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য বিনিশ্চিতম্॥" (দেবীভাগবত, ৫।১৮।২২-২৩)

'দেবীভাগবত'-এ ভগবতী দুর্গা স্বমুখে নিজের রূপপরিগ্রহের তত্ত্ব বলছেন মহিষাসুরকে। যিনি অরূপা, যাঁর জন্ম নেই—সেই আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি, ব্রহ্মের 'পট্টমহিষী' বলে যাঁকে তন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনিই জগৎকে রক্ষা করার জন্য, সাধুদের দুঃখ দূর করে দানবরূপী দুরাচারী দুর্বৃত্তদের দলন করতে বারবার স্বর্গে ও মর্ত্যে অবতীর্ণা হন। 'গীতা'য় (৪।৮) যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্/ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে", ঠিক তেমনি ভগবৎ-শক্তি ভগবতী দেবীও ঐ একই উদ্দেশ্যে ভক্তদের কল্যাণকামনায়, সন্তানদের প্রার্থনায় নানা রূপে নানা নামে যুগে যুগে অবতীর্ণা হন। 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ (৪।১৬-১৭) সেজন্য বলা হচ্ছে ঃ "উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ।/ চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্‌ভুজাষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।" সাধকদের সাধনার সিদ্ধি হিসাবে কৃপাময়ী জগজ্জননী তাঁদের সামনে আসেন করুণাঘন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে। আবার অত্যাচারিত সন্তানদের কাতর আহ্বানে তাদের রক্ষা করতে তিনিই রুদ্রাণীমূর্তিতে ভীষণা ভয়ঙ্করী দনুজদলনীরূপে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবির্ভূতা হয়ে তাদের রক্ষা করে জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। মায়ের এই যে একাধারে কৃপাময়ী ও প্রচণ্ড চণ্ডিকামূর্তি, এটি তাঁর বিশেষত্ব।

তিনি তো সকলেরই মা। তাই প্রয়োজনে সন্তানদের শাসন করার জন্য তাঁকে কঠোর হতে হয়, তাঁকে ভীষণা উগ্রমূর্তি ধারণ করতে হয়। তিনি তাদের বিনাশ করলেও একেবারে ত্যাগ করেন না। তাই পরাজিত দানবশ্রেষ্ঠ মহিষাসুরকে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়ে চিরকালের জন্য সাযুজ্যমুক্তি দান করেন। তিনি কালীরূপে অসুরদের বধ করে তাদের মুণ্ড ও হাতগুলিকে নিজের শরীরে ধারণ করে তাদের নিত্য সংযুক্ত করে রাখেন নিজের সঙ্গে। এমনিই তাঁর কৃপা তাঁর দুরন্ত সন্তানদের ওপরেও। মায়ের এই মহিমা অতুলনীয়! আবার সিদ্ধ সাধকদের তপস্যায় তাঁদের কাছে তিনি আসেন কৃপাসুমুখী হয়ে, বরাভয় করে। তাঁদের প্রয়োজনমতো অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-দানে তিনি তাঁদের জীবনের সব সাধও মিটিয়ে দেন।

সাধকের ভক্তিরস আস্বাদন করার জন্য কত রূপেই না আসেন 'সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণকর নানা রূপধারিণী' দেবী জগদম্বা! কত না বর্ণে তাঁর সেই আগমন—"তুমি কখনো শ্বেত, কখনো পীত, কখনো নীললোহিত রে।" কখনো শ্বেতবর্ণা সরস্বতী, কখনো পীতবর্ণা দুর্গা, লক্ষ্মী, কখনো নীলবর্ণা মহাকালী, চামুণ্ডা, কখনো বা রক্তবর্ণা জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি নানা রূপ ও নামে ভক্তের হৃদয়পদ্ম আলো করে মা আসেন।

এইসব দেবীর মধ্যে দেবী দুর্গার কথাই বেশি বলা হয়েছে নানা শাস্ত্রে। একেবারে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'মহাভাগবতপুরাণ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'—এইসব নানা পুরাণে, পরবর্তী কালে 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে ও শাক্ত পদাবলীতে এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, প্রেমিক প্রমুখ ভক্ত সাধকদের রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গা ও মা কালীর নানা রূপ ও লীলামাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীদুর্গার পৌরাণিক পরিচয়ই সর্বাধিক প্রচারিত। তাঁর 'শ্রীদুর্গা' নামটি দেবীভাগবতে প্রচারিত হয়েছে 'দুর্গম' বা 'দুর্গ' নামক এক অসুরকে বধ করা প্রসঙ্গে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৪৯-৫০) নিজের এই নামপ্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "অদ্য প্রভৃতি যে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি, দুর্গ দৈত্যস্য সমরেপাতনাৎ ঘোর দুর্গমাৎ।"—দুর্গ নামক দৈত্যের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করার জন্য আজ থেকে আমার নাম হবে 'দুর্গা'। এই দুর্গম বা দুর্গাসুরকে বধ করার আগে দেবী ভগবতী দেবতাদের রক্ষা করার জন্য আরো দুটি রূপ ধরেন—একটি 'শতাক্ষী', অন্যটি 'শাকম্ভরী'। এই শাকম্ভরী অবতারেই তিনি দুর্গ অসুরকে বধ করেন। দেবীভাগবতের সঙ্গে স্কন্দপুরাণের কাহিনীর এই প্রসঙ্গে সামান্য অমিল আছে। স্কন্দপুরাণের মতে, এই ঘটনা ঘটে বিন্ধ্যাচলে। সেখানেই দেবী ভগবতী তাঁর দূতী কালরাত্রির সাহায্যে দুর্গমাসুরকে ডেকে এনে যুদ্ধে তাকে নিহত করেন, আর পরিশ্রান্ত হয়ে এসে বসেন বর্তমান কাশীর দক্ষিণপ্রান্তে দুর্গাবাড়ির স্থানে। তাঁর পরিশ্রমজনিত

* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, সুলেখক ও সুবক্তা।

স্বেদ বা ঘাম থেকে সৃষ্টি হয় 'দুর্গাকুণ্ড' আর আকাশ থেকে তাঁর অসি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় মাটি কেটে দুটুকরো হয়, সৃষ্টি হয় বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তস্থিত 'অসি' নদীর। আর তখনি তাঁর নাম হয় 'দুর্গা'। দেবতারা তাঁর এই অসুরনিধনে নিশ্চিন্ত হয়ে যে-স্তবে তাঁর বন্দনা করেন, তার নাম 'বজ্রপঞ্জর'। কাশীখণ্ডে এই বিখ্যাত স্তবটি আছে। এই স্তবপাঠে নানা বিঘ্ননাশ হয় বলে সকলের বিশ্বাস। এখানে তিনি 'বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা' নামে খ্যাতা। শাস্ত্র বলছেনঃ "শতাক্ষী-শাকম্ভরী দুর্গাদেবতানাং জলদান-অন্নদান-দৈত্যবধকর্মভেদেন নামভেদ মাত্রমেব কেবলম্, ন তু অবতার ভেদ ইতি বোধ্যম্।" (দেবীভাগবত, ৭।২৮।৮৩, টীকা) দেবীভাগবতে বলা হচ্ছে, দেবীর ঐ তিনটি নাম দেবতাদের জলদান, অন্নদান ও দৈত্যবিনাশ—এই তিনটি পৃথক কর্মের উদ্দেশ্যে উক্ত হয়েছে মাত্র, তত্ত্বত বা বাস্তবিক এঁদের অবতারভেদ হয়নি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তাঁদের মানসিক বৈকল্য বা মোহাচ্ছন্ন অবস্থার কারণ জানতে যখন তপোবনের প্রধান মুনি মেধসের কাছে হাজির হন, তখন মুনিবর তাঁদের জানান, দেবী মহামায়ার প্রভাবে সমগ্র চরাচরের সকল প্রাণীই—সে যতই জ্ঞানী হোক না কেন—মায়াচ্ছন্ন হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য—যেটা যা নয় সেটাকে তাই মনে করে তারা মমতার আবর্তে—মোহগর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। এমনকি জগৎপতি নারায়ণও যোগনিদ্রারূপিণী দেবীর প্রভাবে নিদ্রাভিভূত। একমাত্র সেই মহামায়াই কৃপা করে মোহের আবরণ সরিয়ে না নিলে কোন গতি নেই। "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী/ সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৭-৫৮) এই 'মহামায়া' কে? তাঁর স্বরূপ-স্বভাব ও উৎপত্তি বিষয়ে রাজা সুরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মুনি মেধস বলেনঃ "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্/ তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।" (ঐ, ১। ৬৪)—তিনি সর্বদা বর্তমানা, এই সমগ্র জগৎই নানা রূপে, রঙে, আকারে তাঁরই মূর্তি। তিনিই এই সমুদয় জগতের অন্তর-বাহির জুড়ে আছেন; তবুও জগতের সন্তানদের কল্যাণে, তাদের ত্রিবিধ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য তিনিই নানা যুগে নানা মূর্তিতে আবির্ভূতা হন।

এই পুরাণে তাঁর এই আবির্ভাব তিন খণ্ডে বিভক্ত—তিন লীলাবিগ্রহ হিসাবে। প্রথম চরিত্রে তিনি তামসী মহাকালী। কারণসলিলে শায়িত এবং তাঁরই মায়ায় আচ্ছন্ন বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপত্তি হয় মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের। তাদের উপদ্রবে বিঘ্নিত হয় বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ম। উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মা তামসী দেবীর স্তব করেন, যাতে তিনি বিষ্ণুর মায়াচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে তাঁকে জাগরিত করেন। ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্না দেবী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত করেন এবং তাঁকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে দৈত্যবধে সাহায্য করেন। আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে মহাকালী হিসাবে দর্শন দেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে রম্ভাসুর ও মহিষীর সন্তান, শিবাংশসম্ভূত মহাবলশালী মহিষাসুর যখন দেবতাদের জয় করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন, তখন স্বর্গচ্যুত বিপন্ন দেবতাদের আবেদনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অন্যান্য ক্রোধান্বিত দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে হিমালয়ে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে (বর্তমানে মহালয়ার পূর্বদিনে) দেবীর আবির্ভাব হয়। দেবতাদের তেজে সৃষ্ট সেই দেবীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দেবতাদের গায়ের রঙের মতো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ছিল। তারপরে দেবতারা নিজেদের অস্ত্রাদি ও নানা অলঙ্কার দিয়ে সেই দেবীকে সাজিয়ে দেন। শাস্ত্র বলেন, এইসব দেবতার তেজ আদ্যাশক্তি মহাদেবীরই তেজ। তাঁরই তেজে সকল দেবতা তেজোময়। এখন প্রয়োজনে তাঁর সেই স্বকীয় তেজ আবার দেবতাদের শরীর থেকে তাঁর ভাগবতী তনুর সৃষ্টি করল। "অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।/ একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।" (ঐ, ২। ১৩) "নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।" (ঐ, ৪।৩) সেই দেবী সর্বদেবময়ী, তিনি নানা অস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সজ্জিতা হয়ে সপ্তমী থেকেই মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। প্রথমে মহিষাসুর তার প্রধান সেনাপতিদের পাঠাল দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দেবী অনায়াসে তাদের বধ করলে অবশেষে মহিষাসুর এল যুদ্ধ করতে। মহামায়াবী মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমে মহিষ, তারপর সিংহ, অসুর, হাতি এবং পরিশেষে আবার মহিষের রূপ ধরে দেবীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে দেবী পা দিয়ে মহিষের কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করে শূলের দ্বারা আঘাত করেন। তখন মহিষের মুখ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসে মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলে দেবী খড়্গের আঘাতে তাকে বধ করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে দেখা যায়, শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য দেবী পার্বতী সৃষ্টি করেন কৌষিকী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও কোটি যোগিনীদের। এঁদের নিয়ে তিনি একে একে চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে সংহার করেন। যদিও এইসব শক্তি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তবুও তিনি বলেনঃ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (ঐ, ১০।৫)—এঁরা সব আমারই সৃষ্ট 'মৎ বিভূতয়'। আমি একা—প্রয়োজনে নানা হই।

আবার তাঁদের সব আমারই মধ্যে টেনে নেওয়ায় আমার অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণিত হয়। দেবতারা দেবীর সাহায্যে বিপন্মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন ঃ মা, ভবিষ্যতে আমরা বিপদে পড়লে তুমি আবার এসে আমাদের ও মর্ত্যের মানুষদের রক্ষা করো। দেবীও বলেন ঃ "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি/ তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।" (ঐ, ১১।৫৫)

দেবী তাঁর সেই কথা রাখার জন্য আবার ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে দেবতাদের সহায় হন। দেবতারা ব্রহ্মাকে বলেন, শরৎকাল দেবতাদের 'অকাল', দেবী এখন নিদ্রিতা। তাঁকে ঘুম থেকে তুলে রাবণবধ করার জন্য রামকে সাহায্য করাতে হবে। ব্রহ্মা মর্ত্যে এসে কোন নির্জন স্থানে এক বিল্ববৃক্ষমূলে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে একপক্ষ কাল অর্থাৎ শুক্লা নবমী পর্যন্ত দেবী ভগবতীর বোধন ও পূজাদি করেন। ষষ্ঠী পর্যন্ত বিল্বমূলে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করার পর ব্রহ্মা সপ্তমীতে মৃন্ময়ীমূর্তিতে দেবীর বিশেষ আবাহন করেন। অষ্টমী ও অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে বিশেষ পূজার পরে নবমীতেও দেবীর পূজা হয়। দশমীতে সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। নবমীতে রাবণবধ হয়। এই বিবরণ মহাভাগবতপুরাণে আছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই বিবরণ আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আশ্বিন কৃষ্ণানবমীতে ব্রহ্মা বোধনপূজাকালে বিল্ববৃক্ষের পত্রান্তরালে এক অপূর্ব কন্যাকুমারীর দর্শনলাভ করেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা মাল্যভূষিতা সেই দেবীকেই আদ্যাশক্তিজ্ঞানে ব্রহ্মা স্তব করলেন। এটি বিখ্যাত 'তান্ত্রিক দেবীসূক্ত' বলে পরিচিত। "ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা, রুদ্রেন্দ্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।/ সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ।" (পূর্ব খণ্ড, ২২। ১১)—রাবণ, রাম বা রুদ্র-ইন্দ্র আমাদের যাকিছু শক্তি, সেসবই তো মা তোমার। সেই সর্বশক্তিময়ী দেবি, তুমি একমাত্র রামেই প্রবৃত্তা হও। হে দেবি, আজ সেইজন্যই তোমার বোধন করছি। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও।

দেবী ভগবতী স্তবে তুষ্টা হয়ে বালিকামূর্তি ত্যাগ করে ভগবতী চণ্ডিকার রূপ ধরে বর দিতে চাইলে ব্রহ্মা বললেন ঃ "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ/ অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া।" (ঐ, ২২।১৪) রাবণবধ ও রামকে অনুগ্রহ করার জন্য অকালে আমি তোমাকে বোধন করছি। অতএব আজ আশ্বিনের আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে যতদিন না রাবণ বধ হয়, ততদিন আমরা পূজা করব। জগতের সকলে "এবং ক্ষিতিতলে স্বর্গে পাতালে চ নরাদয়ঃ। অর্চ্চিষ্যন্তি বিশেষেণ যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।" (ঐ, ২২।১৬) এইভাবে চিরকাল তোমার বোধনপূজা এই তিথিতে উদ্‌যাপিত হবে।

দেবী ভগবতী 'তথাস্তু' বলে বললেন ঃ "আজ কৃষ্ণা নবমীতে কুম্ভকর্ণ বধ হবে। ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণের হাতে অতিকায় মারা যাবে। চতুর্দশীতে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করবে। অমাবস্যা (মহালয়ার দিন) রাত্রে ইন্দ্রজিত মারা যাবে। প্রতিপদে মকরাক্ষ, দ্বিতীয়া থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত অন্য রাক্ষসেরা মরবে। সপ্তমীতে আমি রামচন্দ্রের বাণে প্রবেশ করব। অষ্টমীর দিন রাম-রাবণে দারুণ যুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা কাটা যাবে ও আবার জোড়া লাগবে। শুক্লা নবমীতে রামচন্দ্রের কাছে রাবণ মৃত্যুবরণ করবে। দশমীতে তোমরা সকলে বিজয়োৎসব করবে।"

দেবী তাঁর কথামতো অকালে বোধিতা হয়ে রামচন্দ্রের সাহায্যকারিণী হয়ে রাবণবধ করালেন। পৃথিবী কলুষমুক্ত হলো। দেবতারা ও মর্ত্যের মানুষ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হলো দেবী ভগবতীর কৃপায়। এইভাবে অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজার প্রচলন হলো। বসন্তকালে যে বাসন্তী দুর্গার পূজা হয়, সেটি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের প্রবর্তিত। সেটি দেবতাদের জাগরণের কাল, তাই তখন শুধু বোধন ছাড়া অন্য সব পূজাই হয় শারদীয়া পূজার মতো। তবে জনপ্রিয়তায় সেরা শারদীয়া দুর্গাপূজাই।

মর্ত্যের মানুষ আমরা আজও বছরের এই কয়টি দিন উন্মুখ হয়ে থাকি দেবী ভগবতীর পূজা উৎসবকে অবলম্বন করে তাঁর কৃপালাভের জন্য। তিনি সেই প্রাচীনকালে শান্তি ও ধর্মস্থাপন করার জন্য নানা অস্ত্রে নানা অসুরকে নিধন করেছেন। বর্তমান যুগে সেই অসুরদের চেহারা পালটে গিয়েছে। আসুরিক বৃত্তি কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর উন্মত্ততায়, হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতার তাড়নায় জর্জরিত মর্ত্যের মানুষ তাই মাকে কাতর প্রার্থনা করে—হে জগজ্জননী জগদম্বে! পূর্বের মতো এখনো তোমার ঐশী শক্তির প্রভাবে আমাদের অন্তরের অসুরবৃত্তিকে দমন করে জীবনে শান্তিদান কর। চৈতন্যদায়িনী জননী আমাদের জীবনে শুভবুদ্ধি দাও, জ্ঞান-বিদ্যা-অর্থ-তেজ-বীর্য-সিদ্ধি দান কর।

"মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী।
আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে॥
ওঁ মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাম্‌কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥"

(দুর্গাপ্রদক্ষিণস্তুতি)

"প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, চণ্ডীপাঠাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র, ৪) ❑

গীতায় গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম ও সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব

সীতানাথ গোস্বামী*

মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব বলেছেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এবং অধর্ম, অনর্থ, অকাম ও অমোক্ষ বিষয়ে যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্রও আছে এবং যা এখানে (মহাভারতে) নেই তা কোথাও নেই।[১] এইভাবে মহাভারতের সারবত্তা বুঝিয়ে তিনি বলেছেন যে, এখানে বিষয়ের গাম্ভীর্য ও ব্যাপকতা আছে এবং এজন্যই এই গ্রন্থকে 'মহাভারত' বলা হয়েছে, শুধু 'ভারত' বলা হয়নি। "মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। (১২।৫।৪৫) ব্যাপকতা শুধু শ্লোকপরিমাণে বা আকৃতিতে নয়, বিষয়বৈচিত্র্যেও বটে। এই অতিব্যাপক ও ভারবৎ মহাভারতের সার হলো আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীভগবান কর্তৃক গীত এই উপনিষদ্ বা উপনিষদ্‌তুল্য গম্ভীরার্থদ্যোতক গ্রন্থেও আবার স্বয়ং ভগবান মধ্যে মধ্যে রহস্য বা গোপনীয় তত্ত্ব বলেছেন, কখনো গোপনীয়তর বা গুহ্যতর তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, আবার কখনো গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয়েও উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থান্তে তিনি সর্বগুহ্যতম তত্ত্বেরও নির্দেশ করেছেন তাঁর অর্জুনকে প্রদেয় উপদেশগুলির পরিশেষে। এই সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব বলার পরে (১৮।৬৬) তাঁর উপদেষ্টব্য আর কিছুই ছিল না। এজন্য মধুসূদন সরস্বতী এই ১৮।৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যার শেষে বলেছেন ঃ "সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ।" (মুনশীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স, ১৯৭৮, পৃঃ ৭৭৫) ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ১৮।৭৩ শ্লোকের ব্যাখ্যার শেষে "পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ" বললেও সেখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য হলো যে, শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদের এখানেই পরিসমাপ্তি। এর পরে সঞ্জয়ের মুখে পাঁচটি শ্লোক উচ্চারিত হলেও তা কোনভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ-রূপ[২] গ্রন্থের অংশও নয়। সুতরাং এটি অবিসংবাদিত যে, ১৮।৬৭ থেকে ১৮।৭৩ পর্যন্ত শ্রীভগবান এই গীতাগ্রন্থের অধিকারী ও ফলের উল্লেখ করলেও তা গীতাতত্ত্বের অন্তর্গত নয় এবং ১৮।৬৬ শ্লোকেই শাস্ত্রার্থের সমাপ্তি।



দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—তোমাকে সাংখ্যতত্ত্ব বা সম্যক্‌জ্ঞান বা আত্মতত্ত্বের কথা বললাম, এবার কর্মযোগের কথা শোন। ২।৩৯ থেকে ২।৫৩ পর্যন্ত তিনি কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ তথা ঈশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করার উপদেশ দিলেন। কর্মযোগ নামাঙ্কিত তৃতীয় অধ্যায় মূলত কর্মযোগের উপদেশেই নিয়োজিত। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের মধ্যে মধ্যেও কর্মযোগের তত্ত্ব উপদিষ্ট রয়েছে। যাই হোক, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান কর্মযোগের পরম্পরাটি যেভাবে তাঁর উপদেশের ফলে প্রধানত রাজর্ষিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তার বিবরণ দিয়ে সেই যোগের বর্তমান কালে নাশ হয়ে যাওয়ার কথাও অর্জুনকে শোনালেন। আজ তিনি অর্জুনকে যে-কর্মযোগের কথা বললেন তা মোটেই নতুন নয় কিন্তু অতি পুরাতন এবং অর্জুন তাঁর ভক্ত ও সখা হওয়ায় তাঁকেই এই রহস্যতত্ত্ব বললেন ঃ "ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।" (৪।৩) এই বাক্যে 'রহস্য' শব্দটির অর্থ গোপনীয় বা গুহ্য। কর্মযোগই যে গীতার গুহ্যতত্ত্ব তা বেশ বোঝা গেল। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান বললেন ঃ

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (৬১)

—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করেন এবং সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় ভ্রামিত করেন বা ঘোরাতে থাকেন। সেখানে কোন জীবের কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। পরবর্তী শ্লোকে (১৮।৬২) আছে—হে ভরতবংশোদ্ভব, সকলভাবে তাঁরই শরণ নাও, তাঁরই প্রসাদে পরা শান্তি ও শাশ্বত বিষ্ণুপদ লাভ হবে। অনন্তর ১৮।৬৩ শ্লোকে তিনি বলছেন—গুহ্য থেকে গুহ্যতর এই জ্ঞানের কথা তোমাকে বললাম। এবার সমস্ত দিক বিবেচনা করে যা ইচ্ছা তাই কর।

এখানে ভগবান স্পষ্টত জ্ঞানযোগকেই গুহ্যতর বা গোপনীয়তর বা রহস্যতর বললেন। কর্মযোগ হলো গুহ্য এবং জ্ঞানযোগ হলো গুহ্যতর। কর্ম তো সকলেই করে এবং সেই কর্মই তার বন্ধনের কারণ হয়, যেহেতু আমার আচরিত কর্মের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। এই

প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ, গবেষক এবং সুলেখক। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এর সঙ্গে যুক্ত।

জন্মে যত কর্ম করে যাব এবং পূর্ব পূর্ব জন্মে যত কর্মের অনুষ্ঠান করেছি, কিন্তু তার ফল পাওয়া হয়নি—তেমন অনেক কর্মের ফল আমার প্রাপ্যরূপে সঞ্চিত হয়েই আছে এবং তার সঙ্গে যদি এই জন্মেও সাধারণ মানুষের মতো কামনাপূর্বক কর্ম করে যাই তবে তার ফলভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ আবশ্যক হবে। এর ফলে অনন্ত জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ নেই। এইজন্যই উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ হলো যে, এমনভাবে কর্ম কর যাতে আর কর্মের ফল পেতে না হয়। এইটিই হলো কর্মের কৌশল। এই কর্মকৌশলকেই শ্রীভগবান কর্মযোগ বলেছেন ঃ "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" (২।৫০) কুশলতার সঙ্গে অর্থাৎ ফলকামনা বর্জন করে বা ঈশ্বরে ফলসমর্পণ করে কর্মের অনুষ্ঠান করলে আর কর্মফল ভোগ করতে হয় না। অথচ কর্ম করার ফলে চিত্তের শুদ্ধি হয়। তখন চিত্ত জ্ঞানার্জনের উপযোগী হয়। সুতরাং কর্মযোগ বা কর্মকুশলতা অবশ্যই গুহ্য বা রহস্য এবং পরবর্তী স্তরে প্রাপ্য জ্ঞান হলো গুহ্যতর। শ্রীভগবান ১৮।৬৩ শ্লোকে বলেছেন ঃ

'ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥"

কর্মযোগ সার্থকভাবে সম্পন্ন হয় না যদি কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করা না যায়। ফলকামনা ছেড়ে কর্মের অনুষ্ঠান করলেও প্রকৃতির নিয়মে কর্ম করলে ফল হবেই, সুতরাং 'ফল হয় না'—একথা বলা যাবে না। তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কর্মফলের প্রাপ্তিতে (শুভকর্মের স্থলে) উল্লসিত হবেন না, আবার (অশুভকর্মের ক্ষেত্রে) উদ্বিগ্ন মনে ক্লেশও ভোগ করবেন না। এটি তখনি মজ্জাগত হয় যখন অনুষ্ঠাতা বোঝেন যে, শ্রীভগবানই এই কর্মের ফলদাতা এবং অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি তাঁর চরণে ফলরাশিকে উৎসর্গ করে দিতে সমর্থ হন। ফল সমর্পণের কথা ভগবান বহু স্থলেই বলেছেন ঃ

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (৫।১০)

এছাড়াও রয়েছে ঃ "যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ" (৩।৯), "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" (৪।২৩) ইত্যাদি। কর্মযোগের রহস্যটি সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে তৃতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোকে (৩০) ঃ

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

এখানে বলা হয়েছে—সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে ('ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য'), সকল জীবের পরিচালক অন্তর্যামীই যে আমাকে চালাচ্ছেন তা বুঝতে হবে ('অধ্যাত্মচেতনা'), সকল কামনা ত্যাগ করতে হবে ('নিরাশীঃ'), মমত্বভাবনা ত্যাগ করতে হবে ('নির্মমঃ ভূত্বা'), কাজ করে যেতে হবে, ধর্মযুদ্ধে [জীবনযুদ্ধে] এগিয়ে যেতে হবে ('যুধ্যস্ব') এবং নিজের কর্তব্যকর্মগুলি অপ্রিয় বা অরুচিকর মনে হলেও কোনপ্রকার জ্বর বা মনস্তাপ এলেও তাকে পরিত্যাগ করতে হবে ('বিগতজ্বরঃ')।

এই গুহ্যতত্ত্ব কর্মযোগ যথাযথভাবে সম্পন্ন করলে যখন চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন সর্বদাই হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করা যাবে এবং তখনি গুহ্যতর তত্ত্ব অনুভব করা সম্ভব হবে যে, শ্রীভগবানই আমার নিয়ন্তা, চালক। এই কথাই রয়েছে ১৮। ৬১ শ্লোকে 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' ইত্যাদি বাক্যে।

গ্রন্থান্তে গুহ্য ও গুহ্যতর তত্ত্বের কথা বলার পরে ভগবান সর্বগুহ্যতম তত্ত্বের কথা বললেন ঃ

"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥"
(১৮।৬৪)

—সর্বগুহ্যতম এবং আমার পরম বক্তব্য তত্ত্বটি আবার শোন, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং সেজন্য তোমাকে হিতবাক্য বলছি। এই কথা ভগবান বলার ফলে একটি সংশয় অবশ্যই জন্মায় যে, ভগবান তো কর্মযোগকে রহস্য বা গুহ্য বলেছেন, জ্ঞানযোগকে গুহ্যতর বলেছেন এবং এখানে সর্বগুহ্যতম বলছেন। কিন্তু গুহ্যতর তত্ত্বের পরে তো আসে গুহ্যতম এবং তার পরে আসবে সর্বগুহ্যতম। এই মধ্যবর্তী গুহ্যতম তত্ত্ব কি তিনি বলেননি? এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান গুহ্যতম তত্ত্ব বলেছেন পঞ্চদশ অধ্যায়। সমগ্র অধ্যায়টি ধরে পুরুষোত্তম বাসুদেব কৃষ্ণকে নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলার দ্বারাই গুহ্যতম তত্ত্ব বলা হলো এবং অধ্যায়ের অন্তে এই সংশয় বিদূরিত করে স্পষ্ট বললেন ঃ

"ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥" (২০)

সগুণ সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানাই গুহ্যতর তত্ত্ব জানা। তদপেক্ষা গুহ্য হলো নির্বিশেষে আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ পুরুষোত্তমের জ্ঞান। 'গুহ্যতম' শব্দ আরেকবার রয়েছে নবম অধ্যায়ে ঃ

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥" (১)

—আমার প্রতি অসূয়ারহিত তোমাকে এই গুহ্যতম তত্ত্ব বলব এবং এই জ্ঞানবিজ্ঞান-সহিত তত্ত্বকে জেনে তুমি অশুভ থেকে মুক্ত হবে।

এর পরের শ্লোকে শ্রীভগবান আবার বলছেন—এই তত্ত্ব বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা) এবং গুহ্যতত্ত্বগুলির



মধ্যেও শ্রেষ্ঠ (রাজগুহ্য) ও উত্তম তথা পবিত্র। এই অধ্যায়ে গুহ্যতমতত্ত্ব যে বাসুদেব, তাও নির্দিষ্ট হয়েছে। ক্রমে ভগবান উন্মেষিত করেছেন যে, তিনিই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁতেই সকল বস্তু অবস্থিত রয়েছে। তিনি নিজে তাঁর প্রকৃতিকে বশীকৃত করে পুনঃ পুনঃ প্রতি সৃষ্টিতে জগতের উৎপাদন ঘটিয়ে থাকেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব হলেও সাধারণ মানুষ তার মূঢ়তার জন্য মানবদেহধারী তাঁকে বুঝতে না পেরে অবজ্ঞা করে ঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (৯।১১)

নিজের বহুবিধ শক্তিমত্তা, সর্বকর্তৃত্ব, সদাবিদ্যমানত্ব ইত্যাদি বোঝানোর জন্য নবম অধ্যায়ে একটিমাত্র শ্লোকে (১৮) তিনি যেভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন ত্রয়োদশ প্রকারে, তার তুলনা নেই ঃ

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

এইভাবে এই অধ্যায়ে বাসুদেব তত্ত্ব বলা হলেও এখানে ক্ষরাক্ষরভিন্ন পুরুষোত্তমের উল্লেখ না থাকায় এর ততটা গুরুত্ব হয়নি—যতটা হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট বক্তব্য নিহিত রয়েছে তিনটি (১৬-১৮) শ্লোকে। শ্লোকত্রয় নিম্নরূপ ঃ

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ এই লোকে অর্থাৎ সংসারে পুরুষের দুই অবস্থা — ক্ষর ও অক্ষর। সকল ভূতকেই 'ক্ষর' বলা হয় এবং কূটস্থকে 'অক্ষর' বলা হয়। এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত হন। তিনি অব্যয় ও ঈশ্বর-রূপে লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত থেকে সকলকে পালন করেন। আমি ক্ষর থেকে ভিন্ন এবং অক্ষর থেকে উত্তম। এইজন্য লোকে ও বেদে আমি 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যা আছে এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ে যেসকল বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, সেইসব বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ক্ষর ও অক্ষর—এই দ্বিবিধ পুরুষের কথা বলা হলেও বস্তুত এই ক্ষর বা জড়বর্গ পুরুষ নয়, কিন্তু পুরুষের উপাধি এবং একইভাবে অক্ষর বা মায়াকে পুরুষ বললেও তা পুরুষ নয়, কিন্তু পুরুষের উপাধি। যা নিজের নিকটবর্তী বস্তুতে (উপ) নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেয় বা আধান করে (আদধাতি), তাই হলো উপাধি। যেমন দর্পণ তার স্বধর্ম মালিন্য সমীপবর্তী মুখে চাপিয়ে দেয় বলে দর্পণ হলো মুখের উপাধি। নির্বিশেষ চৈতন্যই হলেন পুরুষ। তিনি সর্বত্র বিরাজিত থাকায় এই জড়পদার্থ তার রূপে পুরুষকে রূপায়িত করে। এজন্য এই জড়বর্গ বা ক্ষর পদার্থ হলো পুরুষের উপাধি। তাকেই 'পুরুষ' বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। আবার এই একই নির্বিশেষ চৈতন্য যখন মায়াকে প্রকাশিত করে, তখন মায়াই হয় পুরুষের উপাধি। অথচ সেই উপাধি মায়াকেই 'পুরুষ' নামে বলা হয়েছে। আনন্দগিরি ভাষ্যের টীকায় বললেন ঃ "পুরুষোপাধিত্বাৎ পুরুষত্বং ন সাক্ষাদিতি।" মধুসূদন বলেছেন ঃ "দ্বাবিমৌ-পৃথগ্ রাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিত্বেন পুরুষশব্দ-ব্যপদেশ্যৌ লোকে সংসারে।"

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'অক্ষর' শব্দের অর্থ কূটস্থ এবং কূটস্থই মায়া। কূটস্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, কূটস্বরূপে স্থিত (কূট ইব স্থিতঃ)। 'কূট' শব্দের অর্থ হলো 'বহু'। একটি রজ্জুই মায়ার বা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হলে মালা, জলধারা, মাটিফাটা, সাপ ইত্যাদি বহুভাবে দেখা যায়। এক রজ্জুই বহু স্বরূপে (বহুর মতো) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবের কাছে প্রতীয়মান হয়। একের এই বহুত্ব-প্রতীতি মায়ার দ্বারাই সম্ভব। অন্যভাবেও 'কূটস্থ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়। 'কূট' অর্থ বঞ্চনা, ছলনা বা মায়া; যেমন 'কূটসাক্ষী' অর্থ যিনি মিথ্যা কথার দ্বারা বঞ্চনা করেন। সুতরাং 'কূটস্থ' অর্থ মায়ার প্রকাশক চৈতন্য বা পুরুষ। এখানে উপাধি মায়াকেই 'পুরুষ' বলা হয়েছে।

এই দুই পুরুষোপাধিকে যে পুরুষ বলা হলো তা থেকে ভিন্ন অপর একজন উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, তিনিই 'পরমাত্মা' নামে উল্লিখিত। প্রতিবিম্বিত মুখ দর্পণমালিন্য-বশত দর্পণরূপ উপাধির দ্বারা মলিনরূপে প্রতিভাত হলেও বিম্বস্বরূপ আসল মুখ কিন্তু মালিন্যের দ্বারা অসংস্পৃষ্টই থাকে। এইরূপ উপাধিদোষসংস্পৃষ্ট নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ চৈতন্যই বেদান্তে 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত হন। তিনিই আবার মায়াশক্তির দ্বারা সর্বত্র লোকত্রয়ে প্রবেশ করে অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হয়ে এই ভূ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি লোকসমূহকে ধারণ করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেও তাঁর কোন ব্যয়-বিকার-ক্ষয় নেই, তিনি অব্যয়। তাঁর সামর্থ্যের কোন অভাব না হওয়ায় তিনি ঈশ্বর।

পরবর্তী শ্লোকে (১৫।১৮) শ্রীভগবান বলছেন ঃ আমি বাসুদেব কৃষ্ণ যেহেতু ক্ষর অর্থাৎ কার্যপদার্থ থেকে অতীত (অর্থাৎ, উৎকর্ষে ছাড়িয়ে গিয়েছি) এবং অক্ষর বা মায়াশক্তি থেকেও উত্তম, এইজন্য আমি লৌকিক শাস্ত্রাদিতে ও বেদে

'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছি। ভাষ্যকার আরো একটু স্পষ্ট করে অধ্যায়ের প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলেছেন ঃ সংসাররূপ মায়াজন্য অশ্বত্থবৃক্ষ থেকেও আমি অতিশয় আবার এই সংসারবৃক্ষের বীজভূত মায়া থেকেও আমি উত্তম বা উৎকৃষ্টতম। এই ক্ষরাক্ষর উভয় থেকেই উত্তম হওয়ায় আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে কথিত হই।

কৃষ্ণে পুরুষোত্তম শব্দের লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—"হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ।" (রঘুবংশ, ৩।৪৯) বেদেও পরমেশ্বর পুরুষোত্তম নামে উল্লিখিত থাকার দৃষ্টান্ত—"স উত্তমঃ পুরুষঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।১২।৩) "তত্ত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ।" (যোগতত্ত্ব উপনিষদ্, ২) "সগুণং ব্রহ্ম চিদ্‌ঘনানন্দৈকরূপং পুরুষোত্তম-রূপেণ মথুরায়াং বসুদেবসদ্মন্যাবির্ভবিষ্যতি" (গোপীচন্দন উপনিষদ্, ১১) ইত্যাদি। যিনি উত্তম পুরুষ, তিনিই পুরুষোত্তম। উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি পুরুষোত্তমঃ—কর্মধারয় সমাস। অসমান অবস্থায় উত্তমঃ পুরুষঃ—এই ব্যাসবাক্যে 'পুরুষ' শব্দ পরে থাকলেও এবং 'উত্তম' শব্দ পূর্বে থাকলেও উত্তম শব্দের পরনিপাত হয়ে পুরুষোত্তম হবে। (সূত্র—রাজদন্তাদিষুপরম্, ২।২।৩১)

পুরুষোত্তম শব্দের দ্বারা যেমন নির্গুণ নির্বিশেষ নির্ধর্মক ব্রহ্মকে বোঝা যাবে, তেমনি তিনি যখন মায়াশবলিত হয়ে সগুণ সবিশেষ হয়ে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান হবেন—সেই সগুণ ব্রহ্মকেও বোঝা যাবে। এখানে ভগবান বাসুদেব সগুণ সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর হয়েই নিজেকে পুরুষোত্তম বলে জানতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

যাই হোক, বাসুদেব কৃষ্ণই যে গুহ্যতম—একথা স্পষ্ট, কিন্তু শ্রীভগবান পূর্বে উদ্ধৃত ১৮।৬৪ শ্লোকে যে সর্বগুহ্যতম তত্ত্বের কথা বললেন তার স্বরূপ এখনো স্পষ্টীকৃত হয়নি। সংক্ষেপে এটুকুই বক্তব্য যে, এই গুহ্যতম তত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা স্বল্পপ্রয়াসে যেকোন মানুষ যে-উপায়ে পেয়ে তার জীবনকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে, সেই উপায় অর্থাৎ ভক্তিই হলো সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব। পরবর্তী দুটি শ্লোকে (৬৫-৬৬) ভগবান যেভাবে তাঁকে পাওয়ার উপায় নির্দেশ করেছেন তা যে স্পষ্টতই ভক্তিমার্গ—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই শ্লোকদ্বয় ঃ

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয় বলে আমি সত্য বলছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাকেই পাবে। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে এক আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিই কয়েকটি শব্দে পরিবর্তিত অবস্থায় নবম অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার পূর্বার্ধের অন্তে ভগবানের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে শ্লোকটি হলো ঃ

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" (৩৪)

এই পুনরুক্তির দ্বারা এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শ্রীভগবানের এই বিষয়ে সমধিক আগ্রহ রয়েছে এবং এই ভক্তিমার্গই সর্বসাধারণের পক্ষে অনায়াসলভ্য। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' ও 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ' নামক অতিপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ গ্রন্থের রচয়িতা মধুসূদন সরস্বতী যেভাবে গূঢ়ার্থদীপিকা টীকাতে বংশীবিভূষিতকর শ্রীকৃষ্ণের দুবার বন্দনা করেছেন এবং 'কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি ঘন্নীলং মহঃ' বলে স্তুতি করে তাঁকে দর্শন করে নয়নযুগলের সার্থকতা প্রার্থনা করেছেন, তাতে তাঁর মতে ভক্তিই যে পরমাশ্রয় সেবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব ভক্তিই ভগবানের উপদেশের সার—একথা গ্রন্থের অন্তিম ভাগে ভগবানের উপদেশের অন্তে সুপরিস্ফুট হয়েছে। ❑

টিপ্পনী

(১) "ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥" (মহাভারত, ১৮।৫।৫০)

এর টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন ঃ "ধর্মে চেতি চকারচতুষ্টয়াদধর্মাদিচতুষ্টয়মপ্যত্রোক্তং হানার্থমিতি বোধ্যম্॥"

(২) 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ' অর্থ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন। গীতায় ভগবানের প্রথম উক্তি হলো—"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্" (২।২) ইত্যাদি এবং অর্জুনের উক্তির সমাপ্তি হলো "করিষ্যে বচনং তব।" (১৮।৭৩) সুতরাং ২।২ থেকে ১৮।৭৩ পর্যন্তই 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ'। এই অংশে তত্ত্বোপদেশের সমাপ্তি যে ১৮।৬৬-তে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সংবাদের আদি ও অন্তে বিদ্যমান শব্দদ্বয় হলো—'কুতঃ তব'। এর অর্থ—তোমার কিভাবে? সবই তো আমার। আমি দিয়েছি, তোমার জীবিকার অতিরিক্ত যাকিছু আমাকে দাও, তবে ভক্তিপূর্বক দাও নতুবা আমি গ্রহণ করি না। উদরপূর্তির অধিক গ্রহণ তো চৌর্য। ('ভাগবত', ৭।১৪।৮) তাই যা পার, যতটা পার—পত্র-পুষ্প-ফল ভক্তিপূর্বক আমাকে দাও। এখানেও সেই সর্বগুহ্যতম ভক্তির তত্ত্বই সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে।

আধুনিক রুশ শিল্পীদের সৃষ্টিতে স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর প্রভাব

গৌতম হালদার*

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী জীবন-জিজ্ঞাসায় শিল্পকলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অধ্যপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় ঃ "অবশ্যই তিনি শিল্প-ইতিহাস ও শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পের পাগল প্রেমিকও ছিলেন।"[১] তাঁর শিল্পচিন্তা ১৯০৫-২০ সময়পর্বে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ভারতশিল্প আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল ঐ আন্দোলনের সঙ্গে সিস্টার প্রত্যক্ষ যোগসূত্রে।[২] কিন্তু প্রায় একই সময়কালে (১৯০৬-২০) সেই পাগল শিল্পপ্রেমিকের শিল্পচিন্তা নয়, তাঁর 'রাজযোগ'-এর ভাবনা অর্থাৎ প্রচলিত যুক্তির উর্ধ্বগত ভাবনা আধুনিক অগ্রণী রুশ শিল্পীদের সৃষ্টির গভীরে সক্রিয় প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রায় অজানা ঐতিহাসিক তথ্যটি প্রথম এদেশে পরিবেশন করেছিলেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতশিল্পকলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পার্থ মিত্র তাঁর ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 'Nationalism and Art in Colonial India : 1855-1922' গ্রন্থে। তিনি অবশ্য বিষয়টির বিশদ আলোচনা না করে শুধু জানিয়েছিলেন ঃ "The Yogic system expounded in Swami Vivekananda's Chicago lectures, played a part in the art of Malevich and his Circle. In this fascinating world 'upside down', the Indian Painters turned to the West while the European avant-garde headed East for inspiration."

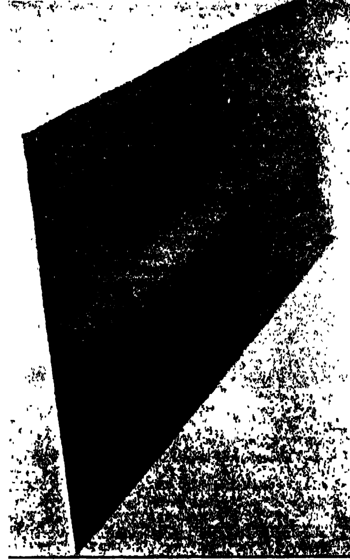

বেদান্ত-প্রভাবিত পি. ডি. আউস্পেনস্কি, ১৯২৬

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার ঐ বিপুলায়তন গবেষণা গ্রন্থে ডঃ মিত্র উদ্ধৃতিটির পূর্বাংশে বলেছেন, ভারতীয় ধর্ম কিভাবে থিয়সফিস্ট হেলেনা ব্লাভাৎস্কি, রুডল্ফ স্তেনার ও অ্যানি বেশান্তের লেখার মাধ্যমে আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের জনক ওয়েসিলি ক্যানদিনস্কিকে (১৮৬৬-১৯৪৪) অনুপ্রাণিত করেছিল রঙিন সঙ্গীতময় চিত্ররচনায়।[৩] অবশ্য এই তথ্যে অনবধানতাজনিত ত্রুটি স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতা নয়, ১৮৯৫-৯৬ সালে নিউ ইয়র্কে বিদেশি ছাত্রদের ক্লাসে প্রদত্ত 'রাজযোগ' বক্তৃতামালার সুসম্বদ্ধ সঙ্কলনের রুশ অনুবাদ। অধ্যাপক মিত্রের গ্রন্থগত তথ্যসূত্রে 'লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্ট' (LACMA) কর্তৃক প্রকাশিত 'The Spiritual in Art : Abstract Painting, 1890-1985' শীর্ষক সচিত্র ক্যাটলগটির সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ শিরোনামে LACMA-এ অনুষ্ঠিত এক বিশাল চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ ১৯৮৬-তে।[৪] সেই গ্রন্থের ১৮টি নিবন্ধের অন্তর্গত কয়েকটি লেখায় মূলত শ্রীমতী শার্লট ডগলাসের 'Beyond Reason : Malevich, Matiushin and Other Circles' লেখাটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বিপ্লবপূর্ব ও তার পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় (১৯০৬-১৯৩০) আধুনিক মহান পথিকৃৎ শিল্পীদের সৃষ্টির নেপথ্যে প্রাচ্যের এবং অবশ্যই স্বামীজীর অধ্যাত্মভাবনার সবিশেষ প্রভাবের বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। তিনি লিখছেন ঃ "Vivekananda taught a version of Advaita, a school of Vedantic philosophy, and Raj Yoga, the influencial book compiled from his popular lectures given in the United States... and published in Russia in 1906. It is one of many books on Yoga, Theosophy and related subjects that enjoyed wide popularity in Russia in the years before World War I."[৪ক] ঐ সময়কালে, বিশেষত ১৯১৭ সালের বলশেভিক আন্দোলন-পূর্ব রাশিয়ায় শিল্পীদের মধ্যে থিয়সফির রহস্যময় অলৌকিক ভাবনার সঙ্গে ভারতীয় যোগভাবনার প্রতি এক নৈসর্গিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। তাঁরা স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এ মনের বন্ধনমুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে নিরন্তর আত্মসংস্কারসাধন ও একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলাই যে শিল্পসৃষ্টির বিস্তীর্ণ বিশ্বজনীন পথ, তা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা। "Through a thin mist of doubt"[৫] রুশ অগ্রণী শিল্পীরা এক সুনীল স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। শিল্পী মেলভিচ, মাতিউশিন, কুলবিন, ক্যানদিনস্কি, পাভেল ফিলোনভ থেকে রদেশেঙ্কোর শিল্পকলায় স্বামীজী-সহ প্রাচ্যের যোগিজনের অধ্যাত্মচিন্তার গভীর প্রভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল। তাঁদের সৃষ্টিতে সেই চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজবাদের উন্মেষের পরই (১৯৩০ সালে) বিমূর্ত শিল্পকলায় একরকম নিরুৎসাহকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় অতীন্দ্রিয় ভাবনায়ও ভাটা পড়ে। কিন্তু সেদেশে সৃষ্টিশীল শিল্পীর মন থেকে তা একেবারে মুছে যায়নি।

* *শিল্পী নন্দলাল বসুর বন্ধুবর শিল্পী অসিত হালদারের পৌত্র, আসানসোল-নিবাসী, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার।*

■ রুশ ভাষায় স্বামীজীর গ্রন্থ প্রকাশ

রুশ শিল্পীরা স্বামীজীর লেখা পড়েছিলেন রুশ অনুবাদে। রুশ ভাষায় ঐ অনুবাদের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে জানা এক্ষেত্রে প্রয়োজন। নভিকভের অনূদিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৭৮৮ সালে প্রকাশিত হলেও রাশিয়ায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছিলেন জেরেসিম লেবেডফ (১৭৪৯-১৮১৭) তাঁর 'Unbiased Contemplation of East Indian Brahmanical Systems, Sacred Rites and Folk Customs' (মূল রুশ ভাষায়) গ্রন্থে ১৮০৫ সালে।[৫ক] সেসময়ে আধিভৌতিক রহস্যজগতের বিষয়ে রচনা বা গ্রন্থাদি প্রকাশে সেদেশে প্রবল বিধিনিষেধ ছিল। ১৭৮৩ সালে রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭২৯-৯৬) নিজের আগ্রহে প্রকাশনা ক্ষেত্রে রাজ্যের একক অধিকার শর্তসাপেক্ষে তুলে নেওয়ায় অনেক নিজস্ব প্রকাশন সংস্থা সেখানে গজিয়ে ওঠে, যদিও মিস্টিক গ্রন্থ প্রকাশে পাণ্ডুলিপির ওপর পুলিশি খবরদারি থেকেই যায়।[৬] সেই বাঁধানিষেধ মেনেও সেদেশে নানা অভিনব পারমার্থিক বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে থাকে। আগ্রহী পাঠক, এমনকি জীববিজ্ঞানের অধ্যাপকও 'মিডিয়াম' ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ লেখায় ব্যক্ত করার ফলে ১৮৭৫-এ সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী ডিমিট্রি মেণ্ডেলেভের নেতৃত্বাধীন এক 'মিডিয়াম কমিশন' গঠন করা হয় অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলীর সরেজমিনে যাচাইয়ের উদ্দেশে। কমিশন ৪০টি প্ল্যানচেট-মাধ্যম পরীক্ষার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং মাত্র ৮টি 'মানব-মাধ্যম' নিরীক্ষণের পরই তাঁদের মনে হয়, ঐ কাজ "a complete waste of time.... Spiritualism was a form of superstition."[৭] খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের এই বিরূপ মন্তব্য সেকালে অতীন্দ্রিয়বাদীদের ভীষণভাবে বিঁধলেও তাঁদের ধ্যানধারণায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সেকারণে অধিবিদ্যার নামে ভূত-প্রেতচর্চার নানা গ্রন্থপ্রকাশ অব্যাহত ছিল। ইতোমধ্যে ১৯০৫-এ রুশ প্রকাশনজগতে সবরকম বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলে সেখানে নানা বিদেশি ধর্ম, দর্শন, অধিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের হুজুগ পড়ে যায়। এমনি অনুকূল আবহে ১৯০৬ সালে স্বামীজীর পাতঞ্জল যোগসূত্র-সহ 'রাজযোগ' রুশ অনুবাদে 'Filosofia Ioga : Laktsii o Radzha Ioga, so Vkliucheniem aforizmum Patandzhali' শিরোনামে প্রকাশ করে সেন্ট পিটার্সবার্গের 'Sosnitsa' প্রকাশন সংস্থা। অনুবাদক ছিলেন Ia. Popov।[৮] অতঃপর নিঝিভিন-কৃত অনুবাদে স্বামীজীর নিবন্ধত্রয় 'My Master', 'Hymn of Creation' [1907] ও 'God and Man' [1908] দুটি পৃথক সঙ্কলনগ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশ পায় এবং মস্কো থেকে ১৯১২ সালে অনুবাদে প্রকাশিত হয় তাঁর 'Practicheskaya Vedanta' [Practical Vedanta]। পিটার্সবার্গের 'The Nevyi Chelvek' প্রকাশন তাদের অন্যান্য গ্রন্থ—'Karma Ioga' (কর্মযোগ, ১৯১৩-১৪), 'Bhakti Ioga' (ভক্তিযোগ, ১৯১৪) ও 'Dzhnana Ioga' (জ্ঞানযোগ, ১৯১৪) রুশ ভাষান্তরে প্রকাশ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের তাগিদে। সমসাময়িক যেসব বিদেশি গ্রন্থ রুশ অনুবাদে জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে চার্লস লেডবিটার ও অ্যানি বেশান্তের 'থট ফর্ম' (১৯০৫), উইলিয়াম জেমসের 'প্রিন্সিপিল্স অফ সাইকলজি' (১৯০৫), 'দা ভ্যারাইটি অফ রিলিজন্স' (১৯০৯), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (১৯১২), হেনরি বার্গসনের পাঁচ খণ্ড রচনাবলী (১৯১৩-১৪), উইলিয়াম ওয়াকার অ্যাটকিন্সের (যোগী রামচারক!) ১৯১৩ সালে 'পাথ টু অ্যাটেনমেণ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান যোগীস', 'ফাণ্ডামেণ্টালস অফ দা ওয়ার্লড ভিউ ফর দা ইণ্ডিয়ান যোগীস', ১৯১৪-এ প্রকাশিত 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দা সিক্রেট রিলিজিয়াস ফিলসফি অফ ইণ্ডিয়া' [Sokrovennaia religioznaia filosofiia Indii] (১৯১০) উল্লেখযোগ্য।[৯]



বহু থেকে এক-এর দিকে : সুপ্রিম্যাটিস্ট চিত্রণ
কাজিমির মেলভিচ, ১৯১৭-১৮

■ রাশিয়ায় স্বামীজীর 'রাজযোগ' সম্পর্কে আগ্রহ

রাশিয়ায় স্বামীজীর 'রাজযোগ' বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার অন্যতম মূল কারণ, ঐ রচনা সম্পর্কে সেদেশের বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা লিও তলস্তয়ের সপ্রশংস উক্তি। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতা বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা তলস্তয়কে তাঁর রচনা সম্পর্কে কৌতূহলী করেছিল। তলস্তয় ডায়েরির অংশবিশেষে স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছিলেন : "ভারতীয় জ্ঞানের এক মনোহারী গ্রন্থ", যদিও খ্রিস্টান ও থিয়সফিস্টদের অলৌকিকত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী তাঁর মনে মাঝে মাঝে সংশয় জাগত : "ঐ লেখা 'বুদ্ধিদীপ্ত ফাঁকা বুলিসর্বস্ব' নয় তো!" এই সংশয় সত্ত্বেও তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর খ্রিস্টীয় ভাবনার

সাযুজ্যের কথাও বলেছেন। শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সম্পৃক্ত সত্যাভিসারী তলস্তয় স্বামীজীর 'রাজযোগ' পাঠান্তে তাঁর গভীর অন্তর্ভাবনায় ২৬ জুন ১৯০৮-এর দিনলিপিতে লিখেছেন : "Felt now for the first time the possibility, as Vivekananda says, that 'I' could completely yield to 'you'-Felt the possibility of self-denial not for the sake of sound sense.... It is most diffficult and even most necessary to escape from terrible indulgence with self and with one's 'I'. And I am beginning-now before my death-to sense the possibily of such renunciation of one's 'I'."[১০]

তলস্তয় ব্যতীত আধুনিক রুশ শিল্পীদের স্বামীজী-প্রভাবিত হওয়ার আরেক মুখ্য কারণ অবশ্যই কবি হুইটম্যান ও এমার্সনের সমকালীন শিল্পরসজ্ঞ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, আমেরিকা নব-দর্শনের জনক বলে কথিত হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসের (১৮৪২-১৯১০) গ্রন্থে স্বামীজীর রচনা, গ্রন্থাদি থেকে বহুল উদ্ধৃতি—যা রাশিয়ায় তাঁর পরিচিতিকে এক ব্যাপক ও গভীর মাত্রা দিয়েছিল। অধ্যাপক জেমস স্বামীজীর বক্তৃতাদির গুণমুগ্ধ শ্রোতাই শুধু ছিলেন না, তাঁর দার্শনিক ও অধ্যাত্মভাবনায় ঐকান্তিকভাবে প্রভাবিতও ছিলেন। এসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাঁর নব্য আমেরিকায়—"Emerson was one of the prophets of the 'New America', Walt Whitman wrote its psalms. Among those who have sensed its coming have been the friends of Whitman, Richard Maurice Bucke and Edward Carpenter... mystical and spiritual America which centers predominantly about the recognition of new and hitherto unrecognised powers of mind.... From the orient too, have come contributing influences-Madam Blavatsky with her Theosophy and Swami Vivekananda with the Vedanta philosophy."[১১]

উদ্ধৃতির অন্তর্গত কবি এমার্সন থেকে রিচার্ড বাক, এডোয়ার্ড কার্পেন্টার—এঁরা সকলেই ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম ও দর্শনে স্বভাবত অনুরক্ত ছিলেন। অপরদিকে জেমস প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় ভাবনায় ভাবিত হয়েও পাশ্চাত্যের আধুনিক 'কিউবিজম' চিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যাতারূপে সমগ্র ইউরোপে, বিশেষত ফরাসি শিল্পকলা জগতে খুবই পরিচিত তখন। তাঁর 'লজিক্যাল' ভাবনা ও 'ফ্যান্টাসি' ভাবনায় ভর করে শিল্পী ব্রাক, পিকাসো, জুয়ান গ্রিসদের বলা হতো অলঙ্করণধর্মী নম্র-ভাবাপন্ন কিউবিস্ট শিল্পী এবং মার্শাল দুকাম্প, ভীলনদের বলা হতো শক্তপোক্ত যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কিউবিস্ট।[১২] এঁরা প্রত্যেকেই সিম্বলিক ছবি আঁকায় রপ্ত হয়েছিলেন।

■ প্রতীক সম্পর্কে স্বামীজী

স্বামীজী 'সিম্বল' অর্থাৎ প্রতীক বা রূপক সম্পর্কে লিখেছেন : "মানব-মনে প্রতীকের প্রভাব প্রবল। আমরা তাতে ভাবনার স্বাভাবিক প্রকাশ দেখি। আমাদের ভাবনা মাত্রই প্রতীকী। আমাদের উচ্চারিত শব্দরাশি ভাবনার প্রতীক। ভাবনা যেমন প্রতীককে বাইরে টেনে আনে, প্রতীকও তেমনি ভাবনাকে অন্তর্মুখী করে।" স্বামীজী কিন্তু ব্যক্ত করতে ভোলেননি যে, আপাত সহজবোধ্য মনে হলেও প্রতীক বা রূপককে উপলব্ধি করা একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব। স্বামীজীর উপলব্ধিতে সেকারণে ক্ষুদ্রতম শব্দটিও যেমন একটি প্রতীক, তেমনি অপরিমিত বিশ্বচরাচরও একটি প্রতীক।[১৩] কলারসজ্ঞ যামিনীকান্ত সেন তাঁর 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' গ্রন্থে লিখছেন : "অধ্যাত্মজগতে বিচরণ করতে গেলে বস্তুবাদের ভাষায় কাজ চলে না। তখন আদিকাল থেকে মিষ্টিকরা ও সাধকেরা যা ব্যবহার করে এসেছে তা গ্রহণ করতে হয়। সেজন্যই সিম্বল, রূপক ও সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গভীর তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা অনেকটা রূপকের ভিতর দিয়ে ছাড়া অন্য উপায়ে প্রকাশ করার যো নেই।"[১৪] সমসাময়িক আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রতীক সম্পর্কিত ধারণার কথায় ঐ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :


মিখাইল মাতিউশিন, ১৯২৫

'ইউরোপে ললিতকলার ইতিহাসে সিম্বল বা রূপকের ব্যবহারের চেষ্টায় এক বিচিত্র বিপর্যয় এবং অনির্দিষ্ট অস্থিরতা দেখতে পাওয়া যায়। একালের আর্টে প্রথম যখন রূপক প্রয়োগ হয়েছে, তখন শিল্পীরা রূপকের প্রাণকথা ও অফুরন্ত শক্তি উপলব্ধি করতে পারেননি। শিশুর হাতে সুতীক্ষ্ণ তূণীর ও শরসঙ্ঘ দিলে যেমন সে অনেক সময় তা নিয়ে ঘর তৈরি করে বসে, গভীর অধ্যাত্মবোধহীন শিল্পীরা অনেক সময় রূপক নিয়ে তেমনি খেলা করেছেন।"[১৫] এই নিবন্ধে আলোচিত শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই উক্তি কমবেশি প্রযোজ্য।

প্রতীক সম্পর্কে স্বামীজীর কিছু প্রত্যয়ী বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার প্রচ্ছদচিত্র সম্পর্কে পুনের 'মারাঠা' পত্রিকা যখন লিখেছিল : "The front page is almost picturesque", স্বামীজী তখন সেটিকে বিশেষিত করেছিলেন 'বর্বর, বীভৎস, কদর্য' বলে। তিনি অনুগামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন : "পদ্ম জাগরণের অন্যতম প্রতীক।... লংম্যান

গ্রিন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রাজযোগ বইয়ের জন্য আমি যে-প্রতীক তৈরি করেছি তা আপনি দেখে নেবেন।"[১৬] তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে মূর্ত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের জগদ্বিখ্যাত প্রতীকরূপটি, যার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন ঃ "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের, কমলদল ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক, আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত যুক্ত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়।"[১৭]

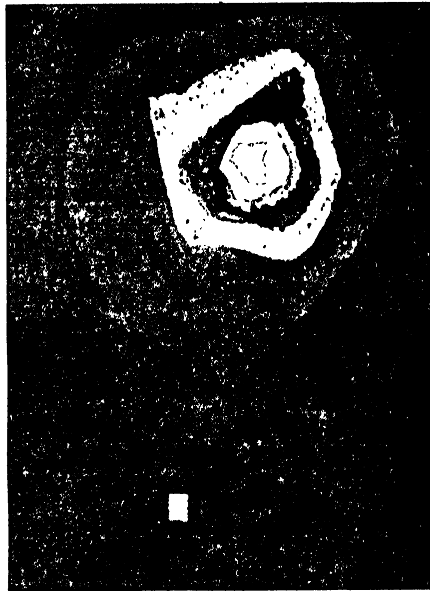
স্বামীজী তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের সুশৃঙ্খল, কর্মকুশল, বহির্মুখী মনোজগতের অগভীরতা ও অস্থিরতা (যা অনেক-সময় 'hotchpotch', 'riot' অথবা 'chaos' বলে তাঁর মনে হয়েছিল) সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। ভারতশিল্পের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামীও সেদেশের অপেক্ষাকৃত বহির্মুখী জনমানসে 'চিহ্ন' ও 'প্রতীক'-এর পার্থক্য অনুধাবনে শিশুসুলভ বিভ্রান্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[১৮]

■ স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি, 'রাজযোগ', পিটার আউস্পেনস্কি ও রুশ শিল্পীরা

স্বামীজীর উপলব্ধিতে আর্ট সৃষ্টির সর্বত্রব্যাপ্ত। এই ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলাকে বোঝার চেষ্টায় অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। অধিকাংশ ইউরোপীয় শিল্পকর্মে যে ভাবের অভাব রয়েছে তা তাঁর বিপুলপ্রসারিত ও অধ্যাত্মসাধনঋদ্ধ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেখানে তখন নানা 'ইজম'-পুষ্ট শিল্পধারায় সৌন্দর্যতত্ত্ব—'the science of sensual knowledge'-এ সংজ্ঞা-বদ্ধ হয়েছিল। আমি বাস্তবে যা দেখছি, ভাবছি, অনুভব করছি তাই আঁকছি—স্বভাবত এধরনের বাস্তব ইন্দ্রিয়জ শিল্পচেতনা ইউরোপীয় শিল্পীর সৃজন-ক্ষমতাকে সীমায়িত ও শৃঙ্খলবদ্ধ করেছিল, স্বামীজী তা তাঁর ইউরোপ-পরিক্রমায় বিভিন্ন মিউজিয়াম ও প্রদর্শনক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবশ্য সেখানে প্রাণবন্ত ফরাসি চিত্রগুলি তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, শিল্পকলাকে স্বামীজী তাঁর আর্ট-সম্পৃক্ত অনুভবী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করতেন। তিনি জানতেন, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম—এই ত্রিধারা একই সত্যের পরিপূরক। স্বভাবত যখন যেখানে তিনি ঐ সত্য-সুন্দরকে পেয়েছেন, নির্দ্বিধায় তাকে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনে শেখার এক অদম্য স্পৃহা ছিল তাঁর। ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় চিত্রপ্রদর্শনীতে স্বামীজী তাঁর স্বজাতীয় শিল্পী রবি বর্মার ছবি দেখেছিলেন, ধরে নেওয়া যায়। শিল্পী সেখানে দুটি স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো রবি বর্মার চিত্রকে উচ্চস্তরের মনে করেননি। কারণ তাঁর দুঃসাহসিক ধারণায় ঃ "ওদের (পাশ্চাত্যের) নকল করে এক-আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্র-করা পটো ভাল... তাঁদের কাজে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ আছে। ওসব রবি বর্মা-ফর্মা চিত্তি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালি চিত্তি, আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্তি প্রভৃতি আছে ভাল।"[১৯]

এমন উদার প্রজ্ঞাঘন যাঁর শিল্পচিন্তা, যা ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, তাঁর 'রাজযোগ' বিজ্ঞানমনস্ক রুশ প্রগতিশীল অধিবিদ্যায় জিজ্ঞাসু শিল্পী-মানসকে স্বভাবতই প্রভাবিত করেছিল। স্বামীজী তাঁর 'রাজযোগ'-এ পাতঞ্জল যোগসূত্রের প্রাণায়াম-কেন্দ্রিক যোগসাধনায় মনকে নিয়ন্ত্রণ ও একাগ্র করার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন ঃ "রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমত মানুষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই ঐ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়-বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিকঠিক নিয়মিত করিয়া অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলেই উহা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিকঠিক বুঝিতে পারিব, আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে। মনের শক্তিসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মিসদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সবকিছু আলোকিত করে, ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়।... মনকে অন্তর্মুখ করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা—যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে (রাজযোগই) একমাত্র উপায়।"[২০]

শিল্পী মাত্রেই সত্যান্বেষী। সেকারণে রুশ শিল্পীরা যখন 'রাজযোগ'-এর ভূমিকায় দেখলেন ঃ "রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য—এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর


'কুল কন্সেনট্রেশন'—ওয়াসিলি ক্যানদিনস্কি-র অনবদ্য সৃষ্টি (১৯৩০)

ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা"[২১], তখন স্বভাবতই তাঁরা তাঁদের উদ্দিষ্ট জীবন-সত্যে পৌঁছাতে স্বামীজীকেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এক সুদৃঢ় অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সারনাথে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মধ্যে আত্মার নিভৃত দিব্যরূপকে (spirit) স্থূলশরীরের ভিতর দিয়ে উদ্দিপ্ত করার, ফুটিয়ে তোলার অলৌকিক সফলতা প্রসঙ্গে শ্রীসেনের ধারণা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "ভারতবর্ষে বাহির হতে আত্ম-সংহরণের জন্য পতঞ্জলি প্রমুখ দর্শনকার ভাবুকেরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যেসমস্ত ব্যবস্থা কল্পনা করেছেন, তাতে মনে হয় শুধু ভারতবর্ষের লোকের পক্ষেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে অন্তর্মুখী হয়ে এরকম অলৌকিক মূর্তির রূপ-কল্পনা সম্ভব।"[২২] বাস্তবে রুশ শিল্পীরা স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর গভীর নিহিতার্থ কতটা বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেবিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

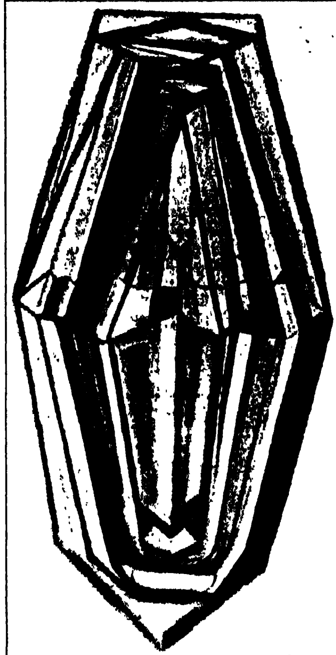
আধুনিক বিমূর্ত শিল্পকলা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক মরিশ টাকম্যান লিখছেন ঃ "Four leading abstract pioneers—Wassily Kandensky, Frantisek Kupka, Piet Mondrain and Kazimir Malevich—moved toward abstraction through their involvement with spiritual issues and beliefs."[২৩] আলোচ্য পথপ্রদর্শক শিল্পীরা তাঁদের অতীন্দ্রিয়-অন্বেষার প্রাথমিক পর্বে মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন হেলেনা ব্লাভাৎস্কি, ওলকট, চার্লস লেডবিটার, বেশান্তদের থিয়সফি এবং রুডল্ফ স্তেনারের অ্যানথ্রপসফির চলিত রহস্যাবর্তে। শ্রীমতী ডগলাসের অনুমান, সেসময়ে কিউবো-ফিউচারিস্ট চিত্রী মেলভিচদের সবচেয়ে আকর্ষণ করে এম. ভি. লোদিজেনস্কির গ্রন্থ 'Sverkhsoznanie i puti k ego dostizheniiu' [The superconsciousness and ways to achieve it, 1911]। তাঁর কথায় ঃ "In this book Lodyzhenskii explained the methods employed by Raja Yoga and by Christian asceticism to achieve the super-conscious, of expanded conscious, state." প্রসঙ্গত লোদিজেনস্কি লিও তলস্তয়ের প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তাঁর শেষজীবনের সঙ্গী ছিলেন এবং স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগলাভ করেছিলেন।

১৮৯৩ সালে ঐতিহাসিক শিকাগো বিশ্বধর্মসভা-খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের উদার ওজস্বী ভাষণ আমেরিকা ও ইউরোপে থিয়সফিস্টদের রহস্যের অবগুণ্ঠন অনেকাংশে সরিয়ে দেয়। তাঁর সহজ অথচ তীক্ষ্ণ মন্তব্যের গভীর সার্বজনীন আবেদনে সেদেশের কট্টর থিয়সফিস্টরাও তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাশিয়ায় 'রাজযোগ'-এর কথা শিল্পীমহলের আড্ডায় প্রথম এনেছিলেন এমনই একজন থিয়সফিস্ট, দার্শনিক পিটার আউস্পেনস্কি (১৮৭৮-১৯৪৭)। জন বোল্টের কথায়, আউস্পেনস্কি-কেন্দ্রিক আড্ডাচক্রে সঙ্গীত, অ্যালকেমি, হ্বাগনারের সঙ্গে অবিসংবাদিতভাবে উঠত স্বামীজী ও তাঁর 'রাজযোগ'-এর কথা। ঐ চক্রে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক যোগসূত্রের অপেক্ষাকৃত জটিল আবর্তের আভাস বোল্টের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছিল। আউস্পেনস্কি-কেন্দ্রিক সেই মজলিশে থাকতেন শিল্পী কাজিমার মেলভিচ, মিখাইল মাতিউশিন ও তাঁর স্ত্রী কবি অ্যাল গোরে, ভবিষ্যবাদী কবি ও শিল্পী মায়াকভস্কি, ভ্রাতৃদ্বয় ডেভিড ও [illegible]র বার্লিক, মিখাইল লারিওনভ, নাতালিয়া গাঞ্চারোভা এবং কবি ক্রুচেনিখের মতো তরুণ প্রতিভাদীপ্ত মানুষেরা। আড্ডা হত সঙ্গীতকার-চিত্রী মাতিউশিনের গৃহেই, কখনো বা কোন বোহেমিয় রেস্তোরায়। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, নীৎসের একান্ত পাঠক তরুণ সাংবাদিক আউস্পেনস্কি শেষমেশ থিয়সফিস্ট হয়েছিলেন মাদাম ব্লাভাৎস্কির লেখার মোহজালে আকৃষ্ট হয়ে। কবিতা ও চিত্ররচনায় ত্রিমাত্রিকতার গণ্ডি পেরিয়ে চতুর্মাত্রিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার নির্ভীক প্রচেষ্টায় তরুণ রুশ কবি ও শিল্পীদের একান্ত অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি। ১৯১০-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থের বিষয় হয়েছিল ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র আর সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় সৃষ্টির চতুর্মাত্রিকতাকে নিয়ে।[২৪] স্বভাবত মনে আসবে, স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এও আলোচিত হয়েছে উচ্চতর চেতনার উন্মেষে ঐ চতুর্থ মাত্রা—'কাল'কে 'ক্ষণ'-এ গুটিয়ে আনার কথা। আউস্পেনস্কির ভবিষ্যবাদী দর্শন ও শিল্পচিন্তা ১৯১১ সালে গ্রন্থবদ্ধ হয় 'টার্টিয়াম অর্গানাম'-এ। গুরু গর্জেফের প্রভাবে ১৯১৩-এ 'অলৌকিক'-এর সন্ধানে আউস্পেনস্কির মিশর ও ভারতবর্ষ পরিক্রমা।[২৫] ঐবছরই প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ—'The


কাজিমির মেলভিচ-এর সৃষ্টি : তুষারপাতের পরদিন প্রভাতে

Search of New Life, What is Yogo', স্পষ্টতই যা স্বামীজীর সাধনভাবনায় অনুরণিত। ভারত পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর 'টার্টিয়াম অর্গানাম' গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। সেই মহাগ্রন্থের ১৯২১-এ কৃত ইংরেজি অনুবাদ আউস্পেনস্কিকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়।

স্বামীজী তাঁর আত্মোপলব্ধিতে বিজ্ঞানভিত্তিক যোগসাধনায় রহস্যের কিছু দেখেননি। কিন্তু ইউরোপীয়রা প্রায়শই ইন্দ্রিয়-অগোচর যেকোন বিষয়কে রহস্যাবৃত দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বামীজীর যোগমানস সমাধির নিঃসীম নৈঃশব্দ্যে অনায়াসে স্থিতধী থাকত। আউস্পেনস্কির কল্পলোকে কিন্তু পরম নিঃসীমতা ছিল কিছুবা 'ভয়ঙ্কর'![২৬] সীমার মধ্যে অসীমকে রহস্যনিবিড় দেখার আউস্পেনস্কির এই সহজাত প্রবণতাই কিন্তু তাঁর সংসর্গে থাকা শিল্পী মেলভিচদের মনেও ঘটিয়েছিল অতীন্দ্রিয় জিজ্ঞাসার জাগরণ। আউস্পেনস্কি মানব-মনের অতলান্ত অন্বেষণে কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অস্তিত্বহীন নিঃসীমতায় নিজেকে মেলাবার ঐকান্তিক তাগিদ তিনি পেয়েছিলেন স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর নিবিষ্ট পাঠান্তেই। 'তত্ত্বমসি'—এই ঔপনিষদিক বাণী বারবার এসেছে তাঁর লেখায়। শ্রীমতী ডগলাসের কথায় ঃ "The spiritual mental discipline of Yoga, especially as expounded by Swami Vivekananda and his followers was a Consistant far reaching inspiration for the Russian Theosophist P. D. Ouspensky and all Theosophical Writers."[২৭]



'ফর্মুলা অফ স্প্রিং' ঃ প্যাভেল ফিলোনভ, ১৯২৩

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আধুনিক রুশ শিল্পীরা অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মতোই মাদাম ব্লাভাৎস্কিদের থিয়সফি সম্পর্কে ছিলেন অশেষ কৌতূহলী, এমনকি শিল্পী ক্যান্দিনস্কি তাঁর থিয়সফীয় ভাবনার প্রাণস্পন্দনকে (vibration of soul) ছবিতে প্রকাশে উৎসুক ছিলেন। এই অবস্থায় রুশ চিত্রীরা—যামিনীকান্ত সেনের কথায়—"অধ্যাত্মপথে আত্মার সহজ অনুধ্যানকে অনুসরণ না করে অলীক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক মধ্যযুগসুলভ ম্যাজিক ও সম্মোহনকলার দিকে... অতিপ্রাকৃত ভোজের রাজ্যে যা কিছু ইতর ও শয়তানী ব্যাপার আছে তার ভিতরও যাতায়াত করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে" প্রবৃত্ত হয়েছিল।[২৮] থিয়সফিস্টদের সম্পর্কে সেদেশের শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা যতই শ্রদ্ধাশীল হোন না কেন, স্বামীজী বলতেন ঃ "থিয়সফিস্টদের মিরাকল ভারতবর্ষে অভিনব কিছু নয়। সিদ্ধাই নামে হঠ-যোগীরা প্রধানত ওর চর্চা করে থাকেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ 'চৈতন্য যদি একবার হয়, ওসব হাবজা-গোবজা বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করে না।" ১৮৯৫ সালে এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "সম্প্রতি পাশ্চাত্যজগতে যে রহস্যময় চিন্তারাশি ফেটে পড়ছে, তার মধ্যে সত্য আছে। সেসম্বন্ধে আমি সচেতন, কিন্তু তার বেশির ভাগ পাগলামি ও দুষ্ট মতলবে পূর্ণ।"[২৯] প্রসঙ্গত স্বামীজীর সাধনজীবনের সঙ্গে একপদবাচ্য না হলেও মাদাম হেলেনা ব্লাভাৎস্কির তথাকথিত ভারতীয় অতীন্দ্রিয়দর্শনের নামে মধ্যযুগীয় ভূতপ্রেত মহাত্মারূপী কুসংস্কারকে নিয়ে থিয়সফিক্যাল গ্রন্থাদি খ্রিস্টীয় ১৮৭৫-১৯২০ সময়পর্বে ইউরোপ ও আমেরিকার উর্বর গ্রহিষ্ণু মানবক্ষেত্রকে প্রবলভাবে উসকে তুলেছিল। 'থিয়সফি'—সপ্তদশ শতাব্দীর এই গ্রিক শব্দের অর্থ 'ভগবদ্-জ্ঞান'। সেই অর্থে সিস্টার নিবেদিতার এক পত্রে দেখা যায়, তিনি লিখেছেন ঃ "উদ্ধৃতির থিয়সফিস্ট শব্দ বদলে যদি 'থিয়সফি আন্দেলন' করা হয়—তাহলে বলতে হবে—বিবেকানন্দ সত্যই ওকাজ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর অভিপ্রেত কাজে সফল হয়েছিলেন।"[৩০]

■ কাজিমার সেভেরিওনভিচ মেলভিচ ও মিখাইল মাতিউশিন

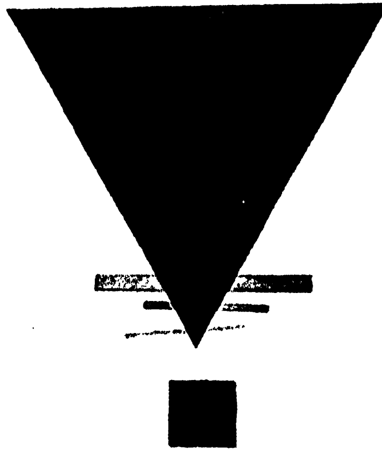
স্বামীজীর 'রাজযোগ' বিষয়ে আগ্রহী রুশ শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য শিল্পী কাজিমার মেলভিচ। তিনি থিয়সফিস্ট আউস্পেনস্কির চতুর্মাত্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচ্যের যোগ, সমাধির প্রতি অপার কৌতূহলী হন এবং বিমূর্ত চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণ নিরবয়বী 'সুপ্রিম্যাটিস্টিক' চিত্রসৃষ্টিতে উত্তরণ তাঁর ১৯১৫-এ, যার চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯২৩ সালে মস্কোয় এক প্রদর্শনীতে রাখা তাঁর সাদা ক্যানভাসে। এক্ষেত্রে শিল্পীর ঐ আপাত অর্থহীন যথেচ্ছাচারী চিত্রসৃষ্টির নেপথ্যালোকে স্বামীজীর অদ্বৈতবাদী দর্শনে প্রভাবজনিত বিভ্রান্তিকে অস্বীকার করা যায় না। ১৯২৯ সালে তাঁর শেষ পূর্বাপর চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল মস্কোর ট্রেটিয়াকভ গ্যালারিতে। আজীবন অর্থাভাবে জর্জর বিশ শতকের এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী দুরারোগ্য ক্যান্সারের যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর শবাধারের নকশা করে যান কালো বর্গক্ষেত্র ও বৃত্তের প্রতীকী সমাহারে।

রাজযোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এসব উৎকর্ষের সিঁড়ি ভেঙে ওঠার বিষয়ে অশেষ কৌতূহলী হয়েও মেলভিচ, মাতিউশিনের মতো রুশ পথিকৃৎ শিল্পীরা তাঁদের স্বভাবে কেউই উঠেপড়ে যোগানুশীলনে মাতেননি, কিংবা যথার্থ দিগ্‌দর্শক গুরুর অভাবে মেতে উঠতে পারেননি। যোগানুভূতির তুরীয় আনন্দ আস্বাদন না করেও তাঁরা সেই 'অরূপরতন'টিকে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখাসম্পদের বিমূর্ত চিত্রলেখায় ব্যক্ত করার সাহস দেখিয়েছেন। সমাধির বিমূর্ত প্রকাশের স্পর্ধাও দেখিয়েছেন শিল্পী মেলভিচ তাঁর চতুর্মাত্রিক 'সুপ্রিম্যাটিস্টিক' চিত্ররচনায়। সৃজনশীল শিল্পীর শিল্পসাধনায় মনকে একাগ্র করা, বলা বাহুল্য, একান্ত জরুরি। স্বামীজীর কথায়—রাজযোগ মানুষের স্বভাবজ বহুমুখী বিক্ষিপ্ত মনের গতিকে অন্তরের দিকে একাগ্রতায় আনতে শেখায়, স্বরূপকে জানার সহায়তা করে। "সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে।... রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য—কিভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কিভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভিতরের ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে নিজের সিদ্ধান্ত করা যায়।"[৩০ক] প্রসঙ্গত, মেলভিচ ও তাঁর সতীর্থ শিল্পীচক্র রাজযোগ সম্পর্কিত এই প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন স্বামীজীর গ্রন্থপাঠ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনাদি থেকেই।

"No books, no scripture, no science can ever imagine the glory of the Self, which appears as man—the most glorious God that ever was, the only God that ever existed, exists, or ever will exist. I am to worship, therefore, none but my Self."[৩১] স্বামীজীর এ হেন অদ্বৈতবাদী বক্তব্য যেমন তলস্তয় জীবনের শেষপ্রান্তে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তেমনি তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল শিল্পী মেলভিচের ভাবনাতেও। শ্রীমতী ডগলাসের কথায়, মেলভিচ ফিউচারিস্ট ও কিউবো-ফিউচারিস্ট ধরনের বিমূর্ত চিত্ররচনার আত্মতুষ্টি থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন। চিত্রে আত্মপ্রকাশের সুতীব্র তাড়নায় তিনি স্বামীজীকে স্মরণ করে লিখেছিলেন : "ঈশ্বরকে আমি খুঁজছি, খুঁজে মরছি আমার মুখটিকে; আমি রেখাঙ্কনে এঁকেছি তা। আমি লড়ছি সেই আমার মুখাবয়বকে সজীব করতে।" নানা দ্বন্দ্ব, সংশয়, অস্থিরতার মধ্যে মেলভিচ একাগ্রতার আলোয় তাঁর অন্তরতমকে দেখার প্রচেষ্টায় সুপ্রিম্যাটিস্টিক চিত্রের প্রারম্ভিক রচনাপর্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন : "This is how I reason about myself and elevate myself into a Deity saying that I am all and that besides me there is nothing and all that I see, I see myself.... I search for God, I search within myself for myself."[৩২] এভাবেই স্বামীজীর যোগ-জারিত রথে শিল্পী মেলভিচ তাঁর উচ্চতর উপলব্ধিতে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিলেন সুপ্রিম্যাটিস্টক চিত্ররচনার মধ্যে।

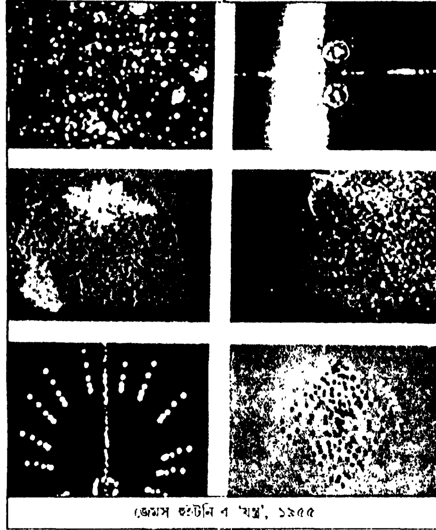
এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্যাপার, মেলভিচ ও তাঁর অনুগামী রুশ শিল্পীরা তাঁদের ছবিকে 'বিমূর্ত' না বলে 'নিরবয়ব' (objectless) বলতেন। ধ্যানের নিরন্তর অভ্যাসে ইন্দ্রিয়বদ্ধ চিত্ত পরিশীলিত হয়। "যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্যভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনি সমাধি অবস্থা আসে।" উল্লেখ্য ব্যাপার, যোগমানস সমাধির অবাঙ্ময় অরূপ বিষয়শূন্য ধ্যানে গা ভাসাতে চায় সমাধির অতলে তলিয়ে যাওয়ার আকুল অভিপ্রায়ে। এই ধ্যানে স্বভাবতই মানুষের অধিকারপ্রাপ্তির কথা ওঠে। সেক্ষেত্রে অনুধ্যানরহিত আবহে লালিত মেলভিচের সমাধিকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা বিশ্বদরবারে সাদরে গৃহীত হলেও ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা নেহাতই তৃণীর নিয়ে খেলা বলে মনে হতে পারে। মানুষের চিন্তনদীর দ্বিমুখী ধারার অন্তর্গত বিষয়মুখী ধারা থেকে রুশ শিল্পীরা যেন বিষয়হীন বিপরীতমুখী ধারায় চলে আসতে উন্মুখ হয়েছিলেন স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরই।

প্রখ্যাত সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী মাতিউশিন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্বামীজীর 'রাজযোগ'-অন্তর্গত সম্প্রসারিত দেখায়। এপ্রসঙ্গে শ্রীমতী ডগলাসের উদ্ধৃতি : "Matuishin was quite serious about the ability to see through the back of the head. Much of the Eastern-influenced literature of the time spoke of a special organ for perceiving visual impressions, which did not rely on the physical



মেলভিচ-এর অসাধারণ 'সুপ্রিম্যাটিস্ম', ১৯২০

eye. This organ, or visual center in the brain, was invoked to explain statements by the sleep-walkers that they 'see' and their obvious ability to negotiate obstacles. Vivekananda explained in this way—'The eyes do not really see. Take away the nerve-center which is in the brain, eyes will still be there, with the retinae complete, as also the picture of objects on them, and yet the eyes will not see. So the eyes are only a secondary instrument, not the organ of vision.' It was this nerve-center that Matuishin hoped to train in Young artists to increase the sensitivity to the new space and forms within it."[৩৩]


জেমস হুইটনি র 'যন্ত্র', ১৯৫৫

'রাজযোগ'-এ মনের একাগ্রতার কথায় চিত্ত ও বৃত্তি প্রসঙ্গে স্বামীজীর (একাধারে শরীর ও মন-বিজ্ঞানী) ঐ উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যধন্য আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য পরমানন্দ সরস্বতী ঐ 'দেখা'র সহজ সুন্দর বিশ্লেষণে লিখছেন ঃ "চোখ দিয়ে আমরা দেখি না। চোখ আমাদের চেতন ঘরের জানলা—মন সেই জানলা দিয়ে দেখে। সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা—এসব অনুভূতির কোন রূপ নেই। মন তাও দেখে। মন অনুপস্থিত থাকলে অতি কাছের মানুষটিকেও আমরা দেখতে পাই না। মন শুধু ভাবময় মনোময় রূপকেই দেখে না। একান্ত তন্ময় হলে, মন সুস্থ স্বচ্ছ হলে তার চিন্ময় আলোয় সে তার আত্মস্বরূপকেও দেখে। নিহিত হৃদয়গুহায় পরম আনন্দকে সে খুঁজে পায়।"[৩৪]

ভারতীয় তন্ত্রসাধনার সঙ্গে পরিচিত সমসাময়িক শিল্পী পাভেল ফিলোনভ স্বামীজী-ব্যাখ্যাত মনের একাগ্রতা আনায় রাজযোগের প্রয়োগকে ছবি আঁকায় নয়, 'ছবি নির্মাণ'-এ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—একটি সুনিয়ন্ত্রিত চিত্রে শিল্পীমনের জটিলতা বিশুদ্ধ এবং শুবস্তুতায় প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগৎ ও মানবহৃদয়ে এক অলক্ষিত যোগসূত্র গড়ে ওঠে। তিনি কঠোর অভ্যাসগত চিত্রনির্মাণকে শুধুই একাগ্রতা আনার উপায় হিসাবে দেখেননি, তা তাঁর ধারণায় ছিল শিল্পীর আত্ম-আবিষ্কারের একান্ত পথ। ১৯১৪ সালে ফিলোনভের ছোট্ট শিল্পীচক্র—'ওয়ার্লড ফ্লাওয়ারিং' প্রতিষ্ঠার ভিত্তিই ছিল—"On an aesthetic evolutionism—Insisted on the same extremes of intellectual and physical effort called for in Raja Yoga."[৩৫] ফিলোনভ শিশুদের চিত্রশিক্ষায় অ্যাকাডেমি গঠনে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। তাঁর আরেক বিশিষ্ট ভাবনা ছিল আহার গ্রহণে। শ্রীমতি ডগলাস লিখছেন ঃ "Why Filonov, struck by the slow eating habits of an Arab pesant, became extermely attentive to the process of masticating and digestion, maintaining that this practice, also ovserved by Yogis, gave him the maximum benefit from the food."[৩৬]

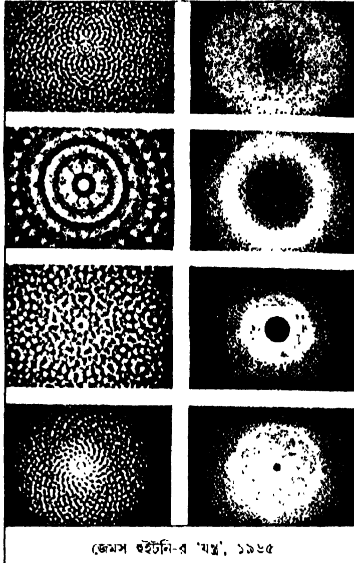
■ **শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ**

স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর প্রভাব প্রসঙ্গে আরেক জগদ্বিখ্যাত রুশ শিল্পী, ভারতে অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত নিকোলাস রোয়েরিখের (১৮৭৪-১৯৪৭) কথা বলতে হয়, যিনি সমসাময়িক হয়েও সেদেশের আধুনিক বিমূর্ত শিল্পীদলভুক্ত ছিলেন না; এমনকি এই বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি তাঁর অভিজাত জীবনচর্যায়ও ছিলেন শিল্পী মেলভিচদের একেবারে বিপ্রতীপে।[৩৭] উচ্চবিত্ত অ্যাটর্নি পিতার একমাত্র সন্তান নিকোলাস একাধারে হয়ে উঠেছিলেন চিত্রী, ভাস্কর, স্থপতি, পুরাতাত্ত্বিক, সার্থক মঞ্চ অলঙ্কারিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং কবি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক আন্দোলনের ভয়ঙ্কর দিনে তিনি অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রাচীন ঐতিহাসিক গির্জা, গ্রন্থাগার, মিউজিয়ামের অমূল্য সম্পদ ধ্বংস হতে। বিশ্বের মহার্ঘ সম্পদ লুপ্ত হতে দেখার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী কালে তাঁর 'Roerich Pact' রচনা, যা প্রাচীন ঐতিহাসিক শিল্পসামগ্রী রক্ষা করার এক আন্তর্জাতিক দলিল হিসাবে 'UNO' প্রতিষ্ঠার দুই দশক পূর্বেই চালু হয়েছিল। আমেরিকা-সহ পৃথিবীর ৩৫টি দেশ ঐ প্যাক্টে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনশনের ভিত্তিই ছিল নিকোলাসের সেই সাংস্কৃতিক চুক্তি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময়ে নিকোলাসকে তাঁদের বিপুল শিল্প-সংগ্রহ, প্রাসাদোপম গৃহ—সবকিছু ছেড়ে সপরিবারে ইউরোপে আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি তেলরং এবং পরে টেম্পারায় প্রায় ৭০০০ ছবি এঁকেছেন। ইংল্যান্ডে ১৯২০ সালের তাঁর চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে থিওসফিস্টদের অবাস্তব, অলৌকিক ভাবনার রেশ নিকোলাসের চিত্রে ও লেখায় প্রচ্ছন্ন ছিল আজীবন। কিন্তু

এসবের মধ্যেও স্বামীজীর 'রাজযোগ'-এর সঙ্গে পরিচিত নিকোলাস তাঁর চিত্ররচনার বিষয় করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে। ঐ চিত্রটি—'Dedicated to blessed Bhagawan Sri Ramakrishna'—সযত্নে রাখা আছে বেলুড় মঠে। শিল্পীর উল্লেখযোগ্য চিত্র-সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে নিউ ইয়র্কের রোয়েরিখ মিউজিয়াম-সহ আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে এবং ভারতবর্ষে এলাহাবাদ, বারাণসী, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই ও কুলু উপত্যকায় নাগ্গারের 'Himalayan Research Institute'-এ। তাঁর সুবৃহৎ মুরাল-চিত্রের এক অনন্য নিদর্শন আজও মানুষকে আকর্ষণ করে মস্কোর কাজান রেলওয়ে অঙ্গনে। তাঁর সৃষ্ট আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতীক 'Banner of Peace' দুর্গম সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বতচূড়ায় আজও দৃশ্যমান। মঞ্চ অলঙ্করণে তাঁর অসামান্য কাজ দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেছেন ষ্ট্রাগনার, বোরোদিন, মরিশ মেতারলিঙ্ক প্রমুখের নাটক দেখতে গিয়ে। "Art is one—indivisible." এ সত্য বোঝাতে তিনি শিকাগো, নিউ ইয়র্ক ও ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিল্পীদের একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং চিত্র-সংরক্ষণালয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় স্নাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ তাঁর জীবনের শেষ দুই দশক ঈশ্বরের আনন্দঘন সান্নিধ্যে, হিমালয়-কোলে কাটিয়ে হয়েছিলেন 'the greatest Painter of the Himalyas'। তিনি মানবকল্যাণব্রতী হয়ে বলতে পেরেছিলেন, শিল্পকলা সৌন্দর্যসৃষ্টি করে—যা আমাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে শেখায়, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তা ঈশ্বরের আরাধনাও। উল্লেখ্য, ১৯২১-এ মেক্সিকোর 'সান্তা ফে'তে তাঁর 'Cor Arden' [Flaming Heart] চক্রের দুই তরুণ শিল্পী এমিল বিস্ট্রাম (১৮৯৫-১৯৭৬) ও রেমণ্ড জনসন (১৮৯১-১৯৮২) পরবর্তী কালে স্পিরিচুয়াল শিল্পী হয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।



জেমস হুইটনি-র 'যন্ত্র', ১৯৬৫

কবি ও লেখক নিকোলাস ২৭টি গ্রন্থের রচয়িতা। জন্মে রুশ এই বিশ্বপথিক শিল্পীর অকৃত্রিম ভারতপ্রীতি তাঁর লেখাতেই পাই ঃ "O Bharat, all beautiful, let me send thee my heart-felt admiration for all the greatness and inspiration which fill thy ancient cities, thy meadows, and thy himalayas."

দুই বিশ্বযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপ ও রাশিয়া থেকে অন্যান্য পেশার মানুষদের মতো শিল্পীরাও অর্থোপার্জন এবং নির্বিঘ্ন জীবননির্বাহের আশায় আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। সে-কারণে শিল্পী মেলভিচ-সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে স্বামীজীর সাধনচিন্তায় অনুরণিত (তা যত তাৎক্ষণিকের হোক) রুশ ও আমেরিকান নিরবয়বী শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা করা দরকার।[৩৮] ঐ পর্যালোচনায় কিছুবা ইঙ্গিত মিলবে শিল্পী-পরম্পরায় সেই অনুরণনের হার্দিক আবেদন সম্পর্কে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেগবান মার্কিনী ভাবনার সঙ্গে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, উদ্বেগ মিলেমিশে সেদেশে শিল্পীদের অন্তর্মুখিনতাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিল। প্রভাবশালী মার্কিন শিল্পে পরম্পরাগত আদর্শের চেয়ে অনুসন্ধান-প্রবণতাই ছিল মুখ্য এবং স্বভাবত তাদের জীবনভাবনাও ছিল কিছুবা চঞ্চল এবং অগভীর।

■ ইভান ক্লুন (Ivan Kliun, 1873-1943)

জন্ম রুশ কৃষক পরিবারে। তাঁর সহজাত অঙ্কন-দক্ষতা ১৯০৮ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে স্ক্যানডিনেভীয় প্রতীক শিল্পীদের, বিশেষত প্রদর্শনীতে এডোয়ার্ড মুঙ্ক ও পাভেল কুজনেতসভের চিত্র দেখে দেখে পরিপক্ক হয়। ১৯১২ সালে শিল্পী মেলভিচের সঙ্গে তাঁর কিউবো-ফিউচারিস্টধর্মী ছবি আঁকার সূত্রপাত। সেসময়ে মেলভিচের সংস্পর্শে তিনি স্বামীজীর 'রাজযোগ' বিষয়ে অবশ্যই জেনেছিলেন। ভবিষ্যবাদীদের সঙ্গে থেকে তিনি কবি ক্রুচেনিখের সহযোগে লিখেছিলেন প্রতীকবাদী শিল্পকলা ও সাহিত্যের অবক্ষয়ের কথা 'Secret vices of the Academicians' গ্রন্থটিতে (১৯১৫)। মেলভিচ এবং ভ্লাদিমির তাতলিনের অনুপ্রেরণায় ১৯১৫-১৭ সময়কালে তাঁর 'objectless' চিত্ররচনা চলে।

■ আর্থার ডোভ (১৮৮০-১৯৪৬)

১৯০৩ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর্থার ডোভ পত্রিকার অলঙ্করণকর্মে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭-০৮ সালে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসে যান এবং সেখানে পল সেজান ও ফউবিজম চিত্র তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার অ্যালফ্রেড স্টিগলিজের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই যোগসূত্রে ১৯১০ সালে অ্যালফ্রেডের নিউ ইয়র্কস্থ ২৯১ নং গ্যালারির প্রদর্শনীতে শিল্পী আর্থার তাঁর ৬টি অসাধারণ বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রকৃতির ছবি রেখেছিলেন। দার্শনিক বার্গসনের গ্রন্থপাঠে প্রভাবিত হয়ে ১৯১১-১২ সালে তিনি এঁকেছিলেন 'Ten Commandments'-ভিত্তিক প্যাস্টেল চিত্র, যা—তাঁর কথায়—ছিল অর্গানিক বিমূর্ততা। ১৯২০ সালের আঁকা

দৃশ্যচিত্রগুলিকে তিনি বলেছেন 'Gods Eye Format'। ১৯২৩-২৪ সালে শিল্পী আর্থার স্টিগলিজের বেদান্তবাদী আত্মীয় ডেভিডসন-দম্পতির মাধ্যমে স্বামী নিখিলানন্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং প্রাচ্য দর্শন তাঁকে কাছে টেনে নেয়। ফলে তাঁর চিত্রের বিমূর্ততা এক পারমার্থিক রূপ পায়। এক্ষেত্রে স্বামীজীর অনুবর্তীর সঙ্গে যোগসূত্রে আর্থারের ভাবনাকে অনায়াসে স্বামীজীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। তাঁর ১৯২৫-৪০ সময়কালের প্রায় সব কাজই ছিল বেদান্ত-প্রভাবিত। চিত্ররচনা তখন তাঁর কাছে ছিল—"to express the essence beneath the physical exterior of things."

■ মরিশ গ্রেভস (Morris (Cole) Graves)

জন্ম—২৮ আগস্ট ১৯১০, আমেরিকার অরিগনে। প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানী শিল্পী মরিশ তাঁর স্বভাব-অনুসন্ধিৎসায় ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালে জাপান, হংকং, ফিলিপিন্স-সহ প্রাচ্যের বৌদ্ধধর্মী দেশ পরিক্রমায় বৌদ্ধ ধ্যানধারণা, বিশেষ করে 'Zen' তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। প্রসঙ্গত, ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় 'জেন' (যা বাংলায় 'ধ্যান') বৌদ্ধতত্ত্বের কথা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন জাপানের প্রতিনিধি সোয়েন শাকু, যদিও ঐ তত্ত্ব প্রচার শুরু হয় ১৯২০ সালে। ইউরোপ ও আমেরিকায় 'Zen'-এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল ১৯৫০-পরবর্তী সময়ে অ্যালেন গিনবার্গ প্রমুখ 'বীট' কবিদের মাধ্যমে। ১৯৩৬ সালে তাঁর তেলরঙের মিস্টিকাল ছবি প্রথম দেখানো হয় সিয়াটেল আর্ট মিউজিয়াম, ওয়াশিংটনে। ১৯৩৭ সালে স্বামীজী সাক্ষাৎধন্য ফাদার ডিভাইনের নিউ ইয়র্কস্থ আশ্রমে পাঁচ মাস থাকাকালীন জেন-তাড়িত শিল্পী মরিশের রচনায় গভীর আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধির ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং ঐ বছরেই তাঁর তেলরং ছেড়ে টেম্পারায় আঁকার সূত্রপাত। ১৯৩৮-৩৯ সালের 'Purification Series'-এর চিত্রাবলী এবং ১৯৪১-এ 'Inner Eye Series' নিঃসন্দেহে বেদান্তচিন্তা-উদ্গত তাঁর বিবেক-জাগরণ। আনন্দ কুমারস্বামীও তাঁকে ঐ চিন্তায় প্রভাবিত করে থাকবেন। ১৯৪৭ সালে হনলুলু অ্যাকাডেমি অফ আর্টে প্রাচ্য শিল্পকলার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। নির্জনতাপ্রেমী শিল্পী মরিশের আমেরিকা ছেড়ে ডাবলিনে বসবাসের মুখ্য কারণ ছিল—"just to escape the onrush and outrage of machine noise." কিন্তু ১৯৬৪ সালে স্থায়িভাবে দেশে ফিরে তিনি NASA-র যান্ত্রিক শিল্পকর্মে অংশ নেন।

প্রসঙ্গানুযায়ী আশ্চর্যের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সঙ্গীত-সম্পৃক্ত বিমূর্ত ধারায় (রঙিন ফিল্ম মাধ্যমের) আরেক চিত্রশিল্পী জেমস হুইটনির কথা, যিনি ১৯৩৯-৪০-এ হলিউডে স্বামী প্রভবানন্দের অধীনে যোগানুশীলন করেছিলেন তাঁর তৎকালীন অত্যাধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসাবে। এই ভাবেই হয়তো আজও ...শ্বের সৃজনশীল শিল্পীহৃদয়ে ভাবনা বিলীন হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিপ্লবপূর্ব আধুনিক রুশ এবং ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও তাঁদের চিত্ররচনায় স্বামীজীর সমৃদ্ধ যোগ-ভাবনার প্রভাব সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিলেন। 'Futurist, Dadaist, Suprematist' চিত্রীদের 'dehumanist art'-কে নিয়ে তাঁর বলতে বাঁধেনি যে, ঐজাতীয় "যন্ত্র-প্রভাবান্বিত গাজেট মার্কা শিল্পরূপের মধ্যে মানবীয় চেতনার বিশেষ কোন স্থান ছিল না।" অবশ্য তিনি তাঁর সুগভীর শিল্পচিন্তায় ও সংবেদনে তাঁদের অবয়বহীন জ্যামিতিক চিত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনা ও সংস্কারের কথা স্বীকার করেছেন। সেকারণে মেলভিচদের সৃষ্টিতে নেহাত জ্যামিতি-সর্বস্বতা তিনি দেখেননি। তিনি জানতেন, ধ্যান-ধারণার সাহায্যে অভ্যাসগত বন্ধন থেকে মন মুক্তি পায়। নিরবয়ব চিত্রের কথায় তিনি বলেছেন ঃ "ঐ শিল্পীরা প্রচার করলেন যে, কোন বিষয়কে গৌরবমণ্ডিত করা শিল্পীর কাজ নয়। শুদ্ধ আবেগ একমাত্র আধেয় বস্তু।"[৩৯] ধ্যানধারণা-প্রসূত সংস্কারমুক্ত উপলব্ধি শিল্পীচিত্তকে সঙ্কুচিত হতে দেয় না। বাস্তবে সেসময়ে অন্তরাত্মার খোঁজে চতুর্থ মাত্রা নিয়ে রুশ অগ্রণী শিল্পীরা যত ভেবেছেন, স্বামীজীর 'রাজযোগ' ততই যেন তাঁদের হৃদয়-তটকে প্লাবিত করেছিল উত্তাল সমুদ্রোচ্ছ্বাসে। ❑

তথ্যসূত্র

১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, ১ম সং, পৃঃ ৬৪-১৩৪

২ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং দ্রষ্টব্য

৩ p. 6. "Idian religious thought, filtered through the Theosophical writings of Helena Blavatsky, Rudolf Seiner and Annie Besant, inspired Kandinsky's images of colour music." --এই উদ্ধৃতির 'upside down' প্রসঙ্গে মনে আসে বিশ শতকের প্রথম দশকে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেন ঃ "It is strange, indeed, that his work is better known, more thought of in England and by English artists, than in India and by Indians." (The Present State of Indian Art, The Modern Review, Vol. II, No. 2, August 1907, Footnote, p.10)

৪ ১৮৯০-১৯৮৫ সময়পর্বের ২৩০টি বাছাই বিমূর্ত শিল্পকলার বর্ষব্যাপি এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অন্তর্গত রবার্ট অ্যাণ্ডারসন বিল্ডিং-এ। ছবিগুলিকে তাদের বিষয় ও কালক্রমে যে পাঁচটি বিভাগে দেখানো হয়, তা হলো—Symbolism, The Generation of the Abstract Pioneer in Europe, The Generation of the Abstract Pioneers in America, Abstract Paintings in Europe, America 1939-1970, Do 1970-85. ঐ প্রদর্শনী পরে দেখানো হয় Museum of Contemporary Art, Chicago এবং Gemeentemuseum, Hague-এ।

৪ক The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985, p. 186

৫ 'Spiritual', p. 167. ভবিষ্যবাদী রুশ কবি আলেকজাণ্ডার ব্লকের 'Otvet' (The Response) থেকে উদ্ধৃত।

৫ক লিটম্যান ও রিবাকোভ সম্পাদিত প্রবন্ধ-সঙ্কলন, 'Hinduism, Tradition and Contemporaneity'-এর অন্তর্গত O.V. Mezentseva-এর 'Hindu Studies in the USSR', পৃঃ ২৮২-২৮৫ (ইংরেজি সংস্করণ, ভোস্তক, কলকাতা, ১৯৮৯)

৬ 'Spritual', Occult Literature in Rusia—Edward Kasinee, Boris Kerdimum, p.362

৭ Ibid., pp. 361, 365

৮ ডঃ দানিয়েলচুক 'রাজযোগ' অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন 'Tolstoy and Vivekananda' গ্রন্থে (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৭, পৃঃ ৩২)। তাঁর উল্লেখ অনুবাদের শিরোনাম 'Filosofiya Yoga এবং অনুবাদক Ya. Popov। ঐ পুস্তিকা থেকে ১৯১৪-এ 'সোসনিতসা', সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত স্বামী অভেদানন্দের মুখবন্ধ-সহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের রুশ অনুবাদ 'Provozvestie Ramakrishny' ও মস্কো থেকে ১৯১২-এ প্রকাশিত স্বামীজীর 'Prakticheskaya Vedanta' [Practical Vedanta] বই দুটির কথা জানা যায়।

৯ 'Spiritual', p. 198, Footnote 7, 8 & p. 363

১০ 'Tolstoy and Vivekananda' [Reprint, 1987], pp. 3-4

১১ 'Spiritual', p. 224. 'Current Literature'-এর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত মাইকেল উইলিয়ামসের 'The New Spiritual Emerging' নিবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী লিণ্ডা হেণ্ডারসন লিখেছেন: "The article—being reviewd had cited the contribution of William James and suggested to the reviewer the lineage of the new mystical/ spiritual orientation."

১২ হর্বার্ট রিডের 'Art Now', Faber, Paper Covered Edition, 1960, p. 78

১৩ The Complete Works Of Swami Vivekananda, Vol. I, Mayavati Memorial Edition, 1989, p. 72

১৪ আর্ট ও আহিতাগ্নি—২য় ভাগ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২১

১৫ ঐ, পৃঃ ৫৭-৫৮

১৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮

১৭ ঐ, পৃঃ ৩৯ (পাদটীকা)

১৮ 'Sources of Wisdom'-এর অন্তর্গত 'Understanding the Art of India', Ministry of Cultural Affairs, Sri Lanka, 1981. pp. 150-151. নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের 'Parnassus' (Vol. VI, 1934) পত্রিকায়।

১৯ Complete Works, Vol. V, pp. 475-476 (শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুবাদ)

২০ রাজযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, মাঘ ১৪০৭, পৃঃ ৫-৬

২১ ঐ, পৃঃ ৪

২২ আর্ট ও আহিতাগ্নি, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৮

২৩ 'Spiritual', 'Hidden meanings in abstract art'—Maurice Tuckman, p. 34. রুশশিল্পী ক্যানদিনস্কি (১৮৬৬-১৯৬৬) ব্লাভাৎস্কি, রুডল্ফ স্তেনার, বেশান্ত প্রমুখ থিয়সফিস্টদের রচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'Concerning the Spiritual in Art' [1910] এখনো পর্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের কাছে সমানভাবে আদৃত।

২৪ 'The Fourth Dimension: an Essay in the Study of immeasurable. ১৯১০-এ প্রকাশের পরই বইটি রুশ শিল্পী, কলাবিদদের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। ('Spiritual', p. 221,

২৫ গ্রিক-আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত মিষ্টিক, দার্শনিক, পরিব্রাজক জর্জ ই. গোরজেফের (J. E. Gurdjieff, ১৮৭২-১৯৪৯) দর্শনে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-নির্বাহ ঘুমিয়ে থাকার মতোই অকিঞ্চিৎকর। তিনি বলতেন: "Transcendance of the sleeping state required work—when it was achieved, an individual could reach remarkable levels of vitality and awarness" 'Tertium Organum: Kliunch k zagadkam mira' (Tertium Organum, the Third Canon of Thought: The key to the Enigmas of the World—Saint Petersberg, Trud, 1911) গ্রন্থে আউস্পেনস্কি মানস-উৎকর্ষের অনুভবকে ব্যক্ত করেছেন।

২৬ আউস্পেনস্কির অসীমতার কল্পনা ছিল এরকম: "The sense of the infinite is the first and most terrible trial before initiation. Nothing exists. A little miserable soul feels itself suspended in an infinite void. Void disappears There is only infinity." ('Spiritual', p. 220)

২৭ Ibid., p. 186

২৮ আর্ট ও আহিতাগ্নি, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮-১৯

২৯ সমকালীন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭-৭০

৩০ ঐ, পৃঃ ১১২, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুবাদ

৩০ক রাজযোগ, পৃঃ ৭-৮ অবতরণিকা দ্রষ্টব্য

৩১ 'Spiritual', p. 188 শ্রীমতী ডগলাস উক্ত উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে কবি হুইটম্যানের অদ্বৈতভাবনার মিলের কথা বলেছেন নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক ডি. কে. চারির 'Whiteman and the Light of Vedantic Mysticism', [1964] গ্রন্থোল্লেখে ('Spiritual', footnote 29, p. 199)

৩২ ঐ, পৃঃ ১৯০। একই উপলব্ধিতে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শেষবেলাকার শিষ্য শিল্পী চৈতনাদেব চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "Artists would have to remember that art is a means of realisation of the ultimate Self." ['Art from the Point of View of the Artist'—Journal of the Society of Oriental Art (JISOA)]

৩৩ 'Spiritual', p. 191

৩৪ উত্তরমীমাংসা—শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ১৩৮৯, পৃঃ ৭০

৩৫ 'Beyond Reason', 'Spiritual', p. 186

৩৬ Ibid., p. 178

৩৭ শিল্পী রোয়েরিখ সম্পর্কে সংবাদ মিলেছে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (১ম খণ্ড), 'রোয়েরিখ জন্মশতবর্ষের প্রদর্শনী ক্যাটলগ' (১৯৭৬) এবং ভি. এম. ভোলদার্স্কির 'ট্রেটিয়াকভ আর্ট গ্যালারী'র গাইড-বই (মস্কো, ১৯৭৭) থেকে।

৩৮ 'Spiritual', 'Chronologies, Artists and the Spiritual'—Judi Freeman, pp. 393-419

৩৯ 'শিল্পজিজ্ঞাসা', 'এক্ষণ' ক্রোড়পত্র, শারদীয়া ১৩৮৩, পৃঃ ১৬-২০

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব! একটু ফিরে দেখা

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় কিছু আনুষ্ঠানিক রীতি পালিত হয়—এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গা'—আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে এই পূজা অতীতে কিভাবে উদ্‌যাপিত হতো?—জিজ্ঞাসুর এই অনুসন্ধিৎসা মেটাতে আমরা সাহায্য নেব কয়েকটি পুরনো **ডায়েরির**।

৫৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে 'মায়ের বাড়ি'তে এই ডায়েরি লেখা চালু হয় এবং চলে প্রায় ৩০ বছর ধরে। ডায়েরিগুলিতে বিবৃত হয়েছে উদ্বোধনের তথা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির বহু কর্মকাণ্ডের কথা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত অনেক তথ্য এবং বিবিধ বিষয়।

এবার আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক।

পুণ্য মহালয়ার দিন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ দিয়ে 'মায়ের বাড়ি'তে শুরু হতো দুর্গাপূজার আয়োজন। ডায়েরির ভাষায় (বানান সর্বত্র অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)—

মহালয়া : *"সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়—স্বামী অদ্বয়ানন্দজী পাঠ করেন। স্বামী সুতীর্থানন্দজী মায়ের পূজা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও পূজনীয় শরৎ মহারাজজীকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হয়। পূজা সাধারণভাবেই করা হয়। মায়ের বিশেষ ভোগরাগাদি হয়। খিচুড়ী, পাঁপড় ভাজা, আলুর দম, মাছের ঝাল, পায়েস, দৈ, মিষ্টি ইত্যাদি হয়েছিল। ৫ জন মহিলা ও ১৫ জন ভক্ত, ৫ জন সন্ন্যাসী দুপুরে প্রসাদ পান। বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীঠাকুর, মার বাউলসুরে উদ্দাম সংগীতাদি হয়। তাহাদের দলকে চা, সিংগারা, কচুরী ও দরবেশ ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।..." (৩০/৯/১৯৫১)*

আরেক বছর মহালয়ার বিবরণ—

"শ্রীশ্রীমাকে নূতন কাপড় চাদর পরান হইল। ফুল মালা দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষ ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। খিচুড়ী, পাঁপড় ভাজা, আলুর দম, মাছের ঝোল, চাটনী, পায়েস। প্রসাদ পাইলেন ৭০ জন ভক্ত নরনারী।..." (৩/১০/১৯৫৬)

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন, ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হতো।

আবার একটু উঁকি দেওয়া যাক ডায়েরির পাতায়—

মহাসপ্তমী : *"আজ সকালে ঠাকুর ও মাকে মালা পরান হয়, বেলার মা মালা আনিয়াছিলেন। প্রেমরূপানন্দ স্বামী শরৎ মহারাজের ঘরে চণ্ডীপাঠ করেন। অষ্টমী ও নবমীতেও পাঠ করিবেন। দুপুরে ঠাকুরের ভোগে খিচুড়ী, পাঁপড় ভাজা, দই, পায়েস প্রভৃতি দেওয়া হয়। প্রায় ৩০/৪০ ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিল।..." (১৫/১০/১৯৫৩)*

"শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তমী। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভোগ হইয়াছিল। সাদা ভাত, আলুর দম, শুক্তো, ডাল, মাছ, চাটনী, দৈ, পায়েস ইত্যাদি। প্রসাদ পান ১০০ ভক্ত নরনারী। স্বামী জীবানন্দ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করেন।..." (১১/১০/১৯৫৬)

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৯ সালের মহাসপ্তমীর বিবরণ লক্ষণীয়—

"আজ দুর্গাপূজা আরম্ভ হইল। বাইরের কেউ প্রসাদ পান নাই। রেশনের কড়াকড়ির জন্য এইবার এইরকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে।..." (২৮/৯/১৯৪৯)

মহাষ্টমী : *"শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গল আরাত্রিক, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, বিশেষ ভোগ, আরাত্রিক হয়। পূজক স্বামী সুতীর্থানন্দ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠক স্বামী অদ্বয়ানন্দ। বেলা ১॥৹ টার মধ্যে সব হইয়া যায়। ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন, তার মধ্যে ১২৫ জন স্ত্রীভক্ত ছিলেন। হাতে হাতে ২৫০ জনকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৫/৬ জন ভক্তেরা বাড়ীতে প্রসাদ লইয়া যান। বৈকাল ৩টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলে। সন্ধিপূজা ৪-১ মিনিট গতে ৪-৪৯ মধ্যে পূজা, বলিদান সমাপ্ত হয়। পূজক স্বামী সুতীর্থানন্দ, রামকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী বলিদান করে।... রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ একটু দেরীতে উঠে। রাত্রেও ৫/৭ জন ভক্ত প্রসাদ পান। তিনজনে সন্ধ্যারাত্রিক করেন—প্রেমরূপানন্দ, অদ্বয়ানন্দ ও সুতীর্থানন্দ।..." (৮/১০/১৯৫১)*

মহানবমী : *"সকালে স্বামী প্রেমরূপানন্দ চণ্ডীপাঠ করেন। ঠাকুরের পূজা সাধারণভাবে হয়। ৭০/৮০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। আজ সকালে মঙ্গলারতি হয়। কার্তিক মাসে মঙ্গলারতি করা হয়। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি বলিয়া আজ আরম্ভ হয়।" (১৭/১০/১৯৫৩)*

৺বিজয়া দশমী : *"শ্রীশ্রীমায়ের সাধারণভাবে পূজা ও ভোগরাগাদি হয়। সকালে জলখাবারের সময় শ্রীশ্রীমাকে দইকরমা দেওয়া হয়।...*

"৺বিজয়ার মিষ্টি : দশ সের বাসন, ২॥ সবেদা দিয়া দরবেশ তৈয়ারী হয় আর ৩ সের ময়দা দিয়া গজা তৈয়ার হয়। বৈকালে ৪ ভরি সিদ্ধির সরবৎ হয়। আরাত্রিকের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমাকে সব নিবেদন করা হয় এবং আরাত্রিকের পরেই সব ভক্তদের সিদ্ধি, দরবেশ ও গজা প্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত এইরূপ চলে, তারপরে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ হয়।..." (১০/১০/১৯৫১)

ডায়েরির এই 'ঝাঁকি দর্শনে' এটাই প্রতিভাত হয়—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আমাদের জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীরই বিশেষ পূজাতে কাঙ্ক্ষিত রূপ পায়। শ্রীশ্রীমা বাহির এবং অন্তরের রূপ ঢেকে রেখেছিলেন বহুদিন। কিন্তু আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পরে তিনি যেন আজ স্বেচ্ছায় অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে অগণিত তৃষ্ণার্ত মানুষ এখন তাঁকে আকুলভাবে চাইছে এবং মাতৃসুধা আহরণ করছে। মাতৃগরিমা বিকাশের এই পুণ্যক্ষণে আমরাও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করি এবং তাঁর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

গ্রন্থনা : রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য



এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

'অন্ধজনে দেহ আলো'

নিজের বিন্দুমাত্র স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেও কেবল একটু ভালবাসার, একটু প্রেমের অনুভব থাকলেই মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে। এই মহান কাজে সে ব্রতী হতে পারে শুধু ইচ্ছা থাকলেই। আর সে এমন একটা কাজ—যে-কাজ টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট অন্য কোন কিছু দিয়েই করা যায় না।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?"—কবির এই ভাবনাকে কিছুটা বদলে দেওয়া যেতে পারে, যদি মানুষ তার চোখদুটি মরণোত্তর দান করে যায়। ঐ মৃত মানুষের চোখদুটি দিয়ে অন্ধ মানুষ ফিরে পাবে তার দৃষ্টিশক্তি, উপভোগ করবে জগতের রূপ। মৃত মানুষটি বেঁচে থাকবে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া অন্ধ মানুষের মধ্যে।

ভারতবর্ষে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দৃষ্টিহীন। এর মধ্যে শুধু কর্ণিয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে ৩০ লক্ষ। যে-শিশু জাতির ভবিষ্যৎ, তারাই এই অন্ধত্ব রোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্ধত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার মরণোত্তর চক্ষুদান গ্রহণ করে তা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্ন আই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। মৃত মানুষের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টি ফিরে পায় দৃষ্টিহীন মানুষ। এই মহান কর্মে নিবেদিত হওয়া আমাদের গর্বের বিষয়। গণচেতনার উদ্দেশ্যে এই কাজে আমদের ব্রতী হতে হবে। শুধু একটু সজাগ থাকতে হবে, যাতে কারো মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আই ব্যাঙ্কের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে পারি। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের এইটুকু সহযোগিতা পেলেই যে-চোখদুটি আমরা পুড়িয়ে বা কবর দিয়ে নষ্ট করতাম, তাই হয়ে উঠবে অন্ধ মানুষের আলোর দিশারি।

জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উচিত এই চক্ষুদানের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়া এবং মানুষকে মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য উৎসাহ দেওয়া। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য—

(১) প্রয়োজনের তুলনায় দাতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। (২) এই চোখ স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যেকারোর হতে পারে। (৩) মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অন্তত ৬ ঘণ্টার মধ্যেই চোখ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। (৪) চোখদুটি তুলে নেওয়ার পর দেহে কোনরকম বিকৃতি দেখা দেয় না। (৫) চোখে চশমা থাকলে তা চক্ষুদানের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কর্ণিয়া টিস্যু ঠিক থাকলে যেকোন চোখই ব্যবহারযোগ্য থাকে। (৬) এই ধরনের চোখ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সাফল্য ৮০ শতাংশের ক্ষেত্রে প্রথমবারেই আসে, ১৫ শতাংশ আংশিক সফল হয়। মাত্র ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সফল হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, প্রথমবারে প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। (৭) চক্ষুদানের বিষয়ে পৃথিবীর সবকটি প্রধান ধর্মের নেতাই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। (৮) এই কাজের জন্য আই ব্যাঙ্ক কোন টাকাপয়সা নেন না এবং তাঁরা বিনা পয়সায় চিকিৎসকদের কাছে চোখ পৌঁছে দেন। গ্রহীতাকেও এজন্য কোন অর্থব্যয় করতে হয় না। (৯) কোন ব্যক্তি মরণোত্তর চক্ষুদান করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলে দুজন সাক্ষীর দস্তখত-সহ একটি চক্ষুদানের অঙ্গীকারপত্র (দানপত্র) যেকোন আই ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে। (১০) মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ির কোন ব্যক্তিকে আই ব্যাঙ্কে খবরটা পৌঁছে দিতে হয়।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" প্রেমই শেষ কথা, ভালবাসাই শেষ কথা। সুতরাং সকলকে অন্তরের তাগিদে ভালবাসতে হবে, একে অন্যের কাজে লাগতে হবে, যেকোনভাবেই হোক অন্যের প্রয়োজনে কাজে লাগাই মানুষের কর্তব্য। ভালবাসার এই সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের ব্রতী হতে হবে। শারদীয়ার পুণ্যলগ্নে মানবহিতে ব্রতী 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে সকলের মধ্যে এই শুভচেতনা জাগ্রত হোক—জগজ্জননীর কাছে এই প্রার্থনা।

পুলককুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন ডিভিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড

পুরনো দিনের পুরনো কথা

আমি 'উদ্বোধন'-এর পাঠক। এই পত্রিকা সম্বন্ধে আমার নতুন কিছু বলার নেই। বহু পণ্ডিত, মনীষী ও প্রথিতযশা মানুষের প্রশংসিত এই পত্রিকা। গত মাঘ মাসে (১৪১০) শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংখ্যায় ডায়েরির পুরনো পাতা থেকে ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৬ এবং ১৯৬১ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের কিছু বিবরণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে ছাপানো হয়েছে। আমার বয়স এখন ৬০। আমি ঐসময়ে মায়ের বাড়ির পাশেই থাকতাম এবং অতি ছোট বয়স থেকেই বাবা-মায়ের নির্দেশে উদ্বোধনে প্রায় প্রতিদিনই যেতাম—বিশেষ করে সন্ধ্যারতির সময়। আমার বাবা ও মা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত ছিলেন।

১৯৫০-এর উত্তরকালে উদ্বোধনে অনুষ্ঠিত অনেক ছোট ছোট ঘটনা এই মুহূর্তে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, যদিও অবিন্যস্তভাবেই।

ডায়েরির পাতায় লক্ষ্য করলাম, ২ জানুয়ারি ১৯৪৮ এর বিবরণে (পৃঃ ১৭১) দেওয়া রয়েছে—"স্বামী নির্বেদানন্দ, অশেষানন্দ এবং কয়েকজন ব্রহ্মচারী (কলিকাতা ছাত্রাবাস), স্বামী পবিত্রানন্দ (অদ্বৈত আশ্রম) এবং আরো কয়েকজন সাধু আসিয়াছিলেন।" যতদূর মনে হয়, অশেষানন্দ নামটি 'স্বামী সন্তোষানন্দ' হবে। ভক্তমহলে তিনি 'অশেষ মহারাজ' নামে সুপরিচিত ছিলেন বলেই সম্ভবত এই বিভ্রান্তি ঘটেছে।

২২ ডিসেম্বর তারিখের বিবরণে লেখা আছেঃ "রাত্রে স্বামী মুনীষানন্দ, কান্ত মহারাজ, নীলরতনবাবু, রামু, বীরেনবাবু ও ব্রহ্মচারী (?) ছিলেন।" এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তারিখের বিবরণে লেখা আছেঃ "রাত্রে রামু, নির্মল ও অপূর্ব থাকে।"

উপরি উক্ত দুটি দিনের বিবরণেই 'রামু' নামটি উল্লিখিত। রামু হচ্ছেন রামকৃষ্ণ ব্যানার্জি। তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত, অবিবাহিত এক ভক্ত। তিনি আমার জ্যাঠতুতো দাদা। উল্লিখিত বর্ষগুলির অনেকটা সময়ই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। দশ বছর আগে (১৯৯৪) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজে সেই দিনগুলিতে ফিরে গেছি! কত সুখস্মৃতি, আনন্দময় স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করছে! স্বামী অদ্বয়ানন্দ (অর্ধেন্দু মহারাজ), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (বিমল মহারাজ), স্বামী প্রেমরূপানন্দ (হরিপদ মহারাজ), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (নন্দী মহারাজ), প্রবীর মহারাজ—এঁদের কত সান্নিধ্য পেয়েছি! সন্ধ্যারতির পর কোন মহারাজের ঘরে প্রণাম করার অছিলায় যেতাম চকোলেটের লোভে। কোন কোন মহারাজ আমাদের মতো ছোটদের একটা-দুটো করে চকোলেট দিতেন, যার আস্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভালবাসার এইসব টুকরো স্মৃতিগুলি আজও বেশ উপভোগ করছি আর নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে এই স্মরণে যে, ছেলেবেলার খানিকটা সময় মায়ের বাড়িতে কাটাতে পেরেছি এবং পূজনীয় সন্ন্যাসীদের স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরনো দিনের ঐ বর্ণনায় উল্লিখিত পূজনীয় সন্ন্যাসীদের অনেকেই আজ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে চলে গিয়েছেন। ছেলেবেলায় তাঁদের সান্নিধ্যে যখন থাকতাম, তখন তাঁরা দয়া করে আমাদের বয়সোচিত সামান্য একটু কাজ করতে দিলে কী আনন্দ এবং গর্ব হতো তা বলে বোঝাতে পারব না। বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের উৎসবের আগের দিন আমরা ছোটরা সকলে মিলে বিকালে প্রচুর বড় বড় ভাঁড় ধুয়ে পরিষ্কার করে পরের পর সাজিয়ে রাখতাম, কারণ পরদিন ঐ ভাঁড়ে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

এখন লিখতে বসে ছোটবেলার একটি দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতিও ভেসে আসছে। একদিন খুব সকালে উদ্বোধনে গিয়েছি। তখন সকাল ৭টা-সাড়ে ৭টা। আমাকে কোন একজন ভক্ত কয়েকজন মহারাজের উপস্থিতিতে কাছাকাছি একটি দোকান থেকে গরম জিলিপি ও সিঙাড়া আনতে বলেছিলেন, যেটি ঠাকুরকে নিবেদন করা হবে। সেটি যখন আনছি, রাস্তার ওপর থেকে একটা চিল ছোঁ মেরে একটা সিঙাড়া নিয়ে চলে গেল আর ভয়ে আমার হাত থেকে পুরো শালপাতার চাঙাড়ি পড়ে গেল। সেই দুঃখ আমি আজও ভুলতে পারি না যে, আমার বয়ে আনা জিলিপি-সিঙাড়া ঠাকুরকে নিবেদন করা গেল না।

আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) উপস্থিতি। উদ্বোধন ও সন্নিহিত অঞ্চলের অনেকের আপদে-বিপদে সত্যেন মহারাজকে দেখেছি পরিত্রাতার ভূমিকা নিতে। শোকে-তাপে জর্জরিত অশান্ত মনকে শান্ত করতে সত্যেন মহারাজ ছিলেন অনন্য। আমি এইরকম বহু ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।

বলরামকৃষ্ণ ব্যানার্জি
অশোকগড়, কলকাতা-৭০০ ০৩৫

পত্রলেখকের ধারণা অনুযায়ী 'স্বামী সন্তোষানন্দ' নামটি ঠিক নয়। কারণ, ডায়েরিতে 'অশেষ মহারাজ' নয়, 'অশেষানন্দ' নামটিরই উল্লেখ আছে।

সম্পাদক

প্রসঙ্গ মহাভারতের সময়কাল

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে কালীশঙ্কর ভট্টাচার্যের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা—যদিও একটু বিলম্বে।

পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর. এন. আয়েঙ্গার—যিনি একজন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সঙ্গে যুক্ত—প্রমাণ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ১৪৭৮ অথবা তার একবছর আগে বা পরে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়েছিল। মহাকাব্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তিনটি সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে [এর মধ্যে একটি জার্মান সফ্টওয়্যার যেটি ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যবেক্ষণের কাজে নাসা (NASA)-তে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়] বিচার করে ঐ সময়টিকে নির্ভুল বলে সিদ্ধান্তে আসেন।

তিনটি সূর্যগ্রহণ এবং একটি চন্দ্রগ্রহণ, যার আগে বা পরে একই মাসে দুটি সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল (যার বর্ণনা সভাপর্ব, ভীষ্মপর্ব এবং মুষল পর্বে পাওয়া যায়), ডাঃ আয়েঙ্গারকে এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যেই মহাভারতের কাল বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও নির্ভুল তারিখ কিছু পাওয়া যায় না। এই সময়কালের মধ্যে ডাঃ আয়েঙ্গার ১২টি সম্ভাব্য তারিখ বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৭৮ অব্দটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল হিসাবে সবচেয়ে বেশি মিলে যায়। পূর্বেকার বিচার অনুযায়ী ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, শনি গ্রহ এবং রোহিনী নক্ষত্র একই স্থানে এবং তার খুবই কাছে বিশাখা নক্ষত্রের অবস্থান। মহাভারতের মতো বিশাল মহাকাব্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের বর্ণনা মিলেমিশে ওলটপালট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ধাঁধার সবকটি নির্ভুল উত্তর একসঙ্গে বিচার করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৪৭৮ অব্দটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাব্য কাল।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স' পত্রিকাটিতে এবং ব্যাঙ্গালোরের সর্বাধিক বিক্রিত পত্রিকা 'ডেকান হেরাল্ড'-এ (October 21, 2003 দ্রঃ) ডাঃ আয়েঙ্গারের এই পর্যালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে।

অমলেন্দুনারায়ণ দে
অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, সিমেন্স ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ

ব্রজভূমে ব্রজরাজ

অরুণপ্রকাশ ঘোষ*

শিশিরভেজা ঘাসে তখনো অযুত হীরকবিন্দু। শিউলির সুমিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরপুর। পাখির কলতানে মুখর শান্ত প্রকৃতি। প্রভাতের কোমল আলোকস্নাত পৃথিবী। দীর্ঘায়ু বংশের দুর্গাদালানে হাজারো পক্ষীকুলের উচ্ছলতা। এরই মধ্যে ঢাক ও সানাইয়ের আওয়াজ। দুর্গাপূজা হচ্ছে বাড়ির সন্নিকটে ঘোষবংশের পাঁচ খিলানযুক্ত সুউচ্চ দুর্গাদালানে। দেবদুর্লভকান্তি বালক রাখাল নতুন পোশাকে পিতা আনন্দমোহনের সঙ্গে বাড়ি থেকে দুর্গাদালানে যাচ্ছে। সপ্তমীপূজার মহাস্নান ও অন্যান্য পূজা শুরু হবে। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী গৃহকর্তা হাজির থাকেন দালানে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন, তাঁর ডানদিকে তন্ত্রধারক। পুরোহিতের ঠিক পিছনে ডানদিকের থামের গায়ে গৃহকর্তা জমিদার আনন্দমোহন, অন্যপাশের থামের গায়ে বালক রাখাল—নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, ঝাঁঝ, ঘড়ি-ঘণ্টা ও শাঁখের আওয়াজ কিছুই হয়তো তার কানে যাচ্ছে না।

বেলা বাড়ে, সকালের পূজা শেষ হয়। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবী রাখালকে নিয়ে ঘরে ফেরেন। তারপরে বাড়ির পশ্চিমে নিজস্ব পুকুরে কাজের লোকের তদারকিতে সাঁতার কেটে রাখালের স্নান। রাত্রে আরতির সময় সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে আরতিদর্শন। বংশের প্রথা অনুযায়ী আরতির সময়ে দুর্গাদালানে সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে আরতি দেখেন।

নবমীতে কুমারীপূজা। এছাড়া কুলদেবতা শ্রীধর নারায়ণ ও কুলদেবী শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালীর ঘট সকালে দালানে এনে দুর্গাপ্রতিমার পূর্বদিকে স্থাপন করে একইসঙ্গে তিনজনের পূজা ও আরতি তিনজন পুরোহিত সম্পন্ন করেন। নবমীতে দুর্গাদালানের সামনের মাঠে বলিদান হয়। এই দৃশ্য নিশ্চয়ই রাখালের মনে রেখাপাত করে। দুর্গাদালানের এই মাঠেই আনন্দমোহন প্রধানত রাখালের জন্য পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন।

বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন বোধনতলাটি বালক রাখালের খেলার প্রিয় স্থান। সঙ্গীদের নিয়ে সে বোধনতলায় ঘুরে ঘুরে শ্যামাসঙ্গীত গায় এবং মন্দিরের সামনে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মাটির কালীমূর্তি স্বহস্তে নির্মাণ করে পূজা করে। কখনো সে পুরোহিত হয়ে পূজা করে। কেউ কলা বা কচুর ডাঁটা নিয়ে বলি দেয়। কখনো সে নিজেও বলি দেয়। তখন সঙ্গীদের কেউ পুরোহিতের আসনে বসে।


শিকড়া-কুলীনগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূজাবেদি

দিনের বেলা অশ্বত্থগাছের ডালে দড়ি টাঙিয়ে দোলনা করে সঙ্গীদের সঙ্গে দোল খায় বালক রাখাল। পিতার মুসলমান প্রজাদের কাছে গ্রামের দক্ষিণ মাঠের প্রান্তে দরগার কথা শুনে সঙ্গীদের নিয়ে সেখানেও মাঝে মাঝে যায় বালক রাখাল।

☆

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শিকড়াকুলীন গ্রামের এই ঘোষবংশে দুর্গাপূজা শুরু হয় ১৭০০ সালে—পলাশির যুদ্ধের ৫৭ বছর আগে। ঐসময়ে গোলপাতা-ছাওয়া মাটির আটচালা ঘরে দুর্গাপূজা হতো। সুন্দরবন থেকে এই গোলপাতা ছাউনির কাজে ব্যবহারের জন্য আনা হতো। এই পাতা অনেকটা নারকেলপাতার মতো। গোলাকার দণ্ডের চারদিকে ঘন ঘন চার সারি করে পাতা। একটি পাতার দণ্ডকে চার ভাগ করে লম্বালম্বি চিরে রোদে শুকিয়ে ঘরের চালে ছাউনি দেওয়া হয়। এই গোলপাতা খুব টিকসই।

পরবর্তী কালে রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ-রূপে বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। শিকড়াতে এসে পিতৃগৃহে অবস্থান না করে তিনি বাল্যের প্রিয় খেলার স্থান বোধনতলায় মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। জমিদারগৃহিণী, অবগুণ্ঠিতা বিধবা হেমাঙ্গিনী দেবী আভিজাত্য ভুলে বোধনতলায় এসে পুত্রের সঙ্গে দেখা

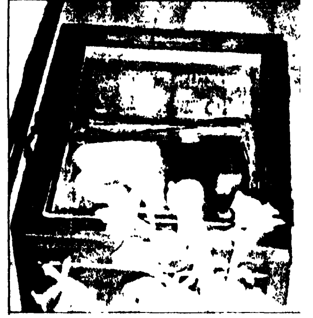
* *শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের উত্তরপুরুষ। বর্তমানে কলকাতা নিবাসী।*

করেন। ধূলায় লুটিয়ে পুত্রের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম মাকে—তাঁর রাখাল আজ 'ব্রজের রাখাল', এসেছে ব্রজভূমে—পরিণত দেবশিশু। পুত্রের উপস্থিতিতে স্বর্গীয় জ্যোতির আভাস! দুটি নয়নের বাঁধ ভেঙে অন্তরের নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় ভেসে গেলেন মাতা। স্নেহশীলা মাতা শান্ত করলেন নিজ হৃদয়কে। বুদ্ধত্বলাভের পর গৃহত্যাগী পুত্র এসেছেন নগরপ্রান্তে। রাজা শুদ্ধোদন রাজগৃহে পুত্রকে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সম্মত হননি অমিতাভ। এখানেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

জমিদারি ছাড়াও আনন্দমোহনের লবণ ও সরিষার ব্যবসা ছিল এবং সেই সূত্রে বেশির ভাগ সময় তিনি কলকাতায় কাটাতেন। মনে হয় এই সমস্ত সূত্রে হেমাঙ্গিনীর পিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাহ ঘটে। হেমাঙ্গিনী দেবীর আগ্রহ ও উৎসাহে আনন্দমোহন রাখালকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় তাঁর শ্বশুরালয়ে নিয়ে এলেন—বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে শ্যামলাল সেনের গৃহে। শ্যামলাল সেন যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন।


স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শয়নগৃহ

ততদিনে গ্রামের দক্ষিণদিকে কলকাতা যাতায়াতের রাস্তায় চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পূর্বে গ্রামের উত্তরদিকের নদীপথে যাতায়াত প্রশস্ত ছিল। টাকির জমিদার কালীনাথ রায় টাকি থেকে বারাসত পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে ভারতভূমি থেকে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেছিলেন। ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি রাজা রামমোহন রায় কলকাতার টাউন হল-এ সভা ডাকলেন—লর্ড বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানানো হবে। এই অভিনন্দনপত্রে যেসমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবু দ্বারকানাথ, কালীনাথ রায়, জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলেনীপাড়া) প্রমুখ ৩-৪ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। রায় কালীনাথ মুনশির তৈরি রাস্তায় ক্রমে ঘোড়ার গাড়ি চলাচল শুরু হলো। বসিরহাট থেকে ঘোড়ার গাড়ির অগ্রিম আসন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হলো। এই রাস্তার নাম হলো 'কালীনাথ মুনশি রোড'।


শয়নগৃহে রক্ষিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পাদুকা

সকাল ৯টায় মতি শা-র ঘোড়ার গাড়ি শিকড়াতে এসে থামল ভোঁ বাজিয়ে। প্রস্তুত আনন্দমোহন, প্রস্তুত রাখাল। রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোয় পিতার সঙ্গে সেই মহানিষ্ক্রমণ ব্রজ-রাজের। সিদ্ধার্থ যেমন নিশীথে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজপথে সারথি ছন্দকের সঙ্গে, এখানেও দৃশ্য প্রায় অনুরূপ। রথ আধুনিক। সঙ্গী পিতা স্বয়ং। পিতা তাঁকে নিয়ে চলেছেন মিলনের জন্য। এ এক বিধিলিপি। মানুষ ভাবে এক, বিধাতা মৃদু হেসে করেন আরেক। ঘোড়ার গাড়ি কালীনাথ মুনশি রোড ধরে বেলেঘাটার 'কেলেনী' বিলে এল। তারপর গাড়ি ঠেলে জল পার করে, ঘোড়া বদল করে বেলা ১২টায় আবার যাত্রা শুরু হলো বারাসতের উদ্দেশে। সেখানে এসে ট্রেনে শিয়ালদহ এবং অবশেষে মামার বাড়ি। ১৮৭৫ সালে শ্যামলাল সেনের বাড়ির কাছে কলকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি এবং কিছুদিনের মধ্যে নিকটবর্তী এক ব্যায়ামাগারে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালের প্রথম পরিচয়। দুই উত্তাল স্রোতস্বিনীর মিলন হলো সাগরে পৌঁছাবার পূর্বেই। তখন কে জানত এই দুই বালকের মধ্যে কী অমিত শক্তি নিহিত আছে! ক্রমে ভাগ্যের কুসুমগুলি একে একে পাপড়ি মেলে বিকশিত হতে শুরু হলো এবং পরমার্থ লাভের প্রবল স্রোতোধারাটি মহাসমুদ্রে মিলনের পথে অগ্রসর হলো।

ব্রজের রাখাল ব্রজে এসেছিলেন ব্রজলীলার জন্য। ধন্য আনন্দমোহন, ধন্য হেমাঙ্গিনী দেবী, ধন্য কৈলাশকামিনী দেবী। ধন্য শিকড়াকুলীন গ্রামের ঘোষবংশ ও তার মাটি। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের পূত পাদস্পর্শে পুণ্যভূমি শিকড়া তীর্থভূমিও। এ কোন পার্থিব নাট্যকারের নৈসর্গিক নাটক নয়, এ পরমপুরুষের স্বহস্তে লেখা বিধাতার মহানাটক। আনন্দমোহন তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতৃহারা একমাত্র পুত্রকে স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে এলেন মহামিলনের মহাতীর্থে। সবকিছু ছেড়ে রাখাল চলল সবকিছু পেতে। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে সে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের রাজা মহারাজ—'রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন'। ❑

শ্রীমায়ের শরৎ, শরতের শ্রীমা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর অবিরত ছলছল শব্দ। চারদিকে সুগন্ধী পুষ্পের গন্ধ। ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখামৃত পানে মুগ্ধ। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক শরতের কোলে উপবিষ্ট। বিস্ময়ে হতবাক্ ভক্তবৃন্দ। ততোধিক বিস্মিত যুবা শরৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের অধরে মৃদু মৃদু হাস্য। রহস্যে ভরা দৃশ্য। রহস্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের রহস্যভঙ্গ : "দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।"



তাঁর সৃষ্ট অভিনব উদার সঙ্ঘের মহাদায়িত্বভার গ্রহণে চিহ্নিত শরৎ কতটা সক্ষম—শ্রীরামকৃষ্ণ নিলেন বাজিয়ে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শরৎ। আনন্দে উচ্ছল শ্রীরামকৃষ্ণ।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে শরৎকে দেখেছিলেন সঙ্ঘের কর্ণধাররূপে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দেরও অন্তরে অনুভূত হয়েছিল—এই কার্যে শরৎই একমাত্র উপযুক্ত। বিদেশে বেদান্তপ্রচাররত স্বামী সারদানন্দকে তিনি ডেকে এনেছিলেন ভারতে, তাঁকে ভার দিয়েছিলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান পরিচালকের। নেতার অর্পিত সঙ্ঘ-পরিচালনার এই মহাভার সারদানন্দজীও সুনিপুণ হস্তে আমৃত্যু পালন করেছেন।

স্বামীজীর আরো দিব্য অনুভব হয়েছিল—ভবিষ্যতে শরৎই পারবে 'জ্যান্ত দুর্গা'র দীর্ঘকালীন সেবাভার গ্রহণ করতে। সেজন্যই কি তিনি বরানগর মঠে বিরজা-হোমান্তে শরতের নাম দিয়েছিলেন 'সারদানন্দ'? স্বামীজীর প্রদত্ত নাম সার্থক। শরতের জীবন ছিল সারদাময়। তিনি ১৮ বছর (১৯০২-১৯২০) অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করে অনন্যসাধারণ সেবকরূপে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ স্নেহচন্দ্রিমায় স্নাত হয়েছিলেন সারদানন্দ মহারাজ। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন আবর্তিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি কর্মে তিনি ছিলেন শ্রীমায়ের মুখাপেক্ষী ও আশীর্বাদপ্রার্থী। শ্রীমায়ের আদেশই ছিল তাঁর কাছে শেষকথা। নিজের মতামতকে সর্বদা উপেক্ষা করে শ্রীমায়ের নির্দেশপালনই ছিল তাঁর জীবনব্রত। মঠ মিশন



পরিচালনা, 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রণয়ন, বিবেকানন্দ-গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনা এবং সর্বোপরি শ্রীমায়ের সেবা প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম তিনি অবলীলাক্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন শ্রীমায়ের অমোঘ কৃপায়।

আর শ্রীমাও তাঁর স্নেহের শরতের ওপর সর্ববিষয়ে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। শরৎ ছাড়া তিনি এক পা কোথাও যেতেন না। শরতের মতামতের ওপর ছিল তাঁর প্রচণ্ড আস্থা। শরৎ যা বলবে তাই হবে—একথা ভক্তদের খোলাখুলি বলতেন তিনি।

এভাবে শ্রীমা ও শরৎ ছিলেন উভয়ের পরিপূরক। শরতের জীবন যেমন শ্রীমা-ছাড়া অকল্পনীয়, তেমনি যেন শরৎবিহীন শ্রীমার জীবন অসম্পূর্ণ। শ্রীমায়ের প্রতি

* *রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের বিদগ্ধ গবেষক সন্ন্যাসী, সুলেখক।*



শরতের অপূর্ব ভক্তি এবং তাঁর প্রতি শ্রীমায়ের অনুপম স্নেহ—এই দুই মিলে ছিল শ্রীমা ও শরতের অলৌকিক দিব্য সম্পর্ক। শরতের শ্রীমা, শ্রীমায়ের শরৎ—এই অপূর্ব দিব্যলীলা মর্ত্যে সঙ্ঘটিত হয়েছিল, যা ভাবলে আমরা শিহরিত হই।

সারদানন্দজী ছিলেন শ্রীমায়ের 'দ্বারী' ও 'ভারী'। এই 'দ্বারী-ভারী'র ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন গুরুভাই স্বামী যোগানন্দজীর পরামর্শে। যোগানন্দজী শরৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমায়ের কাছে। এভাবে শরৎ শ্রীমায়ের সেবাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর অপরূপ মাতৃসেবার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়, চিরনমস্য। তাঁর নিজের কথায়ঃ "মায়ের ভাবে ভরপুর হয়ে সকল কাজ করতুম।" তাঁর জীবনের এক-একটি কর্ম যেন সর্বদেবদেবীস্বরূপা জগন্মাতা শ্রীমায়ের পূজার এক-একটি উপচার। তাই তাঁর সকল কর্ম সফলতায় পরিপূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, প্রথমেই শ্রীমায়ের স্থায়ী আস্তানা হোক। দেরি হলেও সারদানন্দজী তাঁর নেতার ইচ্ছা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন—বাগবাজারে ভক্ত কেদার দাস প্রদত্ত জমির ওপর শ্রীমায়ের জন্য দোতলা পাকাবাড়ি এবং জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের নতুন বাড়ি নির্মাণ করে। প্রথমটির জন্য তিনি ঋণ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। দ্বিতীয়টির জন্য তাঁকে অর্থভিক্ষা করতে হয়েছিল। এই দুটি বাসগৃহে শ্রীমাকে অধিষ্ঠিতা করে মাতৃ-মুখাপেক্ষী সারদানন্দজী আপনার সব শ্রম সার্থক বোধ করেছিলেন। আর শ্রীমাও একান্ত শরণাগত শরৎকে উৎফুল্লহৃদয়ে অজস্র আশীর্বাদ করেছিলেন। এই দুই মহতী কীর্তি সারদানন্দজীর মাতৃভক্তি ও মাতৃসাধনার অপূর্ব নিদর্শন।

বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়িতে সারদানন্দজী নিজেকে 'মায়ের দারোয়ান' বলে গর্ববোধ করতেন। তাঁর এই গর্ববোধ ছিল অকৃত্রিম। শ্রীমায়ের তৃপ্তিবিধানের জন্য তিনি সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। যেদিন থেকে শ্রীমা বাগবাজারের নিজালয়ে থাকতে আরম্ভ করেছিলেন, সেদিন থেকেই সারদানন্দজী ছিলেন সদা আনন্দময়। তখন থেকে তাঁর কর্মশক্তি যেন বহুগুণ বর্ধিত হয়ে তাঁকে সর্বত্র জয়শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল। আর শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে নিজের বাড়িতে খোলামেলাভাবে থাকতেন, তখন তিনি শ্রীমায়ের জন্য কত ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত থাকতেন—তার নিদর্শন আছে শ্রীমাকে এবং তাঁর সেবকদের লিখিত পত্রগুচ্ছে।

শ্রীমা ছিলেন সারদানন্দজীর আরাধ্যা দেবী। তিনি বন্দনা করেছেনঃ "যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।/ সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।" একদা সারদানন্দজী এক ভক্তকে বলেছিলেনঃ "তুমি যাঁর [অর্থাৎ শ্রীমায়ের] কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" 'উদ্বোধন'-এর কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত শ্রীমায়ের কাছ থেকে 'শেষ জন্ম'-এর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। একথা জানতে পেরে সারদানন্দজী বলেছিলেনঃ "কি হে, ষোল আনা কাজ গুছিয়ে নিলে! যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কৃপা পাবার জন্য দিনরাত কত তপস্যা করছে, আর তুমি কিনা তাঁর একটু-আধটু কাজ করে আসল কাজটি হাসিল করে নিলে! যাও, আর ভাবনা কি, এখন ড্যাংড্যাং করে ঘুরে বেড়াও।" নিজের সেবক অশেষানন্দজী সাধন-ভজনের উপদেশ চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ "মা যা তোমাকে দিয়ে গেছেন, অধ্যাত্মজীবনে তার চেয়ে বড় আর কিছু কেউ দিতে পারবে না জেনো। তিনি যা বলে দিয়েছেন তাই অধ্যাত্মজীবনের শেষকথা জানবে। তাঁর দেওয়া পবিত্র নাম জপ করেই তুমি সবকিছু পাবে। আমাদের মা জগন্মাতা স্বয়ং। বিশ্বাস কর, তাঁকে ধরে থাক, তোমার যাকিছু প্রয়োজন সব তিনি তোমার জন্য করবেন।"

এরকম মনোভাব সারদানন্দজীর সব আচরণে প্রকাশিত হতো। তাঁর জীবনীকার প্রকাশচন্দ্র লিখেছেনঃ "মায়ের ইচ্ছার উপর তিনি (সারদানন্দজী) কখনো নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেন না।... তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা দৈবনির্দেশ। মানুষের মনগড়া আইন সেখানে প্রযোজ্য নয়। শরৎ কখনোই সে-ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ তো দূরের কথা। তাঁর মন স্বতই মেনে নিত যে, মায়ের ইচ্ছাই ঠাকুরের বিধান। বলতেন, 'মা ও ঠাকুর কি আলাদা?' এভাবে সারদানন্দজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্তগোষ্ঠীর বাইরে বহু ব্যক্তিকে শ্রীমায়ের মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।"

শ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে সারদানন্দজী তন্ত্রসাধনায় পূর্ণাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। বড়লাট কারমাইকেল একদা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করলে জনসাধারণ ও ভক্তমহলে কালো মেঘের ছায়া নেমে আসে। সঙ্ঘপরিচালক-রূপে সারদানন্দজী কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তখনি তিনি শ্রীমায়ের কাছে উপনীত হয়ে সব নিবেদন করেন। সব শুনে শ্রীমা সারদানন্দজীকে বলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলতে। শ্রীমায়ের পরামর্শে সারদানন্দজী বিবেকানন্দ-শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সহায়তায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব বুঝিয়ে বললেন। বড়লাট সব শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর মন্তব্য



প্রত্যাহার করলেন। সকলের মন থেকে সংশয়-মেঘ অন্তর্হিত হলো।

শ্রীমা বলতেনঃ "শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।" শ্রীমা তাঁর স্নেহের চন্দ্রমোহনকে বলেছিলেনঃ "তুমি বরং উদ্বোধনের কাজ করে যখন সময়-সুযোগ পাবে তখন শরতের সেবা করবে। যদি তুমি তাঁর আন্তরিকভাবে সেবা কর এবং শরৎ যদি তোমার উপরে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে জেনো, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবেই হবে। যেকেউ শরৎকে ভালবেসে সেবা করবে, মুক্তি তার কেনা। শরৎ ঠাকুরের গণেশ, শরৎ আমার মাথার মণি। সারা দুনিয়ায় শরতের মতো মহাপুরুষ খুব কম আছে জানবে।" নিজ সেবকের প্রতি শ্রীমায়ের এরূপ গভীর, তাৎপর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ উক্তি সত্যই বিস্ময়কর!

দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মঠ-মিশনের প্রধান পরিচালকরূপে সারদানন্দজীকে ত্রাণসেবার ব্যবস্থা করতে হতো। এজন্য প্রতিটি ত্রাণসেবা আরম্ভের পূর্বে মানুষের দুঃখে ব্যথিত সারদানন্দজী করুণাময়ী শ্রীমাকে পত্রদ্বারা সব জানাতেন। পরমকল্যাণময়ী শ্রীমাও জীবদুঃখে কাতর দরদি সন্তানকে প্রাণভরা আশীর্বাদ করতেন। তিনি ভক্তদের বলতেনঃ "শরতের দিল দেখলে! নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে? ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মতন এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই। সমস্ত পৃথিবীতে নাই। জীবের দুঃখে প্রাণ কাঁদা!—যেন পালনকর্তা, সকলকে অন্নদান করচে।"

এমনকি নিজের মন্ত্রশিষ্যের কোন বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকলে শ্রীমা বলতেনঃ "নিচে গিয়ে শরতের কাছে সব জেনে নাও।" শ্রীমায়ের আদেশে শরৎ মহারাজও জিজ্ঞাসুকে উদ্দিষ্ট বিষয়ে লিখে দিতেন। কখনো শ্রীমা নিচে খবর পাঠাতেন শরৎকে গান গাইবার জন্য। আদেশমাত্র অম্লানবদনে শরৎ মহারাজ ভাবের ঘোরে গান গাইতেন। আর ওপর থেকে শ্রীমা গান শুনে ভাবে বিভোর হতেন।

শ্রীমায়ের ইচ্ছানুযায়ী সারদানন্দজী জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের ভাইদের সব সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন, ৺জগদ্ধাত্রীর নামে জমির অর্পণনামা বেলুড় মঠের পরিচালনাধীনে এনেছিলেন, শ্রীমায়ের তৃপ্তিবিধানের জন্য 'যোগমায়া' রাধুর বিবাহ দিয়েছিলেন জাঁকজমক সহকারে। বাগবাজারে ও জয়রামবাটীতে শ্রীমা এবং তাঁর সঙ্গিনী ও পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান, স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তুষ্টিবিধানে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। মহাশক্তিধর আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত অপর কেউ একাজের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। উপযুক্তই তাঁর নাম 'সারদানন্দ'।

উৎসব-আনন্দে অথবা দুঃখ-বিপদে শ্রীমাই ছিলেন সারদানন্দজীর গতি—সকল গতির শেষ গতি। একদিনের জন্যও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন'—সারদানন্দজীর মাতৃসেবার এটি ছিল মূলমন্ত্র। 'রঙ্গময়ী' শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় তাঁর আরোগ্যলাভের জন্য সারদানন্দজী কতভাবে যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন—তা ভাবলে অবাক হতে হয়। সারদানন্দজীর আপশোস ছিল—শ্রীমা তাঁর কাছে অবগুণ্ঠিতা থাকেন। অন্তর্যামিনী শ্রীমা সেই আপশোস মিটিয়ে দিলেন তাঁর 'ভারী' শরতের হাতে ওষুধ-পথ্য গ্রহণ এবং শরীরে কৃপাহস্তপল্লব পল্লবিত করে। জননী ও সন্তানের মধ্যে অবগুণ্ঠনের এই দূরত্ব কেবল শ্রীমায়ের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার প্রকাশমাত্র। বাস্তবিক, অন্তরে অন্তরে ছিল না কোন দূরত্ব।

শ্রীমা তাঁর অবশিষ্ট দায় ও তাঁর অদর্শনে যারা নিরাশ্রয় বোধ করবে—তাদের সকল ভার তাঁর 'সৃষ্টিধর' সন্তান শরতের ওপর ন্যস্ত করে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তারপরেই পরমমঙ্গলরূপিণী শ্রীমা শ্রাবণের মঙ্গলবারে এক মহানিশায় মায়িক তনু পরিত্যাগ করে প্রবেশ করলেন নিত্য লীলায়। শ্রীমায়ের ভাগবতী তনু বেলুড় মঠের ভূমিতে চিতায় শায়িত, অগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী। ঠিক সেসময়ে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে দেখা দিল মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য, শ্রীমায়ের চিতাভূমিতে নেই কোন বারি। নিভন্ত চিতায় শ্রীমায়ের শরৎ যেই সিঞ্চন করলেন এক পূর্ণকলস জল, অমনি থমকে থাকা বৃষ্টিধারা হুহু করে এসে ভাসিয়ে দিল দেবচিতাকে। আর কেউ পারলেন না দিতে পুণ্যবারি। শ্রীমা তাঁর প্রিয় সন্তানের হাতে শেষ সেবা গ্রহণ করে ছিন্ন করলেন মায়িক সম্পর্ক।

সারদানন্দজীর মাতৃসেবার অবসান কিন্তু কোনদিন হয়নি। পার্থিব জগতের মহাজীবনের শেষসময় পর্যন্ত তিনি শ্রীমায়ের 'দ্বারী'-রূপে রইলেন। ভক্তেরাও কোনদিন শ্রীমায়ের অভাব অনুভব করেননি। তখন তাঁর মাতৃসেবা রূপান্তরিত হয়েছিল ব্যাপক বিশ্বরূপিণী মাতৃসেবায়। শ্রীমায়ের মহাসমাধির পর জয়রামবাটী ও বেলুড় মঠে পরম রমণীয় দুটি মাতৃস্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেই সারদানন্দজী বিশ্বের দরবারে শ্রীমায়ের সন্তান-ভক্তদের কাছে রেখে গেলেন মাতৃসুধাপানের অমৃতধারা।

মাতৃগতপ্রাণ শরৎকে প্রণাম নিবেদন করি—

"শ্রীসারদাগত-প্রাণং প্রেম-প্রজ্ঞান-সারদম্।
স্বামিনং সারদানন্দং শরচ্চন্দ্রং নমাম্যহম্॥" ❑

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ

অমলেন্দু দে*

স্বামী বিবেকানন্দ "যেমন নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে মনে করতেন, সেইরকম তিনি নিজেকে সারদাদেবীরও 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে গণ্য করতেন।"[১] স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে অভেদজ্ঞান করতেন তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকায় ধর্মমহাসম্মেলনে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রায় স্থির করলেও শ্রীমায়ের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন। ঠিক করলেন, শ্রীমা যা বলবেন তিনি তাই করবেন। এরপর শ্রীমায়ের নির্দেশ চেয়ে তিনি পত্র লেখেন। শ্রীমা পত্রোত্তরে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করে পাশ্চাত্যদেশে গমনের অনুমতি দিলেন। তাঁর অনুমতি পেয়ে স্বামীজীর সকল দ্বিধার অবসান হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমায়ের আশীর্বাদকেই স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে ঐতিহাসিক সাফল্যের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তি মনে করতেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের মাসাধিককাল পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজী এই দিন শ্রীমাকে 'সঙ্ঘজননী'রূপে গুরুভাইদের কাছে বর্ণনা করেন।

একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেন, তিনি অনেক সন্তানের মা হবেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি সত্য হয়। বহু মানুষ শ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করতে আসছেন দেখে নিবেদিতা বলেন ঃ "মা! রামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন, একদিন তোমার অগুণতি ছেলে হবে—সেদিন তো প্রায় এসে গেল। সারা দেশই যে দেখছি তোমার।" শ্রীমা উত্তর দেন ঃ "তাই তো দেখছি।"[২] তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সহজেই তাঁর কাছে আশ্রয় পেতেন, তাঁর স্নেহলাভ করে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর মানসপুত্র হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরাই স্বামীজীর পথটি নির্দিষ্ট করে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর স্বামীজীর ওপর শ্রীমায়ের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ স্বামীজী ঢাকায় পদার্পণ করেন। তাঁকে দর্শন করতে রেলস্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা স্বামীজীকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে আসতে সাহায্য করেন। হেমচন্দ্র ছিলেন একজন স্বেচ্ছাসেবক। তাই সেদিন খুব কাছ থেকে স্বামীজীকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তারপর ৩ এপ্রিল ঢাকায় তিনি স্বামীজীকে 'প্রথম' ও 'প্রকৃত' দর্শনের সুযোগলাভ করেন। পরের দিনও স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে।[৩]

হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ-সহ দশ-বারোজন যুবক ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে 'জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ' লাভ করেন এবং তাঁদের সবাইকে স্বামীজীর 'স্পর্শ' ও 'বাণী' 'এক অপূর্ব চৈতন্যালোকে নিয়ে' যায়। তখন থেকেই হেমচন্দ্র ও তাঁর "বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত" হন। পরবর্তী কালে তাঁরা প্রত্যেকেই 'এক—একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিসংগ্রামী' হন।[৪] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্র ও তাঁর আরো কয়েকজন বন্ধু ঢাকায় 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেন। এই সংস্থাটি পরে "আরো বৃহৎ আকারে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ রূপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে।" সুতরাং এই দুটো সংস্থা স্বামীজীর প্রভাবেই স্থাপিত হয়।[৫] স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই কতটা ছিল তা এর থেকে বোঝা যায়। উল্লেখ্য, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে বাংলায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রায় একই সময়ে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের মুক্তির জন্য একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা থেকে বাংলায় পাঠান। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ যুবকদের অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদার সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে দেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে অরবিন্দের নির্দেশে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রনাথ এই সমিতির খবর পেয়ে অরবিন্দকে জানান। এই বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অরবিন্দ প্রমথনাথ মিত্র ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা অরবিন্দের পরামর্শ অনুযায়ী অনুশীলন সমিতিকে সংগঠিত করতে সম্মত হন। যতীন্দ্রনাথ স্থাপিত বিপ্লবী দল এই সমিতির সঙ্গে একত্রিত হয়। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে অনুশীলন সমিতি পরিচালনার ব্যবস্থা হয়।[৬] স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়াত হওয়ার কয়েকমাস আগেই এই বিপ্লবী দল সংগঠিত হয়।

স্বামীজীর জ্বালাময়ী বাণী যুবকদের দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, বাঘা যতীন, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল,

** প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি।*

বিনয়-বাদল-দীনেশ, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবার বহু তরুণ বিপ্লবী পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। সরকারের বিরূপতা সত্ত্বেও শ্রীমা তাঁদের আশ্রয় দান করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। বস্তুত, তিনি ছিলেন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের নির্যাতিত জীবনের একমাত্র শান্তি ও আশ্রয়ের স্থল।

বিপ্লব আন্দোলনের নেতারা স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে ও বিদেশে মিশনের কাজে নিযুক্ত সন্ন্যাসীদের কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করতে শুরু করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশ সরকার যে-মত ব্যক্ত করে, তা থেকে স্বামীজীর রচনাবলী সম্পর্কে পুলিশের ভীতির কথা জানা যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল সি. এ. টেগার্টের লেখা ৪১ পৃষ্ঠার নোটটি পড়লে বোঝা যায়, স্বামীজী যে বলেছিলেন—রাজনীতির সঙ্গে মিশনের কোন যোগ নেই, সেবিষয়ে সরকার তাঁর ওপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেনি।[৭] এই নোটে স্বামীজীর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়, তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং ভারতের দুঃখ-দুর্দশার জন্য স্বামীজী ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উল্লেখ করে বলা হয়, 'যুগান্তর' পত্রিকার মাধ্যমে ভূপেন্দ্রনাথ যুবকদের মনে বিপ্লব ও সন্ত্রাসের বীজ বপন করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহাত্মক প্রচারের জন্য তাঁকে সরকার একবছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ভূপেন্দ্রনাথ কিছুদিন বেলুড় মঠে লুকিয়ে থাকেন এবং আমেরিকায় চলে যান। আগস্ট মাসে ভূপেন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌছান। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই তিনি বিপ্লবী দলের উগ্র সদস্যদের কাছে সম্মানলাভ করেন।[৮]

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের মনোভাব আলোচনায় ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের ডিরেক্টর বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণে রাজনৈতিক বিষয় বিশেষ নেই, কিন্তু তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুদের ওপর খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের সমন্বয়সাধন করা সম্ভব নয়।[৯] স্বামী বিবেকানন্দের পরিবারে রাজদ্রোহের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উভয় ভ্রাতার উদ্দেশ্য একই ঃ বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করা। ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবের মাধ্যমে আইনের দ্বারা স্বীকৃত সরকারকে উৎখাত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বেদান্তদর্শনের মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীর মধ্যে শক্তির উন্মোচন ঘটাতে চান। বেদান্ত সকল মানুষের ঐক্যের শিক্ষাই দান করে। পরবর্তী কালে বর্ণভেদপ্রথা এই ঐক্যের আদর্শকে বিপর্যস্ত করে ভারতবাসীকে বিভক্ত করে। তার ফলেই কতিপয় ইংরেজের পক্ষে ত্রিশকোটি ভারতবাসীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।[১০]

গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদের জাগ্রত করার জন্য যেসব কথা বলেন তা ভারতের বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। 'লিবার্টি' নামে বিপ্লবীদের ইস্তাহারে তাঁর রচনা উদ্ধৃত করে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।[১১] স্বামীজী বলতেন, ভারতের পুনর্জাগরণের জন্য দরকার শক্তি অর্জন করা। এতে যে ইংরেজ সরকার ভয়ানক উদ্বিগ্ন হতো তা এই নোট থেকে জানা যায়।[১২] ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Kali the Mother' এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 'Web of Indian Life' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর গ্রন্থকে রাজনৈতিক ইস্তাহার বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়, তাঁর রচনায় তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে।[১৩] নোটে অবশ্য এই কথাও স্বীকার করা হয়, স্বামীজীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিতার মতান্তর হয়, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় স্বামীজী তাঁকে তিরস্কারও করেন। নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে এই আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। এই সব অভিযোগও এই নোটে করা হয়। নিবেদিতা 'ম্যাটসিনির আত্মজীবনী' নামক ছয় খণ্ডের পুস্তক এবং পিটার ক্রপটকিনের দুটো গ্রন্থ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেন। 'ম্যাটসিনির আত্মজীবনী'র প্রথম খণ্ড তিনি প্রথমে বৈপ্লবিক সমিতিকে দেন। এই খণ্ডটি সমগ্র বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত ও পঠিত হয়। এই খণ্ডের শেষে গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। অন্য পাঁচ খণ্ড ও ক্রপটকিনের দুটো পুস্তক তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে দেন।[১৪] নিবেদিতার স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকার কথা শ্রীমা জানতেন। ইংরেজদের অত্যাচারের রূপ দেখে শ্রীমায়ের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বজননীরূপে তিনি তাদের সর্বনাশ চাইতে পারেননি। কারণ, তারাও তাঁর 'ছেলে'। একইসঙ্গে 'স্বদেশি'-করা সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। শ্রীমায়ের কাছে বিপ্লবীদের যাতায়াত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ বিপ্লবীদের কাউকে আসতে নিষেধ করেননি। তাই বিপ্লবীরা শ্রীমায়ের স্নেহাশীর্বাদ থেকে কখনোই বঞ্চিত হননি। তারই স্পর্শে আনন্দে আত্মহারা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।[১৫] শ্রীমায়ের কাছে প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীই এসেছেন। তাঁদের দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন পত্রে লিখেছেন ঃ "সকল দলই সমবেতভাবে বলছে, নতুন চেতনা এসেছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকেই। যাঁরা কারামুক্ত হয়েছেন, তাঁরা

মাতাদেবীকে প্রণাম জানাতে আসছেন। মাতাদেবী বলছেন, 'কী সাহস! এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর স্বামীজীই আনতে পারেন। দোষ যদি কারো হয়, সে তো তাঁদেরই।' অপূর্ব! মাতাদেবী অপূর্ব—নয় কি?"[১৬] প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি আন্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, তাই তার এত প্রাণশক্তি। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা অরবিন্দ একথা বলতেন।[১৭] ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি মুম্বাই শহরে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে-ভাষণ দেন, তাতে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান স্মরণ করেন।[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি' শ্রীমাকে দেশপ্রেমিকরা গ্রহণ করেছিলেন জননীরূপে।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতা বরোদায় এলে অরবিন্দ রেলস্টেশনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। নিবেদিতা অরবিন্দের মধ্যে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্বর্গীয় আদেশপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীকে দেখতে পান। আর অরবিন্দ নিবেদিতার মধ্যে দেখতে পান বিদেশি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য উৎসর্গীকৃত এক তেজোদীপ্ত মহিলাকে। তাঁরা পরস্পরকে মা কালীর ভক্ত হিসাবে, ভবানী ভারতীর সন্তান হিসাবে দেখতে পেলেন। তা ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতার ভিত্তি।[১৯] বাংলায় ফিরে এসে নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কাজে সহায়তা করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ পাঁচজনকে নিয়ে বিপ্লবী কমিটি গঠন করেন। তার একজন সদস্য নিবেদিতাকে মনোনীত করেন। নিবেদিতা স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। অরবিন্দকে ও অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার পর বিপ্লবী আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হলেও নিবেদিতা নিরুৎসাহ হননি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরে আসেন। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দকে মুক্ত দেখে আনন্দিত নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান করেন।[২০] নিবেদিতা অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। কারাগারে সাধনার ফলে তাঁর মুখে যে প্রশান্তভাব পরিস্ফুট হয়, তা থেকে বোঝা যায়—তিনি তখন একজন রাজনীতিবিদ মাত্র নন, তিনি এক নতুন প্রাণশক্তির অধিকারী, যাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যন্মুখী। নিবেদিতা লক্ষ্য করেন, অরবিন্দ এখন একজন যোদ্ধা নন, তিনি একজন যোগী।[২১] ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দের গোপনে ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের ডিরেক্টর তাঁর দীর্ঘ নোটে লেখেন, অরবিন্দ ঘোষের চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব প্রতিফলিত।[২২] তবে অরবিন্দের 'শক্তি'র প্রতি আবেদন অনেক বেশি ছিল।[২৩] এই নোটে বিস্তৃত করে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ প্রকাশিত 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়। বিপ্লবীদের কাছে এই পুস্তিকা উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়। এটি ছিল রূপান্তরের বার্তাবাহক এবং ব্রিটিশ শক্তির প্রতি চরমপত্র। এটি এমনই এক 'রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ডিনামাইট' ছিল যে, তা বাংলার উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।[২৪] বিপ্লবীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ উল্লেখ করে গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী অভেদানন্দ যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছান, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিপ্লবী দলের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় ধারাবাহিকভাবে যে-বক্তৃতা দেন তা 'India and her People' গ্রন্থে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়ার সময়ে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়ে যান। তাঁর কাজকর্ম গুপ্তচর বিভাগ সন্দেহের চোখেই দেখত।[২৫] অরবিন্দ মানিকতলা বোমার মামলায় যে-বিবৃতি দেন তাতেও পুলিশ বিভাগ রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ লক্ষ্য করে। অরবিন্দ বেদান্তবাদকে বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম হিসাবে উল্লেখ করেন।[২৬]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ('বাঘা যতীন')। অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত হন। বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি ছিলেন অরবিন্দের অন্যতম সহযোগী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতাকে জানতেন। শ্রীমায়ের স্নেহলাভের সৌভাগ্যও তাঁর হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ট্রেনে বাগনান থেকে বালেশ্বর যাত্রাকালে তিনি জানতে পারেন, শ্রীমা ঐ ট্রেনে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি মায়ের কাছে ছুটে আসেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বালেশ্বর রওনা হন।[২৭] বুড়িবালাম যুদ্ধের অন্যতম নায়ক বাঘা যতীন আহত হয়ে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান। শ্রীমায়ের শক্তি কতটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং তাঁদের প্রভাবিত করেছিল তা প্রথম যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই স্পষ্ট হয়।

বাঙলা 'সাপ্তাহিক যুগান্তর' (১৯০৬-১৯০৮) পত্রিকা থেকেই ধারণা করা যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ এই পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রতীকচিহ্নে দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতীক ছিলঃ হিন্দু-ধর্মের ত্রিশূল ও চক্র এবং ইসলামের অর্ধচন্দ্র ও তরবারি। অরবিন্দের তত্ত্বাবধানেই এই পত্রিকা পরিচালিত হতো। সম্পাদক হিসাবে কারো নাম ছাপা না হলেও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীরা। দেবব্রত



বসু শ্রীমায়ের কাছে যাতায়াত করতেন এবং পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' ব্যাপকভাবে প্রচার করাই ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দেই অরবিন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ঃ ''পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।'' 'যুগান্তর' পত্রিকায় জোরালোভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রচারিত হয়।[২৮] একই সময়ে অরবিন্দকে ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৬-১৯০৮) সম্পাদনা করতে হয়। এই দুটো কাগজের সঙ্গে যুক্ত থেকে অরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন খাতে প্রবহমান করেন, পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি করেন।

ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পথটি রচনা করেন, 'সাপ্তাহিক যুগান্তর' সেই পথেরই সমর্থক ছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কীভাবে দূর করা যায় তা ভাবতে গিয়ে এই পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে। এই পত্রিকায় লেখা হয় ঃ ''এই কথাটি এখন নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে; আর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ভঞ্জনের উহাই পথ। বাংলায় অনেক ধর্ম আসিয়াছে; ভবিষ্যতে হয়তো অনেক ধর্ম আসিবে। সাম্প্রদায়িক ভেদ মিটাইবার পথ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। পরমহংসদেব শাক্ত, বৈষ্ণব, রামায়েৎ, মুসলমান সকল ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সকল ধর্মপন্থাই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিবে।''[২৯] বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বিপন্ন মানুষের সেবা করতেন। রাজনীতির সঙ্গে সন্ন্যাসীদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও ইংরেজ সরকার তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখত। গোপনে পুলিশ তাঁদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। বিদেশী শাসকের এই কাজের সমালোচনা করে 'যুগান্তর' মন্তব্য করে ঃ ''ভারতবর্ষে যে যথার্থ মানুষ জন্মিবে সেই ইংরেজের শত্রু।''[৩০] প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনকে লক্ষ্য করে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা বলে, যেসব সাধু প্রথমে ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরাও আজকাল রাজনীতি চর্চায় যোগ দিচ্ছেন, 'দেশময় রাজদ্রোহের বীজ' ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনকে লক্ষ্য করে 'ইংলিশম্যান' এই মন্তব্য করে। ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলোর ওপর ইংরেজের কোপদৃষ্টি পড়ায় 'যুগান্তর' ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখে ঃ ''মহাপুরুষ বিবেকানন্দ বলিতেন যাহা জীবসেবা তাহাই ধর্ম; যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় তাহাই ধর্ম। ইউরোপে যেমন ধর্ম বা রাজ মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞান থাকায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। দেশের লোকের কষ্ট দেখিলেই স্বামীজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, সেইজন্য তিনি নানাস্থানে অনাথ, আতুর, দরিদ্রের সেবার জন্য আশ্রম খুলিয়া গিয়াছেন। এসমস্ত যদি ধর্মের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে এই ত্রিশকোটি ভারতবাসী যে অনশনে, অর্ধাশনে, নির্যাতনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা কি ধর্মের অঙ্গ নহে? মুক্তিই ভারতের লক্ষ্য; যাহারা সামান্য দুঃখকষ্ট হইতে নিবৃত্তিলাভের উপায় করিতে পারে না, তাহারা কি করিয়া সমগ্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিবে? যাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনে গোলামি মাত্র সার করিয়া বসিয়াছে তাহারা কি করিয়া মুক্তির অধিকারী হইবে? সাধুমণ্ডলী যখন ভারতের ধর্মোপদেষ্টা, তখন রাজনীতিরও উপদেষ্টা। ধর্ম ভিন্ন ভারতের অন্য কিছুরই অধিপত্য হইতে পারে না। জাতীয় মুক্তির জন্য যদি যুদ্ধঘোষণাও করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাই ধর্ম। সাধুমণ্ডলী যথার্থ পথেই চলিয়াছেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ত্যাগীর দল, তাঁহাদিগকে ভীতিবিহ্বল করিবার সাধ্য ইংলিশম্যানের আজও হয় নাই।''[৩১]

বাংলায় বিপ্লববাদের প্রভাব লক্ষ্য করে কলকাতার 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান' আর এলাহাবাদের 'পাওনিয়ার' প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রাজদ্রোহসূচক' কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারকে সচেতন করে। 'যুগান্তর' পত্রিকার ওপর বারবার সরকারি আক্রমণ নেমে আসে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে একবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথকে 'একজন বীর' বলে প্রশংসা করে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখেন।[৩২] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'যুগান্তর' পত্রিকার কণ্ঠরোধ করতে সক্ষম হয়। বারবার আঘাতে যে ভয়ানক ক্ষতি 'যুগান্তর'-এর হয়, তা কাটিয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। 'যুগান্তর' পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের ভূমিকার সমর্থন যেভাবে করে, তাতে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন হয়। আলিপুর বোমার মামলার বিচারপতি চার্লস পোর্টেন বিচক্রফ্ট 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এই পত্রিকা ব্রিটিশ জাতির প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা প্রচার করে, প্রতিটি লাইনে বিপ্লব সঞ্চারিত করে এবং কিভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় তা উল্লেখ করে।[৩৩]

গুপ্তচর বিভাগের নোটেও মানিকতলার মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁদের অনেকের যোগাযোগ উল্লেখ করা হয়। অরবিন্দ সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হন। আলমোড়ার কাছে মায়াবতী আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দ যাঁদের আতিথেয়তা দান করতেন, তাঁদের মধ্যে মানিকতলা মামলায় অভিযুক্তরাও ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানেই মুম্বাইয়ের রামচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। পরে রামচন্দ্র প্রভু বাংলার কয়েকজন বিপ্লবীকে আশ্রয় দেন। ইন্দ্রনাথ নন্দী নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে আলমোড়া আশ্রমের যোগাযোগ ছিল।[৩৪] মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরো তিনজন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু ও

শচীন্দ্রকুমার সেন। পরে দেবব্রত ও শচীন্দ্রকুমার রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হন। দেবব্রত 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ' ও শচীন্দ্রকুমার 'ব্রহ্মচারী শচীন্দ্র' নামে পরিচিত হন। কুঞ্জলাল সাহা মাদ্রাজের মায়লাপুর আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা মামলায় অভিযুক্ত ভবভূষণ মিত্র প্রায়ই বেলুড় মঠে যেতেন।[৩৫] কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বেলুড় মঠের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করে এই নোটে বলা হয়, বেলুড় মঠের শিক্ষার দ্বারা বাংলার বিপ্লবীদের মন গঠিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সরকার অনুশীলন সমিতিকে নিষিদ্ধ করে।[৩৬]

আলিপুর বোমার মামলার প্রয়োজনে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ১১৭ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটের 'ন্যাশনাল স্টুডেন্টস মেস'-এ তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ যেসব কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে তাতে এই মেসের কয়েকজন বাসিন্দা যে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং মেসটি বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র ছিল সেই খবর পায়। কুলচাঁদ সিংহ রায় নামে এক ছাত্রের ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের একটি খাতা থেকে পুলিশ জানতে পারে যে, 'ন্যাশনাল কলেজ'-এর ৩০জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আরেকটি তথ্য থেকেও পুলিশ জানতে পারে, এই মেসটিকে বৈপ্লবিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। বোসপাড়া লেনের স্বামী নির্মলানন্দ ওরফে তুলসীচরণ দত্তের মন্তব্যও পুলিশ এখান থেকে সংগ্রহ করে। পরে স্বামী নির্মলানন্দ ব্যাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্মলানন্দজী তখন মেসের ছাত্রদের কাছে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নের বিষয়ে বলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে উপদেশ দেন। নির্মলানন্দজী বলেন, আমরা তরুণ ও উৎসাহী যুবকদের চাই। বেলুড় মঠ তোমাদেরই ব্যবহারের জন্য। শুধু দেশের মুক্তি নয়, সমগ্র পৃথিবীকেই তোমরা মুক্ত করতে সক্ষম হবে।[৩৭]

গুপ্তচর বিভাগ থেকে যখন স্বামী নির্মলানন্দের শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ও মঠের আরেকজন সন্ন্যাসীকে বলা হয়, তখন তাঁদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি কিভাবে কুলচাঁদ সিংহরায় নামক ছাত্রটি এই ধারণা স্বামী নির্মলানন্দের শিক্ষা থেকে করল। তাঁরা বলেন, ছাত্ররা স্বামী নির্মলানন্দের আলোচনা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারেনি।[৩৮] গুপ্তচর বিভাগ থেকে বলা হয়, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস অনুষ্ঠানে একদল ছাত্র নৌকায় বেলুড় মঠে যায়। তারা কতটা আনন্দিত ও উৎসাহিত হয় তা সুরেন্দ্রচন্দ্র লাল নামক এক ছাত্রের ডায়েরি থেকে জানা যায়।[৩৯] গুপ্তচর বিভাগের নোটে এই কথাও বলা হয়, কলকাতা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরফে যোগেন ঠাকুর বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি যুগান্তর ও যুবকমণ্ডলী সারথি সংগঠনগুলোর সদস্য ছিলেন। এই নোটে আরেকটি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বলা হয়। তাঁর শিক্ষাকে বিপ্লবীরা তাঁদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন। স্বামীজী তাঁর অনুগামীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ-এর সাহায্যে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে উপদেশ দেন। মানিকতলা গ্রুপের ইন্দ্রনাথ নন্দী স্বামীজীর উপদেশ মতো ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ-এর সাহায্যে গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে প্রয়াসী হন।[৪০]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে Act XXI of 1860-এর অন্তর্ভুক্ত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। তখন শ্রীমা সারদাদেবীই ছিলেন এই মিশনের কেন্দ্রবিন্দু। সিস্টার নিবেদিতাও ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে। এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লিখিত হয় ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত বেদান্তের চর্চা করা, তা প্রচার করা এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করা; মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক চর্চা ও প্রচার করা; এইসব বিষয়ে শিক্ষকদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা; জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষামূলক কাজ করা; বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি মানবসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি।[৪১]

গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বহু আশ্রম স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এইসব আশ্রমে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেন। মিশন এইসব আশ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করেন না। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয় এবং পূর্ববঙ্গে এই সমিতির পাঁচশো শাখা গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যদের আশ্রমগুলিতে যাতায়াত ছিল।[৪২] বিভিন্ন নামে এইসব আশ্রম স্থাপিত হয়, যথা—অনাথ আশ্রম, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ইত্যাদি। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী প্রকাশানন্দ ওরফে সুশীলকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী বিরজানন্দ ঢাকার মিশন পরিদর্শন করেন। পরে স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই শাখাটির কাজকর্ম বন্ধ হয় এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় শুরু হয়। পূর্ববঙ্গ ও অসম সেক্রেটারিয়েটের কেরানিদের উদ্যোগেই এই শাখাটি পুনরুজ্জীবিত হয়। একসময়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু। তিনিও এই শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৪৩]

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী সি. কে. সেন নামে একজন উকিলের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হয়। ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বয়কটের সমর্থনে ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন করে পরিচিতিলাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হয়, তাতেও দুজন উদ্যোগী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ করা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, এই শাখাটি বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয়স্থল ছিল। এই শাখাটি পার্বত্য ত্রিপুরার বিপ্লবী দলের সদস্যদের দ্বারা স্থাপিত হয়। প্রিয়নাথ ব্যানার্জি ও নিশিকান্ত ঘোষের মতো নেতারা এই শাখায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নলিনী দে নামে বিপ্লবী আন্দোলনের কলকাতা শাখার এক সদস্য পুরীর মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বসবাস করেন এবং তাঁর সঙ্গে বেলুড় মঠে এসে মিশনে যোগদান করে সন্ন্যাসী হন।[৪৪]

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে এক বড় সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে বিপ্লবী দলের বিখ্যাত বক্তা লিয়াকৎ হোসেন বিদ্রোহমূলক গান গেয়ে উপস্থিত জনসাধারণকে দেশের সেবার জন্য এবং নিজেদের জীবনদান করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।[৪৫] বেলুড় মঠের সব সমাবেশেই বিপ্লবীরা উপস্থিত থাকতেন বলে সরকারি নোটে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গ্রামের আশ্রমসমূহের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের যোগাযোগের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকার গ্রামাঞ্চলে যেসব আশ্রম গড়ে উঠেছে তার খবর সংগ্রহ করে। ঢাকার ফরাসগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত উৎসবে নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি ও আরো অনেকে যোগদান করেন। তাঁদের বাংলার বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিপ্লবীরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ'-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। বরিশাল শহরে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরী' স্থাপন করে স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত রচনা এবং 'কথামৃত' সংগ্রহ করে এইসব গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে বিপ্লবকর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের কেন্দ্রে একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়।[৪৬]

সরকারি আক্রমণ বিপ্লবীদের ওপর তীব্রতর হওয়ায় এবং তাঁদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ রয়েছে—এই সন্দেহে যে-জটিলতার সৃষ্টি করে, সেই বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন যোগাযোগ নেই। তিনি এবিষয়ে এই বিবৃতির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে দেন।[৪৭] এই বিবৃতি সত্ত্বেও যে গুপ্তচর বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ সি. এ. টেগার্ট নিশ্চিন্ত হতে পারেননি তা তাঁর নোটের শেষ অংশ পাঠ করলেই বোঝা যায়।[৪৮]

জয়রামবাটীর কাছে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কিছু ছাত্র ও যুবক দেশসেবার উদ্দেশ্যে এই আশ্রম স্থাপন করে। তখনো এই আশ্রম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এর সঙ্গে সঙ্ঘের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই আশ্রম ও তার কর্মীদের প্রতি শ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি এই আশ্রমে এসে বিশ্রামও করতেন। এখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ও নিজের পট স্থাপন করে নিয়মিত পূজার ব্যবস্থাও করেন। তিনি কোয়ালপাড়া আশ্রমকে তাঁর 'বৈঠকখানা' বলতেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে এই আশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এর ওপর পুলিশের 'কড়া নজর' সবসময় ছিল। অবশ্য শ্রীমা বলতেন, শুধু শুধু হুজুগ করে না বেড়িয়ে বরং গঠনমূলক কাজ করা উচিত। বলতেন: "দেখ, তোমরা 'বন্দে মাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িও না। তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।"[৪৯] ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু (পরবর্তী কালে স্বামী কেশবানন্দ) শ্রীমাকে বলেন: "মা, স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হতো!" এই কথা শুনে শ্রীমা বলেন: "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।"[৫০] প্রসঙ্গত, শ্রীমা এর ঠিক আগেই বলেন: "শুধু স্বদেশি করে কি হবে? আমাদের যাকিছু সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যাকিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না!"[৫১] শ্রীমা রাজনৈতিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের মূলে আধ্যাত্মিকতা রাখার কথা বলতেন। একই মনোভাব ব্যক্ত করতেন বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাই বিপ্লবীদের দলে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা পেতেন এবং তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথেই আত্মগঠনে প্রয়াসী হতেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে একজন ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করেন: "মা, এদেশের দুঃখ-দুর্দশা কি দূর হবে না?" শ্রীমা উত্তরে বলেন: "ঠাকুর তো এসেছিলেনই তার জন্যে।"[৫২] এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঠাকুরই কাজ করছেন—এমন ইঙ্গিত শ্রীমায়ের উত্তরে পাওয়া যায়।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মে যখন অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে গ্রেফতার হন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়, তখন অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনীদেবী গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হন। এই অবস্থায় অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিপ্লবী দেবব্রত বসুর বোন সুধীরা মৃণালিনীদেবীকে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যান। শ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ "চঞ্চল হইও না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ নাই; তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত পুরুষ, ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি অতি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হইয়া আসিবেন।" মৃণালিনীদেবীর মানসিক শান্তির জন্য শ্রীমা তাঁকে 'কথামৃত' পড়তে বলেন। অরবিন্দকে আপন সন্তান মনে করতেন বলে শ্রীমা তাঁকে 'বৌমা' সম্বোধন করতেন।[৫৩] অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার পর মৃণালিনীদেবী শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ "I was glad to know that she had found so great a spiritual refuge."[৫৪]

স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) বহু তরুণ বিপ্লবী বেলুড় মঠে যাতায়াত করতেন। পরবর্তী কালে তাঁরা অনেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। যোগদানের পূর্বে তাঁদের কারাবাস ও অন্তরিন জীবনের অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির যেসব সদস্য শ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), রাধিকামোহন গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ—'ভরত মহারাজ') এবং নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ)।[৫৫] ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত দুই বিপ্লবী দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন মুক্তিলাভের পর শ্রীমায়ের অনুমোদনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আশ্রয়লাভ করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের মঠে আশ্রয়দান করা যে কত বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের ওপর পুলিশের দৃষ্টি সবসময়েই ছিল। কিন্তু শ্রীমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতিই ছিল এইসব বিপ্লবীর আশা ও ভরসাস্থল।

বিশ শতকের প্রথমদিকে শ্রীমায়ের কাছে যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন—বিভূতিভূষণ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রজনীকান্ত প্রামাণিক, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তপানন্দ), ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ), যতীন্দ্র দত্ত, মতিলাল বিশ্বাস, মাখনলাল সেন ও তাঁর স্ত্রী মৃন্ময়ীদেবী।[৫৬] বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতার কন্যা প্রফুল্লমুখী বসু শ্রীমায়ের প্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তেরোবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। এর আটাশদিন পর তিনি বিধবা হন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লমুখী ভারাক্রান্ত মনে শ্রীমায়ের কাছে আসেন। তখন তাঁর বয়স ষোল। তাঁকে দেখেই শ্রীমা বলে ওঠেন ঃ "অত নিরাশ কেন মা? তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।" শ্রীমায়ের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়নি। প্রফুল্লমুখী গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলার বিভিন্ন জেলে তাঁকে বন্দি জীবনযাপন করতে হয়। স্বাধীনতালাভের পর কুমিল্লার 'সারদা দেবী মহিলা সমিতি'র অন্যতম পরিচালিকা ছিলেন তিনি। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।[৫৭]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন। শ্রীমা তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।[৫৮] পরবর্তী কালে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গান্ধীবাদী নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ঢাকা জেলার আউটসাহী গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রীমায়ের ভক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্তের স্ত্রী গিরিজা গুপ্তা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি নারী সংগঠন, গঠনমূলক কার্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৫৯]

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে ধৃত বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্টেট প্রিজনার এবং বিপ্লবী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিসিমা বিধবা ননীবালাদেবীও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ৩নং রেগুলেশনে বন্দি করা হয়। তাঁর কাছে একটি 'মাউজার' পিস্তল ছিল। সেটি তিনি কোথায় রেখেছেন তা জানার জন্য বিধবা ননীবালাদেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ননীবালাদেবীকে গ্রেফতার করা হয়। নির্যাতন করেও তাঁর কাছ থেকে কোন তথ্য পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ননীবালাদেবী অনশন শুরু করেন। গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশ্যাল সুপারিনটেণ্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, তিনি আহার করলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি সম্মত আছেন। তখন ননীবালাদেবী তাঁকে বলেন ঃ "আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।" গোল্ডি বলেন ঃ "আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।" ননীবালাদেবী লিখে দেন। গোল্ডি সেই দরখাস্তটি ছিঁড়ে ফেলে দিলে তিনি আহত সিংহীর মতো গোল্ডির মুখে বসিয়ে দেন প্রচণ্ড এক চড়। আরেকটি চড় মারতে উদ্যত হলে উপস্থিত কর্মচারীরা তাঁর হাত চেপে ধরে বলে ঃ "পিসিমা

করেন কি, করেন কি!'' ননীবালাদেবী উত্তরে বলেন ঃ ''ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল কেন?''[৬০] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কারাগারে বন্দি ননীবালা শ্রীমাকে স্মরণ করেই এই শক্তি অর্জন করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজের ছাত্র, অনুশীলন সমিতির সদস্য দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে দুবছরের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে অন্তরিন করা হয়। সেখানে শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য সুরেন করও অন্তরিন ছিলেন। বন্দিজীবনের কঠোরতা সহ্য করতে না পারায় সুরেন কর আত্মহত্যা করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে দীনেশ দাশগুপ্ত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শ্রীমা বন্দিজীবনে পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কে তাঁর কাছে খোঁজখবর নেন। সুরেন করের আত্মহত্যার খবর শুনে শ্রীমা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন ঃ ''হে ঠাকুর, আর কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে!''[৬১] সিটি কলেজের ছাত্র নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দি করা হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে 'যুগান্তর' দলের প্রাক্তন সদস্য, মঠের তরুণ ব্রহ্মচারী গৌরহরি মায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন।[৬২]

শ্রীমায়ের এক নিরীহ ভক্ত ঠাকুরঘরে জপধ্যান করে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে প্রসাদ বা জল খাওয়ার অবকাশটুকুও দেয় না। শ্রীমা গভীর বেদনার সঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ ''দেখ দিকি, ইংরেজের কী অন্যায়! আমার ভাল ছেলে, তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদ দিতেও দিলে না! এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে?''[৬৩] শ্রীমায়ের ত্যাগী সন্তান স্বামী জ্ঞানানন্দকে মিথ্যা সন্দেহে পুলিশ কাটিহারে নজরবন্দি করে রাখে। কোয়ালপাড়ায় শ্রীমা অসুস্থ—এই সংবাদ পেয়ে তিনি দেখতে আসেন। নজরবন্দি থাকায় তাঁকে সবাই কাটিহারে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু শ্রীমায়ের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তিনি ফিরে যান। গভীর বেদনা অনুভব করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ ''যা হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে।'' শেষপর্যন্ত শ্রীমা তাঁকে চলে যেতে মত দিলেও এদেশ থেকে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন।''[৬৪]

এইসব কারণে পুলিশের কড়া নজর ছিল জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়া আশ্রমের ওপর। জয়রামবাটীর মায়ের বাড়ি পুলিশের রেকর্ডে 'মাতাজীর আশ্রম' নামে উল্লিখিত হয়। জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়া অঞ্চলে সরকার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অন্তরিন করে রাখে। সেই সময়ে এই অঞ্চল ছিল 'ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, অশিক্ষা-কবলিত, দুরধিগম্য'। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই অন্তরিন যুবকরা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ করেছেন—এমন যুবকও ছিলেন। তাঁদের জন্য মায়ের মন সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। কেউ কেউ তাঁকে চিঠিও লিখতেন। সেইসব চিঠিতে পুলিশের ছাপ মারা থাকত। এই ধরনের চিঠি পেলে শ্রীমা অশ্রুসজল নেত্রে ছাপের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং দু-একটি বাক্যে তাঁর হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করতেন। এঁদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রশংসা করে তিনি বলতেন ঃ ''আহা, কী সব চাঁদের মতো ছেলে, দেশের জন্য কতই না দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ কচ্ছে।''[৬৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশসেবার নামে শ্রীমা রাজনৈতিক ডাকাতি সমর্থন করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন, স্বদেশি ডাকাতির ফলে মুক্তিসংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তা হয়েওছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী কালে এই কথা স্বীকার করেছেন।[৬৬]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে একই নামের দুজন সিন্ধুবালাকে গ্রেফতার করে পুলিশ যে অমানুষিক আচরণ করে, তাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিতর্কও চলে। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে শেষপর্যন্ত এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে বাধ্য হন। তিলজলা রেলওয়ে কেবিনে কাজ করতেন দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা নিজেদের রেলওয়ে কোয়ার্টাসে 'যুগান্তর' দলের পলাতক বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চক্রবর্তী ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে আশ্রয় দেন। ভারতরক্ষা আইনে পুলিশ সাবাজপুর গ্রামের সিন্ধুবালাকে গ্রেফতার করে। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের বড়দি এবং আসন্নপ্রসবা। তাঁকে গ্রেফতারের পর পুলিশ খবর পায়, পাশের গ্রামে আরেক সিন্ধুবালা আছেন, আর তিনি হলেন দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। পুলিশ তাঁকেও গ্রেফতার করে। রাতে তাঁদের অনেকটা পথ হাঁটিয়ে প্রথমে এক জমিদারের কাছারিতে, পরদিন হাঁটিয়ে ইন্দাস থানায়, তারপর ট্রেনে বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া স্টেশন থেকে হাঁটিয়ে বাঁকুড়া থানায় আনা হয়। তাঁদের দুজনকে পনেরোদিন জেলহাজতে রাখার পর নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনার ফলে বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। তিনি সিন্ধুবালা দ্বয়ের ওপর পুলিশী অত্যাচারের খবর পেয়ে ''বল কী!'' বলেই শিউরে ওঠেন, মুহূর্তে তাঁর চোখমুখের অবস্থা বদলে যায়। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ঃ ''এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কৈ শুনিনি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তবে আর বেশিদিন নয়। আচ্ছা, এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে-দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত? দেবেনের ভাইরা সব কোথায় ছিল?'' স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছেন ঃ ''সেইদিন মায়ের অগ্নিময়ী মূর্তি দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত



হইয়া গিয়াছিলাম।" কিছুক্ষণ পরে খবর এল, দুই সিন্ধুবালাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবর পেয়ে শ্রীমা বলেন ঃ "এ খবর যদি না পেতাম, তবে আজ রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না।" দু-একদিন পরে মা আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়কে বলেন ঃ "এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে না, এ আর বেশিদিন নয়।"[৬৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে (১৯১৪-১৯১৮) সরকারি দমননীতির সঙ্গে সমগ্র দেশে যখন ভয়ানক দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন শ্রীমা কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ "আগে ওদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।"[৬৮] এখানে শ্রীমা 'ওদের' বলতে স্পষ্টতই ব্রিটিশ শাসন এবং 'নিজেদের' বলতে ভারতীয়দের বোঝান। এই সময়েই তিনি দেশ স্বাধীন হবে—এমন ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল সি. এ. টেগার্ট লিখিত দীর্ঘ রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানকারী প্রাক্তন বিপ্লবীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। ধর্মের নামে রামকৃষ্ণ মিশন সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে—এমন ধারণাও সরকারি মহলে প্রবল হয়। 'আনন্দমঠ'-এ উল্লিখিত পথ অনুসরণ করে মিশনে যোগদানকারী এইসব তরুণ বিপ্লবী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে—এমন আশঙ্কাও ব্যক্ত হয়। স্বভাবতই রামকৃষ্ণ মিশন এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল 'দরবার ভাষণ'-এ রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেন ঃ "হীনমনা ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকেরা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের দল বৃদ্ধি করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে মহৎ আদর্শসম্পন্ন তরুণদের সর্বনাশ করছে। তরুণদের অভিভাবকরা এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের মিশতে দেখে খুশি হন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রুসংখ্যাই বৃদ্ধি করছেন।"[৬৯] বাংলার গভর্ণরের এই মন্তব্য রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে। তখন অনেকেই প্রাক্তন বিপ্লবীদের মঠ থেকে বিতাড়নের পরামর্শ দেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীমাকে একথা জানালে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেনঃ "ওমা! এসব কী কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের, দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।"[৭০] স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ এক পত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। এইভাবে সঙ্ঘজননী এক গভীর সঙ্কট থেকে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে রক্ষা করেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশে একই সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও বিপ্লববাদ দমনের পথ অনুসরণ করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত সচিব এডউইন স্যামুয়েল মন্টেগু ভারতে আসেন এবং তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট তৈরি হয় এবং তা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৯' পাশ হয়। অন্যদিকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ভারত সচিবের সম্মতি নিয়ে চেমসফোর্ড একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই কমিটি ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও তার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে এবং ষড়যন্ত্র দমন করার জন্য আইন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দেবে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিচারপতি এস. এ. টি. রাওলাট। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল এই কমিটি যে-রিপোর্ট পেশ করে তা 'সিডিশন কমিটির রিপোর্ট' বা 'রাওলাট কমিটির রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিডিশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার একটি বিল বা আইনের খসড়া তৈরি করে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় পেশ করে। কঠোর হস্তে বিপ্লব আন্দোলন দমন করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনে সরকারকে কয়েকটি জরুরি ক্ষমতা দেওয়া হয়। যেমন—যাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে, তাঁরা আইনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার সমস্ত বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা এই বিলের প্রতিবাদ করেন এবং তার প্রত্যাহার দাবি করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ বড়লাট চেমসফোর্ড এই বিলে সম্মতি দেন। সংখ্যাগুরু সরকারি সদস্যদের সমর্থনে এই বিলটি পাশ হয়। এই আইন 'রাওলাট আইন' নামে পরিচিত। এই বিলটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসার পর থেকেই গান্ধীজী এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। 'রাওলাট আইন' পাশ হওয়ার পর তিনি ৬ এপ্রিল ভারতের সর্বত্র হরতাল পালনের আহ্বান জানান। সকল শ্রেণির মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায়। বহু লোক হতাহত ও গ্রেপ্তার হয়। ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সেনাবাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়।

ইতোমধ্যে বহু তরুণ শ্রীমায়ের আশ্রয়লাভ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, মঠ-আশ্রমে কর্মরত রয়েছেন। স্বভাবতই সরকার মঠের ওপর কড়া নজর রাখা কখনোই শিথিল করেনি। রাওলাট সত্যাগ্রহীদের ওপর, বিশেষ করে মহিলা সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশের অত্যাচারের খবরে শ্রীমা একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেনঃ "জান, ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে, দেরি নাই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব

জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।... যে-রাজ্যে নারী-নির্যাতন চলছে, সে-রাজত্বের ধ্বংসের দেরি নাই।"[৭১] ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ লিখেছেন ঃ "নারীদের বা দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের লাঞ্ছনার কথা শুনিলে তিনি বিচলিত হইতেন।"[৭২] তরুণ নজরবন্দিদের প্রতি শ্রীমায়ের স্নেহ কত গভীর ছিল তা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা থেকেও জানা যায়। এই সময়ে সুরেশ চৌধুরী নামে এক তরুণ পুলিশের নজরবন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে কোয়ালপাড়া আশ্রমে এসে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার অনুরোধ জানায়। আশ্রমের ওপর পুলিশের কড়া নজর থাকায় আশ্রমের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সকলে তাকে বলেন শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করে এখনি চলে যেতে। শ্রীমা একথা শুনে স্বামী ঈশানানন্দকে বলেন ঃ "আহা বরদা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বিষ্ণুপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা আমার কাছে ছুটে এসেছে! তুমি যদি আজ রাত্তিরটা গ্রামের কোন লোকের বাড়িতে বা বৈঠকখানায় তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে কাল সকালেই আমি দীক্ষা দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব।" পরদিন সকালে মা তাঁকে দীক্ষা দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেন।[৭৩] এইভাবে ভয়ানক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও শ্রীমা তাঁর সন্তানদের প্রতি স্নেহে অবিচল থাকতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, ধর্মের সঙ্গে উদারতার কোন বিরোধ নেই। ধর্ম সঠিকভাবে অনুসৃত হলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার সমাজ থেকে সহজেই দূর হবে। তবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং তাঁদের সন্তানদের জীবনের আচরণের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিকটি হলো তাদের সেবা, ত্যাগ, সাহসিকতার প্রকাশ, যা সমাজকে এক মহত্তর জাতীয় ও বিশ্বচেতনার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে। ❑

সূত্রনির্দেশ

১ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৫

২ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita—Edited by Sankari Prasad Basu, Vol. II, 1982, p. 990

৩ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, পৃঃ ৭-৮

৪ ঐ, পৃঃ ১২-১৩

৫ ঐ, পৃঃ ১৩

৬ *Raja Subodh Chandra Mallik and His Times, in Bengal Past and Present,*—Amalendu De, National Council of Education, Calcutta, 1996, pp. 48-49

৭ দ্রঃ A Note on The Ramakrishna Mission, in Terrorism in Bengal, A Collection of Documents—Compiled and Edited by Amiya k. Samanta, Vol. IV, 1995, pp. 1334-1375

৮ Ibid., pp. 1341-1342. এই নোটে বলা হয়, প্যারিসে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণ ভার্মা ভূপেন্দ্রনাথকে এই আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই নোটে লেখা হয় ঃ "Keeping in the back ground this man, it is reported, was probably one of the most dangerous leaders of the revolutionists in Bengal, and his relationship with Swami Vivekananda gave him a sort of religious prestige with the fanatical members of the revolutionary party." (Ibid., p. 1342)

৯ Ibid., p. 1345

১০ Ibid.

১১ Ibid., p. 1346; গুপ্তচর বিভাগের নোটে লেখা হয় ঃ "It might be noted here that the highly revolutionary Liberty leaflets, which have been circulated, broadcast over the greater part of India during the last year commence with this watchword of Vivekananda-. 'Arise, Awake and stop not till the goal is reached.'"

১২ Ibid., p. 1350

১৩ Ibid., pp. 1350-1351

১৪ Ibid., p. 1351; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, জুন ১৯৪৯, পৃঃ ৯৬। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের পূর্বে নিবেদিতা তাঁকে 'ম্যাটসিনির আত্মজীবনী' গ্রন্থের পাঁচ খণ্ড ও ক্রপটকিনের দুটো পুস্তক দেন এবং ক্রপটকিনের পুস্তক পাঠ করতে বলেন।

১৫ 'স্বরাজ', ১০ চৈত্র ১৩১৩

১৬ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 987

১৭ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৬৭

১৮ দ্রঃ The Present Situation, in The Essential Writings of Sri Aurobindo—Edited by Peter Heehs, Oxford University Press, Calcutta, 1998, pp. 21-22

১৯ দ্রঃ Sri Aurobindo a biography and a history K R. Srinivas Iyengar, Pondicherry, August 1985, pp. 61-62

২০ দ্রঃ Sri Aurobindo : A Biography and A History—K R Srinivas Iyenger, Pondicherry, 1985, pp. 323-324

২১ Ibid., নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ *'The Dedicated'* গ্রন্থে লেখেন ঃ "Nivedita thought She could still hear the voice of Swami Vivekananda stirring up the masses. 'Arise, Sons of India! Awake.' That had been the first phase of the struggle. Now this life-giving cry was repeated differently, because the effort required in the changing circumstances was no longer identical; but the source of it was still the same! Now the new order was that every individual should become a sadhak of the nation—a seeker—so that 'One could find Himself and manifest Himself in every human being, in all humanity." Aurobindo Ghose... was, as Nivedita understood him, the successor to the spiritual Masters of the past, offering the source of his inspiration for all to drink from in Yogic solitude. Since his imprisonment at Alipur, Aurobindo Ghose was no longer a fighter but a Yogi." (quoted in Sri Aurobindo A Biography and A History, p. 324)

২২ দ্রঃ A Note on the Ramakrishna Mission, in Terrorism in Bengal, Vol. IV, p. 1350

২৩ Ibid., এই নোটে স্পষ্ট করে লেখা হয় ঃ "The teaching of Aurabinda Ghosh, the leader of the Manicktola conspiracy, were modelled on the same lines as Swami

Vivekananda's, but with a more definite appeal to force or Sakti, which he maintained was necessary for the regeneration of India."

২৪ Ibid., pp. 1354-1359; Sri Aurobindo: A Biography and A History, p. 179. আয়েঙ্গার লেখেন, সম্ভবত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভবানী মন্দির' লিখিত হয়।

২৫ দ্রঃ A Note on The Ramakrishna Mission in, Terrorism in Bengal, Vol. IV, p. 1354

২৬ Ibid., পুলিশ বিভাগের নোটে লেখা হয় ঃ "During the enquiries into the Maniktala bomb case, the Mission again attracted the attention of the police. Arabinda Ghosh, the leader of these conspirators, in his defence, said, 'At one time I contemplated a large religious movement based on the Vedanta movement and spreading over India, England and America, as I firmly believed, and still, believe that Vedantism is the future religion of the world. With that view I worked hard for a few months and approached many of my friends and acquaintancy.'"

২৭ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬২

২৮ অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তর'—অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলক ও সম্পাদক), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২০০১

২৯ ঐ, পৃঃ ৫৬২; ভূমিকা, পৃঃ ২০

৩০ ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ২২

৩১ ঐ

৩২ ঐ, পৃঃ ২৬

৩৩ ঐ, পৃঃ ৩৫

৩৪ A Note on The Ramakrishna Mission, in Terrorism in Bengal, Vol. IV, pp. 1357-1358

৩৫ Ibid., p. 1358

৩৬ Ibid.

৩৭ Ibid., pp. 1358-59. গুপ্তচর বিভাগের নোটে ছাত্রদের নিকট স্বামী নির্মলানন্দের বক্তব্য থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয় ঃ "We want boys, not the old, boys energetic, not enervated, weak adults. Secure all boys for the work. This Math is for your use. Not to speak of the deliverance of the country, you will be able to deliver the world."

৩৮ Ibid.

৩৯ Ibid., হরেন্দ্রচন্দ্র পাল তাঁর ডায়েরিতে লেখেন ঃ "To day we all seek to cross over to the other bank of this small river Ganges. When we shall be able to unfurl the banner of independence on the other side of thraldom and make all sides resound with the throbbing of triumphant drum and the cries of 'Bande Mataram", then we should be so very happy. To think of it even in imagination the mind becomes filled with energy and joy."

৪০ Ibid.

৪১ Ibid., pp. 1359-1360

৪২ Ibid., pp. 1360-1364; আমার জীবন কাহিনী—পুলিনবিহারী দাস, অমলেন্দু দে সম্পাদিত, ১৯৮৭। এই গ্রন্থে বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৪৩ A Note on The Ramkrishna Mission, in Terrorism in Bengal, Vol. IV, p. 1360

৪৪ Ibid., pp. 1360-1361

৪৫ Ibid., p. 1361. লিয়াকৎ হোসেনের ভূমিকা আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—Raja Subodh Chandra Mullik and His Times, in Bengal Past and Present এবং অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তর' দ্রঃ A Note on The Ramkrishna Mission, in Terrorism in Bengal, Vol. IV, pp. 1362-1365

Ibid., pp. 1367-1369

Ibid., p. 1370

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১৪০৮, পৃঃ ৩৩০

৫০ ঐ, পঃ ২৬৩

৫১ ঐ, পৃঃ ২৬২

৫২ ঐ, পৃঃ ১৭৩

৫৩ শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিকথা- - শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১৯৭১, পৃঃ ১০

৫৪ 'উদ্বোধন', ৪৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫১, পৃঃ ৫৫

৫৫ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৫৬

৫৬ ঐ, পৃঃ ৪৬০-৪৬১

৫৭ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত, ১৩৭০, পৃঃ ২৩৩-২৩৪

৫৮ দ্রঃ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬২

৫৯ ঐ, পৃঃ ৪৬১-৪৬২

৬০ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, পৃঃ ৩৭-৪১

৬১ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, ১ম সং, পৃঃ ২১-২২

৬২ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬৪

৬৩ শ্রীমা সারদা দেবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৬৪

৬৪ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬৪

৬৫ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ২৮৮

৬৬ 'রাখাল বেণু', মাঘ ১৩৮৭—চৈত্র ১৩৮৮, পৃঃ ২৯৩

৬৭ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৫৪

৬৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৫১

৬৯ ঐ, পৃঃ ৪৬৯-৪৭০; লর্ড কারমাইকেলের 'দরবার ভাষণ'-এর স্থান কোথায় ছিল এই নিয়ে বিতর্ক আছে। কারো মতে, কলকাতায় ভাষণটি দেওয়া হয়, অন্যদের মতে দিল্লি কিংবা ঢাকায়। স্বামী ত্যাগরূপানন্দ লিখিত সাম্প্রতিক ইংরেজি প্রবন্ধে এটি কলকাতায় হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। (দ্রঃ The Wonder that She is Swami Tyagarupananda, The Statesman, 16 December 2003, p. 9)

৭০ 'উদ্বোধন', বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ২০৩; শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বক্তব্যটি ভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ "ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।"

৭১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা স্মৃতি—সুজিত নাগ সম্পাদিত, ১৩৭৮, পৃঃ ৩২৬-৩২৭

৭২ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, ক্যালকাটা বুক হাউস, ৮ম সং, পৃঃ ১৮৩

৭৩ মাতৃসান্নিধ্যে, পৃঃ ১১১



চৈতন্যজীবনীকাব্য ঃ দুই প্রধান কবির ভাব ও ভাষায়

তাপস বসু*

॥১॥

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে এক নতুন জীবনচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যের 'রাধাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপম্' ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক যুগজীবনকে একান্তই অভিভূত করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁর দিব্যজীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর মুরারি গুপ্ত ও পার্ষদ-স্বরূপ দামোদর সংক্ষিপ্ত কড়চা আকারে সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনীকথা রচনা করেন। তাঁর তিরোধানের পর কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী সংস্কৃতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, চূড়ামণিদাস প্রমুখ কবিরা চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করে খ্যাতিমান হন। চৈতন্যজীবনীসাহিত্য পুরোপুরি আধুনিক জীবনীসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। বাঙলা সাহিত্যে তখন ঐশী মহিমাই প্রধান ছিল, সাহিত্যের জগৎ ছিল দেবতার অধীন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের জীবন নিয়ে রচিত কাব্যগুলি লৌকিক-সাংসারিক জীবনকে সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করল। মানবমহিমার জয়গান হলো উদ্গীত। জীবনীকাব্যের কবিরা মহাপ্রভুর মর্ত্যলীলাকে অবলম্বন করলেও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী, অলৌকিকতার স্পর্শ ও ভক্তির আতিশয্যে মানবজীবনের স্বরূপ মাঝে মাঝেই আবৃত হয়েছে। কারণ, জীবনীকারদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু শুধু সামান্য মনুষ্যমাত্র নন— তিনি বহিরঙ্গে কৃষ্ণ, অন্তরঙ্গে রাধা।

বাঙলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীকাব্যের প্রধান দুই কবি বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। প্রথম চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্যরচনার কৃতিত্ব বৃন্দাবনদাসের। পরবর্তী কালে চৈতন্য-জীবনীকারেরা সকলেই তাঁর কাব্যের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও অপরাপর কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থে বৃন্দাবনের কাব্য 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই উল্লিখিত হয়েছে। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, বৃন্দাবনদাস প্রথমে নিজের কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রেখে-ছিলেন, পরে লোচনদাস এই নামে একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করলে কবিজননী নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম বদল করে রাখেন 'চৈতন্যভাগবত'। নিত্যানন্দদাস লিখিত 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব ইতিহাস-গ্রন্থে এই বিষয়ে একটু ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা অনেকাংশেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়—

"চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"[১]

শ্রীমদ্ভাগবতে যে-ক্রমানুসারে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে, বৃন্দাবনদাস সেই ক্রম অনুসরণ করেই চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন। সেইদিক থেকে বিচার করে দেখলে বৃন্দাবনদাসের কাব্যগ্রন্থের নতুন নামকরণ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আত্মপরিচয় না থাকায় কবির জীবনতথ্য সবিশেষ জানা যায় না। জননী নারায়ণী ছাড়া কেবল একবার তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলেছেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য বৃন্দাবনদাসের ঘটেনি। সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে কবির জন্ম হয়। তাঁর আক্ষেপোক্তি তাই ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে ঃ

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে মুখ দরশনে॥"[২]

জননী নারায়ণী সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন 'শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা'। বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। তাঁর উক্তি থেকেই জানা যায় যে, মহাপ্রভুর গয়া থেকে ফিরে আসার কালে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে নারায়ণীর বয়স ছিল চার বছর। গয়া-প্রত্যাগত চৈতন্যদেবের প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি ভাববিহ্বল হয়েছিলেন ঃ

"চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কান্দে নাহিক সম্বিত॥"[৩]

এর ১৩-১৪ বছরের মধ্যে অন্ততপক্ষে ১৪৪০ শকের আগে নারায়ণীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি অনুমান করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনদাস যে উল্লিখিত সময়ের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন বৃন্দাবনদাস। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর নিত্যানন্দ ৮-১০ বছর এবং অদ্বৈত প্রায় ১০-১২ বছর জীবিত ছিলেন। এইসব যুক্তির সাহায্যে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন, বৃন্দাবনদাস আনুমানিক ১৪৪০ শকের (১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ) নিকটবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রথমে অনুমান করেন, ১৪২৯ শকে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; পরে তিনি ১৫৪৭ শকের পক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ষোড়শ শতাব্দীর দশের কোঠায় বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যমধ্যে লিখেছেন ঃ

"সর্বশেষ ভৃত্যতান বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥"[৪]

এক্ষেত্রে 'তিনি' সর্বনামের উদ্দেশ্য-রূপে ডঃ সুকুমার সেন শ্রীচৈতন্যকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র 'চৈতন্যভাগবত'-এ এই

* *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও সুলেখক, বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক।*

সিদ্ধান্তের সঙ্গতি লক্ষিত হয় না। নিত্যানন্দকে নিজ ইষ্ট বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবনদাস। যেমন—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"[৫]

অথবা—

"ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"[৬]

তাই এইসব সিদ্ধান্ত বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবকাল-রূপে যে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ বা তার নিকটবর্তী কালকে বুঝিয়েছেন—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সঙ্গত।

বৃন্দাবনদাসের রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। তাঁর গ্রন্থে মুরারি গুপ্তের রচনা থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে। এছাড়া চৈতন্যজীবন বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের গয়া প্রত্যাগমন পর্যন্ত বহু ঘটনার বর্ণনা মুরারি গুপ্ত রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে গৃহীত হয়েছে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনদাসের প্রসঙ্গ এসেছে। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'গৌড়গণোদ্দেশ-দীপিকা'র আভ্যন্তরীণ উপাদানের তুলনাত্মক আলোচনা ও আরো বহু তথ্য বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন যে, ১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেকোন সময়ে বৃন্দাবনের কাব্য রচিত হয়েছে।

'চৈতন্যভাগবত' আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত। আদিখণ্ডের ১২টি অধ্যায়ে চৈতন্যের জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়ায় পিতৃপিণ্ড প্রদানের পর নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পর্যন্ত বর্ণিত। এই পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হলো ঃ 'গৌরাঙ্গের জন্মলীলা', 'পাঠাভ্যাসাদি', 'শৈশবের খেলাধূলা', 'নিত্যানন্দের জন্ম', 'ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন', 'দিগ্বিজয়ীর পরাভব কাহিনী', 'লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু', 'বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ', 'গয়া গমন' প্রভৃতি। ২৬ অধ্যায়ে বিধৃত মধ্যখণ্ডে গয়া-প্রত্যাগমন থেকে শুরু করে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী বিন্যস্ত। 'নগর সঙ্কীর্তন', 'নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলন', 'অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ', 'জগাই-মাধাই উদ্ধার', 'কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ' ইত্যাদি এই খণ্ডের উল্লেখ্য বিষয়। ১১টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত অন্ত্যখণ্ডে 'নীলাচল গমন', 'জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ', 'সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' প্রভৃতি। এই খণ্ডে 'নিত্যানন্দলীলা' ও 'অদ্বৈতলীলা' বর্ণিত হয়েছে।

বৃন্দাবনদাস সংস্কৃত সাহিত্যে ছিলেন সুপণ্ডিত। মুরারি গুপ্তের 'কড়চা', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'পদ্মপুরাণ', 'বরাহপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' থেকে কবি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'জৈমিনি ভারত' ও 'মনুসংহিতা' থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও 'চৈতন্যভাগবত' কিন্তু নীরস দার্শনিক তত্ত্বভারে ভারাক্রান্ত হয়নি। বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুকে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন; কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, তাঁর কাব্যে ভক্তিরসের সঙ্গে জীবনরসের স্বতঃস্ফূর্ত মেলবন্ধন ঘটেছে। অবতার শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণিত হলেও মানুষ শ্রীচৈতন্যদেব উপেক্ষিত হননি। শ্রীচৈতন্যের দিব্য ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি দেখাতে গিয়ে কবি তাঁর মানবিক আচরণগুলিকেও একান্ত বাস্তবোচিত করে তুলেছেন। ভাগবতের অনুসরণেই কবি স্বয়ং মহাপ্রভুর কণ্ঠেই চৈতন্যাবতারের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন ঃ

"সঙ্কীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইনু সর্বদেশে কীর্তন-প্রচার॥"[৭]

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস অলৌকিক-অপার্থিব প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন; বস্তুত, শ্রীচৈতন্যের ওপরে কবি আরোপ করেছেন কৃষ্ণাবতারের বহু মুখ্য ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা 'চৈতন্যভাগবত'-এ অপূর্ব কাব্য-চমৎকৃতির সৃষ্টি করেছে। প্রায় সমগ্র কাব্যটিই অনাড়ম্বর বর্ণনাধর্মী ভাষায় পয়ার ছন্দে রচিত—যেখানে ত্রিপদী ছন্দ কবি প্রয়োগ করেছেন, সেখানেও বর্ণনামূলকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ সমসাময়িক সমাজ-জীবনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। এই গ্রন্থে বাংলার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের আলেখ্য চিত্রায়িত হয়েছে। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি বিষয়ে কবি লিখেছেন ঃ

"নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"[৮]

কিন্তু এই নবদ্বীপই আড়ম্বর-বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় নিমজ্জিত থেকে জীবনের যথার্থ সত্যস্বরূপ থেকে বঞ্চিত—

"নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥"[৯]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু-উৎপীড়ন ও স্মার্তশক্তি প্রভৃতি অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-বিরোধিতা, বৈষ্ণব-নিন্দা ও পরিহাস প্রভৃতির উল্লেখে বৃন্দাবনদাস সমকালীন বাংলার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন।

নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ভ্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাই এই অংশের বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের কাব্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। বাস্তব ঘটনার বিন্যাসে ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি এবং অলৌকিক ঘটনা সংযোজনার প্রবৃত্তি থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ী বৈষ্ণবদের মধ্যে মতানৈক্য, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার সম্পর্কে একমাত্র উপজীব্য। এই গ্রন্থ রচনার সময় বৃন্দাবনদাস আদর্শরূপে যখন মুরারি ও কবি কর্ণপুরের জীবনীকে

পেয়েছিলেন, তখন চৈতন্যের নীলাচল লীলার বর্ণনা কেন দিলেন না, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকাহিনী একেবারেই কেন বাদ দিলেন—এটাই প্রশ্নের বিষয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর উল্লেখ করেছেন। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে চৈতন্যজীবন সম্পর্কে তথ্য আহরণে কবির অক্ষমতার বিষয়টিকে গ্রহণীয় মনে হয় না। এমন হতে পারে, চৈতন্যদেবের জীবনের যে-পর্বটিকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনে ষড়্‌গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন গড়ে তুলেছেন, সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রতি আকর্ষণের অভাব ছিল বৃন্দাবনদাসের। তিনি হয়তো সেই চৈতন্যদেবের স্বরূপ মহিমা প্রভাসিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, যার সঙ্গে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি ছিল। একারণেই জীবন-আখ্যান-রূপে 'চৈতন্যভাগবত'-এর অসম্পূর্ণতা পাঠককে অতৃপ্ত রেখেছে। ভক্তরূপে ভগবানের লীলা বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়েই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলার মধ্যে অলৌকিকত্বের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কাব্যের সূচনা থেকেই মহাপ্রভুকে তিনি কৃষ্ণাবতার-রূপে স্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্যের নরদেহে 'মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল'। শচীর গর্ভস্থিত শ্রীচৈতন্যের আরাধনার উদ্দেশ্যে স্বর্গের দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীতে, শিশু নিমাই দত্তাত্রেয়াদি ভাবের দৈবী বিভূতির অধিকারী হয়ে কখনো রাম, কখনো বা বামনের ভাব অঙ্গীকার করছেন। মহাপ্রভুর দেহে বরাহ অবতারের চিহ্নাদি পর্যন্ত বিবৃত করেছেন বৃন্দাবনদাস। শিশু নিমাইয়ের পদসঞ্চালনে নূপুরের অনুরণন, তাঁর পদচিহ্নে ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকার বিভিন্ন চিহ্ন গোচরীভূত করেছেন। আরেকটি বিষয় নিয়েও 'চৈতন্যভাগবত'-এর পাঠকের প্রশ্ন উচ্চকিত হতে পারে। সেটি হলো 'চৈতন্যভাগবত'-এ নিত্যানন্দের প্রসঙ্গের অতিরেক। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, বৃন্দাবনদাসের গুরু নিত্যানন্দ এবং তাঁরই নির্দেশ শিরোধার্য করে বৃন্দাবনদাস গ্রন্থরচনায় প্রয়াসী হন। তাই সমগ্র কাব্য জুড়ে নিত্যানন্দও বন্দিত হয়েছেন; আর একথাও স্বীকার্য যে, কবি বিশ্বাস করতেন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামই চৈতন্য ও নিত্যানন্দ-রূপে কলিকালের পাপ দূরীভূত করতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। নামসঙ্কীর্তন প্রচারকল্পে নিত্যানন্দ অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলেই নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে আরো বেশি প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণব সমাজে সেইসময় নিত্যানন্দ-বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। কবি তাদের ভর্ৎসনা করেছেন—তাঁর নিদারুণ কটাক্ষ কোথাও কোথাও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে গেছে ঃ

"এত পরিবারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥"[১০]

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের লেখনীতে এমন উক্তি পাঠকের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিয়ে দেখলে ষোড়শ শতাব্দীর সমাজজীবন ও বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের নানাবিধ তথ্যের প্রকাশে কাব্যটির মূল্য অপরিসীম।

॥২॥

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। চৈতন্যদেবের জীবনের তথ্যাবলী ও ইতিহাস রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য জীবনকে অবলম্বন করে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা, ওড়িশা ও বৃন্দাবনের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক মতাদর্শ কবির গভীর নিষ্ঠা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে কাব্যকৌলীন্য লাভ করেছে। কবির বক্তব্যানুযায়ী তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য দুটি—প্রথমত, চৈতন্যজীবনের শেষ বারো বছরের অন্তরঙ্গ অলৌকিক লীলারস গৌড়জনের কাছে পরিবেশন এবং দ্বিতীয়ত, পূর্বসূরিদের প্রদত্ত তথ্যের পাদপূরণ ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক যেসব তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছিলেন, সেগুলি বর্ণন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বেদতুল্য প্রামাণিক গ্রন্থরূপে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তো বটেই, বিশ্ব দার্শনিকমহলেও সমাদৃত হয়েছিল এবং এখনো তা কোনভাবে হ্রাস পায়নি। যুক্তির পারম্পর্য ও মনস্তত্ত্বের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ওপরেই কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন হৃদয়াবেগের মিস্টিক অভিব্যক্তিকে। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতিভা ইউরোপীয় Scholastic Philosopher-দের প্রতিস্পর্ধী।

আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কবি নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে বাস করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে কবি বৃন্দাবনে যান; সেখানেই তিনি উপনীত হন রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সমীপে এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ঝামটপুর গ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন মুকুন্দদেব গোস্বামী রচিত 'আনন্দরত্নাবলী' নামক এক গ্রন্থ পাঠ করে, কিন্তু এক্ষেত্রে কবি-প্রদত্ত তথ্যই প্রামাণ্য বিবেচিত হওয়া সঙ্গত। কবির পিতা ভগীরথ, মা সুনন্দা।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকাল নিয়ে বহু মতানৈক্য আছে। এই গ্রন্থের অনেকগুলি পুঁথিতে রচনাকাল নির্দেশক একটি শ্লোক পাওয়া যায় ঃ

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসীত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"[১১]

এই শ্লোককে অনুসরণ করলে সিদ্ধান্ত করা যায়, ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবার দিন বৃন্দাবনধামে কৃষ্ণদাসের কাব্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের পাঠান্তরকে গ্রহণ করলে গ্রন্থ-সমাপ্তির বছর হয় ১৫০৩ শকাব্দ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছুকাল আগে রচিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, আনুমানিক ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রথম বৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

দীনেশচন্দ্র উদ্ধৃত শ্লোকটিকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা সমাপ্তির কাল বলে নির্দেশ করেছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিনটি লীলাপর্যায়ে বিন্যস্ত। আদিলীলার ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৯টি পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিলীলায় চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, অদ্বৈত-নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় ছাড়াও শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, কৈশোর ও সন্ন্যাস বর্ণিত হয়েছে। মূলত বৃন্দাবনদাসকেই কবি অনুসরণ করেছেন। যেখানে বৃন্দাবনদাস বর্ণনা ও বিশ্লেষণকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, কৃষ্ণদাস সেখানে মূল সূত্রটিকে ঠিক রেখে বিষয়কে বিস্তৃত রূপ দিয়েছেন। মধ্যলীলায় আছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান পর্যন্ত ৬ বছরের বর্ণনা। নীলাচল, রাঢ়দেশ ভ্রমণ, দাক্ষিণাত্যে নানা তীর্থ পর্যটন, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, বৃন্দাবন যাত্রা, প্রয়াগে রূপ গোস্বামী ও বারাণসীতে সনাতন গোস্বামীকে ধর্মশিক্ষা প্রদান, রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষ আঠারো বছরের পরিচয় সুমুদ্রিত। কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানরহিত প্রভুর দিব্যলীলা পরিব্যক্ত হয়েছে এই পর্বে—যা কোন জীবনীকারই দিতে পারেননি তাঁদের কাব্যে। দিব্যভাব বর্ণনা করেই থেমে থাকেননি কৃষ্ণদাস, এই অবস্থার স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সুচারুরূপে।

বৃন্দাবনদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত মনোভাব অনেকটাই ভাবাবেগনির্ভর। ভক্তপ্রাণের আকুলতাই সেখানে প্রধানরূপে প্রতীয়মান—সচেতনভাবে কোন তত্ত্ব বা দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই সেখানে। অন্যদিকে, কৃষ্ণদাসের কাব্যে চৈতন্য-জীবন ও বাণীর একটি দার্শনিক রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা আছে এবং তা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যও আবেগমুখী, তবে সেই আবেগ বাধাবন্ধনহীন নয়, তটরেখার দ্বারা সীমাসংহত। কুলপ্লাবী না হয়ে এক নির্দিষ্ট মোহানার অভিমুখী। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ শ্রীচৈতন্যের প্রকট লীলা বর্ণনে কৃষ্ণদাস ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করেছেন। বৈদান্তিকের মতোই করেছেন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এও এসেছে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত হলো আদিলীলার 'আত্রভক্ষণ', মধ্যলীলায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর মস্তককর্তন ও পুনঃসংযোজন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ রূপপ্রদর্শন, অন্ত্যলীলায় রুদ্ধ কক্ষ থেকে প্রভুর নিষ্ক্রমণ, একটি হাতের দীর্ঘীভবন ইত্যাদি। বৃন্দাবনদাসের সহজ ভক্তির আলোক এই অপ্রাকৃতের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। এই অলৌকিকতা নির্বিচার—অনেকাংশেই ভক্ত-হৃদয়ের ভাবনাজাত। অন্যদিকে দার্শনিক ভাব ও চেতনার অধিকারী কৃষ্ণদাসেরও ভক্তিনিষ্ঠা তাঁর বৈষ্ণব স্বভাবকে প্রকট করে। 'চৈতন্যভাগবত' যদি 'ভাগবত'তুল্য হয়, কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' সেক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ।

কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের 'পতিতপাবণি' ব্যক্তিত্বকেই প্রভাসিত করেছেন। প্রেমই তাঁর সাধনার মূলে—এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমের দ্বিধাগতি—কৃষ্ণমুখী ও মানবমুখী। রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের সাধনা কৃষ্ণপ্রেম, আর এই প্রেমই তাঁকে মানবমুখী করেছে। বাস্তবজীবন-জনিত দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক চেতনা, দার্শনিক-মননশীলতা, ভক্তিভাব, বিচারবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তির সমাহারে কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলিকে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করেছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রাগানুগা-ভক্তি, প্রেমবিলাসবিবর্ত, সখী বা গোপীতত্ত্ব, রাধা ও কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ সহজ সুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বের এমন নিপুণ ব্যাখ্যা অন্য কোথাও দুর্লভ ঃ

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানী॥"[১২]

এই 'সম্বিৎ', 'আনন্দ' এবং 'সৎ' একত্রে 'মহাভাব'রূপে উদ্গত হলে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্ভব ঘটে। রাধা হলেন সেই 'মহাভাবঠাকুরানী'।

॥৩॥

বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য। শ্রীচৈতন্যচরিত্র এই গ্রন্থে ভাগবতের আদর্শে রূপায়িত হওয়ায় কবির পৌরাণিক ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবত্বের বিষয়টিই প্রধান হয়েছে শিশু নিমাইকে কৃষ্ণাবতাররূপে অঙ্কন করায়। নিমাইয়ের চঞ্চলতা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে ঃ

"গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
উঠি হাসে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গভঙ্গি করি নাচে গৌরচন্দ্র
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥"[১৩]

শিশুর এই চাঞ্চল্যের মধ্যেই অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ লক্ষিত হয়েছে ঃ

"খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে-সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥"[১৪]

গয়া-প্রত্যাগত নিমাইয়ের ভাববিভোর তন্ময় রূপটি বর্ণিত হয়েছে এইভাবে ঃ

"পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্নান॥...
কৃষ্ণরে প্রভুর মোর কোন্ দিগে গেলা।
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥"[১৫]

শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের বাণীরূপটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে ঃ

"হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল।
সর্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল॥
চৌদিকে শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দনে।
গোপিকার বেশে নাচে মাধব নন্দনে॥"[১৬]

বৃন্দাবনদাসের ভাষা অলৌকিক ভাবরসসিক্ত। Euphyny-র প্রাধান্যই এই জাতীয় রচনার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। ভাষা আবেগঋদ্ধ হওয়ায় পয়ারের চরণের মধ্যেই সুরের রণন অনুভূত হয়। পয়ারের শোষণ-ক্ষমতার কারণেই যুক্ত ব্যঞ্জনাশ্রয়ী শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় বদ্ধ হয়েছে। যেমন ঃ

"অপূর্ব ষড়্ভুজ মূর্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়॥"[১৭]

বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বা ক্রিয়ারূপের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যুগশৈলীর প্রভাব পড়েছে। 'হইলা', 'চলিলা', 'শুনিলেক', 'ধরিবেক' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'হেন' বিশেষণ যোগে অজস্র বাক্যের ব্যবহার সর্বত্র দেখা যায়। যেমন—'হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্', 'হেন মতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়', 'হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার', 'হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ' ইত্যাদি। 'চৈতন্যভাগবত'-এ ব্যবহৃত ধ্রুবপদগুলিতে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি ও আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন ঃ

"যাইবা কোথায় আজি রাখিমু বান্দিয়া।
ক্ষণে বলে প্রভু ক্ষণে বলে মাতালিয়া "[১৮]

'যাইবা', 'রাখিমু' 'মাতালিয়া' ইত্যাদি শব্দে আঞ্চলিকতার প্রভাব আছে। ভাটিয়ালি গানের প্রভাব পড়েছে উল্লিখিত শব্দগুলিতে।

ডঃ সুশীলকুমার দে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর ভাষা-শিল্পীকে 'quaint and laboured diction' বলেছেন, ডঃ সুকুমার সেনও কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার মধ্যে ব্রজবুলির মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন। বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাসের তুলনায় কৃষ্ণদাসের ভাষারীতি-রচনাশৈলী কঠিন। এর কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীদের ছত্রছায়ায় বসে রচনা করেছেন তাঁর কাব্যটি। বৃন্দাবন গোস্বামীরা ইচ্ছাসত্ত্বেও গৌড়বাসীকে গৌড়ীয় তত্ত্বদর্শন সহজভাবে বোঝাতে সক্ষম হননি, দেবভাষা সংস্কৃতে তাদের গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল বলে। তাঁদের ইচ্ছাতেই কৃষ্ণদাস তাঁদের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্ব চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে বাংলায় প্রচার করলেন। কবিরাজ গোস্বামীকে এই গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করতে হয়েছে, তার ফলে ভাষার সহজ-সরসতা এবং কবিত্ব মাঝে মাঝেই ক্ষুন্ন হয়েছে। সন্ধিযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দ এবং পদ একারণেই এই কাব্যে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন ঃ 'বিঘ্নবিনাশন', 'পাদপদ্ম', 'পূর্বশৈল', 'ষড়ৈশ্বর্য', 'পুলকাশ্রু', 'সচ্চিদানন্দময়', 'উদঘূর্ণা' প্রভৃতি। পয়ারের শোষণ-ক্ষমতার পরিচয় এই গ্রন্থে সর্বত্রই প্রায় লক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন ঃ "প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।/ ধীরধীরাত্মক গুণ, অঙ্গে পট্টবাস।" "কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত। / গুণশ্রেণি পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত॥" "স্বাঙ্গবিশেষাভাস রূপে প্রকৃতিস্পর্শন। জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥" "পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য স্বয়ং চৈতন্য ভগবান্। তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীবস্ফুলিঙ্গ সমান॥"[১৯]

সংস্কৃতাশ্রয়ী তৎসম শব্দের প্রয়োগ যেমন করেছেন কবি, তেমনি তার সঙ্গে অনায়াস দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন ব্রজবুলি শব্দ—যেমন ঃ "যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটি সংখ্যা লোক।/ দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক", "তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার", "ঐছে যদি পুন কর তবে না সহিমু" ইত্যাদি। যুক্ত ব্যঞ্জনের যে দৃপ্ত কঠিন ভাব, তাতে কবি আশ্চর্য স্নিগ্ধতার বাতাবরণ এনে দিয়েছেন ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহারে। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে অতীতকালের ক্রিয়াপদে 'আ' প্রত্যয় যোগ বহুল পরিমাণে প্রথম পুরুষে। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক'-এর যোগ কিছু কিছু লক্ষিত হয়। 'হেন' বিশেষণ যোগে বাক্যগঠনের রীতি যেমন সেই যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি পঞ্চমী বিভক্তি 'হৈতে' ব্যবহার করে বাক্য গঠনের দৃষ্টান্তও প্রচুর। যথা—"সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়", "তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ" ইত্যাদি।

॥৪॥

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' দুটিই আকরগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনী জানতে হলে প্রথমটির দিকে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন জানার জন্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' আমাদের পড়তেই হবে। ব্যক্তি-জীবনানুভূতি, সময় ও সমাজ পরিবর্তনে অনিবার্যরূপে কাব্যদুটির ভাব-ভাষা-রীতি-নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কালের অমোঘ নিয়ম মেনে তার পর্যালোচনায় ব্রতী হলে কোন অসুবিধা নেই।❑

● **তথ্যসূচী ঃ** (১) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত— বৃন্দাবনদাস, ভূমিকা, সম্পাদনা — রাধানাথ কাবাশী, ১৯৩১, শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির, ধান্যকুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা; (২) ঐ, মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়; (৩) ঐ, ২য় অধ্যায়; (৪) ঐ, অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়; (৫) ঐ, আদিখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়; (৬) ঐ, ১ম অধ্যায়; (৭) ঐ, মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়; (৮) ঐ, আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়; (৯) ঐ; (১০) ঐ, মধ্যখণ্ড, ২৩ অধ্যায়; (১১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্—মুরারি গুপ্ত, উপসংহার, শ্লোক-৪; (১২) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ; (১৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিকাণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, (১৪) ঐ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়; (১৫) ঐ, মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়; (১৬) ঐ, (১৭) ঐ, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়; (১৮) ঐ, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, (১৯) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

এই রচনাটি 'রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক প্রবন্ধ'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ভারতের বাইরে অসুরনাশিনী—মহিষমর্দিনী

দেবব্রত দাস*

দেবী দুর্গার সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি হলো অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়। তাঁর এই বীরত্বের কাহিনী 'দেবীমাহাত্ম্য' ও 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এ উল্লিখিত রয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী, দেবতাদের তেজ থেকে দেবী চণ্ডিকা নামে এই দেবীর জন্ম হয়েছিল। মহিষাসুর ইন্দ্রকে বিতাড়িত করে নিজেই স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। দেবী অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সমগ্র অসুরবাহিনীকে বিনাশ করেন। এরপর চণ্ডিকার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহিষাসুর নানা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। বিশেষ করে মহিষের রূপ ধারণ করার জন্য তিনি 'মহিষাসুর' নামে পরিচিত হন। অবশেষে দেবী এই মহিষের কাঁধে পা রেখে তাকে শূলাঘাত করেন। তখন মহিষের মুখ থেকে 'মহিষাসুর' নিজের স্বরূপে নির্গত হন। দেবী তখন খড়্গাঘাতে তাঁকে বধ করেন। তাই 'মহিষাসুরমর্দিনী'-রূপেই দেবী আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিতা।

সপ্তম শতাব্দীতে কবি বাণভট্ট এই মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে দেবীর রূপবর্ণনা করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'চণ্ডীশতক'-এ। মহাকাব্যের যুগের শেষদিকে দুর্গাপূজার ধারা রীতিমতো প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। 'হরিবংশ' ও পুরাণের সময় মাতৃসাধনা আরো প্রবল হয়। তবে তন্ত্রের আবির্ভাবের পর দেবীমাহাত্ম্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর আগে তা আর কখনো হয়নি।

মহিষাসুরমর্দিনী যে কেবল ভারতেই প্রচলিত তা নয়, ভারতের বাইরেও অর্থাৎ তৎকালীন বৃহত্তর ভারতেও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি প্রচলিত ছিল। কম্বোজে ইন্দ্রবর্মণের 'বেকঙ্' (Bekong) প্রত্নলিপিতে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার কথা আছে।[১] যবদ্বীপে পাওয়া গেছে মহিষাসুরমর্দিনীর ষড়্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা এবং দ্বাদশভুজা মূর্তি। বাতাবিয়া মিউজিয়ামে কতকগুলি সুন্দর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি রক্ষিত আছে।[২] বলিদ্বীপে একাধিক মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। কুত্রি নামে যে-মূর্তিটি (খ্রিস্টীয় ১০ম-১২শ শতক) পাওয়া গেছে, সেটি অতি চমৎকার।[৩]

বিভিন্ন যুগের মহিষমর্দিনী মূর্তির এবং বিভিন্ন গ্রন্থে দেবীর ঐ রূপের বর্ণনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দেবী দ্বিভুজা থেকে আরম্ভ করে বিংশতিভুজা, অষ্টবিংশতিভুজা, এমনকি দ্বাত্রিংশতিভুজা-রূপে বর্তমান। অবশ্য প্রাচীন মূর্তিগুলিতে দেবী কেবল দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা।[৪]

প্রাচীনকালে মহিষমর্দিনীরূপে দেবীকে সাধারণত সিংহারূঢ়া এবং একটি মহিষকে অথবা একটি মহিষের মস্তক-সহ পুরুষকে অথবা একটি মহিষের গলা থেকে নির্গতপ্রায় একটি পুরুষকে নিধনরতা অবস্থায় দেখা যায়। অর্থাৎ মহিষাসুরমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মূর্তিগুলিতে দেবীকে মহিষমর্দনরতা অর্থাৎ মহিষমর্দিনীরূপে দেখা যায়। সুতরাং দেবীকে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে 'মহিষমর্দিনী'-রূপে চিহ্নিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মূর্তির কাল খ্রিস্টপূর্ব বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মূর্তি হিসাবে যে-ভাস্কর্যটি দাবি করতে পারে, সেটির কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে নয়। পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ এই অর্ধভগ্ন মূর্তিটি পাওয়া গেছে মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল সঙ্খ-এ (Sonkh) উৎখননের সময়। যে-স্তরে মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তার কাল রাজা সূর্যমিত্রের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে অনুমিত।[৫]

প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখে মনে হয়, মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দুটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) দেবীর সঙ্গে বাহনরূপে সিংহের অবস্থান এবং (২) দেবী কর্তৃক মহিষকে অথবা মহিষাসুরকে মর্দন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে পরবর্তী কালে রচিত 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ', 'মৎস্যপুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা আছে মার্কণ্ডেয়পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে। কিন্তু এই পুরাণ বা উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির কোনটিই মহিষমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মূর্তিগুলির সমকালীন নয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক যুগে দুর্গা এক প্রধানা মাতৃদেবীরূপে পরিচিতা হলেও নিশ্চিতরূপে খ্রিস্টীয় বা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তী কোন আকরগ্রন্থে দেবীকে 'সিংহবাহিনী' এবং 'মহিষমর্দিনী' বা 'মহিষাসুরমর্দিনী'-রূপে বর্ণনা করা হয়নি।[৬] মহাভারতে পাণ্ডবদের দুর্গাপূজাতেও দেবীর পরিচিত মহিষমর্দিনী রূপ কল্পিত হয়নি

* *তন্ত্র, পুরাণ ও উপনিষদ্ বিষয়ে গবেষক, বিভিন্ন রচনা ও গ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।*

সিংহের সঙ্গে দুর্গার যোগাযোগ খ্রিস্টীয় বা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর আগে না ঘটলেও পশুরাজের সঙ্গে কিছু অভারতীয় দেবীর সম্পর্ক অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে মাতৃদেবী সম্পর্কে যেসব ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস (cult) প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ (১) দেবীর বাহন হিসাবে সিংহের উপস্থিতি এবং (২) দেবাসুরের যুদ্ধে দেবীর অংশগ্রহণ ও অসুরনিধন। উদাহরণ হিসাবে অভারতীয় দেবী ব্যাবিলনীয় 'ননা'র কথা ধরা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টীয় ও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 'পশ্চিম' (west) দিক থেকে ভারতে বিভিন্ন ধ্যানধারণার প্রবাহের ইঙ্গিত নানা সূত্রে পাওয়া যায়।

ভারতে দুর্গার মহিষমর্দিনী বা মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রচলনের সময় অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে অভারতীয় মাতৃদেবী ননার সঙ্গে অম্বার অর্থাৎ দুর্গার একীকরণের মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও দ্বিতীয় শতকে হুবিষ্কের সময়ের পাথর ও পোড়ামাটির 'নারী ও সিংহমূর্তি' এবং পরবর্তী কুষাণযুগে কয়েকটি মুদ্রায় খোদিত সিংহবাহিনী নারীমূর্তিগুলিকে 'ননা' বা 'উমা' অর্থাৎ দুর্গা বলে অনেকেই মনে করেন।

এই 'ননা' কেবল ইরান-সহ পশ্চিম এশিয়াতেই নয়, মধ্য এশিয়াতেও প্রাচীনকাল থেকে জনপ্রিয় দেবী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই খ্যাতি মধ্য এশিয়ার প্রাচীন পেনজিকেন্ট শহরের আমলেও অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎকালীন পেনজিকেন্টে 'ননা'কে ঐ নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে পূজা করা হতো। মধ্য এশিয়ার তাজাকিস্তান রিপাবলিকের উত্তর-পশ্চিমে একটি শহর পেনজিকেন্ট। সমরকন্দ থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের এই শহরটির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জেরাভশন নদী। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এখানে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে প্রাকারবেষ্টিত এই শহরের আবির্ভাব খ্রিস্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে। প্রাচীন পেনজিকেন্ট অঞ্চলে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে দেখা যায় একটি চারহাতবিশিষ্ট দেবীমূর্তি; দেবী তাঁর বাঁদিকের একটি হাত দিয়ে মহিষজাতীয় একটি মর্দন করছেন। দেবীর শরীরের কিছু অংশ মহিলাদের স্বচ্ছ পরিচ্ছদে ঢাকা। পরিচ্ছদটি চতুষ্কোণ নকশা ও অন্যান্য অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। মহিষটির সামনে একটি অসুর রয়েছে—অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক জন্তুর মতো দেখতে। অসুরটির দেহ দেবীর এক বাঁহাতে ধরা বর্শা বা ত্রিশূলের দ্বারা বিদ্ধ। দেবীর নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদের ডানদিকে রয়েছে একটি সিংহ। দেবী, সিংহ, মহিষ, অসুর রয়েছে একটি পাদপীঠের (pedestal) ওপর। পিছনে চালচিত্র। দেবীর পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করছে পাদপীঠের সামনের দিকে একটি শিবলিঙ্গের উপস্থিতি। কালো রঙের শিবলিঙ্গটি একটি মাল্য দ্বারা সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে অলঙ্কৃত। দেবীর অঙ্গে রত্নখচিত কোমরবন্ধ ও নানা আভরণ। তিনি অর্ধেক বসা ও অর্ধেক দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় রয়েছেন। যেহেতু এটি পেনজিকেন্টের একটি মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত চিত্র, তাই আমরা ধরে নিতেই পারি যে, ভারতীয় মহিষাসুরমর্দিনী ঐ অঞ্চলে পূজনীয়া ছিলেন। তবে এই চিত্রটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—দেবী একই সঙ্গে 'মহিষমর্দিনী' আবার 'অসুরনিধন-কারিণী'। সঙ্গে সহচর রয়েছে বাহন সিংহ। পেনজিকেন্টের এই চিত্রটি আমাদের প্রমাণ দেয়, মধ্য এশিয়ার পেনজিকেন্ট অঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় পাদ অবধি মহিষমর্দিনী দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ায় সিংহবাহিনী ভারতীয় দেবী মহিষমর্দিনীর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তিনি 'ননা'রই রূপান্তর হিসাবে ঐ অঞ্চলে অতিপরিচিতা ও উপাস্যা ছিলেন।[৮]



পেনজিকেন্টে আবিষ্কৃত কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ সিংহবাহিনী ননার প্রতিরূপ

এর থেকে অনেক ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত অনুমান করে থাকেন, সিংহবাহিনী দেবী পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে ভারতীয় ভাবনায় এসেছে। এঁদের মতে, সিংহবাহিনী দুর্গার কল্পনা নাকি এসেছিল পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিসের দেবীমূর্তির অনুকরণে। যুদ্ধের দেবী ব্যাবিলনের ননা, আসিরীয় ইসতার, পারস্যের অনাহিতা, গ্রিসের এথেনার মূর্তির সঙ্গে সিংহ, বর্শা প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু এই মতকে যুক্তি দ্বারা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, ভারতের আদি দেবী সরস্বতীর বাহনও তো সিংহ আর অস্ত্র 'পবি' অর্থাৎ বর্শা বা শূল ছিল। ঋগ্বেদে মাতা সরস্বতী শত্রুদলনী, ভক্তদের কল্যাণার্থ তিনি যুদ্ধ করেন—"অহং জনায় সমদং কৃণোমি"।[৯] পশ্চিম ভারতের গীর্ণার অঞ্চলে আজও সিংহবাহনা আদি দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে সিংহবাহনা সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। আর বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বৃহদ্দেবতা'তে বলা হয়েছে—অদিতি, বাক্, সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্না।[১০] সরস্বতী হলেন মহাদেবীর আদিরূপ আর দুর্গা মহাদেবীরই রূপভেদ। তাই সরস্বতীকে দুর্গার পূর্বাভাস বলা যায়। আবার 'নিঘণ্টু'তে বাক্ বা সরস্বতীকে 'ননা' বলা হয়েছে।[১১] সুতরাং ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভারতের আদি দেবী সিংহবাহনা সরস্বতীই খুব সম্ভবত বিদেশে 'ননা অন দি লায়ন' (Nona on the Lion)-রূপে সমাদৃতা হয়ে আবার স্বদেশে দুর্গারূপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় 'চণ্ডী'তে বলা হয়েছে, শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যের নিধনকর্ত্রী স্বয়ং মহাসরস্বতী; মহাভারতেও অর্জুন দুর্গাদেবীর স্তব করেছিলেন 'সরস্বতী' সম্বোধন করে। সরস্বতীপূজার প্রণামমন্ত্র হলোঃ "ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ"। আর দুর্গাপূজার অঞ্জলিমন্ত্রে আছে—"ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" কাজেই আদি দেবী সরস্বতী আর দেবী দুর্গা উভয়েই ভদ্রকালীরূপিণী চৈতন্যদায়িনী।

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মহিষমর্দিনী দেবী, যিনি শিবের শক্তি, তিনি কিভাবে মধ্য এশিয়ায় পৌঁছেছিলেন? আমরা উত্তরে বলতে পারি, খুব সম্ভবত আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে শৈবধর্ম ও শক্তিপূজার প্রসার মধ্য এশিয়ায় বিস্তারলাভ করেছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে গর্দেজ অঞ্চলে শ্বেতপাথরের তৈরি অষ্টম-নবম শতাব্দীর একটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পাওয়া গেছে 'স্কুরেত্তি মার্বেল' (scoretti marble) নামে খ্যাত মহিষাসুরমর্দিনীর একটি প্রতিরূপ।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাপ্ত মহিষমর্দিনীর মূর্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গজনী এলাকার টাপা সর্দারে প্রাপ্ত অষ্টম শতাব্দীর ভাস্কর্যটি। উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধবিহারে এটি পাওয়া গেছে। এটির অবস্থান ছিল একটি বুদ্ধমূর্তির সামনে। বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধমূর্তির উল্টোদিকে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তির অবস্থান প্রমাণ করে, আফগানিস্তানে অষ্টম শতাব্দীতে তিনি নিশ্চয়ই একশ্রেণির বৌদ্ধদের উপাস্যা দেবী ছিলেন।[১২] ❑



টাপাসর্দারে আবিষ্কৃত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিটির একাংশ—অসুরের দুটি পা এবং মহিষের ছিন্ন মাথা দেখা যাচ্ছে

তথ্যসূত্র

১ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা—উপেন্দ্রকুমার দাস, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা-গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃঃ ১২৮

২ ঐ, পৃঃ ১৩১

৩ ঐ, পৃঃ ১৩২

৪ দ্রঃ Elements of Hindu Iconography—T. Gopinath Rao, Vol. I, Part II, Madras, 1914, p. 106

৫ শক্তির রূপঃ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়—ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৯০, পৃঃ ১৫

৬ ঐ, পৃঃ ১৬

৭ Nona on Lion, A Study in Kushan Pneumatic Art—B. N. Mukherjee, 1970, p. 19

৮ দ্রঃ শক্তির রূপঃ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়, পৃঃ ২৯-৩৩

৯ ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৬

১০ বৃহদ্দেবতা, ২।৭৮-৭৯

১১ দ্রঃ নিঘণ্টু, ১।১১; শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শাস্ত্রসাধনা, পৃঃ ৭৯

১২ The Mahishamardini Image From Tapa Sardar—S. Toddey, South Asian Archiology, Edited by N. Hamond, London, 1973, pp. 203-213

ইউরোপে পাঁচ সপ্তাহ

স্বামী স্মরণানন্দ*

ইউরোপ ছাড়া প্রায় সকল মহাদেশের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করার সুযোগ আমার আগেই হয়েছে। ইচ্ছা ছিল, ইউরোপে অবস্থিত আমাদের সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্রগুলি একবার দেখে আসব। আকস্মিকভাবে সেই সুযোগ এসে গেল। আমাদের মস্কো শাখার প্রধান স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আমাকে ৮-৯ দিনের জন্য রাশিয়া যাওয়ার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। এই সুযোগে ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করার সুযোগও আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময়, তার মধ্যে আমাকে এই সাতটি দেশে ভ্রমণ শেষ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এটি একটি ঝটিকা সফর।

● রাশিয়া ●

৬ জুন ২০০৩ মধ্যরাত্রে আমি নতুন দিল্লি থেকে 'এয়ার ফ্রান্স'-এর বিমানে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হলাম। ফরাসি সময় সকাল ৬টায় প্যারিস পৌঁছালাম। বিমানবন্দর চত্বরটি এত বিশাল যে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য কাজ। অবশ্য বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বাসের ব্যবস্থা আছে। বিশ্রামকক্ষে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে মস্কোগামী বিমানে রওনা দিয়ে মস্কোর স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া ৩টায় মস্কোয় অবতরণ করলাম। পাসপোর্ট পরীক্ষাকক্ষটি যাত্রীতে একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ঘরটি আকারে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর আলোর ব্যবস্থাও ছিল অপর্যাপ্ত। সেখানে ঐ বিপুল যাত্রিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক কাউণ্টার ছিল না। আবার যাঁরা ঐ কয়েকটি কাউণ্টারে কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরাও প্রত্যেক যাত্রীকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছিলেন। সেই কারণেই সেখান থেকে ছাড়া পেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল। তার ওপর আরেক সমস্যা দেখা দিল, আমার মালপত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিক-ওদিক বৃথা খুঁজে যখন আমি এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করতে যাব, তখনি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার ব্যাগদুটি ঐ ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। ব্যাগগুলির সন্ধান পেয়ে পরম স্বস্তি পেলাম।

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদিকা লিলিয়ানা, ব্রহ্মচারী ভিক্টর (অমৃতচৈতন্য) এবং অ্যালেক্স বাইরে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের আশ্রমে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। প্রথমে বর্তমানের রাশিয়া সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে নিই।

আয়তনের বিচারে রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। ১৯১৭ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ ছিল কমিউনিস্টদের শাসনাধীন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসান হলে রাশিয়া এক স্বাধীন দেশ হিসাবে গণ্য হতে থাকে। এখানে জুন মাসে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ঐদিনটি সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত। কিন্তু সরকারি মহল ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বের ইউ. এস. এস. আর. বর্তমানে ২১টি রাষ্ট্রবিশিষ্ট 'রাশিয়ান ফেডারেশন' নামে পরিচিত।

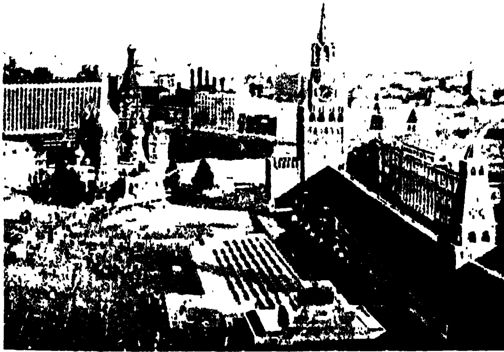
শুধুমাত্র সামরিক শক্তির বিচারে রাশিয়া ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশরূপে পরিচিত ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের চিত্রটি ছিল বড়ই করুণ এবং প্রধানত সেই কারণে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট শাসন চলাকালীন এদেশে 'ধর্ম' ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু নতুন জমানায় 'ধর্ম' স্বীকৃতিলাভ করেছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ান পার্লামেন্টে চারটি ধর্ম সরকারিভাবে অনুমোদন লাভ করে। সেগুলি হলো অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, ইহুদিধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম। সরকারিভাবে স্বীকৃতিলাভ না করার ফলে হিন্দুধর্ম প্রচার করার উপায় নেই। গ্রিক গির্জা দিন দিন তার হৃতগৌরব ফিরে পাচ্ছে এবং এবিষয়ে সরকারের পূর্ণ সমর্থনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক রাশিয়াতে রোমান ক্যাথলিক অথবা প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের কোন স্থান নেই। তার ফলে অতি দ্রুত এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যদিও একশ্রেণির রাজনীতিক যেকোন প্রকারে কমিউনিজম ফিরিয়ে আনার জন্য এখনো সচেষ্ট। কিন্তু সেই আশা অপূর্ণই থেকে যাবে মনে হয়।

● মস্কো—ক্রেমলিন ●

মস্কোয় ধর্ম ও রাজনীতির পীঠস্থান হলো ক্রেমলিন। মস্কো এবং নেগ্‌লুরিয়ায়া নামক দুটি নদী দ্বারা এই অঞ্চলটি পরিবেষ্টিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি রাজধানীর জন্য বিশেষ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, কারণ বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে এই জায়গাটি ছিল সুরক্ষিত। যে-অংশটুকু নদী দ্বারা

*রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক।

পরিবেষ্টিত ছিল না, সেখানে একটি কাঠের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। কয়েক শতাব্দী পর শত্রুরা এই প্রাচীরটি ধ্বংস করলে সেই স্থানে একটি ইঁটের দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী ক্রেমলিন ঐ ইঁটের লাল রঙের প্রাচীর এবং কুড়িটি বৃহৎ টাওয়ার দ্বারা ছিল সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ক্রেমলিনের এই প্রাচীরের মোট দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই কিলোমিটার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেমলিনে অনেকগুলি চার্চ এবং ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। রাশিয়ার গ্রিক চার্চের বিশপগণ তারই একটিতে বাস করেন। প্রশাসনিক দপ্তরগুলিও ক্রেমলিনেই অবস্থিত। পর্যটকদের একমাত্র ঐ চার্চগুলিতেই প্রবেশাধিকার আছে। একটি চার্চে আবার বিশাল বিশাল ঘণ্টা আছে। রুশ সম্রাটগণ বিভিন্ন সময়ে ঐসব বিশালকায় ঘণ্টা প্রস্তুত করান। এরূপ একটি ঘণ্টা একবার ভেঙে যায়। সেই ভাঙা ঘণ্টাটি এবং একটি অতিকায় কামান বর্তমানে রাশিয়ার প্রাচীন ঢালাইকার্যের নিদর্শন।



ক্রেমলিনের বিখ্যাত রেডস্কোয়ার

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ কয়েকটি বিশেষ স্থান দেখার জন্য ইতোমধ্যেই একটি ভ্রমণসূচী তৈরি করেছিলেন। মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসের আমন্ত্রণে সেখানে ১২ জুন আমার একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল।

৮ তারিখ সকালে লিলিয়ানা, ব্রহ্মচারী ভিক্টর, বেলারুশ থেকে আগত যুবক দমিত্রি এবং আমি—এই চারজন রাশিয়ার বৃহত্তম 'মনাস্টারি' 'Sergiev Posad' দেখতে গেলাম। মস্কো থেকে গাড়িতে প্রায় দুঘণ্টার পথ। ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত র‍্যাডোনেথের সেন্ট সারজিভ এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে সারজিভের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই মঠেই রাশিয়ার সেই বিখ্যাত শাসক ভয়ঙ্কর ইভানের নামকরণ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবেই শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই মঠটি আকারে এবং ধনসম্পদে সমৃদ্ধিলাভ করে। আজ সেন্ট সারজিভ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কার্যক্ষম মঠ।

মঠের চার্চগুলিতে নিত্য অনেক ভক্তের সমাগম হয়। একজন যাজকের নেতৃত্বে প্রার্থনাসঙ্গীত গীত হয়। উপস্থিত সকলে সমবেত-ভাবে সেই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। সেইসময় পরিবেশ বেশ পবিত্রভাব ধারণ করে।



অতিকায় ঘণ্টার ভগ্নাবস্থা

সারজিভ পোসাদ থেকে আমরা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত একটি 'Dhacha'-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। কমিউনিস্ট শাসনকালে দেশে কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে উৎসাহবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকার মস্কোয় কর্মরত এক-একজনকে মফস্সল অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গমিটার করে জমি দান করেছিলেন। শর্ত ছিল—যাঁরা ঐ জমিতে বাস করবেন, তাঁরা সেখানে তাঁদের বসবাসের জন্য নিজেদের বাড়ি নিজেরা নির্মাণ করে নেবেন এবং অবশিষ্ট জমিতে তাঁদের নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শাকসবজির চাষ করতে হবে। সারজিভ পোসাদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে এরূপ একটি 'ধাচা'তে তিন মহিলা ভক্ত বাস করেন। প্রধান সড়ক থেকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলে পিচের রাস্তা আর দেখতে পাওয়া যায় না। বৃষ্টি হওয়ার ফলে সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সেই তিন মহিলার বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁরা হলেন লেনা খালাসেনা, নেসা পেট্রোবনা এবং ওলগা। তাঁরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। প্রস্তুত করে রেখেছিলেন নিরামিষ খাবার। রান্নার পদগুলি ছিল ভাত, ভাজা, সবজি ইত্যাদি। আমরা তাঁদের বাড়ি যাওয়ায় তাঁরা খুব খুশি। তাঁদের মধ্যে একজন ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন।

সন্ধ্যাবেলা স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ বিখ্যাত বলশয় থিয়েটারে অনুষ্ঠিত ব্যালে নৃত্য দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরুষ এবং মহিলা শিল্পীরা সমবেতভাবে সুপরিকল্পিত নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু বিখ্যাত কাহিনী মঞ্চস্থ করলেন। সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনাটি বেশ সুবিন্যস্ত। আমার মনে হলো, এই নৃত্যগুলিতে যেন দৈহিক কুশলতা ও কসরতের প্রকাশ বেশি। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রা-

সহযোগে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ অধিকতর মাত্রায় প্রত্যক্ষ করা যায়।



সারজিভ পোসাদ

রাত দশটায় আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। তখনো সূর্যাস্ত হয়নি! কলকাতার বিকাল সাড়ে পাঁচটার মতো মনে হচ্ছিল।

পরদিন আমাকে পুশকিন আর্ট মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হলো। পুশকিনকে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি আবার ছিলেন একজন উৎসাহী শিল্প-সংগ্রাহক। 'প্লাস্টার অফ প্যারিস'-এর ছাঁচে গ্রিক ও রোমান ভাস্কর্যের বহু কাজের নমুনা সেখানে সংগ্রহ করে রাখা আছে। ঐ সংগ্রহশালায় রাশিয়া ও ইউরোপের অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু মৌলিক চিত্রও সংগৃহীত আছে দেখলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় আমাদের গাড়িটি একটি ছোট দুর্ঘটনার শিকার হলো। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বেলারুশের রাজধানী মিনিস্ক থেকে আগত দমিত্রি। গাড়িটি মেরামতের জন্য তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে হলো।

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ইউরোপের বৃহত্তম নদী ভলগার বুকে এক নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনৈক মহিলা ভক্ত নাতাশার আমন্ত্রণে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমাদের ভলগা নদীর তীরে য়ারোস্লাভল শহরে পৌঁছাতে হবে। ঐ মহিলা ভক্তটিই নৌকাভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকেও ঐ ভ্রমণে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ঐ পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হলো। প্রথমত দমিত্রির যে-গাড়িটিতে আমাদের য়ারোস্লাভল যাওয়ার কথা ছিল, সেটি পূর্বেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার ওপর আমার পাসপোর্ট এবং ভিসা রাশিয়ান সরকারের বিদেশমন্ত্রকের কাছে রেজিস্ট্রির জন্য জমা দেওয়া ছিল। সেগুলি সেখানেই পড়ে ছিল এবং জানা গেল, ১২ জুন থেকে এখানে ছুটি থাকবে। পাসপোর্ট ইত্যাদি সময়মতো হাতে না পেলে আমার ১৬ তারিখ প্যারিস রওনা হওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেইজন্য স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ এবং লিলিয়ানা খুব ব্যগ্রভাবে সেই কাজে চলে গেলেন এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করে ফিরে এলেন। এজন্য প্রায় সমস্ত দিন তাঁদের অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশিদের জন্য রাশিয়ান সরকারের নিয়মগুলি অনমনীয় এবং বিরক্তিকর।

১২ তারিখ সকালে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আমাকে মস্কো নদীর তীরে একটি পার্কে নিয়ে গেলেন। আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাচীন ক্যাথিড্রালও ঘুরে দেখলাম। সরকার এগুলির সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হয়েছেন।

সকাল সোয়া এগারোটায় অধ্যাপক মার্ক মুকুলস্কি এবং ডঃ রিবাকভ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁরা উভয়েই খুব ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

বিকালবেলা আমরা ভারতীয় দূতাবাসের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা, বিষয় 'আধুনিক যুগের মানুষের নিকট বেদান্তের বাণী'। ছুটির দিন থাকায় সেদিন পথে কোন যানজট ছিল না। বিকাল সাড়ে চারটায় আমরা রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তামিলনাড়ুর মানুষ। চা-পানের পর আমরা সভাঘরে গেলাম। দেখলাম, প্রায় ১০০ শ্রোতা উপস্থিত, অধিকাংশই রাশিয়ান। লিলিয়ানা প্রতিটি বাক্য অনুবাদ করে দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। আমাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে হলো।

আশ্রমে ফিরে তাড়াতাড়ি রাতের আহার সেরে নিতে হলো। কারণ, রাত ১১টায় সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার ট্রেন ধরতে আমাদের তখনি মস্কো রেলস্টেশনের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। কমিউনিস্ট শাসনকালে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল 'লেনিনগ্রাদ'; কিন্তু কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসান ঘটলে এই শহরটিকে তার পুরনো নাম 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনের ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বগিগুলি ভারতবর্ষের এ. সি. টু-টায়ারের মতো। আমরা যখন সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম, একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস এবং বৃষ্টি আমাদের স্বাগত জানাল। সেখানে রামকৃষ্ণ সোসাইটির সদস্যগণ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঐ কেন্দ্রের সম্পাদক মিকগুয়েল, ইগর এবং লুইডমিলা।

অতি সম্প্রতি সেন্ট পিটার্সবার্গের তিনশো বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ৪৯টি রাষ্ট্রের প্রধানগণ সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ছিলেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের মাত্র কদিন পর আমরা সেখানে পৌঁছালাম। সেই কারণে শহরটি তখনো পর্যটকদের ভিড়ে পূর্ণ।

মিকগুয়েল এবং ইগর আমাকে বহু সংগ্রহশালায় পরিপূর্ণ এবং স্থাপত্য শিল্পসমৃদ্ধ এই ঐতিহাসিক শহরটি ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা 'প্যালেস স্কোয়ার'-এ গেলাম, যার আয়তন বিশাল এবং সমস্ত অঞ্চলটি পাথর-বাঁধানো। এখানেই অবস্থিত আর্মিটেজ প্যালেস। একদা সম্রাটদের আবাসস্থল, বিশাল ও সুন্দর এই প্রাসাদটি এখন একটি সংগ্রহশালা। সেখানে প্রবেশের টিকিটের জন্য লম্বা লাইন; আবার এদিকে ক্রমাগত টিপটিপ বৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠাণ্ডা বাতাস। সঙ্গীদের আমি জানালাম, এই খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে আমি লাইনে দাঁড়াতে চাই না। কাজেই মিউজিয়াম দেখার পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম, প্যালেস স্কোয়ারের চারদিকে বেশ বৃহদাকার সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে।

সেন্ট পিটার্সবার্গ নোভা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি খুব বেশি দূরে নয়। এটি একটি খালের মতো এবং বাল্টিক সাগরে গিয়ে মিশেছে। নদী এবং খালগুলিতে পর্যটকদের ঘোরানোর জন্য মোটরলঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

সোসাইটিতে ফিরে এসে প্রার্থনা এবং জপধ্যানে যোগ দিলাম ১৫-১৬ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রাত ৯টা পর্যন্ত আমাকে ভক্তদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। সেন্ট পিটার্সবার্গ এতই উত্তরে অবস্থিত যে, এখানে গ্রীষ্মকালকে বলা হয় 'হোয়াইট নাইট'। বছরের এই সময়টিতে সারারাত সূর্যের আলো থাকে এবং অন্য কোন আলোর সাহায্য ছাড়াই ঐ আলোতে সংবাদপত্র পর্যন্ত পড়া যায়। রাত এগারোটা পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার শীতকালে একটানা কয়েক সপ্তাহ সূর্যের দর্শনই মেলে না!

পরদিন সকালে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আমাকে পিটারহফে নিয়ে গেলেন। 'পিটারহফ' শব্দটির অর্থ হলো 'পিটার শহর'। সাগরপাড়ে অবস্থিত ঐ স্থানে পৌঁছাতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এটি একটি বিশালাকৃতি পার্কের মতো। ভোগবিলাসে মত্ত তৎকালীন শাসক জারদের বেশ কিছু প্রাসাদ এখানে আছে। সেসময় গরিবদের খুবই অবহেলা করা হতো। সেই কারণেই এখানে কমিউনিস্ট শাসনের অভ্যুদয়। কিন্তু হায়! ঐ ঈশ্বরও অসফল হলেন! এখানে কয়েকটি খুব সুন্দর ঝরনা আছে। জায়গাটি বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত; সেইজন্য বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের ফলে আরো বেশি ঠাণ্ডা লাগছিল।

বিকাল পাঁচটায় আমরা 'চিলড্রেন্স আর্ট স্কুল'-এ গেলাম। এখানে আমার একটি ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আধুনিক যুগের মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আদর্শ'। জনৈক ভক্ত খুব সহজভাবে প্রতিটি বাক্য অনুবাদ করে দিলেন। ৫০ মিনিট ভাষণ দেওয়ার পর আরো প্রায় ৪৫ মিনিট চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। দর্শকাসনে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত। ছুটির দিন থাকায় সেদিন লোকের উপস্থিতি কম ছিল।

১৫ তারিখ রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইজওয়ারার উদ্দেশে রওনা হলাম। হিমালয় পর্বতমালার চিত্র অঙ্কনের জন্য বিখ্যাত নিকোলাস রোয়েরিকের সম্পত্তি এটি। তিনি ছিলেন ভারতপ্রেমিক এবং দীর্ঘদিন কুলু উপত্যকায় বসবাস করেন। এখন তাঁদের গৃহাদি সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট দেখাশুনা করে। মহিলা ভক্ত ওলগা সেই ট্রাস্টের প্রধান। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রী আমাদের জন্য নাচগানের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করল। আমি প্রদর্শনী ও মিউজিয়ামটিও ঘুরে দেখলাম। মধ্যাহ্নভোজের পর স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে রাশিয়ান ভাষায় কিছু সাধারণ আলাপ আলোচনা করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আবার সেন্ট পিটার্সবার্গের দিকে যাত্রা করলাম। পথে আমরা বেশ যানজটে আটকে গেলাম। আশ্রমে পৌঁছে দেখলাম, কয়েকজন ভক্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

রাতের ট্রেনেই আমরা মস্কো রওনা হলাম। ১৬ তারিখ সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে আমরা সেখানে পৌঁছালাম। লিলিয়ানা আশ্রমেই আমাদের জন্য প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজের আহার প্রস্তুত করে দিলেন। ১২টা ৪৫ মিনিটে আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে হবে, কারণ ঐদিনই সন্ধ্যায় আমার প্যারিস রওনা হওয়ার কথা। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, ব্রহ্মচারী ভিক্টর, লিলিয়ানা এবং অ্যালেক্স

আমাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এলেন। রাশিয়াকে বিদায় জানিয়ে প্যারিসের বিমানে উঠলাম। প্যারিস পৌঁছাতে প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় লাগল।

● প্যারিস ও ইতালি ●

সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে প্যারিস পৌঁছালাম। আমাদের ফ্রান্স কেন্দ্রের প্রধান স্বামী বীতমোহানন্দ এবং স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্যারিস থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে ছোট সুন্দর শহর গ্রেৎজ-এ আমাদের আশ্রমটি অবস্থিত।



গ্রেৎজ আশ্রমের প্রবেশদ্বারে

আশ্রমটি প্রায় ২৫ একর জমির ওপর অবস্থিত। চমৎকার শান্ত পরিবেশ, চারদিকে সবুজের মেলা। ফরাসি ভাষায় আমাদের আশ্রমটির নাম 'Centre Vedantique Ramakrichna'। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে এই আশ্রমটির সূচনা হয়; পরবর্তী কালে সেটি গ্রেৎজ শহরে স্থানান্তরিত হয়। ফ্রান্সে ইংরেজি ভাষা বিশেষ কাজে আসে না। সেখানে ফরাসি ভাষা শিখতেই হবে, ফরাসি ভাষাতেই এখানকার সব কাজকর্ম চলে।

স্বামী বীতমোহানন্দ, স্বামী দেবাত্মানন্দ এবং স্বামী গঙ্গানন্দ ছাড়াও ঐ আশ্রমে দুজন যুবক বাস করেন। তাঁদের একজন আমেরিকান এবং অপরজন নাইজেরিয়ান। নাইজেরিয়ান যুবকটিকে 'রামজী' বলে ডাকা হয়। এছাড়া পাঁচজন ভক্ত সেখানে থাকেন। প্রধান বাসস্থানটি অতি প্রাচীন একটি বাড়ি। বাড়িটির দক্ষিণদিকের সংযোজিত অংশে আছে বর্তমান মন্দিরটি। এগুলি ছাড়াও আরো একটি বাড়ি আছে, যেটিকে বলা হয় 'মায়ের বাড়ি'। অদূরে অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছেই দুটি অতিথিনিবাস।

সকাল সাড়ে ৬টায় মন্দিরে প্রার্থনা শুরু হয়। তারপর হয় জপ-ধ্যান এবং স্তোত্রাদি আবৃত্তি। প্রাতরাশের পর সকাল আটটায় স্বামী বীতমোহানন্দ আমাদের (কলকাতা থেকে আগত ডাঃ গৌর দাস এবং আমাকে) আশ্রমটি ঘুরিয়ে দেখালেন। আশ্রমে কয়েকটি গবাদি পশু এবং একটি ফুলের বাগান চোখে পড়ল। এমন বিশাল এক সম্পত্তির সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা সত্যিই এক দুরূহ কাজ!

দুপুর ১২টায় আহারপর্ব শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিকাশ সান্যাল এসে আমাদের প্যারিস দর্শনের জন্য নিয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক আমাদের কলকাতার পূর্বকালীন 'পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস হোম'-এর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি আবার নরেন্দ্রপুর কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। তবু সান্যাল আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে গেলেন। 'ইউনেস্কো'র অফিস বাড়িটি মোটেই দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। আমরা বিখ্যাত 'আইফেল টাওয়ার' দেখলাম, তবে ওপরে উঠিনি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স পরিভ্রমণকালে স্বামীজী যেখানে ছিলেন, সেই স্থানটিও আমরা দেখলাম। এসব বাড়ি বর্তমানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। কাজেই সেগুলি আমরা বাইরে থেকেই দেখলাম। সারাবছর হাজার হাজার পর্যটক প্যারিসে আসে। এটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর নগরী। সবশেষে সান্যাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ নিয়ে গেলেন। এখানে অনেক দেশেরই নিজস্ব বাড়ি আছে। সেই বাড়িগুলিতে সংশ্লিষ্ট দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাস করে। সান্যাল এখন অবসর গ্রহণ করেছেন, তবুও তিনি ইউনেস্কোর সঙ্গে যুক্ত। খুবই কর্মব্যস্ত মানুষ। পথে যানজটের জন্য গ্রেৎজে ফিরতে আমাদের প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগল। এটি এক অতি সাধারণ (common) ব্যাধি, যার দ্বারা পৃথিবীর সব বড় শহরই পীড়িত।

পরদিন ১৮ জুন আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ভোগীলাল প্যাটেল এবং ডাঃ সুনীতি বসু। আমরা আরেকটি ছোট শহর 'মেলন'-এ গেলাম। এখানে রাজা চতুর্দশ লুইসের অর্থমন্ত্রী সরকারি তহবিলের অর্থ ব্যয় করে নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং সেটি দেখার জন্য রাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! সরকারি অর্থের এমন অপচয় দেখে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন; পরিণামে সেই অর্থমন্ত্রীকে কারাবন্দি করা হয়।

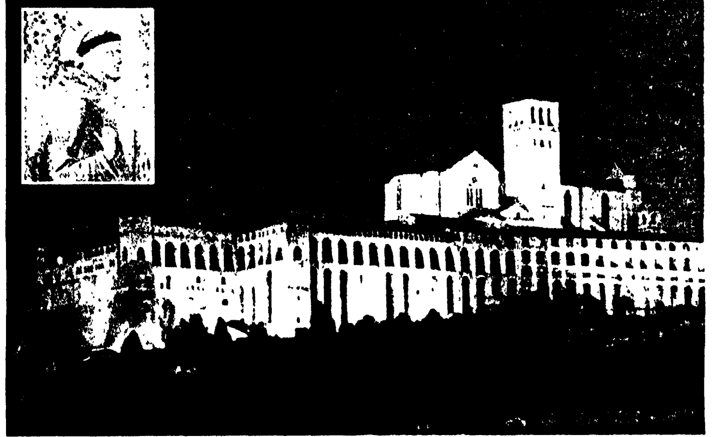
মধ্যাহ্নভোজের পর ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং আমি দুপুর দেড়টায় রোমের বিমান ধরার জন্য বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ ইতালির রোম বিমানবন্দরে পৌঁছে আমরা একটি 'ওপেল' গাড়ি ভাড়া করলাম। ২২০ কিলোমিটার দূরে

উত্তর ইতালিতে অবস্থিত অ্যাসিসিতে সেন্ট ফ্রান্সিসের জন্মস্থান দর্শন করার জন্য ডাঃ সুনীতি নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললেন। পেরুজিয়া পৌঁছানোর পর আমরা অ্যাসিসি যাওয়ার পথটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রথমত বেশ রাত হয়ে গেছে, তার ওপর পথনির্দেশগুলি আমাদের কিছুটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। অতএব মোবাইল ফোনে অ্যাসিসিতে আমাদের আমন্ত্রণকর্তা ভিটো ডেগর‍্যাণ্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। ভিটো অবিবাহিত। ভারতবর্ষে উত্তরকাশীতে তাঁর একটি নিজস্ব কুঠিয়া আছে। প্রতিবছর শীতকালে তিনি সেখানে এসে একমাস থাকেন। অবশেষে অ্যাসিসি রেলস্টেশনে ভিটোর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাদের সুজাতার বাড়ি নিয়ে গেলেন। হল্যাণ্ডের ঐ মহিলা বিশেষ ভক্ত। তাঁর অপর নাম সিলভিয়া লেম্যান। রাত সাড়ে ১১টায় রাতের আহার সেরে আমরা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ভিটোর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভাবছিলাম, কে জানে কোথায় আমরা চলেছি! কিন্তু পরদিন সকালটি আমাদের খুব বিস্মিত করল! পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ভিটোর বাড়ির চারদিকের দৃশ্যাবলী অতি মনোরম; পাহাড়, উপত্যকা, পাকা শস্য এবং অলিভপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত এস্থানটি এককথায় চিত্তাকর্ষক।

বেলা ৯টার সময় আমরা সেন্ট ফ্রান্সিস এবং সেন্ট ক্লারার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখার জন্য রওনা হলাম। ভিটো আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের সেন্ট মারিয়া অ্যাঞ্জেলিনো ক্যাথিড্রাল এবং সেন্ট ফ্রান্সিস ও সেন্ট ক্লারার ব্যাসিলিকা-দুটির সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়ে দিলেন। সেখান থেকে আমরা আবার সুজাতার বাড়ি গেলাম। সেখানে দুপুরের আহারের পর আমরা বিশ্রামের জন্য গেলাম ভিটোর বাড়ি।

১১৮২ খ্রিস্টাব্দে এক ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে সেন্ট ফ্রান্সিসের জন্ম হয়। যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬ বছর, তখন স্পোলেটো শহরে তাঁর এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন হয়। স্বপ্নে তাঁকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অ্যাসিসির সন দ্যমিয়ানো চার্চে ফিরে গেলে তিনি শুনতে পান, ক্রুশবিদ্ধ যিশু যেন তাঁকে বলছেন : "ফ্রান্সিস যাও, আমার ভাঙা বাড়িটি মেরামত কর।" তারপর তিনি সংসারত্যাগ করে কঠিন সাধনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন এবং অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ খ্রিস্টধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি অনেকগুলি চার্চেরও সংস্কারসাধন করেন। যে-দৈবনির্দেশ তিনি পেয়েছিলেন তা সকলের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক দিক থেকে এবং আক্ষরিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

পরবর্তী কালে অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যেসকল যুবতী তাঁর আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মহিমায় সেন্ট ক্লারাকে তাঁর সমমর্যাদা দেওয়া হয়। ফ্রান্সিসের সম্প্রদায় মহামান্য পোপের অনুমোদন লাভ করেছিল। পবিত্রতা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং দানব্রতকে মূলমন্ত্র করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ অতি দ্রুত প্রসারলাভ করতে থাকে। তীর্থদর্শনে তিনি জেরুজালেম এবং ইজিপ্টে গিয়েছিলেন। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ফলে মানবত্রাতা যিশুখ্রিস্টের হাতে এবং পায়ে যে-ক্ষতগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট লা ভারনাতে থাকাকালীন ফ্রান্সিসের শরীরেও সেই ক্ষতগুলির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪২ বছর বয়সে অ্যাসিসিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজ অ্যাসিসি এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, প্রধানত রোমান ক্যাথলিকদের কাছে। সেন্ট ফ্রান্সিসের স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদ, চার্চ এবং অন্যান্য স্থানগুলি পশ্চিম দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মানুষকে আজ আকর্ষণ করে।



সেন্ট ফ্রান্সিস ব্যাসিলিকা; ইনসেটে সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি

১৯ তারিখ বিকালে আমরা ফাদার অ্যান্টনি এলেনজিমিট্টামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি কেরালার মানুষ; বর্তমানে অ্যাসিসিতে স্থায়িভাবে বসবাস করছেন। উদারহৃদয় এই মানুষটি উপনিষদ্‌ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করেছেন এবং অনেকগুলি ভাষায় তাঁর গভীর

ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি বহু ভারতীয় গ্রন্থ ইতালি ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যখন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি বোম্বাই (মুম্বাই)-তে ছিলেন, তখনি আমি তাঁকে চিনতাম। তাঁর বাড়ি থেকে গেলাম সেন্ট ক্লারার গির্জায়, যেখানে তাঁর দেহাবশেষ সংরক্ষিত আছে।

সন্ধ্যাবেলা ভিটোর বাড়ি ফিরে এসে আমরা চারদিকের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী প্রাণভরে উপভোগ করলাম। প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ দম্পতি—লুসিয়ানো এবং লুসিয়ানা পোরপোরা ভিটোর বাড়িতে এলেন। তাঁরা হৃষীকেশের স্বামী চিদানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষিত এবং খুবই সজ্জন মানুষ। এছাড়া এক ইংরেজ যুবক হেনরি জারভিস এবং তাঁর বাগদত্তা কাত্যাও এসেছিলেন। সুজাতাও এসে দলে যোগ দিলেন। বেশ প্রাণোদ্দীপ্ত সমাবেশ! তাঁরা সকলে মিলে অতি উপাদেয় নৈশাহার প্রস্তুত করলেন। আগেই বলেছি, হেনরি ইংরেজ, ইংরেজির শিক্ষক। কাত্যা ইতালিয়ান। দেখলাম, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা উভয়েই বেশ উৎসাহী।

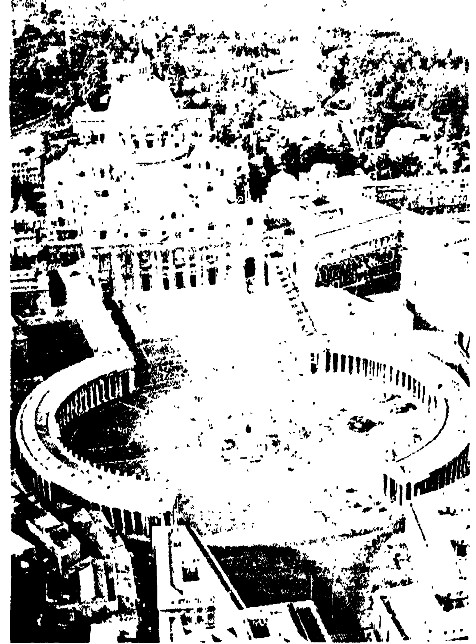
ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হওয়ায় এবং বেড়াবার অনুকূল মেজাজ না থাকায় পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হেনরি এবং কাত্যা ইতালীয় ভাষায় কয়েকটি ভজন পরিবেশন করলেন। ওদিকে ভিটো প্রস্তুত করলেন এক বিশাল ইতালিয়ান পিৎজা।

পরদিন সকালে ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং আমি রোমা টারমিনির (রোমের প্রধান রেলস্টেশন) ট্রেন ধরার জন্য ফোলিগনো স্টেশনে গেলাম। ভিটো আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। বেলা ৯টা নাগাদ আমরা রোমা টারমিনিতে পৌঁছালাম। সেখানে পৌঁছে আমরা একটি টুরিস্ট বাসে চড়লাম। ঐ বাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমগ্র রোম ঘুরিয়ে দেখায়। পুরো ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনলে পছন্দমতো যেকোন স্থানে নেমে সেই স্থান দর্শন করে আবার ঐ টিকিটেই পরের বাসে চড়া যায়। ঐ বাসগুলি আধঘণ্টা অন্তর চলে।

৯টা ৫০ মিনিটে আমরা 'স্প্যানিস বাথস'-এ নামলাম। কিন্তু চড়া রোদে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা অসম্ভব মনে হওয়ায় আমরা আবার পরের বাসে উঠে পড়লাম। এবার আমরা গিয়ে নামলাম ভাটিকান নগরীর সেন্ট পিটার্সে।

ভাটিকান নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেন্ট পিটার্সের ব্যাসিলিকাটি আকারে বিশাল। অতি চমৎকার 'Piazza San Pietro' (সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার) ধরে সেন্ট পিটার্সে যাওয়া যায়। তার গোলাকৃতি গম্বুজটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরের প্রাচীরগুলিতে রোম এবং খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের নানা উপাখ্যান চিত্রিত। সেন্ট পিটার্সের গম্বুজটির পরিকল্পনা করেছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। মধ্যযুগের রেনেসাঁসের সময়ের স্থাপত্য নিদর্শনগুলি দেখতে আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টা সময় লাগল।

ভাটিকান নগরী রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এক কেল্লা। মহামান্য পোপ এই শহরে অধ্যক্ষতা করে থাকেন। সেন্ট পিটার্স থেকে আমরা আবার বাস ধরে কলোসিয়ামে গেলাম। এটি রোমের খ্রিস্টপূর্ব যুগের একটি



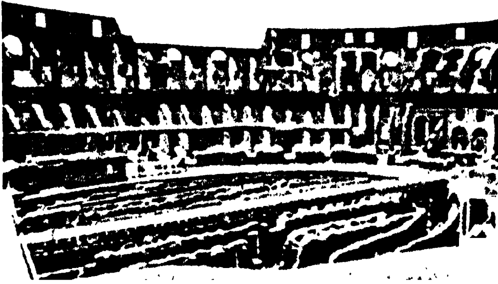
সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের পিছনে সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল

উল্লেখযোগ্য স্থান। জায়গাটি বিশাল। প্রায় ২০,০০০ দর্শক গ্যালারিতে একত্রে বসে ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে ক্রীতদাসদের লড়াই (gladiatorial battle) দেখতে পারতেন। সেটি ছিল পৌত্তলিক (Pagan) রোমান সাম্রাজ্য থেকে খ্রিস্টান রাজত্ব আসার এক বিরাট পরিবর্তন। যখনি কোন রোমান সম্রাটকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হতো, তখনি পৌত্তলিকগণকে তাঁদের মন্দিরগুলিসহ নির্দয়ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো।

রোম নগরীর চারদিকে বহু ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও স্থাপত্য ছড়িয়ে আছে। সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির সব কয়টি দেখতে হলে বেশ কয়েকটি দিন লেগে যাবে. ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি যতদূর সম্ভব অক্ষত রেখে তার চারপাশে আধুনিক নগরী গড়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগের ইউরোপ উত্তরাধিকার সূত্রে তার সংস্কৃতি লাভ করেছে গ্রিস এবং রোম থেকে। গ্রিস থেকে এসেছে দর্শন এবং শিল্পকলা; রোম থেকে এসেছে সাম্রাজ্যস্থাপন তথা রাজ্যশাসন প্রভৃতি। আজকের পশ্চিমী দুনিয়া যে সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে, তার মেধা এবং কলাবিদ্যার উৎস হলো ঐ দুই মহান সভ্যতা—যা আজ বিলুপ্ত।

সেই টুরিস্ট বাসযোগে আমরা সোয়া ৩টায় রোমা টারমিনিতে ফিরে এলাম। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা ৩৭ মিনিটের আগে ফলিগনো যাওয়ার কোন ট্রেন ছিল না। অতএব ট্রেন ধরার জন্য বেশ কিছু সময় আমাদের সেখানে অপেক্ষা করতে হলো। রোম স্টেশনে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের কাছে এসে তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় কথা শুরু করলেন। বেশির ভাগ কথাই ডাঃ সুনীতি বসুর সঙ্গে হয়। ভদ্রলোক বাংলাদেশি। রোমে কয়েক বছর আছেন। এখানে তিনি জামাকাপড়ের ব্যবসা করেন। ভদ্রলোক আমাদের রোম স্টেশনের পকেটমার ও ছিনতাইকারীদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন। ফলিগনো স্টেশন থেকে ভিটো আমাদের তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন।



রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম

পরদিন সকালে আমরা ভাড়া করা গাড়িতে রোমের উদ্দেশে রওনা হলাম। রোম থেকে আমাদের প্যারিসের বিমান ধরতে হবে। কিন্তু প্রথমে আমরা গেলাম সেন্ট অ্যাঞ্জেলিকা গির্জায়। সেখানে সুজাতা আমাদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় জানিয়ে গেলেন। হাইওয়ে পর্যন্ত ভিটো আমাদের পৌঁছে দিলেন।

বিমানবন্দরে পৌঁছে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়েই বিমান উড়ল। ফ্রান্সের প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছে অবতরণের সিঁড়ির জন্য প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। এদিকে আমাদের মালপত্র তখনো এসে পৌছায়নি। দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশভাগ যাত্রীর মালপত্র পৌঁছায়নি। দু-ঘণ্টা বৃথা অপেক্ষা করার পর একটি অভিযোগ নথিভুক্ত করে আমরা গ্রেৎজ আশ্রমের দিকে যাত্রা করলাম। স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। আজকাল আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রাকালে প্রায়শই মালপত্র হারিয়ে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

নৈশাহারের পর গ্রেৎজ আশ্রমে দোভাষীর সাহায্যে প্রায় একঘণ্টা আমি ভক্তদের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সব প্রশ্ন আমি লিখে রাখিনি। তবে একটি প্রশ্ন ছিলঃ "শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা অবতার বলি কেন?"

আমাদের মালপত্র পরদিনও এসে পৌঁছাল না। কিন্তু আশার বাণী শুনলাম যে, সেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং পরদিন আমাদের কাছে গ্রেৎজ আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বেলা ১২টার সময় মোটরে আমাদের হল্যাণ্ড রওনা হওয়ার কথা। আমাদের দলে এখন মোট চারজন—ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস, ভোগীলাল প্যাটেল এবং আমি। ইউ. কে.-র বাসিন্দা ভোগীলাল ইউরোপে তাঁর হোণ্ডা গাড়িটি নিজে চালিয়ে খুব আনন্দ উপভোগ করেন। গাড়ির ডিকিতে তাঁর বিছানাপত্র থাকে। তিনি আবার সর্বদা নিজের রান্না-করা খাবার সঙ্গে রাখেন, যে-বিদ্যায় তিনি খুবই পারদর্শী।

● হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ড) ●

সন্ধ্যা ৬টার সময় আমরা আমস্টেলবীন শহরে অবস্থিত আমাদের হল্যাণ্ড কেন্দ্রে (রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি) পৌঁছালাম। সুন্দর দোতলা বাড়ি, সামনে এবং পিছন দিকে ছোট্ট বাগান। আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভাল। শ্যামলিমায় পূর্ণ চারদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। স্বামী সর্বাত্মানন্দ ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ। হল্যাণ্ডের এক যুবক দাব তাঁকে সাহায্য করেন।



আমস্টারডাম রেলস্টেশনের সামনে লেখক ও স্বামী সর্বাত্মানন্দ

রাতের বিশ্রাম শেষে ঘুম ভাঙল এক উজ্জ্বল সকালে। সকাল সাড়ে ৯টায় আমরা ট্রেনযোগে আমস্টারডাম সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। আমস্টারডাম হল্যাণ্ডের বৃহত্তম নগরী। ঐ নগরীতে অনেকগুলি খাল আছে। অনুমান করা হয়, সেগুলির সংখ্যা প্রায় ১০০টির মতো হবে। একটি টুরিস্ট লঞ্চে করে আমরা শহর পরিদর্শনে গেলাম। স্বামী সর্বাত্মানন্দ এবং দাবকে নিয়ে আমরা এখন সংখ্যায় পাঁচজন। কারণ ভোগীলাল রান্না করার জন্য আশ্রমে থেকে গেছেন। তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রায়ই এখানে আসেন; কয়েকদিন আশ্রমবাস করে অন্যত্র যান।

আমরা অনেকগুলি খাল অতিক্রম করলাম। সেই অবসরে একনজরে নৌকা থেকে আমস্টারডাম শহরটি দেখা হলো। এই খালগুলি শহরটিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। আমরা ট্রেনযোগে বেলা সোয়া একটায় আশ্রমে ফিরে এলাম। দুপুরের আহারের পর কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আমরা একটি বাঁধ দেখতে গেলাম। ভোগীলাল আমাদের ঐরকম একটি বাঁধ দেখাবেন বলে রেখেছিলেন। নেদারল্যাণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলই সমুদ্রতটের নিচে অবস্থিত। সেই কারণেই সমগ্র সমুদ্রতটে বাঁধ দেওয়া আছে, যাতে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে দেশটিকে ভাসিয়ে না দিতে পারে। ভোগীলাল তাঁর গাড়ি নিয়ে অনেক সন্ধান করলেন, কিন্তু একটি বাঁধেরও দর্শন পাওয়া গেল না! মনে হলো, তিনি পথ ভুল করেছেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য একটি বাঁধের সন্ধান মিলল, কিন্তু সেটি আকারে খুবই ছোট।

আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা ৭টার সময় ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে আমার 'আধুনিক যুগের মানুষের নিকট বেদান্ত' বিষয়ে কিছু বলার কথা। আলোচনার পর রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রায় ৩০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ হল্যাণ্ডের মানুষই দেখলাম ইংরেজি ভাষা বুঝতে পারেন; সেইজন্য আর অনুবাদের প্রয়োজন হলো না।

● জার্মানি ●

সন্ধ্যার পর স্বামী দেবাত্মানন্দ এলেন গ্রেৎজ থেকে। আমাদের মালপত্রগুলিও তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন। পরদিন তাঁর আমাদের মোটরযোগে জার্মানি নিয়ে যাওয়ার কথা। আমরা পাঁচজন দুটি গাড়িতে ভাগাভাগি করে উঠলাম। ইউরোপের রাস্তাঘাট অতি সুন্দর। ঘণ্টায় প্রায় ১৪০/১৫০ কিলোমিটার বেগে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালানো যায়। প্রথমে আমরা গেলাম ওবারহসেনে লিলির বাড়ি। তিনি জার্মান ভক্ত এবং এই গ্রামে তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি আছে। তিনি প্রায়ই গ্রেৎজে গিয়ে বেশ কিছুদিন বাস করেন। তিনি আমাদের জন্য মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুত করেছিলেন। আহার ও বিশ্রাম শেষে আমরা বিন-ওয়েড নামে একটি গ্রামের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত একটি বেদান্ত সোসাইটি আছে। বিকাল পৌনে ৫টায় আমরা সেখানে পৌঁছালাম।

জার্মানির গ্রামাঞ্চলগুলি খুবই আকর্ষণীয়। এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জগতের বৃহত্তম যুদ্ধের ব্যবস্থা করে সমগ্র বিশ্বের বুকে পাঁচ বছর ধরে বিরাট দাবানল জ্বালানো হয়েছিল! মানুষ নিজেই এই পৃথিবীকে নরকে পরিণত করছে; আবার সে-ই চেষ্টা করলে সেখানে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমরা যখন বিন-ওয়েড সোসাইটিতে পৌঁছালাম, তখন সেখানে মাত্র ৪-৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন; কারণ সেখানকার মানুষ ধারণা করতে পারেননি যে, আমরা অত শীঘ্র সেখানে পৌঁছে যাব। বসুমল্লিক এবং তাঁর জার্মান স্ত্রী, ভারতবর্ষের আলমোড়া থেকে আগত যোশী, জনৈকা মহিলা ভক্ত ডিয়টলিণ্ড কপমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কপমান স্বামী নিখিলানন্দ রচিত শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবনী জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

এই বাড়িটি তিনতলা এবং প্রধান সড়কের ওপর অবস্থিত। চারদিকে খেত; সেখানে সোনালি রঙের পাকা গম তোলার অপেক্ষায় রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছবির মতো। কয়েক মাইল অন্তর অন্তর এমন সুন্দর সুন্দর গ্রাম আছে।

বাড়িটির একতলায় একটি সভাঘর এবং খাবারঘর, অবশ্যই একটি রান্নাঘর এবং দু-একটি থাকার জন্য ঘরও আছে। দোতলায় অনেকগুলি ঘর। সেখানে ১৫-১৬ জন থাকতে পারেন। মন্দিরটি একেবারে ওপরতলায়। একজন সাধুর থাকার জন্যও একটি বড় ঘর আছে। বাড়িটির চারপাশেই ফুলের বাগান। একপ্রান্তে কাঠের একটি একতলা বাড়ি।

সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রার্থনা এবং জপধ্যান হলো। ৭টা ৩৫ মিনিটেও দেখা গেল সূর্য স্বমহিমায় ভাস্বর! ইতোমধ্যে আরো অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে।

পরদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ সকাল ৬টায় মন্দিরে কিছুক্ষণ ধ্যান হলো। তারপর স্বামী দেবাত্মানন্দের সঙ্গে কিছুটা বেড়িয়ে এলাম। বেলা ১১টার সময় ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল বেলা পৌনে ১টা পর্যন্ত।

সন্ধ্যাবেলা ভজন এবং জপধ্যানের পর আমরা রাতের আহার গ্রহণ করলাম। অমিত ব্যানার্জি নামে এক যুবক তার স্ত্রী সাহানা ও তাদের তিনমাসের সন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। অমিতকে আমি মাদ্রাজে

(চেন্নাই) থাকতেই চিনতাম। সাহানা খুব ভাল সেতার বাজায়। তার বাবা হলেন বিখ্যাত সেতারবাদক সন্তোষ ব্যানার্জি এবং তিনিই সাহানার গুরু। সাহানা আশ্রমে সেতারের একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করল। তবলায় সঙ্গত করল অমিত। রাত ৯টার সময় শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি চলল প্রায় দেড় ঘণ্টা। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'Köln' (কোলন) শহরে প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন একটি ক্যাথিড্রাল দেখাতে নিয়ে গেলেন। এর পূর্বের নাম ছিল 'Cologne'। উনবিংশ শতাব্দীতে এটির নির্মাণকাজ শেষ হয়। এই ক্যাথিড্রালটি অতি সুন্দর। এর সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ৩০০ ফুট। সম্পূর্ণ পাথর দ্বারা নির্মিত গোথিক খিলান, ধনুকাকৃতি গম্বুজ এবং বিশাল বিশাল স্তম্ভে শোভিত ক্যাথিড্রালটি মনে রাখার মতো। সেখান থেকে আমরা গেলাম রাইন নদী দেখতে। এটি ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ নদী। বড় বড় লঞ্চে চাপিয়ে ভ্রমণার্থীদের নদীবক্ষে ঘোরানো হয়। দুপুরের আহারের জন্য আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম।

বিকালবেলা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ভক্তদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। ফ্রাঙ্কফুর্ট (এখান থেকে দেড় ঘণ্টার পথ), কোলন এবং অন্যান্য শহর থেকে আগত কয়েকজন ভক্ত সেসময় উপস্থিত ছিলেন।

যোশী, শ্রীমতী বসুমল্লিক এবং লিলির মতো বয়স্করা জার্মানিতে একজন সন্ন্যাসীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করে আমাকে সেখানে একজন সন্ন্যাসীকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলেন। জার্মানরা সংস্কৃত এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী এবং সেই কারণেই জার্মানদের জন্য সঙ্ঘের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হলে আজ থেকে ৬০ বছর পূর্বেই সেখানে একটি শাখাকেন্দ্রের সূচনা করা সম্ভব হতো।

● সুইজারল্যাণ্ড ●

২৮ তারিখ সকালে পৌনে ৯টায় আমরা চারজন (ভোগীলাল, ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং আমি) জার্মানিকে বিদায় জানিয়ে জেনেভার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। দীর্ঘ পথ, প্রায় ৮০০ কিলোমিটার। গাড়ি চালানোর সুযোগ পেয়ে ভোগীলাল খুব খুশি! তিনি আবার গাড়ির ডিকিতে অনেক আহার্যবস্তু বোঝাই করে নিয়েছিলেন; যেমন স্ন্যাক্স, বড় একটি ফ্লাস্ক ভর্তি চা এবং লাঞ্চ প্যাকেট। স্বামী দেবাত্মানন্দ ফ্রান্স রওনা হয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছাড়া আবহাওয়া ছিল অতি সুন্দর। খেত, শস্য ও তরঙ্গায়িত সবুজে ঢাকা টিলাগুলির ওপর সূর্যরশ্মি জ্বলজ্বল করছিল। সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশের সময় কোনপ্রকার অভিবাসন অথবা কাস্টমসের ঝামেলা ছিল না। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দেশগুলি (Schenger) এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সময় এই 'চেকিং' পদ্ধতি বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকটা ভারতবর্ষের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার মতো। সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশের পর অনেক ছোট-বড় সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে হয়। পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথটি সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণে ইতালি যাওয়ার পথে অবস্থিত।

আমরা জেনেভা পৌঁছালাম সন্ধ্যা পৌনে ৮টায়। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি সুন্দর ছোট জমির ওপর আমাদের আশ্রমটি অবস্থিত। তবুও জায়গাটি বেশ শান্ত। চারদিকে প্রচুর গাছ। জেনেভাতে নিয়ম হলো, মোট জমির এক তৃতীয়াংশে বাড়ি নির্মাণ করতে হবে এবং বাকি অংশে আবশ্যিকভাবে বাগান এবং গাছপালা থাকবে।

দেশটি আকারে ছোট হলেও সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষার প্রচলন আছে। উত্তর-পশ্চিমে ফরাসি ভাষা, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জার্মান ভাষা এবং দক্ষিণে 'ইতালিয়ানো'। চারদিকে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। জেনেভা শহরটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় হ্রদ জেনেভার পূর্ব এবং দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সবচেয়ে বড় শহর জুরিখ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার ভাষা জার্মান। সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ মানুষই তিনটি ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, সুইজারল্যাণ্ড প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল না। সুইজারল্যাণ্ডে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য একরকম সাধারণ চুক্তি বলবৎ আছে। সেই কারণেই এই দেশের মুদ্রা 'সুইস ফ্রাঙ্ক' সর্বদা মোটামুটি স্থিতাবস্থায় থাকে।

২৯ জুন রবিবার দুটি গাড়িতে করে আমরা স্যামোনে যাত্রা করলাম। একটি গাড়ি সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের, অপরটি ভোগীলালের। সাগ্নিক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। সে জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘে কর্মরত। স্যামোনেতে পর্যটকদের খুব ভিড়। ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'মো ব্লাঁ' (Mont Blanc) দেখার জন্য আমরা টিকিট কেটে 'কেবল কার'-এ চড়লাম। আমরা প্রায় ১২,৫০০ ফুট উঁচুতে চলে গেলাম। 'মো ব্লাঁ'র উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট। ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী অতি চমৎকার। ফরাসি ভাষায় 'Mont Blanc' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় 'মো ব্লাঁ'। ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আল্পস পর্বতমালার এই অংশটি ফ্রান্সে অবস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ফরাসিরা খুব গর্ববোধ করেন। পর্বতশৃঙ্গটি তুষারাবৃত। অনেকেই

দেখলাম বরফের ওপর স্কী করতে যান। সময়, শক্তি এবং স্কীর কৌশল জানা থাকলে ব্যাপারটি আদৌ কঠিন নয়।

দুপুর সোয়া ৩টায় আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। বিকাল পৌনে ৬টায় ' দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত' বিষয়ে একটি ভাষণ দিলাম। প্রায় ২৫-৩০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই ভারতীয়।

সন্ধ্যার পর 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন' (WHO)-এর ডঃ হোসেন এসে ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং আমাকে জেনেভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর কর্মস্থল 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন' (ILO)-তে। বিশাল একটি বাড়ি। শ্রীলঙ্কা থেকে আগত হোসেন সুইজারল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন আছেন। অতি উদারহৃদয় মানুষ তিনি। বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান রয়েছে।

পরদিন সকালে জেনেভা কেন্দ্রের প্রধান স্বামী অমরানন্দ আমাদের নিয়ে গেলেন সাস ফি-তে। চতুর্দিকে পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে এটি একটি অতি সুন্দর গ্রাম। ভোগীলাল গেলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন এবং দুসপ্তাহ ছিলেন (৪-১৯ আগস্ট ১৮৯৬)। ট্রেনযোগে জেনেভা থেকে আমরা গেলাম ব্রিগে—প্রায় দুঘণ্টার পথ। সেখান থেকে বাস ধরলাম। ট্রেন এবং বাস—দুই-ই চমৎকার। এরপর একটি চার্চে গেলাম। তখন সেখানে কেউই ছিলেন না। অবশ্য তখন দুপুর হয়ে গেছে এবং সেসময় সেখানে কারো থাকার কথাও নয়। স্বামীজীর জীবনীতে বলা আছে, এই স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি কয়েকটি ফুল তুলে ভার্জিন মেরির চরণে নিবেদন করেছিলেন। সম্ভবত ঘটনাটি এই চার্চেই ঘটেছিল।

তারপর আমরা 'কেবল কার'-এ চেপে ওপরে উঠে গেলাম। ছোট ছোট বগি, প্রতিটিতে চারজন মাত্র বসতে পারেন। এরূপ প্রায় দশটি বগি পর পর ওঠানামা করছে। প্ল্যাটফর্মে বগিগুলি কয়েক সেকেণ্ড মাত্র থামে; তার মধ্যেই যাত্রীদের ওঠানামা করতে হয়। আমরা প্রায় ৭,৮০০ ফুট উঁচুতে পৌঁছে গেলাম। ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে একটি তৃণাচ্ছাদিত জায়গায় পৌঁছালাম। জায়গাটি প্রায় জনমানবশূন্য। চারদিকের দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য বাক্‌রুদ্ধ করে দেয়, কারণ সেখানে ১১,০০০ ফুট থেকে ১৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু পর্বতশৃঙ্গের সমাবেশ; তার মধ্যে কোনটি আবার সম্পূর্ণ তুষারাবৃত। লক্ষ্য করলাম, বরফ অতি দ্রুত গলে গিয়ে একটি নদীতে পরিণত হয়ে নেমে যাচ্ছে। সেই নদীর জল আবার জেনেভা হ্রদে গিয়ে পড়ে। এই হ্রদটিই হলো রোন নদীর উৎস।

খোলা আকাশের নিচে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য জায়গাটি আদর্শ। ভোগীলাল যে লাঞ্চ প্যাকেটগুলি তৈরি করে দিয়েছিলেন, আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন পিকনিক করছি! প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় সেখানে কাটিয়ে আমরা 'কেবল কার'-এ চড়ে সাস ফি-তে নেমে এলাম। সেখান থেকে বাসযোগে গেলাম রেলস্টেশন এবং জেনেভার ট্রেন ধরলাম। সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় আশ্রমে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে আমরা আল্পস পর্বতের আরেকটি দিক দেখার জন্য রওনা হলাম। জেনেভা থেকে ট্রেনে আমরা গেলাম 'মঁত্রো'। সেখানে আমরা 'ন্যারো গেজ' ট্রেনে চড়লাম; এই ট্রেনের নাম 'গোল্ডেন পাসলাইন প্যানারোমিক এক্সপ্রেস'। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়, গ্রাম ভেদ করে ঐ ট্রেন পর্বতরাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে। সেখানকার দৃশ্যাবলী খুবই আকর্ষণীয়। এই ট্রেনটি অনেকগুলি পর্যটনকেন্দ্রে আমাদের পৌঁছে দেয়; যেমন ইন্টারল্যাকেন, লুসর্ন এবং জুরিখ। প্রথমে আমরা স্থির করেছিলাম, অতি সুন্দর স্থান ইন্টারল্যাকেন দেখতে যাব; কিন্তু দেখা গেল, সেখানে গেলে ঐদিন আর জেনেভায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেই কারণে আমরা স্টাডে নেমে বাস ধরলাম। সেই বাস আমাদের এক নির্জন প্রান্তরে পৌঁছে দিল। সেখানে একটি 'কেবল কার' স্টেশন আছে, যা আরো উঁচুতে নিয়ে যায়।



মন্ট ব্ল্যাঙ্ক বা মো ব্লাঁ-র অপরূপ সৌন্দর্য

সেখানে পৌঁছালে আরেকটি অতি আকর্ষণীয় পর্বতশৃঙ্গ জুংফ্রাঁ এবং একটি হিমবাহ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐদিন আবহাওয়া বিশেষ ভাল ছিল না, বিশেষত উঁচু স্থানগুলিতে। তার ফলে 'কেবল কার' চলছিল না। তাই আমরা দ্রুত লাঞ্চ সেরে জেনেভার পথে রওনা হলাম। সন্ধ্যার আগেই আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম।

ডাঃ গৌর দাস সেখানে থেকে গেলেন, কারণ তিনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন আমাদের আগেই ফেরার টিকিট সংগ্রহ করতে। ৫ জুলাই তারিখের টিকিটও তিনি পেয়ে গেলেন।

২ জুলাই সকাল ৯টায় আমরা সুইজারল্যাণ্ডকে বিদায় জানিয়ে ভোগীলালের গাড়িতে ফ্রান্স রওনা হলাম। তিনি এবং সুনীতি ভাগাভাগি করে গাড়ি চালালেন। এখানকার রাস্তায় গাড়ি চালানো খুবই উপভোগ্য। পথমধ্যে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর ছোটখাট সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি রয়েছে। যেমন—গাছের নিচে সিমেন্টের তৈরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেঞ্চ-টেবিল, টয়লেট ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ এবং কিছু স্ন্যাক্স ছিল। পিকনিকের মতো মনে হচ্ছিল। জেনেভা থেকে প্যারিসের দূরত্ব প্রায় ৫৩৭ কিলোমিটার। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ৩৫ ফ্রাঙ্ক খরচ করতে হয়েছিল।

● ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন ●

দুপুর ৩টার সময় আমরা গ্রেৎজে 'Centre Vedantique Ramakrichna'-তে পৌঁছালাম। সন্ধ্যায় স্বামী গঙ্গানন্দ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এটি মরক্কোর রাজার সম্পত্তি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাতের আহারপর্ব সেরে কয়েকজন ভক্তের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্মানন্দ, সুনীতি এবং আমাকে নোতর ড্যাম ক্যাথিড্রালটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। বিশালকায় এই ক্যাথিড্রালটি খুবই আকর্ষণীয়। ভিক্টর হুগো রচিত 'The Hunchback of Notre Dame' গ্রন্থটি এই ক্যাথিড্রালকে বিখ্যাত করে তুলেছে। এই ক্যাথিড্রালটির সামনের খোলা চত্বরটি আয়তনে বিশাল। চওড়া চওড়া রাস্তা এবং তার দুপাশে বিশাল বিশাল প্রাচীন বাড়ি স্থানটির আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি করেছে। সিন থেকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই জায়গাটি অনেকটা দ্বীপের মতো। অতি সঙ্কীর্ণ এই নদীটিতে কিন্তু প্রচুর জল আছে। পৌনে ১টায় ফিরে এসে আমরা দুপুরের আহার গ্রহণ করলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মন্দিরে প্রার্থনা হলো, তারপর যথারীতি জপধ্যান।

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাদের বিখ্যাত 'ল্যুভর মিউজিয়াম' দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্যারিসের মধ্যভাগে নোতর ড্যামের খুব কাছেই এটি অবস্থিত। এই মিউজিয়ামে বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্করের সৃষ্ট চিত্র ও ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে। গ্রিস এবং ইজিপ্টের আদলে ইউরোপীয় কলাশিল্প এই মিউজিয়ামটিকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালার মর্যাদা দিয়েছে। এখানে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এবং অন্যান্য অনেক শিল্পীর কীর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত 'মোনালিসা' চিত্রটি এখানেই শোভা পাচ্ছে। এটি আকারে খুব একটা বড় নয়। এখানে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। কলাশিল্পে আগ্রহী যেকোন ব্যক্তি এখানে বেশ কয়েক ঘণ্টা এমনকি কয়েকটি দিনও কাটাতে পারেন, অবশ্য সবকিছু ঘুরে দেখার মতো সময় এবং সামর্থ্য যদি তাঁর থাকে।

সন্ধ্যাবেলা স্বামী বীতমোহানন্দ লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন। তিনি সেখানে একটি সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। রাতের আহারের পর কয়েকজন ভক্তের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

পরদিন সকালে আশ্রমে বিশ্রাম করলাম। বিকাল ৫টার সময় আমি ও ডাঃ সুনীতি বসু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। স্বামী দেবাত্মানন্দ এবং স্বামী গঙ্গানন্দ আমাদের বিদায় জানিয়ে গেলেন।

● ইংল্যাণ্ড ●

গ্রিনউইচ সময় সন্ধ্যা পৌনে ৮টায় আমরা হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। ডাঃ সুনীতি বসুর স্ত্রী ডাঃ ইলা বসু এবং জনৈক ভক্ত প্রদীপ্ত দাস বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সুনীতির বাড়িতে রাত্রিবাস করে পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় বোর্ণ এণ্ড-এ অবস্থিত আমাদের আশ্রমে আমার যাওয়ার কথা। বিমানবন্দর থেকে তাঁদের বাড়ি বেশ দূরে।

শ্রীমতী ও শ্রী বসু দুজনেই চিকিৎসক। ইংল্যাণ্ডে তাঁরা একটি ক্লিনিক বা চিকিৎসালয় চালান। তাঁদের মেয়ে উমা উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। তাঁদের বাড়িটি বেশ বড়, সুন্দর এবং চারদিকের পরিবেশ অতি শান্তিপূর্ণ।

রবিবার সকালে ডাঃ সুনীতি আমাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। রবিবার হওয়ায় ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি কলেজই বন্ধ ছিল। কোথাও কোথাও অবশ্য রবিবারের উপাসনা চালু ছিল। সেই কারণেই দুপুর ১টার পরই ভিতরে যাওয়া যেত। ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করতে ২ পাউণ্ড প্রবেশমূল্য লাগে। এই বাড়িগুলি দেখার জন্য মাথাপিছু এতটা খরচ করা আমার নিরর্থক বলে মনে হলো। অক্সফোর্ডের পর কেম্ব্রিজই ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিকালবেলা আমরা ওয়াই. এম. সি. এ. হল-এ 'বিবেকানন্দ হিউম্যান সেণ্টার'-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে

গেলাম। বাংলাদেশের ফরিদপুরের রামচন্দ্র সাহা এটির তত্ত্বাবধান করেন। কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি এই কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ঐ সভায় আমি সভাপতিত্ব করলাম। দর্শকাসনে প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের লণ্ডন আশ্রমের প্রধান এবং ঐ সভার বিশেষ অতিথি স্বামী দয়াত্মানন্দ আমাকে বলেছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী সংখ্যায় অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির তুলনায় বেশি। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের লণ্ডন কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডঃ নন্দকুমার, লিবারল পার্টির সাংসদ সাইমন হেইন্স, লণ্ডন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক অফিসের ডিরেক্টর মার্ক বিকারম্যান এবং কভেনট্রি ইউনিভার্সিটির শান্তি বিষয়ক পঠন-পাঠনের অধ্যাপক তথা চিন সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যালান হাণ্টার। সভার কাজ শেষ হলে স্বামী দয়াত্মানন্দের সঙ্গে আমি আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হয়ে রাত ৯টায় সেখানে পৌঁছালাম। ১০ একর জমির ওপর স্থাপিত এই কেন্দ্রটিতে প্রচুর বৃক্ষের সমারোহ। প্রধান বাড়িটি ছাড়াও আরো দুটি বাড়ি আছে। আশ্রমের চারদিকের পরিবেশ অতি শান্ত, মনোরম ও শ্যামলিমায় পূর্ণ।

পরের দিনটি মোটামুটি বিশ্রামেই কাটল। আশ্রমে উপস্থিত কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হলো। রাতের আহারের জন্য আমরা অদূরে অবস্থিত দিলীপ মুখার্জির বাড়িতে গেলাম। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের খুব ভক্ত। সম্প্রতি তাঁরা সুন্দর ঠাকুরঘর-সহ একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন।

৮ তারিখ সকালে লণ্ডন কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ লাখানি আমাকে ইদানিং কালে তৈরি স্বামী নারায়ণ মন্দিরে নিয়ে গেলেন। ভোগীলালও আমাদের সঙ্গে সেখানে গেলেন। মন্দির-চত্বরটি বেশ বড় এবং সেখানে গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা আছে, যেটি এখানে একান্ত দুর্লভ। বুলগেরিয়ান চুনাপাথরে নির্মিত এবং গুজরাটি শিল্পের অনুকরণে কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দিরটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মন্দিরের ভিতরে ইটালিয়ান মার্বেলের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য অনেকটা রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে অবস্থিত দিলওয়ারা মন্দিরের মতো।

গুজরাটের মহান সন্ত স্বামী নারায়ণ প্রায় ২০০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডনে অবস্থিত স্বামী নারায়ণের অনুরাগী ভক্তগণ আনুমানিক ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ১০০ কোটি টাকা) ব্যয় করে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। এঁদের মূল কেন্দ্রটি গুজরাটের আমেদাবাদে অবস্থিত। তার শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক। স্বামী নারায়ণের অনুগামী ভক্তসংখ্যাও প্রচুর। এই মন্দিরের ভিতরে একটি সংগ্রহশালা আছে। সেখানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরা প্রদর্শিত হয়েছে।

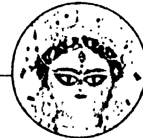
আমি তাঁদের লণ্ডন কেন্দ্রের প্রধান স্বামী আত্মস্বরূপ দাসের সঙ্গে দেখা করে প্রায় আধ ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করলাম। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রতিদিন স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই মন্দিরে আসে। তাদের সামনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করা হয়। এই ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই ইংরেজ, কিন্তু তাদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। মন্দির-কর্তৃপক্ষ আমাকে তাদের উদ্দেশে দু-এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন। সেইমতো আমি কিছুক্ষণ বললাম।

৯ তারিখ সকালে আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম, কারণ এবার আমাকে প্যারিস থেকে মুম্বাই যাওয়ার বিমান ধরতে হবে। স্বামী দয়াত্মানন্দ, স্বামী শিবরূপানন্দ এবং ভোগীলাল আমাকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বিমান উড়তে কিছুটা বিলম্ব হলো।

প্যারিস বিমানবন্দরের বাসে ২-৩ কিলোমিটার দূরে বিমানবন্দরের অন্য এক প্রান্তে যেতে হলো। প্যারিস বিমানবন্দরটি এত বিশাল যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে না পারলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

১০ জুলাই রাত দেড়টায় বিমানটি মুম্বাই বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল। মুম্বই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ এবং অন্যান্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাত সোয়া ২টায় আশ্রমে পৌঁছালাম। পরদিন সন্ধ্যায় কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতে হবে। ❑

(ভাষান্তর ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)



বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট

(১৪১১ বঙ্গাব্দ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)

৩ কার্ত্তিক/২০ অক্টোবর ঃ **মহাসপ্তমীপূজা**

৪ কার্ত্তিক/২১ অক্টোবর

সন্ধিপূজা ঃ দ্বিপ্রহর ২ ঘটিকা

৫ কার্ত্তিক/২২ অক্টোবর ঃ **মহানবমীপূজা**

৬ কার্ত্তিক/২৩ অক্টোবর ঃ **দশমীবিহিত পূজা ও বিসর্জন**

আলোচনা

মনে হয় 'অবক্ষয়' শব্দটি একটি অজুহাতমাত্র

অসীমকুমার চৌধুরী*

অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, দেশের সব সমস্যার মূল হলো 'অবক্ষয়'। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে, অথচ নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। গুরুগম্ভীর, ছদ্মকুশল, ভাবুক ভাবুক কথাবার্তার সবখানেই এই এক বার্তা। অথচ বোদ্ধাব্যক্তিরা সমাধানের কোন পথ দেখাতে পারছেন না। কেন?

কোন বিষয়ে আলোচনার আগে বিষয়টির অন্তত চলনসই একটি সংজ্ঞা ধরে নিতে হয়। তাই অবক্ষয় বা মূল্যবোধহীনতা বলতে যদি মনে করা হয়—'যা হওয়া উচিত ছিল তা না হওয়া', তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। রাজা দশরথের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু মধ্যমা রাজমহিষী কৈকেয়ী ও তস্যা পরিচারিকা মন্থরার কুচক্রান্তে রামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হলো। মহাভারতে প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছে অথচ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য প্রমুখ জ্ঞানী পুরুষেরা একটিও প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ করলেন না। অবশ্য এইসব অস্বাভাবিক ঘটনার ভাষ্যও দেওয়া হয়েছে। রামচন্দ্র বনবাসে না গেলে রাবণবধ হতো না। যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসতে না দেওয়া থেকে শুরু করে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ঘটনা দুর্যোধন প্রমুখদের দ্বারা সঙ্ঘটিত না হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতো না, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতো না, সর্বোপরি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো সর্বকালের অমূল্য সম্পদটি সৃষ্টি হতো না। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সংজ্ঞা নিরূপিত হতো না। জীবন ও কর্মের অর্থ থেকে যেত অজ্ঞাত। কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজটি করণীয় বা অকরণীয় তার নির্দেশ আমরা পেতাম না। এসবই ঈশ্বরের লীলা বলে ধরে নিলে গোল মিটে যায়। তবুও সব কথা বোঝা দায়! মহাজ্ঞানী ভীষ্ম পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে, পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ! কী আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন। কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সেজন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি এইজন্য কাঁদছি যে, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই। এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য কিছুই বোঝার যো নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭০-৭১); সিদ্ধান্ত হলো, দুষ্টের দমনের জন্য শিষ্টের সাময়িক দুঃখভোগ। যেহেতু শেষপর্যন্ত মূল্যবোধ রক্ষা পেল, তাই উল্লিখিত ঘটনাগুলি অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেক সাম্প্রতিক ঘটনাকেও নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দীপক বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন আপন ভ্রাতৃজায়াকে 'সতী' হতে দেখে রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণে উদ্দীপনা হওয়া বা নাবালিকা বিধবার দুঃখে কাতর হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের জন্য উঠে পড়ে লাগা। তবে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র ঘেঁটে পণ্ডিতজনের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে আপনাপন কর্তব্য স্থির করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত কায়েমি স্বার্থ পরাজিত হয়েছিল। অর্থাৎ 'সোস্যাল ডায়নামিক্স' বা সামাজিক গতিবিজ্ঞান স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সেটা সম্ভবও নয়।

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর পথ একেবারে আলাদা। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কূটকচালি নেই। তিনি সোজাসাপটা বলে দিলেন, অনেক জানার নাম 'অজ্ঞান'। ঈশ্বর আছেন—এটি জানাই হলো 'জ্ঞান'। সেটি জেনে অহৈতুকী ভালবাসা ও ভক্তি নিয়ে ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকলে আপন অন্তরে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবেই। তারপরে 'বিজ্ঞান'। এরপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হবে। সর্বাংশে দেহমনাতীত হতে হবে। তাতে সফল হলে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যাবে। তাঁর সঙ্গে হবে আলাপন। সুতরাং চরৈবেতি—এগিয়ে পড়। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উনিশ শতকে বিদেশিয়ানা ও নীতিহীনতার যে-তুফান উঠেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি ও অহৈতুকী ভালবাসার অমৃতকথা সেই তুফানকে যেন স্তিমিত করে দিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, মানুষই কেবল বলতে পারে—'আমিই ব্রহ্ম'। কারণ ধর্ম তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, পূর্ণতার বীজ তার মধ্যে উপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে জাগাতে হবে। কেমন করে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলে রেখেছেন, মানুষকে 'মান হুঁশ' হতে হবে। স্বামীজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে। সে-কাজই তখন হয়ে দাঁড়াবে সেবা। অহৈতুকী সেবা। সেটিই

* *'সমাজবাদী ভাবনা' শীর্ষক দ্বিমাসিক পত্রিকার সম্পাদক, চারুচন্দ্র কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।*

পূজা। সেটিই প্রার্থনা। ভাবটি অবশ্য তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "তিনি [ঈশ্বর] তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ।" "মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১২২) তাই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ঃ "ভ্রান্তিবশত লোকে যাদের 'মানুষ' বলে অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণ'-এরই সেবক।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩০)

এবার আজকের যুগে আসা যাক। দেখা যাচ্ছে বর্তমানেই অবক্ষয় বা মূল্যবোধহীনতা নিয়ে যত বিলাপ এবং সময় বা কালের ওপর দোষারোপ করে হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু কাল তো প্রবাহ। নদীপ্রবাহের মতোই নির্লিপ্ত। গঙ্গা দিয়ে প্রতিনিয়ত যেমন ভেসে চলেছে পূতিগন্ধময় বর্জ্যপদার্থ, তেমনি ভেসে চলেছে পূজার অর্ঘ্যও। গঙ্গা কিন্তু নির্লিপ্ত। যে যেমনভাবে গঙ্গাকে দেখেছে, সে তেমনিভাবে কর্ম করেছে। আবার এমন ভাবও আছে, মৃতকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে সেটা হবে শ্রেষ্ঠ সৎকার। সুতরাং কাল কিছু নয়, আসল বিষয় হলো আমাদের মতিগতি ও আচরণ। নিজেদের মনের ভাবকে আমরা কালের ওপর আরোপ করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ কোন একটি ক্ষেত্রের আচরণকে সমকালীন আচরণধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুকুল একটি প্রথা ছিল। শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে যেত এবং সেখানেই শিক্ষালাভের সঙ্গে লালিত-পালিত হতো। এমনভাবেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুরুর আদর্শ সঞ্চারিত হতো—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ট্রান্সমিশন অফ হেরিটেজ'। সেইরকম আশ্রমিক শিক্ষা-প্রদানের 'আদর্শ' মাথায় রেখেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী গড়ে তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের একটি স্বতন্ত্র জীবনবোধ গড়ে তুলতে সহায়তাদান। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বলে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শের পরম্পরা এখনো বজায় রয়েছে। বহিরাগত শিক্ষকও আছেন এবং তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে সুস্নাত নন; ফলে আশ্রমিক জীবন বাইরের প্রভাবকে যে এখন একেবারে এড়িয়ে চলছে, তা বলা যাবে না। তবু আশ্রমিকরা যেহেতু সর্বদা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তাই রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র বা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ছাত্রীদের স্বচ্ছ জীবনবোধ এবং সমাজচেতনা গড়ে উঠছে। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে আশ্রমিকতার বহিরঙ্গতা বজায় থাকলেও অন্তরঙ্গতা প্রায় অন্তর্হিত। নানা ঘটনা সেকথাই বলে।

একসময়ে অনেক অনাশ্রমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জীবনবোধ গড়ে তোলা। ছাত্রছাত্রীরা আপনাপন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষক বা অধ্যাপকের ছাত্র বলে গর্ববোধ করত। আজ আর সেদিন নেই। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বড় অংশ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তির বকলমে দলীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন। ইদানীং সর্বস্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রশাসকদের নিয়োগ হয় গুণ ও যোগ্যতার পরিমাপে নয়, অন্য কোন শর্তসাপেক্ষে। তাছাড়া শিক্ষক-ছাত্রের সওদাগরি সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান। তাই যখন মূল্যবোধের কথা শুনি, তখন তা মনে দাগ কাটে না।

পিতামাতা হিসাবেই বা আমরা কোন্ সামাজিক দায়িত্ব পালন করছি? অধিকাংশ পিতামাতা সন্তানদের ইঁদুরদৌড়ে জুড়ে দিচ্ছেন। যেমন করেই হোক প্রতিযোগিতায় সফল হতে হবে। কতজন পিতামাতা সন্তানকে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পাঠ দেন? এই যে আপন সন্তানকে তাঁরা ঘোড়ার মতো নানা প্রতিযোগিতায় ছোটাচ্ছেন, তাও তো নিঃস্বার্থতায় নয়। আবার সন্তানদের মাধ্যম করে পিতামাতার দল নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতেছেন। তাই শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা বিষয়ে ক্লান্তিকর তথ্যসংগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আবার এসে পড়ে ঃ "অনেক জানার নাম অজ্ঞান।" শিক্ষায় যদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন না থাকে তবে তা শিক্ষাই নয়, সে-শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত পূর্ণতাকে বিকশিত করার পরিবর্তে তাকে গভীরতর সুপ্তিতে তলিয়ে দেবে। আজ তা-ই হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি যেধরনের সৃষ্টিশীলতা তৈরি করেছে, তার বেশির ভাগটুকুই দৈহিক আরাম ও বিনোদনে ব্যয়িত হচ্ছে। তার কাজ উপযোগিতা বৃদ্ধি করা। কারণ, দেহ আরো বেশি আরাম চায়। সেটি প্রদানে ব্যর্থ হলে রণে ভঙ্গ দিতে হবে। সেই কারণেই এত অস্থিরতা। এই অনিশ্চয়তাজনিত অস্থিরতা অবসাদ ডেকে আনছে। প্রায়ই শোনা যায়, ছাত্রছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে। সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ভোগবাদের দেশে মনোরোগ এবং আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। আজ সেই প্রবণতা আমাদের দেশেও দেখা দিতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক। কারণ, সৃষ্টির আনন্দটুকু হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার ফলে জীবনের ঘরে জমে উঠছে শূন্যতার পাহাড়।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ/ মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" (৩।৩৭) স্বামী প্রেমেশানন্দ শ্লোকার্থ করেছেন ঃ "শ্রীভগবান বলিলেন, ইহাই রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে শত্রু বলিয়া মানিবে।" তিনি আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ "এই কামই

ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। আর কামনার উদ্ভব রজোগুণ হইতে। কামনা আর কিছুই নহে, কেবল দিনরাত চাই-চাই। মান চাই, অর্থ চাই, সুখ চাই। 'আমি চাই না'—একথা বলিবার লোক নাই। এবং চাওয়া কখনো নিবৃত্ত হইতে দেখি না। ইহা 'মহাশনঃ'—দুষ্পূরণীয় 'মহাপাপ্মা' মুক্তিলাভের পথে মহাপ্রতিরোধস্বরূপ বাসনা।" ('উদ্বোধন', ১০৫তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮০); শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন ঃ "ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫১৪)

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অবক্ষয় নিয়ে যাঁরা বিলাপ করছেন তাঁরাই হলেন 'চাই চাই'-এর সবচেয়ে বড় কারবারি। এঁদের পাঁচমিশেলি দলটিও বেশ ভারি। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক, আরক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, পেশাদার সমাজসেবী, ধর্মব্যবসায়ী, গণৎকার—কে নেই এই দলে!

তথাপি এটিই ভারতের পূর্ণ সমাজচিত্র নয়। এখানেই রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো কিছু সংগঠন। সাধারণ মানুষের দাননির্ভর এইসব সংস্থা নীরবে মানুষের সর্বাত্মক সেবায় ব্রতী রয়েছে। সন্ন্যাসীরা পাশে পান এমন অসংখ্য মানুষকে, যাঁরা নামযশের কাঙাল নন। এই দেশেই এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের স্বল্প আয় থেকেও কিছুটা অন্তত বাঁচিয়ে প্রতি মাসে দুঃস্থ-দুর্গতদের সাহায্য করেন—লোকচক্ষুর আড়ালে।

এই মুহূর্তে আমরা এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে পেয়েছি, যিনি সারা দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন কমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের মনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে তাদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাদের দেশের উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য শপথগ্রহণ করাচ্ছেন, যা স্বামীজী চাইতেন। তিনি ডঃ এ. পি. জে. আবদুল কালাম।

এই ভারতেই, এমনকি বিহারের মতো রাজ্যেও এমন গ্রাম এখনো আছে—যেখানে দুঃস্থ মানুষের সেবায় সরকারের সাহায্য গিয়ে পৌঁছালে তারা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কারণ, তারা চোখের সামনে জীবন দেখেছে। পাঠকবর্গ জানেন, তাদের আদর্শ ছিল গ্রামের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা। কোন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কথামতো না চলায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামীণ উন্নয়নের মডেল হিসাবে আজ সেই গ্রাম চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছে ভাল্কি গ্রামেও চলেছে অনুরূপ কর্মযজ্ঞ। সংবাদমাধ্যমগুলি এইসব খবর সম্প্রচারে বিশেষ উৎসাহী নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা যে সুদূরপ্রসারী হতে পারত, তাতে কোন দ্বিমত নেই। ভোগবাদী বিজ্ঞাপন সম্প্রচারে কতিপয় লোকের মুনাফা হয়, কিন্তু দেশের বৃহদংশ মানুষের কোন উপকার হয় না। বাস্তব চিত্র সেটাই।

তাই সব খবর আমরা জানতে পারি না। তবু যতটুকু জানা যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কেতাবি ভাষায় যারা অসংগঠিত উদ্যোগী—তারাই দেশের অনেকখানি ভার বহন করছে। গরিব মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে। 'অবক্ষয়' শব্দটিই বরং তাদের অচেনা। ❑

সমাধান ঃ

পাশাপাশি ঃ (১) মায়াবতী, (৩) সাধন, (৪) আত্মা, (৫) লরা, (৭) রাজম আয়ার, (৮) তিন, (১০) কালভে, (১২) বিগ্রহ, (১৪) দর্শন, (১৫) রিপন, (১৭) নব, (২০) সন্ন্যাসীর গীতি, (২২) কলা, (২৪) লীন, (২৫) বস্টন, (২৬) সংসার।

ওপর-নিচ ঃ (১) মার্বেল, (২) তীর্থরাম, (৩) সালেম, (৪) আরতি, (৬) রাখাল, (৯) নরেন, (১০) কাঞ্চন, (১১) ভেদ, (১৩) হরি, (১৬) পথিক, (১৮) বসন, (১৯) ইতিহাস, (২১) রন্ধন, (২৩) লাহোর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, রমা রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, শঙ্করচন্দ্র মাইতি, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ সরকার, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল।

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ কার্তিক ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা**
আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী
৩ কার্তিক, বুধবার
(২০ অক্টোবর ২০০৪)
শ্রীশ্রীকালীপূজা
দীপান্বিতা অমাবস্যা
২৫ কার্তিক, বুধবার
(১১ নভেম্বর ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ৭, ২২ কার্তিক
রবিবার, সোমবার
(২৪ অক্টোবর, ৮ নভেম্বর ২০০৪)

শরৎকাল ও লেখনীর জয়

মঞ্জুভাষ মিত্র

চোখের সামনে একমুঠো সাদা কাশফুল
উসকে তুলেছে নীল আকাশের খুশিকে
শরৎকুমারী নাচের ছন্দে পা ফেলছে গ্রামে নগরীতে
সময় থাকতে হৃদয় আমার, চিনে নাও ঐ রূপসিকে।

আমার বুকের ভিতর রয়েছে উদাসী নদীর ধারা
বছর বছর ভেসে চলে গেছে পণ্যপূর্ণ নৌকাগুলি
কোন্ সে-বছর, কিসের পণ্য?
কিছুই জানি না, হয়েছি ধন্য
শুধু এইটুকু জানি।

শরৎ আকাশে হয়েছে রবির পূর্ণ উদয়
হৃদয় আমার, দেবী দুর্গার মঙ্গলগান কর
পাঁচ ইন্দ্রিয় ভরে
শিউলি এবং ডাকের সাজের গন্ধের স্বাদ নাও
বল কল্পনা আজ জয়ী হবে, তরবারি হেরে যাবে
বল লেখনীর জয়।





নূতন ভুবন গড়ব

শেখ সদরউদ্দীন

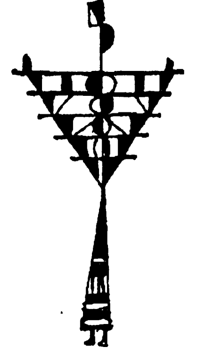
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নূতন ভুবন গড়ব—
মরুর বুকে বন-বনানীর চারা রোপণ করব।
ফুলের বনে মৌমাছি-মন
গুঞ্জরিয়ে উঠবে,
তপ্ত হৃদয় জুড়িয়ে দিতে
শীতল মলয় ছুটবে।
পাখির কণ্ঠে ঘুমভাঙানি ভোরের কূজন ধরব—
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নূতন ভুবন গড়ব!

দ্বন্দ্ব-বিভেদ ধর্ম নিয়ে
হবে না কেউ অন্ধ—
থাকবে নাকো ধোঁয়া-ধুলো হাওয়ায় বারুদ-গন্ধ!
সঙ্কীর্ণ মনটি ভেঙে
জাগবে আলোর আশা—
হিংসা-ঘৃণা থাকবে নাকো
থাকবে ভালবাসা।
প্রীতি প্রেমের সুবাস দিয়ে সবার হৃদয় ভরব—
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নূতন ভুবন গড়ব।

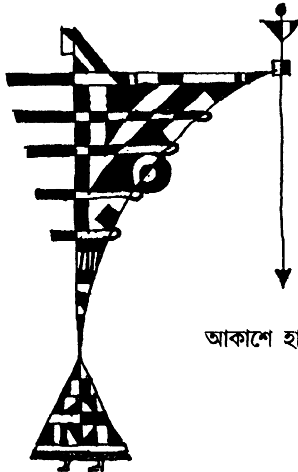
জীবন-মরণ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যু মাঝে এত জীবন
আগে কে তা জানত?
জীবন ভরা এত মরণ
আগে কে তা মানত?
বেঁচেও তো বুকের মাঝে রোজ দুবেলা গনি
স্পষ্ট বাজে মৃত্যুদেবের লঘু পদধ্বনি
তেমনি ধারাই মৃত্যু মাঝে
শুনি যদি নিত্য বাজে
জীবনদেবের আগমনী
সে-শোনা কি ভ্রান্ত?



জীবন মাঝে মরণ আছে
পরম ছদ্মবেশে
নতুন জীবন পাবে জীবন
মরে নতুন দেশে।
জীবন দিয়ে, জীবনটি যে
আড়াল হয়ে আছেন নিজে
মৃত্যুতে সে-আড়াল ভাঙে
হোক না বিয়োগান্ত।
যোগ-বিয়োগের অতীত সে যে, অনন্ত তার রূপ
মৃত্যু হলো হোমের আগুন, জীবন হলো ধূপ।
ছুঁইয়ে গায়ে সেই শিখাটি
মৃত্যুরূপী দেবতাটি
জীবনকে রোজ করেন জানি
অমর লোকের পান্থ।



তিনি আসছেন

নিভা দে

চারদিকে নিঃশব্দ শিহরণ
তিনি এলে আর সব বাহুল্যবিলাস
ছেড়ে দিতে হয় সব রাজপথ—
তিনি আসছেন।...

প্রতীক্ষায় গেল কাল
দিন ক্ষণ মাস—মাঠ হলো ফুটিফাটা
আকাশে হাহা তৃষ্ণা—চরাচর প্রতীক্ষায় প্রণত ছিল।
তিনি আসছেন।...

তাঁর আবির্ভাবে
শুদ্ধ হবে সব পথ-প্রান্তর;
সিক্ত হবে পূর্ণ হবে আনন্দ-ধ্বনিতে।

তোমায় ভালবাসি বলে

শিশুতোষ ধাওয়া

মাগো, তোমায় ভালবাসি বলে তোমার চরণ পূজি
অন্তরে পাই ব্যথা যখন তোমায় আমি খুঁজি,
অন্ধকার আকাশ-তলে
তারার প্রদীপ যেমন জ্বলে
স্নিগ্ধ তোমার দুটি চোখের শান্তিবাণী বুঝি,
তোমায় আমি পাব বলে তোমার চরণ পূজি।

এই জীবনের পথের বাঁকে মৃত্যু পাতে ফাঁদ
আলো-ছায়ার থাকে থাকে কতই পরমাদ,
দগ্ধ জীবন যন্ত্রণাতে
পাব বলে তোমার হাতে
পরম লগন, পরম পরশ, পরম আশীর্বাদ
তাই তো জানি অভয় মানি ঘুচবে পরমাদ।

ষড়রিপুর দহন হৃদে চিতা বহ্নিমান
অন্তর্যামী তুমি জান কী তার পরিমাণ,
তুমি শিব-শক্তিময়ী
অন্তস্তলের হে চিন্ময়ী,
তুমি আমার শীতল বারি, আমার পরিত্রাণ
হে ঈশ্বরী, তোমায় পূজি এ দীন সন্তান!



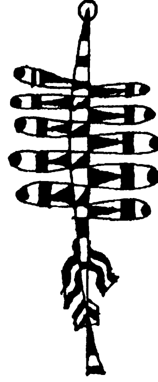
তোমার প্রতি

সুনীলকুমার পাল

দুঃখে যখন থাকি
আকুল হয়ে ডাকি,
চোখের জলে তোমার মধুর নামটি তখন গাই
মনের মাঝে সেই ক্ষণেতে দেখতে তোমায় পাই।

দুঃখ বিদায় হলে
তোমাকে যাই ভুলে,
হায় রে তখন আমায় তুমি দাও যে বড় ফাঁকি
ত্রিসীমানার কোথায় তুমি, তোমায় ছাড়াই থাকি।

তাই তো আমি বলি
জীবনটাতে খালি
সুখই নয়, দুঃখ খানিক দিও সাথে তারই
তোমার মধুর নামটি সদাই জপতে যাতে পারি।



ফাঁপা দেখনদারি

দেবী রায়

এই যে ফাঁপা দেখনদারি!

জীবন নিয়ে বিব্রত,
ঘোর-সংসারী

ভাবি না একবারও
এই জগৎসংসারও
মূর্খামি
'আমি আমি'

ভাবি না একবারও
আগে সেতুর কাছে পৌঁছাই
তারপর?
পার হওয়ার কথা!





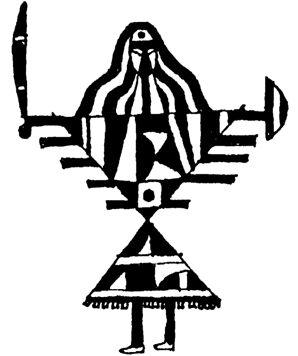
অবাঙ্‌মনসোগোচর

চণ্ডী সেনগুপ্ত

এই হাতে তাঁর কী বরাভয়!
অন্য হাতে লয়,
মূর্ত আবার অমূর্ত সে,
অনন্ত বিস্ময়।

গুণহীন গুণান্বিত
বাক্যমনাতীত কে ও!
অনন্য বিস্ময়।

কোন্ খেয়ালে দাঁড়ায় এসে!
কন্যা বেশে ত্রি-দিবসে
বিশ্বমাতার নন্দিনীরূপ
অচিন্ত্য বিস্ময়।



তবেই হতো ভাল

রথীন্দ্রমোহন ঘোষ

যদি এমন হতো—
ডাকতে পেতাম তোমায় আমি বিড়ালছানার মতো।

হতো যদি এমন—
আমি অষ্টপ্রহর ছুঁতে পেতাম তোমার দুটি চরণ।

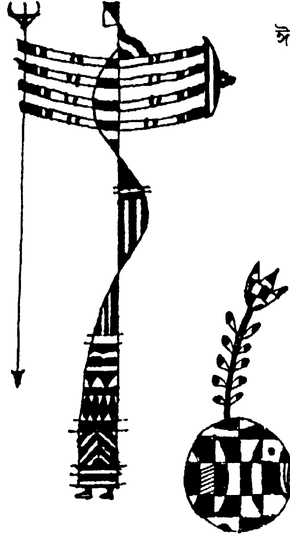
এমন হতো যদি—
দিবানিশি সদাই আমি তোমার জন্য কাঁদি।

তবেই হতো ভাল—
তবেই হতো ভাল ঠাকুর—তবেই হতো ভাল,
মনের আঁধার ঘুচে যেত, দেখতে পেতাম আলো।

ত

রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মাগো—
'মা ত্বং হি তারা' গাইল যারা
আজ কি তারা নিরুদ্দেশ?
(তোমার) সৃষ্টি এখন পাপেই ভরা
অনাচারের নেই কি শেষ?
বিবেক-বুদ্ধি বন্দি যে আজ
বিবেকানন্দ তুমি কোথায়?
ভায়ের রক্তে এই ছিনিমিনি
কতকাল আর সইব হায়!
মাগো—
তুমি জলে তুমিই স্থলে
সর্বঘটে তুমিই আছ
তবু—
কোন্ সাহসে ইয়াঙ্কি-লাদেন
ধ্বংসযজ্ঞে মাতে আজও?
এ কোন্ লীলা খেলিছ মাগো
কিছুই যে তার বুঝতে নারি
সন্তান সব ভুলেছে তোমায়
তুমি কি ভুলেছ দিব্যনারী?



ওগো পান্থপাদপ, আমি তোমাকে চাই

দীপালি রায়

ঈশ্বর, আমি তোমাকে চাই
মগ্নতায় তোমাকে চাই
উপাধানে নাম লিখে
স্বপ্নে সুষুপ্তিতে তোমাকে চাই।

তুমি আমার মায়ের মুখ
পূর্ণ অবয়বে
তুমি আমার অবুঝমাড়*
অরণ্যপল্লবে
তুমি আমার অবোধ ভাষ্য
অনাবাসীর চোখে
তুমি আমার মত্ত ঝঞ্ঝা
প্রলয় দরিয়াতে

তুমি আমার পান্থপাদপ
তৃষ্ণা সাহারায়
তুমি আমার গোপন রাত্রি
নির্জন কান্নায়।

———
*ছত্তিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা একটি অনুন্নত এলাকা



মানুষ

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস



(১)
স্বর্গ কোথায়? নাই জানলাম
মর্ত্যভূমির মানুষ তাই
মর্ত্যভূমির পরিবেশেই
মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।

(২)
মানুষ হয়েই এই পৃথিবীর
মানুষ ভালবাসতে চাই
দুঃখ-দীনের যন্ত্রণাতে
সবার কাছে আসতে চাই।

(৩)
হোক সে-মানুষ জটিল ভারী
হলোই বা সে নিরক্ষর
হয় যদি হোক ভিন্ন মতের
হোক না যতই স্বার্থপর।

(৪)
দীর্ণ, শীর্ণ এবং জীর্ণ
মানুষ নামের যোগ্য নয়
হয় যদি হোক; সেও মানব
জানুক জীবন সাধ্যময়।

(৫)
সবার আগে। তাই
মানুষ করে গড়তে চাই
আসবে যেদিন শেষের সেদিন
মানুষ হয়েই মরতে চাই।



তোমার আকাশ আমায় ছুঁয়ে

দুর্গা মণ্ডল



পায়ে পায়ে পথ হয়েছে ভারী
একটুখানি নামলে তুমি
তোমায় ছুঁতে পারি।

জানি তুমি অনেক বড়
হাজার তারা বুকে ধর,
আমার পিদিম পায় না নাগাল
পায় না নাগাল তারি
যেন তোমায় ছুঁতে পারি।

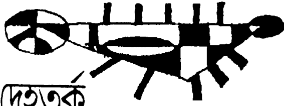
মেঘের আড়াল ছিঁড়ল যদি ভোরে
দুচোখ ভরে দেখব তোমায়
দেখব নতুন করে।

তোমার আকাশ আমায় ঢাকুক
তোমার আশিসে জীবন মাতুক
সকল চাওয়ায় বাজবে তুমি
(মোর) হৃদয়বীণার তারে,
আমি দেখব নতুন করে।

মা আসছেন

রেণুপদ ঘোষ

আশ্বিনে রোদ দুর্বাদলে
কলমিলতার ফুল ছুঁয়ে যায়
সেই না দোলন বক্ষে আমার
আশ্বিনে রোদ গান গেয়ে যায়
কানে তখন নাক-কুড়াকুড়
চৌপর তার বাজনার বোল
শিউলি-কাশে ঢুলছে বাতাস
কে আজ থাকে ঢ্যাঙ-কুড়াকুড়
নীল দিগন্তে উড়িয়ে ছুটি
রঙিন সুতোয় স্বপ্ন বোনে
এপার-ওপার পারাপারে
উড়িয়ে দিলাম, যা তোরা আজ
মন চেয়েছে তোমায় মাগো
কলুর ঘানি এই দুনিয়ায়
হাত ঝনঝন মাটির থালা
উঠতে-বসতে সন্ধে-সকাল
আশ্বিনে-রোদ ঐ লিপিরই
ট্যারেন্টুলায় আলপনা দেয়
মা আসছেন ডাঙায়-জলে
খোরশোলা-ব্যাঙ-তিমিঙ্গিলে
কোন্ সে-কথা বলে
ঢেউ-দোল-দোল জলে
উজানে দাঁড় টানে
গণ্ডিঘেরা প্রাণে
গিজ্‌তা-ঘিনা-তাক
ঢোল-ডগরের ডাক
কোন্ সে নিরুদ্দেশে
সে কোন্ পরবাসে
হালকা ডানার তোড়ে
কোন্ সে-ভেলায় চড়ে
ঘামের বিন্দু যত
পারাবতের মতো
মন ছুঁয়েছে পা
ভরসা কেবল 'মা'
পা ঝনঝন হাঁটি
পাই তোমারই চিঠি
বুক-ভরানো হাসি
পাতায় বাজে বাঁশি
তাই তো খুশির আলো
বলছে ঃ আঁধার গেল।



দেহতর্ক

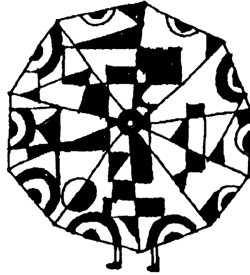
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

দেহের মধ্যে মন, না
মনের মধ্যে দেহ—
মনের ভিতর কোন্ পথে যে
জল ছলছল করে,
কে একজন শরীর গড়ে,
আবার ভেঙে ফেলে!
কে এক অবুঝ জলকে নিয়ে
ছলাৎ ছলাৎ খেলে—
আরশিতে মুখ দেখতে গিয়ে
নিজেই ভেঙে ফেলে।
এরই ভিতর কথার ছলে
বলল যেন কেউ,
দেহের মধ্যে দেহই কেবল—
জলের মধ্যে ঢেউ!

সার্থক পূজন

সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিজয়া থেকে বোধন
শুধু তোমারই পূজার আয়োজন।
এগিয়ে চলার পথে
কত আনন্দ, কত না রোদন!
সংসারে আবদ্ধ জীবের
রোগ-জ্বালা-যন্ত্রণা
পাওয়া না পাওয়ার আনন্দবেদন।
তোমারই দেওয়া মনের গহনে ফুটে ওঠা
এক-একটি ফুল দিয়ে তোমারই সুতায়
গাঁথা মালা তোমারই চরণে নিবেদন।
প্রতিটি মুহূর্ত তোমার নিবিড় সান্নিধ্যবোধে
কত না প্রার্থনা
তোমার প্রীতির জন্য
কত না পরিকল্পনা
প্রাণের আর্তি-ভেজা রূপান্তরের খেলায়
জানি না কোন্‌টা পাবে
তোমার অনুমোদন।
তোমার ইচ্ছায় মা কেউ ঋষি কেউ বা সুরথ
কেউ বা সমাধি অবোধজন।
সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে
সুনিশ্চিত এই অবধারণ—
যুগাবতারের ছায়া
জীবধাত্রী জীবন্ত দুর্গার
অনন্য অনুসরণ।
সর্ব জীবে নিষ্কাম প্রেম দিয়ে
অনুক্ষণ তোমার চিন্তন চলন বলন আচরণ
তোমার সার্থক পূজন।



সত্যি বাঁচা

অরুণ মৈত্র

এইটুকু তোর পাওনা ছিল
বাকিটুকু উপরি পাওয়া
প্রাণধারণের জন্য বায়ু
স্বস্তিটুকু এমনই চাওয়া।

যা পাবি তাই আঁকড়ে ধরিস
বন্যাজলে কুটোর মতো
অন্য যা তা অন্ন তা নয়
পেট ভরানোর নানান ছুতো।

আমরা কি আর সত্যি বাঁচি
খাওয়ার জন্য নয়তো বাঁচা
প্রাপ্তি যদি একটুও চাস
মুক্ত করে দিসরে খাঁচা।

সবার জন্য বাঁচলে পরেই
সত্যিকারের সত্যি থাকা
নয়তো সবই থেকেও তা নেই
পূর্ণ থেকেও সব যে ফাঁকা।

অলঙ্করণ ঃ সৌরীশ মিত্র

নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর-একথা প্রমাণিত সত্য

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়*



আপনি নিরামিষাশী হবেন কেন?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। শরীরগঠনে, স্বাস্থ্যরক্ষায় নিরামিষ আহারের উপযোগিতা নিয়ে একসময় প্রশ্ন ছিল চিকিৎসক-বৈজ্ঞানিক মহলে। স্বাভাবিকভাবে জনমানসেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। 'মাছ-মাংস-ডিম না হলে চলবে কী করে?', 'অ্যানিম্যাল প্রোটিন না খেলে কি শরীর থাকে?', 'মাছের মাথা না খেয়ে, নিরামিষ খেলে কি পড়াশুনায় মাথা (ব্রেন) হয়?'—ইত্যাদি শুভানুধ্যায়ী প্রশ্নে নিরামিষাশীদের জর্জরিত হতে হতো; এখনো যে হয় না তা নয়, তবে সাম্প্রতিক কালে নিরামিষ আহার সম্পর্কিত পটভূমিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইতোমধ্যে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ তথা খাদ্যচর্বি, কোলেস্টেরল ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধির সম্পর্ক নিয়ে জ্ঞান গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে নিরামিষ আহার বিষয়ে যেখানে বছরে দশটারও কম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হতো—নব্বইয়ের দশকে তা সাড়ে সাত গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বৈজ্ঞানিক রচনার বিষয়বস্তুরও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। আগে মুখ্য বিষয়বস্তু থাকত নিরামিষ খাদ্যের পর্যাপ্ততা বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্নালোচনা, অধুনা সেই স্থানে এসেছে বিবিধ রোগব্যাধির নিবারণ ও চিকিৎসায় নিরামিষ আহারের উপযোগিতা। দেশে-বিদেশে নিরামিষ-ভোজীর সংখ্যা বাড়ছে লক্ষণীয়ভাবে। 'জীবহত্যা পাপ', 'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি'—এবম্বিধ ধর্মীয় ও নৈতিক কারণে অতীতে অনেকে নিরামিষাশী হতেন। সাম্প্রতিক অতীতে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আয়ুর্বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞান।

কথায় আছে, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। ভাল-মন্দের মধ্যে বুঝে, বিচার করে ভালটা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং সত্তার সঙ্গে তা এমনভাবে জড়িত যে, অপ্রকৃতিস্থ হলেও সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় না। বস্তুত, অভ্যাস-অভিরুচি-প্রবৃত্তি-লোভকে অন্তত কিছু সময়ের জন্যও একপাশে সরিয়ে রেখে, বদ্ধচিন্তার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে যদি সদ্‌ভাবে আন্তরিক অনুধাবন করা হয়, তাহলে আমিষ খাদ্য বর্জন ও নিরামিষ আহারের স্বপক্ষে বেশ কিছু ভাল কারণ স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়, ভালটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এই কারণগুলোর প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজগুণের তাৎপর্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমোঘ। সুতরাং অনতিক্রম্য এই কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে 'নিরামিষাশী হবেন কেন?' প্রশ্নটি বরং অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে—'নিরামিষাশী হবেন না-ই বা কেন?'

(১) জীবনের সব অবস্থায় সুষম নিরামিষ খাদ্য উপযোগী

জীবনচক্রের সর্বাবস্থায় সুষম নিরামিষ খাদ্য উপযোগী। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে, এমনকি সন্তানসম্ভবা এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, সুষম নিরামিষ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হতে পারে।[১.১] সুতরাং, বৈজ্ঞানিক বিচারে, মাছ-মাংস-ডিম খেতেই হবে, না খেলে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে—এই ধারণাটি অজ্ঞতাপ্রসূত, কুসংস্কারের নামান্তর। যদি ভাবি, মাছ-মাংস-ডিম না খেলে তার পরিবর্তে প্রচুর দুধ-ছানা-মাখন-ঘি খেতে হবে, তাও নয়। সুপরিকল্পিতভাবে খাদ্যগ্রহণ করলে, সকলপ্রকার প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য বাদ দিয়েও অর্থাৎ মাছ-মাংস-ডিম শুধু নয়, তার সঙ্গে গবাদি পশুপ্রাণীর দুধ ও যাবতীয় দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য পরিহার করেও স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, নিরামিষাশী মায়েদের সন্তানের জন্মকালীন ওজন (birth weight) আমিষাশী মায়েদের সন্তানের অনুরূপ।[১.২] নিরামিষভোজী মায়েদের স্তনদুগ্ধের গুণগত প্রকৃতি আমিষাশী মায়েদের সমতুল এবং তা পুষ্টিগুণে পর্যাপ্ত।[১.১] শৈশবে নিরামিষ আহারে শরীরগঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ভালই বজায় থাকে। শরীরের ওজন ও উচ্চতাও স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে[১.৩] এবং শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সারাজীবন বজায় রাখতে সাহায্য করে।[১.১] সবিশেষ উল্লেখ্য, আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষ-ভোজীদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাও (Immune System) বেশি শক্তিশালী। মাংসাশীদের শ্বেতরক্তকোষের (White Blood Cell) ক্যান্সার-কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা যতখানি, নিরামিষাশীদের তা দ্বিগুণেরও বেশি।[১.৪] শারীরিক সক্ষমতার

** তরুণ গবেষক। আমেরিকা থেকে পুষ্টিবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, মাউন্ট সাইনাই স্কুল অফ মেডিসিনের প্রাক্তন গবেষক, বর্তমানে নেপালের ধারান শহরে B. P. Koirala Institute of Health Science-এর শারীরবিজ্ঞান বিভাগের যুগ্ম অধ্যাপক।*

প্রয়োজন যেখানে তুঙ্গে, যেমন প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াক্ষেত্রে, এমনকি সৈন্যদের জন্যও নিরামিষ আহার শরীরের চাহিদা ও পুষ্টির যোগান দিতে পারে।

(২) নিরামিষ খেলে মানুষ বাঁচবে আরো বেশি দিন

নিরামিষ আহার আয়ুবৃদ্ধি করে। একাধিক ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) গবেষণায় খুব কমই মাংস খাওয়ার সঙ্গে দীর্ঘজীবনের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে।[২.১] 'সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট' (Seventh-day Adventist) নামক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের এই পুরুষ ও নারীদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (Life expectancy) তুল্যমূল্য বিচারে যথাক্রমে সাত ও সাড়ে চার বছর বেশি; পুরুষদের গড় জীবৎকাল ৭৮.৫ বছর ও নারীদের ৮২.৩ বছর। বিধিবদ্ধ গবেষণার তথ্যানুসারে এরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক দীর্ঘজীবী জনসম্প্রদায়।[২.২] গবেষকদের অভিমতে, এই দীর্ঘজীবনের অন্যতম কারণ নিরামিষ আহার। শুধু তাই নয়, নিরামিষ ভোজনের সঙ্গে ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম যোগ করলে, সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে, দশ বছর পর্যন্ত আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে।[২.২]

ব্রিটেনে প্রায় ৫০০০ আমিষভোজী ও ৬০০০ নিরামিষভোজীর ওপর ১২ বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, নিরামিষভোজীদের মধ্যে ক্যান্সারজনিত মৃত্যু প্রায় ৪০ শতাংশ কম, হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যু কম ৩০ শতাংশ।[২.৩] জার্মানিতে প্রায় ২০০০ নিরামিষাশী মানুষকে ১১ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তুল্যমূল্য বিচারে এঁদের মৃত্যুহার অর্ধেক; হৃদরোগজনিত মৃত্যুহার প্রত্যাশিতের এক-তৃতীয়াংশ; ক্যান্সার ও দেহের অন্যান্য অসুখ-হেতু মৃত্যুহারও অর্ধেক, ক্ষেত্রবিশেষে আরো কম।[২.৪] পাশ্চাত্যের দেশগুলি শুধু নয়, প্রতিবেশী চীন দেশের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জনসমীক্ষাও (China Health Project) একই বার্তা বহন করছে এবং তা হলো, নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যপ্রদ এবং দীর্ঘজীবনের অন্যতম পাথেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথাবদ্ধ গবেষণা নিষ্পন্ন না হলেও জীবনের পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ অভিজ্ঞতার অশেষ মূল্য থাকে। লক্ষণীয়, হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক সাধারণ বিধি নিরামিষ আহার এবং সাধু-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-গৃহিভক্তদের অনেকেই সেখানে দীর্ঘজীবনের অধিকারী।

(৩) আপনার হৃদ্‌যন্ত্র আরো ভাল থাকবে

নিরামিষ ভোজন হৃদ্‌যন্ত্রকে (Heart) ভাল রাখে, হৃদ্‌রোগ না হতে সাহায্য করে। আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিবিধ ব্যাধির প্রকোপ লক্ষণীয়রূপে কম—একের পর এক গবেষণায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। ক্যালিফোর্ণিয়াতে ২৫০০০ 'সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট' খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ওপর অনুসন্ধানে মাংস খাওয়ার সঙ্গে হৃদ্‌রোগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে—মাংস খাওয়া যত বেশি, হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাবও তত বেশি।[৩.১] 'কার্ডিয়া' (Coronary Artery Risk Development in Young Adults, CARDIA) নামক গবেষণা প্রকল্পে ৫০০০ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, নিরামিষাশীদের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতাজনিত শারীরিক পটুতা বেশি এবং হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনাও কম।[৩.২]

বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন, যারা মাংস খায় না, তাদের রক্তচাপ (Blood pressure) তুলনামূলকভাবে কম।[৩.৩] তারপর একাধিক গবেষণায় নির্ণীত হয়েছে, আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের রক্তচাপ কম।[৩.৪, ৩.৫] সবিশেষ উল্লেখ্য, উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure বা Hypertension) অন্যান্য আধিব্যাধি—যেমন কিডনির অসুখ, স্ট্রোক ও হৃদ্‌রোগের সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকার জন্য নিরামিশাষীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা, রোগব্যাধির প্রকোপও যে কম পরিগণিত হবে, তা খুব আশ্চর্যজনক নয়। আশার আলো উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের (Hypertensive patients) জন্যও আছে[৩.৬, ৩.৭]—নিরামিষ আহার শুরু করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়।[৩.৬]

নিরামিষ ভোজন হৃদ্‌রোগ না হতে সাহায্য করে। নিরামিষাশীদের মধ্যে হৃদ্‌রোগের ব্যাপকতা কম শুধু নয়, হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যুহারও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ইংরেজ ও জার্মান নিরামিষভোজীদের মধ্যে হৃদ্‌রোগহেতু মৃত্যুহার যে বিশেষ-ভাবে কম, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি পাঁচটি ভবিষ্যাপেক্ষ গবেষণায় ৭৬,০০০ পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আমিষাশী পুরুষদের তুলনায় নিরামিষাশী পুরুষদের হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যুহার ৩১ শতাংশ কম। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরামিষভোজীদের মধ্যে তজ্জনিত মৃত্যুহার কম ২০ শতাংশ।[৩.৮]

নিরামিষাশীদের মধ্যে হৃদ্‌রোগের ব্যাপকতা কম হওয়ার অন্যতম কারণ—তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম। মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-মাখন-ঘি ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য খাদ্যে সম্পৃক্ত চর্বির (Saturated fat) প্রধান উৎস এবং কোলেস্টেরলের একমাত্র উৎস। উপরন্তু খাদ্যে তন্তু বা আঁশ (Fiber) থাকলে তা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্যে কোন তন্তু থাকে না। তাই ঘি-মাখন খুব বেশি না খেলে নিরামিষ আহারে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমই থাকবে, হৃদ্‌রোগের বিপদও অনেকাংশে এড়ানো যাবে। একটি দিঙ্‌নির্দেশক গবেষণায়[৩.৯] প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চর্বি কম (Low fat) ও তন্তু বেশি (High



fiber)-প্রধান নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম, ধূমপান বন্ধ ইত্যাদি মানসিক চাপ কম করার কৌশল জীবনযাত্রায় যোগ করলে 'অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস' (Athero-sclerosis) নামক কোলেস্টেরল-সঞ্চিত রক্তনালী শক্ত হওয়ার রোগ শুধু থামানো নয়, এই রোগপ্রক্রিয়াকে উল্টোদিকে চালিত করে রক্তনালীর রোগবিহীন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাও বাস্তবিক-পক্ষে সম্ভব।

(৪) ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ কমবে

নিরামিষ আহার ক্যান্সার না হতে সাহায্য করে, ক্যান্সার রোগের সম্ভাব্য বিপদ (risk) কমায়। রোগব্যাধির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী যদি কেউ থাকে তা হলো ক্যান্সার, যার আগমনের সম্ভাবনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আশার কথা এই যে, আমেরিকার স্বনামধন্য 'ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট' (NCI)-এর তথ্য অনুসারে যাবতীয় ক্যান্সার রোগের ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ খাদ্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অর্ধেক ক্যান্সার উপযুক্ত খাদ্যা-ভ্যাসের সাহায্যে আমরা নিজেরাই নিবারণ করতে পারি।[৪.১] সুষম নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে মাদক পরিহার করলে, মদ্যপান ও ধূমপান না করলে, খৈনি বা জর্দাপান না খেলে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়। গবেষকদের অভিমত, সব ক্যান্সার যদি না-ও হয়, বহু ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই কমবেশি মাত্রায় খাদ্য-পানীয়ের ভূমিকা আছে।[৪.২]

কিছু ক্যান্সার, যেমন বৃহদন্ত্র (Colon), প্রস্টেট (Prostate) এবং স্তন (Breast)-এর ক্যান্সার স্পষ্টতই খাদ্য সম্পর্কিত।[৪.৩-৪.৭] সেইসব দেশে স্তন-ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব কম যেখানে উদ্ভিজ্জ খাদ্যই প্রধান আহার্য—যেমন ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান।[৪.৪-৪.৬] উল্লেখ্য, জাপানে স্তন-ক্যান্সার বিরল, কিন্তু জাপানি মহিলারা আমেরিকায় চলে গেলে তাদের স্তন-ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা চার গুণ বেড়ে যায়। কারণ—চর্বি বেশি, তন্তু কম, মাংস-প্রধান তথাকথিত আধুনিক মার্কিনী খাদ্য, বাস্তবিক যা ক্যান্সার-সহায়ক। মাংস খাওয়ার সঙ্গে বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার হওয়ার সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার লক্ষণীয়ভাবে কম।[৪.৩, ৪.৮] কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে 'লাল মাংস' (Red meat) খারাপ শুনে যদি ভাবি, সাদা মাংস (White meat) ভাল, তাহলে ভুল করব। লাল মাংস, সাদা মাংস দুই-ই পৃথক পৃথক ভাবে বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার হওয়ার বেশি বিপদ-সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত।[৪.৮] প্রসঙ্গত, মাছ-মাংস তথা প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে প্রস্টেট-ক্যান্সার রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও নিরূপিত হয়েছে গবেষণায়।[৪.৭]

ভারতীয় পুরুষদের ক্যান্সার বেশি হয় যথাক্রমে মুখগহ্বরে, ফুসফুসে, খাদ্যনালীর উপরিভাগে, বৃহদন্ত্রে এবং প্রস্টেটে।[৪.৯] ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার সর্বাধিক বেশি হয় প্রথমত জরায়ুর নিম্নস্থ সার্ভিক্স (Cervix) নামক অংশে, দ্বিতীয়ত স্তনে, তৃতীয়ত মুখগহ্বরে।[৪.৯] প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরামিষ আহারের ক্যান্সার-প্রতিষেধক উপযোগিতা প্রযোজ্য। খাদ্যে ভাত-রুটি-ডালের সঙ্গে শাকসবজি, ফলমূল বেশি গ্রহণ করলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে কমে।[৪.৯] ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যে একাধিক রাসায়নিক যৌগ ও ভিটামিন থাকে, যা ক্যান্সার-সহায়ক পদার্থকে (Carcinogen) নিষ্ক্রিয় করে এবং সুস্থ জীবকোষের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার বিবিধ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে।

(৫) ডায়াবেটিসে নিরামিষ খাদ্য উপযোগী

বিবিধ রোগব্যাধির মধ্যে নীরব ঘাতক একটি রোগের নাম 'ডায়াবেটিস' (Diabetes)—'মধুমেহ' বা 'বহুমূত্র রোগ' নামেও যা পরিচিত। ইদানীং আমাদের দেশে শহরবাসী এবং অধিক আয়সম্পন্ন গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। কারণ—খাদ্যাভ্যাস-সহ জীবনযাত্রার পরিবর্তন। নিরামিষ আহার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ কমায়, এমনকি ডায়াবেটিস হয়ে থাকলে তার চিকিৎসাতেও সাহায্য করে।[৫.১]

গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, আমিষ আহারের সঙ্গে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের ব্যাপকতা কম।[৫.২] প্রসঙ্গত, উদ্ভিজ্জ-প্রধান খাদ্যে চর্বি ও প্রাণিজ পদার্থ কম; তাই ডায়াবেটিস রোগের বিপদ-সম্ভাবনাও কম থাকে। জীবনযাত্রায় যত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা হবে, খাদ্যতালিকায় মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যের অনুপ্রবেশ যত বেশি হবে—ডায়াবেটিসও তত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতবর্ষ ও চীনে[৫.১] ডায়াবেটিসের ব্যাপকতা এইভাবেই বেড়ে চলেছে।

ইনসুলিন-নির্ভর ও ইনসুলিন-নির্ভরতাহীন—ডায়াবেটিস দুই প্রকার হতে পারে এবং দুই ক্ষেত্রের চিকিৎসাতেও খাদ্যের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।[৫.৩ ৫.৫] ইনসুলিন-নির্ভরতাহীন ডায়াবেটিসের (Non-insulin-dependent diabetes) ক্ষেত্রে ফলমূল, শাকসবজি, উদ্ভিজ্জ-প্রধান নিরামিষ আহারের মাধ্যমে এই রোগ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় শুধু নয়, কিছু ক্ষেত্রে সুষম নিরামিষ খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে এই রোগ নিরাময় করাও যেতে পারে।[৫.৩-৫.৫] যে-খাদ্যে চর্বি কম, তন্তু ও জটিল শর্করা বেশি (Diet low in fat and high in fiber and complex carbohydrates), তা ইনসুলিনকে আরো ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ফলে রক্তে শর্করার (Blood sugar) মাত্রা কম রাখতেও সহায়ক হয়। ইনসুলিন-নির্ভর ডায়াবেটিস (Insulin-dependent diabetes) রোগীদের ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ-প্রধান নিরামিষ খাদ্য ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে পারে না, কিন্তু ইনসুলিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কমায়।[৫.৪] উপরন্তু, নিরামিষ ভোজনের অন্যতম উপকারিতা হলো রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকা, যা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

(৬) হাড় আরো শক্ত থাকে

নিরামিষ আহার শরীরের হাড় আরো শক্ত রাখে, পরিণত বয়সে হাড় ভাঙে কম। 'অস্টিওপোরোসিস' (Osteoporosis) নামক রোগে হাড় ক্ষয়ে যায়, কমজোরি হয়ে পড়ে, যার জন্য হাড় ভাঙার সম্ভাবনা বাড়ে। সাধারণত ঋতু-পরবর্তী (Menopause) কালে মহিলাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। একাধিক গবেষণায় 'অস্টিওপোরোসিস'-এর সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে।[৬.১-৬.৪] যেসব দেশে উদ্ভিজ্জ খাদ্যই প্রধান আহার্য, সেসব দেশে 'অস্টিওপোরোসিস'-জনিত কোমরের হাড় ভাঙাও (Hip fracture) কম।[৬.১] প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের মধ্যে গবেষণায় দেখা গেছে, নিরামিষাশীদের তুলনায় আমিষাশী মহিলাদের হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার (Bone loss) পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ।[৬.২] যেসকল বয়স্কা মহিলা খাদ্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় প্রাণিজ প্রোটিন বেশি গ্রহণ করেন, তাঁদের কোমরের হাড় ভাঙার সম্ভাব্য বিপদও বেশি।[৬.৩]

চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হাড় ক্ষয়ে কমজোরি হয়ে ভাঙার ক্ষেত্রে মূল অপরাধী হলো খাদ্যে বেশি পরিমাণে প্রোটিন, বিশেষত প্রাণিজ প্রোটিন। আমেরিকানরা আমিষ-প্রধান খাদ্যে বেশি ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে, অন্য দেশের মানুষ উদ্ভিজ্জ-প্রধান খাদ্যে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে কম; তৎসত্ত্বেও আমেরিকানরা 'অস্টিওপোরোসিস'-এর শিকার হয় বেশি।[৬.৪] দেখা গেছে প্রোটিন, বিশেষত প্রাণিজ প্রোটিন বেশি খেলে শরীর থেকে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম নিঃসৃত হয়ে যায়। শরীরে ক্যালসিয়ামের ভাণ্ডার হলো হাড়। ফলস্বরূপ ক্যালসিয়াম ক্রমাগত হারিয়ে হাড় ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে, বৈজ্ঞানিক বিচারে, মাছের কাঁটা ও মাংসের হাড় চিবিয়ে নিজ শরীরের হাড় আরো শক্ত রাখার চেষ্টা করলেও 'অস্টিওপোরোসিস'-এর কারণে সেই চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ ও সার্থক হওয়ার নয়। অনেক সহজ ও কার্যকরী পন্থা হলো, খাদ্যতালিকায় ঘন সবুজ শাকসবজির পরিমাণ বাড়ানো।

(৭) কিডনি আরো ভাল থাকবে

নিরামিষ আহার কিডনিকে (Kidney) ভাল রাখে, কিডনির অসুখ (Renal/Kidney disease) হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ কম থাকে। 'কিডনি স্টোন' (Kidney stone) কিডনির অন্যতম একটি রোগ, যা থেকে কিডনি বিকলও (Renal failure) হতে পারে।[৭.১] প্রস্রাবে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম, অক্সালেট, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি নিঃসৃত হলে 'কিডনি স্টোন' হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মাংসে 'পিউরিন' (Purine) নামক রাসায়নিক যৌগ বেশি থাকে, যা থেকে প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিড বেশি নির্গত হয়। খাদ্যে প্রোটিন বেশি খেলে প্রস্রাবে ক্যালসিয়াম এবং অক্সালেটের পরিমাণ বাড়ে।[৭.২-৭.৩] গবেষণায় তাই পরিলক্ষিত হয়েছে প্রত্যাশিত ছবি—আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে 'কিডনি স্টোন'-এর প্রকোপ অনেক কম।[৭.১]

কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম প্রধান দুইটি কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস—দুইয়েরই ব্যাপকতা বা সম্ভাব্য বিপদ নিরামিষাশীদের মধ্যে কম। তাই আমিষ আহারে কিডনির অসুখের বিস্তৃত পটভূমি রচিত হয়। প্রসঙ্গত, কিডনির অসুখ বর্তমান থাকলে আমিষ ভোজনে তা আরো খারাপ দিকে যায়। ব্রিটিশ চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন, যাদের 'কিডনি স্টোন' তথা কিডনির অসুখ হওয়ার প্রবণতা আছে, তাদের নিরামিষ আহার করা উচিত।[৭.৪]

(৮) নানাধরনের অসুখ-বিসুখ এবং মাদকাসক্তি কমে

ছোটবড় নানা অসুখ থেকে রক্ষা পেতে নিরামিষ আহার সাহায্য করে। নিরামিষাশী হলে শরীর অধিক সুস্থ থাকে। আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে বেশি শক্তিশালী, তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং রোগজীবাণু-সংক্রমণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে নিরামিষাশীদের কম হওয়াই স্বাভাবিক। তদুপরি জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হলো, নিরামিষভোজীদের মধ্যে মাদক-দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে কম। নিরামিষাশী মদ্যপ ব্যক্তি বিরল। স্বাভাবিকভাবেই মদ্যপানজনিত 'গ্যাসট্রাইটিস' (Gastritis), 'প্যানক্রিয়াটাইটিস' (Pancreatitis), 'সিরোসিস' (Cirrhosis) ইত্যাদির প্রকোপ থেকে নিরামিষাশীরা বহুলাংশে মুক্ত থাকেন—এই অনুমান বিশেষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। গবেষণায় নিরূপিত হয়েছে, নিরামিষাশীদের মধ্যে ধূমপায়ী কম বলে ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)-জনিত মৃত্যুহারও কম।[৮.১]

পাথুরি রোগ (Gall stone) হওয়ার সম্ভাবনাও নিরামিষ আহারে কমে। ৭৫০ জন মহিলার ওপর এক অনুসন্ধানে[৮.২] দেখা গেছে, আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে পাথুরি রোগের প্রাদুর্ভাব অর্ধেক। বয়স এবং শরীরের ওজন হেতু পার্থক্য বাদ দেওয়ার পরেও দেখা গেছে যে, নিরামিষভোজীদের তুলনায় আমিষাশীদের পাথুরি রোগের আপেক্ষিক বিপদাভাস (Relative risk) প্রায় দ্বিগুণ। নিরামিষ খাদ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম, তন্তু বেশি; তাই তা পাথুরি রোগের বিপদ থেকে রক্ষা করে। প্রসঙ্গত, কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation), অর্শ (Hemorrhoi-ds), হার্ণিয়া (Hernia), অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis), ডাইভারটিকুলার ডিজিস (Diverticular disease), গেঁটেবাত (Gout) ইত্যাদি বিবিধ রোগের সঙ্গে তন্তু-কম আমিষ খাদ্য জড়িত। নিরামিষ খাদ্য এইসব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী।

(৯) দুরারোগ্য ব্যাধিতে নিরামিষ খাদ্য উপকারী

দীর্ঘমেয়াদি দুরারোগ্য একাধিক রোগের উপশমে নিরামিষ খাদ্য উপযোগী। বিভিন্ন অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়েছে, হাঁপানি



(Bronchial asthma), রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস (Rheumatoid arthritis) ইত্যাদি রোগে নিরামিষ আহার বিশেষ উপকারী। দেখা গেছে, নিরামিষ আহার শুরু করার পরে রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস রোগীদের উপসর্গ কমে।[৯.১] অস্থিসন্ধি (Joints) বা হাড়ের সংযোগস্থলে ফুলে যাওয়া, আড়ষ্টতা এবং যন্ত্রণা কম থাকে। ফলস্বরূপ বেদনাহারী (Analgesic) ওষুধের ব্যবহার বা তার মাত্রা কম রাখতে নিরামিষ আহার সাহায্য করে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সুইডেনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, পুরো একবছর ধরে সম্পূর্ণ প্রাণিজ-খাদ্যবিহীন নিরামিষ (Vegan) আহারে হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি কমে, সুতরাং ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন ও পরিমাণও হ্রাস পায়।[৯.২]

শুধু রোগ নিবারণে বা নিরাময়ে নয়—খাদ্যের প্রকৃতি, খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তথা জীবাণুর উপস্থিতি এবং খাদ্য তৈরির পদ্ধতিজনিত কারণেও নিরামিষ আহার শ্রেয়।

(১০) খাদ্যে বিষক্রিয়া কিংবা খাদ্যবাহিত অসুখ থেকে রেহাই পাওয়া যায়

নিরামিষ আহারে খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food poisoning) এবং খাদ্যবাহিত বিভিন্ন অসুখ (Food-borne diseases) থেকে অনেকখানি রক্ষা পাওয়া যায়। আমিষ খাদ্য, যথা লবণাক্ত বা মিষ্টি জলের মাছ, মুরগি এবং পাঁঠা-ছাগল-ভেড়া-গরু-মহিষ-শুয়োর ইত্যাদির মাংস খাদ্যবাহিত বিবিধ অসুখ ও বিষক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাও মেলে। মোচার ঘণ্ট, সুক্তো বা ফুলকপির ডালনা খেয়ে 'ফুড পয়জনিং' হয়েছে বিশেষ শোনা যায় না। কিন্তু কষা মাংস, মাছের কালিয়া বা বিরিয়ানি খেয়ে ভয়ানক পেটের অসুখের কথা সংবাদপত্রে প্রায়শই দেখা যায়।

খাদ্যবাহিত বিপদও খুব কম নয়। আমেরিকার 'সেণ্টার ফর ডিজিস কণ্ট্রোল অ্যাণ্ড প্রিভেনসন' (CDC)-এর হিসাবে, বছরে ৭.৬ কোটি (76 million) খাদ্যবাহিত অসুখ থেকে ৫০০০ আমেরিকানের মৃত্যু হয়।[১০.১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation, WHO) তথ্যানুসারে, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন বছরে খাদ্যবাহিত অসুখের শিকার হতে পারে।[১০.২] সি.ডি.সি.-র তথ্য থেকে আরো জানা যাচ্ছে, ৯৯ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে খাদ্যবাহিত অসুখের কারণ আমিষ খাদ্য।

কেন আমিষ আহারে খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং খাদ্যবাহিত অসুখ এত বেশি হয়, তার উত্তরও দুর্লভ নয়। এমনিতেই মাছ-মাংস দ্রুত পচনশীল (যার জন্য ফ্রিজ-এ মাছ-মাংস হিমশীতল রাখতে হয়, কিন্তু আলু-পটল-ফুলকপি ফ্রিজ-এর বাইরে রাখা যায়); তার ওপর রয়েছে জীবাণু-সংক্রমণজনিত সমস্যা। বাণিজ্যিক স্বার্থ-প্রভাবমুক্ত 'কনস্যুমার রিপোর্টস' (Consumer reports) অনুযায়ী খোদ আমেরিকাতে অর্ধেক মুরগির মাংস রোগজীবাণু-সংক্রামিত, অন্য মাংসও উল্লেখযোগ্য রকমে রোগজীবাণুর আধার।[১০.৩] আমেরিকার মতো স্বাস্থ্য-সচেতন দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই এই অবস্থা হলে ভারতবর্ষের মতো দেশে জীবজন্তুদের মধ্যে রোগজীবাণু-সংক্রমণ এবং মাংসে রোগজীবাণুর উপস্থিতি তথা জীবাণুজাত বিষের (Toxin) মাত্রা ন্যূনপক্ষে আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয় অথবা বেশি বৈ তো কম নয়। মাংস খাওয়ার আনুষঙ্গিক বিপদ কম করার অন্যতম উপায় হলো 'অ্যান্টিবায়োটিক' (Antibiotic) ওষুধ ব্যবহার করে জীবজন্তুদের জীবাণু-সংক্রমণ কমানো। মুশকিল হলো, তাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। বিপদ কম করার চেষ্টায় আরো বড় বিপদ আসছে। মাংসে 'অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী' (Antibiotic-resistant) রোগজীবাণুর উপস্থিতি ক্রমশ আবিষ্কৃত হচ্ছে। দুই দশক আগে মারাত্মক প্রজাতির ই. কোলাই (E. coli 0157 : H7) রোগজীবাণু-সংক্রমণ বিরল ছিল, আজ আর নয়। লক্ষণীয়, গতকাল ই. কোলাই, আজ ইনফ্লুয়েঞ্জা, আগামিকাল পাগলা গরুর অসুখ (Mad cow disease), পরশু 'সার্স' (SARS)—নিত্যনতুন ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস-জনিত এমন বিচিত্র সব রোগের আবির্ভাব হচ্ছে জীবজন্তু-জগতের মধ্য দিয়ে মনুষ্যকুলে। 'প্রেগন্যান্সি, চিলড্রেন অ্যাণ্ড এ ভেগাল ডায়েট' গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ মাইকেল ক্লেপার-এর অভিমত হলো, খাদ্যতালিকায় প্রাণিজ দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা জীবনের সঙ্গে জুয়াখেলার মতো। মন্তব্যটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

(১১) নিরামিষ আহারে বিষভক্ষণ থেকে বাঁচা যাবে

নিরামিষ আহারে বিষাক্ত রাসায়নিকের কুফল অনেক কম, খাদ্যের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে বিষ খাওয়ার বিপদও অনেক কম। একথা এখন আর অজানা নয় যে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে কৃষিকাজে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়ে চলেছে। জমিতে ব্যবহৃত এইসব বিষাক্ত পদার্থ মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করছে, বৃষ্টি-বন্যায় মাটি ধুয়ে নদী ও সমুদ্রে এসে পড়ায় সেখানকার জলও কলুষিত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে জলজ জীবন (Aquatic life)। খাদ্য-শৃঙ্খলের (Food chain) প্রাকৃতিক বিধানে বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশক পদার্থ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে নদী ও সমুদ্রের মাছে এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর শরীরে। এইসব রাসায়নিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক বস্তু হলো 'স্থায়িভাবে জৈব দূষণকারী' (Persistent Organic Pollutants, POP) শ্রেণিভুক্ত পদার্থসমূহ, বিশেষত ডি.ডি.টি. (DDT) এবং পি.সি.বি. (Polychlorinated biphenyls)।[১১.১] একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, অতি অল্প মাত্রায় এই জাতীয় বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে জলজ প্রাণী শুধু নয়, মানুষের শরীরেও অসামান্য ক্ষতি হয়। সন্তানসম্ভবা মায়েদের ক্ষেত্রে এই কলুষের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ায় শিশুদের

ভবিষ্যৎ বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। যদি ভেবে থাকি যে, মাছ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর, তাহলে ভুল করব। এর কারণ হলো, ডি.ডি.টি., পি.সি.বি. প্রভৃতি ক্যান্সার-সহায়ক (Carcinogen) বস্তু এবং পারদ-সীসা-আর্সেনিক-ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি ভারি ধাতু (Heavy metals) মাছের মধ্যে থাকে—যা ধুয়ে, ফ্রিজ-এ হিমশীতল রেখে, এমনকি রান্না করেও দূর করা যায় না।

কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের অবশেষ ফলমূল-শাকসবজিতেও থাকে, থাকে কৃষিজ ফসলে। কিন্তু রাসায়নিক বিষের বিপদ নিরামিষ আহারে অত্যন্ত কম। কারণ, শাকসবজি ও ফলমূলে কীটনাশক ইত্যাদির পরিমাণ মাছ-মাংসের তুলনায় নগণ্য এবং ভাল করে ধুয়ে নিলে এই পরিমাণ আরো কমে যায়। বিপদ অন্যদিকে আরো আছে। মানুষের রোগ সারাতে যে-পরিমাণ 'অ্যান্টিবায়োটিক' ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তার আটগুণ বেশি খাওয়ানো হয় গবাদি পশুদের।[১১.২] 'স্টেরয়েড' (Steroid), অন্যান্য 'হর্মোন' (Hormone) ও ওষুধও জীবজন্তুদের দেওয়া হয়, যাতে তাদের রোগ না হয়, ওজন বাড়ে, খাদ্যোৎপাদন বেশি হয়। ফলে অপরিহার্যভাবে প্রাণিজ খাদ্যের মাধ্যমে এই রাসায়নিক বোঝা (Chemical burden) বিপুল পরিমাণে মানুষের মধ্যে এসে পড়ছে এবং দুরারোগ্য সব ব্যাধির জন্ম হচ্ছে। নিরামিষ আহারে জানা-অজানা এইসব বিপদ থেকে স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা পাওয়া যাবে।

(১২) নিরামিষ আহারে দূষণ প্রতিহত হয়, প্রকৃতি রক্ষা পায়

নিরামিষ ভোজন অবিসংবাদিতভাবে প্রকৃতি-পরিবেশের পক্ষে ভাল। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ যদি সত্যিই আমাদের পীড়া দেয়, পৃথিবী নামক এই গ্রহের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি কোন চিন্তা বা আগ্রহ থাকে, তাহলে অবশ্যই আমিষ খাদ্যাভ্যাস পুনর্বিবেচনা করতে হবে। নিরামিষ আহার এক্ষেত্রে হবে স্বাভাবিক পছন্দ, যাকে বলে 'ন্যাচারাল চয়েস'।

এক কেজি গম উৎপাদনের জন্য যত জল প্রয়োজন হয়, তার একশো গুণ বেশি জল লাগে এক কেজি মাংস উৎপাদনে।[১২.১] প্রসঙ্গত, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বর্তমানে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রায় জলসঙ্কটের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জলাভাবে আনুমানিক পঁচিশ বছরে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষই জলসঙ্কটের মুখোমুখি হবে।[১২.২] জলাভাবের এই পরিপ্রেক্ষিতে মাংস উৎপাদনে একশো গুণ বেশি জলের ব্যবহার বস্তুত অপচয়ের নামান্তর। মাংস উৎপাদনের জন্য পশুপালন করতে হয়। পশুপালনে খাদ্যও লাগে। ধান, গম, যব প্রভৃতি দানাশস্য, সয়াবীন, ছোলা ইত্যাদিও পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে পশুখাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ বছরে প্রায় ৫০ কোটি টন।[১২.৩] সমগ্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যশস্য প্রতি বছর পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয়, এক কেজি প্রাণিজ প্রোটিন (মাংস) তৈরি করতে যেখানে প্রায় ছয় কেজি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (দানাশস্য) লাগে,[১২.৪] সেখানে প্রোটিনের চাহিদাপূরণের নামে মাংস উৎপাদন করার জন্য পশুপালন করে ছয়গুণ বেশি খাদ্যশস্য ব্যবহার করা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক রসদের অপব্যয়। প্রসঙ্গত, খাদ্যাভ্যাসে পাশ্চাত্যের প্রভাব যত বাড়ছে, মাংসাদি আহারও তত বাড়ছে, বাড়ছে মাংসের চাহিদা এবং মাংস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পশুপালন। ফলত, আমাদের দেশেই ২০২০ সাল নাগাদ পশুখাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ কোটি টন থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৫০০ কোটি টন।[১২.৩] গবেষকদের অভিমত, ভারতবর্ষ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হলেও অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে।

খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় জমিতে। বিপুল পরিমাণে কৃষিশস্য পশুখাদ্যরূপে ব্যবহারে শুধু খাদ্যশস্যের অপব্যয় নয়, কৃষিজমিরও অপব্যবহার হয়। আমেরিকাতে যাবতীয় কৃষিজমির ৮৭ শতাংশ ব্যবহৃত হয় মাংসের জন্য পশুপালনে। মাংসপ্রধান খাদ্যের যোগান দিতে সেদেশে ২,৬০০ লক্ষ একর জমিতে অরণ্যবিনাশ করা হয়েছে।[১২.১] জমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষের বহুল ব্যবহার ও তজ্জনিত দূষণের কথা বিবেচনা করলে বনজঙ্গল সাফ করে মাংস খাওয়ার জন্য জমি তৈরির ক্ষতি আরো বিষময় হয়ে ওঠে। মাংস উৎপাদনের স্বার্থে গবাদি পশুপালনের জন্য জমি তৈরি করতে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বর্ষণসিক্ত বনাঞ্চল (Rain forest) প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে। এই হারে ধ্বংস হতে থাকলে আগামী ৮০ বছরে আমাজন নদীর অববাহিকায় দক্ষিণ আমেরিকার বর্ষামুখর বনাঞ্চল সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। চিরতরে শেষ হয়ে যাবে অমূল্য কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ। মাংস খাওয়ার সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতির সম্পর্ক কতখানি, তা একটি সংখ্যাভিত্তিক তথ্যে পরিস্ফুট হতে পারে। মাত্র ১১৪ গ্রাম ওজনের একটি মাংসের খাবার (Quarter pound Burger) তৈরির জন্য ৫৫ বর্গফুট বনাঞ্চলের বিনাশ ঘটে![১২.১]

মাংস খেলে স্বাভাবিকভাবেই মাংসের চাহিদা বাড়ে, মাংসের চাহিদা মেটাতে পশুকৃষি (Animal agriculture) অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং পশুকৃষিতে পরিবেশ দূষণ অপরিহার্য। বিরাট একেকটি পশুখামারে বিশাল সংখ্যায় গবাদি পশুপালন করা হয়। এই পশুদের মলমূত্র জমা হয় বড় বড় ডোবায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি রোগজীবাণু, পরজীবী কৃমিতে ভরা এইসব মলমূত্রের ডোবা-পুকুর আক্ষরিক অর্থেই আবর্জনার নরককুণ্ড। প্রতি বছর আমেরিকার পশুখামারে ১৪০ কোটি টন ঘন পশুমল উৎপন্ন হয়—মনুষ্যকুলেও এত বর্জ্যপদার্থ তৈরি হয় না।[১২.৫] জীবজন্তুদের মলমূত্র থেকে নির্গত গ্যাস পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। গবাদি পশুদের থেকে নিঃসৃত ৮ কোটি টন মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে এসে ভূমণ্ডলের উষ্ণতাবৃদ্ধির (Global warming) বিপদ বাড়াচ্ছে[১২.৬] এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস অ্যাসিড বৃষ্টির (Acid

rain) সহায়ক হচ্ছে, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।[১২.৫] পশুপালনের জন্য প্রয়োজনীয় পশুখাদ্য উৎপাদন করতে জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিমাণ যোগ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন আমেরিকার মতো মাংসপ্রধান দেশে ৩৫,০০০ মাইল বিস্তৃত নদীপথ[১২.৭] দূষিত হয়ে গেছে।

শুধু মাংস নয়, মাছের চাহিদা মেটাতেও পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষতি হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agriculture Organisation, FAO) হিসাবে, পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মৎস্যশিকার ক্ষেত্র (Fishing grounds) উপর্যুপরি মৎস্যশিকারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে।[১২.৮] কিছু প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের সংখ্যা এমন কমে গেছে যে, সমুদ্রে মৎস্যশিকারে বিরল প্রজাতির মাছ সেই জায়গায় উঠে এসে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পরিবেশবিজ্ঞানীরা সঙ্কেত দিয়েছেন, সমুদ্র বিপন্ন। প্রসঙ্গত, জলজ-জীবকৃষি (Aquaculture)—বড় চৌবাচ্চায় কৃত্রিম মাছচাষের ব্যবস্থা—নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ নির্গত হওয়ার কারণে পশুখামারের মতোই পরিবেশ দূষিত করে।

(১৩) নিরামিষ আহারে এমন এক তৃপ্তি আছে, যা আমিষ ভোজনে নেই

প্রতিদিন আমেরিকায় ২ কোটি ২০ লক্ষ প্রাণী হত্যা করা হয় মাংসের যোগান দিতে। ব্রিটেনে হত্যা করা হয় ২৫ লক্ষ। ভারতবর্ষে এই সংখ্যা সুনির্দিষ্টরূপে জানা না থাকলেও বছরে বেশ কয়েক লক্ষ টন মাংস উৎপাদন করতে কত কোটি প্রাণী হত্যা করতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়। নরহত্যায় আমরা কেঁদে ভাসাই বা প্রতিবাদ করি, কিন্তু পশুহত্যায় উদাসীন থাকি—এটা সম্ভব হয় নৈতিক ভিত্তিই দুর্বল বলে। ধর্মীয়-নৈতিক কারণে নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা বহুকাল স্বীকৃত। ঈশ্বরপ্রেমী সাধু-সন্ত-ভক্তবৃন্দ শুধু নয়, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী-দার্শনিক-শিল্পীরাও অনেকে আমিষ বর্জন করে নিরামিষভোজী হয়েছেন, নিরামিষ আহারের সপক্ষে বলেছেন।

আমাদের আহার্যের জন্য কোন প্রাণিহত্যা করা হয়নি এবং মাংস খাওয়ার বাসনায় রসনার তৃপ্তির জন্য কোন নিহত প্রাণীর দেহাংশ আমাদের খাওয়ার থালায় উঠে আসেনি, আমরা আসতে দিইনি—এটি জেনে আহারের মধ্যে এমন এক সাত্ত্বিক তৃপ্তি আছে, যা বলাবাহুল্য, আমিষ ভোজনে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এই তৃপ্তি, দুর্লভ আনন্দ কী বস্তু তা আমিষ বর্জন করে নিরামিষাশী হলে আপনিও জানবেন বোধে-অনুভবে, যেমন অন্যান্য নিরামিষভোজীরা জানেন, জেনেছেন। এর সঙ্গে নিরামিষ আহারের যাবতীয় স্বাস্থ্যগত উপকারিতা উপভোগ করবেন এবং প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণেও আপনার সদর্থক ভূমিকা থাকবে।

নিরামিষ আহারে আপনার কল্যাণ, আপনার পরিবারের কল্যাণ, কল্যাণ দেশ ও দশের। প্রাত্যহিক নিরামিষ ভোজন সর্বজনীন মঙ্গলাচরণ। ❑

—তথ্যসূচী—

১.১ Position of the American Dietetic Association and Dietetians of Canada. J Am Diet Assoc. 2003; 103 : 748-765

১.২ O'Connell JM, Dibley MJ, Sierra J, Wallace B, Marks JS, Yip R. Growth of vegetarian children. The Farm Study. Pediatrics. 1989; 84 : 475-481

১.৩ Hebbelinck M, Clarys P. Physical growth and development of vegetarian children and adolescents. In : Sabate J, ed. Vegetarian Nutrition. Boca Raton, FL : CRC Press; 2001 : 173-193

১.৪ Malter M, Schriever G, Eilber U. Natural killer cells, vitamins and other blood components of vegetarian and omnivorous men. Nutr Cancer. 1989; 12 : 271-278

২.১ Singh PN, Sabate J, Fraser GE. Does low meat consumption increase life expectancy in humans? Am J Clin Nutr. 2003; 78 (3 suppl) : 5265-5325

২.২ Fraser GE, Shavlik DJ. Ten Years of Life—Is It a matter of Choice? Arch Intern Med. 2001; 161 : 1645-1652

Thorogood M et al. Risk from death from cancer and ischaemic heart disease in meat and non-meat eaters. Br Med J. 1994; 308 : 1667-1671

২.৪ Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Eilber U. Mortality pattern of German vegetarians after 11 years of follow-up. Epidemiology 1992; 3(5) : 395-401

৩.১ Snowdon D. Animal product consumption and mortality because of all causes combined, coronary heart disease, stroke, diabetes, and cancer in Seventh Day Adventist. Am J Clin Nutr. 1988; 48 : 739-748

৩.২ Slattery M et al. Meat consumption and its associations with other diet and health factors in young adults : the CARDIA study. Am J Clin Nutr. 1991. 54 : 930-935

৩.৩ Salie F. Influence of vegetarian food on blood pressure. Med Klin. 1930; 26 : 929-931

৩.৪ Armstrong B. Blood Pressure in Seventh Day Adventist vegetarians. Am J Epidemial. 1977, 105 : 444-449

৩.৫ Sacks F M et al. Blood pressure in vegetarians. Am J Epidemial 1974; 100 : 390-398

৩.৬ Donaldson AN. The relation of protein foods to hypertension. Calif West Med. 1926; 24 : 328-331

৩.৭ Margetts BM et al. Vegetarian diet in mild hypertension : a randomised controlled trial. Br Med J. 1986; 293 : 1648-1671

৩.৮ Key TJ et al. Mortality in vegetarians and non-vegetarians : Detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999; 70 : 5165-5245

৩.৯ Ornish D et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? Lancet 1990; 336 : 129-133

৪.১ National Cancer Institute. Cancer Rates and Risks Washington DC : 1985

৪.২ Cummings JH, Bingham SA. Diet and the prevention of cancer. Br Med J. 1998; 317 : 1636-1640

৪.৩ Phillips RL. Role of lifestyle and dietary habits in risk of cancer among Seventh-Day Adventists. Cancer Res (Suppl) 1975; 35 : 3513-3522

৪.৪ Trichopoulos D et al. The effect of westernization on urine estrogens, frequency of ovulation, and breast cancer risks: a study in ethnic Chinese women in the orient and in the U.S.A. Cancer 1984; 53 : 187-192

৪.৫ Armstrong B, Doll R. Environmental factors and cancer incidence and mortality in different countries, with special reference to dietary practices. Int J Cancer. 1975; 15 : 617-631

৪.৬ Hirayama T. Epidemiology of breast cancer with special reference to the role of diet. Prev Med 1978; 7 : 173-195

৪.৭ Mills PK et al. Cohort study of diet, lifestyle and prostate cancer in Adventist men. Cancer. 1989; 64 : 598-604

৪.৮ Fraser GE. Associations between diet and cancer, ischemic heart disease, and all-cause mortality in non-Hispanic white California Seventh-day Adventists. Am J Clin Nutr. 1999; 70 : 5325-5385

৪.৯ Sinha R et al. Cancer Risk and Diet in India. J Postgrad Med 2003; 49 : 222-228

৫.১ Lanou AJ and Barnard ND. Food power : a vegetarian approach to diabetes. Diabetes Voice 2003; 48 : 27-30

৫.২ Snowdon D. Does a vegetarian diet reduce the occurrence of diabetes? Am J Public Health 1985; 75 : 507-512]

৫.৩ Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. J Nutr Med. 1994; 4 : 431-439

৫.৪ Anderson JW, Ward K. High-carbohydrate, high-fiber diets for insulin-treated men with diabetes mellitus. Am J Clin Nutr. 1979; 32 : 2312-2321

৫.৫ Nicholson AS et al. Toward improved management of NIDDM : a randomized, controlled, pilot intervention using a low-fat, vegetarian diet. Prevent Med. 1999; 29 : 87-91

৬.১ Abelow BJ et al. Cross-cultural association between dietary animal protein and hip fracture. Calcified Tissue Int. 1992; 50 : 14-18

৬.২ Marsh AG et al. Vegetarian lifestyle and bone mineral density. Am J Clin Nutr. 1988; 48 : 837-841

৬.৩ Sellmeyer DE et al. A high ratio of dietary animal to vegetable protein increases the rate of bone loss and the risk of fracture in postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2001; 73 : 118-122

৬.৪ Hegsted DM. Calcium and osteoporosis. J Nutr. 1986; 116 : 2316-2319

৭.১ Paecock M et al. Hypercalcuria of renal stone disease. Proc of Renal stone Research symposium, Livingston, London

৭.২ Kerstetter JE, Allen LH. Dietary protein increases urinary calcium. J Nutr. 1990; 120 : 134-136

৭.৩ Kunkel ME, Beauchene RE. Protein intake and urinary excretion of protein-derived metabolites in aging female vegetarians and nonvegetarians. J Am Coll Nutr. 1991; 10 : 308-314

৭.৪ Robertson WG et al. Should recurrent calcium oxalate stone formers become vegetarians? Br J Urol. 1979; 51 : 427-431

৮.১ Fraser G et al. Diet and lung cancer in seventh Day Adventists. Am J Epidemiol. 1991; 133 : 683-693

৮.২ Pixley F et al. Effect of vegetarianism on development of gall stones in women. Br Med J. 1985; 291 : 11-12

৯.১ Kjeldsen-Kragh J et al. Controlled trial of fasting and one year vegetarian diet in rheumatoid arthritis. Lancet 1991; 338 : 899-902

৯.২ Lindahl O et al. Vegan regimen with reduced medication in the treatment of bronchial asthma. J asthma 1985; 22 : 45-55

১০.১ Nicols Fox. Spoiled : The Dangerous Truth About a Food Chain Gone Haywire, Basic Books, 1997

১০.২ 'Foodborne Diseases Are on the Rise in Europe', FAO news release, Feb 25, 2002

১০.৩ 'How We Tested Beef and Chicken', Consumer Reports, Aug. 2003

১১.১ Elizabeth Kolbert, 'The River', The New Yorker, Dec 4, 2000

১১.২ 'Food and Environment : Antibiotic Resistance', Union of Concerned scientists, Jun 16, 2003

১২.১ Tax Meat—The Ecological Argument. People for the ethical treatment of Animals, Norfolk, VA, USA Internate http://www.taxmeat.com/humane.html 26/4/2004

১২.২ De SOUZA R et al Critical Links : Population, Health, and the Environment, Population Bulletin 58, No 3, 2003

১২.৩ Bhalla G. S. et al Prospects for India's Cereal Supply and Demand to 2020. International Food Policy Research Institute, Washington DC, 2004

১২.৪ David Pimentel, 'Livestock Production: Energy Inputs and the Environment', report to the Canadian Society of Animal Science, Montreal, July 24-26, 1997

১২.৫ Paul Appleby, 'Animal Farming and the Environment'. Internet: http://www.ivu.org/oxveg/Talks/animalfarmenv.html 30.4.04

১২.৬ 'Ruminant Livestock and the Global Environment', EPA, May 31, 2002

১২.৭ 'Reducing Water Pollution from Animal Feeding Operations', EPA, Congressional testimony, May 13, 1998

১২.৮ Carl Safina, 'The World's Imperiled Fish', Scientific American, Nov. 1995, pp. 48-49



আদালতের আঙিনায় বাঙলা ভাষা

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

লিখিত বাঙলা ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়' গ্রন্থে। কিন্তু তার প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বছর পরে বাঙলা ভাষা আদালতের আঙিনায় প্রবেশাধিকার পায়। প্রাচীন যুগ, যাকে 'বৈদিক যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়—সেযুগে ন্যায়-নীতি ও আইনের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সূক্ষ্ম। তাছাড়া সবকিছু আলোচনা হতো সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায়। মধ্যযুগ বা মুসলমান আমলে প্রথম বিচারকার্যের জন্য আলাদা আদালত স্থাপন করা হয়, কিন্তু সেসময়ে আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। সেখানে আবেদন-নিবেদন বা রায় সবকিছুই হতো ফারসি ভাষায়। এরপর আধুনিক যুগে প্রথম ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত আদালতে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজরা রানী এলিজাবেথের এক সনদ নিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করে এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা এদেশের বাদশাহের প্রয়োজনীয় অনুমতিও পায়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি একটি নতুন সনদ পায়। সেই সনদে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে কোম্পানিকে এদেশে তাদের বাণিজ্যিক কার্যালয়ের বা কুঠির কর্মচারীদের ইংল্যাণ্ডের আইন অনুযায়ী বিচারের অধিকার দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে সকল সনদেই কোম্পানির এই বিচারের অধিকার থাকে। কিন্তু বিচারের অধিকার কোম্পানির থাকলেও বিচার করার মতো কোন প্রতিষ্ঠান বা আদালত এখানে ছিল না। অবশেষে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান নিয়ে কলকাতায় একটি 'মেয়র্স কোর্ট' স্থাপন করা হলো। এটিই কলকাতার প্রথম আদালত। কিন্তু বাদশাহের দেওয়া অনুমতিপত্র অনুযায়ী এখানে কোন নতুন আদালত স্থাপনের অধিকার ইংরেজ কোম্পানির ছিল না। তা সত্ত্বেও কোম্পানির প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই আদালত প্রাধিকারপ্রাপ্ত আদালতের মতো কাজ করতে থাকে। এখানে উইল, খতপত্র, দলিল প্রভৃতি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা ছিল এবং ঐসমস্ত কিছু ইংরেজি ভিন্ন বাঙলা, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষায় করার অধিকারও দেওয়া হয়। এই প্রথম কোন আদালতে বাঙলা ভাষার প্রবেশাধিকার ঘটল। অবশ্য এসব অধিকার পাওয়ার পরেও ঐ আদালতে প্রথম বাঙলা দলিল হিসাবে আমরা পাই ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের একটি খতপত্র। এটি আদালতের আঙিনায় প্রাপ্ত বাঙলায় লিখিত প্রথম প্রমাণপত্র। এই খতপত্রের ভাষা ছিল এরকম—

৺শ্রী শ্রী রাম

> মহামহিম শ্রীযুত মেং ডগলিষ সাহেব বরাবরেষু লিখিতং শ্রী কালিচরণ দাষ কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে শহরের স্থানে শ্রী গয়ারাম ঘোষজার তহবিল হইতে চলন ১১০০ এগারো শত তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম ইহার সুদ ফিসদ সালিআনা ১০ দষ তঙ্কার হিসাবে দিব টাকার করার ছয় মাহা বাদে ব্যাজ সমেত টাকা দিব ইহার করার টাকা লইয়া খত দিলাম ইতি সন ১১৬২ (?) সাল তারিখ ২২ মাঘ ২ ফিবরেল।

এই খতপত্রের ভাষা দেখে বোঝা যায়, এরকম ভাষা হঠাৎ লেখা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর আগে থেকেই এধরনের খতপত্র লেখা হতো। কিন্তু উপযুক্ত আদালতের অভাবে তা রেজেস্ট্রি করা হয়নি। প্রকৃত ঘটনাও তাই। বাঙলায় লেখা খতপত্র, সন্ধিপত্র, চুক্তি ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে কৃত একটি চুক্তির উল্লেখ করতে হয়। ঢাকা সোনারগাঁ অঞ্চলে হওয়া এই চুক্তিপত্রটি 'শ্রীযুত মিত্রি গাই সাহেব ও মিত্রি গারবেল'-এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস নামে দুই ব্যক্তির মধ্যে আড়তদালালি সম্পর্কিত একটি চুক্তি। কিন্তু যেহেতু এটি প্রথম আদালত স্থাপনের পূর্বে কৃত চুক্তি, তাই এটিকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরেকখানি চুক্তিপত্রও উল্লেখযোগ্য। এটি প্রথম আদালত 'মেয়র্স কোর্ট' স্থাপনের পরে করা চুক্তি। কিন্তু এটি কোনদিন কোন আদালতে আনা হয়নি। এটি হলো ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ওারিন হিষ্টীন, ওলিস অনডরসি ও রিচার্ড বারওএল'-এর সঙ্গে কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের করা চুক্তিপত্র। এর ভাষার গঠন কিছুটা ইংরেজি ভাষার ন্যায়। যেমনঃ "রাজা করার করিবেন তাবেদারী অঙ্গরেজ কুম্পানির তাহার মলুক দুসমণ হইতে পরিচ্ছন্ন হইলে মলুক কোচবিহার সুবে বাঙ্গালার মোতালুক হবেক।" হয়তো এটি ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনূদিত হয়ে থাকতে পারে। তাহলেও অনুবাদটি উচ্চস্তরের। এই চুক্তিপত্রের পরিভাষাগুলি সেকালে অভাবনীয় বলা যায়। বিশেষত 'signed, sealed and constituted' অর্থে 'দস্তখত

** শান্তিপুর-নিবাসী, পেশায় আইনজীবী, পত্র-পত্রিকায় আইনের বিষয়ে লেখালেখি করেন। বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, গ্রন্থপ্রণেতা, দেশ-বিদেশের পুরনো মুদ্রা সংগ্রাহক।*

ঠাকুরের সমাধিচিত্রের ১২৫ বর্ষপূর্তি



শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮ খ্রিস্টাব্দ রবিবার একটি ঐতিহাসিক দিন। ঐদিন শ্রীরাম পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে অপরাহ্নে ব্রাহ্মভক্ত কেশবচন্দ্র সে বাসভবন 'কমলকুটিরে' শুভ পদার্পণ করেছিলেন। কেশবচ চেষ্টায় ঐদিন সমাধি অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ফটো হয়েছিল। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থার মোট তিনটি দেখতে পাই। এটি প্রথম। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঐ ঐতিহাসি ফটোগ্রাফ তোলার ১২৫ বছর পূর্তি। এই প্রসঙ্গে সেকালে কেশব পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' থেকে দুটি প্রাসঙ্গিক অংশ দেওয়া হলো ঃ

"বাস্তবিক তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) স্বর্গীয় ভাব দর্শনে সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া ঐ রবিবারে অপরাহ্নে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনেও পরমহংস মহা পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেদিনও তাঁহার সমুদয় ভক্তিভাব পাইয়াছিল। কেবল সমধুর নৃত্য হয় নাই। তাঁহার সুমিষ্ট মধুর সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সেদিন সমাধিন তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দঘন এই নাম শ্রবণে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।"

দ্রষ্টব্য ঃ 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৬ আশ্বিন ১৮০১ শক, ১ অক্টোবর ১
সংবাদ (শিরোনামা) পৃঃ ৬,

"তাঁহার উক্তিসকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হ তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফঝম্ফ করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করি না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দনহীন স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জীবনতরী পথিকের পক্ষে আলোকস্তম্ভস্বরূপ।"

দ্রষ্টব্য ঃ 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১ আশ্বিন ১৮০৮ শক, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, পৃষ্ঠা।

'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে লিখেছেন ঃ "There is something in that wonderful smile that no photograph was ever able to reproduce."

তথ্যসঙ্কলন ঃ সন্তোষকুমার

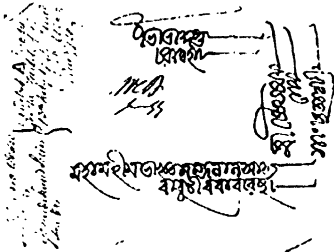
করিলেন, মোহর করিলেন এবং সমাধা করিলেন'—আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ভারতে আইনসিদ্ধভাবে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে দেশের বিচারব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে প্রতি জেলায় একটি করে ফৌজদারি ও একটি করে দেওয়ানি আদালত স্থাপন করা হয়। ঐসব আদালতে প্রথম থেকেই বাঙলায় আবেদন পেশ করার অনুমোদন ছিল। ফলে আদালতের সীমার মধ্যে বাঙলা ভাষার প্রবেশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট (পুরনো) স্থাপিত হয়। এই সুপ্রিম কোর্টে দেশীয় আইনকানুন উপযুক্ত স্থান পাবে বলে নির্দেশ জারি হয়। ফলে একদিকে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ বেড়ে ওঠে, অপরদিকে বেশ কিছু সরকারি নিয়মকানুন প্রধানত ইংরেজদের উদ্যোগে বাঙলায় অনূদিত হতে আরম্ভ করে। এসব সত্ত্বেও একটি কথা স্মরণযোগ্য, বাঙলা ভাষায় মূল ইংরেজি আইনের সম্পূর্ণ তরজমা প্রথম বের হয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। জোনাথান ডানকান এইসব আদালতে প্রচলিত আইনসমূহের একটি বাঙলা অনুবাদ 'সপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বের করেন। সম্পূর্ণ বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা গ্রন্থের দুরূহ সম্মানও এর প্রাপ্য। এরপর অনেকগুলি আইন-সঙ্কলন বাঙলায় বের হতে থাকে। অনুবাদকগণ হয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন অথবা সরকারের অনুমতি নিয়ে অনুবাদ করতেন। ঐসময়ে আইন বা অ্যাক্টকে 'রেগুলেশন' বলা হতো।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন আইনে নির্দেশ দেওয়া হলো—(১) সদর দেওয়ানি ও মফস্‌সল দেওয়ানি আদালতগুলি প্রকাশ্যে জনসাধারণের সম্মুখে আইনগুলি ঘোষণা করবে, (২) ঐগুলি ফারসি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, (৩) আদালত ভবনের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ নির্দেশনামা বা আইনগুলি টাঙানো থাকবে এবং (৪) ইংরেজি, ফারসি ও বাঙলা ভাষায় আইনগুলি প্রকাশের তারিখ থেকে একমাস কাল ঐভাবে থাকবে। এই প্রথম আইনের বাঙলা অনুবাদ বাধ্যতামূলক করা হলো। অবশ্য ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দেই দেখা গেল, কোম্পানির নোটিশ ইত্যাদি ইংরেজির সঙ্গে বাঙলাতেও কোম্পানির কলকাতা অফিসের দরজায় এবং শহরের বিভিন্ন অংশে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। পরে বাঙলায় অনেক নোটিশ, এমনকি আইনের অংশবিশেষ অনুবাদ হয়েছে। তাতে মনে হয়, বাঙলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদির অনুবাদের ব্যবস্থা আগেও ছিল, কিন্তু ঐধরনের কোন সরকারি আদেশ পাওয়া যায়নি। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি আইন-সঙ্কলন বের হয়। তাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়, সকল আইনেরই বাঙলায় অনুবাদ করতে হবে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এদেশের আইনব্যবস্থায় এক বিপ্লব সাধিত হয়। এই বছরে একগুচ্ছ নতুন আইন বা রেগুলেশন জারি করা হয়। সেইসঙ্গে এও স্থির হয়, যেসমস্ত রেগুলেশান জারি করা হবে সেগুলির এক-একটি বাৎসরিক সংস্করণ তৈরি করে প্রতি সংস্করণের প্রথমে ঐ সংস্করণের আইনগুলির একটি সূচীপত্র অর্থাৎ ঐ সংস্করণস্থিত সব আইনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সম্বলিত সূচী প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি সূচীপত্র-সমেত সংস্করণ ফারসি ও বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে এবং তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ঐরকম ১০টি করে অনূদিত কপি লণ্ডনে কোম্পানির হেড অফিসে পাঠাতে হবে। পাছে জাহাজডুবির ফলে ঐ অনূদিত কপি লণ্ডনে না পৌঁছায়, তাই স্থির হলো—দুটি জাহাজে প্রত্যেকটিতে ৫ কপি করে অনুবাদ পাঠাতে হবে। বাঙলায় এই আইন অনুবাদ আদালতের পক্ষে খুবই সাহায্যকারী বলে গণ্য হতো। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে পূর্ণিয়ার জেলা জজ জেমস গ্রাহাম গভর্ণর জেনারেলকে জানান, ১৭৯৩, ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের অমুক নম্বর আইনের বাঙলা অনুবাদ তিনি পাননি। তাই তাঁর কাজের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আরেকটি আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, আদালতের সিলমোহর বাঙলায় করতে হবে। এছাড়া এই বছরই আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি আইনে বলা হয়, অতঃপর দেশের প্রতিটি আইনের অধীনে যেসব 'নিয়মাবলী' (rules) ও 'নির্দেশাবলী' (orders) তৈরি করা হয়—তাদের প্রত্যেকটির মূল আইনের মতো বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। এইসঙ্গে আরো বলা হলো যে, ইংরেজি আইনের বাঙলা অনুবাদে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে একই 'পদনাম ও প্রতিশব্দ' (designation and term) ব্যবহার করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বাঙলায় আইনের ক্ষেত্রে দিশারী হিসাবে গণ্য। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের একটি আইনে কিভাবে আইন বা আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু অনুবাদ হবে তা বলতে গিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, 'আক্ষরিক ও সাহিত্যিক' (verbatim of literatim) অনুবাদ অনভিপ্রেত, কারণ তা দেশের অধিকাংশ লোক বুঝবে না। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের অপর এক আইনে নিম্ন আদালতগুলিতে ইংরেজির পরিবর্তে বাঙলায় আদালতের সব কাগজপত্র রক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উচ্চতর আদালতে ঐ কাগজপত্রের ইংরেজি অনুবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা থাকে।

এইসময়ে বাঙলায় অনুবাদের 'রসুম' (fees) ছিল এরকম ঃ "তরজমানবিস বাঙ্গলা ও পারসির দুই সাহেব অর্দ্ধা অর্দ্ধা করিয়া পাইবেন—(১) যেবিষয় পাঁচহাজারের অধিক না হয় তাহার আপিলের আরজি কিম্বা নূতন বিষয়ের আরজি তরজমা করিতে ৫ পাঁচ টাকা। (২) পাঁচহাজারের অধিক হইলে তাহার আপিলের আরজি কিম্বা নূতন বিষয়ের আরজি তরজমা করিতে ১০ দশ টাকা। (৩) আর কোন প্রকারের আরজি করিতে ২ দুই টাকা।"



১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কৃত একটি কর্জপত্রের প্রতিলিপি

দীর্ঘদিন ধরে এদেশের আদালতসমূহে দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করার জন্য 'পণ্ডিত'-এর ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজিতে 'নেটিভ ল অফিসার' নামে অভিহিত হলেও সাধারণ্যে এঁরা 'জজপণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা নিজেরা আদালতের রায় ঘোষণা করতেন না। এঁদের কাজ ছিল বিদেশীয় বিচারকদের কাছে এদেশীয় হিন্দু আইন সংক্রান্ত উদ্ভূত প্রশ্নগুলির উত্তর করে দেওয়া। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধার করে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কৃতে এবং 'ভাষা'য় (অর্থাৎ বাঙলা ভাষায়) এগুলির উত্তর দিতেন। উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি বাঙলা অক্ষরে লিখিত হতো। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই পণ্ডিতদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি স্থির করে দেওয়া হয়। আদালত থেকে পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন করা হতো বাঙলা ভাষায়। যেমন ঃ "ছুথরে জাতির পাত্রের নখ কাটীলে ও বিবাহের সময় তাহারদিগের মাথাতে সূত্র ধরিলে নাপিতদিগের জাতির পর কিছু আঘাত হয় কিনা" ইত্যাদি।

যখন আদালতের বিভিন্ন কাজকর্মে বাঙলা ভাষা ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করতে থাকে, তখন 'ইংলণ্ডীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরদের' দেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর 'উদ্দেশ্যাবলী'র মধ্যে বলা হলো ঃ "এখানে বিভিন্ন আদালতের সওয়াল-জবাব এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত কাজকর্ম দেশী ভাষায় সম্পন্ন হয়। এদেশে কোম্পানী যে আইন প্রচলন করতে বদ্ধপরিকর তা ইংলণ্ডের আইন নয়—যে-আইন ভারতীয়রা দীর্ঘদিন ধরে পূর্বতন রাজা-বাদশাহের আমল থেকে মেনে চলছেন সেই আইন।... তাই কোম্পানীর নতুন ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ভবিষ্যতে ব্রিটিশ রাজত্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার পক্ষে যেসব বিষয়ে শিক্ষালাভ প্রয়োজন, সেইসব বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হল।" এখানে প্রথম থেকেই আদালতের প্রয়োজনে বাঙলা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।

প্রথমে সরকারের যাকিছু বাঙলা ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন হতো, তা সবই করতেন সরকার-নিযুক্ত ফারসি অনুবাদক। কিন্তু আদালতে ব্যাপকভাবে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করার ফলে বাঙলা অনুবাদের চাহিদা এতই বেড়ে যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে আলাদাভাবে একজন বাঙলা অনুবাদক নিয়োগ করতে মনস্থ করেন। সেইজন্য সরকারের অধীনে 'বঙ্গীয় অনুবাদক' নামে একটি পদ সৃষ্টি করা হয় এবং সরকার উইলিয়াম কেরীকে এই পদে নিয়োগ করেন।

এইভাবে আদালতে বাঙলা ভাষার প্রবেশ যখন অবশ্যম্ভাবী, সেই সময়ে সরকার ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের এক আদেশে আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষা চালুর নির্দেশ দিলেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি 'বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের জুদিসিয়াল ও রেবেন্যু ডিপার্টমেণ্টের' অ্যাক্টিং সেক্রেটারি এফ. জে. হ্যালিডে এক 'বিজ্ঞাপন' জারি করেন ঃ "ভারতবর্ষস্থ কৌনসেলের শ্রীযুক্ত প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে ঐ আকটের দ্বারা শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের যেসকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেবকে অর্পণ করাতে ঐ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবেক এবং এইরূপ পরিবর্ত্তন করণার্থ ১ জানুআরি তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল।"

এই পরিবর্তনকে বাংলার জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সাধারণভাবে স্বাগত জানালেও 'যশোহর জিলাবাসী

কতিপয় জনানাং' আদালতে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন এবং ফারসি ভাষা বহাল রাখার জন্য আবেদন জানান। এই মর্মে তাঁরা সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন।

আদালতে বাঙলা ভাষা চালু হওয়ার সরকারি নির্দেশ জারির পর আদালতের আভ্যন্তরীণ সকলপ্রকার কাজ বাঙলায় করার প্রচেষ্টা নবোদ্যমে শুরু হয়ে যায়। সাক্ষী দেওয়ার পূর্বে আদালতে শপথগ্রহণের বয়ানের বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বাঙলা বয়ান হলো ঃ "আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে জাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ হইবেক এবং সত্য ভিন্ন হইবেক না।" আদালতের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্মের বাঙলা করা হলো। যেমন ঃ "জিলা নদিয়ার দেওয়ানী আদালত। ফরিয়াদি মিরজা গোলাম ফরিদ। আসামী রামমোহন ছুতার এবং সহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি বৃন্দাবন ছুতারের পুত্র ও উত্তরাধিকারি ভিম ছুতার। সহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি বৃন্দাবন ছুতার ও ভিম ছুতার প্রতি আগে। তোমারদিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই জিলার মধ্যে পুনর্ব্বার মুনসেফ ফরিয়াদি মিরজা গোলাম ফরিদের পক্ষে ১৮৩৯ সালের ৭ আগস্ট তারিখে তোমারদের নামে খরচা ও ১৮৪১ সালের ৭ মে পর্য্যন্ত সুদ সমেত কোম্পানীর ৪৫ টাকা ৩ আনা ৬ পাই একতরফা ডিক্রী করিয়াছেন।... আমার দস্তখত এবং এই আদালতের মোহরে এই এত্তেলা অদ্য ১৮৪১ সালের ১ জুলাই তারিখে দেওয়া গেল। অমুক জজ।"

এইভাবে যখন আদালতের সব কাজকর্ম বাঙলায় শুরু হয়ে গেল, তখন দেখা গেল বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবের ভাষা ব্যবহার করে বাঙলা লিখছেন। এটি খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয়। তখন সব বাঙলা লেখার ভাষার মধ্যে সমতা আনার জন্য ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল সার্কুলার অর্ডার নং ১৪৬-এর মাধ্যমে সরকার এক নির্দেশনামা জারি করেন। তাতে বলা হলো ঃ "সরকার আশা করেন যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে কার্যবিবরণী লেখার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এগুলি যেন বোধগম্য হয় এবং এজন্য চলতি ভাষা থেকে এবং পণ্ডিতদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তাই সকল প্রধান কর্মচারি এবং নিম্নপদস্থ বিচারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আইনগুলির বাঙলা অনুবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের ভাষা এবং আইনী পরিভাষা ব্যবহার করেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আইনগুলির বাঙলা অনুবাদ করেন ইংরেজ সিভিলিয়ান হেনরি পিটস ফরস্টার।

সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত দুখানি আদালতের আরজির উল্লেখ করতে হয়। এই আরজি-দুটি থেকে সে-যুগে আদালতে ব্যবহৃত বাঙলা ভাষা যে কতটা দৃঢ় ও কার্যক্ষম ছিল তার নমুনা পাওয়া যায়। আরজি-দুটি যথাক্রমে ১৭৯০ ও ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের। একটি ফৌজদারি ও অপরটি দেওয়ানি আদালতের আরজি। এ-দুটির আকার, লেখার প্রণালী, আবেদনকারিদ্বয়ের নাম ও ঠিকানার প্রায় সমতা এবং একত্রে রক্ষিত হওয়া দেখে মনে হয়, ঐ আরজি-দুটি প্রকৃত কোন আবেদনপত্র নয়—আরজি লেখার নমুনা বা মডেল মাত্র। কিন্তু তাতে এদের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। আরজি-দুটি নিম্নরূপ ঃ

॥১॥

৺শ্রীশ্রী হরি

সন ১০৯৬।—

মহামহিম দয়ানি আদালতের সীযুৎ সাহেব বরাবরেষু—

আরজী সী রামকান্ত চন্দ্র সাঃ বিষ্ণুপুর আশামী শ্রী সদারাম মহন্ত চকলা তথা সাঃ ইদাস মকদমা ইহার স্থানে আমার এক কীত্যা তমসু দিআ টঃ ৫০০ পাচশত টাকা আর চটা বাবুদ ৫০ পঞ্চাশ তঙ্কা একুণে ৫৫০ পাচশত পঞ্চাশ তঙ্কা স্বররতি (= বদমায়েসি) করি দেয় না এ কারণে নালিষ শাহেব ধর্ম্ম অবতার হকক আদালত করিআ আশামী আদালতকে হুকুম করিআ আমার টাকা দেলাইআ—দিআতে হুকুম হইবেক আমি গরিব সাহেব ধর্ম্ম অবতার আমার পনে (= পানে) নেক নজর করিঅ্যা দেলাইআদি আইবেন আই (= এই) আরজ নিবেদন করিলাম সন ১০৯৬ সাল তাঃ ২২ আষাঢ়।

॥২॥

৺৭ শ্রীশ্রী হরি

সন ১০৯৭।—

জায়নামা

মহামহিম ফোদর আদালতের সীযুৎ সাহেব বরাবরেষু—

চাকালাই বিষ্ণুপুর সাং বানসুর শ্রী রমাকান্ত চন্দ আরজ নিবেদন আমার য়ই (= ঐ) সাকীমে শ্রী মানিক রায় স্থানে আমার মূল ১০ দশ তঙ্কা পানা (= পাওনা) ছিল তাহাতে আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না আমাকে দুইচারি বদজবান গালি দিল এবং আমাকে মারিতে উধুতু (= উদ্যত) হইল একারণ নালিস সাধামী (= আসামী?) মজকুকে হুজু[র] তলপ করিআ দুখই নিসাব (= দুঃখ দূর?) করিতে আগে (= আজ্ঞা?) হঅ আমী গরিব প্রজা সাএব ধম অবতা[র] আমাবাবে জেমত হুকুম হঅ এইতদার্থে আরজ নিবেদন লিখিআ দিলাম ইতি তাংখ/৭ শেবন— ❑



বিবেকানন্দের স্বদেশহিতৈষণা প্রসঙ্গ ফিরে দেখা

চন্দনা রায়*

বিবেকানন্দের স্বদেশ-সমাজ ভাবনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিতির পর যেকোন সচেতন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আসে, একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিবিধানের জন্য যে চিন্তাভাবনা করেছেন—তা কি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র চিন্তার একটি দিকমাত্র? তাঁর অনুভূত অদ্বৈততত্ত্বের সঙ্গে এই সমাজভাবনার সামঞ্জস্য আছে কি?

বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের হইল ঈশ্বর কেন্দ্র, জীব বা মনুষ্য পরিধি। বিবেকানন্দের হইল জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র, ঈশ্বর পরিধি।"[১] এই মন্তব্য বিবেকানন্দের সমাজভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ বিবেকানন্দের সমাজভাবনা মূলত জীব বা মানুষের উত্তরণের ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানবসমাজের বিকাশে ধর্ম তথা অদ্বৈতবাদের ভূমিকাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর সমাজসংস্কার চিন্তা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী নিজেকে দেশকালের সীমায় বেঁধে স্বদেশহিতব্রত তথা জগদ্ধিতব্রতকে স্বধর্ম বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন, মায়া বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না—ব্যাপারটি যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করে। বিবেকানন্দের এই স্বদেশহিতব্রতের সূচনা তাঁর গুরুর প্রেরণায়। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার শিক্ষা ও সেই শিক্ষাকে জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছেন, তাই তাঁর স্থাপিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘের ব্রত আত্মমুক্তি ও জগতের হিতসাধন।



শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় ধর্ম কেবল উচ্চ দার্শনিক চিন্তা হিসাবে পরিগণিত হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবনে ও সমাজে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বকে বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন। তাই বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার অর্থ বৃহত্তর মানবসমাজের এবং অবশ্যই স্বদেশের মঙ্গলচিন্তা। ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন দর্শন ও শাস্ত্রের জটিলতার মধ্য থেকে বিবেকানন্দ একটি সাধারণ সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন—"আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন একটি সাধারণ ভিত্তি আছে যাহা দ্বারা সমগ্র জগতের ভাবস্রোত পরিবর্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস।"[২]

এই বিশ্বাসকে নিছক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে বিবেকানন্দ থেমে যেতে চাননি, কারণ তিনি জানতেন এই তত্ত্বের প্রয়োগ না হলে, সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত নিপীড়িত মানুষের উপকারে এই তত্ত্ব না প্রয়োগ করলে এটি একটি উচ্চ দর্শনচিন্তা হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিটি মানুষ তথা জীবের মধ্যে যে ব্রহ্ম রয়েছেন, সেবিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে, ব্রহ্মবিকাশের চেষ্টা করতে হবে। এই আত্মানুসন্ধান বা আত্মবিকাশের কর্মধারাকে মানুষের সমাজে এনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর কাছে সামাজিক সংস্কার। তিনি বলেছেন ঃ "এই দরিদ্রগণকে—ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও শিখাও—সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।"[৩]

প্রত্যেক যুগপুরুষ তাঁর দেশ, সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন ঘটান, এটা তাঁদের ওপর ন্যস্ত এক গুরুদায়িত্ব। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব ছিল অতি কঠিন। ভারতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। তখন ইংরেজ শাসন কায়েম হয়েছে। যান্ত্রিক উন্নতি এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আঘাতে দেশজ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্যুদস্ত। দেশের মানুষের এক ক্ষুদ্র অংশ

* বর্তমানে রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদে কর্মরতা. উন্নয়নমূলক অর্থনীতির চর্চা করেন।

দুহাত বাড়িয়ে এই নতুন সভ্যতাকে স্বাগত জানাচ্ছে, আরেক অংশ তাদের প্রাচীন সভ্যতার খুঁটিনাটি সংস্কার ও লোকাচার-দেশাচারকেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আঁকড়ে থাকতে চাইছে, যেকোন পরিবর্তনকেই অস্বীকার করছে প্রাণপণে। অপরপক্ষে প্রথমোক্ত দলটি বিদেশি নব্য সভ্যতার আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপহাস করছে। বিবেকানন্দকে লড়তে হয়েছে এই দুই দলেরই বিরুদ্ধে। তিনি জানতেন, দেশজ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি অতি নেতিবাচক মনোভাব দেশের মানুষের আত্মশ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেবে; অপরপক্ষে জাতিভেদের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজা ও অস্পৃশ্যতার অনুশাসন দেশকে ক্রমশ পঙ্গু করবে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নতুন মাত্রা পেয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজের কাছে। কারণ, এর মাধ্যমে জাতিসত্তার ঐক্যকে দুর্বল করে দেওয়া যে সম্ভব তা সুচতুর ইংরেজের বুঝতে দেরি হয়নি। কিভাবে এই ঐক্য দুর্বল করা যেত বা কিভাবে দেশের মানুষের এক অংশকে দেশের বাকি নিপীড়িত জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত তা ফুটে উঠেছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়ঃ "আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত করে আছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যামি'। এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব। রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্যলাভের আশায় এর প্রসার।"[৪]

ধর্মকে ঘিরেই যে ভারতবর্ষের মূল প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হয়—একথা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই ধর্মকে উপরি উক্ত এই দুটি দলের হাত থেকে উদ্ধার করে তিনি তার সার্বজনীন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষায় নব্যশিক্ষিত যে ভারতীয় বিদ্রূপ করছে তার পৌত্তলিক স্বদেশবাসীকে, যুক্তির তরবারিতে বিবেকানন্দ তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন। আলোয়ারের মহারাজ মঙ্গল সিংহের সঙ্গে এপ্রসঙ্গে কথোপকথন বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য উদাহরণ। প্রতিমার পূজা যে ধাতু, কাঠ বা পাথরের পূজা নয়—চৈতন্যময় ঈশ্বরের পূজা, এর উদাহরণ তিনি দিয়েছেন মহারাজের নিজের তৈলচিত্রের ওপর মহারাজের পারিষদবর্গের শ্রদ্ধাবোধের তুলনা করে। ঐ ছবি যেমন কাঠ বা কাঁচ নয়, তাঁর নিজের প্রতিরূপ; তেমনি দেবমূর্তি ঈশ্বরের প্রতিভূ—এই কথা বিবেকানন্দ তাঁকে স্মরণ করিয়েছেন।

অন্যপক্ষে ব্রাহ্মণত্বকে বংশানুক্রমিক জাতিভেদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার চারিত্রমহিমাকেই বিবেকানন্দ আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণত্বের যে-সংজ্ঞা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল তা হলো শম ও দমবিশিষ্ট ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণের বিকাশ এবং মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমন। এই সত্ত্বগুণের বিকাশকে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সমাজের সর্বদেহে, সর্বশ্রেণিতে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ ও কর্ম-বিভাজনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থা, যার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি—তার যৌক্তিকতাকে বিবেকানন্দ অস্বীকার করতে চাননি, শুধু বংশপরম্পরায় বয়ে চলা এর জাতিগত শ্রেণিপ্রাধান্যকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। সর্ববিষয়ে মৌলিক চিন্তায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ এই প্রথাটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি ও সংস্কারের বিভিন্নতার স্বীকৃতির ওপরই রচিত হয়েছিল বর্ণাশ্রম। এক পরিবারের অন্তর্গত হয়েও লোকে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত, অব্রাহ্মণ তাঁর চর্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারতেন—এসবের সাক্ষ্য যে ঋগ্বেদ বা মহাভারতে আছে তা বিবেকানন্দ জানতেন। তবে কালক্রমে এর পরিবর্তিত রূপটি উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে একে নিপীড়নের যন্ত্র করে তুলেছে, মানুষকে বিকশিত করার পরিবর্তে জাতিভেদ মানবতাকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে—একথা জেনেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে।

বস্তুত একথা মানতেই হয়, মানুষের সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে যদি সামাজিক বর্ণাশ্রমকে সম্পূর্ণ বিলোপ করা যায়ও, তবু তার জায়গা নেয় আর্থিক ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নব জাতিভেদ। আবার আর্থিক ও সামাজিক—এই দুইপ্রকার বর্ণাশ্রমের অস্তিত্বহীন সমাজে মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য ও ক্রিয়াশীলতার প্রেরণাকেও কি অস্বীকার করা হয় না? অল্ডাস হাক্সলির 'The Brane New World'-এও তাই ঘুরেফিরে আসে ঐ বর্ণাশ্রম। বিবেকানন্দ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন এভাবে—"উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য-অনার্য, ঋষি-ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি যাহাই হও, ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই



এক আদেশ, সে-আদেশ এই—'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকেই এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয় অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশ ঈশ্বরলাভ করিতে পারে।"[৫]

আদর্শ ধার্মিকতা বা আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের জন্য বিবেকানন্দ জোর দিয়েছেন অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের ওপর। অন্তরের পাশব প্রকৃতি জয় করে, ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়েই মানুষ ক্রমে তার আদর্শের দিকে অর্থাৎ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। এইজন্য অন্যত্র মানুষের বিবর্তন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন: "Animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংসসাধন করে progress (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়।... মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom-এ স্থূলদেহের সংরক্ষণে যে struggle পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব [গুণ] বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেই struggle চলেছে।"[৬]

তবে কি মানুষের উত্তরণের এই সংগ্রামকে শুধু দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এই ভেবে ক্ষান্ত হতে হবে যে, এটি মানবসভ্যতার এক চিরকালীন সমস্যা! যখন এই সমস্যার সমাধান হবে তখন মানবসভ্যতার বিবর্তনেরও প্রয়োজন ফুরাবে, অতএব তার পরিবর্তনের চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই? হৃদয়বান বিবেকানন্দ ধর্মকে কখনোই নির্মম দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও জীবনপ্রদ। সভ্যতার পরতে পরতে ক্রমবিবর্তনের প্রতি স্তরে ধর্মের প্রয়োজন আছে এবং ধর্ম সেই দাবি মেটাতে সক্ষম। তদানীন্তন ভারতবর্ষে ধর্মকে যে আচারের মরুবালুরাশি গ্রাস করেছিল, তাকে সরিয়ে ধর্মকে স্বমহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন স্বদেশের জাতীয় জীবনে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে নতুন লোকাচার ও দেশাচারের প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। স্মৃতির অনুশাসন থেকে ধর্মকে মুক্ত করে শ্রুতির বন্দনাগান গেয়েছেন বিবেকানন্দ। তবে সমাজদেহে ব্রাহ্মণত্বের প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো শূদ্রজাগরণ। কারণ, শূদ্রজাগরণের ফলেই সমাজের নিপীড়িত মানুষ নিজেদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে। ভারতে শূদ্রজাগরণের দিন আসছে—একথা তিনি বারেবারে বলেছেন। তথাকথিত ভদ্রশ্রেণি যদি স্বেচ্ছায় এই মহাশক্তিকে জাগ্রত করার কথা ভাবে, তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক; নইলে এই শক্তি নিজেই নিজের পথ করে নেবে। আবার একটি-দুটি শূদ্রের অবস্থার উন্নয়ন যে শূদ্রজাতির উন্নয়নের পথ সূচিত করে না, তাও বিবেকানন্দ জানতেন। সেইজন্য তিনি প্রশ্ন করেছেন: "বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম, জাবাল, ধীবরপুত্র ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা ও বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল। তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর ও সারথিকুলের কি লাভ হইল?"[৭]

লক্ষ্য যেখানে স্থির, সেখানে উপায়ের কথা আলোচিত হতে পারে। এপ্রসঙ্গে অত্যুৎসাহী মাত্র কয়েকজন সংস্কারপন্থী এই আন্দোলনে সামিল হোক—এটা বিবেকানন্দ চাননি। তিনি সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত সমাজসংস্কার বা আইনের দ্বারা সংস্কার—উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের জন্য যে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় এবং তার প্রস্তুতিপর্বটি যে বিরাট, তাও তিনি জানতেন। তাঁর মতে—"নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর প্রবল জনমত গঠিত হইতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কার সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের নিকটই কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনো বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তো অত্যাচার; ইহার মতো প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় দোষযুক্ত হইলেই সেগুলি সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়েচড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনা-আপনি আসিবে।"[৮]

ভাবলে বিস্ময়বোধ হয়, বিবেকানন্দের সমাজসংস্কার ভাবনা কত আধুনিক ছিল! ব্যক্তিকে তিনি কখনোই সমষ্টির সঙ্গে একাসনে বসাতে চাননি তাঁর সমাজসংস্কার কর্মসূচীতে—সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যতই প্রবল হোক না কেন। যে-আন্দোলনের গণভিত্তি থাকে না, সে-আন্দোলন যতই প্রবল ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে চলুক না কেন, কিছুদিন পরেই তা দিশা হারিয়ে ফেলে। একমাত্র গণসমর্থনই তাকে দুর্বার গতি দিতে সমর্থ হয়। আর এই গণসমর্থন তৈরি হয় চেতনার প্রসারে, শিক্ষার বিস্তারে। আধুনিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতি (Developmental Economics) বিষয়ক ভাবনার অন্যতম মূল প্রবক্তা নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন চেতনার প্রসারে শিক্ষার ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন চিন ও কেরালার শিক্ষা ও মানব-উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)-এর তুলনামূলক আলোচনায়। ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালা গণশিক্ষাকে অবলম্বন করে পরিবারকল্যাণ কর্মসূচীতে ও শিশুমৃত্যুরোধে সারা পৃথিবীর সামনে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, চিন তার রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় হস্তক্ষেপেও সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। এমনকি মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিতেও সামাজিক উন্নয়ন তত পরিলক্ষিত হয় না—যতটা শিক্ষার প্রসারে সম্ভব হয়। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে কেরালা ভারতের অনেক অঙ্গরাজ্যের নিচে অবস্থিত, কিন্তু মানব-উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠিতে সে ঐ রাজ্যগুলিকে তো বটেই, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। গণশিক্ষাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কেরালা আজ উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিঙ্‌নির্দেশ করছে। পৃথিবীর নানা দেশে উন্নয়নমুখী আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে শিক্ষার গুরুত্বকে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবহারিক সাক্ষরতায় (functional literacy) সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আশ্চর্য ফল জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিবেকানন্দের সমাজসংস্কার ভাবনায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এইজন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উন্নয়নের ভাবনা নিজেকেই ভাবতে হবে। একজন সংস্কারক তাকে সাহায্য করতে পারে মাত্র, সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত করতে পারে না। কারণ—"উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা।... তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে।"[৯] আধুনিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে এই মতবাদের গুরুত্ব স্বীকার করে বলা হচ্ছে—উন্নয়ন কর্মসূচী যাঁরা রূপায়ণ করতে বা পরিকল্পনা করতে সাহায্য করছেন তাঁদের ভূমিকা কিছুটা পরোক্ষ, আর যাঁদের জন্য পরিকল্পনা তাঁদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপায়ণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

বিবেকানন্দ এই সংস্কারপ্রয়াসীদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় দেখে সন্তুষ্ট থাকেননি—তাদের সেবকের ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন। তাঁর গুরুর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রতে তাদের আহ্বান করে তিনি বলেছেন: "নিজেদের খুব বড় কিছু ভাবিও না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে এইটুকু কর।... কাহারও কল্যাণ করিতে পার—এধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেইভাবে অপরের কল্যাণসাধন করিতে পার।... অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া যাও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরো অধিক আলোক লইয়া যাও। কারণ, আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল।"[১০]

ব্যাপক গণশিক্ষা যে চেতনার সঞ্চার করে, তার হাত ধরে আসে উত্তরণ। কিন্তু উত্তরণ জড়বাদী সমাজবাদ (Materialistic Socialism) অথবা বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত আধ্যাত্মিক সমাজবাদে (Spiritual Socialism) হতে পারে। আধ্যাত্মিক সমাজবাদে শ্রেণিবিদ্বেষের অবসান ঘটে কিভাবে? শ্রেণিভেদের অবসান ঘটালে কি জাতিবিভাগও থাকবে না? অথবা বৈদান্তিক ধর্মচিন্তা কি সমাজের উচ্চবর্ণের উচ্চবর্গীয় সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে? তাদের কি হবে, যারা নিজেদের সম্বন্ধে বলে: "কোল কুর্মি কোড়া/ বেদ শাস্ত্র ছাড়া"? অধ্যাত্মবাদের ওপর ভিত্তি করে যে-সাম্যবাদ আসবে তা স্পর্শ করবে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ উপরি উক্ত এই দুটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন: "উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত, ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি সামান্য কর্মও অদ্ভুত ফল দিয়া থাকে; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে।... এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র। আর ইহার ফল হইবে এই যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক

জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না।... আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না।”[১১] অর্থাৎ জাতিবিভাগ থেকে গেলেও একে আশ্রয় করে যে অধিকার তারতম্য আমরা বর্তমান সমাজে প্রত্যক্ষ করি তা থাকবে না। সমাজের প্রয়োজনে বৃত্তিবিভাগ থাকতে পারে, কিন্তু অধিকার তারতম্য না থাকায় শ্রেণিবিদ্বেষ থাকবে না। আর এই ভাবনার মূল আশ্রয় অদ্বৈততত্ত্বে।

বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের ওপর জোর দিতেন খুব বেশি। প্রতিটি মানুষকে তার সবলতার দিক দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইতেন। এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গুরুর অবদান। এই প্রসঙ্গে তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেনঃ “This habit of seeing every people from their strongest aspect.... It must have been the training under Ramakrishna Paramahamsa.”[১২] একইভাবে ধর্মকেও তিনি দেখেছিলেন এক উদার রূপে। ধর্ম তাঁর কাছে সম্প্রসারণের বার্তা নিয়ে আসত, সঙ্কীর্ণতার নয়। ধর্মভিত্তিক সমাজচেতনাও বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অপেক্ষা শুধু সেই স্বপ্নের রূপায়ণের। ❑

তথ্যসূচী

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৪৩
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ৩৯
৩ ঐ, পৃঃ ৬৩
৪ আর্য অনার্যঃ সাংস্কৃতিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড
৫ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, ৬৭
৬ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬
৭ স্বামীজী ও শূদ্ররাজ—বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 'দর্পণে মুক্তমন' শারদ সংখ্যা, ১৪১০, পৃঃ ২৯
৮ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০
৯ ঐ, পৃঃ ১০৬
১০ ঐ, পৃঃ ১০৭
১১ ঐ, পৃঃ ১০৫-১০৬
১২ The Master As I Saw Him—Sister Nivedita, 1972, p. 228

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বিরজানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সবুজ পাতা

বাঙালির প্রাণের পুজো

চারিদিকে আলোর খেলা
বইছে হাওয়া, মানুষ মেলা,
মায়ের আশিস ধূপে আসে
ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
প্রদীপ হাতে পুরুত নাচে,
ঢাকের বাদ্যি তালে তালে
ধুনুচি তুলে খোকন দোলে,
তোটনসোনা বায়না ভুলে
মায়ের কোলে শান্ত ছেলে,
বাতের ব্যথা সহ্য করে
অভির পিসি করজোড়ে,
হাঁপের টানে বঙ্কুবাবুর
বিনিদ্র রাত তেমনি দুপুর
তবুও তিনি মণ্ডপেতে
মায়ের স্নেহের পরশ পেতে,
সবাই কেমন ঠায় দাঁড়িয়ে
একদৃষ্টে দেখে চেয়ে
স্মিত হাসি মায়ের মুখে
চিন্ময়ী রূপ উঠছে জেগে,
ধনী-গরিব নির্বিশেষে
সবাই বদ্ধ মায়ের স্নেহে।
দিন কেটে রাত, রাত কেটে দিন
দশমীতে আনন্দ ক্ষীণ
বিসর্জনের বাজনা বাজে
মন খারাপের বাজনা সে যে।

ছড়া : অনির্বাণ কর ● ছবি : গৌরীশ মিত্র



দেবী সারদা

শ্রীশ্রীমায়ের সাধারণ গ্রাম্য ব্যবহার কখনো তাঁর দেবীরূপকে প্রকট হতে দেয়নি। রূপ ঢেকে, স্বরূপ ঢেকে অতি সাবধানে তিনি নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন। তাঁর জন্মকালে কিছু কিছু দিব্যদর্শন দিদিমার (শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী) হয়েছিল। কিন্তু আদ্যাশক্তি মহামায়ার অদ্ভুত মহিমায় তা আবার সকলে ভুলেও গিয়েছিল। লীলাময়ী মা তাঁর ভক্তদের নিয়ে লীলা করতেন। হঠাৎ কখনো কখনো নিজের দেবীরূপ প্রকাশ করতেন আর পরক্ষণেই তা ভুলিয়ে দিতেন। ভক্তদের কেউ কেউ তাঁকে দেবী জগদ্ধাত্রী, বগলা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, শীতলা, গঙ্গা, রাধা ও সীতা-রূপে দর্শন করেছিলেন। সেসব ঘটনার কয়েকটি এখানে বলা হবে।

বাঁকুড়া মঠের কাছে ভাড়াবাড়িতে মা আছেন রাধুর চিকিৎসার জন্য। স্বামী হরিপ্রেমানন্দ একদিন সন্ধ্যায় মায়ের চরণে হাত বোলাচ্ছেন। প্রদীপের আলোয় শীর্ণ দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে।





হঠাৎ—



দেবী বগলার ধ্যানমন্ত্রে বর্ণনা আছে, তিনি দুষ্ট ব্যক্তির জিহ্বা টেনে বের করে তাকে প্রহার করছেন (না কৃপা করছেন?)। একবার কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্ত হরিশ এসেছে। মা তখন কামারপুকুরেই আছেন। হরিশের স্ত্রী ঝগড়াঝাঁটি করে তার মনকে খেপিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাকে বলত 'খ্যাপা হরিশ'। একদিন—

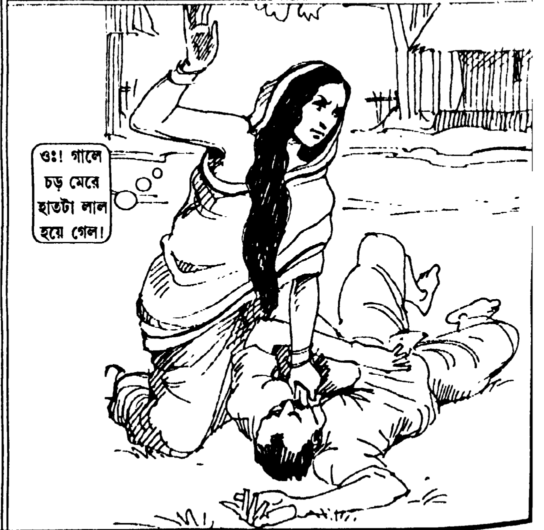


কিছুক্ষণ পরে—



হরিশ মাকে তাড়া করে। মা ভয়ে ছুটতে থাকেন। শেষে ঠাকুরের জন্মস্থানের কাছে ধানের গোলার চারধারে দুজনেই ঘুরপাক খেতে লাগলেন।





অন্য একদিন—

শিবরাম রামলালদাদার ভাই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের ভাসুরপো। শিবরাম ওরফে শিবুর দৃঢ়ধারণা, তার ভিক্ষামাতা শ্রীশ্রীমা-ই কালী। একদিন কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটীর পথে—









• চিত্ররূপ ঃ সৌরীশ মিত্র •

শারদ অর্ঘ্য

অসুর নেই, সিংহ নেই, মা দুর্গার চার হাত

প্রণবেশ

একসময় ছিল ভয়ঙ্কর দুর্গম অঞ্চল। এখন আর ততটা দুর্গম নয় ঠিকই, তবে বাস্তব অর্থে সুগমও নয়। যাতায়াত করাটা এখনো রীতিমতো কষ্টসাধ্য। বর্ধমান-বাঁকুড়া সংলগ্ন অঞ্চলের প্রধান ভরসা 'বড় দুঃখের রেল'—বি. ডি. আর—সেই ছোট রেল। রেলগাড়ি ঝমাঝম করে এল তো এল, না এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই!

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার পূর্বপ্রান্তে বর্ধমানের লাগোয়া দক্ষিণ দামোদরের ১২ মাইল ভিতরে আকুই গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের বিরাট পঞ্চরত্ন মন্দিরটির সামনে দাঁড়ালে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আশ্চর্য সুন্দর এই ইঁটের মন্দিরটি মহাকালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে আজও স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কানুরাম রায়। দেবালয়ের সামনের দেওয়াল ও থামে অসংখ্য টেরাকোটার অলঙ্করণ বাংলার অভাবনীয় শিল্প-সুষমাকে আজও ধারণ করে রেখেছে। টেরাকোটার কাজে জীবন্ত হয়ে আছে গৌরাঙ্গলীলা, রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, শিবদুর্গার ইতিবৃত্ত, জগন্নাথ-সুভদ্রার কাহিনী প্রভৃতি। যুগের পর যুগ এগুলিই হয়ে উঠেছে লোকশিক্ষার বাহন। এই বিপুল শিল্পসম্ভারের মধ্যে ফুটে উঠেছে যে অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পচেতনা, তার তুলনা মেলা ভার।


অলঙ্করণ: সৌরীশ মিত্র

এখানে বারো মাসে তেরো উৎসব। উৎসব মানেই জনসমাগম। আর জনসমাগম বা ভক্তসমাগম মানেই মেলা। রাধাষ্টমী ও জন্মাষ্টমীতে এখানে যেমন বিপুল জনসমাগম হয়, তেমনি পৌষ সংক্রান্তি, রাস এবং দোলযাত্রার পুণ্যলগ্নেও এখানে জমে ওঠে মেলা। মেলা মানেই মিলন। ভক্তের সঙ্গে যেমন ভগবানের মিলন, তেমনি ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার মিলনও। তবে এখানকার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় দুর্গাপূজার সময়।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা কানুরাম রায় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর পুত্ররা হঠাৎই একবার শারদীয়া দুর্গাপূজা করার আবদার জানালেন। কানুরাম ভাবলেন, তা কি করে সম্ভব? তিনি বৈষ্ণব, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব। এখানে কি করে শক্তিপূজা হবে? পুত্রদের আবদারকেও তিনি ফেরাতে পারলেন না। তখন তিনি গোস্বামীদের মত ও অনুমতি চাইলেন। জানতে চাইলেন, বৈষ্ণব-ধর্মে শক্তিপূজা করার কোন পথ বা নজির আছে কিনা এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ যে-মূলমন্দিরে আছেন, তার বাইরে অবস্থিত চণ্ডী-মণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা আনা বিধেয় কিনা—ইত্যাদি। শোনা যায়, সমস্ত দিক বিবেচনা করে শ্রীজীব গোস্বামীর পাটের গোস্বামীরা শারদীয়া দুর্গোৎসব করার অনুমতি তাঁকে দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা কতকগুলি স্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

এই অনুমতি পাওয়ার পরই ১৭৬৫ সালে এখানে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াইশো বছর হতে চলল, সেই ট্র্যাডিশন আজও একইভাবে চলে আসছে। এই গ্রামে এই একটিমাত্র প্রতিমা, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মের ওপর। তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক থাকেন ঠিকই, কিন্তু থাকে না অসুর, সিংহ এবং মহিষ। থাকে না দেবীর দশ হাত। এখানকার দেবী দুর্গা দশভুজা নন, চতুর্ভুজা। তিনি দশপ্রহরণধারিণী নন, তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শারঙ্গ। তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে বলা হয়: "প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণী নমোঽস্তুতে।" এখানে দেবী বৈষ্ণবীরূপ ধারণ করেছেন।

* প্রখ্যাত সাংবাদিক, সুলেখক।

গ্রামেরই প্রবীণ ব্যক্তি অমূল্যরতন রায় জানিয়েছেন, এখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ থাকায় দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা আনা গুরুর নিষেধ। সেই কারণেই বৃন্দাবনের চতুর্ভুজা কাত্যায়নী দুর্গাপ্রতিমা আনা হয়। এখানে সবরকম বলি নিষিদ্ধ। পাঁঠাবলি তো দূরের কথা, কুমড়োবলিও হয় না।

এখানকার দুর্গাপূজা পদ্ধতিও কিছুটা আলাদা। এটি গোস্বামীরাই প্রণয়ন করেছেন। সন্ধিপূজার শেষে ধ্যানের সময় একশো আটটি তুলসীপাতার মালা হাতে নিয়ে পুরোহিত উচ্চারণ করতে থাকেন অসুরবধের সময় সেই চামুণ্ডার রূপবর্ণনা—"দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতি-ভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্না..." ইত্যাদি। ঐসময় মাঝখানে একটা পথ রেখে দেবীর মুখোমুখি নিঃশব্দে জোড়হাতে একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে মহিলা ভক্তরা দাঁড়িয়ে থাকেন। সকলেই দেবীর কৃপাপ্রার্থী।

ধ্যানের সময় উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনা অনুসারে অসুরবধ হওয়ার পরই ঐ ১০৮ তুলসীপাতার মালা দেবী দুর্গার হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। ধ্যানের পরমুহূর্তে হরিধ্বনি সহকারে শুরু হয়ে যায় বাদ্য বাজানো। আরতির পর দেবী ও নবগ্রহের হোম হয়। হোমের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ খোল ও করতাল নিয়ে গান শুরু করেন ঃ "বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে ও কিশোরী।" গান গাইতে গাইতে তাঁরা নাচতে থাকেন। তারপর অষ্টমীব্রতধারী ভক্তরা দেবী দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আছে, প্রবল প্রতাপান্বিত মহিষাসুরের আক্রমণে ও অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বিষ্ণু ও শিবের কাছে অসুরবধের প্রার্থনা জানাতে থাকেন। বিষ্ণু ও শিব ঐসময় মহিষাসুরের ওপর কুপিত হলে তাঁদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হয় এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য দেবতাদেরও তেজ নির্গত হতে থাকে। দেবতাদের সেই তেজসমষ্টি থেকেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব। তখন দেবতারা দেবী দুর্গাকে প্রণাম জানিয়ে স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁকে তৃপ্ত করতে থাকেন। কারণ তাঁরা জানতেন, এই দেবী মহামায়াই অসুরকে নিধন করতে সক্ষম। তাঁদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন।

অন্য একসময় যুদ্ধে দেবী অসুরাধিপতি শুম্ভকে বধ করলে দেবতারা দেবীকে স্তব করতে থাকেন। বলেন ঃ "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।/ সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

এখানে একটি ব্যাখ্যা স্মরণ করা যেতে পারে। মা দুর্গা আদিতে বৈষ্ণবী শক্তিসম্ভূতা—সেকারণে চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গধারিণী। কেবল মহিষাসুরকে বধ করার জন্যই ক্রোধোন্মত্তা হয়ে দেবী দশ বাহু প্রসারিত করে দশ প্রহরণ ধারণপূর্বক মহিষাসুরকে নিধন করেন।

মহাষ্টমী তিথির শেষ দণ্ডে নবমী তিথির আদিমুহূর্তে এই নিধনকার্য সম্পন্ন হয়। হয় পাপের বিনাশ, অশুভ শক্তির পরাজয়। অসুরনিধনের এই মুহূর্তে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য মা দুর্গার কাছে বহু স্থানে নানাপ্রকারের বলি পূজার অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত আছে।

কথিত আছে, অসুরনিধনের পরেও ক্রোধোন্মত্তা দেবীর পদভারে ব্রহ্মাণ্ড টলমল করতে থাকে। এতে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তবে কি সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে? দেবতারা দেবীকে শান্ত ও প্রসন্ন করার জন্য স্তবস্তুতি করতে থাকেন। কিন্তু তাতেও মহামায়ার ক্রোধ প্রশমিত না হলে নিরুপায় দেবতারা বিষ্ণুর পদাশ্রিত ব্রজগোপিনীদের শরণাপন্ন হন। গোপিনীরা বিষ্ণুশক্তিসম্ভূতা চামুণ্ডারূপিণী দুর্গার কানে হরিধ্বনি করে তাঁর হাতে তুলসীমালা পরিয়ে দেন। তুলসীর সংস্পর্শে চামুণ্ডা প্রকৃতিস্থ হয়ে চতুর্ভুজা বৈষ্ণবী দুর্গামূর্তি ধারণ করেন।

সম্ভবত এই কারণেই ঐদিন 'বৃন্দাবন বিলাসিনী' কীর্তন করার প্রচলন আছে। গ্রামপ্রধান অমূল্যরতন রায় বলেছিলেন, মহাপ্রভু যে প্রেম-ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্মের প্রচারক বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী-কৃত এই ভাষ্য যে কলির জীবগণকে কত ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস, তা বর্তমানে আর কেউ চিন্তাভাবনা করেন না বা করতে পারেন না। বৈষ্ণবদর্শন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অপূর্ব অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক তুলে ধরেছিল। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকে বাঁশিতে এবং চামুণ্ডারূপিণী মা দুর্গাকে বৈষ্ণবীরূপে রূপান্তরিত করেছিল এই দর্শন। প্রকৃতপক্ষে ভয়মিশ্রিত ভক্তিকে পরিণত করেছিল প্রেম ভক্তিতে। মহাপ্রভুর সেই প্রেমধর্ম থেকে আজ আমরা বিচ্যুত বলেই আমাদের যাকিছু সঙ্কট ও বিপদ।

বাঁকুড়া জেলার আকুই গ্রামে বৈষ্ণবধর্মের একটা অবিরাম স্রোত দীর্ঘকাল ধরেই প্রবাহিত। সেটা ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ সালের মধ্যবর্তী সময়। সেসময় এই দুর্গম গ্রামে যাতায়াতের কোন পথঘাট বা যানবাহন ছিল না। ইঁট দিয়ে মন্দির তৈরি করতে হলে যেসমস্ত উপাদান প্রয়োজন, তার কোনকিছুই এই গ্রামে পাওয়া যেত না। সেইসময় কানুরাম রায় বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে এবং অপার ভক্তিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সেসময় ইঁট তৈরি করাও এক কঠিন সমস্যা ছিল। কাঠের আগুনে ইঁট তৈরি করতে হতো। কানুরাম রায়



বৈপুলসংখ্যক সুদক্ষ কারিগর নিয়োগ করায় এই দুর্গম গ্রামে মন্দির তৈরির কাজ একটানা তিনবছর ধরে চলার পর মন্দিরটি তৈরি হয়।

মন্দিরটি উচ্চতায় ৩৫ ফুট এবং প্রস্থে ২২ ফুটের মতো। এই মন্দিরটির শিল্প-সম্পদ এবং কারিগরি দক্ষতা শুধু বাঁকুড়া জেলাতেই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেই এক বিরল দৃষ্টান্ত। পূর্বদিকের ত্রিখিলান ঢাকা বারান্দা অতিক্রম করে গর্ভগৃহের প্রধান প্রবেশদ্বার। উত্তরদিকেও আরেকটি প্রবেশপথ আছে। ঢাকা বারান্দার ছাদ উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দুটি চওড়া খিলান ও মধ্যবর্তী গম্বুজের ওপর বিন্যস্ত। গর্ভগৃহের ছাদও অনুরূপ দুটি খিলান ও মধ্যবর্তী গম্বুজের ওপর স্থাপিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে বলা হয়েছেঃ

"শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ।

অশীতিতম শকাব্দে শ্রীল শ্রীরাধাকান্তস্য শ্রীমন্দিরান্ত ইতি। শুভমস্তু শকাব্দা। ১৬৮৩ মাহামাস ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ। মহারাজা তিলকচন্দ্র রায়স্য অধিকার পরিবারক শ্রীকানুরাম দাস সাকিন আকুই তস্য জায়া শ্রীমতী চাঁপা দাসি শ্রীশ্রীচরণে অর্পণ করিলেন। কারিগর শ্রীঈশ্বরী সাকিন বল্যাড়া সংপূর্ণ শকাব্দা ১৬৮৬।"

আকুই গ্রামে বাস করতেন হরেকৃষ্ণ (দাস) রায়। তিনি জীব গোস্বামীর পাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই পুত্র কানুরাম রায় ১৬২০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেসময় এই বঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রমুখ ছয় গোস্বামীর প্রবল প্রভাব। এই ছয় গোস্বামীর প্রবর্তিত শ্রীধাম বৃন্দাবনের ভক্তিপ্লাবন ছিল অব্যাহত।

কানুরাম রায় বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের অধীনে পরিচারকের পদে কাজ করতেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দির থেকে শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, নাড়ুগোপাল এবং শ্রীরাধাদামোদরের (শালগ্রাম শিলা) মূর্তি নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই অনুসারে তিনি চলে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে দুজন গোস্বামী পায়ে হেঁটে ঐ বিগ্রহগুলি নিয়ে আসেন আকুই গ্রামে। তাঁদের সময় লেগেছিল ছয় মাস। আজকের দিনে বসে সেদিনের সেই কঠিন সাধনার কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কতখানি ভক্তি, আন্তরিকতা এবং ত্যাগ থাকলে তবেই ঝড়জল মাথায় নিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে ছয় মাস ধরে পায়ে হেঁটে পৌঁছানো যায় বৃন্দাবন থেকে আকুই গ্রামে, তা সহজেই অনুমেয়।

এই বিস্ময়কর মন্দির নির্মাণের প্রধান কারিগর ছিলেন ঈশ্বরী। গোস্বামীদের উপস্থিতিতে ও নির্দেশে কানুরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবসেবার জন্য তিনি তাঁর চার পুত্রকে সেবায়েত নিযুক্ত করেন। শুধু মন্দির নয়, বিগ্রহের স্নানের জন্য 'রাধাকুণ্ড' নামে একটি জলাশয়ও খনন করা হয়।

এখনো প্রতিদিন সকালে সাড়ে তিন সের আতপচাল ও আনুষঙ্গিক এবং সন্ধ্যায় আনুষঙ্গিক-সহ আড়াই সের মুড়কি, আধ সের শীতলী দেওয়া হয়। ইদানীং আর সের নেই, সবই কিলোগ্রামে ওজন হয়। তবে অনুপাত বজায় আছে।

কানুরামের মধ্যম ও তৃতীয় পুত্রের বংশ লোপ পায়। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধর অমূল্যরতন রায় তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বহু অর্থব্যয় করে মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন।

শোনা যায়, বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ যখন শোনেন যে, কানুরাম রায় তাঁর স্বগ্রামে এরকম একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন তিনি স্বয়ং সেই মন্দির দর্শন করতে বর্ধমান থেকে হাতির পিঠে চেপে আকুই গ্রামে আসেন। তিনি মন্দির এবং মন্দিরের বিগ্রহ দর্শনে খুবই আনন্দিত হন এবং মন্দিরের ব্যয়বহনের জন্য বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার আদ্রাজোল ও লক্ষ্মীজোল নামে দুটি মৌজা প্রদান করেন। কানুরাম রায় মহারাজার এই দান তুলে দেন শ্রীজীব গোস্বামীর পাটে। মন্দিরের রাসভিটার পাশে দুজন গোস্বামীর সমাধি এখনো বর্তমান। কানুরামের মরদেহও রাধাকুণ্ডের তীরে সমাধিস্থ হয়।

আকুই গ্রামে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে সারাবছর ধরেই চলে মেলা, পার্বণ এবং উৎসব। চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান প্রবাহটি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য এবং বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মল্লরাজ্যের সর্বত্র তা প্রচারিত হয়েছিল। তবে কেউ কেউ বলেন, তাঁরও আগে শ্রীজীব গোস্বামীর আত্মীয় মথুরেশ সার্বভৌম এখানে এসে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

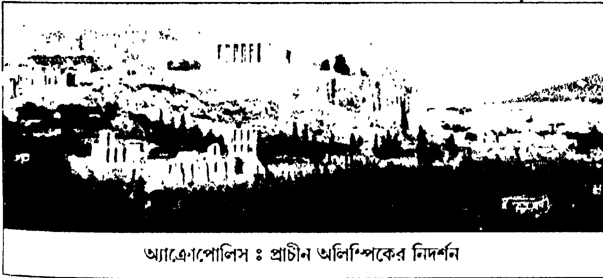
বাঁকুড়া জেলার ধর্ম-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই অঞ্চলে তিনটি তরঙ্গে রাধাকৃষ্ণ উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে এই ভাবটি প্রথম প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতকে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি ধারা প্রবাহিত হয়। আর ঊনবিংশ শতকে সেই ধারাটি আবার নতুন গতি ফিরে পায়। অষ্টাদশ শতকে কানুরাম রায় বৈষ্ণব-মন্দির এবং বৈষ্ণব-মতে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করে সেই মূল ধারাকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন।

মেলা, মন্দির, উৎসব এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাঁকুড়া। এই জেলারই একপ্রান্তে অবস্থিত আকুই গ্রামটি জেলার মূল ধারার সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে গ্রথিত। ❑

কালজয়ী অলিম্পিয়াড সভ্যতার দিগ্‌দর্শিকা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*

'সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফরটিয়াস'—অলিম্পিকের এই বীজমন্ত্র যত দিন যাচ্ছে ততই আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে মানবজীবনে। বিশেষ করে এবারের অলিম্পিয়াড তার জন্মভূমিতে প্রবিষ্ট হয়ে উত্তর আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। অলিম্পিয়ার অদূরে এথেন্সে অনুষ্ঠিত 'গ্রেটেস্ট শো অ্যাণ্ড ফেস্টিভ্যাল অন ইউনিভার্স' অর্থাৎ বিশ্ব অলিম্পিকের রাজসূয় যজ্ঞের রেশ এখনো প্রতি পলে অনুভূত হচ্ছে মানবজীবনে। বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশের সমস্ত শ্রেণির মানুষের দেহ-মন-আত্মার সুর-তাল-লয়ের যোগবলয় তৈরি হয় এই অলিম্পিককে কেন্দ্র করে। সব ধর্ম, বর্ণ, রুচি, কৃষ্টি, ভাষাভাষীর মানুষের চিন্তা-চেতনার, মেধা-মনীষার তথা শারীরিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের প্রতিফলন দেখা যায় অলিম্পিকে। ইতিহাসাতীত কাল থেকে এই অলিম্পিক আন্দোলন, যা 'অলিম্পিজম' হিসাবে অভিহিত, তা যেন মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হয়ে আছে।



অ্যাক্রোপোলিস ঃ প্রাচীন অলিম্পিকের নিদর্শন

১৯৬০ সালে রোমে আধুনিক অলিম্পিকের চতুর্দশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে ইতালির রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক গিওভানি গ্রঁসি উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে রচিত এক ভাষণে বলেন ঃ "বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যোগদানকারী মানব-মানবী অলিম্পিকের প্রজ্বলিত পূতাগ্নিকে সাক্ষী রেখে শুধু যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন তাই নয়, আগামী দিনের জন্য এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। স্বাধীনতা, সাম্য, প্রেম ও ন্যায়বিচার হবে ঐ সমৃদ্ধির মাপকাঠি।" প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইউরোপের এক সুসভ্য রাষ্ট্র ইতালির রাজধানী রোম থেকে উচ্চারিত এই ভাষণ সমাজমানসকে যে কী পরিমাণ প্রভাবিত করেছে, তার প্রমাণ অলিম্পিকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও এবারের অলিম্পিকে রেকর্ডসংখ্যক দুই শতাধিক রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ।



প্রথম অলিম্পিকের পদক

অলিম্পিকের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। প্রাচীন গ্রিস, যার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনে পুষ্ট হয়েছে মানব-সভ্যতা—সেই গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে শুরু হয়েছিল অলিম্পিক। চলেছিল ১,১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। আবার আরেকটি সূত্র বলছে, কিংবদন্তি হারকিউলিস নাকি অলিম্পিয়াডের সূচনা করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ১২৫৩ অব্দে। তবে অলিম্পিকের সৃষ্টি নিয়ে যতই ইতিহাসের চাপান-উতোর থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—প্রাচীন অলিম্পিয়ায় জন্ম নেওয়া এই অলিম্পিক মানবসভ্যতাকে দিয়েছে চির শাশ্বত আলোকদর্শিকা। প্রথমে গ্রিস, পরে পেলোপোনেসিয়ান, হেলেনিক, প্যান হেলেনিক এবং শেষপর্যন্ত রোমান সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে প্রতি চারবছর অন্তর এক-একটি অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সম্পর্কে শুধু যে নতুন নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, 'সভ্যতা' শব্দের যে-ব্যঞ্জনা আমাদের আধুনিক মননে গাঁথা হয়ে গেছে, তার গোড়াপত্তনও করেছে।

প্রাচীন অলিম্পিয়া, যা গ্রিক দেবদেবীদের আবাসস্থল অলিম্পাস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত—সেখানেই প্রতি চারবছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো অলিম্পিয়াডের যাবতীয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ। তারপর গ্রিকসাম্রাজ্য রোমানদের হস্তগত হলেও অলিম্পিক অনুষ্ঠানে কোন ছেদ পড়েনি। শেষপর্যন্ত ৩৯৩ সালে রোমসম্রাট থিওডেসিয়াস এক বিশেষ ডিক্রি জারি করে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। তারপর একদিন গ্রিস ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। লুপ্ত হয়ে যায় অলিম্পিয়াড। দীর্ঘ বারো শতাব্দীর পর ফরাসি, জার্মান, ডাচ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা অলিম্পিকের গৌরবগাথা ও তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসকে খুঁজে বের করলেন

* তরুণ ক্রীড়া-সাংবাদিক।

অলিম্পিয়া থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের বৌদ্ধিক সমাজ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক মহল উদ্যোগী হন মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ও সৃষ্টি অলিম্পিকের পুনর্জীবনে। ঐতিহাসিকদের আগ্রহ এবং পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাটির তলা থেকে উঠে আসে মানবসভ্যতার ইতিহাসের, প্রগতির ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়।


কুর্বাতিন : আধুনিক অলিম্পিকের জনক

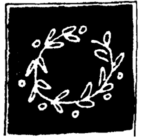
মার্বেল পাথরের তৈরি অলিম্পিয়া নগরী, ব্রোঞ্জ ও মার্বেলে ক্রীড়াবিদদের অনবদ্য মূর্তি, স্মারক, স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, মন্দির বাস্তবিক আধুনিক পৃথিবীর মানুষের কল্পনার অতীত। অলিম্পিয়া খুঁজে পাওয়ার পাঁচ দশক পর ফরাসি দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তিন আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করলেন ১৮৯৬ সালের ২৫ মার্চ গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে। তার পরের ইতিহাস মানুষের আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাস। কিন্তু যে-ইতিহাস একদিন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত হলো নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে। প্রাচীন গ্রিসের চারণকবি পিণ্ডার আমাদের জন্য রেখে গেছেন খেলাধূলা, শরীরচর্চা নিয়ে রচিত সব লোকগাথা। খেলা নিয়ে আঁকা ব্যাসিলাইডিসের চিত্রমালার উদ্ধার সম্ভব হয়েছে প্যাপিরি লোকগাথার মর্মোদ্ধার করে। পিণ্ডার রচিত প্যাপিরির লোকগাথা না হলে প্রাচীনকালের ঐ বীরেরা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যেতেন।

প্রাচীন গ্রিসের সমস্ত শিল্প-ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে সেদিনের সব প্রখ্যাত বিজয়ীদের কেন্দ্র করে। মাইরন, ফিডিয়াস এবং পলিক্লেটাসের সৃষ্ট সব ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে আমরা সেই চিরন্তন জীবনজয়ী মানুষকেই খুঁজে পাই। আর রোমান সাম্রাজ্য যেমন একদিন গ্রিক সাম্রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, ঠিক সেভাবে রোমান সভ্যতা ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে মানুষের চিন্তার দিগন্তও বিস্তার করেছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট বিরাট বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটার, কলোসিয়াম ও স্টেডিয়ামের গঠন শুধু একান্তই 'গ্রেকো-রোমানিক' নয়, তার স্থাপত্যশৈলী ও বৈচিত্র্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের সৃজনধর্মী নান্দনিকতার প্রেরণাস্বরূপ। রোমের স্নানাগার থেকেই তৈরি হয়েছে আজকের অত্যাধুনিক সুইমিং পুল। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত সারি সারি ক্রীড়াপ্রাসাদ আজও কল্পনাপ্রবণ, চিন্তাশীল মানুষের মানস-সৃজনের ভিত্তি। কালের গতি, ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নানাবিধ আগ্রাসী প্রকোপে পড়েও সেসব সৃষ্টি আজও মানুষকে অবাক করে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে জীবন্ত বিস্ময় হয়ে।

৩৯৪ সাল পর্যন্ত রোম ছিল বিশ্বের খেলাধূলার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সেইসময়কার ভ্রমণকারী ও কবিরা খেলাধূলার বিষয়ে নানারকম বর্ণনা রেখে গেছেন। কিন্তু এর মধ্যে সার্কাস ম্যাক্সিমাস স্টেডিয়ামের বর্ণনা এবং একটি প্রাচীন ছবি পাওয়া গিয়েছে, যা আধুনিক মানুষের সব কল্পনাকে পর্যন্ত হার মানাতে পারে। বলা হয়েছে, প্রায় চার লক্ষ দর্শক বসতে পারে—এমন গঠনশৈলী নিয়েই সার্কাস ম্যাক্সিমাস তৈরি হয়েছিল। প্রায় ছোটখাট একটি শহরের আকারে তৈরি সার্কাস ম্যাক্সিমাস রাজধানী রোমের কেন্দ্রস্থলে ছিল। বিরাট এই স্টেডিয়ামে একই সঙ্গে একশোটি রথের দৌড় হতো। সারাদিন ধরে চলত নানারকম প্রতিযোগিতা। দেশ-বিদেশ থেকে যেমন প্রতিযোগীরা আসত, দর্শকরাও আসত সেভাবে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহলমুখর স্টেডিয়ামের অঙ্গন। ধ্বংস হয়ে গেল বিশ্ববিশ্রুত স্টেডিয়াম, যা লোকগাথায় আজও অমর।

রোমের নমাশি সভ্যতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই অ্যাম্ফিথিয়েটারের কথা না বললে কিছুই বলা হয় না। প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট ডোমিশিয়ানের নির্দেশে টাইবার নদীর ধারে এই অ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি হয়। চারধারে দর্শকাসন, মধ্যস্থলে বিশাল এক জায়গায় নদী থেকে জল এনে বিরাট কৃত্রিম জলাশয় তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে নকল নৌযুদ্ধের মহড়া দেখত রোমের জনসাধারণ-সহ দেশের রাজপুরুষরা। অস্বীকার করার উপায় নেই, গ্রিক ও রোমক সভ্যতা একদিন যেসব ক্রীড়াঙ্গন তৈরি করে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রবাহ সৃষ্টি ও চালনা করেছিল, তার উত্তরসূরি আধুনিক পৃথিবী বা উত্তর আধুনিক সভ্যতা।

প্রাচীন অলিম্পিকের নানা ঘটনার নান্দনিক উৎকর্ষ-সমৃদ্ধ চিত্রাবলী এই উত্তর আধুনিক সভ্যতার শিল্পতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। এসমস্ত অ্যাম্ফিথিয়েটার-সহ প্রাচীন গ্রিসের পার্থেনন, অ্যাক্রোপলিসের চারদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন রঙের ফ্রেস্কো দেখে মনে হয় যেন সদ্য আঁকা হয়েছে! তাছাড়া রয়েছে মুর্‍্যালে অঙ্কিত রথের দৌড়, ডিসকাস ছোঁড়া, শরীরচর্চা ও অভিনয়, নৃত্যের সব দৃশ্য। এইসব চিত্ররীতি ইতালি ও টারকুইনিয়ন চিত্ররীতির যথার্থ প্রতিফলন দেয়। মল্লবীরদের যে-ছবি রয়েছে, তার সঙ্গে আজকের মল্লবীরদের শারীরিক কসরতের বেশ মিল পাওয়া যায়। মল্লবীরদের হাতে রয়েছে চামড়ার দস্তানা, মুখ ও চোখে ফুটে উঠেছে এক ভয়ঙ্কর শত্রুতার আভাস, যেন প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত!




এথেন্স-২০০৪ অলিম্পিকের লোগো

পাশে রথের দৌড় হচ্ছে বলে দুই যোদ্ধা একটু সরে দাঁড়িয়েছে।

অন্য ছবিতে সারথিরা ছোট রথে উপবিষ্ট। তাদের ঋজু ও বলিষ্ঠ দেহ। রথকে টেনে নিয়ে চলেছে একজোড়া ঘোড়া। একটি রথের চাকায় কিছু লেগে উলটে পড়েছে। ঘোড়া মাটিতে নিক্ষিপ্ত, তার ওপর সারথি। সামনে ও পিছনের সারথিরা ঐ দুর্ঘটনায় হতচকিত হয়ে রথ থামানোর চেষ্টা করছে। প্রত্যেকের হাতে চাবুক। একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকরা হাত তুলেছে দুর্ঘটনার সম্ভাবনায়। আজকের পত্রপত্রিকায় ফটোগ্রাফাররা যেমন এক-একটি মুহূর্তকে আগামী দিনের জন্য ছবির মধ্য দিয়ে ধরে রাখেন, প্রাচীনকালের চিত্রশিল্পীরাও তেমনি অনাগত প্রজন্মের জন্য এঁকে গেছেন এইসব অমর চিত্রগাথা। আরেকটি দেওয়ালে রয়েছে পাঁচজন দৌড়বীর। পাশে একজন ডিসকাস ছুঁড়ছে, অন্যজন লাফাচ্ছে। এইসব চিত্রমালাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেওয়ালসুদ্ধ টারকুইন মিউজিয়ামে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

গ্রিক ও রোমক সভ্যতায় লালিত মহাজাগতিক এই অলিম্পিয়াড একদিন বন্ধ হয়ে গেলেও মানুষ যা পেয়েছে, সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রমালা, পাথরে খোদাই শিল্পী ও অ্যাথলিটদের অনবদ্য মূর্তি এবং কলোসিয়াম, অ্যাম্ফিথিয়েটার-সহ নানা-বিধ সব স্থাপত্য ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে মানবজাতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে শিল্পবোধ, রুচি, সংস্কৃতি, সৃজনশীল এক সভ্যতা—যা জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে আরো 'অ্যাডভেঞ্চারাস' কিছু করে দেখাতে। জীবনের থেকে বড় কিছু করে দেখানোর প্রবণতা থেকেই আজকের বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে কল্পলোকের পথে। আর তার পিছনে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে প্রাচীন অলিম্পিক তথা সভ্যতার অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা।

ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তিনের নেতৃত্বে তৎকালীন ইউরোপের বিশিষ্ট বুধমণ্ডলী যার পুরোভাগে ছিলেন, তাঁর স্বদেশীয় ইক্যালট, আমেরিকার উইলিয়াম স্লোয়ান, রাশিয়ার জেনারেল দ্য বুটস্কি, ব্রিটেনের এস. সি. হার্বাট ও লর্ড অম্পটিল, গ্রিসের জর্জ অ্যাভেরফ-সহ প্রত্যেকেই একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে অলিম্পিকের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক আয়োজনের আগে যে-সনদ তৈরি করেছিল, তার চারটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়—(১) ক্রীড়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক ও দৈহিক উৎকর্ষের বৃদ্ধি, (২) ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা, (৩) সারা বিশ্বে অলিম্পিজম আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জীবনবোধ বা বিশ্বচেতনা গড়ে তোলা এবং (৪) প্রতি চারবছর অন্তর এই মহান উৎসবের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে একত্রিত করে মানবজগৎকে প্রকৃত সত্যাচরণে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

কুবার্তিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। অলিম্পিক আন্দোলন আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন অলিম্পিয়ায় সৌরশক্তির সাহায্যে প্রজ্বলিত অলিম্পিক মশাল গোটা বিশ্ব পরিক্রমা করে মূল অনুষ্ঠানকেন্দ্রে আসে। এর দ্বারা প্রমাণিত অলিম্পিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রকৃত রূপটি। আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের অলিম্পিক। অলিম্পিক তার উৎসমুখে ফিরে এল যেন যাবতীয় আবেগ, উদ্দীপনা ও বাস্তব তাৎপর্যকে সঙ্গী করে। নানা দেশে সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত ছিল এবারের এথেন্স অলিম্পিয়াড, যেখানে গোটা দুনিয়ার দুশোর বেশি রাষ্ট্রের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেই চিরন্তন সত্যটিই প্রতিফলিত।



এথেন্সের মূল অলিম্পিক স্টেডিয়াম

সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে কতই না 'ইজম'! ইতিহাসের তথা কালের পালাবদলে সেসব একে একে মুছে গেছে বা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। একমাত্র অনির্বাণ, অবিনশ্বর হয়ে বিরাজমান অলিম্পিকের মহিমা ও আদর্শ—যে-মহিমা ও দিগদর্শন গোটা বিশ্বের মানবসমাজকে টেনে এনেছে এবারের অলিম্পিকে। তাই তো গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'র রচয়িতা মহাকবি হোমার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ "দিনের বেলা আকাশে যেমন সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কোন তারা থাকে না, ঠিক তেমনি ক্রীড়া-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন কোন উৎসব নেই যা অলিম্পিকের চেয়ে বড়।" আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সেই কথার যাথার্থ্য দেখা গেছে সদ্যসমাপ্ত অলিম্পিকে।❑

ভারতীয় তির-ধনুক

দীপকুমার রায়*

ভারতবর্ষে সমরাস্ত্র-রূপে তির-ধনুকের আবির্ভাব ও ব্যবহার কবে থেকে শুরু তা ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা সমরবিদ্যা-বিশারদদের কাছে আজও অস্পষ্ট। পুরাণবেত্তাদের মতে, দেবতা ও অসুরদের সাগরমন্থনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে তির-ধনুকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। এই মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানা নেই। 'সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এ উল্লেখ আছে, দেবতাদের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং সাড়ে পাঁচ হাত (১ হাত = ২৪ আঙুল) দীর্ঘ 'হরধনু' নামক ধনুক ব্যবহার করতেন। এই পরিমাণ দীর্ঘ ধনুক 'দিব্যধনু' শ্রেণিভুক্ত। এর থেকে ছোট মাপের ধনুককে বলা হয় 'মানবধনু'। মহাদেবের 'হরধনু' ধারাবাহিকভাবে পরশুরাম, ভরদ্বাজ, দ্রোণাচার্য, অর্জুন ও সাত্যকির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে আক্রমণাত্মক অস্ত্ররূপে তির-ধনুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে হস্তচালিত আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যবহারের ফলে তির-ধনুক একক প্রধান আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ভূমিকা থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনরূপে চিহ্নিত। হুইলারের মতে, সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার খুবই অস্পষ্ট। এই স্থানে যেসব সূক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত তিরের ফলা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই ব্রোঞ্জ ও তামা-নির্মিত। এদের গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ যথাক্রমে ১.১৯ ইঞ্চি, ০.৬৪ ইঞ্চি এবং ০.০৭ ইঞ্চি। এখানে যদিও কোন ধনুকের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তবুও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, সেই যুগে ভারতে তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল না। হয়তো সেই যুগে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি পচনশীল বস্তু দ্বারা ধনুক নির্মিত হতো, যা কালের ধ্বংসলীলাকে উপেক্ষা করে নিজের অস্তিত্বরক্ষা করতে পারেনি।

জাতককাহিনী, বেদের স্তোত্র, মহাকাব্য, পৌরাণিক উপাখ্যান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও পরবর্তী যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাদিতে ভারতীয় তির-ধনুকের ব্যবহারের প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান।

বৈদিক যুগে তির-ধনুকই ছিল প্রধান সমরাস্ত্র। সমরবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই 'ধনুর্বেদ'-এ অন্তর্ভুক্ত। 'ধনুর্বেদ' একটি উপবেদরূপে গণ্য। সেই যুগে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, বৈশম্পায়ন, ভরদ্বাজ, দ্রোণাচার্য, বলরাম প্রমুখ স্বনামধন্য ঋষিগণ ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁদের শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল খুবই উচ্চ মানের। দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ—এই চার ভাগে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে ছাত্রদের ধনুর্বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হতো। ম্যাকডোনাল ও কিথ স্বীকার করেছেন, বৈদিক যুগে তির-ধনুকই ছিল প্রধান ও অন্যতম সমরাস্ত্র। 'ধনুর্বেদ' ও 'নীতিপ্রকাশিকা'তে তির-ধনুককে 'মুক্ত শ্রেণিভুক্ত অস্ত্র' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। 'সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এর ভাষ্যকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী কিন্তু তির-ধনুককে 'যন্ত্র-মুক্ত শ্রেণিভুক্ত' হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, তির হচ্ছে শস্ত্র আর ধনুক তির-নিক্ষেপের যন্ত্র বিশেষ। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ও জার্মান পণ্ডিত ডঃ গুস্তাফ অপার্টের মতে, ধনুকই অস্ত্র হিসাবে গণ্য। আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

ধনুক নির্মাণের জন্য প্রধান উপকরণ বাঁশ, বেত ও কাঠ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ'-এ উল্লেখ আছে, পবিত্রসলিলা গঙ্গা-বিধৌত দেশে শরৎকালে উৎপন্ন পরিপুষ্ট বাঁশ ধনুকনির্মাণের প্রকৃষ্ট উপাদান। অনুরূপভাবে বিতস্তা নদীপার্শ্বস্থ অঞ্চলে উৎপন্ন বেত ধনুকনির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এছাড়া শাল, চন্দন, কুকুভ, ধবল, শিমুল ও বেতস গাছের কাঠও শাস্ত্রানুসারে ধনুক-নির্মাণের যোগ্য। বিভিন্ন ধাতু ও জন্তুর শিং দ্বারাও ধনুক নির্মিত হতে পারে। নির্মাণের উপাদানভেদে ধনুককে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। বাঁশের ধনুককে বলা হয় 'কোদণ্ড'। কাষ্ঠনির্মিত ধনুক 'দ্রুণ' নামে পরিচিত। আবার সিংহল ও ভারতের তালজাতীয় গাছের কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের নাম 'কার্মুক'। বিভিন্ন ধাতুনির্মিত ধনুক 'ধনুস' এবং জন্তুর শিং দ্বারা নির্মিত ধনুক 'শারঙ্গ' নামে পরিচিত।

ভারতীয় ধনুকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণত লম্বা ধনুক অশ্বারোহী এবং বেঁটে ধনুক পদাতিক সৈন্যের ব্যবহারের যোগ্য বলে বিবেচিত। জ্যা-সহ ধনুকের ওজনের তারতম্য অনুসারে 'কোদণ্ডমাণ্ডন'-এ ধনুককে ১৮টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। 'অগ্নিপুরাণ' ও 'নীতিপ্রকাশিকা' মতে, চার হাত দীর্ঘ ধনুক মানুষের ব্যবহারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বিভিন্ন শাস্ত্রমতে তিন পর্ব, পাঁচ পর্ব, সাত পর্ব ও নয় পর্বযুক্ত ধনুক শুভ ফলদায়ক। নয়ের বেশি পর্বযুক্ত ধনুক নিকৃষ্টশ্রেণির ও ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিত। ধনুকের গলদেশে ও তলদেশে গাঁট থাকলে তা ব্যবহারের অযোগ্য। আবার ব্যবহারের সময় ধানুষ্কের হাত যদি ধনুকের বাইরে বা ভিতরে চলে যায় তাহলে সেই ধনুক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ধানুষ্কের উচ্চতা ও শারীরিক শক্তির অনুপাতে ধনুকের দৈর্ঘ্য নির্ণীত হওয়া উচিত। ধনুক ধানুষ্কের অস্বস্তির কারণ হলে নিপুণভাবে চালনা করা ও লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব। পাতলা, মসৃণ অথচ দৃঢ় এবং দুদিক ক্রমশ সরু ধনুকই বাঞ্ছনীয়। মধ্যস্থলে দৃঢ়মুষ্টি ধারণের জন্য একটি পৃথক কাঠের টুকরো যোগ করা বিধেয়। ধাতু বা শিং-নির্মিত ধনুকে মুষ্টিধারণের স্থানটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এইসকল ধনুক দেখতে অনেকটা জোড়া ভুরু মতো।

* *Musiologist-রূপে বিভিন্ন যাদুঘর ও সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত। বস্তুসংরক্ষণের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণারত।*

বাঁশ, বেত ও কাঠের ধনুকের চেয়ে ধাতু ও শিং-নির্মিত ধনুকের স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি। শিং-নির্মিত ধনুকের আরেকটি আকর্ষণ বোধহয় উন্নতশ্রেণির ধনুকের প্রয়োজনীয়তা—যার ফলে তিরের বেগ, ক্ষিপ্রতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ধাতু-নির্মিত ধনুকের ব্যবহার সাধারণ পদাতিক সৈন্যের মধ্যে ছিল না বললেই চলে; কারণ ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারি এবং তির নিষ্ক্রমণের শ্লথতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপযোগী বিবেচিত হতো। শিং-নির্মিত ধনুক অবশ্য গজারোহী সৈন্যেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করত। মনে হয়, শিং-নির্মিত ধনুক উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন সৈন্যরা বা সেনানায়করা ব্যবহার করতেন, কারণ তাঁরাই সর্বদা গজপৃষ্ঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন। শরভ, রোহিত, হরিণ ও গরু-মহিষের শিং দ্বারাও ধনুক নির্মিত হতো। এইসকল ধনুক নির্মাণের পদ্ধতিও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমে শিংগুলিকে লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলা হতো। পরে সমান মাপের শক্ত দুটি শিং একত্র জুড়ে ধনুক নির্মিত হতো। জ্যা-মুক্ত অবস্থায় এক-একটি ধনুক একটি পূর্ণ বয়স্ক মহিষের শিংয়ের মতো আকৃতিলাভ করত। স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য এইসকল ধনুককে সর্বদা উলটোদিকে বাঁকিয়ে জ্যা-যুক্ত করা হতো। ধনুকনির্মাণে বিভিন্ন প্রকারের ধাতু বা শিং একক বা যৌথভাবে ব্যবহারের প্রচলন যথেষ্ট ছিল। যৌথ ব্যবহারের ফলেই যৌগিক ধনুকের সৃষ্টি। ধনুকের ক্রমবিকাশে যৌগিক ধনুকই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট। যৌগিক ধনুকে কাঠ, বাঁশ, বেত, শিং ও যেকোন ধাতুর ব্যবহার ও নিপুণ সংযোজন কারিগরের দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। ক্ষেপণসাধ্যতা গুণের জন্য যৌগিক ধনুকের গর্ভদেশ শিং দ্বারা এবং দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য অপর অংশ কাঠ বা ধাতু দ্বারা নির্মিত। পরবর্তী কালের দুই বা বহু বাঁকযুক্ত যৌগিক ধনুক সম্ভবত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ও ভঙ্গুরতা রোধে বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হতো।

প্রাগৈতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগের ন্যায় মধ্যযুগেও তির-ধনুকই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতো। মোগল আমলের ধনুকগুলি প্রায় ৪-৫ ফুট দীর্ঘ এবং বাঁশ, কাঠ, ইস্পাত, শিং বা হাতির দাঁতের দ্বারা নির্মিত। 'আইন-ই-আকবরী'তে 'তকস্-কমান' ও 'কমান-ই-গুরোয়া' নামে দুপ্রকারের ধনুকের উল্লেখ আছে। প্রথমটি আকৃতিতে খুবই ছোট এবং দ্বিতীয়টি ব্লোচম্যান কর্তৃক 'গুলেল'-রূপে চিহ্নিত (আজকা[illegible]নতি বলা হয়)। 'গুলেল' দ্বারা ছোট ছোট পোড়াম[illegible]গুলি বা ঐরকম যেকোন বস্তু তীব্র বেগে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা যেত। রাজপুত যোদ্ধাদের মধ্যেও 'গুলেল'-এর যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

এজার্টন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, মোগল আমলের সাধারণ ধনুকের অবতল অংশ—যা জ্যা-যুক্ত করলে উত্তল হয়—তীব্রতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য পশু-তন্তু দ্বারা দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদিত, গর্ভদেশ শিং-নির্মিত এবং পাতলা অথচ শক্ত দুর্ভেদ্য কাঠের টুকরো দ্বারা সুন্দরভাবে সংযোজিত। ধনুকগুলি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, চকচকে এবং দুই প্রান্তদেশ সর্প-মস্তকাকৃতি বিশিষ্ট। শিং-নির্মিত অংশে কোন কারুকার্য নেই, কিন্তু কাষ্ঠ-নির্মিত পৃষ্ঠদেশ আরবদেশীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে লতা-পাতা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি অঙ্কিত এবং স্থানে স্থানে গিলটি কার্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত।

রাজপুত যোদ্ধাদের মধ্যেও তির-ধনুকের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাদের বেতের ধনুক একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রথম অবস্থায় ধনুক এমনভাবে বাঁকিয়ে রাখা হতো যে, ধনুকের উভয়প্রান্ত অতি সন্নিকটে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় মিলিত অবস্থায় থাকত, কিন্তু সামান্য উত্তাপ প্রয়োগে উভয় প্রান্ত খুলে সাধারণ ধনুকের আকার ধারণ করত। রাজপুতরা 'আর ধনুক'-এর ব্যবহার জানত। এই ধনুকের ব্যবহারপদ্ধতি সামান্য ভিন্ন, কিন্তু কার্যকারিতা প্রায় বন্দুকের মতো। এই ধনুকে একটি কোটরযুক্ত সোজা লৌহশলাকার ওপর ফাঁপা শিং বা হাড়ের অংশ কবজা দ্বারা যুক্ত অবস্থায় ধনুক ও জ্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করার জন্য বন্দুক চালাবার ঘোড়ার মতো একটি যন্ত্র যুক্ত থাকত। ফাঁপা অংশের ভিতর ৯ ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ ছোট ছোট তির রাখা হতো। তিরগুলি একটির পর একটি ঘোড়ার মতো যন্ত্র সঞ্চালনের ফলে তীব্রবেগে নিক্ষিপ্ত হতো।

শিখ যোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে বা ছোট ছোট দলে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে হয়রান করার উদ্দেশ্যে তির-ধনুকের ব্যবহার করত। মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের তির-ধনুকসহ চিত্র জন-সাধারণের খুবই পরিচিত। রাজপুতদের ধনুকে যেমন জ্যামিতিক নকশা ও দেবদেবীদের মূর্তি অঙ্কিত থাকত, শিখদের ধনুক সেরূপ গুরুর বাণী ও উক্তি দ্বারা নানাভাবে অলঙ্কৃত হতো।

রেশমি সুতো দ্বারা প্রস্তুত ধনুকের জ্যা সর্বোৎকৃষ্ট। পরিপুষ্ট বাঁশ বা অন্য কোন গাছের ত্বকের তন্তু দ্বারা তৈরি জ্যাও ব্যবহারের উপযোগী। এছাড়া ছাগল, হরিণ, গরু, মহিষ ইত্যাদির লোমশূন্য চামড়া বা স্নায়ু দ্বারা গঠিত জ্যাও ব্যবহারযোগ্য। 'ধনুর্বেদ'-এর মতে, পট্টসূত্র দ্বারা গঠিত কনিষ্ঠ আঙুল পরিমিত বেড়-যুক্ত জ্যা দৃঢ় ও যুদ্ধকার্যে সহনশীল। পাটের তন্তুর অভাবে হরিণের স্নায়ুতন্তু গ্রহণীয়। পাকা বাঁশের ত্বক-তন্তু, ভাদ্রমাসের অর্কবৃক্ষের ত্বক-তন্তু ও সদ্যমৃত পশুর লোমশূন্য চামড়া একত্রে আবর্তিত করে যে-সুতো প্রস্তুত হতো, সেইরকম ৩-৪টি আবর্তিত সুতো একত্র করে ভালভাবে পাকিয়ে যে মসৃণ নিরেট নলাকৃতি জ্যা প্রস্তুত হতো তা পবিত্র, সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল এবং সব কাজে ব্যবহারযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ মূর্ভা, অর্ক, সন, গবেধু, ভেনু, ও স্নায়ু-নির্মিত জ্যায়ের উল্লেখ আছে।

যদিও তিরই অস্ত্র হিসাবে গণ্য, কিন্তু তির ও ধনুক পরস্পরের পরিপূরক। একটি আদর্শ তিরের চারটি অংশ—ফলা বা ফলক, দণ্ড বা শ্যাফ্ট (shaft), জ্যা-যুক্ত করার খাঁজ বা নচ্ (notch) ও পালক। তিরের ফলক সাধারণত পাথর, বাঁশ, কাঠ, শিং, হাড় বা ধাতু-নির্মিত। ধাতু-নির্মিত ফলকের নিচের দিকে

একটি ছোট হাতলের মতো অংশ থাকত। ফলক হয় দণ্ডের অগ্রভাগে শক্ত করে গুঁজে বা দৃঢ়ভাবে সুতো দিয়ে বেঁধে অথবা কোন ধাতু-নির্মিত কোটরের সঙ্গে যুক্ত করে তিরের দণ্ডের অগ্রভাগে সংযুক্ত করে দেওয়া হতো। ফলকবিহীন তিরের অগ্রভাগ সাধারণত পাটযুক্ত হতো। ফলকের আকৃতিভেদে 'ধনুর্বেদ'-এ দশপ্রকার তিরের উল্লেখ আছে। এদের নাম যথাক্রমে 'আরামুখ', 'ক্ষুরপ্র', 'গোপুচ্ছ', 'সূচীমুখ', 'ভল্ল', 'দ্বি-ভল্ল', 'বৎসদন্ত', 'অর্ধচন্দ্র', 'কর্ণিক' ও 'কাকতুণ্ড'। সাধারণত 'আরামুখ' দ্বারা বর্মচ্ছেদ, 'ক্ষুরপ্র' দ্বারা বাহুচ্ছেদ, 'গোপুচ্ছ' দ্বারা পতাকাচ্ছেদ, 'সূচীমুখ' দ্বারা জ্যাচ্ছেদ, 'ভল্ল' দ্বারা বক্ষচ্ছেদ, 'দ্বি-ভল্ল' দ্বারা বাণ অবরোধ, 'বৎসদন্ত' দ্বারা জ্যা-কর্তন, 'অর্ধচন্দ্র' দ্বারা মস্তকচ্ছেদ, 'কর্ণিক' দ্বারা ধাতুনির্মিত বাণচ্ছেদ এবং 'কাকতুণ্ড' দ্বারা বেধনযোগ্য সকল অস্ত্র বিচারপূর্বক বিদ্ধ করা যেত। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে 'অঞ্জলিকা', 'সর্পাকার', 'কপর্ণ', 'পত্রিনা', 'সায়ক', 'শিলীমুখ', 'সিয়্যাম', 'আঁকড়িদার' ইত্যাদি বহুপ্রকার ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সমরবিদ্যা-বিশারদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। কৌটিল্যের মতে ছেদন, ভেদন, তাড়ন, ইত্যাদি কার্যভেদে তিরের ফলক কাঠ, অস্থি বা ধাতু-নির্মিত হতে পারে। ধাতু-নির্মিত ফলককে সুদৃঢ়, সুতীক্ষ্ণ ও বিশেষ কার্যক্ষম করার জন্য একপ্রকার প্রলেপ লাগানোর বিধি 'ধনুর্বেদ'-এ আছে। এই প্রলেপ লাগানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। প্রথমে সরিষা, পঞ্চ লবণ ও মধূখ (মোম) একসঙ্গে পিষে ফলকের ওপর লাগিয়ে আগুনে গরম করতে হয়। পরে পিপুল, সৈন্ধব লবণ ও কুট (গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ) একসঙ্গে গোমূত্রের সঙ্গে পেষণ করে ফলকের ওপর লেপন করে পুনরায় আগুনে গরম করতে হয় যতক্ষণ না ফলকের রঙ ময়ূরের গলার মতো নীলবর্ণ হয়। পরিশেষে ফলক ঠাণ্ডা হলে পরিষ্কার জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়।

তিরের প্রধান অংশ দণ্ড। দণ্ড সাধারণত বাঁশ, কাঠ বা শর দ্বারা গঠিত হতো। এর আকৃতি অগ্র থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত প্রায় সমবেড়যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নলখড় ও বেণুবাঁশ দ্বারা নির্মিত দণ্ডের অগ্রভাগ সামান্য সরু আকৃতিবিশিষ্ট। 'ধনুর্বেদ'-এ দণ্ডের আকৃতিভেদে তিরকে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত ভারি হলে তির স্ত্রী-তির হিসাবে চিহ্নিত, যা দূর লক্ষ্যভেদে সক্ষম। পশ্চাদ্ভাগ ভারি হলে তা পুরুষ শ্রেণিভুক্ত, যা যেকোন কঠিন বস্তুকে ভেদ করতে সমর্থ। সর্বত্র সমান বেড় ও ওজনবিশিষ্ট তির নপুংসক নামে আখ্যায়িত, যা সবরকম লক্ষ্যভেদে উপযুক্ত। এই তির ধানুষ্কের অভ্যাসের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

'নারাচ' নামক সম্পূর্ণ লৌহ-নির্মিত তিরের উল্লেখ মহাভারতে আছে। 'নারাচ' শিকারে বা যুদ্ধক্ষেত্রে হাতিকে আঘাত করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। 'নালিকা' অনেকের মতে ফাঁপা লৌহ-নির্মিত তিররূপে গণ্য, কিন্তু ভিন্ন মতও আছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ 'প্রাস', 'শক্তি', 'কুন্ত', 'ভিন্দিপাল', 'তোমর', 'ত্রাসিকা' প্রভৃতি বহু তীক্ষ্ণাগ্র ক্ষেপণীয় অস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলি ধনুকের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হতো কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তিরের দৈর্ঘ্য নিয়ে কোন স্থিরতা ছিল না। ভারতে ১৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ফুট দীর্ঘ তিরের ব্যবহার দেখা গেছে। আবার আড়-ধনুকে মাত্র ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ তির ব্যবহৃত হতো। তিরের দৈর্ঘ্য সাধারণত ধনুকের অর্ধেক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিরের বেড় $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি থেকে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি বা ধানুষ্কের কনিষ্ঠ আঙুলের বেড়ের বেশি হওয়া অনুচিত। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত ভারতীয়দের তিরগুলি ছিল প্রায় ৩ ফুট লম্বা। এজার্টনের মতে, ১৮৫৭ সালে লখনৌতে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত ভারতীয় তিরগুলি ছিল ৬ ফুট দীর্ঘ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ ৯ ফুট দীর্ঘ তিরের উল্লেখ আছে, যা হাতির পিঠে হাওদা থেকে ঝুলন্ত এক বিশেষ ...নর থলিতে করে যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করা হতো।

তিরের খাঁজকাটা অংশ তিরকে জ্যা-যুক্ত করতে সাহায্য করে। এইজন্য তিরের পশ্চাদ্ভাগে পাতলা অথচ শক্ত বাঁশ বা কাঠের টুকরো দুপাশে সুতো বা তন্তুর দ্বারা দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে দেওয়া হতো। অনেক সময়ে বাঁশ, কাঠ, অস্থি, হস্তিদন্ত বা ধাতু-নির্মিত দুদিকে খাঁজযুক্ত ছিপির মতো একটি পৃথক অংশ তিরের পিছনে আঠাজাতীয় পদার্থ দ্বারা দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হতো।

তিরকে নিয়ত উড্ডয়নে সাহায্য করার জন্য পাখির পালক দ্বারা আসজ্জিত করার বিধি ছিল। পালকগুলি তিরের সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে সজ্জিত করা হতো। এইজন্য কঙ্ক, হংস, শশাদন, মৎস্যভুক, চক্রবাক, গৃধ্র, কুরঙ্গ, পরভৃত, ময়ূর, বনমোরগ ইত্যাদি পাখির বড় বড় পালকগুলি ব্যবহৃত হতো। প্রতিটি তিরে চারটি করে ৩ থেকে ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ পালক ভালভাবে ছেঁটে আঠা বা স্নায়ু-নির্মিত সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা সংযোজিত করা হতো। কোন কোন সময়ে তিরের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে পালক গুঁজে দেওয়া হতো। শিং-নির্মিত ধনুকে ব্যবহৃত তিরে সাধারণত ৮ ইঞ্চি মাপের পালক যুক্ত করা হতো।

দক্ষ ধানুষ্কের পক্ষে ধনুকের মজবুত মুষ্টিধারণ, নিখুঁত লক্ষ্য সম্পাদন ও স্থির অঙ্গুলিসঞ্চালনের অভ্যাস বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিরনিক্ষেপের সময়ে ধানুষ্ক বাঁহাতের মুঠি দ্বারা ধনুকের নির্দিষ্ট স্থান ধরে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা তিরের খাঁজকাটা অংশ জ্যা-এর মধ্যবর্তী স্থানে সংলগ্ন করে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে ধনুক এবং জ্যা-এর মধ্যে যেন কমপক্ষে ১২ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে। আরো লক্ষণীয়, ধনুক ও তিরের ফলক যেন প্রথম অবস্থায় ভূমির দিকে নিম্নমুখী থাকে। তিরনিক্ষেপের ঠিক প্রাক্কালে ধানুষ্ক দুহাত দিয়ে তির-ধনুক নিশানার দিকে লক্ষ্য রেখে সামনের দিকে ওঠায় এবং জ্যা-সংলগ্ন তির যতদূর সম্ভব নিজের দিকে আকর্ষণ করে লক্ষ্যবস্তু, ফলক ও নিজের দৃষ্টি এক সরলরেখায় নিবদ্ধ করে। তির জ্যা-মুক্ত করার সময় ধানুষ্কের শরীর এক কল্পিত ত্রিভুজের আকৃতি

লক্ষ্যবস্তুর প্রতি স্থির এবং শ্বাসরুদ্ধ করা অবশ্যকর্তব্য। তিরনিক্ষেপের সময় ধানুষ্কের বাম অগ্রবাহুতে চর্ম-বর্ম পরিধান করা বিধেয়, নচেৎ জ্যা দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিজের সুবিধামতো ধানুষ্ক ক্ষেত্রবিশেষে বসে বা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন আসনের সাহায্য নিতে পারে। বিভিন্ন আসন গ্রহণের জন্য ধানুষ্কের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও অভ্যাস প্রয়োজন। 'কোদণ্ডমাণ্ডন'-এ ধানুষ্কের জন্য আলীয়, প্রত্যালীয়, বৈশাখ, সম্পদ, কূর্ম, পদ্মাসন, দার্দুর ও গরুড় আসনের উল্লেখ আছে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে মণ্ডল, নিশ্চল, বিকট, সম্পুট, স্বস্তিকা, অসমপদ ইত্যাদি বহুপ্রকার আসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এর মতে, ধনুকের গাত্র যদি মসৃণ না হয় এবং ধানুষ্কের জ্যামুষ্টি যদি শিথিল হয়, তাহলে তিরের গতি মৎসপুচ্ছের মতো যাবে। জ্যামুষ্টি যদি কম্পিত হয়, তাহলে তির লক্ষ্যবস্তুর বামে বা দক্ষিণে যাবে। অনুরূপভাবে জ্যামুষ্টি লক্ষ্যবস্তুর ওপর বা নিচে হলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হবে না। অভ্যাসকালে ধানুষ্ক লক্ষ্যবস্তুকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে স্থাপন করবে, যাতে সূর্য সর্বদা ধানুষ্কের পিছনদিকে থাকে। লক্ষ্যবস্তু সাধারণত চঞ্চল, অচঞ্চল বা নানাপ্রকার গতিময় হতে পারে। অতএব অভিজ্ঞ ধানুষ্ককে সর্বদা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি স্থিরদৃষ্টি রেখে সুস্থির মস্তিষ্কে ধনুকে তির সন্ধান দ্বারা লক্ষভেদ করতে হবে। তির দ্বারা কতদূরের লক্ষ্যবস্তু সঠিকভাবে বিদ্ধ করা সম্ভব, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। অতিশয়োক্তি বলে মনে হলেও মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লেখ আছে, দুমাইল দূরস্থ লক্ষ্যবস্তুও তির দ্বারা বিদ্ধ করা সম্ভব। 'ধনুর্বেদ'-এর মতে, নিয়মিত অভ্যাস করলে ৬০ ফুট দূরত্বে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তু শ্রেষ্ঠ নিশানারূপে পরিগণিত। ঐতিহাসিক ও গবেষক পি. সি. চক্রবর্তীর মতে, ভারতীয় তিরন্দাজ সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট তির-ধনুকের সাহায্যে ১২০ গজ দূরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে নির্ভুল ও কার্যকরভাবে বিদ্ধ করতে সক্ষম।

বিখ্যাত ধানুষ্ক ও যোদ্ধারা সাধারণত তিরের ওপর নিজ নিজ নাম খোদাই করে রাখতেন। 'মহাভারত', 'রঘুবংশ', 'পাতালখণ্ড', 'রাজতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে নামাঙ্কিত তিরের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ব্যবহৃত নামাঙ্কিত তিরের চাক্ষুষ প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের বহু সংগ্রহালয়ে আজও বিদ্যমান। ভারতীয় তির-ধনুকের অঙ্গসজ্জাতেও বহু বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সম্ভবত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তির-ধনুক নানা রঙে রঞ্জিত করা হতো। গিলটি করা বা নানা বিচিত্র অঙ্গসজ্জা ও চিত্রাঙ্কন-সহ অলঙ্করণের চাক্ষুষ প্রমাণ আজও বিভিন্ন ঘরানার চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, গুহা ও মন্দির-গাত্রে, মুদ্রায় ও সংগ্রহালয়ে সযত্নে রক্ষিত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পরিস্ফুট।

তির-ধনুক যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় সমরসম্ভারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আধুনিক যুগেও আদিবাসী ও উপজাতি জনগণের মধ্যে তির-ধনুকের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। আধুনিক সভ্যসমাজেও তির-ধনুক চালনা শিক্ষা ও অভ্যাস প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, তির-ধনুকই আধুনিক যুগের অস্ত্রবিশারদদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভারতীয় আড়-ধনুকই বর্তমান যুগের রাইফেলের পূর্বসূরি। তির-ধনুক সম্বন্ধে এখনো গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিভিন্ন যুগে ভারতীয় জীবনধারা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সমরবিদ্যা সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। ❑

- History of Sanskrit Literature—A. B. Keith, Oxford, 1928
- The Ain-i-Akbari (tr.)—Blochmann, Calcutta, 1939
- Epic India—C. V. Vaidya, Bombay, 1907
- The Jataka (tr.)—E. B. Cowell, 6 Vols., Cambridge, 1895
- Early Indus Civilisation—E. J. H. Mackey, London, 1948
- Military System of the Sikhs (1799-1849)—F. S. Bajwa, Patna, 1964
- Vaisampayana, Nitiprakasika—G. Oppert, Madras, 1882
- Weapons, Army Organisation... Ancient Hindus... Gunpowder and Fire-arms—G. Oppert, Ahmedabad, 1967
- Studies in Indian Weapons and Warfare—G. N. Pant, New Delhi, 1970
- The Art of War in Ancient India—G. N. Date, Bombay, 1929
- Military History of India—Jadunath Sarkar (Sir), Calcutta, 1960
- War in Ancient India—V. R. R. Dikshitar, Madras, 1948
- Ancient Indian Weapons... to Vedic Period—S. D. Singh, Lieden, 1965
- Archaeology of Weapons... Pre-history of Chivalry—R. E. Oakeshott, London, 1964
- Kautilya's Arthasastra (tr.)—Radhagobinda Basak, 2 Vols., Calcutta, 1970
- Kurukshetra War—A Military Study—P. Sensarma (Major), Calcutta, 1975
- Mahabharata (tr.)—P. C. Ray, Calcutta, 1919
- The Art of war in Ancient India—P. C. Chakraborti, Delhi, 1972
- Dhanurveda (tr.)—Pandit Iswar Chandra Sastri, Calcutta, 1956
- Bhojaraja Yuktikalpataru (tr.)—Pandit Iswar Chandra Sastri, Calcutta, 1917
- Ramayana (tr.)—Panchanan Tarkaratna, Calcutta, 1904
- Ramayana (tr.)—M. N. Dutta, 7 Vols., Calcutta, 1892-1894
- Agnipuranam (tr.)—M. C. Apte, Poona, 1957
- Vedic Index—Macdonell and Keith, 2 Vols. (Reprint), Delhi, 1958
- Dhanurveda (tr.)—Jogesh Chandra Roy, Calcutta, Saka 1361
- History of India as... historians—J. Dowson an H. M. Elliot, Vols. I-VIII, Calcutta, 1953-1956
- Military Heritage of India, Early Period—Dr. Dilip Kumar Ray (Press)
- An illustrated handbook of Indian Arms—W. Egerton, London, 1880

বাঙলা কাব্যে বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি

শ্যামাপদ কর্মকার*

অতীতে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার প্রমুখ অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ লেখকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যিক বনফুল বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। এছাড়া বাঙলা ভাষায় রচিত বহু গল্প, উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের নাম বহুভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সেসম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বিদ্যাসাগরের জীবন ও দর্শন নিয়ে যতটা গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, আজও তা করা হয়ে ওঠেনি। এখানে আলোচ্য বিষয় বাঙলা কাব্যে বিদ্যাসাগর-চর্চা।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ "The man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bangalee mother." এই একটি বাক্যের মধ্যেই সংক্ষেপে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ চরিত্রমাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মধু-কবি তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে যে-সনেট রচনা করেছেন, তাতে মুখ্যত দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের কথাই বলেছেন। সম্ভবত এটিই বিদ্যাসাগরের প্রশস্তিমূলক প্রথম কবিতা। এখানে কবি বলেছেন ঃ

"বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে
যেজন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ।"

উল্লেখ্য, কবি মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্রকে গিরীশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আলোচ্য কবিতাটি ছাড়াও 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে' কবিতাটিও ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ করেই রচিত। প্রবাসে কবি যখন প্রবল অর্থসঙ্কটে পড়েন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রই তাঁকে অর্থসাহায্য পাঠান। তাই তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞ কবির এই উক্তি ঃ

"নমি পায়ে কব কানে, অতি মৃদুস্বরে,
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে।
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনানগরে,
কেড়ে লব রাজ্যপদ তব আশীর্বাদে।"

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে 'বিদ্যাসাগর' কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার সাতটি স্তবকে ঈশ্চরচন্দ্রের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম স্তবকে কবি বঙ্গমাতার উদ্দেশে আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

"হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ, বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কী মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভা করুণা গভীর!
বিদ্যার সাগর খ্যাতি আরো মনোহর,
বিশাল উদার চিত্ত, দয়ার সাগর।"

এই 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বোধ হয় কাঙাল-দুঃখীদের। বাংলায় মানুষের অভাব নেই। কিন্তু দীন-দুঃখী মানুষের বন্ধু কজন আছে? মূর্তিমান দয়ার প্রতীক বিদ্যাসাগর পীড়িত মানুষের দুঃখমোচন করতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই কবি হেমচন্দ্র বলেছেন ঃ

"কত রাজা রানী আছে এরাজ্য ভিতর,
কাঙালে করিবে আর কেবা সে-আদর।"

বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করে কবি সমসাময়িক বঙ্গবাসীর মধ্যে নির্ভীক বীর্যবান এই মহান চরিত্রের 'স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত'-এর কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি কবিতার উপসংহার টেনেছেন এই বলে ঃ

"তব দেবদেহ,
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ,
অমর তোমার সেই খর্বদেহ ঠাট,
সেই দয়াপূর্ণ নেত্র বিশাল ললাট।
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট।
দরিদ্র সন্তান হয়ে জিনিলে সম্রাট।"

* অবসরপ্রাপ্ত বাঙলা-শিক্ষক, হুগলি বাগীপুর হাই স্কুল। ছোটদের জন্য একাধিক গল্পবইয়ের লেখক।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের দরবারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের কথাই বিশেষভাবে বলেছেন ঃ

"বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে,
অখ্যাত জড়ত্ব ভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকিরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালে প্রথম জয়টিকা,
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থে 'সাগরতর্পণ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। অন্যায় সামাজিক বাধা-নিষেধের ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল তীব্র। বিদ্যা-সাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্যতম কারণও এটিই—

"শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয় বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্ক ফলার তুমুল আন্দোলন,
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর—"

তাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষমাহীন জেহাদ। তাই কবি বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ ব্যক্তির পুনরাবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন। 'সাগরতর্পণ'-এ কবি বলেছেন ঃ

"প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মুরৎ নাহি চাই,
মানুষ খুঁজি তোমার মতো, একটি তেমন লোক,
স্মরণচিহ্নমূর্ত যেজন ভুলিয়ে দেবে শোক।"

বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় শুধু তাঁর আচার-আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারেও তাঁর সেই স্বাদেশিকতার প্রকাশ সর্বজনবিদিত। সেই স্বদেশপ্রীতির আদর্শ যাতে সকলের মনে অটুট থাকে, তার জন্য বিদ্যাসাগরের চটিজুতার কথা বলতেও সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ঠাবোধ করেননি ঃ

"সেই যে-চটি—দেশি চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে এই আমাদের পণ।
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে থাকব প্রতীক্ষায়,
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দী গাঁয়।"

বাঙলা কাব্যে যে কেবল বিদ্যাসাগর-প্রশস্তিই রচিত হয়েছে তা নয়। কাব্যের মধ্য দিয়ে অজস্র কটূক্তিও বর্ষিত হয়েছে তাঁর প্রতি। তাই কবি হেমচন্দ্র বলেছেন ঃ "আপনি সহিলা নিন্দা, কত তিরস্কার।" একথা যে কত সত্যি তা সমসাময়িক কালে পত্রপত্রিকার পাতা ওলটালেই নজরে পড়বে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যে-আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার জন্য শুধু নিন্দা-তিরস্কারই তাঁকে সহ্য করতে হয়নি, একসময় তাঁর জীবনসংশয়ও উপস্থিত হয়েছিল।

কিন্তু ঐ সময়েই বাংলার পথেঘাটে, নগরে, প্রান্তরে এক লোককবি আপনার স্বচ্ছ স্থির বুদ্ধিতে যেসমস্ত গান রচনা করে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার বেগবতী স্রোতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখদের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অপপ্রচার কোথায় ভেসে গিয়েছিল! কোথা থেকে পাঁচালী-রচয়িতা দাশরথি রায় এই প্রচণ্ড ক্ষমতাশীল পরিবর্তনের সমর্থক হওয়ার মতো মন পেলেন, তা জানার উপায় নেই। পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাষায় তিনি বিদ্যাসাগরের সমর্থনে গান লিখে, সমস্ত দেশময় সেই গান গেয়ে সাধারণ মানুষের হৃদয়কে এই পরিবর্তনের উপযোগী করে তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

"ক্ষীরপাই নগরে ধাম ধন্য গণ্য গুণ গ্রাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক,
তিনি কর্তা বাঙালির তাতে আবার কোম্পানির
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।"

কবি বিদ্যাসাগরকে 'বাঙালির কর্তা' বলে উল্লেখ করেছেন। যে-আন্তরিকতা তাঁর ছিল, তার বলেই তিনি বলেছিলেন ঃ

"তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে,
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।"

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'সাহিত্য' কবিতায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের দান এবং পরবর্তী কালের সাহিত্যে তাঁর প্রভাব ও প্রেরণার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবদিনটিকে কবি নবীনচন্দ্র বলেছেন ঃ

"সেই দিন শুভদিন কিবা বাংলার
সেইদিন দেবগণ
কিবা পুষ্প বরিষণ
করিলেন; কি আনন্দ গীতে সুকুমার,
বঙ্গসাহিত্যের উষা হইল সঞ্চার।"

সেদিনকার উষা আজ গৌরবের দৃপ্ত মধ্যাহ্নে উপনীত হলেও দেশের আজ বড় দুর্দিন। এসময় বিদ্যাসাগরের মতো দৃঢ়তেজা পুরুষেরই একান্ত প্রয়োজন। তাই কবি মনীশ ঘটকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঃ

"সমাজের ক্লেদ গ্লানি, কলুষ হরণে
যে-শৌর্যে উঠিল ঝলি' কর্মে ও চেতনে,
মহেশের মধ্যনেত্রসম অকস্মাৎ
জ্বলি ওঠো সেই শৌর্যে। হানো অপঘাত
পরধর্মী পরাশ্রয়ী বাঙালির শিরে,
মৃত্যুর অমৃতসিঞ্চি' বাঁচাও জাতিরে।" ❑

কোন্ পবনে! বাজছে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়*

অনেক প্রশ্নের সেরা প্রশ্ন—আমাদের প্রাণ কোথায় আছে? বায়ুতে। আমাদের শরীরে একটা 'ক্যাপটিভ এয়ার' আছে—নিরুদ্ধ বাতাস, যার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন যোগ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস হলো যেন হাপর টানা—অগ্নিকে উসকে দেওয়ার যান্ত্রিক কৌশল। প্রাণবায়ুর খবর রাখেন ক্রিয়াযোগীরা, সহজিয়া বাউলরা। আর রাখেন সুফি সাধকরা।

এই দেহ এবং এই শ্বাস। জড় দেহ নয়, চেতন দেহ। সে-দেহ কেমন? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক রুমি বলেছেন ঃ "Everything in the universe is within you. Ask all from yourself." 'শিবসংহিতা' আরো বিস্তারিত। পঞ্চভূত-বিনির্মিত এই দেহই ব্রহ্মাণ্ড। কিরকম?—

"দেহঽস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে॥" (বসুমতী প্রকাশন, ২।১।৪)

কি আছে এই দেহে? সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরুপর্বত। মেরুদণ্ডসমন্বিত পর্বত-মস্তক। সাতটি চক্র তার সপ্তদ্বীপমালা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মনের সপ্তভূমি। এরপর নদ-নদীসমূহ, সমুদ্রসকল, পর্বতসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, ঋষি-মুনিবর্গ, গ্রহনক্ষত্রকুল, পুণ্যতীর্থসকল, পীঠস্থানসমূহ, পীঠদেবতাগণ। এই শরীর এক আকাশ। ঠাকুর বললেন—ঘটাকাশ। ঘট হলো শরীর। এই শরীরেই সৃষ্টি-সংহারকারী রবি-শশী সর্বদা ভ্রমণশীল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—সবই এই শরীরে। ত্রিলোকে যা আছে, সব আছে এই শরীরে। মেরু অবলম্বন করে যার যা কাজ করে যাচ্ছে।

'মেরু' শব্দের সাধারণ ধারণা—Pole—উত্তর ও দক্ষিণ। দেহমেরুর উত্তরে—সহস্রার। দক্ষিণে—মূলাধার। জপমালার গ্রন্থিবীজ বা প্রধান বীজ—সুমেরু।

বিজ্ঞানী অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী—'ব্রেন' যাঁদের বিষয়—তাঁরা কিভাবে দেখছেন? "The spinal chord is a nerve fibre, extending from the bottom of the brain throughout our body and is protected by 24 spinal vertebrae." মেরুদণ্ড হলো স্নায়ুতন্ত্র। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিধারা। "Extending from the bottom of the brain"—বিজ্ঞানীরা ওপর থেকে নিচে নামছেন—অবরোহণ। আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা নিচ থেকে ওপরে উঠছেন—আরোহণ। মেরুদণ্ডটিকে সযত্নে রেখেছে চব্বিশটি হাড় বা কশেরুকা দিয়ে তৈরি দুর্দান্ত একটি আধার। সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (সি. এন. এস.) ও পেরিফারেল নার্ভাস সিস্টেমকে যুক্ত করেছে (পি. এন. এস.)।

"কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর
ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর॥" (অনন্ত গোঁসাই)

'চৌদ্দ পোয়া' মানে সাড়ে তিন হাত। ত্রিধারার একটি ধারা—মূল ধারা দেহভূমিতে অজস্র শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত। বাউলগানের প্রচলিত ধারায় জমির সঙ্গে এই মানবদেহের তুলনা। রামপ্রসাদের আক্ষেপ—'এমন মানবজমিন রইল পতিত'। কালাচাঁদ পাগল গাইছেন ঃ

"মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন
করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে॥
এই জমি তোর চৌদ্দ পোয়া
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া
মন্ত্র-বীজে নে সৃজে
গাছ হলে বীজ জন্মে মূলে॥"

রুমির অনুভূতি—"I am a tree with a trained parrot in its branches/ silence, thought, and voice." গাছের ডালে শিক্ষিত তোতা, সে শুধু কৃষ্ণকথা বলে।

বিজ্ঞানীরা 'ইঞ্জিনিয়ারিং' নিয়ে ব্যস্ত। হাড়ের খাঁচা, স্নায়ু, অনুভূতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুভূতি। অবোধ শিশু যেমন জিজ্ঞেস করে—ওমা ওটা কি, ওমা এটা কি? সেইরকম—"The spinal cord receives information from the senses and transmits it to the brain." ঠাকুরও বালকবৎ। সেটা আবার আলাদা জিনিস। ঠাকুর যেমন বলতেন, সব আমার মা জানে, আমি খাইদাই আর থাকি। তিনি মাথাটা কেটে যেন মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কাটা মুণ্ডের নিগূঢ় বাণী—জ্ঞান চাস? তাহলে তোর মুণ্ডুটা আমাকে দে। আঁধার রাতে দক্ষিণেশ্বরের পথে পথে উন্মত্ত ঠাকুর ছুটছেন আর বলছেন—আমার বিচারবুদ্ধিতে আগুন লাগিয়ে দে।

এই বিজ্ঞানে মনের অস্তিত্ব নেই। চিন্তার উৎস সন্ধানের চেষ্টা কোথায়? অথচ মনের সপ্তভূমির সন্ধান ঠাকুর দিয়েছেন। ছোরাছুরি ছাড়াই মানুষ বহুকাল আগে তার মাথার খবর জেনেছে সাধনার দ্বারা। পায়ের পাতায় ছোট্ট একটি অনুভূতি—নিমেষে মাথা জানিয়ে দিয়েছে—ওটা হাতি নয়, পিঁপড়ে। ঠিক কোন্‌খানটায় তাও বুঝিয়ে দিয়েছে। পায়ের পিঁপড়ে হাতে খুঁজব না। দূর থেকে শব্দ আসছে। কত দূর! কোন্‌দিক অনুমান করতে পারব। কিভাবে? এইভাবে ঃ

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক।

Modality	Stimulus (সাহায্যকারী)	Type of Receptor (ধরন)	Receptors (গ্রাহক)
দৃষ্টি	আলো	ফটো রিসেপ্টার	রডস অ্যাণ্ড কন্স
শ্রবণ	ধ্বনি, স্বর	মেকানোরিসেপ্টার	হেয়ার সেলস 'ককলিয়ার'
ব্যালেন্স	হেড মুভমেন্টস	মেকানোরিসেপ্টার	হেয়ার সেলস (সেমি সার্কুলার ক্যানালস)
সোমাটিক (দেহানুভূতি)	মেকানিক্যাল, নক্সাস, থার্মাল অ্যাণ্ড কেমিক্যাল	মেকানো, নোসি, থার্মো, কেমোরিসেপ্টার	ডর্সাল রুট গ্যাঙ্গলিয়ন নিউরন্স
স্বাদ	কেমিক্যাল	কেমোরিসেপ্টার	টেস্ট বাডস্
গন্ধ	কেমিক্যাল	কেমোরিসেপ্টার	অলফ্যাক্টরি সেন্সরি নিউরন্স

নিউরোলজিস্টরা এরপর বললেন : "all roads lead to Rome." অজস্র স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সারা শরীরে চনমন করছে। সমস্ত সংবাদ চালান করে দিচ্ছে হেড অফিসে। "সব আমার মা জানেন।" মা-থা, মা যেখানে থাকেন। আমাদের সাধনসঙ্গীত ওদের অনেক আগেই সাধকের অভ্রান্ত অনুভূতিতে এই তত্ত্ব ধরে বসে আছে। 'টার্মিনোলজি' অন্যরকম—"শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী।" এই অজ্ঞাত সাধক নামের প্রত্যাশী নন, তিনি তাঁর প্রাপ্ত জ্ঞান আটটি চরণে জ্ঞাত করে গেছেন। বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন হয়নি।

"জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী"—"The serpent power at the base of the spine." মাথায় না মূলাধারে? ঠাকুর বললেন, মূলাধারে মাথা তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে। যেন ময়রা! ছানা আসছে, চিনি আসছে। তৎক্ষণাৎ 'সন্দেশ' তৈরি করে 'ডেলিভারি' করে দিচ্ছে। সন্দেশের অপর অর্থ 'সংবাদ'। উর্দুতে 'আকবর'—অখবার।

কুণ্ডলিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা। একটি ত্রিকোণে অগ্নিবর্ণ অবস্থান্। ছানা আর চিনি হলো ঠাকুরের কলির মায়া—কাম আর কাঞ্চন। প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী, ঠাকুরের ভাষায়, কড়াইয়ের ডালের বেপারি। সে যে অমৃতের আধার, কিন্তু জাগাতে হবে, তুলতে হবে। কোন্ 'রুট'-এ! "Up and higher up—to Rome—the Vatican City." লালনের আক্ষেপ—"আমার বাড়ির কাছে আরশি-নগর/ এক পড়শি বসত করে/ আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ॥"

মনের সপ্তভূমির সর্বনিম্নতল মূলাধার। 'মূলাধার ত্যজ শিবে।' "জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী।" সুষুম্নার পথ ধরে 'স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত', চল মা, ধাপে ধাপে ওপরে—মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। ঠাকুর বলছেন : "যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। যখন সংসারে মন (নিউরোলজি নীরব) থাকে, তখন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি মনের বাসস্থান (তন্ত্রে এই তিনটি স্থান হলো—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর)। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না—কেবল কাম-কাঞ্চনে মন থাকে।" (নিউরোলজি অন্তত এইটুকু বলতে পেরেছে—বর্ণ, স্বাদ, সঙ্গীত, "এতই গন্ধ, এতই বরণ, এত গীতি এত ছন্দ" আমাদের অনুভবে আসে কোন্ পথে? উত্তর—Neural encoding and decoding.)

"মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয় (অনাহত)। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। (দেহাতিরিক্ত অনুভূতি। নিউরোলজির ব্যাখ্যা—"The thalamus is the most important relay station of the senses.") আর চারদিকে জ্যোতির্দর্শন হয়। তখন সে-ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক হয়ে বলে, একি! একি!"

নিউরোলজিস্ট ব্যাখ্যা করুন—আপনাদের অনুসরণে, Vision, Light, Photoreceptor, rods, cons. ঈশ্বরের আলোর ধারণা আছে কি? Source—God. কোন্ চোখে দেখা যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন : ও চোখে হবে না সখা! "ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।/ দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥" আমি তোমাকে অলৌকিক চক্ষু প্রদান করছি। মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ (বিশুদ্ধ)। অবিদ্যা, অজ্ঞান সব উবে গেল। মনে তখন বিশুদ্ধ চিন্তা। আনন্দময়, ঈশ্বরময়, জ্যোতির্ময়। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল (আজ্ঞাচক্র)—নিরুপম রূপদর্শন। ঠাকুরের অনুপম উপমা—"যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান।" এরপর শিরোদেশ সপ্তমভূমি (সহস্রারে)—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী। সমাধি। ঠাকুর সমাধিস্থ। দণ্ডায়মান, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ, দেহে প্রাণ নেই। মহাত্মা তোতাপুরী বুকে কান পাতলেন। হৃদয়ের শব্দ নেই। অমল জ্যোতিতে দেহ উদ্ভাসিত। নিউরোলজিতে ব্যাখ্যা নেই। এবার তাঁরা বললেন, দার্শনিক স্পিনোজাই ঠিক ধরেছেন—মস্তিষ্ক তথ্য ও তত্ত্বের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, উথালপাথাল। টুকরোগুলিকে জুড়তে না পারলে সমগ্রের জ্ঞান আসবে না। খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নয়। স্বতোলব্ধ জ্ঞানই সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সেই বাউল—"At this level, man is aware of the universe's unity; not as an observer but rather as within himself."

'রত্নসার'-এ সেই সারকথা—

"ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।
ভাণ্ড বিচারিলে জানি আপন মাহাত্ম্য।
আপনা জানিলে জানি বৃন্দাবনতত্ত্ব॥
ভাণ্ড হইতে জানি জত কৃষ্ণের মহিমা।
ভাণ্ড হইতে জানি রাধা-প্রেমতত্ত্ব সীমা॥"

এখন লাখ টাকার প্রশ্ন—আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে। কোন্ পবনে ভাসছে আমার নাও! ❑

মাতৃতান্ত্রিক বঙ্গসমাজে দুর্গাপূজার ঐতিহ্য

শ্যামলী মহাপাত্র*



মাতৃপূজার প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে দেখা গেলেও ভারতবর্ষের মতো শক্তিসাধনা আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করে সকল ধারাই 'বহু'-এর মধ্যে 'এক' হয়ে উঠেছে এবং এই 'এক'কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে শক্তি অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনা। এবিষয়ে মুখ্যত বাংলাদেশের সাধকগণের সাধনাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, যদিও শক্তিসাধনা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। তাই বলতেই হয়, এই শক্তিসাধনা বাংলাদেশের মতো আর কোথাও তেমন প্রাণবন্ত নয়।

আমরা পার্বতী-গিরিজা-উমাকে পাই শাক্তসাহিত্যে। আবার দক্ষ-তনয়া সতী দশমহাবিদ্যায় রূপান্তরিতা। তাঁর একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত একান্ন দেবীপীঠ। আবার অসুরনাশিনী চণ্ডীই হলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। আবার শক্তিসাধনার প্রধান আরাধ্যা দেবী কালী। স্থান-কাল-পাত্রানুসারে রূপে ও গুণে তাঁরা বহু হলেও মূলত এক। এবং অদ্বিতীয়া মহাদেবী থেকে সকল দেবীই প্রসৃতা। বিষ্ণু কর্তৃক মহাদেবী সতীর মৃতদেহকে একান্ন খণ্ডে ভাগ করে একান্ন পীঠে ছড়িয়ে দেওয়ার উপাখ্যানও হয়তো একান্ন দেবীকে এক দেবীর অংশ হিসাবে অভিন্ন করে তোলার জন্য সৃষ্ট। বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী বিভিন্ন মূর্তিতে পূজিতা। 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিখণ্ডে স্বয়ং বিষ্ণু সাবিত্রীদেবীকে পরম ভক্তিসহকারে স্তবপাঠের দ্বারা তুষ্ট করছেন ঃ "সর্বগা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্বতোঽদ্ভুতা।/ সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যং তন্ন বিনা ত্বয়া॥/ তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।/ স্মর্তব্যা ভূতিকামৈ র্বাতৎ প্রবক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ॥" বিষ্ণু বিভিন্ন স্থানে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনা করে গেছেন, শেষে বলেছেন—দেবী সাবিত্রী মাতৃকাগণমধ্যে বৈষ্ণবী, সতীমধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্তমা এবং সর্বশরীরিগণের শক্তি। যদিও বিভিন্ন রূপিণী দেবী উদ্ভব-অভিব্যক্তিতে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এবং পূজাবিধি ও উপাখ্যানে অনেকাংশেই পৃথক, তবু দার্শনিক শক্তিতত্ত্বের নিয়মানুসারে যেহেতু শক্তি মূলত এক, তাই এই শক্তি-প্রতিমূর্তি দেবীগণও এক সনাতনী মহাদেবীর অংশ।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিতা দেবীগণের মতো বাংলার বিভিন্ন স্থানেও বিভিন্ন দেবীকে আমরা পাই। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে মানিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এ বিভিন্ন দেবীর নাম পাওয়া যায়। এইভাবে 'দুর্গা', 'জয়দুর্গা', 'বিশালাক্ষী', 'কালী', 'মহাকালী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে দেবীর পূজাপাঠ ও মূর্তিপূজা বাংলার বিভিন্ন স্থানে হয়। ভারত তথা বাংলাদেশের এই শক্তিপূজার প্রচলন অতি প্রাচীন কাল থেকেই। পাঁচহাজার বছর আগে পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোয় যে দেবীপূজা হতো, সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষের অসংখ্য দেবীমূর্তি থেকে তা বোঝা যায়। বৈদিক যুগেও যে শক্তিপূজা এবং শক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল, সে-প্রমাণও পাওয়া যায়। অষ্টমন্ত্রাত্মক 'দেবীসূক্ত'-এর 'ঋষি' মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে নিজ আত্মারূপে অনুভব করে বলেছেন ঃ 'আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যাদেবী বিশ্বেশ্বরী'। এবং দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবতাদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা। তাঁর চরিত্রত্রয়ের ছন্দগুলি গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। এই ছন্দত্রয় দ্বারা মন্ত্রপাঠে ব্রহ্মতেজ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরমানন্দ লাভ হয়। চণ্ডীজপের আরম্ভেই গায়ত্রী ছন্দোরূপে আবির্ভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী ও সন্ধ্যায় সামবেদধারিণী বৃদ্ধা। প্রাতে কুমারীর মতো মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী। যুবতীর মতো মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধাসমা মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা।

জাপানে সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবীর পূজা হয়। এই 'চনষ্টী' শব্দের সংস্কৃত অর্থ চণ্ডী। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর ৮১তম থেকে ৯৩তম—এই ১৩টি অধ্যায়কেই 'দেবীমাহাত্ম্য' বা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' বলা হয়। মহাভারতেও দেবীর 'ভদ্রকালী' ও 'চণ্ডী'—এই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু 'চামুণ্ডা'

'পদ্মা-গঙ্গা' দ্বিমাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা, সুলেখিকা।

নামটি ভবভূতির 'মালতীমাধব'-এর ৫ম অঙ্কে উদ্ধৃত। কৃত্তিবাসের বাঙলা রামায়ণ অনুসারে, রাম ও রাবণ দুজনেই দেবীভক্ত ছিলেন। প্রবাদ, শরৎকালে রাবণবধের জন্য রাম দেবীর অকালবোধন করেন। রামের আরাধনায় তুষ্ট দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র মতে, শরৎকালে সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। 'দেবীভাগবত'-এর মতে শরৎকালে দুর্গাপূজার উৎপত্তি। স্বয়ং রাম দেবীপূজায় ১০৮টি পদ্ম দ্বারা সঙ্কল্প করার কথা স্থির করেন। কিন্তু সংগৃহীত পদ্ম থেকে দেবীর ছলনায় একটি পদ্ম অদৃশ্য হয়ে যায়। যেহেতু সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না, তাই পদ্মলোচন রাম নিজের একটি চোখ উৎপাটিত করে শ্রীদুর্গার চরণে অঞ্জলি দিতে মনস্থ করেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হয়ে রামকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন এবং সেই থেকেই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা হয়ে আসছে। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর প্রকৃতি খণ্ডে (২।৬৬।৭-১০) বলা হয়েছে, মহাশক্তি মূলাপ্রকৃতি থেকে এই বিশ্ব উৎপন্ন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্তা। দেবীকে 'বৃহন্নারদীয়পুরাণ' সর্বশক্তিময়ী বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনা করে 'উমা', 'লক্ষ্মী', 'ভারতী', 'গিরিজা', 'অম্বিকা', 'দুর্গা', 'ভদ্রকালী', 'চণ্ডী', 'মাহেশ্বরী', 'কৌমারী', 'বৈষ্ণবী', 'বারাহী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছে। 'দেবীভাগবতপুরাণ' অনুসারে পরমপুরুষ দুইভাগে বিভক্ত—এক সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় পরাশক্তি মায়াপ্রকৃতি। কিন্তু এই দুই মূলত এক এবং অভিন্ন। বহ্নি ও তার শক্তির মতো পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি অভেদ। সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি, অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। বিভিন্ন পুরাণ, মহাপুরাণ ও উপপুরাণে দুর্গাপূজা ও দেবীমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত।

ভারতবর্ষের আর্যেতর অধিবাসিগণ সমাজব্যবস্থার দিক থেকে মাতৃতান্ত্রিক ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে মাতৃদেবতা এবং মাতৃউপাসনার প্রাধান্য দেখা যায়। এই আর্যেতর সমাজে 'মা' কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে আবির্ভূতা। এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল ছিল। তাই সন্তানের অনিশ্চিত পিতৃপরিচয়ের কারণে মাতৃপরিচয়ই সন্তানকে পরিচিত করে। আর্যেতর এই জাতিগুলির দৈনন্দিন জীবন মুখ্যত কৃষিনির্ভর ছিল এবং কৃষিকর্মের সব ব্যাপারে মেয়েরাই যেহেতু অগ্রণী ছিল, তাই আর্থিক জীবনে মায়ের প্রাধান্যই অনুভূত হতো। এইভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 'মা' যে বৃহৎ মূল্য লাভ করে, সেটাই ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত করেছিল।

মুসলিম রাজত্ব যখন শুরু হলো, তখন যে দর্শনভিত্তিক আর্য ধর্মমতের ওপর প্রবল আঘাত আসে এবং সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। এরই ফলে বাংলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার এত প্রসার ঘটে। তবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার প্রচলন হয়ে থাকে, বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আরো বহু স্থানে মাতৃপূজার প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। কারণ, পৃথিবীর বহু দেশে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশে মাতৃপূজার যে প্রচলিত বিচিত্র রূপ আছে—সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমানে মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা এসে মিশেছে। অনেক প্রাচীন ধারার মুল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করতে পারি। এই মাতৃ বা শক্তিদেবীর প্রাচীন ধারা মুখ্যত দুটি। একটি শস্যপ্রজননী ভূতধারিণী পৃথিবী দেবী, অপরটি এক পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী—যিনি পরবর্তী কালে 'পার্বতী', 'গিরিজা', 'অদ্রিজা' নামে খ্যাত এবং এই পার্বতীই হলেন 'উমা'।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট করে উমার উল্লেখ পাই 'কেন উপনিষদ'-এ। ইন্দ্রই এখানে উমার আবির্ভাবের প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী। সেই অর্থে দেবী এখানে ইন্দ্রের জন্মদাত্রী। ইন্দ্রের সম্মুখেই দেবী প্রথমে জ্যোতির্ময়ী হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা। দেবাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্ম দেবতাগণের জন্য বিজয়লাভ করেন। কিন্তু দেবতাগণ এই বিজয়ে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি করেননি। তাঁরা এটিকে তাঁদেরই বিজয় মনে করে নিজেদের মহিমান্বিত বোধ করেন। ব্রহ্ম দেবতাদের শিক্ষাপ্রদানস্বরূপ আবির্ভূত হলেও দেবতারা তাঁর শক্তি সম্বন্ধে অবগত হননি। এই পূজনীয় পুরুষটি কে তা জানতে প্রথমে তাঁরা অগ্নিকে এবং পরে বায়ুকে পাঠান। কিন্তু দুজনেই ব্যর্থ হন তাঁদের শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। শেষে স্বয়ং ইন্দ্র অগ্রসর হলে সেই মূর্তি সহসা তিরোহিত হয়। ইন্দ্র তখন আকাশে একটি স্ত্রীমূর্তি দেখতে পান, যিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। সেই দেবী উমাই ইন্দ্রের কাছে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেন।

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান ও মেরুদুহিতা মেনার দুই কন্যা—গঙ্গা ও উমা। ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য দেবতাগণের কার্যের নিমিত্ত নদী গঙ্গাকে হিমালয় দান করেন, অন্য কন্যা উমাকে অর্পণ করেন লোকপূজ্য দেবতা রুদ্রকে। মহাভারতে উমা-মহেশ্বর সংবাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও

পার্বতীকে শিবপত্নীরূপেই পেয়ে থাকি। পরে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উমাকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ অন্য রূপে। দক্ষসুতা সতী পতির অপমান সহ্য করতে না পেরে যোগবলে দেহত্যাগ করে জন্মলাভ কামনায় শৈলবধূ মেনকার গর্ভে আবির্ভূতা। এদিকে সতী দেহত্যাগ করামাত্র মহাদেবও সেইক্ষণ থেকেই সবকিছু পরিত্যাগ করে দেবদারু বৃক্ষপরিবৃত হিমালয়ের এক সানুপ্রদেশে কঠোর তপস্যায় মগ্ন। তারপর মেনকা-কন্যা উমা মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করে পরিণয়ে আবদ্ধ হন এবং দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম দেন।

বৈদিক যুগে দুর্গার প্রতিমা ছিল না। হব্যবাহী অগ্নিশিখাই ছিল দুর্গার রূপ। পরে যখন প্রতিমার প্রচলন হয়, তখন সেই অগ্নিশিখার রূপ দেবীর গায়ের পীতাভ বর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ঋগ্বেদের খিল অংশে দুর্গাদেবীকে 'রাত্রিদেবী' বলা হয়েছে। অগ্নিরূপিণী দুর্গাকে এই ঋগ্বেদে 'শত্রুবধকারিণী', 'রাক্ষসহন্ত্রী', 'অসুরনাশিনী'ও বলা হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে কেবল হিন্দুধর্মই এই জগন্মাতার পূজা প্রচার করে চলেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে এত বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের পরিচয় মেলে না। এই দুর্গাদেবী আদ্যাশক্তিরূপে বিশ্বের সকল বস্তুই সৃষ্টি করেছেন।

বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'নারায়ণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দুর্গোৎসবের ঘটনাটি লিখেছেন। ঘটনাটি এইঃ হৈমবতী বিয়ের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলে যান। মেনকার ঐকান্তিক অনুরোধে গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠালে মহাদেব তিনদিনের জন্য পার্বতীকে পিত্রালয়ে পাঠাতে রাজি হন। যে তিনদিন হৈমবতী গিরিরাজের বাড়িতে ছিলেন, সেই তিনদিন মহোৎসবের আয়োজন করেন গিরিরাজ। অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে হৈমবতী পিতৃগৃহে সাদরে আপ্যায়িত হওয়ার পর দশমীর দিন যখন পুনরায় কৈলাসে চলে যাওয়ার সময় আসে, তখন মা মেনকার সঙ্গে অন্য স্বজন-পরিজনদের চোখের জল দেখে হৈমবতীও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনা ও ফের বিদায় দেওয়ার যে মর্মস্পর্শী ঘটনা, সেটাই দুর্গোৎসবের মূল পটভূমি।

প্রতিমাপূজা বাংলার তথা বাঙালির একটি বিশেষত্ব। বাঙালির ধর্ম, চরিত্র, সংসার ও পরমার্থ গড়ে উঠেছে তার নৈমিত্তিক পূজার্চনা দিয়ে। ভাবের ও রসের রাজ্যে এসবের বিশেষ মূল্য আছে। দুর্গা বিশ্বমাতা—'জগতাং ধাত্রী'। তিনি দশভুজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এক নারীমূর্তি, মাতৃমূর্তি। ত্রিজগতের ধাত্রী বিশ্বজননী দুর্গার প্রতিমাতে মায়ের সব লক্ষণ পরিস্ফুট। কন্যারূপিণী জগন্মাতার ঘর-গেরস্থালী, সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ সবই আছে। এবং এসবের জ্বালা মেটাতে বছরে একবার তিনি বাপের বাড়িতে আসেন। দেবী দুর্গার প্রতি এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা, ভক্তির অভিব্যক্তি বাঙালি ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব।

প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ প্রথম এই রূপ দর্শন করেন। তাঁর শিষ্য বিরূপাক্ষ এই খবর পেয়ে শিষ্য সদানন্দ স্বামীকে দুর্গোৎসবের নির্দেশ দেন। এই সদানন্দ স্বামীই প্রথম দুর্গাপূজা করেন। তাঁর পদানুসরণে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই বাংলাদেশে মূর্তি গড়ে দশভুজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেন।*

দেবী দুর্গা বৈদিক দেবতা বা তন্ত্র বেদপূর্ব কিনা সেবিষয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করতেন যে, দেবীপূজা তথা শক্তিবাদ বৌদ্ধধর্মেরই একটা পরিণতি। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারও দেবী দুর্গাকে বৈদিক দেবতা বলেননি। তাঁর মতে, অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে দেবী দুর্গা আর্যদেরও দেবী হন। অথচ স্বামী শঙ্করানন্দ বলেছেন, তন্ত্র বৈদিক, বেদেরই একটি আনুষ্ঠানিক অংশ। বেদাগমের শিবপ্রোক্ত আদ্যাস্তোত্রে স্বয়ং শিব বলেছেনঃ "তাং কালী তারিণী দুর্গা/ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।" দশমহাবিদ্যার মূল আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার সঙ্গে ভগবতী দুর্গার অভিন্নতা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, মূল বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাদেবীর কোন উল্লেখ নেই। তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র-কৃত দুর্গার অকালবোধনের কাহিনী থেকেই শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রচলন। মহাভারতে দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, চতুরাননা, কুমারী। সেখানে তিনি মহিষ-মর্দিনীরূপে কল্পিত ছিলেন না। বিন্ধ্যবাসিনী, বাঘমুখী বলে তাঁকে প্রণাম জানানো হয়েছে। ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর পূজা প্রচলন প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকেই। পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় এবং ব্যাবিলনের 'ননা' মূর্তির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ দুর্গমধ্যে অপরাজিতার মূর্তি স্থাপনের উল্লেখ আছে। এবং এইসমস্ত সিংহবাহিনী নারীমূর্তিগুলিকে 'উমা' বা 'দুর্গা' বলেই অনেকে মনে করেন। কলকাতার সংগ্রহশালায় মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের একটি একক দ্বিভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গা ও একটি চতুর্ভুজা সিংহবাহনা দেবীমূর্তি ঢাল, তরোয়াল, ত্রিশূল ও বরদা মুদ্রা নিয়ে আছেন। দুটিই প্রস্তরমূর্তি।

* এবিষয়ে মতান্তর আছে—সম্পাদক

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ আছে, দেবী দুর্গ নামে এক অসুরকে বধ করায় তাঁর নাম হয়েছিল 'দুর্গা'। 'দেবীপুরাণ'-এ দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা 'দুর্গেশ্বরী' বলা হয়েছে। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এ তাঁকে সর্বরূপিণী ও সর্বশক্তিময়ী বলা হয়েছে। এখানে তিনি 'দুর্গা', 'কালী', 'পার্বতী', 'চামুণ্ডা', 'কৌশিকী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিতা। 'কালিকা-পুরাণ'-এ দুর্গাকে পৃথিবীদেবী বলা হয়েছে। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে দেবী দুর্গা শক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতি, ব্রহ্মের সহিত অভিন্না, স্বয়ংসিদ্ধা। 'পদ্মপুরাণ'-এ রাত্রিদেবী ব্রহ্মার অনুরোধে হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করে উমার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত, বৈদিক দেবী রাত্রিই পৌরাণিক পার্বতীরূপে পূজিতা ছিলেন।

দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে ভাবের অশ্বমেধ ও রসের রাজসূয় যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞে যেমন বহু আচার-আচরণ, নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ আছে, তেমনি দুর্গাপূজাতেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবশ্য-পালনীয়। ভক্তিসহকারে দুর্গাপূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞসমান ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলে ভক্তগণ একে 'কলির অশ্বমেধ' নামে অভিহিত করেছেন। আনন্দসূচক কোন মনস্কামনা পূর্ণ হলে রসসম্ভারে যেমন অতীতে রাজসূয় যজ্ঞ পালিত হতো, তেমনি কোন ভক্তের আনন্দবাসনাকে দুর্গাপূজা দ্বারা পূর্ণ করা হলে রাজসূয় যজ্ঞের মতো ফলপ্রাপ্তি হয় বলে দুর্গাপূজাকে 'কলির রাজসূয় যজ্ঞ'ও বলা যেতে পারে।

বৈদিক ঋষিরা শরৎকাল বলতে 'ইষ' অর্থাৎ আশ্বিন এবং 'উজ' অর্থাৎ কার্তিক—এই দুই মাসকে বুঝতেন। যদিও পরবর্তী কালে ভাদ্র-আশ্বিন—এই দুই মাসকেই শরৎকাল বলা হয়ে থাকে। দুর্গাদেবীর অপর নাম 'অম্বিকাদেবী'। 'অম্বিকা' অর্থাৎ শরৎ ঋতু, তাই শরৎকালেই দুর্গাপূজা। 'কালিকাপুরাণ'-এ আছে, ব্রহ্মা দুর্গার বোধন করেন রাত্রিতে অর্থাৎ অকালে। প্রচলিত নিয়মানুসারে বসন্তকাল অর্থাৎ সূর্যের উদয়কালেই বোধন করা বাঞ্ছনীয়। এই বসন্তকাল অর্থাৎ সূর্যের যখন উত্তরায়ণ, তখন সেটি দেবতাদের দিবাভাগ। এবং শরৎকাল অর্থাৎ সূর্যের যখন দক্ষিণায়ন, তখন দেবতাদের রাত্রি। শরৎকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে সমস্ত দেবদেবীর মতো দেবী দুর্গা বিষ্ণুশক্তি-বিষ্ণুমায়া নিদ্রিতা থাকেন। তাঁর জাগরণের জন্য এই শরৎকালে বোধনের দ্বারা দেবীকে জাগ্রত করা হয় বলে দুর্গার অপর নাম 'শারদীয়া'। কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামের অষ্টোত্তরশত নীল পদ্ম দ্বারা দেবীর আরাধনা ও পূজাপার্বণ যদিও শাস্ত্রানুযায়ী অকালে, তবুও দশভুজা-রূপে দেবীর এই আবির্ভাবকালকেই শাস্ত্রে দুর্গাপূজার প্রশস্ত সময় বলা হয়েছে।

'মহাভাগবত'-এ আছে, রামচন্দ্রের আদিত্যস্তবে তুষ্ট ব্রহ্মা লঙ্কার সমুদ্রতীরে এই পূজা সম্পন্ন করেন। বোধ নবমীতে বোধন করে সেদিন থেকে শুক্লা ষষ্ঠী পর্যন্ত দেবীর সাধারণ পূজা হয়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যাবেলায় দেবীকে বেলপাতায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস, সপ্তমীতে নবপত্রিকা প্রবেশ অর্থাৎ কলাবৌ পূজা এবং সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মৃন্ময় মূর্তিতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে সন্ধিপূজা এবং দশমীতে সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন হয়। নবমীতেই রামচন্দ্র রাবণবধে সমর্থ হন। দশমীতে তাই বিজয়োৎসব সম্পন্ন হয়। 'কালিকাপুরাণ'-এও দুর্গাপূজা সম্বন্ধে এই একই কাহিনী বর্ণিত। এইসব কাহিনী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্রহ্মা পূজারী ছিলেন, রামচন্দ্র নয়। এইরকম অনেক পুরাণেই অকালবোধনের একই তথ্য পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মাই সর্বত্র পুরোহিতরূপে দেবীর কাছে রাবণবধের প্রার্থনা করেন।

'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর 'চণ্ডী'তে আছে, রাজা সুরথ এবং সমাধি নামে বৈশ্য শরৎকালেই পনেরো দিন যাবৎ মাটির প্রতিমা পূজা করেন। বৈদিক যুগে শরৎকালে নতুন বছরের শুরু এবং এই নতুন বছরেই 'রুদ্রযজ্ঞ' সম্পন্ন হতো। রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি হলেন দুর্গা, তাই শরৎকালে রুদ্রযজ্ঞের বিবর্তিত রূপ দুর্গাপূজা হয়। অনেকে মনে করেন, শরৎকালে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে রুদ্র ও অম্বিকাকে তুষ্ট করা হতো।

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'মহাপূজা' বলা হয়। মহাস্নান, পূজা, হোম, বলিদান—এই চারটি পর্বেই মহাপূজা সিদ্ধ হয়। 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ দেবী দুর্গা 'কুমারী' নামে অভিহিতা। দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীর মন্দিরে কুমারী প্রতিমার পূজা দেবী দুর্গারই ঐতিহ্যবাহী। তান্ত্রিক মতবাদের প্রতিফলন কুমারীপূজা সব শক্তিপীঠেই হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা করেছিলেন। শ্রীমায়ের নামে পূজার সঙ্কল্প হয়। ঋতুমতী না হওয়া ষোলো বছর পর্যন্ত মেয়েরা কুমারীপূজায় নানা নামে অভিহিতা হয়ে পূজিতা হয়। কথিত আছে, একটি কুমারী কন্যাকে খাওয়ালে বিশ্বভুবনকে খাওয়ানো হয়। দশমীতে দেবী বিসর্জনের দিন অপরাজিতা পূজা, সিদ্ধিপান, পারস্পরিক প্রীতি-সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম—এইসব সৌহার্দ্যতা চলে। উত্তর ভারতে 'রাবণবধ' বা 'দশেরা উৎসব' সাড়ম্বরে পালিত হয়।

যদিও প্রবাদ অনুযায়ী, সদানন্দের পদানুসরণ করে বাংলায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দশভুজা দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন, কিন্তু 'দুর্গামঙ্গল'-এর 'দুর্গাসপ্তশতী'তে দেবী চণ্ডিকা ও চণ্ডীপাঠ প্রসঙ্গে জানা যায়, বাংলাদেশে রাজা দনুজমর্দন

দেব প্রথম দশভুজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এই উপলক্ষ্যেই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর চণ্ডীকাহিনী অবলম্বনে 'দুর্গামঙ্গলকাব্য' বাঙলায় বিবৃত করা হয়। দেবীপূজায় চণ্ডীপাঠ একটি প্রধান অঙ্গ। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সার 'চণ্ডী'র মধ্যে নিহিত। 'গীতা'র মতো 'চণ্ডী' হিন্দুদের কাছে সমাদৃত ও নিত্যপাঠ্য।

দুর্গাপূজা তিনরকমভাবে সম্পন্ন হয়। সাত্ত্বিক পূজার উপকরণ নিরামিষ, সঙ্গে জপ ও যজ্ঞ। দ্বিতীয়ত, রাজসিক পূজায় আমিষ উপকরণ, পশুবলির ব্যবস্থা এবং জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্র। তৃতীয়ত, তামসিক পূজায় মদ-মাংস প্রধান উপকরণ; জপ, যজ্ঞ, মন্ত্রের ব্যবস্থা নেই। ব্যাধজাতি সাধারণত এইভাবে দুর্গাপূজা করে থাকে। দুর্গা বিশ্বমাতা— 'জগতাং ধাত্রী'। বিশ্বজননীর এই পূজায় সকলের অধিকার ও অবাধ আমন্ত্রণ আছে। অর্থাৎ দুর্গাপূজা সার্বজনীন। এই পূজায় দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়—'শবরোৎসব' ও 'শক্রবলি'। দুটি বিশেষ ব্রতও আছে—'দুর্গাষষ্ঠী ব্রত' ও 'দুর্গাষ্টমী ব্রত'। সন্তানের মা ও সধবারা এটি করে থাকেন। মা দুর্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন প্রতিবার বিভিন্ন যানে, যা উল্লিখিত হয় বিভিন্ন পঞ্জিকাতে। এবং ফিরেও যান সেই মতে। নৌকায়, দোলায়, গজে বা ঘোটকে হয় দেবী দুর্গার এই যাতায়াত।

বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে দুর্গাপূজা হয় তা সম্ভবত ষোড়শ শতকে প্রচলিত। আকবরের রাজত্বকালে 'মনুসংহিতা'র বঙ্গদেশি প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপ্রতিমার পূজা করেন। কুল্লুক ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী তাঁকে যজ্ঞের ফললাভস্বরূপ দুর্গাপূজার নির্দেশ দেন এবং পণ্ডিত নিজেই দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন ও সেইমতো পূজা হয়।

দেবীপূজার ইতিহাস বাংলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রেই প্রধান নয়, দেবীকে অবলম্বন করে বাংলার শক্তিসাধনাও ক্রমবিস্তারলাভ করেছে। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কালী এবং দশমহাবিদ্যার দেবীরাই প্রধানা। তবে দুর্গাপূজা প্রাচীনতা এবং ব্যাপকতায় এখনো পর্যন্ত বাঙালির সর্বপ্রধান পূজা। রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে চণ্ডীপাঠ বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অঙ্গরূপে দেখা দিলেও সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন প্রাধান্য দেখা যায় না। বাংলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, এই সাংবৎসরিক উৎসবের সঙ্গে মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত্র ও পরবর্তী কালে জমিদারি তালুকদারি তন্ত্রের যোগ আছে। সাড়ে ছয়হাজার বছর যাবৎ এই শারদোৎসব শরৎ ঋতু প্রবেশজনিত উৎসব। দুর্গাপূজা উৎসবপ্রধান বলেই সম্ভবত সাধনার ক্ষেত্রে কালী এবং দশমহাবিদ্যার দেবীগণ বেশি প্রাধান্যলাভ করেছেন। তবে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কালী এবং পার্বতী, উমা, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী—সবই অভিন্না।

হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ ও সীতারাম—এই তিনটি যুগলরূপ ভারতে প্রসিদ্ধ হলেও দেবী গৌরী বা পার্বতীকে আমরা পেয়েছি অতি প্রাচীনকাল থেকে সর্বরূপে এবং সর্বমহিমায়। সর্বব্যাপিণী, সর্বৈশ্বর্যময়ী, আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলব্ধি করে শাক্তসঙ্গীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদ সন্তানের যে সর্ববিস্মারক আকুতি দেখিয়েছেন, তা আর কোন সাহিত্যেই নেই। সাধক রামপ্রসাদ শ্যামাপূজাকে যে একটি সার্বজনীন ধর্মসাধনার রূপ দিয়েছেন, পরবর্তী কালের সাধকগণ তার আরো বিস্তার ঘটিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ শতবর্ষ কালে বাংলার জনমানসের মধ্যে শাক্তধর্ম একটি সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ধারারই পরিণতিলাভ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মেতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বোধি', তাঁরই আশ্রয় নেন বিদেশি শাস্ত্রদর্শনে পরিশীলিত 'বুদ্ধি'— যার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। শক্তিসাধনা-লব্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের বোধিকে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেন বেদান্তরূপে।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া এক হয়েও বহু মূর্তিতে ভক্তদের কাছে উপাস্যা। অর্থাৎ যিনি দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মাকে যে যেরূপে চিন্তা করবে, তাকে তিনি সেই রূপেই দর্শন দেবেন। মায়ের অপার মহিমায় ও সিঞ্চিত করুণাধারায় আপ্লুত বঙ্গবাসী শারদীয়া দুর্গাপূজাতে উৎসবের ফল্গুধারায় আবেগবিহ্বল অনুভূতিতে মহিষমর্দিনী মায়ের শরণাপন্ন হয়। তারা ভক্তিশ্রদ্ধায় বিধিনিয়মে জপযজ্ঞে নৈবেদ্য-উপচারে মহিমান্বিত করে তোলে দুর্গাপূজা ও তার ঐতিহ্যকে। ❑

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৪০৯
শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৩৮১
দেবী দুর্গা—স্বামী অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৯৮
বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩
৫ দুর্গাপূজা সেকাল থেকে একাল—বিমলচন্দ্র দত্ত, ১৩৯৩

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সাহিত্যসাধক বসন্তরঞ্জন রায়

শান্তি সিংহ*



॥ এক ॥

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ গবেষকের মতে, বাঙলা ভাষার প্রথম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ " 'চর্যাপদ' যেমন আদি বাঙলাভাষার প্রথম নিদর্শন, তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের বাঙলাভাষার প্রথম নিদর্শন।"[১]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের আবিষ্কারক, বসন্তরঞ্জন রায়ের (১৮৬৫-১৯৫২) জন্ম বাঁকুড়া জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম বেলিয়াতোড় বা বেলেতোড় গ্রামে। তাঁর মাতা ও পিতার নাম মুক্তকেশী (ডাকনাম মোক্ষদা থেকে মকুদেবী) এবং রামনারায়ণ। লক্ষণীয়, রামনারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর রামতারণের দ্বিতীয় পুত্র যামিনীরঞ্জন রায় (১৮৮ ১৯৭২), যিনি শিল্পী যামিনী রায় নামে সুপরিচিত।

রামনারায়ণ এবং রামতারণের পিতা গোপালচরণ রায়। পুরুলিয়া শহরের আমলাপাড়ায় তাঁদের আবাসস্থল এখনো সাবেকি জমিদারবাড়ি হিসাবে বিদ্যমান।

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জন বেলেতোড় গ্রামের দুর্গামেলায় (নিয়োগীমেলায়) পাঠশালার পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডলের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর পিতার কর্মস্থলে স্বল্পদিন পড়ার পর তিনি পুরুলিয়ায় বেণীমাধব রায়ের আশ্রয়ে থেকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। পুরুলিয়ার ধনী জমিদার বেণীমাধব ছিলেন বসন্তরঞ্জনের পিতামহ গোপালচরণের অগ্রজ। বেণীমাধব রায়ের পুত্র উমাচরণের বিবাহ হয় হুগলির আঁটপুরে বাবুরাম ঘোষের (উত্তর জীবনে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ নামে সুপরিচিত) বোন চন্দ্রকামিনীর সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাবুরাম ঘোষের অপর ভগিনী কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসু।

উমাচরণ রায়ের পুত্র প্রাণকৃষ্ণের অভিভাবকত্বে বসন্তরঞ্জন রায় পুরুলিয়ায় পড়াশুনা করতেন। অথচ তীব্র অনুভূতিপ্রবণ, সাহিত্যপ্রাণ বসন্তরঞ্জনের অঙ্ক কষতে মোটেও ভাল লাগত না। অথচ স্কুল জীবনেই 'বৈষ্ণবপদাবলী', বিশেষত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ছন্দে তিনি খুঁজে পেতেন মুক্তির আকাশ, জীবনের ছন্দ আর বৈষ্ণব কবিতার রসমাধুর্য।

উত্তরাধিকার সূত্রে সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী বসন্তরঞ্জন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে মানভূম-পুরুলিয়ার রুক্ষপ্রান্তরে, পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন।

॥ দুই ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর 'নবম সংস্করণের ভূমিকা'য় অধ্যাপক মদনমোহন কুমার লিখেছেন ঃ "বসন্তরঞ্জন পরিশ্রমী ও মেধাবী ছাত্র হইলেও অঙ্কে ছিলেন কাঁচা, ফলে থার্ড ক্লাসে (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি) বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করেন।" অধ্যাপক কুমার এবং অন্যান্য গবেষকদের ধারণা, বসন্তরঞ্জনের প্রথানুগ পড়াশুনার ইতি তখনি হয়। কিন্তু সে-ধারণা সঠিক নয়। বাড়ির চাপে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসেছিলেন।

প্রথানুগ স্কুল-কলেজ শিক্ষায় আগ্রহ না থাকলেও সাহিত্যপাঠে তাঁর গভীর মনস্কতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, ভাগবত-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন পুঁথি পাঠে তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মে। তাই স্বচেষ্টায় সংস্কৃত, মাগধি, পালি, প্রাকৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় তাঁর ক্রমশ ব্যুৎপত্তি হয়।

* *রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার বাঙলা বিভাগের শিক্ষক, সুলেখক।*

১২৯৪ বঙ্গাব্দে বিয়ের পর বসন্তরঞ্জন কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। অথচ তাঁর ডাক্তারি পড়া ভাল লাগত না। তাই তাঁর মায়ের অসুখের সময় বেলেতোড়ের বাড়ি গিয়ে আর ফিরে আসেননি। কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছায় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল স্টোর্সে (ডিপার্টমেন্টে) দেশি ওষুধ সরবরাহ কাজের জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। তা না-মঞ্জুর হলে তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের সৈন্যবিভাগে যোগদানের আবেদনপত্র বাড়ির চাপে জমা দেন। অতঃপর তিনি পিতার আজ্ঞায় পালামৌ খাসমহলে চাকরির চেষ্টাও করেন। অবশেষে ত্রিহুত রেলওয়ে অফিসে তিরিশ টাকা মাইনের কেরানির চাকরি স্বচেষ্টায় জোগাড় করেন। ইতোমধ্যে শিশুপুত্র রামপ্রসাদ এবং বালিকা কন্যা উষাকে নিয়ে বসন্তরঞ্জন সস্ত্রীক সমস্তিপুরের শ্বশুরবাড়িতে আসেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর জমিদারির 'রিসিভার' হিসাবে তাঁর নাবালক দুই পুত্র ও এক কন্যার অভিভাবকও হন। বসন্তরঞ্জনের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী, শ্যালিকা এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গৌরীপ্রসাদ (মাত্র একবছর বয়সে) আকস্মিকভাবে মারা যায়। সমস্তিপুরের সেই বিশাল বাড়িটি ভূতুড়ে ছিল বলে বসন্তরঞ্জনেরও ক্রমে বিশ্বাস হয়। এপ্রসঙ্গে তাঁর পৌত্র কৃষ্ণগোপাল জানিয়েছেন ঃ "সমস্তিপুরে যে-বাড়িতে [বসন্তরঞ্জন] থাকতেন, সেই বাড়ির একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা তিনি একদা আমাকে বলেছিলেন, 'ভাই, বাড়িটা একটু গোলমেলে ছিল, অর্থাৎ ভূতুড়ে। আমি ভূতকে বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু বাড়ির জিনিসপত্র এখান থেকে ওখানে বাড়ির মধ্যে স্থানান্তরিত হতো। তাতে তোমার ঠাকুমা ও তোমার বাবার মামারা খুব ভয় পেত। একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বাজার থেকে ছোট এক ঝুড়ি পাকা আতা এনেছিলাম। সেটা ভাঁড়ারঘরে রাখা ছিল। সন্ধ্যেবেলা খাবার সময় আতার ঝুড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল, বাগানে তুলসীতলায় আতার ঝুড়ি বসে আছে। অনেক সময় হঠাৎ দোতলার জানালা খুলে গেল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার বন্ধুরা বলত—ঐ বাড়িতে কোন কিছু দেখতে পাও? আমি উড়িয়ে দিতুম।'"[২]

সমস্তিপুরে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় বসন্তরঞ্জন মাতৃহীন শিশুপুত্র রামপ্রসাদকে নিয়ে বেলেতোড় গ্রামে ফিরে আসেন। বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের চাপে তিনি আর দারপরিগ্রহ করেননি। গভীর অধ্যয়নে এসময় মগ্ন থাকার মাঝে ১৩১১ বঙ্গাব্দে তাঁর ভাগ্যাকাশে আসে নতুন দুর্যোগ। ঐ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর জননী এবং মাত্র ছয়মাসের মধ্যে তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। মাতৃপিতৃহীন বসন্তরঞ্জনকে প্রকৃত অর্থে অভিভাবকহীন, অনাথবৎ দেখে প্রাণকৃষ্ণ রায়ের মাতুল বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ) বসন্তরঞ্জনকে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ করে দেন। দীক্ষাগ্রহণের পুণ্য স্মৃতিকথা বসন্তরঞ্জন তাঁর গ্রামের আপনজন কপর্দ্দীশ্বর রায়ের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন। ২৬.২.১৯৭৪ তারিখে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সেই স্মৃতিকথা নিজস্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফি। কপর্দ্দীশ্বর রায় বলেছিলেন ঃ

"তাঁর [বসন্তরঞ্জনের] জীবনের শেষ ২-৩ মাস প্রায়ই গল্প করতেন সাহিত্য নিয়ে, আর করতেন ছোট ভাই হরিদার কথা। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্র নেওয়ার কথা বলেছিলেন। বসনদা (বসন্তরঞ্জন) বলেন, 'শ্রীমা দিন স্থির করে দেন। স্নান সেরে গেলুম। আসন পাতা ছিল, তাইতে বসিয়ে শ্রীমা বললেন—"একটু স্থির হও।" পরে কেউ নেই দেখে নিয়ে নাম দেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে বলেন—"আমি তোমার গুরু নই, ঐ তোমার গুরু।" তারপর অঞ্জলি পেতে বলেন—"দাও তোমার জন্মজন্মান্তরের সব পাপ আমায় দাও।" আমার চোখ জলে ভেসে গেল। তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। শ্রীমা মাথাটা ধরে তুলে দেন।' "

প্রত্যক্ষদর্শী কপর্দ্দীশ্বর সদাচারপূত বসন্তরঞ্জনের আরেকটি চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন ঃ "বসনদা (বসন্তরঞ্জন) যৌবনে স্ত্রী বেঁচে থাকতেই নিয়মিত একাদশী করতেন। একদিন রান্নাবাড়ির দাওয়ায় রামনারায়ণ-জ্যাঠা, হরিদা (বসন্তরঞ্জনের অনুজ নলিনীরঞ্জন) ভাত খেতে বসেছেন। সেদিন পুকুর থেকে বড় বড় মাছ এসেছিল। বসনদার পাতে ছিল পেঁপে আর মিষ্টি। জ্যাঠা বসনদার পাত দেখছেন আর 'হুঁঃহুঁঃ' করছেন বিরক্তির সঙ্গে। জ্যাঠাইমা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'ওরকম হুঁঃহুঁঃ করছ কেন?' রাগী জ্যাঠামশাই বসনদার পাতের দিকে একবার চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে খেতে লাগলেন। বসনদা তখন হাত গুটিয়ে বললেন বাবা-মাকে, 'তোমরা বেঁচে থাকতে আমি আর একাদশী করব না।' তখন রামনারায়ণ-জ্যাঠা মাছের মুড়ো ভেঙে বসনদার পাতে দিলেন। জ্যাঠা বসনদাকে খুব বেশি ভালবাসতেন।"

॥ তিন ॥

বিদ্যানুরাগী বসন্তরঞ্জন জমিজমা দেখাশোনা অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য পাঠে, বিশেষত সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অবহট্ঠ-মাগধী অপভ্রংশজাত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে লেখা সাহিত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলার লোকজীবনে ক্ষেত্রসমীক্ষাসূত্রে শব্দসঙ্কলন ও ছড়া-প্রবাদ সংগ্রহে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। সেই সুবাদে একদা 'দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার' সংস্থার সহসভাপতি এল. লিয়োটার্ডের (L. Liotard) কাছে তিনি তিন কিস্তিতে দেড় হাজারের বেশি বাঙলা শব্দসঙ্কলন পাঠান। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৭ ফাল্গুন (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি) 'দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার' সংস্থার বাঙলা নাম হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্'। পরিষদের সদস্যভুক্তির সুবাদে বসন্তরঞ্জন আরো কিছু ছেলে-ভুলানো ছড়া লালমাটির দেশ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া

প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে পরিষদের মুখপত্রে পাঠান। ১৩০২ সালের ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ছড়াগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পরেও বসন্তরঞ্জন উক্ত গ্রন্থের আরো তিনটি পুঁথি উদ্ধার করেন। তারপর প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর সংগৃহীত তিনখানি পুঁথির পাঠ মিলিয়ে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) তিনি সম্পাদনা করেন নবরূপে 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী'। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অতুলনীয় গবেষণায় বিমুগ্ধ হয়ে নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধায় 'বিদ্বদ্বল্লভ' উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর পুঁথি-অনুসন্ধান এবং পুঁথি-গবেষণাকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে বসন্তরঞ্জন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অবৈতনিক পুঁথি-সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষোড়শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে উল্লিখিত হয় ঃ "স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নাম পরিষদের পুঁথি-সংগ্রাহকরূপে লিপিবদ্ধ হইবে।"

পুঁথি-সংগ্রহকর্মে নিবেদিতপ্রাণ বসন্তরঞ্জনের অক্লান্ত ক্ষেত্রসমীক্ষায় মাস দুইয়ের মধ্যে কালজয়ী পুঁথি-আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন কাঁকিল্যা গ্রামে মল্লরাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে তিনি একক প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মহাগ্রন্থের পুঁথি। অতঃপর পাঁচবছর ধরে পুঁথিটি সম্পর্কে তিনি নানা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। লক্ষণীয়, তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথির প্রথম, মাঝের এবং শেষের দিকে কিছু পৃষ্ঠা পাওয়া না গেলেও এবং আবিষ্কৃত পুঁথির মাঝে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি পেলেও বসন্তরঞ্জন সুনিশ্চিত যুক্তিতে ঋদ্ধ হয়েই তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাখার পক্ষপাতী হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষী তাঁর যুক্তিসমূহ মান্য করায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, গ্রন্থ প্রকাশের সম্যক ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। প্রকাশিত গ্রন্থটির সম্পাদকীয় অংশে বসন্তরঞ্জনের প্রাসঙ্গিক অভিমত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ "প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা চলে না, এবং উচিতও নয়। ছাপা বইয়ের ভাষা প্রায়শ আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র—একেবারে নতুন ছাঁচে ঢালা। ছাপাতে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির তল্লাসে প্রবৃত্ত হই। কাজটি কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুঁথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝানো সুকঠিন। সুদূর মফস্সলের সর্বত্র যানবাহন সুলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও নাই বলিলেই হয়। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভাদর্শনের সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; একক্ষেত্রে জীবনসংশয় ঘটনা ঘটে।" অধ্যাপক মুস্তাফির স্মৃতিচারণ ঃ

"পুঁথি অনুসন্ধানে [বসন্তরঞ্জন] একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কত নির্জন, বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়াছেন! একবার দামোদর নদের তীরবর্তী স্থানে, রাতের অন্ধকারে, ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। তাহারা পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। তাঁহার পিতা রামনারায়ণের অন্নদাস কিছু ডাকাত ছিল জমিদারি চালানোর ব্যাপারে। তাহাদেরই কেহ বসন্তরঞ্জনকে চিনিতে পারিয়া ক্ষতি করে নাই। অপর এক সময়ে পুঁথির অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুর অভিমুখে গরুর গাড়িতে করিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে বাঘের দর্শন মেলে। সাহসে ভর করিয়া বসন্তরঞ্জন গাড়িতে যে বিচালি (খড়) পাতা ছিল, তাহাতে আগুন ধরাইয়া গাড়ির সামনে রাখেন এবং তাহাতে কাঠিকুটা দিয়া আগুন করেন। ফলে বাঘটি চলিয়া যায়।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রবন্ধে বসন্তরঞ্জন রায় লিখেছেনঃ "পুঁথিখানি (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) বাঙ্গালা তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা, ২২৬ পত্রের (পৃষ্ঠা) পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড। কৃষ্ণকীর্তন অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। অক্ষরগুলি অনেকটা খ্রিস্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ। পুঁথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজে লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।" (পৃঃ ১২৩-১২৪)

উল্লেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পুঁথি-সংগ্রাহক পদে সংযুক্তিসূত্রে বসন্তরঞ্জনকে কলকাতায় ঘরভাড়া নিতে হয়। তিনি বেলেতোড় গ্রাম থেকে উঠে আসেন ৫/১ ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিটে, অবশেষে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ঘরভাড়া নেন। বসন্তরঞ্জন-পৌত্র কৃষ্ণগোপালবাবু জানিয়েছেন ঃ "বসন্তরঞ্জন প্রথম যখন কলকাতায় এলেন, তখন বৈঠকখানা রোডে একটি বাসাভাড়া করে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন খুড়তুতো ভাই যামিনীরঞ্জন (শিল্পী যামিনী রায়) ও তাঁর কনিষ্ঠ রজনীরঞ্জন। সেইসময় পুত্র রামপ্রসাদকে বেলেতোড় স্কুল থেকে তুলে নিয়ে

হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। কলকাতার বাসাবাড়ি থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাতায়াত করতেন।"

বসন্তরঞ্জনের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি আবিষ্কার এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুঁথিটির সম্পাদনকর্মের অব্যবহিত পরে বাংলার বিদ্বৎসমাজে যুগপৎ বিস্ময়-শ্রদ্ধা এবং তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তার কারণ—সম্পাদিত গ্রন্থটির নামকরণ ও আবিষ্কৃত পুঁথিটির প্রাচীনত্ব ও লিপিকাল এবং কবি চণ্ডীদাস এক না একাধিক প্রভৃতি নানা সংশয়সূত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ। লক্ষণীয়, তথাকথিত প্রতিপক্ষের পণ্ডিতবর্গের উপর্যুপরি যাবতীয় যুক্তিজাল হেলায় ছিন্ন করেছিলেন বসন্তরঞ্জন—যিনি ছাত্রজীবনে এন্ট্রান্স-অনুত্তীর্ণ আলাভোলা এক 'বাঁকড়ি' মানুষ! তখনি মনে জাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমৃতবাণী ঃ "ওদেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা তার পিছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। জ্ঞান আর ফুরায় না।"[৩] তিনি আরো বলেছেন ঃ "বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মতো হয়ে যায়।"[৪]

অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফির স্বহস্তে লেখা 'স্মৃতিকথা'য় রবীন্দ্রসমীপে গবেষক বসন্তরঞ্জনের চিত্রটি এইরকম ঃ "ত্রিবেদীমশায়ের (রামেন্দ্রসুন্দর) নির্দেশে এবং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিটি কবিকে দেখাইতে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে বসন্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের কলিকাতার বাটিতে যাইলে এক চাপরাশি একটি শ্লেট ও পেন্সিল তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বলে—পরিচয়, কী প্রয়োজন ইত্যাদি লিখে দিতে। বসন্তরঞ্জন বলেন, 'তোমার বাবুকে গিয়ে বলো গে যে, বসন্ত রায় বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দেখা করার সময় হবে কী?' চাপরাশি কী বলিয়াছিল জানা নেই, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কবি স্বয়ং আসিয়া সাদরে বসন্তরঞ্জনকে ঘরে বসাইয়া আপ্যায়ন করেন। বসন্তরঞ্জন পুঁথিখানি কবিকে দিয়া বলেন, 'পড়ে মতামত দেবেন।' কবি পুঁথিখানি কিছুক্ষণ দেখিবার পর বলেন, 'পুঁথিখানির স্পর্শে ধন্য হলুম। তবে আপনি এর পাঠোদ্ধার না করা পর্যন্ত এর রসাস্বাদনে বঞ্চিত রইলুম। আমি কবি, ভাষাবিদ বা পণ্ডিত নই।' "

॥ চার ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের সুযোগ হয়। সেইসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পুঁথিশালা (Bengali Manuscripts Library) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে উপাচার্য মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল কার্যকরী প্রস্তাবে (Calcutta University Executive P. G. Arts Resolution No. 6) বসন্তরঞ্জন রায়কে বাঙলা বিভাগের আংশিক শিক্ষক (Part time Tutor) পদে নিযুক্ত করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে এম. এ. ক্লাসে বাঙলা পাঠক্রমের দ্বিতীয়পত্র পড়ানো শুরু করেন বসন্তরঞ্জন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে বসন্তরঞ্জন তাঁর শিক্ষণযোগ্যতা প্রমাণের ভিত্তিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

গবেষকের নিষ্ঠা, সততা ও ছাত্রদরদি শিক্ষক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কর্ম করে যথারীতি অবসরগ্রহণ করেন বসন্তরঞ্জন। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। তাই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণের সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য তাঁকে 'সরোজিনী বসু সুবর্ণপদক'-এ সম্মান জ্ঞাপনের সময় তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "আমাদের দেশ ভূতের মতো পিছু হাঁটে। আমি ঘাটের মড়া, এক পা গঙ্গামুখো, আমায় মেডেল দেওয়ার কী সার্থকতা? বরং নবীনদের মধ্যে যে বাঙলা ভাষা অথবা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, তাকেই মেডেল দেওয়া হোক।" এধরনের নিরাসক্তি তাঁর সুবর্ণ-সম্মান গ্রহণের সময় প্রকাশিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করতে চাইলে সেই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি সবিনয়ে জানান ঃ "আমি রায়ও বটে, বাহাদুরও বটে।" বলা বাহুল্য, লোকায়ত চেতনার অনুসারী হয়ে সেই বর্ণকৌলিন্যের পোশাকি শিরোপা তিনি গ্রহণ করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার অনুধ্যানী বসন্তরঞ্জন অখ্যাত-অবহেলিত-মেহনতি মানুষদের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাই মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা বা অবমাননাকে তিনি ধিক্কার দিতেন, কলকাতা মহানগরীর বুকে মানুষে টানা রিক্সায় আয়েশি বা বিলাসি মানুষের যাতায়াত বা প্রমোদভ্রমণকে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা মনে করতেন। তাই এই অমানবিক প্রথাকে তিনি 'কলকাতার কলঙ্ক' বলতেন। বেদনামিশ্রিত ক্ষোভে তিনি একদিনও টানা রিক্সায় চড়েননি। গ্রামে বা শহরে মুটে-মজুর বা গরিব মেহনতি মানুষদের অহেতুক বেশি খাটানোর পর তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানায় তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী হতেন, বাড়ির কাজের লোকদের 'মা' বা 'বাবা' বলে সস্নেহে ডাকতেন এবং চমৎকার ব্যবহার করতেন।

নারীজাতির প্রতি বসন্তরঞ্জনের ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। বাড়ির মেয়েদের দিয়ে পুরুষদের ব্যবহার্য ধুতি-পাঞ্জাবি, ফতুয়া-গেঞ্জি কাচানো তিনি পছন্দ করতেন না। তাই নিজের ঐসব কাজ তিনি নিজে সানন্দে করতেন, প্রতিদিন। সাধারণ বাঙালি জীবনে মেয়েরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে

রান্নাঘরে। অথচ রান্নাঘর থাকে অপ্রশস্ত ও আলোবাতাসহীন, ঘিঞ্জি। তাই বসন্তরঞ্জন গৃহস্থালির কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেনঃ "বাড়ি করবার সময় পায়খানা আগে তৈরি করে, তবে ঠাকুরঘরের কথা ভাবতে হয়। মেয়েরা বেশির ভাগ সময় রান্নাঘরে থাকেন বলে রান্নাঘর সবচেয়ে প্রশস্ত ও খোলামেলা হওয়া দরকার। অথচ আমরা করি তার উলটো।" বিবাহিতা মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করলে বলতেনঃ "সাবিত্রী হও।"

॥ পাঁচ ॥

বসন্তরঞ্জন তাঁর প্রথম যৌবনে শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্য হয়েছিলেন মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমে। তারপর জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় এবং গবেষকসত্তার ক্রমবিস্তার ও লোকপ্রসিদ্ধি ঘটে। দীক্ষাগ্রহণের সময় থেকে তিনি আমৃত্যু প্রতিদিন জপধ্যান থেকে কখনো বিরত হননি। তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল সাদাসিধা এবং ভারতীয় সংস্কৃতিবোধে পরিপুষ্ট। অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফির লিখিত 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায়, প্রতিদিন খুব ভোরে, কাক-কোকিল ডাকার আগেই তাঁর ঘুম ভাঙত। ঘুম থেকে উঠে তিনি বিছানায় বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন। প্রাতঃকৃত্য শেষে পাতলা চা খেতেন, নিজে কাপ-ডিশ ধুয়ে নিতেন। তারপর গড়গড়ায় তামাক সেবন এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পড়া। তিনি চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করতেন না, একটি মোড়ায় বসতেন আর ছোট টিপয় বা টুলকে টেবিলের মতন ব্যবহার করতেন। ফাউন্টেন পেন নয়, তিনি দোয়াত-কলম আর কপিং পেন্সিলে লিখতেন। তিনি গায়ে ও মাথায় নারকেল তেল মেখে বারোমাস উষ্ণ জলে স্নান করতেন, কখনো সাবান ব্যবহার করতেন না। গঙ্গার পলিমাটি মাঝে মাঝে গায়ে মেখে তা শুকালে স্নান করতেন। স্নানের পর পরনের থান-ধুতি ফতুয়া নিজে ধুয়ে-নিঙড়ে শুকাতে দিতেন। দুপুরে এবং রাতে খাওয়ার আগে প্রতিদিন দুবার জপে বসতেন। প্রতিবার জপে সময় লাগত অন্তত একঘণ্টা। পদ্মাসনে বসে তিনি স্থিরভাবে জপ করতেন। এই জপধ্যানে নড়চড় হয়নি আজীবন। তিনি ফতুয়া বা হাতকাটা পাঞ্জাবি এবং থানধুতি (পাড়হীন) পরতেন, শীতকালে ফুলহাতা গরমের পাঞ্জাবি ও বালাপোষ ব্যবহার করতেন, মাথায় পরতেন বিশেষ ধরনের টুপি। তিনি বলতেন, স্বামী সারদানন্দের আদর্শে টুপি পরা। বাড়িতে চটি এবং বাইরে জিভওলা নিউকাট জুতো পরতেন। জুতো পালিশ বরাবর নিজে করতেন। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটতেন। স্নানের পর এবং বাইরে বেরনোর আগে চুল ও দাড়ি চিরুনি ও বুরুশ নিয়ে আঁচড়াতেন। ডিম-মাংস প্রথম থেকেই খেতেন না। উত্তরজীবনে স্নেহের পুত্রবধূর ছোট বোন একুশ বছর বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হলে তার সঙ্গে তিনিও মাছ খাওয়া ছেড়ে দেন। প্রতিটি একাদশীর দিন দুপুরে মুগ ভেজা বা সিদ্ধ খেতেন এবং রাত্রে ফলাহার। তাঁর আহার ছিল খুব সাদাসিধে। দুপুরে সামান্য ভাত, পাতলা তরকারি, তবে দুধকলা দিয়ে ভাত খেতে বেশি পছন্দ করতেন। রাতে পাতলা এবং আঁচেপোড়া রুটি তিন-চারটি এবং দুধ খেতেন। পাথরের থালায় খেতে পছন্দ করতেন। গ্লাসে নয়, ঘটিতে জল পান করতেন। হামানদিস্তায় ছেঁচা পান লাড্ডুর মতো গোল করে শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে আলগোছে ফেলে দিতেন। তিনি বিষ্ণুপুরী অম্বুরি তামাক পছন্দ করতেন, গড়গড়ায়। রাত বারোটা বা তারও বেশি সময় পড়াশুনা করলেও তিনি ভোরে ঠিক উঠতেন। বাড়ির দেওয়ালে শোভিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর ফটো তাঁর নিরন্তর প্রেরণার উৎস ছিল। আর ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপকদের একটি গ্রুপ ফটো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনও বিকালের দিকে সাহিত্য পরিষদ অফিসে বা 'প্রবাসী' পত্রিকা দপ্তরে কিংবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণের কাছে বেড়াতে যেতেন। তাঁরাও তাঁর বাড়িতে আসতেন। প্রিয় ছাত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে প্রায়শই আসতেন। তাঁকে আমপোড়ার সরবত দিয়ে গরমের দিনে আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল স্নেহের পুত্রবধূ রেণুকাদেবীর।

প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে মাতৃদর্শনে প্রায় নিয়মিত আসতেন বসন্তরঞ্জন। তাঁর পৌত্র কৃষ্ণগোপাল রায় জানানঃ "বসন্তরঞ্জন মা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাই কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়শই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে যেতেন। তখন তাঁর সঙ্গে ফলমিষ্টি থাকত। মা বসন্তরঞ্জনকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি নিজ হাতে ফলমিষ্টি বসন্তরঞ্জনকে খেতে দিতেন। শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) বলতেন, 'শরৎ, আমার বসন্ত এসেছে, ওকে তোমাদের সঙ্গে খাইয়ে দিও—একই পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে।' শ্রীমা বলতেন, 'বসন্তর সবটাই সাধু, খালি পরনে গেরুয়া বসন নেই।' " ❑



তথ্যসূত্র

১ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৩

২ ২০ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে বর্তমান লেখককে লেখা পত্র।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-লিখিত, কথামৃত ভবন, ১৩৯৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯

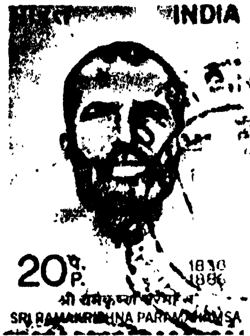
৪ ঐ

ডাকটিকিটে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসহচরগণ

শোভেন সান্যাল

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে যে ভারতীয় ডাকবিভাগও মুক্ত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশিত বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট থেকে। বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডলীর এবং তাঁর সংস্পর্শে আসা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে কয়েকটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে।

এই তালিকায় প্রথমেই পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৩ ভারতীয় ডাকবিভাগ একটি বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এই ডাকটিকিটে স্বামীজীর যে-ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি আঁকা হয়েছিল ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার টমাস হ্যারিসনের তোলা স্বামীজীর সুপরিচিত শিকাগো-বক্তৃতার ছবির অনুকরণে। স্বামীজীর সুবিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকীতে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। এই বহুবর্ণের ডাকটিকিটেও স্বামীজীর সেই একই ভঙ্গিমার ছবি দেখানো হয়েছিল। এই ছবিটির পশ্চাৎপটে ছিল শিকাগো ধর্মমহাসভা যে আর্ট ইনস্টিটিউটে হয়েছিল, তার আভাস। এই ডাকটিকিটের নকশা করেছিলেন বিখ্যাত ডাকটিকিট নকশাকার সি. আর. পাকড়াশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দ স্মারক মন্দিরটিকেও একটি সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিটে প্রকাশ করে বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের সবিশেষ আনন্দিত করেছে ভারতীয় ডাকবিভাগ।





ডাকবিভাগ প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী বিষয়ক ডাকটিকিট

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা 'খুকি', স্বামীজীর 'মানসকন্যা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা' অগ্নিকন্যা ভগিনী নিবেদিতা যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাননি, কিন্তু তিনি তাঁর পরিচয় দিতেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'-রূপে। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। জন্মসূত্রে আইরিশ হয়েও বাংলার তৎকালীন বহু বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তাঁকে ইংরেজ সরকারের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজসেবা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নিবেদিতার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁর সুপরিচিত ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর পোশাকে সজ্জিত একটি বহুবর্ণের ছবি সমেত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ১৯৬৮ সালের ২৭ জুন।

যেকোন কারণেই হোক, তখনো পর্যন্ত ভারতীয় ডাকবিভাগ স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমায়ের কোন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেনি। ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ শ্রীরামকৃষ্ণের আবক্ষ প্রতিমূর্তিসমেত একটি বহুবর্ণের সুন্দর স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। বলা বাহুল্য, ডাকটিকিটটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে খুব আদরণীয় হয়েছিল। বহু সাধারণ মানুষ তা সংগ্রহ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি থাকার জন্যই।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের রূপকার, ধর্মপ্রাণা, দানশীলা, পুণ্যবতী রানী রাসমণিকে ডাকবিভাগ শ্রদ্ধা জানিয়েছে তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৯ এপ্রিল ১৯৯৪ একটি বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পটভূমিকায় গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্না রানী রাসমণিকে দেখানো হয়েছিল এই ডাকটিকিটটিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের শেষপর্বে বেশ কিছু গণ্যমান্য বাঙালি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন তো বাংলার রসসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল, যদিও তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের

* *পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিটের সখের সংগ্রাহক, সুলেখক।*

সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বিখ্যাত হননি—তাঁরা স্ব স্ব কীর্তিতেই সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁদের সেই অমর কীর্তিকে স্মরণ করেই ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই সূত্র ধরেই এই নিবন্ধে তাঁদের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু অধরলাল সেনের বাড়িতে। ঠাকুর তাঁকে সহাস্যে বলেন ঃ "বঙ্কিম, তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?"[১] ইংরেজ সরকারের কর্মচারি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চটজলদি উত্তর ঃ "আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।"[২] রসিক ঠাকুরও খুব সুন্দর করেই প্রত্যুত্তর দেন ঃ "না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন।"[৩] শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী'ও তিনি পঞ্চবটীতে ভক্তদের সঙ্গে বসে বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনেছিলেন ১৮৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর এবং এতে উল্লিখিত নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাও করেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মানে ডাকবিভাগ ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ একটি বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।


তেরঙ্গা পতাকার পটভূমিতে মনীষীদের ছবিসহ ডাকটিকিট

বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও দেখা করতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে বলেছিলেন ঃ "এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।"[৪] বিদ্যাসাগরও হেসে বলেছিলেন ঃ "তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।"[৫] ঠাকুরের উত্তর ছিল ঃ "নাগো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র!"[৬]

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতীয় ডাকবিভাগ একটি রঙিন ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তারপর ডাকটিকিটে আবার তাঁকে দেখা যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিটে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত স্নেহধন্য। তাঁকে বেশিদিন দেখতে না পেলেই ঠাকুর অধীর হতেন। একবার তাঁর অসুখ সারানোর জন্য কলকাতার ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালীকে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্রের তিরোভাবের খবর শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে ভারতীয় ডাকবিভাগ শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল একটি বহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

স্বধর্মত্যাগী মাইকেল মধুসূদন দত্তও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ব্যারিস্টার মধুসূদনকে দক্ষিণেশ্বরে ডেকে এনেছিলেন একটা মামলা উপলক্ষ্যে। সেখানে এসে তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।

শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে নারায়ণ শাস্ত্রী। মাইকেল শ্রীরামকৃষ্ণকে মিনতি করে তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিলেন শান্তির কথা, আশ্বাসের কথা। মধুসূদনের মিনতি সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার চেষ্টা করেও ধর্মত্যাগী মধুসূদনকে সেবিষয়ে কিছু বলতে পারলেন না। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন, মা কালী তাঁর মুখ চেপে ধরেছিলেন—স্বার্থের জন্য ধর্মত্যাগী মধুসূদনের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেননি। কিন্তু মাইকেলের দুঃখ পরম করুণাময় ঠাকুরের বুকে বেজেছিল। তাই তাঁকে বললেন—গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে। তারপর তাঁকে রামপ্রসাদী গান শোনালেন। মধুসূদনের নিমীলিত চোখের নীরব অশ্রুবর্ষণে মিশেছিল তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তির জন্য ভারতীয় ডাকবিভাগ সম্মান জানায় ২১ জুলাই ১৯৭৩ তাঁর মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের সাগরদিঘীতে। আর সেজন্যই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর তারাও এই মহাকবিকে শ্রদ্ধা জানাতে ২৯ জুন ১৯৯৬ বহুবর্ণ এক স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

বর্তমান লেখকের সংগ্রহ থেকেই এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া আরো কেউ এই তালিকায় থাকতে পারেন। ❑

তথ্যসূত্র ঃ ১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ১২১০ ২ ঐ ৩ ঐ ৪ ঐ, পৃঃ ৫০ ৫ ঐ ৬ ঐ

এই রচনাটি 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ইতিহাস

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

বিনয়কুমার ভট্টাচার্য*

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একদিকে পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান ক্যাথলিক সাম্রাজের বিস্তার, আরেকদিক হল্যাণ্ডের ব্যবসায়িক বাড়বাড়ন্ত ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির চাপে মরিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির মানসে রানী প্রথম এলিজাবেথের উদ্যোগ ও তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে একটি বিধিবদ্ধ সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ এই বিধিবদ্ধ সংস্থাটির নামকরণ করা হয় 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'। ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এই পরিচালন পর্যদের প্রথম প্রধান ছিলেন টমাস স্মিথ নামে এক ধনকুবের। লণ্ডন শহরের ফেনচার্চ স্ট্রিটে স্থাপন করা হয় এর সদর দপ্তর। বর্তমানে এর কোন অস্তিত্ব নেই। আর টমাস স্মিথের প্রাসাদটি এখন 'লয়েডস্ ইনসিওরেন্স'-এর প্রধান কেন্দ্র।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ডাচ বা ওলন্দাজদের মতোই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) সোনা-রুপার বিনিময়ে নানা মশলাপাতি, বস্ত্র ও সৌখিন দ্রব্যাদির বাণিজ্য। এই উদ্দেশ্যেই ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ডেলফোর্ড বন্দর থেকে কোম্পানির চারটি ছোট বাণিজ্যতরী যাত্রা শুরু করে। প্রথম কয়েক বছর বেশ ভালরকম লাভ ও আমদানি হলেও ক্রমাগত ওলন্দাজ জলদস্যু ও পর্তুগিজ বোম্বেটেদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে অতঃপর এই কোম্পানি ভারতের দিকে লক্ষ্য স্থির করে। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে তারা প্রথমে মাদ্রাজের উপকূল বরাবর কতকগুলি দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করে। এরপর রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পর্তুগিজ পত্নী ক্যাথারিন-প্রদত্ত বৈবাহিক উপহার বোম্বাইয়ের দুর্গটি ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিকে ভাড়ার বিনিময়ে লিজ দেওয়া হয়। আরো প্রায় ৩০ বছর পর ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী অংশ বঙ্গদেশে কোম্পানির আগমন ঘটে কলকাতায় জব চার্ণকের পদার্পণের মাধ্যমে। বস্তুত, সেইসময় থেকেই ভারতীয় বস্ত্র ও নানা সামগ্রীর বাণিজ্যে কোম্পানির অর্থনৈতিক বিকাশ ও অংশীদারদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ওমপ্রকাশের কথায়, ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে এশিয়া মহাদেশের প্রভূত অবদান রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এইসব দেশ থেকে আমদানি করা অর্থ ও বিভিন্ন পণ্য যেমন বস্ত্র, মশলা, চা, বিলাসদ্রব্য ইত্যাদির প্রভাবে ওদেশের অধিবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এইসব পরিবর্তনের বিরোধিতাও কম ছিল না। চিরাচরিতভাবে ভারতবর্ষ তার শ্রমিকদের দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা বা স্বল্প মজুরির জন্য যেন একটি কর্মশালা। তাই এখানকার শিল্পসামগ্রীর আমদানিতে কোম্পানির বাড়বাড়ন্ত হলেও স্থানীয় উৎপাদকরা প্রমাদ গুনল। প্রতিবাদ জানাতে লণ্ডনে রেশমশিল্পীরা হাঙ্গামা বাঁধায় ও কোম্পানির দপ্তর আক্রমণ করে। ফলস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট এইসব আমদানির ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে এবং অবশেষে ভারতীয় কাপড়—যেমন রেশম, মসলিন, ছাপা-কালি ইত্যাদির ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ হয়। এতে ভারতীয় তাঁত ও শিল্পীদের দুরবস্থার বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের যান্ত্রিক বয়নশিল্পের উন্নতি হতে থাকল।

এদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের জয়লাভের পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস ব্রিটেনের অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ক্রমশই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কোম্পানির ২৪ জন পরিচালকই প্রকৃতপক্ষে একাধারে দেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হতে থাকে, যার লক্ষ্য অবশ্যই অংশীদারদের স্বার্থ। পলাশি যুদ্ধের পরই ফরাসি চন্দননগর ক্লাইভের দ্বারা অধিকৃত হলে কোম্পানির সম্পদ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতে নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠনের পরেও যারা যুদ্ধ, ব্যাধি বা শঠতা থেকে রক্ষা পেত—সেইসব সৈন্য ও অফিসারেরা ঐ সম্পদের অধিকারী হয়ে নিজেদের জন্য আলাদা একটা শ্রেণি 'Nabob' ('নবাব'-এর অপভ্রংশ) তৈরি করেছিল, যারা দেশে ফিরে অভিজাত মহলে সমাদৃত হয়েছিল। শোনা যায়, পলাশি বিজয়ে রবার্ট ক্লাইভের প্রাপ্তি হয়েছিল প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। সেকালে এর মূল্য ধারণার বাইরে।

এইসব ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানির Nabob-রা যেভাবে সমাদর পেত, এমনকি পার্লামেন্টের প্রায় ১০ শতাংশ আসনও দখল করেছিল, তাতে স্থানীয় অভিজাতরা রীতিমতো ক্ষুব্ধই হয়েছিল। ফলে আরেকটা নতুন আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস জেমস ফক্স, এডমণ্ড বার্ক এবং অন্যান্যরা মিলে কোম্পানির কার্যধারা বিশেষ করে অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলসমূহকে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা ভেস্তে যায়। কারণ, রাজা তৃতীয় জর্জ সরকারকে বরখাস্ত করে সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেন। সেই নির্বাচনে কোম্পানির কারসাজিতে একটি বশংবদ পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। তবুও সংস্কারের দাবিতে প্রবল জনমতের চাপে নতুন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট (মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর টমাস পিটের প্রপৌত্র) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' জারি করেন, যাতে কোম্পানির ভারত সম্পর্কিত বিষয়গুলি পার্লামেণ্টের একটি বোর্ড অফ কণ্ট্রোলে ন্যস্ত হয়। এই আইনে ব্যবসা-

* *বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দেশ-বিদেশে বহু বিজ্ঞানসভায় আমন্ত্রিত বিদগ্ধ লেখক।*

বাণিজ্যের ব্যাপারে স্বাধীন হলেও কোম্পানি প্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই পতনোন্মুখ মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় ও আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার উত্তরোত্তর বাড়িয়েই যাচ্ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পাঁচবছরের মধ্যেই কোম্পানি জমির যোজনা আদায় তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেখা দেয় সেই বিখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', যাতে প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায় বলে অনুমান। সেই দুর্ভিক্ষে ত্রাণ দূরের কথা, কর আদায় আরো জোরদার করা হয়েছিল। বস্ত্রশিল্প ও ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে সাধারণের মধ্যে কেনাবেচা নিষিদ্ধ, এমনকি বয়নশিল্পীদের বিশেষত মসলিন প্রস্তুতকারকদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এজাতীয় বয়ন আর সম্ভব না হয়। এমনকি অতি প্রয়োজনীয় লবণের ওপরও কর ধার্য করা হয়েছিল। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিসকে স্বর্ণপদক-সহ বিশেষ নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন লণ্ডনের মেয়র। কারণ, তিনি মহীশূরের টিপু সুলতানকে পরাজিত করে কোম্পানির তরফে কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। তাছাড়া কলমের এক খোঁচায় তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মাধ্যমে বঙ্গদেশে প্রায় দুই কোটি ছোট ভূস্বামীকে চিরকালের জন্য প্রজা বানিয়ে এবং মোঘল আমলের কিছু জোতদারকে পাকাপাকিভাবে জমিদার বানিয়ে এই নতুন শ্রেণির পত্তন করেন কোম্পানির কর আদায় সুনিশ্চিত করার জন্য।

এছাড়াও একচ্ছত্র আধিপত্যের ব্যবসায়িক রমরমা তো ছিলই। ঐ বিশেষ আইন চালু হওয়ার পর প্রায় ৭০ বছর মোটামুটিভাবে কোম্পানির স্বর্ণযুগ ছিল বলা চলে। বর্তমান সিলেনিয়াম ডোমের বিপরীতে টেমস নদীর অপর পাড়ে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাজের মাল খালাস করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল সেইসময়কার সর্বাধুনিক বিশাল এক পোতাশ্রয়—'ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক্স'। কাছেই ছিল কাটলার গার্ডেন্সে ৫ একর জায়গা জুড়ে বিপুলায়তন গুদামঘর। এর কর্মিসংখ্যা ছিল ৪,০০০-এরও বেশি। কর্মব্যস্ততায় পুরো এলাকাটা গমগম করত। বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যের নামে রাস্তা যেমন—'ক্লোভ ক্রিসেন্ট', 'স্যাফ্রন অ্যাভিনিউ' ইত্যাদি আজও সেখানকার আশপাশে রয়েছে।

ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ডে ঘটে গিয়েছে শিল্পবিপ্লব। বিশালাকার কলকারখানায় বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে আরো উন্নত ধরনের বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী। এসবের জন্য চাই বাজার। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ব্রিটেনের শিল্পপতিরা বিশেষ করে কাপড়ের মিল-মালিকেরা ভারতের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের অবসান দাবি করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে সেই অধিকার বাতিল করা হয়। আর সেইসময়েই কোম্পানির ডক ও গুদাম বিক্রি হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, বিলাতি জামাকাপড় ভারতে অবাধে ও প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে। এক হিসাবে জানা যায়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতে ব্রিটেনের বস্ত্র আমদানি বাড়ে ৫১ গুণ, আর ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি নেমে আসে মাত্র এক-চতুর্থাংশে। এতে ভারতের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প ও শিল্পীরা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, বাণিজ্যের ইতিহাসে এই ধরনের বিপর্যয়ের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড-রূপে দেখা দিলেও বণিক বণিকই। অর্থ, আরো অর্থের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকের দল ভারতে এমন কোন হীন কাজ নেই যা করেনি। শোষণের জন্য সাধারণ মানুষের ওপর যেমন চলেছে সীমাহীন নিষ্ঠুর অত্যাচার, তেমনি দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি এদের ব্যবহারও ছিল খুব নৃশংস ও অবমাননাকর। অগত্যা ক্রীড়নক হলেও শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকেই বাদশাহ হিসাবে মান্যতা দেওয়ার দাবি নিয়ে মীরাটের একদল সৈন্য দীর্ঘ ৩৬ মাইল পথ মিছিল করে দিল্লি যায়। প্রত্যুত্তরে তাঁর দুই পুত্র ও পৌত্রকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয় ও বৃদ্ধ সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করে বর্মায় (মায়ানমার) নির্বাসন দেওয়া হয়। সামান্য একটা বন্দুকের কার্তুজের চর্বিযুক্ত খোলের ব্যাপারে ঐ মীরাট সেনানিবাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শুরু হয় বিখ্যাত 'সিপাহী বিদ্রোহ'। প্রায় দুবছর এই বিদ্রোহ চললেও ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর, বর্তমান বিদেশ ও কমনওয়েলথ দপ্তরের অদূরে পুরনো ইণ্ডিয়া অফিস ভবনের সামনে রবার্ট ক্লাইভের প্রতিমূর্তির সামনে এক সরকারি আদেশনামায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। তিনবছর পর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসটিও ভেঙে ফেলা হয়। এইভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা হয় একসময়কার প্রতাপশালী কোম্পানিটির নাম। তখন থেকে ভারতে ব্রিটিশ রানী ও পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসনের সূচনা হয়। এর পরিণতিও আজ সকলের জানা। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ❑

তথ্যসূত্র ঃ

In search of East India Company—Nick Robins, DTE-10(20), 2002

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

গণেশ পাইনের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সাক্ষাৎকার ঃ দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের অন্যতম কৃতী শিল্পী গণেশ পাইনের জন্ম ১১ জুন ১৯৩৭। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর শিল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। গত ২১ মার্চ ২০০৪ তাঁর কাছে রাখা প্রশ্নগুলির উত্তর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি দিয়েছেন।

• *আমার নমস্কার নেবেন গণেশদা। আজ চিত্রশিল্পের জগতে যে-পর্যায়ে আপনি উন্নীত হয়েছেন, সেখানে আপনার মা-বাবা ও বাড়ির প্রভাব নিশ্চয় কিছু রয়েছে। সেসম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি।*

— আমার জন্ম উত্তর কলকাতার কবিরাজ রো-র একান্নবর্তী পরিবারে। পিতার নাম কৃষ্ণদাস পাইন। তখন একান্নবর্তী পরিবারের গঠন যেরকম হতো—সেইরকম। পাঁচ ভাইবোন, খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোনের সঙ্গে এক প্রশস্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েছি। পিতা খুব সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন। ঠাকুরদার নিজস্ব সংগ্রহ ছিল, তা সাজানো থাকত ঘরের বড় বড় কাঁচের আলমারিতে। সেইসকল শিল্পবস্তু মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। সেই দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান জিনিসগুলির মধ্যে সম্রাট বাহাদুর শাহ ও মমতাজ মহলের আইভরি পেন্টিং প্রভৃতি বেশ কিছু শিল্পবস্তু ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কবিরাজ রো-র বাড়ি ছেড়ে আমাদের শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকতে হয়। আরেকটা ব্যাপার, আমার ঠাকুরমা অসাধারণ গল্প বলতে পারতেন। সেগুলি প্রধানত মহাকাব্য থেকে। এছাড়া



মুখাকৃতি—বাঁদরের ভঙ্গিতে, শিল্পী ঃ গণেশ পাইন

** দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিমান চিত্রশিল্পী। 'বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী চিত্রসমালোচক ও দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।*

লোককাহিনীর অসাধারণ সব গল্প শুনতাম, যা আমার জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আজ এত কাল অতিক্রম করে আসার পরও আমার সচেতন ও অবচেতন মনে ছেলেবেলার ঘটনাগুলো কোথাও যেন রয়েই গেছে। তখন 'মৌচাক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বেরত। তাতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ছবির reproduction-টা প্রথম দেখি। এমনিতে তখনকার দিনের বিভিন্ন বইপত্রে বিভিন্ন illustration দেখে দেখে 'চোখটা তৈরি' হয়েছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সেই 'মৌচাক' পত্রিকার ছবিটি আমার চোখ খুলে দিল, যা অলঙ্করণ (illustration) থেকে আলাদা।



বংশীবাদক, শিল্পী ঃ গণেশ পাইন

• *ছোটবেলা থেকে আপনার ওপর ধর্মের প্রভাব কিভাবে পড়েছে বলে মনে হয়?*

— আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁদের নিত্য পূজা হতো। একটি বিগ্রহ পূজার বেদির ওপর অধিষ্ঠিত থাকত, আরেকটি বিগ্রহ পাইনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বাড়িতে পালা করে পরিক্রমা করত। সেইমতো বছরে শীত বা গ্রীষ্মে একবার অন্তর ঠাকুর আসতেন দিনকুড়ির জন্য। সেটা 'পালার ঠাকুর'। পালার বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। তাঁকে চন্দন দিয়ে সাজানো হতো। এই বিগ্রহের নাম 'শ্রীধর'। এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল—একটি ধাতুনির্মিত স্ট্যাণ্ডের ওপর শালগ্রাম শিলা বসানো থাকত। স্ট্যাণ্ডের ওপর এই শিলাটি থাকা ও না-থাকার মধ্যে একটি ফর্ম বা আকার সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে ও বিমূর্ত (abstraction) ভাব খুঁজে পাই—সেই ছোটবেলায়। শ্রীধরের পাশে 'কুনকে' (লক্ষ্মী) পূজিত হতো। কুনকের ওপর দুটো চোখ, নাক, মুখ এবং সোনার তৈরি চোখ সিঁদুর দিয়ে বসানো হতো। কবিরাজ রো-র বাড়ির উলটোদিকে একটি দেবালয় ছিল। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় মন্দিরটি ভাঙা পড়ে।

পরে অবশ্য আবার স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে মন্দিরটি তৈরি হয়। কিন্তু সেটি ছেলেবেলায় দেখা মন্দিরের সঙ্গে মেলে না। সেই মন্দিরের অনেককিছুই আমাকে প্রভাবিত করেছিল। ছোটবেলায় রামায়ণ, মহাভারত বা মনসামঙ্গলের কাহিনী শুনতে শুনতে সেই সময়ের মানসিক বয়সটা সাধারণত যেরকম থাকে, তার থেকে অনেকটা যেন বেড়ে গেল এবং একটা জীবনবোধ তৈরি হলো।

- *আপনার চিত্রকলার জগতে ধর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কতটা পড়েছে বলে মনে হয়?*

— ধর্মের পরিবেশের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। যৌবনকালে যে-সময়টাতে বুদ্ধির উদয় হলো—যে-বুদ্ধি আমাদের বিচার করতে শেখায়, তার অনেক আগে—আমার সেই ছেলেবয়সেই গড়ে উঠেছিল।

- *দেশে-বিদেশে আর্টের ওপর ধর্ম বেশ প্রভাব ফেলেছে। এটা ভাল না খারাপ, বা কতটা স্বাস্থ্যকর বলা যায়?*

— এর মধ্যে ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে। ধর্মের মধ্যে লোককল্যাণ ও লোকহত্যা, যাকে হিংসার ভাব বলা যেতে পারে—এদুটোই নানা আকারে রয়েছে।

- *আপনি 'চৈতন্যভাবনা' ও 'দেবী দুর্গা' বিষয়ে বিভিন্ন ছবি এঁকেছেন; তাছাড়া 'ইহলোক', 'পরলোক' ও 'মগ্নচৈতন্য' আপনার ছবিতে উঠে এসেছে। এব্যাপারে যদি আলোকপাত করেন।*

— আমি চৈতন্যদেবকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি, তবে 'ভক্তির অবতার' হিসাবে নয়। তিনি একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। যখন জাতিভেদের বেড়াজালে সমাজ বিচ্ছিন্ন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"—যিনি কৃষ্ণভক্ত, সেই



প্রস্তরীভূত জীবনে সজীব বৃক্ষলতার প্রতিভাস, শিল্পী ঃ গণেশ পাইন

চণ্ডাল ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এথেকেই প্রমাণিত হয়, অখণ্ড প্রেমের সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তিনি বাংলাদেশে রেনেশাঁ বা নবজাগরণের হোতা ছিলেন। এইসব কারণে চৈতন্যদেব 'মহাপুরুষ' হিসাবে বারবার আমার ছবিতে এসেছেন। আর দেবী দুর্গার ছবি আঁকি প্রধানত অনুরোধ করা হয় বলে। এছাড়া দুর্গোৎসব বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব—এটাও একটা কারণ।

'ইহলোক'-'পরলোক' ব্যাপারটা আমার 'মগ্নচৈতন্য' (psyche) থেকে উঠে এসেছে। মগ্নচৈতন্য বলতে বোঝায় এমন এক মানসিক অবস্থা, যা সচেতন মন নয়, কিন্তু মানুষের সভ্যতার যাকিছু স্মৃতি তা অবচেতন মনের গভীরে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব আপনার ছবিতে কতটা পড়েছে? আপনার 'The Magician' ছবির মধ্যে তাঁর প্রভাবই বা কতটা?

- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তো আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। আমার দাদাকে পড়াতে আসতেন জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, স্বামী বেদাত্মানন্দজী মহারাজ প্রমুখের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যখন আমার ৮-৯ বছর বয়স, তখন পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মাস্টারমশাই অনেক গল্প বলতেন। তার মধ্যে বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, স্বামী অভেদানন্দজীর মতো উচ্চকোটির সাধকরা।

শিল্পকলার জগতে আপনার প্রিয় কয়েকজন শিল্পী সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

- আমাদের দেশের শিল্পকলার মুখ সাধারণত ইউরোপের আর্টের দিকে ঘোরানো। যদিও অন্যান্য দেশ-মহাদেশের শিল্পও কম সমৃদ্ধ নয়। সেই হিসাবে আমার জীবনে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রেমব্র্যাণ্ট, বিশেষত যখন ছাত্র ছিলাম। তিনি ইউরোপের মধ্যযুগের শিল্পী, যিনি সাধারণ এক শিল্পীর চোখে আমরা যে-বিশ্বকে দেখতে পাই তাকে চিত্রে রূপান্তর করেছিলেন। বিশেষত আলোর ব্যবহারে অসাধারণত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। তখন সেই বয়সে আমার কাছে তার আকর্ষণ সত্যিই আলাদা। পরবর্তী কালে যিনি আমার জীবনে প্রভাব ফেলেন, তিনি পল ক্লী। যখন শিল্পকলা ক্রমশ আধুনিক যুগে প্রবেশ করল, তখন পল ক্লী ছবির মধ্যে নিয়ে এলেন অন্য এক মাত্রা। আমি মনে করি, ছবির একটা অন্য দর্শন আছে, সেটা তিনি রচনা করলেন—যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছোটবেলায় আমার

ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। বস্তুত, এঁদের তিনজনের কাজই আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এপ্রসঙ্গে জানাই, এখন ঐ শিল্পীদের কিছুটা প্রভাব থেকে পরীক্ষানিরীক্ষার পর নিজের যে-ধরন, সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। সম্প্রতি 'সীমা আর্ট গ্যালারি'তে মুখের ছবির যে-প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে মিশরীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—যাতে মৃত্যুকে জয় করার এক অনির্বচনীয় ব্যাপার ছিল।

● *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া মিশরীয় প্রভাব আপনার ওপর পড়েছে কি? পড়লে তা কি পরিমাণে?*

— খুব ছোটবেলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অলঙ্করণ থাকত, তা দেখে দেখে ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চমানের ছবি দেখে বুঝতে শিখেছিলাম অলঙ্করণ ও ছবির পার্থক্যটা ঠিক কোথায়। পরবর্তী কালে যখন নিজের ধরন তৈরি হয়েছে—সেখানে মিশরীয় প্রভাব রয়েই গেছে।

● *শিল্পীমহল সম্পর্কে কিছু বলুন।*

— কলকাতায় যদি কেউ বাঙলা ঘরানার সামগ্রিক একটা ধারণা করতে চায়, সেধরনের কোন ছবির মিউজিয়াম কিছু নেই। এর ফলে শিল্পকর্ম যাঁরা করছেন, তাঁদের সামনে কোন লক্ষ্যবস্তু থাকছে না। তার ফলে ছবি আঁকার শুরু এবং শেষ সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়। আমাদের ছবির যে-বিবর্তন তা দেখতে পাই না।

● *কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কি ধরনের শিক্ষা পেয়েছেন?*

— আমার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের সময়সীমা ছিল ১৯৫৫-১৯৫৯ সাল। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন শ্রদ্ধেয় চিন্তামণি কর। আমাকে প্রথমেই 'ডবল প্রমোশন' দেওয়া হয়। তখন বাড়িতে আঁকা চারটি ছবির কাজ—তা যেকোন মাধ্যমে হোক না কেন—কলেজে জমা দিতে হতো। সেই কাজগুলি দেখে তখনকার মাস্টারমশায়দের ধারণা হয়, আমার 'তৈরি হাত'। সেজন্যই আমাকে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেইসময়ে আমি ছবি আঁকা জানতামই না। একটা মানসিক প্রক্রিয়ায় আমি ছবি-চারটি করেছিলাম। সেই কারণে দ্বিতীয় বর্ষে ঢুকলেও অনেকে বলতে থাকে, যে ড্রইং জানে না তাকে কি করে দ্বিতীয় বর্ষে সুযোগ দেওয়া হলো? তখন আমার মাস্টারমশাই মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সেই অসুবিধার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ড্রইংয়ের প্রাথমিক সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে যে প্রাথমিক ছবি আঁকার ব্যাকরণগত সূত্র শেখানো হতো, তা ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক ঘরানার। তাতে শেখানো হয়েছিল 'বিলীয়মান বিন্দু' (vanishing point) কি করে নির্ধারণ করতে হয়। শিল্পীর চোখ থেকে যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) দেখতে হয়, সেটির প্রাকৃতিক উপায় কি? 'আলোছায়া' (light & shade)-এর সম্পর্ক বোঝানো হয়। সাধারণত প্রাথমিক বিভাগে এগুলিই শেখানো হয়।



যুগযন্ত্রণার রূপকল্প, শিল্পী ঃ গণেশ পাইন

● *আপনার কাজ অল্প ও ছবির একক প্রদর্শনীর (Solo Exhibition) সংখ্যাও অল্প, এর কারণ কি?*

— যে-পদ্ধতিতে আমি কাজ করি, সেই 'টেম্পারা' (Tempara) পদ্ধতিটি জটিল, তাই কাজ করতে সময় লাগে। ইউরোপীয় টেম্পারা প্রথায় একটা স্তরে ছবি সম্পূর্ণ হয় না। অনেকগুলি স্তরে থাকে। আমি যে-টেম্পারা করি, তাতে ডিমের আঠা ব্যবহার করি না। এখন যে-টেম্পারাগুলি করছি তা আমার নিজের শিক্ষার জন্য করা—এখনো দেখানো হয়নি কোথাও। তা 'এনকস্টিক' (encaustic—এটি একটি medium, যার মিশ্রণে রঙের কাজ করা হয়)। ডিমের ব্যবহার আছে এমন টেম্পারা (egg tempara), ছানার টেম্পারা (easin tempara)—সব ধরনের পদ্ধতিই পরখ করেছি, কিন্তু সেভাবে কোন পদ্ধতিই জুতসই বলে মনে হয়নি। আমার এখনকার টেম্পারাকে 'এগ টেম্পারা'য় ফেলা যাবে না। টেম্পারার যা প্রধান গুণ—জল-প্রতিরোধকতা তা আমার নিজের টেম্পারায় উপস্থিত। স্বল্পসংখ্যক একক চিত্রপ্রদর্শনী করার কারণ—প্রধানত পাঁচটা ছবি সাজিয়ে একক প্রদর্শনীর প্রথা আমাদের দেশে চালু নেই—যা ইউরোপে আছে। এখানে প্রদর্শনী করতে গেলে কমপক্ষে ৩০-৪০টি ছবির প্রয়োজন।

- *আপনি সম্প্রতি মিশর ও ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। দেখে কি মনে হলো?*

— আমি মিশর ও ইউরোপ মহাদেশ ঘুরে এলাম পর্যটকের ভূমিকায়। যদি দেশটাকে জানতে হয়, তবে কিছুদিন অন্তত সেদেশে থাকতে হয়।

- *আপনি ভারতীয় চিত্রকলার একটা বিক্রয়যোগ্য বাজার তৈরি করতে পেরেছেন। কিভাবে এটা সম্ভব হলো?*

— এর উত্তর আমার জানা নেই।

- *শিল্পের মধ্যে, বিশেষত সমসাময়িক আধুনিক চিত্রকলায় প্রয়োগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?*

— সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পুরাতন গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রথিতযশা মহিলা শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় উল্লেখ করলেন ঃ "আমি অয়েল প্যাস্টেলের রঙে যেমন খুশি তা আঁকতে পারছি এবং তা থেকে আনন্দও পাচ্ছি।" এথেকে বোঝা যায়, চিত্রকলায় visual art-এর চোখে দেখা যে-জীবন, তার পরিধিটা বিরাট। অন্য যেকোন শিল্পকলায় একটি শাস্ত্রবদ্ধ ধারা থাকে—সেটাকে অতিক্রম করে কোন শিল্প হয় না। কিন্তু visual art-এ সেটা সম্ভব।

- *ভারতীয় চিত্রকলার ভবিষ্যৎ কি?*

— এখন দেখা যাচ্ছে চিত্রকলায় একটা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বায়নের বোধ কাজ করছে। সেক্ষেত্রে দেশীয় প্রভাব থেকে শিল্প মুক্ত হতে চাইছে, একটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সেখানে শিল্পের সব প্রান্তের শিল্পধারণার একটি সমষ্টিগত রূপ প্রকাশিত হতে পারে।

- *আপনার ছবির composition-এ আলোর বৈশিষ্ট্য ও কালি-কলমের কাজ সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন।*

— আমার ছবির Composition-এর মধ্যে থিয়েটারের খুব প্রভাব আছে। থিয়েটারে যেরকম একটি সরলরেখায় দেখার (eye level) ওপর কলাকুশলী ও অভিনেতাদের অভিনয়টা চলতে থাকে, আমার ছবির composition-এও সেই ব্যাপারটা আছে।

কালি-কলমে আমার ছবি আঁকার কারণ, প্রথমদিকে পয়সার অভাব ছিল। এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে করেছি। এখন যেটা করি—কোন ছবি আঁকার আগে কাগজের ওপর কলমের সাহায্যে ছবির খসড়াটা তৈরি করে নিই।

- *আপনি একজায়গায় বলেছিলেন, আর্ট কলেজ থেকে বেরনোর পর শিল্পী পরিতোষ সেনের 'Form & Space' বিষয়ক বক্তৃতা শুনে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঘটনাটা যদি বিস্তারিতভাবে বলেন।*

— আর্ট কলেজ থেকে ব্যবহারিক ও পুঁথিগত অর্ধ জ্ঞানের পরিধি নিয়ে যখন আমাদের ছেড়ে দেওয়া হতো তখন সাধারণত সাহিত্যনির্ভর বিষয় থেকে (যেমন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্') নির্বাচন করে ছবি আঁকা হতো। এছাড়া মডেল ও স্টিল লাইফকে সামনে রেখে তার থেকে আঁকা হতো। তখনো আমার পায়ের নিচে জমি ছিল না। সেসময় 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ আধুনিক চিত্রকলার কার্যকারণের ওপর পরিতোষবাবুর 'Form & Space' শীর্ষক বক্তৃতা শুনি। ঐ বক্তৃতায় তিনি বুঝিয়েছিলেন, 'Form' (চিত্র)-এর সঙ্গে 'Space' (স্থান)-এর সম্পর্ক। এটা তিনি বুঝিয়েছিলেন সাধারণত 'পল ক্লী' গ্রন্থ থেকে। তার পর থেকেই পল ক্লী-র বই দেখতে শুরু করি।

- *শিল্পকলার ছাত্র হিসাবে দেখেছি, সোজা-বাঁকা লাইন টানতে টানতে একটা সময় হাতে আড়ষ্টতার ভাব আসে। সেটা কি করলে দূর করা যাবে?*

— সবচেয়ে ভাল হয় ব্ল্যাকবোর্ড-এ চক দিয়ে আঁকা অভ্যাস করলে।

- *প্রতিদিন ছবি আঁকতে বসলেও কখনো কখনো কিছুতেই আঁকায় মন বসতে চায় না বা তখন আঁকতে বসলে মনোমতো ছবিও আঁকা যায় না।*

— আমরা যারা ছবি আঁকি, তাদের প্রায় সকলকেই কম-বেশি এই সমস্যায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে দুটো পথ আছে। প্রথমত, জোর করে আঁকতে বসলে আস্তে আস্তে মনটা বসে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা যোগসাধনার মতো। মনঃসংযোগ ক্রমশ চলে আসে। দ্বিতীয়ত, শিল্পী গোপাল ঘোষ প্রায়ই বলতেন, ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে বন্ধ্যা সময় আসে। এরকম অসার সময়ে ছবি আঁকার বৃথা চেষ্টা না করে শিল্পের অন্য কোন মাধ্যমের খবর নেওয়া ভাল।

- *আপনার ছবির মধ্যে Traditional Study Work, যেমন গল্প বলা, ধর্মীয় প্রভাব ইত্যাদি এবং একটি বিশেষ মাধ্যম নিয়ে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপারটা কি ঠিক?*

— হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, তবে আমি অন্য সকল মাধ্যমেই কাজ করছি।

- *বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, সমসাময়িক কলকাতার শিল্পীদের কাজের মধ্যে আপনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।*

— দেখছি তো হচ্ছে। তা থেকে শিল্পীরা জীবিকা উপার্জনও করছেন। ফলে আমার অন্তরে আনন্দ হচ্ছে। ❑

“যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মূলে”

স্বামী দিব্যানন্দ

শক্তি ● লেখক : স্বামী অমৃতত্বানন্দ ● প্রকাশক : লেখক, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর, বাংলাদেশ ● মূল্য : ২৫ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+১৫০ ● প্রকাশকাল : ২০০৩

স্বামী অমৃতত্বানন্দজীর লেখা ‘শক্তি’ ১৪৮ পৃষ্ঠার একটি অমূল্য গ্রন্থ। ছয়টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পুরাণে শক্তি, শক্তিতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্বই সাকার মূর্তিতে রূপময়, শ্রীকৃষ্ণকথা ও সমন্বয় সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সংহিতা, মহানির্বাণতন্ত্র, গীতা, চণ্ডী, বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ্, নিরুক্ততন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতির সহায়তায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

পুরাণে শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী অমৃতত্বানন্দজীর আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিযোগে আপন বক্তব্যকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার এই প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অভিনন্দনযোগ্য। শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিদর্শন, অদ্বৈতবেদান্ত মতের ব্যাখ্যা, পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদত্ব বিশ্লেষণ, অষ্টমাতৃকা যে মহাশক্তিরই বিভূতি—এসকল আলোচনা শাস্ত্রজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৃতীয় অধ্যায়ে কালীতত্ত্বের আলোচনা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সাবলীল ভাষায় ‘কালী’ নামের অর্থ, কালীর আবির্ভাব কাহিনী, কালী ও কালের স্বরূপ, কালো রূপের তাৎপর্য, দক্ষিণাকালীর নামকরণের ব্যাখ্যা প্রভৃতি নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গূঢ় অর্থ আত্মস্থ করে লেখক কালীর ত্রিনয়না, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, বিপরীত-রতাতুরা, শ্মশানালয়বাসিনী রূপের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার দ্যুতিতে সে-আলোচনা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নিরাকারা, নির্গুণা, ব্রহ্মস্বরূপা আদ্যাশক্তির স্বরূপ আলোচনা সাধারণের বোধগম্য নয়। লেখক অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কল্পনার মধ্যে কালীমূর্তির প্রকাশের ব্যাখ্যায় কালীতত্ত্বের অধ্যায়টিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক সহজভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শক্তি ভিন্ন কিছুই নেই। চিচ্ছক্তি থেকেই ভাব, রূপকল্পনা, মূর্তি, উপাসনাপদ্ধতি, মন্ত্র, মুদ্রা, উপচার প্রভৃতি সবকিছুই উদ্ভূত হয়েছে।



পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকথা বিষয়ক আলোচনা এক অপূর্ব সংযোজন। শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে পাঠকের মনোগ্রাহী করে তোলার এটি একটি সার্থক উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণজীবন সনাতন সত্যের জীবন্ত প্রকাশ—এই কথাটি সহজ করে তুলে ধরার জন্য তিনি ‘শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং ভগবান?’, ‘শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণ অবতার?’ প্রভৃতি আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাই তিনি কারো উপাসনা করেননি—এবিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ভিন্নমতও আছে। বিশদ শাস্ত্রীয় উদাহরণ-যোগে তিনি দেখিয়েছেন, ভগবানই নরদেহ ধারণ করে মানুষের মতো আচরণ করে পথ দেখান। তিনি উপাসনা করেন, তপস্যা করেন, দেবদেবীগণের পূজা করেন। গীতামুখে তিনি স্বয়ংই বলেছেন: “ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।”—যদিও আমার তিনলোকে পাওয়ার কিছু নেই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যস্ত থাকি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ, তাকে দেখেই মানুষ ধর্মপথে চলবার অনুপ্রেরণা পায়, কর্ম করার কৌশলও বুঝতে পারে।

‘শ্রীকৃষ্ণেই সত্যকার ধর্ম রূপ পেয়েছে’, ‘শ্রীকৃষ্ণ ও শাস্ত্র’, ‘শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের প্রবক্তা’ প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে নিখিল বেদবেত্তা ও ধর্মপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তিনি খুব সহজভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে কালী-ই, কালী-ই যে শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বরূপত অভিন্ন এই দুই শক্তি যে একই শক্তির দুটি প্রকাশমাত্র তা সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। মাতৃভাবই সাধনার শেষকথা—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে লেখক গুরুগম্ভীর আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির আলোকে ‘ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ’ এবং ‘নিত্য ও লীলা’ বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কালী ও কৃষ্ণের আরাধনা, স্বরূপ নির্ণয়, তত্ত্ব ও তথ্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। স্বামী অমৃতত্বানন্দজী নানা গ্রন্থ থেকে নানারঙের ভক্তিপুষ্প চয়ন করে একটি অমূল্য মালিকা শক্তিস্বরূপা কালী এবং সর্বশক্তির আধারভূত কৃষ্ণের চরণে বিনম্রচিত্তে নিবেদন করেছেন। হৃদয়ের পুষ্পিত শ্রদ্ধাভক্তির চন্দনে তা হয়ে উঠেছে শুভ্র ও সনাতন। এই গ্রন্থপাঠে তৃষিত ভক্তের হৃদয় ভক্তিরস পান করে তৃপ্ত হয়ে উঠবে—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। ❑



বিপন্ন বিজ্ঞানী, অনন্য উত্তরাধিকার

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

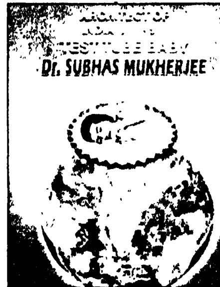
Architect of India's First Test Tube Baby—Dr. Subhas Mukherjee* ● *Edited by : Prof. Sunit Mukherjee & Dr. S. C. Lodh* ● *Published by : Dr. Subhas Mukherjee Memorial Reproductive Biology Research Centre, WBSIDC Industrial Estate, Building-1, 620 Diamond Harbour Road, Kolkata-700 034* ● *Price : Rs. 180* ● *Pages : 12+230* ● *Published on : September 2001

‘Architect of India's First Test Tube Baby—Dr. Subhas Mukherjee’ গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ প্রায়-বিস্মৃত বিজ্ঞানী ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা ও প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরার এমন এক সাধু উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলা উচিত কুমারী কানুপ্রিয়া আগরওয়াল ওরফে দুর্গার কথা। দুর্গা ভারতবর্ষের প্রথম নলজাতক শিশু (Test Tube Baby)। দুর্গার বাবা-মা তাঁদের পরিচয় এবং তাঁদের সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত গোপন

রাখতে চান বলেই এই ছদ্মনামের আশ্রয়। ৩ অক্টোবর ১৯৭৮ কলকাতায় দুর্গার জন্ম হয় প্রধানত ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক প্রচেষ্টায়। পৃথিবীর প্রথম নলজাতক মানবসন্তান লুই ব্রাউনের জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে তার মাত্র ৬৭ দিন আগে ২৮ জুলাই ১৯৭৮। সেই গবেষণাকাণ্ডের স্থপতি দুই বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড এবং স্টেপটোয়ের সঙ্গে কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কোন যোগাযোগ ছিল না। পৃথিবীর দুই প্রান্তে সমান্তরালভাবে কিঞ্চিৎ ভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছিল।

মনে পড়ে যায় বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং মার্কনির সমান্তরাল গবেষণার কথা। জগদীশচন্দ্র এবং সুভাষ—এই দুই বাঙালি বিজ্ঞানীর সাধনার পথে মিল আরো আছে। জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর স্বল্পবিত্তের গবেষণাগারে অনাড়ম্বর আয়োজনেই সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিলেন, তেমনি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট ফ্ল্যাটের এক অপরিসর ঘরে বসে মানবকল্যাণে প্রযুক্তি প্রয়োগের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মিলটি হলো, বেতারের আবিষ্কর্তা জগদীশচন্দ্রের মতো নলজাতকের কারিগর সুভাষও জীবৎকালে তাঁর সিদ্ধির স্বীকৃতি পাননি। উপরন্তু সুভাষের ভাগ্যে জুটেছে বৈজ্ঞানিক মহল, প্রশাসক এবং সংবাদমাধ্যমের ত্রিকোণ আক্রমণ। তাঁর গবেষণার যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তার প্রধান হিসাবে আশ্চর্যজনকভাবে নিযুক্ত হন রেডিও-ফিজিক্সের এক অধ্যাপক। তাঁর বা কমিটির অপর তিন সদস্যের কারোরই প্রযুক্তিনির্ভর প্রজননবিদ্যা (Reproductive Technology) নামক আধুনিক বিজ্ঞানশাখাটি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু সেই কমিটি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের দাবিকে নস্যাৎ করে যে-রিপোর্ট পেশ করল, তার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব তেমন কিছু না থাকলেও প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। কোনরকম বৈজ্ঞানিক সেমিনারে সুভাষবাবুর যোগদান বা বিদেশযাত্রার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। দেশ ও বিদেশের বিজ্ঞানীমহল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন—তাঁর গবেষণার খুঁটিনাটি নিয়ে যোগ্য বৈজ্ঞানিকদের দরবারে পেশ করার সুযোগই পান না। অবশেষে আত্মহত্যা করেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়—মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায়, কোনদিক থেকেই কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে।



ডাঃ মুখোপাধ্যায় জীবৎকালে তাঁর প্রতিভা এবং পরিশ্রমের স্বীকৃতি পেলেন না, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু সহকর্মী বন্ধুর উদ্যোগে ব্যাঙ্গালোরের বৈজ্ঞানিক টি. সি. আনন্দকুমার গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত গবেষণাপত্রের খসড়া, ডায়েরি, এলোমেলো কাগজপত্র, আগরওয়াল দম্পতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—সব বিশ্লেষণ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, দুর্গা প্রকৃতই নলজাতক; এবং এই সাফল্য অর্জন করার পথে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এমন কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যা এই সিকি শতক পরেও সবচেয়ে কার্যকরী এবং আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতদিন এই আনন্দকুমারই প্রথম ভারতীয় নলজাতকের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। মানবিক ঔদার্য এবং সততার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে এই অবাঙালি বৈজ্ঞানিকই তাঁর পূর্বসূরি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব নথিভুক্ত করেছেন। মূলত তাঁর এই বিরল সত্যপরায়ণতার জন্যই ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এমন এক প্রকাশনা সম্ভব হলো। সুভাষের জীবনপঞ্জী, নলজাতক গবেষণা সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় নোটস, অন্যান্য বিষয়ে তাঁর কিছু প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, ডাঃ আনন্দকুমারের উল্লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছুই সাজানো আছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত না হলে জানাই যেত না—জনবিস্ফোরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুষ্টি ইত্যাদি বিজ্ঞানের কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁর বিশেষজ্ঞজনোচিত পাণ্ডিত্য ছিল, জানা যেত না আরো কত নিঃসন্তান দম্পতির কাছে তাঁর গবেষণার সুফল পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি সুপরিকল্পিত পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার পিছনে সম্পাদকদ্বয়ের আরো একটু পরিকল্পনা, মুদ্রকের আরো একটু যত্ন কাম্য ছিল। কয়েকটি অতৃপ্তির কথা বলিঃ (১) ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দুই সহ-গবেষক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনীত মুখোপাধ্যায় (এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক) এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের এস. কে. ভট্টাচার্যের প্রায় কোন বক্তব্যই নথিভুক্ত করা হয়নি। (২) ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং নিকট বন্ধুজনদের স্মৃতিচারণ যোগ করলে মানুষটিকে চিনতে, তাঁর সংগ্রামকে বুঝতে অনেক সুবিধা হতো। (৩) প্রায় সমস্ত নথি অবিকল মুদ্রিত করতে যাওয়ায় গোটা গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরনের টাইপ ফণ্ট এবং সাইজের এক বিভ্রান্তিকর সমাহার হয়ে উঠেছে। এমনকি কখনো মূল জার্ণালের পৃষ্ঠাঙ্কের সঙ্গে গ্রন্থটির নিজস্ব পৃষ্ঠাঙ্ক গুলিয়ে যাচ্ছে। (৪) নলজাতকের উপাখ্যান সংক্রান্ত সংবাদপত্র কাটিংয়ের সম্ভাবনাময় অধ্যায়টি এক পাতায় সেরে দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি কথা বলি, সরকারের নিযুক্ত কমিটির যে-রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এতটা হেনস্থা, সেই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি কি উদ্ধার করা গেল না? কিংবা সেই কমিটির কোন সদস্যের বিবৃতি? ভারতীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের এই দিঙ্‌নির্ণয়ী আখ্যানটিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে সেই নথিটির কিন্তু প্রয়োজন আছেই। আবেগ আর অসূয়াকে সরিয়ে রেখে সেই নৈর্ব্যক্তিকতা যদি আমরা এখনো না অর্জন করতে পারি, তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিজ্ঞানীর উত্তরাধিকার আমাদের জন্য নয়।

তবে ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভারতের প্রাচীন ও মহান সভ্যতার এক যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন। আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়েছিল টেস্ট টিউবের প্রাচীন সংস্করণ কলস বা দ্রোণ থেকে। তাই তাঁর নামই রাখা হয়েছিল 'দ্রোণ'। 'দ্রোণ' ও 'দুর্গা'র মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান হলেও ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই সেই সনাতন ভারতীয় বিজ্ঞানচেতনার যথার্থ উত্তরসূরি। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপঃ গত ২৫-২৮ জুলাই ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৫ তারিখ মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ৯টায় 'কমিউনিটি হল কাম ফ্লাড সেন্টার'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডঃ রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক ও সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্রী ও মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, মিলনকান্তি পাল ও পূর্ণিমা দাস। সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৭ তারিখ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, প্রসাদমোহন মিদ্যা ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস। সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী ও ব্যোমকেশ মাইতি। এই সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। বিকালে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শেখরানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী নিয়মানন্দজী, ভুবনচন্দ্র দাস ও সুশীলকুমার প্রধান। উৎসবের বিভিন্ন দিনের সন্ধ্যায় 'যত মত তত পথ', 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং 'বিশ্বজননী সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—**ভারতেঃ** গদাধর আশ্রম, হায়দরাবাদ, মায়াবতী, মুজফ্‌ফরপুর, পুরী মিশন আশ্রম ও তিরুবনন্তপুরম। **বহির্ভারতেঃ** ওয়াশিংটন ডি সি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত ২০০৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফল নিম্নরূপঃ

বিদ্যালয়	পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
নরেন্দ্রপুর	১৩৩	১২৭	৯০
পুরুলিয়া	৪৭	৪৫	২৬
রহড়া	৯৪	৮৩	৪২
বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ)	৯৩	৯২	৬৩

বিভিন্ন আই. আই. টি.-তে এম. এসসি.-তে ভর্তি হওয়ার জন্য ২০০৪ সালে যে 'জয়েন্ট অ্যাডমিশন' পরীক্ষা (JAM) হয়, তাতে **বিদ্যামন্দির**-এর ছাত্ররা অসাধারণ ফল করেছে। ২০-র মধ্যে অধিকৃত সর্বভারতীয় স্থানসহ ফলাফলের সারাংশ এরকমঃ

বিষয়	পরীক্ষার্থী	যোগ্য নির্বাচিত হয়েছে	সর্বভারতীয় স্থান
পদার্থবিজ্ঞান	২০	২০	১, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৬ ও ২০
রসায়নবিজ্ঞান	২৩	২১	৩, ৬ ও ১২
গণিত	১২	১০	১ ও ৬

ত্রিপুরা ও সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ২০০৪-এ **বিবেকনগর (ত্রিপুরা) স্কুল**-এর ফলাফল নিম্নরূপঃ

পরীক্ষা		স্থান
ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা :	ইঞ্জিনিয়ারিং	৪, ৭, ৯ (২ জন), ১৩ ও ১৭
	মেডিক্যাল	২, ৪, ১২ (২ জন) ও ১৩
সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা :		১, ৩ ও ১৫

নিউ দিল্লির 'ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন' পরিচালিত 'অল ইণ্ডিয়া সাইবার অলিম্পিয়াড'-এ **দেওঘর বিদ্যাপীঠ (ঝাড়খণ্ড)**-এর দুটি ছাত্র ২য় স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যাপীঠের আরেকজন ছাত্র অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য 'ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স (বায়োলজি) অলিম্পিয়াড'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে যে ত্রাণকার্য শুরু করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হাত ধরে, সেই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মিশনের ত্রাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণের জন্য **'সাধারণ সম্পাদক (ত্রাণ), রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২'**—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ কর্তৃক সরাসরি এবং তার বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন বিগত কয়েক মাসের (ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে জুলাই ২০০৪) ত্রাণকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশন স্বল্পকালীন ত্রাণকার্য ছাড়াও বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প যেমন পুনর্বাসন, জলধারা প্রকল্প ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। সুতরাং নিম্নলিখিত কয়েক মাসের বিবরণীতে যে খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে, তা সামগ্রিক চিত্র পেতে সাহায্য করবে।

চিকিৎসা

সাগরদ্বীপে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের সহায়তায় ১১-১৫ জানুয়ারি ২০০৪ একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালিত হয়। ঐ শিবিরে ৩,৫৬৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মেলায় আগত দরিদ্র তীর্থযাত্রী এবং সাধুদের মধ্যে ১৫০টি কম্বল ও ১০০টি বিভিন্ন ধরনের পোশাক বিতরণ করা হয়। মনসাদ্বীপ আশ্রম কর্তৃক মেলাপ্রাঙ্গণে ও আশ্রমে মোট ৬০০ তীর্থযাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

শৈত্যপ্রবাহ

ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ আগরতলা, আলং, বাঁকুড়া, বরানগর, বেলগাঁও, ভুবনেশ্বর, ছাপরা, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, গোলপার্ক, ইছাপুর, জম্মু, কামারপুকুর, কনখল, করিমগঞ্জ, কাটিহার, কিষাণপুর, লিমডি, মালদা, বেলুড় মঠ, মেদিনীপুর, নারায়ণপুর, নরেন্দ্রপুর, পাটনা, পুরী মঠ, পুরী মিশন, রায়পুর, রাজকোট, শিকড়াকুলীন গ্রাম ও বৃন্দাবন আশ্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১৫,৫৮৮টি কম্বল ও ৩,৫০৩টি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

দাঙ্গাজনিত বিশৃঙ্খলা

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগানে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে মালদা আশ্রম বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে মে ২০০৪-এর মধ্যে ৫টি চা বাগানের ১৫,৫৪২ জন মানুষের মধ্যে ১৫,১৫০ কেজি চাল, ১,৬১০ কেজি ডাল, ৫,২৭৬ কেজি আলু, ১,৯১০ কেজি নুন, ২,৯৭৪ প্যাকেট বিস্কুট ও ৩০ কেজি গুঁড়ো দুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৫টি ধুতি, ৬৬টি শাড়ি, ২৫৬টি জামা, ২৭৪টি প্যান্ট ও ৪৯৬টি গেঞ্জিও বিতরণ করা হয়।

খরা

মে থেকে জুন ২০০৪ লিমডি (গুজরাট) আশ্রম 'রামকৃষ্ণ জলধারা প্রকল্প'-এর অধীনে ৯টি গ্রামে পুষ্করিণী সংস্কার করেছে। এই গ্রামগুলিতে প্রতিবছর গরমকালে খাওয়ার জলের তীব্র সঙ্কট হয়। এছাড়া এই আশ্রম কর্তৃক লিমডি শহরের নানা জায়গায় ৬টি হ্যাণ্ড পাম্পও বসানো হয়েছে।

মে থেকে জুন ২০০৪ পুনে মঠ (মহারাষ্ট্র) কর্তৃক ভয়াবহ জলসঙ্কটপূর্ণ ১৮টি গ্রামের মানুষের জন্য প্রতিদিন রোজ এক লক্ষ লিটার করে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

টর্ণেডো

মে মাসের শেষ সপ্তাহে এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে হুগলি জেলার বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইছাপুর আশ্রমের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে ১০টি বাড়ির পুনর্নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কাজ চলছে। এছাড়া এই আশ্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৮৫টি ধুতি, ৮৫টি শাড়ি, ৬০টি কম্বল, ৪০টি লুঙ্গি ও ৪০টি গামছা বিতরণ করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড

এপ্রিল থেকে জুন ২০০৪-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মেদিনীপুর, মালদা ও নদীয়া জেলার মোট ২৯৫টি পরিবারের মধ্যে মেদিনীপুর, মালদা ও সারগাছি আশ্রমের মাধ্যমে ৮৮টি জি. আই. শীট, ১৩২টি বাঁশ, ২৭৮টি মশারি, ১১টি বিছানার চাদর, ২২টি মাদুর, ৫৬০টি শাড়ি, ৫৬২টি ধুতি, ৬০ সেট শিশুদের পোশাক, ১৬টি সতরঞ্চি, ১৬টি তোয়ালে, ২৪টি গামছা, ৪৮০টি চাদর, ২৪০টি কম্বল ও ২৪০ সেট বাসন বিতরণ করা হয়।

দারিদ্র্য

জানুয়ারি থেকে জুন ২০০৪ মুম্বাই, লিমডি ও সারদাপীঠ আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪৫৪টি দুঃস্থ পরিবার এবং পুরী মঠ, ভুবনেশ্বর, আগরতলা, জম্মু, কিষাণপুর, চেরাপুঞ্জি ও শিলচর আশ্রমের মাধ্যমে ওড়িষা, ত্রিপুরা, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাঞ্চল, মেঘালয় ও অসমের মোট ৩,৯০৬ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৭,৫৯০ কেজি চাল, ৩,৭৭০ কেজি ডাল, ১,৫২০ কেজি বাজরা, ১৫১ কেজি তেল, ২৪০ কেজি গুঁড়ো দুধ, ১,২৮০ প্যাকেট বিস্কুট, ১,০৮২টি ধুতি, ২,০২৫টি শাড়ি, ১,১৬২টি প্যান্ট, ২৪০টি মশারি, ২,৫৪৪টি শীতবস্ত্র, ৭৮৫টি কম্বল, ৬৭৭টি নানারকমের পোশাক, ৩৬২টি চাদর ও ৪০টি লণ্ঠন বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০টি শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১,৪১২ বাক্স পোশাক (ব্যবহৃত), ৮৪০ সেট শিক্ষাসংক্রান্ত জিনিসপত্র ও ৯৮০ সেট সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

জুন ২০০৪ থেকে 'শেয়ার অ্যাণ্ড কেয়ার ফাউণ্ডেশন' (আমেরিকা) ও 'আমুল'-এর সহায়তায় ২৫টি শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে দুধ বিতরণ শুরু হয়েছে।

বন্যা

জুন ২০০৪-এ প্রবল ঝড় ও বর্ষণে অসমের কাছাড় জেলার বহু ঘরবাড়ি ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শিলচর আশ্রম কর্তৃক ঐ জেলার বিভিন্ন স্থানের মোট ১,৭২৫ জনের মধ্যে ৬০ কুইন্টাল চাল, ৪ কুইন্টাল ডাল, ৩০০ প্লাস্টিক ত্রিপল ও ঘর বানানোর নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া এই আশ্রম পরিচালিত ৬টি চিকিৎসা-শিবিরে উক্ত অঞ্চল ও নিকটবর্তী কিছু গ্রামের মোট ২,৯৬৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

জুলাই ২০০৪-এ বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিহারের ৪৫টি গ্রাম ও মুজফ্ফরপুর অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬টি গ্রামের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পাটনা, মুজফ্ফরপুর ও কুচবিহার আশ্রমের মাধ্যমে চিঁড়ে, গুড় ও খিচুড়ি বিতরণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণকার্য

রামকৃষ্ণ মিশন, অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বন্যাপীড়িত মানুষদের মধ্যে রান্নাকরা ও শুকনো খাবার বিতরণ এবং চিকিৎসা-ত্রাণকার্য করা হচ্ছে—

অসমেঃ শিলচর শহর, মোনিগাঁও, করিমগঞ্জ ও কামরূপ জেলা। **বিহারেঃ** সমস্তিপুর, মুজফ্ফরপুর, বৈশালী ও কাটিহার জেলা। **পশ্চিমবঙ্গেঃ** কুচবিহার জেলা।

এই ত্রাণকার্যের জন্য প্রদত্ত নগদ টাকা বা 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে প্রদত্ত চেক/ড্রাফ্ট ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত।

স্বামী স্মরণানন্দ
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২ — *সাধারণ সম্পাদক*

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নামসাই (অরুণাচল প্রদেশ) : গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, ঊষাকীর্তন, পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। আলোচনাসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন চয়ন পুরকায়স্থ। ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, অরুণাচল প্রদেশের পরিবহনমন্ত্রী সি. পি. নামচুম এবং অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এ. কে. বরা। পুরস্কার বিতরণ এবং ২১ ও ২২ তারিখ ধর্মালোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। ২২ তারিখ স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভজন, 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। ২২ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন অ্যাভিনিউ (দুর্গাপুর) : গত ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন ডঃ তাপস বসু। ২২ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ, ভদ্রকালী (হুগলি) : গত ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শপূত ১৮নং নীলমণি সোম স্ট্রিটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২১ তারিখ সন্ধ্যায় 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ২২ তারিখ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা (বেলুড় মঠ পর্যন্ত), বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী দেবাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে রুইপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিজামপুর ও মালোপাড়ায় পানীয় জলের নলকূপ স্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ ও আশ্রমের যৌথ উদ্যোগে সংশোধনাগারে প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার জেলাশাসক কে. জে. এস. চিমা ও স্বামী দিব্যানন্দজী। মোট ৯টি বিভাগে আবাসিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। ৫টি বিভাগের পুরস্কার আশ্রম থেকে প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে স্বামীজী ও নেতাজীর ওপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংশোধনাগারের গ্রন্থাগারের জন্য ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গ্রন্থ প্রদান এবং সকল আবাসিকের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনামন্দির, ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা (হুগলি) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী ও কাশীনাথ দে চৌধুরী। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নগাঁও (অসম) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসে প্রসাদ পান।

গুড়াপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র (হুগলি) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, লীলাগীতি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমের শিক্ষামন্দিরের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বেদমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে উপস্থিত সকলে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হরিনামসঙ্কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শিশির। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ১০টি ধুতি ও ১০টি মহিলা পোশাক এবং ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে খাতা বিতরণ করা হয়।

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (বর্ধমান) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, গ্রাম-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন প্রায় ১,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ১৯৫ জন শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান গেহ, চেলিয়ামা (পুরুলিয়া) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়।

বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম (হুগলি) : গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি

ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন বনৌষধির ওপর এক প্রশিক্ষণশিবির আয়োজিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন ডাঃ ছন্দা মণ্ডল।

নারিট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সারদা আশ্রম, আমতা (হাওড়া)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন আশ্রমের সদস্যগণ 'যুগজননী সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন তপন চ্যাটার্জি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমন্ত মণ্ডল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী, ঘোঁজা, গাইঘাটা (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, পদাবলীকীর্তন, আলোচনা, ভক্তিগীতি, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৪০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিষদ (কাশীশ্বর মিত্র বাটী, কলকাতা-৭০০ ০০৪)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, এইচ. আই. জি. আবাসন (দুর্গাপুর-১২)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। সান্ধ্য আলোচনাসভায় ভাষণ দেন ছায়া ঘোষ ও ডঃ বুদ্ধদেব চৌধুরী।

জগন্মাতা-রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ, চরচন্দনবাটী (নদীয়া)ঃ গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী, স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী, স্বামী উমেশানন্দজী, স্বামী বামদেবানন্দজী, স্বামী শ্রীধরানন্দজী, ডঃ নমিতা দত্ত, ডঃ দীপক দত্ত, অভিষেক অধিকারী প্রমুখ। উভয় দিনে স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী। দুদিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ২৩ তারিখ সন্ধ্যায় 'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর' যাত্রাপালা অভিনীত হয়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪)ঃ গত ২২, ২৩ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, দীপক গুপ্ত প্রমুখ। দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ (নদীয়া)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি এবং ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি জন্মোৎসব পালিত হয়। ২২ তারিখ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ২৭ তারিখ উদয়াস্ত 'রামকৃষ্ণ' নামকীর্তন, সন্ধ্যায় 'সাধক বামাক্ষেপা' শ্রুতিনাটক, ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা এবং ২৯ তারিখ প্রায় ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিন বিকালে ভক্তিগীতির পর ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবাত্মানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্যজী। সন্ধ্যায় সঙ্ঘ পরিচালিত 'বিবেকানন্দ পাঠভবন' এর ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে।

নোনা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, উলুবেড়িয়া (হাওড়া)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'চণ্ডী'পাঠ, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন অলোক সান্যাল, দীপক দে, শ্যামল বিশ্বাস, সুকুমার বসু ও পঞ্চানন বিশ্বাস। সভার পর 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, ধনেশ্বরপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও গোপালচন্দ্র মণ্ডল। প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

চাঁদুর শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ শরণতীর্থ, তারকেশ্বর (হুগলি)ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, বক্তৃতা, শ্রুতিনাটক প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও ডঃ অমিয় চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বৈদিক প্রার্থনা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শাশ্বতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করেন স্বামী নির্বিকল্পানন্দজী। বিকালে আশ্রম-বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 'কৃষ্ণ-কানাইয়া' নৃত্যনাট্য ও 'দানবীর হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-১৩৬)ঃ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'স্বামীজীর বাণী' পাঠ, বস্ত্র-বিতরণ, সঙ্গীতাঞ্জলি, বাউল-সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় আশ্রম-সম্পাদক নারায়ণ চক্রবর্তীর স্বাগত-ভাষণের পর ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও স্বামী সনাতনানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।❑



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

SRI MA SARADA DEVI

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী



'উদ্বোধন'-এরগ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ **রামকৃষ্ণ মিশন**, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ **সত্যনারায়ণ রায়**, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
  ফোন : (০১১) ২৩৫৮-৭১১০/৩০২৩
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
  ফোন : (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা
  নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪
  ফোন : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

অসম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
  ফোন : (০৩৮৪২) ২৬৬৭৮৯, ২৬৭৭৮৯
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ, ফোন : (০৩৮৪৩) ২৬২২৭২
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি
  জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭, ফোন : (০৩৬১) ২৪৭০৯৯১
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স
  বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা, ফোন : (০৩৮১) ২২৩০২২২, ২৩৭৫৮৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক**, **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড
  ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যাণ্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী, ফোন : (০৬৭৫২) ২২২৪৭৯, ২২৮৯১৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮, ফোন : (০৬৭১) ২৩০৩৮৯২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্‌হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল
  নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩, ফোন : (০৩৬০) ২২৪৫২৭২

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪
  ফোন : (০৬১২) ২৬৭০৮১৫

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি
  রাঁচি-৮৩৪০০৮, ফোন : (০৬৫১) ২৫৪-১৯৭০/১০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**, বিষ্টুপুর
  জামশেদপুর-৮৩১০০১, ফোন : (০৬৫৭) ২৪২৩৭৯৫, ২৪৩০৬৯৯
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০
  ফোন : (০৫২২) ২৭৮-৭১৯১/৭১৪৩

মধ্যপ্রদেশ

- **চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়**
  কোয়ার্টার নং ২৮/এস, ওয়েস্টল্যাণ্ড, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি
  খামারিয়া, জব্বলপুর-৪৮২০০৫, ফোন : (০৭৬১) ২৪৩০২০৬

ছত্তিশগড়

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **পি. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ও. এন. জি. সি.
  কে. জি. পি, ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার (পশ্চিম)
  মুম্বাই-৪০০০৫২, ফোন : (০২২) ২৬৪৯-৪৭৬০, ২৬৪৬-৪৩৬৩
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনি
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স
  ও. এন. জি. সি. কলোনি, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এ/৭, রচনা সোসাইটি
  বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড
  বালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : (০২৬৩২) ২৪২৩৭৩
  ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com



রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার, নিউ টাউন, পিন-৭৩৬১০১, দূরভাষ ঃ (০৩৫৮২) ২৩৩৮৫৯

একটি প্রার্থনা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী পার্ষদ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে কোচবিহারের নিউ টাউনে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটি তিনি স্থানান্তরিত করেন। ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের প্রজাবৎসল, উদারহৃদয় ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর অনুগ্রহ করে ৮ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর এই আশ্রমটি বেলুড় মঠ-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এটি রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

সাধুনিবাস, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, মঠের প্রাচীর, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়িগুলি বহু বছর যাবৎ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। বাড়িগুলির আশু সংস্কারের প্রয়োজন। মঠের ভিতর বৃষ্টির জল জমে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই মাটি ফেলে জমি ভরাট করা, নর্দমা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা অতীব জরুরি।

(১)	**মঠের প্রাচীর ও বিভিন্ন বাড়ি মেরামতের জন্য প্রয়োজন**	**১০ লক্ষ টাকা**
(২)	**আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ঔষধ ও চিকিৎসকদের সাম্মানিক মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন**	**৩ লক্ষ টাকা**
(৩)	**গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক ও শিশুদের পুস্তক কেনার জন্য প্রয়োজন**	**১৩ লক্ষ টাকা**
(৪)	**কোচবিহার জেলার গ্রামের গরিব ও মেধাবী ১,০০০ ছাত্রের মধ্যে শিক্ষার উপকরণ বিতরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রদান ও ছাত্রবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে আনুমানিক প্রয়োজন**	**৫ লক্ষ টাকা**
	মোট	**৩১ লক্ষ টাকা**

রামকৃষ্ণ মঠের সেবামূলক কাজ সহৃদয় জনসাধারণ, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জিনিসপত্র ও অর্থসাহায্যের দ্বারাই নির্বাহ হয়ে থাকে। সহৃদয় জনসাধারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্ত, শিষ্য, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য অছিপর্ষদ, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট যথাসাধ্য জিনিসপত্র ও আর্থিক সাহায্য করার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি।

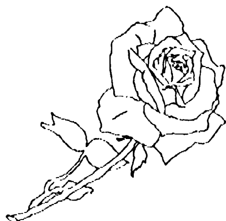
এই প্রকল্প রূপায়ণে যেকোন দান "Ramakrishna Math, Cooch Behar"—এই নামে A/c Payee Cheque বা Bank Draft অথবা M.O.-যোগে পাঠাতে পারেন। **সকল আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।** দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নিবেদক
স্বামী অজরানন্দ
অধ্যক্ষ

সৌজন্যে : রবিলাল ঠাকুর, কোচবিহার

লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

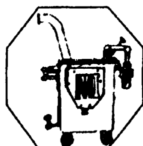


The rich should serve God and His devotees with money, and the poor should worship God by repeating His name.

Sri Ma Sarada Devi

শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর (ভগবানের) কৃপা হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে। তাঁর (ভগবানের) শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; তিনি যেমন যেমন দরকার, তেমন তেমন দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

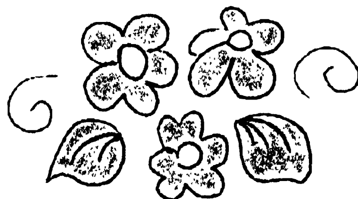
শ্রীমা সারদাদেবী

Call on the Lord who pervades the entire Universe. He will shower His blessings upon you.

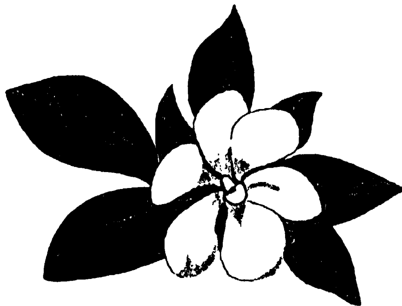
Sri Ma Sarada Devi

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী









I am the mother of the wicked, as I am the mother of the virtuous.
Sri Ma Sarada Devi

জগজ্জননী সারদা

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী



শ্রীশ্রী মা সারদামণির ১৫০তম জন্মবর্ষে পুনশ্চর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিমাইসাধন বসু
সকলের মা মা সারদা

শ্রীমা সারদা দেবীকে "ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি" বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে পূজা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সারদা, সরস্বতী।" অনস্বীকার্য সত্য হল, সারদা দেবী বাংলা তথা ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক অনন্যা মহীয়সী নারী। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ, পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ। কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণীর গভীরে প্রবেশ ও মূল্যায়ন করা তেমনি দুরূহ। সেই দুরূহ কাজ ঐতিহাসিকেরই। বিশ্বপ্রাণী ভালোবাসা, মাতৃস্নেহের অমল সুধা আর মানুষকে সুখী জীবনের আলো-দেখানো প্রদীপ হাতে নিয়ে জয়রামবাটীতে যে শিশুকন্যার আবির্ভাব ঘটেছিল ১৫০ বছর আগে (১৮৫৩), আজ শিশুকন্যার চরম অবহেলা ও অবমাননার যুগে তাঁকে নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, গবেষক ও সুলেখক নিমাইসাধন বসু। তাঁর মৌলিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘটনা-বিন্যাসের নিজস্বতা পাঠকের বহুতর জিজ্ঞাসার অবসান ঘটাবে। প্রথাগত জীবনী রচনা নয়, বরং মানবসভ্যতার কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সারদাদেবীর আগমন — ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রবীণ লেখক তার বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভঙ্গিমায়। স্বচ্ছ কলম তার আপন গতিতে নির্মাণ করেছে এক দ্যুতিময় জীবন-আলেখ্য। প্রখর তাপদগ্ধ দিনে বৃষ্টির মতো বার্তাবাহী এই অসাধারণ গবেষণামূলক গ্রন্থটি চিরকাল মানুষের মনে শান্তি দেবে। লেখার জাদুস্পর্শে মনে হয় আমরা যেন মায়ের সঙ্গেই চলেছি। দাম ঃ ১০০টাকা।

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
জগজ্জননী সারদা ৩০
এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন? ৪০
বিবেকানন্দ সূর্যের এক নাম ৩০
গল্পের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ ৪০

নিতাই বসু
স্বামী বিবেকানন্দ ৩৫

সুনীল জানা
কথামৃতের গল্প ৪০

অমরেন্দ্রনাথ আদক
ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৩০

পুনশ্চ ৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ফোন ঃ ২২৪১-৩৫৭২; ২৩৫০-৭৬০২

গল্পের রাজা শ্রী রামকৃষ্ণ

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী



বিবেকানন্দ সূর্যের এক নাম

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী







রবীন্দ্র রত্নাবলী

রবীন্দ্র-ভাবনার আকর-গ্রন্থ

ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ-শিল্প, সংগীত-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মহান দ্রষ্টা ও স্রষ্টা ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার রত্নকণিকাগুলি সঞ্চিত রয়েছে এই মহাগ্রন্থে। এ যেন সৃষ্টি-সিন্ধু মন্থনজাত এক অমৃতকুম্ভ, যার মধ্যে রয়েছে সমগ্র জাতির অমরত্বের প্রাণরসধারা। সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে তাঁর উপরোক্ত চিন্তার শ্রেষ্ঠ ভাবকণিকাগুলি যেমন সংকলিত হয়েছে তেমনি সৃষ্টির সুনির্বাচিত সম্পদগুলিও সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। একটিমাত্র আধার থেকে পরিপূর্ণ আস্বাদনের এমন সুবর্ণসুযোগ প্রায় দুর্লভ। গ্রন্থের শেষপর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে মহান স্রষ্টার মৌলিক চিন্তা-ঋদ্ধ 'বাণীচয়ন' অংশটি। এই সকল অমৃত-মন্ত্র জীবনকে দান করবে অমিত গতি, মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমলেশ ভট্টাচার্যএই দুরূহ কর্মটি সম্পন্ন করেছেন। ভারতীয় শৈলীর বহুবর্ণময় চিত্রে গ্রন্থটিকে সুশোভিত করেছেন এ যুগের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশশী দে ও রতন আচার্য। রেখাচিত্রে গ্রন্থটিকে শোভন সুন্দর করেছেন খ্যাতিমান শিল্পী সুব্রত চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অবলম্বনে বহুবর্ণময় প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন সুদক্ষ রূপকার অনুপ রায়। মহাভারতে যেমন সমগ্র মানব-জীবন প্রতিবিম্বিত, এই একখানিমাত্র গ্রন্থে তেমনি সমগ্র রবীন্দ্র-ভাবনার জগৎ প্রতিবিম্বিত। প্রতিটি গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মত একখানি রত্নকোষ। পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা ঃ বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও অধ্যাপক/চিত্তরঞ্জন মাইতি। সহযোগিতায় ঃ গবেষক ও প্রাবন্ধিক/রোমি সাহা। ২০০ টাকা



রবীন্দ্র-বাণীচয়ন

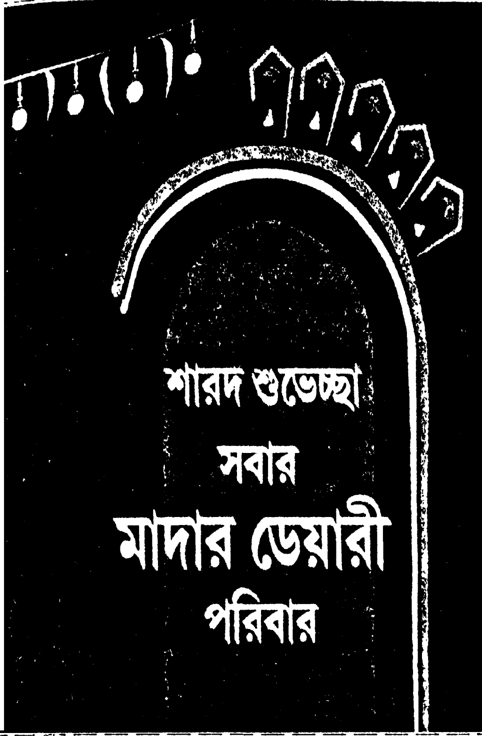
মহান স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যে সকল মৌলিক চিন্তার বিচ্ছুরণ ঘটেছে, তারই বাণীরূপ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই সকল অমৃত-মন্ত্র জীবনকে দান করবে অমিত গতি, মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা। বেদ পুরাণ মহাভারতের নব ভাষ্যকার, অরবিন্দ-রবীন্দ্রের ভাবনায় ঋদ্ধ কথাকার অমলেশ ভট্টাচার্য এই বাণী-চয়ন পুস্তিকাটির সংকলন-কর্ম সম্পাদনা করেছেন। প্রভূত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফসল এই মহামূল্যবান ভাবনা-সমৃদ্ধ নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থখানি। ২৫ টাকা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম্নী

সতেরটি কন্যার হৃদয়ের ছবি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করে কবি তাঁর অননুকরণীয় ভাষা ও ছন্দে তাদের রূপদান করেছেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুবর্ণময় তুলির টানে অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও ছন্দিত রেখায় তা অনন্য মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে তারা দাঁড়িয়েছে রূপদক্ষ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। ২০ টাকা

সাহিত্যবিহার ১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ / প্রাপ্তিস্থান ঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোঃ প্রা.লি. ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ ☎ ২৩৫০-৪৫৩৪/২৩৫৪-০৭২৮



With Best Compliments From :



WATCO INDIA LIMITED

20, Circus Avenue
Kolkata-700 017
Phone No. : 2247-5135

Swiming Pool Engineers

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দমুখর হোক সবার জীবন।





বাতাসে উৎসবের মেজাজ। উৎসবের
আনন্দে মেতে উঠুন। সঙ্গে রয়েছে
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক।
নানা ঋণ প্রকল্পের ডালি সাজিয়ে।
বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য উপযোগী স্কিম।
সহজে ঋণ, সুলভ সুদের হার।

স্বপ্নের বাড়ি সত্যি করে তুলতে **হাউসিং লোন** একান্ত নিজস্ব মোটরবাইক/গাড়ীর জন্য **স্কুম / কার লোন**
পুত্রকন্যার উচ্চশিক্ষার ভার নিতে **এডুকেশন লোন** চিকিৎসকদের নানা প্রয়োজন মেটাতে **ডক্টর প্লাস**
জাতির ভবিষ্যত স্রষ্টা শিক্ষক, তাঁদের উদ্দেশে **টিচার প্লাস** বাড়ির মালিকদের জন্য **রেন্ট প্লাস**
চাষিভাইদের কৃষিকাজে উৎপাদন বাড়াতে ঋণ **কৃষি প্লাস** নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী পুলিশবাহিনীর জন্য **পুলিশ প্লাস**
ইত্যাদি নানা ঋণ প্রকল্প।


ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
আপনার সঙ্গে - সবসময়

www.sbi.co.in & www.statebankofindia.com
Contact : Ph. (033) 2213 0622 / 2281 4871 / 2355 0422

আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে। সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনিতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

The mind is like a mad elephant. It rushes with the wind. That is why one must distinguish between good and evil and work hard for the sake of God.

Sri Ma Sarada Devi

ভগবানের নাম চিন্তা যেরকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরির রুটি সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

Everything is in the mind; nothing bears fruit unless the mind is pure.
Sri Ma Sarada Devi

সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়িঘর পরিবার আমার নয়, এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে।
শ্রীরামকৃষ্ণ

জগতের প্রতিটি কণায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তির প্রকাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

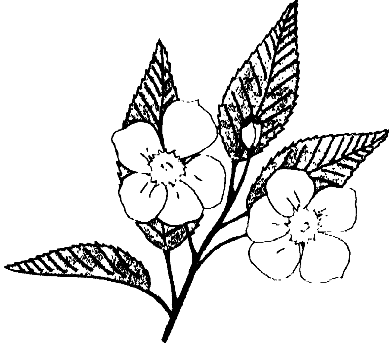
স্বামী বিবেকানন্দ

When a mighty log of wood floats down a stream, it carries on it hundreds of birds and does not sink. A reed floating down may sink with the weight of even a single crow. So when a saviour appears, innumerable men find salvation by taking refuge in Him. The Siddha can only save himself with much toil and tumble.

Sri Ramakrishna

One should be extremely careful about making His service perfectly flawless. But the truth is, God knows our foolishness, and therefore He forgives us.

Sri Ma Sarada Devi



A WELL WISHER

When the mind is free from attachment to sense-objects, it turns to God and is fixed on Him.

Sri Ramakrishna

আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।
শ্রীমা সারদাদেবী

In worshipping God we have been always worshipping our hidden self.
Swami Vivekananda

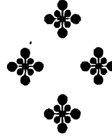
দশহরার দিন কয়েকজন ভক্ত মায়ের পায়ে পদ্মফুল দিয়া পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। মা একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ "ওমা, আমি মনসা নাকি?" পরে ঠাকুরের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন ঃ "উনিই মনসা, গঙ্গা—সব।"
(শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে শাস্তির কথা পাওয়া যায়— তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

- স্বামী বিবেকানন্দ

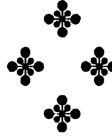
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone: 2554-2248 (Pub.) 2554-2403 (Editor)
2533-9292 (Mayer Bari)

Vol. 106
No. 9
September
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06





বিষ্ণুপুরের শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা মন্দিরে মায়ের শ্রীমূর্তির মুখছবি

...ল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
...্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥



উদ্বোধন সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা সডাক ১০০ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ৫০ টাকা

If undelivered, Please retur to
Udbodhan Offi e,
1 udbodhan Lane, Kolkat

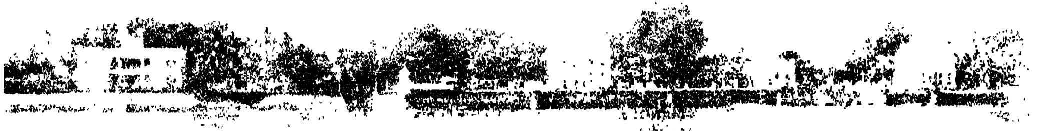
কার্তিক ১৪১১ ১০ম সংখ্যা

উদ্বোধন

॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা







রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।



প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ● কার্তিক ১৪১১ ● অক্টোবর ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' : **১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি : ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে : আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

দিব্য বাণী

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥...
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥



কালীর ভয়ঙ্করী রূপ ভক্তের কাছে বরাভয়কারী। (দৈত্যরাজ শুম্ভের আদেশে চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ দেবী অম্বিকার প্রতি ধাবিত হলে তাদের প্রতি ভীষণ ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হলো। তখন) দেবীর ভ্রুকুটি-কুটিল ললাট থেকে অবিলম্বে খড়্গ ও পাশ (বন্ধনাস্ত্র) হস্তে করালবদনা দেবী কালী নির্গতা হলেন। সেই দেবী নানা অঙ্গে বিচিত্র কঙ্কাল ধারণ করেছেন, গলদেশে শোভিত নরমুণ্ডের মালা, পরনে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম, তাঁর অস্থিচর্মসার দেহ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, অতি বিশাল তাঁর মুখ, রক্তাক্ত লোলজিহ্বা (জিহ্বা সঞ্চালন হেতু) তাঁকে অতি ভয়ঙ্করী করে তুলেছে, তাঁর আঁখিদ্বয় কোটরাগত ও রক্তবর্ণ, তাঁর বিকট হুঙ্কারে (দশ) দিক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে।...

সেই কালিকা দেবী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে দেবী চণ্ডিকার নিকট এলে তিনি বললেন ঃ "হে দেবি, আপনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মস্তক আমার কাছে এনেছেন বলে আজ থেকে 'চামুণ্ডা' নামে আপনি অভিহিতা ও পূজিতা হবেন।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী (৭।৬-৮,২৭)



সংসারে ভক্তি

'সংসারে ভক্তি'র অর্থ যদি হয় সংসারের প্রতি ভক্তি, যেমন 'ঈশ্বরে ভক্তি' বলিতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, তাহা হইলে ইহা অতীব সুলভ। কারণ, এই জগৎসংসারে ভক্তি অধিকাংশ মানুষেরই প্রবল। কিন্তু 'সংসারে ভক্তি' বলিতে যদি 'সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরে ভক্তি' বুঝায়, তাহা হইলে উহার অন্য অর্থ হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া সংসারধর্ম পালন করিতে গিয়া প্রায় ষোল আনা মনই সংসারে খরচ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে দিবার জন্য মনের আর প্রায় কিছুই বাকি থাকে না। মনই বলিতে থাকেঃ "ঈশ্বরচিন্তা করিবার সময় কই?" কান্তকবি দুঃখ আর অনুশোচনায় রচনা করিয়াছিলেনঃ "আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে পাইনে।" তাই সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরে পরমা ভক্তি বড়ই দুর্লভ। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করিতেন, এই ভক্তিই জীবের প্রাণরস। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের সৌধ এই প্রাণরসের উপরেই নির্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ "ভক্তি গেলে মানুষ কী লয়ে থাকে?" আপাতদৃষ্টিতে একথার সত্যতা আছে বলিয়া হয়তো মনে হইবে না। কারণ, এই সংসারে পিতা-মাতা, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, অর্থ, ক্ষমতা, মান, যশ, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরভক্তির তেমন কোন প্রয়োজন নাই। আসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি তো দিব্যি আনন্দে জীবনযাপন করিতেছে! কৈ তাহাদের হৃদয়ে তো ভক্তি-ভাবুকতার লেশমাত্র নাই! একথা ঠিক বটে। তবু একটি 'কিন্তু' আছে। দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চরম বিপদের মুহূর্তে কাহারো হৃদয়ে এই ভক্তির উৎস-মুখ খুলিয়া গিয়া তাহাকে জননীর ন্যায় রক্ষা করিতেছে। একমাত্র পুত্রের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পর পাগলিনী-প্রায় মাতা এই ভক্তির কারণে ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া উঠেন। অগ্নিকাণ্ড, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিশাহারা মানুষ ভক্তির কারণেই সঠিক পথ খুঁজিয়া পায়। এই ভক্তির আবহেই দেখিতে পাই, ধীরে ধীরে বহু সামাজিক ব্যাধি দূর হইয়া কখন কোন নিম্নপথগামী মানবগোষ্ঠী উচ্চতর জীবনমার্গে অনুপ্রাণিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যষ্টি বা সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই এই ভক্তি তাহার/তাহাদের জীবনে বাঁচিয়া থাকিবার একটি উপাদান। সুতরাং ভক্তির বীজ সকলের অন্তরে বিদ্যমান। যেমন কর্মের বীজ সকলের মধ্যেই দেখা যায়। কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেহ কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না।

ভক্তি দুইপ্রকার। বিধিবাদীয় বা বৈধী ভক্তি এবং রাগাত্মিকা বা রাগভক্তি। আবার এই রাগভক্তি কখনো ঐশ্বর্যাত্মিকা, কখনো বা মাধুর্যাত্মিকা। ব্যষ্টির জীবনে এই রাগভক্তির প্রসঙ্গ আসিলেও সমষ্টির ক্ষেত্রে কখনো রাগভক্তির প্রসঙ্গ উঠে না, কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা রূপায়িত হইবে না; ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে, এই জগৎ-রূপ খেলাটি বন্ধ হইয়া যায়। এই খেলার প্রধান উপজীব্যই হইল—'ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাক'। অথচ 'রাগভক্তি' হইলে সদা-সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান, নামগুণকীর্তন আপনিই অন্তরে অন্তরে চলিতে থাকে। সেরূপ অবস্থায় সমাজ বা সংসার তো আর থাকিবে না। সুতরাং সমষ্টির জন্য অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য সর্বত্র, সকল ধর্মে বৈধী ভক্তিই অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু আশার কথাও আছে। এই বৈধী ভক্তির পরিণামেই রাগভক্তি। অর্থাৎ ভক্তের লক্ষ্য কী হইতে পারে? শ্রীভগবানের প্রতি কী উপায়ে ভালবাসা জন্মিতে পারে, ইহাই ভক্তের লক্ষ্য। ঈশ্বরের নামগুণগান করিতে করিতে তাঁহার প্রতি অন্তরের টান বাড়াইতে বৈধী ভক্তি সাহায্য করে। ক্রমে মানুষ একটু একটু করিয়া নিবিড়

শুভ বিজয়া'র
প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি। এই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই।

—সম্পাদক

ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদন করিতে থাকে। ধীরে ধীরে ইহা যেন তাহার এক নেশায় পরিণত হয়। সুতরাং যেসকল নিন্দুক "ধর্ম মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে" বা "Religion is opium" ইত্যাদি রটনা করিয়া থাকে, তাহারা খুব ভুল কিছু বলে না। তবে একটি কথা আছে। সুরাপানাদি বৈষয়িক নেশা ঈশ্বরকে ভুলাইয়া দিয়া মানুষের মনকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং ক্রমে তাহার মধ্যে হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধের আধিক্য ঘটে। কিন্তু এই ভক্তির নেশা মানুষের মনে প্রবল শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের সন্নিকটবর্তী করে। তাহার অন্তরে আনন্দের ফল্গুপ্রবাহ যেন জীবনস্রোতের দিক পরিবর্তন করিয়া মনকে স্বস্বরূপের দিকে প্রধাবিত করে; যে-ব্যক্তি আজ অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি-পরায়ণ ছিল, ভক্তির নেশা তাহাকে স্বার্থবুদ্ধি-বিরহিত এক দিব্যলোকের অধিকারী করিয়া তুলে।

বৈধীভক্তির মধ্যেও আবার স্তরবিশেষ আছে। ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ এবং ভক্তির তমঃ। কিন্তু রাগভক্তি সাত্ত্বিক। সেখানে বাহ্য আড়ম্বর নাই। অন্তরের অকপট ব্যাকুলতাই সেখানে পূজার উপচার। ভক্তির সত্ত্বে ক্রমশ সকল 'দোকানদারি' ঘুচিয়া গিয়া তাহা রাগভক্তিতে পরিণত হয়। বিধিবাদীয় ভক্তির বিভিন্ন স্তর কিরূপ? ভক্তির তমঃ কেমন? "ভক্তির তমঃ যার হয়, তার জ্বলন্ত বিশ্বাস।... যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো, কাটো, বাঁধো!' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।" কিয়ৎক্ষণ পরেই বলিতেছেন ঃ "কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী। এমন রোখ হওয়া চাই।" 'ভক্তির তমঃ' শব্দটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। এইরূপ ব্যক্তিরও মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত যথার্থ অন্তরঙ্গতা স্থাপন করা। ঈশ্বরের সহিত এই ব্যক্তিগত সম্পর্কই তাহার মুখ্য উপজীব্য। "আয় মা সাধনসমরে, দেখব মা হারে কি পুত্র হারে।" রামপ্রসাদ গাহিলেন। আধুনিক কালে ধর্ম-ধর্ম করিয়া যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাইতেছে, যে গোঁড়ামি কিংবা ধর্মের অপব্যবহার আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছে—তাহাকে 'ভক্তি' আখ্যা দেওয়া যায় না। স্পষ্ট করিয়া বলিলে, কিছু মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে যে বিকৃত মানসিকতা দেখা যাইতেছে, তাহারা যে-ধর্মেরই হউক, তাহার সহিত ভক্তিশাস্ত্রে বিধৃত 'ভক্তি'র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক অর্থাৎ ভাব-সাধন বলিয়া কোন ব্যাপার সেখানে নাই। সুতরাং আমাদের আলোচনায় কোন ধরনের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

রজোগুণী ভক্তের বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ "ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে। রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। (সকলের হাস্য) যখন পূজা করে গরদের কাপড় পরে পূজা করে।" এক্ষেত্রেও বাহ্য উপচার যাহাই হউক না কেন, মূল আলোচ্য বিষয় সেই এক 'সম্পর্ক'। অর্থাৎ ভক্তের সহিত ভগবানের 'সম্পর্ক'। বাকি বর্ণনা আলঙ্কারিক। অর্থাৎ যথার্থ ভক্তের, সে তমঃ, রজঃ কিংবা সত্ত্বগুণী হউক, ঈশ্বরের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্পর্কই মূলকথা। সত্ত্বগুণী ভক্তের স্বভাব কী? ঠাকুর বলিতেছেন ঃ "যে-ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে।... শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হলো। খাবার ঘটা নাই। পোশাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনো তোষামোদ করে ধন লয় না।" অবশ্য একথাও সত্য যে, যাহার যাহা স্বভাব, তদ্বিপরীতে কর্ম করিতে গেলেই বিপদাশঙ্কা থাকে। যে-ব্যক্তি তামসিক, সে যদি রজোগুণী ব্যক্তিকে নকল করিতে যায়, তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যাহার ভিতরে প্রবল রজোগুণ, সে যদি ক্ষণিক উৎসাহের বশে কোন সত্ত্বগুণী সাধককে অনুকরণ করে, তাহা হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া রজোগুণ ফের তাহার মাথায় চড়িবে। ধীরে এবং স্বাভাবিকভাবে যে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন তথা বিবর্তন ঘটে, তাহাকে পথ করিয়া দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু ভক্তির বীজ যে সকলের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা মানিতেই হয়। ঘোর নাস্তিকের মধ্যে এই ভক্তির অভিব্যক্তি স্নেহ, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধারূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গান গাহিতেন ঃ "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।... শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।" ঠাকুর নিজেও জীবকে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেছেন ঃ "মা এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দে" ইত্যাদি। এই শুদ্ধাভক্তি গোপগোপীগণের হইয়াছিল। আমাদের কি হইবে না? হইবে কিনা, সে-বিচারে না গিয়া প্রার্থনা করিতে তো বাধা নাই। এবং এই শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ভক্তির উৎকর্ষ বাড়িবে বৈ কমিবে না। মন যে পরিমাণে শুদ্ধ হইবে, তাহার রজঃ-তমোবৃত্তি ততই নাশ হইতে থাকিবে। ক্রমশ সেই ভক্ত সাত্ত্বিক ভক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবে। অবশেষে এক অপূর্ব দিব্য রাগাত্মিকা ভক্তি সাধকের অন্তরের সংসারচেতনাকে ঈশ্বরচেতনায় রূপান্তরিত

করিয়া দিবে যেন কোন এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে! স্বরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র'-এ স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করিয়াছেনঃ "কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি।" অর্থাৎ ঠাকুর যেমন বলিতেন, মোড় ঘুরিয়া যায়। মানুষের ছয়টি রিপু বা শত্রু আমৃত্যু তাহার সঙ্গী। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয় রিপুকে বন্ধু করিয়া লওয়ার কৌশল বিধৃত হইয়াছে উল্লিখিত স্তোত্রাংশে।

ভক্তিপথে এই ষড়্‌রিপুকে ঈশ্বরমুখী করিয়া দেওয়া খুব সহজ। কাম অর্থাৎ মনের তীব্র ইচ্ছা বিষয়মুখী হইলেই আমাদের জীবনে তীব্র অশান্তি নামিয়া আসে। ইহাকে ঈশ্বরমুখী করিলেও অশান্তি আসে। তবে সেই অশান্তি বস্তুত বিরহ-মাধুর্যে সুষমান্বিত। ঈশ্বরগতপ্রাণ ভক্তের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পাড়া-পড়শি যদি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে? উহাও সাধককে আরো বেশি করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া তুলে। তাহার সকল কামনা-প্রবাহ কেবল ঈশ্বরের প্রতি ধাবমান হইবে, অন্য কাহারো পানে নহে।

অনুরূপে, মন হইতে ক্রোধ তো সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইবে না, বরং উহা ঈশ্বরকেন্দ্রিক হইয়া উঠুক। তাঁহার নামগুণ-গানে যেকেহ বাধাপ্রদান করিবে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কিংবা আধ্যাত্মিক যে-স্তরেই হউক, তাহার প্রতি রোষানল জ্বলিয়া উঠুক। ভক্তের রোষানল কাহারো ক্ষতি করে না। বিষয়ী মনের রোষানল অপরের ক্ষতিসাধন করে, এমনকি অপরের মৃত্যুরও কারণ হয়। ভক্তের রোষানল শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'সাপের ফোঁস'-এর ন্যায়, ছোবল মারে না।

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে লোভ আছে। যে যথার্থ ভক্ত, সে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের লোভ করে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টির লোভ করে। মনে মনে হয়তো ভাবিলঃ 'মায়ের পায়ের ঐ জবাখানি আমার চাই।' ভাগবৎ-কথা শুনিতে তাহার লোভ হয়। দেবালয়ের দিব্য গন্ধে সে প্রলুব্ধ হয়।

ভক্তের মনের মোহ তাহাকে অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া চলে। কিরূপে? ভক্ত ভগবানেতেই মোহগ্রস্ত হয়। অন্য ভাবের লোক দেখিলে সে কুণ্ঠিত হয়। অপরাপর ভক্তের দর্শন পাইলে সে পুলকিত হইয়া উঠে। শ্রীভগবানের লীলাস্থান কিংবা ভাগবৎ গ্রন্থের উপর বিষয়ী লোকের ন্যায় তাহার মনেও এক অদ্ভুত মোহের সৃষ্টি হয়। "তিন টান এক হলে ভগবানলাভ হয়।"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। মায়ের সন্তানের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান—এই তিন টান। ইহা ভক্তের মোহই বটে।

ভক্ত কখনো কখনো মদ-গর্বে গর্বিত হইয়া বলেঃ 'জান না, আমি কাহার দাস?' স্বামী বিবেকানন্দের সেই অনবদ্য শ্লোকাঞ্জলি স্মর্তব্যঃ

"কূর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥"

গগনের নক্ষত্রসমূহকে আমরা চর্বণ করিতে পারি, এই ব্রহ্মাণ্ড অথবা ত্রিভুবনকে সমুৎপাটিত করিতে পারি। জান না আমরা কে? আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস! ইহাই মদগর্ব। যে 'মদ' (অহঙ্কার) এতকাল শত্রু ছিল, এখন তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সহস্রগুণ বাড়াইয়া দিতেছে।

ভক্ত আবার কখনো কখনো মাৎসর্য-দুষ্ট হইয়া উঠে। অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে 'হিংসে' জাগিয়া উঠে। কোন ভক্ত দৈনিক পাঁচহাজার ইষ্টমন্ত্র জপ করে দেখিয়া অপর ভক্তের মনে 'হিংসে' হয়। সে লুকাইয়া দশহাজার জপ করিতে সচেষ্ট হয়। কোন ধনী ভক্ত নিজ গুরুস্মরণে হয়তো পাঁচহাজার দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিল। অপর কেহ মাৎসর্যাক্রান্ত হইয়া নিজের ইষ্টস্মরণে দশহাজার দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিল। অর্থাৎ মাৎসর্য (jealousy) রিপুর মোড় ঘুরিয়া গেল এবং ভক্ত ইষ্টের আরো সন্নিকটবর্তী হইল। জ্ঞানপথে বা কর্মপথে এই 'মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া' ব্যাপারটি বেশ কঠিন হইয়া পড়ে। ভক্তিপথে ইহা সহজতর। কারণ ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। জ্ঞানপথে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধনেরই অঙ্গ, সাধ্য নহে। কর্মও একটি সাধনমাত্র। স্বামীজী তাঁহার 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতাবলীতে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন, ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। যেটুকু ভক্তিলাভ হইল, উহাই প্রাপ্তি। পরিণামে ভক্তের ভক্তিই মূর্ত হইয়া উঠে তাহার ইষ্টদর্শনে। প্রহ্লাদের অপরিসীম দিব্য ভক্তি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়া নৃসিংহের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবকে যখন প্রহ্লাদ স্তব করিতে লাগিলেন, অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিনি প্রহ্লাদের গা চাটিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত মানুষকে উপাদেয় আহার পরিবেশন করিলে তাহার যেমন (ক) ক্ষুধানিবৃত্তি, (খ) তৃপ্তি এবং (গ) পুষ্টিলাভ হয়, তেমনি ভক্তির দ্বারা ভক্তের তুষ্টি, পুষ্টি এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে। ভক্তির প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেনঃ "ভক্তোঽসি মে সখা চেতি"—হে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলেই দেবতাগণ-ঈপ্সিত এই বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইতেছি। ভক্ত কিরূপে সংসারে থাকিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইতেনঃ নৌকা জলে ভাসে, কিন্তু নৌকার ভিতরে জল নাই। তেমনি যাহারা ভক্ত, তাহারা সংসারে থাকিলেও তাহাদের অন্তরে সংসার প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই 'সংসারে ভক্তি'। ❑

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র



॥১॥



Ramkrishna Mission
Belur P. O., Howrah Dist.
Dated.........12. 8.........1925

শ্রীমান কালীসদয়*,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসারে থাকিয়া সহস্র সম্পদের ভিতরেও যে মনে করে—আমি বেশ আনন্দে ও শান্তিতে আছি, সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেহ ওরূপ মনে করিতে পারে কিম্বা একেবার যার দূরদৃষ্টি নাই, সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে পারে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় বা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে যার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, সে কখনই যেকোন অবস্থায়ই হউক সংসারকে কখন সুখময় শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সততই সেইজন্য সে মোহের পার ভগবৎ নিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি আমার খুব আনন্দ হয়, কারণ তোমার মন সংসারে কখন শান্তি সুখ অনুভব করে না; ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ। তোমার কোন ভয় নাই, ঠাকুর তোমায় যথার্থ পথেই চালাইতেছেন। তোমার পদস্খলনের ভয় নাই, তিনিই তোমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন।

এখন কোনপ্রকারে ঐ মালাতেই জপ কর কোন ক্ষতি নাই। এখন থেকে মালা সাবধানে রাখিও, পরে নূতন মালা করিয়া লইলেই হইবে। এখানে যদি ৺পূজার সময় আসা হয় তখন মালা নূতন করিয়া লইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ মহামায়ার পূজা প্রতিমায়ই হইবে যদিও এখনও পর্য্যন্ত কোন সংস্থানই নাই। এই রূপই প্রতি বৎসরই হয়। তাঁর ইচ্ছায়।

৪র্থ ভাগ কথামৃতের ২৩ পৃষ্ঠায় ৪র্থ paragraph খুঁজিয়া দেখিলাম, তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

প্রার্থনা করি, তুমি ও তোমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁর স্মরণ মনন করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। আমার শরীর তত মন্দ নয়। মঠের স্বাস্থ্য, তাঁর ইচ্ছায়, এখনও খারাপ হয় নাই তবে সময় আসিতেছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* অসমের করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত কালীসদয় পশ্চিমা ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।—সম্পাদক

।।২।।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Sri Hathiramjee Muth
Ootacamund, Nilgiris
S. India
20.6.26

শ্রীমান কালীসদয়,

তোমার ১৪।৬ তারিখের পত্র কাল এখানে পাইলাম। আমরা গত ৪ঠা জুন মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মাদ্রাজ শেষকালটা ভয়ানক গরম হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেখানকার কার্যও অনেকটা শেষ হইয়াছিল, বাকি যাহা আছে তাহা এখানে বসিয়া হইয়া যাইতেছে। এখানেও ঠাকুরের একটী ছোটখাট মঠ নির্ম্মাণ হইতেছে। তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা এখানেও বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে। যুগধর্ম্ম এই রূপেই সংস্থাপন হয় দেখিতেছি। এখানকার পার্ব্বতীয় পল্লিতেও ঠাকুর ও স্বামীজীর বহু ভক্ত দেখিতেছি ও আশ্চর্য্য হইতেছি। মনে হইতেছে ধন্য ঠাকুর ধন্য তোমার লীলা।

এ স্থান অতি শীতল এবং অতি রমণীয়, চমৎকার দৃশ্য। 8000 ft. above the mean sea level. বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ আবার এত উপরে প্রকাণ্ড একটী হ্রদ। ইহা মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের গ্রীষ্মনিবাস। যেমন বাংলার দার্জিলিং[;] অনেক সাহেব ও অনেক দেশী লোক এখানে থাকে। আমরা যে বাড়ীতে আছি ইহা দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ বালাজী (বা তিরুপতি বা বেঙ্কটেশ্বর) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্মনিবাস। বালাজীর মহাঐশ্বর্য্য। তিনি দয়া করিয়া আমাদের দিন কতকের জন্য থাকিতে দিয়াছেন। সবই ঠাকুরের কৃপা, বালাজী তাঁরই এক রূপ। মোহন্ত মহারাজ নিমিত্ত মাত্র। বাড়ী well furnished, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অতি নির্জ্জন। নিকটে লোকালয় নাই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমাদের সকলের শরীরই ভাল আছে। অবশ্য আমার বৃদ্ধ শরীর, কিছু না কিছু অসুখ আছেই। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কষ্টদায়ক নয়, মোটের উপর ভালই আছি। স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। মনও খুব ভাল আছে তাঁর কৃপায়।

তোমাদের ওখানকার ঠাকুরের সেবাসমিতির কার্যের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি উহা স্থায়ী হউক* এবং বহু লোকের কল্যাণ সাধিত হউক উহা দ্বারা। তুমি সেবাকার্য্য করিয়া কখনই উহাতে আসক্ত হইবে না, আমি নিশ্চয় জানি। এবং ধীরে২ তাঁর রাজ্যে তুমি অগ্রসর হইতেছ এবং হইবে এবং এই জীবনেই পূর্ণত্ব লাভ করিবে, তাঁর কৃপায় ইহাও আমি নিশ্চয় জানি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং সমিতির ছেলেদের সকলকে জানাবে। কর্ম্ম করিতে গেলে বাধাবিঘ্ন নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি হইবে এবং ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। Struggle যেখানে নাই সেখানে কাজ বাড়ে না। "Struggle is life." ইতি

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ এখানে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস সবরকমই পাওয়া যায়, অবশ্য খুবই দুর্ম্মূল্য। ঠাকুরের কৃপায় একপ্রকার সব চলে যাচ্চে। শীতের জন্য খুব গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। বেশীদিন বোধহয় এখানে থাকা হবে না, কারণ এখানকার বর্ষা অতি ভয়ঙ্কর যেমন চেরাপুঞ্জি। সেসময় এ জায়গা প্রায় খালি হয়ে যায়। সেটী জুলাইয়ের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়। লোকে বলছে, তখন স্বাস্থ্য নাকি এখানকার খুব ভাল হয়। যাহয় ঠাকুরের ইচ্ছায় হইবে। ভালই হইবে তার সন্দেহ নাই।

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করিমগঞ্জের আশ্রমটি ১৯২৯ সালে বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়।—সম্পাদক



কার্ত্তিক ১৩১১
অক্টোবর ১৯০৪

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৯শে ভাদ্র রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শতাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান একত্র মিলিত হইয়া সমস্ত দিবস ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ পাঠ, আলোচনা, ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনাদি করেন। প্রায় ২০০ কাঙ্গালীকে পয়সা, চাল ও প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জানিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

•

বিগত জন্মাষ্টমীর দিবস অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারেও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

•

বিগত ১লা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ সমিতির সভ্যগণের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করেন।

•

মানিকতলাবাজার হরিসভার সপ্তম সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩০শে ভাদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া উৎসব চলিতেছে। ১৭ই আশ্বিন উৎসব শেষ হইবে। এই সভায় বিগত ১লা আশ্বিন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী 'ব্যবসা ও অক্ষয় ধনলাভ', ২রা আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ 'নির্ভর' ও ৪ঠা আশ্বিন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় 'সুগম সাধন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই আশ্বিন হইতে ১২ই আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কথকতা করেন। ১৬ই আশ্বিন কাঙ্গালীভোজন ও ১৭ই আশ্বিন নগরসংকীর্ত্তনান্তে উৎসব সমাপ্ত হইবে।

•

বিগত ২রা আশ্বিন সাহিত্যসভার পঞ্চম বাৎসরিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব এম. এ. মহাশয় 'কর্ম্মফল' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

•

বিগত ৩১শে ভাদ্র কলিকাতা টাউন হলে 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী বীরপূজা করিতে ধীরে ধীরে শিখিতেছে দেখিয়া আশা হয়। আশা করি, এ সকল উৎসব সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসমাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উহাদের প্রভাব বিস্তার করিবে।

•

বিগত ৮ই আশ্বিন তারিখে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় গৃহে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্বামী সত্যকাম 'Song of the Sanyasin' নামক স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাটীর আবৃত্তি এবং বাবু পুলিনবিহারী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রশ্নোত্তর হয়। বিগত ১৫ই আশ্বিন সিমলা ষ্ট্রীটস্থ জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে উক্ত সমিতির আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতেও স্বামী সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলেন।

•

অগষ্ট মাসের মধ্যভাগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইংরাজী ভাষায় (১) পরে কি হইবে? (২) খ্রীষ্ট কি বৈদান্তিক ছিলেন? এবং (৩) বেদান্ত আস্তিক না নাস্তিক?—এই তিনটী বক্তৃতা করেন। এক্ষণে স্বামী আত্মানন্দ বাঙ্গালোরে থাকিয়া তিনটী ক্লাস করিতেছেন।— মুদালিয়ারের বাঙ্গালায় একটী, দেবংখন স্কুলে একটী ও বিবেকানন্দ আশ্রমে একটী। পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি অধ্যাপিত হইতেছে।

•

মস্‌লিপাটামের হিন্দুগণ 'বিবেকানন্দ মন্দির' নামক একটী মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ওঙ্কারের পূজা ও সপ্তাহে দুই দিবস গীতাপাঠ হয়। গত ২৭শে অগষ্ট এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথাকার হিন্দু সাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উক্ত দিবস ঐ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করান। উক্ত স্বামী মস্‌লিপটমে ইংরাজী ভাষায় দুইটী বক্তৃতা দেন—(১) সত্য কি? (২) সত্য উপলব্ধি করিবার উপায়।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—**সম্পাদক**

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সন্ন্যাসযোগ

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২।।

শ্লোকার্থ ঃ *একমাত্র ঈশ্বরার্থেই কর্মফল সমর্পণ করিতেছি, স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি না—এইরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী চিরশান্তি লাভ করেন; কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্তিবশত সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।*

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মন আকৃষ্ট হইলে সংসারের সব বস্তুই তুচ্ছবোধ হয়। সংসারী লোক সর্বদাই একটা কিছু আশা লইয়া কাজকর্ম করে, কিন্তু যথার্থ ভক্তের মনে এই সংসারে কোন লাভের আশা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, ভগবানের সেবা হিসাবেই করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই কর্মের ফলভোগ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাঁহার মন ভগবানে আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার মন বাসনায় পূর্ণ থাকে; তাই সে যাহা কিছু করে, পিছনে একটি ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে। সুতরাং ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই, তাহাকে নিষ্কাম কর্মযোগী বলিয়া অভিহিত করিলে তাহারও ক্ষতি হয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়।

[মন্তব্য ঃ যদিও শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার উল্লেখ নাই, তথাপি শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ চিরশান্তি' যোগী লাভ করেন। জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিলেই মোক্ষলাভ এবং চিরশান্তি লাভ হয়। অজ্ঞান ব্যক্তির চিরশান্তি লাভ হয় না।—**সম্পাদক]**

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্।।১৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *যিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, তিনি বিবেক-বুদ্ধি সহায়ে নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম সকলই পরিত্যাগ করেন বা তত্তৎ কর্মফল ত্যাগ করেন, এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকে কোন কর্মে প্রয়োগ না করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহনগরে প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ যখন সাধকের মন ভগবানে সর্বদা যুক্ত থাকে, তখন সে পরোক্ষে বুঝিতে পারে এবং বুদ্ধি পাকা হইলে প্রত্যক্ষ করে যে, স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হইতে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই দেহ ও মনের কোন কর্ম করা বা না করা সম্বন্ধে তাহার কোন রাগ-দ্বেষ থাকে না। পূর্ব সংস্কার অনুসারেই তাহার কার্য চলিতে থাকে। ভক্তিপ্রধান সাধক দেখিতে পান, ভগবান সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন। সুতরাং আমার এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই এবং কাহাকেও দিয়া কিছু করাইবারও নাই। আর জ্ঞানী সাধক সিদ্ধ হইলে দেখিতে পান, এই জগৎটা ব্রহ্মের মায়াশক্তির একটা খেলা মাত্র। ইহাতে কাহারো কর্তৃত্ব নাই; তাহার নিজেরও কিছু করিবার নাই এবং কাহাকেও কিছু বলিবার নাই। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইহার চূড়ান্ত আদর্শ। আমাদের লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) এবং হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) জীবনেও এই আদর্শ স্পষ্ট দেখা যায়। ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণও শুধু স্বামীজীর আদেশ ছিল বলিয়াই কাজ করিতেন—নিজের কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না। ইঁহারা সকলেই ঠিক দেখিতে পাইতেন—আমি একখানা রথে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, রথ প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। 'নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'।

[মন্তব্য ঃ চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, কর্মে অকর্ম দর্শন ও অকর্মে কর্মদর্শন—ইহাই বিবেকবুদ্ধি। এই বিবেকবুদ্ধিসহায়ে ভক্ত কর্ম করেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি দৈনন্দিন অবশ্যকর্মই নিত্যকর্ম। উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, গৃহদাহজনিত দোষস্খালনে বিশেষ যাগাদি নৈমিত্তিক কর্ম। পুত্রকামনা বা স্বর্গকামনাদি পরিপূর্তির জন্য যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম এবং ব্রাহ্মণ-

হত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম। ইহাই বেদোক্ত কর্মবিভাগ। এবং এই মনুষ্যদেহকে একটি নবদ্বারসম্পন্ন গৃহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।—**সম্পাদক**]

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥১৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *আত্মা (প্রভু) বা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফলভোগ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তির কারণেই মানুষের অন্তরে কর্তৃত্বাদি বোধ জন্মাইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রভাবে কর্তৃত্ব, কারয়িতৃত্বাদি আত্মাতে অধ্যারোপিত হইয়া থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ পৃথিবী অবিরাম ঘুরিতেছে। তাহার আহ্নিক গতির ফলে কখনো দিন, কখনো রাত হয় এবং বার্ষিক গতির ফলে কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম হয়। প্রকৃতির নানাপ্রকার বিপর্যয়ে বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঝড়, খরা প্রভৃতি হইয়া থাকে। মানুষকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এইসব প্রাকৃতিক নিয়মের পশ্চাতে অবস্থিত প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করিতে ঋষিগণ উপদেশ দিতেন। তাই ঝড়ের দেবতা পবন, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সবই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। মানবদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। দেহে যৌবনোদ্গম হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী-পুরুষের মিলন-লালসা উদ্ভূত হয়। তাহার পর সন্তানের জন্ম হইলে সন্তানের উপর যে দারুণ আকর্ষণ, তাহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম-বশে এই জগতের সর্বপ্রকার জীবজন্তু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রক্ষার জন্য প্রবল উদ্যম করিয়া থাকে। আবার বৃদ্ধ হইলে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া জরা-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। এই সৃষ্টির মধ্যে যত কিছু কাজকর্ম হয়—প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়মে হইয়া থাকে। চুম্বক-প্রস্তরে এমন এক আশ্চর্য শক্তি আছে, কোন লৌহখণ্ড কোন কারণে তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলেই এক দারুণ আকর্ষণ তাহাকে চুম্বকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতির এইসব নিয়ম বুঝিতে পারিলে মানুষ ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে চালাইতে পারে। যাহা মানুষের সাধ্যাতীত, মানুষ তাহাকেই ঈশ্বরের কৃপাধীন মনে করিত, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাহা অনেকটা মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। আকাশের মেঘকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃষ্টিরূপে পরিণত করা, অনুর্বর জমিতে জল সরবরাহ করা, অনুর্বর জমিকে উর্বর করা, পৃথিবীর একপ্রান্তের সংবাদ অন্যপ্রান্তে প্রেরণ করা, জন্মান্ধকে বিদ্বান করিয়া তোলা, আতুরকে চলচ্ছক্তিপ্রদান করা, এমনকি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম হৃৎযন্ত্র বসাইয়া মানুষের দেহস্থ কার্য পরিচালন ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার অদ্ভুত কার্য মানুষ করিতেছে। কিন্তু পূর্বে লোকে মনে করিত, এইসব কার্য ভগবানের ইচ্ছাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। চিকিৎসাবিদ্যা তো বহু প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত, পাপের ফলে রোগ হয় এবং ঔষধের দ্বারা নিবারিত হয়; পূর্বে যে-রোগে মানুষ বাঁচিত না, এখন সেইসব রোগ অনায়াসে নিবারিত হইতেছে। বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে হঠযোগের ক্রিয়া দ্বারা মানবদেহের সমস্ত শক্তিকে মানবের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। পতঞ্জলি ঋষি কর্তৃক আবিষ্কৃত রাজযোগের সাধনাসাহায্যে মানুষ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। অতএব এইসব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আমরাই আমাদের সমস্ত উন্নতি ও অবনতির নিয়ামক। অজ্ঞতাবশে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট পাই এবং প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখী হই। এমনকি প্রবল বিচারবুদ্ধি সহায়ে অনাত্ম প্রকৃতির সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে পূর্ণশান্তি, পূর্ণকামত্ব লাভ করাও সম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞতাই মানুষের সমস্ত দুঃখের হেতু। যদি ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের বন্ধনমুক্তি হইত, তাহা হইলে মুনি-ঋষিরা সুখশান্তি লাভের জন্য এত উদ্যম করিবার পরামর্শ কেন দিয়াছেন? কর্মই তো মানুষের জন্ম-মরণ, উন্নতি-অবনতি, এমনকি বন্ধন-মুক্তির কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে মানুষের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ। আমরা নিজের অতীত জীবনের ঘটনা কিছুই মনে করিতে পারি না। সব ঘটনাই যে সংস্কাররূপে আমাদের সূক্ষ্মদেহে রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। দেহের লালসাকে নিজের লালসা মনে করিয়া কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো লক্ষ লক্ষ বৎসর এই রূপরসের চারিধারে ঘুরিয়া মরিতেছি। জ্ঞান হইলে মানুষ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যাকিছু ভালমন্দ, তাহার কৃতকর্মই সেসবের কারণ; তবে ব্রহ্মাই এই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন—এই হিসাবে তিনি নিয়মকর্তা মনে করিয়া তাঁহাকে লোকে দায়ী করিয়া থাকে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল সহাস্য বদনে বলেন, 'যে আমাকে চায় সে আমাকে পায়, যে আমাকে না চায় তাকে পঞ্চভূতে নাচায়।'

[**মন্তব্য ঃ** আত্মা কাহাকেও 'কর্ম কর' বলিয়া নিয়োগ করেন না। তাই আত্মা কারয়িতা নহেন, আত্মা কর্তাও নহেন। নীলিমা-শূন্য আকাশে যেরূপ নীলিমা-ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মাতেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ভ্রম হয় মাত্র। —**সম্পাদক**] [ক্রমশ]।।তেইশ।।

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

মাতৃতীর্থপরিক্রমা

বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার দ্বাবিংশ পর্যায়ে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির।—সম্পাদক

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে প্রখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল, তেমনি শ্রীশ্রীমাও এখানে শুভাগমন করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কালীর আদি মন্দির ছিল গঙ্গার তীরে। বর্তমানে যেখানে মন্দিরটি অবস্থিত, তার কাছ দিয়েই পূর্বে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল; কালক্রমে গঙ্গা অনেক দূরে সরে যায় এবং সেখানে ভাঙা জমির ওপর বড় বড় বাড়ি, চিৎপুর রোড (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বছর আগে 'তপস্বী কালীবর' নামে হিমালয় থেকে আগত জনৈক শক্তিসাধক সন্ন্যাসী দেবীর স্বপ্নাদেশের পর ভুল করে এখানে তপস্যার জন্য আগমন করেন। তিনি তৎকালীন গভীর জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে দেবী কালীর দর্শন পান এবং এই অলৌকিক দর্শনলাভে 'সিদ্ধ' হয়ে এখানকার বেতবনের ভিতরে একটি গোলপাতার ছাউনির মধ্যে যে-কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নাম হয়—'সিদ্ধেশ্বরী'। তপস্বী কালীবর অতঃপর দেবীর পূজার ভার এক কাপালিক সাধকের ওপর ন্যস্ত করে পুনরায় দেবীর আদেশে সতীপীঠের সন্ধানে দক্ষিণদিকে কালীঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করেন। উক্ত কাপালিক যখন দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন, তখন এই অঞ্চলের দস্যুরা মাঝে মাঝে এখানে পূজা দিতে আসত এবং ডাকাতিতে সফল হওয়ার জন্য নরবলিও দিত। এইভাবে ডাকাতদের দ্বারা পূজিতা হওয়ায় অনেকে এই কালীকে 'ডাকাতকালী'ও বলত।

একদা বন্যার জলে দুটি বালককে ভেসে আসতে দেখে ডাকাতেরা তাদের বলিদানের জন্য কাপালিকের কাছে নিয়ে যায়, কিন্তু কাপালিক সেই বালকদুটিকে ('চক্রবর্তী' পদবিধারী ব্রাহ্মণ সন্তান) দেবীর কাছে বলি না দিয়ে নিজের আশ্রয়ে রেখে দেন এবং তাদের সংসারাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তাদের পূজাপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে তাদের ওপরেই তিনি দেবীর নিত্যপূজার ভার দেন। কাপালিকের অবর্তমানে এই ব্রাহ্মণ সন্তানদ্বয় দেবীপূজার অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের নিজস্ব বংশ লুপ্ত হওয়ায় পরবর্তী কালে তাঁদের দৌহিত্র বলাগড়ের মুখোপাধ্যায় বংশীয়রা দেবীর সেবায়েত নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে তাঁদেরই উত্তরাধিকারিগণ পালাক্রমে এই পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন।[১]

❀ ❀ ❀

এখানকার মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন বাগবাজারে আসতেন, মায়ের মন্দিরের দরজায় এসে মাকে প্রণাম করে ভাবে বিহ্বল হয়ে বলতেন, 'ওরে, এই মা সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তোদের যার যা কামনা, সবই তিনি পূর্ণ করতে পারেন।' বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'উপেন, যা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে মানত কর। তোর এক দরজা যেন শত দরজায় পরিণত হয়।' উপেন্দ্রনাথ মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর প্রত্যেক নাটক রচনার পরে সর্বপ্রথমে মা সিদ্ধেশ্বরীর চরণে নিবেদন করতেন।"[২]



বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী ◆ *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

কথিত আছে, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই দেবীর নামকরণ করেছিলেন 'চিৎপুরের গিন্নিমা'।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও এখানকার মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ করছেনঃ "একবার আমি বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী মাকে ষোলটা ডাব মানত করেছিলাম। আজ না কাল, এই ভেবে আর দেওয়া হয়ে ওঠে না। একদিন একটি পয়সা দেব মনে করেছি, আর একটি আধুলি বের হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, মা এভাবেই নেন।"[৩]

এখানে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়ঃ "লোকপরম্পরায় শোনা যায়, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ের মন্দিরে নিত্য আসতেন, কখনো কখনো সঙ্গে নিয়ে আসতেন গিরিশ ঘোষকে।... রামকৃষ্ণদেব ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ঋষিরাও মায়ের মন্দিরে অর্চনা করে গেছেন। এসেছেন রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী মাতা সারদাদেবীও।"[৪]

এখানকার একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়ঃ "একসময়ে বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির হইতে শ্রীমায়ের জন্য স্নানজল লইয়া আসা হইত। একদিন ঠাকুরের পূজার পর স্বামী বাসুদেবানন্দ বিভিন্ন পাত্রে সিদ্ধেশ্বরীর ও ঠাকুরের স্নানজল মাকে দিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'দুটো কিসের?' উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইলে মা বলিলেন, 'ও একই।' বাসুদেবানন্দ তথাপি পাত্র দুইটি আগাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, 'মিশিয়ে দাও।' বাসুদেবানন্দ বলিলেন, 'কাল থেকে দেব।' কিন্তু মা তাঁহার সামনেই মিশাইতে আদেশ করিলেন এবং ঐ মিশ্রিত স্নানজলই পান করিলেন।"[৫]

অপ্রকটের পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে রোগমুক্ত করার জন্য স্বামী সারদানন্দ দৈবপ্রতিকার আরম্ভ করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নানা শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করিয়েছিলেন। তার মধ্যে এই সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে শতরূপ চণ্ডীপাঠও একটি অঙ্গ ছিল। এসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "বিশ্বেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ যত স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। মার বাড়িতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলাত্মিকা—এই পাঁচটি মহাবিদ্যার অর্চনা আর পাঁচটি গ্রহপূজা হয়। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে শতরূপ চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। সর্বশেষ বারাসতের শ্মশানে একটি স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল।"[৬]

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও তাঁদের সন্তানদের বহু স্মৃতি ধারণ করে বাগবাজারের প্রখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির ভক্তদের কাছে চির আকর্ষণীয়।

❋ ❋ ❋

রাস্তা থেকেই দেবীমূর্তি দর্শন করা যায়। সামনে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা। মূল মন্দিরের মধ্যে শায়িত মহাদেবের ওপর দণ্ডায়মানা ত্রিনয়নী মৃন্ময়ী কালীমূর্তি। মন্দিরের মেঝে বারান্দা থেকে নিচে। মূর্তি পশ্চিমাস্যা এবং অতি সুন্দর প্রসন্নময়ী। বারান্দার নিচে সামনের ফুটপাথের ওপরেই বলিদানের মঞ্চ। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও ভূমিকম্পে আদি মন্দিরটি ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন কলকাতার চোরবাগানের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের শ্যামলাল মল্লিক ও বিনোদবিহারী মল্লিক। গর্ভমন্দিরের দরজার সামনেই পাথরে তাঁদের নাম খোদাই আছে। এছাড়াও মন্দিরের সংস্কারক হিসাবে আদি মন্দিরের নির্মাতা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের (ওরফে 'ব্ল্যাক জমিদার') বংশের অভয়চরণ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজনের নামও খোদিত আছে। মিত্র বংশীয়রাই প্রথমাবস্থায় দেবীর সেবার খরচও অনেকাংশে বহন করতেন বলে জানা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোলের দিন বিগ্রহের নতুন অঙ্গরাগ উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।❑

পথনির্দেশঃ ৫১২, রবীন্দ্র সরণি (পূর্বতন চিৎপুর রোড), কলকাতা-৭০০ ০০৫। উত্তর কলকাতার কুমারটুলির কাছে মদনমোহন মন্দিরের কিছুটা দক্ষিণে রাস্তার ওপর এই মন্দির। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের প্রায় উত্তর-পশ্চিমে মদনমোহনতলা স্ট্রিট ধরে রবীন্দ্র সরণিতে এসে ডানদিকে এগোলেই পড়বে এই মন্দির।

তথ্যসূত্র

১ মন্দিরের প্রাক্তন সেবায়েত, ৮১ নং রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩ নিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের (অধুনা প্রয়াত) কাছ থেকে প্রাপ্ত।
২ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৬২৮
৩ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৮৯
৪ কালীক্ষেত্র কলকাতা—বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১
৫ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৪৪
৬ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, পৃঃ ১৯৩, পাদটীকা

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ভ্রম-সংশোধন

● গত পৌষ ১৪১০ সংখ্যার ৯৭৫ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র'-এর ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'রাধু[র] কন্যা'র পরিবর্তে 'রাধু কল্য' হবে।

● গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার ৪৪৬ পৃষ্ঠার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে ১ম স্তম্ভের ২৮ পঙ্‌ক্তিতে আছে "তিনি এঁদের সুন্দর করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন।" হবে—"এঁদের সুন্দর করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন আর. ডি. রাণাডে।"

● গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যার ৩৭৭ পৃষ্ঠার 'প্রাপ্তি সংবাদ'-এ 'মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী' গ্রন্থটির লেখক ও প্রকাশকঃ মিহিরকুমার বিশ্বাস, শেলা আছে। হবে—মিহিরকুমার বিশ্বাস, কোলা।

বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্ব

মিনতি কর

বেদ ও উপনিষদের ধারাকে উপজীব্য করে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র বস্তুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হলো অদ্বৈততত্ত্বে। নানা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু অদ্বৈত, সাধনার দ্বারা প্রজ্ঞার উদ্ভাসনে প্রতিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হয়েছেঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি... তদিতর ইতরং শৃণোতি... যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ... তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ।"[১] অর্থাৎ দ্বৈত নেই, কিন্তু যখন দ্বৈতের ন্যায় বোধ হয়, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে শ্রবণ করে; কিন্তু যে-অবস্থায় সাধকের সমস্তই আত্মস্বরূপ হয়ে যায়, তখন আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর স্ফুরণ না হওয়ায় কিসের দ্বারা কাকে আঘ্রাণ করবে, কিসের দ্বারা কাকে দর্শন করবে, কিসের দ্বারা কী শ্রবণ করবে? তখন ভেদসাপেক্ষ সমস্ত বস্তুই বিলুপ্ত হয়ে যায়। জাগতিক সমস্ত বোধই দ্বৈতের ন্যায় বোধ, পরমার্থদৃষ্টিতে দ্বৈত নেই। সুতরাং 'অদ্বৈত' শব্দের অর্থ হলো দ্বৈতাভাব। দার্শনিক ভাষায় এটি হলো ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী। অর্থাৎ এই দ্বৈতসত্তা অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত হলো দ্বৈতপ্রতীতি মিথ্যা। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে 'মিথ্যা' শব্দটি পারিভাষিক। 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ হলো—যার প্রতীতি হয়, কিন্তু যা বস্তুত থাকে না। এই উক্তিটি অর্থহীন নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্পের প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান হয়, তখন ভ্রমদৃষ্ট সর্প থাকে না। এজন্য সর্পটি যথার্থরূপে প্রতীত হয়েও ভ্রম দূরীভূত হলে সর্পের প্রতীতি হয় না। এজন্য একে বলা হয় 'মিথ্যা'। সুতরাং মিথ্যা বস্তু প্রতীতিগম্য হলেও পারমার্থিক সত্তাশূন্য। বেদান্ত-মতে এজন্য সত্তা এক হলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্তার ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে। ব্রহ্মকে বলা হয় পারমার্থিক সৎ, নামরূপাত্মক জগৎ ব্যাবহারিক সৎ ও রজ্জুসর্প প্রাতিভাসিক সৎ। উক্ত তিনটিকে 'সৎ' বলে অভিহিত করার উদ্দেশ্য এই কথাই প্রতিপাদন করা যে, সমস্ত বস্তুর প্রতিষ্ঠা সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা, যাকে বলা হয় 'অধিষ্ঠানচৈতন্য'। বেদান্ত-মতে ব্যাবহারিক সৎ এই জগৎ বাধিত হয় একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা, এজন্য দেহাত্মপ্রত্যয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত অনুবর্তন করে।

বেদান্তের দৃষ্টিতে সকল মানুষেরই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর প্রয়াস কর্তব্য। শ্রুতি বলছেনঃ "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"[২] এই মানবজন্মে যদি চরমতত্ত্বটি অবগত হওয়া যায় তবেই পরমলাভ, অন্যথা মহান অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। এই অনর্থের পুনরাবৃত্তিলক্ষণ জন্ম, মৃত্যু ও সংসার। একমাত্র মনুষ্যজন্মেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আত্মাকে 'অন্তরতম', 'প্রিয়তম' বলে অভিহিত করে উপনিষদ্ মানব-মনকে আত্মাভিমুখী করেছে। আত্মবিজ্ঞানের দ্বারাই অপর বস্তুর জ্ঞান হয়, আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট অন্য বস্তু নেই। এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আত্মাকে সত্যের সত্য প্রাণেরও প্রাণ বলে নিরূপণ করা হয়। যেমন অগ্নি থেকে বিস্ফুলিঙ্গ ব্যুত্থিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্ম বা আত্মা থেকে সকল প্রাণ, সকল দেবতা, সকল প্রাণী—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হয়। একেই আত্মার সগুণভাব বলা হয়েছে। কারণরূপে নির্ণীত সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর; কার্য-কারণ-ভাবরহিত আত্মা বা ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্কল। উপনিষদে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"[৩] কেবল তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, এছাড়া আর কোন পথ নেই। নিজেকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত রূপে উপলব্ধি করতে হয়। এই জ্ঞানলাভের সাক্ষাৎ উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান অর্থাৎ সমাধি ও শ্রদ্ধা ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বা সাধন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অপর একটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, যা হলো ঈশ্বরভক্তি ও গুরুভক্তি।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"[৪]

—যার পরমেশ্বরে পরা ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতিও অনুরূপ ভক্তি আছে, তার কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অদ্বৈতবেদান্ত-মতে ভক্তিকে আত্মোপলব্ধির সাক্ষাৎ কারণ বলা হয়নি, কিন্তু তা পরম্পরারূপে কারণ। ঈশ্বরপ্রণিধান ও ভক্তি নিদিধ্যাসনের অন্তর্ভুক্ত।

অদ্বৈতবেদান্তে বৈরাগ্যের কথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাত্মসাধনার মুখ্য সোপান হলো বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যকে সমাশ্রয় করে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রত্যেকটি মতের মধ্যে মূলগত পার্থক্য থাকলেও সকলেই বৈরাগ্যের অনুশীলনে শ্রদ্ধাবান। বৈরাগ্য মোক্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বৈরাগ্য ও বিবেক মনের বৃত্তিসমূহের দূরীকরণের কারণ। বৈরাগ্যের উদয় ব্যতীত জ্ঞানোদয় সম্ভব নয়। জ্ঞানোদয় না হলে বাসনাক্ষয় হয় না। সুতরাং বৈরাগ্যই ইষ্টসাধনের উত্তম উপায়। বৈরাগ্যসাধনার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়।

ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের ফল হলো সর্বাত্মভাব ও জীবন্মুক্তি। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হন। উপনিষদে বলা হয়েছেঃ

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"[৫]

—সেই পরাবরস্বরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হলে হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন ও সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সকল কামনা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ইহজীবনেই মরণশীল মানুষ অমৃতত্বলাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থাই জীবন্মুক্তি অবস্থা।

অদ্বৈতবাদ ভারতের সনাতন ভাবধারার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারতের মধ্য দিয়ে এই ভাবধারাটি প্রকটিত হয়েছে। পরে তা গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য ও তদনুগামীদের দর্শনশাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এপর্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদের বিষয়বস্তু আলোচনা করলাম। এরই পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও সাহিত্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনা করা যায়। একই সূর্যালোক যেমন বৈদূর্যমণিতে প্রতিফলিত হলে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, একই ঈশ্বরের কৃপা যেমন ব্যক্তিভেদে বিভিন্নভাবে প্রকটিত হয়, তেমনি মহামানব বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েও অদ্বৈততত্ত্ব বিশিষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ-সমন্বিত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিবেকানন্দের প্রতিটি অক্ষরে উদ্ঘাটিত হয়েছে সত্য—যা অবিতথ, যা কল্যাণের অনুগামী।

প্রাচীন ঋষিদের মতো তিনি চেয়েছিলেন মঙ্গলের পথটিকে উদ্ঘাটিত করে অজ্ঞানের আবরণের অপসারণ। যে-আবরণ সত্যকে সত্যস্বরূপে প্রকাশ করে না, যে-আবরণ আত্মস্বরূপকে অনাত্মরূপে প্রকটিত করে, যে-আবরণ অহংবোধকে জাগ্রত করে—তা মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যা থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথ অনুগমনের জন্য চাই একটি উন্মেষ, চাই একটি আলম্বন। উপনিষদের মধ্যে, গীতার মধ্যে এই সত্যসন্ধানী দৃষ্টির পথ প্রদর্শিত হয়েছে। বিবেকানন্দ এই সত্যদৃষ্টিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন সনাতন ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞালব্ধ দৃষ্টিকে।

বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতি সমগ্র মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। এর মধ্য দিয়ে তিনি সনাতন অদ্বৈতবাদের ভাবধারাটিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা মনে করি, ইহাই হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প—ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ দৃষ্ট হয়; যে-রহস্য অভেদ্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও অদ্বৈতবাদ ভেদ করিয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবাদী বেদান্ত।"[৬] "অদ্বৈতদর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হয়, তাহার সারমর্ম এই যে, অদ্বৈতবেদান্ত ইন্দ্রিয়ভোগে উৎসাহ দেয় না। আমরা আনন্দের সহিত উহা স্বীকার করি।"[৭]

অদ্বৈতবেদান্তের মূল কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত হবে, যা স্বামীজীর সঙ্গীতে ও কাব্যকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যথা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ, অবিদ্যা, জগৎ ও সংসার, কর্মফল। স্বামীজীর অসাধারণ কাব্যকৃতি 'সন্ন্যাসীর গীতি'তে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবন্মুক্তি, ভক্তি, চরম সমাধি ও মানবপ্রেম আলোচিত হয়েছে।

ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ

উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয়েছে ঃ "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"[৮]—তোমরা বিদিত হও, অন্ধকারের পরপারে আমিই সেই অদ্বিতীয় আত্মা। তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। শঙ্করাচার্য 'নির্বাণদশক'-এ বলেছেন ঃ

"ন ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ু-
র্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।...
ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকা
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।...
ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্মতং বা।..."[৯]

—আমি পৃথিবী নই, জল নই, তেজ নই, বায়ু নই, আকাশ নই, ইন্দ্রিয় নই, এই সকলের সমষ্টি নই। আমি পিতা, মাতা, দেবতা বা লোকসমূহ নই। আমি সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন বা মীমাংসক নই। আমি অনুভূতি-স্বরূপ এক সচ্চিদানন্দ আত্মা। স্বামীজী অনুরূপভাবে বলেছেন ঃ

"দেব নহি, আমি নহি পশু কিংবা নর,
দেহ নহি, মন নহি নারী বা পুরুষ,
শাস্ত্র স্তব্ধ সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি,
আমার প্রকৃতি ঘোষে—'আমি সেই' বাণী।"[১০]

অদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো—দ্বৈতপ্রতীতি মিথ্যা। এই দ্বৈতবোধ হলো 'তুমি' ও 'আমি'-রূপে প্রতীতি। এই প্রতীতি-রূপ সংস্কার জীবচৈতন্যে বর্তমান থেকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে অনুবর্তিত হয়। 'শিবস্তোত্র'-এ বিবেকানন্দ বর্ণনা করলেন ঃ

"বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্।"[১১]

—পূর্ব সংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে; তা বলবান ব্যক্তিদেরও ঘূর্ণিত উর্মিমালার মতো বিদলিত করে। এর থেকেই উত্থিত হচ্ছে 'তুমি' ও 'আমি'র দ্বৈতপ্রবাহ। এরূপ বিকারযুক্ত চিত্ত শিবে [পরমাত্মায়] সংস্থাপিত হলে বন্দনার যোগ্য হয়। জন্যজনকভাবজনিত বৃত্তি অসংখ্য হলেও 'এক' বস্তুই চিরন্তন সত্য। ঐ স্তোত্রেই বিবেকানন্দ বলছেন ঃ "অগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।" শঙ্করাচার্যও তত্ত্বোপদেশে বলেছেন ঃ "অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎ সদা।" অদ্বৈতই একমাত্র সত্য, দ্বৈতবাদ অসত্য বা মিথ্যা। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন ঃ

"দুই নয়, বহু নয়, এক—শুধু এক
তাই তো আমার মাঝে আছে সব 'আমি'

অনিবার তাই প্রেম—ঘৃণা অসম্ভব;
'আমি' হতে আমারে কি সরানো সম্ভব?
স্বপ্ন হতে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ
হও অভী, বল বীর ঃ নিজ দেহ-ছায়া
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যুঞ্জয়
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।"[১২]

এই কবিতাটিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ উদ্ঘোষিত হয়েছে। আমাদের সমস্ত প্রতীতির মূলে আছে 'অহম্' বোধ আর সমস্ত ব্যবহারের মূলে যে-প্রতীতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়, তা হলো 'আমি' ও 'আমার'। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে লিখেছেন ঃ "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।" অর্থাৎ ধর্মী আত্মা সত্য, ধর্ম অনৃত। ধর্মী ও ধর্মের একীভাববশত 'আমি' ও 'আমার' এরূপ লোকব্যবহার প্রচলিত হয়। বিবেকানন্দ কবিতাটিতে বলতে চেয়েছেন, এই দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা। একের অধিক দুই বা বহু মিথ্যাপ্রতীতি। ব্যাবহারিক যে 'আমি' বা 'আমার' বলে প্রতীতি, তা অধ্যস্ত প্রতীতি। কারণ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অধ্যাস করেই এই ব্যবহার হয়। প্রতিটি প্রাণীর যে 'আমি' বা 'আমার' বলে ব্যবহার, তা কোন না কোন উপাধিযুক্ত। কিন্তু শ্রুতি যে-আত্মাকে প্রতিপাদন করেন, তা সকল উপাধি বিনির্মুক্ত। 'আমি' ব্রহ্মস্বরূপ—একথা বুদ্ধিস্থ হলে আর আত্মপর ভেদ থাকে না, তখন আর পরবিদ্বেষ থাকে না, অন্যকে ঘৃণা করাও অসম্ভব। আমি ব্রহ্মস্বরূপ, চিৎস্বরূপ—এরূপ উপলব্ধিই যথার্থ অনুভব। স্বপ্নজ্ঞান যেমন মিথ্যা অর্থাৎ জাগ্রতকালে স্বপ্নজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ ব্যাবহারিক দশার 'আমি' জ্ঞানও মিথ্যা। এই মিথ্যাজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপনিষদ্ মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে ঃ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[১৩] অর্থাৎ ওঠ, জাগ এবং জান। স্বামীজী বলেছেন ঃ "স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠ, বন্ধনকে দূর করে অভীঃ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হও। কারণ দেহ বিনশ্বর। কারণ জ্যোতির্ময় সৎস্বরূপ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলে আর কোন ভয় থাকে না। একেই বলা হয়েছে, 'অভয়ম্ অজরম্ অমৃত্যুপদম্'।"

"নাহি ছিল মহাকাল, 'সেও' নাহি ছিল,
ছিলাম, রয়েছি আমি, রব চিরকাল।"[১৪]

সমুদ্রের অনন্ত লহরির মতো এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা ব্রহ্ম কালের অতীত চিরস্থির। জগতের স্বরূপ আর আত্মার স্বরূপ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলছেন ঃ

"জেনো কিন্তু—এসকলই ফেনপুঞ্জবৎ
স্থান কাল পাত্র আর কার্য ও কারণ,
আমি কিন্তু উর্ধ্বচারী ইন্দ্রিয় ও মনের
নিত্য দ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই সৃষ্টি মাঝে।"[১৫]

আত্মা দ্রষ্টা ও সাক্ষী—এটিই বেদান্তবাদীর মূল কথা। সূর্যকিরণ যেমন শুচি ও অশুচি বস্তুতে পতিত হলেও তার কোন দোষ হয় না, সর্বভূতে অনুস্যূত আত্মাকেও কোন কালিমা স্পর্শ করে না। একই বৃক্ষে দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে অবস্থান করে। জীব কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা সাক্ষিরূপেই অবস্থান করেন। এটিই সাক্ষীর স্বরূপ।

নির্গুণ ব্রহ্ম কার্যকারণভাবরহিত; কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম, যাঁকে ঈশ্বর বলা হয়, তিনিই কার্যকারণভাবের সঙ্গে অন্বিত। তিনি উৎপত্তিরহিত হয়েও সিসৃক্ষাবশত এই নামরূপের দ্বারা ব্যাকৃত জগৎ সৃষ্টি করেন। "একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়", "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"—এই শ্রুতিতে ঈশ্বরের সিসৃক্ষা ও বহুভবন বর্ণিত আছে। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

(১) "একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।
আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা।..."

(২) "সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ।"[১৬]

এই সৃষ্টির কতই বৈচিত্র্য! কত জীব কত প্রাণী! এখানে সুখ-দুঃখ আছে। জরা, জন্ম ও মরণ এই সৃষ্টির সঙ্গে অন্বিত। কিন্তু 'যেই সূর্য তারি কিরণ, সেই সূর্য সেই কিরণ'—এই পঙ্‌ক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বলা হয়—সূর্যের কিরণ, তেমনি ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি, ঈশ্বর কারণ ও সৃষ্টি কার্য। অন্যভাবে বলা যায়, সূর্যকিরণ সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, তেমনি এই সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নয়। তিনিই সব। আবার সৃষ্টির লয় হয় নির্গুণ চরমতত্ত্বে। স্বামীজী বলছেন ঃ

"আমি বর্তমান
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়।"[১৭]

এই কবিতার মধ্যে অদ্বৈতবাদের কথাই প্রকাশিত হয়েছে। লৌকিক জগতের ব্যবহারে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই তিনের ভেদজ্ঞান থাকে। সাধনার ফলে যখন এই ত্রিপুটির লয় হয়, তখন নির্গুণ আত্মচৈতন্য বর্তমান থাকে। [ক্রমশ]

তথ্যসূচী ঃ (১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।১৫; (২) কেন উপনিষদ্, ২।৫; (৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।১৫; (৪) ঐ, ৬।২৩; (৫) মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮; (৬) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ২৩২; (৭) ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ২৩৪ (৮) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩।৮; (৯) নির্বাণদশক, ১-৪; (১০) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৪৪-১৪৫; (১১) শিবস্তোত্র, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২০০; (১২) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫; (১৩) কঠ উপনিষদ্, ১।৩।১৪; (১৪) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫; (১৫) ঐ, পৃঃ ১৪৫; (১৬) ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭৭, ২০৭-২০৮; (১৭) ঐ, পৃঃ ২১৫।

শাহজাদা দারাশুকো ও সাধক বাবালাল

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

প্রায় তিনশো বছরের মোগল জমানায় শাহজাদা দারাশুকো এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। বিলাসব্যসন, সুরাপান, নাচগান, প্রমোদ-বিহার, শিকার-উৎসব ও ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে সদা ব্যস্ত শাহজাদারা যখন শাসন ও শোষণের রুটিন-মাফিক জীবনের ঘেরাটোপে স্বেচ্ছাবন্দি, দারাশুকো তখন রাজপ্রাসাদের কুটিল রাজনীতির বাইরে অন্বেষণ করেছেন এক অপার্থিব জগৎ। তাঁকে কেন্দ্র করে শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে জটিল ষড়যন্ত্র ও তাঁর অন্যান্য ভাইদের ক্ষমতালিপ্সা থেকে বহু দূরে তিনি বিচরণ করেছেন জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃত সীমানায়। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। জ্ঞানার্জনে ছিল তাঁর অপার উৎসাহ। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় মোল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর কাছে। অন্য কোন গুরুর উল্লেখ নেই তাঁর জীবনীতে। তাঁর মধ্যে ছিল নাচিকেত অগ্নি। তরুণ গরুড়-সম মহৎ ক্ষুধার আবেশে পীড়িত হতেন তিনি। সাচ্চা মুসলমান হিসাবে কোরাণ ও হাদিসে যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, তেমনি তিনি পরিচিত হয়েছিলেন এরিস্টটল ও প্লেটোর রচনার সঙ্গেও। ধর্মতত্ত্ব ছিল তাঁর অধ্যয়নের প্রিয় বিষয়, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি পরিহার করে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করতেন সব ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের। সব ধর্মের মূল সত্য যে এক—এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি প্রথম জীবনে মূলত অনুপ্রাণিত ছিলেন সুফিতত্ত্বে। উপনিষদের ফারসি অনুবাদের সময় তিনি অনুধাবন করেন বেদান্তের সঙ্গে কোরাণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য। ধর্ম সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু এই ধার্মিক মানুষটির সহনশীলতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে মনে জাগে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাসনা। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এক কিংবদন্তি। ঐতিহাসিক ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে, আব্বাসী খলিফা মামুন ও শাহজাদা দারার সমকক্ষ পণ্ডিত ও দার্শনিক আর কেউ ছিলেন না মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে, যদিও তাঁদের মধ্যে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহীর অভাব ছিল না।[১]

মোগল সম্রাটদের মধ্যে অল্পবিস্তর পরধর্মের প্রতি আঘাত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটা যে সবসময় ধর্মীয় কারণে হতো তা নয়, রাজনৈতিক কারণেও তাঁরা আঘাত করতেন অন্যের ধর্মীয় ভাবাবেগে। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে এর শুরু। যখন তিনি নেশাগ্রস্ত থাকতেন, তখনি তাঁর মাথায় ভূত চাপত! মন্দির ভাঙার আদেশ দিতেন। আবার সুস্থ অবস্থায় তিনি ভিন্ন মানুষ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শাহজাহানের ছিল খানিকটা অবজ্ঞার ভাব। তিনি তাঁদের দেখতেন সম্রাটসুলভ অহমিকা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে কখনো কখনো মন্দিরনির্মাণে তিনি যেমন হিন্দু ও জৈনদের আর্থিক সাহায্য করেছেন, তেমনি আবার মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসেও ছিল তাঁর সমান উৎসাহ। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি তো ইতিহাসের এক বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ তো তাঁকে জিন্দাপীর বানাতে চেয়েছেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শাহেনশা আকবর। তিনি কেবল পরাক্রান্ত সম্রাটই ছিলেন না, বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব জানার ব্যাপারে তাঁর ছিল আজন্ম কৌতূহল। দারা তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর ছিল শাহজাহানের স্নেহের আধিক্য। পিতার প্রতি পুত্রেরও শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি অতিক্রম করেছেন তাঁর পিতাকে। সেটা হলো তাঁর ধর্মচিন্তা। স্বীয় ধর্মের প্রতি আনুগত্যে তিনি যেমন পিতার সমধর্মী, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাতেও তিনি অনন্য। এককথায় মোগল জমানায় দারা ছিলেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। শাহজাদা দারা জন্মসূত্রে পুণ্যাত্মা। আজমীরের আন্না সরোবরের তীরে তাঁর জন্ম। সুফি সাধক মৈনুদ্দিন চিস্তির সাধনপীঠ হিসাবে আজমীরের খ্যাতি সারা বিশ্বে। দারা যে আজন্ম ধর্মবিশ্বাসী ও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন, সেটা এই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য কিনা কে বলতে পারে!

শাহজাহানের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে চলেছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দারা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু রণনীতিতে অপটু। সমালোচকের ভাষায় ঃ "Dara was more a man of the Court than of the Camp."[২] আওরঙ্গজেব কেবল ধূর্ত রাজনীতিবিদই নন, ছিলেন রণকৌশলী যোদ্ধাও। সিংহাসন দখলের পূর্বে দারার জন্য যে চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন তিনি, তাতে প্রবেশ করে অকালে প্রাণ দিতে হয় দারাকে। সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলা যায়, দারা যদি হন 'ব্রুটাস', তবে আওরঙ্গজেব 'অ্যান্টনি'। ঐতিহাসিক ডঃ কানুনগোর ভাষায় ঃ "দারা মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বস্মৃতি এবং আওরঙ্গজেব উহার ভাবী নিয়তির অঙ্গুলিসঙ্কেত।"[৩] ধর্মমতে আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান সুন্নী, শরিয়তপন্থী স্থবির আদর্শের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। সমালোচকের ভাষায় বলতে হয় ঃ "শরিয়তপন্থী ওলেমারা যদি ডগম্যাটিক, আকবর যদি র‍্যাশনালিস্ট, দারা হলেন মিস্টিক। দারা মধ্যযুগের বুদ্ধবাদী বা ইনটেলেকচুয়্যাল।"[৪] দারার বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব অভিযোগ এনেছিলেন 'কাফের' বলে। আর এই অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল তাঁর হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে। যাঁরা এইভাবে তাঁর ধর্মভাবনাকে অসম্মান করেছেন, তাঁরা জানতেন না যে, দারা কেবল ধার্মিকই ছিলেন না, নিজ ধর্মে

আস্থাশীলও ছিলেন। মানুচী যে বলেছেন, দারা নাকি মৃত্যুর মুহূর্তে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেটি আসলে মানুচীর উর্বর মস্তিকের কল্পনা, যা বাস্তবতাবর্জিত।[৫] বহুবিধ ধর্মচিন্তায় কোরাণের সাদৃশ্য অন্বেষণ করেছেন দারা। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মমতের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন ঃ "He appears to be independent in his judgement and bold in his conclusions."[৬] হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদের সময়ই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে ধর্মদ্বেষিতার মিথ্যা অভিযোগ। অথচ সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে, ঐসব ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের কোথাও আজন্ম স্বধর্মনিষ্ঠ দারার ইসলাম-ত্যাগের লেশমাত্র প্রমাণ নেই—"In all these works there is not the slightest indication that Dara had renounced Islam and embraced Hinduism."[৭] দারার আঙটিতে হিন্দিতে লেখা 'প্রভু' শব্দ তাঁর জীবনে বিপদ ডেকে এনেছিল।[৮] ধর্মান্ধ বিরোধীরা বোঝেননি ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষোভের সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীকে বলেছিলেন, কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ও পেছনের টিকি না কেটে দিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব।[৯] দারা অবশ্য কাঁচি নিয়ে নয়, খরশান লেখনীকে হাতিয়ার করে একাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সেই গভীর চিন্তার ফলশ্রুতি 'মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন'।

'মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন' দারার গভীর অধ্যাত্মচিন্তার মননশীল ফসল। এতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে মুক্ত চিন্তারাজি। কিন্তু আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে, যেমন সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে বিকালবেলা সলতে পাকানো। সাধক বাবালালের সঙ্গে ধর্মালোচনার আগে পর্যন্ত তিনি কেবল সলতে পাকিয়েছেন। তারপর তাঁর চিন্তার প্রদীপটি জ্বেলেছেন 'মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন'-এ বাবালালের অধ্যাত্মচিন্তার আলোকে। ভারতের খ্যাতিমান সাধকদের মাঝে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না বাবালালকে, কিন্তু দারার চিন্তার বিকাশে তাঁর অবদান অপরিসীম। বাবালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ কান্দাহার অভিযানে দারার চরম ব্যর্থতার অব্যবহিত পরে—ভগ্নমনোরথ দারা যখন লাহোরে ফিরে আসেন মুলতানের পথে। পুত্রের ব্যর্থতার অগৌরব ঢেকে দিতে পিতা শাহজাহানের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ, তখন তাঁকে মানসিক কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরই প্রিয়ভাজন হিন্দি কবি মুনশি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। তিনি দারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সেযুগের অন্যতম খ্যাতিমান সাধক বাবালালের। এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। তখন দারার বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর। বাবালালের প্রকৃত নাম 'লালদাস'। তিনি পাঞ্জাবের বাবালালী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম পুরুষ। কথিত আছে, 'চেতনস্বামী' নামে এক যোগীর অলৌকিক কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বাবালাল। তাঁর স্থায়ী মঠ ছিল পাঞ্জাবের সবহিন্দ জেলার অন্তর্গত ধ্যানপুরে। তিনি জটাধারী নন, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী। সেকারণে লোকে তাঁকে ডাকত 'নেড়ে বাবালাল' নামে। 'সাথিয়াৎ' নামক গ্রন্থে দারা তাঁকে কেন যে কবীরপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন, তা বোঝা যায় না। বাবালাল ছিলেন মূর্তিপূজার সমর্থক, আর কবীর তো মূর্তিপূজার সম্পূর্ণ বিরোধী। স্মরণীয় তাঁর উক্তি ঃ "পাথর পূজেঁ হরি মিলে, তো মৈঁ পূজুঁ পহাড়।" বাবালাল শেষজীবনে মিস্টিক সাধকে পরিণত হলেও প্রথম জীবনে ছিলেন হঠযোগী। সুতরাং তাঁকে কবীরপন্থী বললে সত্যের অপলাপ হবে।

বাবালালের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। পণ্ডিত শিউনারায়ণের মতে, তিনি কসুরের ক্ষত্রী—যাঁর বাসস্থান বতালার সন্নিকটে ধ্যানপুরে। অনেক গবেষণার পর হেনরি উইলসন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বাবালালী সম্প্রদায়ের আদি পুরুষের জন্ম রাজপুতানার মালবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৭)।[১০] বাবালালীরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও রামভক্ত। তবে এই রাম অযোধ্যার অধিপতি নন, স্বয়ং ঈশ্বর। এঁদের কপালে থাকে গোপীচন্দন। ভক্তিমার্গের পথিক হয়েও এঁরা অবতারবাদের বিশ্বাসী নন। এঁদের ধর্মমত মূলত একেশ্বরবাদ। সৃষ্টি সম্পর্কে এঁদের ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সাংখ্যযোগের। এঁরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। রাজানুজ সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলে গণ্য হলেও এঁদের নিজস্ব কোন তাত্ত্বিক মতবাদ নেই। বরং এঁদের ধর্মমত অনেকখানি কবীরপন্থী, মুলুদাসী, সেনপন্থী এবং খাকিদের কাছে। ভক্তি আন্দোলনে এঁদের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রিয়ারসনের মতে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অন্যতম সংস্কারক বাবালাল কবীর, দাদূ ও আকবরের মতো একেশ্বরবাদী। তাঁর ধর্মমত গড়ে উঠেছে সুফিতত্ত্ব ও ভক্তিমার্গের সাধকদের মতের সমন্বয়ে। বাবালাল রামভক্ত তো ছিলেনই, উপরন্তু তাঁর প্রেম ঈশ্বরে নিবেদিত সুফিদের মতো। তিনি স্বয়ং বলেছেন ঃ "একজন খাঁটি শিষ্যের অনুভূতি কখনো ব্যাখ্যা করা যায় না, যাবেও না; যেমন বলা হয়ে থাকে, একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রেমিকের প্রেমানুভূতি কেমন? উত্তরে বলেছিলাম, 'প্রেমিক হলেই তুমি তা জানতে পারবে'।"

বাবালালের সঙ্গে দারার ধর্মালোচনা চলেছিল নয়দিন ধরে। সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এক মুনশি। নাম যদুদাস বা যাদবদাস ক্ষত্রী। আলোচনা চলে উর্দুতে। পরে এই উর্দু রূপকে ফারসিতে অনুবাদ করেন কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। গ্রন্থের নাম 'নাদির-উল-নুকাৎ'। পরে এটি আবার উর্দুতে রূপান্তরিত হয়। সে-গ্রন্থের নাম 'রিসালা-ই-উসুলাহ ওয়া আজুবাহ্-ই-দারাশুকো ওয়া বাবালাল'। নয়দিনে কথিত হয় মোট সাতটি সংলাপ, যা 'Seven Dialogues' নামে পরিচিত। বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, প্রথম সংলাপটি কথিত হয়েছিল লাহোরে জাফরখানের বাগিচায়। দ্বিতীয়টি

হয়েছিল বাদশাহী বাগের সবাই আনোয়ার মহলে। তৃতীয় ও ষষ্ঠটি হয়েছিল ধনবাঈয়ের বাগিচায়। চতুর্থ সংলাপের স্থান শাহগঞ্জে আসফখানের প্রাসাদে। পঞ্চমটি নিকলানপুরের সন্নিকটে গাবানের শিকারভূমিতে। সপ্তম সংলাপটি হয়েছিল কোন অজানা স্থানে। এটির স্থায়িত্ব তিনদিন। সামান্য পরিবর্তন আছে শিউনারায়ণের রচনায়। তাঁর মতে, দ্বিতীয় সংলাপটি হয়েছিল সবাই নউ মহলে। পঞ্চমটি কাহ্নুয়ানের কাছে কালনৌরে। শিউনারায়ণের মতকে মেনে নিয়েছেন বিক্রমজিৎ হসরৎ।[১১]

দারা ও বাবালালের বাক্যালাপে অনেক মূল্যবান কথা আছে। সেই দীর্ঘ আলোচনার কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবেশন করা যাক। এটি সংলাপের হুবহু অনুবাদ নয়, তবে কোথাও বিকৃত করা হয়নি বাবালালের সংলাপকে।[১২] এখানে দারা প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা বাবালাল।

প্রঃ নাদ ও বেদের পার্থক্য কি?

উঃ বাদশাহ ও বাদশাহীর মধ্যে যে-প্রভেদ।

প্রঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদ কি? কিভাবেই বা জীবাত্মা বিলীন হয়ে যায় পরমাত্মার সঙ্গে?

উঃ জল থেকে মদের উদ্ভব। কিন্তু মদকে মাটির ওপর ঢেলে দিলে জলীয় অংশটা মাটির গভীরে গিয়ে বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। আর ওপরে পড়ে থাকে মদের নোংরা অংশটা। তদ্রূপ জীবাত্মা যতক্ষণ মানবদেহে অধিষ্ঠান করে, ততক্ষণ তারও ঐ একই অবস্থা। ইন্দ্রিয়সমূহের ময়লা পরিত্যাগ করতে পারলে জীবাত্মা পুনরায় মিশে যাবে পরমাত্মায়।

প্রঃ আত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ কি?

উঃ মূলত কোন প্রভেদ নেই।

প্রঃ তাহলে শাস্তি ও পুরস্কার কেন দেখা যায়?

উঃ এসব দেহের ধর্ম। দাগ দেহতেই থাকে। যেমন গঙ্গা ও গঙ্গার জল।

এই পার্থক্য বোঝাতে বাবালাল বলেছেন, কুঁজোতে রাখা গঙ্গার জলে একবিন্দু শরাব ফেলে দিলে পুরো জলটাই অপবিত্র হয়ে যায়। অথচ গঙ্গানদীতে সহস্র কলসি মদ ঢেলেও নষ্ট করা যায় না গঙ্গার পবিত্রতা।

প্রঃ অনেকে বলেন, গাছ ও বীজের মধ্যে যে-প্রভেদ, স্রষ্টা ও জীবের প্রভেদও তদ্রূপ। একথা কি ঠিক?

উঃ স্রষ্টা সমুদ্রের মতো বিশাল আর জীব হলো জলপূর্ণ ঘট। দুইয়ের আধেয় বস্তু এক হলেও আকারে প্রভেদ আছে।

প্রঃ হিন্দুদের মূর্তিপূজা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উঃ হৃদয়কে মজবুত করার জন্য এই প্রথার প্রচলন। উদ্দেশ্য মনঃসংযোগ। আত্মা সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি হয়েছে, তাঁর আর প্রয়োজন নেই মূর্তিপূজার। কিন্তু যতক্ষণ না সেই উপলব্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ মূর্তির বাইরের রূপে আকৃষ্ট হতে হবে। বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলে, কিন্তু বিয়ের পর আর তাদের পুতুলের প্রয়োজন পড়ে না।

প্রঃ কাশী কি? হিন্দুদের বিশ্বাস, কাশীতে মরলে নাকি স্বর্গবাস হয়?

উঃ 'কাশী' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রজ্ঞা (ওয়াজুদ) বা জীবনের পূর্ণাবস্থা। জীবনের পূর্ণাবস্থায় মৃত্যু হলে মোক্ষলাভ হয়।

প্রঃ প্রতিটি মানুষ কি মোক্ষলাভে সক্ষম?

উঃ সাধারণ মানুষ মরে 'বাসনা' নিয়ে। একমাত্র মহাপুরুষরাই পারেন জীবনের পূর্ণতা নিয়ে মরতে। বাসনা (খায়েশ) ও প্রকৃত প্রজ্ঞার (ওয়াজুদ) অধিষ্ঠান দুই মেরুতে।

প্রঃ গোপিনীরাই কেবল কৃষ্ণের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যের পক্ষে কি তা সম্ভব?

উঃ সংস্কারাসক্ত মানুষের কাছে অশরীরী রূপ অধরা। একমাত্র কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠেছেন যেসব সাধুসন্ত, কেবল তাঁরাই পারেন সে-রূপকে উপলব্ধি করতে।

প্রঃ লঙ্কাকাণ্ডের পর রামচন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে কেবল রামচন্দ্রের সৈন্যদলের পুনর্জীবন লাভ হয়েছিল। অথচ রাবণ-সৈন্যের পুনর্জন্ম হলো না কেন?

উঃ মৃত্যুকালে রাবণ-সৈন্যের মনে ছিল রাম-চিন্তা। তাই তারা উদ্ধার হয়ে গেল।

প্রঃ ওঙ্কার উচ্চারণে কি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়?

উঃ ওঙ্কারই পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র শব্দ। শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যিনি খাঁটি ও মেকির প্রভেদ নিরূপণ করে এই শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করেন, তাঁর স্বর্গবাস অনিবার্য।

প্রঃ কোন্ অবস্থায় পৌঁছালে একজন ফকির জাগতিক মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন?

উঃ সমাজবদ্ধ জীব খাদ্যগ্রহণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনে অভ্যস্ত। এসব অতিক্রম করে সবকিছুর প্রতি অনাসক্ত হতে পারলে মায়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

প্রঃ পুরুষকার (কদর) আছে যে-ব্যক্তির, তিনি অসাধারণ ও তিনিই সবচেয়ে সুখী। এর ব্যাখ্যা কি?

উঃ পুরুষকার স্বয়ং ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরের সৃষ্টিও বটে।

প্রঃ তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অবস্থান জানতে পারব কি করে?

উঃ সন্তান মাতৃগর্ভে থাকার সময় কদর থাকে মায়ের গর্ভে। জন্মাবার পর কদর অর্ধেক চলে যায় সন্তানের কাছে, বাকি অর্ধেক থেকে যায় মায়ের স্তনে দুগ্ধরূপে। সন্তান কাঁদলে মাতৃদুগ্ধে শান্ত হয়। সন্তান পরিণত বয়সে ভালমন্দের সংস্পর্শে এসে স্বয়ং কদর হয়ে যায়।

প্রঃ কবর ও দাহ যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকারের প্রচলিত রীতি। একজন দরবেশ যদি হিন্দুর পোশাকে দেহত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে কোন্ রীতি মানা হবে?

উঃ দাহ বা কবর একটা ধর্মীয় প্রথা মাত্র। দরবেশ তাঁর দেহ সম্পর্কে থাকেন সদা উদাসীন। সেক্ষেত্রে তাঁর জড়দেহের

কি গতি হবে, সেব্যাপারে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। সাপ গর্তে ঢোকার সময় যেমন খেয়াল রাখে না তার খোলসটা কোথায় পড়ে থাকে।

প্রঃ ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করলে সাধক নাকি তাঁকে আস্বাদন করতে পারেন। সেটা কি ধরনের?

উঃ একখণ্ড লোহাকে আগুনে তপ্ত করলে লোহা আগুনের রঙ লাভ করে।

বাবালাল দারাকে বলেছিলেন, সাধক চার শ্রেণির। (১) এক শ্রেণির সাধক সোনার মতো, অন্যকে যিনি সোনা বানাতে পারেন না। (২) এক শ্রেণির সাধক অ্যালকেমির মতো—যিনি অন্যকে সোনায় পরিণত করলেও যাকে সোনায় রূপান্তরিত করা হয়, তার মধ্যে অ্যালকেমির কোন গুণ থাকে না। (৩) আরেক শ্রেণির সাধক চন্দনবৃক্ষের মতো—যিনি পাশাপাশি অন্যান্য বৃক্ষকেও সুগন্ধি বৃক্ষে পরিণত করতে পারেন। (৪) যথার্থ সাধক প্রদীপের মতো—যিনি পারেন সহস্র প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে। সাধক বাবালালের এই শ্রেণিবিভাগ জানার পর দারা মূল ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্কে ঃ

"The gnostic illuminates your body and soul,
Removes thorns from the place and transforms it into a rose garden.
The Perfect takes out all from imperfections,
A Candle kindles a thousand Candles."[১৩]

বাবালাল উপদেশ দিয়েছিলেন দারাকে ঃ "শেখ হয়ো না, সন্ত হয়ো না, অলৌকিক ক্রিয়াবিদ হয়ো না। বরং একজন ভণ্ডামিমুক্ত খাঁটি ফকির হও।" দারার জীবনে এই উপদেশের ফল হয় গভীর ও ব্যাপক।

বাবালালের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটে দারার ধর্মজীবনে। কিভাবে সে-পরিবর্তন ঘটেছিল তা জানতে হলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে প্রাক্-বাবালাল পর্বে দারার পঠন-পাঠনের প্রতি। এই পর্বে দারার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন। প্রথম গ্রন্থ 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া' তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের রচনা। পরবর্তী কালে যিনি সুফিধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বলে গণ্য হবেন, সেই দারা এই গ্রন্থে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন সুফিদের সম্পর্কে, যদিও তিনি তখনো সুফিসমাজে প্রবেশ করেননি আনুষ্ঠানিকভাবে। গ্রন্থটিতে আছে মোট ৪১১ জন সুফিসাধক ও ধর্মগুরুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর এই অনুসন্ধান চলেছে হজরত মহম্মদ, চার খলিফা, দ্বাদশ ইমাম থেকে তাঁর সমসাময়িক মিয়াঁ মীর পর্যন্ত। গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। এখানে তিনি যেমন হজরত মহম্মদের জন্মতারিখের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে নির্ভীক আলোচনা করেছেন, তেমনি সুফিসাধকদের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে হাজির করেছেন সাধিকাদেরও। সর্বোপরি এতে আছে সাধকদের অমূল্য বাণীর এক নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন। তাঁর মানস গঠনে এই বাণীগুলির যথেষ্ট ভূমিকা আছে। প্রথম গ্রন্থ রচনার অব্যবহিত পরে মিয়াঁ মীরের অন্যতম শিষ্য মহম্মদ শাহ লিসান-উল্লার কাছে সুফি-মতে দীক্ষা নিয়ে শাহজাদা দারা কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। 'লিসান-উল্লা' শব্দের অর্থ খোদাতালার জিহ্বা। তাঁর গুরুর সাধারণ্যে পরিচিতি ছিল 'মৌলানা বদখ্শী' নামে। এঁর সাধনস্থল ছিল কাশ্মীরে। দারার দীক্ষাও সেখানেই। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাকনাৎ-উল-আউলিয়া'তে আছে কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশদের কীর্তি-কাহিনী। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, দীক্ষাগ্রহণের পর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে তাঁর জীবনের। তাঁকে আর বিলাসব্যসনপ্রিয় শাহজাদা মনে না হয়ে মনে হয় নিষ্ঠাবান দরবেশ। তৃতীয় গ্রন্থ 'রিসালা-ই-হক্নুমা'র রচনাকাল ১০৫৭ হিজরী। এতে আছে কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা। কাদেরিয়ারা মুক্তিপথের সাধক নন। এই সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের কঠোর পরীক্ষা দিতে হয় না ভক্তদের। প্রেমপ্রীতি ও অনাবিল আনন্দ এঁদের নিত্য সম্পদ।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায়, শাহজাদা তখনো হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হননি। উপনিষদ্, গীতা অনুবাদ তখনো দূর অস্ত। সমালোচক ঠিকই বলেছেন ঃ "His earlier studies were purely sufistic in character."[১৪] হিন্দুধর্মে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ফারসি অনুবাদ পাঠের পর। বাবালালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও সমকালীন ঘটনা। শুধু হিন্দুধর্ম কেন, অন্যান্য ধর্মগুলির প্রতিও যে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তার পিছনে ছিল বাবালালের অনুপ্রেরণা। বাবালালের একটি বাণী তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, যা তিনি উদ্ধার করেছেন তাঁর 'সাথিয়াৎ'-এ। বাণীটি হলো ঃ "সত্য কোন একটি বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া নয়।" এর পর শুরু হয় তাঁর সত্যসন্ধান। ফলে—"Deeper and wider was his study the greater was the realisation of the truths found in other religious and more outspoken the appreciation for them."[১৫] বেদান্তের সঙ্গে সুফিমতের সামঞ্জস্য দেখতে পান তিনি। আর তাঁর সেই উদার ধর্মমতের প্রকাশ ঘটে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজনা-উল-বাহ্রায়েন'-এ। গ্রন্থের শিরোনামটির অর্থ—দুই নদী বা সমুদ্রের মিলন। নীল নদের দুটি শাখা-বাহর-উল-আবয়াদ ও বাহর-উল আসওয়াদ। এদের পরিচিতি শ্বেত ও নীল নদী নামে। এদের সঙ্গমস্থলের নাম মাজমা-উল-বাহ্রায়েন। দারা তাঁর গ্রন্থে শুনিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কাহিনী। তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল শিরাজের বাবা কিঘানের বাণী ঃ "There is one lamp in this house, by whose rays, whereever I look there is an assembly."[১৬] ঘরের মধ্যে একটাই প্রদীপ, যার আলোয় আমরা দেখি সব ধর্মের সম্মিলন। তাঁর এই উদার মতবাদই হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। আবার এই উদার মতবাদই তাঁকে করে তুলেছিল নির্ভীক ও বিনয়ী। ভাগ্যের

ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও তিনি তাই চিত্তকে স্থির রেখে দাঁড়িয়েছিলেন উন্নত মস্তকে ও সপ্রতিভ মহিমায়। আর তাই তিনি বিজিত হয়েও জয়ী। বাবালালের প্রভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।[১৭] সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন মথুরার মন্দিরে পাথরের রেলিং উপহার। বাবালালের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন মূর্তির মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব। পীর শাহ্ দিলরুবাকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেনঃ "বাজের-ই-বাত-ইমানিস্ত পিন্‌হান।" তাঁর প্রপিতামহ শাহেনশাহ্ আকবর কাশ্মীরে একটি মন্দির তৈরি করে তার গায়ে প্রতিটি ধর্মের গোঁড়া ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিলঃ "অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি আসবেন এই মন্দির ধ্বংস করতে, তিনি সর্বাগ্রে ধ্বংস করুন তাঁর নিজের উপাসনাগৃহ। হৃদয়ের অনুশাসন মেনে চলি বলে আমরা সবার অন্তরের সঙ্গে একত্রে চলব। আর যদি শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে চলি, তাহলে যাকিছু ভাল তাকেই ধ্বংস করব।" আকবর পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। তাঁর পক্ষে যে-কাজ সহজ ছিল, দারার পক্ষে তা ছিল না।[১৮] দারাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে তিনি যে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তার পিছনে ছিল তাঁর মনের অনমনীয় গড়ন ও ঐশ্বরিক শক্তির অলোকসামান্য প্রভাব।❑

পাদটীকা

১ শাহ্‌জাদা দারাশুকো—ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৫
২ Majma-Ul-Bahrain—M. Mahfuz-Ul-Haq, 1998, p. 3
৩ শাহ্‌জাদা দারাশুকো, পৃঃ ১০৫
৪ রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি—কামালউদ্দিন হোসেন, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪৩
৫ Storia do Mogor, Vol. I, 1996, pp. 356-358
৬ Majma-Ul-Bahrain, p. 5
৭ Ibid., p. 28
৮ হিন্দিতে 'প্রভু' লেখার জন্য যাঁরা নিন্দা করেছেন দারাকে, তাঁরা কি জানতেন না যে, তৎকালীন সুফি কবিদের ভাবপ্রকাশের ভাষা ছিল হিন্দি? তারও আগে গজনীর পরাক্রান্ত সম্রাট সুলতান মামুদ তাঁর মুদ্রায় কলিমা খোদিত করেছিলেন নাগরী হরফে। সুতরাং দারার বিরুদ্ধে অভিযোগ—"Appear too flimsy and frivolous to be given any credence." (Rizi-Muslim Revivalist Movements in Northern India, 1995, p. 363)
৯ রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন', পৃঃ ১৬
১০ Religious Sects of the Hindus—Wilson, 1972, pp. 191-196
১১ B. J. Hasrat-Dara Shikuh : His Life and Works, 1982, p. 242
১২ বাবালালের সংলাপ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে ইংরেজিতে বিক্রমজিৎ হসরতের গ্রন্থে এবং বাঙলায় ডাঃ কানুনগো ও অমিয়কুমার মজুমদারের 'দারাশুকোহ্ঃ জীবন ও সাধনা' (১৯৮৫) গ্রন্থে।
১৩ উদ্ধৃতঃ B. J. Hasrat, p. 243
১৪ Majma-Ul-Bahrain, p. 26
১৫ Ibid., p. 26
১৬ তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী, উদ্ধৃত হয়েছে Rizvi-র গ্রন্থে, পৃ. ৩৫৭
১৭ মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন-এ মুসলমান সাধকদের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু সাধকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আর কেউ নন, বাবালাল বৈরাগী। এই ছোট্ট ঘটনাই প্রমাণ করে, দারার ওপর বাবালালের প্রভাব কত গভীর ছিল।
১৮ আকবর হাদিসে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু কোরাণ ও হাদিসে দারার ছিল দ্বিধাহীন বিশ্বাস। হজরত মহম্মদকে আকবর শেষ নবী বলে মানতে চাননি, যেহেতু তিনি নিজে থেকে উম্মত সৃষ্টি করেছিলেন। আর মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলে স্বীকার করেছেন দারা। একজায়গায় মিল ছিল দুজনের। সেটা হলো 'সুলহ্ ই কুল' বা সর্বধর্মে সহিষ্ণুতার আকবরীয় নীতি মেনে চলতেন দারা।

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের কার্যধারা চতুর্ধাবিভক্ত, যথা আর্তত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সনাতন ধর্মপ্রচার বা আধ্যাত্মিকতার বিস্তার। এবারের বিষয় 'শিক্ষা'। স্বামীজী শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলেছেনঃ *"শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে-পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তারই প্রকাশ। মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনো জ্ঞানী ও শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায়সকল তাহার অন্তরে কোনপ্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যেসকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি-প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্বজ্ঞ এবং জগৎসৃষ্টি-কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তোলে। অতএব ঐ আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য।"*—একথাগুলি এবারের প্রচ্ছদে মুদ্রিত। এই ভাব ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে অনুভূতিতে পরিণত হলেই শিক্ষার সার্থকতা। আবার সেই শিক্ষার সুষম অভিপ্রকাশ ঘটলেই সমাজ ও সভ্যতার অনুপুঙ্খ বিকাশসাধন সম্ভব। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম অনুপ্রবেশ ১৯০৫ সালে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর তত্ত্বাবধানে। কুমোরের কুশল হস্তে যেভাবে সুন্দর মৃৎপাত্র গড়ে ওঠে, শিক্ষার্থীর জীবনও তেমনি গড়ে ওঠে দক্ষ শিক্ষকের অভিভাবকত্বে। ১৯২১ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'স্টুডেন্টস হোম'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তার ছবি ইনসেটে দেখা যাচ্ছে।

স্মৃতিকথা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার পর]

স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী প্রেমেশানন্দজীর আগমন

কল্যাণ মহারাজ কখনো নিজের বিষয়ে কিছু বলতেন না, তাই তাঁর সম্বন্ধে কোন খবর যোগাড় করা কঠিন ছিল। এমনকি বহুদিন পর্যন্ত আমরা তাঁর সন্ন্যাস-পূর্ব নামও জানতাম না। অনেকদিন পর আমি জানতে পারি, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। তিনি বরিশাল জেলার মানুষ ছিলেন। বরিশালের লোকেরা তাঁদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য সুপরিচিত। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বেশ কয়েকজন বড় বড় জাতীয় নেতা ঐ জেলার মানুষ ছিলেন। কল্যাণ মহারাজও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন।


স্বামী কল্যাণানন্দ

আগেই বলেছি, তিনি রাত্রে অনেকবার উঠে হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন। অন্য কাউকে দিয়ে তিনি একাজ করাতেন না। অন্য অনেক কাজের মতো একাজটিও তিনি স্বয়ং করতেন। এইজন্যই যখন তাঁর দেহত্যাগ হলো, আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম—কে এখন এসমস্ত সামলাবে? একমাত্র তিনিই সেবাশ্রমের সবকিছু জানতেন এবং সামলাতে পারতেন। আর তিনি কখনো অন্যত্র যেতেন না—সবসময়েই তাঁকে পাওয়া যেত।

অখণ্ডানন্দজীর মহাসমাধিতে কল্যাণ মহারাজের প্রতিক্রিয়া

আমি যতদূর শুনেছি, অখণ্ডানন্দজী মহারাজ কোনদিন কনখল সেবাশ্রমে আসেননি। অবশ্য চিঠিতে তাঁর সঙ্গে কল্যাণ মহারাজের যোগাযোগ ছিল। কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে আমি কল্যাণ মহারাজকে পাঠানো অখণ্ডানন্দজীর মহাসমাধি সংক্রান্ত একটি টেলিগ্রাম খুঁজে পাই। টেলিগ্রামটির উলটোপিঠে কল্যাণ মহারাজের মন্তব্য লেখা ছিলঃ "মিশনের আলোকবর্তিকা চলে গেলেন।..."

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কর্মদক্ষতা

কল্যাণ মহারাজ খুব অল্পকথায় কর্মীদের নির্দেশ দিতেন। সবসময়েই তিনি কর্মব্যস্ত থাকতেন—হাসপাতালেই হোক, বাগানেই হোক, আর গোশালাতেই হোক—কিছু না কিছু করতেনই। কিন্তু কথা খুবই কম বলতেন। কি করে তিনি গলার স্বর বিন্দুমাত্র না চড়িয়ে সমস্ত কিছু পরিচালনা করতেন—তা জানতে আমার খুব কৌতূহল হতো। তিনি এত শান্ত ও আত্মসংবৃত ছিলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে অন্য সকলেও নিঃশব্দে নিজেদের কাজ করে যেত।

লোকে কল্যাণ মহারাজকে কৃপণ স্বভাবের মনে করত। তার কারণ, তিনি রোগীদের বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় বাজার থেকে না কিনে নিজের হাতে সেলাই করে তৈরি করে নিতেন। চাদর তৈরি করার জন্য তিনি দুটি লম্বা কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি রেখে সেগুলি সেলাই করে এমনভাবে জুড়ে দিতেন, যাতে একটি আরেকটির ওপর না পড়ে। কায়দাটি বেশ চমৎকার ছিল। আমিও একবার ঐভাবে চাদর তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু জোড়টি সুষম না হওয়ায় চাদরটি কুঁচকে গেল। কেন এমন হলো জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেনঃ "নারায়ণ, সেলাই করার সময় কাপড়দুটি বেশি টান-টান রাখলে হবে না, শুধু একসঙ্গে ধরে রেখে আস্তে আস্তে সেলাই করতে হবে। যদি একটা কাপড় বেশি টান আর অন্যটি আলগা হয়, তাহলে ঐরকম হয়।" এইরকম সূক্ষ্ম ও নিপুণ ছিল তাঁর কাজের ধারা। কাজ করার শৈলীও তিনি জানতেন। আর আসল কথা, এই ধরনের কাজে যে ধৈর্য লাগে তা তাঁর ছিল।

কল্যাণ মহারাজ তাঁর অনুসৃত নীতিগুলি খুব কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। কোনকিছু একবার ধরলে তাঁকে সহজে তার থেকে বিচ্যুত করা যেত না। একদিন তাঁর সঙ্গে তর্ক করার মাঝখানে আমি কৌতুক করে প্রশ্ন করিঃ "মহারাজ, একটা কথা বলুন। আপনি কি বরিশালের লোক?" তিনি বললেনঃ "কে বলল তোকে যে, আমি বরিশালের লোক?" আমি বললামঃ "আমার মনে হচ্ছে।" তিনি আর কিছু বললেন না। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, তিনি সত্যই বরিশালের লোক ছিলেন। তিনি কিন্তু আমার প্রশ্নের কথাটা ভোলেননি। ব্যাপার হলো, তাঁর সঙ্গে আমার এমনই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, মুখোমুখি তর্ক করতেও আমার বাধত না। তিনি তাতে কিছু মনে করতেন না, বরং ব্যাপারটা পছন্দই করতেন।

'তুইতোকারি'র উপাখ্যান

আমি কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথাবার্তা বলতাম। তিনি আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন, আমিও তাঁকে 'তুই' বলতাম। যেহেতু তিনি ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলত না, তাই আমি শব্দটির মানে কী তা জানতাম না। বেশ কিছুদিন এইরকম চলেছিল। এইসময় একবার স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী বেলুড় মঠ থেকে এখানে আসেন। একদিন তিনি আমায় বললেনঃ "ওহে নারায়ণ, তোমার মহারাজকে 'তুই' বলে সম্বোধন করা উচিত নয়। 'তুই' কেবল ছোটদের ও অধস্তনদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।" আমি বললামঃ "সেকি! আমি তো তা জানতাম না।

উনি আমায় 'তুই' বলেন, আর ইংরেজিতে তো একটিই শব্দ 'you' আছে।" তিনি বললেন ঃ "আরে না, না! বাঙলায় তিনটে শব্দ আছে—'আপনি', 'তুমি', 'তুই'। তুমি সেদিনের ছোকরা, তোমাকে উনি 'তুই' বলতেই পারেন, কিন্তু তুমি ওঁকে 'তুই' বলতে পার না। তুমি ওঁকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবে।" আমি বললাম ঃ "তাই নাকি? কিন্তু উনি তো আমাকে কখনো একথা বলেননি।" জ্ঞানাত্মানন্দজী আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ "উনি নিজের থেকে বলবেন না, কিন্তু তোমার ঐরকম করা উচিত। তাছাড়া ওঁর ঘরে ওরকম করে ঢুকে পড়ো না। ওঁর ঘরে কারোর ঢোকা উনি পছন্দ করেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে।" এইভাবে তো আমার শিক্ষা হলো। সেদিন বিকালে মহারাজের কাছে গিয়ে আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মহারাজ, আপনি কেমন আছেন?" তিনি বললেন ঃ "এসব আবার তোকে কে শেখাল?" আমি বললাম ঃ "আপনি এতদিন ধরে আমায় বোকা বানিয়ে এসেছেন—'তুই'-এর মানে কী তা বলেননি। আপনাকে আমার কখনো 'তুই' বলা উচিত হয়নি। এঁরা সবাই বলছেন—'তুই' কথাটা অবজ্ঞাসূচক, আমার 'আপনি' বলা উচিত ছিল। এতদিনে আমি আপনাদের ভাষার রহস্য ভেদ করতে পেরেছি। এঁরা আরো বলছেন, অনুমতি না নিয়ে আপনার ঘরে ঢুকে পড়া আমার উচিত নয়।" কল্যাণ মহারাজ বললেন ঃ "ওসব ভুলে যা। তুই সোজাসুজি আমার ঘরে ঢুকবি। মনে রাখিস, অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তোকে 'আমার' কাছেই পাঠিয়েছেন। আমি যা বলব, তুই তাই শুনবি, অন্যের কথায় কান দিবি না। নিজের মতো থাক। ভিতরে আয়, যেমন ছিলি তেমনই থাক। এরা জ্ঞান দিয়ে তোর মগজধোলাই করছে।" আমি বললাম ঃ "কিন্তু আপনি বলুন, আমাকে আর ওরকম বোকা বানাবেন না। আপনাকে আমার 'তুই' বলে ডাকা একেবারেই উচিত হয়নি।" তিনি বললেন ঃ "তুই আগে ভিতরে আয় তো দেখি।" আমি ভিতরে ঢুকে এতদিন ধরে 'তুই' বলার জন্য মহারাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। তিনি হেসে বললেন ঃ "তাতে কী এসে যায়? কথার কী গুরুত্ব আছে? ভিতরের ভাবটাই আসল।" আমি তাঁকে বললাম ঃ "না মহারাজ, কথাও ভিতরের ভাবের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত।" পরে কল্যাণ মহারাজ জ্ঞানাত্মানন্দজীকে বলেছিলেন ঃ "তোমরা সকলে ছেলেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছ দেখছি। ও আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলত তা আমি উপভোগ করতাম। ও 'তুই' বলে আমাকে ডাকলে আমার খুব মজা লাগত।"

আমার প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা

ওপরের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, কল্যাণ মহারাজ আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। কেন তা আমি জানি না। অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রথামাফিক—তাদের সঙ্গে তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না, শুধু কী কী করতে হবে তাই বলে দিতেন, তার বেশি কিছু নয়। একদিন একজন মহারাজ তাঁকে বলেন ঃ "এই ছেলেটি ছাড়া আর কেউ আপনার কাছে আসতে বা আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।" কল্যাণ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "জান কি? ছত্রিশ বছর ধরে আমি এখানে রয়েছি। তার মধ্যে কোনদিন সঙ্ঘের কোন প্রেসিডেন্ট আমার কাছে আর কাউকে পাঠিয়ে বলেননি, 'একে যত্ন করে রেখো'। তাই এই ছেলেটির ব্যাপার একটু আলাদা। স্বয়ং স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ একে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।" কল্যাণ মহারাজ সবিশেষ নজর রাখতেন যাতে কেউ আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে। হাসপাতালের কাজের ব্যাপারে আমার তেমন কোন যোগ্যতা ছিল না, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম—এই পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। বস্তুত, যে আড়াই বছর আমি তাঁর সঙ্গ পেয়েছিলাম, তাতে হাসপাতালের কাজের ব্যাপারে আমি অনেক, অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম।

তাছাড়া কল্যাণ মহারাজের আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তা এতই অধিক ছিল যে, একবার তিনি বলেছিলেন ঃ "নিশ্চয়ানন্দের পর এই ছেলেটিকে বাদ দিলে আমি এমন কাউকে পাইনি যার ওপর এখানকার কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারি।" অন্যেরা যে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করত না তা কিন্তু নয়। আমরা নবীন ব্রহ্মচারীরা সকলে মিলে খুব সুসম্বদ্ধ একটি দল গড়ে তুলেছিলাম, তা নিশ্চয় করে বলতে পারি। আর কল্যাণ মহারাজও প্রত্যেকের প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন—সকলেই তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের বলতেন ঃ "এরপর তোরাই সব চালা দেখি। নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে সব ঠিক কর।" আমরা নিজেরা কোনকিছু করার পরিকল্পনা করে তাঁকে জানালে তিনি শুধু বলতেন ঃ "বেশ, তাই কর।" আর সবকিছুই বেশ ভালভাবে চলত।

যেহেতু অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তাঁকে আমার যত্ন নিতে বলেছিলেন, তাই প্রথমদিকে কল্যাণ মহারাজ আমাকে কোন কাজ করতে দিতেন না। তিনি যতটা সম্ভব আমাকে আরামে রাখার চেষ্টা করতেন এবং আমি কী খেতে পাচ্ছি, কী করছি তার ওপরও নজর রাখতেন। অন্য সকলে তাই বলাবলি করতেন ঃ "মহারাজ এই ছেলেটাকে বিগড়ে ছাড়বেন। এ কিছুই করে না, খালি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে আর সবসময় তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করে।" তাঁরা মোটেই বাড়িয়ে বলতেন না। কল্যাণ মহারাজ যেখানেই যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন—তিনি দোকানে গেলেও আমাকে সঙ্গে থাকতে হতো, আবার কাছাকাছি কোন মঠে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গেলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হতো। যেখানেই তিনি যান না কেন, আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

স্বভাবতই প্রথমদিকে সকলে আমাকে ঈর্ষা করতেন, বলাবলি করতেন ঃ "এই ছেলেটা কে হে? আর মহারাজ একে কোথা থেকেই বা যোগাড় করলেন? এ হিন্দি জানে না, বাঙলা বলতে পারে না, যার জন্য মহারাজকে এর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। এ কে?" অবশ্য আমিও অবস্থাটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা আমার উচিত হবে না। তাই ক্রমশ আমি অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার ও তাঁদের যতটা পারি সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যখন কল্যাণ মহারাজ বিশ্রাম করতে যেতেন, আমি হাসপাতালে গিয়ে ঘর মোছা ও বাসনপত্র মাজার কাজ করতাম। আস্তে আস্তে আমি আর সকলের মন পেতে সক্ষম হলাম। তা না হলে কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীও আমার উদ্দেশ্য কী সেসম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের এইরকম মনোভাব কয়েক সপ্তাহের মতো ছিল।

কথা দিয়ে কথা রাখা

একবার আমি বেলুড় মঠ ও সারগাছি দর্শন করতে যাই। কল্যাণ মহারাজ আমাকে কোন এক বিশেষ তারিখের মধ্যে ফিরে আসতে বলেন, কারণ ঐ তারিখেই তিনি কোথায় যাবেন ভেবেছিলেন। আমি যখন তাঁর আদেশ অনুযায়ী ঠিক সময়মতো ফিরে এলাম, তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ "খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলি তো!" আমি বললাম ঃ "আপনি আমাকে আজকে ফিরতে বলেছিলেন, আমি সেইমতো এলাম।" এর ফলে তাঁর পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী যাত্রা করা সম্ভব হলো। কেউ কথা দিয়ে কথা রাখলে বা কোন কাজ তিনি যেমন চাইতেন, সেইমতো করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। এই কারণেই আমার ওপর তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যায়। কখনো কারো বিশ্বাসভঙ্গ করতে নেই। কেউ বিশ্বাস করলে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। কল্যাণ মহারাজ প্রায়ই বলতেন, কথা দিলে সেই কথা রাখা অত্যন্ত জরুরি—বিশেষ করে সাধুদের পক্ষে।

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর আগমন

এইরকম সময়ে একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ কনখলে এলেন। তাঁর আগমনে সমগ্র সেবাশ্রমের পরিমণ্ডলে যেন একটা অভ্যুত্থান ঘটল! শুদ্ধানন্দজীও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন, আর কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। তাঁর আসায় সেবাশ্রমের পুরো আবহাওয়াটাই বদলে গেল—যে-মুহূর্তে তিনি আশ্রমে পা রাখলেন, সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেল। যেদিন তিনি এসে পৌঁছালেন, সেবাশ্রমে বেশ হুলস্থুল পড়ে গেল। প্রত্যেকেই খুব উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। মহারাজ তখন সবে সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে ছুটিতে রয়েছেন। কল্যাণ মহারাজের ঘরের ঠিক পাশে আমার ঘরের সামনাসামনি তাঁর জন্য একটা ঘর ঠিকঠাক করে রাখা হলো। আমরা সকলে তাঁকে দেখব বলে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ডাঃ ব্যানার্জি তাঁর গাড়ি নিয়ে এলেন এবং কল্যাণ মহারাজ তাঁর সঙ্গে শুদ্ধানন্দজীকে আনতে গেলেন। শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে এলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শিষ্য স্বামী অম্বিকানন্দজী, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী অসীমানন্দজী ও একজন ব্রহ্মচারী সেবক।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী ছিলেন একজন প্রকৃত দিব্যপুরুষ। আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। সংস্কৃত, বাঙলা এবং ইংরেজিতে ছিল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। তাই তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। আমরা জানতাম যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনেক রচনা বাঙলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। কনখলে থাকাকালীন তিনি প্রবীণ সাধুদের জন্য 'ব্রহ্মসূত্র'-এর ক্লাস নিতেন। কাছাকাছি অন্য কয়েকটি মঠের সাধুরাও সেই ক্লাসে যোগ দিতেন।

শুদ্ধানন্দজী আসায় আমাদের সেবাশ্রম প্রাণময় হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হতাম, আর শুদ্ধানন্দজী কথাপ্রসঙ্গে আমাদের অনেককিছু বলতেন। তিনি যেই জানতে পারলেন আমি বাঙলা বুঝি না, অমনি কথাবার্তা ইংরেজিতে চালাতে আরম্ভ করলেন—যদিও আমাদের ওখানে এমন কয়েকজন বাঙালি ব্রহ্মচারী ছিল, যারা ইংরেজি ভাল জানত না। আমি উপস্থিত থাকলেই আমি যাতে বুঝতে পারি সেইমতো যেন তিনি সচেতনভাবে ইংরেজিতে কথা বলতেন। তিনি যতদিন ছিলেন, সেবাশ্রমে সত্যসত্যই এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর কথাবার্তা মনকে অনেক উঁচুতে তুলে দিত। আমরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করতাম। সেসময়ে আমি 'মিশন' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশোনা করেছিলাম এবং স্বামীজীর রচনাবলীও কিছু কিছু পড়েছিলাম, কিন্তু তাঁদের জীবনবৃত্তান্তের খুঁটিনাটি তেমন জানতাম না। শুদ্ধানন্দজী কথাপ্রসঙ্গে এইরকম অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের বলতেন এবং সাগ্রহে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতেন। সত্যসত্যই তিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎসস্বরূপ ছিলেন। তিনি আমাদের পাঠ সম্বন্ধেও পথনির্দেশ করতেন। বিশেষ করে তিনি আমাদের নিয়মিতভাবে 'গীতা' পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমার বাঙলা শেখা

সেবাশ্রমে এসে আমি বাঙলাভাষার দিকে প্রথমে খুব একটা মনোযোগ দিইনি। বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য কম নয়—শিক্ষার্থীকে তা বিভ্রান্ত করতেই পারে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, বাঙলাভাষার দিকে মন দিলে

আমার সংস্কৃত-জ্ঞানের ক্ষতি হবে। কিন্তু একদিন হলো কি, স্বামী জগদানন্দজী আমাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' থেকে একটি প্রবন্ধ পড়ে তাঁকে শোনাতে বললেন। সেসময় তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না বলে জগদানন্দজী আমাদের ওখানেই ছিলেন। ঐ প্রবন্ধে একটি বাক্য ছিল—"As many opinions, so many ways." সেটি শুনে জগদানন্দজী মন্তব্য করলেন—এটি সঠিক অনুবাদ নয়। তিনি আমাকে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থটি আনতে বললেন। সেটি নিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিক বাক্যটি পড়লেন—"যত মত তত পথ।" ("As many faiths, so many paths.") তখন আমার বোধোদয় হলো, কীভাবে অনুবাদ খারাপ হলে পুরো অর্থটাই বিকৃত হয়ে যায়। তখনি আমি বাঙলা শিখব বলে মনস্থ করলাম। 'কথামৃত' হলো আমার পাঠ্যগ্রন্থ, আর অসীমানন্দজী হলেন আমার শিক্ষক। পরে স্বামী শুদ্ধানন্দজী বেলুড় মঠে ফিরে গিয়ে আমাকে 'বর্ণপরিচয়' ও আরো কয়েকটি পাঠ্যগ্রন্থ পাঠিয়ে দেন। আমি সেগুলি সবই পড়লাম। তবে অন্য সবকিছুর চেয়ে 'কথামৃত' পাঠই আমাকে বেশি সাহায্য করেছিল। তার কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার মাধুর্য ও স্বচ্ছতা। যা আমি বুঝতে পারতাম না, তা কাউকে না কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলতাম। যে নয়বছর আমি কনখলে ছিলাম, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের 'কথামৃত' পাঠ হতো। আমরা পাঁচটি খণ্ড একটার পর একটা পড়ে শেষ করে আবার গোড়া থেকে শুরু করতাম। এতে আমার বাঙলা শেখার খুব সুবিধা হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি উৎসব

স্বামী শুদ্ধানন্দজী যখন আমাদের এখানে ছিলেন, তখন একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি কত তারিখে পড়েছে তা আমি জানি কিনা। আমি 'না' বলায় তিনি আমাকে পঞ্জিকা আনতে বললেন ও তাতে আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী কত তারিখে পড়েছে তা দেখলেন। জুলাই বা আগস্টের কোন একদিন ঐ তিথিটি পড়ে। তিনি বললেন ঃ "তোমরা অতি অবশ্য তাঁর জন্মতিথি পালন করবে। সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যে এতটা স্থায়িত্ব পেয়েছে এবং অবাধ গতিতে কাজ করে চলেছে, তা প্রধানত তাঁরই জন্যে। বরানগর মঠের দিনগুলিতে অন্য সব সাধুরা তীর্থযাত্রায় এদিক-ওদিক চলে যেতেন, একমাত্র তিনিই অবিচল হয়ে থেকে মঠকে সুসম্বদ্ধ করে ধরে রেখেছিলেন। সেখানে যারা ছিল তাদের দেখাশোনা তিনিই করতেন।" তাঁর কথা শুনে আমরা রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করলাম। দিনটি খুব আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটল। শুদ্ধানন্দজী তাঁর গুরুপ্রতিম রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে বললেন। রামকৃষ্ণানন্দজীকে তিনি বরানগর মঠের সময় থেকেই জানতেন। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাওয়ার কয়বছর আগেই তিনি বরানগর মঠে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর কাছে তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীই ছিলেন সবকিছু।

ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণের জন্মতিথি পালন

সেইসময়ে শুদ্ধানন্দজী আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করার জন্য বলেন। আমরা তাঁদের জন্মতারিখ নির্ণয় করতে এবং তাঁদের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। তবে এব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারিনি। যাই হোক, অনেক কষ্টে পুরনো সব পত্রিকা থেকে তথ্য যোগাড় করে আমরা তার অনুলিপি তৈরি করলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে কলকাতা বা মাদ্রাজের পত্রিকার অতিরিক্ত কপি পেলে আমরা তার পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক অংশ কেটে রাখলাম। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজি জীবনী থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। এইসমস্ত উপাদান আমরা আমাদের নিয়মিত ক্লাসে এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে কাজে লাগাতাম। এইসবের ভিত্তিতে আমরা ঠাকুরের পার্ষদগণের জন্মতিথির একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করি। কোন প্রবীণ সন্ন্যাসী কনখলে এলে, তাঁদের বিষয়ে বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতাম। উদাহরণস্বরূপ স্বামী জগদানন্দজী, স্বামী প্রেমেশানন্দজী প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ সাধু এই সময়ে কনখলে এসে আমাদের এখানে ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।[২]

শুদ্ধানন্দজী ও কল্যাণ মহারাজ

একদিন শুদ্ধানন্দজী কল্যাণ মহারাজকে বললেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেবাশ্রমের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে, জমা টাকা কোথায় কতটা খাটানো হচ্ছে এবং ঐজাতীয় সব তথ্য যোগাড় করতে বলেছেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, বেলুড়ের মূলকেন্দ্র কখনো কল্যাণ মহারাজের কাছ থেকে বিস্তারিত কোন প্রতিবেদন পেত না। আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। শুদ্ধানন্দজী বললেন ঃ "ভাই

২ একবার অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজী কনখলে এলে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের সম্বন্ধে কোন বই বের করার কথা ভাবছেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন ঃ "সময় হলে ঠিক বেরবে।" পরে ঐ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা কিছু নিবন্ধ 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ বেরতে আরম্ভ করে। সেইগুলিকে একত্র করে 'The Disciples of Sri Ramakrishna' নামে একটি গ্রন্থ ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। সেসময়ে আমি অল্পদিনের জন্য বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একদিন দেখলাম, পবিত্রানন্দজী সদ্যপ্রকাশিত বইটির কয়েকটি কপি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকে এক কপি বই উপহার পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

কল্যাণ! ওঁরা চাইছেন যে, আমি তোমাদের আর্থিক অবস্থা কিরকম তা একটু দেখি। তোমরা কোথায় কত টাকা লগ্নি করেছ?" কল্যাণ মহারাজ বললেন ঃ "মহারাজ, এইসব ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে কেন? তোমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছ, আর অবসর কাটাচ্ছ।... প্রথমে নিজের স্বাস্থ্যটাকে উদ্ধার কর। ভালরকম বিশ্রাম নাও। কদিন পরে আমরা মুসৌরী যাব, গিয়ে মনের আনন্দে কাটাব। এইসব ব্যাপারে চিন্তা করা বন্ধ কর।" শুদ্ধানন্দজী বললেন ঃ "কল্যাণ, তুমি ঠিক বলেছ।... ও নিয়ে আর ভাবব না।" এরপর শুদ্ধানন্দজী পুরো ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলেন। এইরকম ছিল তাঁদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা।

স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল অপূর্ব। শুদ্ধানন্দজী, বিরজানন্দজী ও জ্ঞান মহারাজ (ইনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই থেকে গিয়েছিলেন)—এঁদের একসঙ্গে দেখার সুযোগ আমার একবার হয়েছিল। তিনজন যখন একসঙ্গে থাকতেন—দৃশ্যটি দেখার মতো হতো। এঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্পূর্ণরূপে জানতেন এবং পরস্পরের প্রতি এঁদের অদ্ভুত মনের টান ও সহানুভূতি ছিল—মনে হতো এঁদের দেহ তিনটি বটে, কিন্তু মন একটিই।

মাছ সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামির মূলোৎপাটন

হরিদ্বারে গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সেসময়ে কল্যাণ মহারাজের সহ্য হতো না। তাই আমরা মুসৌরীতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম, তিনি সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। তাছাড়া তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল এবং সেবাশ্রমে যে-পথ্য দেওয়া হতো তা তাঁর উপযোগী ছিল না। সেবাশ্রমে যেহেতু আমিষ খাবার ছিল, তাই ডাক্তার তাঁকে বলেছিলেন—যতদিন মুসৌরীতে থাকবেন ততদিন যেন তিনি মাছ খান। বহুমূত্রের রোগী হওয়ায় অন্য কিছুতে তাঁর শরীরের পুষ্টি হতো না। তাই মুসৌরী থাকাকালীন কল্যাণ মহারাজ শুধু খানিকটা করে মাছ খেয়ে থাকতেন, কিন্তু মুশকিল হলো আমাকে নিয়ে। আমি মানুষ হয়েছিলাম অন্ধ্রপ্রদেশে, কট্টর নিরামিষাশীরূপে। বহুবার আমি কথাপ্রসঙ্গে মাছ খাওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছিলাম। সকলকে বলতাম, অন্ধ্র অঞ্চলে কেবল সবচেয়ে নিচু জাতের লোকেরাই মাছ খায়, ভদ্রলোকেরা তা পরিহার করে। ছেলেবেলায় আমাদের মাছের বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হতো না, এমনকি তার পাশ দিয়ে সাইকেলে করে যাওয়াটাও ভাল চোখে দেখা হতো না। কাজেই আমি মৎস্য-বিদ্বেষীরূপে বেড়ে উঠেছিলাম এবং কেউ মাছ খেলে তাকে অপছন্দ করতাম। একদিন মুসৌরীতে আমি কল্যাণ মহারাজের কাছে রয়েছি, এমন সময় ডাক্তার মহারাজকে দেখতে এলেন। দেখে তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, আপনার শরীর দেখছি ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না। আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন।" মহারাজ বললেন ঃ "কেন? আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।" পরে ডাক্তার গিয়ে মহারাজের ব্রহ্মচারী সেবককে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে বলল ঃ "মহারাজ নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন নারায়ণ মহারাজ আমাদের এখানে থাকবেন, ততদিন মাছ-মাংস খাওয়া চলবে না। সেইজন্যই এইরকম হয়েছে।" একথা শুনে বোধহয় ডাক্তার মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ভাল কথা। কিন্তু এইরকম যদি চলে তাহলে মহারাজ আর বেশিদিন নাও বাঁচতে পারেন।" ঐ ডাক্তারের সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় ছিল। তিনি অনেকসময় সেবাশ্রমে আসতেন ও আমাদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবি, নাম ছিল ডাঃ রাধাকৃষ্ণ। সেইসময়ে তিনিও মুসৌরীতে বাস করছিলেন। তিনি বিদায় নেওয়ার আগে তাঁর কাছে গিয়ে আমি কী হয়েছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ "আপনাকে আমার তা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না।" আমি বললাম ঃ "না, আপনি আমাকে খুলে বলুন।" ডাক্তার বললেন ঃ "ব্যাপার কি জানেন? আমি মহারাজকে মাছ খেতে নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তিনি তা খাচ্ছিলেনও। ঐ একটি জিনিসই তিনি খেতে পারেন এবং তাঁর খাওয়া উচিত। ওটি না খেলে তাঁর শরীরের পুষ্টি হবে না। কিন্তু শুনলাম, এখন আপনি এখানে আছেন বলে উনি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার সনাতনপন্থী সংস্কারে বাধে—এমন কিছু উনি করতে চাইছেন না।" আমি বললাম ঃ "ও এই ব্যাপার! আচ্ছা, উনি যদি আবার মাছ খাওয়া শুরু করেন, তাহলে কি ঠিক হয়ে যাবেন?" ডাক্তার উত্তর দিলেন ঃ "নিশ্চিত হবেন। ওঁর রোজ মাছ খাওয়া উচিত—আর কিছু নয়, ভাত বা ঐজাতীয় কিছু তো নয়ই।" আমি 'ঠিক আছে' বলে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলাম। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম—এই একজন মানুষ, যিনি আমার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ব্যক্তির জন্য নিজের প্রাণ অবধি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন! কেন তিনি আমার জন্য এতটা করবেন? তারপর রান্নাঘরে গিয়ে সেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললাম ঃ "চল, আমরা বাজারে যাই।" বাজারে খানিকটা মাছ কেনা হলো। বাড়িতে ফিরে সেই মাছটা ধোয়াধুয়ি করতে আমিও হাত লাগালাম। ব্রহ্মচারী মাছ রান্না করে খাবার টেবিলে নিয়ে এল। কল্যাণ মহারাজকে যখন মাছ পরিবেশন করা হলো, তিনি বললেন ঃ "এ কি? আমি যে তোকে বলেছিলাম, আমার জন্য আর মাছ আনবি না!" ব্রহ্মচারী বলল ঃ "কিন্তু নারায়ণ মহারাজ নিজেই তো আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে গিয়ে মাছ কিনতে বললেন। এমনকি তিনি নিজেও মাছ খাবেন বলছেন।" "তুই মাছ খাবি?"—মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ।" তারপর মাছ দেওয়া হলে যদিও আমার ভাল লাগছিল না, তবু আস্তে আস্তে তা আমি খেতে লাগলাম। মহারাজও খেলেন এবং আর

সকলেও বেশ রুচি করে খেল। মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "মাছ খেলে তোর ভালই হবে।" এইভাবে মাছ সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামির অবসান হলো।

আমার সংস্কারকে যে আমি জয় করতে পেরেছিলাম—এটা আমার কাছে আত্মপ্রসাদের ব্যাপার। দক্ষিণ ভারতের এক গোঁড়া পরিবারে মানুষ হওয়ায় এই সংস্কার আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। অনেক গোঁড়া সংস্কারাচ্ছন্ন লোকই নিজেদের পালটাতে পারে না। পরে আমি ভেবে দেখলাম, যে-দ্রব্য শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছে তা যদি আমরা অপছন্দ করি, তাহলে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত হয়। আমরা তাঁকে যা নিবেদন করছি, নিজেরা সেটাকে হেয় ভাবছি—এর অর্থ দাঁড়ায় আমরা যেন ঠাকুরের চেয়েও উচ্চস্তরের জীব, তাঁর চেয়েও পবিত্র! শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদিত সকল বস্তুই আমাদের প্রসাদরূপে গ্রহণ করা উচিত। আর আমরা জানিই বা কতটুকু? কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তার কিছুই আমরা জানি না। তিনি যদি বস্তুটি গ্রহণ করে থাকেন, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। এসম্বন্ধে এই হলো শেষকথা। আসলে ব্যাপারটা হলো, আমাদের চেতন মনের অগোচর এত সব সংস্কারের বন্ধনের সম্মুখীন হতে হয়! আধ্যাত্মিক জীবনে এর প্রত্যেকটি আমাদের ছিন্ন করা দরকার। সত্যকারের আধ্যাত্মিকতা, বিশেষ করে ভক্তি কাকে বলে, তা বোঝা অতীব কঠিন। কিন্তু সাধককে খুব সচেতন থাকতে হবে। কে কিভাবে এগোবে তা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে—জোর করে অন্যের ওপর কোনকিছুই চাপানো উচিত নয়। তবে এক্ষেত্রে আমার বিচারের ধারা ছিল এইরকম ঃ আমরা যদি কোন কিছু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তিসহকারে নিবেদন করি, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুকে ঘৃণাও করি—তাহলে এরূপ ভক্তির সার্থকতা কী? মোট কথা, উপরি উক্ত অভিজ্ঞতায় আমার খুবই উপকার হয়েছিল। আর পরবর্তী কালে আমি যখন বেলুড় মঠে ছিলাম, তখনো এটি আমার খুব কাজে লেগেছিল। সেখানে থাকার সময় একবার আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই। তখন একদিন বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ একবাটি মাছের ঝোল নিয়ে এসে আমায় বললেন ঃ "নারায়ণ, ওরা বলল তুমি মাছ ভালবাস। এই নাও, খানিকটা মাছের ঝোল এনেছি, খাও।" আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আপনি যদি হাতে করে দেন, আমি নিশ্চয়ই খাব।"

আধ্যাত্মিক জীবনে এইরকম অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। আমরা যদি নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বলে পরিচয় দিই, তাহলে আমাদের তাঁকে শতকরা একশো ভাগ গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে আমরা নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখব। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার যোগীন মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোকে যা করতে বলি—সবসময় তুই তাই-ই করবি। না হলে বড় বড় ব্যাপারেও তুই নিজের বিবেচনা খাটাতে গিয়ে বিপদে পড়বি।" তাঁকে সম্পূর্ণ মেনে চলা—এমনকি বাহ্যত গুরুত্বহীন শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেনে চলা আবশ্যিক; নতুবা আমাদের মন তাঁর উপদেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করে তুলবে। ভক্তের পক্ষে তাঁকে সমগ্ররূপে গ্রহণ করার, নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের নম্রভাবে, সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা কোনকিছুই জানি না, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানেন। আমরা সকলেই গতানুগতিকতা ও সংস্কারের বেড়াজালে বন্দি। সেই বন্দিদশা আমাদের ঘোচাতে হবে। এই কারণে আজ এই ভেবে আনন্দ পাই যে, আমি কনখলের ঐ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে থাকার, কল্যাণ মহারাজের মতো একজন মহাত্মার সঙ্গে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। [ক্রমশ] (চার)

* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়।
—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ অগ্রহায়ণ ১৪১১
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**স্বামী সুবোধানন্দ** কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী ৭ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার (২৩ নভেম্বর ২০০৪)
		স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী ৯ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর ২০০৪)
পূজাতিথি-কৃত্য	ঃ	**শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা** কার্তিক শুক্লা নবমী ৪ অগ্রহায়ণ, শনিবার (২০ নভেম্বর ২০০৪)
		শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা কার্তিক পূর্ণিমা ১০ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (২৬ নভেম্বর ২০০৪)
একাদশী-তিথি	ঃ	৬, ২২ অগ্রহায়ণ সোমবার, বুধবার (২২ নভেম্বর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৪)

'তব কথামৃতম্'

অজয় ভাদুড়ী

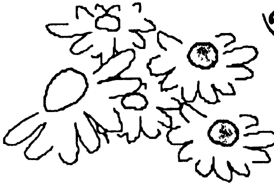
যখনি একাকী বসে থাকি নির্জনে নিভৃতে
চিলেকোঠায় ঠাকুরঘরে একমনে বসে পড়ি
তোমার অমৃতবাণী
'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।'

চলার পথে, ট্রেনে যেতে যেতে
কাজের অবসরে অফিসে বসে
অফিসের ব্যাগ থেকে সযতনে
বের করে আনি
'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।'

আহা কত সান্ত্বনা পাই
মনে হয় প্রভু তুমি এসেছিলে
শুধু আমাদেরই জন্য।
তাই তাপিত সংসারী জীব হয়ে
দিশাহারা শুধু তোমাকেই খুঁজে ফিরি;
শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাক্য জানি
'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।'

এ সুধারস পান করে মনে জোর পাই
বুকে বল পাই
মনে হয় আছ তুমি সদা পাশে,
আর কী ভয়, ডঙ্কা মেরে হব পার,
শুনি তোমার অভয়বাণী
'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।'

জীবনে চলার পথে যদি স্মরি
শ্রীরামকৃষ্ণনাম দিনে রাতে
শেষদিন নিশ্চয় ধরবে এ হাত নিজ হাতে,
বলেছিলেন মাতাঠাকুরানী।
পাছে ভুলে যাই নানা কাজে,
তাই বুকে ধরে থাকি
'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।'



ওঠরে জেগে শিশু-কিশোর

যদুপতি মল্লিক

ওঠরে জেগে শিশু-কিশোর
বিশ্বপিতার নামে—
ডাক এসেছে গড়তে হবে
সমাজ ধরাধামে!

তোরাই দেশের ভাবী শক্তি
ভবিষ্যতের বল—
আদর্শে তাই থাকতে তোদের
হবেই অবিচল!

অনেকটা পথ উঠতে হবে
সত্যের দীপ জ্বেলে,
প্রেম বিলাবি মানবে তুই
সবুজ হৃদয় মেলে।

ডাক এসেছে সমাজ গড়ার
দেশের গঠনকর্মে—
আয়রে ছুটে শিশু-কিশোর
শপথ নিয়ে মর্মে!



তুমিময় হয়ে আছি

মায়া মণ্ডল

এই পাহাড়, এই পর্বত
এই মরু, এই জঙ্গল
এই আকাশ, এই বাতাস
এই নদী, সমুদ্র
এই সবুজ শ্যামলিমা
এই তৃণ, এই পাখির কুজন
দিবারাত্র গাইছে
তুমি আছ—তুমি আছ।

তুমি আছ আমার বক্ষঃস্থলে
আমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে
দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
শোণিত হয়ে বইছ।
পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণায় তুমি আছ।

যদিও তুমিময় হয়ে আছি বোধিতে
তবু, অবুঝ এ স্থূল পার্থিব মন
বুঝতে পারে না
তোমার সর্বক্ষণের উপস্থিতি।

বিশ্বাস

রণজিৎকুমার সেন

আল্লাহ, ঈশ্বর নহে সহোদর
উভয়েই একজন,
পাপ তাপ খণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
নজর সর্বক্ষণ।



মহামায়ার ছায়া

হরিগোপাল চৌধুরী

দিন শেষে রাত্রি আসে, রাত্রি শেষে দিন,
মহামায়ার কারিগরি তুলনাবিহীন;
অবিরাম অতীতের ইতিহাস লিখে—
নদী চলে নিরন্তর সাগরের দিকে।
আকাশের নীহারিকা নিঃশব্দ নিবিড়,
পৃথিবীর বুকে শুধু প্রস্তরের ভিড়।
উচ্চশির পর্বতেরা নীরব নিথর,
তারই নিচে মুখরিত সারি সারি ঘর।
ছয় ঋতু ছয় রঙ ঘুরে ঘুরে আসে,
সাদা, কালো, সুখ-দুঃখ তারই পাশে পাশে।
কী বিচিত্র লীলাচিত্র, কী আশ্চর্য মায়া
এরই মাঝে খুঁজে নাও মহামায়ার ছায়া।

প্রভু তোমাকে

বাসুদেব দাশ

হে প্রভু!
বাতাসের আবর্তে তোমার নিত্য আগুনের ছোঁয়া
প্রতিদিন বিস্ময়ে পুড়িয়ে
শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় উদ্ভাসিত হয় নিজ আবাসে—
তুমি অনায়াসে
হাস নরম আলোয়
ফুলের যাবতীয় সুগন্ধ উড়িয়ে।

হে প্রভু!
এখানে এখনো পড়ে থাকে খুব অনাদরে
শুধুই আমার
নিঃসঙ্গ মনের
অনির্বাণ গৃহস্থ প্রাকার
যার চারিদিকে বুদ্ধির দৌরাত্ম্য আবৃত করে রাখে
দুঃস্বপ্নের নিদ্রিত বৃত্তিধারী সেবকের
লক্ষণীয় বোধের অধিকার।

হে প্রভু!
এরই মধ্যে তোমার স্বধর্মে বোনা সময়ের সকল গূঢ় আশা
তুলে দিতে উদ্ধত বিনম্র মায়ায়
আমার অন্তরের প্রণাম অকপটে রেখে যেতে চাই
তোমার আশ্রিত চরণছায়ায়।

তাঁর আলো

বিশ্বনাথ গরাই

মানুষের একান্ত নিভৃতে
দোলাচল চিত্তে কিংবা কোন অন্তিম বিষাদে
একটি মাতৃমুখ অথবা নরদেবতার ছবি ভেসে ওঠে।

নাস্তিক যতই ভাবে মানুষ নিজেকে, আত্মখনিত কূপের
অন্ধতম অন্ধকারে নির্বাসিতের মতন
সেই মুখ আঁকড়ে ধরেই সে তো পুনরায় বেঁচে ওঠে।

সেখানেই জয় তাঁর, দিগ্বিদিক আলোজ্যোতিধারা
মানুষকে ধুয়ে দেয়, তাই জ্বলে ওঠে আত্মদীপ
মানুষ তো দেবতাসদৃশ হয় তাঁর হৃদিপটে!

'মম মায়া দুরত্যয়া'

অপর্ণা দাশগুপ্ত

যার নেশা—নেশা, আগুন—আগুন
মোহিনী চোখের চাহনিতে
তুমি ভুলে যাও আত্মপরিচয়,
সেই হলো মায়া, মন-মোহিনী।

যার মায়াবী রঙিন প্রকাশ,
রেশম-আঁচলে ফাঁস দিয়ে হত্যা কর
নিজের বিশুদ্ধ বিবেককে—,
সেই হলো মায়া, অঘটনঘটনপটীয়সী।

যার মমতামাখা স্নেহের স্পর্শে
অবিরাম বাসনার ভিড়ে
হারিয়ে ফেলেছ আপন ঠিকানা আর লক্ষ্য,
সেই হলো মায়া, বিনোদন-বিলাসিনী।

যার কল্লোলিনী কলকাকলিতে বাঙ্ময় প্রাণমন,
বুকের ভিতরে শুনতে পাও না—
স্বতোচ্চারিত গভীর প্রণবমন্ত্রের ওঙ্কারধ্বনি,
সেই হলো মায়া, প্রমাদ-প্রমাদিনী।

যার কুহেলী নিশির আদিম আহ্বানে—
রক্তে জাগে উত্তাল ঝঞ্ঝা,
পার হয়ে যাও চুরাশি লক্ষ যোনি,
সেই হলো মায়া, মদিরা-কুহকিনী।

একবার, নিমিলিত চোখে, অন্তরে ডুব দাও—
কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ স্মরণ কর,
শুনতে কি পাও পুরুষোত্তমের সতর্কবাণী!
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া!"

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ **স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।**

—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজীর বইতে পড়েছি, আনন্দলাভ করতে গেলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকা চলবে না এবং নিজেকে স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বলে জানতে হবে। স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর কাকে বলে? সংসারজীবনে সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পঞ্চকোষ মনে করা কি সম্ভব?*

—কমলকুমার মাইতি, জাঙ্কা, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর ঃ একবার বেলুড় মঠে একজন গৃহী ভক্ত এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "মহারাজ, আপনারা কত বড় ত্যাগী, সব ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য চলে এসেছেন।" প্রত্যুত্তরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন ঃ "আমাদের থেকে আপনারাই বড় ত্যাগী।" কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা ক্ষুদ্র সংসারকে ছেড়ে বিরাটরূপী ভগবানকে নিয়ে আছেন। আর সংসারী ব্যক্তি বিরাটরূপী ভগবানকে ছেড়ে ক্ষুদ্র সংসার নিয়ে আছেন। সুতরাং সংসারীর ত্যাগই বড়। আসলে বৃহৎ আনন্দ যদি কেউ পেতে চায়, তাকে ক্ষুদ্র আনন্দ ত্যাগ করতে হবে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই স্বামীজী বলেছেন, পারমার্থিক আনন্দ লাভ করতে হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকা চলবে না। আমরা কিসের সাহায্যে ভোগ করি? প্রথমত স্থুলশরীর। স্থুলশরীরের নিজস্ব ভোগের ক্ষমতা নেই, যদি না মন এর সাথে যুক্ত থাকে। সুতরাং ভোগাসক্তি মনেরই। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিন নিয়ে 'সূক্ষ্মশরীর'। আবার মন কার? মন আমার। অর্থাৎ আমি মনের মালিক। তাই মন আসল ভোক্তা নয়, আমিই আসল ভোক্তা। এই আমি বা অহংবোধ শাস্ত্রে 'কারণশরীর'-রূপে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আত্মা অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই স্পৃষ্ট নন; সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি কিছুই নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—"যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।/ সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥" (৩৩) অর্থাৎ সর্বানুস্যূত হয়েও আকাশ যেমন সবকিছু থেকে পৃথক, অলিপ্ত বা অযুক্ত, তেমনি সর্বব্যাপী হয়েও আত্মা সবকিছু থেকে আলাদা, অস্পৃষ্ট। নিজেকে সবকিছু থেকে পৃথক ভেবেও সংসারের সকল কর্ম অনাসক্ত হয়ে যে করা সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনালেখ্য। প্রাচীনকালে রাজা জনক এইভাবে আত্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সংসারের সব কাজের মধ্যে থেকেও যে নিজেকে সাক্ষিরূপে পৃথক করে রাখতে পারে, তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুরের ভক্তদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। কেউ যদি কেবল জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ করে, তাহলে কী তার মুক্তিলাভ হবে? সেবার সঙ্গে আত্মার মুক্তির সম্পর্ক কী, যদি অনুগ্রহ করে বলেন খুব উপকৃত হব।*

—রথীন মণ্ডল, পারুলডাঙা, বীরভূম

উত্তর ঃ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম লক্ষ্যকে স্বামীজী মন্ত্রের আকারে অভিব্যক্ত করেছিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" আসলে এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা যোগদান করেছেন বা করছেন, তাঁদের জন্যই নির্ধারিত থাকলেও বৃহত্তর ভক্তসমাজের জন্যও স্বামীজীর একই উপদেশ। নিজের আত্মার মুক্তি তার পক্ষেই সম্ভব, যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর করে তুলতে পেরেছে। একদা স্বামীজী বলেছিলেন—"নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর" ("Unselfishness is God")। যে ক্রমশ নিঃস্বার্থপর হয়ে উঠছে, কেবল নিজের মুক্তির প্রতি তাঁর লক্ষ্য থাকবে কী করে? যুক্তি দিয়ে দেখলে কেবল নিজেরই মুক্তির জন্য যদি কেউ সচেষ্ট হয়, সে তাহলে স্বার্থপর হয়ে পড়বে। সুতরাং সকলের মুক্তির জন্য আমাদের প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে। ব্যষ্টির মুক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 'জগদ্ধিতায়' প্রসঙ্গ কাজে কাজেই চলে আসে। অপরদিকে আরেকটি কথাও সহজে বোঝা যায় যে, আত্মমুক্তির সংজ্ঞাই হলো নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা অর্থাৎ ভগবানের আমিকে (পাকা আমি) নিজের আমির (কাঁচা আমি) জায়গায় স্থাপন করা দরকার। অর্থাৎ ভগবানকে ভালবেসে তাঁর পাদপদ্মে সর্বকর্মফল সমর্পণ করে নিজের চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানাই হলো মুক্তি। অর্থাৎ একইসঙ্গে ভক্তিযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনের মাধ্যমে মুক্তিলাভের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। একটু

বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, জগতের হিতের জন্য যে সেবাপ্রসঙ্গ স্বামীজী এনেছেন, তার মধ্যেই এই যোগসমন্বয় আপনা-আপনি সংঘটিত হয়। সুতরাং "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-ই এযুগে মুক্তিলাভের উপায় বলে রামকৃষ্ণ সংঘে সকল ভক্ত বা সদস্য মনে করেন। অতএব "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এবং "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" দুটি মন্ত্রেরই লক্ষ্যার্থ বা মূল তাৎপর্য এক।

প্রশ্ন ঃ *দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর নামে একটা জোয়ার এসেছে—বিশেষ করে বিভিন্ন মঠ ও মিশন, অন্যান্য প্রাইভেট আশ্রমাদির উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করলে এটি বেশ বোঝা যায়। অথচ সমাজজীবনে এর তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বৃহত্তর সমাজে মানুষের মন নিম্নগামী। এবিষয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের ভূমিকা কী?*

—তপনকুমার গড়াই, বিধাননগর, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ তোমার কথা ঠিক। এখন চারিদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর নাম ছড়াচ্ছে। তাঁদের পুণ্যনামে গ্রামে-গঞ্জে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে। গত দশবছরে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই ধরনের কত নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে তা আমরা 'উদ্বোধন' পত্রিকার 'বিবিধ সংবাদ' বিভাগে নজর দিলেই অনুমান করতে পারব। সকলেই উৎসব অনুষ্ঠান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে ধীরে ধীরে মেতে উঠছে। তবে তুমি যা বলেছ—সমাজে এর প্রভাব পড়ছে না, এই কথাটি ঠিক নয়। সমাজের মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব কেমনভাবে গ্রহণ করছে, তা অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো উপলব্ধি করব। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, বিদেশেও ঠাকুরের ভাব ক্রমশ ছড়াচ্ছে। বিভিন্ন দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী আশ্রম বা মঠ নির্মাণ করার জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছেন। এবিষয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের ভূমিকা কী বুঝতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার, তুমিও রামকৃষ্ণ সংঘের একজন সদস্য। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রভাব তখনি সমাজের ওপরে আরো বেশি করে পড়বে যখন এই সংঘের সদস্যগণ প্রত্যেকেই নিজেকে ঠিক ঠিক তৈরি করবে এবং স্বীয় জীবনকে আদর্শের পথে পরিচালিত করবে। বক্তৃতা করে, বই লিখে কিংবা ত্রাণসেবা করে সমাজের ওপর স্থায়ী প্রভাব কখনো ফেলা যায় না। সেইজন্য স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" (আমার সমরনীতি, বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৮৭) অর্থাৎ শুধু কথা নয়, জীবন চাই।

স্বামীজী একটি 'মডেল' নির্মাণ করে যেতে চেয়েছিলেন, যাতে সমাজের মানুষ সেই মডেল দেখে নিজেদের পথ ও লক্ষ্য নির্ণয় করতে পারে। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সংঘ ধীরে ধীরে এই মডেলের রূপ পরিগ্রহ করেছে—নানান উত্থান, পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। যদি বল, বৃহত্তর সমাজ এখনো শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে তেমনভাবে গ্রহণ করেনি, তাহলে বলব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চয়ই দেখতে পাবে—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতটা সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। সিদ্ধসঙ্কল্প স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই।

প্রশ্ন ঃ *আজকাল দেখা যায়, যুবক-যুবতীদের অধিকাংশই ঈশ্বরবিমুখ এবং ধর্মকর্মবিরোধী। কখনো কখনো পরিবারের আত্মীয়স্বজনও তাদেরকে তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কারো ঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কিংবা মঠ-মিশনে যাওয়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে তার কী করণীয়?* ***—মিঠুন রায়, বিশালগড়, ত্রিপুরা***

উত্তর ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কেবল যুবক-যুবতী নয়, অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরবিমুখ। কঠ উপনিষদে এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।/কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্‌ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" (২।১।১) অর্থাৎ ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন, অন্তর্মুখ করে সৃষ্টি করেননি। এর অর্থই হলো, মহামায়ার ইচ্ছা—মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে থাকুক। কদাচিৎ কখনো কারো মনে ঈশ্বরপরায়ণতা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে দুর্লভ কেউ হয়তো ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রাপ্ত হন। যেমন গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।/ যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"(গীতা, ৭।৩) সুতরাং ঈশ্বরকৃপায় বা গুরুকৃপায় যার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মেছে, সেই ভক্তির বীজ তাকে কোনমতে স্থির থাকতে দেয় না। যেখানে ঈশ্বরকথা হয়, যেখানে তাঁর নাম-গুণ-গান কীর্তন হয়, সেখানে সে যায়, কারোর নিষেধ সে শোনে না। তার আকুল প্রার্থনায় ভগবান সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কৃপা করে অনুকূল পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করে দেন এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটে। ফলে তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। আসল কথা, ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক টান থাকা চাই। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।

চিকিৎসা বিষয়ে এক দিগ্‌দর্শন

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত "তুই পরমহংস হবি" শীর্ষক রচনাটি বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক। এযুগে চিকিৎসকদের অর্থলোলুপতা ও নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী আমাদের দুঃখ দেয়। বিশেষত যখন দেখি, সত্যকার সেবাপরায়ণ, মানবদরদি চিকিৎসকদের জীবনেও প্রতিহিংসার অভিশাপ নেমে আসছে এবং ঐধরনের ঘটনায় (এমনকি জনদরদি চিকিৎসকদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে) সাধারণ মানুষের উপেক্ষা, তখন এমন লেখার যাথার্থ্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করি।

রচনাটি পাঠ করে চিকিৎসা কিভাবে বিরাট সেবাযজ্ঞের একটা অংশীদার হতে পারে, তা জানার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে জমে ওঠা সঙ্কট কিছুটা দূরীভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি প্রস্তাব 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষের নিকট রাখতে চাই। রচনাংশটিতে স্বামী কল্যাণানন্দজী চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের উদ্দেশে এবং চিকিৎসাকর্মী লেখককে যেসব চিকিৎসাসম্বন্ধীয় মূল্যবান বাণী ও উপদেশ প্রদান করেছেন, সেগুলি সঙ্কলন করে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেশের সমস্ত চিকিৎসকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হোক। তার ফলে যদি চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকজনেরও বোধোদয় ও শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তাহলে চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আতঙ্কই কেবল দূর হবে তাই নয়, সত্যিকারের সেবাপরায়ণ, মানবদরদি চিকিৎসকরা নির্ভয়ে, নির্বিবাদে প্রাণভয়রহিত হয়ে চিকিৎসারূপ সেবাযজ্ঞে অংশ নিতে পারবেন।

কবিতা দাস
পেয়ারাবাগান, বড়িশা, কলকাতা-৭০০ ০০৮

প্রসঙ্গ ধনরাজ গিরিজী ও কৈলাস আশ্রম

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত পূজনীয় স্বামী সর্বগতানন্দজীর লেখা "তুই পরমহংস হবি" কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাস তথা অতীত দিনের স্মারকস্বরূপ। এই রচনাটিতে হৃষিকেশ কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী প্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ লিখেছেন—"শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'কৈলাস আশ্রম'-এর মোহন্ত"। (পৃঃ ৫১০) এই তথ্যটি ভ্রান্তির অবকাশ রাখে। শঙ্করাচার্য তো নয়ই, যতদূর তথ্য পাই—কৈলাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভবত ১৮৮০ সালে এবং প্রতিষ্ঠাতা ধনরাজ গিরিজী স্বয়ং। অর্থাৎ কৈলাস আশ্রম অত প্রাচীন নয়। প্রচলিত কথা অনুসারে, ১৮৮০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে হরিদ্বারের 'সুরথ গিরি বাংলো'তে ধনরাজ গিরিজী বাস করতেন। বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর মনীষা তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে। একদা একান্তবাসের প্রেরণায় তিনি হৃষিকেশে চলে আসেন এবং চন্দ্রভাগা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের সন্নিকটে নিজস্ব কুটির নির্মাণ করেন। কালীকমলীর ছত্রে তিনি ভিক্ষাদি করতেন। এই সময়ে তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে কিছু বেদান্ত-অনুরাগী সন্ন্যাসী তাঁর সন্নিকটে কুটির রচনা করে তাঁর পদপ্রান্তে বেদান্ত-স্বাধ্যায়াদি করতেন। এভাবেই সূত্রপাত হয় এক দশনামী মণ্ডলের।

বর্তমান কৈলাস পীঠাধ্যক্ষ অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দজীর কাছে শুনেছি, তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছিলেন যে, ঐসময়ে ছোট ছোট ফুঁসঘাসের কুটির, কালীকমলীর ছত্রে ভিক্ষা, প্রধানত শাঙ্করভাষ্য-সহ প্রস্থানত্রয় স্বাধ্যায়—এই 'বিষয়ত্রয়' ছিল তাঁদের জীবনের অবলম্বন। তাঁদের তপস্যাপূত জীবনের দিনলিপির আভাস পাই স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনকথা 'মন ও মানুষ' গ্রন্থেও।

একদা ধনরাজ গিরিজী স্বপ্নাদেশ পান যে, হরিদ্বারে এক জীর্ণ মন্দিরে নর্মদেশ্বর মহারাজ (মহাদেব) উপেক্ষিত অবস্থায় আছেন। তিনি ধনরাজ গিরিজীকে সংস্কারসহ প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। এই স্বপ্ন অনুসারে ধনরাজজী হরিদ্বারে যান এবং খোঁজ নিয়ে দেখেন ঘটনাটি সত্য। তিনি স্বয়ং হরিদ্বারস্থিত জীর্ণ মন্দির থেকে নর্মদেশ্বর মহাদেবকে নিজের কাছে এনে বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে থাকেন। শোনা যায়, তিনি বলতেনঃ "শিবজীকে বেদান্ত শোনানোই আমার সেবাপূজা।" ১৮৯৭ সালে তিনি হৃষিকেশে মন্দির নির্মাণ করে নর্মদেশ্বর মহাদেবকে বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিয় বিগ্রহ চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে এই বিগ্রহের নাম রাখেন 'অভিনব চন্দ্রেশ্বর'। এই সময়েই জনৈক সজ্জনের অনুদানে নির্মিত হয় একটি ছোট গ্রন্থাগার। অপরিগ্রহে দীক্ষিত কঠোরতাপ্রিয় ঐ সন্ন্যাসিমণ্ডলের নিকট নিত্য স্বাধ্যায়হেতু ঐ গ্রন্থাগার নির্মাণের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। ইষ্ট মহাদেব 'অভিনব চন্দ্রেশ্বর'-এর মন্দির এবং ইষ্টকল্প শাস্ত্র-সংরক্ষণ হেতু 'গ্রন্থাগার নির্মাণ'—এই দুই নির্মাণের দ্বারাই গড়ে ওঠে শ্রীকৈলাস আশ্রম—ব্রহ্মবিদ্যাপীঠের ঔপচারিক বিকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের প্রতি ধনরাজ গিরিজীর আস্থা এবং নিষ্ঠার তথ্যসূত্রও পাই উদ্বোধন, বেদান্ত মঠ এবং কৈলাস আশ্রম প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' (স্বামী অব্জজানন্দজী রচিত), 'মন ও মানুষ' ও 'আমার জীবনকথা' (স্বামী অভেদানন্দজী রচিত), 'কৈলাস আশ্রম শতবার্ষিক স্মারক'

ইত্যাদি গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এইসকল তথ্য। স্বামীজীর সঙ্গে ধনরাজ গিরিজীর ঘনিষ্ঠতা ছিল সেইসময়ে, যখন স্বামীজী একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী (হয়তো একই সময়ে তাঁরা চন্দ্রেশ্বর মহাদেব সংলগ্ন নদীতটে তপস্যাদি করতেন)। কৈলাস আশ্রমে ধনরাজ গিরিজীর প্রথম সারির বিদ্যার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী অভেদানন্দজী। তিনি কৈলাস আশ্রমে অন্তেবাসী বিদ্যার্থী হিসাবে প্রায় তিনবছর (১৮৮৯/৯০ থেকে ১৮৯৩) স্বাধ্যায়াদি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশে অভেদানন্দজীর প্রথম বক্তৃতাটি ছিল 'পঞ্চদশী' নামক বেদান্তগ্রন্থের ওপর (১৮৯৬ সাল, ব্লুমসবেরি স্কোয়ার, লণ্ডন)। এই বক্তৃতার ওপর কৈলাস আশ্রমের স্বাধ্যায়ের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানত এই সময়ে কৈলাস আশ্রমে বিদ্যার্থী ছিলেন প্রখ্যাত রামতীর্থজী মহারাজ প্রমুখ। আজও প্রায় ১২৫ বছর ধরে এই সারস্বত সাধনা কৈলাস আশ্রমে নিত্য প্রবহমান। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে আসেন এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে তাঁরা কৈলাস আশ্রমে আশ্রয় পান। একমাত্র শর্ত—আবাসিক বিদ্যার্থীকে কাষায়বস্ত্রধারী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী) হতে হবে। দশনামী গুরুকুল পরম্পরা অনুযায়ী এটি একটি আবাসিক বেদবিদ্যালয়, যেখানে ষড়ঙ্গসহিত লঘু এবং বৃহৎ প্রস্থানত্রয় পড়ানো হয়।

স্বামী সর্বাত্মানন্দ
প্রাক্তন ছাত্র, কৈলাস আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ

আচার্য বিনোবা ভাবে সম্পর্কে কয়েকটি কথা

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যায় তাপসশঙ্কর দত্তের লেখা 'আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত আচার্য বিনোবা ভাবে' পাঠ করে আনন্দ পেলাম। তবে এর মধ্যে তথ্যগত কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ল। শ্রীদত্ত লিখেছেন ঃ "কাশীতেই গান্ধীজীর সঙ্গে বিনোবা ভাবের দেখা হয়েছিল।" একথা ঠিক নয়। বিনোবাজী যেসময় কাশীতে আসেন, তার এক মাস আগে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গান্ধীজী এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। কাশীতে এসে বিনোবাজী উক্ত ভাষণ পাঠ করে গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে পত্রালাপে নির্দেশ পেয়ে বিনোবাজী কোচরব আশ্রমে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করেন।

এবিষয়ে 'বিনোবা শতবার্ষিকী প্রকাশন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ' প্রকাশিত 'আপন কথায় বিনোবা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিনোবাজী বলেছেন ঃ "ঐ দিনটি ছিল ৭ জুন ১৯১৬।... আমি আমেদাবাদ স্টেশনে নামি।... এলিট ব্রীজ পার হয়ে সকাল আটটার সময় (কোচরব) আশ্রমে পৌঁছাই। বাপুকে জানানো হলো—এক নতুন ভাই এসেছেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, স্নানাদি করার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।' স্নানাদি সেরে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন তরকারি কুটছিলেন। আমার কাছে এটাও একটা নতুন দৃশ্য ছিল। আমি কোনদিন শুনিনি যে, রাষ্ট্রনেতা তরকারি কোটার কাজও করেন। তাঁর প্রথম দর্শনেই আমি আমার শ্রমের পাঠ পেলাম। একটা ছুরি বাপু আমার হাতেও ধরিয়ে দেন।" (পৃঃ ৪৬)

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী লিখিত 'ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন' গ্রন্থেও [৪র্থ (পরিবর্ধিত) সং, ১৯৬২, পৃঃ ১৭] একই কথার উল্লেখ রয়েছে। এতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, বিনোবাজী কাশীতে গান্ধীজীর প্রথম দেখা পাননি, পেয়েছিলেন কোচরব আশ্রমে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীদত্ত লিখেছেন ঃ "কাশীতেই তিনি (বিনোবাজী) বেদ, গীতা, উপনিষদ্, পুরাণ আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে নেন।" কিন্তু পূর্বোক্ত 'আপন কথায় বিনোবা' গ্রন্থে দেখা যায় ঃ "কাশীর মুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে প্রচুর হিন্দি ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ছিল। অল্পদিনেই আমি সেখানকার প্রায় সব বই দেখে নিয়েছিলাম। রোজ কয়েক ঘণ্টা করে সেখানে পড়তাম। সংস্কৃতও আমার শিখবার দরকার ছিল। একজন পণ্ডিতের নিকট জানতে চেয়েছিলাম, সংস্কৃত শিখতে কতদিন লাগবে? তিনি বলেন, 'বারো বছর।' আমি বলি, এতটা সময় আমার নেই। তিনি প্রশ্ন করেন, 'কত বছরে শিখতে চাও?' আমি বলি, দুই মাসে। তিনি (বিস্ময়ে) আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।" (পৃঃ ৪৩)

ঐ গ্রন্থেই আবার দেখা যায় ঃ "১৯১৭ সনের কথা। এক, স্বাস্থ্যোদ্ধার ও দুই, অধ্যয়নের প্রয়োজনে বাপুর কাছ থেকে একবছরের ছুটি নিয়ে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওয়াই-এতে থেকে প্রথমে সংস্কৃত পড়ব। গীতার প্রতি অনুরাগ থাকায় আমি বন্ধু গোপাল রাওয়ের সাহায্যে নিজে নিজে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করেছিলাম। এখন পড়ার ইচ্ছা ছিল বেদান্ত ও দর্শন। এবিষয়ে ওয়াই-এতে আমি উত্তম সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠে নামক এক আজন্ম ব্রহ্মচারী বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়াতেন। তাঁর কাছে উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়বার ইচ্ছা হয় বলে সেখানে কিছু বেশি সময় থাকি।

"সেখানে আমি উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, মনুস্মৃতি ও পাতঞ্জল যোগদর্শন অধ্যয়ন করি। এছাড়া ন্যায়সূত্র, বৈশেষিক সূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিও পড়ি। আর বেশি পড়বার মোহ ছিল না। মনে হয়েছিল, এখন আর যা পড়ার ইচ্ছা হবে আমি নিজেই তা পড়ে নিতে সমর্থ হব।" (পৃঃ ৫১)

এর দ্বারা আমার ধারণা—বিনোবাজী কাশীর বাইরেই সংস্কৃতজ্ঞানে তাঁর প্রয়োজনীয় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র মাহাত
চিঙুড়কসা, পশ্চিম মেদিনীপুর

সুস্থ দেহই তো সুস্থ মনের বসতবাটি

'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যাই পাঠক-পাঠিকার চেতন ও অবচেতনে এক অনিন্দ্য অভিঘাত সৃজন করে 'মানুষ'কে 'মান-হুঁশ' সম্পৃক্ত এক মানবতার অনুষঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুচি-শুদ্ধির অমল আবহে প্রকৃত 'মানুষ' গড়ার কারিগর হিসাবে 'উদ্বোধন' আমাদের মগজ ও মননে উদ্বোধন করছে অক্ষয় অবিনাশী আলোকময়তার এক উজ্জ্বল বাতিঘর। প্রত্যেকটি লেখায়, রেখায়, প্রতিবেদনে, প্রাসঙ্গিকীতে যেন প্রাণ পাচ্ছে সেই বিমূর্ত বিস্ময়ের আদল; প্রাণিত, শীলিত করছে আমাদের বোধ ও মেধা। কিন্তু বিবিক্ত পত্রিকাটিতে ক্রীড়াবিভাগটি যেন একটু অবহেলিত মনে হয়েছে। খোদ বিবেকানন্দ যেখানে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'-এর পরিবর্তে মাঠে ফুটবল খেলার আহ্বান জানিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকশিক্ষার নির্মল নিয়মে পৃথিবীর পাঠশালার দরজা করেছেন হাট, রুশো-রবীন্দ্রনাথ এমনকি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্গাতা ডিউই স্পেনসারও 'টোটাল এনটিটি'-র সাপেক্ষে প্রকৃতিপড়ুয়ার দপ্তর থেকে 'প্র্যাগম্যাটিক' শিক্ষা নিতে বলছেন—সেখানে বিশ্বায়নের বিপুল বৈভবে ভারতীয় খেলাধুলার স্থান নিয়ে যদি ক্বচিৎ আলোকপাত করা হয়, সেক্ষেত্রে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে বলেই মনে হয়, যেখানে শরীর ও মন পরস্পরের পরিপূরক।

সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

স্বামী সুবোধানন্দজীর পত্র প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র পড়ে মন খুব উদ্দীপিত হলো। পূর্বস্মৃতি জাগরিত করে আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই চিঠিগুলি। শুনেছি, আমার নাম 'গঙ্গাপ্রসাদ' রেখেছিলেন স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ। সেইসময় তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে (কলমা গ্রামের পাশের গ্রাম) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার বাবা-মা শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং খোকা মহারাজ আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘরে স্থাপন করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন। আমার কাকা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কলমা রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির ঠাকুরসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আমার সম্পর্কিত জ্যাঠামশাই। তাঁর সঙ্গে আমি প্রথমবার কলকাতায় এসে ১৯৪৫ সালে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বিজয়লক্ষ্মীও সেদিনই দীক্ষালাভ করেছিলেন বলে মনে পড়ে। জ্যাঠামশাইয়ের কন্যা গৌরীদি, শিবুদি শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর পত্রে উল্লিখিত ভূপতি দাশগুপ্ত ছিলেন কলমার বিখ্যাত জমিদার। তিনি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আমরা পড়েছি। জ্যাঠামশাই সেখানে সহকারী হেডমাস্টার ছিলেন। কার্তিকদা ছিলেন বিলাতফেরত ডাক্তার, সুশীলদা ভবানীপুরে থাকতেন। দেশভাগের পর ভূপতি জ্যাঠামশাই শেষজীবনে সম্ভবত সেখানেই থেকেছেন।

ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ সেন

সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

রচয়িতা বাল্মীকি নন, কালিদাস

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার ৪৩৮ পৃষ্ঠায় 'মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা' শীর্ষক রচনায় লেখক লিখেছেন ঃ "চোখের সমক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুনকে শরবিদ্ধ হতে দেখে যাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে এসেছিল সেই শ্লোক—'না খলু না খলু বাণঃ'! শোক থেকে স্বতোৎসারিত বলে তার নাম হলো 'শ্লোক'। বল্মীকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর দস্যু থেকে রত্নাকর রূপান্তরিত হয়েছিলেন অমর রামকথাকাব্যের মহাকবি ঋষি বাল্মীকিতে।"

আসলে এটি মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ১ম অঙ্কের ১৪নং শ্লোকের বিকৃত আংশিক উদ্ধরণ মাত্র। "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্..." শ্লোকে রাজা দুষ্যন্তকে আশ্রম-মৃগের প্রতি বাণ মারতে নিষেধ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে আহত ঋষি বাল্মীকির মুখ ফুটে বেরিয়ে আসা শ্লোকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। বাল্মীকির সেই শোকজাত শ্লোকটি এই ঃ

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

(রামায়ণ, ১।২।১৫)

লেখকের অনবধানতাজনিত এই ভ্রান্তির কারণে পাঠক সমাজে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য সম্পাদক মহারাজকে আমার এই পত্র।

কালীজীবন দেবশর্মা

ডানকুনি, হুগলি

লেখকের উত্তর

পত্রলেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি আমার অনবধানতাজনিত ভুলটি নির্দেশ করেছেন। এই বিষয়ে আরো কয়েকটি পত্র পূজনীয় সম্পাদক মহারাজের কাছে এসেছে বলে শুনেছি। 'উদ্বোধন'-এর বিদগ্ধ পাঠককুলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

অয়ন বিশ্বাস

বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা

কলকাতার গান্ধীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শ্রীসনাতনধর্ম'

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'তিলক যুগ'-এর পরে এসেছিল 'গান্ধী যুগ'।[১] গান্ধীজী নিজে সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি সাংবাদিকতাকে মানসিক বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করতেন। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গান্ধীমতের অনুসারী পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এইসময় অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সাল নাগাদ কলকাতার সাপ্তাহিক 'মতবালা', সাপ্তাহিক 'সেনাপতি', মাসিক 'বিশ্বমিত্র', দৈনিক 'কলকাত্তা সমাচার', দৈনিক 'ভারতমিত্র' প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্রপত্রিকাগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হলেও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শ্রীসনাতনধর্ম' পত্রিকাটির বিষয়ে প্রায় কোন আলোচনাই হয়নি।

'শ্রীসনাতনধর্ম' পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হলো—এর সম্পাদক ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট গান্ধীবাদী লেখক, সমাজ-সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বৈজনাথ কেডিয়া। (১৮৮৬—২১ ডিসেম্বর ১৯৪৭)। তিনি জাতিতে ছিলেন মাড়ওয়ারি। ১৯১৭ সালে তিনি বন্ধু মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের[২] সঙ্গে হিন্দির প্রসারের উদ্দেশ্যে 'হিন্দি পুস্তক এজেন্সি' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা তৈরি করেন। এখান থেকে প্রায় ৭৫০টি বই প্রকাশিত হয়। কলকাতাতে মুখ্য কার্যালয় হলেও এই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বারাণসী, পাটনা ও লাহোরে। বৈজনাথ কেডিয়া ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১ বছর কারাবাস করেন। তিনি মারওয়ারি অগ্রবাল সভা, কেডিয়া জাতি সহায়ক সভা, শ্রীকৃষ্ণ গোশালা, মারওয়ারি রিলিফ সোসাইটি, বড়বাজারের কুমারসভা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতার পিঁজরাপোল সোসাইটির লিলুয়া এবং সোদপুর শাখার কাজ পরিচালনা করতেন। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পের সময় তিনি মুঙ্গেরে কার্যালয় খুলে আর্তদের সেবা করেন।[৩]

'শ্রীসনাতনধর্ম' প্রকাশিত হতো বৈজনাথ কেডিয়ার আরেকটি প্রকাশন সংস্থা বণিক প্রেস (১ নং সরকার লেন, চোরবাগান, কলকাতা) থেকে। এটি প্রত্যেক শনিবার প্রকাশিত হতো। মূল্য ছিল ২ পয়সা। অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ীর গ্রন্থেই একমাত্র এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, ঐ তথ্যও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, পত্রিকাটি ১৯২৪ সালে অমৃতলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অমৃতলাল কিন্তু সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন বৈজনাথ কেডিয়া। প্রথম থেকেই যে কেডিয়া সম্পাদক ছিলেন, তার প্রমাণ হলো 'সরস্বতী', 'মারওয়ারি অগ্রবাল' ও 'মাধুরী'—এই তিনটি সমকালীন পত্রিকায় 'শ্রীসনাতনধর্ম' সম্বন্ধে যে-আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কেডিয়াকেই প্রথম থেকে সম্পাদক বলা হয়েছে।[৪] তবে অমৃতলাল 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বেঙ্গল প্যাক্ট বিষয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে মতভেদ হলে অমৃতলাল 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগ ছেড়ে 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন—একথা শিউপূজন সহায় লিখেছেন।[৫]

অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী আরো লিখেছেন যে, 'শ্রীসনাতনধর্ম' সঙ্কীর্ণ অর্থে সনাতনধর্মের পত্র ছিল না, এতে বৃহৎ হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা মিলিত হয়েছিল। এটি যুগলকিশোর বিড়লার অর্থ এবং প্রেরণায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৬] পত্রিকাটি কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, সেবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটির ২৯ মার্চ ১৯২৪ তৃতীয় অঙ্ক থেকে ২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ উনচল্লিশতম অঙ্ক পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।[৭]

নাম থেকে পত্রিকাটিকে চরিত্রে কঠোর হিন্দুত্ববাদী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তা ছিল না। এটি গান্ধীজীর আদর্শগুলিই প্রচার করত। এর উদ্দেশ্য ছিল সনাতনধর্মের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরা, যা কেডিয়াজীর মতে সর্বপ্রকার

সঙ্কীর্ণতামুক্ত এক প্রকৃত মানবধর্ম। পত্রিকাটি বলেছেঃ "সনাতনধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের কোন বিরোধ নেই।"[৮]

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীসনাতনধর্ম' সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা (Review) প্রকাশিত হয়েছিল। এলাহাবাদের 'সরস্বতী' পত্রিকা 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর প্রশংসা করলেও এতে সংবাদের স্বল্পতার কথাও উল্লেখ করেছিল।[৯] কলকাতার মাসিক 'মারওয়ারি অগ্রবাল' লিখেছিল, এতে উচ্চস্তরের ধর্মনিরপেক্ষ রচনা থাকে এবং এর উদ্দেশ্য হলো সনাতনধর্মের প্রকৃত আদর্শগুলি তুলে ধরা।[১০] লখনৌয়ের মাসিক 'মাধুরী'তে 'শ্রীসনাতনধর্ম' সম্পর্কে সমালোচনার সুরই দেখা যায়। 'মাধুরী' লিখেছে, পত্রিকাটিতে প্রকাশিত রচনাগুলি গভীর বিষয় নিয়ে রচিত হলেও সংবাদের খুবই অভাব, নীতিতেও কিছুটা নবীনতা ও তেজস্বিতা দরকার; কারণ সনাতনধর্ম অসাধ্য রোগীতে পরিণত হয়েছে, একে সুস্থ করতে হলে কড়া দাওয়াই দরকার।[১১]

'শ্রীসনাতনধর্ম' গান্ধীজীর আদর্শকে কিভাবে অনুসরণ করেছিল তা আমাদের আলোচ্য বিষয়। পত্রিকাটি 'Young India' থেকে গান্ধীজীর বক্তব্য তুলে দিত।[১২]

১৯২৪ এর জুন মাসে A.I.C.C.-এর আমেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেস সদস্যদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে চরকা কাটতে পারা, কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে থেকেও যেসব ব্যক্তি কাউন্সিলে প্রবেশ করেছেন—তাঁদের ঐসব পদ থেকে পদত্যাগ করা এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ধিক্কার জানানোর ওপরে জোর দেন। প্রথম প্রস্তাব-দুটি পরাজিত হয়, তৃতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ গোপীনাথ সাহাকে ধিক্কার জানানোর তীব্র বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন-সহ বাংলার অধিকাংশ প্রতিনিধি। প্রস্তাবটি ৭৮ ভোটে জেতে, স্বরাজীরা দিয়েছিল ৭০টি ভোট। এই ৮ ভোটে জেতার ফলে গান্ধীজী 'Young India'-এর 3 July 1924 সংখ্যায় নিজেকে 'Defeated and humbled' বলেন।[১৩]

এইসময় গান্ধীজী ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছিল স্বরাজ্য দলের খ্যাতনামা নেতা মধ্যপ্রদেশের ডঃ মুঞ্জের বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেসের ওপরে গান্ধীজীর প্রভাবকে খর্ব করার জন্য স্বরাজ্য দল সর্বশক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয়েছে এবং এখন কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীজী অপেক্ষা স্বরাজ্য দলকেই বেশি সমর্থন করে। 'শ্রীসনাতনধর্ম' লিখেছিল, ডঃ মুঞ্জের মতো আরো কিছু লোক স্বরাজ্য দলে থাকলে দেশের স্বাধীনতালাভ দুরাশামাত্র। কাউন্সিলে প্রবেশ বিষয়ে দেশবাসীর স্বরাজীদের ভোট দেওয়ার কারণ—দেশবাসী স্বরাজীদের মহাত্মাজীর ভক্ত ভেবেছেন।... স্বরাজীরা বিভিন্ন সূচনার দ্বারা মহাত্মাজীর প্রতি নিজেদের অপার ভক্তি প্রকাশ করেছিল।[১৪] 'শ্রীসনাতনধর্ম' আরো লিখছে, গান্ধীজীর প্রস্তাবগুলিই শুধু পরাজিত হয়েছে স্বরাজ্য দলের কাছে, তাঁর মহিমা কিন্তু জয়লাভ করেছে। স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে কিছু বলাই বিপজ্জনক। সম্মানহানির ভয়ে বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং বর্মার প্রতিনিধি-রূপে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে যাওয়া মনস্থ করেছেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর তুল্য দেশভক্ত এবং দেশপ্রেমের কারণে বারবার দণ্ডিত তথা জীবনভর শত লাঞ্ছনা সহনকারী কয়জন ব্যক্তি স্বরাজ্য দলে আছে? কিন্তু নরহত্যাকারী গোপীনাথের জন্য স্বরাজ্য দলের হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকে; আর বিদ্বান-শিরোমণি, ত্যাগিরাজ, অটল দেশপ্রেমী শ্যামবাবুকে স্বরাজ্য দল শুধু তিনি মহাত্মা গান্ধীর পরমভক্ত হওয়া এবং স্বরাজ্য দলের সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণে উত্ত্যক্ত করছে।

"जो हिन्दु-हिन्दुमें, हिन्दु-मुसलमानोंमें, संप्रदाय-संप्रदायमें, घर-घरमें वैमनस्यकी महाचिता जलाया,... देशवासियोंकी स्वतंत्रताकी अपेक्षा देशवासिओंपर अपनी प्रभुता स्थापित करनेके भूखे हैं।"[১৫]

স্বরাজ্য দল গান্ধীজীকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে। স্বরাজ্য দল ভারতবাসীর অধঃপতনের মূল দলাদলির মূর্ত প্রতীক—যে-দলাদলি হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলিমে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, গৃহে গৃহে বৈমনস্যের মহাচিতা জ্বেলেছে।... দেশবাসীর স্বাধীনতা চায় না স্বরাজ্য দল, দেশবাসীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়।

'Bengal Pact' নিয়ে গান্ধীজী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। সার্বিক বিচারে গান্ধীজী 'Bengal Pact' অসমর্থন করেননি, চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম নেতাদের সমর্থনলাভের জন্য তার প্রভাব ও ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে মতিলাল নেহরুর সমর্থনে 'Bengal Pact' পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙার মহারাজা প্রমুখ 'Bengal Pact'-এর বিরুদ্ধে সভা করেছিলেন।[১৬] 'শ্রীসনাতনধর্ম'ও সেইসময় 'Bengal Pact'-এর বিরুদ্ধে বলেছে, মুসলিমদের চাকরির লোভ দেখানো স্বরাজ্য দলের একটি কৌশলমাত্র। এতে স্বরাজ্য দল সামান্য কিছুদিনের জন্য মুসলিমদের দলে টানতে পারলেও বেশিদিনের জন্য পারবে না।[১৭] আবার ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সরকার যখন বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য 'Ordinance' জারি করল এবং নির্বিচারে অসংখ্য মানুষকে বন্দি করতে লাগল, তখন গান্ধীজী এবং স্বরাজ্য দল মিলিতভাবে 'Ordinance'-এর বিরোধিতা করলেন।[১৮]

স্বভাবতই 'শ্রীসনাতনধর্ম' ও সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে 'Ordinance'-বিরোধিতাকে স্বাগত জানাল।[১৯] যে-'শ্রীসনাতনধর্ম' এযাবৎ চিত্তরঞ্জনের সমালোচনায় মুখর ছিল, সে-ই এখন চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য সাদরে প্রকাশ করল এবং তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল, চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, বাংলার মানুষের মধ্যে প্রবল বিদ্রোহী ভাব রয়েছে, সরকার যা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছে না; কিন্তু বাংলার মানুষ তো কোন হিংসাত্মক কাজ করছে না, সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই বাংলার মানুষের হৃদয়ে যে-বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, তার কথাই বলছেন। সরকারি দমনপীড়ন প্রজাদের হৃদয়ে যে-বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছে, সরকার কোন দমননীতি প্রয়োগ করেই তাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। ("देशबंधु सी.आर. दाशने....कहा था, कि बंगालमें बगावतका फैलाव इतना अधिक है, कि जिसका सरकारका पुरा पुरा पता नहीं है। लेकिन अब तमाम बंगालके लोग अनोखे उच्छाहके साथ कानुन मानकर चलते हुए... तो देशबंधुके उस स्पष्ट कथनका एक ही अर्थ हो सकता है। वह यह ही है, कि...देशभकतके हृदयमें जो बगावतकी आग धधक उटी थी... सरकारी दमननीतिसे ही जो बगावत प्रजाके दिलमें पैदा होती है, वह कया दमननीतिसे ही कभी ठंडी की जा सकती है?")[২০]

'শ্রীসনাতনধর্ম' হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চাইত। এবিষয়েও পত্রিকাটি গান্ধীজীর মতেরই অনুসারী। পত্রিকাটি লিখছে, গান্ধীজী বলেছেন—আমি হিন্দু-মুসলিমে মিলন ঘটাতে পারব না। তাঁর মধ্যে কপটতা নেই বলেই তিনি একথা বলছেন।... দেশের যা পরিস্থিতি, নেতারা স্বার্থসাধনে ব্যস্ত, সে-অবস্থায় কি করে হিন্দু-মুসলিম মিলন ঘটানো সম্ভব? তাঁকে ভারতের মানুষ যদি বুঝতে পারত, তাহলে কখনো কাউন্সিলে প্রবেশের চমকদারিতে ভুলত না। কংগ্রেসকে শুধু বিরোধ থেকে বাঁচাতেই গান্ধীজী মোতিলাল এবং চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল সংক্রান্ত লাফঝাঁপ মেনে নিয়েছেন। দুঃখের কথা এই যে, এই দুজনও গান্ধীজীকে বুঝতে পারেননি, তাঁরা যদি সদ্য রোগমুক্ত অনশনব্রতী মহাত্মাকে বাঁচাতে চান, তাহলে তাঁরা এইসব দৌড়ঝাঁপ বন্ধ করে দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনে, দেশবাসীর মধ্যে ঐক্যস্থাপনে রত হবেন— আমরা এই আশা করতে পারি। হিন্দু-মুসলিমের মিলনই ভারতে চিরস্থায়ী মহাশক্তি উৎপন্ন করবে।[২১]

'শ্রীসনাতনধর্ম' আরো লিখছে, গান্ধীজীর দীর্ঘ উপবাসের ঠিক পরেই এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট ও কলকাতার নিকটবর্তী কাঁকিনাড়াতে বিরাট হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে। বহু হিন্দু অনাথ হয়েছে। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই দোষী বলেছেন।... মুসলমান সৎপুরুষরাও এধরনের দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।[২২]

সামাজিক বিষয়গুলিতেও পত্রিকাটিতে গান্ধীমতের প্রতিফলন ঘটেছে। চরকা কাটা ভারতের দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং জাতীয়তাবোধ বিকাশের সহায়ক বলা হয়েছে।[২৩]

বিদেশি বস্ত্র বর্জন এবং স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহার করতে বলেছে 'শ্রীসনাতনধর্ম'—অনেকেই সভা-সমিতিতে বিদেশি বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে বলেন, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের বিদেশি বস্ত্র এনে দেন। বিবাহাদি উৎসবে বাঙালি, ক্ষত্রিয়, মাড়ওয়ারি সব জাতের স্ত্রীলোককে বিলাতি কাপড় পরতে দেখা যায়। 'বসুমতী' পত্রিকা বড়বাজারের দোকানদারদের বিলাতি কাপড় বেচার জন্য খুব কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। কিন্তু বড়বাজারের হোলসেলারদের কাছ থেকে যেসব খুচরা বিক্রেতারা কাপড় কেনে (যাদের কাছ থেকে সাধারণ ক্রেতারা কেনে),... তারা দোকানে 'দেশি এবং বিলাতি কাপড়ের ব্যবসায়ী'—এই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখে এবং গ্রাহকদের ঠকিয়ে দেশি কাপড় বলে বিলাতি কাপড় বেচে।... [বসুমতী] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে এইসব দোকানে পিকেটিং করার সুপারিশ তো কখনো করে না। 'সঞ্জীবনী' কি সেইসব বাঙালিবাবুদের অনুরোধ করবে, যারা লাখে লাখে বিলাতি কাপড় পরে ইংরেজদের অফিসগুলির শোভাবর্ধন করেন।[২৪]

খাদির প্রচারের বিষয়টিও পত্রিকাটি তুলে ধরত। এখানে লেখা হয়েছিল, 'Young India'-তে লাহোরের লালা বরকত রাম তাপুরের একটি শোকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মহাত্মার নামে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য ১০০ টাকার নোট পাঠিয়েছেন। তাঁর কুমারী কন্যা সরলাদেবী সারাজীবন খদ্দর পরার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাঁর মায়ের ভয় ছিল, বিয়ের পর এই প্রতিজ্ঞা পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। মায়ের ভয় দূর করার জন্য সরলাদেবী আত্মহত্যা করেন এবং নিজের খদ্দরের শাড়িগুলি অনাথ মেয়েদের দিয়ে দিতে বলে পিতাকে অনুরোধ করেন মহাত্মাজীর কাছে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য ১০০ টাকা পাঠাতে।[২৫]

স্বদেশি ব্যবসায়ীদের শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্য টাটা পরিবারের ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত দিয়ে পত্রিকাটি লিখছে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কত টাকা ব্যবসায়ে লাগাতে হবে তা যাতে তারা বুঝতে পারে, সেজন্যই এই বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে।[২৬]

গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার সমর্থনে পত্রিকাটিতে আছে, গ্রামের বুদ্ধিমান যুবকরা—যাদের দিয়ে গ্রামের উন্নতির আশা ছিল—তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে বেশি

বেতনের চাকরির লোভে। শহরগুলিই ভারতের পরাধীনতার কারণ, ভারতের গ্রামগুলির উন্নতি না হলে ভারতের উন্নতি হবে না।[২৭]

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার সমর্থনে পত্রিকাটি বোম্বের গুজরাটি দৈনিক 'সাঁঝ বর্তমান'-এর ১৫ মার্চ ১৯২৪-এ প্রকাশিত খ্যাতনামা গান্ধীবাদী গোপালদাস অম্বাদাস দেশাই-এর অস্পৃশ্যতাবিরোধী রচনার হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছে।[২৮] পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছেঃ একসঙ্গে খাদ্যগ্রহণ করলে কি হবে? আমি চাই এই দলিত ভাইদের জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু ভেদভাব ছাড়া প্রদান করতে।[২৯]

গান্ধীজীর মত অনুসারী পত্রিকাটি ভারতীয়দের চরিত্রগঠনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিত। প্রচুর অর্থ উপার্জনের অভিপ্রায়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে যেসব কুরুচিকর চিত্র, সাহিত্য, নাটক ও সিনেমার প্রচার হচ্ছে, তার প্রভাব থেকে সন্তানদের বাঁচাতে অভিভাবকদের সচেতন হতে বলেছে 'শ্রীসনাতনধর্ম'।[৩০]

মাড়ওয়ারিদের একটি উপাসনা মন্দির গোবিন্দ ভবনের মুখ্য মহান্ত হীরালাল গোয়েঙ্কার রচনা কলকাতার অন্য একটি পত্রিকা 'মাড়ওয়ারি অগ্রবাল'-এর মতো 'শ্রীসনাতনধর্ম'ও প্রকাশ করত। হীরালাল একটি রচনায় পুরুষদের উপদেশ দিচ্ছেন—নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককে মা অথবা বোনের মতো মনে করতে।[৩১] আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই হীরালালই ১৯২৮ সালে ধর্মের নামে মেয়েদের প্রতারণা করে তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিষয়টি কলকাতার দৈনিক 'ভারতমিত্র', সাপ্তাহিক 'মতবালা', সাপ্তাহিক 'হিন্দুপঞ্চ' ইত্যাদি হিন্দি পত্রপত্রিকায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয় এবং কলকাতার বাইরের পত্রপত্রিকাও এবিষয়ে লেখালেখি করে। গান্ধীজীও ঐ কেলেঙ্কারির ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন এবং 'হিন্দি নবজীবন' পত্রিকায় এই বিষয়ে 'ভক্তিকে নামপর ভোগ' নিবন্ধ রচনা করেন।[৩২]

পরিশেষে, 'শ্রীসনাতনধর্ম' যেসব পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করত, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—গান্ধীজীর আদর্শের প্রতিফলন হয়েছিল যেসব সাহিত্যে, সেগুলির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো ঠিকই, তবে অন্য ধরনের বইয়ের বিজ্ঞাপনও বেরোত। উল্লেখ্য, প্রেমচন্দের 'সেবাসদন' উপন্যাস ১৯১৮ সালে কেডিয়ার 'হিন্দি পুস্তক এজেন্সি' থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩৩] 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর ১৯২৪ এর ৬ জুলাই সংখ্যাতেও 'সেবাসদন', 'প্রেমাশ্রম'—এই দুটি গান্ধী-আদর্শের অনুসারী উপন্যাসের বিজ্ঞাপন রয়েছে। 'হিন্দস্বরাজ্য', 'কংগ্রেসকা জন্ম অউর বিকাশ' (লেখক—সিদ্ধনাথ মাধব লোণচে) এবং চরিত্রগঠন সংক্রান্ত পুস্তকেরও বিজ্ঞাপন আছে।[৩৪]

'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সুন্দর সংযত রচনাশৈলী, যা একে সমকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য হিন্দি পত্রিকা—যেমন 'ভারতমিত্র', 'কলকাত্তা সমাচার', বিশেষত 'স্বতন্ত্র' থেকে আলাদা করেছে। শেষোক্ত পত্রিকাগুলির ভাষা আবেগপূর্ণ ও জ্বালাময়ী। তা সত্ত্বেও গান্ধীজীর প্রশস্তিতে এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিন্দায় 'শ্রীসনাতনধর্ম' তার স্বভাবসিদ্ধ সংযম থেকে কখনো কখনো বিচ্যুত হয়েছে। তবুও একথা বলতে হয়, কলকাতার হিন্দি সাংবাদিকতার ইতিহাসে পত্রিকাটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ❑

সূত্র নির্দেশ

১ হিন্দি পত্রকারিতাঃ রাজস্থানী আয়োজন কী কৃতী ভূমিকা—কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, দিল্লি, ১৯৯৯, পৃঃ ৫১

২ এই ব্যক্তি ছিলেন জাতিতে মাড়ওয়ারি। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বংশে জন্মলাভ করেও তিনি দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।

৩ কেডিয়ার জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য—
হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস—শ্যামসুন্দর শর্মা, বঙ্গীয় খণ্ড, বারাণসী, ১৯৯৮, পৃঃ ১৯৫
প্রকাশকনামা—কৃষ্ণচন্দ্র বেরী, বারাণসী, ২০০১, পৃঃ ৩৬৩, ৩৮৭

৪ দ্রষ্টব্য 'সরস্বতী', এলাহাবাদ, আগস্ট ১৯২৪; 'মাড়ওয়ারি অগ্রবাল', কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ সম্বত ১৯৮১; 'মাধুরী', লখনৌ, ৯ জুলাই ১৯২৪

৫ শিউপূজন রচনাবলী—শিউপূজন সহায়, ৪ ভাগ, পাটনা, ১৯৫৯, পৃঃ ১৪৩
পণ্ডিত অমৃতলাল চক্রবর্তী (১৮৬৩-১৯৩৬)ঃ এক অনন্য হিন্দি লেখক ও সাংবাদিক—সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইতিহাস অনুসন্ধান' ১৩-তে প্রকাশিত নিবন্ধ, পৃঃ ৩১৪

৬ সমাচারপত্রোঁ কা ইতিহাস—অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, বারাণসী, ১৯৫৩, পৃঃ ৩০৭

৭ এই সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে শ্রীসরস্বতী পুস্তকালয়, ফতেপুর শেখাবাটী, সীকর, রাজস্থান থেকে। এই পত্রিকাটি কলকাতা, হাওড়া, দিল্লি বা বারাণসীর কোন লাইব্রেরি বা অভিলেখাগারে অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি।

৮ 'শ্রীসনাতনধর্ম', কলকাতা, ১২ জুলাই ১৮২৪, অঙ্ক ১৮

৯ 'সরস্বতী', এলাহাবাদ, আগস্ট ১৯২৪

১০ 'মাড়ওয়ারি অগ্রবাল', কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, সম্বত ১৯৮১ অর্থাৎ ১৯২৪-এর এপ্রিল-মে মাস

১১ 'মাধুরী', লখনৌ, ৯ জুলাই ১৯২৪

১২ গান্ধীজী 'Young India'-তে বলেছেন, আমাদের বিরোধী, আমাদের শাসক অথবা তার সহযোগী—যেই হোক না কেন, তাদের কারো সঙ্গেই আমাদের বিরোধ থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হলো,

আমাদের কাজের দ্বারা তাদের মধ্যে সদ্বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব সঞ্চার করা। ('মহাত্মাজীকী সূচনা', 'শ্রীসনাতনধর্ম', কলকাতা, ১২ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ৪৭)

১৩ Modern India—Sumit Sarkar, 1885-1947, Madras, 1983, p. 227

১৪ 'শ্রীসনাতনধর্ম', ৭ জুন ১৯২৪, পৃঃ ১৬৮, সম্পাদকীয়—স্বরাজীকী নারাজী

১৫ ঐ, ৫ জুলাই ১৯২৪, পৃঃ ২৪৪, 'মহাত্মাজী অউর স্বরাজ্য দল'

১৬ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচী, ২য় সং, কলকাতা, ১৩৪২, পৃঃ ১৭০-১৭২

১৭ 'শ্রীসনাতনধর্ম', ২১ জুন ১৯২৪, বর্ষ ১, অঙ্ক ১৫, পৃঃ ২০৬, সম্পাদকীয়

১৮ India's Struggle for Independence—Bipan Chandra (Ed.), Delhi, 1989, p. 239. অর্ডিন্যান্সটির নাম ছিল 'Bengal Criminal Law Amendment Ordinance'।

১৯. 'শ্রীসনাতনধর্ম', ৮ নভেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪৭৪-৪৮৫, ৪৯১-৪৯৩

২০ ঐ, পৃঃ ৪৯২-৪৯৩, দিলকী বগাবত

২১ ঐ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪২৮-৪৩২

২২ ঐ, ২৫ অক্টোবর ১৯২৪, পৃঃ ৪৬০-৪৬১

২৩ ঐ, বর্ষ ১, অঙ্ক ২১, পৃঃ ৩০১, মহাত্মাজীকা চর্যা

২৪ ঐ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪৩৪, স্ত্রিয়োঁকে গুলাম

২৫ ঐ, ৫ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ২৮, খদ্দর অউর জননী জন্মভূমি

২৬ ঐ, পৃঃ ২৯, তাতা ঘরানা

২৭ ঐ, ১৯ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ৫৮, হরে দিনোঁকী দিহাত, দিহাত তবকী অউর অবকী, দিহাতেঁ কৈসে বিগড়ী

২৮ ঐ, ২৯ মার্চ ১৯২৪, পৃঃ ২১, অস্পৃশ্যতা

২৯ ঐ, ৫ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ২৯, ধর্মকা শুদ্ধরূপ

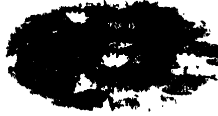
৩০ ঐ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৩৯৬, সম্পাদকীয়

৩১ ঐ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪২৬

৩২ গান্ধীজী 'হিন্দি নবজীবন' পত্রিকায় উক্ত বিষয়ে 'ভক্তিকে নামপর ভোগ' নামক নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানে তিনি মেয়েদের জীবিত কোন পুরুষকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন।
দ্রঃ 'ভারতমিত্র' : কলকাতার এক অবলুপ্ত হিন্দি পত্রিকা—সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৫, পৃঃ ৫৮৪

৩৩ হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস—শ্যামসুন্দর শর্মা, বঙ্গীয় খণ্ড, বারাণসী, ১৯৯৮, পৃঃ ১৯৫

৩৪ 'শ্রীসনাতনধর্ম', ১৬ আগস্ট ১৯২৪, পৃঃ ৩৩০



শব্দচেতনা ৪০

পুরাণভিত্তিক শব্দছক

১		২		৩		■	৪		
■	■		■		■	৫		■	■
৬			■	৭			■	■	৮
	■	■	৯	■	■	১০			
১১					■	■	■	■	
	■	■	■	■	১২	১৩			
১৪			১৫	■	■		■	■	
	■	■	১৬		১৭	■	১৮		
■	■	১৯		■		■		■	■
২০			■	২১					

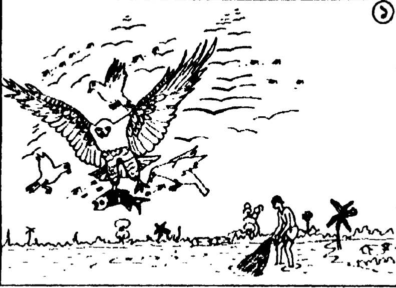
পাশাপাশি : (১) শিবপ্রিয়া কালী (৪) প্রদীপ বা প্রদীপের সলতে (৫) লক্ষ্মীর —— (৬) পূজার উপচারবিশেষ (৭) শিবের বাহন বৃষ (১০) স্তবমন্ত্রে দেবী জগদ্ধাত্রীকে এমনও বলা হয়েছে (১১) ললাটে চন্দ্র—এই অর্থে 'কালী' (১২) শিব (১৪) কালীপূজার রাত (১৬) সূর্যপুত্র (১৮) স্তবস্তুতি (১৯) দেবী দুর্গার এক অস্ত্র (২০) দুর্গা (২১) যার প্রথম রূপ 'কালী'।

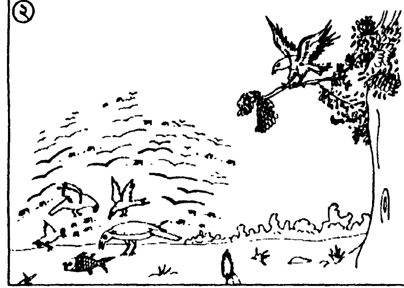
ওপর-নিচ : (১) শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে যে-দেবতা ভস্ম হন (৩) লক্ষ্মীপতি (৪) পঞ্চপল্লবের একটি (৫) 'এসেছে শরৎ হিমের ——' (৬) কার্তিক মাসে হিন্দুগৃহে প্রতি সন্ধ্যায় প্রজ্বলিত হয় (৮) মহাকালী (৯) বিষ্ণুর হাতে নিহত দৈত্য (১৩) দুর্গা (১৫) শিব বা বিষ্ণু (১৭) জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা (১৮) ইন্দ্র (১৯) সরস্বতী

স্নেহাশিষ কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

'কথামৃত' পরিচয় : ছবি ও ছন্দে





অবধূতের চিলগুরু

ঠাকুর বলেন, যত অশান্তি—বাসনাটি যদি থাকে,
ঐ বাসনাই মানুষকে ফেলে দৈব-দুর্বিপাকে।
মনেও তখন বহুরকমের ভাবনাচিন্তা জোটে,
শান্তি মেলে না মোটে।
এ নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বেশ সে এক কাহিনী মেলে,
যা শুনে বুঝবে, বাসনা জীবকে কোন্ পাকে দেয় ফেলে।

এক অবধূত, যাঁর গুরু পুরো চব্বিশ—গুনতিতে,
গুরু বলে তাঁকে এক চিলকেও হয়েছিল মেনে নিতে।
একজায়গায় মাছ ধরছিল জেলেরা কয়েকজন,
একটা সে চিল ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে করে পলায়ন।
ঠোঁটে মাছ নিয়ে চিলকে পালাতে দেখে আর কোথা যায়,
পিছু পিছু ধাওয়া করল কাকেরা হাজার খানেক প্রায়।
চিল বেচারা তো ঠোঁটে মাছ নিয়ে উড়ে উড়ে হয় সারা,
কা-কা-কা চিৎকার করে কাকেরাও করে তাড়া।
চিল দক্ষিণে ওড়ে তো কাকেরা সেদিকেই পিছে ওড়ে,
উত্তরে উড়ে গেলে কাকেরাও ঠিক পিছে পিছে ঘোরে।
পুবদিক থেকে চিল উড়ে যায় সোজা পশ্চিম পানে,
কাকেরাও ওড়ে, অতটা সহজে তারাই কি হার মানে?
অবশেষে চিল ব্যতিব্যস্ত, মাছটাও পড়ে যায়,
কাকেরা তখন চিলটাকে ছেড়ে মাছটার দিকে ধায়।
চিলটা তখন চিন্তামুক্ত, বন্ধ করল ওড়া,
গাছে বসে ভাবে, মাছটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া।
সেটা নাই আর কাছে,
বাঁচা গেল বাবা, অশান্তি নাই, বসে থাকি এই গাছে।

অবধূত এই চিলের কাছেই শিক্ষা পেলেন বেশ,
মাছরূপ এই বাসনা থাকলে নাই চিন্তার শেষ।
এই সত্যটি জেনে,
সেই অবধূত ঐ চিলটিকে গুরু বলে নেন মেনে।

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়
ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল



আদি শঙ্করাচার্য (৩৬)

চিরন্তনী

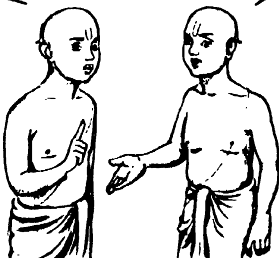
শিশু ও কিশোর বিভাগ



শিষ্যদের আকুল আর্তি দেখে আচার্য শঙ্কর বৈদ্যকে আনতে অনুমতি দিলেন।

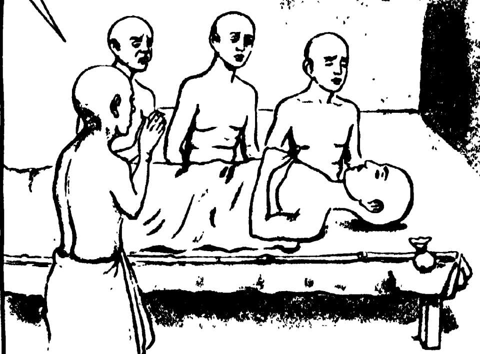


বৈদ্য ব্যর্থ হয়ে চলে গেলে অভিনব গুপ্ত তাঁর মন্ত্রশক্তির প্রভাব দেখে মনে মনে দারুণ আনন্দলাভ করল। কিন্তু আচার্যের শিষ্যরা গভীর বেদনায় মুহ্যমান হয়ে গেলেন। ঠিক এইসময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।



পদ্মপাদ তখন তাঁর অভীষ্ট দেবতা নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হলেন। ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনায় প্রসন্ন ভগবান স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে জানালেন, যে-ব্যক্তি মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করেছে, তার বিরুদ্ধে পালটা মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করলে আচার্যের রোগ সারবে, নয়তো মৃত্যু অনিবার্য। পদ্মপাদ সেকথা আচার্যকে জানালেন।





অতঃপর পদ্মপাদ পালটা মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করালেন। অভিনব গুপ্ত মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হলেন। দুপক্ষের মন্ত্রশক্তির মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হলো। শেষপর্যন্ত জয়ী হলেন পদ্মপাদ। অভিনব গুপ্তের শরীরে ভগন্দর রোগের আবির্ভাব হলো এবং আচার্য ক্রমশ সুস্থ হতে থাকলেন। অবশেষে অভিনব গুপ্তের মৃত্যু হলো। এঘটনায় কামাখ্যাবাসী তান্ত্রিকদের মনে ভয় হলো, তারা বুঝল—তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি নয়, অদ্বৈতবাদই তন্ত্রের লক্ষ্য।



চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু

স্মরণ

সৈয়দ মুজতবা আলীর চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ*

নিতাই নাগ

কিছু কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী আছেন যাঁরা চিরন্তন সত্য—উদার মানবতা ও তার উদ্গাতাদের প্রত্যক্ষ করেন, ব্যক্ত করেন সেই মহামানবতাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের মহান কর্মকৃতিত্বে মানবজাতি গৌরবান্বিত। এরকমই একজন হলেন সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। ১৯০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী তিথিতে অসমের করিমগঞ্জে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সিকান্দার আলী ছিলেন সরকারি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মচারী। পারিবারিক উদার আবহাওয়ায় তিনি পালিত হয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনে মৌলভীবাজারে ও সিলেটের সরকারি স্কুলে পড়াশুনার পর তিনি শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে একবার সিলেটে এসে 'আকাঙ্ক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শোনার পর কিশোর মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় ১৭ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। তখন সবেমাত্র 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এব্যাপারে পিতার কাছ থেকে কোন বাধা আসেনি। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ নিজে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং শেলী-কীটস ও 'বলাকা' কাব্য পড়াতেন। শান্তিনিকেতনে ৫ বছর পড়ার পর তিনি কিছুদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তবে এখানে পরিবেশ তাঁর ভাল লাগেনি। এরপর তিনি জার্মানির বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের বর্তমান ধর্মজীবন' সম্বন্ধে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি কর্মসূত্রে কাবুল বেতারকেন্দ্রে, ভারতে দিল্লি, কটক ও পাটনা রেডিওতে চাকরি গ্রহণ করেন। বরোদায় রাজ কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকরূপেও তিনি কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। শেষজীবনে বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষা ও পরে ইসলামী সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, উর্দু, আরবি, ফারসি, গুজরাটি, মারাঠি এবং বিদেশি ভাষার মধ্যে ফরাসি, জার্মানি, ইটালিয়ান ইত্যাদি প্রায় ১৫টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। কাবুল বেতারকেন্দ্রে চাকরি উপলক্ষ্যে সেখানে তিনি যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার ফসল হিসাবে ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হয়। বাঙলা সাহিত্যে এটি একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এই প্রথম গ্রন্থের দ্বারা তিনি বাঙালি পাঠকদের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। এরপর 'শবনম', 'শহর-ইয়ার', 'মুসাফির' ইত্যাদি উপন্যাস এবং 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'বড়বাবু' ইত্যাদি রম্যরচনার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রাখেন। তাঁর রচনার নিজস্ব শৈলী ছিল। বৈঠকী চালে দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে গভীর কথা সহজভাবে তিনি লিখতেন। তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্য থাকলেও তাতে পাণ্ডিত্যের ভার ছিল না; রসসাহিত্য বা রম্যরচনা লিখতে গিয়ে কৃত্রিমতাকে ঠাঁই না দিয়ে তিনি বাঙালির সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও তাঁর অন্তর ছিল ঈশ্বরবিশ্বাস ও কবিচিত্তের ভাবরসে সমৃদ্ধ। সাহিত্যিক সুহৃদ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ভাষায়ঃ "খাঁটি মুসলিম হিসাবে ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তারপরেই যে-ধর্মের শিক্ষার ওপর তাঁর অধিক আস্থা ছিল, তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের। এটা কথার কথা নয়, মুখোশ নয়। সে-পরিচয় বলতে গেলে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে আছে।" তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদারমনোভাবাপন্ন একজন খাঁটি মুসলমান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাল জানতেন বলে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ সব তাঁর পড়া ছিল। গীতার প্রতি তাঁর এরূপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' গ্রন্থখানি সর্বদা তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে রাখতেন। তিনি তিলকের 'গীতারহস্য' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছিলেনঃ "গীতার মতো ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের

* সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্মঃ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)-র জন্মশতবর্ষ স্মরণে।

সর্বমানুষকে সবসময়ই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পথপ্রদর্শক।"

মুজতবা আলী ছিলেন মধ্যযুগের সুফি সাধকদের প্রতি গভীর অনুরাগী। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার বিষয়ও ছিল ঐ সুফিদের ওপরে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালবেসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপরে; প্রধানত তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন সুফি সাধক পীরের বাণী। ১৯৪৪ সালে দাক্ষিণাত্যে বেড়াতে গিয়ে তিনি মহর্ষি রমণের সঙ্গলাভ করেন। উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও অন্তরে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। 'কথামৃত' ও ঠাকুরের জীবনী পাঠ করে বিচার-বিশ্লেষণ ও শ্রদ্ধার আলোয় দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেনঃ "এর (শ্রীরামকৃষ্ণের) মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রিস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির।... আমার মনে হয় উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছবিচার ছিল না।"

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের প্রভাবে দিশাহারা হিন্দুসমাজে ঠাকুরের আবির্ভাব হিন্দুধর্মের অভিভাবকরূপে স্বীকৃত হওয়ার মহান তাৎপর্য মুজতবা আলী উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে, ঠাকুর যেমন জনগণের ধর্ম (folk religion), ভাষা-আচার-ব্যবহার সবকিছু গ্রহণ করেছিলেন; তেমনি সাকারসাধনার পশ্চাতে বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব অপসারণ তথা নির্মূল করেছিলেন। আবার ঠাকুর ঈশ্বরের কথা বলতে বলতে যে বাহ্য তথা বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, তা বলা যায় না। তাঁর ধারণায়ঃ "পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, 'কলিকালে মানুষের অন্নগত প্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ ইংরেজ শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাতে হাতে বুঝতে পেরেছে, অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে, অন্য কোন চিন্তার স্থান তার মস্তকে নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের রূপ তিনি বিস্মৃত হননি। তাই তিনি উল্লেখ করেছিলেনঃ "পরমহংসদেব বেদোক্ত পন্থাই বরণ করেছিলেন। অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্পন্ন পন্থা বরণ করেছিলেন।... এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্মসমন্বয় করতে পেরেছিলেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষে অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সবকিছুর অবহেলা করেননি।... সত্য সর্বত্র বিরাজমান—ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি।"

আবার ঠাকুরকে তিনি বরণ করেছিলেন গীতার আঙ্গিকে এবং সেই সূত্রে বলেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। একথা স্বীকার করেও যদি দম্ভ ভরে কিছু বলি তবে বলব, যে-সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনিই সমগ্র পুরুষ—পরমপুরুষ। কোন মহাপুরুষকে যদি দম্ভ ভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করব। তার কারণ, গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এই তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।" পণ্ডিত রতন জানকরের সুরে মুজতবা আলী রচিত একটি গানে তাঁর মরমি মনের ভাব ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে—"কীই বা হতো তোমার রাজা/ একটু মোরে দিলে/ কীই বা ক্ষতি হতো কাহার/ বিরাট এ নিখিলে/ তোমার বিশ্ব বসুন্ধরা/ অনন্ত বৈভবে ভরা/ কণাটুকু যেত না তো/ করুণা বর্ষিলে।"

ঈশ্বরবিশ্বাসের আলোয় তিনি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে বুদ্ধিকে সবকিছু দেখার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে দেখেননি। যথার্থ ভক্ত ও জ্ঞানীর মতো মুজতবা আলী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে চরম কথাটি বলেছেন, তা তাঁর প্রকৃত ঈশ্বরবিশ্বাসী নম্রহৃদয়ের পরিচয় বহন করে—"পরমহংসদেবকে সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমার মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধুসন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের ওপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই।" ❑

তথ্যসূত্র

১ সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম খণ্ড)—গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, ১৩৮৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৯০

২ 'উদ্বোধন' : শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন-এর অন্তর্ভুক্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব'—সৈয়দ মুজতবা আলী, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৫৭

এই রচনাটি 'রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ক্রীড়াজগৎ

অলিম্পিজমের জয়, জয় গ্রিসেরও

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

"এই অলিম্পিয়াড কেবল স্বপ্নেই ভাবা ও করা সম্ভব। ২৮তম অলিম্পিয়াড বিষয়-বৈচিত্র্য, নান্দনিকতা, সাংগঠনিক কুশলতা, সর্বোপরি মানবাত্মার জয়গানে এক ইতিহাস হয়ে থাকবে।" আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি জ্যাকুয়িস রগের এই প্রতিক্রিয়া আক্ষরিক অর্থেই সত্য। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন এই অলিম্পিকের প্রধান সংগঠক গিয়ানা অ্যাঞ্জেলোপৌলস। গোটা অলিম্পিক সংসারের পক্ষ থেকে জ্যাকুয়িস রগ তাঁর গলায় অলিভ পাতা-শোভিত অলিম্পিক হার পরিয়ে দিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলিম্পিক আয়োজনের কৃতিত্বস্বরূপ। আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কোফি আন্নান জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব একযোগে যদি অলিম্পিক অয়োজন করে, তাও বোধ হয় এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি ইভেন্ট হয়েছে ঘড়ি ধরে। সংগঠন কমিটির কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দেখিয়ে দিয়েছেন দেশাত্মবোধ কাকে বলে। ছোট দেশ গ্রিস 'গ্রেটেস্ট শো অ্যাণ্ড ফেস্টিভাল অন ইউনিভার্স' আয়োজন করতে পারবে কিনা, তা নিয়ে একসময় সন্দিহান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ একাধিক শক্তিশালী দেশ। কিন্তু অলিম্পিকের জন্মদাতা রাষ্ট্র সর্বোত্তম গেমস আয়োজন করে আমেরিকা-সহ গোটা বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, অলিম্পিক কেবল নিছকই এক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসবমঞ্চ নয়, এ হলো ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সভ্যতার শাশ্বত ব্যঞ্জনার অভিপ্রকাশ।

গ্রিস তার আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে ৬টি সোনা-সহ ১৬টি পদক জিতে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেছে। অন্যদিকে চিন ৩২টি সোনা-সহ ৬৩টি পদক জিতে চমকে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য যতটা সহজ হবে ভাবা গিয়েছিল তার উলটোটাই হয়েছে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার যথারীতি শীর্ষে অবস্থান করেছে ৩৫টি সোনা-সহ ১০৩টি পদক জিতে। চতুর্থ স্থানে রাশিয়া, তার পরের ধাপে বিস্ময়কর অগ্রগতির সাক্ষ্যবহনকারী অস্ট্রেলিয়া। তবে মহাদেশীয় দৃষ্টিকোণে দেখলে এবারের অলিম্পিকে এশিয়ার উত্থান ও দাপট পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যমকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। তা এতটাই যে, গোটা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের তরফে হাজির একুশ হাজার প্রতিনিধির মুখপাত্র হয়ে স্বয়ং আই.ও.সি.-র সভাপতি জ্যাক রগ বলেই ফেলেছেন: "২০০৪-এ আমরা দেখলাম 'এথেন্স এশিয়ান গেমস'।" আই.ও.সি.-র পর্যবেক্ষকদের ধারণা, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো ক্রীড়া-শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 'ভিশন এশিয়া', 'মিশন অলিম্পিক'।

এথেন্সে ৩৩টি ইভেন্টের প্রতিটি বিভাগেই তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। জলে, বিশেষ করে সাঁতারে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যে থাবা বসিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, জাপান, এমনকি ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আপাত পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রও। বহুচর্চিত 'রেস অফ দ্য সেঞ্চুরি' বেশ উপভোগ্য হয়েছে মার্কিনি মাইকেল ফেল্পস ও অস্ট্রেলিয়ান ইয়ান থর্পের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রে। ফেল্পস ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগ মিলিয়ে ৮টি পদক জিতে কিংবদন্তি রুশ জিমন্যাস্ট আলেকজাণ্ডার দিতানিনের দুর্লঙ্ঘ্য নজির স্পর্শ করেছেন। তবে মার্ক স্পিৎজের ৭টি সোনা জয়ের কীর্তি তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। জলের দ্রুততম মানব-মানবীর স্বীকৃতি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারি হল ও ডাচকন্যা ইঙ্গে দ্য ব্রুইন। ডাইভিংয়ে অবশ্য চিনের জিম্মায় গেছে অধিকাংশ স্বর্ণপদক। আর ওয়াটার পোলোর পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাঙ্গেরি ও ইতালি। হাঙ্গেরি এবার নিয়ে ৮বার অলিম্পিক সোনা জিতল।

ট্রাক অ্যাণ্ড ফিল্ডে চমক জাগিয়ে উঠে এসেছে চিন। গোটা এশিয়ার পক্ষেই চিনের এই সাফল্য এক সুদূরপ্রসারী প্রেক্ষিত তৈরি করবে। মহিলাদের ১০,০০০ মিটারে জিং হুইনা ও পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলসে লিউ জিয়াং এশিয়ার মুক্তি সূর্যের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করবেন চিরকাল। এবার ট্রাকে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আলজিরিয়ার হিচাম গুইরোউজ ও ব্রিটেনের কেলি হোমস। দুজনেই জোড়া সোনা জিতে ডাবল করেছেন। কেনিয়ার কেনসাকি বিকোলে থামিয়ে দিয়েছেন দূরপাল্লার দৌড়ে ইথিওপিয়ার গেব্রাসেলিসির একাধিপত্য। তাঁর মতোই ব্যর্থ হয়েছেন মেগাতারকা রানার কিপতেকার, তিনবারের সোনাজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার চেকতারকা জ্যান জেলেনি, ব্রিটিশ মহিলা ম্যারাথনার পলা র‍্যাডক্লিফ, মোজাম্বিকের মারিয়া মুতোলা-সহ অনেক প্রখ্যাত তারকাই। মার্কিন স্প্রিণ্টার মরিস গ্রিনকেও এই তালিকায় রাখা যায়। স্বদেশীয় জাস্টিন গ্যাটলিন সোনা জিতে পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ হয়ে বিজয়ীর মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর স্বঘোষিত 'গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম' গ্রিনের ভাগ্যে জুটেছে ব্রোঞ্জ। গ্যাটলিনের মতোই বিস্ময় উদ্রেক করেছেন মেয়েদের দ্রুততমা বেলারুশের ইলিয়া নেসতেরেঙ্কো।

ডেকাথলনে চেক প্রজাতন্ত্রের রোমান সিব্রোল ও সুইডেনের হেপ্টাথলিট ক্যারোলিনা ক্রয়েস্ট সেরা অলরাউণ্ড অ্যাথলিটের মুকুট নিয়ে দেশে ফিরেছেন। ম্যারাথনে দুক্ষেত্রে সহজেই সোনা জিতেছেন যথাক্রমে ইতালির স্তেফানো বালদিনি ও জাপানের মিজুকি নগুচি। ব্রাজিলের ডি-লিমা মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সোনা হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেলেও আই.ও.সি. তাঁকে অলিম্পিকের চিরন্তন ঐতিহ্য মেনে দৌড় শেষ করার জন্য 'ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন' পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে। পুরুষদের ট্রায়াথলনের তিনটি ক্ষেত্রে (সাঁতার, সাইক্লিং, রানিং) শুরু থেকেই নিজের

অগ্রগমন ধরে রেখে সোনা তুলে নিয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের হ্যমিস কার্টার। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সোনা পেয়েছেন অস্ট্রিয়ার (অস্ট্রেলিয়াজাত) কেট অ্যালেন। আর প্রাচীন ও আধুনিক অলিম্পিকের যোগসূত্র পেন্টাথলনে (সাঁতার, ফেন্সিং, শুটিং, রানিং ও অশ্বারোহণ) দুই ক্ষেত্রে সোনা জিতেছেন যথাক্রমে রাশিয়ার আন্দ্রে মোয়েসেভ ও হাঙ্গেরির সুজান হোরোস।

বক্সিঙে যথারীতি দেখা গেছে কিউবার দাপট। ১২টির মধ্যে ৫টি ক্যাটাগরিতে সোনা গেছে কিউবানদের ঝুলিতে। তাঁরা কুস্তিতেও জিতেছেন একটি সোনা, যা ছিল চিন্তার অতীত। কুস্তিতে অবশ্য সেরা চমক মিশরের কারাম ইব্রাহিম, যিনি হেভিওয়েটে সোনা জিতেছেন। সুপার হেভিওয়েটে জিতেছেন উজবেক পালোয়ান আর্তুর তাইমাহভ। অপর পাওয়ার ইভেন্ট ভারোত্তোলনেও দেখা গেছে চমক। ইরানের হুসেন আলি রেজাজাদে সুপার হেভিওয়েটে সোনা জিতেছেন। এই ইভেন্টের অন্যান্য বিভাগে অবশ্য প্রত্যাশামতোই ফল হয়েছে। জুডোতে জাপানের আধিপত্যের পাশাপাশি ফেন্সিঙে ইউরোপের দাপটও অব্যাহত ছিল। মার্শাল আর্ট তাইকোণ্ডোর ক্ষেত্রে চিন, কোরিয়া, তাইওয়ানের প্রতিযোগীদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন মধ্য ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

কোর্টক্রাফ্ট খেলাগুলির মধ্যে টেবল টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন —দুটি খেলাতেই পুরুষ সিঙ্গলসের খেতাব চিনের হাতছাড়া হয়েছে। আর টেনিসে বিশ্বতারকাদের পরিবর্তে চিলির অখ্যাত নিকোলাস মাসুকে সোনা জিততে দেখে দ্বিধাবিভক্ত টেনিসপ্রেমীরা। মাসু শুধু সিঙ্গলসের সোনাই জেতেননি, সঙ্গী ফ্রান্সেসকো গঞ্জালেসকে নিয়ে তুলে নিয়েছেন ডাবলসের সোনাটিও। অ্যাণ্ডি রডিক, রজার ফেদেরার, লেটন হিউইট, গুস্তাফো কুয়ের্তেন, মারাত সাফিন-সহ সার্কিটের রথী-মহারথীরা আগেই বিদায় নেওয়ায় অবশ্য মাসুর কাজটি আপাতসহজ হয়ে যায়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশমতোই সোনা জিতেছেন বেলজিয়াম তারকা জাস্টিন হেনা হার্দিন। রুশ ললনাদের দাপট তিনি চমৎকার শিল্পমণ্ডিত টেনিসে থামিয়ে দেন। মহিলাদের ডাবলসে চিনের জুটি লি টিং ও সান টিয়াং সোনা জিতেছেন। ভারতের বিশ্বখ্যাত ডাবলস জুটি লিয়েণ্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি শুরুটা দারুণ করে সেমিফাইনালে উঠেও চূড়ান্ত মুহূর্তে হতাশা ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি।

শুটিং, তিরন্দাজির মতো যোগনিবিষ্ট খেলাগুলিতেও দেখা গেছে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গেমসের প্রথম সোনাটি চিনের মহিলা শুটার লি ডিউং পেলেও পরবর্তী পর্বে শুটিঙের প্রতিটি পরীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়েছে দর্শকেরা। এশিয়া, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রতিটি পর্বে যে লড়াই হয়েছে তা বহুদিন মনে রাখবে গ্রিসবাসী। ভারতের রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর ট্রাপ শুটিঙে রুপো জিতে নর্মান প্রিচার্ডের শতাধিক বছর আগের নজির স্পর্শ করেছেন। আর অঞ্জলি ভাগবৎ, অভিনব বিন্দ্রা তাঁদের ওপর অর্পিত আস্থার প্রতিফলন দিতে ব্যর্থ যথারীতি। তিরন্দাজিতে কোরিয়ার একাধিপত্যের দিন যে শেষ তা বুঝিয়ে দিয়েছে ফ্রান্স, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকের তুঙ্গস্পর্শী চাপ নিতে না পারায় পদকের দোরগোড়ায় যেতে পারেননি ভারতের সত্যদেব প্রসাদ ও মহিলা টিম।

বল গেমে দেখা গেছে শতাব্দীর বৃহত্তম অঘটন। 'ড্রিম টিম' মার্কিন বাস্কেটবল দল সেমিফাইনালেই আটকে যায় আর্জেন্টিনার কাছে। এছাড়াও 'ড্রিম টিম' হেরেছে পুয়ের্তোরিকো ও লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত অবশ্য আর্জেন্টিনাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে মার্কিন মহিলারা অবশ্য দেশকে গর্বিত করেছেন প্রত্যাশা অনুযায়ী সোনা জিতে। ভলিবলে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সোনা জিতেছে ব্রাজিল ও চিন—হ্যাণ্ডবলের ক্ষেত্রে যা গিয়েছে ক্রোয়েশিয়া ও ডেনমার্কের জিম্মায়। ফুটবলে আর্জেন্টিনা প্রত্যাশা পূরণ করেছে যথারীতি লাতিন ঘরানার উৎকর্ষ দেখিয়ে। কার্লোস তেভেজ মারাদোনার উত্তরসূরি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেয়েদের সোনাটি যুক্তরাষ্ট্র জিতলেও ব্রাজিলের ছন্দোময় ফুটবল মন জয় করে নিয়েছে সারা বিশ্বের। আর হকিতে তাঁদের দীর্ঘদিনের সাধনা ও আজন্মলালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া। শেষপর্যন্ত তারা গাঁটমুক্ত হয়ে সোনাটি ঘরে নিয়ে যেতে পেরেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও জার্মানি প্রথম সোনা জিতে দেশবাসীকে আনন্দ দিয়েছে। দুক্ষেত্রেই হল্যাণ্ডের হার হকির ভবিষ্যতের পক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আর নয়বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত প্রচারের ফানুসকে হাওয়ায় ভাসিয়ে, দেশবাসীকে দিবাস্বপ্ন দেখিয়ে এথেন্সে গিয়ে যথারীতি সপ্তম! ভারতের মতো অবস্থা হয়েছে পাকিস্তানেরও। এশিয়ার নিজস্ব খেলা হকির কোন প্রতিনিধিকেই দেখা যায়নি শেষ চারে।

এবার অলিম্পিকে কোন পদক না পেলেও বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ তাঁদের জীবনজয়ী উপস্থিতি দিয়েই গোটা বিশ্বের প্রচারমাধ্যমের নজর টেনে নিয়েছেন। মার্লিন ওটে, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, জোয়ান উডওয়ার্ড, রবার্ট পিভটরা প্রমাণ করে দিয়েছেন জেদ, অধ্যবসায়, পরিশ্রমক্ষমতা ও দুচোখ-ভরা স্বপ্ন থাকলে যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। পিভট ও উডওয়ার্ড (শুটিং ও ইকোয়েস্ট্রিয়ান) সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী হিসাবে এথেন্সে এসেছিলেন। এথেন্সে সত্তরোর্ধ্ব পিভটের পাশে মালয়েশিয়ার বারো বছরের ডাইভার জেরিমি নিক্সনের উপস্থিতি অলিম্পিকের চিরন্তন সত্যকেই তুলে ধরেছে। দুই শতাধিক দেশের সাড়ে ছাব্বিশ হাজার ক্রীড়া, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-সহ আবিশ্ব সংবাদমাধ্যমের একুশ হাজার সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনার জন্য আরো কয়েক হাজার রেফারি, আম্পায়ার, অ্যাডজুডিকেটর বা জুরিকে নিয়ে সংগঠিত 'গ্রেটেস্ট শো অ্যাণ্ড ফেস্টিভাল' সব দিক থেকেই এক কালজয়ী অলিম্পিয়াড হিসাবে পরিগণিত হবে। ❑

বিজ্ঞান-সংবাদ

জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ

বছর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদের ঘটনার (বিমানের ধাক্কায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ হওয়া) স্মৃতিতর্পণ যেন সারা বিশ্বে, বিশেষ করে আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদ আরো ছড়াচ্ছে বলেই মনে হয়। এবং সেদেশে ইচ্ছাকৃতভাবে জীবাণু সংক্রমণ করানোর সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। আমেরিকায় কয়েকজনের শরীরে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু সংক্রমণ ও ডাকযোগে ঐ জীবাণু পাঠিয়ে রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার দুশ্চেষ্টা ধরা পড়ায় ঐ সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যেকোন দেশে মহামারী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিভাবে রোগটিকে চেনা যাবে, কিভাবে রোগের কারণ অনুসন্ধান করা হবে এবং মহামারী দেখা দিলে কি করণীয় তা সব দেশের ঠিক করে রাখা উচিত।

পটভূমিকা ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের ঘটনা বাদ দিলেও গত কুড়ি বছরেই তিনটি ক্ষেত্রে যুদ্ধতে জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া নথিভুক্ত হয়েছে। প্রথমটি আমেরিকার ওরিগনে ১৯৮৪ সালে ইচ্ছাকৃতভাবে স্যালমোনেলা (Salmonella) জীবাণু (যা আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে হাজার হাজার লোক অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু কারো মৃত্যু হয়নি। অন্য দুটি ঘটনা ঘটেছিল জাপানে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে, যাতে কুড়ি জনের কম মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও বড় রকমের জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত ও সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেনি, তবু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে, স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে তারা যেন তাদের তত্ত্বাবধান বিভাগকে এমনভাবে তৈরি করে রাখে যে, হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সেই রোগের কারণ নির্ণয় এবং সেই কারণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন (confirm) করতে ও তার প্রতিরোধ (intervention) করতে পারে। পর্যটন ও বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে যেকোন স্থানীয় মড়ক আন্তর্জাতিক ভীতির কারণ হয়েছে। তাছাড়া জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি হচ্ছে এবং বংশগতি সংক্রান্ত গবেষণার অপব্যবহারের ফলে আরো সাঙ্ঘাতিক ধরনের জৈব মারণাস্ত্র তৈরি হতে পারে এবং নতুন নতুন সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভীতি বাড়লেও মনে রাখতে হবে, এধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে কমই। কেন কম, তার কারণ—এরূপ সন্ত্রাস ঘটানোর জন্য জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় করা, তৈরি করা ও তাদের অস্ত্র হিসাবে মান বজায় রাখা বেশ কঠিন ব্যাপার এবং এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। জীবাণু জীবন্ত প্রাণী বলে এদের নাড়াচাড়া করতে বিশেষ কৌশল দরকার, যাতে তারা রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা বজায় রাখে। বহু লোকের জন্য পানীয় জল ও খাদ্যকে দূষিত করতে এগুলির পরিমাণ প্রচুর হতে হবে। বহুল পরিমাণে ক্ষতিসাধন করতে হলে পানীয় জলে জীবাণু মেশাতে হবে বা বাষ্পাকারে (aerosol) ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, এই ধরনের কাজে ঠিক ঠিক যন্ত্রপাতি ও অনুকূল আবহাওয়া দরকার। এইসব সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য জীবাণু বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমই।

কোন্ কোন্ জীবাণু বা রাসায়নিক দ্রব্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ জনস্বাস্থ্য বিভাগ যাতে তৈরি থাকতে পারে তার জন্য বেশ কয়েকটি জীবাণুকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এগুলি হলো অ্যানথ্রাসিস জীবাণু (Bacillus anthracis), প্লেগ জীবাণু (Yersinia pestis), ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিজম (Clostrium botulism) প্রভৃতি। ১৯৭১ সাল থেকে আমেরিকায় গুটিবসন্ত হয়নি। (দ্রঃ 'বিনাশের পথে বসন্তরোগের জীবাণু', 'উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪০৬, পৃঃ ৫৬৯-৫৭২) দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। অ্যানথ্রাক্স একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় না, কিন্তু গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিলে তা সংক্রমণ ঘটায়। বর্তমানে এর বিরুদ্ধে ভাল টিকাও তৈরি হয়নি। এখন বেশির ভাগ লোকের শরীরে গুটিবসন্তের প্রতিরোধক শক্তিও নেই বলে এই রোগ আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে যেতে পারে। এমনকি টিকা তৈরিতে অভিজ্ঞ লোক পেতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। বর্তমানে ঠিক হয়েছে, আমেরিকায় আবার দু-তিন জায়গায় গুটিবসন্তের টিকা তৈরি হবে। [দ্রঃ **Epidemiological Bulletin, Pan American Health Organisation, Sept. 2001, pp. 1-4**] ❑

সঙ্কলন ও ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩৮

পাশাপাশি ঃ (১) বলরাম, (৫) বালি, (৬) মনসিজ, (৭) সরমা, (৯) শশধর, (১০) বগলা, (১১) তারক, (১৪) সতীশ, (১৬) কর্দম, (১৭) বলন্ধরা, (১৯) শবর, (২১) সহদেব, (২৩) জয়, (২৪) সনাতন।

ওপর-নিচ ঃ (১) বলি, (২) মকর, (৩) যম, (৪) ব্রজদুলাল, (৫) বাগীশ, (৭) সরস্বতী, (৮) মান্ধাতা, (১০) বক, (১২) রঘুবর, (১৩) পাকশাসন, (১৪) সম, (১৫) শচীশ, (১৮) রাধেয়, (২০) বৎস, (২২) বসু, (২৩) জন।

সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

পিনাকীকিঙ্কর নন্দী

ব্রহ্মসূত্রের মর্মানুধ্যানে এক নান্দনিক প্রয়াস

অমলেন্দু

বেদ-বেদান্ত (পূর্ব খণ্ড) ব্রহ্মসূত্র • লেখক : ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী • প্রকাশক : শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ভি. আই. পি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ • মূল্য : ৮০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮+২৭৬ • প্রকাশকাল : ১৯৯৬

সংস্কৃতিসৌধের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক হিন্দুই বিশ্বাস করে, বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখনিঃসৃত বাণী নয়, বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। বেদ প্রধানত দুভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বিভিন্ন যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু হলো ব্রহ্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানকাণ্ডেরই অপর নাম 'বেদান্ত'। বেদান্ত বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ এবং বেদ-প্রতিপাদ্য সত্যের নির্যাস। এককথায় বেদই সমগ্র হিন্দুজাতির বহু শতাব্দীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রামাণ্য দলিল।

চার্বাক, বৌদ্ধ এবং অপরাপর বেদ-বিরোধী সম্প্রদায় কর্তৃক ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় বাধ্য হয়ে নৈষ্ঠিক প্রাচীনপন্থিগণ নিজেদের দার্শনিক চিন্তাকে এমন একটি দৃঢ় যুক্তির বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, তা অপরের দ্বারা অখণ্ডনীয় হয়ে ওঠে। এইপ্রকার দার্শনিক চিন্তা থেকেই ৬টি আস্তিক হিন্দুদর্শনের উৎপত্তি হয়। আস্তিক দার্শনিকরা বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও তাঁরা সকলেই বেদকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতেন—এমন কথা বলা যায় না। ৬টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে শেষের ২টি (পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত) বেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এভাবে ভারতে শতাব্দীব্যাপী নানা দার্শনিক চিন্তার প্রসার হয়েছিল। অবিন্যস্ত এসকল দার্শনিক চিন্তাকে সংহত এবং বিন্যস্ত করার বিশেষ প্রয়োজনবোধেই 'সূত্র' শাস্ত্রের উৎপত্তি। সূত্র একপ্রকার সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ত শব্দরাশি, যার অর্থ সন্ধানলাভের সহায়ক। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে মধ্বাচার্য পদ্মপুরাণ সূত্রের যে-সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, তার সরলার্থ হলো ঃ সূত্র-শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন—সূত্র সংক্ষিপ্ত এবং দ্ব্যর্থহীন, আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ দ্যোতক অথচ সকল প্রশ্নের প্ররোচক, পুনরুক্তিবর্জিত এবং ত্রুটিহীন। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সূত্রকে সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা থেকেই সূত্রশাস্ত্রের অধিকাংশ প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষত বেদান্তসূত্র সম্পর্কে এই দুর্বোধ্যতা খুবই প্রকট, যার ফলে বেদান্তের বহু শাখার (মতবাদের) উৎপত্তি হয়েছে।

উপনিষদ্গুলিতে আমরা দেখতে পাই পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের অভাব। আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবই দৃষ্ট হয়। তাই উপনিষদ্গুলির মধ্যে নিহিত চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের সঙ্কলক বাদরায়ণ এই দুরূহ কাজে উদ্যোগী হন। অবশ্য জৈমিনি, বাদবি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি বহু নামের উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়। প্রচলিত কাহিনী মতে, গীতা এবং মহাভারতের গ্রন্থকার ব্যাসদেবকেই 'বাদরায়ণ' বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে ব্যাসকে মহাভারতের এবং বাদরায়ণকে ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের অনুগামী বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং আরো অনেকে ব্যাস ও বাদরায়ণকে এক ব্যক্তি বলে মনে করলেও রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণ সূত্রগ্রন্থকে ব্যাসদেবেরই রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও মনে করতেন, বাদরায়ণ বা এইজাতীয় নামগুলি বিভিন্ন দার্শনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন স্থান বা কোন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন উপাধিমাত্র।

পণ্ডিতপ্রবর ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর **বেদ-বেদান্ত (পূর্ব খণ্ড) ব্রহ্মসূত্র** গ্রন্থে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রের একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেদান্তজ্ঞানের অভিলাষী ব্যক্তিদের মানসলোকে এক উজ্জ্বল বার্তা বহন করে এনেছেন। সাধারণ পাঠক ব্রহ্মসূত্র স্পর্শ করতে ভয় পায়। কেননা এর মধ্যে রয়েছে অগাধ দুর্গম দার্শনিকতার অতল রহস্য। কোন জীব তার সীমিত ও খণ্ড বুদ্ধি দিয়ে ব্যাস-সূত্র জানতে পারে না। সূত্রকার স্বয়ং যদি ব্যাখ্যা করেন, তবেই তা বোধগম্য হয়। তাই ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র ভাষ্য। অতএব ব্যাস-সূত্র বুঝতে হবে ভাগবতের আলোকে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রে চারটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শঙ্কর প্রমুখ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ, শম, দম ও মুমুক্ষুত্ব—এইসকল গুণ থাকলেই ব্রহ্ম বিচারে অধিকার জন্মে। কিন্তু বৈষ্ণবপন্থীরা একথা মানেন না। তাঁদের মতে, সকল কর্ম ও কর্মফলের অনিত্যতার জ্ঞানের জন্য কর্মমীমাংসা শাস্ত্রপাঠ; অতঃপর ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ তিন আশ্রম অতিক্রম করতে হবে। নিছক শাস্ত্রপাঠ জ্ঞান নয়। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঐ জ্ঞানকে পরিপক্ব হতে হবে। পণ্ডিতপ্রবর কালিদাসের কথায় ঃ

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

অর্থাৎ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি। অতঃপর চতুর্থাশ্রমে সংসার ত্যাগ করে প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়ে ব্রহ্মচিন্তা করণীয়। তবে এই ব্রহ্মচিন্তা ও আত্মচিন্তা মূলত সমগোত্রীয়। ঋষিরা বলেন ঃ "আত্মানং বিদ্ধি।" আমি যখন জানি আমি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অংশ—যখন পূর্ণভাবে জানি, তখন সৎ সত্তার সঙ্গে চিৎ সত্তা একাকার হয়ে যায়—তখন আমি পূর্ণ আনন্দস্বরূপে বিরাজ করি। সুতরাং সৎ ও চিৎ-এর মিলনভূমিই আনন্দ। ব্রহ্ম আনন্দঘন কেন? কারণ, তিনি আপনার সমগ্র অনন্ত সত্তাকে পূর্ণভাবে জানেন। এই পরমতত্ত্বটির সন্ধান আমরা বেদমন্ত্র ও বেদান্তসূত্রে পেয়েছি।

'বেদ-বেদান্ত' গ্রন্থের দ্বিতীয় পাদে ছান্দোগ্য, মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদত্রয় থেকে উদ্ধৃতি সহকারে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, পরমাত্মা সর্বব্যাপী। যখন পরিমিত মূর্তিতে ব্যক্ত হন, তখনো তিনি সর্বব্যাপী। পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তিমত্তা আছে বলেই সর্বপ্রকার বিরোধ সম্ভব হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আলোচনার

সারাংশ হলো ঃ একমাত্র ব্রহ্মই সত্তাবান। তাঁর সত্তা থেকেই নিখিল বিশ্বের সত্তা।

গ্রন্থটির অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে আমরা বেদ-বেদান্ত ভাবনার মুখ্য সম্পদটির পরিচয় পাই। যে-ব্যক্তি চরম জ্ঞানের অধিকারী হন, তিনি পরম অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সকল দ্বৈত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরিশেষে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদের প্রামাণ্যকে (বিধানগুলিকে) প্রশ্নাতীতভাবেই মেনে নিতে হয়। কারণ, যেপর্যন্ত সেই পরমব্রহ্মের জ্ঞানলাভ না হয়, সেপর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। শুধু ব্রহ্মানুভূতির পরই শাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। তার পূর্ব পর্যন্ত—"কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্র (শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি) তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাত হয়ে কর্মাধিকারে নিযুক্ত থেকে কর্মের অনুষ্ঠান কর।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬।২৪) কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন—"যে-জ্ঞানী ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁর নিকট সকল বেদের প্রয়োজন ততটুকু, মহাপ্লাবনের সময় ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন যতটুকু মাত্র থাকে।" (ঐ, ২।৪৬) শুধু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটই শাস্ত্রাদির প্রয়োজন নেই—অন্যের নিকট নয়।

গ্রন্থটির পরিশিষ্ট পর্বে প্রতিটি অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা এবং বেদান্ত সাহিত্যের আচার্যগণ ও তাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়াতে গবেষণা-মনস্ক ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ধ্যানলব্ধ ব্যাখ্যানস্বরূপ এই গ্রন্থটি যথার্থই সংগ্রহযোগ্য। ❑

বিবেকানন্দ-পথে পরিব্রাজক এক শিক্ষাব্রতী

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ আচার্য সুধাংশুশেখর ● সম্পাদনা: শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ব্রজমোহন মজুমদার, বিমলকুমার ঘোষ, নারায়ণচন্দ্র সাউ ● প্রকাশক ঃ ব্রজমোহন মজুমদার, প্রধান শিক্ষক, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৭১১১০৪ ● মূল্য ঃ ১০০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৩১৬ ● প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৮

"কিন্তু একটা ছবি তো মন থেকে মুছবার নয়—গায়ে সাদা খদ্দরের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি, পরনে মোটা খদ্দরের কাপড়, পায়ে অ্যালবার্ট জুতো, মাথায় ছাতা। তিনি চলেছেন বাড়ি থেকে স্কুলের পথে। সেখানে ছাত্ররা আছে—তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে।"—হেডমাস্টারমশায় আচার্য সুধাংশুশেখর এক প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিচারণে ঠিক এইভাবেই চিত্রায়িত হয়েছেন।

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের এক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক ছিলেন সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন জাতীয় শিক্ষকও। তিনি যেসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত শিক্ষাব্রতের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগের মহাসন্ধিক্ষণ। অতএব বিবেকবাণীর সার্থক রূপকারের জীবনালেখ্য **'বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ আচার্য সুধাংশুশেখর'** সত্যিই ছাত্র-শিক্ষকের সেতুবন্দি গ্রন্থ। তাই এই আলোচনা সেই বিবেকপদে অর্পিত জীবনকে পাঠকের সসীম দৃষ্টির পরিধিতে আনার প্রয়াসমাত্র।

আলোচ্য দুর্লভ সঙ্কলনটিকে বর্তমান যুগের শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের নিরিখে বিচার করা যাক। বর্তমানে ছাত্রদরদি শিক্ষকসমাজ বিলুপ্তপ্রায়, একই সঙ্গে শিক্ষকপ্রেমী ছাত্রসমাজও বিগতপ্রায়। তার কারণ অনেক। এদেশে নানা কারণে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত 'man-making education'-এর প্রসার এবং 'Head, Hand and Heart'-এর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হতে পারেনি। এবং এব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দ সম্যক অবহিত নন—একথা অসত্য নয়। আমাদের জাতীয় শিক্ষা ইতিহাসচেতনা এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেনি। আমাদের শিক্ষায় (ব্রিটিশ প্রবর্তিত ধারা অনুযায়ী) কোনভাবে অনুরণিত হয়নি যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার অন্তরে নিহিত পূর্ণ স্বরূপকে (ব্রহ্ম) প্রসুপ্ত সিংহের নিদ্রাজাগরণের মতো জাগ্রত করতে সক্ষম। বরং ঠিক তার বিপরীত ছবিই দেখা গেছে, যথা—ছাত্রদের চরিত্রে উপেক্ষা, সংযমের অভাব, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-বিলাসের প্রসারণ, স্বদেশের প্রতি অশ্রদ্ধা-অভক্তি, পেটের দায়ে স্বাধীন চিন্তার বলিদান, বিদেশের দুয়ারে 'ভিক্ষাং দেহি' গীতি, জাতির ভগ্ন মেরুদণ্ড এবং বলে, সংযমে, ধর্মে দুর্বল এক ভীরুতা। আজকের দিনের এইসব অপ্রিয় সত্যগুলি একদা (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) 'দাদাঠাকুর' শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সংবাদে পরিবেশন করেছিলেন।



কিন্তু আচার্য সুধাংশুশেখর এই নেতিবাচকতাকে ইতিবাচক করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বামীজীর শিক্ষাধারায় ছাত্রদের মন-প্রাণ ধুইয়ে দিয়ে, শুদ্ধ-মনে বিবেকবাণীর মর্মস্পর্শী বীজ বপন করে। হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে তিনি যোগদান করেছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং দীর্ঘ ৮ বছর সহকারী শিক্ষকপদে আসীন থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

আচার্য সুধাংশুশেখর সারাজীবন ধরে শিক্ষাদান করেছিলেন স্বামীজীর মানুষ গড়ার শিক্ষার আদর্শ অবলম্বন করে। তাঁর নেতৃত্বগুণে এবং সহকর্মী ও ছাত্রদের সহযোগিতায় এই বিদ্যালয় সেকালে হয়ে উঠেছিল সত্যসাধনার পীঠস্থান। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এক বলিষ্ঠ অথচ কুসুমপেলব হৃদয়ের অধিকারী সেই মানুষ নিজে যেমন সত্য-শিব-সুন্দরকে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি সেই উপলব্ধিকে তিনি অনুসঞ্চারিত করেছিলেন বিদ্যাদানের উপযুক্ত আশ্রমিক পরিবেশে। সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের দিগ্‌দর্শন করেছিলেন এই শিক্ষাব্রতী। তিনি তাঁর তপস্যার ধন ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন জরামুক্ত হতে আর আত্মসম্পদে বরীয়ান, বলীয়ান, মহীয়ান হওয়ার 'অভীঃ' মন্ত্র। তাঁর বহু যশস্বী ছাত্র তৈরি হয়েছেন। কেউ বিশ্বের দরবারে নিমন্ত্রণ পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন, কেউবা বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিজগুণে। এসবই শিক্ষক সুধাংশুশেখরের আত্মহোমের প্রজ্বলিত বহ্নি। তাঁর অন্তরের গভীরতা এবং ব্যাপ্তির পরিচয় দেয় গ্রন্থে সঙ্কলিত তাঁর প্রাত্যহিক

দিনলিপির মলিন পাতার উজ্জ্বল অক্ষরগুলি। তাতে রয়েছে অন্তঃপ্রবাসী মনের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা, পারিবারিক পরিচয়, কিছু স্মৃতিবিজড়িত ছবি, স্বলিখিত পত্রাংশ, আশ্রমের পরিবেশরক্ষা, অনাসক্ত কর্মযজ্ঞকথা এবং সর্বোপরি তাঁর অনাড়ম্বর জীবনে প্রতিফলিত উচ্চ-ব্যাপ্ত-গভীর চিন্তারাজি এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মী নির্বিশেষে কোন এক আদর্শপ্রেমী মানুষের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভয় এবং সমীহ কীভাবে আবর্তিত হতো—তার প্রাঞ্জল বর্ণনা পড়লে এক নতুন অনাস্বাদিত অনুভূতি জন্মায়। আবার একই সঙ্গে, পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে কিছু অকথিত আদর্শ শিক্ষকের জীবনালেখ্য উপস্থাপনের প্রয়োজন যে অবশ্যই রয়েছে—এই অভাববোধও জন্মায়।

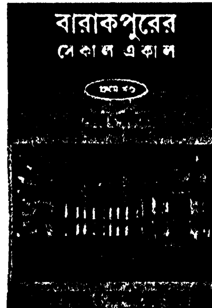
গ্রন্থখানি ৬টি অধ্যায়-সম্বলিত। প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে বিষয়সূচীর নির্দেশ দেওয়া আছে। তাছাড়া সূচীপত্র তো আছেই। গ্রন্থনা এবং মুদ্রণ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সূচীপত্রে পত্রাঙ্ক উল্লেখ করা হয়নি বলে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রচ্ছদে এবং শিরোনামাঙ্কিত পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নামকরণ দেখা যায়—'বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ আচার্য সুধাংশুশেখর'। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে যে-পৃষ্ঠা থেকে তার শীর্ষস্থান থেকে শেষপর্যন্ত বাঁদিকের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাতে নামকরণ দেওয়া হয়েছে 'বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত সুধাংশুশেখর'। এতে একটু বিভ্রান্তি হতে পারে বলে মনে হয়। গ্রন্থের অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা উন্নত মানের। গ্রন্থখানি বহুপঠিত হওয়ার দাবি রাখে। ❑

আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বারাকপুর

শুভঙ্কর ঘোষ

বারাকপুরের সেকাল একাল (১ম খণ্ড) ● সম্পাদনাঃ কানাইপদ রায় ● প্রকাশক : কানাইপদ রায়, সম্পাদক, নগর পেরিয়ে ● মূল্য : ৪০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+১৯৮ ● প্রকাশকাল : ১৯৯৯

জাতির যেমন ইতিহাস থাকে, দেশের যেমন ইতিহাস থাকে, তেমনি অঞ্চলেরও ইতিহাস থাকে। ছোট হোক, বড় হোক, জনপদ গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত সর্বদাই কৌতূহলপ্রদ। নদীর বিকাশবৃত্তান্তের সঙ্গে জনপদের বিকাশবৃত্তান্ত জড়িয়ে থাকে। হুগলি, ভাগীরথী বা গঙ্গার প্রবহমানতার পাশাপাশি জনপদের নানামাত্রিক প্রবহমানতা অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক জনপদের ইতিহাস রচনার স্রোত, সাধারণভাবে, গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছরে বিশেষ লক্ষ্য করা গেছে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বা 'কলিকাতা কল্পলতা' রচয়িতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে বলা যায়, পরবর্তী কালে জেলা-মহকুমা-শহর-পৌর এলাকা, এমনকি ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়েও ইতিহাস লেখার আগ্রহ রীতিমতো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিপুত্রদের উদ্যোগই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বটে। একজন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা নীহাররঞ্জন রায় আজ নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু মাটির গন্ধযুক্ত অঞ্চলকথা বলার স্পৃহা ও চর্চার মানসিকতা বর্তমানে সত্যই প্রশংসনীয় বিষয়। এদিক থেকে বারাকপুর মহকুমাভিত্তিক ইতিহাস রচনার যে দায়িত্ব নিয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে', তা একদিক থেকে অভিনব, অন্যদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। **'বারাকপুরের সেকাল একাল (১ম খণ্ড)'** সম্পাদনা করেছেন কানাইপদ রায়। তিনি জানিয়েছেনঃ "সেনাদের ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর' নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 'ব্যারাকপুর' বানান লেখা হয়েছে বারাকপুর।" এক্ষেত্রেও বিষয়গত শুদ্ধতাই বিষয়গত বানানের শুদ্ধতায় গবেষকের দৃষ্টিতে ঋদ্ধ করা হয়েছে।



পত্রিকার উদ্যোগে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অর্থ হলো, এটি একার কাজ নয়, অনেকের। বারাকপুর মহকুমার অতীত সন্ধানে পাঁচশো বছর পিছন অবধি দেখা সম্ভব হয়েছে। কীভাবে বারাকপুরের ভাঙাগড়া ও পটপরিবর্তন ঘটেছে তা চমৎকার উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাঁকিবাজার (বর্তমান নবাবগঞ্জ), দিগঙ্গ (মণিরামপুর), চাণক (বারাকপুর), বুড়নিয়ার দেশ (টিটাগড়) রূপান্তরিত হয়েছে সময়ের ক্রমে। অনেকগুলি জনপদ এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ১ম খণ্ডে মণিরামপুরকে বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যে বারাকপুর উল্লিখিত হয়েছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, সাধক রামপ্রসাদ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ বারাকপুরের সাহিত্যভূমিকে উর্বর করে তুলেছেন। বারাকপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে মহীয়সী নারী রানী রাসমণি।

'মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুরু ও মহাত্মা গান্ধী', 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট', 'ইঁট শিল্প', 'কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা', 'পলতা জলকল' ও মণিরামপুরের বিপুল বিচিত্র দিক আলোচিত হয়েছে। বারাকপুরের দুটি সিপাহী বিদ্রোহ, সদর বাজার, মঙ্গল পাণ্ডের কথা এবং তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। বারাকপুরের শিল্পাঞ্চল, রাজনীতি, ধর্মচর্চা ও লোকজীবন নিয়ে 'নগর পেরিয়ে' নিশ্চয়ই পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করবে। তবে লিটল ম্যাগাজিনসমূহের নামোল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ।

কোন ইতিহাসই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 'বারাকপুর সেকাল একাল (১ম খণ্ড)' পাঠের পর স্বভাবত পাঠকের দাবি থাকছে, পরবর্তী খণ্ডে বা খণ্ডসমূহে বারাকপুরের সেকাল ও একাল আরো পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। কানাইপদ রায়ের সম্পাদনা পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক লেখকই যত্ন নিয়ে বিষয়গত বিশ্লেষণে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক জন্মস্থান ও পৈতৃক বাড়ির সংস্করণ ও উদ্বোধন

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভোরে স্বামীজীর জন্মস্থানে মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা ও ভজনের পর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে প্রকাশ্য মঞ্চে গুণ্ডিচা ব্রাদার্স কর্তৃক ধ্রুপদসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বেলা ৯টা ৩০ মিনিটে স্বামীজীর নবসংস্কৃত পবিত্র জন্মস্থান ও পৈতৃক বাড়ির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। বেলা ১০টায় প্রকাশ্য মঞ্চে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বৈদিক মন্ত্রপাঠ করেন ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ব্রহ্মচারিবৃন্দ। আশীর্বাণী প্রদান করেন পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজী। ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী প্রভানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী বিশোকানন্দজী ও স্বামী সর্বগানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে ৫৫০-এর বেশি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী অংশগ্রহণ করেন এবং দুপুরে ১৫,০০০-এরও বেশি ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বিকালে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সার্থক রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্যদের স্মারক উপহার প্রদান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুবোধরঞ্জন দে।



উদ্বোধনী সভায় পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজী-সহ পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজবৃন্দ, পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ এবং স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।



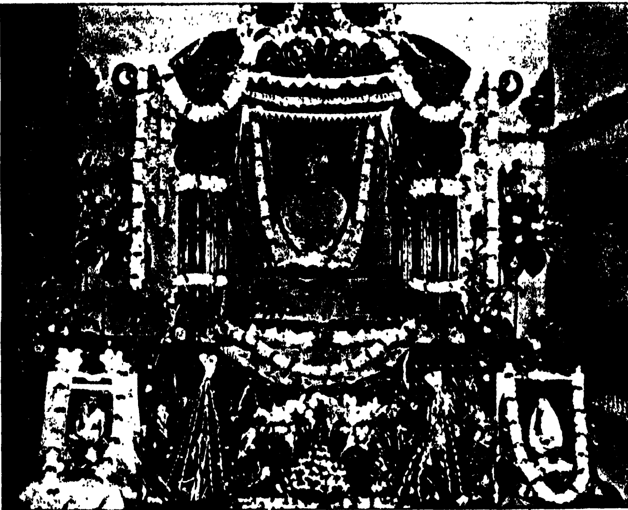
স্বামীজীর জন্মস্থানে সন্ধ্যারতির পর প্রকাশ্য মঞ্চে শেখর সেন কর্তৃক একক অভিনয় প্রদর্শিত হয়। এদিন অগণিত ভক্ত স্বামীজীর জন্মস্থান ও পৈতৃক বাড়ি পরিদর্শন করেন।

গত ১ অক্টোবর ২০০৪ 'বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন করেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালাম।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মন্দির প্রতিষ্ঠা

রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ চণ্ডীপুর: গত ২৯ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুনর্নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৯ তারিখ বাস্তুপূজা, বাস্তুযজ্ঞ, অধিবাস ও পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথিতে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, বেদপাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এরপর যজ্ঞমণ্ডপে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী হোম' অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠের পর আশীর্বাণী প্রদান করেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজী। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৩৫ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং ১৫,০০০ ভক্ত যোগদান করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের



স্বামীজীর জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত পূজাবেদি

সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী এবং স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এদিন মণ্ডপে ভক্তিগীতি, ভজন, বাউলগান, কীর্তন, সরোদবাদন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ আগস্ট ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী সুবীরানন্দজী। ১ তারিখ পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজী প্রায় ১০০ ভক্তকে দীক্ষা প্রদান করেন। এদিন ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে 'বিবেকানন্দ দিবস' পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ছাত্র ও যুবক অংশগ্রহণ করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। ২ আগস্ট ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে আশীর্বাণী প্রদান করেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজী। এই সম্মেলনে প্রায় ৮০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ প্রদান ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, স্বামী গুড়াকেশানন্দজী প্রমুখ। উৎসবের বিভিন্ন দিনের সভায় স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী।

দ্বারোদ্ঘাটন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মুম্বাই: গত ৮ আগস্ট ২০০৪ আশ্রম পরিচালিত সাক্ওয়ার গ্রামের (থানে জেলা) 'রুরাল হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার'-এর নতুন চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, চেন্নাই: গত ১১ আগস্ট ২০০৪ স্বামী বিবেকানন্দের দুটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং 'ব্রহ্মানন্দ হল' ('পরীক্ষাগৃহ') ও 'শিবানন্দ ব্লক' ('শ্রেণিকক্ষ')-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চেন্নাই: গত ১৩ আগস্ট ২০০৪ আশ্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'শ্রীসারদা সভাভবন' ('অ্যাসেম্বলি হল')-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত দুই শাখাকেন্দ্রে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়—শিলং ও চেঙ্গলপট্টু।

গত ১১-১৮ জুলাই ২০০৪ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক জীববিদ্যা অলিম্পিয়াডে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘরের একটি ছাত্র ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। এইজন্য গত স্বাধীনতা দিবসে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম রাষ্ট্রপতিভবনে তাকে অভিনন্দন জানান এবং পুরস্কারস্বরূপ নগদ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করেন।

সংশোধনাগারে সেবাকার্য

রামকৃষ্ণ মিশনে সেবাকার্যের বিবরণ সাধারণত সংক্ষেপেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এই সেবাকার্য চতুর্ধাবিভক্ত। যথা ত্রাণকার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্মান্দোলন। এই ধর্মান্দোলন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য একটি নতুন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের যৌথ প্রচেষ্টায়। মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার উৎসমুখ খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংশোধনাগারে মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সেবাকার্য শুরু করেছে। এই সেবাকার্যের তাৎক্ষণিক ফল কিছু দেখা না গেলেও অল্পবিস্তর প্রভাব সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়া মানুষের মধ্যে হিংসাত্মক বা অমানবিক মনোভাব হ্রাস পাচ্ছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পথেঘাটে দেখা হলে তারা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ভক্তকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, প্রশ্ন করে গাড়ি খারাপ হয়েছে কি? কিংবা—আপনাদের জন্য একটু চা নিয়ে আসব? 'কেন' প্রশ্ন করলে তারা বলে, আমরা তো আপনাদের ছাত্র ছিলাম সংশোধনাগারে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র ও প্রাইভেট আশ্রমের ভক্ত ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দিদের মধ্যে সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

আলিপুরদুয়ার সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান।

কুচবিহার জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান।

তুফানগঞ্জ সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা।

বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, পশুপালন ও মৎস্যচাষ শিক্ষা প্রদান।

রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা।

কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান।

বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা।

মালদা জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, কাঠের কাজ, বই বাঁধানো, সেলাই, ছবি আঁকা, সঙ্গীত, পশুপালন, মাছচাষ শিক্ষা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান, মহাপুরুষদের জন্মোৎসব পালন ও নানা গঠনমূলক কাজ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪ জনকে সেলাই মেশিন, ৬ জনকে কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি, ১ জনকে সেলুনের সামগ্রী ও ১ জনকে ছোট ব্যবসায় সাহায্য প্রদান করা হয়।

হাওড়া জেলা সংশোধনাগার: স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গ্রন্থাগার স্থাপন,

সেলাই, কাঠের কাজ, দ্বিচক্রযান সারানো, উলবোনা, পশুপালন, স্বল্পসময়ে খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ, একাগ্রতা বা ধ্যানশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ব্রতচারী প্রশিক্ষণ ও সঙ্গীত শিক্ষাপ্রদান।

দেহত্যাগ

স্বামী অনির্বাণানন্দজী (বিশ্বেশ্বর মহারাজ) গত ১৬ আগস্ট ২০০৪ ভোর ৪টায় তিরুবনন্তপুরম আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমের মধ্যে তাঁর শরীর যায়। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৬ সালে তিনি রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, জলপাইগুড়ি, রামহরিপুর এবং জামতাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে অসুস্থতার জন্য তিনি অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে বেলুড় মঠ ও পরে তিরুবনন্তপুরম আশ্রমে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন।❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৩০ আগস্ট ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হররূপানন্দজী ও স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সাগরপাড়া (মুর্শিদাবাদ) : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। উৎসবে আগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন অ্যাভিনিউ (দুর্গাপুর) : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা নির্ভিকপ্রাণাজী। ২৯ তারিখ সকালে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শুভব্রতানন্দজী এবং দুপুরে প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৮ তারিখ বিকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আলোকচিত্রসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইস্পাতনগরীর কিয়দংশ পরিক্রমা করে।

বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম (হুগলি) : গত ২ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক ভক্তসম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ১৫০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন এবং স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী ও স্বামী আপ্তেশানন্দজী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (আলিপুরদুয়ার) : গত ২ মার্চ ২০০৪ জপ-ধ্যান, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী লোকনাথানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। ৩৫০ জন ভক্ত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এদিন ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে কম্বল প্রদান করা হয়।

গাজিপুর ক্রাউন ফুটবল ক্লাব (শাখা—মা সারদা সেবা সঙ্ঘ) : গত ৬-৭ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, পতাকা উত্তোলন, শান্তিমন্ত্র, কবিতা ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও সার্বিক গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সহযোগিতায় শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব ও মা সারদা সেবাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সহায়তায় উত্তর গাজিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবসংস্কৃত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য, খেলাধূলার সরঞ্জাম, পুরস্কার এবং কৃতী ছাত্রদের শংসাপত্র প্রদান করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, কালিপ্রসন্ন ধাড়া ও অমিয় চক্রবর্তী। ৭ মার্চ দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৭ মার্চ ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, আলোচনাচক্র, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ পান।

সাহাপুর বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন (বর্ধমান) : গত ৭ মার্চ ২০০৪ পূজা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, বাউলগান, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাহাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ পরিচালিত এই শিক্ষানিকেতনের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী সনাতনানন্দজী, ডাঃ বিমান মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা, কোন্নগর (হুগলি) : গত ৭ মার্চ ২০০৪ নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহে বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সকালে প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও বিকালে স্বামী প্রভানন্দজী ভাষণ দেন। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

গাঁতি বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৭ মার্চ ২০০৪ 'চণ্ডী' পাঠ, পদাবলী কীর্তন, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী, গোপেন চৌধুরী, মোঃ নাসিরুদ্দিন ও কুমারেশ দাশশর্মা। এদিন ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাপালা অভিনীত হয়।

স্বামী যোগানন্দ উৎসব সমিতি, দক্ষিণেশ্বর (কলকাতা-৫৭) : গত ১০ ও ১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের পবিত্র জন্মভিটায় যথাক্রমে স্বামী যোগানন্দজীর জন্মতিথি ও জন্মোৎসব পালিত হয়। ১০ তারিখ মঙ্গলারতি, 'চণ্ডী' পাঠ, ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দজীর প্রতিকৃতিসহ নগর-সঙ্কীর্তন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যোগানন্দজীর জীবনী বিষয়ে আলোচনা করেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান) : গত ১৩-১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১৩ তারিখ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ১৪ তারিখ পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, তরুণ গোস্বামী ও সোমনাথ মিত্র। উভয়দিনেই সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) : গত ১৩-১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১৩ তারিখ ভক্তিগীতি, 'গীতা' পাঠ, আলোচনা পভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী। ১৪ তারিখ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী এবং স্বামী সুপর্ণানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোক সমাজপতি।

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হাওড়া) : গত ১৪ মার্চ ২০০৪ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অরুণাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান) : গত ১৪ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বাউলগান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন নবসংস্কৃত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

তিলজলা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-৩৯) : গত ১৪ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, ভজন, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, তেলোভেলোর চটি (হুগলি) : গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, নরনারায়ণ-সেবা, মেলা, গীতি-আলেখ্য, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১৪ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী। ১৫ তারিখ 'স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুরক্ষা শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অংশগ্রহণ এবং ২০০-র বেশি ব্যক্তির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন আরামবাগের মহকুমা শাসক আসরফ আলি মল্লিক। বৈকালিক আলোচনাসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী। ১৬ মার্চ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহায়তায় অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী পরেশানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। শতাধিক যুবক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর (হাওড়া) : গত ১৪ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, মাতৃবন্দনা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী ও ডঃ রামচন্দ্র মান্না। সবশেষে 'জগাই-মাধাই উদ্ধার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাণ্ডু (গুয়াহাটি) : গত ১৯-২১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য-গীতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ২১ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী, স্বামী রঘুনাথানন্দজী ও ডঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দনগর (হুগলি) : গত ২০-২১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, বৈদিক মন্ত্র ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির বার্ষিক মুখপত্র 'উদ্দীপন' প্রকাশিত হয়। উভয়দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী, দেবানন্দ ব্রহ্মচারীজী, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ও অধ্যাপক পিনাকীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, ঠাকুরপুকুর (কলকাতা-৬৩) : গত ২০-২১ মার্চ ২০০৪ পূজা, সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাসবানন্দজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ চিন্ময়ীকুমার ঘোষ, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে 'Great Sayings' পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, চকমানিক (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২১ মার্চ ২০০৪ প্রভাতফেরি, পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রদর্শনী, গীতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী ও ডঃ তাপস বসু। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৭৯ জন রক্তদান করে।

রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, সিঙ্গুর (হুগলি) : গত ২১-২২ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-সঙ্কীর্তন, পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি ও বাৎসরিক উৎসব এবং ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী ও স্বামী সুখানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। রাত্রে কথায় ও গানে 'সারদাবন্দনা' পরিবেশিত হয়। ২২ তারিখ সন্ধ্যায় 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালা অভিনীত হয়।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হোজাই (অসম) : সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হোজাই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের বানভাসিদের মধ্যে খিচুড়ি, চাল, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, কুঁড়া, লবণ, পলিথিন সিট, ত্রিপল, চিনি, বাতাসা, মোমবাতি, চিঁড়া, পুরনো বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ এবং দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডবকা (অসম) : সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হোজাই মহকুমার যোগিজান অঞ্চলের বানভাসিদের মধ্যে বাসনের সেট, মশারি, পুরনো কাপড়, হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিতরণ, দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন, নলকূপ স্থাপন, ঠেলাগাড়ি প্রদান, ঘরবাড়ি সারানো, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, বদরপুর (অসম) : সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর অঞ্চলের বানভাসিদের থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে চাল, ডাল, লবণ, দুধ প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। এই আশ্রমের পরিচালনায় বিভিন্ন সংস্থা থেকে খিচুড়ি ও ভাত এবং সারদা সঙ্ঘ, বদরপুর শাখা থেকে পুরনো কাপড় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাঁও (অসম) : সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কড়েগাঁও ১নং ব্লকের পোপড়াগাঁওয়ের শরণার্থী শিবিরের বানভাসিদের মধ্যে নতুন শাড়ি, ধুতি ও স্টিলের বাসন বিতরণ করা হয়।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৪ মার্চ ২০০৪ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্যপ্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে একটি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা এটি প্রদান করেন।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ১৭ মার্চ ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছির অর্থানুকূল্যে বর্ধমান মেঘা আই সেন্টার ও রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মানন্দ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবাত্মানন্দজীর সহযোগিতায় চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৭৮ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বহির্ভারতে সেবাব্রত ☐ বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ (রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম), শ্রীমঙ্গল (বাংলাদেশ) : সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবিগঞ্জ ও বরুণার বিভিন্ন অঞ্চলের বানভাসিদের মধ্যে চিঁড়া, গুড়, চাল, বিস্কুট, দেশলাই, মোমবাতি, স্যালাইন, নতুন ও পুরনো বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল-নিবাসী স্বেচ্ছাসেবী স্বামী রামানন্দজী মহারাজ গত ২০ জুলাই ২০০৪ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ২৬ বছর এই আশ্রমের কনস্ট্রাকশনের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীরও স্নেহ লাভ করেছিলেন। হৃষীকেশের কৈলাস আশ্রম থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের শিলচর-নিবাসী দেবব্রত নন্দী মজুমদার গত ৩০ এপ্রিল ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ত্রিপুরার আগরতলা-নিবাসিনী বাসনা দেববর্মা গত ১ মে ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৯ মে ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ সমিতি-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, গৌহাটি-নিবাসিনী আরতি ধর চৌধুরী গত ২৮ মে ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, খড়্গপুর-নিবাসী শিশিরকুমার বিশ্বাস গত ১৬ জুন ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির ডানকুনি-নিবাসী নদীয়াবিনোদ দাশ গত ১৯ জুন ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ☐



নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর-৭১২৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
  কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন ঃ ২৬৭৩-৯২০৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ** (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ধনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
  পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন ঃ ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯
  ফোন ঃ ২৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
  উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন ঃ ২৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
  ফোন ঃ ২৬৬৩-৭০৪৬
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
  ফোন ঃ ২৬৮৪-৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- **শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র**
  গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬
  ফোন ঃ ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- **জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র**, প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
  জনাই-৭১২৩০৪, ফোন ঃ ৯১১২-২৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ৪/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
  ফোন ঃ ২৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**
  তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, বগুলা-৭৪১৫০২
- **নব রামকৃষ্ণ অপেরা**, বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, সি/২০, পোঃ তাহেরপুর
- **ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল**, 'সারদা ভবন'
  ফুলিয়া-৭৪১৪০২, ফোন ঃ ০৩৪৭৩-২৩৪০০২

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫
  পিন ঃ ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**
  শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর**, ফোন ঃ ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩, ফোন ঃ ০৩৪৮২-২৬৫৪০৭
- **দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬

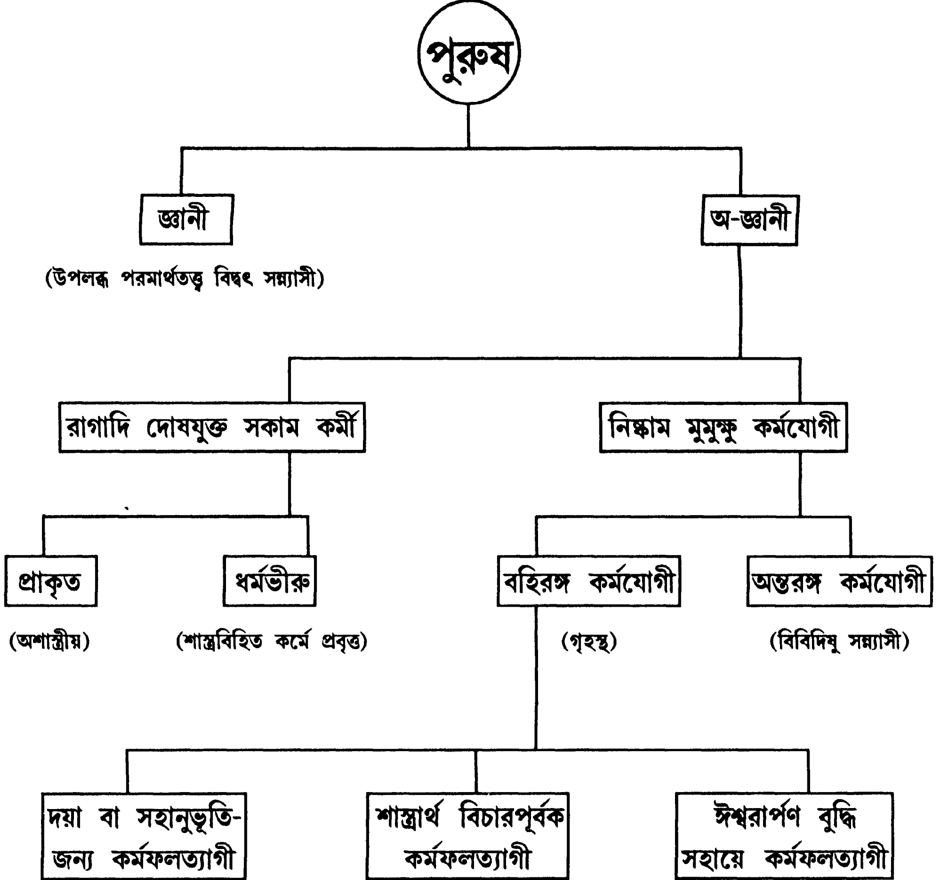
বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামহরিপুর-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা-৭২২১৫০
- **কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩
  ফোন ঃ (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮

পুরুলিয়া

- **পুরুলিয়া বুক ডিপো**, হাটতলা, ফোন ঃ (০৩২৫২) ২২৭২৯-২২৬৫১৩

জীব বা পুরুষের শ্রেণিবিন্যাস



সূত্র : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১৩—স্বামী বাসুদেবানন্দকৃত ব্যাখ্যা সমেত।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

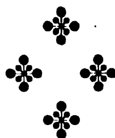
❋

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

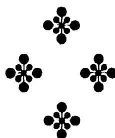
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ


The Symbol of trust





UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

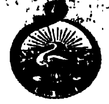
Vol. 106
No.10
October
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৬ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

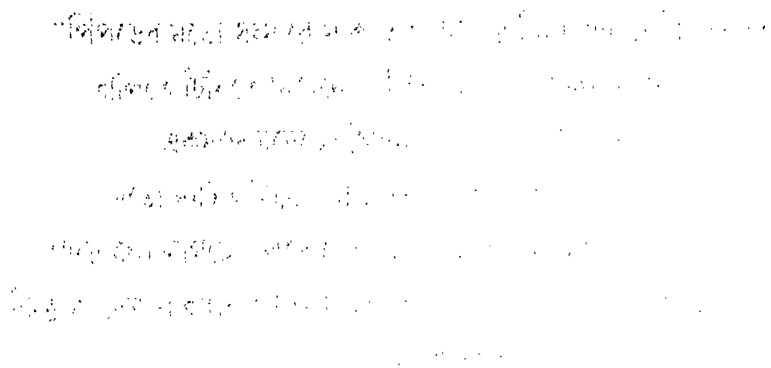
২০০৪ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

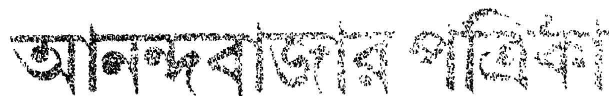
- বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।
- **'উদ্বোধন'** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং **স্বামী বিবেকানন্দের** ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, **'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**
- ২০০৪ সালের জন্য **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে।** সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'কে** পৌঁছে দিতে হবে। **'উদ্বোধন'** একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।
- **'উদ্বোধন'**-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ** এবং **স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের** নামে উৎসর্গীকৃত। **'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor,** ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা **M.O.** কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ **সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ**



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
অগ্রহায়ণ ১৪১১ ১১শ সংখ্যা
উদ্বোধন
॥ ১০৬ ॥
০৬তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা





৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

website : www.anandabazar.com

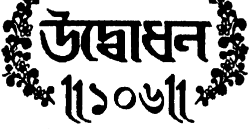


নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

40040

সূচীপত্র



১০৬তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৪১১ ● নভেম্বর ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক: স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ: সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ: ৮০ টাকা; সডাক: ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য: ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' ঃ **১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com





১ওঁ সতি নামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু॥
অকাল মূরতি অজুনি সৈভং গুর প্রসাদি॥জপু॥

তিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তিনি ওঙ্কার পদবাচ্য। সৎ অর্থাৎ অস্তি (সত্য) তাঁর নাম। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। তিনি পুরুষ অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। তিনি ভয়শূন্য। তাঁর কোন শত্রু নেই। তাঁর স্বরূপ কালের (কাল = সময় বা মৃত্যু) অতীত, কালেরও কাল তিনি। তিনি অযোনিসম্ভব (জন্মরহিত)। তিনি স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ তাঁর জন্মের কোন কারণ নাই, কেননা তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। গুরুকৃপা লাভ করে এই বীজমন্ত্র সর্বদাই জপ কর।



সাচা সাহিবু সাচু নাই ভাখিআ ভাউ অপারু॥
আখহি মংগহি দেহি দেহি দাতি করে দাতারু॥
ফেরি কি অগৈ রখীঐ জিতু দিসৈ দরবারু॥
মুহো কি বোলণু বোলীঐ জিতু সুণি ধরে পিআরু॥
অংমৃত বেলা সচু নাউ বডি আঈ বীচারু॥
করমী আবৈ কপড়া নদরী মোখু দুআরু॥
নানক এবৈ জাণীঐ সভু আপে সচিআরু॥

প্রভু সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যপদবাচ্য অর্থাৎ সত্যই তাঁর নাম। অপার প্রেমের সঙ্গে তাঁর নাম করতে হবে। 'দাও, দাও' বলে সবাই তাঁর কাছে চায় এবং দাতা (তিনি) দান করেন।

সেই কালাতীত পরমেশ্বরের সম্মুখে কী এমন উপচার (নৈবেদ্য) রাখব, যার দ্বারা তাঁর দরবার (মহিমা) দর্শন করতে (বুঝতে) পারব? অর্থাৎ কোন জাগতিক বস্তু দ্বারা তাঁকে জানা বা বুঝা যায় না।

মুখে এমন কী কথা বলব, যা শুনে তিনি খুশি হবেন? ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর সত্য নাম জপ ও মহিমাকীর্তনই তাঁর পূজার উপকরণ (নৈবেদ্য), যাতে তিনি প্রীত হন। সংস্কারবশেই জীবের আহার ও বস্ত্র (আত্মার আবরণরূপ এই শরীর) লাভ হয়। কিন্তু কেবল তাঁর কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভ করে। নানক বলছেন, এরূপ জান যে, সত্যস্বরূপ প্রভুই সব।

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী (১ম খণ্ড, বীজমন্ত্র, শ্রীজপজী, পৌড়ী-৪)



বিশ্বাস ও প্রার্থনা এবং প্রার্থনা ও বিশ্বাস

"গিরিশের পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস!"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। অর্থাৎ 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার'—একথায় গিরিশের বিশ্বাসের কূল পাওয়া যায় না। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের অসামান্য প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মদ্যপ গিরিশের চরিত্র ভাল নয়। সব জানিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিলেন। নাস্তিক, লম্পট গিরিশ ক্রমে 'বিশ্বাস-আকর'-এ পরিণত হইলেন। এরূপ বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনি তো জীবন্মুক্ত পুরুষ। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের মন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় অনবরত দুলিতে থাকে। কখনো ভাবিলাম, ঈশ্বরকে সকল ভার সমর্পণ করিয়াছি, আর চিন্তা কিসের? পরে হঠাৎ মনে হইল, অমুক বস্তুটি বা ব্যক্তিটি না হইলে আমার চলে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতায় কম পড়িল। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার বলিতেছেন—বালকের ন্যায় বিশ্বাস চাই।

১৮৮৪-র ৬ ডিসেম্বর। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়াছেন অধর সেনের গৃহে। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করা। অধর বঙ্কিমের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের খুব গুণগান করিয়াছেন। বৈঠকখানায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ "গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—বালকের মতো বিশ্বাস করলে—ঈশ্বরলাভ হয়। বালকের কী বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়'; অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা'। একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। তা, সে-ছেলে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়তো ছুতোর-কামারের ছেলে।... স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারি বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া, কপট হলে হবে না।"

সাধকের সাধনা পরিণতি লাভ করিলেই এই 'বালকের বিশ্বাস' সম্ভব হয়। সংসারে চলিবার প্রয়োজনেই হউক, কিংবা ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রেম-ভক্তি লাভের প্রয়োজনেই হউক, একটি প্রাথমিক বিশ্বাস লইয়া সাধকের চলা শুরু হয়। ঈশ্বরের দর্শনলাভ তো করি নাই, কে তিনি, কোথায় থাকেন—কিছুই জানা নাই; তবু তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে ভাল লাগে। মনের অসহায় মুহূর্তে সকল আর্তি সেই অচেনা, অজানা ব্যক্তির চরণে নিবেদন করিলে মনে বেশ তৃপ্তি হয়। অর্থাৎ এই বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়াই প্রার্থনা করা এবং ফলত হৃদয়ের গভীরে এক নির্মল আনন্দপ্রাপ্তি। এই নিরঞ্জন তৃপ্তির রেশ কিন্তু দীর্ঘকাল থাকে না। প্রার্থনা যখন জাগতিক, সে-তৃপ্তি একপ্রকার; যখন প্রার্থনা আধ্যাত্মিক, তখন তাহার তৃপ্তি অন্যপ্রকার। অধ্যাত্মজীবনে কখনো কখনো অতৃপ্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াই তৃপ্তির আবির্ভাব হয়। সহসা সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাপরম্পরায় এই প্রার্থনাভিলাষ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। তখন ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিবার ইচ্ছার তীব্রতা হ্রাস পায়। মহামায়ার অদ্ভুত প্রপঞ্চে মন আবিষ্ট হইয়া পড়ে। শুভকর্মে অগ্রসর হইতে চাহিলেই কেহ যেন পিছন হইতে টানিয়া ধরে। কবিগুরুর ভাষায় ঃ "কেন আমায় পাগল করে যাস, ওরে চলে যাওয়ার দল।..." মানবের অবিশ্বাসী মন কখন যে আকৃষ্ট হয় সংসারের বিচিত্র প্রলোভনে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। ভক্তি ও ভক্তের বিভিন্ন স্তরের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। বিশ্বাসই সবকিছুর মূল স্তম্ভ। বিশ্বাসের স্তরভেদ রহিয়াছে। আগে বিশ্বাস, পরে প্রার্থনা। এবং ধীরে ধীরে 'প্রার্থনা'ই সাধককে লইয়া যায় 'প্রত্যয়ে'। "যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়"—রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন। তখন আগে প্রার্থনা, পরে বিশ্বাস। এই প্রত্যয়কে শাস্ত্রে 'আস্তিক্যবুদ্ধি' বলা হইয়াছে। বালোচিত আস্তিক্যবুদ্ধি ক্রমে প্রৌঢ় আস্তিক্যবুদ্ধিতে পরিণত হইয়া থাকে। অষ্টাবক্র মুনি বলিয়াছেন, প্রৌঢ় বৈরাগ্য অবলম্বিত হইলে আস্তিক্য-বুদ্ধিও প্রৌঢ়ত্ব লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে যথার্থ বিশ্বাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই সেই বিশ্বাস 'গিরিশের ন্যায়' অচল অটল হইয়া থাকে। তাই কথায় বলে ঃ "বিশ্বাসে পাহাড় টলে যায়।" মহম্মদের বিশ্বাসের এমন জোর ছিল, তিনি পর্বতের নিকট গমন করেন নাই, পর্বতই নাকি তাঁহার নিকট আসিয়াছিল! ইহা শুধু কথার কথা নহে, তাহার প্রমাণ আমরা সাধু নাগমহাশয়ের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে সুমেরুবৎ অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের জোরে তিনি ঢাকার নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে নিজের বাসগৃহে মাতার গঙ্গাস্নানের বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য সুরধুনী গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত রহিয়াছে। ঐ পবিত্রধারায় স্নান করিয়াছিলেন—এমন ব্যক্তিকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এখনো সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। শোনা যায়, দগ্ধপাপ গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস এমনই অভাবনীয় দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, একদা গঙ্গাস্নানে নামিবার কালে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "মা গঙ্গা, তুমি মনে করো না, তোমার জলে ডুব দিয়ে আমি পবিত্র হতে এসেছি। ঠাকুরের কৃপায়

আমার সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমি তোমার বুকে পা দিচ্ছি তোমাকে পবিত্র করার জন্য!"

এই অকল্পনীয় বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কী? মূল পার্থক্য এককথায় বলা যায়—সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, কিন্তু দিব্য অতিজাগতিক বিশ্বাসের ভিত্তি পারমার্থিক সত্যের অপরোক্ষ জ্ঞান। এবং এইরূপ সত্যদ্রষ্টার সংস্পর্শে আসিলে অনায়াসে আগন্তুকের সংশয় দূরীভূত হইয়া বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটে। আর "বিশ্বাস বাড়লে জ্ঞান বাড়বে"—শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি। (২২ অক্টোবর ১৮৮৫)

পরিণত বিশ্বাসকে অনেক আচার্য 'শ্রদ্ধা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'শ্রদ্ধা'র ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রকরণ গ্রন্থাদিতে (বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক ২৬ দ্রষ্টব্য) 'শ্রদ্ধা'র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—'গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধি'। অর্থাৎ যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেনঃ "ঈশ্বরকে দেখা যায়", তখন হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্যই ঈশ্বরকে দেখা যায়'। ইহাই যথার্থ শ্রদ্ধার পরিণাম। যেকোন ধর্মের যেকোন সাধকের ক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাধকগণের জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে একথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ও প্রার্থনায় কোন আড়ম্বর নাই, নাই কোন আত্মশ্লাঘা, কোনরূপ স্বার্থকোলাহল সেখানে শোনা যায় না; সেখানে আছে অগাধ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে 'একাকীর তরে একাকীর' নিরলস মিলনেচ্ছা, সুপ্ত আত্মার অন্ধকার হইতে জাগ্রত সত্যের আলোয় আসিবার নিরবচ্ছিন্ন অদম্য অভিলাষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী এক রাশিয়ান সাধকের আত্মজীবনী 'The Way of Pilgrim' গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়াল্টেরাস ট্রুরন লিখিয়াছেনঃ "He harps very much on one string no doubt; but what a string it is!—a deep bourdon-sound, which runs on, underneath the harmonies and discords of daily life, till it has brought them into unison of God."—*তিনি বীণার একই তারে সুর তুলিয়াছেন, সেকথা স্বীকার করিতেই হয় [অর্থাৎ প্রার্থনা, আত্মনিবেদন, আকুতি ইত্যাদি]। কিন্তু ইহা কী সুর? ইহা একটি অতিগম্ভীর দিব্যধ্বনি, যাহা দৈনন্দিন জীবনের সকল ঐকতান ও বৈষম্যের আধারস্বরূপ, যাহা মানুষকে ঈশ্বরের সহিত একাত্মতার পথে লইয়া চলে।*

ঐ রাশিয়ান সাধক তাঁহার আত্মজীবনীতে কোথাও নিজের নাম লিখিয়া যান নাই। পাণ্ডুলিপিটি একটি গির্জায় পাওয়া যায় এবং ১৯৩০ সালে ইহার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের চতুর্থ 'narrative'-এ সাধক লিখিয়াছেন (Harper and Row Publishers, San Fransisco, 1952, p. 88)ঃ "কিন্তু আমার অন্তরের অন্ধকার প্রদেশে সমস্ত কিছু অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার সাহায্যে ক্রমশ বেশি বেশি আলো প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার নিজের কৃতিত্বে নহে, বরং ঈশ্বরের কৃপায় এবং গুরু (মঠাধ্যক্ষ বা মঠাচার্য)-র অনুকম্পায়।... ইহার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন কেবল নৈঃশব্দ্যে ডুবিয়া যাওয়া, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আরো বেশি করিয়া প্রভু যিশুর নাম স্মরণ করা। যেকেহ এইরূপ করিবে, তাহারই অন্তরে আলো জ্বলিবে, সকল বিষয়ই বোধগম্য হইবে, এমনকি স্বর্গরাজ্যের বেশ কিছু রহস্যও তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। যে জানে তাহার এই [প্রার্থনা করিবার] শক্তি লাভ হইয়াছে, তাহার জ্ঞানের কী গভীরতা! আলোকিত হৃদয়ে সকল রহস্য উন্মোচনে তাহার কী দক্ষতা! নিজের অন্তর হইতে জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার কী অসীম প্রত্যয়,... এবং নিজের বিকৃত ইচ্ছার কারণে পতন হইতে দেখিলে তাহার চক্ষের কোণে যে করুণার্দ্র অশ্রুবিন্দু!"

এই প্রৌঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই ক্রমে কার্যে রূপায়িত হইয়া থাকে। কারণ, ইষ্টের অদর্শনে ভক্তের প্রাণে এমন তীব্র ব্যাকুলতা জন্মিতে থাকে যে, সে স্থির থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিতেছেনঃ "ব্যাকুলতা।... যদি কারো ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, এ-ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশি দেরি নাই।"

বিশ্বাস হইতে প্রার্থনার উদ্গম এবং পরিপক্ব অবস্থায় এই প্রার্থনার প্রৌঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা। তখন আর "বেতালে পা পড়ে না।" পরিণত অবস্থায় 'বিশ্বাস' অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-অপরোক্ষানুভূতিই পরিণত বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলিলেনঃ "হাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি; তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠরূপে।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৯৭) আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং প্রত্যক্ষ করি বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদের নিকট জগৎ সত্য। দেশকালাতীত অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইলে তখন 'জগৎ সত্য' বোধের পরিবর্তে 'পরমাত্মাই সত্য'—এই বিশ্বাসেই সাধকের পরম সিদ্ধি।❑

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র



(মিসেস জর্জ ডব্লু. হেলকে লিখিত)

॥১॥

৫৪ ডব্লু. থার্টি থ্রি, নিউ ইয়র্ক
১৮ মার্চ [ফেব্রুয়ারি] ১৮৯৫

প্রিয় মা,

আমি নিশ্চিত যে, এতদিনে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুকিরা মাঝে মাঝে চিঠি লেখে এবং সেজন্য আমি নিয়মিত আপনার সংবাদ পাই। মিস মেরী ইদানীং বক্তৃতার মেজাজে আছে, তার পক্ষে এটা ভালই। আশা করি, এখনি সে তিলে তিলে তার কর্মশক্তিকে অপচয় করে ফেলবে না—একটি পেনিকে বাঁচাতে পারলে সেই পেনিটিই অর্জিত হয়। ভগিনী ইসাবেল ফরাসি গ্রন্থগুলি আমাকে পাঠিয়েছে এবং কলকাতার প্রচারপত্রগুলিও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থগুলি আসা উচিত। সেগুলি আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় তবে সেগুলির দাম এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, নতুবা আমি আপনাকে ডাকখরচ পাঠিয়ে দেব।

আমি বেশ ভালই আছি। শুধু এইসব বৃহৎ নৈশভোজ আমাকে কখনো কখনো দেরি করিয়ে দিয়েছে এবং অনেকদিন আমি ভোর দুটোয় বাড়ি ফিরেছি। আজ রাতে এরকম একটি নৈশভোজে যাচ্ছি। এজাতীয় ব্যাপারের এখানেই শেষ। এত বেশি রাতজাগা আমার পক্ষে ভাল নয়। সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত প্রতিদিন আমার গৃহে ক্লাস থাকে এবং তারা যেপর্যন্ত ক্লান্ত বোধ না করে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলি। গতকাল ব্রুকলিনের পর্ব শেষ হয়েছে। আগামী সোমবার সেখানে আমার আরেকটি বক্তৃতা আছে।

সাধারণত বীনের স্যুপ এবং ভাত বা বার্লি আমার এখনকার সাধারণ আহার। আমি ভালই আছি। আর্থিক বিষয়ে বলতে গেলে, কেবল খরচটুকু আমি চালিয়ে নিচ্ছি এবং তার বেশি কিছু নয়; কারণ আমার বাসস্থানে যে-ক্লাসগুলি নিচ্ছি তাতে কোন মূল্য নিই না। আর জনসমক্ষে দেওয়া বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থায় তো রয়েছে বহু হাত।

নিউ ইয়র্কে আমার বেশ কয়েকটি বক্তৃতা আগে থেকে পরিকল্পিত হয়ে আছে; সেই বক্তৃতাগুলি আমি ক্রমশ দিয়ে যাব। ভগিনী ইসাবেল আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছে এবং সে আমার জন্য কতকিছুই করে! তার প্রতি আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতা।

খুকি[১] [চিঠি] লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, কেন তা জানি না।

খুকিকে দয়া করে বলবেন, ভারত থেকে যে ছোট সংস্কৃত বইটা এসেছিল, সেটি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়। সেটা নিয়ে আসতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ওটি থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ করতে চাই।

মিস্টার হিগিন্স আনন্দে ভরপুর। তিনিই আমার জন্য এই সবকিছুর পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সবকিছু যে এভাবে সাফল্যলাভ করেছে তাতে তিনি খুবই আনন্দিত।

মিসেস গার্ণসি এই বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। মিস [ফ্লোরেন্স] গার্ণসি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁর পিতা ও মাতা তা মোটেই পছন্দ করেন না। আমি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। বেচারা 'ভগিনী জেনী'[২], বহু পুরুষ তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে আছে। এখানে মিঃ [অস্টিন] করবিন নামে রেলদপ্তরের একজন অত্যন্ত ধনী ভদ্রলোক আছেন, তাঁর একমাত্র কন্যা মিস [অ্যানা] করবিন আমার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। আর যদিও তিনি 'সেই ৪০০'[৩] জনের

১ হ্যারিয়েট ম্যাকিণ্ডলে, ভগিনীদের মধ্যে কনিষ্ঠতমা।
২ হেল ভগিনীগণ সম্ভবত স্বামীজীকে একটি শিশুদের ছড়া শিখিয়েছিলেন। যেখানে 'সিস্টার জেনী' নামে একটি চরিত্র ছিল। সেই উপমা দিয়ে স্বামীজী লিখতে চেয়েছেন মিস ফ্লোরেন্স গার্ণসির কথা।
৩ 'The Four Hundred' বা 'সেই চারশো' বা 'সম্ভ্রান্ত ৪০০'—তৎকালীন নিউ ইয়র্ক শহরের একটি প্রচলিত শব্দ। অর্থ—উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ।

অন্যতমা নেত্রী, এক অর্থে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং অধ্যাত্মভাবাপন্নাও। সর্বদাই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাগমে এবং বিদেশি আভিজাত্যে পরিপূর্ণ তাঁদের গৃহে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। প্রিন্স, ব্যারণ এবং সারা পৃথিবী থেকে সমাগত—কী নয়? এই বিদেশিদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। আমি দুঃখিত যে, আপনার গৃহজাত আভিজাত্য [সেই তুলনায়] বড় একটা চিত্তাকর্ষক নয়। তাঁর বৈঠকখানার পিছনে একটি দীর্ঘ উদ্যান আছে এবং সেখানে রয়েছে তালজাতীয় সবরকম গাছ, বসার আসন এবং বৈদ্যুতিক আলো। আগামী সপ্তাহে সেখানে এক কুড়ি লম্বা-পকেটধারীদের জন্য আমাকে একটি ছোট ক্লাস নিতে হবে। কৌতুকটি মন্দ নয়! মা, "মোটের ওপর এই পৃথিবীটা এক বিরাট ধাপ্পাবাজী।" "কেবল ঈশ্বরই সত্য, আর সবকিছুই শুধু স্বপ্নমাত্র।" মাদার টেম্পল[৪] বলেন যে, তিনি আপনার কর্তৃত্বাধীনে থাকতে পছন্দ করেন না এবং সেই কারণে শিকাগো যান না। কাছাকাছি তিনি বেশ সুখে কাটাচ্ছেন। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, ডেলমোনিকো এবং ওয়ালডর্ফের নৈশভোজের সংশ্রবে এসে আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে যাচ্ছিল। তাই সব আমন্ত্রণকে এড়াবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি পুরোপুরি নিরামিষাশী হয়ে গিয়েছি। ধনীরা বাস্তবিকই এই পৃথিবীর লবণ—তারা খাদ্য বা পানীয় কোনটাই নয়। এখনকার মতো বিদায়।

আপনার চির স্নেহাস্পদ পুত্র
বিবেকানন্দ

।।২।।

৫৪ ডব্লু. থার্টি থ্রি, নিউ ইয়র্ক
[২৬ এপ্রিল ১৮৯৫(?)]

প্রিয় মা,

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে কলকাতার প্রচারপত্রগুলি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে আপনাকে যে-পত্রখানি লিখেছিলাম, সম্ভবত সেটি আপনি পাননি। দয়া করে সেগুলি এবং আপনার কাছে কলকাতার সভা সম্পর্কে যদি কোন প্রচারপত্র থেকে থাকে তবে তাও আমাকে ৫৪ ডব্লু. থার্টি থ্রি—ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। আর, গ্রীষ্মকালের কোটটা পাঠাবেন ১৯ ডব্লু. থার্টি এইট—ঠিকানায় মিস ফিলিপসের প্রযত্নে।

শীঘ্র যে শিকাগো যেতে পারব সেরকম কোন সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না; ভাবছি, আমার সব টাকা শিকাগোর ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসব। দয়া করে আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, শিকাগোতে আমার সর্বসাকুল্যে ঠিক কত টাকা আছে? যাতে আমি এখনি তুলে নিয়ে নিউ ইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি।

দয়া করে এটুকু করবেন এবং এরপর আপনাকে আর বিরক্ত করব না। বহুদিন আগেই কম্বলগুলি সম্পর্কে আমি ভারতে চিঠি লিখেছি। জানি না দেওয়ানজী[৫] বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। আমার কাছে কোন সংবাদ নেই।

আমি ভাল আছি এবং এখনো মাসাধিককাল নিউ ইয়র্কে থাকব। এরপর একটুখানি গ্রীষ্মকালীন নিরিবিলি ও বিশ্রামের জন্য সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাব—সে-স্থান যেখানেই হোক না কেন। মিসেস ব্যাগলি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে চলে এসেছেন এবং আমার অনেকগুলি ক্লাসে উপস্থিত থেকেছেন।

ক্লাসগুলি বেশ জোরকদমে চলছে; প্রায় প্রতিদিনই আমাকে একটি করে ক্লাস নিতে হচ্ছে এবং সেগুলি শ্রোতাতে ঠাসা হয়ে যায়। কিন্তু কোন 'টাকাকড়ি' নয়, শুধু তারা নিজেরাই নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়। আমি কোন দক্ষিণা নিই না। সভ্যরাই স্বেচ্ছায় ঘরভাড়া ইত্যাদি খরচের জন্য সাহায্য করে।

এই গ্রীষ্মেই আমার চলে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা।

সকলকে আমার ভালবাসা।

সকৃতজ্ঞভাবে চিরদিন আপনার
বিবেকানন্দ

৪ মিসেস জেমস ম্যাথুজ—মিস্টার হেলের এক বিবাহিতা ভগিনী।
৫ জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—**সম্পাদক**

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সন্ন্যাসযোগ

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫।।

শ্লোকার্থঃ *আত্মা পরমার্থত কাহারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। সকল বিবেকজ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বলিয়া প্রাণিগণ মোহবশে 'আমি [কর্ম বা ভোগ] করি ও করাই' ইত্যাদি ভ্রম করিয়া থাকে।*

ব্যাখ্যাঃ ভগবানের তত্ত্ব মানুষ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। ভগবানের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ঋষিরা ঈশ্বরকে মানুষরূপে পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেইজন্য মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানকে তাহাদের ন্যায় রাগদ্বেষযুক্ত একটি জীব বলিয়া মনে করে। দীর্ঘকাল বেদান্তমতে চিন্তা ও সাধন করিলে ভগবানের তত্ত্ব কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডে থাকিতেন। ভারতবর্ষের সবদিক বিবেচনা করিয়া আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইসব আইনের বিষয় যাহারা জানিত, তাহারা ভারতে সুখে-শান্তিতে থাকিত। আর যাহারা আইনভঙ্গ করিত, তাহারা শাস্তি পাইত। এক ব্যক্তি চুরি করিয়া যখন জেলে গেল, তখন সে বিচারকদের উপরই বিরক্ত হইত—রানী ভিক্টোরিয়ার উপর নহে। আবার কেহ আইন অনুসরণ করিয়া যখন সুখী হইত, তখন ভিক্টোরিয়াকে সুখদায়িনী মনে করিত না। তবে তখনো মূর্খ ব্যক্তি সুখের সময় বলিত, 'ধন্য রানী ভিক্টোরিয়া' আর দুঃখের সময় রানীকে গালাগাল করিত। এই সৃষ্টিটা প্রায় সেইরূপই বটে। জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি পরিচালনের নিয়মও স্রষ্টার ইঙ্গিতেই হইয়াছে। সেইজন্য সাধারণ লোকে ঈশ্বরকেই দায়ী করে। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বস্তু ব্রহ্ম পশ্চাতে আছেন বলিয়াই এই বিষম ক্রিয়াশীল জগৎ অবিরাম চলিতে পারিতেছে। জ্ঞানীরা এই ব্রহ্ম ও তাহার সৃষ্টির তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মানুষ যে ইচ্ছা করিয়াই এই জগৎখেলায় যোগদান করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলেই যে সে ইহা হইতে বিরত হইতে পারে, তাহা বদ্ধ অবস্থায় মানুষ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। নিজের উপর সব দায়িত্ব লইয়া আমরা নিজেরা যে নিজেকেই কষ্ট দিতেছি, তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, আমরা সংসার-ভোগের লালসায় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের ইহাতে কোন স্বার্থ নাই। তবে কেন তিনি এই সৃষ্টিতে জীবের এত দুঃখ দেখিয়াও সৃষ্টি বন্ধ করেন না? আমরা দুঃখে পড়িলেই এই কথা বলি, আর সুখের সময় আরো সুখ পাইবার জন্য তাঁহার কাছে আরো প্রার্থনা জানাই। মুনি-ঋষিরা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয় পন্থাই তো সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের দিকে যাইতে মানুষ আদৌ চেষ্টা করে না বলিলেই চলে। অজ্ঞান ব্যতীত ইহার আর কী কারণ হইতে পারে? যাহাদের একটু চৈতন্য হয়, তাহারাই তো এই সৃষ্টির বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং সফলকাম হয়। অতএব ভগবানকে আমাদের কোনকিছুর জন্যই দায়ী না করিয়া পুরুষকার সহায়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করাই প্রকৃত জ্ঞান।

[**মন্তব্যঃ** পূর্বেই বলা হইয়াছে, গীতার মতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব নাই। যিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও 'আমি কর্তা' ইত্যাদি অবিদ্যাজাত ভ্রম হইতে মুক্ত হন।—**সম্পাদক**]

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬।।

শ্লোকার্থঃ *অজ্ঞান বা অবিদ্যা অনাদি। অনাদি এই অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের দ্বারাই নাশ্য। সূর্য যেমন সকল বস্তুকে অবভাসিত করেন, তেমনি আত্মজ্ঞানীর উপলব্ধি শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে সর্ববস্তুতে প্রকাশিত করিয়া থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া দেহের ভিতর থাকিয়া সুখী হইবার জন্য জীব প্রাণপণ চেষ্টা করে। অবশেষে যখন দেখে—এই দেহে থাকিয়া সুখী হইবার কোন আশা নাই, তখন গুরুর উপদেশানুসারে ব্রহ্মের স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন সে দেখে, আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি জীব হইয়াছি। আমি প্রকৃতপক্ষে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপই ছিলাম, আছি ও থাকিব।

[**মন্তব্য ঃ** অজ্ঞান বা অবিদ্যা অনাদি, কিন্তু সান্ত। অন্তযুক্ত বলিয়া সান্ত। অবিদ্যার উৎস কোথায়, কবে—কিছুই জানা যায় না। তাই অনাদি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহা বিনষ্ট হয়। তাই সান্ত। সূর্য যদি গঙ্গাজলে কিংবা সুরাতে প্রতিবিম্বিত হন, তাহা যেমন সূর্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বস্তুতে ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটিলেও ব্রহ্মবস্তুতে কিছু দোষ লাগে না।—**সম্পাদক**]

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব, ব্রহ্মেই স্থিতি, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ—তাঁহাদের সকল পাপ ও পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিধৌত হইয়াছে। তাঁহাদের পুনর্জন্ম অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে যাতায়াত আর হয় না।*

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব যাঁহার বুদ্ধিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সেই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করিবার জন্য নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত, যিনি ব্রহ্মকেই জীবনের একমাত্র গতি বলিয়া জানিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র শান্তির স্থান জানিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজনে নিযুক্ত, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন।

তদাত্মানঃ = তাঁহার [ব্রহ্মের] চিন্তা করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া যাওয়া যে, 'আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই' বোধ হইবে। মা যেমন ছেলের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বোধ করেন, নিজের সুখ-দুঃখকে হারাইয়া ফেলেন।

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষা = জ্ঞান হইলে যাবতীয় পূর্ব সংস্কার হইতে মুক্ত হইবে। তখন দেহ, মন ও বুদ্ধির যাবতীয় সু ও কু সংস্কার ছিন্ন হইয়া যায়। এককথায় জ্ঞানে ডুবিয়া যাওয়া।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *বিদ্বান, বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গাভি, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে যিনি সমদর্শী—তিনিই যথার্থ ব্রহ্মদর্শী পুরুষ।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যখন জ্ঞানাতীত অবস্থালাভ করে, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যায়। তখনকার অবস্থাকে বলে 'ব্রহ্মনির্বাণ'। সেই অবস্থায় কি বোধ হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার নিম্নে ব্রহ্ম, বিদ্যামায়ার দ্বারা নিজেকে বহু আত্মায় বিভক্ত করিয়া নিজেই নিজের মহত্ত্ব বোধ করেন। সেই অবস্থায় জগৎ দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু জগতের সব বস্তুই এক ব্রহ্মের দ্বারা নির্মিত বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় আমি তোমাদের সকলকেই দেখছি রাম। উদাহরণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে চিন্ময় কোশাকুশি, মোমের বাগান, ফলমূল ইত্যাদি।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯।।

শ্লোকার্থ ঃ *যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত অর্থাৎ সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, তাঁহারা এই জীবনেই সৃষ্টি (সর্গ) বা জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন। কারণ, ব্রহ্ম চণ্ডাল-ব্রাহ্মণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাই সেই জ্ঞানী বা সমদর্শী পুরুষগণকে দোষ কখনো স্পর্শ করে না।*

ব্যাখ্যা ঃ বাহিরের কোন বস্তু যাঁহার মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা উপস্থিত করে না; শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান, সৎ-অসৎ, সাধু ব্যক্তি-অসাধু ব্যক্তি প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা ভাল এবং মন্দ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া থাকি—তাহাদের সবগুলিকে যিনি একভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার মনের সাম্য এবং শান্তভাব কিছুতেই নষ্ট হয় না—তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেন; কারণ ব্রহ্মানুভূতি হইলে মানুষের মন সর্বদা সাম্যভাবেই অবস্থান করে। তখন তিনি এই সৃষ্টিকে জয় করিয়া ইহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যান। [ক্রমশ]।।চব্বিশ।।

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৭ পঙ্‌ক্তিতে 'যেন তস্য প্রতিমা অস্তি'-র পরিবর্তে 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি' হবে।

গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার ৪৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা ঃ ১-এ 'নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি'র পরিবর্তে 'আলমবাজার মঠ' হবে। এই সংখ্যার ৪৭৬ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীএকাদশীদেবী-স্তোত্রম্' কবিতাটির ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'সুরাসুরবিনাশানাং'-এর পরিবর্তে 'মুরাসুরবিনাশাং' হবে। ঐ কবিতার বঙ্গানুবাদের ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'সুর নামক'-এর পরিবর্তে 'মুর নামক' হবে।

গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার ৫৭৪ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২২ পঙ্‌ক্তিতে '১৮৮৫'-এর পরিবর্তে '১৮৯৫' হবে। ঐ সংখ্যার ৫৮৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তিতে '৬ আগস্ট ১৯৪৬'-এর পরিবর্তে '৬ আগস্ট ১৯৪৫' হবে।



অগ্রহায়ণ ১৩১১
নভেম্বর ১৯০৪

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বতে অজ্ঞাতভাবে ৩।৪ বৎসর বাস করিয়া যখন কাশ্মিরে উপস্থিত হন, তখন তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিসবেট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া লন। ফরেণ অফিস হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইবার পর তাঁহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সকল সন্দেহ দূর হয় এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিব্বতাভিযানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া রেসিডেন্সির ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট ঐ কথা উত্থাপিত করেন। নানা কারণে ঐ প্রস্তাবানুসারী কার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, গভর্ণমেন্টের রেকর্ডপুস্তকে এখনও ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত রক্ষিত আছে।

•

বিগত ১২ই কার্ত্তিক রামকৃষ্ণ মিশনের আর একজন সন্ন্যাসী আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং অনেক দিন যাবৎ উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি কালিফোর্ণিয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

•

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির কথা অবগত আছেন। বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকটি যুবক স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর দলবদ্ধ হইয়া স্বামীজীর জীবনের আদর্শে জীবনগঠন ও নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতার্থে কর্ম্ম করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাঁহারা যে তাঁহাদের চেষ্টায় কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এই অঞ্চলের সকলেই অবগত আছেন। প্রতি বাড়ীতে হাঁড়ি রাখিয়া সমিতির সভ্যগণ সপ্তাহে সপ্তাহে চাল সংগ্রহ করেন। এইরূপে প্রায় ১২।১৩ মন চাল সংগৃহীত হয় ও প্রায় ৪০।৫০ ঘর নিঃস্ব ভদ্র পরিবারকে এতদ্দারা সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতির অনাথ বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩।১৪ জন বালক বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক ৪৬নং বোসপাড়া লেনে উক্ত সমিতির প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে প্রায় ৪০০ চার শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু পুলিন বিহারী মিত্র কয়েকটী ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলে সমিতির অনাথ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্তোত্রাদি আবৃত্তি করেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এবং সভাপতি স্বামী সারদানন্দ মহাশয় সমিতির উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে দি গ্রেট ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক আর্ট এণ্ড ভ্যারাইটি পার্টী কর্ত্তৃক ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাস্থলে বীরবাণী ও স্বামী বিবেকানন্দ নামক দুইখানি পুস্তিকা, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বিরচিত একটি কবিতা এবং স্বামীজীর হাফটোন ছবি বিতরিত হয়। পর দিবস রবিবার সমিতির অনাথবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

•

আগামী ২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি রবিবার দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির দেবালয়ে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাঘ-মহোৎসব হইবে।

•

কিছুদিন হইল, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে জনৈক বন্ধুর অর্থানুকূল্যে একটী দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে ও তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। মায়াবতী কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের লোকেরা অতি দরিদ্র। সমতল প্রদেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য তাহাদের নিকট পঁহুছে না। এই কারণে এখানকার অনেকে ২।৩ বৎসর ধরিয়া বিনা চিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এখানে দরিদ্র লোকের মধ্যে রোগের এত আতিশয্য যে, অজ্ঞ জনগণের ঔষধাপেক্ষা দেবতার কৃপায় অধিক বিশ্বাস থাকিলেও এমন কি, ৩০ মাইল দূর হইতেও রোগিগণ চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়া থাকে। অল্প অল্প দূর হইতে ত অনেকেই আসে। ইহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান না দিলে ইহাদের চিকিৎসা করা অসম্ভব। আবার একজন লোকের দ্বারাও সমুদয় কার্য্যগুলি সুনিয়মিতভাবে চলে না। এই সকল কারণে এই কার্য্যকে স্থায়ী করিবার জন্য অর্থসাহায্য আবশ্যক। সহৃদয় সাধারণকে এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। সাহায্যদাতাগণ তাঁহাদের সাহায্য স্বামী স্বরূপানন্দ, অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন। বিগত জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে এখানে সর্ব্বসুদ্ধ ৬৬৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

•

আমরা নিজের মুক্তিসাধন ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির মুক্তিসাধনের চেষ্টাকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্থল বলিয়া বিবেচনা করি। এই মুক্তি আমাদের সকলের আদর্শ হইলেও ইহার পথ সকলের পক্ষে এক নহে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত অধিকারভেদ আছে।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষণ

স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংস্করণ ও বিবেকানন্দ সংস্কৃতিকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে...

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত-ভাষণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীআব্দুল কালাম, রাজ্যপাল শ্রীবীরেন জে. শাহ, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র শ্রীসুব্রত মুখার্জি, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভ্রাতৃবৃন্দ এবং মাননীয় অতিথিবৃন্দ—

আজকের এই অনুষ্ঠান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিছুক্ষণ আগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটায় গড়ে ওঠা নতুন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। দেশ ও বিদেশের মানুষ স্বামীজীর জন্মস্থানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দিরের জন্য কয়েক দশক ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আমি ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী এ. পি. জে. আব্দুল কালামকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অনুগ্রহপূর্বক তিনি এই অনুষ্ঠানে আসতে রাজি হয়েছেন। অভিনন্দন জানাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীবীরেন জে. শাহ, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র শ্রীসুব্রত মুখার্জি এবং এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিকেও।

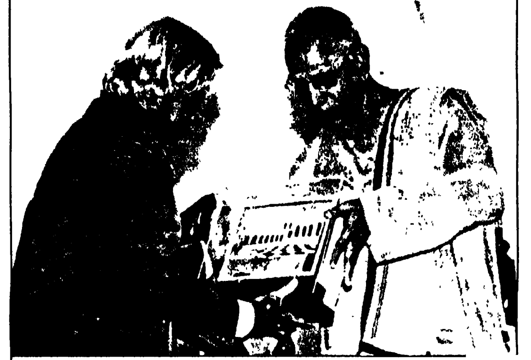
এই বৃহৎ প্রকল্পে প্রদত্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের কথা উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যে অবহেলা করা হয়। এছাড়া বহু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর নিকট থেকেও বেশ ভালরকম অনুদান এসেছে। কলকাতা পৌরসভা, পুলিশ, আমাদের আর্কিটেক্ট মেসার্স ডেভেলপমেণ্ট কনসালট্যান্টস (প্রাইভেট) লিমিটেড, কনট্রাক্টর মেসার্স লার্সেন ও টুব্রো লিমিটেড এবং আরো অনেকের কাছ থেকে আমরা অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি।

স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ি ও তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালা ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশনের এই নতুন শাখাকেন্দ্রে থাকবে উচ্চ মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক-গ্রন্থাগার, ধর্মের বিভিন্ন দিক, বিজ্ঞান, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি গবেষণাবিভাগ, গ্রাম ও শহরের বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জনকল্যাণ বিভাগ। স্বামীজী সমাজের দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে অনুভব করতেন। আশা করি রামকৃষ্ণ মিশনের এই নতুন কেন্দ্রটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সবশেষে একটি বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমরা অর্থনৈতিকভাবে অতি শক্তিশালী হওয়ার আশা করছি, তখন বিবেকানন্দের ভাবধারা খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে সর্বশক্তিমান হলেই চলবে না, তাকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে। এইরকম ভারতেরই স্বপ্ন স্বামীজী দেখতেন। আসুন, আমরা সকলে স্বামীজীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হই।

পুনরায় এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় অতিথিবৃন্দকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

ধন্যবাদ।



ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ

ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণ

ভারত জেগে উঠছে

স্বামীজীর বাড়ির পরিমণ্ডলে নির্মিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। এমন একটি পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের জন্য আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি জানলাম যে, স্বামীজীর আদি বসতবাড়ির মৌলিকতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া এই সংস্কারকার্যটি করেন। এই ঐতিহাসিক লগ্নে আমি সন্ন্যাসিবৃন্দকে প্রণাম জানাই ও আয়োজক রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ্‌গণ, স্বামীজীর অনুরাগিবৃন্দ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদাধিকারী ব্যক্তিগণ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রসারিত দৃষ্টি

বন্ধুগণ, স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ির এই সুন্দর পরিবেশে একটি ঘটনা আমি স্মরণ করি, যা ঘটেছিল ১৯০১ সালে বম্বে থেকে ইউরোপগামী একটি জাহাজে। দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি সেই জাহাজে ছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ ও জামসেদজী নউসেরওয়ানজী টাটা। পরিচয় আদানপ্রদানের পর স্বামীজী নউসেরওয়ানজী টাটাকে তাঁর গন্তব্য ও যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শ্রীটাটা বলেন, ভারতবর্ষে ইস্পাতশিল্প নিয়ে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য। বন্ধুগণ, এই ঘটনা ১৯০১ সালের, যখন ভারতবর্ষ ইংরেজদের পদাধীন! স্বামীজী বলেন, এটা নিশ্চিত একটি মহৎ উদ্দেশ্য—আমার শুভেচ্ছা জানবেন। কিন্তু আপনাকে আরেকটি বিষয় অনুধাবন করতে বলি—আপনি ইস্পাত নির্মাণ করার জন্য অর্থব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুবিদ্যা বিজ্ঞান বিষয়েও জ্ঞান আহরণ করুন। আমার ভাল

লাগবে, আপনি যদি এই বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার কী অদ্ভুত এই বাণী! এরপর বহু ঘটনা ঘটে যায়। জামসেদজী নউসেরওয়ানজী টাটা ইস্পাত তৈরি করার প্রযুক্তি ইংল্যাণ্ড থেকে আনতে পারেননি। তবে আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি ইস্পাত তৈরির বিশেষ পদ্ধতি জেনে নেওয়ার পর জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি গড়ে তোলেন। দুভাগে বিভক্ত এক বৃহৎ প্রকল্পের সৃষ্টি হলো। এক, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের জামসেদপুরে একটি ইস্পাত তৈরির কারখানা গড়ে তোলা। দুই, ব্যাঙ্গালোরে একটি ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলতে তিনি তাঁর সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দান করলেন।

কিছুদিন আগে জামসেদপুরে গিয়ে আমি জামসেদজী নউসেরওয়ানজী টাটার সেই দূরদৃষ্টির ফল প্রত্যক্ষ করি। আজ টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি বছরে চল্লিশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরি করছে। ভারত যে আজ ইস্পাত প্রযুক্তিবিদ্যায় স্বনির্ভর, তার কারণ টাটার সেই প্রসারিত দৃষ্টি। একই সঙ্গে আমরা দেখি, যে বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের বীজ একদিন উপ্ত হয়েছিল, আজ তা 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' হিসাবে এক মহৎ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ঘটনাটিতে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামীজীর এক অপূর্ব প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতকে শক্তিশালী ও উন্নত দেখতে চেয়েছেন। কারণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের যথাযথ ভূমিকা তিনি বহু আগেই অনুধাবন করেছিলেন। স্বামীজীই প্রথম জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর আবিষ্কারের স্বত্ব নিশ্চিত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান শুধু আধ্যাত্মিক জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যেও তা প্রসারিত ছিল।

ধর্মমতসমূহের পারস্পরিক সুদৃঢ় মেলবন্ধন

বন্ধুগণ, তামিলনাড়ুর আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে থাকাকালীন আমি রাজকোটের অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত হতাম। একবার রাজকোটের বিশপ রেভারেণ্ড ফাদার গ্রেগরি ক্যারোটেমপ্রেল, সি. এম. আই. আমাকে আহ্বান করেন ক্রাইস্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। ঐদিনই আমি স্বামী ধর্মবন্ধু আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'জীবনের দর্শন' বিষয়ে প্রায় এক লক্ষ ছাত্রের সামনে ভাষণ দিই। পরে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় এক ছাত্রসম্মেলনে যোগ দিতে আমাকে পোরবন্দর যেতে হয়। রাজকোটের অ্যালফ্রেড স্কুল—যেখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রারম্ভিক শিক্ষালাভ হয়—পরিদর্শনও আমাকে প্রভাবিত করে। একইদিনে ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দুটি ঘটনার কথা আমি আপনাদের গোচরে আনতে চাই।

ক্রাইস্ট কলেজের অনুষ্ঠানের আগে আমি বিশপের গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে আসি। গৃহে ঢোকার সময় মনে হলো, আমি যেন এক পবিত্র স্থানে এলাম। সেখানে এক অনুপম প্রার্থনাকক্ষে পরস্পর-সম্বন্ধরূপে সমস্ত ধর্মমতের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম। ফাদার গ্রেগরি ক্যারোটেমপ্রেল, সি. এম. আই. তাঁর এই অসামান্য প্রার্থনাকক্ষ তৈরির তাৎপর্য বোঝানোর সময় নিকটবর্তী স্বামীনারায়ণ মন্দির থেকে অনুরোধ আসে তাঁদের মন্দির দর্শনের জন্য। ফাদার গ্রেগরিকে এই কথা জানাতে উনিও আগ্রহভরে মন্দিরদর্শনে আমার সঙ্গী হলেন। মন্দিরে ঢুকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দীপ্ত বিগ্রহের সামনে এসে এক অনন্য অনুভূতি হলো। সময়টা ছিল দুপুরবেলা, যখন সাধারণত মন্দির বন্ধ থাকে—শুধু আমাদের জন্য ঐসময় মন্দির খোলা রাখা হয়েছিল। আমাদের সকলের কপালে তিলক পরিয়ে স্বাগত জানানো হলো। রেভারেণ্ড ফাদার গ্রেগরি, আব্দুল কালাম এবং ওয়াই. এস. রাজন—সকলের কপালে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল তিলক, সে এক দর্শনীয় মুহূর্ত! এই ঘটনাটি আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে উদ্ভূত শক্তির পরিচায়ক—যার পরিণতি এক অনন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে। এই ঘটনার ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে 'সুরাট স্পিরিচুয়াল ডিক্লারেশন' গৃহীত হয় এবং সেই উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনেরও মহতী অবদান ছিল।

প্রার্থনার শক্তি

পরের ঘটনাটি ছিল অতি মনোরম। রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে অনুরোধ করেন, বিমানবন্দর যাওয়ার পথে যেন কিছুক্ষণের জন্য আমি সেখানে আসি। আমি যখন মিশনে পৌঁছাই, তখন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী ও স্বামীজীর জীবনের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা চলছিল। এরপরই প্রার্থনার সময়। ছন্দোবদ্ধ তালে সুমধুর সঙ্গীত সমস্ত হলঘরে অনুরণিত হচ্ছিল। শতাধিক ভক্তের সঙ্গে আমিও প্রার্থনায় যোগ দিই। আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং প্রার্থনার গভীরতা আমায় এক অন্য স্তরে উন্নীত করে। আমার বন্ধুরা এবং সঙ্গী সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে আমার এই মানসিক উত্তরণ লক্ষ্য করেন। সেদিন আমি বুঝলাম, এখানে সময়ের জ্ঞান থাকে না। এটি হয়তো একটি সুসম্বদ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাব।

আজ এখন স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে অবস্থানকালেও আমি রাজকোটের উপলব্ধির মতোই এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করছি।

আমি জানতে পারলাম যে, এই কেন্দ্রে একটি পাঠ্যপুস্তক-গ্রন্থাগার তৈরির পরিকল্পনা আছে। এই প্রসঙ্গে আমি ভারতে ডিজিটাল লাইব্রেরি ইনস্টিটিউটের ওপর একটু আলোচনা করতে চাই—যা এখানকার পাঠ্যপুস্তক-গ্রন্থাগার ও গবেষণার কাজে সহায়ক হয়ে উঠবে।

ভারতে ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রারম্ভিক উদ্যোগ

ভারতে ডিজিটাল লাইব্রেরি পোর্টাল তৈরির জন্য ডিজিটাল লাইব্রেরি ওয়েব পোর্টালের একটি কার্যক্রম আছে। এটির কর্ণধার 'মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি'। সৃজনধর্মী কাজকে লালিত করা এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার করায়ত্ত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগে সহযোগী হয়েছেন 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' এবং আমেরিকার 'কার্ণেগি মেলন ইউনিভার্সিটি'। এই ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২০০৫ সালের মধ্যে ভারতে অনুসন্ধানযোগ্য ও পঠনোপযোগী ১০ লক্ষ পুস্তকের একটি সম্ভার গড়ে তুলবে। অদ্যাবধি ভারতে

৮০,০০০ পুস্তক ডিজিটাইসড হয়েছে—যার মধ্যে ৪৫,০০০ পুস্তক ৯টি প্রাদেশিক ভাষায় অনলাইনে (ওয়েবসাইট-এ) পাওয়া যাচ্ছে। এখানকার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের পাঠ্যপুস্তক এইভাবে ডিজিটাইস করা এবং আনুষঙ্গিক কাজের সফ্টওয়্যার অ্যাকসেসের জন্য 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এর প্রফেসর এন. বালাকৃষ্ণাণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিজিটাল লাইব্রেরি ইনস্টিটিউট-এর স্মৃতিক্ষমতা প্রতিবছর দ্বিগুণ হচ্ছে। আজ মাত্র কয়েক গ্রাম ওজনের ৩০০ জি. বি. ডিস্ক ১০০ ইউ. এস. ডলারে পাওয়া যায়, যা ৩০ হাজারের বেশি বই ধারণে সক্ষম। আর দশ বছরের মধ্যে ঐ একই মাপের ডিস্ক ৩ কোটি বই ধারণের উপযোগী হবে। ভেবে দেখুন, আপনার হাতের মুঠোয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের চেয়েও বড় একটি গ্রন্থাগার। এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ডিজিটাল গ্রন্থাগার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতাস্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে—যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, তুলনামূলক ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত মানুষের কাছে খুবই সহায়ক হবে।

আমি আরো জানলাম যে, এই সংস্কৃতিকেন্দ্র দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে গ্রামীণ ও বস্তি উন্নয়নকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি গ্রামের জনগণকে সাহায্য ও যথাযথ নির্দেশ-উপযোগী 'PURA' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই।

PURA

(Providing Urban Amenities in Rural Areas)

'PURA'-র মাধ্যমে গ্রামের মানুষের শহরাঞ্চলে বসবাসের জন্য আগমন নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। আমাদের পরিকল্পনা হবে গ্রামীণ পরিবেশকে এমন আকর্ষণীয় করে তোলা যে, শহরের মানুষই গ্রামে বসবাস করতে আকৃষ্ট হবে। এর ফলে স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি বড় শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার হ্রাস করে অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, দূষিত পরিবেশ, অপরাধ বৃদ্ধি, রোগবিস্তার এবং সর্বোপরি শহরবাসীর জীবনযাপনের নিম্নমান প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

সংযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধি

আমাদের দেশের ৭০ কোটি মানুষ ৬ লক্ষ গ্রামে বাস করেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি সেতুনির্মাণের লক্ষ্যে, চাকরির সুযোগ বাড়াতে ও গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে 'সংযোগ'-এর মাধ্যমে গ্রামগুচ্ছগুলিতে সমস্ত বর্গের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়ানো সত্বর কাম্য। জল, বিদ্যুৎশক্তি, রাস্তাঘাট, শৌচব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা, রোজগার যোজনা—এগুলিই আজ গ্রামের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি ও অপরিহার্য।

অপরিহার্য সংযোগব্যবস্থা

যে একীকরণ প্রক্রিয়া গ্রামীণ ভারতে প্রাচুর্য আনতে পারে, তা হলো : *প্রাকৃতিক সংযোগব্যবস্থা*—উৎকৃষ্ট রাস্তা ও পরিবহণ। *ইলেকট্রনিক সংযোগব্যবস্থা*—উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার অপটিক কেবল-এর মাধ্যমে শহরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ও ইণ্টারনেট পরিষেবা। *জ্ঞানবৃদ্ধিতে সংযোগব্যবস্থা*—শিক্ষা, বৃত্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে চাষি, শিল্পী, কারিগরদের শিক্ষাদান ও নির্দিষ্ট কর্মোদ্যোগ প্রণয়ন। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও ব্যাঙ্কের সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যাবে এবং তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও করা যাবে।

এই প্রণালী অবলম্বন করে এই সংস্কৃতিকেন্দ্রটি কলকাতার আশপাশের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 'PURA'-র কাজ শুরু করতে পারেন, যাতে যোগদান করবেন কিছু N.G.O., লোকহিতৈষী ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক। এভাবে গ্রামের মানুষের জীবনে প্রগতি আনার প্রচেষ্টাই হবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।



বিবেকানন্দ সংস্কৃতিকেন্দ্রে সংগ্রহশালা পরিদর্শন করছেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি

উপসংহার

প্রিয় সুহৃদগণ, আমার মনে পড়ছে দেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর প্রেরণাপূর্ণ বাণী : নিজে শেখ; প্রত্যেকে তার স্বরূপের শিক্ষা দাও। নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান কর এবং প্রত্যক্ষ কর কিভাবে সে জাগছে। শক্তি আসবে, যশ আসবে, মঙ্গল আসবে, পবিত্রতা আসবে, পরমোৎকৃষ্ট সমস্তই আসবে—যখন এই নিদ্রিত সত্তা আত্মসচেতনতায় জেগে উঠবে।

স্বামীজীর এই আত্মসচেতন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান প্রকৃতই চিত্তের ন্যায়পরায়ণতার বিবর্তনের ফলস্বরূপ। এই ন্যায়ানুসারী হৃদয়বৃত্তিই চরিত্রে সৌন্দর্য আনয়ন করে। এই চারিত্রিক সৌন্দর্য গৃহে সমন্বয় সৃজন করে। গৃহমধ্যগত এই সমন্বয় ভাব দেশে শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করে। জাতির এই শৃঙ্খলাই সারা বিশ্বে শান্তির অগ্রদূত। সুতরাং আমরা এইভাবে প্রবুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টিতে ব্রতী হই, যা হবে স্বামীজীর ইচ্ছার প্রকৃত প্রতিফলন। এইসব জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত নাগরিকের শরীর হবে দৃঢ় এবং মন অদমনীয় তেজে পূর্ণ, যারা শুনবে স্বামীজীর সুস্পষ্ট নিনাদ—"ওঠ, জাগ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"

উন্নত ও প্রাচুর্যে ভরা ভারত আমাদের লক্ষ্য, যেখানে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ আনতে সহায়ক হবে। এই সংস্কৃতিকেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুক, যেখান থেকে এইসব মহৎ চিন্তা ও কার্যাবলী সঞ্চারিত হতে থাকবে। এই সংস্কৃতিকেন্দ্র ও প্রাচীন গৃহটির উদ্বোধন করে আমি অতীব আনন্দিত। আশা করি, যারা এই স্থান পরিদর্শনে আসবেন, তাঁরা প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করবেন। আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, যাঁরা এই স্থান পরিদর্শনে অপারগ—তাঁরাও যেন অনুরূপ অনুভূতির অধিকারী হন।

ভগবানের আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। ❑

মাতৃতীর্থপরিক্রমা

শ্যামপুকুরবাটী

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ত্রয়োবিংশ পর্যায়ে শ্যামপুকুরবাটী।—**সম্পাদক**

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে 'শ্যামপুকুরবাটী' (৫৫এ, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাক্ অন্ত্যলীলাস্থল। 'কথামৃত' গ্রন্থের প্রথম ভাগের পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ খণ্ড, তৃতীয় ভাগের বিংশ থেকে দ্বাবিংশ খণ্ড, চতুর্থ ভাগের সপ্তবিংশ থেকে ত্রিংশ খণ্ড, 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', 'শ্রীম-দর্শন' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে এই শ্যামপুকুরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘদিন অবস্থানের ও নানা অপূর্ব লীলার কথা বর্ণিত আছে। শ্যামপুকুরের বিত্তশালী গোকুল ভট্টাচার্যের অট্টালিকা-সংলগ্ন বৈঠকখানা বাড়িটিকেই 'কথামৃত' গ্রন্থে 'শ্যামপুকুর-বাটী' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৮৮৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কণ্ঠদেশে 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ঐ রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তখন তাঁর সুচিকিৎসার জন্য ভক্তগণ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় আনা স্থির করেন। প্রথমে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে ভক্তগণ সেখানে ঠাকুরকে নিয়ে আসেন, কিন্তু ঐ ছোট বাড়িতে মুক্তবায়ুর অভাব দেখে ঠাকুর প্রবেশ করেই বাড়িটি ত্যাগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তসঙ্গে পদব্রজে তাঁর প্রিয় গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে (বলরাম মন্দির) চলে আসেন। প্রথমাবস্থায় কয়েকদিন সেখানে থাকাকালীন ভক্তগণ ৫৫ নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়িটি ভাড়া করেন এবং সেই প্রশস্ত ভবনে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। পরে এই বাড়িটিই ভক্তমহলে 'শ্যামপুকুরবাটী' নামে পরিচিত হয়।

এই শ্যামপুকুরবাটীর পর্বটি ঠাকুরের প্রাক্ অন্ত্যলীলায় মুখরিত ছিল। ১৮৮৫ সালের ২ অক্টোবর তথা ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৮ আশ্বিন ঠাকুর এই বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং ১১ ডিসেম্বর অবধি ৭০ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে এখানে কত ভগবৎ প্রসঙ্গ হয়েছে, কত ভক্ত ও পার্ষদ আগমন ও অবস্থান করেছেন, কত বিচিত্র লীলার সমাবেশ হয়েছে, কত দুর্লভ ভাবসমাধি ঘটেছে, আবার কত কৃপাদান পর্বও অনুষ্ঠিত হয়েছে! ভগবানের লীলাস্মৃতির সঙ্গে এখানে আরো যাঁদের পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাঁরা হলেন —শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের বিশেষ অন্তরঙ্গ ও লীলা-পার্ষদগণ। আরো যাঁদের স্মৃতি এখানে বিশেষভাবে জড়িত, তাঁরা হলেন—'কথামৃত'-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী, চিত্রকর অন্নদা বাগচী, লেখক রাজকৃষ্ণ রায়, অভিনেত্রী বিনোদিনী, খ্রিস্টান ধর্মযাজক প্রভুদয়াল মিশ্র, ভক্তিমতী গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি প্রমুখ। এছাড়াও এসেছেন ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ —পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহিমাচরণ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ (দানাকালী), কালীপদের কনিষ্ঠা ভগিনী



শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপূত শ্যামপুকুরবাটী। ইনসেটে বাড়ির প্রবেশপথ ◆ *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

মহামায়া দেবী, চুনীলাল বসু, হরিবল্লভ বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র গুপ্ত, মনমোহন মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, নিত্যগোপাল, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, রামতারণ, অধ্যাপক নীলমণি, দুকড়ি ডাক্তার, নবীন কবিরাজ, অমৃত সরকার, শ্যাম বসু, বিহারী মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সকলের স্মৃতিতে এই বাড়িটি ভরপুর।

এই বাড়িতেই ১৮৮৫ সালের ৬ নভেম্বর কালীপূজার দিনে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পূজা করেছিলেন, আর তিনি সমাহিত অবস্থায় ভক্তদের একহাতে 'বর' ও অন্যহাতে 'অভয়' প্রদান করেছিলেন। এই বাড়িতে থাকাকালীনই ঠাকুর একদা ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের একান্ত আগ্রহে শারদীয়া মহাপূজায় তাঁর বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও জ্যোতিঃপথে উপস্থিত হয়ে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। এই বাড়িতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন জগন্মাতা জানিয়ে দিয়েছিলেন, অপবিত্র লোকেরা তাঁর চরণস্পর্শ করে পাপমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর তাদেরই অসহ্য পাপভারে তাঁর শরীরে ক্ষত হয়েছে। ধর্মীয় নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অনেক তীর্থভ্রমণের পর এই বাড়িতে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ নিজের বুকে ধারণ করে সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতাররূপে তাঁকে বরণ করেছিলেন। এই বাড়িতেই নটী বিনোদিনী প্রাণের টানে অসুস্থ ঠাকুরকে পুরুষের ছদ্মবেশে দেখতে এসে কৃপালাভ করে পরবর্তী জীবনে সাধিকায় পরিণত হয়েছিলেন। আবার এই বাড়িতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। এরকম নানা অপূর্ব ঘটনায় এই বাড়িটি সত্যই এক মহাতীর্থে পরিণত।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে ভক্তেরা সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন, তখন শ্রীশ্রীমাকে তাঁর সঙ্গে আনা হয়নি; দক্ষিণেশ্বরেই তিনি একাকী ছিলেন। বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকদিন মাত্র থাকার পর যখন শ্যামপুকুরবাটীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর যথাযথ সেবার জন্য ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে (১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসে ঠাকুরের আগমনের কয়েকদিন পর) শ্যামপুকুরবাটীতে নিয়ে আসেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "ঠাকুরের শ্যামপুকুরে আগমনের কয়েকদিন পরেই ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, সুচিকিৎসার সহিত দিবারাত্র সেবা ও সুপথ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও থাকা আবশ্যক। যুবক ভক্তগণ সেবাভার গ্রহণ করিলেও পথ্যের জন্য শ্রীমাকে ঐ বাটীতে আনয়ন ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা গেল না। কিন্তু তখন আরেক সমস্যা উপস্থিত হইল। বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট অন্দরমহল নাই; কাজেই শ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী থাকিবেন, ইহা ভক্তগণ স্থির করিতে পারিলেন না। বিশেষত তাঁহার অপূর্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়া অনেকে তাঁহার আগমন সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। এত দীর্ঘকাল নহবতে থাকিয়াও যিনি কখনো কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই, তিনি সর্বপ্রকার লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে আসিয়া বাস করিবেন—ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অথচ গত্যন্তর না থাকায় তাঁহাকে আনিবার এই প্রস্তাবে ঠাকুরের অনুমতি লইতে হইল। তিনি ভক্তদিগকে শ্রীমায়ের পূর্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, 'সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে? যা হোক, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সকল কথা জেনেশুনে সে আসতে চায় তো আসুক।' ভক্তগণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল উপাদান অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐরূপ অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসঙ্গে ভাবিবার ছিল শ্রীমায়ের স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী স্বীয় জীবনধারাকে পরিচালিত করার অপরিসীম ক্ষমতার, বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগে প্রস্তুত থাকার কথা। কার্যতও দেখা গেল যে, আহ্বান আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া শ্যামপুকুরে আগমনপূর্বক নির্দিষ্ট কর্তব্যে রত হইলেন।"[১]

শ্যামপুকুরের এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "শ্যামপুকুরে ঐ ৫৫ নম্বর বাড়ি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়া উভয়দিকে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর রোয়াক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ঘর। উপরে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; বাম ভাগে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমে যে-দ্বার পাওয়া যায়, উহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সুপ্রশস্ত কক্ষের প্রবেশপথ। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি ঘর। একখানিতে ভক্তগণ এবং অপরখানিতে শ্রীমা রাত্রে বাস করিতেন। ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথে পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার গায়ে চারিহাত আন্দাজ চতুষ্কোণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল। এই চাতালেই শ্রীমায়ের সারাদিন কাটিত এবং এখানেই ঠাকুরের পথ্যাদি রন্ধন হইত।

"ঐ বাড়িতে একটিমাত্র স্থান সকলের স্নানাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকায় শ্রীমা অপর সকলের পূর্বে রাত্রি তিনটার সময় নিচে নামিয়া স্নানাদি সারিয়া তেতলায় ছাদে সিঁড়ির পার্শ্বে চাতালে উঠিয়া যাইতেন। সেখানে যথাকালে পথ্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে বৃদ্ধ গোপাল-দাদা বা লাটুর দ্বারা নিচে সংবাদ পাঠাইতেন; তখন সুবিধা হইলে ঠাকুরের ঘর হইতে লোক সরাইয়া দিয়া শ্রীমাকে পথ্য লইয়া আসিতে বলা হইত; নতুবা সেবকগণ তাঁহার নিকট হইতে উহা লইয়া আসিতেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমা ঐ চাতালেই বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে

আন্দাজ এগারোটার সময় নামিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট ঘরে রাত্রি দুইটা পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন অম্লানবদনে এই কঠিন সেবাব্রত পালন করিতে লাগিলেন। অথচ সেবার সর্বপ্রধান কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার কর্তব্য লোকচক্ষুর অন্তরালে এমনই নীরবে অনুষ্ঠিত হইত যে, যাঁহারা প্রত্যহ সেখানে যাতায়াত করিতেন তাঁহারাও তাঁহার উপস্থিতির কথা জানিতে পারিতেন না।"[২]



বাঁদিকে ওপরের ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা বাস করতেন ◆ আলোকচিত্র ঃ ডি. ডি. সাহা

বলা আবশ্যক, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর অবধি শ্যামপুকুরে অবস্থানের পর ঠাকুরকে উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্যামপুকুরবাটীতে অন্তরালবর্তিনী শ্রীশ্রীমা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো যেভাবে ঠাকুরের দেবতনুর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তাতে ঠাকুরের লীলাস্থল ছাড়াও এই শ্যামপুকুরবাটী মাতৃতীর্থে পরিণত হয়েছে—একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্যামপুকুরের এই বাড়ি থেকে ঠাকুর কাশীপুরে চলে যাওয়ার পর বহুদিন এই বাড়িতে কেউ বাস করেনি; প্রকৃতপক্ষে এটিকে লোকে 'ভূতুড়ে বাড়ি' মনে করত। পরে অবশ্য এই বাড়ি ভাগ করে ভাড়া দেওয়া হয়। ৫৫এ অংশের এই বাড়ির আবাসিকা (বর্তমানে পরলোকগতা) পরম ভক্তিমতী, কৌমার্যব্রতধারিণী লক্ষ্মী গোস্বামীর অনুপ্রেরণায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত যুবক এখানে ১৯৭৮ সালের ২৭ আগস্ট 'শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বাড়িটির স্মৃতি বজায় রাখার ভার গ্রহণ করেন এবং বাড়ির তৎকালীন মালিক সন্তোষকুমার বসুর অভিপ্রায়ে এই বাড়ির তত্ত্বাবধানের ভার সঙ্ঘের ওপর ন্যস্ত হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক এই বাড়ির দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ঘরখানির আমূল সংস্কারের পর ঘরটি আকারে ও আয়তনে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূল স্থানটি এখনো অবিকৃতই আছে এবং সেখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিত্রয় বেদির ওপর পূজিত হচ্ছে।

স্মরণ সঙ্ঘের সম্পাদক গৌতম গুপ্তের (শ্রীম-র অন্যতম প্রপৌত্র) সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, ঠাকুরের এই বাড়িতে অবস্থানের প্রায় ৯৩ বছর বাদে একমাত্র গৃহী ভক্তদের প্রচেষ্টায় এই লুপ্ততীর্থ পুনরায় জাগ্রত হয়েছে এবং পরে বেলুড় মঠের সহায়তায় এটি নবরূপ ধারণ করেছে। বাড়ির দুটি অংশের মধ্যে যে-অংশটিতে (৫৫এ) ঠাকুর বাস করতেন, সেই অংশটি ১৯৮৮ সালে বেলুড় মঠ ও স্মরণ সঙ্ঘ যৌথভাবে ক্রয় করেন এবং স্মরণ সঙ্ঘ এর দায়িত্বে থাকেন। যে-অংশের (৫৫বি) ছাদের আচ্ছাদনযুক্ত চাতালে শ্রীশ্রীমা সারাদিন কাটাতেন ও ঠাকুরের পথ্যাদি রান্না করতেন, সেই অংশটিও ভাড়াটিয়াসমেত ১৯৯৫ সালে বেলুড় মঠ ও স্মরণ সঙ্ঘ যৌথভাবে ক্রয় করেন এবং এটিরও দায়িত্বে থাকেন স্মরণ সঙ্ঘ। ভাড়াটিয়া তোলার পর ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে এটির অধিগ্রহণ করা হয়। সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী, বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ঐ চাতালের ঘরটি সংস্কারের পর সেখানে ২০০৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন স্বামী প্রভানন্দজী। বর্তমানে দুটি অংশসমেত সমগ্র বাড়িটি বেলুড় মঠ ও স্মরণ সঙ্ঘের অধীনে এলেও আপাতত এটি পরিচালনার দায়িত্ব স্মরণ সঙ্ঘের ওপরেই ন্যস্ত আছে। ❑

পথনির্দেশ ঃ ৫৫এ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪। উত্তর কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ঢুকে কয়েক মিনিট হেঁটে গেলে ডানদিকে রাস্তার ওপরেই এই দোতলা বাড়িটি দেখা যাবে। বাড়ির দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা ঃ "Here lived for sometime Sri Sri Ramkrishna Paramhangsa Dev." বাড়ির গায়ে পশ্চিমদিকে রয়েছে এক প্রাচীন শিবমন্দির, যা ঠাকুরের সময়েও ছিল। দোতলার বারান্দায় রাস্তার ওপর এক স্মারক প্রতীক—'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ'।

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৭৭
২ ঐ, পৃঃ ৭৭-৭৮

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্ব

মিনতি কর

[পূর্বানুবৃত্তি]

অবিদ্যা বা মায়া

যা আছে বলে পরিদৃষ্ট হয় অথচ থাকে না—তাকে বলা হয় দৃষ্টনষ্টস্বরূপ, একেই বলে 'মায়া' বা 'অবিদ্যা'। ত্রিগুণাত্মিকা জগৎপ্রসবিণী শক্তিই মায়া। মায়ার ফলেই ব্রহ্ম জগৎ-রূপে প্রতীত হয়। এর মধ্যে নাম-রূপ-দেশ-কাল-নিমিত্ত আছে, এজন্য একে বলা হয় ব্যাবহারিক সত্য আর ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য। বিবেকানন্দ বলছেন ঃ "মায়ার ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই, নামরূপকে কখনোই পৃথক করা চলে না; সেইহেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না, কিন্তু তারা একেবারে যে শূন্য, তাও নয়—একেই বলে মায়া।"[১৮] "মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।"[১৯]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, মায়া বা অবিদ্যার কার্যকারিতা কী? এর উত্তরে বলা যায়, মায়ার দ্বিবিধ কার্য—আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়া প্রথমে বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে, তাকে বলে 'আবরণ'। তারপর যে-বস্তু যা নয় তাকে সেইরূপে প্রতীত করে, একে বলা হয় 'বিক্ষেপ'। শঙ্করাচার্য 'বেদান্তকেশরী'তে খুব সুন্দরভাবে মায়ার বর্ণনা করেছেন ঃ

"চত্বারোঽস্যাঃ কপর্দা যুবতিরথ ভবেন্নূতনা নিত্যমেষা।
মায়া বা পেশলা স্যাদঘটনঘটনাপাটবং যাতি যস্মাৎ॥
স্যাদারম্ভে ঘৃতাস্যা শ্রুতিভববয়ুনান্যেবমাচ্ছাদয়ন্তী।
তস্যামেতৌ সুপর্ণাবিব পরপুরুষৌ তিষ্ঠতোঽর্থপ্রতীত্যা॥"[২০]

মায়ার চারপ্রকার উৎকর্ষ—(১) নিত্য যুবতী, নিত্যই নতুন; (২) মায়া অঘটনপটীয়সী—অতীব কৌশলসম্পন্না, (৩) মায়া ঘৃতাস্যা—আরম্ভে মধুরা পরিণামে বিষোপমা; (৪) শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মজ্ঞানের আচ্ছাদিকা।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা বিষয়ভাসকতা-গুণহেতু দুটি পাখির ন্যায় এই অজ্ঞানে অবস্থান করে। বিবেকানন্দ বলছেন ঃ

"মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়,
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিষ্পেষে;
পৃথিবী, নরক, স্বর্গ—ভাল ও মন্দের
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে।"[২১]

অদ্বৈতবাদী বলছেন, যখনি মায়াকে জানতে যাও তখন সে দূরে পলায়ন করে। কারণ, জ্ঞান হলে অজ্ঞান আর থাকে না।

সংসার

এই সংসারের স্বার্থপরতা, দুঃখকাতরতা, অসারতা, অন্ধকারময়তা স্বামীজীর চিত্তকে প্রবলভাবে করেছে। 'সখার প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ "স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব হেথা কোথা শান্তির আকার।" সকলেই স্বার্থান্বেষণে ব্যাকুল। সংসারাসক্ত সকল মানুষই এই সংসারকে স্বর্গ বলে মনে করে। দেখা যায়, অসাধু ব্যক্তিই এই জগতে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। সেকথাই বলেছেন স্বামীজী ঃ "যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।" এই স্বার্থপর মানুষের কথায় তিনি বলছেন ঃ

"হও জড়প্রায়, অতি নিচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।"[২২]

যার হৃদয় মানুষের দুঃখে আন্দোলিত, তার স্থান এই স্বার্থান্বেষী জগতে কোথায়? কিন্তু বিবেকবান পুরুষও আছেন, যার কাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা, যশ, মান, খ্যাতি তুচ্ছ। কারণ, তাঁদের দৃষ্টিতে জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। বিবেকবুদ্ধিতে বিচার করলে এই সংসারে সুখ-দুঃখের আবর্তন পরিলক্ষিত হবে। সংসারের সমস্ত সুখের পর্যবসান দুঃখে, সমস্ত আশার পর্যবসান নিরাশায়। 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ'-এ বলা হয়েছে, বস্তুর অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ ও বিনাশে দুঃখ। তাই সংসারে প্রকৃত সুখ কোথায়? স্বামীজী বলছেন ঃ

"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সেজন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।"[২৩]

জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনের নিরন্তর সঙ্ঘাত। শুধুই জীবনের জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলা। এখানে কেউ হাসে কেউ কাঁদে। আশার প্রলোভনে প্রমত্ত হয়ে মরীচিকাতে যেমন জলভ্রান্তি হয়, তেমনি দুঃখময় সংসারে মানুষ সুখের আশায় ভ্রান্ত হয়।

"পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে হায়—ভগ্ন তার শত আশা,
পুঞ্জীভূত মরিচার মতো।"[২৪]

বিবেকানন্দ আরো বলছেন ঃ "সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।" প্রকৃত সুখপ্রাপ্তির জন্য চাই বিবেক ও বৈরাগ্য। জীবনের যাকিছু অর্জন, সেসবই ধ্বংসস্তূপমাত্র। তাই ভক্তের আকুল প্রার্থনা—

"নিয়ে যাও জননী গো মোরে সেই দূর পরপারে,
যেথায় সকল দ্বন্দ্ব শেষ,
সকল দুঃখের পারে, অশ্রু যেথা নাহি দেখা দেয়
পার্থিব সুখেরও নাহি লেশ।"[২৫]

কর্মফল

এই জগতে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আছে। স্বামীজী বলছেন ঃ "জগতে তো যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; এরূপ বৈষম্য কেন? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান।... ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর!... বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন।... আমরা নিজেরাই

করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রের উপর সমভাবেই বর্ষণ করে। কিন্তু যে-ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত, তাহাই শস্যশালী হয়; যে-ভূমি ভালভাবে কর্ষিত নয়, তাহা ঐ বৃষ্টির ফললাভ করিতে পারে না। ইহা মেঘের অপরাধ নহে।... আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি।... পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে।... আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ।... তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফলভোগ করিতে আসে। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মবিধান; আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের নিয়ামক।... ইহা-দ্বারাই 'ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ' নিরাকৃত হয়। আমরা যাহাকিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে।"[২৬]

'দোষ কারো নয়' (No one to blame)—এই কবিতাটিতে তিনি কর্মতত্ত্ব ও সংস্কারতত্ত্বের কবিত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। স্বকৃত কর্মের জন্য অপর কেউ দায়ী নয়। ভাল-মন্দ-প্রেম-ঘৃণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব একটি অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ। সুতরাং একটিকে গ্রহণ করলে অপরটিকে গ্রহণ করতে হয়। কর্মপাশ কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না।

"ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি
বৃথা যত পরিতাপ আব
বুঝিয়াছি গূঢ় অনুভবে
স্বকর্মের কিবা অধিকার।
হর্ষ-ব্যথা অপমান যশ—
মোর কর্মে জাত প্রেতচয়,
ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।"[২৭]

'অধ্যাত্মরামায়ণ'-এ আমরা অনুরূপ ভাব দেখতে পাই:
"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো
হি লোকঃ।।"[২৮]

সুখ-দুঃখের দাতা কেউ নয়। এটি অন্যের দেওয়া—একথা ভ্রান্তিমাত্র। সমস্ত প্রাণীই নিজ কর্মসূত্রের দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ পূর্বকর্মফলানুসারেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। রামপ্রসাদও বলেছেন: "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

স্বামীজীর 'পানপাত্র' কবিতাটিতে অনাদি কর্ম ও সংস্কারের ধারা বর্ণিত হয়েছে, যা মানুষকে স্বীকার করতে হয়।

"তোমারি মন্থিত সুরা—দূর অতীতের
বাসনা বেদনা ভ্রান্তি যুগযুগান্তের।
দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ।"[২৯]

এই কর্ম ও সংস্কারের ধারা মানববুদ্ধির অগম্য। এই সংস্কারের ধারাকে বুঝতে চেষ্টা না করে পরম দেবতার দর্শনই আমাদের কাম্য। ঐ কবিতাতেই স্বামীজী বলছেন:

"লও এই পানপাত্র—
বুঝিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার,
শুধু চোখ বুজে দেখ স্বরূপ আমার।"[৩০]

প্রশ্ন হলো—তাহলে কি এই কর্মপাশ থেকে নিবৃত্তি নেই? বেদান্ত বলছেন: "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"[৩১]—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। অর্থাৎ সংসারে অনাসক্তিই মুক্তির প্রথম সোপান। আত্মদর্শন হলেই কর্মসংস্কার ক্ষয় হয়ে যায়। আবার সেই কথা—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ"।

মুক্তি ও জীবন্মুক্তি

স্বামীজী 'শিবস্তোত্র'-এ লিখেছেন: "বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ।"[৩২] অনাদি কর্মসংস্কারের ধারা প্রবহমান। আর কর্মপাশে বদ্ধ জীবের কী পরম দুর্গতি! এই সংস্কার ক্ষয়েরও উপায় আছে। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ই হলো মুক্তির সোপান। এই তিনটি সমভাবে অভ্যস্ত হলেই জীবন্মুক্তি সঙ্ঘটিত হয়। জীবন্মুক্তিই অদ্বৈতসাধনার রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে। বহুকাল ব্যর্থতা ও নিরাশায় আন্দোলিত হয়ে বহু সাধনার পরে যখন আত্মচৈতন্যের উদ্ভাসন হয়, তখন হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয় ও কর্মপাশ শিথিল হয়। শ্রুতি বলছেন:

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"[৩৩]

আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের গ্রন্থিভেদ হয়, সংশয় ছিন্ন হয় আর সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এই মর্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে ও এই জীবনেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, পরমাত্মার দৈববাণী অন্তরে শ্রুত হয়। বিবেকানন্দ লিখছেন:

"ঐ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান!
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয়
ডুবে গেল পরমা শান্তিতে।
জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ! আনন্দ! এ কী অপরূপ!"[৩৪]

'খুলে গেল দ্বার'—এই বাক্যটি হৃদয়ের গ্রন্থিভেদের ইঙ্গিত করে। 'গ্রন্থি' শব্দের অর্থ অবিদ্যার পাশ। এই পাশ ভস্মীভূত হলে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যের উদ্ভাসন ঘটে। ফলে জীবাত্মা শুদ্ধচৈতন্য অভিনিষ্পন্ন হয়ে 'সোঽহম্'-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। বিবেকানন্দ বলছেন:

"নহে দ্বৈত, নহে বহু—অদ্বৈতের ভূমি,
একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়।
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিন্তায়।"[৩৫]

তিনি অন্যত্রও বলেছেন: "খুলে যায় সকল বন্ধন, মায়ামোহ হয় দূর।"[৩৬] 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ বলা হয়েছে: "তদ্ সোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্"। বেদান্ত-মতে ঈশ্বর বিম্বচৈতন্য ও জীব প্রতিবিম্বচৈতন্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরে

এই বিশ্ব-প্রতিবিম্ব ভেদ থাকে না, কারণ ব্রহ্মে অভিনিষ্পন্ন হলে জীবভাব বিনষ্ট হয়। বিবেকানন্দ বলছেন :

"ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম!
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, 'সোঽহং সোঽহং'।"[৩৭]

'বেদান্ত-দর্শন' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন : "বেদান্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হইয়া যায়। জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ-রূপে নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে—নিত্য সত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে—পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ করাই অদ্বৈতবেদান্তের লক্ষ্য।"[৩৮] পরম আনন্দস্বরূপ জ্যোতির উদ্ভাসনে জীবের অনন্তের, সত্যের উপলব্ধি হয়—"আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৭) তাই তিনি বলছেন :

"আছ, আছ, তুমি আছ,
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ,---আমার ঈশ্বর তুমি,
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি।"[৩৯]

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় ব্রহ্মবিজ্ঞান থেকে। যদিও দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা বা ব্যাবহারিক সৎ, কিন্তু এরও সার্থকতা আছে "সম্মুখে পশ্চাতে চেয়ে দেখি--সব ঠিক সকলি সার্থক।" প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্যাবহারিক জগৎ যা মিথ্যা—এর সার্থকতা কোথায়? উত্তরে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, সোপানারোহণক্রমে একটিকে ত্যাগ করে অপরটিকে গ্রহণ করতে হয়। যতদিন পারমার্থিক জ্ঞান না হয়, ততদিন দ্বৈত প্রপঞ্চ সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতিও দ্বৈত প্রপঞ্চের অন্তর্গত। আত্মজ্ঞান হলে এসবের আর প্রয়োজন থাকে না।

ভক্তি ও গুরুতত্ত্ব

"মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" অর্থাৎ মুক্তির কারণ ব্রহ্মজ্ঞান। সেই সমুদয় সাধনের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। নিজের আত্মার স্বরূপ যে পরব্রহ্ম অন্য বিষয়কে বর্জন করে, তাঁর নিরন্তর চিন্তাকে 'ভক্তি' বলে। কেউ কেউ আত্মার যথার্থ চিন্তনকেও ভক্তি বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজনটি ভক্তিরসের দ্বারা পরিপ্লুত ও গুরুতত্ত্বটি এখানে পরিস্ফুট। শ্রুতি বলেছেন, 'আচার্যবান্ পুরুষোবেদ'—অপরোক্ষজ্ঞানবান গুরু শিষ্যের অপরোক্ষ ভ্রম দূর করতে সক্ষম। নররূপ ধরে যিনি শিষ্যের ভ্রম দূর করেন, তিনি আচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ বলছেন 'নির্গুণ গুণময়'। প্রশ্ন হতে পারে, যিনি নির্গুণ, তিনি কি করে গুণযুক্ত হবেন? সমাধানে বলা যায়, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তিনি কল্যাণগুণসমন্বিত ও হেয়গুণরহিত; পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি গুণরহিত শুদ্ধচৈতন্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তিনি বলছেন : যিনি জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমের পারাবার, যিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করে পরম বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার মতি থাক—

"বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ।"[৪০]

শিব, কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্রাদির মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়েছে। ভক্তি ও প্রেমের চরম পরিণতি হলো অভেদানুভব। স্বামীজী বলছেন : "প্রেমই সত্য, কারণ উহা মিলনকারক, ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্বের ভাব আনে—পৃথক করে। প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক।" ভক্তির মধ্যে উপাস্য উপাসকভাবে থাকে, তাই ঈশ্বরকে সগুণরূপে উপাসনা করা হয়।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতার মধ্যেও ভক্তি, শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে কবি বিবেকানন্দ চরমতত্ত্বটি উদ্ঘাটন করেছেন :

"সর্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য হয় যে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা...
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর।"[৪১]

'আমন্ত্রণ' কবিতাটির মধ্যে স্বামীজীর গুরুভক্তি প্রকটিত হয়েছে, তিনি 'রামকৃষ্ণদাস' বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। সংসারের আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদ্বন্দ্বের মূল স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন—

"শ্রীগুরুচরণাম্বুজ, ধরাবাসী সবাকারে করি নমস্কার
অমৃতের পূর্ণপাত্রে পান তরে আমন্ত্রণ করি বারংবার—
পরিপূর্ণ যাহা সর্ব অবতার-প্রাণসারে—
পূর্ণ যাহা সবাকার মিলিত সত্তায়—
সে অমৃত-পূর্ণপাত্র ধরিয়া মানবদেহ
রামকৃষ্ণরূপ লয়ে এসেছ ধরায়।"[৪২] [ক্রমশ] (দুই)

তথ্যসূচী : (১৮) বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৮৩; (১৯) ঐ, ৯ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ৩১৮; (২০) বেদান্তকেশরী, ২৬; (২১) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৪৫; (২২) ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২০৯; (২৩) ঐ; (২৪) ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫ (২৫) ঐ; (২৬) ঐ, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৫; (২৭) ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭; (২৮) অধ্যাত্মরামায়ণ, ২।৬।৬; (২৯) বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩; (৩০) ঐ; (৩১) ঈশ উপনিষদ্, ১; (৩২) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০০; (৩৩) মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮; (৩৪) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; (৩৫) ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮; (৩৬) ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৪; (৩৭) ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮; (৩৮) ঐ, ২য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ৩৪৭; (৩৯) ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪; (৪০) ঐ, পৃঃ ২০৬; (৪১) ঐ, পৃঃ ২১৪; (৪২) ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০।

ধর্ম

"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগী হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ আর ত্যাগ—দুটি বিপরীতমুখী ভাব। একটিতে আছে সংসারের যাকিছু সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুর্বার আকর্ষণ, অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বস্তু থেকে সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের হিল্লোলে গা ভাসিয়ে দেওয়া, অন্যটিকে আশ্রয় করে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় উদাসীন হওয়া ও স্রোতের গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। ত্যাগের প্রয়োজন কী? বেশ তো আছি—সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে। মন যা চায় তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন? কেন তাকে অনর্থক বিব্রত করা? সংসারের আরো দশজনে যা করছে—ধন, জন, মান নিয়ে সদা ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাপন—সেই তো বেশ। কেন মিছামিছি বিপরীত পথে যাওয়া—যেখানে আছে নিরন্তর অন্তরে দ্বন্দ্ব আর বাহিরে ব্যর্থতা! কিন্তু সহজ সরল ভোগের পথ মনের একান্ত কাম্য হলেও সেটিকেই সবসময় মন মেনে নিতে চায় না—এমনি আশ্চর্য তার গঠন। যখন দেখা যায়, ইন্ধন পেতে পেতে ভোগাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অবাধ গতিতে বেড়েই চলেছে, থামতেই চাইছে না—একশো হলো তো সহস্রের জন্য ভাবনা, সহস্র মিলল তো লক্ষের জন্য উন্মাদনা, আরো চাই আরো। তখন আর মন নিজেকে বাসনার অনলে দগ্ধ হতে দিয়ে চায় না, বিদ্রোহ করে ওঠে—পিছন ফিরে তাকিয়ে পর্যালোচনা করে—কতদূর এসেছি, কোথায় চলেছি, কেন চলেছি? এই কী শান্তির পথ? তখনি ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চায়, বলে—না না অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, পথ ভুলে অনেক দূর তো এসেছি, আর নয়। দেখে শুনে ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শান্তি চাই, সুখ চাই না, ভোগ চাই না।

ত্যাগের শক্তি অসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। সংসারের কেউ কোনকিছুর অধিকার ত্যাগ করলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ছোট ছোট শিশু বা বালকেরা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য বা ব্যবহারের জিনিস থেকে যখন অন্যদের দেয়, তখনি তাদের একটি আত্মতৃপ্তির অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আবহাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্নে লালিত হলে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ জীবনযাপন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন, ততটুকুর জন্যই আমাদের ভোগ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কোন এক জায়গায় গণ্ডি না টানলে উপায় নেই, ভোগবাসনা আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে কে জানে? এক ব্যক্তি শত জনকে বঞ্চিত করে প্রচুর ধন, প্রচুর খাদ্য, অপরিমিত বিলাসসামগ্রী ভোগ করবে—এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অনুচিতও। প্রত্যেক মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায়, তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত কিনা অবশ্যই চিন্তনীয়।

ঐহিক ভোগসুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব—যখন প্রশ্ন জাগে তখন সংসারে সীমার সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে একমাত্র অনন্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সাংসারিক পরিবেশে সবসময় পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ বরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য বৈরাগ্য যখন তীব্র হয় তখন কি অনুকূল কি প্রতিকূল যেকোন অবস্থার সঙ্গেই অক্লেশে যুদ্ধ করে পথ সহজ করে নিতে পারা যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণভাবে যে-ত্যাগ তা শ্রেষ্ঠ। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" (মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১০।৫) অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। এই আন্তর বৈরাগ্য বহু তপস্যার ফলে হয়। বাহিরে অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাসক্ত পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সদা বর্তমান। কিন্তু তপস্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবিলাসের মধ্য থেকে অনাসক্ত হওয়া অসম্ভব, বামনের চাঁদ ধরার ইচ্ছার মতো হাস্যকর। তপস্যা ব্যতীত অনাসক্তি লাভ অসম্ভব।

প্রকৃত ত্যাগীই অনলস নিষ্কাম কর্মী, তিনিই প্রকৃত কর্মী। যিনি নিজে মনেপ্রাণে ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করেছেন, তিনিই দেশের ও দশের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। কারণ, নিজের স্বার্থ বলতে যে তাঁর কিছুই নেই! ত্যাগ জীবনবিমুখতা নয়, জীবনকে পূর্ণ করার উপায়। একটি শরীর ও একটি মন দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বসুন্ধরার বিপুল সম্পদ—রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ তিনিই বিচিত্রভাবে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন—যিনি প্রকৃত ত্যাগী, সব ছেড়ে যিনি সব পেয়েছেন। ভোগীর চিন্তাধারণার বাইরে এই তত্ত্ব! স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় কথাটির তাৎপর্য কী তা বোঝা যায়। আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে

একবার বলেন, এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলালেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বের করে নিতে হবে, যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়। কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই। স্বামীজী তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি আপনার চেয়ে এই জগৎ-রূপ কমলালেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি, আর আমি তাই এ থেকে বেশি রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেওয়ার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কী আনন্দ, একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি, অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশহাজার গুণ বেশি রস পাবেন, এক ফোঁটাও বাদ যাবে না। এই হলো প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ। ত্যাগের অসীম শক্তির কথা ভেবেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন ঃ "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।/ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥" জগতে যতকিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য। জগৎ তাতে কল্পিত, মিথ্যা—এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতাবুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসবে, সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা অদ্বৈত নির্বিকার ভাব রক্ষা কর, কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।

অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ শেষে বোঝে, আপাতসুখকর ভোগের পথ পথ নয়; ত্যাগের পথই পথ—অনন্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শান্তির পথ। তাই ত্যাগই কাম্য, ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সর্ববিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করতে পারা যায়, ততটুকুই কল্যাণজনক। ❑

এই রচনাটি 'রা দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শব্দচেতনা ৪১

শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে বিশেষ শব্দছক

১	২				৩	■	৪		
■		■	■	■	৫			■	■
৬		■	৭	■		■	৮		■
	■	■	৯				■	■	১০
	■	■		■		■	১১		
১২			■	১৩	■	১৪	■	■	
	■	■	১৫				■	■	
■	১৬	১৭	■		■		■	১৮	
■	■	১৯			■	■	■		■
২০			■	২১					

পাশাপাশি ঃ (১) ভানুপিসির আসল নাম (৪) 'মিত্র' কীর্তনিয়া, যাঁর গানে শ্রীমা মুগ্ধ হন (৫) শ্রীমায়ের কৃপায় এঁর পানদোষ দূর হয় (৬) "—— ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ বসতে চায় না" (৮) মাকুর ছেলে (৯) শ্রীমা এই সাধনা করেছিলেন (১১) গৌরীমা কোয়ালপাড়া থেকে এঁকে সঙ্গে নিয়ে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের কাছে যান (১২) মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়—এপ্রসঙ্গে শ্রীমা যাঁর গল্প বলেছিলেন (১৫) শ্রীমা এই তীর্থে এসেছিলেন (১৬) '——জননী সারদা' (১৮) রাধু নিজের গর্ভধারিণীকে এই 'মা' বলতেন (১৯) ইনি শ্রীমায়ের কাছ থেকে গৈরিকবস্ত্র পান (২০) শ্রীমা একবার এই রূপ ধারণ করেছিলেন (২১) শ্রীমাকে সারদানন্দজী শোনাতেন "—— নিজজন প্রতিপালিনী শ্রীকালী"।

ওপর-নিচ ঃ (২) শ্রীমা যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—"আমাদের সর্বস্ব" (৩) শ্রীমায়ের অন্যতম চিকিৎসক 'ডাঃ সরকার' (৪) মধ্যরাত্রে শ্রীমায়ের উদ্দেশে পদ্মবিনোদের গান '—— হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' (৬) শ্রীমায়ের আশ্রিত আরামবাগের 'বসু' উকিল (৭) দরিদ্র ভক্তের দেওয়া যা দেখে শ্রীমা বলেন এ-ই আমার 'গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ' (১০) শ্রীমা এই ভাড়াবাড়িতে থেকেছেন (১৩) শ্রীমায়ের মাতামহ (১৪) শ্রীমায়ের 'ভারী' (১৭) শ্রীমায়ের ভাইঝি (১৮) শ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান স্বামী গৌরীশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মাঘ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

স্মৃতিকথা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী তারকেশ্বরানন্দজীকে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ

একবার স্বামী তারকেশ্বরানন্দজী খুব অসুস্থ হয়ে 'স্বর্গাশ্রম' (হৃষীকেশ) থেকে কনখলে এলেন। কল্যাণ মহারাজ বিশেষ দৃষ্টি দিলেন, যাতে তাঁর ঠিকমতো সেবাযত্ন হয়। আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ "ওঁর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিবি। উনি খুব উচ্চকোটির সাধু। ভাল করে ওঁর সেবা করবি।" তারকেশ্বরানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। আমিও দেখলাম, তিনি অসাধারণ এক সন্ন্যাসী, একজন সত্যকারের মহাত্মা। সবিশেষ যত্নের সঙ্গে আমি তাঁর পরিচর্যায় নিরত হলাম। সবসময় তিনি ধীর, স্থির ও প্রশান্ত থাকতেন। তাঁর স্বভাব ছিল সর্বদা ধ্যানপ্রবণ ও অন্যের আনন্দ-উদ্রেককারী। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক অনুপ্রেরণা ও উপদেশ পেয়েছিলাম—বিশেষ করে কীভাবে বিচলিত না হয়ে সব কাজ করতে হয় সেই সম্বন্ধে। একদিন আমি জানতে চাইলাম, তিনি কীভাবে সাধু হলেন? তিনি বললেন, ছাত্রাবস্থা থেকেই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তিনি ঘন ঘন উদ্বোধনে যেতেন। কিন্তু কলেজে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করতে হতো। ফলে ক্রমশ তাঁর মনে ধারণা জন্মায় যে, তাঁর দ্বারা আর কিছু হবে না। তাই একদিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন ঃ "মা, আর আমি এখানে আসব না। আমি এখানে বেমানান, এখানকার উপযুক্ত নই।" এইটুকু বলেই তিনি পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ছুটে গিয়ে তাঁর জামা ধরে তাঁকে আটকান। তারপর তাঁকে ঘুরিয়ে সামনে এনে তাঁর দুই কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন ঃ "যখনি তোমার মনে খারাপ চিন্তা আসবে, আমাকে মনে করো।" এই বলে তাঁকে ছেড়ে দেন। বাড়ি ফেরার পথে সেই তরুণের মনে ক্রমাগত কথাগুলো ঘুরতে থাকে ঃ "আমাকে মনে করো, আমাকে মনে করো; মনে রাখবে, মনে রাখবে।" রাতে বিছানায় শুয়েও তিনি সারাদিনের ঘটনার কথা ভাবতে থাকেন। মায়ের অপূর্ব স্নেহময় চোখদুটি সবসময় তাঁর মনে ভাসতে থাকে। এর কিছুদিন পরেই তিনি সন্ন্যাসলাভের জন্য বেলুড় মঠে যোগ দেন।


স্বামী কল্যাণানন্দ

তারকেশ্বরানন্দজীর তিতিক্ষা

তারকেশ্বরানন্দজী ছিলেন একজন সত্যকার মহাপ্রাণ সাধু। একবার তিনি যখন স্বর্গাশ্রমের নিকটবর্তী জঙ্গলে পরিভ্রমণ করছিলেন, দৈবক্রমে এক শিকারি ভুল করে তাঁকে হরিণ ভেবে গুলি ছোঁড়ে। লোকটিকে তারকেশ্বরানন্দজী ভাল করেই চিনতেন। কিন্তু পুলিশ এসে যখন আঘাতকারীকে তিনি চেনেন কিনা জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি চিনি, কিন্তু তোমাদের বলব না।" পুলিশ কর্তৃপক্ষ বারবার অনুরোধ করলেও তিনি তার নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি যখন সেবাশ্রমে এলেন, তখনো গুলিটি তাঁর বুকে থেকে গিয়েছিল। এর ফলে মাঝে মাঝে তাঁর অসহ্য মাথা ধরত—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হতো। সমস্তই তিনি সহ্য করতেন, কিন্তু কে তাকে গুলি করেছিল কখনো কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি।

কল্যাণ মহারাজের শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি

আমার ধারণা, স্বামী কল্যাণানন্দজী প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়েরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অবশ্য এটা সত্য যে, তিনি স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগে তিনি যে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ-লাভে ধন্য হয়েছিলেন—সেকথা আমি খুব ভাল করেই জানি। তিনি বারবার বলতেন ঃ "মায়ের কৃপা, মায়ের কৃপা।" স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফেরার আগে কল্যাণ মহারাজ প্রায়ই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন। মায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।

অনেকবার আমার চোখে পড়েছে, কল্যাণ মহারাজ তাঁর ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো একটা কিছুকে প্রণাম করছেন। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটিকে একটি কার্ডবোর্ডের টুকরো ছাড়া আর কিছু মনে হতো না। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম ঃ "মহারাজ, ঐ ছোট কার্ডবোর্ডের টুকরোটার কী এমন বিশেষত্ব? ওতে তো কিছুই নেই।" তিনি বললেন ঃ "কিছু নেই কিরে! তুই দেখতে পাচ্ছিস না, এটি শ্রীশ্রীমায়ের ছবি। ১৯০১ সালে বেলুড় মঠ থেকে এখানে আসার সময় এটিকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তুই দেখতে না পেলে কি হবে, এর মধ্যে আমি মায়ের চেহারার ছাপ দেখতে পাই।" ছবিটি প্রায় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, আবছা একটু প্রান্তরেখার মতো শুধু অবশিষ্ট ছিল। তা দেখে কার ছবি আমি তা ধরতে না পারলেও মহারাজ কিন্তু পারছিলেন। তিনি বললেন ঃ "এই ছবির মধ্যে মা আছেন, এর মধ্যে মা বিরাজ করছেন।"

একবার আমি কল্যাণ মহারাজকে বলি, কখনো কখনো আমার প্রার্থনা—কোন পার্থিব বস্তুর জন্য নয়, অন্যের মঙ্গলের জন্য করা প্রার্থনাও—অপূর্ণ থেকে যায়। আমি অনুযোগ করেছিলাম ঃ "প্রার্থনা করলেও বিশেষ সাড়া পাই না।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই প্রার্থনায় সাড়া পেতে চাস?" আমি বললাম ঃ "অবশ্যই চাই।" তখন তিনি বুদ্ধি বাতলালেন ঃ "তাহলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করিস। ঠাকুর বিচার করে দেখেন, যা প্রার্থনা করছিস তাতে তোর ভাল হবে কিনা। কিন্তু মা ঠিক

গর্ভধারিণীর মতো—তুই যা চাইবি, তা-ই তিনি তোকে দিয়ে দেবেন। মায়ের কাছে যদি প্রার্থনা করিস, তাহলে সাড়া পাবিই পাবি। মায়ের মতো আর কেউ নেই।" বাস্তবিক, তিনি এমনভাবে এই কথাকয়টি বললেন যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি তাঁর দেওয়া বুদ্ধিটা পরীক্ষা করে দেখলাম—মায়ের কাছে একটা প্রার্থনা করলাম, নিজের জন্য বা পার্থিব কোন বস্তুর জন্য নয়, অন্যরকম প্রার্থনা এবং তা পূরণও হলো। কল্যাণ মহারাজের কথা ফলে গেল দেখে আমার আনন্দের সীমা রইল না।

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর কাছে পাঠগ্রহণ

স্বামী প্রেমেশানন্দজীও ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন জাত কবি—বহু সুন্দর গানের রচয়িতা। সেটা ছিল ১৯৩৫ সাল। প্রেমেশানন্দজী তখন হৃষীকেশের স্বর্গাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। একদিন কল্যাণ মহারাজ আমাকে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি ও আরো দুজন ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেবাশ্রমে এসে থাকার জন্য অনুরোধ করলাম। আমরা তাঁকে আমাদের পড়াবার, শাস্ত্রপাঠের ক্লাস নেওয়ার জন্যও বললাম। প্রথমত তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। পরে আমরা যখন তাঁকে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানালাম, তখন আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি রাজি হলেন, কিন্তু একটি শর্তে—আমাদের প্রতিদিন দুটি করে শ্লোক মুখস্থ করতে হবে, একটি গীতা থেকে, আরেকটি উপনিষদ্ থেকে। আমরা সেইরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তিনি এলেন। হাসপাতালের সমস্তরকম বাঁধা কাজ ছিলই; তা সত্ত্বেও আমরা কথামতো শ্লোক মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রেমেশানন্দজী আসায় আমার খুব উপকার হয়েছিল। তিনি প্রথমে বাঙলায় ক্লাস নিতেন। পরে আমাকে ইংরেজিতে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতেন। তিনি যতদিন কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন, আমরা তাঁর দিব্যসঙ্গ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলাম।

ঠাকুরের পার্ষদদের নিয়ে স্তোত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ হলে প্রেমেশানন্দজীকে সারগাছি কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। আমরা সকলেই তাতে আনন্দিত হয়েছিলাম, যদিও এর ফলে আমরা তাঁর সঙ্গবিচ্যুত হয়েছিলাম। উপযুক্ত জায়গাতেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল—সাধুরূপে যেমন তিনি মহান ছিলেন, তেমনি ছিল মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা। আর তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলী ছিল সকলের সমাদর ও অনুকরণের যোগ্য। প্রেমেশানন্দজী আমাদের সেবাশ্রমের প্রত্যেকেরই গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সত্যসত্যই তিনি ছিলেন এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন তিনি আমার ঘরেই বাস করেন। তখন প্রতিদিন সকালে উঠে তিনি একটি স্তোত্র সুর করে গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের নিয়ে রচিত সেই স্তোত্র 'শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবন্দনম্' আমার বরাবরই খুব ভাল লাগত। স্তোত্রটি অবশ্য তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ শিষ্যদের কয়েকজন তখনো স্বদেহে থাকায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। অনেক পরে স্তোত্রটিকে সম্পূর্ণ করা হয়। আমি আমেরিকায় আসার পর স্তোত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ করে তাঁকে একটি চিঠি লিখি। তার কিছুদিন পরেই পূর্ণাঙ্গ স্তোত্রটি যখন হাতে পেলাম, তখন আমার আনন্দের সীমা রইল না। বস্টনে ও প্রভিডেন্সে সকলেই আমরা স্তোত্রটি কণ্ঠস্থ করে নিই। এটি একটি অপূর্ব রচনা—ঠাকুরের সব সাক্ষাৎ শিষ্যের বন্দনা একটি স্তোত্রে গ্রথিত।

গোপন করার মতো কিছু না থাকা—এক দৈবী সম্পদ

একবার প্রেমেশানন্দজী আমাদের 'ঈশ উপনিষদ্'-এর পাঠ দিচ্ছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে 'ততো ন বিজুগুপ্সতে'[৩]—এই কথাকয়টি আছে। অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তাঁর 'জুগুপ্সা' থাকে না। 'জুগুপ্সা' শব্দটির অর্থ ঈর্ষা অথবা বিদ্বেষ হতে পারে। প্রেমেশানন্দজী কিন্তু এটির এক নতুন ধরনের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেনঃ "জুগুপ্সার অর্থ গোপনের ইচ্ছা, কোনকিছু লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি যখন সকলের মধ্যেই আত্মাকে সমভাবে বর্তমান দেখ, তখন নিজের কাছেও কিছু লুকোও না, অপরের কাছেও কিছু লুকোও না।" গোপনীয় কিছু না থাকা, লুকোবার মতো কিছু না থাকা—মহত্তম সম্পদ। এতে সকলের সঙ্গে অভিন্নতাবোধ জন্মায়।

একবার জওহরলাল নেহেরু তাঁর কন্যা ইন্দিরার জন্মদিনে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। সেসময়ে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। যেহেতু তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, তাই জন্মদিনে কন্যাকে তিনি অজস্র উপহার দিতেন। কিন্তু সেবারে জেলে থাকায় তিনি তাকে কোন উপহার পাঠাতে পারেননি। তাই তিনি একটি চমৎকার চিঠিতে লেখেনঃ "আমার আদরের ছোট মা, আজ জেলে থাকায় তোমাকে আমি কোন উপহার পাঠাতে পারছি না। তবে আজ আমার মনে একটা মহৎ চিন্তা জাগছে—সেইটির ভাগ আমি তোমাকে দেব। জীবনে কখনো এমন কিছু করো না, যা অন্যের কাছে লুকিয়ে রাখার দরকার হয়।" ঐ চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো কী চমৎকার একটি ভাব! "এমন কিছু করো না যা অন্যের কাছে লুকিয়ে রাখার দরকার হয়।"—এই ভাবটা যদি আমরা মনে ধরে রাখি, তাহলে এর

---

৩ "যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"
—যিনি সর্বভূতকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখেন এবং নিজের আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি সেই উপলব্ধিহেতু কাউকে বিদ্বেষ করেন না।

থেকে যে দ্রুত চিত্তশুদ্ধি হবে—তা সুনিশ্চিত। নেহেরু ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যদিও অনেকে তাঁকে ধর্মবিশ্বাস-বিরহিত এক সাধারণ লৌকিক পুরুষ বলে মনে করে।

অতএব গোপনীয় কিছু না থাকা এক মস্ত বড় আধ্যাত্মিক গুণ। প্রেমেশানন্দজীর ভাষায় ঃ "গোপনের ইচ্ছা থাকে না—অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার মনোবৃত্তি হয় না।"

কল্যাণ মহারাজ ও অন্যান্য ঘটনাবলী

১৯৩৭ সালে শেষবার মুসৌরী যাওয়ার আগে কল্যাণ মহারাজ সমস্ত সাধুর সমক্ষে সেবাশ্রমের সিন্দুকের চাবিটি আমার হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন ঃ "আমার অনুপস্থিতির সময়ে তুই সবকিছু চালাবি।" আমার চেয়ে বর্ষীয়ান যেসব সাধু ছিলেন, তাঁদের তিনি দায়িত্ব নিতে বলতে পারতেন, তা না করে আমাকে দায়িত্ব দিলেন—ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না। আমি তাঁকে চাবিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম ঃ "আমি এত সব সামলাতে পারব না। আমি কিছুই জানি না। আর আপনার সিন্দুক তো আমি কখনো খুলিইনি।" কিন্তু মহারাজ প্রায় আদেশের সুরে পুনরায় বললেন ঃ "না, তুই-ই এটা নে।" আমি চাবিটি স্বামী দুর্গানন্দজীকে দিলাম, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর কল্যাণ মহারাজ আর সবাইকে বললেন ঃ "তোমরা সকলে একে সাহায্য করো।" আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ "হাতে চাবি থাকা মানে কিন্তু এ নয় যে, তুই সবাইকার প্রভু। তুই সবাইকার সেবক। এদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তোকে কাজ করতে হবে। চাবি তোর কাছে রাখ। টাকাকড়ির ব্যাপার ও অন্যান্য সবকিছু সামলাবি।" আমি উপস্থিত প্রবীণ সাধুদের চরণস্পর্শ করলাম। তাঁরা বললেন ঃ "কিছু ভেবো না, আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি দায়িত্ব নিলে কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।" এই কারণেই যখন সেবাশ্রমে নতুন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখনো স্বামী মাধবানন্দজী একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, কল্যাণস্বামীর অনুজ্ঞা অনুযায়ী নারায়ণই সবকিছু চালাতে থাকবে।

কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগ

১৯৩৬ সালের শেষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী শ্রীবাসানন্দজী ও শেষোক্তজনের পূর্বাশ্রমের দৌহিত্র নারায়ণ মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী বন্দনানন্দজী) কনখলে আসেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 'অদ্বৈত আশ্রম'-এর অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করার পর একবছর কনখল অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। তিনি তখন তপস্যার উদ্দেশ্যে হৃষীকেশে যান এবং নীরব ধ্যান-ধারণায় কালাতিপাত করেন। ঐ সময়ে কখনো কখনো আমরা তাঁকে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র দিয়ে আসতাম। স্বামী কল্যাণানন্দজী ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মধ্যে এক অপূর্ব ভালবাসার সম্পর্ক ছিল—স্বামী কল্যাণানন্দজী বীরেশ্বরানন্দজীকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগ হয়, বীরেশ্বরানন্দজী তখন কনখলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান—সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান তিনিই করতে থাকেন। তাঁর সময়োপযোগী সাহায্যের তখন বড়ই প্রয়োজন ছিল।

সেসময়ের ঘটনাপরম্পরা ছিল এইরকম। কল্যাণ মহারাজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তাই তিনি মুসৌরী চলে যান। সেখান থেকে ২০ অক্টোবরের চিঠিতে তিনি আমাকে একটি 'হট ওয়াটার বট্‌ল' ও কিছু ওষুধপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য লেখেন। তদনুযায়ী ২৩ অক্টোবর জিনিসগুলি নিয়ে আমি একটি গাড়িতে করে দেরাদুন হয়ে মুসৌরীর পথে রওনা দিই। ওখানকার রাস্তা তখন এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, যানবাহন কেবল একাভিমুখী যেতে পারত—হয় মুসৌরীর দিকে, নয় তার বিপরীত দিকে। তবে বিপরীতমুখী গাড়ির পার হওয়ার জন্য মাঝে অতিক্রমস্থল বা 'জংশন' ছিল। এইরকম একটি জংশনে আমি শুনতে পেলাম—কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। মনে হলো, আহ্বানকারী আমার অপেক্ষায় ছিল। তাকিয়ে দেখলাম, একটি বড় বাসের মধ্যে স্বামী শ্রীবাসানন্দজী ও নারায়ণ মহারাজ রয়েছেন। আমি বাসের কাছে গিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মহারাজ কোথায়?" তাঁরা বাসের মেঝের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন—সেখানে কল্যাণ মহারাজের মরদেহ শায়িত ছিল। দেখামাত্র তীব্র আঘাতে আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনক্রমে গিয়ে আমি তাঁর পায়ের কাছে বসলাম এবং সেইভাবে যাহোক করে কনখলে এলাম। কনখলে যখন পৌঁছালাম তখন আমার প্রবল জ্বর—সবাই আমাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। তাতে বাইরের অনেক সাধুও অংশগ্রহণ করলেন। সৎকারের আগে মহারাজের মরদেহ সমেত সকলের একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ তোলা হয়। তাতে সবাই আমাকে উপস্থিত থাকতে বলল। আমি বললাম, আমি ঐ ফটোর মধ্যে থাকতে চাই না। কিন্তু সকলে বলতে গেলে আমাকে প্রায় টেনে-হিঁচড়েই সেখানে নিয়ে গেল। "তোমাকে মহারাজের পাশে বসতেই হবে"—তারা বলল। ফটোর ব্যাপারে আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না। মানুষটাই যেকালে চলে গেছেন, সেকালে ফটো নিয়ে কী হবে? যাই হোক, ফটো তোলা হলো। তবে আমাকে ফটোর যে-কপিটি দেওয়া হয়েছিল, তা আমি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। আমার তা দেখার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাকি কপিগুলির কি হয়েছিল, তা জানি না। তারপর সৎকারের জন্য মরদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। তবে আমি শয্যা ছেড়ে উঠতেই পারিনি। প্রায় একমাসের মতো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলাম। শোকে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছিলাম।

শোক কাটিয়ে উঠলাম

আমার চিন্তা হলো, আশ্রমের পুরো ব্যাপারটা কে সামলাবে? শরীররক্ষার আগে মহারাজ আমার হাতে চাবি দিয়ে সবকিছু দেখতে বলেছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আর সবাই আমাকে সাহায্য করবে। তবুও আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি কিছুই জানি না। এখন এই চরম সঙ্কটের মাসটিতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী রোজ আমাকে সস্নেহে বলতেন ঃ "চিন্তা করো না। তুমি ঠিক পারবে। সুস্থ হয়ে ওঠ, আমরা এর মধ্যে চালিয়ে নেব।" কদিন পর তিনি আমাকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে কয়েকটা জিনিস জেনে নিলেন—এটা কী? ওটা কী? এই এই ওষুধের ব্যবস্থা কীরকম? ইত্যাদি। আমি যা যা জানতাম, তাঁকে বললাম। পরে তিনি হাসপাতালের খাতাপত্র নিয়ে এসে ক্রমে ক্রমে আরো কিছু বিষয় জেনে নিলেন। কিছুদিন গেলে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। সকলেই আমাকে কাজ চালাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগলেন।

সেবাশ্রমের সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এরপর বেলুড় মঠ থেকে একজন সাধুকে পাঠানো হলো। তবে তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। সকলের সহযোগিতায় আমি কাজ করতে লাগলাম। পদাধিকারী ব্যক্তিরা সকলেই যথাবিধি ছিলেন, কিন্তু মহারাজ সমস্ত কিছু আমাকেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অর্থে আমাকেই পরিচালকের আসনে বসিয়ে গিয়েছিলেন। পদাধিকার বলতে গেলে আমার কিছুই ছিল না—তখন আমি একজন দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও নই। কিন্তু কল্যাণ মহারাজের আমার ওপর পূর্ণমাত্রায় আস্থা ছিল।

কল্যাণ মহারাজের আস্থা ও ভালবাসা

স্বামী কল্যাণানন্দজী ছিলেন ভালবাসায় পরিপূর্ণ। আমার কাছে তিনিই ছিলেন সব। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু আমার কাছে এক প্রচণ্ড আঘাত হয়ে এসেছিল—আমার সমস্ত আশা তাঁকে আশ্রয় করেই দাঁড়িয়েছিল। তিনি আমাকে এত ভালবাসতেন যে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আর আস্থার কথা কি বলব? এর আগে কাউকে কখনো আমাকে ঐভাবে বিশ্বাস করতে আমি দেখিনি। স্বামী দুর্গানন্দজী একবার মন্তব্য করেছিলেন ঃ "নারায়ণ আসার পর স্বামী কল্যাণানন্দজী তাঁর হৃদয় একেবারে হাট করে খুলে দিয়েছেন। যেকেউ তাঁর কাছে এখন যেকোন জিনিস পেতে পারে।" কোনকিছু চাইবার থাকলে আর সবাই আমাকে সামনে ঠেলে দিত—কল্যাণ মহারাজ কখনো 'না' বলতেন না। সবসময়েই তিনি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন, যা চাইতাম তাই দিতেন। বস্তুত, আমার মনে হতো তিনি আমাকে নতুন এক জীবন দান করেছেন, যেন আমার জীবন নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর তোরঙ্গগুলি পরিষ্কার করতে করতে আমি দেখলাম যে, পশমি আলোয়ানের বড় একটি গাঁট রয়েছে। সেগুলি ছিল ঠাকুরঘরে; সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য হালকা পশম দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম বুনটের চাদর। কল্যাণ মহারাজ কবে যে সেগুলি আনিয়ে রেখেছিলেন—জানি না। আমাদের প্রত্যেকের নাম এক-একটি কাগজের টুকরোয় লিখে প্রতিটি চাদরে একটি করে টুকরো তিনি আলপিন দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। দেখে আমরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন, শীত এলে আমাদের সবাইকে সেগুলি দেবেন—কিন্তু তার আগেই তাঁকে মুসৌরী চলে যেতে হয়। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু চাদরগুলি রয়ে গেল। আমি তা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর হাতে তুলে দিলাম—তিনি সেগুলি আমাদের সবাইকার হাতে হাতে দিলেন। চাদরগুলিতে কাগজের টুকরোয় আমাদের সাধু-ব্রহ্মচারীদের এক এক জনের নাম লেখা ছিল। আমরা আবেগে আপ্লুত হলাম, সকলেরই চোখে জল এসে গেল।

ডাকঘরের টাকার উত্তরাধিকার

একদিন ডাকঘর থেকে খবর এল, সেখানে মহারাজের কিছু টাকা প্রাপ্য আছে। পোস্টমাস্টার ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি মহারাজের শিষ্য। তাই তিনি আমাকে সই করে টাকাটা নিয়ে নিতে বললেন। ভারতবর্ষে কোন সাধুর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকার তাঁর এক বা একাধিক শিষ্য, তাঁর সম্প্রদায়, তাঁর গুরুভাইরা বা তাঁর গুরুর ওপর বর্তায়। ভারতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এজাতীয় কোন এক আইন আছে। কাজেই পোস্টমাস্টার সোজাসুজি বলতে পারলেন ঃ "আপনি তাঁর শিষ্য। এইটের জন্য সই করুন, আমি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেব।" আমি বললাম ঃ "কিন্তু আমি তো তাঁর শিষ্য নই।" তিনি বললেন ঃ "আমরা জানি আপনি তাঁর শিষ্য, কারণ তিনি কখনো তাঁর তরফে আর কাউকে পোস্ট অফিসে পাঠাতেন না। আরো সব সাধু ছিলেন, ইচ্ছা করলে তাঁদেরও তো পাঠাতে পারতেন।" মহারাজ যেখানেই যেতেন, আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম—এর ফলে সবাই ধরে নিয়েছিল, আমি তাঁর শিষ্য। আমি যদি সই করতাম, পোস্টমাস্টার আমাকেই টাকাটা দিয়ে দিতেন। এক আমি তাঁর শিষ্যেরও বাড়া ছিলাম, কিন্তু নিয়মানুসারে আমার নিজেকে তাঁর শিষ্য বলে দাবি করা চলত না। আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের শিষ্য। তাই আমি সই করতে অসম্মত হলাম। এর ফলে উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্র (succession certificate)-এর জন্য আমাদের আদালতে গিয়ে দরখাস্ত করতে হলো। মহারাজের সব গুরুভ্রাতাকে চিঠি লিখতে হলো—তাঁদের মধ্যে স্বামী পরমানন্দজী ও স্বামী বোধানন্দজী আমেরিকায় ছিলেন, এছাড়া ছিলেন স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী বিরজানন্দজী ও ব্রহ্মচারী



জ্ঞান মহারাজ। এঁদের পাঁচজনকেই দরখাস্তে সই করতে হলো। টাকাটা আমাদের হাতে আসতে একবছরের বেশি সময় লেগে গেল।

বাইরের সাধুসমাজে নবনিযুক্ত সম্পাদকের পরিচয় প্রদান

বাইরের সাধুরাও মনে করতেন, আমি কল্যাণ মহারাজেরই শিষ্য; কারণ তিনি সবসময়ে তাঁদের সব অনুষ্ঠানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যেহেতু অন্য কোন সাধু কখনো কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে থাকতেন না আর তাঁরা নিয়মিত আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখতেন; তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি অবশ্যই তাঁর শিষ্য হব। মহারাজের দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠ থেকে যে-সাধুকে সেবাশ্রমের সম্পাদক করে পাঠানো হলো, তাঁকে তাঁরা সেবাশ্রমের প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দিলেন না। তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন আমাকেই করতে হলো। আমি তখন দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও নই, কিন্তু তাঁরা তা ধর্তব্যই মনে করলেন না। তাঁরা বললেনঃ "সে যাই হোক, আপনি তাঁরই শিষ্য। আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি। নতুন সম্পাদককে আমরা কখনো চোখেই দেখিনি। আমরা একমাত্র আপনাকেই চিনি—আর কাউকে নয়।" আমাকে তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হলো যে, নবনিযুক্ত সম্পাদক শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ও একজন বড় সাধু। শেষমেশ তাঁরা তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন বটে, কিন্তু বললেন—আমাকেও তাঁদের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে। এইভাবে চলতে লাগল—আমরা দুজনেই তাঁদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। এইসমস্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাধুদের যেসব জিনিস উপঢৌকন দেওয়া হয়—যেমন তাম্রপাত্র ও বস্ত্র—তা তাঁরা আমাকেও দিতেন। অবশ্য যেহেতু আমি তখন ব্রহ্মচারী, তাই আমাকে গৈরিকের পরিবর্তে শুভ্রবস্ত্র দেওয়া হতো।

স্বামী অতুলানন্দজীর আগমন

আমাদের সেবাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দজীর ফটোগ্রাফ ছিল, কিন্তু নিশ্চয়ানন্দজীর কোন ফটো ছিল না। অনেকে বলত, নিশ্চয়ানন্দজীর কোন ফটোই নেই। ১৯৪০ সালে যখন স্বামী অতুলানন্দজী সেবাশ্রমে আসেন, তখন আমি তাঁকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ "ফক্স ভগিনীরা যখন হরিদ্বারে আসেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ানন্দজীর একটি ফটো তুলেছিলেন।" ভগিনীদের মধ্যে যিনি তখনো জীবিত, তাঁকে তিনি পত্র লেখেন এবং এইভাবে নিশ্চয়ানন্দজীর একটি ফটো আমাদের হস্তগত হয়।

অতুলানন্দজীর অবস্থানকালে 'ক্রিসমাস ইভ' উপলক্ষ্যে বেদি আমিই সাজিয়েছিলাম। সেইসময়ে একটি বাক্সের মধ্যে আমি এক বিশেষ বস্তু আবিষ্কার করি—বড়সড় একটি কার্ডবোর্ডের 'ফোল্ডার'। সেটি খুললে দেখা গেল সুন্দর একটি ছবি—অশ্বের ভোজ্যাধার, মেরি ও শিশু যিশুখ্রিস্ট। আমি বেদির ওপর ছবিটি রেখে সেটি আলোকিত করার ব্যবস্থা করি। অতুলানন্দজী এসে খুব কাছে গিয়ে ছবিটি খুঁটিয়ে দেখলেন। পরের দিন সকালে তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি ঐ ছবিটির বিষয়ে কিছু জান কি?" আমি বললামঃ "না, আমি ওটি একটি বাক্সের মধ্যে প্যাক করা অবস্থায় পাই। তাছাড়া আর কিছু জানি না।" তিনি তখন ছবিটি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। সেটির পিছনে দেখা গেল তাঁর সই রয়েছে। ১৯১৬ সালে আমেরিকা থেকে তিনি ওটি কল্যাণ মহারাজকে বড়দিনের কার্ডরূপে পাঠিয়েছিলেন। তখন ১৯৪০ সাল, কার্ড পাঠাবার পর বহুকাল গত হয়েছে—কাজেই তাঁর সইটিও প্রায় মিলিয়ে এসেছে। স্পষ্টত কল্যাণ মহারাজ সেটি কখনোই খুলে দেখেননি।

আরো অনেক না-খোলা জিনিস

কিন্তু শুধু ঐ কার্ডটিই নয়, আরো বেশ কিছু জিনিস কল্যাণ মহারাজ না-খোলা রেখে দিয়েছিলেন। লোকে তাঁকে চেক পাঠিয়েছিল—সেগুলিও খোলা হয়নি, যেমনকার তেমনি থেকে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সিন্দুকের মধ্যে আমি ঐ চেকগুলি পাই। দাতাদের চিঠি লিখলে তাঁরা সেগুলি পুনরায় বলবৎ করে দিয়ে আমাদের টাকাগুলি তুলতে সাহায্য করেন—চেকগুলি যে নষ্ট করে ফেলা হয়নি তাতে তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন। বস্তুত, কে কত দান করল তা নিয়ে কল্যাণ মহারাজ কখনোই মাথা ঘামাতেন না। টাকাকড়ির ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কল্যাণ মহারাজের পরবর্তী কালে সেবাশ্রম

কল্যাণ মহারাজ গত হওয়ার কিছুদিন পরে আমি তাঁর নির্দেশনার অভাব অনুভব করতে লাগলাম। সেবাশ্রমে তখন সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সমেত এক বিধিবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো বর্তমান। আমি ছিলাম এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তখন আমি দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও নই—তাই আমার অবস্থা হয়ে উঠল বেশ সঙ্গিন। সবাই যখন বলতঃ "তুমি কী জান?" আমি চুপ করে থাকতাম। কল্যাণ মহারাজের কাছে যা দেখেছি, যা শিখেছি—কী করে তাঁদের আমি বোঝাই? হাসপাতালের কাজকর্মের সাবলীল ধারা ব্যাহত হতে লাগল।... আমি শ্যামলাতালে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করলাম। আমি বললামঃ "মহারাজ, স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।... আপনি যদি আমাকে অন্য কোথাও পাঠান তো ভাল হয়।" তিনি বললেনঃ "না, তুমি ফিরে যাও। যেমন কাজ করতে, ঠিক তেমনিই করে যাও। কোনকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের মতো থাক, আর স্বামী কল্যাণানন্দের সময়ে যেভাবে করতে, সেইভাবেই কাজ করে যাও। ভাবনা করো না।"

অতএব আমি সেবাশ্রমে ফিরে এলাম। রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখি, সেখানে সকল সাধু-ব্রহ্মচারী, এমনকি আমার কুকুরটি পর্যন্ত উপস্থিত! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "ব্যাপার কী?" তাঁরা বললেন ঃ "তুমি গিয়ে কি স্বামী বিরজানন্দজীকে বলেছ যে, তুমি এখান থেকে চলে যাবে?" "একথা কে বলল?" ব্রহ্মচারীরা বলল ঃ "আমাদের মন বলছিল যে, তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছ। আমরা অনুরোধ করছি, তুমি চলে যেও না। আমরা তোমার পিছনে আছি। তুমি নিজের ভাবে কাজ করে যাও। কেউ ব্যাঘাত করবে না।" আর প্রবীণ সাধুরা বললেন ঃ "অবশ্যই। তুমি এখান থেকে যাবে কেন?" সুতরাং আমি রয়ে গেলাম। সকলেই খুব সহযোগিতা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে বেলুড় মঠ থেকে সম্পাদক স্বামীকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

অন্য সকলে নিয়মকানুন অনুসারে চলত। স্বামী কল্যাণানন্দজী ওসবের ধার ধারতেন না। তিনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করতেন, আর তাঁর উপলব্ধিতে যা করা প্রয়োজন বলে মনে হতো তাই করতেন। ঐ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে একটি মহৎ সত্য আমার কাছে উন্মোচিত হয়—যদি আমার মানসিক শান্তি ও আনন্দ এমন কারো ওপর নির্ভর করে—যার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাহলে শান্তি আমার কাছে অধরাই থেকে যাবে। সবকিছু থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলতে হবে। কর্তব্য যা তা করে যেতে হবে; সেটাই সব। তা হলো ঠাকুরের কাজ, তার জন্যই আমরা নিবেদিত-প্রাণ। এই হলো সব, এছাড়া আর কিছুই বিবেচ্য নয়। অন্য কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। অনেক কিছু ঘটেছিল, কিন্তু আমি তা নিয়ে আর কখনোই মাথা ঘামাইনি।

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ পৌষ ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**স্বামী প্রেমানন্দ** অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী ৫ পৌষ, সোমবার (২০ ডিসেম্বর ২০০৪) **যিশুখ্রিস্ট** ৯ পৌষ, শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর ২০০৪) **শ্রীমা সারদাদেবী** অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী ১৯ পৌষ, সোমবার (৩ জানুয়ারি ২০০৫) **স্বামী শিবানন্দ** অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী ২৩ পৌষ, শুক্রবার (৭ জানুয়ারি ২০০৫)
একাদশী-তিথি	ঃ	৭, ২৩ পৌষ বুধবার, শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর ২০০৪, ৭ জানুয়ারি ২০০৫)

বার্লোগঞ্জের আশ্রম

১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল অবধি স্বামী অতুলানন্দজী কনখলে ছিলেন। প্রথম দু-এক বছর আমরা গ্রীষ্মের কয়েক মাস তাঁর জন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিতাম। পরে আমরা বার্লোগঞ্জ (Barlowgunj) বলে একটি জায়গায়—জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা ও মনোরম—একটা বাড়ি কিনেই নিই। মিঃ গান্ধী নামে আমাদের বন্ধুস্থানীয় এক ব্যক্তি ('Atman Alone Abides' গ্রন্থে তাঁর নামের উল্লেখ আছে) সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন। বাড়িটি আমার পছন্দ কিনা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি 'হ্যাঁ' বললে তিনি বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে বললেন ঃ "আমি এই বাড়িটি কিনতে চাই। এর জন্য আপনি কত দাম নেবেন?" দাম শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্কের—কয়েক হাজার টাকার—একটি চেক কেটে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ "এই নিন আপনাদের বাড়ি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আপনি এরকম করতে গেলেন কেন?" তিনি বললেন ঃ "সারাবছর ধরে আপনারা কঠোর পরিশ্রম করেন। হাসপাতালের কাজ থেকে আপনাদের অবসর নেই। এখন আপনাদের অবসর কাটাবার এই বাড়িটি হলো।" আমি অনুযোগ করলাম ঃ "কিন্তু বাড়ি মানেই তো ঝামেলা আর দায়িত্ব।" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "সেসব আমি দেখব।" এইভাবে ঐ বাড়িটি কেনা হয়। পরবর্তী কালে এটি বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা এটির নাম দেন—'শ্রীসারদা কুটির' বা বার্লোগঞ্জ আশ্রম।[8] [ক্রমশ] (পাঁচ)

৪ আরো পরে মঠ কর্তৃপক্ষ বাড়িটি বিক্রি করে দেন।

* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়।
—সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন ঃ কার্তিক ১৪১১ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ ৮৯০ পৃষ্ঠার ১ম কলামে 'মাছ সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামির মূলোৎপাটন' অংশে 'সেবাশ্রমে যেহেতু আমিষ খাবার ছিল'-র স্থানে 'সেবাশ্রমে যেহেতু আমিষ খাবার নিষিদ্ধ ছিল' হবে।

এক ঝলকে মণিময় গুম্ফা

বন্দিতা ভট্টাচার্য

চিররহস্য ও বিস্ময়ে ভরা ধ্যানগম্ভীর হিমালয়। অনন্ত রূপরাশি নিয়ে এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তা কখনো হারিয়ে যাবে না। এর আকর্ষণ দুর্নিবার। হিমালয়ের প্রেমে যে পড়েছে সেই মজেছে। হিমালয়ের অভিযানে কতজন সফল হয়েছেন, আবার কতজন ব্যর্থ হয়েছেন, আবার কতজন যে মৃত্যুবরণও করেছেন তার হদিশ আমাদের জানা নেই। এই হিমালয়ের টানেই হঠাৎ একদিন ভ্রমণের ডাক এল 'সাউথ ক্যালকাটা মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন' থেকে। ওঁরা কোথা থেকে খবর পেয়েছেন, পাহাড়-পর্বতের প্রতি আমার অসীম উৎসাহ ও আন্তরিক ভালবাসা। সত্যি সত্যি কালক্ষেপ না করেই ঐ সংস্থার একজন সাধারণ সদস্যা হয়ে পাড়ি দিলাম লে-লাদাখের পথে আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে, ২০০২ সালে। সঙ্গে পরিচিতা অল্পই, অপরিচিতাই বেশি। এবারের যাত্রার একটি বিশেষত্ব আমাকে প্রথম থেকে মুগ্ধ করেছে, যখন শুনলাম বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফা দর্শনই অভিযাত্রীদের মূল লক্ষ্য।

২৪ দিনের সূচি। কত নাম-না-জানা জায়গা চোখে দেখব, কত অনাবিল আনন্দে মন ভরে উঠবে! লে-লাদাখ এখনো নিষ্ঠাভরে বৌদ্ধধর্মকে জীবনচর্যায় এবং জীবনচর্চায় প্রধান অঙ্গ করে রেখেছে তা দেখে ধন্য হব। লে-লাদাখের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ও ধর্মপ্রাণতা দর্শনে আমার অনুভূতির কথা নিবেদন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

আমার কাছে কল্পনা ও স্বপ্নের দেশ এই লে-লাদাখ। এর পথে পথে ছড়িয়ে আছে বিস্ময়। চীর আর পাইনের জঙ্গল ভেদ করে মানালির পথ দিয়ে কত শত পথ অতিক্রম করে যখন পৌঁছালাম তুষারাবৃত আকাশস্পর্শী পাহাড়ের চরণতলে, তখন এই স্বর্গীয় রূপ দর্শনের সৌভাগ্যকে আমার জীবনে দেবতার পরম আশীর্বাদ বলে মনে হলো। পাহাড়ের নিরেট পাথরের খাঁজে খাঁজে দুধসাদা বরফ জমে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। আবার নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে সিন্ধুনদ—উচ্ছল ও উদ্দামতায় যেন চিরদিনের সঙ্গী সে। কত তার রং, কত তার শোভা! কখনো তাকে পাই হাতের কাছে, আবার পরমুহূর্তে তাকে হারাই! এই পথেই দর্শন করলাম মণিময় গুম্ফাগুলি।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান লে। এর সর্বত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ এবং অসংখ্য গুম্ফা ও চোর্তেন ছড়িয়ে আছে। লে হলো এককালে লাদাখের রাজধানী এবং এখন লাদাখের জেলা সদর। লে-র সৌন্দর্য সারা ভারতে অতুলনীয়। এর চারপাশে এবং কিছুটা দূরে রয়েছে আঠারো থেকে কুড়িটিরও বেশি গুম্ফা। প্রাচীন ও নবীন এই বৌদ্ধ মঠ বা গুম্ফাগুলি বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যায় আচ্ছন্ন। পথেঘাটে কোন লামা সন্ন্যাসী বা সাধারণ মানুষ ধর্মচক্র দেখলেই একবার ছুটে গিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এবং 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' মন্ত্রটি জপ করে চলেছেন অবিরাম। সোনা-রুপো ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি গুম্ফার মূর্তিগুলিতে। কত শত রং চোখ ঝলসে দিচ্ছে! বাইরের বিলাস, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য গুম্ফার প্রাণ নয়—অন্তরে রয়েছে নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ও ধর্মপ্রাণতা। লে থেকে যেসমস্ত বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তাদের মধ্যে 'শান্তিস্তূপ' ও 'শঙ্কর গুম্ফা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



শান্তিস্তূপ



শান্তিস্তূপে বুদ্ধমূর্তি

দিনটি ছিল ২৭ আগস্ট। স্নান সেরে প্রাতরাশের পর শান্তিস্তূপের পথে যাত্রা শুরু। আমরা যে-হোটেলে ছিলাম, সেখান থেকেই শান্তিস্তূপ দেখা যায়। মনে হয় কত কাছে! কিন্তু না, হাঁটা পথে বেশ দূর। পথের দুধারে আপেল ও খুবানির জঙ্গল পার হয়ে চলেছি রুক্ষ বোল্ডার ফেলা উঁচু (বেশ চড়াই) রাস্তায়। হাঁপাতে হাঁপাতে জলের বোতল প্রায় শেষ করে ফেলে ওপরে উঠলাম। রাজগীরে জাপানি সহায়তায় বানানো 'বিশ্বশান্তি স্তূপ'-এর আদলে এই শান্তিস্তূপ। স্তূপের গায়ে চারদিকে চারটি বুদ্ধমূর্তি। চাতালটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মার্বেল পাথরের ওপর রোদ পড়ে যেমন ঝকঝক করছে, আবার তেমন তেতেও আছে। পা রাখা যাচ্ছে না। বড়ই নীরব ও নির্জন। বুদ্ধমূর্তির চরণতলে অনেক ভক্ত আসছেন—নতজানু ও দণ্ডবৎ হচ্ছেন এবং প্রদক্ষিণ করে চলে যাচ্ছেন। শান্তিস্তূপে গিয়ে মনটা সত্যি শান্ত হয়ে যায়। বড়ই আকর্ষণীয় স্তূপটি।

শান্তিস্তূপ দর্শন করে হাজির হলাম শঙ্কর গুম্ফায়। এটি অন্যান্য গুম্ফা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, লে-লাদাখের প্রায় সব গুম্ফা পাহাড়ের ওপরে নির্মিত হয়েছে এবং গুম্ফা থেকে রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আর গুম্ফার সামনে সাদা সাদা চুনমাখানো চোর্তেন ছড়িয়ে থাকে। শঙ্কর গুম্ফা পাহাড়ের টিলায় নয়—সমতলেই। আর খানিকটা আধুনিকও বলা যায়। নানা দেবদেবীর মূর্তি বিরাজ করছে সেখানে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি চেনরেজি—যাঁর একহাজার চোখ, একহাজার হাত এবং একহাজার পা। প্রধান লামার ঘরটিও পরিপাটি করে সাজানো। আর লম্বা বারান্দায় কত জনের ছবি—ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর পাশেই করণ সিং-এর ছবিও দ্রষ্টব্য।

পরদিন ২৮ আগস্ট। সকালবেলা। থাক, স্থানাভাবহেতু দিন হিসাবে না বলে স্থান ধরে বর্ণনা দেওয়াই সমীচীন মনে হচ্ছে। লাদাখের সবচেয়ে বিশাল এবং ধনাঢ্য গুম্ফা 'হেমিস' লে থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরে। এই হেমিস আমার কাছে স্বপ্নের বস্তু ছিল। কত বছর আগে গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অফ কালচারে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মুখে শুনেছিলাম হেমিস গুম্ফার কথা। তাঁর মুখেই শোনা—যিশুখ্রিস্টের ছেলেবেলা নাকি এখানেই কেটেছিল। অনেক বর্ণময় বর্ণনা মহারাজজী দিয়েছিলেন। সে-বর্ণনা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই স্বপ্নের লে-লাদাখ আজ বাস্তব হয়ে আমার সামনে উপস্থিত। আমি হেমিসে দাঁড়িয়ে মনে মনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম প্রয়াত মহারাজজীর চরণে। এই গুম্ফাটি অন্যান্য গুম্ফা থেকে ব্যতিক্রম। দূর থেকে একে দেখা যাবে না। কারণ পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এটি এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে, মনে হয় যেন পাহাড়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার।



হেমিস গুম্ফার গুহাচিত্র

প্রবেশদ্বারে ছোট বড় কত সাদা সাদা চোর্তেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক প্রবীণ লামা মন্ত্র জপ করতে করতে আমাদের সামনে দিয়ে হাসিমুখে চলে গেলেন।

আমরা পুরনো বিরাট দরজা পার হয়ে ভিতরে পৌঁছালাম। সামনে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি বিরাট উঠান। উঠানের ওপর থেকে কতকগুলি সিঁড়ি আরো ওপরে উঠে গেছে। একটি বিরাট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মন্দির-কক্ষে পুরনো সোঁদা সোঁদা গন্ধ আর চারদিকে একটা রহস্যময়তা ও অন্ধকার। কক্ষটি অসংখ্য মূর্তি ও দেওয়ালচিত্রে ভরা। এক বৃদ্ধ লামা আমাদের কাছে ডেকে হেমিসের ইতিহাস বলতে লাগলেন।

গ্রীষ্মকালে পদ্মসম্ভব গুরু রিনপোর জন্মতিথিতে এক বিশাল মেলা এই প্রাঙ্গণে বসে। দূর দেশ থেকে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা ভক্তিনম্রচিত্তে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। রাজা সেনগে নামগিয়াল ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হেমিস গুম্ফা নির্মাণ করেন। সেদিক থেকে এটি বেশ প্রাচীন। উৎসবের সময় নাচ-গান ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান মন্দির বা গুম্ফাতেই হয়ে থাকে। গুম্ফার মধ্যে অনেক ঘর ঘুরে দেখলাম। প্রতিটি ঘরেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি—তাতে দেবীমূর্তিগুলি ঠিক তান্ত্রিক দেবীমূর্তি নয়। সোনাদানা মণিমুক্তো দিয়ে মূর্তিগুলি সজ্জিত। মূর্তির সামনে রুপোর পাত্রগুলিতে জলপূর্ণ। বুদ্ধ শাক্যমুনির মূর্তি অপূর্ব, আয়তনে বিশাল। মূর্তির সামনে ঘিয়ের প্রদীপ নিরন্তর জ্বলছে। আর সেই প্রদীপের আলোয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বুদ্ধমূর্তি জ্বলজ্বল করছে। শান্ত, গম্ভীর মূর্তিটি কিন্তু বড়ই করুণাময়। মূর্তিগুলির গয়না ও মুকুটে দামি পাথর বসানো, আর তাতে আলো পড়ায় ঝিলিক দিচ্ছে।

প্রবীণ লামার মুখেই শুনলাম প্রধান লামা ডুকচেন রিমপোজ এখন সম্মেলনের জন্য ফ্রান্সে আছেন। এরপর অন্য একজন সন্ন্যাসী কত অলিন্দ, কত সিঁড়ি ও কাঠের বারান্দা পার হয়ে আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন। একটি বন্ধ ঘরে থরে থরে সাজানো নানা রঙের সিল্কের কাপড়জড়ানো পুঁথির আলমারি। শুনেছি পুঁথিভাণ্ডারের জন্য হেমিসের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সেইসব পুঁথির সংখ্যা যে কত, তা বলে শেষ করা যাবে না। স্বামী অভেদানন্দজীও এই হেমিসের আকর্ষণে এসেছিলেন। তিনি একখানি মূল পুঁথির তিব্বতী অনুলিপি (যার মধ্যে যিশুখ্রিস্টের নিরুদ্দেশকাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল) দেখেন এবং একজন দোভাষীর সাহায্যে পাঠোদ্ধার করেন।

অমূল্য দুটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'তাঞ্জুর' এবং 'কাঞ্জুর'-এর পাণ্ডুলিপি এখানে রেশমের কাপড়ে জড়ানো আছে, যেখানে বুদ্ধ-নির্দেশিত আটটি মার্গ বা পথের (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) হদিশ মেলে। আর এই নির্দেশাবলী মানুষকে শান্তি দেয়। অসংখ্য পুঁথির এই সংগ্রহশালাটি দেখতে দেখতে কত স্মৃতি, কত পুরনো কথা মনে

ভিড় করে এল। কিন্তু সময় যে নেই! সারাদিন ঘুরে দেখলেও যেন শেষ হবে না।

প্রবীণ লামার অনুমতি নিয়ে একটি পুঁথিসহ ছবি তোলা হলো। এরপর নিচে নেমে এলাম। প্রাঙ্গণের লাগোয়া লম্বা বারান্দার দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনকাহিনী, তাঁর রথের কালচক্র এবং প্রার্থনাচক্র আঁকা। কিন্তু অভিভূত হলাম, যখন দেখলাম এত কোলাহল ও আড়ম্বরের মধ্যেও বৌদ্ধ লামারা এক মনে নিষ্ঠাভরে জপ করে চলেছেন এবং মাঝে মাঝে ঘণ্টা ও ছোট ড্রাম বাজিয়ে স্তবের শেষে প্রণতি জানাচ্ছেন তাঁদের ইষ্টকে।

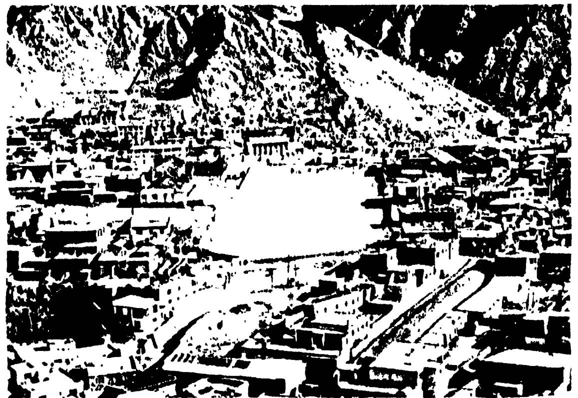
এরপর গন্তব্যস্থল 'থিকসে গুম্ফা'। লে থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে থিকসে। একতলা, দোতলা অতিক্রম করে তিনতলায় পৌঁছে থমকে গেলাম। এক বিশালায়তনের বুদ্ধমূর্তি। কপালে জ্বলজ্বল করছে শঙ্খের টিপ। চরণদুটি একতলা পর্যন্ত প্রসারিত। বুদ্ধমূর্তির চালচিত্রে নানা দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। থিকসের কারুকার্য বেশি সুন্দর। পাশের মন্দিরে ২১ ধরনের তারামূর্তি। তান্ত্রিক ভাবনা-সম্বলিত দেওয়ালচিত্রগুলি আকর্ষণীয়। মৈত্রেয় বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি নয়নমনোহর মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এইসব মূর্তি বিভিন্ন রঙে এবং ভঙ্গিমায় খোদিত। প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো অবলোকিতেশ্বর মূর্তি করুণার প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাজ করছেন। পাশে ধর্মরাজের মূর্তিও দ্রষ্টব্য। মধ্যে মা তারার এক বীভৎস মূর্তিও সকলকে স্তম্ভিত করে দেয়। মন্দিরের ছাদের ওপর উঠে যে নৈসর্গিক দৃশ্য চোখে পড়ল তা কোনদিন ভোলা যাবে না।

এরপর 'শ্যে প্যালেস' বা 'শ্যে গুম্ফা'। লে থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে একটি সুন্দর টিলার ওপর রাজপ্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলাম প্রায় ৭-৮ মিটার উঁচু এক বর্ণাঢ্য বুদ্ধমূর্তি। তামা ও পিতল মিশিয়ে এই মূর্তিটি নির্মিত। মন্দিরের মধ্যেই একটি স্তম্ভের গায়ে লেখা আছেঃ "It was made in about this year 1633 by Deldam Namgyal as a funery memorial to his father King Singe Namgyal." এই শ্যে গুম্ফাকে রাজাদের প্রাসাদ বলা হতো। গ্রীষ্মকালে রাজারা সপরিবারে এখানে বাস করতেন। টিলার ওপর অবস্থান বলে বহু দূর থেকে এই শ্যে গুম্ফা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খাঁ খাঁ রোদে পুড়তে পুড়তে হাজির হলাম 'Stock Palace' বা 'স্তোক গুম্ফা'য়। পথের ক্লান্তি ভুলেই গিয়েছি। এখানে মিউজিয়ামের দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। মাথাপিছু ২৫ টাকার টিকিট কেটে গাইডের সঙ্গে মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এই গুম্ফার ছাদ থেকে দেখা যায় শস্যশ্যামল খেতের ওপারেই বরফের মুকুট পরে পাহাড়শ্রেণি থরে থরে যেন সাজানো। গুম্ফার এক-একটি বন্ধ ঘর গাইড খুলে দেখাচ্ছেন আর চোখের সামনে দেখছি কোন ঘরে রাজাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কোন ঘরে সযত্নে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র, কোন ঘরে চিনামাটির সুন্দর সুন্দর পাত্র, কোন ঘরে প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি। ঘরের সামনে কারুকার্যময় থাঙ্কা দেখলাম। ছোট ছোট নানা ছবি বিক্রিও করল আমাদের গাইডটি। স্তোক গুম্ফার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরনোদিনের রাজা-রাজড়াদের কাহিনী, তাঁদের জীবনচর্যা—যা আমাদের কিছুক্ষণের জন্য অতীতে নিয়ে যায়। আমরা যেন রাজাদের পাশে পাশেই ঘুরছি, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আমরাই যেন রাজা হয়ে গিয়েছি! আর দেখলাম সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত বহু প্রাচীন বস্তু। এখানে বৃহৎ মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দেখার মতো।

৩ সেপ্টেম্বরে গেছিলাম লে থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী গুম্ফা 'স্ফিতুক'-এ। ৫৫০ বছরের কিছু বেশি প্রাচীন এই মঠ। লাদাখের প্রধান লামা এখানে থাকেন। সিন্ধুনদের তীর ধরে ৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর একটি ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের সিঁড়ি চলে গেছে চূড়া পর্যন্ত। এখানেও সেই বিশাল বুদ্ধমূর্তি—প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। ধ্যানাসনে মগ্ন এই মূর্তি। পাশেই সিঁড়ি বেয়ে একটি মন্দিরে দেখতে পেলাম এক বিশাল তারামায়ের মূর্তি—২৪টি হাত, রং কালো এবং মুখমণ্ডল সাদা কাপড়ে ঢাকা। তাঁর পাশে বিশাল আকৃতির ভৈরবমূর্তি। পূজারত পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, দেবীর মুখের আবরণ উন্মোচন হবে উৎসবের সময়। এছাড়া সবসময় মুখটি ঢাকা থাকে। মন্দির থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যে সবাই অভিভূত। কাছেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিমানঘাঁটি। দূরে লে শহর ও সিন্ধুনদের দু-তিনটি শাখা হাতছানি দিচ্ছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে এখান থেকেই পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কারাকোরাম পর্বতের K_2 শৃঙ্গ দেখা যায়।

স্ফিতুক গুম্ফার পরবর্তী আকর্ষণ 'ফিয়াং গুম্ফা'। লে থেকে ১৯ কিলোমিটার পশ্চিমে প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো গুম্ফা এটি। এর মন্দিরের মধ্যে বেশ অন্ধকার, চারদিকে শুধু নীরবতা। এখানে মানুষের মুখে ভাষা নেই—শুধু যেন চেয়ে থাকা। বিশাল



লাদাখের ঘন … একাংশ

বুদ্ধমূর্তি এর কেন্দ্রবিন্দু—অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির ১১টি মাথা। তারামায়ের মূর্তিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া প্রধান গুরুদের মূর্তিও রয়েছে। অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তির পাশেই লাল টুপি পরা রত্নশ্রী। মূর্তির সামনে থরে থরে সাজানো জলপূর্ণ পাত্র। মাখন-গলানো ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু সর্বত্র যেন একটা রহস্যময়তা। আর ইতিহাস? সেই একই। বজ্রসেন, পদ্মসম্ভব, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর—সকলেই আছেন যথাস্থানে। মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। চোখদুটি করুণায় ও প্রেমে পূর্ণ। চারদিকে রেশমের সজ্জা ও বর্ণাঢ্য চিত্র।


লে-র সর্ববৃহৎ বৌদ্ধমঠের পূর্ণচিত্র

এবার গন্তব্য লে শহর থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে লিকির গুম্ফা। একাদশ শতাব্দীর নিদর্শন। আশপাশের দৃশ্য অতীব মনোরম। এই গুম্ফার চত্বরে একটি বিশাল জুনিপার গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীনকালের সাক্ষী হিসাবে। এখানকার মানুষেরা ইঁট, কাঠ ও মাটি দিয়ে গুম্ফাটির নতুন করে সংস্কার করছে। একজন বৃদ্ধ লামার মুখে শুনলাম, এই গুম্ফা বিশেষ সম্পদশালী। সোনার সিংহাসনে সোনার বুদ্ধমূর্তি। চারদিকে অলঙ্কার ও রঙিন ছবি। বিচিত্র চারুকলা ও শিল্পকর্ম সকলকে মুগ্ধ করে। এখানকার মানুষজন বড়ই অতিথিপরায়ণ। কয়েকজন বালক লামা এসে আমাদের হাত ভরে ছোট ছোট মিষ্টি আপেল দিল আর পরিবর্তে আমরা দিয়ে এলাম হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা।

এরপর আমরা চলেছি আলচি গুম্ফার দিকে। লে থেকে ৬৮ কিলোমিটার পশ্চিমে এই বৌদ্ধ মঠ। লিকির, ফিয়াং এবং আলচি—সব গুম্ফাই কারগিল যাওয়ার পথে। গুম্ফাটি একাদশ শতাব্দীর, এর নির্মাতা রাজা রিন-চেন-জিগমে। এখানে চারটি পৃথক মন্দির বা প্রকোষ্ঠ দেখলাম—লোৎসা মন্দির, ভায়রাকানা, মঞ্জুশ্রী ও সামস্ট্রেক। এই মন্দিরগুলিতে যেসব মূর্তি আছে, তাতে কাপড় পরানো এবং সেই কাপড়ে নানা রঙে বুদ্ধের জীবনকাহিনী চিত্রিত। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে যে-কাপড় পরানো হয়েছে, তাতে সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র। এছাড়া মোগল আমলের চিত্র এই গুম্ফার দ্রষ্টব্য।


মূলবেকের বুদ্ধমূর্তি

আলচি দর্শন করে পৌঁছালাম লাদাখের প্রাচীনতম ধর্মকেন্দ্র লামায়ুরুতে। দশম শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়। দুটি মণিচক্র রয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে এক লক্ষ বার লেখা আছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'। এই গুম্ফার পুঁথিগুলি দেখার মতো। কত সযতনে রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে মোড়া। এখানকার বুদ্ধমূর্তিও বিশাল। তাছাড়া আছে অতীশ দীপঙ্কর, পদ্মসম্ভব এবং অন্যান্য মহাগুরুদের মূর্তি। একজন বৃদ্ধ লামা আমাদের দেখে খুশি হয়ে সব মূর্তির পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে গেল আর দেখতে পেলাম যেন—"বাঙালির ছেলে লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর/ জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে অতীশ দীপঙ্কর।" দীপঙ্কর বাংলার বিক্রমশীলার কাছে ব্রহ্মযোগিনী গ্রামে জন্মান এবং পরবর্তী কালে মহাবিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের আমন্ত্রণে তিনি ৬০ বছর বয়সে তিব্বতে যান। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার। যখন তাঁর বয়স ৭৩ বছর, তখন তিব্বতের সক্রেটং মঠে তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতীরা তাঁকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন যে, বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী অবতারজ্ঞানেও পূজা করেন। এই গুম্ফাটি যেজন্য বিখ্যাত তা হলো এর অবলোকিতেশ্বর মূর্তি—যার ১১টি মাথা এবং ১,০০০ হাত। অবাক হয়ে দেখলাম লামারা কত আন্তরিকতা এবং ভালবাসায় গুম্ফার প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন।

পরদিন আমরা মূলবেকের পথে যাত্রা করি। আজ ৫ সেপ্টেম্বর। আমাদের তীর্থদর্শন সমাপ্তির মুখে। রাস্তার ধারে পাথরে খোদাই করা ৫০ ফুট উচ্চ মৈত্রেয় বুদ্ধের দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই মূর্তি ভারতীয় আদলে তৈরি। গলায় লম্বা উপবীত—পা পর্যন্ত প্রসারিত। মূর্তিটির এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে কমণ্ডলু, তৃতীয় হাতে পদ্ম এবং চতুর্থ হাতে অভয়মুদ্রা। মূর্তিটির রাজবেশ। মাথায় ছোট একটি মুকুট, পায়ে নূপুর। বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির অনেক সাদৃশ্য। হয়তো বুদ্ধ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলে। মৈত্রেয় বুদ্ধের কী প্রশান্ত মুখচ্ছবি! কুষাণ যুগের কোন এক সময়ে এই বিশাল মূর্তিটি খোদিত হলেও আজও তা অক্ষত এবং অমলিন। ❑

সুখে থাকলে হয়তো মাগো

বাসব চট্টোপাধ্যায়

সুখে থাকলে হয়তো মাগো তোমায় আমি যেতাম ভুলে
সুখে থাকলে আজ কি মাগো এমন করে তোমায় পেতাম?
তাই আমাকে দুঃখে রাখ নয়নজলে অবিরত।
সুখে থাকলে হয়তো আমি ছেড়ে দিতাম তোমার পথও
সুখে থাকলে তোমার কথা হয়তো মনে থাকত নাকো
তাই তো তুমি মুচকি হেসে আমায় খানিক দুঃখে রাখ।

নানান ঠুনকো খেলনা পেয়ে ছেলেখেলায় যেতাম মজে
ভরপেটেতে থাকলে শিশু যেমন মাতে বেলুন নিয়ে
কিংবা ধরে চুষিকাঠি দোল খেতে চায় আপন মনে
ঘুমিয়ে পড়ে আবার জাগে আপন স্বপ্নে বিভোর থাকে।

হয়তো আমি সুখাবেশে দিন কাটাতাম সারাজীবন
তোমার কথা ভুলে যেতাম নতুন নানান খেলনা পেয়ে।
তুমিই আমায় কাছে টেনে স্মরণ করাও তোমার স্নেহ
আমি তোমার ন্যাওটা খোকা দুঃখে কাঁদি সারাজীবন।
সুখে থাকলে হয়তো মাগো তোমায় আমি ভুলেই যেতাম।

সমর্পণ

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রাণের নিধি স্রষ্টা, তুমি সকল চাওয়ার অন্তপারে;
দিলাম ছুঁড়ে আমার 'আমি'—'সবই তোমার' সাগরজলে,
মারবে কাকে ধরবে কাকে—ভাবছ চিতে অন্তরালে;
'আমি', 'তুমি'-র ধন্দপাকে আর কেন মন মিথ্যে থাকে,
প্রাণ জেনেছে তুমিই সেজন—যেজন আমায় নিত্য আঁকে;
সাদা-কালো মন্দ-ভাল—রামধনুকের সাতটি রঙে,
আর কি এ মন থাকতে পারে—মায়ার পালায় ঠুনকো সঙে?
শুধোয় সবে—"কীই বা হবে—মিথ্যে অমন 'সত্য' খুঁজে?
সারাৎসারে কী দরকার? দেখছ আলো দুচোখ বুজে।"

বলছি মনে সঙ্গোপনে জাগলে তুমি কাতর প্রাণে,
অকিঞ্চনের বুক-মরুতেও—'সব পেয়েছি'র জোয়ার আনে;
অন্যথায়, জীবন হারায় ভোগ-লালসার অন্ধকারে।

ঐশ

তন্ময় ধর

এই-ই মনোভূমি, পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়,
স্বরে ও আলোয় আয়তনবান সত্য।
ঘনীভূত আত্মার মুখোমুখি প্রথম মাত্রায়।
দূর শূন্যের আঁধার পেরিয়ে আসা
আলোর বিজিজ্ঞাসায় বিস্মিত আমি।
শুধু বিন্দু এক।
ঝলসে ওঠে আলো।
এই মুহূর্তে অযাচক কর, আমাকে।



ভারত মহান

ননীগোপাল কুশারী

সীমাহীন নীলিমায় দূর-সীমানায়
একঝাঁক বুনোহাঁস উড়ে উড়ে যায়;
সবুজের মাঠভরা সোনার ফসল
ভোরের আলোয় দোলে, হাসে উচ্ছল;
বাতাসের স্পর্শে সদা স্নেহের শপথ
এই তো আমার দেশ অমর ভারত।

ঋষির বৈদিক মন্ত্র ওঙ্কারধ্বনি।
শঙ্খের গম্ভীর মন্দ্র, সান্ধ্য রামায়ণী,
আজানের উর্ধ্বস্বর, গির্জার গান,
মঠে মঠে স্তোত্রপাঠ, বুদ্ধের ধ্যান,
নদী-হ্রদ-মরুভূমি-পাহাড়-পর্বত
এই তো আমার দেশ অমর ভারত।

আবির্ভূত হেথা কত ঋষি-মহাঋষি,
মুঘল পাঠান এল, অলেখ বিদেশি,
আর্য-দ্রাবিড়—নানা নবীন প্রবীণ,
শক, হূন, ইউচিও এখানে বিলীন;
সমুদ্রের ঘেরাটোপ, হিমাদ্রির পথ,
এই তো আমার দেশ অমর ভারত।

তথাপি নিরন্ন শিশু এখানেই কাঁদে,
বিশ্বাসের ঘাতকেরা ষড়যন্ত্র ফাঁদে,
অনেক অনেক জ্বালা বুকের ভিতর
অবশ্য এখনো দার্ঢ্য হিমাদ্রিশিখর;
এ বীণায় বাজে বিশ্বমঙ্গলের গান
তাই তো আমার দেশ ভারত মহান।

প্রার্থনা

রবি দত্ত

ওগো সত্য, ওগো নিত্য,
কর দীপ্ত মম চিত্ত।
শুভ বৃত্তি মহাসুপ্ত,
হিতবুদ্ধি অবলুপ্ত।
তমোশক্তি মহাঘোরে
বেঁধে রাখে মোহডোরে।
ঘনকৃষ্ণ অমানিশা
আবরিল দশদিশা।

তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ,
অধোগতি কর রুদ্ধ।
দানি আলো, মহাজ্যোতি,
কর সবে শুদ্ধমতি।

একলা যতটা পারি

স্বামী ঈশাত্মানন্দ

সূর্যটাকে পিঠে নিয়ে বসে আছি আমি,
একলা যতটা পারি ছায়া দিতে এই ধরিত্রীকে।
পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদী অনুযোগ করে—
সবটুকু ছায়া ঐ মাটি কেন পাবে?
জ্বলে যায় বুক মোর বুঝবে তুমি কবে?
চারিদিকে ঘিরে থাকা অনন্ত বনানী
একটুও না দুলে তোলে মর্মধ্বনি,
নদীর সমর্থনে।
বিনা শব্দে বলে
মাথায় আগুন নিয়ে অসংখ্য অসহায়
তোমার প্রেমের তরে অনন্ত অপেক্ষায়;
কবে আসবে ধারা।
গভীর নিঃশব্দ, ছবি হয়ে গেছে চারিদিক,
তারই মাঝে তপ্ত হাওয়া বয়ে আনে
দূর গ্রাম্য কোন শৃগালের ডাকে—
ব্যর্থ প্রেমিকের অসহায়-হিংস্র অভিব্যক্তি যেন।
ভীতা জননীর সরে যাওয়া হাত ফুঁড়ে—
ভয়-অনভিজ্ঞ শিশুর ক্রন্দনের মতো
ঝিঁঝিঁপোকা ডাকে- -
যেন বলে কেঁদে কেঁদে, পারবে কি তুমি?

পশ্চিমে ঘুরে বসি—
সূর্যতাপ বুকে নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করি—
কি প্রয়োজনে আমার জীবন?
সহসা এ কী হলো—
বাতাসে মধুর সুর, পাখিরা কি ফিরে গেছে ঘরে?
ফুলেরা উঠেছে জেগে—
মাছের জলকেলি মাছরাঙার নিদ্রাভঙ্গ করে।
প্রচণ্ড অর্কদেব লজ্জায় রক্তিম বর্ণ
বৃক্ষপৃষ্ঠে লুকায়েছে মুখ।
গাছেরা দোলায় মাথা, দূরে গেছে সব ব্যথা,
থেমে থাকা মৃত্যু-সমতুল।
পূর্ব পানে চাহি—
শুভ্রশির মন্দিরের গর্ভপূর্ণ জ্যোতির ছটায়
নিঃশব্দ বাণী গম্‌গম্ করে
হৃদয়ের কোনায় কোনায়—
অনন্ত এ দিব্য মায়া বোঝা বড় দায়,
ধন্য হবে জীব-জীবন সেবায়, দয়ায়।
সেই থেকে—
সূর্যটাকে পিঠে নিয়ে বসে আছি আমি
একলা যতটা পারি ছায়া দিতে এই ধরিত্রীকে।



কাঙাল মন

কমল নন্দী

আমার 'আমি'টা বড় কাঙাল,
দীনতার দৈন্যক্লিষ্ট।
বিধাতার কাছে দুহাত পেতে কাঙালের ভিক্ষা—
দাও যশ, দাও অর্থ
দাও প্রতাপ, দাও সামর্থ্য
শরমের লেশমাত্র নেই।

বিধাতার একান্নবর্তী সংসারের কথা ভাবিনি।
পুকুরের শৈবাল, কচুরিপানা, পুঁটিমাছ, নুড়িপাথর
গঙ্গাফড়িং, জোনাকি, শালিক-চড়ুই
সূর্য, তারা, তোমরা-আমরা, আকাশ, আলো
আরো কত কী! আরো কত কে?

এ বিপুল বিশ্বসংসার কি আমার একার?
ভাগ করে নিতে হবে সকলের সাথে—
প্রত্যাশা অনপেক্ষ বিধাতাপুরুষের বিপুল অহৈতুক দান!
আকাশ আলো তনু মন প্রাণ
প্রদোষে প্রত্যুষে প্রকৃতির গান
মেঘভরা বৃষ্টি, তেজভরা রোদ্দুর
সুখ-দুঃখের ডালি, হাসি-কান্নার পসরা
জীবন-মৃত্যুর মাঝে তাঁর অসীম করুণার ধারা।

আরো কত চাই!

রাজ রাজেশ্বরের ছেলে হয়ে
আর কাঙালিপনা সাজে না!
বিধাতার ইচ্ছাতরঙ্গে ভাসিয়ে দাও গো জীবনতরী।

জীবননদীর এক কূলে বিরহ ও বেদনা
আরেক কূলে প্রেম ও আনন্দ।
জীবনতরীর মাঝি
কূল-পারানির কড়ি নিয়ে ওঠে মৃত্যুর মোহনায়—
অসীম প্রাণসমুদ্রে কুশাগ্র প্রাণের আত্মনিবেদন।

প্রণতি

আর্যকুমার পালিত

উন্নত শাখে উদ্ধত হলো রক্তজবার দল,
মত্ত বাতাসে গন্ধরাজের গন্ধ দোলে,
অপরাজিতার দৃপ্ত নয়ন করে ঐ ঝলমল।
অশোক আত্ম-অভিমানানল জ্বালিয়া তোলে!
পূজামালঞ্চ ছাড়িয়া জননী ফিরে যেতে চান ঘরে,
এমন সময় চরণকমলে প্রণত শেফালি ঝরে।

একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

একদা ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল : "অম্বিতমে নদিতমে দেবিতমে সরস্বতি।" দেবী সরস্বতী জ্ঞানপ্রবাহরূপে নদীর আকারে ভারতবর্ষকে এক পুণ্যশ্লোক দেশ বা জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি গবেষণামূলক হলেও চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। বর্তমান প্রাবন্ধিক যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে সেইসব মতবিরোধের যথাসম্ভব সমন্বয় করেছেন এই প্রবন্ধে।—সম্পাদক

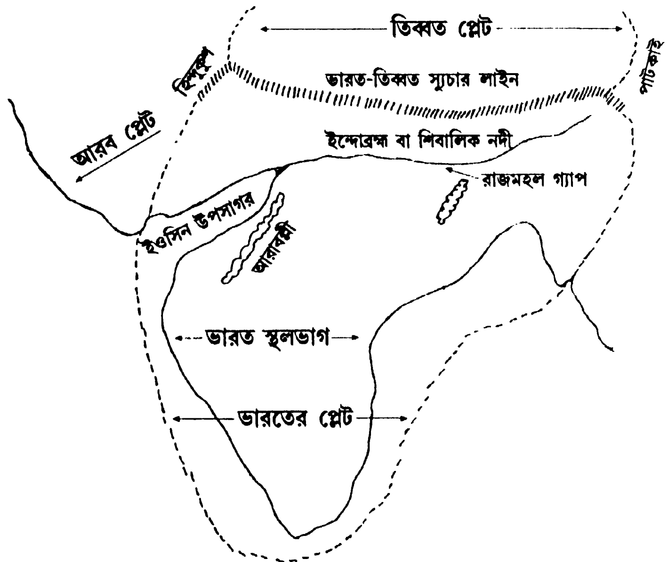
বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, মারাঠি, গুজরাটি—এইসব নানা ভাষার নানা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী নিয়ে লেখা বের হচ্ছে। নদীটির নাম 'সরস্বতী'। এই নামটির সঙ্গে ভারতের হিন্দু মানসের আধ্যাত্মিক যোগ বহু পুরনো এবং অনেকটাই আবেগপ্রবণ। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নদী থেকে ঈশ্বরীতে পরিণত হয়ে যাওয়া এই নামটি শুনে ঔৎসুক্য জেগে ওঠা স্বাভাবিক এবং এইজন্যই বিষয়টি নিয়ে এত প্রচার। অথচ হিন্দু মানসিকতা বাদ দিলে একটি নদীর মৃত্যু এবং সেই জায়গায় আরেকটি নদীর জন্ম একটি অতি সাধারণ ভৌগোলিক ঘটনা, যা ভূবিদ্যার সঙ্গে জড়িত।

ভূপৃষ্ঠ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে সেই আদিকাল থেকে। আদিকাল মানে শুধু দু-চার হাজার বা দু-চার লক্ষ বছর নয়, কোটি কোটি বছর আগে থেকে। সেই পরিবর্তনগুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা আন্দাজ করা যায়। সব ধর্মেই বলেছে, ঈশ্বর হলেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যেমন বাইবেলে আছে, ঈশ্বর বললেন—"Let there be light", অমনি পৃথিবীতে আলোর উদয় হলো। এমনি করে জল এল, মাটি এল, খানাখন্দ ভর্তি হয়ে সমুদ্র হলো। উঁচু জায়গাগুলি হলো ডাঙা। ডাঙার বৃষ্টির জল গড়িয়ে নিচের দিকে চলল সাগরে, আমরা বললাম 'নদী'। তারপর বহু বছর কেটে গেল, পৃথিবীর উপরিভাগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির গতিপথেরও পরিবর্তন হতে লাগল। এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। তেমন পরিবর্তন আজও হয়ে চলেছে অত্যন্ত ধীরে, যা আমাদের বুঝতে বা অনুভব করতে অসুবিধা হয়।

যেমন যদি বলা হয়, এমন সময় ছিল যখন সিন্ধু, যমুনা, সরস্বতী, গঙ্গা—এসব নদী ছিল না; ছিল একটিমাত্র পশ্চিমবাহিনী নদী—অরুণাচল থেকে উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত, বৈজ্ঞানিকেরা যার নাম রেখেছেন 'ইন্দোব্রহ্ম' অথবা 'শিবালিক'—তাহলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এটা সত্য এবং সেই নদীর মোহনা ছিল নৈনিতাল ল্যান্সডাউন অঞ্চল।

টেথিস সাগর

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। সরস্বতী নদীর মৃত্যুকাহিনী সবার জানা হয়ে গেছে। 'দেশ' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যাতেও (৮ জুলাই ২০০০) তিনটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। তারপরে অনেকগুলি চিঠিপত্রের মাধ্যমে নানারকম প্রাসঙ্গিক আলোচনাও হয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী জগমোহন এটি প্রমাণ করতে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন যে,



আদিম ভারতের প্রথম নদী

সরস্বতী সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার চেয়েও বেশি পুরনো। তাতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে প্রমাণগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার প্রয়োজন আছে। পরে এই প্রসঙ্গে আসা যাবে। নদীর জন্ম এবং মৃত্যু—বিশেষ করে উত্তর ভারতে কিরকমভাবে হয়েছে, তার আলোচনা করতে বসে প্রথমে আমাদের ভারতের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। ভারত ছিল অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে, মালাবার উপকূলের সঙ্গে সাঁটা। সেটি



গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড-এর সম্ভাব্য অবস্থান

আবার ছিল আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গে সাঁটা। দক্ষিণ আমেরিকা ছিল আফ্রিকার সঙ্গে লাগানো। এই সম্পূর্ণ ভূ-ভাগটি কুমেরুর সঙ্গে লাগা ছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড'—ভারতের 'গোণ্ড' উপজাতির নামে। অন্যান্য স্থলভাগ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতের টুকরোটি প্রায় ৫.৫ কোটি বছর আগে নিরক্ষরেখা পার করে আরো উত্তরে আসতে থাকে। উত্তরে তখন রয়েছে এশিয়া এবং ইউরোপের সংযুক্ত ভূ-ভাগ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লরেশিয়া'। লরেশিয়ার দক্ষিণের অংশে রয়েছে তিব্বত, তার দক্ষিণে রয়েছে টেথিস সাগর। ভারত এই টেথিস সাগরকে ক্রমে সঙ্কুচিত করতে করতে অবশেষে একেবারে লুপ্ত করে তিব্বতের গায়ে এসে ঠেকল। প্রায় তিন কোটি আশি হাজার বছর আগে টেথিস সমুদ্র অবলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতের প্লেটটি লরেশিয়ের প্লেটের চেয়ে নিচু, তাই তিব্বতের নিচে সেটি ঢুকে যায় এবং সৃষ্টি হয় দুই প্লেটের সংযুক্তকারী রেখা—যাকে বলা হয়েছে 'স্যুচার লাইন' বা 'সেলাই রেখা'। আজকের ব্রহ্মপুত্র নদ এই স্যুচার লাইনের মোটামুটি ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে হিমালয়ের উত্তরে।

ভারতের প্লেটটি প্রতিনিয়ত তিব্বতের আরো নিচে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে স্যুচার লাইনের দক্ষিণে চাপ দিচ্ছে, ফলে সৃষ্টি হয়ে চলেছে হিমালয়, যা একটি ভাঁজ খাওয়া পর্বত বা 'ফোল্ডেড মাউন্টেন'। প্রতিনিয়ত এই ভাঁজ হওয়ার পর্ব এগিয়ে চলেছে এবং হিমালয় সাড়ে সাত থেকে দশ সেন্টিমিটার উঁচু হচ্ছে প্রতি বছরও। সেই হিসাবে আজ থেকে দুহাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মের সময়ে হিমালয় আরো ছশো ফুট নিচু ছিল। আরো পিছিয়ে গেলে অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, সরস্বতীর সময়ে দুহাজার থেকে আড়াই হাজার ফুট নিচু ছিল। সুতরাং আজকের দুরধিগম্য পার্বত্য রাস্তাগুলি সহজে হেঁটে পার হওয়া যেত।

টেথিস সাগর বন্ধ হওয়ার পরবর্তী কালীন দৃশ্যটা একবার বুঝে নেওয়া যাক। ভারতের পূর্বের দিকটা উঁচু, পশ্চিম দিকটা নিচু। স্যুচার লাইনের দক্ষিণ দিকটায় হিমালয় উঁচু হয়ে উঠছে আর উত্তরে তিব্বতের মালভূমি সৃষ্টি হয়েছে। অরুণাচল থেকে একটি নদী হিমালয়ের কোল ঘেঁষে পশ্চিম দিকে বইল এবং টেথিস সাগরের অবশিষ্ট অংশ ইওসিন উপসাগরে এসে মিশল। ইওসিন উপসাগর ছিল আরব সাগরের বর্ধিত রূপ যা পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা হয়ে উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্পূর্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ইওসিন উপসাগরের তলায় ছিল। আগেই বলা হয়েছে, যে-নদীটি ইওসিন উপসাগরে এসে মিশল, তার নাম 'ইন্দোব্রহ্ম'—সিন্ধু (ইন্দাস) এবং ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত রূপ। কেউ কেউ আবার এর নাম দিয়েছেন 'শিবালিক', কারণ আজকের শিবালিক পর্বত ঠিক এই নদীর ওপর উঠেছে।

প্রাথমিক ভারতবর্ষ

ভারতের স্থলভাগের চেহারাটা পাল্টাচ্ছে ধীরে ধীরে। হিমালয় উঁচু হচ্ছে এবং তার পলি দিয়ে ভরাট হচ্ছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থান। তার সঙ্গে ভারতের প্লেটের চাপে বারবার ভূমিকম্প হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বিহারের মালভূমি, আরাবল্লী পাহাড় এবং শিবালিক পর্বতশ্রেণি। উত্তর-পশ্চিমে উঁচু হচ্ছে হিন্দুকুশ এবং পামীর মালভূমি। এইসব উঁচু উঁচু ভূ-ভাগের যেখানে যেখানে নিচু জায়গা ছিল, সেখান দিয়ে বইল জলধারা। ভূ-ভাগের উত্থান এবং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলধারাগুলির গতিপথের পরিবর্তন চলতে থাকল। ব্রহ্মপুত্র নিচু জায়গা পেয়ে দক্ষিণে বেঁকে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলল। অতএব ইন্দোব্রহ্ম শুকিয়ে গেল, অন্তত উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তার প্রবাহ আর রইল না।

আরাবল্লী উঁচু হয়ে ওঠায় ছোট ছোট জলধারা মধ্য হিমালয় থেকে নেমে এসে পশ্চিমের বদলে পূর্বমুখী হয়ে চলল। তৈরি হলো পাললিক ভূমির বঙ্গদেশ। গাড়োয়াল হিমালয় এবং তার পশ্চিম দিকের অংশ থেকে যেসব জলধারা নেমে এল, তারা বয়ে গেল নিচু জমি যেখানে পেল সেইদিকে। তৈরি হলো হরিয়ানা, পাঞ্জাবের সমতলভূমি। কিন্তু এর মধ্যে অনেক লক্ষ বছর কেটে গেছে, সেই সময়ের কথাটা ছেড়ে দিলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, থর মরুভূমির বয়স মাত্র তিনহাজার বছর, আর আমরা বলতে চাইছি কয়েক লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা। একটু পরে সেকথায় আসা যাবে।

উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের গাঙ্গেয় ভূমিতে কোথাও কোথাও পাললিক গভীরতা তিন কিলোমিটারেরও বেশি। এর থেকে প্রমাণ হয়, কত লক্ষ বছর ধরে গঙ্গার অববাহিকা তৈরি হয়ে চলেছে! আজও সে-প্রক্রিয়া চলছে।

কয়েক হাজার বছর পরে হয়তো দেখা যাবে, সুন্দরবনের বা গঙ্গাসাগরের সমুদ্রতট একশো-দেড়শো কিলোমিটার আরো দক্ষিণে চলে গেছে। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি নদীর বুকে পলি জমছে, ভরাট হচ্ছে নদীগর্ভ, উঁচু হচ্ছে নদীর বুক—এর ফল বন্যা। এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যার বিকল্প নেই।

পনেরো লক্ষ বছর আগে

ব্রহ্মপুত্র মোহনায় পলির স্তর এগারো কিলোমিটার গভীর। তার সেই গভীরতা কমতে কমতে কলকাতার কাছে এসে তিন কিলোমিটার বা তারও কম হয়ে গেছে। যদি আজকের সময়টা পিছনে নিয়ে যাই, তাহলে চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে তার অনেকটা প্রমাণ করা যায়; কিন্তু বাকিটা আন্দাজ করে নিতে হবে। আন্দাজ করা মানে ঠিক কল্পনা করা নয়, অনেকটা অপ্রমাণযোগ্য অথচ সত্য বলে মনে হয় —এমন অবস্থা। প্রকৃতি তার প্রত্যেকটি কাজের প্রমাণ রেখে যায়, কিন্তু বহু যুগ ধরে সেই প্রমাণগুলি মুছে যেতে যেতে সেই প্রামাণিক চিহ্নগুলি লুপ্ত হয়ে অথবা গুপ্ত হয়ে যায়। হাজার হাজার বছর পরে সেই প্রমাণগুলি উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মনে করা যাক হিমালয় পর্বতটি নেই, অথবা আছে একটি লম্বা টিলার আকারে। ভারতবর্ষে একটিও মানুষ নেই, পরিবর্তে রয়েছে গভীর জঙ্গল এবং তাতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা। আরাবল্লী ভারতের পশ্চিম উপকূল-সমুদ্রকে আটকে রেখেছে। সিন্ধু নদের চিহ্নমাত্র নেই, তার জায়গায় রয়েছে ইওসিন উপসাগর, পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে উত্তরে জম্মু পর্যন্ত গিয়ে পূর্বে বেঁকে পাঞ্জাব-হরিয়ানার ওপর দিয়ে ল্যান্সডাউন পর্যন্ত তার বিস্তার। হিন্দুকুশ পর্বতও অনেক নিচু, তবু সেটাই ইওসিন উপসাগরের পশ্চিম পাড়। ইন্দোব্রহ্ম নদী আরাবল্লীর উত্তরের ফাঁক দিয়ে ইওসিনে মোহনা করেছে। জায়গাটা তখন সমতল, হিমালয় তত উঁচু নয়, শিবালিকের অস্তিত্ব নেই। কাছাকাছি সাড়ে তিন কোটি বছর ধরে ভারতের প্লেট চাপ দিচ্ছে তিব্বতের গায়ে এশিয়ার প্লেটের ওপর। ফলে যেমন হিমালয় সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি দুপাশে দুটি কাঁধের মতো বেঁকে আসছে পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণের দিকে। পশ্চিমে হিন্দুকুশ আর পূর্বে পাটকাই। পনেরো-কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার সেই ইন্দোব্রহ্ম নদীর গতিপথ কিন্তু এখনো চেনা যায় তরাই অঞ্চলের জলাভূমি-রূপে। জলাভূমিগুলিরও প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, তবু মৃত নদীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ বলে চিনতে পারা যায়।

তরাই অঞ্চলে মোহনা

এসব কথা কেন আসছে—সেই প্রশ্নের একটা সদুত্তর এইখানে দিয়ে রাখা উচিত। একটি নদীর মৃত্যু কেন এবং কিভাবে হয় সেই প্রসঙ্গ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে প্রথমেই ইন্দোব্রহ্ম নদীর কথা উঠে আসে। ১৯১৯ সালে ই. এইচ. প্যাসকো ইন্দোব্রহ্ম নদীর কথা বললেন। সেই বছরেই জি. ই. পিলগ্রিম শিবালিক নাম দিয়ে স্বীকার করে নিলেন যে, আরব সাগরের একটি উপসাগর—নাম ইওসিন উপসাগর—সিন্ধুপ্রদেশ, জম্মু, পাঞ্জাব থেকে নৈনিতাল ল্যান্সডাউন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ল্যান্সডাউনের পাহাড়গুলি মধ্য মিওসিন অথবা নিম্ন প্লাইস্টোসিন যুগের পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত হয়েছে। স্বাদু জলের পলি কি করে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল, সেটি বুঝতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা ইওসিন উপসাগরে পতিত হয়েছে এমন একটি নদীর মোহনার কথা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পিলগ্রিম বলেছেন, আজকের শিবালিক পর্বতমালা ঠিক শিবালিক নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে। কালে ইওসিন উপসাগর বুজে যায় এবং তার থেকে উৎপন্ন হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের সুবিশাল সমতলভূমি। ইন্দাস বা সিন্ধু নদও কাশ্মীর থেকে এবং পঞ্চনদ থেকে জল নিয়ে পরিবর্তিত ইওসিন উপসাগরের ফেলে যাওয়া রাস্তার কিছুটা ব্যবহার করছে। ভূ-প্রকৃতির উত্তোলনের ফলে আরব সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইওসিন উপসাগর বিশাল হ্রদে পরিণত হয়। হিমালয় থেকে অনেকগুলি নদীর গন্তব্যস্থলও ছিল এই জলাভূমি। আরো একটি বিষয় খুবই চিত্তাকর্ষক, তা হলো লুপ্ত ইওসিন উপসাগরে যেসব নদী এসে পড়ল, তাদের জল বের হওয়ার একটা রাস্তা তৈরি হলো পূর্ব দিকে। এটাই প্রাথমিকরূপে গঙ্গা বলা যায়। হয়তো প্রথম দিকে এই জলনিকাশী নদী পশ্চিমবাহিনী ছিল। 'হয়তো' বলা হলো এই কারণে যে, সাধারণভাবে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, পশ্চিমের দিকেই নিকাশীব্যবস্থা ছিল ইওসিন যুগের সময় থেকে।

বড় রকমের ভূমির উৎক্ষেপ হওয়ার পর ইওসিন সাগরের সঙ্গে আরব সাগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অথচ হিমালয়ের জলধারা তাতে এসে জমতে থাকে। তারপর মধ্য মিওসিন যুগে আরেকটি খুব বড় রকমের ভূমির উৎক্ষেপে রাজমহল পাহাড় আর শিবালিকের মাঝ বরাবর নিম্নভূমির স্থান দিয়ে জল নিকাশ করার সুযোগ আসে। এমনি করে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলির উৎপত্তি হলো। হিমালয়ের দক্ষিণ বরাবর সারি সারি লেগুনগুলি ইওসিন সমুদ্রের ধ্বংসাবশেষ। এবিষয়ে নানা মতপার্থক্যও আছে, তবে ধ্বংসাবশেষগুলির চিহ্ন হতে এর চেয়ে ভাল গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব বা সমাধান আজও মেলেনি।

দিল্লির কাছে আরাবল্লী উঁচু হতে থাকায় গঙ্গা পূর্ববাহিনী হয়ে ওঠে প্রথমে ইওসিন সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং পরে হিমালয় থেকে নেমে আসা শাখানদীগুলির জলে

পরিপুষ্ট হয়ে। শিবালিক পর্বতে ৪.৮ কি.মি গভীর স্বাদু জলের পাললিক শিলার অবস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইন্দোব্রহ্মের কথা অবধারিতভাবে এসে পড়ছে। কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা (এম. এস. কৃষ্ণান এবং এন. কে. কে. আইয়েঙ্গার, ১৯৪০) মূল ইওসিন সাগর মেনে নিলেও ইন্দোব্রহ্ম অথবা শিবালিক নদীর অস্তিত্ব মেনে নেননি।

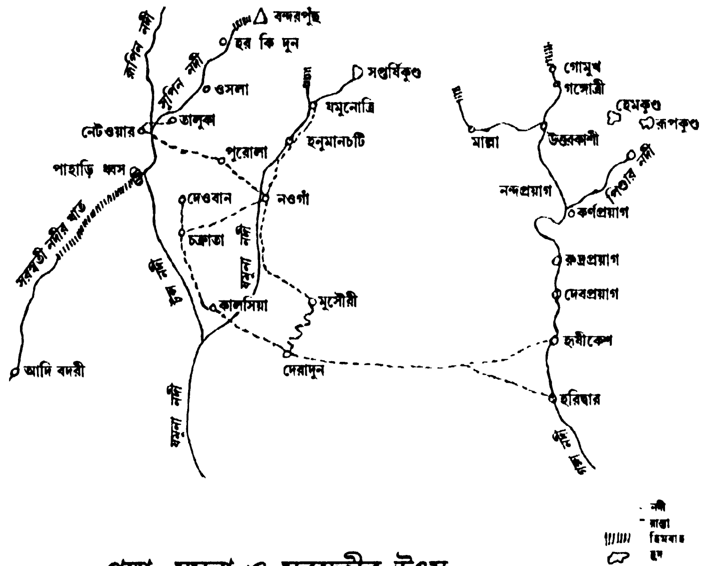
এক লক্ষ বছর আগে

প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী আলোচনা করা, জটিল ভূবিজ্ঞানের আলোচনা নয়। যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এবং যেহেতু সরস্বতী নদীর বিষয়ে আলোচনা চলছে, তাই ঐ নদীটির সঙ্গে সম্পর্কিত জায়গাগুলি অথবা বিষয়গুলি নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

মাটির নিচে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে অনেক জায়গায় যেসব আবিষ্কার হয়েছে, তার থেকে সেই সময়কার আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি এবং ভৌগোলিক খবরাখবর পাওয়া গেছে। রাজস্থানের দিদওয়ানা, জয়াল, নাগৌর, পুষ্করের বালিয়াড়িতে এবং লুনি নদীর অববাহিকায় মাটি খুঁড়ে বহু তথ্য জানা গেছে, যার মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক নিদর্শন আছে। এইসব নিদর্শন মাটির নিচে বিভিন্ন স্তরে রয়েছে এবং এই স্তরগুলির গভীরতা থেকে তাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ উদাহরণ রয়েছে নাগৌর জেলার একই জায়গায়। সবার ওপরের স্তরটি পাঁচ থেকে ছয় মিটার গভীরে রয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'দিদওয়ানা স্তর', যার সময়কাল চব্বিশ থেকে আটাশ হাজার বছর। তার নিচের স্তরের নাম 'অমরপুর স্তর', গভীরতা দশ মিটার, সময়কাল কমবেশি এক লক্ষ বছর। সবচেয়ে নিচু স্তরের নাম 'জয়াল স্তর', গভীরতা সতেরো-আঠারো মিটার, সময়কাল সাড়ে তিন লক্ষ বছর বা তারও বেশি। স্তরগুলির নাম অন্যান্য জায়গা, যেখানে অনুরূপ স্তরের নিদর্শন রয়েছে, তাদের নামে হয়েছে।

দিদওয়ানা স্তরের গুরুত্ব অনেকখানি। এই সময়কালের অর্থাৎ চব্বিশ হাজার বছর আগের খবরে আমাদের বেশি দরকার, কারণ সেই সময়ে সরস্বতী নদীর অবস্থা জানার এটাই একমাত্র রাস্তা। দিদওয়ানা স্তরে বালির চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার মানে সেখানে নদী ছিল। বসতির যেসব চিহ্ন আছে তাতে জলে বাসকারী জীবের, যেমন মাছ বা কুমিরের প্রমাণ আছে। বেশ বড় নদীর ধারে যে বসতি ছিল, সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলতে পারছেন প্রমাণ সহিত।

দিদওয়ানা স্তরের চেয়ে পুরনো স্তর হলো অমরপুর স্তর, এক লক্ষ বা আরো বেশি আগেকার এবং সেখানেও জল ছিল। জলে জমা জমির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। অমরপুর স্তর যেসময়কার, সেইসব জায়গাতে মনুষ্য-বসতির প্রমাণ রয়েছে। তার মানে, এক লক্ষ বছর আগে রাজস্থানে জায়গায় জায়গায় আদিম মানুষের বাস ছিল এবং সেই বাসভূমির অঞ্চলে জল ছিল। থাকতেই হবে, কেননা জল না হলে জীবন চলে না। এবং এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কোন এক নদীর ধারে তাদের বাস ছিল। সেই প্রমাণগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।



গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উৎস

তিন লক্ষ বছর থেকে শুরু করে আটাশ হাজার বছর পর্যন্ত একই জায়গায়, যেমন দিদওয়ানাতে, জলের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। তিন লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষের বাস ছিল না, অথচ জলবাহিত নুড়িপাথর রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই নুড়িপাথরগুলির চেহারা এবং চরিত্র বলে দিচ্ছে যে, তারা অনেক দূর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে। পাথরগুলি

ঐ তল্লাটেরই নয়। প্লাইস্টোসিন যুগে ওখানে নদী ছিল, মানুষ ছিল। নাগৌর থেকে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে জয়াল। জায়গাটা সম্বর লেকের গায়ে গায়ে। সম্বর লেকের কাছ দিয়ে এক লক্ষ বছর আগে নদী বইত, তাতে হিমালয়ের পাথর বয়ে আসত, নদীতে কুমির পাওয়া গেছে আঠাশ হাজার বছর আগে। এসব প্রমাণিত সত্য। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, হিমালয় থেকে (হিমালয় তখন অনেক নিচু ছিল) একটা নদী নেমে এসে রাজস্থানের আজমীড় নাগৌর হয়ে বইত?

এবার আরো একটি প্রমাণের উপস্থাপনা করা যাক। আজমীড়ের লবণ হ্রদগুলির আশপাশে যেসব ফুল জন্মায়, তাদের পরাগ বা রেণু বিশ্লেষণ করে এক অতি অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেছে। পরাগের মধ্যে পুরুষ জিন রয়েছে। জেনেটিক পরীক্ষা করে যেসব তথ্য সামনে এসেছে তাতে জানা গেছে, এইসব জিনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব যুগে যুগে কিরকম হয়েছে। ডি. এন. এ এবং আর. এন. এ পরীক্ষায় জানা গেছে যে, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে অতি জলীয় আবহাওয়া ছিল। আবার দশ হাজার বছর আগে বেশ শুষ্ক আবহাওয়া এসেছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু অনেক কম পরিমাণে। পাঁচ হাজার বছর থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত মোটামুটি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অতিশুষ্ক আবহাওয়া চলছে। এগুলি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত সত্য। আরো অনেক কিছু জানা গেছে, তবে সেসব এই প্রবন্ধের জন্য বাহুল্য হবে বলে মনে হয়।

অনেকরকম বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হলো। এখানে প্রতিপাদ্য এই যে, একটি বেশ বড় নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছিল—যার রাস্তা ছিল হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট হয়ে। সেটি প্রবাহিত হতো আরাবল্লীর পশ্চিম ধার দিয়ে এবং মোহনা ছিল খাম্বাট উপসাগর। তা না হলে খাম্বাট উপসাগরে সবরমতী নদীর মোহনায় হিমালয়ের পলি আসবে কেমন করে? ছয় হাজার বছর আগেকার লোথাল বন্দর গুজরাটের নদীর মোহনায় গড়ে উঠবে কি করে? সেই বন্দরটা ছিল এমন জায়গায়, যেখানে জোয়ার-ভাটা খেলত এবং নদীর মোহনা বা সমুদ্র উপকূল থেকে অনেকখানি অভ্যন্তরে হওয়ায় সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে ছিল। যাঁরা খাম্বাট উপসাগর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁরা সকলেই জানেন—বর্ষাকালে খাম্বাট উপসাগর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন নৌচালনযোগ্য সমুদ্রের অন্যতম।

যে-নদীটির কথা বলা হচ্ছে, সেটি লুপ্ত হয়ে গেলেও তার দেহাবশেষগুলি পড়ে নেওয়া খুব কঠিন নয়। তার প্রধান কারণ, সময়টা খুব দূরের নয়। সবরমতী নদী, বানস নদী, লুনি নদী, পুষ্কর হ্রদ, সম্বর হ্রদ, হিসার জেলার লুপ্ত নদীর খাত, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবর—সব মালার মতো একটি সূত্রে গেঁথে নেওয়া যায়। মিলটা ঠিক কাকতালীয় বলে মনে হয় না। আর সময়কাল জানা যাচ্ছে, এক লক্ষ বছর (বেশি হওয়াই স্বাভাবিক) থেকে চব্বিশ হাজার বছর আগেকার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এটাও কি সরস্বতী নদীর কোন এক অবস্থার বিবরণ? প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে স্মরণে রাখা যেতে পারে যে, বর্তমানে কুরুক্ষেত্রের কাছে লুপ্ত সরস্বতীর ধারা আজও আছে, সামান্য নালার মতো অথচ বিশাল যমুনা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যমুনার এই প্রসঙ্গটিও পরে আলোচনা করা যাবে।

দশ হাজার বছর আগে

তখন থর মরুভূমির জন্ম হয়নি, গাছপালা ছিল রাজস্থানের এখনকার মরু অঞ্চলে। এই সময় থেকে বৃষ্টিপাত একদম কমে যায়, মরুভূমি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। থর মরুভূমির বয়স স্থির করা হয়েছে মাত্র তিন হাজার বছর। তার মানে এই নয় যে, তার আগে মরুভূমির কোন অস্তিত্ব ছিল না। বৃষ্টিপাত কমে আসায় মাটিতে জৈব (হিউমাস)-দ্রব্য কমে এল, কিন্তু নদীর ধারা আরো অনেক বছর ধরে রাখতে পারল উদ্ভিদজীবন। তারপর নদীর ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। হয়তো নদীর পথ ঘুরে গিয়েছিল অন্যদিকে এবং সেটাই ঠিক। নদীটা দক্ষিণবাহিনীর পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে যায়। এক লক্ষ থেকে চব্বিশ হাজার বছর পর্যন্ত যে-নদীটা পশ্চিম রাজস্থানে আরাবল্লীর পাশে পাশে বইত, সেটা যে সরস্বতীই ছিল—এমন কোন প্রমাণ এখনো কেউ হাজির করেননি। তবে সরস্বতী হওয়াই সম্ভব, অথবা সরস্বতী হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—একথা অনেকে বলে থাকেন।

এর মধ্যে একটি খুব জরুরি কথা মনে রাখা দরকার, তা হলো শিবালিক এবং আরাবল্লীর ফাঁকটার কথা। দিল্লি থেকে হরিদ্বারের মাঝে এই ফাঁকটি আমাদের আলোচ্য নদীগুলির ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হরিদ্বারের পূর্ব দিকে গঙ্গা, পশ্চিম দিকে যমুনা, তার আরো পশ্চিমে সরস্বতী। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, যমুনা গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে উৎপন্ন হয়েও দিল্লির কাছে আরাবল্লীর ওপর দিয়ে ওপাশে পূর্বে চলে গেছে। আজকের এই যে যমুনার গতিপথ—এটা কিন্তু আসলে সরস্বতীর গতিপথ ছিল। যমুনা ছিল আরো পূর্ব দিকে, হিণ্ডন নদী অথবা কালি নদীর জায়গায়। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন যে, যমুনা অন্তত তিনবার নিজের পথ বদলেছে। প্রতিবারই পশ্চিমের দিকে আরো সরে এসেছে। এমনি

করতে করতে সরস্বতীর জায়গায় আজকের যমুনা বইছে। এই তত্ত্বটা সত্য এবং তার প্রচুর প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন, যেটাকে নতুন করে আর উপস্থাপিত করার প্রয়োজন নেই। এই সত্যটি মনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সরস্বতী আগে শিবালিক ও আরাবল্লীর ফাঁক দিয়ে পূর্ববাহিনী ছিল। ঠিক কোন্ সময়ে তার জলধারা যমুনা অধিকার করে নিল এবং কেমন করে, সেটা জানা প্রয়োজন। বহুদিন এই সময়টা চিহ্নিত করা যায়নি। সম্প্রতি একটি প্রামাণ্য গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সবচেয়ে পুরনো প্রমাণিত ভূমিকম্পের খোঁজ পেয়েছেন ডঃ অজিত প্রসাদ। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে তিনি রাজকোট জেলার বাগাশ্রা গ্রামে সরস্বতী সভ্যতার একটি কেন্দ্রে খনন করতে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লম্বালম্বি ফাটল দেখতে পান। এতদিন পর্যন্ত উত্তর রাজস্থানের সরস্বতী সভ্যতার সময়কার বিশাল নগর কালীবঙ্গানে একটি ফাটল ছিল সবচেয়ে পুরনো আবিষ্কৃত ভূমিকম্পজনিত ফাটল। কালীবঙ্গান হলো নবীন হরপ্পার সমসাময়িক। তখনো হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে শহুরে হয়ে ওঠেনি। ফাটলগুলির চরিত্র অথবা আকার নিয়ে বেশি আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বিশেষভাবে বলা যায় যে, কালীবঙ্গানে ভূমিকম্পের পরে জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়, মানুষজন সেখান থেকে চলে যায়।

সরস্বতী সভ্যতা হরপ্পার চেয়ে পুরনো কিনা সে-বিতর্কে না গিয়েও প্রশ্ন রয়ে যায়, কালীবঙ্গান থেকে লোকেরা চলে গেল কেন? সংশয় দানা বাঁধে যে, যে-নদীর ধারে শহর গড়ে উঠেছিল, সেটি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিয়ে চলে যায়। সরস্বতী অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল কিনা তা প্রমাণ করা যায় না, তবে তার জলধারা খুব কমে গিয়েছিল, সেকথা সত্য। অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না যে, প্রথম ভূমিকম্পের সময়ে অর্থাৎ কালীবঙ্গান পরিত্যক্ত হওয়ার সময় (২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ডঃ আর. এস. বিষ্টের মতে) নদীটির জলধারায় ঘাটতি শুরু হয়। এর আগে যে-ভূমিকম্প হয়, যার প্রমাণ রাজকোটের বাগাশ্রাতে পাওয়া গেছে (২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ডঃ অজিত প্রসাদ) সেসময় সরস্বতীর কি ক্ষতি হয়েছিল, তার কোন খবর পাওয়া যায় না যদিও রাজকোট এবং কালীবঙ্গানের মধ্যে আটশো কিলোমিটারের দূরত্ব। সরস্বতী সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫০০-এর চেয়েও বেশি শহর গ্রাম বা বসতির (সাইটের) খোঁজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অনেকগুলিতে, যেমন হিসারের রাখীগরহি, বানওয়ালি, দিল্লির কাছে ধনকোট, পাঞ্জাবের ধালেওয়াঁ, গুজরাটের ধোলাভিরা এবং সুর্কোতাদা—এসব জায়গায় ভূমিকম্পের চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ এগুলি খুব বড় কেন্দ্র। আরেকটি বিষয় বেশ দেখা গেছে যে, এইসব শহরকেন্দ্রিক জায়গাগুলিতে বাড়িঘর তৈরির সময় লোকেরা ভূমিকম্পের কথা মাথায় রাখত, বেশ শক্তপোক্ত ভিত কাটত।

২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অথবা ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—দুটোই মেনে নিয়ে বলা যায়, ঐ সময়কালে সরস্বতীর গতিপথের পরিবর্তন হয়েছিল এবং যেহেতু সরস্বতী রাজস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাই মরুভূমির পত্তনও এইসময় আরম্ভ হয়ে যায়। এইসময়েই সিন্ধু-সরস্বতী সাম্রাজ্যের তেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ভয়ানক রকম পতনের সূচনা হয়ে যায়। নদী শুকিয়ে যায়, সমুদ্র পিছিয়ে যায় (লোথাল থেকে সমুদ্র এখন বহুদূরে চলে গেছে, বেট দ্বারকা ডুবে গেছে), সভ্য জনপদ পরিত্যক্ত হয়। সরস্বতী তীরের গ্রাম বা জনপদ—কোনটাই ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের চেয়ে নতুন নয়। তাই পুরাতত্ত্ববিদ্দের রায় হলো, ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সরস্বতী সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়।

আরো একটা বিষয় সম্বন্ধে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে, ২০০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক খরা চলেছিল, যার ফলে ভারতের অনেক নদী শুকিয়ে যায়। সেই সময়কার শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং ছোট ছোট গ্রামের আকার নেয়। হরিয়ানায় সরস্বতী ভূমির ওপর এমন অনেক ছোট ছোট গ্রাম পাওয়া গেছে, যারা হরপ্পার সমসাময়িক। অথচ রাজস্থানে এইরকম গ্রাম নেই। তার মানে রাজস্থানে তখন নদীটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে। [ক্রমশ] (এক)

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বিষয়ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আধ্যাত্মিক রূপ। বেলুড় মঠের মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বার। ঐ দ্বারের মধ্য দিয়ে ঢুকতে গেলে চোখে পড়বে দুপাশে থামের ওপর দুটি ঐরাবৎ। তারা শুঁড়ের ওপর বহন করছে কাগজের রোলের মতো গোলাকৃতি দুটি বস্তু, যা কিনা ঠাকুরের ঘনীভূত ভাবকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতীক। স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভবের ভাষ্যকার। মূলত সারা বিশ্বে ঠাকুরের ভাব ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে এতকাল স্বামীজীই ব্রতী ছিলেন। মা যেন ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী। মায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর পরে মায়ের উন্মোচিত মাতৃত্বের দুর্নিবার আবেদনে ভারতবর্ষ সাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। সারা বিশ্বে তার অভিঘাত পড়ছে, পড়বে। হস্তি ভাবের বিস্তার ও শুভকার্যের প্রতীক। জয়রামবাটীতে তিনটি হস্তিসহ যে বিশাল শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তারই একাংশ দেখা যাচ্ছে প্রচ্ছদে।



আদি শঙ্করাচার্য (৩৭)

শিশু ও কিশোর বিভাগ

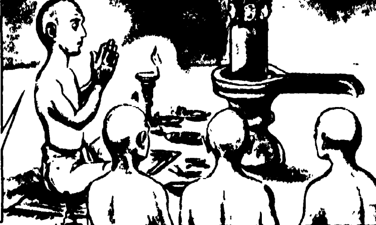
সুস্থ হয়ে আচার্য সশিষ্য যাত্রা করলেন উত্তরবঙ্গের দিকে। সেখানে বাস করেন মীমাংসক মুরারি মিশ্র। তিনি আচার্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে চাইলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রই যেখানে আচার্যের শিষ্যত্ব নিয়েছেন, সেখানে জয় দুরাশা মাত্র। একদিন—



আচার্য এবার এলেন গঙ্গার তীরে। একদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ অর্থাৎ আচার্যের গুরুর গুরু।

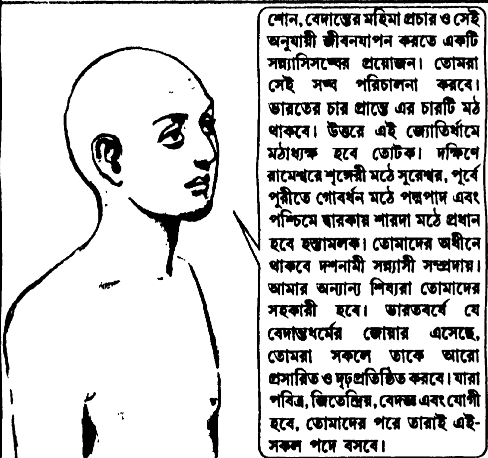


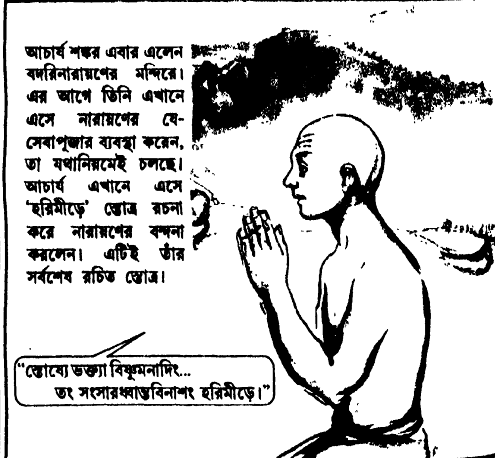
কিছুদিন পর খবর এল, নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পশুপতিনাথ শিবের পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। আচার্য সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ং পূজা করে ধ্যান ও স্তোত্রবন্দনা করলেন। পশুপতিনাথের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হলো।



আচার্য এবার এলেন বদরিকাশ্রমে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি ব্রহ্মধ্যানে সর্বদা নিমগ্ন। তাঁর শিষ্যগণ চিন্তান্বিত হলেন। একদিন-







শেষে আচার্য বদরিনাথ থেকে এলেন শিবক্ষেত্র কেদারনাথে। একদিন—

আমি সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করছি, তোমরা সিদ্ধকাম হও। আমরণ বেদান্তপ্রচারে নিরত থাক। তোমরা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি এখন স্বরূপে লীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।





আচার্য গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং যোগ অবলম্বনে ক্রমশ স্ব-স্বরূপে লীন হলেন। শিষ্যগণ দেখলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, পবন, অগ্নি এবং ঋষিগণ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা তাঁর মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করছেন। আচার্য মস্তকে জটা এবং ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করে বৃষের পিঠে আরোহণ করলেন। দেবতাদের স্তুতিগান শুনতে শুনতে তিনি চলে গেলেন স্বধামে। [সমাপ্ত]

চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু

সবুজ পাতা

'কথামৃত' পরিচয় : ছবি ও ছন্দে



ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায় ● ছবি : সৌরিশ মিত্র

শিব না ব্রহ্মা, কে বড়?

বেদান্তবাদী, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের দল
কোন্ দল বড়, তা নিয়ে বড়ই বাধায় গো কোন্দল।
এই যে খামোকা ঝগড়া-বিবাদ, এ তো করা ঠিক নয়,
ব্যাকুলতা নিয়ে যেকোন পথেই তাঁর দর্শন হয়।

ঠাকুর বলেন, পদ্মলোচন, ছিল সে বর্ধমানে,
রাজপণ্ডিত, সভায় বিচার চলছিল সেইখানে।
শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়—এই নিয়ে দুই দলে
তুমুল তর্ক চলে।

পদ্মলোচন পণ্ডিত, তাই তাকেও প্রশ্ন করে,
তার জবাবটি, ঠাকুর বলেন, বেশ ভাল, মনে ধরে।
সে বলে, শিব বা ব্রহ্মার সাথে আমার আলাপ নাই,
কাজেই কে বড়, কে ছোট—সেকথা বলতে পারি না তাই।

 প্রাসঙ্গিকী

ঐ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।

আর্য সম্পর্কে স্বামীজীঃ একটি প্রশ্ন

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর পত্র সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছায় এই পত্র। ঐ পত্রে অরুণেশবাবুর বক্তব্যঃ "স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট অভিমত 'আর্যরা খাঁটি ভারতীয়।'" স্বামীজীর এই অভিমত তাঁহার কোন্ বক্তৃতায়, লেখায় বা গ্রন্থে আছে জানাইলে উপকৃত হইব।

অনেকেই জানেন, স্বামীজীর লেখা 'ভাববার কথা' গ্রন্থে 'বর্তমান সমস্যা' অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ "এই [আর্য] জাতি মধ্য-আশিয়া, উত্তর ইওরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।" ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য মত উল্লেখ করিয়া জানাইলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিছু বাড়িবে।

কনকবরণ চট্টোপাধ্যায়
বৈদ্যবাটী, হুগলি-৭১২২২২

প্রসঙ্গ 'কলকাতার গান্ধীবাদী পত্রিকা শ্রীসনাতনধর্ম'

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলকাতার গান্ধীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীসনাতনধর্ম' নিবন্ধে লেখিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখিকার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে সাধুবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠীর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলামঃ "১৯৩৭-এর জুলাই মাসে বোম্বাই, মাদ্রাজ, সি পি, ইউ পি, বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস সরকার গঠিত হলো। কিছু পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে আসামে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক কোয়ালিশন গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে বি. জি. খের, রাজাগোপালাচারি, এন. বি. খারে, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিশ্বনাথ দাস, ডঃ খান সাহেব ও গোপীনাথ বরদলৈ। আজাদের মতে, সর্দার প্যাটেল কে. এফ. নরীম্যানকে পছন্দ করতেন না বলে অন্যায় করে খেরকে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। দ্বিতীয় সারির নেতারা, যেমন কে. এম. মুনশি, টি. প্রকাশম, ভি. ভি. গিরি, রফি কিদোয়াই, কৈলাসনাথ কাটজু, অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, সৈয়দ মাহমুদ, হরিশঙ্কর শুক্লা, ডি. পি. মিশ্র, নিত্যানন্দ কানুনগো, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন ইউ পি-তে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-শোভিত ক্যাবিনেট আর কোনদিন প্রাদেশিক স্তরে দেখা দেয়নি।

"নির্বাচনী ইস্তাহার, ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ডের নির্দেশ ছাড়া কর্তব্য সম্বন্ধে 'হরিজন'-এ প্রকাশিত গান্ধীর নানা রচনা প্রেরণা দিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ১৩ নভেম্বর ১৯৩৭-এর রচনা। তাঁর প্রথম আদর্শ ছিল ভারতের দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরল জীবনচর্যা, দ্বিতীয়—মাদক বর্জন, তৃতীয়—কৃষকদের অবস্থার উন্নতি-সাধন। অধিক কর ও খাজনার চাপ, বেআইনী শোষণ ও ঋণের ভার থেকে চাষিকে মুক্ত করতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। এরপর আসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও কলেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। এসব দায়দায়িত্ব স্মরণ করে ওয়ার্কিং কমিটি এক চোদ্দ দফার কর্মনীতি ঘোষণা করে (তাকে আজকের বিশ দফার উৎস বলা যেতে পারে)। রাজস্ব ও খাজনা হ্রাসের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল কৃষি আয়কর প্রবর্তন, জমির স্বত্ব স্থায়িকরণ এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণের দায় মোচন; দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দি ও অন্তরিন মুক্তি; আইন অমান্যের অপরাধে বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণ; শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার অনধিক শ্রমবিধান, জীবিকানির্বাহের ব্যায়ানুযায়ী মজুরি প্রবর্তন ও বেকারভাতা; রাজকর্মচারীদের অতিরিক্ত মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি হ্রাস করে মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয়সঙ্কোচ। মন্ত্রীদের অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের ওপর জোর দিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'মন্ত্রিত্ব হবে কাঁটার মুকুট।' পরিশ্রম, সততা, অপক্ষপাত ইত্যাদি সদ্‌গুণ ছাড়াও কর্মচারীদের থাকা চাই শাসনসংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে দক্ষতা। বর্তমান শাসককুলের কয়জন গান্ধীর এই উচ্চাদর্শ অনুসরণ করেন?" *(আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৯, পৃঃ ২২১-২২২)*

এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর উল্লেখ করেছেন সেব্যাপারে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই। সেসম্বন্ধে কেউ আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

অরিজিৎ পাল
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-১২৯

লেখিকার উত্তর

১৯২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং মুসলিম নেতাদের মধ্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির দ্বারা বাংলায় হিন্দু-

মুসলিম বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বাংলা কংগ্রেসের প্রতি মুসলিমদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল তাদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে। এই চুক্তির মূল শর্তগুলি ছিল—

(১) বাংলার আইনসভায় প্রত্যেক সম্প্রদায় লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পাবে। কিছুদিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা বজায় থাকবে।

(২) সরকারি চাকরির ৫৫% পাবে মুসলিমরা।

(৩) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

(৪) আইনের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণীত হবে না। নমাজের সময়ে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো বা মিছিল করা বেআইনী হবে এবং বকরিদের সময় গোহত্যায় বাধা দেওয়া হবে না।

১৯২৪ সালের মে-জুন মাসে সিরাজগঞ্জে আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' গৃহীত হয়। গান্ধীজী, মদনমোহন মালব্য, লাজপত রায় প্রমুখ নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদনের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল হয়ে যায়।

(সূত্রঃ (১) বাংলার বিধানসভার একশো বছরঃ রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র—সত্যব্রত দত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃঃ ১০২। (২) আধুনিক ভারত ঃ ১৯২০-১৯৪৭—প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্‌, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৮-৩৯)

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
কোন্নগর, হুগলি-৭১২২৩৫

স্বামীজীকে নিয়ে আরো ডাকটিকিট

বিভিন্ন নতুন দিশার প্রবন্ধ, নিবন্ধে অলঙ্কৃত 'উদ্বোধন'-এর এবারের শারদীয়া সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১) হাতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এত বিষয়বৈচিত্র্য, সত্যিই বিস্মিত হওয়ার মতো।

নতুন আঙ্গিকে লেখা শোভেন সান্যালের নিবন্ধ 'ডাকটিকিটে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসহচরগণ" পড়ে ভাল লাগল। আমি একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক। স্কুলজীবন থেকে শুরু করে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সখ ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন লীলাসহচরের সঙ্গে দেশ ও বিদেশের আরো অনেক বিশিষ্ট মনীষীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের অনেকেরই ডাকটিকিট ভারত ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক স্বল্পপরিসরে তা নিবেদন করতে পারেননি। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জীবনীকার এবং পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পরিচিতিকার। তাঁকে ভারতীয় ডাকবিভাগ সম্ভবত স্মরণ করেনি।

যাই হোক, ভারতবর্ষ ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন শ্রীলঙ্কা সরকার ও তাঁদের ডাকবিভাগ। তাঁরা দুই টাকা পঞ্চাশ সেন্ট মূল্যের একটি বহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে—স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীলঙ্কায় পদার্পণের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে। স্বামীজী কলম্বো পৌঁছান ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭। এই ভারতীয় সন্ন্যাসীকে কলম্বোবাসিগণ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানান। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 'Vivekananda : A Biography in Pictures' থেকে জানা যায়ঃ "Eye-witness accounts give a glowing picture of the reception accorded to the Swami at Colombo. The crowd that had assembled saw the launch carrying the Swami steaming the jetty, and there din and clamour of shouts and hand-clapping drowned even the noise of the breaking waves. A grand reception was given to Him in a city hall."

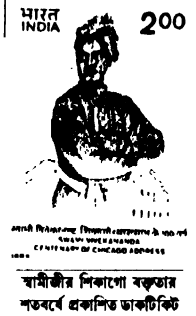


শ্রীলঙ্কার ডাকবিভাগ প্রকাশিত
স্বামীজী-সম্পর্কিত ডাকটিকিট

স্বামীজী কলম্বো থেকে ২৬ জানুয়ারি ভারতের পাম্বানে পৌঁছান এবং মাদ্রাজ পৌঁছান ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। ১৬ তারিখ মাদ্রাজ থেকে তিনি সরাসরি কলকাতা পৌঁছান ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী কালে ২০ জুন ১৮৯৯ স্বামীজী পুনরায় বিলেত যান মাদ্রাজ, কলম্বো, এডেন হয়ে; কিন্তু সেবার কলম্বো ছুঁয়ে গেলেও সেখানে নামেননি।

শ্রীলঙ্কার ডাকবিভাগ প্রকাশিত ডাকটিকিটে সন্ন্যাসীর বেশে স্বামীজীর আবক্ষ প্রতিমূর্তি, পিছনে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এই ডাকটিকিটটি এবং স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশিত (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) ২ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটটির প্রতিলিপি এইসঙ্গে পাঠালাম।



স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার
শতবর্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী
আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১

স্বাস্থ্য

শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা কীভাবে বুঝবেন

বিশ্বনাথ দাস



শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা, গর্ভাবস্থায় তা নির্ণয় করার পদ্ধতির ওপর একটি বড় মাপের গবেষণা প্রকল্প সম্প্রতি শেষ হয়েছে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ টাকা বাজেটের এই প্রকল্পটিতে রাশিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, তথ্যসংগ্রাহিকা ও সুপারভাইজার মিলিয়ে লেখকের নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। উপদেষ্টা কমিটিতে ছিলেন ইউনিসেফ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক-গবেষক, রাশিবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত দুটি খ্যাতনামা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট' (CINI) এবং হুগলির 'নিবেদিতা কমিউনিটি কেয়ার সেণ্টার' (NCCC) তথ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে মূল্যবান সহযোগিতা করেছে এই প্রকল্পে। এই দুটি জেলার প্রায় ৪,০০০ গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্য (প্রত্যেকের কাছ থেকে চারবার যথা, গর্ভাবস্থার ১২, ২০ এবং ২৮ সপ্তাহে এবং প্রসবের অব্যবহিত পরে) এই গবেষণার ভিত্তি।

গবেষণা প্রকল্পটির ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

'জন্মকালীন ওজন কম'-এর সংজ্ঞা কী?

১৯৫০ সালে গৃহীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী জন্ম-ওজন ২,৫০০ গ্রামের কম হলে তা চিহ্নিত হয় কম জন্ম-ওজন (Low Birth Weight) বলে। আর এই ওজন ১,৫০০ গ্রামের কম হলে তা হবে অত্যন্ত কম জন্ম-ওজন (Very Low Birth Weight)।

কম জন্ম-ওজনের সমস্যা

জন্ম-ওজন কম হলে কয়েকটি মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিতে পারে—(১) নবজাতকের মৃত্যুহার (Neonatal Death Rate—জন্মের চার সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু) অন্যদের তুলনায় কম জন্ম-ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় চারগুণ বেশি! (২) এদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, তাদের অনেকেই উপযুক্ত পরিচর্যার দরুন পরবর্তী কালে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গোষ্ঠীগতভাবে কম জন্ম-ওজনের শিশুরা নানা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার শিকার হয়। সেরিব্রাল পালসি, হৃদ্‌রোগ, টাইপ-টু ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, হাঁপানি, মৃগীরোগ, শৈশবাবস্থায় শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ—এসবের হার কম জন্ম-ওজনের শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশ কম। (৩) দেখা গেছে এসব শিশুদের গড় I. Q. (বুদ্ধ্যঙ্ক) তুলনামূলকভাবে কম, স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ফল অন্যদের তুলনায় খারাপ। স্বভাবে এরা বেশ লাজুক হয়, নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে, জোর করে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে না। এবং (৪) এটাও দেখা গেছে, যেসব মা কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট ছিল, তাদের কম জন্ম-ওজনের বাচ্চা প্রসব করার হার তুলনামূলকভাবে বেশি—অর্থাৎ সমস্যাটি চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যায়।

এসব কারণেই সারা পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে কম জন্ম-ওজনের হার কমানোর জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে।

কম জন্ম-ওজনের হার

আমাদের দেশে কম জন্ম-ওজনের হার ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমান প্রকল্পের সমীক্ষা থেকে এই হার পাওয়া গেছে ২৩.১৮ শতাংশ। এই হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি—যেমন আমেরিকায় মাত্র ৮ শতাংশ।

২০০০ সালের 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচিতে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল এই হার ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা। দেখা যাচ্ছে, সেই লক্ষ্য অনেকটাই অধরা থেকে গেছে।

খেয়াল করা দরকার, প্রথমবার যারা মা হয়—তাদের ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথমবার মায়েদের ক্ষেত্রে এই হার ২৬.৯৭%, অন্যদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৯.৪২%। তবে যাদের সন্তানসংখ্যা ৪ বা তারও বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই হার আবার খানিকটা বাড়ার দিকে।

পূর্বাভাসের উপযোগিতা

আগে থেকে ঝুঁকিপ্রবণ গর্ভবতীদের চিহ্নিত করা গেলে তাদের উপযুক্ত নিবিড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-পরিষেবা এবং নিরন্তর পর্যবেক্ষণের আওতায় আনলে তাদের কম জন্ম-ওজনের বাচ্চা প্রসব করার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

কম জন্ম-ওজনের সম্ভাব্য কারণ

বাচ্চার জন্ম-ওজন কম হওয়ার মূল কারণ দুটি—সময়ের আগে প্রসব (গর্ভধারণের ৩৭ সপ্তাহের আগে) এবং সময়ে প্রসব সত্ত্বেও জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের যথাযথ বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া। সময়ের আগে প্রসব হওয়ার সঠিক কারণগুলি আজ পর্যন্ত বহুলাংশে অজানা থেকে গেছে। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার যেসব কারণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মায়ের অপুষ্টি। এছাড়া মায়ের শরীর, স্বাস্থ্য, অনিয়মিত রুটিন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিও রয়েছে।

কম জন্ম-ওজনের যেসব সহগামী বৈশিষ্ট্য বর্তমান সমীক্ষা থেকে ধরা পড়েছে, সেগুলি হলো মায়ের উচ্চতা, ওজন, উচ্চতা-ওজন সূচক (Body Mass Index [BMI] = কেজিতে ওজন ÷ মিটারে উচ্চতার বর্গ), বয়স, মধ্যবাহুর বেড় ও মাথার বেড় (এদুটি অপুষ্টির মাপক), শিক্ষাগত মান—এসব কম থাকা; রয়েছে দারিদ্র্য, কায়িক পরিশ্রম, তামাকজাত দ্রব্যে আসক্তি, গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা (রক্তাল্পতা, হাঁপানি, যক্ষ্মা, রক্তক্ষরণ, বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ইত্যাদি)—এসবের মাত্রা বেশি থাকা। একাধিক সন্তানের জননীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রসবে অস্বাভাবিকতা (যেমন—সময়ের আগে প্রসব, নবজাতকের মৃত্যু, কম জন্ম-ওজন বাচ্চা প্রসব ইত্যাদি), ঘন ঘন গর্ভধারণ। এইসব বৈশিষ্ট্য আবার নিজেদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ঝুঁকিপ্রবণ মা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাই এই সবকয়টি বৈশিষ্ট্য বিচার করার প্রয়োজন হয় না এবং কম জন্ম-ওজনের সম্ভাবনার ওপর এক একটি বৈশিষ্ট্যের কতখানি প্রভাব, তাও নির্ভর করে মায়ের আর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বিচার করা হচ্ছে তার ওপর। মায়ের এইসব বৈশিষ্ট্যের যেকোন একটি থাকলেই যে বাচ্চার জন্ম-ওজন কম হবে, তা কিন্তু নয়। এইরকম একাধিক বৈশিষ্ট্যের যৌথ প্রভাবে এই সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পূর্বাভাসের পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণালব্ধ প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি আসলে এইসব বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন-নির্ভর একটি ছাঁকনিবিশেষ। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি ঝুঁকি-এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ছাঁকনিতে যেসব বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, দেখা যাবে মা সেইসব বৈশিষ্ট্যের ঝুঁকি-এলাকায় আছে কিনা। মায়ের যেসব বৈশিষ্ট্য ঝুঁকি-এলাকায় থাকবে, তাদের প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা নম্বর (score) দেওয়া হবে। মোট নম্বর ৫০-এর বেশি হলে তাকে চিহ্নিত করা হবে ঝুঁকিপ্রবণ মা হিসাবে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য ঝুঁকি-এলাকা এবং মা ঝুঁকি-এলাকায় পড়লে তাকে কত স্কোর দেওয়া হবে—এসব নির্ধারণ করা হয়েছে রাশিবিজ্ঞানসম্মত একটি পদ্ধতিতে।

প্রথমবার মা এবং একাধিক সন্তানের মা—এই দুধরনের গর্ভবতীর জন্য দু-প্রস্থ ছাঁকনির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতি প্রস্থে থাকবে তিনটি করে ছাঁকনি—গর্ভধারণের ১২, ২০ এবং ২৮ সপ্তাহে প্রয়োগ করার জন্য। ১২ সপ্তাহের পরীক্ষায় কেউ ঝুঁকিপ্রবণ বলে চিহ্নিত হলে তাকে নিবিড় চিকিৎসা-পরিষেবায় আনা হবে। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিনা আবার দেখা হবে ২০ এবং ২৮ সপ্তাহের মাথায়। এভাবে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিষেবায় থাকার দরুন তার কম জন্ম-ওজন বাচ্চা প্রসব করার সম্ভাবনা বেশ কমে যাবে।

নিচে সারণি ১ এবং ২-এ দেওয়া হয়েছে প্রথমবার মা এবং একাধিক সন্তানের মা—এই দুধরনের গর্ভবতীদের ২০ সপ্তাহের গর্ভকালীন অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য দুটি ছাঁকনি।

এ দুটি ছাড়াও ১২ এবং ২৮ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় ব্যবহার্য আরো দু-প্রস্থ ছাঁকনির ব্যবস্থা রয়েছে।

কাদের জন্য এই পদ্ধতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হুগলির প্রায় ৪,০০০ গ্রামীণ গর্ভবতী মায়ের ওপর সমীক্ষা করে এই বাছাইপদ্ধতি দাঁড় করানো হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দক্ষিণবঙ্গের এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড বা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই ছাঁকনি প্রয়োগ করা যাবে। পরিবারের দারিদ্র্য এবং গৃহস্থালির কাজের চাপ—এই দুটির জন্য বিকল্প মাপক ব্যবহার করে শহরাঞ্চলের গর্ভবতীদের জন্যও এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি-১

প্রথমবার গর্ভবতীদের জন্য বাছাই পদ্ধতি
(২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় ব্যবহার্য)

মায়ের বৈশিষ্ট্য	কোথায় ঝুঁকি	স্কোর
গর্ভধারণের বয়স	১৭.৬ বছরের কম	৪.৫
উচ্চতা	১৫৪.৫ সেমির কম	২২.৯
উচ্চতা-ওজন সূচক	১৯.৪-এর কম	৯.৬
উদরের বেড়	৬৫.২ সেমির কম	৮.৬
মধ্যবাহুর বেড়	১৯.২ সেমির কম	৮.৩
মাথার বেড়	৪৯.২ সেমির কম	৯.২
পরিবারের দারিদ্র্যমাত্রা-১	সাইকেল/মোপেড/স্কুটার নেই	১৩.৪
পরিবারের দারিদ্র্যমাত্রা-২	রেডিও/টিভি নেই	৭.[illegible]
গৃহস্থালির কাজের চাপ-১	জামাকাপড় কাচা	১৪.[illegible]

মায়ের বৈশিষ্ট্য	কোথায় ঝুঁকি	স্কোর
গৃহস্থালির কাজের চাপ-২	বাইরে থেকে জল/ জ্বালানি কাঠ আনা	৫.৩
শিক্ষাগত মান	নিরক্ষর	৮.২
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা	হাঁপানি/অত্যধিক রক্তাল্পতা/ রক্তক্ষরণ/মাঝে মাঝে দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া	২৭.৫

মোট স্কোর ৫০-এর বেশি হলে বুঝতে হবে, গর্ভবতীর কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু প্রসবের ঝুঁকি আছে।

সারণি-২

একাধিক সন্তানের জননীদের জন্য বাছাই পদ্ধতি
(২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় ব্যবহার্য)

মায়ের বৈশিষ্ট্য	কোথায় ঝুঁকি	স্কোর
গর্ভধারণের বয়স	১৯.৮ বছরের কম	৪.২
উচ্চতা	১৪৯ সেমির কম	১৬.০
উচ্চতা-ওজন সূচক	১৮.৭-এর কম	১৭.২
উদরের বেড়	৭১.৪ সেমির কম	৩.৪
মাথার বেড়	৫০.৬ সেমির কম	১১.৯
পরিবারে বয়স্ক মহিলা	২-এর কম	১৯.১
পরিবারের দারিদ্র্যমাত্রা-১	সাইকেল/মোপেড/ স্কুটার নেই	২.০
পরিবারের দারিদ্র্যমাত্রা-২	রেডিও/টিভি নেই	৬.০
গৃহস্থালির কাজের চাপ	বাইরে থেকে জল/ জ্বালানি কাঠ আনা	৬.১
দুপুরে খাওয়ার পর দু-ঘণ্টা বিশ্রাম	পায় না	৭.৪
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা	হাঁপানি/অত্যধিক রক্তাল্পতা/রক্তক্ষরণ	১৯.৪
কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স	১ বছরের কম বা ৫ বছর বা তার বেশি	১৬.২
পূর্ববর্তী প্রসবে অস্বাভাবিকতা	কম জন্ম-ওজন/সময়ের আগে প্রসব/গর্ভপাত/ শিশুমৃত্যু	৯.১

মোট স্কোর ৫০-এর বেশি হলে বুঝতে হবে, গর্ভবতীর কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু প্রসবের ঝুঁকি আছে।

বাছাইপদ্ধতিটির কার্যকারিতা

নতুন একদল গর্ভবতীর ওপর এই বাছাইপদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এটি ৬৮ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কম জন্ম-ওজন শিশুর মায়েদের গর্ভাবস্থায় চিহ্নিত করতে পারছে। সঠিক পূর্বাভাসের সর্বমোট হারও ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্যয়বহুল আলট্রা-সোনোগ্রাফি পরীক্ষার বিকল্প হিসাবে এই নিখরচার পদ্ধতিটি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে।

সুপারিশ

বর্তমান গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কম জন্ম-ওজনের হার কমানোর লক্ষ্যে তিনধরনের সুপারিশ করা যেতে পারে: (১) কয়েকটি বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি জোরদার করার উদ্যোগ নিতে হবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে—যেমন, মেয়েদের শিক্ষার হার এবং বিয়ের বয়স বাড়ানো, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ও দুপুরে খাওয়ার পর অন্তত দু-ঘণ্টা সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, কায়িক শ্রম কমানো, ঘন ঘন এবং বেশি সন্তান না হওয়া ইত্যাদি। (২) বর্তমান গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা, হাঁপানি, যক্ষ্মা, মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া—এসব থাকলে অথবা আগের কোন গর্ভধারণের ক্ষেত্রে কম জন্ম-ওজনের বাচ্চা প্রসব, সময়ের আগে প্রসব, নবজাতকের মৃত্যু—এসবের ইতিহাস থাকলে বাচ্চার কম জন্ম-ওজন এড়ানোর জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, সেব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সহমত হয়ে কিছু পরামর্শ নির্ধারণ করুন এবং উপযুক্ত স্থানে হোর্ডিং, খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও ইত্যাদির মারফত সেসবের ব্যাপক প্রচার হোক। এবং (৩) সংশ্লিষ্ট গর্ভবতী মহিলাদের ওপর আলোচ্য বাছাইপদ্ধতি প্রয়োগ করে চিহ্নিত ঝুঁকিপ্রবণ মায়েদের নিবিড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-পরিষেবা এবং ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হোক।

এভাবেই আমাদের দেশে কমানো সম্ভব হবে এই অবাঞ্ছিত কম জন্ম-ওজনের হার। ❑

● তথ্যবিশ্লেষণে সহায়তা: **অসীমশঙ্কর নাগ ও সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।**

● **তথ্যসূত্র:** Screening Tools for Prediction of Low Birth Weight Babies—B. Das, Deptt. of Statistics, Presidency College, Kolkata, 2004

সমাধান: শব্দচেতনা ৩৯

পাশাপাশি: (১) তাহিরপুর, (৩) অশ্বমেধ, (৫) কবন্ধ, (৭) দনুজ, (৮) শান্তি, (৯) নয়ন, (১১) লোলা, (১৪) গদা, (১৫) শমন, (১৭) কণ্ঠ, (১৮) বাগীশা, (১৯) মেনকা, (২১) সৌরসেন, (২২) নবপত্রিকা।

ওপর-নিচ: (১) তারক, (২) রক্তদন্তিকা, (৩) অম্বুজ, (৪) মেঘাত্যয়, (৬) বগলা, (৯) নন্দা, (১০) নর্মদা, (১১) লোকেশ, (১২) ধ্যান, (১৩) পাকশাসন, (১৪) গমন, (১৬) মহেশ্বর, (১৮) বামন, (২০) কালিকা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম:

কেউ সঠিক উত্তর দেননি।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভিন্ন দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ • লেখক : ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • প্রকাশক : শঙ্কর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ • মূল্য : ৯০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+২০৮ • প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০১

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তাঁর শেষতম সংযোজন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মজগতের ঋত্বিক হিসাবে না দেখে সমাজশিক্ষক হিসাবে দেখার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মনেপ্রাণে সমাজমনস্ক মানুষ ছিলেন, তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা করেছেন, কৃষক আন্দোলনের সহমর্মী ছিলেন, সমাজে ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং মানুষকে যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা দিতেন—এই ধরনের ব্যাখ্যানই পাওয়া যায় ২০৮ পৃষ্ঠায় পরিবেশিত ২০টি বিষয়ে লেখা প্রবন্ধে। বর্তমান সমাজে মানুষ বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট 'সাফল্য' অর্জন করলেও তার জীবনে 'সার্থকতা' নেই, চেষ্টাকৃত জীবনচর্যা আছে কিন্তু মহৎ জীবনাদর্শ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এই আশায় যে, অন্তত একজন মানুষের মনেও যদি 'মান হুঁশ' সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করা যায়। উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ—একথা জোর দিয়েই বলা যায়।



শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য জোগাড় করে লেখক তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন নিজের মতো করে। তাঁর আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু অনেকেরই জানা, আবার বেশ কিছু বিষয় তত জনপ্রিয় নয় এবং অনেকের কাছেই সেগুলি নতুন বলে মনে হবে। গ্রন্থকার আলোচনার সূত্রপাত করেছেন হোমাপাখি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য দিয়ে, যা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ পাওয়া যায়। বিষয়টিকে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ব্যাখ্যা করার পর লেখক আধুনিক জীববিজ্ঞান থেকে তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য কীভাবে সদর্থক এবং তিনি কীভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ ও বিজ্ঞানকে মিলিয়েছেন তাঁর এই বহু-আলোচিত উপমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা দুইকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁর প্রত্যয় ও প্রয়োগ গড়ে তুলেছিলেন, তা লেখক দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে ও চিন্তায় যে হরেক রকমের দ্বন্দ্ব ছিল, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সরল যুক্তিগ্রাহ্য জীবনপথের সন্ধান দিয়েছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, একজন বিশিষ্ট লোকশিক্ষক। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের নানারকম চোখধাঁধানো প্রচার ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথ সেই সঙ্কট থেকে তাকে রক্ষা করেছিল। তাঁর যুক্তিবাদী মানসিকতা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত বাঙালির দুরবস্থা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। অফিসের চাকরি-অন্ত-প্রাণ বাঙালিদের সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ "পরের কর্ম স্বীকার করে কী হয়ে রয়েছ! আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরেজি-পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুটজুতার গোঁত্তা দুবেলা খায়।" তাঁর যুক্তিবাদী মননের প্রকাশ দেখা যায় তাঁর কিছু মন্তব্যে ঃ "শুচি-অশুচি বিচার জ্ঞানের লক্ষণ নয়।" কিংবা রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁর উপদেশ ঃ "বেশি বিচার করবি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তাঁর ধর্মীয় উদারতা, যার ফলে তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ "আমার ধর্ম ও আদর্শ ঠিক এবং অপরের মত ভুল—এজাতীয় ধারণা হলো 'মতুয়ার বুদ্ধি'।" ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা যে কত বিষময় হতে পারে তার উদাহরণ বর্তমান ভারতের রাজনীতির অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী সমাজদর্শনই পারে আজকের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সুস্থ পারিবারিক-সামাজিক শান্তি দিতে। সৎ লোকশিক্ষা এবং সমাজসেবার ওপর তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। সেজন্য তাঁর পরামর্শ ছিল যতদূর সম্ভব অহংবোধ ও স্বার্থবুদ্ধি যাতে দূর হয় তার জন্য চেষ্টা করা।

'উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি জমিদারতন্ত্রের অত্যাচার ও কুফল সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, জমিদারদের অত্যাচারের কথা শুনলে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে আজও অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, সেটি হলো জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান। অনেক সমাজসংস্কারক ও গবেষক পণ্ডিতের চেষ্টা সত্ত্বেও জাতপাতের বিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আজও ভারতের সমাজ ও রাজনীতিকে কলুষিত ও দুর্বল করে রেখেছে। যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে সীমাবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ এখনো এই দুই সমস্যার হাত থেকে মুক্ত হয়নি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্যাপারে যা বলেছেন ও করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও নষ্ট হয়নি। তাঁর কাছে কে কী খেল এবং কে কার সঙ্গে একাসনে বসল—এগুলির চেয়ে অনেক বড় ছিল 'বিবেক-বৈরাগ্য'। তিনি এক নতুন ধর্মান্দোলনের সূচনা করেছিলেন, যার মূলে আছে সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা। বস্তুত, তিনি ছিলেন অফুরন্ত মানবপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর মানসিকতার মধ্যে ছিল এক অসাধারণ সামাজিক ও ধর্মীয় উদারতা। বাছবিচার ও ছুঁৎমার্গ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, শুদ্ধা ভক্তি দিয়ে জাতপাতের বিরোধ দূর করা যায়। এব্যাপারে শ্রীচৈতন্য ছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বসূরি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরো এগিয়ে গেছেন। তিনি এব্যাপারে তিনটি সমাধানসূত্র দিয়েছেন ঃ (১) যুগোপযোগী ধর্ম, লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি গঠন করা; (২) যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মানসিকতা গঠন করা; (৩) মিশ্র কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সকলকে আপন করে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। তাঁর এই পথনির্দেশের মধ্যে কোন উগ্র ধর্মবিরোধিতা নেই, অথচ সাম্প্রতিককালের বহুকৃষ্টিবাদের (multi-culturalism) মূল সুরটি রয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও অন্য কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক আলোচনা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি বিষয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন মহিলার প্রতি তাঁর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও তথ্যভিত্তিক আলোচনা আছে। সবদিক বিবেচনা করে আলোচ্য গ্রন্থটিকে মূল্যবান বলে স্বীকৃতি দিতেই হয়। কেননা, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন আলোচনাই গদগদ ভক্তির প্রাবল্যে নষ্ট হয়নি, যুক্তিভিত্তিক কারণ দেখিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যভক্তবৃন্দ (বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ), রামকৃষ্ণ মিশন ও তার বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ এবং সেবাব্রত—এসবের মাধ্যমেই আধুনিক বাঙালি সমাজ নতুন আলোর দিশা পাবে, এই প্রত্যয় নিয়ে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে।

গ্রন্থটি মুদ্রণ পারিপাট্যে প্রশংসাযোগ্য। মুদ্রণপ্রমাদ নেই বললেই চলে। প্রকাশশৈলী ও ভাষার ব্যবহার একইসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ ও সরল হওয়ায় গ্রন্থটি পড়তে ভাল লাগে। প্রতিটি প্রবন্ধেই লেখকের পরিশ্রম ও গবেষণামূলক সততা লক্ষণীয়। ❑

ইতিহাস যেখানে কথা বলে

গৌতম মুখোপাধ্যায়

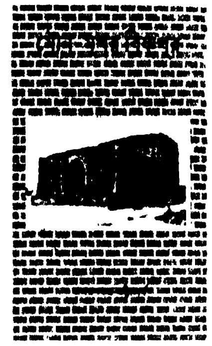
মৌন-মুখর বিষ্ণুপুর • লেখক: অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য • প্রকাশক: দেবীপ্রসাদ নাগ, ২১/ডি, গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫ • মূল্য: ৪৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮৮ • প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০০

সাধারণভাবে ইতিহাস পঠনপাঠনের প্রচলিত রীতিতে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হয় কেবল একটি বৃহত্তর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে। প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির ইতিহাসের গতির দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু তার সমান্তরালে আঞ্চলিক রাজাদের ইতিহাসের যে গতিধারা, তার চর্চা আমাদের দেশে অনেকটাই অবহেলিত। এই আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রধান বাধা হলো, তথ্যগত উপাদানের অভাব। তাই এই ধরনের গবেষণা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসও এমন একটি রাজবংশের ইতিহাস, যা একান্তভাবেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রায় বারোশো বছরের এই ইতিহাসে তথাকথিত কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল না। নিজস্ব রাজনৈতিক গতিধারা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক ছিল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ। এটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা একটি অধ্যায়। তা নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা হলেও সামগ্রিকভাবে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে খুব কম গবেষণা হয়েছে। সেগুলির মধ্যেও আছে কিছু অসম্পূর্ণতা এবং সেইসঙ্গে বহু প্রশ্নের অবকাশ।

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর **'মৌন-মুখর বিষ্ণুপুর'** গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সেইসব গবেষণাধর্মী গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। 'ইতিহাসের অস্পষ্ট পথরেখা ধরে সন্ধানী পথিকের পদচারণাই' তাঁর লক্ষ্য। প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার ফাঁকগুলি দেখিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সমাধানেরও চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস শুধু নয়, বিষ্ণুপুরের ইতিহাসচর্চার ধারার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটবে।

শ্রীভট্টাচার্য অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। এত স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগও নেই। তবে তাঁর আলোচনায় প্রধানত বিষ্ণুপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিধারাই প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা চোখে পড়ার মতো কম, যদিও আজকাল ইতিহাসের এইসব দিকের প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি' নামক পরিচ্ছেদে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঘরানা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের প্রসার এবং তার খ্যাতি ছিল গগনচুম্বী, তথাপি শ্রীভট্টাচার্য সংক্ষিপ্তাকারে তার উল্লেখ করেছেন মাত্র। রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার পাশে সাংস্কৃতিক দিকটির এই আলোচনা তুলনামূলকভাবে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আরো অনেককিছুই আজকাল ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। তার মধ্যে শিল্পের ইতিহাস অন্যতম। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির যে শিল্পকীর্তি, বিশেষত মন্দিরগাত্রে দেখতে পাওয়া যায়, তারও যে একটা ঘরানা এবং ইতিহাস আছে, তা বলা বাহুল্য। শ্রীভট্টাচার্য অবশ্য শিল্পরীতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিকেও খুব একটা যাননি। যদিও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের এব্যাপারে জানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এর পাশাপাশি লোককাহিনীগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরের সামাজিক চিত্রও কিছুটা পাওয়া যেতে পারে।



সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানত চিরাচরিত রাজনৈতিক ইতিহাসই স্থান পেয়েছে। প্রকাশক গ্রন্থটির পিছনে শ্রীভট্টাচার্যের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দাবি করেছেন, গ্রন্থটি "একটি উপযুক্ত সারগ্রন্থের (hand book) অভাব মোচন করবে।" তাঁর এই বিশ্বাস ভ্রান্ত নয়। একদিকে যেমন গবেষকদের কাছে গ্রন্থটি অনেকাংশে ইতিহাসচর্চার ধারা হিসাবে কাজে আসবে, তেমনি

অনুসন্ধানের বিভিন্ন দিক খুলে দেবে। আবার সাধারণ মানুষ এবং পর্যটকদের জন্যও এটি অত্যাবশ্যক। 'পর্যটকের নির্দেশিকা' পরিচ্ছেদটি এব্যাপারে অত্যন্ত উপযোগী।

গ্রন্থটির আরেকটি অসাধারণত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তা হলো লেখকের রচনাশৈলী। সাহিত্য এবং ইতিহাসের অসামান্য যুগলবন্দি হিসাবে গ্রন্থটি অনবদ্য। আজকাল যেখানে ইতিহাসের পঠনপাঠন সাধারণের কাছে একটি নীরস বিষয় হিসাবে মনে হচ্ছে, সেখানে লেখকের মতো ইতিহাসসচেতন শিক্ষকদের বেশি প্রয়োজন— যাঁরা ইতিহাস রচনা ও পঠন-পাঠনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবেন।

প্রাচীন বঙ্গে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের যে-ধারা প্রবহমান ছিল, তা আমাদের গর্বের বস্তু। আজ তার অস্তিত্ব নেই, তবুও তার সঙ্গে পরিচিত না হলে আমরা বঙ্গদেশের ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় থেকে বঞ্চিত হব—যে-সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অনেকাংশেই একেবারে বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আজও সেখানে কান পাতলে বঙ্গ ইতিহাসের নিজস্ব কথা ও সুর শুনতে পাওয়া যায়। সংবেদনশীল পাঠক গ্রন্থটি পড়লে হৃদয়ে ইতিহাসের সেই সুরের অনুরণন অনুভব করবেন। ❑

ভূস্বর্গ ভাবনা

সুমন সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কাশ্মীর ● লেখক : কুণাল চট্টোপাধ্যায় ● প্রকাশক : পরন্তপ, ২৭বি/ ২ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ ● মূল্য : ৭০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৮ ● প্রকাশকাল : ২০০১

কিংবদন্তিতে ঘেরা কাশ্মীর। তুষারধবল শৃঙ্গরাজি দিয়ে উপত্যকাকে জড়িয়ে ধরেছে হিমালয়। পুরাণ-মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সাহায্য নিয়ে জলোদ্ভব দস্যুকে বিনাশ করে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কশ্যপ। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি কশ্যপের নামেই এই রাজ্য। 'কশ্যপ মার' বা 'কশ্যপ মীর' থেকেই 'কাশ্মীর' নামকরণ।

দেশবিভাগের সময়ে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের মাথার মুকুটে মণি হয়ে রয়েছে আজকের জম্মু-কাশ্মীর। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে হিংসা এবং পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদের কালো মেঘে কলুষিত হয়েছে রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবেশ। তবু অমলিন রয়েছে কাশ্মীরের মানুষের হৃদয়। শাশ্বত ভারতের বহমান সংস্কৃতির অনবদ্য নিদর্শন লুকিয়ে রয়েছে কাশ্মীরের মানুষের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায়।

পেশায় সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক ডঃ কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের কলমে ফিরে ফিরে এসেছে মানুষের কথা, কাশ্মীরের জীবনের স্পন্দনের কথা। তথ্য, তত্ত্ব, পরিসংখ্যানকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি লিখেছেন কাশ্মীরের অতীত, পর্যালোচনা করেছেন বর্তমানের। তাঁর আদ্যন্ত গবেষণা ও সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল **'প্রসঙ্গ কাশ্মীর'** বাঙলা ভাষায় কাশ্মীর বিষয়ক গ্রন্থের অভাব পূরণ করেছে স্বাভাবিকভাবেই।

গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়ে 'পাকসালুৎসা' ও 'হাউসবোটের ডায়েরি'তে রয়েছে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং কাশ্মীরের সামাজিক চালচিত্র।

'কাশ্মীর যুগে যুগে' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক দ্বাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও কাব্যকার কলহণ বিরচিত 'রাজতরঙ্গিণী'র উল্লেখ করে কাশ্মীর ইতিহাসের কালপঞ্জি উপহার দিয়েছেন পাঠককুলকে।



তিনটি ভাগে ডঃ চট্টোপাধ্যায় কাশ্মীরের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন—(১) সম্রাট অশোক থেকে মিহিরকুল, (২) গোপাদিত্য থেকে বাদশা জইন উল আবেদিন এবং (৩) ফতে শাহ থেকে হরি সিং।

শেষ দুটি অধ্যায়ে অর্থাৎ 'কাশ্মীর আন্দোলন ও তার ভারতভুক্তি' এবং 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ৩৭০' আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক দলিল, চুক্তি ও ঘোষণাপত্র। কখনো তিনি তুলে ধরেছেন নেহরুর পত্র, আবার কখনো লিখেছেন কাশ্মীর নিয়ে জিন্নাহর ভাবনার কথা।

তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের ফলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাশ্মীরের পর্যটনশিল্প, নষ্ট হচ্ছে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। আর থেমে গিয়েছে প্রগতির চাকা।

পরিশেষে একটি অপ্রিয় অভিযোগ। গ্রন্থে ছাপার ভূত নামক অপদেবতাটির যত্রতত্র উপস্থিতি রয়েছে। আগামী সংস্করণে এদিকে লেখকের সনির্বন্ধ দৃষ্টি প্রয়োজন। প্রচ্ছদের ছবি মনে করিয়ে দেয়, শত হিংসার মধ্যেও কাশ্মীরে জীবনের জলছবি আজও অমলিন। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

* *কৈলাসের চরণ ছুঁয়ে মানসের জলে অবগাহন ● লেখিকা : বেলারানী পণ্ডিত ● প্রকাশক : সুশান্ত হালদার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রকাশনী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল অ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ১৪৮ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯ ● পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬+৭২ ● মূল্য : ৫০ টাকা ● প্রকাশকাল : ২০০৪*

* *বিপ্লবতীর্থ চন্দননগর ● লেখক : বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ● প্রকাশক : শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুটির, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, বিপ্লবী বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬+৭২ ● মূল্য : ১৫ টাকা ● প্রকাশকাল : ১৯৯৪*

* *যুগে যুগে কত ভক্ত ● গীতিকার : দেবাশীষ লাহিড়ী ● প্রকাশক : প্রণব ভট্টাচার্য, ১১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬+৫০ ● মূল্য : ৫ টাকা ● প্রকাশকাল : ২০০২*

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী

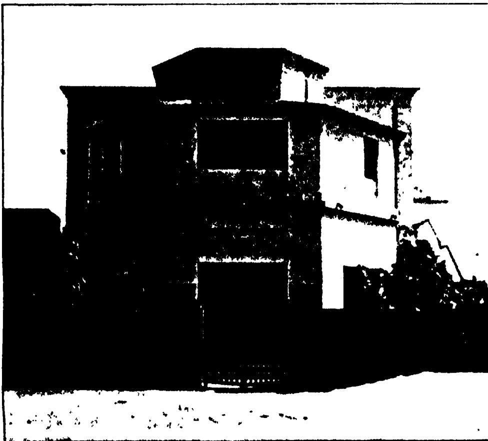
শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটির সূচনা হয় ১৯২৫ সালে, তার বর্তমান অবস্থানে—ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন ভক্তের প্রচেষ্টায়। শ্রীমা সারদাদেবী ঠাকুরের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্যসহ পুরী এসেছিলেন তিনবার—১৮৮৮, ১৯০৪ ও ১৯১১ সালে। শ্রীশ্রীমায়ের ও অন্যান্য মহাপুরুষদের আশীর্বাদধন্য পুরীধামে অবস্থিত আশ্রমটি আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৪ সালে। সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই আশ্রম নানা আধ্যাত্মিক ও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে পুরী ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে। এইসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হলো—

(১) গ্রন্থাগার ঃ ১৯৪৪ সাল থেকে আশ্রমের গ্রন্থাগারটি সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও ভক্তদের কাজে লাগছে। এখানে সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রশস্ত পাঠকক্ষ ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক একটি পাঠকক্ষ আছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০০ গ্রন্থ, ১৪টি সংবাদপত্র ও ৫৫টি সাময়িকপত্র এখানে রাখা আছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

(২) বিদ্যার্থী ভবন ঃ ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থী ভবনটিতে বর্তমানে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মোট ৭০ জন স্কুল-ছাত্র থাকে। তাদের থাকা-খাওয়া, পোশাক, বইপত্র ইত্যাদি বিনামূল্যে আশ্রম থেকেই দেওয়া হয়। ছাত্রদের শারীরিক, বৌদ্ধিক ও চারিত্রিক বিকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষার দিকটিতেও বিদ্যার্থী ভবন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

(৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা ঃ পুরী শহরের অত্যন্ত দরিদ্রঘরের পশ্চাৎপদ স্কুল-ছাত্রদের জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে চালু হয়েছে একটি অবৈতনিক শিক্ষাদানকেন্দ্র। এখান থেকে ছাত্রদের দুপুরের খাবার, পড়াশোনার জিনিস-পত্র এবং স্কুল-ইউনিফর্মও দেওয়া হয়। ২০০৩-২০০৪ সালে ১৮ জন ছাত্র এই সুবিধা পেয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর বিভিন্ন গ্রামীণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হয়। ২০০৩-২০০৪ সালে জগৎসিংহপুর, পুরী ও খুরদা জেলার ১৯টি বিদ্যালয়ে ১,০৩৬ সেট ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে।



রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী



পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকার্য ঃ খরাগ্রস্ত অঞ্চলে নলকূপ স্থাপন

(৪) দুঃস্থ জনগণের সেবা ঃ আশ্রম ২০০১ সাল থেকে পুরী অঞ্চলের অতিদরিদ্র বয়স্ক মানুষদের বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করে আসছে।

(৫) প্রাথমিক ত্রাণকার্য ঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও প্রতিকূলতায় আশ্রম তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৩-২০০৪ সালের অগ্নিকাণ্ড-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে খুরদার ৩৬টি পরিবারে; পুরী জেলার ৬২টি গ্রামে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে শুকনো ও রান্নাকরা খাবার, ওষুধপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদ।

(৬) স্বাস্থ্যসেবা ঃ ১৯৮৪ সালে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল প্রজেক্টের মাধ্যমে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। আজ এটি পুরী ও খুরদা জেলার দুঃস্থ গ্রামীণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। ২০০৩-২০০৪ সালে ২০,০০০-এর কিছু বেশি মানুষের সাধারণ চিকিৎসা ও ২০০-র বেশি রোগীর দন্ত-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সময়েও এই সেবাপ্রকল্পের মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়।

আশ্রমের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আছে প্রাত্যহিক প্রার্থনা, সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন, বিভিন্ন অবতার ও ধর্মাচার্যের জন্মতিথি পালন প্রভৃতি। অতি সমারোহে পালিত হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। আয়োজিত হয়

জনসভা, ছাত্রীদের শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, লীলাকীর্তন প্রভৃতি। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম টিকতালের সারদা উইমেন্স কলেজে ১৬ জন মহিলার উপযোগী একটি টেলারিং প্রশিক্ষণকেন্দ্র শুরু করেছে এবং দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদানের জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করেছে। ১৯৯৪ সালে আশ্রম তার বেলুড় মঠে অন্তর্ভুক্তির সুবর্ণজয়ন্তী এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের শতবর্ষজয়ন্তী পালন করেছে। এছাড়া আয়োজিত হয়েছে ছাত্র-যুব সমাবেশ, প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন, সাধারণ সভা, ক্যুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি। এছাড়া পুরী আশ্রম যথাযোগ্য সমারোহ ও মর্যাদার সঙ্গে ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং পবিত্র পুরীধামে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আগমনের শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করেছে। *(প্রতিবেদক: সোমনাথ ভট্টাচার্য)*

দ্বারোদ্ঘাটন ও আবরণ উন্মোচন

রামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই: গত ২৩ আগস্ট ২০০৪ নবনির্মিত সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এই আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয় মাদুরা কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই ঐতিহাসিক স্থানে ১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে মাদুরাইবাসিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস্ এনসেস্ট্রাল হাউস অ্যাণ্ড কালচারাল সেন্টার (কলকাতা-৬): গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ স্বামীজীর পৈতৃক ভবন সংলগ্ন নবনির্মিত সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই কেন্দ্রের ঠিকানা: ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৬। দূরভাষ: ২২১৯-২০৩০।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বিবেকানন্দ আশ্রম, আলসুর: গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর: গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 'স্বামী বিবেকানন্দ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

শিক্ষককৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন, আলং: গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ একজন শিক্ষক কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছ থেকে 'সি. বি. এস. ই. অ্যাওয়ার্ড ফর টিচার্স' পুরস্কার লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সি. বি. এস. ই. অনুমোদিত ভারতের সকল বিদ্যালয়ের প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে প্রতি বছর ১২ জনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত তিনটি শাখাকেন্দ্রে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়—লখনৌ, মালদা ও রাজমুন্দ্রি।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ মিশন, বিজয়ওয়াড়া: গত ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ কৃষ্ণ পুষ্কর মেলার তীর্থযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ সেবাকার্য চালানো হয়—২,০০০ রোগীর চিকিৎসা, ১,২০০ জনের 'ক্লোকরুম'-এর ব্যবস্থা, ৫০,০০০ জনকে খাদ্য, ৯০,০০০ জনকে ঘোল, ২০,০০০ শিশুকে দুধ এবং ৬,০০০ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রম কর্তৃপক্ষ ধর্মালোচনা এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী-সম্বলিত প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিধানানন্দজী (অসিতাভ মহারাজ) গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪-এর প্রত্যুষে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি বরানগর মিশন আশ্রমের কর্মী ছিলেন। দেহত্যাগের দিন ভোর ৩টায় তিনি গুরুতরভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের পথেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৭৬ সালে বেলুড় মঠে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৮৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তিনি রামহরিপুর, নরোত্তমনগর, মনসাদ্বীপ ও বরানগর মিশন কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহত্যাগে সঙ্ঘ এক নিবেদিতপ্রাণ, কঠোর পরিশ্রমী সদস্যকে হারাল। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ৭ অক্টোবর ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা সংক্রান্ত 'এই সেই বাড়ি' নামক একটি অডিও ক্যাসেটের প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪ মহালয়ার দিন ভাষণ দেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা কালীপূজার পর পুনরায় শুরু হয়েছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দির, বেহালা (কলকাতা-৬০): গত ২১-২৪ মার্চ ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে

বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও ডঃ তাপস বসু। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি (দার্জিলিং) ঃ গত ২২ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী প্রমুখ। এদিন শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে বন্দিদের মানসিক উন্নতি বিষয়ে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ জানুয়ারি ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে 'জাতীয় যুবদিবস' ও ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪ মার্চ ২০০৪ বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১০৭ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিবেকানন্দনগর (বালেশ্বর, ওড়িশা) ঃ গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০০৪ শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য, নাটক, রামায়ণগান, প্রদর্শনী, ভক্তসম্মেলন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা, সঙ্গীত, রচনা, অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও সাধারণ উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শ্রীনিবাসানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী ও মনোরমা মহাপাত্র।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া) ঃ গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' পাঠ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে যথাক্রমে মাতৃসম্মেলন ও সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃসম্মেলনে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অখিলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দেবরূপপ্রাণাজী, বাসবদত্তা চক্রবর্তী, হেনা চৌধুরী, সাধনা রায়, সাধনা মুখার্জি ও রীতা দুবে। এই সম্মেলনে প্রায় ১,৫০০ মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 'মহাত্মা অক্ষয়কুমার সেন' মঞ্চে। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী গিরিধরানন্দজী, স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী ও স্বামী কৌশিকানন্দজী। এই সম্মেলনে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ও বসে প্রসাদ পান।

ভগিনী নিবেদিতা সেবা কেন্দ্র, ডানকুনি (হুগলি) ঃ গত ২৮ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, ধ্যান, ভক্তিগীতি, স্তোত্র ও সঙ্গীতময় 'ভাগবৎ' পাঠ, ছাত্রছাত্রী কর্তৃক আবৃত্তি ও ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন অনেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাগজ, খাতা, পেন্সিল, লজেন্স ইত্যাদি দান করেন।

কুমিরমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চণ্ডীতলা (হুগলি) ঃ গত ২৮ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'বেদ' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, শ্রুতিনাটক, ভক্তিগীতি, রামনামসঙ্কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, ডঃ চিন্ময়ী নন্দী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চককাশীপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৮ মার্চ ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী পররূপানন্দজী, আই. জি. জয়দেব চক্রবর্তী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, নিমতা (কলকাতা-৪৯) ঃ গত ২৮ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী, স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৭ মার্চ এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরিও আয়োজিত হয়।

তড়কাবাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (বাঁকুড়া) ঃ গত ২৯ মার্চ ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি, নামসঙ্কীর্তন, বাউলগান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ইউ. এন. কর। এম. টি. পি. এস. (ডি. ভি. সি.) এস. আই. পি. স্কিমে দুঃস্থদের সেবায় হোমিওপ্যাথি ও ভ্রাম্যমাণ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র এবং চক্ষুচিকিৎসা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা) ঃ গত ২-৪ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব পালিত হয়। ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা, আশীর্বাণীপ্রদান ও ২০১ জন দুঃস্থ নারায়ণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। উৎসবের বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী, স্বামী দেবত্বানন্দজী, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রমুখ। ৪ তারিখ ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূজ্যপাদ মহারাজজী এই আশ্রমে অবস্থান করে দীক্ষাপ্রদানও করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ২-৪ এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা, পুতুল প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী

গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডঃ আনন্দমোহন ঘোষ প্রমুখ। ৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। সমাপ্তিপর্বে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভাঙামোড়া (হুগলি) ঃ গত ৩-৪ এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, বাউল ও রামায়ণ গান, কীর্তন, স্মরণিকা প্রকাশ, গীতি-আলেখ্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, স্বামী কৌশিকানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, ডঃ তাপস বসু, রবীন্দ্রনাথ হাজরা, তরুণ গোস্বামী, নিত্যরঞ্জন কুণ্ডু, অরবিন্দ হোড়, কল্যাণ বসু, সন্দীপন সেন, হিমাদ্রি চ্যাটার্জি প্রমুখ। বিভিন্ন দিনে স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক অমিয়কুমার অধিকারী, সহ-সভাপতি মুরারি নাথ এবং মহাদেব ভট্টাচার্য। ৪ তারিখ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বেদান্তানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, কাঁচরাপাড়া (নদীয়া) ঃ গত ৩-৪ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পালাকীর্তন, দুঃস্থ মহিলা ও ছাত্রছাত্রীদের বস্ত্র, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী, স্বামী উমেশানন্দজী, ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ। ৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি (কলকাতা-১৪৪) ঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়াপ্রাণাজী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন ৪০ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা যোগাশ্রম, পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া) ঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সিহাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাধনামন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বলিত প্রদর্শনী, ব্রতচারী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন সকালে প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী অমেয়ানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুজয়ানন্দজী, স্বামী স্নিগ্ধানন্দজী ও ডাঃ সীতানাথ রায়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৮০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) ঃ গত ৯-১১ এপ্রিল ২০০৪ রামায়ণগান, অঙ্কন, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, ভক্তসম্মেলন, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, ডঃ দিলীপকুমার রায়, মিনতি রায়চৌধুরী প্রমুখ। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং ২৬ জন দুঃস্থ মহিলার মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চাঁদপাড়া বাজার (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১০-১১ এপ্রিল ২০০৪ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী সর্বলোকানন্দজী। ১১ তারিখ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক ভজনচন্দ্র দাস। প্রায় ৫৫০ জন যুবপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

সীতারামপুর রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ১০-১১ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতির প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, ডাঃ মহাপ্রসাদ কুণ্ডু ও বি. এন. মিশ্র। ১১ তারিখ দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৭০টি শাড়ি বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘের সভাপতি জয়দেব মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইন্টালি রামকৃষ্ণ অর্চনালয় (কলকাতা-১৪) ঃ গত ১০-১১ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, পল্লি-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ভজন-কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণাজী ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। ১১ তারিখ প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ১২ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী, স্বামী রাজীবানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১১-১৪ এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১১ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও হর্ষ দত্ত। এদিন দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ১২-১৪ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, বেদ ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, তরজা গান, নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, অসিত মণ্ডল ও সখারাম সামন্ত। ১৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষানিকেতন, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) : গত ১৩-১৪ এপ্রিল ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, ভজন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব সম্পন্ন হয়। ১৩ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ রায়। ১৪ তারিখ প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দিব্যানন্দজী। এদিন প্রায় ১,২০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, নরনারায়ণসেবা ও ১৬২ জন দুঃস্থের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হয়।

বেলাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) : গত ১৮ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদ ও 'কথামৃত' পাঠ, উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিদ্যানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ২২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পূর্ব সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩০) : ১৮-২০ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, বাৎসরিক উৎসব এবং প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়।· বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, স্বামী সুখানন্দজী, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দজী ও স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। ১৮ তারিখ ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়। ২০ তারিখ দুপুরে ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, দাঁতন (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'বেদ' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ভি. ডি. ও. প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং বিকালে দুঃস্থদের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

সারদা সেবাসঙ্ঘ, শিবপুর (হাওড়া) : গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে দুঃস্থ ছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সুভাষনগর (কলকাতা-৬৫) : গত ২৩-২৫ এপ্রিল ২০০৪ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, যাত্রা, ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আবৃত্তি, গান ও নাটক, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিমলাপ্রাণাজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, ডঃ কমল নন্দী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অলোক চট্টোপাধ্যায়।

সেবাব্রত

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, শান্তিপুর (নদীয়া) : গত ১১ এপ্রিল ২০০৪ কলকাতা মেডিকেল ব্যাঙ্কের সহায়তায় মা ও শিশুদের জন্য একটি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ১,৪৭২ জন রোগীর চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার) : গত ১১ এপ্রিল ২০০৪ তুফানগঞ্জ মহকুমা উপ-সংশোধনাগারে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্য সম্বলিত একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার নারায়ণপুর-নিবাসী অনিলকুমার মণ্ডল গত ২৮ জুন ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী দীপ্তিকুমার শীল গত ২৮ জুন ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, নিউ দিল্লি-নিবাসিনী নিভারানী বসু গত ২ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী প্রতিমা দাস গত ৬ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী ইন্দ্রানী সরকার গত ৭ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, অসম-নিবাসিনী সাবিত্রীবালা দে গত ৮ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ❑



আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

All India Elocution Competition



Ramakrishna Mission Institute of Culture
Kolkata

As in the previous years, under Swami Vivekananda Centenary Endowment Programme, the Annual All India Elocution Competition, group-wise, in English, Bengali, Hindi and Sanskrit on 'Swami Vivekananda' as given below will be held this year too at the Institute during December 7-9, 2004. The prize-distribution meeting will be held on 11 December 2004 at 5.30 p.m. in the Vivekananda hall of the Institute. No entry fee is charged for this event. Applications in the prescribed form obtainable from the Institute, through the Heads of their Institutions, may be sent to the Institute on or before 30 November, 2004.

'A'—SCHOOL GROUP—JUNIOR Students from Class III to Class VII	:	Time : Four minutes Subject : Billey's Courage, Compassion and Truthfulness
'B'—SCHOOL GROUP—SENIOR Students from Class VIII to Class X	:	Time : Five Minutes Subject : My Ideal, Swami Vivekananda
'C'—UNDER GRADUATE GROUP Students of Colleges, Including Junior Colleges and Higher Secondary Schools	:	Time : Six Minutes Subject : Meeting of Tradition and Modernity in Swami Vivekananda
'D'—POST-GRADUATE GROUP Post-graduate students of Universities and equivalent Institutions	:	Time Eight Minutes Subject : Indian Renaissance and Swami Vivekananda
GROUP 'E'—Open to All (Exclusively in Sanskrit)	:	Time : Five Minutes Subject : Vivekanandasya Shikshavisayini Bhavana



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া**
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩১৪৫
- **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী-৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ২৫৯২-১২৩০
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **স্বপন চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া
  বারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন ঃ ২৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ঃ ২৫৫৩৯২
- **অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা**
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন ঃ ২৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-২৬০৪৫০
- **দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশত-৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর-৭৪৩ ৩৫২

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ



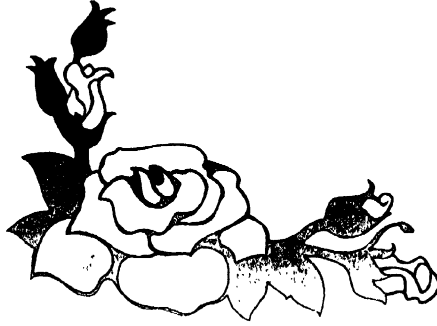
সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী



আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ



ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

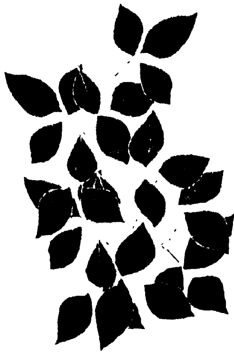
শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

A Suggestion

Folic acid, a vitamin, is abundant in plants; but seriously deficient in our modern processed food. Folic acid prevents congenital diseases, cancers, diseases of heart and Brain. So, US Government has asked for mandatory fortification of flour with Folic Acid. *(Vide : BMJ South Asia Edition, April 2004)*
Indian Ready-to-use food producers should fortify their products with folic acid to improve our national health.

Dr. Arun Kumar Laha, Howrah-711 104

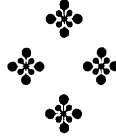
একটি উপকারী পরামর্শ

ফলিক অ্যাসিড উদ্ভিদজগতে প্রভূত থাকলেও রান্না এবং অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য আধুনিক যুগের মানুষের ভোজ্যে এর ঘাটতি থেকে যায়। ফলিক অ্যাসিড জন্মগত বিবিধ রোগ, ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ করে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেদেশে বিক্রিত সব ময়দায় ফলিক অ্যাসিড মেশানো বাধ্যতামূলক করেছে। ফলিক অ্যাসিড একটি ভিটামিন। ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুতকারকগণ (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী, বেকারি ইত্যাদি) তাঁদের প্রস্তুত খাদ্য ফলিক অ্যাসিডযুক্ত করলে মানুষের উপকার হবে।

ডাঃ অরুণকুমার লাহা, হাওড়া-৭১১ ১০৪

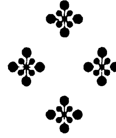
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol.106
No.11
November
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও [illegible] একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



গত ১লা মাঘ ১৪১০ [১৬ জানুয়ারি ২০০৪] [illegible] বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় [illegible] প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৬ [illegible] প্রথম।

২০০৫ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** [illegible]বর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রাম[illegible]-ভাবান্দোলন** ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব** ও বাণী-শরীর। স্বামীজী **বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **২০০৪** সালের জন্য **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'**কে পৌঁছে দিতে **হবে। 'উদ্বোধন' একটি** সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত **করেন, তাহলেই** পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। **এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর [illegible]র পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।**

✡ ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন স্থানাধিকারীকে 'উদ্বোধন' এর ১০৭তম বর্ষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাগুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করা হবে। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে (সম্পাদক, ১নং উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০০০৩) অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক

উদ্বোধন সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা।

If undelivered, Please return it to
Udbodhan Office,
1 udbodhan Lane, Kolkata 3

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৬ ॥



পৌষ • ১৪১১ • ১২শ সংখ্যা

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের—সে-দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।







উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফ্‌ট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্‌ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

সূচিপত্র

উদ্বোধন ॥১০৬॥

১০৬তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ● পৌষ ১৪১১ ● ডিসেম্বর ২০০৪

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



আপনি কি ২০০৫ সালের নবীকরণ করেছেন?

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন'  ১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 'উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

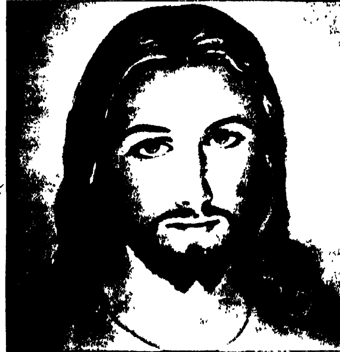
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯









Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. —*ধর্মের জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষিত তারা ধন্য, কারণ তাদের হৃদয় পূর্ণ হবে।*

~†~

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.—*করুণাগুণসম্পন্নরাই ধন্য, কারণ তারা ভগবৎকৃপা লাভ করবে।*

~†~

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.—*পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তারাই ভগবান দর্শন করবে।*

~†~

Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.—*অপরকে বিচার করো না, তাহলে নিজেই বিচারিত হবে। যে-পরিমাণ দোষ তুমি সাব্যস্ত করবে, সেই পরিমাণ দোষে তুমি দূষিত হবে।*

~†~

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:—*প্রার্থনা কর, তাহলেই তোমাদের দেওয়া হবে। অন্বেষণ কর, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। এবং আঘাত কর, তাহলেই দরজা খুলে যাবে।*

~†~

Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.—*মানুষের কাছে যে-আচরণ তোমরা প্রত্যাশা কর, সেরূপ আচরণ তোমরা অপরের প্রতি করবে। এই হলো বিধিব্যবস্থার মূল কথা।*

New Testament, The Sermon on the mount, (St. Matthew)



খ্রিস্টধর্মে সন্ন্যাসজীবন ও মঠবাস

('বড়দিন' উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা)

পাশ্চাত্যদেশে 'সন্ন্যাস' শব্দটি অপরিচিত নহে। যেকোন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়, বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ লইয়া সেই জাতি গঠিত। অতএব এমন মানুষ কোন দেশে, কোন সময়ে থাকিতেই পারেন—যিনি ঈশ্বরকেই জীবনের পরমপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন, যদিও সেরকম মানুষের সংখ্যা অত্যল্প। বস্তুত, প্রভু যিশুর আবির্ভাবের পূর্বেও 'সংসারত্যাগী' ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের অস্তিত্ব মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় এই আশ্রমজীবনের ধারণা যে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এমন হইতেই পারে যে, আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমনের পর হইতে সন্ন্যাসের ধারণা ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ব্যবসার সূত্রেও ভারতীয় 'সন্ন্যাস'-এর ধারণা ঐ অঞ্চলে প্রসারিত হইতে পারে। সেই কারণে হেলেনিক সভ্যতার ইতিহাসে 'stoic' বা তিতিক্ষাপরায়ণ (ascetic) ঈশ্বর-সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও তাহারা 'নীতিবাদ'কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া 'দর্শন'-এর অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। 'Judaism' বা ইহুদিদের ধর্মেতিহাসেও এইরূপ তিতিক্ষাপরায়ণ কিছু সাধকের সন্ধান আছে, যাঁহারা সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দূরে নির্জন স্থানে বসবাস করিতেন। কুমরান খননকার্যের পর 'ইসেনীয়' (Essenes) সভ্যতার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাদের সমাজজীবন ছিল কর্মবহুল, কিন্তু তিতিক্ষাপরায়ণ। থেরাপুটগণের মধ্যেও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দারিদ্র্য (poverty), পবিত্রতা (purity), প্রার্থনা এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, এই সবই যিশুর পূর্ববর্তী বা সমকালীন ইতিহাসের বর্ণনা।



যিশুখ্রিস্টের তিরোধানের পর হইতে তিনশো বৎসর ধরিয়া ঐ ধর্মকে বিলুপ্ত করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার সহিত চলিয়াছিল খ্রিস্টানদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার (persecution)। মূলত সেণ্ট অ্যাণ্টনির সময় হইতে ইজিপ্টে খ্রিস্টধর্ম ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে শুরু করিল (২৫০-৩৫০)। ২০ বৎসর লোকালয়ের বাহিরে থাকিয়া তপস্যাদি করিয়া তিনি পুনরায় সমাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে কেহ কেহ একাকী আশ্রম বা কুটির নির্মাণ করিয়া প্রার্থনাদি করিতেন। যৌথ আশ্রমিক জীবন তখন প্রায় ছিল না। অনেকে মরুভূমি বা জঙ্গলে একাকী ঘুরিতেন। সেণ্ট অ্যাণ্টনির নেতৃত্বে পরবর্তী কালে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন শুরু হইল। বিভিন্ন স্থান হইতে রবিবার সকালে 'ম্যাস'-এ যোগদান করিতে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই ক্রমে একত্রে মঠে বসবাস করিতে শুরু করিলেন। এঁদের 'deserted father' বলিয়া কখনো কখনো অভিহিত করা হইত। প্রায় সমসাময়িক কালে সেণ্ট ম্যাকারিয়াস সিরিয়াতে একটি চার্চ স্থাপন করিয়া কিছু কিছু মিশনারি কাজ শুরু করিয়াছিলেন। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও অনেকটাই সেণ্ট ম্যাকাসিউসের। এই আশ্রমজীবনকে আরো সুসংগঠিত করলেন সেণ্ট আগাস্টাইন—প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই সময়ে সাধু মার্ক এবং এপিরাসের বিশপ 'শুরুকরণ' বা 'baptism'-এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়া মঠ স্থাপন করেন—যদিও প্রাচীনতর ধারানুযায়ী। যখন এইসব ঘটনা সিরিয়াতে বেশি হইতেছিল, তখন 'লরা' (Laura) নামক স্থানে সেণ্ট চ্যারিটনের নেতৃত্বে পদবিভাগ-সম্বলিত (hierarchial) একটি সঙ্ঘ ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পুরোহিতকুল যদিও প্রথমাবধি এই আশ্রমিক জীবনের বিরোধিতা করিতেছিল, তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর ধাক্কা আসিল যখন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে হজরত মহম্মদ তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া মক্কা হইতে মদিনায় আসিলেন। ক্রমশ ইজিপ্ট ও প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টধর্মে অবচ্ছেদ টানিয়া ইসলামধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল এবং মহম্মদের মুসলমান অনুগামিগণ বিভিন্ন মঠের সকল খ্রিস্টান সাধককে হত্যা করিল। তথাপি মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তখন খ্রিস্টধর্মের স্বর্ণযুগ চলিতেছে, অর্থাৎ উহা একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেণ্ট বেনেডিক্ট মঠবাসিগণের জন্য সুচিন্তিত, বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা করিলেন। এই নিয়মাবলী 'Augustian Tradition' (আগাস্টীয় ধারা)-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল এবং বলা যায়, পরবর্তী কালে সঙ্ঘবদ্ধ মঠজীবনের একটি মূল নির্দেশিকারূপে পরিগণিত হইল এই 'Regula Magister'। গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়াছে, সেণ্ট বেনেডিক্টের উপর ভারতীয় সন্ন্যাস আশ্রমের আদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আরো জানা যায় যে, সেণ্ট বেনেডিক্টের অব্যবহিত পূর্বেই প্যালেস্টাইনে 'ক্যাসিয়ান' নামক এক সাধু হিন্দুধর্মের উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম তথা তিতিক্ষাপরায়ণ আশ্রমিক জীবনের কথা বিশেষভাবে প্রচার করিতেন। ক্রমে দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে এই সন্ন্যাসধর্ম এবং মঠজীবনের আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের 'ক্লুনি' নামক স্থানে স্থাপিত চার্চ (৯১০ খ্রিস্টাব্দ) এই বিষয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করিল। ক্লুনির মঠজীবন কেমন ছিল তাহাই সংক্ষেপে আমাদের আলোচ্য। খ্রিস্ট-

ধর্মান্তর্গত জীবন, কর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার বিস্তৃত ঐতিহাসিক পটভূমির সকল নাড়ি-নক্ষত্র সম্বলিত কোন একটি বর্ণনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তথাপি নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ক্লুনিতে সেন্ট বেনেডিক্টের চার্চের অনুবর্তী বর্ণনা আমাদের অনুসন্ধিৎসা কিছুটা নিরাকৃত করিতে পারে। ক্লুনিতে প্রায় সাতশত বৎসরের মধ্যে একই ভিটার উপর তিনবার গির্জা নির্মিত হইয়া এই সন্ন্যাস আশ্রম পরিচালিত হইয়াছিল। তৃতীয়বারের মঠজীবনই আমাদের বর্তমান সংগ্রহ। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যদিও চার্বাকপন্থী বিশাল জনসম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খুবই বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইতোমধ্যে নেপোলিয়ানিক ধাক্কা ও ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাতে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসী-মঠ বেশ কাহিল হইয়াছিল, তথাপি নানাবিধ অভিজ্ঞতার ফলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে Latin 'Monasticism'-এর প্রচার ও ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ব্যাপকভাবেই হইয়াছিল।

■ **মঠের মূল লক্ষ্য—ঈশ্বরানুসন্ধান ঃ** Dom Mayeul de Drenille তাঁহার 'Monks of Yesterday and Today' (St. Pauls Publication, Bangalore) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন খ্রিস্টধর্মে তিতিক্ষাপরায়ণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাস আশ্রমিকগণের সৃষ্টি হইল, তাহার প্রথম পর্যায়ে সমাজের উপর তাহার অভিঘাত দুই ধারায় অনুভূত হইয়াছিল। প্রথমটি 'ত্যাগ'; দ্বিতীয়টি এই ত্যাগের ইতিমূলক দিক—'ঈশ্বরপ্রেম'। তাহাদের এই সংসারত্যাগরূপ আন্দোলন যেন জগতে বিষয়ী মানুষ তথা বিষয়ভোগলালসার ক্রমবর্ধমানতার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এবং দ্বিতীয়টির কারণে খ্রিস্টধর্মে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনকারিগণ পরমপিতার জীবন্ত সাক্ষী রূপে সম্মানিত হইতেন। এবং যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, পিতা (Father), পুত্র (son) এবং আত্মা (Holy Ghost or Spirit) অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণকারী তিনটি সত্তা, তাঁহারা একথাও বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বরের বাণী তাঁহাদের নিকট বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং অবতারসৃষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পৌঁছায়। কঠোর সাধনভজন, শরীর-নিগ্রহ এবং পবিত্রতার কথা 'Old Testament'-এ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেলেও 'New Testament'-এ এই বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে বলিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের সার্বভৌমিক কর্মপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'খ্রিস্টীয় রহস্যবিদ্যা' (Christian Mysticism) যতই বিস্তারলাভ করিয়াছে, এই পবিত্র সনাতন ধারাটিও ক্রমশ প্রত্যক্ষত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

আদি পর্যায়ে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাস আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ঈশ্বরানুসন্ধান। ঈশ্বরসন্ধানের পথিকবর্গ বিভিন্ন উপায়ে তাঁহাদের ইষ্টের পরিতুষ্টিবিধানে প্রয়াসী ছিলেন—কেহ নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে, কেহ গির্জায় সকলের জন্য প্রার্থনাগীতের মাধ্যমে, কেহ বা প্রভু যিশুর গুণগাথা প্রচারের মাধ্যমে। আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিপূরিত হইত কয়েকটি গৌণ কার্যসূচির মাধ্যমে—যথা শিক্ষাদান, সেবা, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি। ইহাও কেবল যৌথভাবে মঠজীবন যাপন শুরু হইবার পরে। ইতিহাসের গতির সহিত দৃশ্যপটও পরিবর্তিত হইল। একদিকে ধীরে ধীরে সপ্তাহে একদিন সকলে একত্রে গির্জায় প্রার্থনাতে মনোনিবেশ করিবার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরানুভূতি ও তাঁহার প্রত্যক্ষ কৃপালাভের জন্য নিবেদিতপ্রাণের সংখ্যা হ্রাস পাইল, অপরদিকে গৌণ ব্যাপারটিই মুখ্যের স্থান দখল করিয়া সন্ন্যাসিগণের অন্তরে সংসারী সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করিল।

■ **মঠে দৈনন্দিন জীবনধারা ঃ** সাধারণত রাত্রি ২টা বা ২½টায় মঠবাসী বা অন্তেবাসিগণের দৈনন্দিন জীবন শুরু হইয়া শেষ হইত সূর্যাস্তের পর। দিনের সিংহভাগ কাটিত সমবেত প্রার্থনায়। প্রার্থনার দুটি স্তর ছিল—একটি সকলের জন্য প্রার্থনা (liturgy), অপরটি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভু যিশুর নিকট প্রার্থনা। ইহার ফাঁকে ফাঁকে থাকিত সেবাকার্য। লক্ষণীয় যে, যেকোন কর্মকেই তাঁহারা 'সেবা' বলিয়া গ্রহণ করিতেন। গ্রীষ্মের দুপুরে একটি সংক্ষিপ্ত দিবানিদ্রার রীতি ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার পর সময় একটু বাড়াইয়া দেওয়া হইত।

দৈনন্দিন আহার্য ছিল প্রধানত দুধ, মধু, ডিম, মাছ, বীন, তণ্ডুলজাতীয় আরো কিছু খাদ্য। সেন্ট বেনেডিক্ট মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কালের গতিকে ধীরে ধীরে খাদ্যসংক্রান্ত নানান ছাড়পত্র (মাংসাদি) তাহারা সংবিধানভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। সারাদিনের কার্যপ্রণালীতে 'নিস্তব্ধতা রক্ষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত সকলেই বাকি সময় মৌনতা অবলম্বন করিতে বাধ্য থাকিত। সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলীর মধ্যে বলা হইয়াছে—"আলস্য সন্ন্যাসজীবনের শত্রু।" যৌথ প্রার্থনা, একান্ত প্রার্থনা, পাঠ, কায়িক শ্রম এবং সেবার একটি চমৎকার সমন্বয় তাঁহার নিয়মাবলীতে পরিলক্ষিত হয়।

সকল পুস্তক ছিল 'পার্চমেন্ট'-এ লিখিত। তাই 'জনসমক্ষে পাঠ' (public reading)-ই প্রচলিত ছিল। মঠের গ্রন্থাগারে ১,০০০ গ্রন্থ থাকিলে ঐ মঠকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইত। গ্রন্থাদির মধ্যে বাইবেল, গানের বই এবং সাধুসন্তের জীবনীই বেশি থাকিত।

সাধুদের নিজস্ব গোপনীয়তা (privacy) বলিয়া কিছু ছিল না। চার্চগুলি যদিও রাজপ্রাসাদতুল্য হইত, কিন্তু মঠবাসিগণের জন্য ছোট ছোট খুপরি ঘর থাকিত। চার্চে বহু ঘর থাকিলেও উহা ভূরি ভূরি আচার-অনুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহৃত হইত। অতিথি আসিলে তাহাদেরও স্থান হইত সাধুদের সঙ্গেই। দুটি ঘরের মধ্যে কেবল একটি বড় ছিদ্রযুক্ত দেওয়ালের পার্থক্য থাকিত। ইহার অর্থ—এই চার্চে সকলেই একই পিতার পুত্র—কোন ভেদাভেদ নাই। দেখা যায়, অ্যাবটের (অধ্যক্ষ) অনুমতি লইয়া কোন কোন ব্যাকুলহৃদয় সাধক দূরে নির্জনে একাকী

চলিয়া যাইতেন, যাহার সংখ্যা অত্যল্প। প্রত্যেক মঠে 'chapter house' নামক নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সাধু স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক সমস্যা বা অনুভূতি বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা করিতেন। এবং শেষে সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলীর একটি অধ্যায় (chapter) পাঠ হইত। এই সময়ে কেহ কাহারো সমালোচনা করিতে পারিতেন না এবং প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ নবীনদের অধ্যাত্মজীবনে অনুপ্রেরিত করিতেন। নবীন সাধুরা প্রবীণদের সহিত অত্যন্ত সম্মানের সহিত কথা বলিতেন। পরিধেয় বস্ত্রাদি, মোমবাতি, সবজি প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ নিজেরাই তৈরি করিতেন। মঠের আয়ের বৃহত্তম উৎস ছিল অতিথি-অভ্যাগতের প্রণামী। চার্চের দামি আসবাব, রত্নাদি এবং প্রণামীর দায়িত্ব 'sacrist'-এর উপর ন্যস্ত থাকিত। প্রথম প্রথম নিষ্ঠা থাকিলেও অধিকাংশ স্যাক্রিস্ট পরে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইত। ক্রমে প্রার্থনা ও পূজা সবই গৌণ হইয়া গিয়া অতিথিসৎকার ইত্যাদিই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ক্লুনিতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবন অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধা ছিল। ক্রমে মানবীয় সীমা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা হারাইয়া মঠবাসিগণ বিলাসভোগে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

■ **কর্মজীবন ঃ** খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসধর্মে কর্মের স্থান প্রার্থনার ঠিক পরেই। মঠে সকল কর্মকেই 'সেবাকর্ম' এবং চার্চসম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্মকে সাংবিধানিক কর্তব্য বলিয়াই গণ্য করা হইত। ব্রাদার লরেন্স এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ "প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য যতটা অনুভব করি, যখন তীব্র কর্মস্রোতে অবগাহন করিতাম তখন যেন তাঁহার সান্নিধ্য আরো বেশি বেশি অনুভব করিতাম।" সেন্ট পলসের জীবনে দেখা যায়, তিনি সর্বদা সকলকে নিজের কাজ নিজেই করিয়া লইতে উপদেশ দিতেন। নিজেও কখনো অন্যের সেবাগ্রহণ করিতেন না। সেন্ট বেনেডিক্ট তাঁহার নিয়মাবলী (Benedictism)-তে লিখিয়াছেন ঃ "তখনি সেই ব্যক্তি সত্যকার সন্ন্যাসী, যখন সে নিজের হাতের দ্বারা (স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া) নিজের জীবন চালাইবে—যেমন আমাদের পূর্বতন পিতৃগণ ও প্রভুর শিষ্যগণ করিতেন।"

যখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবর্গ মরুভূমিতে তিতিক্ষা-সাধনকালে ক্ষতিকারক চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় অন্বেষণে ব্যাকুল, তখনি এই 'কর্ম'-এর সূত্রপাত। পরবর্তী কালে তাঁহারা অনুভব করিলেন, কর্মের মাধ্যমেই বিনয়, মহানুভবতা, আনুগত্য, অনাসক্তি এবং হৃদয়ে পবিত্রতার স্ফুরণ হয়। যাহারা নিজেদের হীনমন্যতায় ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হইত, তাহাদের জন্য প্রবীণ সাধুরা প্রবল কর্ম ও সেবার নির্দেশ দিতেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে মঠ হইতে তাহাদের সাহায্য করা হইত।

মহান খ্রিস্ট-সন্তদের জীবনী হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, কর্মের নেতিবাচক দিকগুলিও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেন্ট বেনেডিক্ট কর্মের অত্যন্ত উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া বিচারশক্তিকে জাগ্রত করিবার উপদেশ দিয়াছেন তাঁহার নিয়মাবলী 'Regula Magister'-এ। সেখানে আরো বলা হইয়াছে ঃ "প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সাধুরা দেখিবেন নবীন সাধুদের জীবনে কর্ম এবং ঈশ্বরসাধনার একটি সুসামঞ্জস্য যেন বজায় থাকে এবং ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ঈশ্বর-সন্ধানের উপায় হিসাবেই কর্ম মঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।" অতএব লোকালয়ের বহির্দেশে মঠের অবস্থিতি, সন্ন্যাসিগণের স্বনির্ভর হইবার প্রয়াস, পাঠ, সমবেত সঙ্গীত ইত্যাদির একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মঠে এমন একটি পরিবেশ বজায় থাকিবে যে, গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সর্বদা প্রার্থনায় রত থাকিতে পারিবেন।

■ **মঠে যৌথ বসবাস ঃ** এতক্ষণে ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলী খুব সহজ ছিল না। মঠে সন্ন্যাসিগণের যৌথভাবে বসবাসের অন্যতম সুফলদায়ক দিকটি হইল, আধ্যাত্মিক পথে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা। সর্বস্তরেই পারস্পরিক একটি বোঝাপড়া সহজেই গড়িয়া উঠিত এবং দায়িত্ব ও পরিশ্রম সেকারণেই এমনভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িত যে, কোন একজনের পক্ষে কখনোই ন্যস্ত দায়িত্ব বা কাজের চাপ অধিক বলিয়া মনে হইত না।

দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক সহানুভূতি, প্রীতি, আনুগত্য এবং ক্ষমাশীলতা বৃদ্ধি এই যৌথ বসবাসের অপর এক ইতিবাচক দিক। খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীর মতে, 'obedience' বা আনুগত্য তীব্র ঈশ্বরপ্রেমেরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। কারণ, পরমপিতার প্রতি আমার প্রেম-ভক্তি নিশ্চয়ই পরমপিতা যাহা ভালবাসেন সেই কাজেই আমাকে অনুপ্রেরণা দিবে! তাই সর্বত্যাগী মঠবাসীরা মনে করিতেন, গোটা সঙ্ঘই যেন ঈশ্বরের বাণীর উদ্ঘোষণের মধ্য দিয়া সৃষ্টির সার্থকতা লাভ করে।

বৌদ্ধ সঙ্ঘে এইভাবে মঠে সন্ন্যাসিগণের যৌথ বসবাসের প্রথা যিশুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কর্মকে তাঁহারা তাঁহাদের সাধনাঙ্গের মধ্যে স্থান দেন নাই। খ্রিস্টীয় মঠে এই যৌথ বসবাসে যেন বিভিন্ন মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু মানুষের সংমিশ্রণে একটি ক্ষুদ্রকায় সমাজ সৃষ্টি হইত। এবং এই মঠ সৃষ্টির প্রথম হইতেই ঈশ্বরানুসন্ধানই ইহার মূল লক্ষ্য বলিয়া মঠের ইতিহাসে উল্লিখিত হইত। এই বৈশিষ্ট্যকে 'Koinonia' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই 'Koinonia'-র মধ্যে যেমন একদিকে রহিয়াছে প্রার্থনার তীব্রতা, অপরদিকে আছে সেবা বা কর্ম। এইপ্রকার মঠ স্থাপন করিয়া যৌথভাবে বসবাসের নির্দেশ যিশু জেরুজালেমে স্বীয় শিষ্যদের দিয়াছিলেন। সেন্ট অ্যান্টনি লিখিয়াছেন যে, এই খ্রিস্ট-সাধনা ও পারস্পরিক প্রীতি সম্পাদন সমান্তরালভাবে মঠে চলিবে। এইভাবে মন হইতে পরের দোষদর্শন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইবে। এবং মঠজীবনে ইহাই আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ❑

স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের তিনটি পত্র



।।১।।

শ্রীশ্রীজীউ ভরসা

রবিবার

Etoh [এটোয়া]*

পরম স্নেহভাজন ভাই হরিমোহন,

তোমার প্রেরিত সন্দেশ গতকল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছে। উহা হরিপ্রসন্নবাবু খাইয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তোমায় Thousands of hearty thanks লিখিতে কহিলেন। তোমার স্বভাব যেমন মধুর ও মোলায়ম, ঐ দ্রব্যগুলিও তদনুরূপ। আমরাও উহা ভক্ষণ করিয়াছি। ফুরাইবার ভয়ে হরিবাবু বেশী বেশী খাইতে চাহেন না। আমাদের রাখাল, যোগেন কোথায় আছে? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও যে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী মহোৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতা আসিবেন কিনা? তুমি এইটি জানিয়া সত্বর এখানে সংবাদ দিও। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভায়া আসিতেছেন, বোধহয় আমরাও যাইতে পারি। খগেন ও সুশীল সেই ৺বৃন্দাবনে আছে। আমরা ভাল আছি। তোমার কুশল লিখিয়া সুখি করিও। ইতি

নিবেদক

শ্রীপ্রেমানন্দ



।।২।।

Ramkrishna Advaita Ashram
Khajanchi Garden, Luksha
Benaras City
The 1st July 1903

My dear Harimohun

অনেকদিন তোমার খপরাদি লই নাই। এখন কি কোচ্চো? বিষয়াদির গোলমাল সব মিটে গেছে ত? তুমি আমাদের অদ্বৈত আশ্রমের কিছুই কখন দাও নাই, এখানে সুন্দর কায হচ্চে গুরুদেবের ইচ্ছায়। হেমবাবুও কতকটা দেখিয়া গিয়াছেন। তুমি ও তোমার সহৃদয় বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা গুরুদেবের কার্য্যে সহানুভূতি করেন, সকলকে বলিয়া এ আশ্রমের জন্য মধ্যে২ সাহায্য পাঠাইও। এই রূপেই ভগবানের কার্য্য হয়। আমাদের তিনি সন্ন্যাসী করেচেন, আমাদের যা কায আমরা কচ্চি। তোমাদের তিনি সংসারে ধন ঐশ্বর্য্যের ভিতর রেখেছেন, অতএব তোমাদের কার্য্য তোমরা কর অর্থাৎ ধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁর কায কর। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

পুঃ তোমার ঠিকানা না জানায় হেমবাবুর care-এ পত্র দিলাম।

Yours affly

Shivananda



।।৩।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

THE RAMKRISHNA MISSION
Laksha, Benaras City
15th Dec., 1919.

শ্রীমান হারু

যোগীন্দ্রের ১০।১২ তারিখের দুইখানি পোষ্টকার্ড এবং তোমার একখানি পত্র পাইলাম। তোমার শরীর-মন দুর্ব্বল হইয়াছে বলিয়াই প্রবোধ চৌধুরীর হস্তে কার্য্যভার দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছ। নতুবা শ্যামাচরণের ও মঠের উপর যে অতদূর শত্রুতাচরণ করিয়াছে, তাহার হাতে কার্য্যভার দিবার কথা তোমার মনে কখনই উঠিত না। ঐরূপ করা অপেক্ষা সেবাশ্রম উঠাইয়া আমাদের চলিয়া আসা ভাল।

যাহা হউক এতদূর কষ্ট সহিয়াছ, আর কিছুদিন তোমরা কষ্ট করিয়া থাক। জানুয়ারী মাসেই নূতন কমিটি গঠন করিয়া কার্য্যভার ঐ কমিটির হাতে দিয়া তোমরা অবসর লইও। আমি ডিসেম্বরের শেষে এখান হইতে ফিরিয়া ঐ বিষয় যত শীঘ্র পারি করিয়া দিব। সকলকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিতেছি।

যোগীন, শ্যামাচরণ, সাতু এবং তুমি—সকলে আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

---

* এই পত্রের পিছনে বাগবাজার ডাকঘরের যে-স্ট্যাম্প রয়েছে, তাতে '6 JA 97' (6 January 1897) তারিখ উল্লিখিত আছে।—**সম্পাদক**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সন্ন্যাসযোগ

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০।।

শ্লোকার্থ ঃ *মোহশূন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রিয় বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল কিংবা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না। কারণ, নির্দোষ ব্রহ্মই সর্বভূতে এক আত্মরূপে বিরাজিত—এই স্থিরবুদ্ধিতে তিনি সকল মোহের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত।*

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হইলে কেবল সর্বত্র ব্রহ্মকেই বোধ হয়; পূর্বে যেসব বস্তুতে রাগদ্বেষ হইত, তাহা না হওয়ায় তিনি কখনো মোহগ্রস্ত হন না। তাঁহার বুদ্ধি সর্বদাই ব্রহ্মের ন্যায় অচঞ্চল স্থির থাকে। কাজেই সাধারণ লোকের মতো প্রিয়, অপ্রিয় বস্তুতে রাগদ্বেষ তাঁহার মোটেই থাকে না।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১।।

শ্লোকার্থ ঃ *বাহ্যবিষয়ে (শব্দ-স্পর্শাদি) ব্রহ্মবিদ্ অনাসক্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজ প্রত্যাগাত্মায় বাহ্যবিষয়-নিরপেক্ষ শাশ্বত সুখ অনুভব করেন এবং অক্ষয় ব্রহ্মে স্থিত হন।*

ব্যাখ্যা ঃ বহির্জগৎ অনুভব করিবার জন্যই জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ নির্মাণ করেন। স্থূলদেহে বিষয়ের সংযোগ হয়, সূক্ষ্মদেহে তাহা ভোগোপযোগী করিয়া সাজানো হয়। জীবাত্মা যতদিন এই বিষয় ভোগ নিয়া আনন্দ করিতে ব্যস্ত থাকেন, ততদিন নিজের চিৎসত্তা ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। ব্যাট-বল খেলিবার জন্য যে ব্যস্ত, সে ঘরের ভিতর গানের জলসায় যোগদান করিতে পারে না। ঠিক সেইরূপ বহির্বিষয়ের সংস্রব ত্যাগ না করিলে অন্তর্জগতের সুখশান্তিলাভ হয় না। আগে খেলার চিন্তা ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে হইবে, তারপর সঙ্গীতের মাধুর্য, সৌকর্য বুঝা যাইবে। বাহ্যজগৎ অনুভব হইতে চলিয়া গেলে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না, বরং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হওয়াতে একটা স্বস্তিলাভ হয়। আর সেইভাবে অবস্থিত না হইলে ধ্যান হয় না এবং ধ্যান না করিলে আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না। সেইজন্য নিষ্কাম কর্ম করিয়া যোগারূঢ় হইবার জন্য গীতায় বারবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যোগারূঢ় ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে অক্ষয় শান্তিলাভ করিতে পারে।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২।

শ্লোকার্থ ঃ *হে কৌন্তেয়, বিষয়স্পর্শজনিত সুখ আসলে দুঃখেরই কারণ। তাহা ব্যতীত এই সুখের আদি আছে, অন্ত আছে, অতএব ক্ষণিক। জ্ঞানী ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়জ সুখে কদাপি প্রীতিলাভ করেন না।*

ব্যাখ্যা ঃ ভোগের বস্তু কখনো স্থায়ী হইতে পারে না—মান, রূপ, যৌবন প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য মানুষকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হয়; যেমন একটা দামি কলম টেবিলের উপর রাখিলে বারবার শঙ্কা হয়—এই বুঝি চুরি হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত, ভোগের শক্তি যত বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাবের কষ্ট বাড়িয়া যাইবে। যাহারা ভাল গান বুঝিতে পারে, অনেক স্থলেই গান তাহার পীড়াদায়ক হয়। কারণ, সংসারে ভাল গায়কের অত্যন্ত অভাব। তাই ভোগে কখনো শান্তি হয় না। সেইজন্য জ্ঞানিগণ বিষয়ভোগ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। নাগ মহাশয়কে একজন একদিন পাতে লবণ দিতে যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, খাদ্যবস্তুতে লবণ দিলে ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে। চৈতন্যদেবের ঘরে পিঁপড়ে দেখায় জনৈক সাধু সন্দেহ করেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও চিনি খান। সেইজন্য গৌরাঙ্গদেব ভক্তের আনীত অনেক সুখাদ্য খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

[**মন্তব্য ঃ** স্বামীজী বলিতেন, সুখ আসে দুঃখের মুকুট পরিয়া, মানুষ বদনটুকুই দেখে, মুকুট দেখিতে পায় না।—**সম্পাদক**]

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *এই শরীরেই যিনি মৃত্যু অবধি কাম বা ক্রোধের বেগ ধারণ করিতে (সংযত করিতে) পারেন—তিনিই প্রকৃত যোগী, প্রকৃত সুখী।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের দেহ-মন একটি যন্ত্রমাত্র। যেভাবে রাখিলে যন্ত্রের ক্রিয়া যেরূপ হয়, যন্ত্রটি চালু রাখিতে সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে হইতে হইবে; অর্থাৎ যন্ত্রটিকে সাবধানে না রাখিলে ঘটনাচক্রে তাহার দ্বারা কোন অনিষ্টজনক ক্রিয়া হইয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ যন্ত্রের ক্রিয়া নিজ কর্তৃত্বাধীনে না রাখিলে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইতে পারে না। বুদ্ধি যোগস্থ হইলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে, এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত সুখী হয়। দুর্বার ইন্দ্রিয়লালসায় ভোগের পশ্চাতে ঘুরিলে মানুষ কখনো সুখী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে চায়—তাহাকে ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাইতে হইবেই হইবে এবং একবার ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয় তাহার বশীভূত হইবে। মাঝি ঝড়ের মুখে মেহনত করিয়া নৌকা বাঁচাইয়া চলে, পরে শুধু হাল ধরিয়া থাকে।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।।২৪।।

শ্লোকার্থ ঃ *যিনি বাহ্যবিষয় ছাড়িয়া আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, যিনি অন্তর্জ্যোতি এবং ব্রহ্মভূত —তিনি ইহজীবনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যা ঃ যাঁহার মন প্রত্যগ্‌ আত্মার সামান্য আভাস অনুভব করে; তাঁহার বুদ্ধি বিবেকে (তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি) পরিণত হয়। তখন তিনি জগতের সমস্ত বস্তুকেই দুঃখজনক বলিয়া বোধ করেন এবং নিজের ভিতরেই প্রকৃত আনন্দ আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সগুণ ঈশ্বরের নানাপ্রকার রূপ, লীলা, সমষ্টি-স্বরূপ ঈশ্বরের অদ্ভুত ঐশ্বর্য এবং নির্গুণ ব্রহ্মের অসীম মাহাত্ম্য বিষয়ে চিন্তা করিয়া আনন্দলাভ করেন। বাহ্যজগতের কোন বস্তুই তাহার কাছে সুখপ্রদ বোধ হয় না। যোগী এই জগতের সর্বত্রই অজ্ঞানের খেলা দেখিতে পান; সংসারের সহস্রপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে তিনি অজ্ঞানই দেখিতে পান। তাঁহার আত্মাতেই জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পান (জ্যোতি—উদ্ভাসিত শক্তি, "তস্যাং জাগর্তি সংযমী")। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া যোগী নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ করেন এবং তিনিই যে পূর্ণ ব্রহ্ম, তাহা তখন বোধ করেন। তাঁহার আর অন্য স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। ইহাই শাস্ত্রে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥২৫॥

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছেন, শ্রবণ-মনন দ্বারা সংশয়রহিত হইয়াছেন, নিদিধ্যাসন (বা ধ্যান) দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, যিনি সকল জীবের কল্যাণে নিরত—সেই সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ ইহজীবনে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ যোগীরা ধ্যান করিতে করিতে যখন সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তখন তাঁহাদিগকে বলি 'ঋষি'। ইঁহাদের মনে বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। তাই তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্মল (ক্ষীণকল্মষাঃ)। লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্মকেই জগদ্রূপে দেখিয়াছেন, সেই ব্রহ্মই আছেন, জগৎ বলিয়া কিছুই নাই—এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা হয়; বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না (ছিন্নদ্বৈধা)। এইরূপ মহাপুরুষের দেহ, মন, বুদ্ধি তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে থাকে (যতাত্মনঃ)। তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্যে কেবলই পরের উপকারজনক বৃত্তিই উপস্থিত হয়। কোন কারণেই তাঁহাদের কাহাকেও পরবোধ হয় না। এমনকি তাঁহাদের শুধু জীবনধারণেই সর্বভূতের হিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে হিতজনক কর্ম করিয়া বেড়াইবেন, তাহা নহে; শুধু পৃথিবীতে অবস্থানের মাধ্যমেই তাঁহাদের শরীর-মনের পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করে। হাসপাতাল ডিস্পেনসারি করিয়া তাঁহাদের সর্বভূতের হিত করিতে হয় না। তাঁহাদের দেহ-বুদ্ধিতে এমন এক পবিত্রতার প্রকাশ হয়, যাহার ফলে চতুর্দিকে সকল মানুষ উপকৃত হয়। তাঁহাদের পবিত্র চিন্তারাশি গগনমণ্ডলে ধাবিত হইয়া সর্বজীবের, বিশেষত যাহারা পবিত্র, তাহাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এবং তদ্দ্বারা শুভচিন্তার উদ্রেক হয়। Micro বা Radio wave যেভাবে কাজ করে, ঠিক সেইভাবে শক্তিশালী চিন্তাতরঙ্গও ক্রিয়া করিয়া থাকে।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌॥২৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *কাম-ক্রোধ হইতে মুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর উভয়ত ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে। তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন। মৃত্যুর পর আর দেহধারণ করেন না।*

ব্যাখ্যা ঃ রাগদ্বেষ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাস (যতি) অবস্থা উপস্থিত হয়। যখন দেহ-মনের কোথাও কোন প্রয়োজনবোধ থাকে না অর্থাৎ মন-বুদ্ধি যখন সংযত হইয়াছে (যতচেতসাম্‌), তখন দেহ থাকিতেই পূর্ণজ্ঞান উপস্থিত হয়। কারণ, আমরা স্বরূপত পূর্ণজ্ঞানী। দেহত্যাগ হইলেও এই জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় না। অতএব প্রথম পর্যায়ে রাগদ্বেষ হইতে মুক্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্ন্যাসী। তৃতীয় পর্যায়ে সেই অবস্থায় অনেকদিন অবস্থান করিতে পারিলে (যতচেতসাম্‌) মন শান্ত হয় এবং ধ্যানে মন বসে। তখন মন কোনভাবেই চঞ্চল হয় না। চতুর্থ পর্যায়ে আত্মানুভূতি-ব্রহ্মনির্বাণ লাভ। আর এই অবস্থা একবার হইলে তাহা কখনো বিনষ্ট হয় না।

স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥

শ্লোকার্থ ঃ *মন হইতে বাহ্যবিষয় বাহির করিয়া, দৃষ্টিকে ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করিয়া, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান (রোধ) করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-শূন্য হইয়া যে-মুনি সর্বদা বিরাজ করেন—তিনি জীবন্মুক্তই হন।*

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥২৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *কর্তা ও দেবতা-রূপে আমি (শ্রীভগবান)-ই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর, সকলের সুহৃৎ (প্রত্যুপকারের আশা করেন না—এরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী); এইপ্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মারূপে জানিয়া যোগী শান্তিলাভ করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ সাধক বহু জন্ম ধরিয়া অনেকপ্রকার যাগযজ্ঞ, তপস্যা করিয়া চিত্তশুদ্ধি করেন। তাঁহাকে শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে থাকিয়া চিত্তকে শান্ত রাখিতে হয়। এই জগতে কাহাকেও নানাপ্রকার দুঃখ এবং কাহাকেও বা বহুপ্রকারের সুখভোগ করিতে দেখা যায়। জ্ঞানী দেখেন, জগতে মানুষ যতপ্রকার পূজা-অর্চা কিংবা সাধন তপস্যা করে, যেন ব্রহ্মই সাধকরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞাদির সাধনানন্দ সম্ভোগ করেন। এই জগতে ভাল-মন্দ সকল লোকেরই নিয়ন্তা তিনি। ব্রহ্ম সর্বভূতের ভিতর থাকিয়া সকলকেই চালাইতেছেন (সর্বলোকমহেশ্বর)। মানুষ সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ কার্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া জীবনের অভিজ্ঞতালাভ করে, যাহার ফলে তাহার তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা হয়। ভগবান কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন—এই ভাবিয়া অজ্ঞানীরা ভগবানের উপর দোষারোপ করেন। কিন্তু সকলের সুহৃৎ তিনি; যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহার জন্য তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই তিন বিষয়ে ভগবানের অপার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানিগণ শান্তিলাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

[ক্রমশ]॥ পঁচিশ।

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**



পৌষ ১৩১১
ডিসেম্বর ১৯০৪

নূতন জাপান

স্বামী সদানন্দ

...৭ই জুলাই কলিকাতা হ'তে রওনা হয়ে ৫ই আগষ্ট প্রায় একমাসে আমরা জাপানের রাজধানী টোকিও পৌঁছুলুম। পিতলের চাক্তি দেখাবামাত্র কুলিরা আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে একটী কুরুমা (ঝিনরিক্সর জাপানি নাম) বোঝাই করে দিলে। কুরুমাওলাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে একজন চৌকিদারের নিকট পথ জেনে নিতে বল্লুম। জাপানি পুলিস কি দেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সহায়স্বরূপ। তাহারা যেরূপ দেশের শান্তিরক্ষক, তদ্রূপ বিপন্ন ব্যক্তিরও যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে। যদি কোন জাপানি ভাষা-অনভিজ্ঞ বিদেশী লোক বিপদে পড়ে, রাস্তা থেকে টেলিফোঁ করে দ্বিভাষী আনিয়ে পুলিস তার তদন্ত করে থাকে। জাপান দেখে আমার প্রথম শিক্ষা এই—সেখানে সম্রাট্ থেকে সামান্য পুলিস পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি জ্ঞান করে। প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তারা—তারা প্রজারক্ষক, যথার্থই "আপদ্রাতা"। আর এদেশের জজ, মাজিষ্টর, মিউনিসিপালিটি, পুলিস, কেরানিবাবু পর্য্যন্ত দেশের রাজশক্তির প্রতিনিধি—সকলেই সরকারের চাকর; ভারতের প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ। পুলিসের লোক বাড়ি এলেই আমরা যম উপস্থিত মনে করি; সর্ব্বস্বান্ত হলেও লোকে পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় না। ষোল আনা টেক্স দিয়েও প্রজাকুল মিউনিসিপালিটির নিকট জোড়হস্ত। সকল অবস্থাতেই আমাদের "নায়ের কড়ি দিয়ে ডুবে পার।"

টোকিওতে আমরা যেখানে বাসা ভাড়া কল্লুম, তাহার অতি নিকটেই জাপানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (Tokio Imperial University)। যেসকল শক্তির সম্মিলনে নূতন জাপানের অভ্যুদয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রধান। পূর্ব্বে এদেশের চতুষ্পাঠীতে যেমন সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শনাদির চর্চ্চা হ'ত ও ব্রাহ্মণবর্ণের ভিতর সেইসকল বিদ্যা আবদ্ধ ছিল—জাপানেও সেইরূপ চীন সাহিত্যের ও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর ও অনুশীলন হ'ত। রাজা ও জমিদারদিগের সভাতেই বিদ্বজ্জনেরা আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। লেখাপড়া প্রধানতঃ বুদ্ধ শ্রমণদের হাতে ছিল। যখন কোন শাসনকর্ত্তা (সোগুণ) বিদ্যানুরাগী হ'তেন, তিনি গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করতেন কিন্তু এদেশের মত জাপানেও উচ্চবর্ণ ভিন্ন দেবভাষার অধিকারী কেহ ছিল না। ভারতের ন্যায় জাপানের অদৃষ্ট আকাশে যতদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার উদয় না হয়েছিল, ততদিন জাপান আপনার প্রাচীন পদ্ধতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প বজায় রেখে সুখে দুঃখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছিল, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মার্কিন নৌসেনাপতি কমোডর পেরির (Commodore Perry) জঙ্গি জাহাজ থেকে জাপানের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য রণভেরি নির্ঘোষিত হ'ল, জাপানের জনকতক সূক্ষ্মদর্শী লোক স্থির বুঝলেন, এ প্রতিদ্বন্দ্বী বিমুখ করতে তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষা, কৌশল অক্ষম। অজেয় মার্কিন কামানের পশ্চাতে এক নূতন জ্ঞানবল বর্ত্তমান। যদি এই জাতীয় জীবন-মরণ বিপদ্ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, যদি জাপান নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায়, তা হ'লে এই নূতন বিজ্ঞানবল সহায় করতে হবে, নচেৎ নয়। জাপান বুঝলে, যদি তার চিরাগত স্বাধীনতা একবার নষ্ট হয়, তবে তার ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহলোক পরলোক চিরদিনের জন্য সাগরের অতলজলে নিমজ্জিত হবে। এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ মহাশক্তির আরাধনায় জাপান প্রাণমন উৎসর্গ করলে। জাপান নিজের সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা, আচারাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; বিদেশীয় আহার, বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় সমাজ, বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নয়, যদি জাপান মহাদেবীপ্রসাদে দুইসহস্র বৎসরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। জাপানের মহা সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, আজ জগৎ তাহার সাক্ষী। নূতন জাপানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন শিক্ষা জাপানে প্রবর্ত্তিত হ'ল। ১৮৭২ সালে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়ে রাজ আজ্ঞায় দেশ-মধ্যে প্রচারিত হ'ল। সম্রাট ঘোষণা করলেন—"কি রাজশাসনসম্বন্ধীয় কার্য্য, শিল্পবাণিজ্য, কি কৃষিকর্ম্ম, কি শিল্প চিকিৎসা—যেকোন বৃত্তি হউক না, সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষা। অদ্যাবধি শিক্ষাপ্রণালী এরূপ বিস্তারিত হবে যে, কোন গ্রামে একটীও অজ্ঞ পরিবার অবস্থান করবে না, কোন পরিবারে একটীমাত্র লোকও মূর্খ থাকবে না।" জাপানের অদৃষ্টচক্রে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের হাতে তার শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁরই পুণ্যে জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না।...

প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা

তপনকুমার ঘোষ

॥ ১ ॥

'আধুনিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বর্তমানকালীন' বা 'সাম্প্রতিক' এবং 'আধুনিকতা' হলো 'বর্তমানকালীনতা' বা 'সাম্প্রতিকতা'। এই অর্থে আধুনিক সকলেই, কারণ প্রত্যেকে তো নিজ নিজ কালেই স্থিত। আক্ষরিক বিচারে যেকোন সময়ের বেশির ভাগ মানুষই সেই বিশেষ কালের বিচারে অবশ্যই আধুনিক।

বলা বাহুল্য, আধুনিকতার এই সংজ্ঞায় মন ভরে না, কারণ এ তো নেহাতই প্রতিশব্দের সন্ধান। আধুনিকতার একটি ব্যাপকতর দ্যোতনা আছে—এটি একটি বিশেষ মানসিকতা ও জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। এই ধারণাটির ব্যবহার সর্বপ্রথম দেখা যায় রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপে। কাজেই, আধুনিকতা নিঃসন্দেহে একটি পশ্চিমী ধারণা। মধ্যযুগের ইউরোপে প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতি ও দর্শনের অনুপ্রেরণায় কলা ও সাহিত্যে যে নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছিল—তাকেই সকলে 'আধুনিক' শিরোনামে ভূষিত করেন। পুরাতনকে নতুন চোখে দেখা এবং নব আঙ্গিকে উপস্থাপনাতেই এই আধুনিকতার উদ্ভব।



পশ্চিমী আধুনিকতার কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা কিন্তু পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক আবু সইদ আইয়ুব 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, আধুনিকতার কোন সংজ্ঞা গ্রন্থটিতে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি, কেননা সেরকম কোন সংজ্ঞা হয়ই না। সংজ্ঞা নিয়ে এই সমস্যা থেকেই যায়, কেননা আধুনিকতার ধারণা সদা গতিশীল। সর্বজনস্বীকৃত একটি সংজ্ঞা না পেলেও আধুনিকতার মোটামুটি একটি অবয়ব আমরা মনে মনে অবশ্যই তৈরি করে নিতে পারি। সেই অবয়বে বাইরের থেকে ভিতরের গুরুত্ব বেশি। আধুনিকতা একটি বিশেষ জীবনদৃষ্টি—একটি বিশেষ মনোভঙ্গি, যুক্তির নিরিখে সমস্ত কিছু বিচার করে দেখা, একটি স্বতন্ত্র বিশ্লেষণী ধারা। যার মধ্যে এসমস্ত উপস্থিত, সে-ই আধুনিক। বেশভূষা, চালচলন, আদবকায়দা ইত্যাদি বহিরঙ্গ বিচারে কেউ যথেষ্ট একালের হলেও মানসিকতায় মান্ধাতার আমলে পড়ে থাকতে পারে। আবার উলটোটাও সম্ভব। কাজেই কোন কালের সীমারেখায় আধুনিকতাকে বাঁধা মুশকিল।

ইউরোপ ভূখণ্ডে জাত এই আধুনিকতার ব্যাখ্যা নানা জনে আবার নানাভাবে দিলেন। মার্ক্স বললেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণই চূড়ান্ত আধুনিকতা। ফ্রয়েডের মতে, প্রবৃত্তিচালিত অবচেতনার উন্মোচনেই প্রকৃত আধুনিকতা। ম্যাথু আর্নল্ডের কাছে আধুনিকতার যথার্থ প্রতিফলন হলো 'বৌদ্ধিক মুক্তি' বা 'intellectual deliverance'-এ।

ভারতীয় দর্শন কেবল বৌদ্ধিক নয়—আত্মিক মুক্তির কথা বলে। পরমাত্মার সন্ধানে জীবাত্মার অভিসার এবং অন্তিমে উভয়ের মিলনে এই আত্মিক মুক্তি আসে। এজন্য দরকার ষড়্‌রিপুর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা। উনিশ শতকের নবজাগরণের পথে আধুনিকতার যে-ধারাটি আমাদের দেশে প্রবাহিত হলো—দেখা গেল, কেবল ঐহিক ও বৌদ্ধিক মুক্তিকে অতিক্রম করে তা সার্বিক মুক্তিরই অভিমুখী।

পাশ্চাত্য-প্রভাবিত হলেও ভারতীয় নবজাগরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার একটি সার্থক সমন্বয়। এই নবজাগরণ আধুনিকতার যে-ভূমিতে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে—সেখানে পূর্বযুগ, নবযুগ ও চিরযুগের এক অনন্য সহাবস্থান। আধ্যাত্মিকতার পবিত্র স্পর্শে আমাদের দেশে আধুনিকতা এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গেল। এই ভারতীয় আধুনিকতার একটি সুন্দর ছবি আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রার্থনা' কবিতায়। কবি সেখানে 'ভয়শূন্য চিত্ত', 'মুক্ত জ্ঞান', 'অখণ্ড বসুধা'র কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন 'হৃদয়ের উৎসমুখ হতে' উচ্ছ্বসিত বাক্যের কথা, 'নির্বারিত স্রোতে' দিকে দিকে প্রবাহিত কর্মধারার কথা, 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' থেকে বিযুক্ত বিশুদ্ধ বিচারের কথা। এসমস্তই পশ্চিমী আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। কিন্তু প্রাচ্যচেতনার প্রাণস্পর্শ মেলে সেই বিখ্যাত ছত্রগুলিতে—যেখানে তিনি বলছেন ঃ "নিত্য যেথা/ তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা।" বলছেন ঃ "ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত" ইত্যাদি।

ভারতীয় আধুনিকতার ধারণা অতএব তৈরি হয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মনীষা ও প্রচেষ্টায়। আধুনিকতার শিশুবৃক্ষটিকে হয়তো বিদেশ থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এদেশের আঙিনায়—সেটি কিন্তু পরিপুষ্ট হয়েছে এদেশেরই জল, মাটি আর বাতাসে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতা তাই কোনভাবেই পাশ্চাত্যের নবজাগরণোত্তর আধুনিকতার 'ফটোকপি' হয়নি।

সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যা থাকলেও আধুনিকতার কিছু কৌল বৈশিষ্ট্যকে আমরা অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। এইসব বৈশিষ্ট্যের নিক্তিতেই আমরা বিচার করতে পারি—কোন বিশেষ চরিত্র আধুনিক কিনা। চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের সবগুলি একত্রে পাওয়া নাও যেতে পারে। কোন মানুষের চরিত্রে এর বেশির ভাগ উপস্থিত থাকলেই আমরা তাঁকে আধুনিক হিসাবে চিহ্নিত করব।

আধুনিকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য 'মানবতা'। মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে সর্বশক্তির আধার বিবেচনা করাতেই আধুনিকতার প্রাথমিক প্রকাশ। মরমি কবি যেমন বলেছেন ঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র কথা। এখানে অবশ্য মানবতা থেকে দেবত্বে উত্তরণ—পাশ্চাত্য আধুনিকতার ধারণা যার নাগাল পায়

না। আধুনিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বচেতনা। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা যায়, একজন মানুষ শুধু আপন দেশ ও কালের গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁর কাছে যথার্থই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। আধুনিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আত্ম-উত্তরণ—আপন গণ্ডিকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করা—বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া। একজন আধুনিক মানুষ স্তরে স্তরে আপন আবরণ উন্মোচন করে পরিপূর্ণতার দিকে সতত ধাবমান। যুক্তিবাদ ও অন্ধসংস্কারের বিরোধিতা আধুনিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমী আধুনিকতার এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং পশ্চিমী সংস্কার আন্দোলন প্রধানত যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করেই রূপায়িত হয়েছিল। আধুনিক যিনি হবেন, তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে সমস্ত যাচাই করবেন—অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা কদাপি পরিচালিত হবেন না। আধুনিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। চারিত্রিক দুর্বলতা আধুনিকতার পরিপন্থী—প্রকৃত অর্থে আধুনিক যিনি, তিনি আপন বিশ্বাসে সর্বাবস্থায় অটল থাকবেন। আধুনিকতার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য—জীবনরস-রসিকতা। আধুনিক মানুষ জীবনকে ভালবাসেন, বিচিত্রতর বর্ণময় জীবনকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করার জন্য সচেষ্ট হন। জীবনের অজস্র বন্ধনকে স্বীকার করে, জীবনের তরঙ্গভঙ্গে নিরন্তর আন্দোলিত হয়ে আধুনিক মানুষ জীবনকে আস্বাদন করেন। এই তালিকায় আধুনিকতার সপ্তম তথা শেষ বৈশিষ্ট্য হলো—স্বাধিকার চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। আধুনিক মানুষ নিজে স্বাধীনচেতা এবং একই সঙ্গে সে অপরের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

॥২॥

ভূমিকা একটু দীর্ঘতর হলো হয়তো, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করতে গেলে এই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, বলাই বাহুল্য, নির্বাচিত কৌল লক্ষণগুলি পাশ্চাত্য ভাবনাপ্রসূত। অনেক সময়েই মনে হবে, আলোচ্য মানদণ্ডগুলি মায়ের অলোকসামান্য চরিত্র বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ত। মনে হবে, জগজ্জননীর স্মরণ এবং মননে তিনি আধুনিক ছিলেন কিনা বা কতখানি আধুনিক ছিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক; তাঁর চিরন্তনী জননীসত্তাকে কোন কালের বন্ধনে বাঁধা যায় না। এসমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করব।

প্রথমেই আসে মানবতার প্রসঙ্গ। যে মহান সাধকের উত্তরাধিকার মা বহন করেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার মহত্তম পূজারী। অপরের মধ্যে আত্মদর্শনের প্রয়াসকে তিনি বহুগুণে উন্নীত করে সর্বজীবে ঈশ্বরভাবনার কথা বলেন। ''শিবজ্ঞানে জীবসেবা''র মহামন্ত্র তিনি জগদ্বাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রের প্রচারে জীবনপাত করেন তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। মায়ের জীবনেও আমরা মানবতার প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গ রয়েছে অনেক। মায়ের জীবনীর সতর্ক পাঠকমাত্রই জানেন, অজস্র ঘটনায় মানবতার মহত্তম উল্লাস সেখানে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। সেখানে মানুষের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কর্ম—সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো জেগে আছে একটি পবিত্র পরিচিতি—সে-পরিচয় সন্তানের পরিচয়। জীবকে শিবজ্ঞান করতে বললেন ঠাকুর। কিন্তু একজন মায়ের কাছে 'শিব' তো অনেক দূরের সাধ্য—তাঁর কাছে সন্তানই প্রিয়তম এবং সত্যতম পরিচয়। সমস্ত বিশ্বসংসারের সকল সন্তানকে আপন অপত্যের অদৃশ্য ডোরে বেঁধে যে-মানবতার পূজা করেছেন মা—কোন পাশ্চাত্য মানদণ্ডে তাকে মাপা যাবে না। মায়ের এই সমত্বের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে এমনকি অনেক মনুষ্যেতর প্রাণীও। ''তুমি কি সকলেরই মা?... এইসব ইতর জীবজন্তুরও?''—এই প্রশ্নের জবাবে মায়ের প্রত্যয়ঋদ্ধ উত্তর স্মরণীয়—''হ্যাঁ, ওদেরও।''

মানবতার এই অনুভবই প্রসারিত হয়ে বিশ্বচেতনায় পর্যবসিত হয়েছে। মাতৃত্বকে দেশকালের গণ্ডিতে কখনোই বেঁধে রাখা যায় না। একাক্ষর 'মা' মন্ত্রে জগৎসংসারের সকল ভেদাভেদ ঘুচে যায়। মায়ের মধ্যে ছিল এক উদার প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি—যার সহায়ে তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কাছে টেনে নিয়েছেন, জগৎকে আপন করে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। অন্তিম বাণী উৎসারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে : ''কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'' কথার কথা নয়, মা তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এই বাণীর প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন। পরাধীন দেশে ইংরেজ সরকারের অকথ্য অত্যাচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এক বিপ্লবী সন্তান যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন : ''মা, তুমি একবারটি মুখ দিয়ে বল 'ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক।' '' তখন তিনি বলেছিলেন : ''ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি, সকলের কল্যাণ হোক।'' তাঁর সর্বপ্লাবী মাতৃত্বের কাছে 'স্বদেশি-বিদেশি' ভেদ নেহাতই তুচ্ছ। তিনি নির্দ্বিধায় তাই বলতে পারেন : ''সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে।''

এমন কথা মুখে বলা যতটা সহজ, কাজে দেখানো কিন্তু ততটা সহজসাধ্য নয়। প্রিয় সন্তান নরেন্দ্রনাথকে আমেরিকা-যাত্রার অনুমোদন দিয়েই যেন মা তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম প্রমাণ দিলেন। সেই যুগে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে সাগরপাড়ি দেওয়া রীতিমতো অপরাধ ছিল। মা নির্দ্বিধায় সেই অনুমতি দিলেন। সাগরপার থেকে এলেন স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তেরা। এলেন নিবেদিতা, ওলি বুল, ম্যাকলাউড প্রমুখ শিষ্যারা। 'সকলের মা' আর কথার কথা রইল না। এবার বাস্তব প্রমাণ দেওয়ার লগ্ন। ভিনদেশের এই কন্যাদের মা পরম সমাদরে আপন করে নিলেন। এমনকি তাঁদের সঙ্গে একত্রে আহারাদি! এই ঘটনা স্বামীজীকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। পাশ্চাত্য ভক্তমহিলাদের কাছেও ব্যাপারটা কম বিস্ময়কর ছিল না। পরবর্তী কালে সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে (১৭ মার্চ ১৮৯৮) নিবেদিতা 'Day of days' বলে চিহ্নিত করেছেন। হিন্দু রীতিনীতি শেখাবার জন্য তিনি কিছুকাল নিবেদিতাকে স্বগৃহে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে একদিন খ্রিস্টান বিবাহপদ্ধতি নিয়ে মায়ের আলোচনা চলছিল। সেই উপলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহশপথ শ্রবণে মায়ের মধ্যে ভাবোদয় হয়। যে-

স্বতঃস্ফূর্ততায় তিনি খ্রিস্টান বিবাহপদ্ধতির প্রশংসা করেন—নিঃসন্দেহে তা তাঁর বিশ্বচেতনার অভ্রান্ত প্রমাণ। ইস্টার দিবসে নিবেদিতার মুখে খ্রিস্টান ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করে তিনি গভীর আনন্দ পেয়েছিলেন। খ্রিস্ট সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। জগতের মুক্তির জন্য যিশুখ্রিস্টের আত্মত্যাগের ঘটনাটি তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। একইসঙ্গে, খ্রিস্টের নিঃশর্ত ক্ষমার কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সুদূর আমেরিকার গির্জায় প্রার্থনা করতে গিয়ে নিবেদিতা যখন যিশুমাতা মেরির কথা ভাবতে ভাবতে মানসচক্ষে মাকে দেখতে পান, তখন আমাদেরও প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়—জয়রামবাটীর সারদাদেবী এক বৃহত্তর বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাসিতা হয়ে উঠেছেন আপন মহিমার সবখানি উজ্জ্বলতা নিয়ে।

আত্ম-উত্তরণকে আমরা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করেছি। এই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মা আধুনিকোত্তমা। এক অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা থেকে 'জ্ঞানদায়িনী', 'সঙ্ঘজননী' তথা 'বিশ্বজননী'র ভূমিকায় তাঁর উত্তরণ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। এই উত্তরণ আদৌ অনায়াসসাধ্য ছিল না। তাঁকে নিরন্তর সাঁতার কাটতে হয়েছে বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে। তাঁর জীবনের ঘটনাপরম্পরা পর্যবেক্ষণ করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে নহবতের খাঁচায়, ঠাকুরের অসুস্থতার সময়ে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে এবং ঠাকুরের তিরোধানের পর জীবনের নানা পর্বে যে-প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছিল—আমাদের জাগতিক ভাবনায় তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যেন একের পর এক গণ্ডি অতিক্রম করে মহত্ত্বের শীর্ষে নিজেকে উন্নীত করলেন। এই যে নিজেকে নিজে ছাপিয়ে যাওয়া—আধুনিকতার এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথার্থ আধুনিক যিনি, তিনি বহতা নদীর মতো; কখনোই বদ্ধ জলার মতো নন। মায়ের জীবনে উত্তরণের কয়েকটি মূল বিন্দু সংক্ষেপে ছোঁওয়া যেতে পারে। ঠাকুর তাঁকে বৃহত্তর, মহত্তর কর্তব্যসাধনের জন্য তিলে তিলে নির্মাণ করেছিলেন। লোকব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনচর্যার খুঁটিনাটি, সাধনপদ্ধতি, দীক্ষাদান ইত্যাদির মতো নানা প্রণালী হাতে ধরে মাকে শিখিয়েছিলেন ঠাকুর। তারপর কাশীপুরে ভারার্পণ করলেন, বললেন ঃ "তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।"

দেখা গেল, ঠাকুরের অসুস্থতার সময়ে কাশীপুরে সঙ্ঘের ভ্রূণ বিকশিত হচ্ছে অপার সম্ভাবনা নিয়ে। জননী যেমন আপন শরীরের অভ্যন্তরে পরম যত্ন ও মমতায় লালন করেন জীবনের সম্ভাবনাকে, তেমনি মাও সযত্নে লালন করলেন সঙ্ঘের বীজটি। একদিন মঠস্থাপনার জন্য তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা সার্থক হলো। নবস্থাপিত মঠের প্রতিটি পদক্ষেপ অলক্ষ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি। সঙ্কটের মুহূর্তে দিলেন নির্ভুল পথের নিশানা—হয়ে উঠলেন 'সঙ্ঘজননী'। তাঁর অনন্য মাতৃত্বের ছত্রছায়ায় দিকপাল সব সন্তান আপনাপন ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত এড়িয়ে 'রামকৃষ্ণের বেদিতলে' একপ্রাণ হলেন। দিকে দিকে ঠাকুরের অমোঘ বাণী প্রচারিত হতে থাকল। দলে দলে, মায়ের কথায়—'পিঁপড়ের সার'-এর মতো ভক্তরা ভিড় করল। মা হয়ে উঠলেন 'ভক্তজননী'—তাদের আধ্যাত্মিক দিশারি। এ এক অবিশ্বাস্য উত্তরণ!

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের খাঁচায়, কাশীপুরের সঙ্কটাবর্তে, কামারপুকুরে শত দারিদ্র্যের প্রকোপে, জয়রামবাটীর স্বার্থকুটিল স্বজন-সান্নিধ্যে, বাগবাজারে ভক্ত সমাগমে, এমনকি দাক্ষিণাত্যের রাজ-আতিথ্যে মা সমান স্বচ্ছন্দ। অনায়াস দক্ষতায় পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। অজস্র প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন হাসিমুখে, সংসারে থেকেছেন—তবু সংসারের ক্লেদ তাঁকে স্পর্শ করেনি। এখানেই মায়ের আধুনিকতা।

যুক্তিবাদ তথা অন্ধসংস্কারের বিরোধিতা আধুনিকতার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মায়ের জীবনে অজস্র ঘটনা ছড়ানো রয়েছে—যেগুলির মধ্যে তাঁর যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত মনের নিখুঁত পরিচয় মেলে। সবিস্তারে না গিয়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুরের দেহাবসানে বৈধব্যবেশ গ্রহণ না করা, ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা হয়ে অব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করা, ঠাকুরের নৈবেদ্য অন্যের হাতে তুলে দেওয়া, ভাইঝি রাধুকে দিয়ে অব্রাহ্মণকে প্রণাম করানো, নলিনীদিদি ও অন্যান্যদের শুচিবায়ুর বিরোধিতা করা, বালবিবাহের সমালোচনা করা, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একপাত্রে জিলিপি-মুড়ি খাওয়ানো, মুসলমান আমজাদের এঁটো পরিষ্কার করা, খুল্লতাতের শববহনে শূদ্রের অংশগ্রহণকে সমর্থন করা, বিধবার নিরম্বু উপবাসের বিরোধিতা করা, নিবেদিতার হাতে ভোগগ্রহণ করা ইত্যাদির মতো অজস্র দৃষ্টান্ত মায়ের সংস্কারমুক্ত মন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করে। আরো আছে—সেযুগে সাহেব ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে তিনি বসেছিলেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষায় প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথকে নির্দ্বিধায় বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এইসমস্ত আচরণ 'আধুনিক' বললে বোধহয় কমই বলা হবে। বস্তুত, এগুলি ছিল অত্যাধুনিক এবং বৈপ্লবিক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ—"মনেতেই শুদ্ধ, মনেতেই মুক্ত"; "উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়"; "আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে"; "আত্মা যদি খেতে চায়, তাকে দিতে হয়"; "দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা" ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আধুনিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যিনি, তিনি ছকে বাঁধা হবেন না—তাঁর থাকবে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা। মায়ের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে এমনকি ঠাকুরও পরাস্ত হয়েছেন। স্মরণীয়, জনৈকা বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের হাতে ঠাকুরের ভোজ্যদ্রব্য পাঠানোর ঘটনা—সেই প্রসঙ্গে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া এবং মায়ের প্রত্যুত্তর। এই ঘটনায় ঠাকুরের অসন্তুষ্টি জেনে এবং নিষেধাজ্ঞা শুনে মা বলেছিলেন ঃ "আমায় 'মা' বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।" দক্ষিণেশ্বরে সাধনরত সন্তানের জন্য রুটির বরাদ্দ বিষয়ে ঠাকুরের অসন্তোষ এবং

মায়ের প্রতিক্রিয়াও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানেও মা বলছেন ঃ "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" তাঁর মাতৃত্বের শক্তির কাছে আর সমস্তই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই মাতৃত্বের শক্তিই তাঁকে দিয়েছে অপরিসীম চারিত্রিক দৃঢ়তা। পরবর্তী কালে মঠ পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিতর্কে মা আপন ব্যক্তিত্ব সহায়ে নির্দ্বিধায় মতামত দিয়েছেন। তখন মঠের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখের মতো দিকপাল ব্যক্তিত্বগণ। তাঁদের সকলের ভাব অভিন্ন নয়, কিন্তু মায়ের ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁরা সকলেই নতমস্তক। চুরির অপরাধে বিতাড়িত ভৃত্য মায়ের আদেশে পুনর্বহাল, সামান্য অপরাধে তিরস্কৃত ব্রহ্মচারী জয়রামবাটীর 'সুপ্রিম কোর্ট' থেকে রায় নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন প্রভৃতি ঘটনা স্মরণযোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন, কাশী সেবাশ্রমের কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ক বিতর্কে মায়ের সুদৃঢ় মতপ্রকাশের কথা। স্মরণীয় হয়ে আছে ১৮৯৮-এর প্লেগের সময় বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে সেবাকার্য পরিচালনায় স্বামীজীর ঐকান্তিক বাসনা এবং তদুত্তরে মায়ের সুস্পষ্ট বিরোধিতা এবং স্মরণীয় মন্তব্য ঃ "বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে?" বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবে পশুবলির বিরোধিতা করে মায়ের সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় মতামতও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এরকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেখানো সম্ভব।

জীবনরস-রসিকতা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে নয়, পাশ কাটিয়ে নয়—সমস্ত বন্ধনকে স্বীকার করে জীবনকে ভালবেসে মুক্তির স্বাদ নিতে চেয়েছিলেন তিনি। কেমন সে-জীবন? অজস্র শোক, তাপ, আঘাত, বেদনায় তিনি জর্জরিত হয়েছেন—নীরবে সহ্য করেছেন সাংসারিক অনটন, স্বার্থকুটিল বৈষয়িক যন্ত্রণা। এসবের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপিণী। কোন অশান্তির আগুন তাঁকে স্পর্শ করেনি। এই নতুনতর পঞ্চতপার পাবকশিখায় তিনি যেন আরো উজ্জ্বল। তাঁর হৃৎকমলে 'আনন্দের পূর্ণঘট' সদাপ্রতিষ্ঠিত।

জীবন সম্পর্কে তাঁর অসীম কৌতূহল। নিবেদিতার বোর্ডিং স্কুলের মেয়েদের বলছেন ঃ "দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সব দেখে রাখবে।" দেখতে তাঁরই কি কম আগ্রহ? ছুটির দিনে নিবেদিতার স্কুলের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দেখেন কখনো মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেন, এমনকি সার্কাসও। দেখা তো শুধু নয়, অসীম কৌতূহলে দেখা—বালিকার মতো মেতে ওঠা। পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে বাঞ্ছিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীমাও বরাভয়করা হয়ে রঙ্গমঞ্চের আঙিনায় আবির্ভূতা। 'পাণ্ডবগৌরব', 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'রামানুজ' ইত্যাদি নাটক তিনি দেখেছেন। রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করতে করতে তিনি সমাধিস্থা হয়েছেন। অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি প্রমুখ তাঁর কৃপাধন্যা হয়েছেন।

রঙ্গকৌতুকে রসরাজ ঠাকুরের তুলনায় মা কম যেতেন না। এসমস্ত ক্ষেত্রে কখনো গৌরী-মা, কখনো লক্ষ্মীদিদি, কখনো নিবেদিতাও তাঁর সহচরী। বেলুড় মঠে বিজয়ার ভাসানের সময় তিনি ডাক্তার কাঞ্জিলালের মুখভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গের অনুমোদন করেন। তিনি নিজে সুন্দর গাইতেন—সেই প্রতিভার স্বীকৃতি রয়েছে ঠাকুরের কথাতেও। তিনি তো সারদা—সরস্বতী! বেশ কিছু গান তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সুর করে সেগুলি গাইতেন। তাঁর ভাললাগা গানের কয়েকটি হলো—'কেশব কুরু করুণা দীনে', 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী', 'বারে বারে দুঃখ দিতেছ তুমি তারা', 'বিপদবারণ তুমি নারায়ণ' ইত্যাদি। কোঠারে ওড়িয়া যাত্রাপালা তিনি শুনেছেন, তাঁরই ইচ্ছায় পরপর দুদিন পালার অভিনয় হয়েছে। "গানের তুল্য কি জিনিস আছে? গানে ভগবানকে পাওয়া যায়"—বলতেন তিনি। দত্তবাড়িতে যতীন মিত্রের কীর্তনগান কেবল মাথুরেই শেষ হচ্ছিল বলে মা ঐ কীর্তন মিলনে শেষ করার উপদেশ দিলেন। সেই গান শুনে মায়ের ভাবসমাধি। বাগবাজারের বাড়িতে থিয়েটারের অভিনেত্রী তিনকড়ির মুখে বিল্বমঙ্গলের গান শুনে মায়ের চোখে জল। অভিভূতা মা বললেন ঃ "আজ কী গানই শোনালি মা!" তাঁর আদেশে শরৎকেও (স্বামী সারদানন্দ) মাঝে মাঝে পাখোয়াজ-তানপুরা নিয়ে গাইতে বসতে হতো। এসমস্তই আনন্দরূপিণী মায়ের জীবনরস-রসিকতার প্রমাণ।

আধুনিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিস্বাধিকারের স্বীকৃতি। মানুষ তো ছাঁচে ঢালা নয় যে, একে অপরের অনুরূপ হবে। ক্ষমতা, প্রবণতা, সংস্কার ইত্যাদির সাপেক্ষে মানুষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। মা এই স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিতেন। এ তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। এপ্রসঙ্গে তাঁর আপ্তবাক্য "যার যেমন, তার তেমন" স্মরণীয়। কখনো কারো ভাবে তিনি আঘাত করতেন না। জয়রামবাটীর জনৈক সন্ন্যাসী স্বদেশি ভাবাপন্ন জানার পর মা তাঁকে দিয়ে কখনো বিলাতি বস্ত্র কেনাননি। এভাবে তিনি তাঁর সন্তানের ভাবকে সম্মান দিয়েছেন। জনৈক ভক্তের কন্যা বিবাহে অনিচ্ছুক হওয়ায় তার সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভক্তদের নানান ভাব—মায়ের কাছে তাদের নানান আবদার! হাসিমুখে মা তাদের আবদার মেনেছেন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণা সত্ত্বেও—শুধু তাদের ভাবের প্রতি সম্মান জানাতে। তাঁর দিকপাল সন্তানদের এক একজনের এক এক ভাব। সকলের ভাবকে সম্মানিত করে মাতৃনামের অদৃশ্য সুতোয় তিনি রচনা করেছেন এক অনন্য ভক্তমালিকা!

ব্যক্তিস্বাধিকারের প্রতি শ্রীমায়ের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি তাঁর নারীমুক্তি বিষয়ক ভাবনায়। নারী অন্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র নয়—আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার তার আছে। জনৈক ভক্ত তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিতে না পারায় মায়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ করলে মা বলেছিলেন, তাঁর মেয়েকে নিবেদিতার স্কুলে রেখে লেখাপড়া শেখাতে। অর্থাৎ বিবাহ নারীজীবনের মোক্ষ—একথা তিনি মানতেন না। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পরগোত্র করে দেওয়ার প্রবণতার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তিনি মনে করতেন, অল্প বয়সে ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুর বিয়ে না দিলে তার দুর্দশা হতো না।' সেই রাধুকেই বিয়ের পরে চোদ্দবছর বয়সে মা মিশনারি স্কুলে

লেখাপড়া শেখাতে পাঠিয়েছিলেন। আজকের দিনেও আমাদের সমাজে সেবিকার (নার্সিং) জীবিকা সম্পর্কে অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও একধরনের উন্নাসিকতা লক্ষ্য করা যায়। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মা সরলাদেবীকে নার্সিং শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এক বিপথগামিনী মহিলা মায়ের কাছে যাতায়াত করছে বলে বলরামবাবুর স্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন ঃ "ও এলে আমাদের যাওয়া হবে না।" শরণাগতার পক্ষ নিয়ে মা বললেন ঃ "কেউ যদি না আসে না আসুক। ও আমার কাছে আসবে। সকলের সবাই আছে, ওর আমি ছাড়া জগতে কেউ নেই।" তিনি ছিলেন সতীরও মা, অসতীরও মা। এঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। একবার দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলীর কিছু বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হয়ে ঠাকুর তাকে গ্রাম্যভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। মেয়ের সেই অপমানে মা নিজে মরমে মরেছিলেন। ঠাকুরের সেই সময়কার ব্যবহার তিনি আদৌ অনুমোদন করেননি। ঐ মহিলাকে নিজের কাছে ডেকে এনে আপন স্নেহের ছোঁয়ায় মা তাকে শান্ত করেন।

আজ নারীমুক্তির নামে চারদিকে নানারকম আন্দোলন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন তার সঠিক দিশা হারিয়ে বাধাহীন স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও পরিবারে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের সমর্থক হয়েও মা একটি অসাধারণ উক্তি করেছিলেন ঃ "দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সবচেয়ে সার্থক।" নারীর আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব তার নিজেরই—এমন দরকারি কথাটি এমন সুন্দর করে বোধকরি কোন নারীবাদী বলেননি। মায়ের জীবনে আমরা নানা ঘটনা লক্ষ্য করি—যেখানে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নারীদের আচার-আচরণের 'লক্ষ্মণরেখা' নির্দেশ করেছেন।

॥৩॥

ভগিনী নিবেদিতা একসময় মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী।" একইসঙ্গে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন ঃ "কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষকথা, না নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ?" এই সংশয়ের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। মা নবীন আর প্রাচীনের এক সেতুবন্ধ! তাঁর এক পা অতীতে, এক পা বর্তমানে—আর পূতপবিত্র দুটি চোখের দৃষ্টি পূর্ণ মহিমায় ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। তিনি একালের, তিনি সেকালেরও—চিরন্তনী জননী তিনি; সনাতন ভারতীয় নারীত্বের এক মহত্তম প্রকাশ।

মায়ের চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত আধুনিকতায় বিদ্রোহের কোন অগ্নিজ্বালা ছিল না। ঐতিহ্যের প্রতি কোন স্পর্ধিত অসম্মান তিনি কখনোই দেখাননি। দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি তিনি ছিলেন সর্বদাই শ্রদ্ধাবনতা। প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতার আকারে যে-আধুনিকতা আমরা সচরাচর দেখে থাকি—তার মধ্যে অনেক সময় একধরনের দুর্বিনীত আত্মপ্রচার থাকে। আপন অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে, প্রাচীনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে আধুনিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মা স্থাপন করেছেন, তার স্নিগ্ধ কল্যাণস্পর্শ আমাদের নন্দিত করে।

তিনি কোনকিছুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন কিছু করতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন পুরাতনের মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ছোঁয়া আনতে। তাই তিনি কিছু ভাঙেননি, ধ্বংস করেননি, বরং ভিতর থেকে পরিমার্জন করে—বর্জনীয় সকলকিছুকে বর্জন করে তিনি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল এক অনন্য সমন্বয়ের ঐতিহ্য—যে-ঐতিহ্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এই ত্রিযোগের সমন্বয়, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবনের সমন্বয়, সেকাল ও একালের সমন্বয় এবং সর্বোপরি দেবত্ব ও মানবত্বের সমন্বয় মায়ের জীবনে প্রতিফলিত আধুনিকতার একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমী সংজ্ঞা অনুসরণ করে (যদিও এমন কোন অনন্য সংজ্ঞা হয় না) আলোচ্য প্রবন্ধে মায়ের জীবনে আধুনিকতার উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করার একটা চেষ্টা করা হলো। তবে এই চেষ্টায় সাফল্য দাবি করা যায় না। বস্তুত, বিবেচিত পশ্চিমী মানদণ্ডগুলি মায়ের জীবনে আধুনিকতার ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সক্ষম নয়। পশ্চিমী আধুনিকতা সমকালেই গুরুত্ব দেয়—মায়ের মধ্যে আমরা পাই চিরকালকে। ভারতীয় দর্শনে বর্তমান কাল তো আসলে এক অনন্ত অখণ্ড জীবনপ্রবাহের একটি খণ্ডাংশমাত্র। মায়ের পূত পবিত্র জীবন সেই অনন্তের অভিসারী। মা সেই অর্থে আধুনিকা নন—তিনি চিরন্তনী।

মায়ের এই চিরন্তনী নারীসত্তাকে ধারণ করে রয়েছে তাঁর মাতৃত্ব। এই বিশ্বসংসারের সকলকে আপন সন্তানরূপে বিবেচনা করে তিনি আধুনিকতার অঙ্গনে প্রবেশ যেমন করেছেন, তেমনি অতিক্রমও করেছেন সেই অঙ্গনের সীমারেখা। আধুনিকতার সকল উপকরণ—মানবতা, বিশ্বচেতনা, আত্ম-উত্তরণ, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি আসলে তাঁর মাতৃত্বেই আধারিত। মাতৃত্বের এই বিজয়বার্তা পাশ্চাত্য চিন্তায় ধরা পড়ে না। নারীপ্রগতির নামে আমাদের চারপাশে যা চলছে, আধুনিকতার তকমায় যেভাবে অপসংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, নারীর শ্রী-সম্পদকে যেভাবে প্রতিনিয়ত বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে—তা যথার্থই উদ্বেগজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধনে চিরন্তনী মাতৃত্বের ভিত্তিভূমিতে অদ্বৈতবেদান্তের মূল ভাবনায় আধারিত মায়ের অলোকসামান্য আধুনিকতা নিঃসন্দেহে একটি কার্যকরী প্রতিষেধকের স্বীকৃতি পেতে পারে। আশা করি শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতার এই দিকটি আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

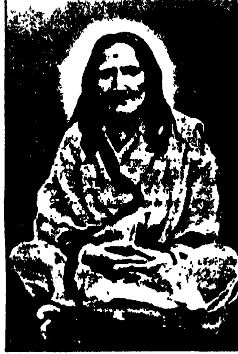
১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা
৩ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
৪ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সইদ আইয়ুব
৫ বিভাবন—স্বরাজ সেনগুপ্ত

ীরী আশ্রম

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার চতুর্বিংশ পর্যায়ে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর অশেষ কৃপাধন্যা মহাসাধিকা, সন্ন্যাসিনী গৌরী-মা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ "১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে প্রশ্ন করিতেছেন, 'গৌর-মা কোথা? একহাজার গৌর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।' গৌরী-মার ইহা অতি উত্তম পরিচয়। গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নানাভাবে অভিহিত হইতেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি ছিলেন 'গৌরদাসী'। স্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপান্তর 'গৌর-মা' নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাঁহার মধ্যম বয়সের প্রচলিত নাম। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পর নাম হয় 'গৌরী পুরী', তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পরে 'গৌরী-মা' বলিয়াই পরিচিত হন। স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন 'মাতাজী'; আবার পিতৃগৃহে তাঁহার নাম ছিল 'মৃড়ানী' বা 'রুদ্রাণী'।"[১]


সাধিকা গৌরী-মা

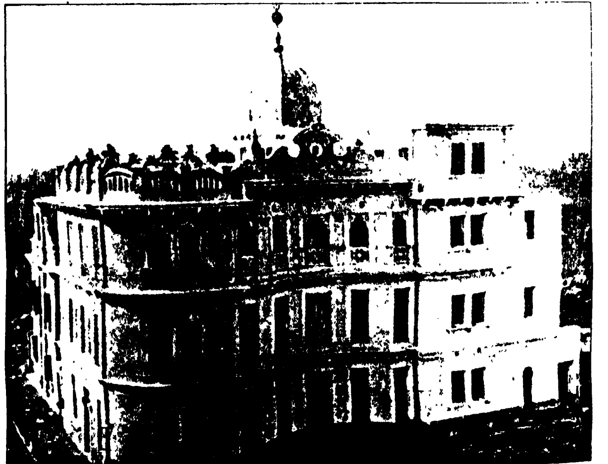
পরম ভাগ্যবতী গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ ও সেবার অধিকারিণী হন এবং কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও বাস করেন। মাতৃজাতির কল্যাণে শহরে থেকে কাজ করার জন্য ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী পরবর্তী কালে তিনি প্রাচীন আদর্শে মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য একটি সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ ও মাতৃসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের নামে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' (২৬, গৌরীমাতা সরণি, শ্যামবাজার, কলকাতা-৪) প্রতিষ্ঠার পর তাঁর চিরজীবনের পতিরূপে নিত্যপূজিত 'দামোদর'কে স্থাপন করেন। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত ও নিজনামাঙ্কিত ঐ আশ্রমের বাস্তুপূজা স্বয়ং শ্রীশ্রীমা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়ায় আশ্রমটি শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যস্পর্শের স্মৃতি ধারণ করে বিদ্যমান। অনুসন্ধানে জানা যায়, নতুন আশ্রমভবন নির্মাণের পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষা হওয়ায় তাঁর এখানে আর আসা হয়নি।

অবশ্য এই আশ্রমভবন ছাড়া ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ও নানা স্থানে স্থানান্তরিত 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'-এ শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল। এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ "অবশেষে তিনি (গৌরী-মা) দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়া ১৩০১ সালে (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে) কলিকাতার অনতিদূরে বারাকপুরের গঙ্গাতীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুপত্নীর নামেই ইহার নামকরণ হইল 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'।"[২]

"আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে গৌরী-মার আমন্ত্রণে মাতাঠাকুরানী একদিন বারাকপুর আশ্রমে শুভপদার্পণ করেন। দীন কুটীর হইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্প, আলিপনা, ভোগারতি ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা করা হয়।"[৩]

"অবশেষে ১৩১৮ সালের প্রথমভাগে বারাকপুর হইতে আশ্রম উত্তর কলিকাতায় গোয়াবাগানে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। আশ্রমে পূর্ব হইতেই ঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর পট ও পদচিহ্ন পূজা করা হইত। গোয়াবাগান আশ্রমে মা যেদিন প্রথম পদার্পণ করেন, সেদিনই তিনি তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আশ্রমমন্দিরে সেই পটখানির নিয়মিত পূজার্চনা হইতেছে।"[৪] গোয়াবাগান আশ্রমে শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে অবস্থানও করতেন।

এরপরেও আশ্রমের কয়েকবার স্থান পরিবর্তন হয়। শেষে শ্যামবাজারে স্থায়িভাবে নিজ জমিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।


শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা এখানে বাস্তুপূজা করেন। এসম্পর্কে জানা যায়ঃ "তাঁহার (গৌরী-মার) মনে মনে ইচ্ছা ছিল, মাতাঠাকুরানীর বাসভবন এবং গঙ্গার সমীপবর্তী কোন স্থানে আশ্রমের জমি ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেরূপ কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আসিয়া শ্যামবাজারে একটি জমির সন্ধান দিলেন এবং নিজেই একদিন আগ্রহ করিয়া গৌরী-মাকে তাহা দেখাইয়া আনিলেন। জমি দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল এবং শ্রীশ্রীমাও এই জমিই ক্রয় করিতে বলিলেন।

"জমি ক্রীত হইলে গৌরী-মা তাহা দেখাইতে মাতাঠাকুরানীকে লইয়া আসিলেন। তিনি জমিতে পদার্পণ করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খাসা জমি, বেশ বাড়ি হবে। মেয়েরা সুখে থাকবে।' তাঁহার এইরূপ আশীর্বাদে গৌরী-মার মনে উৎসাহ বহুগুণ বর্ধিত হইল।

"সেইদিবস মাতাঠাকুরানী পঞ্চরত্ন ও পঞ্চশস্য-সহ একটি রৌপ্যাধার স্বহস্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া আপনিই আপনার পূজামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরী-মা তাঁহাকে সেই স্থানেই মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিলেন, 'এই তো আশ্রমের বাস্তুপূজা আর দেবীর অধিবাস হয়ে গেল।' "[৫]

শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ "গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।"[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নির্বাচিত স্থানটি পূর্বে ছিল—২২/৬, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, পরে এটি হয়—২৬, মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট এবং সবশেষে হয়—২৬, গৌরীমাতা সরণি।

এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পূতাস্থি সংরক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়ঃ "শ্রীমা একদিন গৌরী-মাকে বলেন, 'আমার তো যাবার সময় হয়ে এল,... দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্যভোগ দিলেই হবে।' গৌরী-মার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই নরলীলা সংবরণ করিবেন।"[৭]

শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষার পর গৌরী-মা ও দুর্গা-মা বেলুড় মঠ থেকে তাঁর পূতাস্থি এনে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[৮] এবং পরবর্তী কালে গৌরী-মার দেহত্যাগের পর তাঁরও পূতাস্থি আশ্রমভবনে স্থাপিত হয়।[৯] এমনকি, ভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থিও পরবর্তী কালে সংগৃহীত হওয়ায় দুর্গা-মা সেই পূতাস্থি আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে গেছেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত জনৈক সন্ন্যাসী আশ্রমের মাতৃদ্বয়ের প্রতি অতিশয় ভক্তিযুক্ত ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। গৌরী-মাতার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে একদিন আশ্রমে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তিনি দুর্গা-মাকে বলেন, 'অনেকদিন থেকেই একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি, কিন্তু বলা আর হয় না। আজ বলব বলেই এসেছি। আমার ইচ্ছে—আমাদের ঠাকুরের ব্রহ্মসত্ত্ব সারদেশ্বরী আশ্রমেও থাকে। আমি দিতে পারি, এতে আমারও আনন্দ হবে, আশ্রমেরও কল্যাণ হবে। গ্রহণ করবেন?'

"এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া মা এতই অভিভূত হইলেন যে, বিস্ময়ে ও পুলকে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। ... মায়ের এবম্বিধ মৌন সম্মতিতে সন্ন্যাসীও আনন্দিত হইলেন।... যথাকালে রৌপ্যাধারে সযত্নে রক্ষিত সেই মহামূল্য সম্পদ স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া সৌভাগ্যবতী দুর্গামাতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।...

"৭ জ্যৈষ্ঠ (১৩৫১ সাল) শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপূজা দিবসে বিশেষ হোম, পূজা সহকারে দুর্গামা সেই পরম সম্পদকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থিও ভোগারতি সহযোগে নিত্য পূজিত হইতেছেন আশ্রমমন্দিরে। এই সম্বন্ধে দুর্গামা পরবর্তী ট্রাস্টি ও সেবায়েতদিগকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, 'পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর পূতাস্থির ন্যায় পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থিও এই আশ্রমে যথারীতি পূজিত হইবেন এবং এই বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় আশ্রমের সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।' "[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশ্রমের নিয়মানুযায়ী কোন পুরুষ-ভক্তকে আশ্রমের দোতলায় (যেখানে ঐসব পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়) প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রীবন্দনাপুরী দেবী গৌরী-মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন।❑

পথনির্দেশঃ ২৬, গৌরীমাতা সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪। বিধান সরণির ওপর ফড়িয়াপুকুর স্টপেজে নেমে পশ্চিমদিকে বলরাম ঘোষ স্ট্রিট বরাবর গেলে প্রথম চৌমাথার মুখে পড়বে ডাফ স্কুল। এরপর ডানদিকে কিছুটা গেলে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'। আবার ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ থেকেও এখানে আসা যায়। সেক্ষেত্রে মণীন্দ্র কলেজ স্টপেজে নেমে ন্যায়রত্ন লেন দিয়ে খানিকটা এগোলে এই আশ্রমে আসা যাবে।

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৯ম সং, পৃঃ ৪৮০
২ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬১, পৃঃ ১৬১
৩ ঐ, পৃঃ ২৯০
৪ ঐ, পৃঃ ২৯৩
৫ ঐ, পৃঃ ২৯৮
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৯৯
৭ দুর্গামা—শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী, ১৩৭৭, পৃঃ ১১১
৮ ঐ, পৃঃ ১১৩-১১৪
৯ ঐ, পৃঃ ২২৭
১০ ঐ, পৃঃ ২৬১-২৬২

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

 নিবন্ধ

মাতৃসান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরের মেছুনিরা

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জনজীবনের সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর সংযোগ যেমন নিবিড়, তেমনই ব্যাপক। এটি তাঁর জীবনের অসাধারণত্বের একটি দিক! সমাজে অচ্ছুৎ ও ব্রাত্য ব্যক্তিদের সুস্থ সমাজমানস দান করতে তিনি কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞই ছিলেন না, ব্রতধারিণীও ছিলেন। তাই সমাজের নানা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপালাভে সমর্থ হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের (১৮৭২ সাল) পর তিনি কিছুকাল শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে এবং তারপর নহবতের কুঠুরিতে ঠাকুরজননী চন্দ্রমণিদেবীর সঙ্গে বসবাস করেছেন।[১] পরবর্তী কালে চন্দ্রমণিদেবী প্রয়াতা হলে (১৮৭৫ সাল) শ্রীমা কিছুকালের জন্য শম্ভু মল্লিকের প্রযত্নে নির্মিত চালাঘরে অবস্থান করেন এবং তারপর আবার নহবতের কুঠুরিতে ফিরে আসেন। শম্ভু মল্লিকের উদ্যোগে নির্মিত চালাঘরে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য একজন স্ত্রীলোক নিযুক্তা হয়েছিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে হৃদয়রামের পত্নী সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।[২] কিন্তু পরবর্তী কালে মা যখন স্থায়িভাবে নহবতের কুঠুরিতে অবস্থান করতে লাগলেন, তখন তাঁর অবস্থা প্রায় নিঃসঙ্গ। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী নহবতে ছিলেন, তখন তিনি থাকতেন ওপরের কুঠুরিতে এবং শ্রীমা থাকতেন নিচে। সেই সময়েও তাঁর কোন স্থায়ী সঙ্গিনীর নাম পাওয়া যায় না। তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে বৃন্দে ঝি[৩], কালীর মা[৪] বা যদুর মা[৫] নামে বিভিন্ন দাসীর প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকলেও তাদের স্থায়ী উপস্থিতির কথা নেই। তাছাড়া নানা আত্মীয়পরিজনের উপস্থিতির প্রসঙ্গ থাকলেও তা স্থায়ী ছিল কিনা সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে শ্রীমায়ের সঙ্গিনীরূপে কথিত গোপালের মা (অঘোরমণি দেবী), যোগীন-মা (যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস) ও গোলাপ-মা (গোলাপসুন্দরী দেবী) যথাক্রমে ডিসেম্বর ১৮৮৪, জুলাই ১৮৮৫ এবং জুন ১৮৮৫-তে শ্রীরামকৃষ্ণ তথা মাতৃসান্নিধ্যে এসেছেন।[৬] বস্তুত, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের ঐ কুঠুরিতে বেশির ভাগ সময়েই শ্রীমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে হয়েছিল। সেই কাহিনী তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন।



নহবতখানায় অবস্থান—শ্রীমায়ের কথায়

শ্রীমা নহবতখানায় তাঁর দিনযাপনের অপূর্ব এক চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন ঃ "ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হতো! তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র! কখনো কখনো একাও ছিলুম।... ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না হতো। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। প্রথম প্রথম (নহবতের) ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কী ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!' রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাতেই চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নিচের একটু খালি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙিমাছের ঝোল হতো কিনা। শৌচে আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম, 'হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম!' আর ঐ মেছুনিরা ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গায় নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত! আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম।"[৭]

নহবতের কুঠুরিতে শ্রীমায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের এক বিশেষ চিত্র উপহার দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ ঃ "একদিকে স্বতন্ত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ

জগন্মাতা! একদিকে লীলাবিলাস, অপরদিকে সতৃষ্ণ নিরীক্ষণ—ইহা এক অপূর্ব চিত্র! এই সুখদুঃখমিশ্রিত, নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে অতিবাহিত জীবনের সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলিয়া শ্রীমায়ের হৃদয়ে শুধু এই স্মৃতিটুকুই সর্বদা জাগিয়া থাকিত, 'কী আনন্দেই ছিলুম! কতরকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট-বাজার বসে যেত।'... লক্ষ্মীদিদির অনুপস্থিতিকালে শ্রীমায়ের পায়ের বাত ও সঙ্গিনীহীন জীবন ঠাকুরকে খুবই ভাবাইয়া তুলিত। তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' শুধু এইখানেই নিবৃত্ত না হইয়া দ্বিপ্রহরের আহারের পর মন্দিরোদ্যান জনশূন্য হইলে তিনি তাঁহাকে কালীবাড়িটির খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া কিছুকাল নিকটবর্তী পাঁড়ে গিন্নিদের বাড়িতে বেড়াইয়া আসিতে বলিতেন। সেখানে আলাপাদি করিয়া আরতির পরে পঞ্চবটী নির্জন হইলে শ্রীমা আবার নহবতে ফিরিতেন।"[৮]

শ্রীমায়ের সঙ্গিনী দক্ষিণেশ্বরের মেছুনিরা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষদর্শী শশিভূষণ সামন্ত (পীতাম্বর ভাণ্ডারীর পুত্র) 'মাতাঠাকুরানীর স্মৃতিকথা'তে[৯] জানিয়েছেন ঃ "এইবার মেছুনিদের কথা বলিব। এই দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মন্দির ছাড়াইয়া দেবমণ্ডলের ঘাটের দিকে যাইলে মালাপাড়া রহিয়াছে। তথায় সেইকালে বহু ধীবর বাস করিত। তাহারা রাত্রিকালে নৌকা লইয়া মাছ ধরিত—গান গাহিত। অনেক সময় রাত্রিকালে জাল ফেলিয়া মাছের আশায় অপেক্ষা করিত। ভোরবেলায় সেই জাল তুলিয়া মাছ ছাঁকিয়া ঘরে ফিরিত। সকালবেলায় হাটে-বাজারে মাছ বিক্রয় করিত। সেকালে বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রয় করার প্রথা ছিল। ধীবর-গৃহিণীদের সাধারণ ভাষায় 'মেছুনি' বলা হইত। ক্ষান্ত দাসী, পটল দাসী, ক্ষিরোদ দাসী, নারায়ণী দাসী, পদ্ম দাসী, গোলাপী দাসী—এমন বহু মেছুনি দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটী, এঁড়েদাহ, আলমবাজারে বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রয় করিয়া ফিরিতেন।[১০] পটল দাসী ও গোলাপী দাসী এদের মধ্যে অধিককাল জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মুখে মাতাঠাকুরানীর কিছু কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমরা পটল দাসীকে 'পট বুড়ি' বলিতাম। বৃদ্ধবয়সে তিনি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসিতেন এবং আমাদের জননীদেবী তাঁহাকে যত্নসহকারে মুড়ি, গুড় বা কখনো অন্ন পরিবেশন করিতেন। তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম—'আমরা দলবেঁধেই মন্দিরঘাটে চান করতে যেতাম। তখনি মাঠানের সঙ্গে আমাদের দেখা হতো, কথা হতো। তখন আমাদের বয়েস অনেক কম। সে কতদিনের কথা! নবত-পঞ্চবটী তখন একরকম ছিল। আমরা গিয়ে মাঠানের সঙ্গে কথা বলতাম। প্রথম প্রথম দু-একটা কথা হতো। পরে আমাদের সঙ্গে তাঁর যেন কেমন নিজের লোকের মতো সম্পর্ক হয়েছিল। বাড়ির সব কথা হতো। ছেলে-মেয়ের কথা, স্বামীর কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির কথা। কারো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাড়ি হলে সেকথাও মাঠানের কাছে আমরা বলতুম। একবার ক্ষান্তার স্বামীর সঙ্গে তার খুব বিবাদ বাঁধে। তার স্বামী তাকে এমন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তার একটা দাঁত ভেঙে গিছল। মাঠান সেকথা শুনে রেগে গিছলেন; বলেছিলেন, "মিনসেগুলো মেয়েমানুষদের ভাবে কী? তাদের নইলে চলেও না আবার তাদের ওপর জুলুম করবে—পশুর বল ফলাবে! ক্ষিরো, তুমি খবরদার স্বামীর সঙ্গে যেচে কথা বলতে যাবে না; তবে সংসারের সব কাজ করবে—স্বামীর যা লাগে তা আগিয়ে দেবে, তবে যেচে সোহাগ করতে যাবে না; তাকেও ভাবতে দাও—সংসারে সবারই দাম আছে!" ক্ষিরোদ মাঠানের কথামত চলেছিল। তার স্বামী ঐ কাজের জন্য দুঃখ পেয়ে দোষস্বীকার করেছিল। মোক্ষদার মেয়ের একবার খুব বেয়াড়া জ্বর হয়। কবরেজের ওষুধেও কিছু হচ্ছে না। সেকথা মাঠানকে জানালে তিনি ঠাকুরের ফুল দিয়েছিলেন। তা মাথায় ঠেকাতে কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল। মাঠান আমাদের বাড়ির রান্নাবান্নারও খোঁজ নিতেন। এইসব কথার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, মাঠান সজনে ডাঁটা, পটললতা, কামরাঙা খেতে ভালবাসেন। আমাদের সঙ্গে যশোদা থাকত। সে জিয়ানো মাছ, গুগলি, শামুক ধরত। ভটচাযমশাই-এর [শ্রীরামকৃষ্ণের] শরীর খারাপ হয়েছিল যখন, আমরাই জিয়ানো মাছ, গুগলি মাঠানকে এনে দিতুম। মাঠান গুগলি ভাঙতে পারতেন না। বলতেন, "ওদের মাথায় আঘাত করতে কষ্ট হয়, তোমরা একটু

সমাধান ঃ

পাশাপাশি ঃ (১) হরমনোরমা, (৪) বর্তিকা, (৫) পট, (৬) আসন, (৭) শঙ্কর, (১০) শবাকারা, (১১) শশিভালিনী, (১২) দেবাদিদেব, (১৪) দীপান্বিতা, (১৬) রবিজ, (১৮) বন্দনা, (১৯) বাণ, (২০) রুদ্রাণী, (২১) দশমহাবিদ্যা।

ওপর-নিচ ঃ (২) মদন, (৩) রমেশ, (৪) বট, (৫) পরশ, (৬) আকাশপ্রদীপ, (৮) করালবদনা, (৯) বলি, (১৩) বামা, (১৫) তারণ, (১৭) জলেশ, (১৮) বলহা, (১৯) বাণী।

সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।

ছাড়িয়ে দেবে?" সেই থেকে আমরা রোজ এসে গুগলি ভেঙে দিতাম। আমাদের দলের প্রায় সকলেই চলে গেছে, কেবল গোলাপী আর আমিই বেঁচে আছি। গোলাপী বয়েসে খুবই ছোট। ওর কম বয়েস ছিল বলে মাঠান ওকে খুব ভালবাসতেন। আমাদের মিঠাই, ফল, নাড়ু—আরো সব দিতেন। মন্দিরে কীর্তন, কথকতা, যাত্রাপালা থাকলে আমাদের শুনতে আসার নিমন্ত্রণ জানাতেন। আমরা বোকা মানুষ—তখন কী আর বুঝতুম, উনি কত বড় মানুষ! তবে তেনার যে দয়ার শরীর তা বেশ বুঝতে পারি। আমাদের অনেককেই মাঠান কাপড়, সিঁদুর, তেল সব দিতেন। ক্ষিরোদকে একবার ভূতে পেয়েছিল। কবরেজ, গুণিন, মৌলবী সব দেখিয়েও ভাল হয়নি; শেষে মাঠান একটা তেল দিয়েছিলেন, সেটা মাখতেই সে সেরে উঠল। তবে ক্ষিরোদ বেশিদিন বাঁচেনি—অল্পবয়সেই মারা যায়। তখন জেলেপাড়ায় সঙ হতো—চড়কে মেলা বসত। আমাদের কেউ একজন মাঠানের জন্য তালপাতার পাখা এনে দিয়েছিল। তাতে মাঠান খুব খুশি হয়েছিলেন—সবাইকে সেটা দেখাতেন। মাঠানের কথা ভোলা যাবে নাগো বাবু!'

"গোলাপী দাসী মাতাঠাকুরানীর অপর মেছুনি সঙ্গিনী। তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হাঁদুর মা'। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি জেদি ছিলেন। কেউ একটা কথা বলিলে তাহাকে পালটা দশটা কথা শুনাইয়া দিতেন। তাঁহার আরো গুণ ছিল। খেজুরপাতার চাটাই ও ঝাঁটা বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয় করিতেন। গ্রীষ্মকালে আম, কাঁঠাল, তরমুজ ইত্যাদি ঝাঁকায় লইয়া বাড়ি বাড়ি বিক্রয় করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল, সেটি হইল কাহারো কাজ-বাড়িতে স্বেচ্ছায় শ্রম দেওয়া। মশলা বাটা, আনাজ কাটা, থালা ধোওয়া—এমন সাধারণ ও খুব প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহার সাহায্য সকলে পাইত। আমাদের পাড়ায় কোন বাড়িতে কোন কাজ হইলে সকলেই বলিত, হাঁদুর মাকে সংবাদ দিতে হইবে। গোলাপী দাসীকে আমার ব্যক্তিগত স্মরণে রাখিবার একটি জিনিস মনে উদয় হইতেছে। সেই ঘটনাটি স্বচক্ষে দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। লক্ষ্য করিয়াছিলাম—পরিণত বয়সে গোলাপী দাসী প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান সারিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে একটি ঘটিতে জল লইয়া নহবতঘরের সিঁড়িতে সেই জল ঢালিয়া তথায় প্রণাম করিত। এই কার্যে সেই বৃদ্ধা ব্যতীত অপর কাহাকেও কখনো দেখি নাই। কৌতূহলী হইয়া এই কার্যের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—'বাবু, মাঠান এখানে কতদিন ছিলেন, আমাদের কত আশীর্বাদ করেছেন—তাঁর সেই বসার জায়গাটা ধুয়ে দিয়ে একটু পরকালের কাজ করছি।' তাঁহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি পরিণত বয়সেও পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকট মাতাঠাকুরানীর দুটি ঘটনা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমটি ছিল তাঁহার স্বামীর আরোগ্যের বিষয়। তিনি বলিয়াছিলেন—'একবার হাঁদুর বাবার খুব জ্বর হয়। বাঁচার আশা ছিল না। কবরেজ বলল, আশা কিছু নেই—ভগবানকে স্মরণ কর। বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করছে। আমার তখন কম বয়েস। আমিও ঘরে কাঁদছি। পটলদি ওরা সব এসে সান্ত্বনা দিল। সেই রাত্রে আমি হাঁদুর বাপের মাথার কাছে বসে আধ ঘুম-আধ জাগা অবস্থায় আছি, এমন সময় মনে হলো কে যেন বলছে, "এটা মাথায় বুলিয়ে দে না। এ ঠাকুরের শ্রীচরণের পুষ্প!" ঘুম ভেঙে গেল। কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন ভয় হলো, হয়তো হাঁদুর বাবা আর বাঁচবে না। যাই হোক, রাত কাটতেই সকালেই গেলাম মায়ের মন্দিরে। আমি মন্দিরের পিছনের ফটক দিয়ে ঢুকে পঞ্চবটী হয়ে মাঠানের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, দেখি মাঠান ঘর থেকে বেরিয়ে হাতে একটি ছোট পুঁটুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য, রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি সেইরকমই একটি পুঁটুলি যেন দেখেছিলাম! আমি মাঠানকে প্রণাম জানাতেই মাঠান বললেন, "খুব ভাল হয়েছে মা, আমি তোমাদের পাড়ার কাউকে ধরে এটা তোমার কাছে পাঠাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। এতে মায়ের শ্রীচরণের পুষ্প আছে। তুমি তোমার স্বামীর মাথায় এটা বুলিয়ে দিও। অবশ্য কবরেজ দেখাচ্ছ যেমন তেমনই দেখাবে। আর এই পুঁটুলির মধ্যে একটু মিছরি আছে—তার সরবত করে খাওয়াবে।" এই বলে মাঠান পুঁটুলিটি আমায় দিলেন। আমি কেঁদে বললুম—মাঠান, ও বাঁচবে তো? মাঠান বললেন, "মা, বাঁচা মরা কি কারো হাতে? যিনি মালিক তিনিই জানেন, তুমি তাঁকে জানাও।" মাঠানের দেওয়া ঠাকুরের পুষ্প হাঁদুর বাবার দেহে বুলিয়ে দিয়েছিলাম। কবরেজের ওষুধও খেয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে তার জ্বর চলে গেছিল। তবে জ্বর থেকে ভাল হলেও হাঁটতে ভাল পারেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত; তবে প্রাণে তো বেঁচে গেল। হাঁদুর বাবাকে খাওয়ানোর জন্য মাঠান মাঝেমাঝে ফলমূল সব দিতেন। আরেকটা ঘটনা—আমার মাসি মেদিনীপুর থেকে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির দেখতে আর গঙ্গাচান করতে। সেসময় কালীবাড়িতে যাত্রাগান হচ্ছিল। আমি রাত্রে মাসিকে নিয়ে মন্দিরে এসেছিলাম যাত্রা শুনতে। কী ইচ্ছা গেল, নবত ঘুরে গেলাম। ইচ্ছা ছিল মাসিকে মাঠান দেখাব। নবতে গিয়ে দেখি, মাঠান শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আমি বাইরে থেকে ডাকলাম। মাঠান আস্তে আস্তে বললেন—"আর মা! পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি!" আমার কথা শুনে মাঠান কোনরকমে বাইরে এলেন। আমি

বললাম—মাঠান আপনার আত্মীয় কারা যেন ছিল? মাঠান বললেন, "তারা তাদের দাদার ওখানে চলে গেছে। মা, দরকারের সময় কেউই থাকে না!" আমি বললাম—মাঠান, মাসিকে যাত্রা শোনাতে এনেছি। মাঠান বললেন, "বেশ করেছ মা!" তারপর আমরা চলে গেলাম। আমি মাঠানের শরীরের অবস্থা ভাল দেখলাম না। মাসিকে যাত্রার ওখানে বসিয়ে দিয়ে আবার মাঠানের কাছে গেছি। গিয়ে দেখি মাঠানের ঘর খোলা, তিনি নেই। ভাবলাম, নিশ্চয় বাহ্যে গেছেন। আমি গঙ্গার ধারে এসে মাঠানকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দূরে হারিকেন দেখে বুঝলাম, মাঠান নিশ্চয় আছেন। অনেক দেরি হচ্ছে দেখে কাছে গেলাম। দেখলাম, মাঠান মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছেন। আমি ধরে তাঁকে ঘরে এনে তুলি। মাঠান বিছানায় শুলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি কাউকে শরীর খারাপের কথা বলেননি? মাঠান বললেন, "হ্যাঁগো, বলেছি, ওরা ওষুধ দিয়ে গেছে বিকালে।" আমি মাঠানের ঐ অবস্থা দেখে আর যাত্রা শুনতে গেলাম না। মাঠানের কাছেই বসেছিলাম। যাত্রা শেষ হলে মাসিকে নিয়ে ফিরি। পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানলাম, রোগ একটু কমের দিকে। মাঠানকে কবরেজরা বলেছিলেন আমরুল শাকের রস খেতে। আমি সেসময় রোজ আমরুল শাক তুলে মাঠানকে দিয়ে আসতাম। থানকুনি পাতার ঝোল খেতেন। সেটাও তুলে দিয়ে আসতাম। মাঠান আমাকে খুব ভালবাসতেন। হাতের কাছে যা থাকত, কিছু না কিছু দিতেনই! আমি খুব রেগে যেতাম বলে বলতেন—"গোলাপী, এই তেলটা মাখবি, মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।" এই বলে আমাকে এক শিশি তেল দিয়েছিলেন। আরো বলতেন—"রাগ চণ্ডাল! কখনো রাগবি না!" কী বলব—মাঠানের আশীর্বাদে রাগটা কোথায় চলে গেল! ভটচাযমশাই-এর [শ্রীরামকৃষ্ণের] শরীর খারাপ হতে ওনারা সবাই কলকাতা চলে গেলেন। মাঠানও যেদিন চলে গেলেন, আমরা অনেকে এসেছিলাম। সেদিন আমরা সবাই কেঁদেছিলাম। মাঠান আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—"এরা তো সব রইল। পরে আবার দেখা হবে। তোমরা ভাল থেকো।" সেই শেষ দেখা। কতদিন হয়ে গেল। বড় কপাল করে এসেছিলাম—এমন মানুষের সঙ্গ পাব ভাবতেও পারিনি। তাই এখনো রোজ আসি—মাঠানের কথাই ভাবি! কবে তিনি পার করবেন, সেই আশায় বসে আছি।' " ❑

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৭
২ ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩
৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৭৫
৪ ঐ, পৃঃ ১৬১
৫ ঐ, পৃঃ ৬০
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৪৩২, ৪৫৪-৪৫৬, ৪৬৭-৪৬৮
৭ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬১-৬২
৮ ঐ, পৃঃ ৬৪
৯ শশিভূষণ সামন্তের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত।
১০ শশিভূষণ সামন্ত-বিবৃত ক্ষান্ত দাসী, পটল দাসী, ক্ষিরোদ দাসী, নারায়ণী দাসী, পদ্ম দাসী ও গোলাপী দাসীর নাম দক্ষিণেশ্বর মৌজার সি. এস. পরচা রেকর্ডে নিম্নরূপভাবে উল্লিখিত আছে—

মৌজা—দক্ষিণেশ্বর (J. L. No. 4)		খতিয়ান নং	দাগ নং
(১) নারায়ণী দাসী	স্বামী রামলাল দাস	৫৭	১৭
(২) ক্ষান্ত বেওয়া	„ পঞ্চু মালা	৮৫	৮১
(৩) পটল বেওয়া	„ শশী মালা	৪৫৮	৩৪৮
(৪) ক্ষিরোদ বেওয়া	„ হরি বাগদি	৪৮৯	১৩৯৫
(৫) পদ্ম বেওয়া	„ গণেশ পণ্ডিত	৬৪৮	৮৪৭
(৬) গোলাপী বেওয়া	„ কালাচাঁদ অধিকারী	১৮৪	১০৯

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ মাঘ ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী সারদানন্দ**
পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী
১ মাঘ, শনিবার
(১৫ জানুয়ারি ২০০৫)

স্বামী তুরীয়ানন্দ
পৌষ শুক্লা চতুর্দশী
১০ মাঘ, সোমবার
(২৪ জানুয়ারি ২০০৫)

স্বামী বিবেকানন্দ
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী
১৮ মাঘ, মঙ্গলবার
(১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ
মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া
২৭ মাঘ, বৃহস্পতিবার
(১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
মাঘ শুক্লা চতুর্থী
২৯ মাঘ, শনিবার
(১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ ৬, ২২ মাঘ
বৃহস্পতিবার, শনিবার
(২০ জানুয়ারি, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্ব

মিনতি কর

[পুর্বানুবৃত্তি]

'সন্ন্যাসীর গীতি'তে বেদান্তসিদ্ধান্ত

এই কবিতাটিতে ('বীরবাণী' দ্রষ্টব্য) বিবেক, বৈরাগ্য, এষণাত্যাগ, বেদান্তের সাধন ও সিদ্ধান্তের কথা বিশেষভাবে পরিকীর্তিত হয়েছে। এইজন্য এই কবিতাটি বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে। আমরা এই কবিতার তাৎপর্য বিবৃত করব, যেখানে স্বামীজীর অদ্বৈততত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে যেভাবে—

"উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান
গভীর অরণ্যে, পর্বত প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে।"

পুরো কবিতাটির তাৎপর্য এইরকম—

গভীর অরণ্য বা পর্বতের নির্জন স্থান ভগবৎ আরাধনার অনুকূল। এখানে সংসারের কোলাহল নেই। সাংসারিক জীবনকে অতিক্রম করে এখানে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হয়। কামনা-বাসনা বিবর্জিত, যশ-মানে স্পৃহাহীন ত্যাগী সাধুগণ যে সৎ চিৎ আনন্দ-রূপ ত্রিবেণী ব্রহ্মসাগরে স্নান করে জীবনকে ধন্য করেন, সেই ব্রহ্মের নাম কর। সেই ব্রহ্মের বাচক ওঙ্কার বা প্রণব। 'ওঁ তৎ সৎ'—এই শব্দত্রয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

শৃঙ্খল লৌহময় হোক আর সুবর্ণময় হোক, তারা বন্ধন করে। শৃঙ্খল বন্ধনের প্রতীক। ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ উভয়ই মানুষকে নিপীড়িত করে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ, আর বিদ্বেষ—এই দুটি সাংসারিক শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে সংসার থেকে মুক্তি আসে না, এগুলি দাসত্বের চিহ্ন। উভয়ই আত্মোন্নতির পথে বাধক। যাদের কপালে এই দাসত্বের তিলক অঙ্কিত, তারা কখনোই স্বাধীনতা পেতে পারে না। স্বাধীন আনন্দ পেতে হলে আসক্তিকে বর্জন করতে হবে, বিদ্বেষকে বিদলিত করতে হবে। তাই নিরন্তর 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ'—এই চিন্তায় মগ্ন থাকা চাই।

যতক্ষণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির বিভ্রম হয়। অজ্ঞানই জীবকে অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। কেবল আত্মজ্ঞানই এই সংসারের আবর্তন থেকে মুক্ত করতে পারে। তমোময় রজ্জু জীবাত্মারূপ পশুকে বন্ধন করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তন করে। তাই হে সন্ন্যাসি! মৃত্যুরূপ অন্ধকারকে জয় কর, 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ'—এই মন্ত্র বারংবার আবৃত্তি কর।

কর্মফল অপ্রতিরোধ্য। কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা সব নিয়ন্ত্রিত। তাই শুভ কর্ম করলে শুভ ফল ও মন্দ কর্ম করলে মন্দ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এনিয়মের ব্যতিক্রম নেই। যে এই জগতের মোহপাশে আবদ্ধ হয়, সে অজ্ঞানের শৃঙ্খলকে চূর্ণ করতে পারে না। নামরূপে অন্বিত এই জগতের পারে আছে নিত্য মুক্ত আনন্দ। 'তত্ত্বমসি'—এই ব্রহ্মাত্মভাবনা থেকেই আসে চিরকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। তাই হে সন্ন্যাসি, 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ' মন্ত্র জপ কর।

এই জগৎ স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর মতো মিথ্যা। যারা স্বপ্নময় সংসারে ডুবে থাকে, তারা চরমতত্ত্বকে মানতে পারে না। পিতা, মাতা, জায়া, বান্ধব কেউই আপন নয়। শঙ্করাচার্যও বলেছেনঃ "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।" আত্মার লিঙ্গভেদ নেই; জন্ম-মৃত্যু নেই। তুমি কার পিতা, কার সন্তান, কার বন্ধু, কার শত্রু—এসকল চিন্তা বৃথা। যিনি সর্বময়, যাঁর অস্তিত্ব ব্যতীত এজগৎ অস্তিত্বহীন, সেই 'ওঁ তৎ সৎ'-রূপ পরমব্রহ্ম নিত্য চিন্তনীয়।

নামরূপ-বিবর্জিত শুদ্ধ আত্মা বিষয়ে গীতাতেও বলা হয়েছেঃ

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"[৪৫]

আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে মায়া বা অজ্ঞান, আর মায়াই সমস্ত বস্তুকে ভ্রান্তিরূপে প্রতিভাত করায়। আত্মা নিত্য সাক্ষী স্বরূপ। প্রতিবোধবিদিত জীবাত্মারূপে তিনিই বিবর্তিত হচ্ছেন। যদিও আত্মা বিদিত ও অবিদিতের অতীত, তথাপি আত্মাকে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়। 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম—একথা ভাবনা করে 'ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্র জপ কর। ভোগবাসনা চিত্তে বিদ্যমান থাকলে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। মন প্রশান্ত না হলে তীর্থগমনের উপযোগিতা কোথায়? বন্ধনরজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে মানুষ দুঃখের নিবৃত্তি ও মুক্তির অন্বেষণ করে। আসক্তিরজ্জুর বন্ধনকে শিথিল করলেই মুক্তি আসতে পারে। শোকই হলো অজ্ঞান। 'ইহামুত্রফল' অর্থাৎ ইহজগৎ ও পরজগতের ফলাকাঙ্ক্ষা, আশা, ভয় প্রভৃতিকে ত্যাগ করলেই মায়া বা অজ্ঞানের বন্ধন ছিন্ন করা যায়। অভয়মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হে সন্ন্যাসি, 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ' মন্ত্র জপ কর।

প্রারব্ধ কর্মের ফলানুসারে এই দেহের উৎপত্তি। প্রারব্ধ কর্মবশেই আবার নতুন দেহপ্রাপ্তি, এভাবেই সংসারচক্র প্রবর্তিত হয়। ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের ক্ষয় হয়। এই দেহ থাকল অথবা চলে গেল, তার জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। কেউ এই দেহকেই 'আত্মা' বলে মাল্যভূষিত করে; কেউ অস্থি, মজ্জা মাংসের সমষ্টি বলে দেহ দেখে নির্বিণ্ণ হয়। আত্মার একত্বের উপলব্ধি করে সর্বপ্রকার প্রারব্ধভোগের জন্য প্রস্তুত

থাকা কর্তব্য। স্তুতি বা নিন্দায় নিজেকে আন্দোলিত করা অনুচিত। আত্মা যদি এক হয়, তবে স্তব্য ও স্তাবক ভাব, নিন্দার্হ ও নিন্দনীয় ভাব থাকে না। সুতরাং চিত্তকে স্থির করে সমভাবাপন্ন হয়ে 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ'—এই ব্রহ্মের নাম কর। প্রকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করতে হলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহকে বর্জন করতে হয়। যে-ব্যক্তি রমণীর মোহে প্রলুব্ধ হয়, পত্নীর প্রতি আসক্ত হয়, সে কোন শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে জাগতিক বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়, যাকে ক্রোধ শৃঙ্খলিত করে—সে কোনদিন মায়াপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এজন্য এগুলি পরিত্যাগ করা কর্তব্য। দৈববশে যে-খাদ্য তুমি প্রাপ্ত, তাতেই সুখী হও; কারণ কোন খাদ্য বা পানীয় আত্মাকে মলিন করতে পারে না।

এই সংসারে তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা অল্প। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তোমাকে ভুল বুঝবে, যারা তোমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে তাদের তুমি অবজ্ঞা করো। তুমি নিত্যমুক্ত। যারা মায়ার আবরণে, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত—তাদের পথ দেখাও। সুখের অন্বেষণ বা বিপদের ভয়—এই দ্বন্দ্বের ওপারে যেতে হবে। এভাবে জীবনযাপন করলে কর্মক্ষয় হবে, আত্মার বন্ধনশৃঙ্খল ভেঙে যাবে, প্রারব্ধক্ষয়ের শেষে আর পুনর্জন্ম হবে না, তখন আনন্দস্বরূপে স্থিতি হবে। সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞান হবে। তাই হে সন্ন্যাসি, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ' —এই ব্রহ্মমন্ত্র জপ কর।

সমাধি

'যোগদর্শন'-এ বলা হয়েছে প্রদীপশিখার মতো মনে নিরন্তর অসংখ্যবৃত্তি উৎপন্ন হয়, আর বৃত্তির উৎপন্নতাহেতু মন সর্বদাই চঞ্চল ও আকুলিত। এজন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 'যোগ' বলা হয়। মনের বৃত্তিশূন্য অবস্থা যোগ। সমাধি যোগের চরম অবস্থা। 'যোগদর্শন'-এ সবিকল্প, নির্বিকল্প, সবিচার ও নির্বিচার সমাধি বিবৃত হয়েছে। নির্বিচার সমাধিই সমাধির শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থায় অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ। স্থূল থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মতত্ত্বে মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রলয় বা গভীর সমাধিতে চিত্তের অনুভূতি অপরূপভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছেঃ "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"[৪৪] বিবেকানন্দ বলছেনঃ

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্কসুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে-ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥"[৪৫]

যখন চিত্ত গভীর সমাধিতে প্রবেশ করে, তার আগে অস্ফুটভাবে জগৎসংসার প্রকাশিত থাকে। এই অবস্থায় 'অহম্' ব্যতীত আর কোন কিছু প্রকটিত হয় না। এই অস্ফুট ছায়াসম জগৎসংসার ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। তখন সাক্ষী স্বরূপ অহং বা আমি ছাড়া আর কিছুরই বিদ্যমানতা থাকে না। ঐ ধারাও বন্ধ হলে মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে 'অবাঙ্মনসো-গোচরম্' অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীতরূপে বর্ণনা করা হয়। তাই স্বামীজী বলছেনঃ "বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।" এই অবস্থা শুধু অনুভূতিবেদ্য। একেই মহানির্বাণের অবস্থা বলা হয়। তখন সাধক এই দেহেই ব্রহ্মানুভব করে থাকেন। তিনি স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

মানবপ্রেম

পরিশেষে বিবেকানন্দের মানবপ্রেমের কথা বলা উচিত, যা অদ্বৈতবেদান্ত, গীতা ও ভাগবতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। গীতায় বলা হয়েছেঃ

"লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥"[৪৬]

ক্ষীণকল্মষ মুনিগণ সর্বভূতের হিতে রত থেকে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ভাগবতেও বলা হয়েছে, সর্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের সেবা না করে যাঁরা শুধু বিগ্রহের পূজা করেন, তাঁদের পূজা ভস্মে ঘৃতাহুতির সমতুল্য।[৪৭] যাঁরা জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করেন। তাঁরা যুগে যুগে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তাঁরা মুক্ত—জন্মমৃত্যুর অতীত। সাধারণ মানুষকে ঐশীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দুঃখনিমগ্ন জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁদের হৃদয় মানবপ্রেমে উদ্বেলিত। বিবেকানন্দ বলছেনঃ "প্রেম প্রেম—এই মাত্র ধন।" যেমন পতঙ্গ মৃত্যু স্থির জেনেও অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করে, সেইরকম স্বার্থ-মলিনতা বিসর্জন দিয়ে সকলকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন করতে হবে। কারণ, সর্বজীবে একই ব্রহ্ম বিরাজমান। তাই প্রতিটি মানুষ অনন্তের অধিকারী। মানবপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতি একই কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।" যে সকল প্রাণীর হিতসাধন করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। সনাতন ভাবধারায় অদ্বৈততত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সকলের মধ্যেই সেই ব্রহ্মদর্শন করছেন। তাই মানবপ্রেমে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে—

"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"[৪৮]

[সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূচীঃ (৪৩) গীতা, ২।২০; (৪৪) কঠ উপনিষদ্, ২।২।১৫; (৪৫) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪০৭, পৃঃ ২০৮; (৪৬) গীতা, ৫।২৫; (৪৭) ভাগবত, ৩।২৯।২২; (৪৮) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১০।

কবিতা

নও শুধু ছবি

অজিত

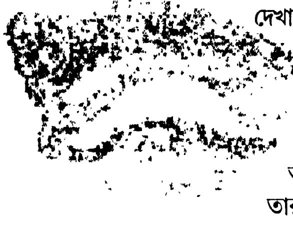
তোমার ছবি সামনে রেখে, নিত্য পরাই মালিকা,
তুমি জগদ্ধাত্রী দেবী, তুমিই দুর্গা-কালিকা।

এ তো শুধু ফটো নয়, কায়া-ছায়া সবই একই,
জগন্মাতা মাগো আমার, অপেক্ষাতে কদিন থাকি?

কত শত ভক্তজনে এল, গেল তোমার টানে
সত্য, মিথ্যা বুঝি না তো, মগ্ন থাকি তোমারি ধ্যানে

এই পৌষের পুণ্যদিনে, স্মরণ করি প্রাণটি ভরে
হে সারদা, শঙ্করী মা, পথের দিশা দেখাও মোরে।





তোমার মা, আমার মাও

সরোজকুমার মাইতি

রোজ সকালে উঠানতলে পবিত্রতা কে ছড়ায়?
—তোমার মা, আমার মাও।
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় নিত্য প্রদীপ কে জ্বালায়?
—তোমার মা, আমার মাও।

কখনো কোথাও বাইরে গেলে
ফেরার সময় পেরিয়ে গেলে,
সমুদ্বেগে আসার পথে তাকিয়ে সময় কে কাটায়?
—তোমার মা, আমার মাও।

সুদূর কোন্ বিদেশপানে
যাত্রা করার শুভক্ষণে
শতেক আশিস জানিয়ে তবু চোখের জলে আঁচল ভেজায়
—কে ভেজায়?
—তোমার মা, আমার মাও।

জ্বরের ঘোরে রোগশিয়রে সবার আগে কে রাত জাগে?
কে তার শীতল হাতের ছোঁয়ায় সকল ব্যথা ভোলায় আগে?
সকল সোহাগ নিঙড়ে দিয়েও বিপদ থেকে আগলে রাখে?
দুঃখ কোন দেওয়ার আগে শতেক দুঃখ নিজেই মাখে?
খাবার মুখে তোলার আগে কে বল আর ধরেন তুলে নিজের খাবার
—আমার মুখে, তোমার মুখেও?
—আমার মা, তোমার মাও।

বরদা-জননী

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি মা সারদা বরদা-জননী বিবেকানন্দ ধন্য,
এমন মাতার আশীর্বাদেই জগৎ অগ্রগণ্য।
অমৃতময়ী মাতৃত্বের এই ধারা অবগাহনে
নিবেদিতা হন কর্মমুখর প্রখর দীপ্তি দহনে।
তব আশ্রয় করুণা লভিয়া
কত অক্ষম গেল যে তরিয়া—
রত্নপ্রভা, তোমার প্রভায় হয়েছে রত্নময়;
অনাথ-আতুর-অস্পৃশ্যের করিয়ে হৃদয় জয়॥

সঙ্ঘজননী! স্তম্ভের মতো দুর্দিনে দীপ জ্বালি
দেখায়েছ পথ, অশেষ করুণা প্রেমধারা দিলে ঢালি।
চিনালে সবারে মানবধর্ম কেমনে করিতে হয়,
কোন্ অবিচল সত্যের পথে ঈশ্বরে প্রেম রয়।
সংসারে থেকে প্রীতি সমধুর—
যে-পথ দেখালে নয় সে তো দূর।
অশান্ত চিত্তে কেমনে বধূর হৃদি হবে ভরপুর—
তারই একান্ত গোপন ব্যথাটি করে দিলে সব দূর॥

তোমার ছোঁয়ার এক নিমেষেই অপ্রিয় প্রিয় হয়,
গঙ্গা-যমুনা মিলনক্ষেত্র জেগে ওঠে সমুদয়।
ওঠে গান, প্রাণ কোকিলের মতো, আন্তরিকতা মনে,
অমল ধবল পবিত্রকথা প্রণব উগারে বনে।
অসংশয়ের তুমি মা জননী,
তুমি ধ্রুবতারা, উপাস্যা ধরণী,
সন্তানে তব রেখেছ ধরিয়া স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া,
আঁধিয়া জানে না সাধিয়া তোমারে—'বরাভয়' বাণী নিয়া॥

মায়ের ডাকে আরেক মা

মন্দিরা মহাপাত্র

আকাশ ছুঁতে চেয়ে যখন
পড়ি কঠিন ভুঁয়ে,
ডাক পাঠালে—আবার দাঁড়াই
তোমার স্নেহচ্ছায়ে।
বজ্রমুঠি খুলল যখন
তোমায় নমস্কারে,
তোমার মায়ায় তোমার ছায়ায়
দুচোখ জলে ভরে।
কত মা যে ধন্য হলো
আজ তোমার চরণ চুমি,
মা হওয়া নয় মুখের কথা
তাই জানালে তুমি।

একান্ত আপন

মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য

হিংসায় মত্ত পৃথিবী বড় দুঃসময়।
চারিদিকে কোলাহল কখন কি হয়॥
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই—হাঁকিছে সবাই।
এক দেশ এক প্রাণ মোরা ভাই ভাই॥
তবুও পীড়ন করে সবল দুর্বলে।
ধর্ম নাই নীতি নাই গেল রসাতলে॥
যেদিকে তাকাই শুধু স্বার্থ আর স্বার্থ।
প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সকলই ব্যর্থ॥
সংসার কুটিল চক্রে ঘোর অন্ধকার।
টাকাকড়ি ধন জন সবই অসার॥
কে আছে আপনজন কাকে বলা যায়।
সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিপদে সহায়॥
ভাবিতেছি মনে মনে কি হবে উপায়।
হেনকালে কানে কানে কেবা যেন কয়॥
'ভয় কিবা আছে বাছা আমি আছি তোর।
ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সব ভার মোর॥
সবেতেই আমি আছি আমাতেই সব।
অন্তর বাহির আমি আমি অনুভব॥
আমার অজানা কিছু নাহিকো ভুবনে।
যাহা কিছু ঘটে হেথা মোর ইচ্ছাধীনে॥
ভীষণে ভীষণ আমি ভয়ালের ভয়।
আমাতেই সৃষ্টি স্থিতি আমাতে প্রলয়॥
শান্ত আমি স্নিগ্ধ আমি মধুরে মধুর।
সদানন্দময় আমি আনন্দ প্রচুর'॥
দেখিলাম চোখ মেলে কেবা হেন জন।
দুহাত প্রসারি আছে একান্ত আপন॥
কহিলেক মৃদুভাষে অতিশয় জোর।
'আর কেহ নাহি থাক আমি আছি তোর॥
সাজানো পাতানো নয় গুরুপত্নী নয়।
সত্যিকারের মা আমি আছি বিশ্বময়॥
কেহ হেথা পর নয় জগৎ তোমার।
শান্তি যদি চাও নিজ দোষ ধর আর॥
সহ্যের অধিক গুণ নাহিকো সংসারে।
সন্তুষ্টির বাড়া ধন কি থাকিতে পারে॥
মা বলিয়া ডাকে যেবা আমি তার হই।
ধুলোকাদা ঝেড়ে মুছে কোলে তুলে লই'॥
এতদিনে চিনিলাম আপনার জন।
'মা মা' বলে শ্রীচরণে লইনু শরণ॥



বড়দিন

স্নেহেন্দু মাইতি

গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল
হাজারটা মোমের আলোয় ঝরে পড়ল বিভূতি
ফাদারের 'সারমন' তরঙ্গায়িত হতে হতে
ধুইয়ে দিচ্ছে এঁটো চুম্বন, পেঁচার ডাক, কালপুরুষের ইশারা...
প্রভুর পাদপ্রদীপের শিখা অবিকল সূর্যের মতো
হৃদয়ে আঁতিপাতি খুঁজে খুলে দিচ্ছে ফুলের পাপড়ি
হিমের বিনম্র পেলব স্পর্শ
মমতায় মুছে দিচ্ছে ধর্মের মুখে কালো দাগ
অগ্নিগর্ভ পাপের মুখে ঢালছে শান্তিজল
গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত কালো রাত
কাকে শুনিয়ে চলে গেল, আবার আসব—
ঝুলিকাঁধে একলাফে ঘরে ঢুকলেন সান্তাক্লজ।





মা সারদা

গোবিন্দলাল কর্মকার

সবখানেতে চোখ যে তোমার সব কাজেতে দড়
আর্ত আতুর ব্যাকুল ধরায় কে তবে কার বড়?
অমানিশার করাল আঁধার ঘেরে যখন দিশা
সব পেয়েছির দেশের আলোয় যোগাও মনে আশা।
সোঁদা মাটির গন্ধে পাথার দোলাও তোমার কোলে
দামাল কামাল সৎ-অসতের ঘর-ভোলানো ছেলে।
বিশ্বমায়ের বিভূতি সে রিক্ত বসন সাজে
স্নেহপীযূষ ঝরাও ভরাও নিঃস্ব বুকের মাঝে।



দহন দানে

নিখিল পাণ্ডে

বিয়োগে বিয়োগে বিচ্ছিন্ন কর, বিধ্বস্ত কর আমাকে
হে দুঃখ, তুমি আমাকে পূর্ণগ্রাস কর।
গভীর অন্ধকারে ব্যাপৃত হোক আমার জীবন
আমি ফের অভিষিক্ত হই এই দুঃখবেলায়।

তুমি নিবিড় আলিঙ্গন দাও আমাকে, মুক্তির মতো
শোকের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে
মুক্তির আলো দেখাও নক্ষত্রের মতো
চাওয়া-পাওয়ার কোন তীরেই না ভিড়ুক তরী।

অন্ধকার যেমন ব্যাপৃত হয় অন্ধকারে, জল
যেমন ব্যাপৃত হয় জলে, অসীম যেমন ডানা
মেলে অনন্তের বুকে, ঠিক সেইভাবে দহন তুমি
পূর্ণ দহনে অভিষিক্ত কর।



প্রাসঙ্গিকী

ঐ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত আমার 'আস্তিকতার স্বরূপ কী' শীর্ষক পত্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করে গত শ্রাবণ ১৪১১ সংখ্যায় দুখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অনেক চিঠি আমার বাড়ির ঠিকানায়ও এসেছে। এঁরা সকলেই 'উদ্বোধন'-এর বিদগ্ধ পাঠক। আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীতাপসরঞ্জন ঘোষ আমার লেখাকে 'অদ্ভুত ভাষ্য' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অভিযোগের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন না তুলে পাঠকের প্রতি বিনম্র দায়বদ্ধতা স্বীকার করে 'উদ্বোধন'-এর পাতায় কিঞ্চিৎ স্থান ভিক্ষা করি।

প্রসঙ্গত বলি, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যবশত কোনরকম 'ভাষ্য' দেওয়ার মতো ধার বা ভার কোনটিই আমার নেই। উনি হয়তো কিছু বলতে চেয়েছেন, কিন্তু ওঁর বক্তৃতা পৌনঃপুনিকতায় রুদ্ধ।

ভারত বৈদিক সভ্যতা ও সনাতন ধর্মের দেশ। বেদ, উপনিষদ্, গীতার বাণী আমাদের সম্পদ। সত্য কথা। কিন্তু কালের আবর্তে সত্যও চঞ্চল। বিশ্বে 'rigid' বলে কিছু আছে কি? এমন কোন প্রথা নেই যা একদিন-না-একদিন ভাঙা হয়নি বা হবে না। ধবল বসনও মলিনতা লাভ করে। ধর্মেও কী গ্লানি জন্মে না? গীতার বাণী স্মরণীয়ঃ "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি...।" মার্জনাপত্র বিক্রয়কে কেন্দ্র করে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়নি? উপনিষদের বাণীঃ "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। এ তমসা অজ্ঞতার আঁধার। কবির ভাষায় 'অদ্ভুত আঁধার'। আলো কষ্ট করে জ্বালাতে হয়, কিন্তু আঁধার এমনিই আসে—যাকে বিদীর্ণ করতে পারে একমাত্র জ্ঞানালোক। আমাদের সমাজকে একদা সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রথা জর্জরিত করেছে। বৈদেশিক শাসকদের দৌলতে ও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিছু অমানবিক প্রথা রদ হয়। তখন সনাতনপন্থীরা এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে বিলেতে দরখাস্ত পাঠিয়েছে! আমরা 'অমৃতের পুত্ররা' বড়ই লড়াই ও বড়াই-প্রিয়। অথচ মধু-কৈটভরা চারপাশে ঘুরঘুর করছে।

সমাজ ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সমাজ বদলায়। "Society is created and recreated by man." পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। যে-পরিবর্তন যুগের প্রয়োজনে, তাকে কি সনাতনী মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া বলে? ঐতিহ্যকে ধারণ করা আর আঁকড়ে থাকা কি এক জিনিস?

ইতিহাসকে অস্বীকার করলে ধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দীর্ঘ ৩৩১ বছর সুলতানী ও ৩৩৬ বছর মোঘল, তারপর ২০০ বছর ইংরেজ দ্বারা ভারত বৈদেশিক শাসনাধীন ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশিদের দ্বারা লিখিত। ভারতে যখন চৈতন্যের যুগ, তখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়নি। ইউরোপে ঘটছে শিল্পবিপ্লব। জলদস্যু ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতে এক-একটি অঞ্চল অধিকার করে ক্রীতদাসের চালান বাড়াচ্ছে। মা ও মাটির সম্মান ভূলুণ্ঠিত। আমরা তখন বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে ঢোল বাজিয়ে সতীর চিৎকার চাপা দিচ্ছি! অনেক দেরিতে কবি বললেনঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য।" তারও অনেক পরে এক সন্ন্যাসী বললেনঃ "হে ভারত ভুলিও না... উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" নিজের দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার তাগিদে জাগরণের ডাক দিলে কি দেশীয় ঐতিহ্য হারিয়ে যায়? স্বামীজীর ভাষণ স্মরণীয়ঃ "আমেরিকাবাসী আমার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।" মানুষকে বোন বা ভাই বলে সম্বোধন—বিশেষত ভিন্ন ধর্মী ও বিদেশিদের—এক্ষেত্রে কি মানবতা তথাকথিত শাস্ত্রবিদ্দের ঈশ্বরের চেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি? মহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের হইল ঈশ্বর কেন্দ্র, জীব বা মানুষ পরিধি। বিবেকানন্দের হইল জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র—ঈশ্বর পরিধি।"

প্রশ্ন ছিল—যিনি প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু মানুষের একনিষ্ঠ সেবক, তিনি কি নাস্তিক? বাইবেলে আছে—"He loves those who loves His fellowmen." 'Education' যদি 'manifestation of the perfection' হয়, তাহলে 'Divinity is manifestation of the humanism' নয় কেন? ঈশ্বরত্বকে মানদণ্ড করে মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন কি অযৌক্তিক? নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর কেন বলেছিলেনঃ "তোর ঘাড় করবে।" এ কি 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানো' নয়? শুধু 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নয়, 'জগদ্ধিতায় চ' বটে। আমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, কল্পনার ঈশ্বরকে পূজা করি অথচ যাঁরা আহার্য, বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত জল, ওষুধ সরবরাহ করে অপরকে প্রাত্যহিক জীবনযাপন করতে সাহায্য করেছেন—তাঁদের স্মরণ করি না।

"Face the brute" কথাটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমি মনে করি, কথাটি ব্যঞ্জনাময়। 'ভক্তি-পিপাসিনী মাতা' কথাটি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের। আমি ব্যবহার করেছি মাত্র।

একাধিকবার 'টেনে আনা' কথাটির ব্যবহার আমাকে বিড়ম্বিত করেছে। বিষয়ের ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ (outlook) অনুযায়ী হয়ে থাকে। তা অপব্যাখ্যা, কি অপ-রূপ ব্যাখ্যা, সেকথা হৃদয়ঙ্গম করার দায়িত্ব পাঠকের, লেখকের নয়।

আমার পত্রে মূল কপিতে 'নাস্তিক' প্রসঙ্গে ছিল—"ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমি বঞ্চিত হলাম।" ছাপা কপিতে দেখলাম—'বঞ্চিত হলাম' স্থলে 'আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না' হয়েছে। লক্ষণীয়, 'বঞ্চিত হলাম' বললে বঞ্চনাকারী হিসাবে ঈশ্বরকে ধরতে হয়। পক্ষান্তরে, 'উপলব্ধি করতে পারলাম না'—বললে উপলব্ধিকারী 'ব্যক্তি'কে বোঝায়। সত্যিই তো আমরা ঈশ্বরকে সর্বদা গুণময় হিসাবে দেখব। আমি এই সুসম্পাদনার জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে দেখতে পায় না। দরকার হয় দর্পণের। ভগবানের দর্পণ ভক্ত। ভক্তের দর্পণও ভক্ত। আসুন, বৃথা তর্ক না করে আমরা (তিন্ধন) ভক্তচন্দন ঘর্ষণে, 'মলয়জ গন্ধেন' একটু আনন্দলাভ করি।

নরেশ বিশ্বাস

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪১২

একটি সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংবাদ' বিভাগে একটি ভুল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি' পর্যায়ে স্বামী পুণ্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম লেখা হয়েছে 'প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়'। তাঁর উপাধি 'মুখোপাধ্যায়' ছিল না, ছিল 'চট্টোপাধ্যায়'। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা বিধুমণি দেবী। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজের ঘনিষ্ঠ স্নেহচ্ছায়ে ১৯৪২ সাল থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, আমি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র।

অর্ধেন্দু দত্ত

বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা-৬৫

'উদ্বোধন'-এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল কাঁথি সেবাশ্রম-প্রকাশিত একটি স্মারকপত্রে (২০০৩) প্রকাশিত তথ্যের (পৃঃ ৩৬) ভিত্তিতে। তবে বর্তমান পত্রটি পাওয়ার পর আমরা বেলুড় মঠে অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, উক্ত তথ্যটি ঠিক নয়; পুণ্যানন্দজীর পূর্বনাম ছিল 'প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়'। পত্রলেখককে ধন্যবাদ।—**সম্পাদক**

'মন পবনের নাও'কে যে নোঙর দিতে হয়

আমরা বোধহয় সকলেই অবগত 'Paradise Lost'-এর সেই মিল্টনীয় উক্তিটি সম্পর্কে ঃ "Mind in its place can make a heaven hell, a hell heaven." সত্যিই 'মন'ই পারে নিজস্ব অবস্থানে অনড় থেকে স্বর্গকে নরক করে তুলতে, নরককে স্বর্গ। বোধহয় এই কারণেই সাধক-কবির আক্ষেপ ঝরে পড়েছে ভক্তিমূলক সাঙ্গীতিক অর্ঘ্যে—"মনরে কৃষি কাজ জান না।" যে অনাবাদী জমি পড়ে থাকে পতিত, তাতে আবাদ করলে সত্যিই সোনা ফলে; আর সেই নিকষিত হেমই পারে পরশপাথরের পরশে আমাদের মনের অন্ধকারে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রমার আলোকমালা প্রজ্বলিত করতে। ঠিক এই প্রেক্ষায় কার্তিক ১৪১১ সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এর 'সবুজপাতা'য় 'কথামৃত-পরিচয়'-এ 'অবধূতের চিলগুরু' একটি অনির্বাণ অমল আলোকবর্তিকা। ছড়াকার সুনীতি মুখোপাধ্যায় ও শিশু চিত্রশিল্পী অনুস্মিতা মণ্ডলের চিত্র-শব্দের বর্ণমালা পাঠক-পাঠিকাকে এক মর্মস্পর্শী মুগ্ধবোধের আশ্লেষে আবিষ্ট করে। যে-চিলটি 'বাসনা'-রূপ মৎস্য চঞ্চুতে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো, বায়সরূপী অসংখ্য দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার জাল তার মগজকে প্রতিনিয়ত করে তুলল ক্ষতবিক্ষত, ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু যেইমাত্র সে 'কাম-কাঞ্চন'রূপ 'আঁশটে গন্ধ লাগা' মাছকে পরিত্যাগ করল, এক অনিন্দ্য প্রশান্তি, অপরূপ প্রসন্নতা, অপার্থিব প্রফুল্লতা ও পুলক তার 'মন'কে পুনরায় জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা দিল ফিরিয়ে। ধন্যবাদ 'উদ্বোধন'। ধন্যবাদ লেখক ও শিল্পীকে, নয়নের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের লোকশিক্ষার বৈদূর্যবাণী মরমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিরাসক্ত মনেই যে মায়ের শীতলপাটি বিছানো।

সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

উলুবেড়িয়া, হাওড়া



একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

একদা ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল ঃ "অম্বিতমে নদিতমে দেবিতমে সরস্বতি।" দেবী সরস্বতী জ্ঞানপ্রবাহরূপে নদীর আকারে ভারতবর্ষকে এক পুণ্যশ্লোক দেশ বা জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি গবেষণামূলক হলেও চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। বর্তমান প্রাবন্ধিক যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে সেইসব মতবিরোধের যথাসম্ভব সমন্বয় করেছেন এই প্রবন্ধে।—সম্পাদক

সাড়ে তিনহাজার বছর আগে

মহাভারত একটি কাব্যগ্রন্থ—সময়কাল ১৬০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর বেদের রচনাকাল ৩০০০ থেকে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। যদিও এসব নিয়ে মতভেদ আছে, তবু সাধারণভাবে এই সময়টাই চিহ্নিত করেন সকলে। মহাভারত সম্বন্ধে খুব বেশি মতবিরোধ অবশ্য নেই। এই দুটি সময়কাল খুব প্রয়োজন, তার কারণ ইতিহাসের কাল (৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যখন অক্ষরমালা বা লেখার প্রচলন হলো) থেকে আরো পিছনের দিনের খবর, বিশেষ করে ভারত সম্বন্ধে, পেতে গেলে এইসব প্রাচীন গ্রন্থ ভাল উপাদান। বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারত সেইসময়কার দেশ, কাল, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং সমাজশাস্ত্রের খনি বিশেষ। প্রশ্ন হলো, মহাকাব্যগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য? কিন্তু সেই বিতর্কে না গিয়ে সেখান থেকে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে—সেটা আগে বুঝে নেওয়া যাক।

ঋগ্বেদে মোট পঁয়তাল্লিশ বার সরস্বতী নদীর স্তুতি করে মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলিতে নানাভাবে সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে—তিনি অন্ন দেবেন, ধন দেবেন, পালন করবেন, রক্ষা করবেন, পুত্র দেবেন, প্রজ্ঞা উৎপাদন করবেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম 'শুভ্রবর্ণা' বলে বন্দিত হয়েছেন। বশিষ্ঠ ঋষি তাঁকে একটি সূক্তের ছয়টি মন্ত্রের মধ্যেই (১০ম মণ্ডল, ৯৬ সূক্ত) এইসব প্রার্থনা করছেন। প্রথমে দেবীরূপে সরস্বতীর কাছে, তারপরে সরস্বান দেবতার কাছে। সরস্বান দেবতার কাছে চাওয়া হচ্ছে স্ত্রী, পুত্র এবং অন্যান্য ভাল ভাল দান। ঋগ্বেদে সরস্বতী 'বাগ্দেবী' এবং 'ভারতী' বলেও বর্ণিত হয়েছেন। তাঁর মহিমা এবং অতুলনীয় দান ছাড়া আর বেশি খবর কিন্তু পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে মহাভারতে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যায়। বনপর্বে পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়ানোর যে-বর্ণনা আছে, তার মধ্যে প্রচুর তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। সরস্বতী নদীর তীরে যত তীর্থ ছিল, সবগুলির উল্লেখ আছে এবং তার মধ্যে কোথায় কোথায় সরস্বতী লুকিয়ে পড়ছেন, আবার কোথায় কোথায় সরস্বতী উঠে আসছেন—তার কথাও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি উল্লেখ করা উচিত বলে মনে হয়। সরস্বতীর সাগরসঙ্গম (কচ্ছ) এবং সিন্ধুর সাগরসঙ্গম (আরবসাগর) যে আলাদা ছিল তা বলা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, সরস্বতী নদী সিন্ধু নদে গিয়ে পড়েছিল। এখানে তার বিপরীত খবর পাওয়া যায়। বিনশন তীর্থ নিয়ে বলা হয়েছে—এইখানে অন্তর্হিত হয়ে তিনি মেরুপৃষ্ঠে, চমসোদ্ভেদে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে (সবগুলিই তীর্থস্থান) গমন করেছেন। ইদানিং একটি সরস্বতী-পুরাণ লেখা হয়েছে, তাতে এই প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির আধুনিক পরিচয় এবং সব লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধারের কথা রয়েছে। প্লক্ষাবতরণ তীর্থ ঠিক হরিদ্বারের (গঙ্গার ক্ষেত্রে) মতো সরস্বতীর অবতরণ-স্থান। তখন হরিদ্বার ছিল না, তার মাহাত্ম্যও প্রচার হয়নি।

যেহেতু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবরণ অন্যরকমভাবে পাওয়া যায় না, তাই লোককথা, পুরাণ, মহাকাব্যগুলি অথবা আরো পুরনো বেদ, উপনিষদ্গুলির ওপর নির্ভর করতেই হয়। এছাড়া মাটির নিচে চাপা পড়ে যাওয়া লোকালয় অথবা অন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এইসব উপাদান কতটা নির্ভরযোগ্য? প্রত্নতত্ত্ব খুব ভাল উপাদান, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করার মধ্যে মতামত ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। বেদে স্তবস্তুতি গুণপনার ব্যাখ্যা যত হয়েছে, ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা সেই তুলনায় কিছুই নেই। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। বশিষ্ঠ ঋষি বলছেন—তিনি আপন মহিমা দ্বারা অন্য সমস্ত জলপ্রবাহকে আবৃত করে রথের ন্যায় গমন করেছেন। এতে খবর পাওয়া যাচ্ছে, অন্য সমস্ত নদী সরস্বতী নদীতে এসে পড়েছে—এই পর্যন্ত। কবিত্ব বেশি, খবর কম। মহাভারত নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি কাজ হচ্ছে অনেক বছর ধরে। ভারতের অনেকগুলি ইউনিভার্সিটিতে (দিল্লি, মিরাট, পুনা, হায়দ্রাবাদ, বরোদা) এই সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কতকগুলি রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে অনেক নতুন খবর পাওয়া গেছে। দিল্লির কাছে ইন্দ্রপ্রস্থ এবং মিরাটের কাছে হস্তিনাপুরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে প্রামাণিক রিসার্চ পেপার প্রকাশ করা হয়েছে। সেই হিসাবে মহাভারতের গল্পকাহিনী এখন অনেক বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মহাভারতের কালনির্ণয় করে তাঁদের রিপোর্ট দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে সেই সময়টা তাই ধরে নেওয়া হয়েছে ১৬০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এবং তাহলে সেইসময়কার যেসব বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে ঠিক ধরে নেওয়া যায়।

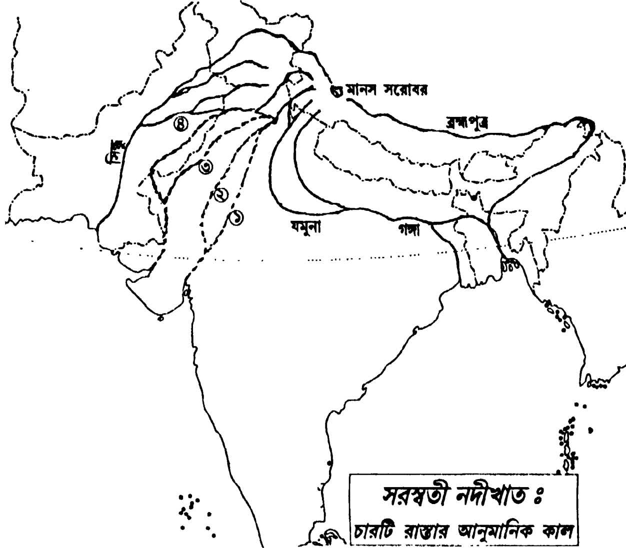
মহাভারতের মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখ বারবার হয়েছে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য থেকে অনেক উপাদান

সদাশিব উবাচ

ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতীং বিন্দ্যাৎ প্রয়াগাদি সমন্ততঃ।।

(হঠযোগপ্রদীপিকা, ২০।১)

নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে আমাদের পক্ষে এক-আধটি মূল্যবান তথ্যের কথা বলা যেতে পারে। এমনি একটি তথ্য হলো—শল্যপর্বে উল্লিখিত সরস্বতীর সাতটি নাম এবং সেই নদীগুলির স্থাননির্ণয়। ব্রহ্মা পুষ্করে যজ্ঞ করার সময় সরস্বতীকে আহ্বান করলেন এবং সেখানে তার নাম দিলেন



(১) ১ লক্ষ বছর আগে থেকে ২৮,০০০ বছর আগে পর্যন্ত। (২) ২৮,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর আগে পর্যন্ত। (৩) ১০,০০০ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর আগে পর্যন্ত (মোটামুটি ইন্দিরা গান্ধী ক্যানালের রাস্তা)। (৪) ৫,০০০ বছর থেকে ৩,৫০০ বছর আগে পর্যন্ত (১,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে।

'সুপ্রভা'। নৈমিষারণ্যে সাধুরা সরস্বতীর নাম দিলেন 'কাঞ্চনাক্ষী', তাহলে নৈমিষারণ্য কোন্‌খানে ছিল? এখনকার নৈমিষারণ্যে মনে হয় গোমতী নদী রয়েছে। মহর্ষি গয় যজ্ঞ করার সময় নাম দিলেন 'বিশালা', জায়গাটার নাম ছিল 'গয় দেশ'। এটা কিন্তু গয়া নয়, গয়ার নাম গয়াসুর থেকে হয়েছে। উত্তর কোশলের মুনি মণ্ডলী নাম দিয়েছিলেন 'মনোরমা'। রাজা কুরু নাম দিয়েছিলেন 'ওঘোবতী', জায়গার নাম কুরুক্ষেত্র। শিবের স্ত্রী সতীর পিতা দক্ষ নাম দিয়েছিলেন 'সুরেণু', জায়গার নাম গঙ্গাদ্বার (আজকের কনখল)। কনখলে তো গঙ্গা থাকা উচিত, সরস্বতী এল কোথা থেকে? ব্রহ্মা হিমালয়ে যজ্ঞ করার সময় নাম দিয়েছিলেন 'বিমলোদকা', জায়গার নাম পাওয়া যায়নি। এমনি সব নানারকম গল্পকথা থেকে উদ্ধার করে নিতে হবে প্রয়োজনীয় খবরটা—যা আমাদের কাজে লাগতে পারে। এই অংশটি এই কারণে উল্লেখ করা হলো যে, এখান থেকে বোঝা যায় সরস্বতী কুরুক্ষেত্র থেকে পুষ্করের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। আরেকটি তথ্য যা খুবই চিত্তাকর্ষক, তা হলো গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার থেকে সরস্বতী দূরে ছিল না। যমুনার স্থানে কি তখন সরস্বতী ছিল? এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক।

এরপর আসছে বিভিন্ন পুরাণের কথা, তারপর তন্ত্রের কথা, তারও পরে মন্দির সংস্কৃতির কথা। যত সময় গেল, নদী হিন্দুধর্মের এক প্রধান দেবী-রূপে আবির্ভূত হলেন; 'সারদা', 'বীণাপাণি', 'বিদ্যাদেবী' নামে অভিহিত হলেন। তাঁর চার হাত; হাতে অক্ষমালা, বেদ, বীণা ধরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সমস্ত ধর্মপুস্তকের মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ছাড়া নদীটির বিষয়ে সবাই একইরকমভাবে নীরব। হিন্দু চিন্তাধারার ত্রিবেণী সঙ্গমের সরস্বতীর সঙ্গে আসল নদী সরস্বতী নদীর কোনরকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম—এই চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হলো কিভাবে?

প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গম

প্রথমেই যদি বলা যায়, ত্রিবেণীতে তিনটি নদীর সঙ্গম কোনদিন ছিল না, হয়নি এবং এটি একটি 'মিথ' (রহস্য), তাহলে সমগ্র হিন্দুসমাজের বিশ্বাসকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেওয়া হবে। এবং সেটি হবে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ভৌগোলিক ঘটনা এটাই। প্রশ্ন হলো, এত বড় একটা হিন্দু মানসিকতা তাহলে কি অলীক চিন্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে? এটা হয় না অথবা বলা যায়, হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত নয় এই কারণে যে, মিথ্যার ওপর নির্ভর করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মের ধোঁকা দিয়ে প্রচার করে যাবেন, তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই 'মিথ'-এর প্রচার করে গেছেন তাঁরা, মিথ্যা প্রচার করেননি। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত।

১৯৬৪ সালে রবার্ট রাইক্স প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ভূমির উৎক্ষেপণের (টেকটনিক আপহিভ্যাল) ফলে সরস্বতী সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে জার্মান ভূবৈজ্ঞানিক হার্বার্ট উইলহেলমি উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদীগুলির জলগ্রহণব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বললেন যে, সরস্বতী নদীর জলরাশি কিছুটা শতদ্রু আর কিছুটা যমুনা নিয়ে নিয়েছে। তিনি বললেন, সরস্বতী আর যমুনার জলগ্রহণভূমি (ক্যাচমেন্ট এরিয়া)-দুটি খুব কাছাকাছি। যমুনা কালক্রমে মোট তিনবার নিজের পশ্চিমদিকে সরে সরে এসেছে এবং সরস্বতীর খাতটি দখল করে নিয়েছে। অতএব পুরাণের যুগে যখন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমের কথা চিন্তা করা হলো, তখন এটাই মনে করা হয়েছিল যে, যমুনার জলে সরস্বতীর জল মিশে আছে।

এখানে একটি প্রধান স্মর্তব্য বিষয় এই যে, বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিল প্রধান পুণ্যতোয়া নদী, দেবী। গঙ্গা বা যমুনা ছিল গৌণ নদী এবং তাঁদের দেবীত্বে উত্তীর্ণ হওয়া পরবর্তী ঘটনা। ঋগ্বেদে যেখানে পঁয়তাল্লিশ বার সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়,

সেখানে গঙ্গার উল্লেখ মাত্র দুবার এবং যমুনার উল্লেখ মাত্র তিনবার আছে। সুতরাং দেবী সরস্বতীর জল যমুনাতে মিশে আছে—এই সত্য ঘটনা একটি মস্ত বড় খবর হয়ে উঠেছিল এবং ত্রিবেণীতে তাই তিনটি নদীর জল মিশে গেছে—এই আনন্দে সবাই সন্তুষ্ট হলো। সরস্বতী ওখানে লুপ্ত হয়ে রয়েছেন, তাও যেমন সত্য; সঙ্গমে তিনটি স্রোতের মিশ্রণ হয়েছে, তাও তেমনি সত্য। ত্রিবেণীতে আলাদা করে সরস্বতীর কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ওখানে স্নান করলে তিনটি নদীর জলে স্নান হবে, তার মধ্যে প্রবঞ্চনাও নেই।

১৯৮০ সালে দিল্লির প্রফেসর যশপাল আমেরিকার *ল্যাণ্ডস্যাট উপগ্রহের দ্বারা তোলা ছবি দেখে সরস্বতীর শুকিয়ে* যাওয়া খাতটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন—হরিয়ানার আদিবদরী থেকে রাজস্থানের কালীবঙ্গান হয়ে পাকিস্তানের নওয়াকোট পর্যন্ত। এরপর ১৯৮৪ সালে যোধপুরের সরস্বতী গবেষণা কেন্দ্রের মরোপন্থ পিংলে ভারত সরকারের সহায়তায় ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) দ্বারা ভারতীয় স্যাটেলাইট দিয়ে সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া খাতের ছবি তুলতে সমর্থ হন। এটা এখন প্রামাণ্য ছবি হিসাবে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে পুরনো নদীখাত সম্বন্ধে বিখ্যাত (ভীমবেটকা গুহা খ্যাত) বিশেষজ্ঞ ভি. ওয়াকানকার ট্রেকিং করেন আদিবদরী থেকে সোমনাথ পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গে পঁয়ত্রিশজন অন্য বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তাঁরা ঠিক মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী কৃষ্ণের দাদা বলরামের পথ ধরেই পরিক্রমা করেন, কিন্তু উলটোদিক থেকে। সরস্বতীর সবচেয়ে শেষের পর্যায়ের রাস্তাটি জানা হয়ে যাওয়ার পর ভারত সরকারের এদিকে নজর পড়ল। ১৯৯৮ সালে সেণ্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার কমিশন সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া বুকে চব্বিশটি গভীর কুয়ো ড্রিল করল এবং আশানুযায়ী তেইশটি কুয়োতে স্বাদু এবং পেয় জল পেল। সেই জল পরীক্ষা করার পর জানা যায়, এই জল আট থেকে চোদ্দ হাজার বছরের পুরনো। শুধু তাই নয়, আইসোটোপ পরীক্ষা করে ভাবা এটমিক রিসার্চ রায় দিলেন—এই জল এসেছে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার থেকে। কুয়োগুলির গভীরতা মাত্র ১৪০ মিটার বা তার চেয়েও কম।

এইসব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রবন্ধলেখকও কিছুটা যুক্ত। সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে বন্দরপুছ হিমবাহকে চিহ্নিত করেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর ডাঃ ভি. এম. কে. পুরী। তাঁর কথামতো একটি দলের সঙ্গে সেই জায়গাটায় গিয়ে বন্দরপুছ পর্বতের সম্পূর্ণ গ্লেসিয়ারটি এবং তা থেকে উৎপন্ন সুপিন নদীটির পাশে পাশে ট্রেকিং করে নেমে এসে ঠিক কোন্ জায়গায় নদীর খাত অন্য রাস্তায় ঘুরে গেছে—সেটা দেখার চেষ্টা করেছেন। সুপিন নদী নেটওয়ার গ্রামের কাছে আসা আরেকটি স্থানীয় নদী রূপিনের সঙ্গে মিশে টন্স নদীর সৃষ্টি করেছে। এই টন্স হলো আসল সরস্বতী নদী। টন্স এখন দেরাদুন থেকে চক্রাতার রাস্তায় কালসিয়া গ্রামের কাছে যমুনায় মিশেছে। আগে তা ছিল না। আগে টন্স নদীর জল চক্রাতা থেকে দেওবানের মধ্যে কোন একটি জায়গায় দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্য রাস্তা ধরে চলেছিল। প্লক্ষাবতরণ তীর্থে (সম্ভবত আদিবাসী) শিবালিক পাহাড় থেকে নেমেছিল এবং হরিয়ানা-পাঞ্জাব হয়ে পাকিস্তানে ঢুকে সিন্ধু নদের সমান্তরাল হয়ে চলে (রাইনি নদী, পূর্ব নারা নদী) আবার ভারতে প্রবেশ করেছিল। এটাই তার শেষ যাত্রাপথ। দেওবানের কাছে ঠিক কোন্ জায়গায় সরস্বতীর স্রোত বাধা পেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে যায়, সেটা বুঝতে পারা গেলেও এখনো প্রমাণসাপেক্ষ বলে এই প্রবন্ধে বলা হলো না।

এরপর হরিয়ানার ওপর দিয়ে কুরুক্ষেত্র, হিসার এবং ঘগ্গরের খাতও ঘুরে দেখেছি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে বিকানির, জয়শলমির, তানোট, সাধেওয়ালা, অকল পার্ক ইত্যাদি স্থান এবং লুনি নদীর সঙ্গে পচভদ্র সঙ্গমের জায়গাও নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। পচভদ্রে যে একটি বিশাল নদী ছিল, তার পূর্ণ বিবরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখন পাওয়া গেছে।

সম্ভবত ২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ি ধসে সরস্বতীর গতিপথ বদলে যায় এবং টন্স যমুনায় এসে মেশে। ইসরোর ডঃ বলদেব সহায়ের মতে, ২৫০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোন একসময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল। আদিবদরীর পাথরগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সেগুলি উচ্চ হিমালয় থেকে হিমবাহবাহিত হয়ে ওখানে পর্যন্ত এসেছে। বন্দরপুছ পর্বতের হিমবাহের পাথর সুপিন এবং টন্স বয়ে ওখান পর্যন্ত এসেছে বলে ধারণা করা অনুচিত নয়।

প্রবন্ধের মূল বক্তব্য

গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গা, যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে যমুনা, আর বন্দরপুছ হিমবাহ থেকে সরস্বতী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীগুলির উৎসস্থলগুলি খুব কাছাকাছি। অন্তত নদীগুলির আয়তন দেখে কল্পনা করা যায় না যে, এত কাছে এত বড় বড় নদীর উৎস হলো কেমন করে! কিন্তু এটাই ভৌগোলিক সত্য। আজ থেকে লক্ষ বছর আগে গঙ্গা-যমুনা ছাড়া সরস্বতীও ছিল এবং সে পূর্ববাহিনী না হয়ে দক্ষিণবাহিনী ছিল। অনেকাংশে প্রমাণসাপেক্ষ বলে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, সেই নদী বন্দরপুছ হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে সুপিন, টন্স-রূপে আদিবদরীর কাছে পাহাড় থেকে নেমে কর্ণাল, আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, হিসার হয়ে সোজা দক্ষিণে বয়ে চলেছিল এবং রাজস্থানের ঝুনঝুনু, শিকার, সম্বর হয়ে আরাবল্লীর পশ্চিম ধার ধরে লুনি নদীর রাস্তায় খাম্বাট উপসাগরে মিলেছিল। সেই কারণে এই রাস্তায় অনেকগুলি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই রাস্তায় অনেকগুলি ছোট ছোট নদী, যেগুলি তার দেহাবশেষ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাও আছে। হরিয়ানার সরস্বতী নদী অথবা গুজরাটের সরস্বতী নদী, লুনি নদী, এমনকি মনে

হয় সবরমতী নদীও ঐ বিশাল নদীটির অংশ ছিল। এইরকম মেনে নিলে সবরমতী নদীর মোহনায় হিমালয়ের পলিমাটি কি করে এল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এরপর হিমালয় যখন উঁচু হতে থাকল, আরাবল্লীও উঁচু হতে লাগল, তখন সরস্বতীর জলধারা হিসারের কাছে দক্ষিণের বদলে পশ্চিমমুখী হলো। এটা ঠিক কোন্ সময়ে হলো সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অনেক আগে হওয়াই উচিত। কেননা ঐসময়ে সরস্বতীর জল যমুনায় অনেকটা চলে যায়। তখনো কিন্তু বাকি জলটুকু শতদ্রু নিয়ে নেয়নি। এইসময় ঘগ্গর পূর্ণ অবস্থায় ছিল। পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর জেলার মীরগড় হয়ে রাইনি নদীর উৎপত্তি হয় এবং সেখান থেকে জয়শলমির জেলার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ রাজস্থানের পচভদ্রে এসে আবার লুনি নদীতে মেলে। লুনি তখন সরস্বতীর শাখানদী ছিল এবং বিশাল মোহনার সৃষ্টি করে কচ্ছের রণে পড়ে। এই রাস্তাটা মোটামুটি প্রমাণ করা গেছে এবং সেই প্রমাণগুলি নতুন করে আর বলার প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল দক্ষিণ রাজস্থানের কিছুটা অংশ, যা এখন অনেক উঁচু হয়ে গেছে—সেই জায়গাটার স্যাটেলাইট চিত্র আসেনি। এইসময় শতদ্রু বোধহয় সরস্বতীর শাখানদী ছিল। মোট চারবার সরস্বতীর রাস্তা পরিবর্তনের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো হিসার, সম্বর হয়ে খাম্বাট উপসাগর। দ্বিতীয়টি হলো শিরসা, বিকানির, নোহর হয়ে। এই দ্বিতীয় রাস্তাটি একটি 'থিসিস' হিসাবে রয়েছে, ঠিক পরীক্ষিত সত্য বলে ধরে নেওয়া মুশকিল। তৃতীয়টি হলো বিকানির হয়ে পচভদ্র এবং কচ্ছের রণে শেষ। আর চতুর্থটি হলো হিসার, গঙ্গানগর, পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর নওয়াকোট নারা নদীর রাস্তায় জয়শলমির হয়ে পচভদ্র এবং রণে মোহনা। এই চতুর্থ এবং শেষ রাস্তাটি নিয়েই যত লেখা চোখে পড়ে।

আজ থেকে সাড়ে চারহাজার বছর আগে ভূমিকম্পের ফলে মাটির উচ্চতার পরিবর্তন হলো, সরস্বতীর জল যমুনাতে এবং শতদ্রুতে চলে গেল। ফলে সরস্বতী শুকিয়ে গেল। ঘগ্গর, হাকরা, নারা—এইসব নদী রয়ে গেল তার দেহাবশেষরূপে। মরুভূমির সৃষ্টি হলো এবং কচ্ছের রণ রয়ে গেল বিরাট নদীর মোহনার সাক্ষী হিসাবে। এই হলো চতুর্থ রাস্তাটির বিলয় হওয়ার কাহিনী।

যমুনা এখন আর তখন

মহাভারতের আগের যুগের কোন ভৌগোলিক বিবরণ না পাওয়ার জন্য ঠিক করে বলা যায় না, কোন্ সময়ে দক্ষিণমুখী সরস্বতী পশ্চিমমুখী হলো। তবে যমুনায় সরস্বতীর জল বইল ২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে—এটা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় পার্বত্য ধস পরীক্ষা করে। যমুনা তিনবার সরে এসেছে পশ্চিমে, তারও প্রমাণ আছে। গাজিয়াবাদের কাছে হিণ্ডন নদী যমুনার ফেলে যাওয়া খাত। তেমনি কালী নদীও যমুনার আরো আগেকার ফেলে যাওয়া খাত। এখন কুরুক্ষেত্র (কর্ণাল) ও দিল্লির কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা তার তৃতীয় অবস্থা। ইতোমধ্যে দিল্লির উত্তরে আরাবল্লী আরো উঁচু হয়েছে, কিন্তু মাটির নিচে থাকায় বোঝা যায় না।

সমস্ত বিষয়টি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সরস্বতীর যাত্রপথের পরিবর্তন একবার-দুবার হয়নি, চারবার হয়েছে। শেষপর্যন্ত সে লুপ্ত হয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেলেও আসলে সে হারিয়ে যায়নি, কেবল অন্যরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্য অনেক নদীর মতোই তার রাস্তা বদলেছে, ফলে তার তীরে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতা ধসে পড়েছে। শস্যশ্যামলা রাজস্থান মরুভূমি হয়ে গেছে, তার বিশাল পরিত্যক্ত মোহনা এখন লবণাক্ত জলাভূমি। অথচ সরস্বতীর তীরে বেদ রচনা হয়েছে কমবেশি এক সহস্র বছর ধরে এবং তাতে পঞ্চনদী, সপ্তনদী ইত্যাদি নাম নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সরস্বতীর মহিমা গাওয়া হয়েছে বারবার। পশ্চিমের ঐতিহাসিকগণ এবং এদেশের নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে একমত হওয়া যায় না যে, আর্যরা বেদ হাতে নিয়ে ভারতে পা রেখেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেদ প্রকট হয়েছে যখন, তখন সরস্বতীর স্বর্ণযুগ চলছে। সিন্ধু নদ থেকে সরস্বতী এবং যমুনা পর্যন্ত, প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান এবং হরিয়ানার সমতলভূমিতে সরস্বতী তীরে বেদ রচনা হয়েছিল। তাই সরস্বতীর এত নাম, তাই সরস্বতী দেবী হয়ে গেলেন। সেইসময় সিন্ধু নদেরও স্বর্ণযুগ ছিল, কিন্তু তাকে দেবত্বে উন্নীত করেননি বেদের ঋষিগণ। এর কারণ আর কিছুই নয়, সরস্বতী তীরে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বহু যুগ ধরে একটু একটু করে। তাই ভারতীয় সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' না বলে 'সরস্বতী সভ্যতা' বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। অবশ্য আজকাল সিন্ধু-সরস্বতী সংযুক্ত সভ্যতা বলার চলন হয়েছে।

এই প্রবন্ধে অনেক উক্তি সম্ভবত বিতর্কের সৃষ্টি করতেই পারে এবং সেই বিতর্ক অনভিপ্রেত নয়। বিষয়টি জটিল এবং গবেষণা এখনো চলছে। সুতরাং শেষকথা বলার সময় এখনো আসেনি। [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূত্র

1 Physical Geology of India—S. M. Mathur
2 The lost city of Dwarka—S. R. Rao
3 Website : saraswati.com
4 National Museum, New Delhi, papers
5 Kalibangan report—Dr. B. B. Lal (on earthquake)
6 Saraswati : River beyond myth—V. G. Rao
7 Dr. Baldev Sahay, ISRO Centre, Ahmedabad
8 The changing routes of Saraswati, P. G. Research Institute, Deccan College
9 The Mahabharata, Sanskrit Original, Gita Press

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্মৃতিকথা

"তুই পরমহংস হবি"

স্বামী সর্বগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এক সাধুর অভিনব পুষ্পাঞ্জলি দান

সেবাশ্রমের কাছেই গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে 'গঙ্গাদাস' নামে একজন বড় সাধু বাস করতেন। কোন ভাণ্ডারা হলে প্রায়শই কল্যাণ মহারাজ আমার হাত দিয়ে তাঁকে ফল ও মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিতেন। আমাদের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা হতো না। তিনি স্মিতহাস্যে পাঠানো জিনিসগুলি গ্রহণ করতেন এবং আমাদের খোঁজ খবর নিতেন, তারপর আমি ফিরে আসতাম। সেখানে বেশিক্ষণ কাটানোর মতো সময়ও আমার হাতে থাকত না। যখনি তিনি সেবাশ্রমে আসতেন, কল্যাণ মহারাজ সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং কিছু খেতে দিতেন। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তা খেয়ে চলে যেতেন। মহারাজ আমাকে বলে দিয়েছিলেনঃ "যখনি এই সাধু আসবেন, এঁকে বিশেষ যত্ন করবি।"


স্বামী কল্যাণানন্দ

মহারাজের মৃত্যুর পর একবার হয়েছিল কি, দুর্গাপূজার সময়ে পূজাশেষে সকলে যখন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে, তখন আমি হাসপাতাল থেকে পূজাস্থল লাইব্রেরি হল-এর দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে পথে ঐ সাধু মহারাজকে দেখতে পেয়ে তাঁকে সঙ্গে করে পূজাস্থলে নিয়ে গেলাম। যখন আমাদের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পালা এল, আমি তাঁর হাতে সামান্য গঙ্গাজল দিয়ে কিছু ফুল দিলাম এবং অঞ্জলি দিতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এগুলি কোথায় নিবেদন করব?" আমি বললামঃ "যেখানে আপনার ইচ্ছা।" সঙ্গে সঙ্গে, কী হচ্ছে তা বোঝার আগেই, তিনি সমস্ত ফুল আমার মাথার ওপর চাপিয়ে দিলেন। ফুলগুলি যাতে মাটিতে পড়ে না যায়, সেইভাবে তা সামলে রেখে আমি ক্ষণকাল স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ধীরপদে প্রতিমার সামনে গিয়ে নত হলাম। ফুলগুলি সব মায়ের পায়ের ওপর ঝরে পড়ল, আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরও বাক্যস্ফূর্তি হলো না। কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমি ইঙ্গিতে সবাইকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান চালিয়ে যেতে বললাম এবং সাধুটিকে সঙ্গে নিয়ে পূজাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম। বস্তুত, সেদিন যখন তিনি ফুলগুলি আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন, তখন আমার এক অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল—বর্ণনা করে তা বোঝাতে পারব না। সাধুটি ছিলেন ঐধরনের। প্রতিমা বা ঐ জাতীয় কিছুতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

'একুশ দিনে শরীরত্যাগ'—একটি প্রামাণ্য পরীক্ষণ

একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার আমি সাক্ষী ছিলাম। রাজস্থান থেকে একজন বিশিষ্ট যোগী হরিদ্বারে এসে তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্মিত এক ধর্মশালায় ওঠেন। একদিন তিনি এক শিষ্যকে ডেকে পঞ্জিকা থেকে পরপর তিথিগুলির বর্ণনা পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে পড়তে বিশেষ একটি তিথি সম্বন্ধে পড়া হতেই যোগী শিষ্যকে থামতে বললেন। সেদিন রাত্রে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র শয্যায় হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন—সেই সময় শিষ্যেরা তাঁর খাবার নিয়ে এল। তিনি মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু ইঙ্গিতে জানালেন যে, তাঁর এসবের প্রয়োজন নেই—অতএব তারা তা ফেরত নিয়ে গেল। সে-রাত্রে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। সকাল হলে শিষ্যেরা আবার এল। তিনি কিন্তু বিছানা ছেড়ে নড়লেন না, প্রাতঃকৃত্যের জন্যও গেলেন না, কিছু খেলেনও না। সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত হয়ে পড়ে রইলেন। এইভাবে দুদিন কাটলে তাঁর শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, কী করতে হবে তারা বুঝতে পারছিল না। তারা আমাদের হাসপাতালে এসে বললঃ "আমাদের গুরুদেব এক বিরাট যোগিপুরুষ। তিনি এইরকম অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর কী হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। আপনারা অনুগ্রহ করে একবার এসে দেখুন।" তাদের 'বিরাট যোগিপুরুষ' কথাটা শুনে আমি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলাম। (বরাবরই আমার এধরনের ব্যক্তিদের দেখার ব্যাপারে কৌতূহল ছিল। এই কৌতূহল, বলতে গেলে, আমার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অনেক বছর আগে, কে একজন লোক মাটির নিচে চল্লিশ দিন ধরে সমাধিস্থ আছে শুনে শুধু তাকে দেখার উদ্দেশ্যে আমি আঠারো মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম!)

আমাদের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেই যোগীকে দেখতে গেলাম। দেখলাম বিশালদেহী এক পুরুষ। কোনরকম বাক্যালাপ তিনি করলেন না। তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু কাহিনী বলল, কিছুদিন আগে তাঁর পঞ্জিকা দেখার ঘটনার কথাও বলল। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেনঃ "আমাদের এঁর রক্ত ও অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাক।" সুতরাং আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। সেখানে সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার দেখলেন, তাঁর শরীরে কোন রোগের চিহ্নমাত্র নেই, চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে তিনি পুরোদস্তুর সুস্থ। ডাক্তার আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে, তিনি কিছু খাচ্ছেন না বা পান করছেন না, মলমূত্র ত্যাগেরও কোন বালাই নেই, আর তাঁর দেহ থেকে যে কোন

দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে—তাও নয়। আমি তখন তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "পঞ্জিকার সেই বিশেষ তিথিটি কী?" তারা জানাল, সেটি সংক্রান্তি—সূর্যের এক রাশি ছেড়ে অন্য রাশিতে সংক্রমণের দিন—যা বিশেষ পুণ্য তিথি বলে বিবেচিত হয়। আমরা ঐ যোগিপুরুষকে হাসপাতালেই রেখে দেওয়ার জন্য শিষ্যদের বললাম, আমরা তাঁর বিশেষ যত্ন করব সে-আশ্বাসও দিলাম। তারাও হাসপাতালেই রয়ে গেল।

আমি হিসাব করে দেখলাম, যোগীর অবস্থান্তরের দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত ঠিক একুশ দিন হয়। যোগীদের ব্রহ্মদর্শনের পর একুশ দিনে মৃত্যুর বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি আমার স্মরণে ছিল।[৫] সুতরাং সদাসর্বদা তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আমি উৎসুক হয়ে রইলাম। প্রতিদিন তাঁকে দেখতে যেতাম ও দু-তিন ঘণ্টা তাঁর কাছে থাকতাম। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি মোটেই নড়াচড়া করতেন না। তাঁকে সরাতে ও তুলে স্নান করাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হতো না। তাঁর দিক থেকে কোনরকম প্রতিরোধ আসত না, তিনি ঠিক যেন একটা বেলুনের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা সকলেই বিস্ময়বোধ করতাম। আমরা তাঁর গায়ে চন্দন তেল ও অন্যান্য মলম লাগিয়ে দিতাম, যাতে শয্যাক্ষত (bedsore) বা গাত্রদুর্গন্ধ না হয়। তাঁর তরফে কোন পরিবর্তন, নড়াচড়া, বা বাক্যালাপ ছিল না। আমি তাঁকে 'কিউ-টিপ' (q-tip) দিয়ে গ্লুকোজ-মেশানো লেবুর রস খাওয়ানোর চেষ্টা করতাম। তার বেশি আর কিছু করা যেত না। মুখে চামচ ঢোকাতে গেলে তাঁর কষ্ট হতো। তাই আস্তে আস্তে 'কিউ টিপ'-এ চাপ দিয়ে একটু একটু রস মুখাভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিতাম। তাঁর অবস্থা যেমনকার তেমনি ছিল।

কেউ কেউ আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন ঃ "ও কি পাগল হয়ে গেল? নিজের কাজকর্ম ফেলে ঐ রোগীটির কাছে গিয়ে তার পাশেই বসে থাকে! ব্যাপারটা কি?"... তাঁরা বলতেন ঃ "তুমি অযথা এত সময় নষ্ট করছ।" আমি বলতাম ঃ "মোটেই সময় নষ্ট নয়। আমি এটাকে এক বিরাট পরীক্ষা হিসাবে দেখছি।"

শেষ দিনে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন রাত্রি। আমি তাঁর ডানদিকে বিছানার পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তাঁর পায়ের ওপর আমার হাতটা রাখা ছিল। কাঁটায় কাঁটায় রাত ১১টায় তিনি আমার দিকে মাথাটা ফেরালেন, স্নিগ্ধ একটু হেসে আমার হাতের ওপর তাঁর হাতটা রাখলেন। আর তারপরেই তাঁর মাথাটা ঢলে পড়ল। তাঁর দেহান্ত হলো। সব যে শেষ হয়ে গেছে তা আমি বুঝতে পারলাম, কারণ মানুষের চেতনাই মাথাটাকে উঁচু করে ধরে রাখে—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে চেতনা অপসৃত হয়, তাই মাথাটা ঢলে পড়ে। আমি যেমন ছিলাম, সেই অবস্থাতেই ডাক্তারকে ডেকে আনতে বললাম। তিনি এসে পরীক্ষা করে যোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

যে-প্রশ্নটি সত্য সত্যই আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করত তা হলো ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কী করে 'একুশ দিন' সম্বন্ধে অত নিশ্চিত হতে পারলেন? বস্তুত, শরীরের নিজস্ব একটা ভরবেগ (momentum) আছে। শরীরকে আহার্য দিয়ে যত্ন করে চালু রাখা হচ্ছে—সেই ভরবেগ একুশ দিন বজায় থাকে। তারপরই সব শেষ হয়ে যায়, কারণ তাকে তো আর আহার্য যোগানো হচ্ছে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস খুবই মৃদু হয়ে এসেছিল—চলছে কি চলছে না প্রায় বোঝাই যেত না। শ্বাসক্রিয়া যাচাই করার জন্য আমি তাঁর নাকের সামনে সুতো ধরতাম। প্রথমদিকে তা বোঝা যেত, কিন্তু পরে আর বোঝা যেত না। এসমস্ত কিছু থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার—কারো যখন পরম সত্তার সঙ্গে অভিন্নতা বোধ হয়, তখন আর এমন কিছু থাকে না যা তাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে, পার্থিব জগতে ফিরিয়ে আনতে পারে। তখন আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার ইচ্ছা বা কোনরকম কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। বাসনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সাধারণ বোধের ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যখন যোগীকে ইন্দ্রিয়ের জগতে টেনে আনতে পারে—এমন আর কিছুই থাকে না, তখন তিনি শুদ্ধ চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যান। যদি তাঁর অপরের মঙ্গলসাধনের কোন ইচ্ছা থাকে, তাহলে আলাদা কথা; নাহলে তিনি পরমসত্তায় লীন হয়ে যান। তবে শারীরিক ক্রিয়ার একটা ভরবেগ থাকেই। উপরি উক্ত রোগীর ক্ষেত্রে কোনরকম দুর্বলতা, দৈহিক পরিবর্তন, পচন-বিক্রিয়ার লক্ষণ বা ঐজাতীয় কিছুই দেখা যায়নি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। কিন্তু একুশ দিনের পর শরীরপাত হয়ে গেল। সমগ্র ঘটনাটি হয়ে রইল এক পরীক্ষামূলক নজির।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শধন্য এক ভক্ত

একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ ভক্ত সেবাশ্রমে আসতেন। তাঁর নাম ছিল 'আশুবাবু'। তিনি মন্দিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, তারপর কারো সঙ্গে কথাটি না বলে চলে যেতেন। তিনি কোথায় থাকতেন, কী করতেন আমরা কিছুই জানতাম না। একদিন আমি আরো দুজন আশ্রমিক ভাইয়ের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি বড়

৫ শ্রীরামকৃষ্ণ এসম্পর্কে বলেছিলেন ঃ *"শিরোদেশ—সপ্তমভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে-অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।"* (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ১১৫)

বাড়ির ভিতর থেকে তাঁকে বেরোতে দেখলাম। আমি সঙ্গীদের বললাম ঃ "মনে হচ্ছে, ইনি এখানেই থাকেন।" তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এই যে আশুবাবু, আপনি তো সেবাশ্রমে প্রায়ই আসেন। এখানেই থাকেন বুঝি?" তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ।" বাড়ির ভিতরে গিয়ে আমরা দেখলাম—একটি বেশ বড় ঠাকুরঘর, তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা বললাম ঃ "আশুবাবু, আপনি আমাদের কখনো এসব বিষয়ে কিছু বলেননি। আজ আপনার কাহিনী বলুন।" তিনি এর আগে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেননি, কারণ তাঁর মনের প্রবণতাই ছিল অন্যরকম। আজ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন, তিনি যখন খুব ছোট ছিলেন তখন তাঁর পিতামহী বা ঐরকম কোন আত্মীয় তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ করেন ও কোলে তুলে নেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে ছুঁয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি আরো জানতে চাই। তাঁর বিষয়ে লেখা বইপত্র পড়েছি, বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে গেছি। আগে কাজকর্ম করতাম, এখন অবসর নিয়েছি। যাকিছু ছিল সব বিক্রি করে এখানে এই বাড়িটি কিনেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আগে আপনি আমাদের এসব কথা বলেননি কেন?" তিনি বললেন ঃ "বলার মতো কিছু তো ছিল না।" তাঁর কথা শুনে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। এরপর তিনি হাসপাতালে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন। ফল ইত্যাদি নিয়ে আসতেন, আমাকে কুশল প্রশ্ন করে মন্দিরদর্শনে যেতেন, দর্শনের পর ফিরে যেতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় শান্তপ্রকৃতির। এর আগে তিনি যে কে, তা খুব অল্প লোকই জানত। প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবন ছিল উন্নত ধরনের।

মানুষের জীবনের দাম বেশি

একবার সেবাশ্রম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এক পাগলা বাঁদরের আবির্ভাব হয়। অনেকে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তার আঁচড়ের চোটে ক্ষতবিক্ষত হয়। বড় রাস্তা ও আমাদের হাসপাতালে আসার গলির সংযোগস্থলের কোনটিতে ছিল তার আস্তানা। বাঁদরের দ্বারা আক্রান্ত অনেকে আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসিত হতো। একজনের তো একটি চোখ প্রায় নষ্টই হয়ে গিয়েছিল। আমি এক পুলিশকর্তার কাছে গিয়ে বলেছিলাম ঃ "এখানে একটা পাগলা বাঁদর উপদ্রব করছে—ওটাকে মেরে ফেলুন।" তিনি বললেন ঃ "না মহারাজ, আমি যদি বাঁদর মারি তাহলে লোকে আমাকেই মেরে ফেলবে।" 'কেন' জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম ঃ "এই অঞ্চলে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ।"[৬] এদিকে বাঁদরের কামড়ে আহত রোগীরা একের পর এক আসতে লাগল। একটি ছোট ছেলের সর্বাঙ্গ তো আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউই কোন প্রতিকারের উদ্যোগ নিচ্ছিল না।

আমাদের একটা বন্দুক ছিল। একজন স্কুলশিক্ষক আমার সহায়করূপে কাজ করতেন। আমি তাঁকে বন্দুকটা দিয়ে বাঁদরটাকে গুলি করতে বললাম, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ "আমি যদি বাঁদরটাকে গুলি করি, লোকে আমাকে মেরে ফেলবে।" বন্দুকটা তখন ফেরত চাইলাম। কি করে তা ব্যবহার করতে হয় তিনি আমায় দেখিয়ে দিলেন। আমি বাঁদরটাকে গুলি করে মেরে ফেললাম—কোন অসুবিধা হলো না। রোগীদের হিতই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা বাঁদরের জন্য কেন তারা কষ্ট পেতে থাকবে?

এই ঘটনার পরে সেবাশ্রমে অভ্যাগত কয়েকজন সাধু স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে অভিযোগ করেন ঃ "নারায়ণ একটি বাঁদরকে হত্যা করেছে—সকলেই তাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে।" মহারাজ চমৎকার একটি চিঠিতে আমাকে লেখেন ঃ "অপরে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। তুমি যে এই কাজটা করার মতো বুকের পাটা দেখিয়েছ, এতে আমি খুশি হয়েছি। সবাই শুধু আইনের আক্ষরিক বয়ানটুকু বাঁচিয়ে চলতে চায়—ফল কী হচ্ছে তা কেউ দেখে না।" পরে বিরজানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওরা (আশ্রমের সাধুরা) অভিযোগ করায় তুমি কি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলে?" আমি তাঁকে বললাম ঃ "না মহারাজ। কারণ আমি জানতাম যে, ঐরকম করা আমার কর্তব্য এবং আমি তা-ই পালন করেছি।" তিনি বললেন ঃ "আর তা করার সাহস তোমার ছিল।" আমি বললাম ঃ "কাজটা আমি না করে পারিনি, কারণ আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত রোগীদের হাসপাতালে আসা আমায় দেখতে হচ্ছিল। আমার আর কী করা উচিত ছিল? চুপ করে থাকা? তা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি, মহারাজ।" মহারাজ আমাকে আশ্বস্ত করলেন ঃ "তুমি ঠিক কাজই করেছ। অন্যে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।" প্রকৃতপক্ষে আর সকলে আমার ওপর দোষারোপ করলেও আমি কখনোই তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি; তার কারণ আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে, আমি যা করেছি তা-ই ঠিক।

এছাড়া পায়রাদের নিয়েও একটা ঘটনা ঘটেছিল। কতকগুলি পায়রা হাসপাতালের মধ্যে বাসা করেছিল, খাবার আর শয্যার ওপর তারা নোংরা ফেলত। তাদের বের করে দিয়ে তাদের ঢোকার পথগুলোতে জাল আটকে দেওয়া

৬ হরিদ্বার ও হৃষীকেশকে অতি পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হয়। সেখানে জীবহত্যা নিষিদ্ধ; এমনকি মাছও ধরতে দেওয়া হয় না।

হলো। তা করতে গিয়ে দু-একটা পায়রা মারাও পড়ল। তাতেও কেউ কেউ আমাকে অভিসম্পাত দিল, বলল ঃ "তুমিই পায়রাগুলোকে মারলে।" একজন বলল ঃ "ওকে গলা চড়িয়ে কিছু বলবেন না। ও তাহলে আপনাকেও মেরে ফেলবে।" কিন্তু একজন সহ-আশ্রমিক আমার সমর্থনে এগিয়ে এসে বলল ঃ "পায়রাগুলো যখন বিছানা নোংরা করত, তখন কেউই কিছু প্রতিকার করেনি, অথচ অভিযোগ সকলেই করত। পায়রাদের গোড়াতে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল কেন?"

আমার কাছে বাঁদর, পায়রা বা সাপের চেয়ে রোগীদের গুরুত্ব ছিল বেশি। নিকটবর্তী একটা বাঁশঝাড়ে বেশ কিছু সাপ ছিল, তাদের কামড়ে দু-তিনটি ছেলে মারাও যায়। কেউই তা গ্রাহ্য করেনি। আমরা একদিন পুরো বাঁশঝাড়ে আগুন লাগিয়ে চল্লিশটা সাপ মারলাম। সাপের কামড়ে মানুষের প্রাণ যাবে—তা সহ্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঁশঝাড়টা পুরোপুরি ধ্বংস করে, জায়গাটা খুঁড়ে, ভিতরে যা ছিল আমরা সব নষ্ট করে দিলাম। তারপর সেখানটা সমান করে একটা 'লন' তৈরি করা হলো। লোকে আমাদের ভয় পেত। আমরা বলতাম ঃ "সর্বপ্রথমে মানুষের প্রাণ।" তার জন্যই আমাদের ঐসব প্রাণিহত্যা করতে হয়েছিল। তা করার মতো সাহসও আমাদের ছিল। অর্জুনের ওপর আদেশ ছিল তাঁর সামনে সারি দিয়ে দাঁড়ানো বিরোধী পক্ষের যোদ্ধাদের হত্যা করার। কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "সমুত্থিত হও, যুদ্ধ কর।" অর্জুনের কি তাঁদের প্রতি করুণা ছিল না? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার ওপরে ছিল তাঁর কর্তব্য, আর প্রতিপক্ষকে সংহার করা ছিল সেই কর্তব্যের অঙ্গীভূত। এই একটি মাত্র রাস্তাই তাঁর সামনে খোলা ছিল।

কল্যাণ মহারাজের কুকুর 'ভুলু'

কল্যাণ মহারাজের কুকুর ভুলুর কাহিনী বেশ দীর্ঘ। যেদিন আমি সেবাশ্রমে আসি সেইদিন থেকেই তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে যায়। তারপর থেকে সে কখনো আমার কাছছাড়া হয়নি। আমি কোথায় আছি কারো যদি তা জানার দরকার হতো, সকলে বলত ঃ "ভুলু কোথায় আছে তা দেখ।" ভুলুকে চিৎকার করে ডাকলেই সে হয় চলে আসত, নাহলে 'ভৌ ভৌ' করে সাড়া দিত। বাগান, অতিথিভবন, গোশালা, লাইব্রেরি, হাসপাতাল—এইসব নিয়ে সেবাশ্রমের মোট জমি ছিল তিরিশ একর। কোন বিশেষ মুহূর্তে তার ঠিক কোন্‌খানে যে আমি থাকব তা কেউ বলতে পারত না। কাজেই সবচেয়ে সুবিধাজনক পন্থা ছিল ভুলুকে ডেকে জেনে নেওয়া—কোথায় আমি আছি। খাওয়ার সময়েও সে আমার সঙ্গে থাকত। তার বেশ ভব্যিযুক্ত একটা নিজস্ব থালা ছিল, তাতে তাকে রুটি, ডাল ও অন্যান্য খাবার দিতাম। সে পেটভরে খেয়ে চলে যেত। এ নিয়মের কখনো এদিক-ওদিক হতো না। আমি যখন অফিসে যেতাম, তখনো ভুলু গিয়ে দরজার পাশটিতে তার জায়গায় বসে থাকত।

উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক

সেবাশ্রমের পুরো এলাকাটা কী অদ্ভুতভাবে ভুলু পাহারা দিত! অনেকে ভাবত, ভুলু কেবল খেতেই ওস্তাদ, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! কিন্তু বাস্তবিক সে সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। তার কানের ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পারতাম, সে কীভাবে পুরো এলাকায় কোথায় কী হচ্ছে সেসম্বন্ধে সতর্ক আছে। ভুলু বাগানে ঢুকলেই বাঁদরগুলো ভয়ে চম্পট দিত। দেখতে পেলেই সে তেড়ে গিয়ে তাদের বের করে দিয়ে আসত। ভুলুর রঙ ছিল কালো আর আকার ছিল বিশাল, বাঁদরগুলো তাকে যমের মতো ভয় করত। সে না থাকলে বাগানের আম আর কলাগুলোকে কোনক্রমেই বাঁদরের হাত থেকে বাঁচানো যেত না। ভুলু মারা যাওয়ার পর আমাদের এই নিয়ে খুব সমস্যা হয়েছিল।

অতিথি ও আগন্তুকদের আমরা সেবাশ্রমের বাগান থেকে ফুল না তুলতে নির্দেশ দিতাম। তাদের কুকুর সম্বন্ধে সাবধান করে বিজ্ঞপ্তিও কয়েক জায়গায় দেওয়া ছিল। কিন্তু কেউ কেউ এইসব নির্দেশ-বিজ্ঞপ্তিকে তেমন গুরুত্ব দিত না। তারা ভাবত ঃ "মহারাজ আমাদের ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করছেন।" এইসব লোককে অবধারিতভাবে এর ফল ভোগ করতে হতো। একবার এক ভক্তের একটি ছোট ছেলে বাগানে এসে ফুল তুলতে আরম্ভ করে দেয়। অকস্মাৎ ভুলু সেইখানে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো এবং তাকে কামড়াতে গেল। তার প্যান্ট কামড়ে ধরে সে তাকে আটকে রাখল। ছেলেটি তো পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। আমরা গিয়ে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা করতে তবে ব্যাপারটা মিটল। এইরকম একটা ঘটনা ঘটায় আমার খারাপ লাগল। সবাই ভুলুকে জোর বকুনি দিল, আমি কিন্তু তাকে বকতে পারলাম না, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে সেবাশ্রমের সম্পত্তিই রক্ষা করছিল। তবে একটা জিনিস আমার অদ্ভুত লাগত—ভুলু কখনো সেবাশ্রমের কোন রোগী বা সাধু বা কর্মীর কোন ক্ষতি করত না। তারা ইচ্ছামতো চলাফেরা করত—তাদের কোনরকম ভয় বা অস্বস্তি বোধ হতো না। কী করে যে ভুলু চিনতে পারত—তারা রোগী, কর্মী বা সেবাশ্রমে বসবাসকারী সাধু-ব্রহ্মচারী, তা আমার বুদ্ধির অতীত ছিল। কিন্তু এরা ছাড়া আর কারো বাগানে ঢোকা সে পছন্দ করত না।

চোরকে জব্দ করা

একদিন আমরা সকলে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন অতিথির সঙ্গে রাত্রে আহার করছিলাম। তাঁরা সেবাশ্রমের অতিথিশালায় এসে উঠেছিলেন। খাওয়ার

মাঝখানে হঠাৎ ভুলু খাবার ঘর থেকে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। খাওয়া শেষ হলে আমরা সবাই অতিথিশালায় গিয়ে দেখি, দরজাগুলো হাট করে খোলা, আর দুটো স্যুটকেশ বেপাত্তা। আমরা সর্বত্র খুঁজলাম, কিন্তু স্যুটকেশগুলো দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য ব্যাপার, ভুলুকেও কোথাও দেখা গেল না। সাধারণত আমি যেখানেই যাই না কোন, সে আমার পিছনে পিছনে যেত। আমি চিৎকার করে ডাকলাম ঃ "ভুলু! ভুলু!" আমাদের আশ্রমের এলাকার বাইরে বহুদূর থেকে তার সাড়া পাওয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি দুটো লোক স্যুটকেশগুলো চুরি করে পালাচ্ছিল, ভুলু তাদের আটকেছে। তারা স্যুটকেশগুলো নামিয়ে রেখেছে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ভুলু আমার দিকে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল। আমি লোকদুটোকে স্যুটকেশগুলো বয়ে ফের অতিথিশালায় রেখে আসতে বললাম। তাদের আমি চিনতাম—একজন আমাদের বাগানে কাজ করত, আর একজন মাঝেমধ্যে আসত। তাদের আমি চলে যেতে বললাম। ব্যাপারটা কী অদ্ভুত! ভুলু খেতে খেতে অতিথিশালায় কি আওয়াজ হয়েছে শুনতে পেয়েছে, আর তখনি অর্ধেক খাওয়া ফেলে দৌড়ে অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেছে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে রেলস্টেশনে যাওয়া

যদিও ভুলু সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, কিন্তু কখনো মন্দিরে বা হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকত না। আমি এঘর থেকে ওঘরে যেতাম, সে বাইরে থেকে আমাকে লক্ষ্য করত, আর অনুসরণ করত। আমি সেবাশ্রমের বাইরে গেলে আলাদা কথা, নাহলে সে ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। একবার আমি কলকাতা গিয়েছিলাম; একটি বিশেষ দিনে আমার ফেরার কথা ছিল। সকলে বলাবলি করছিল ঃ "কাল নারায়ণ মহারাজ ফিরবেন। আমরা ডাক্তারবাবুর ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে স্টেশন থেকে তাঁকে আনতে যাব।" আশ্চর্য ব্যাপার! ভুলু তাদের কথাবার্তা বুঝতে পেরেছিল। পরের দিন সকলে রেলস্টেশনে পৌঁছাবার আগেই ভুলু একটা 'সর্টকাট' রাস্তা ধরে সেখানে এসে হাজির। কী করে যে সে বুঝতে পারল তা আমি জানি না। এইরকম একবার নয়, অনেকবার হয়েছিল। প্রতিবার আমি যখন বাইরে থেকে আসতাম, ভুলু আমার অপেক্ষায় রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত। সাধুরা বলতেন, তাঁরা মোটেই তাকে সঙ্গে করে আনতেন না, সে নিজে নিজেই আসত। প্ল্যাটফর্মে কোন কুকুরের আসার কথা নয়, কিন্তু ভুলু আমার প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার যাতায়াত করত। যে-মুহূর্তে সে ট্রেনের কোন একটি কামরায় আমাকে দেখতে পেত, অমনি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করত—যতক্ষণ না গাড়ি থামে আর আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। আর তার পরের দৃশ্য ছিল দেখবার মতো। আমি নামামাত্র দ্রুত লেজ নাড়তে নাড়তে সে আমার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। ঝুঁকে পড়ে আমি তার গায়ে চাপড় মারতাম। রেলস্টেশন থেকে ফেরার সময় তাকে ঘোড়ার গাড়ির পিছনে বসে আসতে দেওয়া হতো। বস্তুত, পুরো ব্যাপরটাই ছিল অপূর্ব!

ভুলুর বন্ধু লিলি

প্রথমদিকে ভুলুর এক বন্ধু ছিল, তার নাম 'লিলি'। লিলি ছিল একটু খানদানী গোছের। নিশ্চয়ানন্দজী তাকে খাবার টেবিল থেকেই খেতে দিতেন। তার জন্য বেশ ভাল একটা বাটি আলাদা করে রাখা ছিল। যেদিন কল্যাণ মহারাজ শেষবারের মতো মুসৌরী যাত্রা করেন, সেইদিনই লিলি মারা যায়। কল্যাণ মহারাজ মুসৌরী থেকে আর ফিরে আসেননি। সেদিন সকালবেলা লিলির মৃত্যু হয়। আমরা সকলে কল্যাণ মহারাজকে বিদায় জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলাম; ভুলু এল, কিন্তু লিলি এল না। আগের দিন রাত্রে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরের দিন সকালে তাকে মন্দিরের সামনে শুয়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, সে মারা গেছে। আমরা মহারাজকে আর সে-কথা বললাম না। তিনি রওনা হওয়ার পর ডাক্তার এসে দেখে লিলিকে মৃত ঘোষণা করলেন। খুব ভোরেই তার মৃত্যু হয়ে থাকবে।

লিলি ছিল সাদা ফুটফুটে 'পুড্‌ল'-জাতীয় একটি ছোট কুকুর। সে কখনো বাইরে যেত না—বারান্দায়-বারান্দায়ই ঘুরত, আর ইচ্ছা হলে কল্যাণ মহারাজের চেয়ারের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকত। অকর্মার ধাড়ি ছিল—রাজপরিবারের লোকেরা যেমন হয় সেইরকম আর কি! ভাল খায়দায়, কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারে অপদার্থ। লিলিকে মহারাজ বিস্কুট, দুধ ও অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস খেতে দিতেন। ভুলু সে-জায়গায় পেত হাড়, শুকনো রুটি—এইসব মোটা খাবার। বস্তুত, দেখেশুনে একবার একজন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "লিলি বাছা-বাছা খাবার খায়, কিন্তু কোন কাজই করে না; আর ভুলু যা পায় তাই খায়, আর কী পরিশ্রমটাই না করে!"

ভুলুকে বিদায় করার ব্যর্থ প্রয়াস

কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের পর সকলে একবার ভুলুকে বিদায় করে দিতে চাইল। তার কারণ, তাদের ধারণা হয়েছিল—আমি ভুলুর পিছনে অনেক সময় নষ্ট করছি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি নিজে স্নান করতাম এবং ভুলুকেও ভাল করে নাওয়াতাম। তার জন্য আমি একটা আলাদা তোয়ালেও রেখে দিয়েছিলাম। স্নানের পর গা শুকাবার জন্য ভুলুকে একটা জলের ট্যাঙ্ক-এর ওপর তুলে দিতাম। যেহেতু সে আমার ঘরে আমারই খাটের নিচে শুতো, তাই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই হতো। আমি

প্রতিদিন প্রায় আধঘণ্টা সময় ভুলুর পরিচর্যার পিছনে দিতাম। খাটাখাটুনি-করা কোন কুকুরের পক্ষে শুধু ডাল-ভাত যথেষ্ট নয়—তাই আমি তাকে পুষ্টিকর হাড়ের টুকরো চিবোবার জন্য দিতাম। আমাদের মুসলমান মালি বাইরে থেকে তা জোগাড় করে আনত। কখনো কখনো আমি তাকে মাংস আনতে বলতাম। মাংসওয়ালারা প্রায়ই তাকে ঠকিয়ে বাজে মাংস গছিয়ে দিত। তাই আমি মাংস ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তা শুঁকে দেখে নিতাম। তাই দেখেই সবাই ভাবল, ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "না, এভাবে তোমার সময় নষ্ট করা চলবে না।" অতএব ঠিক হলো, প্রশ্নটি নিয়ে ভোটাভুটি হবে। ভোটে অধিকাংশের মত হলো—আমার সময়ের দাম আছে এবং আমি একটা কুকুরের পিছনে অত সময় নষ্ট করতে পারি না। আমি ক্ষুণ্ণ হলাম, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হলো। আমি বললাম ঃ "ঠিক আছে। এটা গণতন্ত্রের যুগ। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই বহাল থাকুক।"

পরদিন সকালে স্বামী অজয়ানন্দজী অন্যদিনের চেয়ে আগে উঠলেন এবং ভুলুর গলায় একটা চামড়ার ফিতে পরালেন। ভুলু খুব ভদ্রস্বভাবের ছিল—যেকোন সাধুই তাকে ইচ্ছামত চালনা করতে পারতেন। অজয়ানন্দজী তাকে নিয়ে রেলস্টেশনে গেলেন এবং আঠারো মাইল দূরবর্তী হৃষীকেশে যায় এমন একটি ট্রেনে উঠলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ভুলুকে নদীর ধারে একটি খোঁটার সঙ্গে বাঁধলেন। তারপর নিকটবর্তী এক দোকানের মালিকের হাতে একটি টাকা দিয়ে তাকে বললেন যে, সে যেন খানিকক্ষণ পরে তাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর সারাদিন হৃষীকেশে অন্যান্য সাধুর সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ তিনি সেবাশ্রমে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যারতির পর আমার ঘরে ঢুকে আমি খাটের নিচে থেকে ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাঁসফাঁস আওয়াজ আসছে শুনতে পেলাম। ব্যাপার কী বুঝতে পেরে হাসিতে আমার দম ফাটার যোগাড় হলো। খাটের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমি ভুলুকে চুপচাপ থাকতে বললাম। রাতের খাবার ঘণ্টা পড়ার পরও সে সেখানেই রইল। আমি একা-একা খাবার ঘরে গিয়ে আমার খাওয়া শেষ করলাম। পাচক ভুলুকে বিদায় করার সিদ্ধান্তের কথা জানত না, তাই তার জন্য রুটি তৈরি করে ফেলেছিল। সে কাঁচুমাচু হয়ে আমাকে বলল ঃ "মহারাজ, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো রোজকার মতো ভুলুর জন্য রুটি তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু এখন শুনছি, ভুলু নাকি বরাবরের মতো চলে গেছে।" আমি বললাম ঃ "তুমি একবার তাকে ডাক দিয়েই দেখো না।" অজয়ানন্দজী তাতে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন ঃ "আরে সে-কুকুর তো এখন বহুদূরে। চিন্তা নেই, এখানে আর কেউ তার টিকি দেখতে পাবে না।" আমি বললাম ঃ "তাই কি?" তারপর পাচককে বললাম ভুলুকে ডেকে দেখতে সে সত্যই আসে কিনা। আমি কেন একথা বলছি বুঝতে না পেরে সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। পাচক 'ভুলু' বলে হাঁক দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে ভুলু এসে হাজির। সকলে হতচকিত হয়ে গেল—কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সকলে মিলে অজয়ানন্দজীকে চেপে ধরল ঃ "আপনি সত্যিসত্যিই ওকে হৃষীকেশে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন কিনা তা আগে বলুন।" বেচারি অজয়ানন্দজী—সকলেই তাঁর কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। তিনি নিজের সপক্ষে সাফাই গাইতে লাগলেন ঃ "আমি অতি অবশ্য ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এমনকি, আমি ওকে একটা খোঁটাতে বেঁধে রেখেও এসেছিলাম। কী করে যে এমন হলো জানি না।" তারপর একজন সাধু মতপ্রকাশ করলেন ঃ "আইনে বলে, কাউকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর যদি প্রথমবার ফাঁসিতে লটকে তাকে প্রাণে মারা না যায়, তাকে আর দ্বিতীয়বার ফাঁসি দেওয়া চলে না। অতএব ভুলু এখানে থেকেই যাবে, এবিষয়ে আর কিছু করার নেই।" সকলেই সম্মতি জানালেন ঃ "ঠিক আছে, ভুলু এখানকারই একজন। আমাদের তাকে বের করে দেওয়ার কোন হক নেই।" এখন প্রশ্ন উঠল—ভুলুর দেখাশোনা কে করবে? একজন ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন ঃ "আমি ভুলুর দেখাশোনা করব। নারায়ণ মহারাজ যেভাবে বলবেন, সেভাবেই করব। তাঁকে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।" এইভাবে ব্যাপারটা মিটে গেল। সেই ব্রহ্মচারী সত্যসত্যই পরিপূর্ণ দরদ ও যত্নের সঙ্গে ভুলুর দেখাশোনা করতে লাগলেন।

ভুলুর মৃত্যু

ভুলুর মৃত্যুকাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি দুঃখজনক। একটা বাঁদর তার মাথায় কামড়ে দিয়েছিল। কুকুরের পক্ষে মাথায় ঘা হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু—মাথার ঘা তো আর সে চেটে পরিষ্কার করতে পারে না। আমি ভুলুর ঠোঁট থেকে লালা নিয়ে তার ঘায়ের ওপর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০জন স্থানাধিকারীকে 'উদ্বোধন'-এর ১০৭ তম বর্ষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাগুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করবেন গায়ক শ্রীঅমর পাড়ুই। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে (সম্পাদক, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩) অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।—সম্পাদক

রগড়ে দিতাম। কিন্তু শীঘ্রই পোকা হতে শুরু করল, আর ভুলু যন্ত্রণায় চিৎকার-আর্তনাদ আরম্ভ করল। ভুলুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ভুলুকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করতে পরামর্শ দিলেন, কারণ ইতোমধ্যেই সে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি তিনি আমাকে কিছুটা আর্সেনিকও দিলেন। সকলেই বলতে লাগল যে, স্বয়ং ডাক্তারই যখন ঐরকম পরামর্শ দিয়েছেন তখন ভুলুকে শেষ করে ফেলা হোক, বহু রোগীতে ভর্তি হাসপাতালে এইরকম বিপজ্জনক প্রাণীকে রাখার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু বিষটা তাকে দিতে কেউই ইচ্ছুক ছিল না। কাজটা আমাকেই করতে হলো। আমি রুটির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে দিলাম—কিন্তু তাতে সে মরল না। যখন ভুলুকে বিষ-মেশানো রুটি দিয়েছিলাম, তখন আশপাশে আর কেউ ছিল না। তাই সকলেই ভাবল, আমি তাকে বিষ দিইনি। আমি বললামঃ "সত্য বলছি, আমি তাকে বিষ দিয়েছি। যখন নিজে দেখছি, ও অত কষ্ট পাচ্ছে, তখন আমি মিথ্যাকথা বলতে যাব কেন?" এরপর ডাক্তার আমাকে আরো বেশি মাত্রায় বিষটা দিলেন। সকলের চোখের সামনে আমি তাকে বিষটা দিলাম। ভুলু চুপচাপ তা খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার শরীরটা নিথর হয়ে গেল।

ভুলুকে, সাধুদের যেভাবে করা হয়, সেইভাবে সমাধিস্থ করা হলো। আমাদের এলাকার এক কোণে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে তার শরীরটা তাতে শুইয়ে দিলাম, তারপর তাতে মাটি চাপা দিলাম। ওপরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হলো—জায়গাটা একটা স্মৃতিস্থলের মতো হয়ে দাঁড়াল। (বহুবছর পরে ১৯৭১ সালে আমি কনখলে যাই। এক মুসলমান মালি, যে ভুলুর পুরো ঘটনাটা জানত, সেসময়ে কয়েকজন সাধুকে বলেঃ "মহারাজ নিশ্চয়ই জায়গাটা দেখতে চাইবেন।" তাই সেখানটা পরিষ্কার করে রাখা হয়। কে একজন সেখানে একটি ফুলও রেখে দেয়। সকলে আমাকে বলে, সেবাশ্রমের সকলেই ভুলুর কাহিনী জানে। সেবাশ্রমের ইতিহাসে ভুলুর বিশেষ ভূমিকার কথা মনে করে তারা জায়গাটাকে সংরক্ষিত করে রাখতে চায়।)

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে করাচিতে

ততদিনে সেবাশ্রমে আমার নয়বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি হয়তো সেইখানেই থেকে যেতাম। কিন্তু ১৯৪২ সালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে যুদ্ধকালীন অপসারণ শুরু হওয়ার পর তিনি রেঙ্গুন থেকে কলকাতা পুরো পথ পায়ে হেঁটে এসেছিলেন। জাপানিরা ব্রহ্মদেশে বোমাবর্ষণ করছিল, লোকজন তাই সেখান থেকে ভারতে পালিয়ে আসছিল। বেশির ভাগ লোককেই পায়ে হেঁটে আসতে হচ্ছিল—সকলের ভাগ্যে তো আর প্লেন বা জাহাজ জোটেনি। রঙ্গনাথানন্দজীকে প্লেন ও জাহাজে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি 'জনগণের সঙ্গে থাকা'ই বেছে নিয়েছিলেন। পথে আহার্য বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা মিলেছিল তাই তাঁকে খেতে হয়েছিল। বেলুড় মঠে তিনি যখন পৌঁছালেন, তখন তাঁর পাকযন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে গেছে, ওজন ৩৫ কেজিতে এসে ঠেকেছে। সুপণ্ডিত রঙ্গনাথানন্দজী রেঙ্গুনে তাঁর বাগ্মিতার জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন—তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। তাঁকে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কনখলে যেতে বলা হলো। কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানালেন—ওখানে একজন করিৎকর্মা ব্রহ্মচারী আছে, সে আপনার ভালরকম যত্ন করতে পারবে। তারপর তাঁরা আমাকে চিঠিতে লিখলেনঃ "রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ, সযত্নে ওঁর পরিচর্যা করবে।" আমি তাঁকে নিয়ে আসতে রেলস্টেশনে গেলাম। রঙ্গনাথানন্দজী এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, হাঁটতেও পারছিলেন না। আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে তাঁকে সেবাশ্রমে নিয়ে এলাম। তাঁর চিকিৎসার জন্য আমি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করলাম। তাঁকে খুব নরম বাসমতী চালের ভাত 'চিজ' মিশিয়ে খেতে দেওয়া হতো। চারমাসে তিনি অনেকখানি সামর্থ্য অর্জন করলেন, এমনকি আমাদের সঙ্গে ভলিবলও খেলতে লাগলেন।

রঙ্গনাথানন্দজী স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পর বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে করাচি কেন্দ্রের দায়িত্ব দিতে চাইলেন। তিনি রাজি হলেন এই শর্তে যে, আমি তাঁর সঙ্গী হব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে তখনি কনখলের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারলেন না। রঙ্গনাথানন্দজী বললেনঃ "আপনারা সময় নিন। আমি এখনি করাচি যাচ্ছি। যথাসম্ভব শীঘ্র আপনারা ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।" ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে তিনি করাচি চলে গেলেন, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম। কনখল ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছিল না, অপরদিকে রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে থাকারও আমার ইচ্ছা ছিল। তিনি এমনই এক অত্যদ্ভুত ব্যক্তিত্ব! ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তাঁর সঙ্গে কাটাতাম। তিনি শুধু একজন পণ্ডিতই নন, একজন উচ্চকোটির সাধুও। বাস্তবিক আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। একমাত্র তাঁরই জন্য আমি কনখল ছাড়লাম। আমি যখন করাচি পৌঁছালাম, তিনি যার-পর-নাই আনন্দিত হলেন। [সমাপ্ত] ❑

* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি 'You will be a Paramahamsa' নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়।
—সম্পাদক

মায়ের চরণে এক অপূর্ব পুষ্প।

বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মজন্মান্তরের মা ঃ শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ • সম্পাদিকা ঃ প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা • প্রকাশিকা ঃ প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা • মূল্য ঃ ২০০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৪৫৫ • প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩

২০০৩ সালটি শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর ভক্তমণ্ডলীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারত তথা বিশ্বের নানা স্থানে তাঁর পুণ্য জীবন নিয়ে স্মরণ, মনন এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। হিংসা ও দ্বন্দ্বপূর্ণ আজকের অশান্ত বিশ্বে শ্রীমায়ের জীবন ও বাণী শান্তির দীপশিখা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথের পাথেয়স্বরূপ। এই মহান উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রকাশিত 'জন্মজন্মান্তরের মা' শীর্ষক শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষ স্মারক সঙ্কলনগ্রন্থটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে সন্ন্যাসিনী সম্পাদিকা জানিয়েছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এযুগে মাতৃভাব প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কেনই বা সঙ্গে এনেছিলেন একখানি অপরূপ মাতৃপ্রতিমাকে—এ-রহস্য আগামী যুগ নির্ণয় করবে।... 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'—সন্তানের এই আকুতি, স্নেহময়ী মায়ের প্রতি এই টান আজও রয়েছে নানা আকারে, নানা অভিব্যক্তিতে।" বস্তুত, কারো স্তুতিতে তিনি বড় নন, তাঁর মহিমা স্বয়ং-প্রত্যক্ষ। 'জন্মজন্মান্তরের মা' সেই মহিমার একটি দিগ্‌দর্শন।



শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী ও গৃহী ভক্তদের মধ্যে প্রথিতযশা ৪৫ জন লেখক-লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি মাতৃনামে সমুজ্জ্বল। সম্পাদিকা এগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' করে মা নামের যে 'মণিহার' খুব অল্প সময়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, তা কৃতিত্বের দাবি রাখে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীমঠ' প্রবন্ধে (শ্রীসারদা মঠে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ) মেয়েদের পৃথক মঠের উপযোগিতা এবং শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় বলেছেন—ঠাকুর ও মায়ের চিন্তাধারা কতভাবে কত দিকে রূপায়িত হবে, সমাজে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে নবভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ ও রূপায়িত করবে—তা কল্পনা করা সাধ্যাতীত। পূজনীয় মহারাজের এই সার্থক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন 'শ্রীসারদা মঠ'।

যুগমাতা, সঙ্ঘজননী, ভক্তবৎসলা শ্রীমায়ের অনন্যসাধারণ চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা রয়েছে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণার 'মাতৃমহিমা', প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা', প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার 'আমি পাতানো মা নই' প্রবন্ধে। শ্রীমায়ের শাশ্বত উপদেশ ঃ "যদি শান্তি চাও কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"—যতবারই বলা হোক, পুরনো হয় না। চাওয়া পাওয়াই সকল দুঃখের মূলে। সাংসারিক জীবনে ঠাকুর-মায়ের কাজে আমরা সুখ-আনন্দ-অর্থ-যশ প্রার্থনা করি, কিন্তু পরিণামে শোক-দুঃখ-কষ্টই পেয়ে থাকি। সেজন্য কি প্রার্থনা করতে হবে তাও শ্রীমা শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ "এককথায় বলতে গেলে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা, বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ।"

ভারতীয় শক্তিবাদের পটভূমিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডী ও বিভিন্ন তন্ত্রের বিশ্লেষণ, সেইসঙ্গে শাক্ত ঐতিহ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনার মাধ্যমে 'ষোড়শী' রূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে পূজা করে জগতের মাঝে তাঁর স্বরূপটি কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ঘাটন করেছেন—তার বর্ণনা দেখি গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'হে বালে হে ত্রিপুরসুন্দরি' এবং ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবীর 'অধ্যাত্মশাস্ত্রে মাতৃশক্তি' প্রবন্ধ-দুটিতে। ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে মাতৃভাবে অভিষিক্তা করে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "হে কালিকে, সে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতা, হে ত্রিপুরাদেবি! সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার দেহ-মন পবিত্র করিয়া ইহাতেই আবির্ভূতা হও। ইহার মধ্যে বিরাজিত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃভাব আরাধনার এটিই শেষকথা।

স্বামী চেতনানন্দ 'যা দেবী সা সারদা' প্রবন্ধে সা-র-দা নামের রহস্য বিশ্লেষণে বলেছেন—কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপু, বিপদ-আপদ, আদি-ব্যাধি, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করে জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, সুখ-সম্পদ-আনন্দ দান করেন—তিনিই সা-র-দা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত দেবী দুর্গার ২৩টি রূপের বিশদ ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রীমায়ের স্বরূপটি তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। লেখক 'শ্রীমায়ের স্বরূপ কথন' এবং 'সন্ন্যাসী ও ভক্তদের দর্শন ও অনুভব' অংশে শ্রীমায়ের আনন্দরূপিণী, তপস্বিনী, লোকজননী, জ্ঞানদায়িনী ও সঙ্ঘজননী ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'যিনি তীর্থযাত্রী তিনিই তীর্থদেবতা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, জয়রামবাটী থেকে সঙ্গিনীদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে দস্যুদের কবলে পড়ে শ্রীমায়ের অপূর্ব লৌকিক ও অলৌকিক ব্যবহারে দস্যুদম্পতির হৃদয় যে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা তাঁর স্নেহ-বাৎসল্যে ভরা লোকজননী রূপেরই সার্থক রূপায়ণ।

'গীতা' ও 'চণ্ডী'তে যেসকল গুণের উল্লেখ আছে—কীর্তি-শ্রী-বাক্-স্মৃতি-মেধা-ধৃতি-ক্ষমা-বুদ্ধি-ক্ষান্তি-লজ্জা-শান্তি-শ্রদ্ধা-কান্তি-লক্ষ্মী-দয়া ও তুষ্টি সবই শ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রে শতদলের মতো পূর্ণবিকশিত। সাংসারিক জীবনে কিভাবে চললে মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে শান্তিতে স্থিরচিত্তে ভগবৎ-অভিমুখী হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সুব্রতা সেনের 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্', বন্দিতা ভট্টাচার্যের 'জয়রামবাটীর মানবী মা', প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণার 'সংসারের আলোছায়ায় শ্রীমা', প্রব্রাজিকা ভাস্করপ্রাণার 'সমদর্শিনী

মা', প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণার 'সাধনার নীরব অধ্যায়', কৃষ্ণা সেনের 'পতিতোদ্ধারিণী' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তাঁদের প্রাণোচ্ছল লেখনীর স্পর্শে প্রবন্ধগুলি বাস্তবিক প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

শ্রীমা শিখিয়েছেন: ''সংসারে চেতন-অচেতন সকলকেই ভালবাসতে হবে। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। সংসারে সকলের প্রতি সমান ভালবাসা হয় কি করে জান? যাকে ভালবাসবে, তার কাছে প্রতিদানে কিছু চাইবে না।'' প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার 'তাঁর সংসার ভালবাসায় গড়ে উঠেছে' প্রবন্ধে শ্রীমায়ের এই ভালবাসার স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

নারীজাতিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেই শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনার গুরু নির্বাচন করেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে। ষোড়শী পূজার মাধ্যমে শ্রীমায়ের মধ্যে সুপ্ত দৈবী শক্তিকে জাগ্রত করে তিনি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে আগত মহীয়সী নারীগণ—গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা সকলেই ছিলেন নারীজাগরণের পথিকৃৎ। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শুধু নিবেদিতা নন, সমগ্র নারীজাতি জাগ্রত হোক শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে। প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণার 'নারীজাগরণ ও শ্রীশ্রীমা' এবং দীপালি রায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমার প্রভাব' প্রবন্ধ-দুটিতে এরই বিশদ ব্যাখ্যা।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, শ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠ গড়ে উঠবে। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতা গড়ে তোলেন বালিকা বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই শ্রীমা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ও প্রাণ-স্বরূপ। শ্রীমায়ের দিব্যসান্নিধ্যে সেবিকা সরলাদেবী কীভাবে উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন, তারই বিবরণ দেখি প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণার 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মাতৃমন্দির ও শ্রীশ্রীমা' এবং প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণার 'শ্রীশ্রীমা ও সেবিকা সরলা' প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের গ্রাস থেকে প্রাচীন সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শকে পুনরুদ্ধার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। উনিশ শতকের রেনেশাঁস বা নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। অবহেলিত ও নিপীড়িত নারীজাতিকে শিক্ষায়, আধ্যাত্মিকতায় ও সাংসারিক আদর্শে তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ইত্যাদি মহান ভাবের বিকাশ ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। এর কেন্দ্রবিন্দু যেমন ছিলেন যুগাবতার, তেমনি যুগজননীও। তাঁর অপূর্ব জীবনচর্যা ভারতের নবজাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেছিল। সর্বোপরি ছিল তাঁর মাতৃত্ব, তাঁর দুকূলপ্লাবী ভালবাসা—যা শুধু ভারতবাসীই নয়, লাভ করেছিল পাশ্চাত্যের মানুষও। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, লরা এফ. গ্লেন (দেবমাতা)—এঁদের প্রতি শ্রীমায়ের যে গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, তা বাস্তবিক তুলনাহীন। চিত্রা দেবের 'উনিশ শতকের কলকাতায় শ্রীশ্রীমা', স্বরাজ মজুমদারের 'অ-ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে মা সারদা' এবং নিমাইসাধন বসুর 'বর্তমান পাশ্চাত্যে শ্রীশ্রীমার প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধ-তিনটি শ্রীমায়ের এই দিকটিই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্তানদের চোখে শ্রীমা ছিলেন সনাতন ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি। স্বামীজী তাঁকে বলতেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। তিনি আরো বলেছেন: ''মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনো কেউ পারে না, ক্রমে পারবে।'' স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তিনি ছিলেন শক্তিরূপা 'সাক্ষাৎ জগদম্বা'। লাটু মহারাজের দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং 'লক্ষ্মী'। মায়ের দুই সেবক স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাঁর মধ্যে দেখতেন দেহধারিণী 'আদ্যাশক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ সন্তানদের স্মৃতিতে শ্রীমায়ের জীবনের দু-চারটি ছবি যেভাবে ধরা পড়েছে, তার তুলনা মেলে না। তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা একই শক্তির দুই প্রকাশ। প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণার 'এক বাউলের দল এসেছিল' অধ্যায়টি তাই বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়।

সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা এতদিন জানতাম, কিন্তু স্বামী সর্বগানন্দের 'সঙ্গীতময়ী শ্রীশ্রীমা' প্রবন্ধে শ্রীমায়ের জীবননাট্যের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। শ্রীমা বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকার গাণ মন দিয়ে শুনেছেন এবং প্রীতিলাভ করেছেন। আবার কোথাও নিজেই গেয়েছেন—'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী', 'বহু সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্বাদল শ্যামে' ইত্যাদি। এসকল গানের বিভিন্ন দিক সর্বগানন্দজী একুশটি অংশে ভাগ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন, যা নতুনত্বের দাবি রাখে।

এই স্বল্প পরিসরে সকল রচনার আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও স্বামী প্রভানন্দের 'রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন ও শ্রীমা', স্বামী

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

নারীজাগরণ বিনা কোন দেশ বা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। স্বামীজী বলতেন, পাখি যেমন একটি ডানার সাহায্যে উড়তে পারে না, তেমনি পুরুষ ও নারীর উন্নতি সমানভাবে না ঘটলে কোন জাতির উন্নতিও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে নারীর উন্নয়ন ভারতেতর দেশের চেয়ে ভিন্নতর। স্বামীজী বলেছেন, ভারতীয় নারীর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে তার মাতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে। শ্রীশ্রীমাকে স্বামীজী আধুনিক ভারতের নারীজাগরণের মূল কেন্দ্রবিন্দু বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং গৌরী-মার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ভিতপূজা করেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষে দক্ষিণেশ্বরে স্থাপিত হয় শ্রীসারদা মঠ।

এবারের প্রচ্ছদের বিষয় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে নারীজাগরণের তাৎপর্য ও বিকাশ'। চিত্রে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, নিবেদিতা স্কুলের আদি ভবন এবং বেলুড় মঠের মন্দিরের আদলে নির্মিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠের মায়ের মন্দির দৃশ্যমান।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার ৫৭৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৭ম পঙ্‌ক্তিতে 'Sacred looks'-এর পরিবর্তে 'Sacred books' হবে।

গত আশ্বিন ১৪১১ সংখ্যার ৭৯৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩৩তম পঙ্‌ক্তিতে 'সাগরদিঘীতে'-এর পরিবর্তে 'সাগরদাঁড়িতে' হবে।

গত কার্তিক ১৪১১ সংখ্যার ৮৮২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে আছে কবীরের স্মরণীয় উক্তি: ''পাত্থর পূজেঁ হরি মিলে, তো মৈঁ পূজুঁ পহাড়।'' হবে—মীরাবাঈ-এর স্মরণীয় উক্তি: ''পাত্থর পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু পাহাড়।''

মুমুক্ষানন্দের 'একালের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা', স্বামী বলভদ্রানন্দের 'শুধু কি আমারই দায়, তোমারও দায়', প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণার 'কয়েকটি শিশু ও শ্রীমা', প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার 'আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের উপায়', প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণার 'অতীত ভারতের তেজস্বিনী ও এ যুগে শ্রীমা', হর্ষ দত্তের 'নরেনের দুর্গোৎসব', বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর 'রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর' এবং অন্যান্য লেখক-লেখিকার রচনায় শ্রীমার জীবনের বিভিন্ন ছবি যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার।

কেবল হিন্দু নয়, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লেখক-লেখিকার লেখনীও মাতৃ-আরাধনায় সমুজ্জ্বল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি অর্জন করেছিলেন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। শুধু মুখেই বলতেন না: "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা", তিনি অন্তর দিয়ে তা অনুভব করতেন। তাই আজও দেখি 'করুণা-পাথার জননী'র অকৃপণ স্নেহ-মমতা অজস্র ধারায় তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ওপর বর্ষিত হয়ে চলেছে। তারই কয়েকটি মর্মস্পর্শী বিবরণ পাঠ করতে গিয়ে মনে হয় 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'। যেমন, কাজী নুরুল ইসলামের 'স্নেহময়ী সারদা দেবী', রওশন আরা ফিরোজের 'উপনিষদের আলোতে সারদা দেবী' এবং মারুফী খানের 'মাগো, আশিস তোমার অশেষ ধারায়' ইত্যাদি প্রবন্ধে।

সন্ন্যাসিনী সম্পাদিকার 'একটি অনুধ্যান'-এ মাতৃস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীমায়ের চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের বিকাশ তাঁর লীলাকে অনুসরণ করে হয়নি, একটা অদ্ভুত ও আশ্চর্য স্বতন্ত্র ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্বে। শ্রীমায়ের মাতৃমহিমার এই দ্যুতিতে স্নাত পাশ্চাত্যের বিদেশিনীদের কাছে শ্রীমা ছিলেন পরম বিস্ময়—ভারতীয় নারী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।

গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, স্মৃতিকথা ও সঙ্কলনগ্রন্থে উদ্ভাসিত 'উল্লেখপঞ্জী'টি খুবই আকর্ষণীয়। এছাড়া আছে ২০টি আলোকচিত্র। শ্রীমায়ের স্বরূপরহস্য, কঠোর-কোমলের মিশ্রণে তেজস্বিতা, সঙ্ঘ পরিচালনা, শ্রীসারদা মঠের ইতিহাস, ভারতীয় শক্তিবাদের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের সাধনা, সর্বোপরি তাঁর অপার্থিব মাতৃমহিমা 'জন্মজন্মান্তরের মা' গ্রন্থটিতে যেন পারমার্থিক রূপলাভ করেছে।

ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যেকোন পাঠকপাঠিকা এই গ্রন্থপাঠে অপরিসীম আনন্দ ও শান্তি লাভ করবেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সব মিলে গ্রন্থটি এত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, যা সামান্য পরিচয় দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। মুদ্রণ ত্রুটিহীন। প্রচ্ছদ, অনুক্রম, উল্লেখপঞ্জী, নির্ঘণ্ট গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদের দৃশ্যটিও চিত্তাকর্ষক—গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আমাদের হৃৎপদ্মও প্রস্ফুটিত হোক শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য মহিমায়। এই মহিমার দিব্যকাহিনী দুই মলাটের মধ্যে উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থটির প্রকাশিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা এবং সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ❑

শব্দচেতনা ৪২

পুরাণভিত্তিক শব্দছক

১				২	■	৩		৪	
	■	■	■		■		■		■
৫	৬		■	৭			■		■
■		■	■		■	■	৮		৯
১০		■	১১		■	১২		■	
	■	১৩		■	১৪		■	১৫	
১৬	১৭		■	■		■	■		■
■		■	১৮			■	১৯		২০
■		■		■		■	■	■	
২১				■	২২				

পাশাপাশি: (১) মহাদেবের এক নাম (৩) পঞ্চমুখবিশিষ্ট শিব (৫) উতথ্যের পত্নী, দীর্ঘতমার মাতা (৭) ইন্দ্রের উপবন (৮) দুর্গার এক নাম (১০) কন্দর্পদেবের এক নাম (১১) কৃষ্ণের এক নাম (১২) কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি কপিরাজ (১৩) ভীমের এক স্ত্রী '——ন্ধরা' (১৪) মদনদেবের এক নাম (১৫) ঈশ্বর (১৬) কার্তিকের দ্বারা নিহত অসুরবিশেষ (১৮) মৃত্যুর দেবতা (১৯) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (২১) শিব ও দুর্গা (২২) বিষ্ণুর এক অবতার।

ওপর-নিচ: (১) ব্রহ্মার পুত্র, ঋষিবিশেষ (২) শনি/যম (৩) বায়ুর অধিদেবতা (৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (৬) গঙ্গার বাহন (৮) বামন অবতারে বিষ্ণুর দ্বারা বিজিত দৈত্যরাজ (৯) দনুর পুত্র (১০) সূর্যবংশীয় এক প্রাচীন রাজা (১১) যমের এক নাম (১২) শিবের এক নাম '——দেব' (১৩) ভীমের দ্বারা নিহত রাক্ষসবিশেষ (১৪) শ্রীরামচন্দ্র (১৫) গীতোক্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (১৭) শ্রীরামচন্দ্রের এক নাম (১৮) শিবপত্নী দুর্গা (২০) বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম।

প্রশান্ত গুপ্ত

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ফাল্গুন ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় ঃ গত ২০-২৩ অক্টোবর ২০০৪ মহাসমারোহ ও আনন্দের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ভক্ত জগন্মাতার আশীর্বাদলাভের জন্য এই চারদিন মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হন। আকাশ পরিষ্কার ও সূর্যকিরণে উজ্জ্বল থাকার জন্য এবারের পূজায় অনেক বেশি ভক্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২১ তারিখ কুমারীপূজায় অন্যান্য বারের মতো প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। আগের বছরগুলির মতো এবছরেও কলকাতা দূরদর্শন পূজার সব দিনই বিভিন্ন সময়ে এই পূজা সরাসরি সম্প্রচার করে। এই কয়দিনে প্রায় ৭৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন

গত অক্টোবর ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ, কুচবিহারের উপকেন্দ্রে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে উক্ত আশ্রমটি তার উপকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এর নাম হয়েছে—**রামকৃষ্ণ মঠ, মেখলিগঞ্জ।** ঠিকানা ঃ জেলা—**কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। পিন-৭৩৫৩০৪। ফোন ঃ (০৩৫৮৪) ২৫৫২৭২।**

দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী ঃ গত ১০ অক্টোবর ২০০৪ নবনির্মিত অতিথিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

পুরী মঠ ঃ গত ৮ অক্টোবর ২০০৪ অতিথি-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ মঠ, কুচবিহার ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট ২০০৪ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ৫০টি শিশুকে দুধ দেওয়া শুরু হয়েছে। একবছর ধরে এই প্রকল্প চলবে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দন্তপরীক্ষা ও দন্ত বিষয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৩০ জনের দন্তপরীক্ষা করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব

গত ২৯-৩০ অক্টোবর ২০০৪ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের বিভিন্ন দিক, নারীকল্যাণ সম্পর্কিত পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। এছাড়া ভাবপ্রচার পরিষদগুলির বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, চারজন সহ-সম্পাদক, পরিষদ-সমূহের ১৩১ জন কর্মকর্তা এবং ১১ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষদ্বয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, পরিষদসমূহের কর্মকর্তাগণ এবং পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কয়েকজন সন্ন্যাসী।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রে বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করা হয়—বরানগর মঠ, ভুবনেশ্বর, মাইসোর, নরোত্তমনগর, বিশাখাপত্তনম্ ও সারদাপীঠ।

বহির্ভারত

মরিশাস আশ্রম এবং **বাংলাদেশের বালিয়াড়ি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট** কেন্দ্রে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রে দুর্গাপূজার বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় সরকার ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, আইনমন্ত্রী মৌদুদ আহমেদ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক রাজ্যমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ এরশাদ এবং আরো কয়েকজন সম্মানীয় ব্যক্তি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

দেহত্যাগ

স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী (হৃষীকেশ মহারাজ)

গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪, মহালয়ার দিন রাত্রি ৯টায় ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৩ সালে দেওঘর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে এবং মনসাদ্বীপ ও আলমোড়া কেন্দ্রে অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। গত ৫ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, আত্মপ্রচারবিমুখ ও তপস্বী স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৩ ও ২৫ নভেম্বর ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী ও স্বামী হররূপানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, চাতরা (বীরভূম)ঃ গত ২৫ এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পূজা, নগর-কীর্তন, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'ভাগবত' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও প্রশান্ত সিনহা। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক বামদেব সাহা। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান)ঃ গত ২৫ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঘোড়া নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন শ্রীসারদা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (হুগলি)ঃ গত ২৫ এপ্রিল ২০০৪ সঙ্গীত, কবিতাপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বারুইপাড়া রাখাল বিদ্যাপীঠে বার্ষিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মহামণ্ডলের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠ ও স্বাগত-ভাষণ দেন স্থানীয় মহামণ্ডলের সহ-সম্পাদক সুকুমার সাঁতরা। ভাষণদান ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মহামণ্ডলের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের সোমনাথ বাগচী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিষদ (২০০৩) (কলকাতা-৪)ঃ গত ১-২ মে ২০০৪ বিশেষ পূজা, কবিতাপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১ তারিখ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রাজীবানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী পরমাত্মানন্দজী ও দীপক সরকার। ২ তারিখ প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দি আর্ট জুয়েলারি, বেলঘরিয়া (কলকাতা-৫৬)ঃ গত ১-২ মে ২০০৪ শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী স্মরণে 'শ্রীমা সারদা দর্শন' শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। ভাষণ দেন স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী ও অধ্যাপক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কুচবিহারঃ গত ২ মে ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে তিনি কল্যাণ দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন চিন্তা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (হুগলি)ঃ গত ২ মে ২০০৪ অর্ঘ্যপ্রদান, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা, জপধ্যান, ভজন, ভক্তিগীতি, ক্যুইজ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১৭৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক শিবিরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পাঠমন্দিরের সম্পাদক অজিত ঘোষাল।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ৩-৫ মে ২০০৪ বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, অধিবাস, সাধুসেবা, প্রভাতফেরি, ভজন, কীর্তন, গীতিনাট্য, ছৌনাচ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন হয়। ৪ তারিখ বুদ্ধপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন দুপুরে ৩৫ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ৫ তারিখ প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম)ঃ গত ৪ মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, আশ্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, ভগবান বুদ্ধদেব সম্পর্কে পাঠ ও আলোচনা, মহানামসঙ্কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন ও সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম)ঃ গত ৯ মে ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন অধ্যাপিকা ডঃ অঞ্জলি গোস্বামী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা সেনচৌধুরী। স্বাগত-ভাষণ দেন সমিতির সভাপতি ডঃ মণীন্দ্রচন্দ্র নাথ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অসিত গুপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, তপন (দক্ষিণ দিনাজপুর)ঃ গত ১৫-১৬ মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, অঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক, কার্তিকচন্দ্র পাল। প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

কলকাতা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদঃ গত ১৫-১৬ মে ২০০৪ **ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৯)**-এ শান্তিমন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ, গীতি-আলেখ্য, সেতারবাদন, যন্ত্রসঙ্গীত, নাটক, চিত্রপ্রদর্শনী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ তারিখ সকালের কার্য-নির্বাহী সভায় ১৩টি সদস্য আশ্রমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব এবং বার্ষিক পত্রিকা 'নৈবেদ্য' প্রকাশ করেন স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী। সদস্য আশ্রমগুলির বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তরদান করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ডাঃ গৌর দাস। উভয়দিনে বহু ভক্ত অংশগ্রহণ করেন এবং সকলকে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর গ্রন্থ প্রদান করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটী (কলকাতা-৫১)ঃ গত ১৬ মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালেখ্য পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদঃ গত ২২-২৩ মে ২০০৪ পতাকা উত্তোলন, বিশেষ পূজা, পুরস্কার-বিতরণ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে মেঘালয়ের **গারো পাহাড় জেলার কুড়ালভাঙা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে** পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী রঘুনাথানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মদেবানন্দজী, স্বামী ঈশাত্মানন্দজী এবং ২৫টি সদস্য আশ্রমের প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ সদস্য আশ্রমগুলির বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তরদান এবং প্রতিদিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন। বিকালে স্থানীয় হাজং ও গারো উপজাতির মেয়েরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি)ঃ গত ২৩ মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০ মে ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী।

শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ২৩ মে ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শেখরানন্দজী ও ডঃ সুরেশরঞ্জন কুইতি। দুপুরে ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, বহিচাড় (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৪ মে ২০০৪ শান্তিমন্ত্র ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, সঙ্গীত, ভি.ডি.ও. শো প্রভৃতির মাধ্যমে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী ও ৬ জন ছাত্রছাত্রী। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপাঠী। প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দেন স্বামী কালাতীতানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৩ মে মেদিনীপুর ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক সম্মেলন এই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী।

হুগলি-চুঁচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, রথতলা (হুগলি)ঃ গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ শহর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে হুগলির শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর প্রারম্ভিক উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনে ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী যতীশানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ ভক্তসম্মেলন, মাতৃসম্মেলন, বেদমন্ত্র পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, চিত্রপ্রদর্শনী, স্মারক পুস্তিকা 'চরৈবেতি' প্রকাশ, ভক্তসেবা, ১৫০টি প্রদীপ প্রজ্বলন, নৃত্যগীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দেন স্বামী রামময়ানন্দজী, স্বামী অঘোরেশানন্দজী, স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী, প্রব্রাজিকা সত্যপ্রাণাজী, বীথিকা ভট্টাচার্য, নীহারকণা নাজির, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, মিলন মন্দিরের সম্পাদক ডাঃ রাজীবলোচন করমহাপাত্র, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র জানা, গার্গী ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ এবং ১০৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা)ঃ গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, স্তোত্র ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, চিত্রপ্রদর্শনী, ঊষাকীর্তন, সম্মেলন, ভজন, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। সম্মেলনে ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ও বসে প্রসাদ পান। সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক বিমল চক্রবর্তী।

দি বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬)ঃ গত ৩০ মে ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ, সঙ্গীত, লীলাগীতি, সরোদ বাদন প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী হররূপানন্দজী, স্বপন চক্রবর্তী, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 'উপনিষদ্' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং 'কথামৃত' পাঠ করেন যথাক্রমে সোসাইটির সহ-সভাপতি ডঃ কমল নন্দী এবং প্রবীরচন্দ্র ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোসাইটির সম্পাদক বিপ্লব তরফদার ও সহ-সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র সাহা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা অনুধ্যান পীঠ, বালি (হাওড়া)ঃ গত ৩ জুন ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী, ডঃ চিন্ময়ী নন্দী ও বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ দিনাজপুর)ঃ গত ৩-৪ জুন ২০০৪ মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'কথামৃত'

ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী ও স্বামী পরাশরানন্দজী। প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ এবং ৭৫ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটি অনাথ শিশুকন্যার আজীবন দায়িত্ব আশ্রম কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। ৪ তারিখ স্বামী দিব্যানন্দজীর পরিচালনায় বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারের বন্দিদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ সৈকত বটব্যাল ও ডাঃ হিমাংশু বর্মণ অংশগ্রহণ করেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এই সংশোধনাগারে একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেছেন।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (কলকাতা-৯) ঃ গত ৪-৬ জুন ২০০৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদি মোহনচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে (উচ্চ মাধ্যমিক) একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩০৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী। ভাষণ দেন সোমনাথ বাগচী, গৌরগোপাল সাহা, ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অমিত দত্ত। এই শিবিরে মহামণ্ডলের সঙ্ঘগীতি শিক্ষা, শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ৫-৬ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, নাটিকা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে **সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকদ্বীপে** বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিষদের সভাপতি স্বামী শান্তিদানন্দজী, সহ-সভাপতি স্বামী রাজীবানন্দজী এবং স্বামী যতীশানন্দজী প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। পরিষদের আহ্বায়ক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় পরিষদের এক বছরের রিপোর্ট পেশ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিষদের মুখপত্র 'দক্ষিণমুখ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সম্মেলনে ৩০টি আশ্রমের প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী।

বেথুয়াডহরী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (নদীয়া) ঃ গত ৫-৬ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বসে আঁকো ও কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জে. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ এবং সেবাসমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। ৪৭টি আশ্রমের ১৬০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৫ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৬ তারিখ পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শুকদেবানন্দজী।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ৬ জুন ২০০৪ মঙ্গলারতি, পথপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা', 'কথামৃত' ও 'ভাগবত' পাঠ, 'মায়ের কথা' আলোচনা, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, শ্যামাগীতিকথা, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবাত্মানন্দজী ও স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৪০ জন দুঃস্থ নারায়ণকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

শিবশক্তি সঙ্ঘ, রাইপুর (বাঁকুড়া) ঃ গত ১৫ জুন ২০০৪ আদিবাসী নৃত্য-সহ প্রভাতফেরি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, তাৎক্ষণিক কবিতাপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী, ডাঃ সুনির্মল বেরা ও দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে উৎসব উদ্যাপন কমিটির সম্পাদক কৌশিক চ্যাটার্জি ও আহ্বায়ক সজলকান্তি মণ্ডল। সভার শেষে প্রায় ১০০ দুঃস্থ নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী।

বালি ঘোষপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (হাওড়া) ঃ গত ১৮ জুন ২০০৪ মন্দিরগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী নরদেবানন্দজী।

সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ভদ্রেশ্বর (হুগলি) ঃ গত ১৮-২০ জুন ২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ভক্তসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব ও প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। উৎসবের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী বামনানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী।

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, জয়নগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৯ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভজন, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন নবনির্মিত ঠাকুরঘর ও দরিদ্র বিদ্যার্থীদের পাঠভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী সুনিশ্চিতানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুনিশ্চিতানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে 'সবার স্বামীজী' পুস্তিকা এবং ৩০০ জনকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ফটো দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি) ঃ গত ২৭ জুন ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১২১ জন যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী, প্রদীপকুমার সেন এবং ডঃ প্রজ্বল দত্ত। যুব প্রতিনিধিরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী ঋতানন্দজী।

শ্রীসারদা সঙ্ঘ, শিলং (মেঘালয়) ঃ গত ২৮ জুন ২০০৪ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী ব্রহ্মদেবানন্দজী, মেঘালয়ের রাজ্যপাল এম. এম. জেকব, ও রাজ্যের মুখ্যসচিব পি. জে. বেজলী। মাননীয় রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সঙ্ঘের সম্পাদিকা সানু মুখার্জি এবং

অধ্যক্ষা মিনতি দত্তরায় তাঁদের বক্তব্য ও বিবরণ পাঠ করেন। সঙ্ঘের বয়োজ্যেষ্ঠা ৮ জন সদস্যাকে মানপত্রাদি এবং ১২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চন্দননগর (হুগলি) ঃ গত ২ জুলাই ২০০৪ গুরুপূর্ণিমার দিন মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। গুরুপূর্ণিমা তিথি ও গুরুতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ সত্যব্রত পাল ও অনীশ রায়চৌধুরী। সঙ্ঘের ইতিহাস তুলে ধরেন সঙ্ঘ-সচিব দুলালচন্দ্র নায়েক। সকালে মায়ের বাণী পরিবেশন এবং বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন স্বামী সুখানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, কটক (ওড়িশা) ঃ গত ৪ জুলাই ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ আশ্রমে ভক্তসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন, শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা এবং কটকের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩০ মে ও ৬ জুন ২০০৪ যথাক্রমে আলোচনাসভা এবং লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত যুব পাঠচক্রে ভাষণ দেন অধ্যাপক তত্ত্বকন্দর মিশ্র, অধ্যাপক শচীন্দ্র রাউল, প্রভাতি মিত্র ও রূপা মিশ্র।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ৪ জুলাই ২০০৪ পূজা, পাঠ, আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রদর্শনী ও বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের উদ্বোধন এবং তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী কালাতীতানন্দজী। ২০ জন যুব প্রতিনিধি পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এদিন ১৫ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

দি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ১০-১১ জুলাই ২০০৪ স্তবপাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী প্রাণারামানন্দজী, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণাজী, প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণাজী ও ডঃ চিন্ময় ঘোষ। ১০ তারিখ স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। ১১ তারিখ স্বাগত-ভাষণ দেন ডঃ নিমাইসাধন বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মৌড়ী তালপুকুরধার (হাওড়া) ঃ গত ১১ জুলাই ২০০৪ পাঠ, সঙ্গীত, চিত্রপ্রদর্শনী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী মিলনানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। মিলনানুষ্ঠানে ১১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন জয়কার্তিক চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী ও পুলককুমার মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তিময় স্বর্ণকার।

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ, নিউ ব্যারাকপুর ঃ গত ১১ জুলাই **দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে** ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৪৩টি আশ্রমের ১৯৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও স্বামী অনঘানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে কেন্দ্রের সভাপতি হরিপদ দত্ত ও আহ্বায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১১ জুলাই ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী গোকুলানন্দজী। এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ২,৫০০ মানুষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

সেবাব্রত

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ২৩ মে ২০০৪ কুচবিহার পৌরসভা ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৩ জন রক্তদান করেন।

রামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র, বেলঘরিয়া (কলকাতা-৫৬) ঃ গত ২৩ মে ২০০৪ 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাকাজ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন মহাদেব ঘোষ। ৩৫ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের পোশাক প্রদান এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী ত্যাগীবরানন্দজী।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) ঃ গত ১৩ জুন ২০০৪ ৭টি স্কুলের ৫০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও খাতা প্রদান করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে তিনি ভাষণ প্রদান করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কল্যাণী-নিবাসী নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত গত ৮ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর-নিবাসিনী চন্দনা ঘোষ গত ১২ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান-নিবাসিনী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী চপলাবালা গোস্বামী গত ১৪ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার কাশীপুর-নিবাসিনী অমিয়কণা চক্রবর্তী গত ১৬ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার সোদপুর-নিবাসিনী উষারানী চৌধুরী গত ২৬ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।❑

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

১০৬ তম বর্ষ

মাঘ ১৪১০ থেকে পৌষ ১৪১১
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৪

সম্পাদক

স্বামী সর্বগানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ আশি টাকা ❑ সডাক ঃ একশো টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা ❑
❑ শারদীয়া সংখ্যা ঃ পঞ্চাশ টাকা ❑

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উদ্বোধন

১০৬তম বর্ষ

মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪

বর্ষসূচি

দিব্য বাণী

কথাপ্রসঙ্গে ❋ স্বামী সর্বগানন্দ

প্রবন্ধ, নিবন্ধ ভাষণ, আলোচনা, চয়ন ইত্যাদি

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রম্যরচনা, নারীশিক্ষা, গবেষণা, শ্রদ্ধার্ঘ্য ইত্যাদি

ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র, শাস্ত্রালোচনা, পৌরাণিকী, শারদ অর্ঘ্য, স্মৃতিকথা ইত্যাদি

পরিক্রমা, মাতৃতীর্থপরিক্রমা, ব্যক্তিত্ব, স্মরণ, ক্রীড়াজগৎ ইত্যাদি

বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি

কবিতা

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্ষ শুরু মাঘ (জানুয়ারি) মাস থেকে। প্রতিবছর 'শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করছি'—এই সন্তানোচিত মনোভাব নিয়ে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। মূল্যবান রচনা পাঠানোর জন্য লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র এবং সম্পাদনার কাজে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলীর অনুবাদ করেছেন মূলত শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত। মুদ্রণের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রেণুপদ ঘোষ, ডঃ কমল নন্দী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রচ্ছদ ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করেছেন 'বনফুল প্রি-প্রেস' এবং প্রচ্ছদের গ্রাফিক্সের কাজ করেছেন স্বামী হররূপানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা জানাই। সকলের সমবেত প্রয়াসে 'উদ্বোধন'-এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রচারও বেড়েছে যথেষ্ট। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।—সম্পাদক



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বিজ্ঞানানন্দ মার্গ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩

দূরভাষ : ২৪১৩৩৬৯, ২৪১৩২৮৬ ✧ ফ্যাক্স : (০৫৩২) ২৪১৫২৩৫ ✧ ই. মেল : rkmsald@sancharnet.in

মাঘমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ শিবির—২০০৫

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুধী ভক্তবৃন্দ,

ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিবছর সারা মাঘ মাস জুড়ে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে) অনুষ্ঠিত হয় মাঘমেলা। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধু ঐ মাসটিতে সমাগত হন স্নানাদি ও কল্পবাসের জন্য।

প্রতিবছর মাঘমেলায় আমরা একটি ধর্মীয় তথা মেডিক্যাল শিবির (ক্যাম্প) পরিচালনা করি—ধর্মপ্রচার ও সাধু-ভক্তসেবার উদ্দেশ্যে। **২০০৫-এ শিবিরটি পরিচালিত হবে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।**

শিবিরের প্রধান প্রধান অঙ্গ হবে :

১. সাধু ও তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি সুসজ্জিত চিকিৎসালয়, যাতে থাকবে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ; থাকবেন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ।

২. ধর্মীয় বক্তৃতা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের জন্য একটি সৎসঙ্গ প্যাণ্ডেল ও মন্দির।

৩. সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বহিরাগত ভক্তদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

৪. হিন্দি, ইংরেজি ও বাঙলায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী এবং বেদান্ত সাহিত্য প্রচারের জন্য একটি পুস্তককেন্দ্র।

৫. শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার ওপর একটি চিত্রপ্রদর্শনী।

একথা বলা বাহুল্য যে, এইসব কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই পুণ্যকর্মে আপনার সহৃদয় অনুদান আমাদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আপনার দানের জন্য আমরা অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার অনুদানের জন্য ধন্যবাদের সঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

দয়া করে আপনার চেক/ড্রাফ্ট ইত্যাদি 'Ramakrishna Mission Sevashrama'-এর নামে 'ক্রস্‌ড ও অ্যাকাউন্ট পেয়ি' করে দেবেন।

আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক—এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

প্রভুসেবায় আপনাদের

স্বামী ত্যাগাত্মানন্দ

সম্পাদক

শিবিরে ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা

এবছর মাঘমেলা শিবিরে যেসব ভক্ত থাকতে চান, তাঁদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। **একজনের একদিনের জন্য খরচ পড়বে ১০০ টাকা। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ভক্তদের তিনদিনের খরচ বাবদ ন্যূনতম ৩০০ টাকা দিতে হবে। কল্পবাস উপলক্ষ্যে যাঁরা ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি অবধি থাকতে ইচ্ছুক, তাঁদের দিতে হবে ২,৫০০ টাকা।**

ভক্ত তীর্থযাত্রীদের তাঁদের থাকা-খাওয়ার খরচ অতি অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে ১৫ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে, ক্রস্‌ড ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট বা মানি অর্ডারের মাধ্যমে 'Ramakrishna Mission Sevashrama, Allahabad'-এর নামে।

● স্নানের প্রধান দিনগুলি ●

পৌষ পূর্ণিমা ২৫ জানুয়ারি, মৌনী অমাবস্যা ৮ ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমী ১৩ ফেব্রুয়ারি, মাঘ পূর্ণিমা ২৪ ফেব্রুয়ারি।

★ **বিশদ বিবরণের জন্য দয়া করে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ-২১১০০৩-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।**

★ **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যেকোন দান আয়কর আইনের (১৯৬১) ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।**



নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশুভাশিস পালিতের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে



শ্রীশুভাশিস পালিত

জন্ম—১২।১০।১৯৭২ মৃত্যু—২০।১২।২০০২

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তোমার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বাবা, মা, দাদা, বৌদি, ভগিনীগণ ও ভগিনীপতিগণ



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)**, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক**, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  গুসকরা-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **ডঃ শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
  ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৬১২৩৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ**, সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ-৭১৩৪০৩,ফোন ঃ০৩৪৩-২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ**
  নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯
- **অজয়কুমার গাঙ্গুলী**
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল**, হাওড়া রেলস্টেশন

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



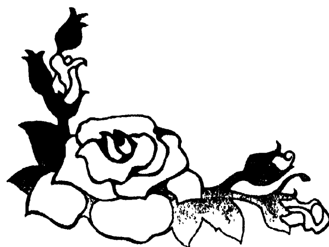
ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



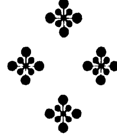
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ



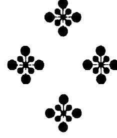
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol.106
No.12
December
2004

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL-RMS/WB/RNP-039/2004-06



উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন



আগামী ১লা মাঘ ১৪১১ (১৫ জানুয়ারি ২০০৫) 'উদ্বোধন' ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ করবে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৬ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

২০০৫ সালের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। দেরি করবেন না।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

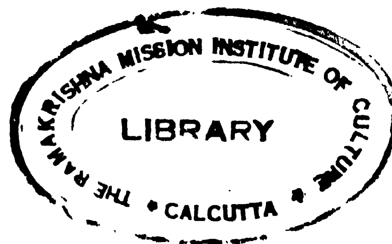
✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ**-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। কিন্তু সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে আগামী বৎসরের জন্য আমরা গ্রাহকমূল্য বৃদ্ধি করতে পারিনি, ৮০ টাকাই রাখা হয়েছে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।**

✡ ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন স্থানাধিকারীকে 'উদ্বোধন' এর ১০৭তম বর্ষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাগুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করা হবে। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে (সম্পাদক, ১নং উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০০০৩) অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক

উদ্বোধন সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা।
If undelivered, Please return it to
Udbodhan Office
1 udbodhan Lane, Kolkata-3


THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA


224149